বিষয়। পৃষ্ঠা।

১। অন্ত্যেষ্টি। (পদ্য) (শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ) ৯১
২। অসমীয়া কি স্বতন্ত্র ভাষা ? (শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ) ১৯৭
৩। অভ্রান্ত গুরু কে ? (শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস) ২৪৪
৪। অন্ধকার। (পদ্য) (শ্রীবরদাচরণ মিত্র, এম্-এ ; সি-এস্)... ... ২৭৭
৫। আর কয়েকটী প্রশ্নোত্তর। (শ্রীহারাধন দত্ত ভক্তিনিধি) ১২৮
৬। আকাশের খুকী। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ২৩৭
৭। আত্মার অস্তিত্ব ও জন্মান্তর পরিগ্রহ তত্ত্ব। (শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্,এ) ৪৪০
৮। ইয়োরোপে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রচার—ভ্রম প্রদর্শন। (শ্রীবিমলানন্দ নাগ) ... ৫৬৩
৯। এক অপরিজ্ঞাত কবি। (শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়) ২০৮
১০। ঐতিহাসিক মীমাংসা। (শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি,এ) ... ১৩৬,২৩৮,
১১। কৃষি কার্য্যের উন্নতি। (শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম,এ) ৬১,১৭৩,২৫০,ও ৬৬১
১২। কি ক্ষতি আমার ? (পদ্য) (শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী)... ... ৭৬
১৩। কর্ম্ম-যোগী ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়। (সম্পাদক) ১৪৩
১৪। কেন কাঁদ ? (পদ্য) (শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল) ... ১৫৭
১৫। কাব্যকুসুমাঞ্জলির কবি। (শ্রীকিশোরীমোহন রায়) ৬১৮
১৬। কার কথা শুনি ? (শ্রীজয়গোপাল দে, বি,এ) ৬৫৪
১৭। কার্ত্তিক পূজা। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ... ৪১৩
১৮। কৈফিয়ৎ। (শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর) ৫৯৮
১৯। খ্রীষ্টের জন্মকাল। (শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ৩৪৫
২০। গরিবসেবা—ভিক্ষাদান। (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম্-এ,বি-এল) ... ৪৬,১৯০
২১। গীতা সমালোচনা। (শ্রীজয়গোপাল দে, বি,এ) ৪৬৯
২২। গরিব ব্যাঙ্ক। (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্-এ ; বি-এল) ৫৩১
২৩। জীব গোস্বামী। (শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম্,এ ; সি,এস্)... ... ৪২২
২৪। তুমি কি দেবতা ? (পদ্য) (শ্রীবরদাচরণ মিত্র, এম্,এ ; সি, এস্,) ... ৬২১
২৫। ত্রয়োদশ শতাব্দী। (সম্পাদক) ১
২৬। ধ্যান ও ধারণা (পদ্য) (শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) ২৮০
২৭। ধর্ম্মের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। (সম্পাদক) ১১৪
২৮। নবশতাব্দীতে নব্যভারত। (শ্রীমধুসূদন সরকার) ১৯
২৯। নগ্নপ্রকৃতি। (পদ্য) (শ্রীবরদাচরণ মিত্র, এম্,এ ; সি-এস্) ... ৬০
৩০। নিমাই চরিত। (সমালোচনা) (শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়) ... ৯৩
৩১। নব্যবঙ্গ। (সমালোচনা) (শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, Barister-at-Law) ... ১৫৮
৩২। নেপালের পুরাতত্ত্ব। (১) (শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্,এ, বি,এল) ২৬৪
৩৩। প্রতিভার পূজা। (পদ্য) (শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম্,এ, বি,এল) ... ২৬
৩৪। প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র। (সম্পাদক) ৩৩
৩৫। পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ। ১২১,৩৭৬
৩৬। পৃথিবীতে জীবোৎপত্তি। (ডাক্তার এস্,বি, মিত্র, B. Sc., M. B. London) ১৪৫
৩৭। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ... ... ৩১২,৩৯০ ও ৬৬৪
৩৮। পুরাণ তত্ত্ব। (শ্রীঈশানচন্দ্র বসু) ৪০৫
৩৯। পত্রাবলী। (পদ্য) (শ্রী যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি,এ) ৫৭৮
৪০। ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ। (সম্পাদক) ... ... ২৮৭, ৪৪৮ ও ৵০
৪১। ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ ও তাহার সাহায্য-প্রাপ্তি স্বীকার। (অতিরিক্ত ফর্ম্মা) ৩৯০ও
৪২। ফুলের বিবাহ। (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম্,এ) ... ...

৪৩। বিয়োগ—[illegible] ... [illegible]
৪৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত, সি-এস্, সি-আই-ই) ... ২২
৪৫। বঙ্কিমচন্দ্র। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ২৪
৪৬। বৌদ্ধসঙ্ঘ। (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম্,এ) ৫১,২৩৩
৪৭। ব্রহ্মের অপবাদ। (শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ৭৮
৪৮। বঙ্কিম বাবু। (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম্, এ, বি, এল) ১০৩
৪৯। বর্ত্তমান বঙ্গভাষা। (শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি) ১৩২
৫০। বসন্তের বোধন। (পদ্য) (শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্,এ) ১৪০
৫১। ব্যাক্‌টেরিয়া। (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম্, এ) ১৬২
৫২। বাঙ্গালা উপন্যাসের বিশেষত্ব। (শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম্,এ, বি,এল) ... ১৭৯
৫৩। বাহ্য পূজা ও ব্রহ্মসাধন। (শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) ৬৩৬
৫৪। বেঙ্গল স্যানিটারি ড্রেনেজ বিল। (শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়) ২৬২,৩৭৯,৪৩০,৪৬১
৫৫। বঙ্গের আদি কবি চণ্ডিদাস। (শ্রীহারাধন দত্ত ভক্তিনিধি) ২৮১,৩৪৭
৫৬। বর্ষার বোধন। (পদ্য) (শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্,এ) ৪৪৮
৫৭। বাঙ্গালীর অবনতির কারণ। (শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম্,এ, বি,এল) ... ৪৮০
৫৮। বিদ্যাপতি। (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম্,এ) ৫৩৯
৫৯। ভগবদ্গীতা। (শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম্,এ, বি-এল) ... ২৪১,৪১৫,৫৮১
৬০। ভীষ্ম। (শ্রীমধুসূদন সরকার) ৫০৫
৬১। মন্থরা। (শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু) ৬৫
৬২। মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন ? (শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) ... ৮১,৩৯৩
৬৩। মধুপুর। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ৬৩৬
৬৪। মৃত্যু। (শ্রীদাশরথি ঘোষ, এম্,এ, বি,এল) ১৯৩
৬৫। মাংসাদ উদ্ভিদ। (সচিত্র) (শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়) ৩৩১
৬৬। মার্কিন পদ্ধতি। (শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়) ৬০৮
৬৭। মগধের পুরাতত্ত্ব। (শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্,এ, বি,এল) ৩৫৬,৫১০
৬৮। যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল। (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম্,এ,) ... ৪৪৯
৬৯। রূপসনাতন। (শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম্,এ ; সি,এস্) ... ২২৫
৭০। রূপসনাতন। (প্রতিবাদ) (শ্রীগোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ) ... ৩৬৭
৭১। শ্রীকৃষ্ণ-যাত্রা। (শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত) ৫৪৭
৭২। শ্রীরূপ ও সনাতন। (প্রতিবাদ) (শ্রীহারাধন দত্ত ভক্তনিধি) ৫০০,৫৫৩
৭৩। সঞ্জীবনী। (পদ্য) (শ্রীবিপিনচন্দ্র রক্ষিত) ৬০৬
৭৪। সাকার ও নিরাকার উপাসনা (প্রতিবাদ) (শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ,বি,এ) ১৪১, ৪৫৬
৭৫। স্বদেশ প্রেম। (শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়) ১৫৩
৭৬। সুখী। (পদ্য) (শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী) ২৩১
৭৭। স্ত্রীশিক্ষা-বিবরণ। (৩) (শ্রীঈশানচন্দ্র বসু) ২২৫
৭৮। সৌন্দর্য্য। (শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন, এম,এ, বি, এল) ২৭৮
৭৯। সাকার ও নিরাকার উপাসনা (প্রত্যুত্তর)। (শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) ৫২৪
৮০। সামাজিক পবিত্রতা। (শ্রীবিজয়লাল দত্ত) ৫৩৫
৮১। স্পর্শ দোষ প্রথার রাক্ষসী মূর্ত্তি। (শ্রীমধুসূদন সরকার) ৬১৯
৮২। হিন্দুদিগের পুনরুত্থান। (শ্রীমধুসূদন সরকার) ২৪৮
৮৩। হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য। (শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু) ৩১৩
৮৪। হিন্দু পত্রিকা। (সমালোচনা) (শ্রীমধুসূদন সরকার) ৩৮৮
৮৫। হিন্দুদিগের পুনরুত্থান (প্রতিবাদ) (শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়) ... ৪৭৭
৮৬। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা। (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীমৃণালিনী, শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস
শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী, শ্রীবিহারীলাল গুহ, বি,এ ; শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু, এ[illegible]
শ্রীহরিপ্রসন্নদাস গুপ্ত ও শ্রীকমলিনী দাসী) ৩৭২ ৪২৮ [illegible]

নব্যভারত।

দ্বাদশ খণ্ড।

ত্রয়োদশ শতাব্দী।*

"খ্রীষ্টাব্দ-১৭৯৪-৯৫—১৮৯৩-৯৪।
শকাব্দা ১৭১৬—১৮১৫।
সংবৎ-১৮৫১-৫২—১৯৫০-৫১।"

কাল আর আজ, কত ব্যবধান? কাল ৩০ শে চৈত্র, ১৩০০ সাল, আর আজ ১ লা বৈশাখ, ১৩০১। কাল ১৩০০ সাল সময়ের অনন্ত কোলে ডুবিয়াছে,—বৎসরের সহিত ত্রয়োদশ শতাব্দীও ডুবিয়াছে, আজ নূতন দিন, নূতন বৎসর, নূতন শতাব্দীর আরম্ভ। আজ বিশেষ দিনে একবার মহাকালকে স্মরণ করি।

সময়ের ছেদ, পরিচ্ছেদ, ভাল কি মন্দ, কে জানে? কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে, ঘটিবে, কে তাহা খণ্ডন করিতে পারে? মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, দিন-রাত্রির পর দিনরাত্রি, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের পর বৎসর—যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ক্রমাগত আসিতেছে, ক্রমাগত যাইতেছে। তুমি চাহিয়া দেখ বা না দেখ, তোমার সুষুপ্তি-প্রলুব্ধ নয়ন ফিরাও বা না ফিরাও—সময় কত কি সাজে সাজিয়া, কত কি রঙ্গ দেখাইয়া অবিরাম চলিয়া যাইতেছে। কোথায় যাইতেছে, কেহ জানে না; কোথা হইতে আসিতেছে, কেহ বলিতে পারে না। সময় এবং বিদ্যুৎ—চির অনাবিষ্কৃত, চির প্রহেলিকাময়, চির অজ্ঞাত। উভয়ের হাব ভাব, চাল্ চল্‌তি, আচার ব্যবহার দেখিয়া দেখিয়া মানুষ জড়-ভরত, দেখিয়া দেখিয়া আরো না দেখার ন্যায় অস্তিত্ব-শূন্য। মানুষের গর্ব্ব কতটুকু?—বুদ্ধির দৌড় কত? সময়-সাগরের তীরে মানুষ গর্ব্বহারা, বুদ্ধি-

* সম্পাদকের প্রবন্ধ কোন সংখ্যায় সর্ব্ব প্রথম ছাপা হইলে, আমাদের দেশের পরনিন্দা-ব্যবসায়ী "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" (?) মাসিকের অসাধারণ ভাষাবিৎ সম্পাদক অত্যন্ত বিরক্ত হন। আমরা এই 'হাম-বড়া' 'গায়-মানে-না-আপনি-মোড়ল' সম্পাদকের অমূল্য (gratis) উপ-দেশানুসারে চলিতে না পরিয়া খুব দুঃখিত হইতেছি। তিনি পৃথিবীর কোন তত্ত্ব রাখুন বা না রাখুন, দুঃখ নাই; নব্যভারতের প্রতি বৎসরের নিয়ম জানিয়া কথা বলিলে বাধিত হইতাম। তাঁহার নিকট এখন নিবেদন এই, তিনি বাঙ্গালা ভাষা ও সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবার জন্য একটী অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করুন। আর কেহ না হইলেও, দেশ কাল ও পাত্রাপাত্র ভুলিয়া, ভারতী ও নব্যভারত-সম্পাদক শিষ্যত্ব স্বীকার করিবে।

হারা চির-বালক। মানুষের সব গর্ব্ব এখানে খর্ব্ব, সব দর্প চূর্ণ। মানুষ জানিয়া শুনিয়াও এ তত্ত্বসম্বন্ধে মহামূর্খ। সময়-তত্ত্বই প্রকৃত অ-দৃষ্টতত্ত্ব—কেহ দেখে নাই, কেহ গণিয়া নিরূপণ করিতে পারে নাই। বাতুল এবং অর্ব্বাচীনের প্রলাপ আমি মানি না, সময় যাহা চিত্র করিয়াছে, এবং প্রতিনিয়ত যাহা চিত্র করিতেছে বা করিবে, কেহ তাহার সম্যক্ ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই, পারিতেছে না, কখনও পারিবে না। কাল সন্ধ্যার সময় তোমার ঘরে মৃত্যু করাল মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া শোকের মহানির্ব্বাণে তোমাকে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছে, আজ প্রাতে তুমি আবার হাসিতেছ কেন, আজ আবার তোমার কল্যকার ধূল্যবলুণ্ঠিত মস্তক গর্ব্বে স্ফীত হইতেছে কেন বল ত? আমি বুঝিয়াছি, তুমি সময়ের রঙ্গ বুঝ নাই, তাই আজ ধেই-ধেই করিয়া মাতালের ন্যায় নৃত্য করিতেছ। এক দিনের দুই দিনের জন্য তুমি সতর্ক হইতে পার না, অথচ তুমি বল যে সময়-তত্ত্ব তুমি বুঝিয়াছ! হায়, মানুষের বুদ্ধি!! কাল তুমি কাঁদিয়াছ, আজ হাসিতেছ। কল্য আবার তোমার জন্য ক্রন্দন না হাস্য, কি রচিত হইতেছে, তুমি বুঝ না, তুমি জান না। এই জন্যই আমি বলি, তুমি সময়ের দাস, দাসানুদাস। সময়, তোমাকে যা ইচ্ছা, করিতেছে,—একবার উঠাইতেছে, একবার বসাইতেছে, একবার হাসাইতেছে, একবার কাঁদাইতেছে, একবার নির্জ্জীব করিতেছে, আর একবার সজীব করিতেছে। এ যেন "সোণার কাঠী রূপার কাঠীর" উপকথার ভেল্কি। তোমার ধনৈশ্বর্য্যের অহঙ্কার, তোমার বুদ্ধি-বিদ্যার গরিমা, তোমার ধার্ম্মিকতার শ্লাঘা, সব উন্মাদের প্রলাপ, অর্ব্বাচীনের তাণ্ডব নৃত্য, মদ্যপায়ীর উল্লাস! তুমি এ জগতে স্বাধীনতা-বিবর্জ্জিত জড়ভরত;—তুমি অ-দৃষ্ট-সময়ের অ-দৃষ্ট-চেলা। তুমি কিছু বুঝও না, তুমি কিছু জানও না।

সময় কখনও শুক্ল-বসনাবৃতা, মধুরদর্শন, পবিত্র গোপ-বালিকা, কখনও চাকচিক্যময়ী বেশপারিপাট্য-বিভূষিতা, নবযৌবন-সম্পন্না শ্রীরাধিকা, কখনও অগ্নিময়ী, অন্তিম শ্মশান-বাসিনী, নৃমুণ্ডমালিনী করালবদনী শ্যামা, কখনও আরামদায়িনী, আসক্তিময়ী, নব নব ভাববিভোরা, প্রেম-মাতোয়ারা, করুণাময়ী, স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি অন্নপূর্ণা। দেখে না কে, কিন্তু বুঝে কে? মজে সকলেই, কিন্তু সতর্ক কে? নবযৌবনে যে মত্ত, সে অন্তিম শয্যার কথা ভ্রমেও ভাবে না; বিষয়-মদ্য-পানে বিভোর মানুষ অহরহ সুধা বলিয়া বিষ বা মরণ-পাত্র চুম্বন করিতেছে! প্রকৃতির লীলাময়ী, মনোমোহিনী ছবি দেখিয়া আকৃষ্ট সকলেই, কিন্তু তত্ত্ব বুঝিল না কেহই, শিখে না কেহই। মানুষ, মানুষ হইল অল্পই। কে বলিবে, সময়তত্ত্ব কত গভীর, কত প্রহেলিকাময়, কত সুন্দর, কত মনোহর!

বলিয়াছি, যাহা যায়, মানুষ তাহাও বুঝে না; যাহা আসে, সাধারণতঃ তাহাও ধারণা করিতে পারে না। যাহা যায়, তাহা যে বুঝে, যাহা আসে তাহাও সে ধারণা করিতে পারে। এই দু-ই যে বুঝে—পৃথিবীতে সে-ই মহাপুরুষ। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বালক রিয়েঞ্জি, আহত ভ্রাতার রক্ত-স্নাত রিয়েঞ্জি মুহূর্ত্তের মহীয়সী শক্তি ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন, "এ দিন ঘুচিবে, অত্যাচারীর অত্যাচার চূর্ণ এবং বিলাসীর

বিলাস খর্ব্ব হইবে!"* তিনি যেন হাতে ধরিয়া ঘটনার পর ঘটনা রাশীকৃত করিয়া ইটালীকে স্বর্গীয় শোভায় সাজাইয়া তুলিয়াছিলেন। যে শুভ মুহূর্ত্তে লুথার বাইবেল গ্রন্থ সমাপন করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে উহার পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন, "পোপের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে তিনি ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।" মানুষ লুথারের দুর্জ্জয় সাহস দেখিয়া অবাক্ হইয়াছে; তাঁহার দুর্দ্দম্য পরাক্রমে খ্রীষ্টধর্ম্ম কত সংস্কৃত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পঞ্চমবর্ষীয় বালক ম্যাট্‌সিনি ভজনালয়ের সোপানারূঢ় বৃদ্ধ ভিক্ষুককে যে মুহূর্ত্তে দেখিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে ইটালীর উদ্ধারের বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সময়, সাধারণতঃ মানুষ সৃষ্টি করে,—কখনও বা মানুষ আবার সুসময় আনয়ন করে। এই মানুষেরাই নর-দেবতা। সময়ে মানুষের বিশ্বাস টলিয়া যায়, মত-শৈবাল জীবন স্রোতের প্রাবল্যে ভাসিয়া যায়—ধর্ম্মবিশ্বাস আকাশে উড়িয়া যায়—এ কথা জগতে শুনিয়া থাকি। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত ধার্ম্মিক, চরিত্র বিসর্জ্জন দিয়া অধার্ম্মিক শ্রেণীতে নাম লেখাইয়াছে,—কত ধার্ম্মিক ধর্ম্মের বিমল অন্তরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বহিরঙ্গনে ফোটা তিলক ভেল্কিরূপ নামাবলী গায়ে লেপিয়া ও জড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। তপশ্চর্য্যানিরত বিশ্বাসীকে বাল্যে দেখিয়াছি চরিত্রবান্, বার্দ্ধক্যে দেখিয়াছি চঞ্চল-চরিত্র;—দেখিয়াছি, ধর্ম্ম ছাড়িয়া রিপু-সেবায়, কেহ বা যশসেবায়, কেহ বা মত-সেবায়, কেহ বা সম্প্রদায় সেবায়, কেহ বা গুরু-সেবায় মাতিয়াছেন। মত পরিবর্ত্তন জগতে অহরহ দেখিতেছি। কিন্তু পুণ্যশ্লোক ঈশা মুশা, শাক্য মহম্মদ, পার্কার ম্যাট্‌সিনি, নানক কবীর, লুথার সেণ্টপলের মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কেহ কখনও শুনে নাই। ইঁহারা সময়ের রাজা, ইঁহারা সময়কে আত্মবশে রাখিয়া জগতকে রূপান্তরিত করিয়া অমর হইয়াছেন। বিদ্যুৎকে আত্মবলে আনিয়া যেমন মানুষ জগতের নানারূপ হিতসাধন করিতেছে, ইঁহারাও তেমনি, সময়রূপ যন্ত্র বলে জগৎকে আমূল পরিশোধিত, পরিবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারাই নরদেবতা, ইঁহারাই মহাপুরুষ। আর আমি, তুমি, সে, আমরা অহঙ্কারস্ফীত সময়ের দাস, মানবদেহে পশু-প্রকৃতি, ঘটনার তুড়িতে উঠি, বসি, চলি, ফিরি।

এত কথা বলিতেছি কেন? শুধু বাক্যাড়ম্বরের জন্য নয়, অবশ্য কিছু বলিবার আছে। এক একটী মুহূর্ত্ত মানুষের জীবনের কত পরিবর্ত্তন করে, উপরোক্ত ঘটনায় বিবৃত হইয়াছে; এক একটী বৎসর, এক একটী শতাব্দী জগতের কত কি পরিবর্ত্তন করে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। দিন, বৎসর, যুগ, শতাব্দী কত মানুষের উত্থান পতনের কারণ; আবার কত মানুষ, কত যুগ কত শতাব্দী শোধনের কারণ। মহাত্মা ঈশা, এই ১৯ শত বৎসরের উপর রাজত্ব করিয়া, ১৯ শত বৎসরকে শাসিত ও রূপান্তরিত করিয়া আজ বিংশ শতাব্দীর দ্বার উদ্‌ঘাটনের জন্য আঘাত করিতেছেন। অল্পাধিক পরিমাণে, পৃথিবীর সকল মহাপুরুষেরাই এইরূপ পৃথিবী শাসন করিয়া আসিতেছেন। সে সকল গভীর তত্ত্বের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার জন্য অদ্যকার এই প্রবন্ধের অব-

* See Gibbon's fall of the Roman Empire, edited by F. A. Guizot, vol II, P. 600.

তারণা নয়। যাহা লিখিব, তাহা অতীত ত্রয়োদশ শতাব্দী সম্বন্ধে—যাহা কল্য শেষ হইয়াছে; লিখিব, মহাকালের সেই বিন্দু পরিমাণ শতাব্দীর দু'দশটী কথা। কিন্তু আজ হইতে তাহা কতদূর, কে বলিতে পারে ?

১১৭৬ সালের দারুণ মন্বন্তর অল্প দিন চলিয়া গিয়াছে। অল্পদিন হইল ইংরাজ রাজত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে, ঘোর অরাজকতা দুর্দ্দম্য প্রভাবে চলিয়াছে। জোর যার, মুল্লুক তার, এই প্রবাদ একাধিপত্য করিতেছে। মুসলমান আমলের পরিবর্ত্তে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তখনও ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এমন সময়ে, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, ১১৮০ সালে, রাধানগর গ্রামে এক ব্রাহ্মণকুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। এই বৎসর ভারতবর্ষে প্রথম গবর্ণর জেনেরেল ও তাঁহার কৌন্সিল নিযুক্ত এবং এই বৎসরই সুপ্রিমকোর্ট সংস্থাপিত হইল।*

এই শিশু মহাকালের এক মহাসন্তান। বিধাতার নানা সৎগুণে ভূষিত হইয়া শিশু ধরায় অবতীর্ণ হইলেন। শৈশবকালে পাঠশালাতেই অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধি শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। বাল্যেই পারস্য ও আরবীতে ব্যুৎপন্ন হইলেন। দ্বাদশবর্ষ বয়সে পাটনার আরবী ও পার্সী শিক্ষা শেষ হইলে, রামকান্ত রায় তাঁহাকে কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন। মুসলমান শাস্ত্রের একেশ্বরবাদ ও প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহাকে মাতাইয়া তুলিল। ষোড়শবর্ষ বয়সে তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে গ্রন্থ লিখিয়া পিতৃ গৃহ হইতে তাড়িত হইলেন। তাড়িত হইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া তিব্বতে উপনীত হইলেন। বিংশতি বৎসর বয়সে নানা অবস্থার নানা ঘটনার পর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু, সন্তানের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া পিতা বুঝিতে পারিলেন, সন্তানের নবীন ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন হয় নাই। ক্রমে রামমোহন যখন কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, পিতা পুনরায় তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়িত করিলেন। ১২১০ সালে পিতার মৃত্যু হয়। তারপর পুনঃ রামমোহন গৃহে আসিলেন। এই সময়ে প্রকৃত রামমোহনের জন্ম হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহনের স্ত্রীর সহমরণ দেখিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—যতকাল বাঁচিবেন, এই ভয়ঙ্কর প্রথা উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিবেন। দেখিলেন, "চিতানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, সহগামিনী স্ত্রীর আর্ত্তনাদ যাহাতে কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, তজ্জন্য প্রবল উদ্যম বাদ্যভাণ্ড বাজিতেছে। সে প্রাণভয়ে চিতা হইতে গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু স্বজনেরা তাহার বক্ষে বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখিতেছে। এই সকল নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখিয়া রামমোহন রায়ের চিত্তে দয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে "এই প্রথা নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন"।*

নানা ঘটনার পর ১২২০ সালে, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে চল্লিশ বর্ষ বয়সে রাজা কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় হইতে জীবনের ব্রত উদ্যাপিত হইতে আরম্ভ হইল। এই সময়ে কলিকাতার অবস্থা

* ৺ রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস ৬৮ পৃষ্ঠা ও নগেন্দ্র বাবুর রামমোহন রায়ের জীবনচরিত ১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

* রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা।

অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। এক দিকে ধর্ম্ম-হীনতা, অন্য দিকে অজ্ঞানতা, এক দিকে অত্যাচার, অন্য দিকে চরিত্রহীনতায় কলিকাতা টলমল করিতেছিল। বিষয়ী ধনীদিগের মধ্যে তো কোন প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা ছিল না, চলিত বাঙ্গালা ভাষায় কাহারও বর্ণজ্ঞানও ছিল না। ইংরাজী যিনি লিখিতে পারিতেন, তিনি বিদ্বান ছিলেন। তখনকার বাঙ্গালা পুস্তকের অবস্থা নিম্নে লিখিতেছি। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদাবলী, এবং বৈষ্ণব কবিদিগের চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ ও পদাবলী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি হস্ত-লিখিত পদ্য পুঁথি সকল প্রচলিত ছিল, কিন্তু গদ্য ছিল না বলিলেই হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে, ১২০৬ সালে দেশীয় ভাষা শিখাইবার জন্য, তদানীন্তন কালের গবর্ণর লর্ড ওয়েলেসলি "ফোর্ট উইলিয়ম" নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে, কতকগুলি বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক লিখিত হয়, তন্মধ্যে রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১ খ্রীঃ) এবং লিপিমালা (১৮০২ খ্রীঃ) এবং রাজীব লোচনের কৃষ্ণচন্দ্র চরিত (১৮০২ খ্রীঃ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকা ও রাজাবলী, কেরী সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধান প্রধান। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মিসনরি মার্সমান এবং ওয়ার্ড সাহেব এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা জয়গোপাল তর্কালঙ্কার দ্বারা সংশোধন করাইয়া ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণ ছাপাইয়া পরে মহাভারত ছাপাইতে আরম্ভ করেন।* ইহার পূর্ব্বে, হেষ্টিংসের শাসন কালে, ডাইরেক্টরদিগের ইচ্ছানুসারে এই আদেশ প্রচারিত হয় যে, বিবাহ, উত্তরাধিকার, চুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিন্দুদিগের হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এবং মুসলমানদিগের মুসলমান ব্যবস্থানুসারে বিচার হইবে। এই নিমিত্ত হালহেড সাহেব ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ও মুসলমানদিগের ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন। তিনিই বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করিয়া মুদ্রিত করেন (১৭৭৮ খ্রীঃ)। যে সকল অক্ষরের সাহায্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, চার্লস উইলকিন্স সাহেব সে সকল ক্ষোদিত করেন। এই শুভ মুহূর্ত্তেই বাঙ্গালা ছাপাখানার প্রথম সূত্রপাত।† ইহার পর ১৭৯৩ খ্রীঃ ফরষ্টর সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুরের সংগৃহীত আইন বাঙ্গালাতে অনুবাদ করেন। ইনিই প্রথম বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করেন। যদিও উপরোক্ত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, হালহেড সাহেব সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রণীত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লন্দন মহানগরে ছাপা হইয়াছিল। সম্প্রতি এই সংস্করণের কয়েকখানি পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পুস্তকখানির অক্ষর, কাগজ, লেখা সকলই আশ্চর্য্য। পুস্তকের নীচে লেখা আছে "লন্দন মহানগরে চাপা হইল—১৮১১।" ছাপা দেখিয়া বোধ হয়, পুস্তকখানি লিথো করিয়া ছাপা, ভারত হইতে যেরূপ কাপি প্রেরিত হইয়াছিল, অবিকল সেইরূপ ছাপা হইয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের

* রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস ৭৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস ৬৯ পৃষ্ঠা এবং রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব, ২য় সংস্করণ, ১৫৪ পৃষ্ঠা এবং নব্যভারত পঞ্চম খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা, এবং নব্যভারত একাদশ খণ্ড, ৫৭৭ পৃষ্ঠা দেখ।

জন্য এই পুস্তকের এক স্থানের ভাষা তুলিয়া দিলাম। সে সময়ের গদ্য বাঙ্গালা কিরূপ ছিল, বুঝিতে পারিবেন।

"আত্মমঙ্গল লিখিয়া লিখিলেন ভাইজীর প্রত্যুত্তর পত্র পাইয়া সংবাদ জ্ঞাত হইলাম। লিখিয়াছেন রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস দুইজন পলায়ন করিয়া আপনকার শরণাগত হইয়াছে অতএব শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করণে যথেষ্ট অধর্ম্ম সে প্রমাণ বটে কিন্তু রাজাজ্ঞা পরিত্যাগ করিলেও অধর্ম্ম আছে। আর আপনি বিদেশী তাহাতে মহাজন দেশাধিকারির সহিত বিবাদ হয় এমত কার্য্য করা উচিত নহে অতএব এ দেশের অধিকারী আমার বাক্যে যদ্যপি নিয়ম ভঙ্গ হয় তাহাও পণ্ডিতের কর্ত্তব্য আপনকার সহিত যথেষ্ট প্রণয় আছে যাহাতে প্রণয় ভঙ্গ না হয় এমত করিবেন।" ৫৫ ও ৫৬ পৃষ্ঠা। বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা এইরূপ। সাধারণতঃ লোকেরা বুলবুলি ও ঘুড়ীর খেলা, কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, বীণ, সেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবাদিগের আমোদ ছিল।* এইরূপ অবস্থার সময় রামমোহন কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার আগমনের পর কলিকাতায় ও বঙ্গভূমিতে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। রামমোহন রায় নানা সংস্কারের সহিত প্রথমেই বাঙ্গালা ভাষার সংস্কারের জন্য গভীররূপে মনোযোগী হইলেন। এ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তুলিয়া দিলাম ;—

"তদনুসারে তিনি পুরাণ প্রতিপাদ্য হিন্দুধর্ম্ম যাহাতে সকলের মন হইতে অপনীত হয়, এবং "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বচনানুসারে অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা দেশ মধ্যে প্রচারিত হয়, তদর্থ যত্নবান হইলেন এবং তদুপায় স্বরূপ ১৬ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়েই "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রণালী" নামক একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিলেন। * * * এতদ্ভিন্ন তিনি দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে অনুশীলন করিয়া ক্রমে ক্রমে হিব্রু লাটিন, গ্রীক, ফরাসী প্রভৃতি ১০টী প্রধান প্রধান ভাষায় লব্ধাধিকার হইয়াছিলেন। * * কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনি কেবল শাস্ত্রালোচনা এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার দ্বারা কুসংস্কারাবিষ্ট অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকদিগকে উৎকৃষ্ট পথে আনয়ন, এই দুই কার্য্যের চেষ্টাতেই সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। এই প্রসঙ্গে দেশীয় বিদেশীয় অনেকানেক পণ্ডিতদের সহিত তাঁহাকে সর্ব্বদাই বিচার করিতে হইত। সেই সকল বিচার প্রায় বাচনিক হইত না, লিখিত হইত। এই জন্য তাঁহাকে বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রের অনুবাদ ইত্যাদি করিতে হইত। * * তিনি "ধর্ম্মতলা ইউনিটেরিয়ান যন্ত্রালয়" নামক একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া নানা গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। * * রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ বাঙ্গালা ভাষায় ৩য় বা ৪র্থ ব্যাকরণ। ইঁহাদ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে।" ১৫৯, ১৬০ ও ১৬১ পৃষ্ঠা।

অনেক অবান্তরিক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের কথা স্মরণ হইলেই প্রধানতঃ মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা স্মরণ হয়। রামমোহন রায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজা,—ইহার উপর ইনি যে প্রভূত ক্ষমতা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষের নবজীবনের ও সর্ব্ববিধ উন্নতির কারণ। জাতীয় ভাষার উন্নতি ভিন্ন কোন্ জাতি কবে উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে? গ্রীক লাটিন ভাষার শ্রীবৃদ্ধিতে গ্রীস ও রোমের উন্নতি, সংস্কৃতের উন্নতিতে ভারতের অসংখ্য জাতির উন্নতি, ফরাসী ভাষার-উন্নতিতে ফরাসী জাতির একদিন উন্নতি হইয়াছিল; আর আজ ইংরাজি ভাষার উন্নতিতে ইংরাজ-জাতি পৃথিবীর মধ্যে গণ্য মান্য হইয়া উঠিতেছে। বিদ্যুৎবেগে এই ইংরাজি ভাষা পৃথিবীতে বিস্তৃত হইতেছে,

* ১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে নগেন্দ্র বাবুর রামমোহন রায়ের জীবনচরিতের উদ্ধৃতাংশ, ৪৫ পৃষ্ঠা।

তৎসহ বিদ্যুৎবেগে এই অসামান্য জাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। যখন ইংরাজি ভাষার অবনতি হইবে, প্রাচীন গ্রীক, লাটিন এবং সংস্কৃত ভাষার অবনতিতে যেরূপ গ্রীসীয়, রোমীয় ও ভারতীয় জাতির অধঃপতন হইয়াছে, সেইরূপ, ইংরাজ-জাতিরও মহাপতন হইবে। ভাষা হৃদয়ের ছায়া, ভাষা মনোবিজ্ঞানের বিবৃতি, ভাষা মানব হৃদয়ের মহাবল। ভাষা মৃতকে জাগায়, ভাষা দুর্ব্বলকে বলীয়ান করে। ভাষা-অস্ত্রবলে কি অসাধ্য যে সাধন করা যায় না, আমি তাহা জানি না। ভল্টেয়ার, রুসো, ভিক্টর হুগো ভাষা বলে মৃত ফরাসী দেশকে সজীব করিয়াছিলেন, এবং দান্তে ও ম্যাট্‌সিনি মৃত ইটালীকে পুনর্জীবিত করিয়া গিয়াছেন। যে জাতির জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি নাই, সে জাতি চির অবনত, চিরপরপদানত, চির নিদ্রিত, চির মৃত। রামমোহন রায়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালার যে সামান্য দুই চারি খানি গদ্য পুস্তক লিখিত হইয়াছিল, তাহা কিছুই নয়। গদ্য ভাষার স্থষ্টিকর্ত্তা, বঙ্গভূমিতে, অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। ব্যাকরণ, ভূগোল, খগোল, ভাষা, দর্শন, সঙ্গীত সমস্ত তিনি রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার মূল পত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই মহাত্মা যখন নব জীবন লাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন, তাঁহার অজেয়, দুর্দ্দম্য শক্তির প্রভাবে বঙ্গভূমি কাঁপিয়া উঠিল। নানারূপ আন্দোলনের সহিত ভাষার স্রোত বহিল, তর্ক বিতর্ক ছুটিল। বঙ্গভূমি সজাগ হইয়া উঠিল। সকল দিকে "হই-হই রই-রই" রব পড়িয়া গেল। এমন এক বৈদ্যুতিক স্রোত বহিল, যাহার প্রবাহে বাঙ্গালায় দিন দিন অসংখ্য লেখক আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালা ভাষাকে আকারে, গঠনে, রচনা-চাতুর্য্যে সজ্জিত করিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে যে সকল মহাত্মার আবির্ভাব হইল, সে সকলই যেন মহাত্মা রামমোহন রায়ের অনুপ্রাণনের ফল। এক ভাষা, এক ঈশ্বর—এই দুই মহামন্ত্র ভিন্ন দেশের মঙ্গল নাই, ইহা প্রচারই যেন এই মহাত্মার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্ত্তী যুগে যে সকল মহাত্মার আবির্ভাব হইল, তাঁহারা সকলেই এই দুই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত। মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাত্মা মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্র, মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু, মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইঁহারা সকলেই এই দুই মন্ত্রে দীক্ষিত এবং অনুপ্রাণিত। দেশ-সংস্কার ইহার আনুষঙ্গিক ফল। এই দুই সংস্কারের সহিত তদানীন্তন কালের বঙ্গসমাজ দেখিতে দেখিতে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যাঁহারা ধীর চিত্তে ঘটনাসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছেন, সকলেই জানেন। মহাত্মা রামতনু, কৃষ্ণমোহন, হরিশ্চন্দ্র, রামগোপাল, রসিককৃষ্ণ, এবং ইঁহার পরবর্ত্তী যুগের মহাত্মা রাজেন্দ্রলাল, মাইকেল, কেশবচন্দ্র, প্যারিচরণ, প্রতাপচন্দ্র, কালীচরণ, কৃষ্ণদাস, সুরেন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার, নরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, মনোমোহন, হেমচন্দ্র, লালমোহন, শিবনাথ, যোগেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, চন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া কেহ বা সমাজ, কেহ বা রাজনীতি, কেহ বা ভাষা সংস্কারে মনোযোগী হইলেন। ইঁহারা সকলেই যেন প্রকারান্তরে রামমোহন রায়ের রক্তে জীবন প্রাপ্ত। রাজার সম-সময়েই বঙ্গভূমিতে হুলস্থুল

পড়িয়া গেল। রাজার প্রতি অত্যাচারের স্রোত যখন একটু থামিল, চতুর্দ্দিকে জয় জয় কারে রাজার নাম ঘোষিত হইতে লাগিল। সতীদাহ নিবারণ হইল, আর সকলের দৃষ্টি দেশসংস্কারের দিকে প্রধাবিত হইল। যাহারা আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা শেষে শিষ্য হইল, সংস্কারের বীজমন্ত্র গ্রহণ করিল। এইরূপে মহাত্মা রামমোহন ত্রয়োদশ শতাব্দীর গতি নির্দ্ধারণ করিয়া, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিষ্টল নগরে স্বর্গারোহণ করিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ রাজার জীবনচরিতের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে সম্বদ্ধ। ইতিহাসের সমস্ত কথার উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যায়। মহাত্মা রামমোহন রায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর নেতা। তাঁহার তিরোধানের পর কিরূপে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইল, সংক্ষেপে লিখিতেছি।

রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, বাঙ্গালা পদ্য ও সংগীতের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে কৃত্তিবাস রামায়ণ, এবং কাশীরাম দাস মহাভারত বিবৃত করিয়া এবং মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ, রামেশ্বর, চণ্ডী, মনসার ভাসান, শিবসংকীর্ত্তন, কবিরঞ্জন প্রভৃতি কাব্য সকল প্রণয়ন করিয়া পদ্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। রামমোহন রায় পূর্ব্ব সংস্কারও রুচির স্রোত ফিরাইয়া, ভাষাকে পদ্যের শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে লইয়া আসিলেন এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কদর্য্য রুচির স্থলে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিলেন। তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত, রামপ্রসাদের সঙ্গীতের ন্যায় দেশের আপামর সাধারণের কণ্ঠস্থ।

"মনে স্থির করিয়াছ চিরদিন কি সুখে যাবে।
জীবন যৌবন ধন মান রবে সমভাবে।
এই আশা তরুতলে, বসিয়াছ কুতূহলে,
বিষয় করিয়া কোলে, জাননা ত্যজিতে হবে।"

এইরূপ দেহাত্মিক, পারমার্থিক সঙ্গীত বাঙ্গালা ভূমির আমূল পরিশোধিত করিয়া বঙ্গদেশকে ধর্ম্মের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। ধর্ম্ম সংস্কার, দেশোন্নতির প্রধান কারণ। ভাষা সংস্কার ও ধর্ম্ম সংস্কার, মহাত্মা এই দুই সংস্কারে মনোযোগী হইয়া বঙ্গের, তৎসহ ভারতের, এবং তৎসহ জগতের ভাবী উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। তাঁহার পদ্য রচনা রাজীবলোচনের রচনা হইতে কত পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাঁহার গ্রন্থের এক স্থান হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শন করিতেছি,—

"আমরা এখন দুই তিন প্রশ্ন করিয়া এ প্রত্যুত্তরের সমাপ্তি করিতেছি। প্রথম, কোন ব্যক্তি আচারের দ্বারা ঋষির ন্যায় আপনাকে দেখান এবং ঋষিদিগের ন্যায় বেশ ধারণ করেন, আপনি সর্ব্বদা অনাচারির নিন্দা করেন অথচ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহার গুরু এবং নিয়ত সহবাসি হয়েন, আর গোপনে নানাবিধ আচরণ করেন; আর অন্য এক ব্যক্তি অধম বর্ণের ন্যায় বেশ রাখে, আমিষাদি স্পষ্টরূপে ভোজন করে, আপনাকে কোন মতে সদাচারি দেখায় না, যে দোষ তাহার আছে তাহা অঙ্গীকার করে। এ দুই প্রকার মনুষ্যের মধ্যে বক ধূর্ত্ত আখ্যান কাহাকে শোভা পায়। এ প্রশ্নের কারণ এই যে ভট্টাচার্য্য আমাদিগকে বক ধূর্ত্ত করিয়া বেদান্ত চন্দ্রিকাতে কহিয়াছেন।" ১০৭ ও ১০৮ পৃষ্ঠা।

বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান বাঙ্গালার সহিত তুলনা করিলে ইহাকে বাঙ্গালা ভাষাই বলা যায় না। কিন্তু প্রথম অবস্থা স্মরণ করুন। মহাত্মাই লেখক, মহাত্মাই গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচয়িতা। প্রথমকার অবস্থায় ইহাপেক্ষা আর কি হইবে, কি হইতে পারে? যদিও ২।৩ জন সাহেবের চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার মূল গঠিত, তথাপি বলিতেই হইবে, মহাত্মা রামমোহন এ ক্ষেত্রে

কার্য্য না করিলে বাঙ্গালা ভাষা জাগ্রত হইত না। পরবর্ত্তী কালে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদিগের ভাষা স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিল, এখনও কতক সেইরূপই আছে; তাহাকে বাঙ্গালা বলিলেও হয়, না বলিলেও হয়; আর রামমোহনের দ্বারা অনুপ্রাণিত ব্যক্তিগণ ভাষার পরিচর্য্যায় প্রাণ মন ঢালিয়া ভাষাকে দিন দিন নব নব সাজে সজ্জিত করিতে লাগিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার যে কি উপকার হইয়াছে, এক কথায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। বাঙ্গালা ভাষা কোন কালেও, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ঋণ পরিশোধে সমর্থ হইবে না। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, ঋষি রাজনারায়ণ, প্রেমাবতার বিদ্যাসাগর, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অক্ষয়কুমারের নাম তত্ত্ববোধিনীর সহিত এদেশে অক্ষয় হইবে।

রামমোহন রায়ের মৃত্যু সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার যুবাপুরুষ ছিলেন। এই মহাত্মা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে—১২২১ সালে নদিয়াজেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী বিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমতঃ সংস্কৃত কলেজে, তারপর চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। পুনর্ব্বার ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। এই সময়েই মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা জন্মে। পঠদ্দশাতেই মদনমোহন রসতরঙ্গিনী ও বাসবদত্তা নামক দুইখানি পদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি দর্শনে পূজাপাদ ৺ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় প্রভৃতি কলেজের অধ্যাপকেরা তাঁহাকে 'কাব্যরত্নাকর' উপাধি প্রদান করেন। পাঠান্তে, কলিকাতার বাঙ্গালা পাঠশালা, বারাসত বিদ্যালয়, কলিকাতা ফোর্টউইলিয়ম কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপকতা করিয়া, ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হন। তিন বৎসর মাত্র সেখানে ছিলেন। কলিকাতার "সংস্কৃত যন্ত্র" তাঁহারই যত্নে স্থাপিত হয়, এবং এ যন্ত্রে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত অনেকগুলি প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এই সময়ে মহাত্মা বেথুন সাহেবের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ। ইঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া এই মহাত্মা "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই বচন উদ্ধৃত করিয়া সাধারণকে বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য উত্তেজিত করেন এবং দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য, সমাজচ্যুতির ভয় পরিহার করিয়া, আপন কন্যাকে স্কুলে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন। শিশুবোধক বাঙ্গালা পুস্তক ছিল না বলিয়া, তিনি শিশুশিক্ষা তিন ভাগ এই সময়ে রচনা করেন। এই সময়েই সর্ব্বশুভকরী নামক মাসিক পত্রিকা তাঁহার যত্নে প্রচারিত হয়। ইহাতে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় এমন একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া সকলেই মোহিত হয়। ১৮৫০ খ্রীঃ তিনি মুর্সিদাবাদের জজ পণ্ডিত হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং ৬ বৎসর ঐ কাজ করার পর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ইহার পর কান্দিতে পরিবর্ত্তিত হন, এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলাউঠা রোগে সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। ইনি রামমোহন রায়ের সমকালিক লোক।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে—১২১৫ সালে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে কোন

বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া খ্যাতি লাভ করেন নাই। কিন্তু তখন হইতেই কবিতা লিখিতেন। ইনিও রামমোহন রায়ের সমসাময়িক লোক। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ই মাঘ হইতে "সংবাদ-প্রভাকর" প্রকাশ করেন। ইহা প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে দ্ব্যহিক, তৎপরে প্রাত্যহিক হয়। ইহাতে গদ্য ও পদ্য দুই-ই থাকিত। ইহা ভিন্ন "সাধুরঞ্জন" ও "পাষণ্ড-পীড়ন" নামে আর দুই খানি সাপ্তাহিক পত্রিকা তাঁহাদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। শেষোক্ত পত্রের সহিত ৵ গৌরীশঙ্কর (গুড় গুড়ে) ভট্টাচার্য্যের রসরাজ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সহিত তুমুল বিবাদ হয়। ইহার পর মাসিক প্রভাকর প্রচার করেন। শেষাবস্থায় তিনি প্রবোধ-প্রভাকর, হিত-প্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ ও কলি-নাটক রচনা করেন। ইনি এক হিসাবে মহাত্মা বঙ্কিম চন্দ্রের বাঙ্গালা ভাষা লেখার গুরু। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে,—১২১০ সালে,দাশরথি রায় জন্ম গ্রহণ করেন। কাটোয়ার সন্নিহিত বাঁদমুড়া গ্রামে ইঁহার পৈতৃক বাস। ইনি পাঁচালী দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচিত প্রভাস, চণ্ডী, লবকুশের যুদ্ধ, মানভঞ্জন, প্রভৃতি পালা-গ্রন্থ আছে। তদ্ভিন্ন জন্মাষ্টমী, বিধবা-বিবাহ বিষয়ক পালাও আছে।

তৎপর প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা। রামমোহন রায়ের বৃদ্ধাবস্থায়, অর্থাৎ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে—১২২৬সালে—১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন, হুগলী জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম এখন মেদিনীপুর জেলার অধীন হইয়াছে। ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ, স্বর্গারোহণ করেন। ইঁহার জীবন আপামর সাধারণ সকলেই জানেন। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে ইনি কি করিয়াছেন, সকলেই জ্ঞাত আছেন, তাহাতে তিনি অমর। বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য ৪০ টীর অধিক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বেথুন বিদ্যালয় স্থাপনেও একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি স্ত্রীজাতির বন্ধু—বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন করিয়া সমাজের যে সংস্কার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অনন্তকাল অবলাকুলের এবং সর্ব্বসাধারণের পূজা পাইবেন। তিনিই ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৫ আইন বিধবাদের জন্য বিধিবদ্ধ করাইয়া গিয়াছেন। নিজ পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবার পাণিগ্রহণ, প্রসন্নচিত্তে অনুমোদন করিয়া, তিনি যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, এরূপ এদেশে প্রায় দেখা যায় না। বেতালপঞ্চবিংশতি হইতে বহু-বিবাহ-বিচার পর্য্যন্ত, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে বিদ্যাসাগরের ৩০ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। বালক শিক্ষা হইতে প্রাচীন-শিক্ষার সমস্ত পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন। তিনিই বাঙ্গালা ভাষাকে নিয়মাধীন করিয়া সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করেন, এবং সংস্কৃত শিক্ষার সহজ উপায় প্রদর্শনের জন্য উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ-কৌমুদী প্রকাশ করেন। এখন যে সুন্দর বাঙ্গালা দেখা যায়, বেতালপঞ্চবিংশতির পূর্ব্বে তাহা ছিল না। বিদ্যাসাগরের সমস্ত কথা লিখিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া যায়। সুতরাং এস্থলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

১৭৪২ শকের আশ্বিন মাসে বিদ্যাসা-

গরের জন্ম, এই শকের শ্রাবণ মাসে মহাত্মা অক্ষয়কুমারের জন্ম। উভয়ে সমসাময়িক, উভয়েই রামমোহন রায়ের সমকালিক লোক। বর্দ্ধমানের অধীন চুপী নামক গ্রামে, কায়স্থ বংশের দত্তকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে সামান্য বাঙ্গালা ও পারশী শিক্ষা করিয়াছিলেন। বয়স বাড়িলে ইংরাজী, ও ফরাশী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং মেডিকেল কলেজে দুই বৎসর কাল রসায়ন ও উদ্ভিদশাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করেন। তিনি নিজ চেষ্টায় ক্ষেত্রতত্ত্ব, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, কনিক সেকসন, ফ্যালকুলম প্রভৃতি গণিত, জ্যোতিষ, মনোবিজ্ঞান সুন্দররূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্র মাস হইতে শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির যত্নে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত ১৭৭৭ শক পর্য্যন্ত, ১২ বৎসর কাল ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার তিনি জীবনস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার সময়ে কত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ যে ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সংখ্যা নাই। চারুপাঠ ও ধর্ম্মনীতির সুন্দর প্রস্তাব সকল প্রথমে প্রবন্ধাকারে এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ১৫০৲ টাকা বেতনে কলিকাতা নর্ম্মালস্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। শেষ জীবনে দারুণ মস্তিষ্ক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বালীগ্রামে ছিলেন, সেখানে ১৮০৮ শকের, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ৬৬ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি তিনভাগ চারুপাঠ, দুইভাগ বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ধর্ম্মনীতি, পদার্থবিদ্যা ও দুইভাগ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় রচনা করেন। তাঁহার রচনা সুন্দর জ্ঞানপূর্ণ ও রুচিমার্জ্জিত।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে,—২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রামমোহন দেহত্যাগ করেন, তাহার ৯ বৎসর পূর্ব্বে, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে—১৭৫০ শকে,—১২৩০ সালের ১২ই মাঘ শনিবার মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। এই বৎসরই বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদন ১২।১৩ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক কলিকাতায় প্রেরিত হন এবং প্রথমেই হিন্দুকলেজে শিক্ষা লাভ করেন। বঙ্গদেশের গৌরব ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রধানতম মহাপুরুষগণ এই কলেজেই বিদ্যাশিক্ষা করেন। ৺ কাশীপ্রসাদ ঘোষ, ৺ রসিককৃষ্ণ মল্লিক, ৺ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ রামগোপাল ঘোষ, ৺ রমাপ্রসাদ রায়, ৺ কেশবচন্দ্র সেন, ৺ দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি সকলেই এই কলেজের ছাত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রামতনু লাহিড়ী, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি মহাত্মাও এই কলেজের ছাত্র। সুতরাং, মহাত্মা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের কাজ বাদে, তদানীন্তন কালের সকল সংস্কারের মূল, এই কলেজ। ডিরোজিয়োর নাম এ দেশে সুবিখ্যাত। তাঁহার ন্যায় সৎ শিক্ষক এদেশে আর অভ্যুদিত হয় নাই। অধ্যাপনা সময়ে, সভাগৃহে এবং কথোপকথন কালে তিনি ছাত্রদিগের প্রবৃত্তি সমূহের সম্যক বিকাশের চেষ্টা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং বাবু রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র। ছাত্রগণ যাহাতে সত্যনিষ্ঠ, স্বদেশপ্রেমিক,

চিন্তাশীল হইয়া স্বদেশ এবং স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া মনে করিতেন। এ সম্বন্ধে বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, মহাশয় প্রণীত মাইকেলের জীবনচরিত হইতে আমরা একটু উদ্ধৃত করিতেছি,—

"রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত লইয়া তখন বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে যাঁহারা সমধিক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই হয় ধর্ম্মসভা, না হয়, ব্রাহ্মসভা, উভয়ের একতর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সতীদাহ নিবারণ লইয়া তখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছিল। ভিতরে ভিতরে তাঁহার ছাত্রদিগকে এই সকল আন্দোলনে যোগদান করিতে উপদেশ দিতেন। ভারতের মঙ্গলজনক কোন অনুষ্ঠান দেখিলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। তাঁহার অধ্যাপনা-গৃহ ছাত্রদিগের সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্ম্ম বিষয়ক তর্ক করিবার ক্ষেত্র স্বরূপ ছিল * * * ডিরোজিয়োর শিক্ষায় কলেজীয় ছাত্রদিগের মধ্যে যে বিপ্লবতরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, অনুকূল বায়ুবলে তাহা আরো ভীষণাকার ধারণ করিল। এদেশে কিরূপ শিক্ষা প্রচলন করা কর্ত্তব্য, এই লইয়া সে সময়কার রাজপুরুষদিগের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল। * * খ্যাতনামা আলেকজাণ্ডার ডফ এবং প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেমান উইলসন যথাক্রমে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য-ভাষা প্রচারার্থীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এদেশীয়দিগের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পাশ্চাত্য, এবং মহামতি রামকমল সেন প্রাচ্য ভাষা প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। মহাত্মা মেকলে পাশ্চাত্য ভাষা প্রচারার্থীদিগের দলে যোগ দিলেন এবং উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ খীঃ অব্দে ৭ই মার্চ্চ অবধারণ করিলেন, ভারতবাসীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং বিজ্ঞান প্রচারই গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্ত অর্থই সেই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যয় হইবে। মহাত্মা বেণ্টিঙ্কের এই অবধারণ ভারত সমাজে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।" ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতি এবং জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠার মূল সুতরাং মহাত্মা রামমোহন রায়। তিনি যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনে সহায়তা করিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল এই শিক্ষা। মধুসূদন কিন্তু ডিরোজিয়োর ছাত্র নহেন। মধুসূদন রিচার্ডসনের ছাত্র। মাইকেল ১৬।১৭ বৎসর বয়সেই পৈতৃকভবন ত্যাগ করিয়া কিছুকাল মান্দ্রাজে অবস্থান করেন। এই কালে কোন ইয়োরোপীয় মহিলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর তাঁহার বাঙ্গলা গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্তি জন্মে। তৎপর ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখান হইতে বারিষ্টার হইয়া স্বদেশে আগমন করিয়া ৫ বৎসর কাল বারিষ্টারি করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন, তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি শর্ম্মিষ্ঠানাটক, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমা সম্ভব, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণকুমারী, বীরাঙ্গনা, চতুর্দ্দশপদী কবিতা, হেক্‌টারবধ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। মাইকেল বাঙ্গালার অমর কবি। ত্রয়োদশ শতাব্দী ইঁহার আবির্ভাবে ধন্য হইয়াছে। পৃথিবীর যে কোন মহা কবির সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে। ইনি বঙ্গের অদ্বিতীয় কবি। বিদ্যাসাগর যেরূপ গদ্য-সংস্কারক, মাইকেল তেমনই পদ্য-সংস্কারক। ইনিই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক। ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্যতর মহৎ ব্যক্তি বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইঁহার অকৃত্রিম বন্ধু।

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ১৭৪৭ শকের ২রা ফাল্গুন, কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৮ম বর্ষ বয়সে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন এবং তিন বৎসরের মধ্যে মুগ্ধবোধ সমাপ্ত করেন। তৎপর ২ বৎসর অন্যান্য স্কুলে ইংরাজি শিখিয়া

৬ বৎসর হিন্দু কালেজে পড়েন। শিক্ষাকার্য্য শেষ করিয়া বিদ্যাপ্রচার ব্রত গ্রহণ করেন এবং শেয়াখালা, চন্দনগর, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া শিক্ষকের কার্য্য করেন। তেমন অর্থবল না থাকায়, কয়েক বৎসর পর ৫০৲ টাকা বেতনে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের ২য় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। দশ মাস পরেই ১৫০৲ বেতনে গবর্ণমেণ্ট হাবড়া স্কুলের হেড্‌মাষ্টারী পদ তাঁহাকে দেন। বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সর্ব্বপ্রথম তিনি শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব নামক পুস্তক প্রচার করেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসও ঐ সময়ে লিখিত হয়। তৎপরে হুগলিতে বাঙ্গালা নর্ম্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে, ৩০০৲ বেতনে (১৮৫৬ খ্রীঃ) ৬ই জুন তিনি ঐ বিদ্যালয়ের প্রধন শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ৪০০৲ টাকা বেতনে এসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর এবং ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এডিসনাল ইনস্পেক্টর হইয়া ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে নর্থ সেণ্ট্রাল নামক নূতন ডিবিজনের ইনস্পেক্টর হইলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনি শিক্ষা বিভাগের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর হইতে তিনি এডুকেশন গেজেটের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সি-আই-ই উপাধীতে ভূষিত হন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লেজিস্‌লেটিভ কৌন্সিলের সভ্য হন, এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে "পুষ্পাঞ্জলি" প্রচার করেন; কিছুদিন হইল, পারিবারিক-প্রবন্ধ, তৎপর আচার-প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ভূদেববাবু সংস্কৃত শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সম্প্রতি দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়া আপন মহত্ত্বের অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার লেখা প্রাঞ্জল, গবেষণাপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন তিনি পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ড ও রোমের ইতিহাস ও দুই ভাগ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ইউক্লিডের কিয়দংশ রচনা করিয়াছিলেন।

এই স্থানে আর দুই মহাত্মার নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে অত্যুজ্জ্বল ভূষণে সজ্জিত করিয়াছেন এবং প্যারীচাঁদ মিত্র অনুবাদ-মূলক বাঙ্গালাকে মৌলিক আকারে পরিশোভিত করিয়া গিয়াছেন। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রথম উপন্যাস-লেখক। তাঁহার সম্বন্ধে বঙ্গীয় লেখকগণের রাজা বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা পাঠে, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান কোথায়, সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক। কথাটা বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা গদ্যের ইতিবৃত্ত পাঠককে কিছু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। * * * প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর পুস্তক রচনা সংস্কৃতের ন্যায় হইত। গদ্য-রচনা ছিল না, এমন কথা বলা যায় না, কেন না হস্ত-লিখিত গদ্য গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে,রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটী স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটীর নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটীর নাম অপর ভাষা

অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। * * তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না,—'খদির' বলিতেন; কদাচ চিনি বলিতেন না, শর্করা বলিতেন। * * পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ানক ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই। এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষার রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্ব মত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

"ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষার আরও একটী গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সার সঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতাল-পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালি-লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্ত প্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুমত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালি-লেখকের সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ।

"এই দুইটী গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডার পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক "আলালের ঘরের দুলাল" নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন। কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালের" দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, অন্য কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না, সন্দেহ।

"উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজন-মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্ব্ব-জন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্ল্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে। এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারা শঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল।" ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নহে। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালের' পর হইতে বাঙ্গালি-লেখক

জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

"আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয়কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে;—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের দুলাল।" প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি। অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ।" শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্যারীচাঁদ মিত্র রামমোহন রায়ের সমসাময়িক। তিনি ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ই জুলাই—১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রীশিক্ষার উৎকর্ষের জন্য রামারঞ্জিকা লেখন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাতে অভেদী নামক উপন্যাস লেখেন। ইহার পূর্ব্বে আলালের ঘরের দুলাল লেখেন। অভেদীর পর "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা" লেখেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে "আধ্যাত্মিকা" প্রকাশিত হয়। ইনি ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার, এবং ভাষা-সংস্কারে রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত পথ অনুসরণ করিয়া অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। উপরোক্ত পুস্তক বাদে "মদ খাওয়া বড় দায়," "যৎকিঞ্চিৎ" "বামাতোষিণী," "কৃষি-পাঠ" ও "গীতাঙ্কুর" লিখিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি এই সকল গ্রন্থ ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৪৮ শকে কালনার সন্নিহিত বাকুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী ও শূর-সুন্দরী প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ই মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৭৪৫ শকে রামনারায়ণ তর্করত্নের জন্ম হয়। পতিব্রতোপাখ্যান, কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব, নবনাটক, রুক্মিণী হরণ প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার রচিত। নাটকে ইনি বেশ কৃতী ছিলেন। ইঁহাকেই প্রথম বাঙ্গালা নাটকলেখক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। "ভদ্রার্জ্জুন" বাঙ্গালার প্রথম নাটক ও হরচন্দ্র ঘোষের "ভানুমতীর চিত্তবিলাস" দ্বিতীয় নাটক, কিন্তু এ সকল পুস্তক ভাল নহে বলিয়া ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় কাদম্বরী ও রাসেলাস নামক পুস্তকদ্বয়ের অনুবাদক।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্রসাদ রায় ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের ছাত্রগণের জন্য "পুরুষ-পরীক্ষা" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ১৭৪২ শকে, চাঙ্গাড়িপোতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নীতিসার দুই ভাগ, রোমের ইতিহাস ও গ্রীস দেশের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সোমপ্রকাশের সম্পাদক হইয়া সাপ্তাহিকসংবাদ পত্র মহলে যুগান্তর উপস্থিত করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

সংবাদ ও সাময়িক পত্র।—১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য "বেঙ্গল গেজেট" প্রকাশ করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারীগণ কর্ত্তৃক "সমাচার-দর্পণ" নামক সাপ্তাহিকপত্র ও 'দিগ্দর্শন' নামক মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মিলিত হইয়া "কৌমুদী" প্রকাশ করেন এবং মিশনরীগণ "গস্পেল ম্যাগাজিন' প্রকাশ করেন। সতীদাহ সম্বন্ধে ইহাদের মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সমাচার চন্দ্রিকা" প্রকাশ করেন,ইহা এখন দৈনিকের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন "ব্রাহ্মণিক ম্যাগাজিন" প্রকাশ করেন, ইহা বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় লিখিত হইত। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে নীলরতন হালদার "বঙ্গদূত" প্রকাশ করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত "সংবাদ-প্রভাকর" প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র মিত্র "জ্ঞানোদয়"বাহির করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গারাম সেন "বিজ্ঞানসেধবী" বাহির করেন। এই অব্দে অক্ষয় কুমার দত্ত "বিদ্যাদর্শন" প্রকাশ করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদ "পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রকাশিত" হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক "ভাস্কর" প্রকাশিত হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কুমার কৃষ্ণনাথ রায় "মুর্শিদাবাদ প্রত্রিকা" প্রকাশ করেন। এই অব্দে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা গেজেট বাহির করেন, ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র মিলিত হইয়া "বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর" প্রকাশ করেন। ইহাতে বাঙ্গালা, ইংরাজি, দুই-ই থাকিত। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জমীদার কালীনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ" প্রকাশিত হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনীর ভার অক্ষয়কুমার দত্ত গ্রহণ করেন এবং ১২ বৎসর দক্ষতার সহিত সম্পাদকের কার্য্য করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "রসসাগর" প্রকাশ করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে "সর্ব্বশুভকরী" প্রকাশিত হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ইহাতে লিখিতেন। ১৮৫১ খ্রীঃ "বিবিধার্থ সংগ্রহ" প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ খ্রীঃ কলিকাতার "বর্ণাকিউলার-সোসাইটী" সমাজ স্থাপিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদকতায় বিবিধার্থ-সংগ্রহ কিছু দিন বেশ চলিয়াছিল। ইহার পর কালীপ্রসন্ন সিংহ ইহার পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলে ইহার নাম "রহস্য-সন্দর্ভ" হয় এবং প্রাণনাথ দত্ত ইহার সম্পাদক হন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদার "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশ করেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ ৮ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সোমপ্রকাশ প্রকাশ করেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হয়। বামাবোধিনী পত্রিকা ১২-৭০ সাল হইতে প্রকাশিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করিয়া আসিতেছে। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ইহার সুযোগ্য সম্পাদক। ইহার পরই বঙ্গদর্শনের যুগ। ১২৭৯ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সময়ে বা ইহার অব্যবহিত পরে মহাত্মা কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া সুলভ-সমাচার প্রকাশ করেন ও বর্ত্তমান যুগের সুলভ সংবাদপত্র প্রচারের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। ইহার পরের ইতিহাস সকলেই জানেন। ক্রমে ক্রমে কিরূপে সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রে বঙ্গ প্রদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং সে সকলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

বঙ্কিম বাবু, প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম প্রবর্ত্তক। আমরা এই সময় হইতে বাঙ্গালা

ভাষার যুগ পরিবর্ত্তন নির্ণয় করিতেছি। ইহার পর হইতে যে সকল লেখকের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তন্মধ্যে ৺ রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, ৺ রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু নবীনচন্দ্র সেন, ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ৺ রাজকৃষ্ণ রায়, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত, বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ এবং বাবু চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির নামই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গপ্রদেশে অসংখ্য কৃতী লেখক অভ্যুত্থিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহাদের সকলের বিষয়ই পাঠকগণ অল্লাধিক পরিমাণে জ্ঞাত আছেন এবং আমরা ১২৮৪ ও ১২৮৫ সালের নব্যভারতে তাহা বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং সে সকল সম্বন্ধে কিছু লেখার প্রয়োজন নাই।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে জুন, ১৭৬০ শকে কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা ভাষার প্রধান সংস্কারক। অন্যতর সংস্কারক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। ইনি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্কিম বাবু, কেশব বাবুর কয়েক মাসের বড়। কেশব বাবু, ১৮৮৪ খ্রীঃ, জানুয়ারি মাসে বহুমূত্র রোগে স্বর্গারোহণ করেন। মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রও বহুমূত্র রোগে বিগত ১৩০০, ২৬ শে চৈত্র, রবিবার ৩—২৫ মিনিটের সময় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামমোহন, মধ্যভাগে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার, শেষ ভাগে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র। এক কথায় বলিতে গেলে ত্রয়োদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া রামমোহন রায় যুগ। দরিদ্র বাঙ্গালা সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যরূপে পরিণত করিবার জন্যই যেন এই শতাব্দীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। শত বৎসর, কোন দেশের জাতীয় ভাষার গঠন এবং সংস্কারের পক্ষে কিছুই নয়; কিন্তু দেখিতেছি, এই এক শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার এত উন্নতি হইয়াছে যে, ইহাকে এখন একটা ভাষা বলিতে, পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী লোকেরাও কুণ্ঠিত হন না। বাস্তবিক বাঙ্গালা দেশ কি কম সৌভাগ্যশালী যে, এক শত বৎসরের মধ্যে শত শত প্রতিভাশালী লোকের অভ্যুত্থান হইয়াছে? ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের আরো কত কি উন্নতি হইয়াছে, সে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। প্রাচীন ভারত যখন আমাদের দ্বারা নব্যভারত রূপে অভিহিত হইয়াছিল, তখন কত লোক ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, সেই ভারতকে যখন কটন সাহেব নব্যভারত বলিলেন, তখন সকলে নির্ব্বাক্। একশত বৎসরের মধ্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদেশে আপনাদের সিংহাসন বদ্ধমূল করিয়াছেন। সেই সঙ্গে ভারতের অসংখ্য জাতিকে শিক্ষা ও স্বাধীনতার আস্বাদন দিয়া, গবর্ণমেণ্ট এখন জাতীয় মহাসমিতি-গঠন-যুগ আনয়নের কারণ হইয়াছেন। জাতীয় মহাসমিতি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রজানীতি সম্বন্ধে প্রধান ঘটনা। ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল। রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তক; সুতরাং ইহার মূলেও রামমোহন। সিপাহি বিদ্রোহের কলঙ্ক ভারতবাসীর অঙ্গ হইতে প্রক্ষালিত হইয়াছে, এখন ভারতবাসী শিক্ষিত, সুসভ্য, দেশ-হিতৈষী, পরদুঃখ-কাতর—স্বদেশপ্রেমিক, ইংরাজের অনুগত। এই একশত

বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কত মহৎ লোকের অভ্যুত্থান হইয়াছে, সংখ্যা নাই। সে সকল কথা ইতিহাস-লেখক স্বর্ণাক্ষরে লিখন। আমরা বলিতে চাই, দেশের উন্নতির মূল, ধর্ম্ম ও জাতীয় ভাষার উৎকর্ষ সাধন। ত্রয়োদশ শতাব্দী এই দুই বিষয়ে বঙ্গদেশে যে স্বর্গীয় ছবি আঁকিয়াছে, কালে এই ছবি যে ভারতে ব্যাপ্ত হইবে এবং তাহা দেখিয়া যে জগৎ আকৃষ্ট হইবে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সাহসপূর্ব্বক লিখিতে পারি, কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র, রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত কার্য্য অতি সুন্দররূপে সমাধা করিয়া গিয়াছেন। বলিতে পারি, কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা সকল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সকল, ধর্ম্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত যে কোন দেশের যে কোন সাহিত্যের সহিত সমকক্ষতা করিতে সমর্থ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মহাউষায় এক মহাত্মা ভারতের এক কোণে দাঁড়াইয়া যে ভেরী নিনাদিত করিয়াছিলেন, সমগ্র ত্রয়োদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া তাহারই আন্দোলন চলিয়াছে। বাঙ্গালার ত্রয়োদশ শতাব্দী, ইংলণ্ডের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রধান ও প্রথম কার্য্য একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা এবং বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি। আর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা অবান্তরিক। জাতীয় উন্নতির সহিত তাহার সম্বন্ধ বড় অধিক নয় বলিয়া তাহার উল্লেখ করিলাম না। এরূপ শতাব্দী আর কখনও বঙ্গদেশের ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না, জানি না। আর কখনও ঘটিবে কি না, তাহাও জানি না। বঙ্গ প্রদেশে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল মহাত্মা জীবিত আছেন এবং গত শতাব্দীতে যে সকল মহাত্মা জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, যে কোন দেশ এই সকল মহাত্মার দ্বারা অমর হইতে পারে। ভারত অতি সৌভাগ্যশালী, এই শতাব্দীতেই রামমোহন, দয়ানন্দ সরস্বতী, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও ত্রৈলঙ্গ স্বামীর উদয় ও তিরোধান। ভারত সৌভাগ্যশালী, এই শতাব্দীতে শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও দ্বারকানাথ মিত্র উৎকৃষ্ট বিচারক এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র অসামান্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ। বঙ্গ সৌভাগ্যশালী যে, এই শতাব্দীতেই দয়ার সাগর মহাত্মা বিদ্যাসাগর, মহামতি তারকচন্দ্র প্রামাণিক এবং **দীনজননী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীর** আবির্ভাব। ত্রয়োদশ শতাব্দী ভারতের চিরস্মরণীয়; এই শতাব্দীতেই সন্তান বিসর্জ্জন নিবারিত হইয়াছে, সতীদাহ উঠিয়া গিয়াছে, বিধবা-বিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কোম্পানীর রাজ্য মহারাণীর হাতে গিয়াছে এবং তিনি জাতি-নির্ব্বিশেষে নিরপেক্ষ ভাবে ভারত শাসন করিবেন, এই কথা ঘোষিত হইয়াছে। এই শতাব্দীতেই স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে, ভারত রেল এবং তাড়িতারে বেষ্টিত হইয়াছে। এই শতাব্দীতেই জাতীয় মহাসমিতির অভ্যুদয়। আমরা কখনও এ শতাব্দীর কথা ভুলিব না। ভুলিব না, মহাত্মাদিগের আবির্ভাবের কথা—আর ভুলিব না মহাত্মাদের তিরোধানের কথা। রামমোহন গিয়াছেন, কেশব গিয়াছেন, রামকৃষ্ণ গিয়াছেন, দয়ানন্দ ও ত্রৈলঙ্গ স্বামী গিয়াছেন, কৃষ্ণদাস গিয়াছেন, মাইকেল গিয়াছেন, বিদ্যাসাগর গিয়াছেন; আর সে দিন আমাদের বাঙ্গালা দেশের অদ্বিতীয় প্রতিভার খনি, সাহিত্য-জগতের রাজা বঙ্কিম

চন্দ্র গিয়াছেন। ২৬শে চৈত্র, রবিবার, ১৩০০, নিমতলার শ্মশানে যে অমূল্য দেহ ভস্মীভূত হইতে দেখিয়াছি, তাহা আর জীবনে ভুলিব না। ভাবিলে প্রাণ অস্থির হয়, চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় বারি বর্ষিত হয়—এই শতাব্দীর কিইবা সজ্ঞানে ভুলিতে পারি? দলিপের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার ভুলিতে পারি না, ১২৮৩ সালের বঙ্গের জলপ্লাবন ভুলিতে পারি না, বোম্বে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ ভুলিতে পারি না, দিল্লির রাজসূয় যজ্ঞ ভুলিতে পারি না, গুই কুমারের সিংহাসন চ্যুতি ভুলিতে পারি না, মণিপুরের হত্যাকাণ্ড ভুলিতে পারি না, ভীষণ সিপাহি যুদ্ধও ভুলিতে পারি না। ত্রয়োদশ শতাব্দী ভারতের বুকের রক্ত দিয়া রচিত। ইহার কিছুই ভুলিবার নয়। তবে যাও, বড় সাধের ত্রয়োদশ শতাব্দি, তুমি কালের অনন্তগর্ভে বিলীন হও; কিন্তু, তুমি বলিয়া যাও, ভারতের ভাগ্যে ভবিষ্যতে কি আছে। যে সকল অমূল্যরত্ন তোমার গর্ভে ডুবিয়াছে, আর কি তাহা পাইব? তাঁহারা যে সকল রক্ত-বিন্দু পাত করিয়া গিয়াছেন, বলে যাও, তাহা হইতে পরশ্রীকাতর, পর-পদ দলিত স্বার্থপর ভারতবর্ষীয় জাতির মধ্যে রক্তবীজের গোষ্ঠির ন্যায়, নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষী দলের উদ্ভব হইবে কি না? বলে যাও, তোমার কোলের ধন একেশ্বরবাদ এবং বাঙ্গালা ভাষা স্থায়ী হইবে—উন্নতিলাভ করিবে, না, তোমার সহিত—রামমোহন ও কেশবের সহিত—বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের সহিত ডুবিবে? তুমি সবে মাত্র কাল গিয়াছ—আজ তুমি কত দূর? ক্ষণেক দাঁড়াও, দু'টা কথা বল। অমূল্য বঙ্কিম-রত্ন লইয়া তুমি উল্লাসে ছুটিলে, আর একটী কথাও বলিবে না? হা কাল, হা মহাকাল, তোমার বিচিত্র লীলা! বুঝিয়াছি, তুমি দাঁড়াইবে না, তুমি কথা শুনিবে না; উত্তর দিবে না—এ দেশ জাগিবে কি ডুবিবে। আমরা সময়ের দাস, তোমার কথা ভাবি আর আনন্দিত হই, ভাবি আর অশ্রুতে সিক্ত হই। এ দেশের ভাগ্যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হইবে কি?—স্বাধীনতার রাজ্য বহুদূর; বিশুদ্ধ চরিত্রের রাজ্য বহুদূর। ধর্ম্ম ও ভাষার উৎকর্ষ সাধন কে করিবে যে, চতুর্দ্দিকে জয় জয়কার হইবে? বুঝি বা আমরা মরণের কোলেই পড়িয়া রহিলাম। হা কাল, হা মহাকাল!!

১লা বৈশাখ, ১৩০১।

নবশতাব্দীতে নব্যভারত।

গত শত অব্দ; ভেবে দেখ মনে
কি সুখের দিন চলিয়া যায়,
পাতাটি নড়ে না, পাখীটি উড়ে না,
কাঁটাটি ফুটে না কাহার পায়।
বিমল উষার তরল কিরণ,
নবীন জোছনা শীতল ভাতি;
সুখাতপ সেবি গত দিন মান
সুখের স্বপনে পোহায় রাতি।
গত শত অব্দ, ভারত-কাননে
শত বসন্তের সুধা বরষণ,
সঞ্জীবন গুণে তাহার, কেমনে
সর্ব্বত্র ফুটেছে নবীন জীবন!

ধরমে, শিক্ষায়, করমে, দীক্ষায়,
কোথায় না নব জীবন-ভাস?
আশার হরষে, প্রফুল্ল-মানসে,
ফুটে নাই কার মধুর হাস?
গত শত অব্দ বৃটিস শাসনে,
বাঘে মেষে খায় একত্রে জল,
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে, রাজা ও কাঙালে,
একই বিধির ভুগিছে ফল!
হাসিছে অরণ্য, শস্যের কনকে,
দরিদ্রের গৃহে দ্রবিণোদয়;
গর্ব্বিত মস্তক, খর্ব্বিত হয়েছে,
খসিছে তাহার ইষ্টকালয়!
মহারুদ্র রূপে, রেলের সহায়ে,
হাসি হাসি শ্রম লভিছে ফল;
বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধা পেচকিনী,
দেখিয়া বর্ষিছে নয়ন জল!
গত শত বর্ষ সমাজ কলঙ্ক,
কি কালী মেখেছে হিন্দুর মুখে!
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বসতি-ভিটায়,
বাস করে চাঁই (১) চামার সুখে!
যেখানে ত্রিতলে বসিয়া দাম্ভিক,
নিয়ত হানিত ঘৃণার বাণ,
সেখানে এখন নাগর ধানুক (২)
পত্নী পুত্রী সহ গাহিছে গান!
কুলীন সধবে! বালিকা বিধবে!
ফলেছে তোদের অভিসম্পাত,
জন গণনায়, স্পষ্ট দেখা যায়,
উচ্চ হিন্দু বংশ হতেছে পাত!
গত শত অব্দ শাস্ত্রের প্রকাশে,
কি আশা বিকাশ করেছে হায়,
ব্রাহ্মণ কুমার মিথ্যা ব্যবসায়ী,
শ্বপচেতে বেদ পড়িতে চায়!

সে মহা মহিম পরম পুস্তক,
কৃত্রিম শাস্ত্রেতে ঢাকে কি আর?
রমেশ প্রসাদে জন সাধারণে
পাইয়াছে তাহে সমাধিকার!
ধরম জগত ললাট ফলকে,
প্রকৃতি মূলক অহো কি ধর্ম্ম!
ফুটিতেছে ক্রমে নবীন আলোকে,
তের শত অব্দে যাহার জন্ম।
দিনে দিনে বেদ- জ্ঞানের উদয়,
হতেছে যেতেছে সরিয়া কলি,
বর্ণের প্রাধান্য পুরাণ পিশাচ,
সত্যালোক হেরি মরিছে জ্বলি!
যাও তবে যাও, রত্ন প্রসবিনি,
তেরশ শতাব্দী সরিয়া যাও,
আসুক এক্ষণে, তোমার ভগিনী,
কি জানি সে আনে দেখিতে দাও।
শান্তির গরভে যে মধুর দ্রোহ
জন্মে, তার মদে মেতেছে জন;
পারিবে কি তব অনুজা ভগিনী,
তুষিতে পুষিতে তাহার মন?
জনতা-সাগরে, উঠিবে তরঙ্গ,
ছুটিবে লঙ্ঘিয়া পাহাড় গিরি,
বর্ণের গৌরব বংশের মর্য্যাদা
আছাড়ে আছাড়ে ফেলিবে ছিঁড়ি!
বঙ্গেতে বোম্বেতে, মাদ্রাজে পঞ্জাবে,
হিমালয় পাদে কুমারী দেশে,
তরঙ্গ উপর, ছুটিবে তরঙ্গ,
মানবের সত্ত্ব রোধিবে কে সে?
নিম্ন উচ্চ হিন্দু, হিন্দু মুসলমান,
পার্সী ও খ্রীষ্টান মিশিয়া যাবে,
সাম্য মন্ত্র বলে, বর্ণ-ভেদ ভুলি,
এ উহার অন্ন স্বেচ্ছায় খাবে!
উপাসনা থাকে থাকুক পৃথক্,
আহার ব্যভার বিবাহ আর,

(১) চাঁই অতি অস্পৃশ্য হীন জাতি।
(২) নাগর ও ধানুক এদুই জাতিও অস্পৃশ্য।

একতার বলে মিশ্রিত হইয়া,
সমাজ হইবে এক আকার !
মানবের স্বত্ব; লভিবে মানব,
থাকিবে না কেহ অস্পৃশ্য ঘৃণ্য,
হত বুদ্ধি হিন্দু, যারে বলে পাপ,
তাহাই তখন হইবে পুণ্য !
যাও তবে যাও, রত্ন-প্রসবিনি !
তেরশ' শতাব্দী সরিয়া যাও,
হেন দুঃখ ল'য়ে, তব ভগিনীকে,
সত্বর সত্বর আসিতে দাও।
হে নব শতাব্দি, এস তবে তুমি,
পুরাণ কোরাণ করি সংযত।
বর্ণ-ভেদ হীন আদি-বেদ-মতে,
উদ্ভাসিত হ'ক নব্যভারত !

শ্রীমধুসূদন সরকার।

বিয়োগ।

(৺রাজকৃষ্ণ রায়ের উদ্দেশে)

মন যেন বরষার আঁধার আকাশ আজ,
মলিন মেঘের ভারে নত ;
অনির্দ্দিষ্ট কি আশায় কোথায় চলেছে প্রাণ,
ভাবহীন অভাবে বিব্রত।
সন্ধ্যায় নদীর কূলে, শ্মশানের বটমূলে,
বসে আছি শ্রান্ত আঁখি নিদ্রার প্রয়াসী—
স্বপ্নে ভাসিতেছে প্রাণে বিরহের বাঁশী।

কালের জলতরঙ্গে চলে গেল প্রিয়জন,
ফিরিলাম কোথায় ভাসায়ে ;
সারানিশি সুখস্বপ্ন ছিল যে নয়নে, কোথা
উবে গেল ঘুম সে ভাঙ্গায়ে।
পরিত্যক্ত পরস্পর (বুকে পাষাণের স্তর)
মিলিয়াছি—এক চিন্তা সকলের প্রাণে—
এর মাঝে কে কবে বা পলায় কে জানে।

চির গোধূলির রাজ্যে করেছি বসতি মোরা,
নাহি আলো বায়ুর প্রবেশ,
সূর্য্য চন্দ্র নয়নের নেশার খেয়াল, ঘোর-
শ্বাসরোধী স্তম্ভিত প্রদেশ।
বিষাদ-শীতের ত্রাস, আহা উহু বার মাস,
নেত্র জল নীহারের অশ্রান্ত পতনে
নিয়ত পঙ্কিল পথ দুর্গম ভ্রমণে।

আজন্ম-আবদ্ধ শ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলে আজ,
কেটে গেল যাতনা-শৃঙ্খল ;
সে বড় আনন্দ, বড় মঙ্গলের কথা, সখা
তার তরে চক্ষে নহে জল।
ছিল এক কারাগার, খেতে শুতে একাধার,
এতটা সময় ধরি বাড়িল মিত্রতা—
সহসা চলিয়া গেলে না কহিলে কথা ?

পাশেতে পড়িয়া তব শূন্য স্থান, নিরখিয়া
নয়নাশ্রু নিবারিতে নারি ;
ফুরালে দিনের শ্রম সন্ধ্যায় একত্র হই,
তুমি কোথা ? চক্ষে বহে বারি।
কারাবাস সুখ নয়, সতত বেদনাময়,
দুঃখের সখীত্ব বড় মরম-পরশী—
ভেঙ্গে গেছে তাহা, তাই এ অশ্রু বরষি।

ছিল লঘুপাপ তাই এত অল্প-ভোগী, তাই
অল্পে অল্পে ফুরাল যাতনা ;
ফিরে গেলে দেশ, আজি মুক্ত-হস্ত-পদ,প্রাণে
শত সুখ সহস্র কামনা।
অভ্যাসে ভুলিয়া থাকি, পরে আপনার ডাকি,
মাঝে থেকে একজন চলে গেলে, আসে
দেশের ঘরের কথা মনে, আঁখি ভাসে।

এটা যাতনার, এটা মরণের দেশ,—সেথা
বিপরীত গিয়াছ যেথায়,
জীবনের মন্দাকিনী বহিছে অনন্ত অঙ্গে,
ডোব ভাস জুড়াও তথায়।
প্রাণ-ভেদী হাহাকার, নাহি সেথা অনিবার,
পরিপূর্ণ স্বপ্নময় সঙ্গীতে মহান্;
সন্তোষের সুখকর জীবন-প্রয়াণ।

সুশীতল চন্দ্রালোকে মন্দার-নিকুঞ্জ-গৃহে
তারাগণ-বেষ্টিত বসিয়া;
বসন্ত দিতেছে ফুল, মেঘেরা মুকুট আনে
ইন্দ্র-ধনু-মণ্ডল ভাঙ্গিয়া।
অপ্সরে তুলিছে তান, দেবের "জয়োঽস্তু" দান
সুখের কিরণ তব নয়নে ফুটিয়া—
মোরা ভাবিতেছি সে কি মোহিনীর দেশ,
যায় যে সে চায়না ফিরিয়া।

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এই শতাব্দীতে বঙ্গদেশে অনেক জন বিখ্যাত লেখক আবির্ভূত হইয়াছেন,—তাঁহাদের মধ্যে দুইজন প্রধান ও শ্রেষ্ঠ,—পদ্যে মধুসূদন, গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা ও ধীশক্তির কথা আজ লিখিতেছি না; বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গদেশকে তিনি যেরূপ সমুন্নত করিয়া গিয়াছেন, সে কথা লিখিতেছি না; বঙ্গবাসীকে যে মহৎ শিক্ষা, উদ্যম ও গৌরব দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার কথা লিখিতেছি না। যিনি বঙ্কিমবাবুর জীবনী লিখিবেন, তিনি এ সমস্ত কথার আলোচনা করিবেন, গত ৩০ বৎসরের বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস বঙ্কিম-ময়, তাহা তিনি প্রকটিত করিবেন।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্য কি ছিল? খ্যাতনামা ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার বঙ্গীয় গদ্য সৃষ্টি করেন, কিন্তু সীতার বনবাস ও চারুপাঠ বিদ্যালয়ে পঠিত হইত, আমাদের মেয়েরা পাঠ করিত,—শিক্ষিত যুবকের জীবন ও চেষ্টা, উদ্যম ও স্পর্দ্ধা ঐ পুস্তকের দ্বারা কতদূর গঠিত ও প্রতিফলিত হইত? ঈশ্বর গুপ্ত ও মদনমোহনের কবিতা সরল ও সুমিষ্ট, কিন্তু জাতীয় জীবন ও জাতীয় উদ্যম, আশা, ও উৎসাহ সে কাব্যে কতদূর প্রতিফলিত হইত?

৩০ বৎসর হইল দুর্গেশনন্দিনী প্রচারিত হইল! তাহার পর কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধাবলী, প্রচারের প্রবন্ধাবলী, ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র,——আর কত নাম করিব? তীব্রগামী পর্ব্বত-নদীর ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বজ্রনাদে বহিয়াছে, —বঙ্গবাসীদিগের হৃদয় উত্তেজিত করিয়াছে, জাতীয় জীবন চেষ্টা, জাতীয় ভাব ও কল্পনা ও ধর্ম্ম-পিপাসা প্রতিফলিত করিয়াছে,—জাতীয় শরীর গঠিত ও বলিষ্ঠ করিয়াছে! অদ্য আমরা বঙ্গসাহিত্যের স্পর্দ্ধা করি, যে সেটী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও জীবন-ব্যাপিনী চেষ্টার ফল!

কিন্তু এ সমস্ত কথা লিখিবার সময় এখনও হয় নাই। এ কথা আজ আমি লিখিতেছি না। বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন আমার মাননীয় বন্ধু ছিলেন,—বন্ধু সম্বন্ধে দুই একটী কথা লিখিতেছি।

যখন আমার ১০।১২ বৎসর মাত্র বয়স

ছিল, তখন আমার পিতা এবং বঙ্কিমবাবু একত্র খুলনায় কাজ করিতেন, উভয়েই ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন, উভয়ের মধ্যে অতিশয় স্নেহ ছিল। আমার পিতার রাজকার্য্য হইতে অবসর লইবার সময় হইয়া আসিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য্যে তখন প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র, সুতরাং বঙ্কিমবাবু আমার পিতাকে যৎপরোনাস্তি সম্মান করিতেন, এবং তাঁহার ঋষিতুল্য আদর্শ চরিত্র লক্ষ্য করিয়া বড় ভাল বাসিতেন। তখন একবার বঙ্কিমবাবু কলিকাতায় আইসেন, আমাদের বাটীতে আমার পিতার সহিত একত্র আহার করেন,—সেই আমি বঙ্কিম বাবুকে প্রথম দেখিলাম! আমি তখন ১০।১২ বৎসরের বালক, বঙ্কিমবাবু আমাকে অতিশয় স্নেহ করিলেন,—সে স্নেহ তিনি আজীবন ভুলেন নাই।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজকার্য্য উপলক্ষে খুলনা জেলায় আমার পিতার কাল হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তখন খুলনায়, তিনি যে রূপ বিলাপ করিয়া একখানি পত্র লেখেন, অদ্যাবধি সে কথা আমার হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে। * *

তাহার দশ বৎসর পরের কথা বলি। বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান যশস্বী লেখক হইয়াছিলেন,—আমি বিলাত হইতে ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে প্রত্যাগত হইয়া আলিপুরে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শন বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন!

ভবানীপুরে একটী ছাপাখানা হইতে ঐ কাগজখানি প্রথমে বাহির হয়, তথায় বঙ্কিমবাবু সর্ব্বদা যাইতেন। সেই ছাপাখানার নিকটে আমার বাসা ছিল, বলাবাহুল্য বঙ্কিমবাবু আসিলেই আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। একদিন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা, তবে তুমি বাঙ্গালা লিখ না কেন? আমি বিস্মিত হইলাম! বলিলাম,—আমি যে বাঙ্গালা লিখা কিছুই জানি না! ইংরাজি বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখি নাই, কখনও বাঙ্গালা রচনা পদ্ধতি জানি না! গম্ভীরস্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন,—রচনা পদ্ধতি আবার কি,—তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে, তাহাই রচনা পদ্ধতি হইবে! তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে! এই মহৎ কথা আমার মনে বরাবর জাগরিত রহিল,—তাহার তিন বৎসর পর আমার বাঙ্গালাভাষায় প্রথম উদ্যম "বঙ্গবিজেতা" প্রকাশ করিলাম। * *

তাহার ১০।১৫ বৎসরের পরের কথা বলি। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে যখন আমি রাজকার্য্য হইতে দুই বৎসরের অবসর লইয়া কলিকাতায় আসিয়া পণ্ডিতগণের সাহায্য লইয়া ঋগ্বেদ অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন একটা বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সে কথা অনেকেই জানেন। উন্নতমনা, সাহসী, উদারচেতা বঙ্কিমচন্দ্র আমাকে সে সময়ে যেরূপ উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, তাহা আমি জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না। চারিদিকে অপবাদ, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া "প্রচার" নামক কাগজে বঙ্কিমবাবু আমার যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই জানেন! তাঁহার উৎসাহ বাক্য আমি ঋগ্বেদের এক খণ্ডে উদ্ধৃত করিয়া আপনার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিলাম। * *

তাহার পর প্রায় আর দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমি যখন যে উদ্যমে লিপ্ত হইয়াছি, তাহাতেই আমি বঙ্কিমবাবুর নিকটে উৎসাহ পাইয়াছি। ইংরাজি ভাষায় আমি যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে ইতিহাস লিখিয়াছি,সেটী দেখিয়া বঙ্কিমবাবু আনন্দিত হইলেন। হিন্দুশাস্ত্রের সার অংশ যখন খণ্ডে খণ্ডে প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম, উদারচেতা বঙ্কিমচন্দ্র আমাকে উৎসাহ দান করিলেন, সে কার্য্যে নিজে সহায়তা করিতে ব্রতী হইলেন!

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বদিন আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি তখন প্রায় অজ্ঞান, কিন্তু আমার গলার শব্দ বুঝিতে পারিলেন,—আমার দিকে চাহিয়া সস্নেহে আমার সহিত কথা কহিলেন,—আমার একখানি ফটোগ্রাফ্ চাহিলেন। সে সময়ে কেন আমার ফটোগ্রাফ্ চাহিলেন, জানি না।

তাহার পর দিন শুনিলাম, যিনি ৩০ বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে রাজ স্বরূপ ছিলেন,—আজীবন আমার বন্ধু স্বরূপ ছিলেন,—তিনি আর নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে আজি বঙ্গবাসী মাত্র আকুল,—তাঁহার বন্ধুদিগের হৃদয়ের শোক প্রকাশের সময় এখন নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও মহত্ত্ব সকলেই জানেন; তাঁহার হৃদয়ের সদ্গুণগুলি অল্প লোকেই বিশেষ করিয়া জানেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র।

১

সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—তের শত সন,
এক পায় দুই পায়, বসন্ত চলিয়া যায়,
শ্যাম-মমতায় মেখে বন উপবন!
তার সে বিদায় ভোজ, মধু খায় রোজ রোজ,
ফুলের গেলাস ভরি মধুকরগণ!
তরুণ তমাল গাছে, কি জানি কি লিখা আছে,
কোকিল করিছে পাঠ সে অভিনন্দন!
উড়ায়ে রুমাল ছাতা, নূতন পল্লব পাতা,
আনন্দ জানায় যেন নীরবে কানন!
বসন্ত বিদায়—কাজ, সভাপতি দ্বিজরাজ,
সুধাকরে করে তার শেষ সম্ভাষণ!
সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—তের শত সন!

২

সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—হায় হায় হায়!
বঙ্কিম বসন্ত-কবি আগে তার যায়!
লইয়ে নবীন, হেম,—অক্ষয়ে অক্ষয় প্রেম—
চন্দ্রনাথ, প্রিয়বন্ধু দীনবন্ধু রায়,
ধরে সবে হাতে হাতে, লইয়া আসিলে সাথে
পারিজাত বন থেকে শ্যামা পাপীয়ায়!
ছিন্নআশা ছিন্নবাসা, সাজাইলে বঙ্গভাষা,
শীতের শিশির মুছে মলয় হাওয়ায়!
এখনো পূরেনি তার, সময়ের অধিকার,—
সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—হায় হায় হায়!
বঙ্কিম বসন্ত-কবি আগে তার যায়!

৩

বাঙ্গালার মহা কবি—ভারত-ভূষণ,
সাজাইলে কত সাজে কাব্য-উপবন!
কমল কমলমণি, পবিত্র প্রেমের খনি,
'কানা কড়ি' দিয়ে সে যে কিনে রাখে মন
'সতু'রে সারথি করি, আরক্ত কপোলে মরি
আপনি সমরে ধরে ফুল শরাসন!

সূর্য্যমুখী ‘সূর্য্যমুখী’, স্বামীর সুখেই সুখী,
স্নেহে প্রেমে মমতায় কোথায় এমন ?
কোমল ‘কুন্দের’ মালা, প্রীতির নৈবেদ্য বালা,
কি সুন্দর করিয়াছে আত্ম-নিবেদন !
‘বিষ’ নহে ‘সুধা’বৃক্ষ, পরশিছে অন্তরীক্ষ,
তারকা ‘হীরার’ ফুলে তীখণ কিরণ,
জগতের একধারে, সুদূর সাগর পারে,
আলো করিয়াছে সে যে বৃহৎ বৃটন !
কত ফুলে সাজাইলে বঙ্গ উপবন !
পূজনীয় প্রিয় কবি, ফুটাইলে যে মাধবী—
বিমল ‘বিমলা’রূপে গড় মন্দারণ !
হৃদয়ে লুকায়ে শূল, হাসে কাঁদে চাঁপাফুল,
আকুল ‘আয়েসা’ চির আনত-আনন !
‘রজনী’ রজনীগন্ধা, আলো করে দিবা সন্ধ্যা,
প্রেম-পূর্ণিমায় তার বেলফুলবন!
ফুল দিয়ে সিঁদ কাটে রমণী কেমন !

৪

বঙ্গের বসন্ত কবি—ভারত-ভূষণ,
কত ফুলে সাজাইলে ভাষা ফুলবন !
‘রোহিণীর’ সমতুল, বিধবা বকুল ফুল,
কোন্ দেশে ফোটে হেন মধুমাখা মন ?
কি শোভা পুকুর পারে,গোবিন্দ তুলিলা তারে,
ইন্দিরা লভিলা যেন নিজে নারায়ণ !
অভিমানে উচ্ছ্বসিতা, অপূর্ব্ব অপরাজিতা,
কি সুন্দর ‘ভ্রমরের’ মধুর মরণ !
না উঠিতে রাঙ্গা রবি, নির্ম্মল সরল ছবি,
ফুলদলে শিশিরের ধীরে পলায়ন !
কত সাজে সাজাইলে ভাষা ফুলবন !

৫

তুমিই আনিয়া দিলে সুষমা শ্যামল,
আগে ছিল রুখু রুখু, না ছিল লাবণ্যটুকু,
মরা গাঙ্গে ছুটাইলে জোয়ারের জল !
দুইজনে চুবাচুবি, দুইজনে ডুবাডুবি,
‘প্রতাপ’ ‘শৈবালে’ যুদ্ধ কাঁপে দেবদল।
এমন আদর্শবীর, কোথা আছে পৃথিবীর,
পিণাকীর চেয়ে এ যে ‘প্রতাপ’ প্রবল !
তুমি ফুটাইলে এই অনল-কমল !

৬

তুমিই সাজালে ভাষা শ্যাম সুষমায়,
বালিকা ‘প্রফুল্ল’ আনি, গড়াইলে দেবীরাণী,
বিদ্যুতে মাখিয়া ফুল দেব-প্রতিভায় !
কল্পনা-কালিন্দীতটে, গড়িলে আনন্দ মঠে,
ভারত ভবিষ্য স্বর্গ সুমেরু ছায়ায় !
শিখালে সন্তান ধর্ম্ম, জননীর প্রিয় কর্ম্ম,
মহাবীর সত্যানন্দ মহাপ্রাণতায় !
তুমি সাজাইলে ভাষা অনন্ত শোভায়!

৭

তুমি সাজাইলে ভাষা নানা আভরণে,
কত রঙ্গ কত রস, কমলাকান্তের বশ,
লিখিলে রহস্য কত বিজ্ঞানে দর্শনে !
বুঝাইলে যোগভক্তি, কৃষ্ণের অসীম শক্তি
দেখালে আদর্শ নর দেব নারায়ণে !
ঝেড়ে পুছে ধূলা মাটী, হিন্দুর আসল—খাটি,
বুঝাইলে দয়াধর্ম্ম দেশবাসিগণে।
তোমার স্বাধীন মত, শরতের রৌদ্রবৎ,
জ্বলিতেছে ভারতের গগনে গগনে !
প্রতিভার দীপ্তরবি, বাঙ্গালীর মহাকবি,
কেন অস্ত যাও আজ অগস্ত্য গমনে,
ঢালিয়া আঁধার ঘন ভাষাফুলবনে ?

৮

যাবে তুমি ? এ জগতে কে না বল যায় ?
কেহ গেলে হাসে লোকে, কেহ গেলে কাঁদে শোকে,
পাষাণ বিদরে কারে করিতে বিদায় !
বসন্ত বাঁচিয়ে থাক্, নিদাঘ শিশির যাক্,
কুলার বাতাসে আর তুষের ধূঁয়ায় !
বার মাস নিতি নিতি, থাকুক্ পূর্ণিমা তিথি,
চলে যাক অমা রাহু, ক্ষতি নাহি তায়।

তুমি থাক, মোরা যাই, আমরা যে ভস্ম ছাই,
কি হবে এ কোটি কোটি রেণু-কণিকায় ?
আমরা পথের ধূলি, কর্দ্দম কঙ্কর গুলি,
আমরা নীচের নীচ পড়ে থাকি পায় !
বিধির অপূর্ব্ব দান, দেশের গৌরব মান,
তুমি কবি-কহিনুর কিরীট চূড়ায় !
মোরা যাই, তুমি থাক, সুখী কর মায় !

৯

গভীর বসন্ত নিশি—গভীর গগন,
কলিকাতা—নিমতলে, দিতেছে গঙ্গার জলে
ধোয়াইয়া ভারতের বুকভরা ধন !
পাতিয়ে অঞ্চল ঢেউ—আঁধারে দেখেনি কেউ—
মহা যত্নে মন্দাকিনী করিছে গ্রহণ !—
পাইয়া কবির ছাই, আনন্দের সীমা নাই,
চলেছে পতিরে দিতে ডগমগ মন !
কত যুগ যুগান্তর, হৃতরত্ন রত্নাকর,
দেবতা লুঠিয়া নিছে করিয়ে মন্থন !
পরশে কবির ছাই, ফিরিয়ে পাইবে তাই,
লবণাক্ত জলে হবে সুধা অতুলন !
ইন্দিরা জন্মিবে শঙ্খে, পারিজাত হবে পঙ্কে,
শুকুতি পরশে হবে মুকুতা সৃজন !
শৈবাল প্রবাল হবে, সুধাকর ফেন সবে,
হইবে কল্পতরু তৃণতরুগণ !
পাষাণে পড়িলে দাগ, হবে মণি পদ্মরাগ,
অঙ্গারে হইবে হীরা কৌস্তুভ রতন !
সত্যই কবি কি মরে ? বোঝেনা অবোধ নরে,
কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন !
আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

প্রতিভা-পূজা।

(শ্রীবঙ্কিমের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত)

(আবাহন)

সাগরের কোলে মাথা দিয়া,
বঙ্গমাতা ছিল ঘুমাইয়া ;
চারিদিকে চিতার অনল !
শকুনি-গৃধিনী-কোলাহল !
পিশাচেরা নাচিয়া বেড়ায়,
অট্টহাসি প্রেতগণ ধায়,
আলো খেলে আঁধারের গায়,
বিভীষিকা নাচি পিছু ধায়।
নিরাশা বসিয়া আছে যেন,
শোক'পরে পাতি সিংহাসন ;
হরি !—এ যে বিকট শ্মশান !
হেথা মাতা কি হেতু শয়ান !

(২)

একি যোগনিদ্রা মা তোমার,
এই ঘোর শ্মশান প্রান্তরে ?
ডাকিনী যোগিনী শব ভাবি,
তোর পরে একি নৃত্য করে !
পাশে তোর কচি কচি ছেলে,
সাত কোটি আছে ঘুমাইয়া,
তারা বুঝি চির নিদ্রাগত,
প্রাণবায়ু গেছে পলাইয়া।
কত ভূত-পিশাচের দলে,
যায় নিতে তাহাদের শব ;
কভু ধায় গৃধিনীর পালে,—
করিছে কি বিকট উৎসব !

(৩)

উঠ মা জননী-জন্মভূমি!
যোগনিদ্রা ত্যজ একবার;
হের মা শ্মশান-চারিভিতে,
শবপ্রায় সন্তান তোমার।
তোমার অমৃত পরশনে,
পাবে দেহে চেতনা আবার;
তোমার করুণা বরষণে,
প্রাণে হবে শক্তির সঞ্চার।
নতুবা কালের আহ্বানে
সিন্ধু উঠি মরণের সাতে,
লবে সবে অতলের কোলে,
বিস্মৃতি যেথায় রাজ্য পাতে।

(৪)

কেন আজ কর আবাহন!—
কে করিবে প্রতিষ্ঠা তাঁহার?
সন্তানের শব হেরিবারে,
জাগরণ—যন্ত্রণা মাতার।
এবে মাতা বড় শক্তিহীন,
কেবা শক্তি করিল হরণ—
কেবা তাঁরে করেছে শ্রীহীন,
আলসে আবেশে অচেতন,
একদিন হেন আবাহনে,
হ'ল তার চেতনা সঞ্চার,
সে চৈতন্য গিয়াছে চলিয়া;
এবে হেথা ঘোর অন্ধকার!

(উদ্বোধন)

(৫)

সুদুর সাগর পার হ'তে,
শক্তির প্রবাহ আসি ধীরে,
সঞ্চারিয়া বিদ্যুতের তেজ,
পরশিল জননীর শিরে।
যোগ নিদ্রা ভাঙ্গিল মাতার,
চাহি দেখে ভীষণ শ্মশান!
সপ্তকোটি শব চারি ভিতে,
নাহিক একটি দেহে প্রাণ।
হেরে সুধু হাসে অন্ধকার!
অজ্ঞানের স্বপ্ন-আবরণ,
ধীরে ধীরে আসিছে নামিয়া;
মৃত্যু বসি পাতি সিংহাসন।

(৬)

ঊর্দ্ধে মাতা আকাশের পানে,
চাহিলেন আকুল পরাণে;
করুণার জ্যোতি বাহিরিয়া,
পশিল বিশ্বের কেন্দ্রপানে।
আকর্ষণ বলে বিশ্ব-প্রাণে,
উঠিল কি শকতির বেলা!
সে তরঙ্গ নামি আসি হেথা,
প্রাণ স্রোতে খেলিল কি খেলা!
কমণ্ডলু করে ধাতা নিজে,
আসিলেন বঙ্গমাতা স্থানে;
ধরম-অমৃত-বারি দিয়া,
প্রাণ দেন মায়ের সন্তানে।

(৭)

বলিলেন সম্বোধি মায়েরে,
"সম্বরণ কর শোক ভার,
বঙ্গ পুনঃ উঠিবে জাগিয়া;
কাল-স্রোতে ভাসিবে আবার—
যেই দিন তোর সুসন্তান,
মাতৃ-পূজা শিখাবে সন্তানে,
সপ্তমে ধরিয়া মহাতান,
ভক্তি দিবে সপ্তকোটি প্রাণে;
সেই দিন মহা শক্তি এক,
হৃদে তোর বহা'বে তড়িত;
তেজ তার ছুটি দেশে দেশে,
উদ্বোধিবে ধরার সম্বিত।"

(৮)

বিশ্ব প্রাণ হইয়া ক্ষোভিত,
যেই শক্তি করিল সঞ্চার,
হয়ে ভিন্ন—চৈতন্য আশ্রয়ে
বিশ্বব্যাপি হইল প্রচার।
সে শক্তি হইল কেন্দ্রীভূত,
—কেন্দ্র তিন শক্তির আধার,
জ্ঞান, কর্ম্ম, চিত্ত শক্তি মিলি,
আকর্ষণে বাঁধিল সংসার।
করুণার আলোড়ন বলে,
সেই তিন শক্তি-কেন্দ্র হ'তে,
তিনটি আবর্ত্ত ভিন্ন হ'য়ে,
বঙ্গপানে আইল ত্বরিতে।

(প্রতিষ্ঠা)

(৯)

একটি শকতি তার মাঝে,
সারা বঙ্গ ঘুরিয়া বেড়ায়,
নাহি পায় আবির্ভাব স্থান,
এত পুণ্য নাহিক কোথায়।
কিন্তু বঙ্গ ছাড়ি নারে যেতে,
বঙ্গমাতা করে আবাহন ;
বঙ্গে তার বড় প্রয়োজন,
জাগাইতে বঙ্গের সন্তান।
নূতন বঙ্গের কর্ম্ম পথ,
করিতে যতনে উদ্‌ঘাটন ;
আদর্শ ধরিয়া সম্মুখেতে,
আহ্বানিতে বঙ্গের সন্তান।

(১০)

উৎকলের উপকূলে অই—
শব এক রয়েছে শায়িত,
পার্শ্বে চিতা হতেছে নির্ম্মাণ,
শবেরে করিতে ভস্মীভূত।
কোথা হতে যোগী একজন,
আসি তেজে ভাতি চারি ভিত,
শবে প্রাণ করিল অর্পণ,
সবে হেরি হইল স্তম্ভিত!
নিজ তেজে পূত করি শবে,
মন্ত্রে তারে করিল দীক্ষিত ;
"শক্তি" তার পুণ্য আকর্ষণে,
বংশে তার হল আবির্ভূত।

(১১)

যে পুরুষ বড় ভাগ্যবান,
সেই হেন শক্তির আধার ;
হয় মহা পুরুষ সে জন,
এই মহা-ঐশ-শক্তি যার,
পূর্ণরূপে হৃদে প্রতিষ্ঠিত
ক্ষুদ্র শক্তি করি আকর্ষণ,
পাতে এক মহা শক্তি মেলা,
জড় করে দূরে পলায়ন।
প্রতিভা আসিয়া বঙ্গে অই,
পাতিল শক্তির সিংহাসন ;
বাঙ্গালীর দলিত পরাণে,
শক্তি পুনঃ হল সঞ্চালন।

(পূজা)

(১২)

মাতৃপূজা ষোড়শোপচারে,
হের করে প্রতিভা হেথায়!
উঠিয়াছে কিবা মহারোল,
সবে ছুটি হেরিবারে ধায়।
হেথা হের তপস্যা কঠোর,
ভারতীর উদ্বোধন তরে ;
কি বর দিলেন তারে মাতা,
কিবা সুধা লেখনী উগারে!
কল্পনার পুণ্য ভাগিরথী,
বিষ্ণুপদ দ্রব করি আনে ;
প্রকৃতি আপনি আসি তারে,
সাজাইলা মনোজ্ঞ ভূষণে।

(১৩)

প্রতিভার সৃষ্টি চমৎকার!
—হের যবনিকা-অন্তরালে,
জাগরণে দেখিবে স্বপন,
কল্পনার মোহ-ইন্দ্রজালে!
দেখিবে স্বর্গের সুখ-ছবি,
নরকের বিকট দর্শন!
দেখিবে মনোজ্ঞ চিত্রমূলে,
পাপের কালিমা-আবরণ!
দেখিবে কোথাও স্তব্ধ হয়ে,
ভালবাসা বিষের দাহন!
রূপ-তৃষা দাবানল কোথা,
অলক্ষ্যেতে চুম্বিছে মরণ!

(১৪)

মনুষ্য-পতঙ্গ হের কোথা,
রূপের আগুনে ঢালে প্রাণ!
কোথা বা বসায়ে স্বার্থ হাট,
বিকি-কিনি করে নিজ প্রাণ!
বিষয়-বাসনা-ঝড়ে কোথা,
উঠায়েছে হৃদয়ে তুফান;
মরণ পেতেছে মেলা সেথা,
বৈরাগ্যের চাহে বলিদান!
হের পুনঃ জ্বলে অন্য দিকে,
কর্ত্তব্যের নিশানা-কিরণ!
সেই পথে লয়ে যায় ধীরে,
নিষ্কাম-করম-অনুষ্ঠান।

(১৫)

অনুষ্ঠেয় আছিল তাহার,
উচ্চতর আদর্শ সৃজন,
জীবনের আঁধার সাগরে,
নাবিকের আলো নিদর্শন;
আঁধার জীবন-সিন্ধুতল,
দীপ্তি' কভু তীব্র বজ্র-করে,
তুলি চিত্র—দেখাইছে পথ,
দিশাহারা ভ্রান্ত নাবিকেরে।
শান্তি দে'খে কর না নির্ভর—
কবে বাসনার মেঘ-কণা,
উঠাইবে প্রলয় তুফান,
ভেঙ্গে তরী হবে আটখানা!

(১৬)

কি সাধনা কিবা সিদ্ধি তার—
দিব্য বেণু কে দিলা তাহারে?
মধুরে ধরিছে মহা তান্,
আকুল করেছে মোহ ভরে।
হৃদয়ের প্রতি স্তর বেড়ি,
কি তুফান করে আলোড়িত;
কি উচ্ছ্বাস মদিরা ঢালিয়া,
প্রাণ মন করে পুলকিত।
যেই নব ভাবের লহরী,
খেলে প্রতি বেণুস্বর সনে;
অঞ্জলি পাতিয়া লয়ে তারে,
নিবেদিছে মায়ের চরণে।

(১৭)

একি নব ধরিয়াছে তান—
ওই শুন বাঁশরীর স্বর!
পূর্ণ মনুষ্যত্ব তত্ত্ব কথা,
নব ধর্ম্ম করিছে প্রচার।
সুখ হেতু ধাইছে মানব,
সুখ কোথা পাইবে লভিতে?
এই ধর্ম্ম বিনা অনুষ্ঠানে,
সুখ-আশা বিফল জগতে;
কর্ম্ম কর কামনা ত্যজিয়া,
চিত্ত-বৃত্তি করহ শীলন;
কুহকিনী উপধর্ম্ম দলে,
সুদূরে করিবে পলায়ন।

(১৮)

কভু ডাকে মধুর আহ্বানে,
প্রচারিতে সত্য সমাচার,

সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয়,
পূর্ণ ঐশ মহা অবতার।
মনুষ্যত্ব চরম বিকাশ,
আকাঙ্ক্ষার বিশ্রামের স্থান ;
মানবের আদর্শ চরম,
ভক্তের আনন্দ নিকেতন।
মথি কভু গীতার সাগর,
নিষ্কাম করম-তত্ত্ব লয়ে,
বিলাইছে বঙ্গে ঘরে ঘরে,
কি অমিয়া—কি শক্তি ঢালিয়ে !

(১৯)

প্রতিভার হের বীরসাজ,
মাতৃ অরি করিতে দমন ;
লেখনীর তীব্র বজ্র তেজে,
অরি দূরে করে পলায়ন।
কুশিক্ষা কুধর্ম্মের প্রভাবে,
কুকবির বিকৃত অঙ্কনে,
হেরি চিত্র ইষ্টদেবতার,
হতেছে মলিন প্রতিক্ষণে।
প্রতিভা জ্বালিল কি অনল !
দগ্ধ তরে মূর্খতা-খাণ্ডব ;
করি দূর ভ্রম অন্ধকার,
প্রচারিল ধর্ম্ম অভিনব।

(২০)

প্রতিভার হস্ত প্রসারিয়া,
কভু হের কত যত্ন করি,
পুঁছাইছে কলঙ্ক ভা'য়ের,
বীরত্বের পশরা বিস্তারি।
সপ্তদশ অশ্বারোহী কথা,
বাতুলের অলীক স্বপন—
কেবল বিশ্বাস-ঘাতকতা,
শুধু অন্ধ স্বার্থের ছলন।
অন্ধ ইতিহাস-কক্ষ হতে,
মা'র এ কলঙ্ক উপাখ্যান,
পুঁছে ফেলি অতি যতনে,
কভু গায় মাতৃযশ গান।

(২১)

শুন পুনঃ গভীর ঝঙ্কার—
হৃদয়-বিদারী আর্ত্তরব !
মা মা রবে জগৎ ভাসায়,
একি তান ধরে অভিনব !
মা বুঝি লুকাল সিন্ধুকোলে,
অকৃতি সন্তান দুঃখ হেরে,
তাই করে অদ্ভুত সাধনা,
মাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার তরে।
সপ্তকোটি গলা ধরি কাঁদে,
ভিক্ষা যাচে হৃদয়ের বল ;
বুঝাইছে সন্তানের ব্রত,
সাধে—ব্রত করিতে সম্বল।

(২২)

বলে—কর স্বার্থ আত্ম-ত্যাগ,
পণ কর প্রাণ বলিদান,
লহ মাতৃভক্তি মন্ত্র কাণে,
সদা কর সে মন্ত্র সাধন।
ত্যাগ কর পুত্র পরিবার,
দূর কর বিষয়-বাসনা,
যতদিন না পার করিতে,
এই মহা ব্রত উদ্‌যাপনা।
যে দিন মহিমা বেদীপরে,
স্থাপিবে মায়ের সিংহাসন,
প্রতিষ্ঠিবে দশভুজা রূপে,
হবে তবে ব্রত উদ্‌যাপন।

(২৩)

কি অদ্ভুত মাতৃভক্তি এই,
শিখাইলে মা-সোহাগী-ছেলে !
কিবা মহা পূজা আয়োজন,
ল'য়ে মা'র সন্তান সকলে।

"বন্দে মাতরং" মন্ত্র-বলে,
করিল যে শক্তি আবাহন,
কাল-গর্ভে সেই শক্তি-বলে,
যেই বীজ হইবে বপন ;—
অহ দূর ভবিষ্যৎ-পটে,
বঙ্গ-ভাগ্য কর বিলোকন,
দেখিবে সে বীজ অঙ্কুরিত,
ফল তার অনন্ত জীবন !

(২৪)

কালের ভবিষ্য রঙ্গভূমে,
হবে যে নাটক-অভিনয়,
প্রতিভা দেখালে ছায়া তার,
যোগবল করিয়া আশ্রয়।
এস ভাই বঙ্গের সন্তান !
ওই মন্ত্র করিয়া গ্রহণ,
করি যত্ন—সেই ভবিষ্যৎ
করিতে নিকটে আনয়ন !
প্রতিভার এ মাতৃ-পূজায়,
এস সবে করি যোগদান,
হবে না হবে না অন্যরূপে,
জননীর মঙ্গল সাধন।

(২৫)

এ অদ্ভুত প্রতিভার তরে,
এস পাতি রত্ন সিংহাসন,
এস ভাই সকলে মিলিয়া,
করি তার পূজা আয়োজন।
এ যে নর-দেবতার পূজা,
প্রতিভার বিহিত সম্মান,
এ পূজার তরে এস সবে,
করি "বন্দে মাতরং" গান।
এ পূজার ফলে অবহেলে,
মাতৃভক্তি করিব অর্জ্জন,
বুঝিব ধর্ম্মের গূঢ় কথা,
মনুষ্যত্ব করিব সাধন।

(বিসর্জ্জন)

(২৬)

কিন্তু এ পতিত বঙ্গে হায় !
মিছা হ'ল পূজা আয়োজন ;
ঐ দেখ প্রতিষ্ঠা লইয়া,
চলিল দারুণ বিসর্জ্জন !!

* * *

কালের করাল রাহুগ্রাসে,
বঙ্গসূর্য্য হবে অদর্শন,
তাই ওই রাহুর আঁধারে,
রবি-শশী লুকাল বদন !
তাই শোকে প্রকৃতি অকালে,
ঢাকে মুখ আঁধার-বসনে !
বঙ্গমাতা অধীর হইয়া,
চাহিলা প্রকৃতি মুখ-পানে।

(২৭)

জ্ঞান আর কর্ম্ম অবতার
মার দুটি আদরের ছেলে,
সে দিন হরিল আসি কাল ;
—মা ছিল অজ্ঞান শোক শেলে,
জ্ঞান পেয়ে চাহিলেন মাতা—
হেরিলেন হাসে তাঁর কোলে,
প্রতিভার পূর্ণ অবতার,
গেল শোক তারে বুকে তুলে।
এবে হেরি হেন অমঙ্গল ;
ভয়ে মাতা কাতর পরাণে,
যত্নে তারে ধরি হৃদিমাঝে,
চাহিলা বিশ্বের কেন্দ্র পানে।

(২৮)

হেরিলা সে মহা কেন্দ্র মাঝে,
উঠিয়াছে মহা আলোড়ন,
কি এক অভাব আসি সেথা,
মহা ঝড় করিছে সৃজন !

যেই শক্তি ছিল কেন্দ্রচ্যুত,
যেই তেজ ত্যজি নিজস্থান,
মাতার কাতর আবাহনে,
লভেছিল ধরায় জনম—
আঁজি ওই বিশ্ব কেন্দ্রপরে,
সে শক্তির [illegible]
লইতে তাহারে তাই আসে,
কাল রূপে মহা আকর্ষণ।

(২৯)

ভয়ে মাতা হইল অজ্ঞান।
শ্রান্ত হয়ে ছিল ঘুমাইয়া,
মার কোলে মায়ের সন্তান ;
কোল হতে পড়িল খসিয়া।
সে দারুণ মুহূর্ত্ত ধরিয়া,
কাল আসি দিল দরশন —
প্রতিভার জ্যোতি নিরখিয়া,
স্তম্ভিত রহিল কতক্ষণ।
বিদ্যুৎ-পুরুষ আসি পরে,
শক্তি লয়ে করিল প্রয়াণ ;
শব-দেহ রহিল পড়িয়া,
প্রতিভার শূন্য সিংহাসন !

(৩০)

বহুক্ষণ পরে বঙ্গমাতা,
ধীরে ধীরে খুলিলা নয়ন ;
দেখে এবে শূন্য কোল তাঁর,
আছে পড়ি শূন্য সিংহাসন !
শোক মোহ হল উদ্বেলিত,
পুনঃ তাঁর হরিল চেতন ;
সেই মহা শোকের তরঙ্গ,
ছুটিল কাঁপায়ে ত্রিভুবন।
বিশ্ববীজ শব্দ-সিন্ধু হতে,
ধ্বনি এক মূর্ত্তিমতী হয়ে,
যথা মাতা শোকে অচেতন,
তথা ধীরে আসিল নামিয়ে।

(৩১)

শুনিলা মা সুমধুর বাণী,
—কালের অমর আশা-ভাষা—
"উঠ মা উঠ মা বঙ্গ রাণি !
দূর কর দারুণ নিরাশা।
"তোমার কাতর আবাহনে,
হয়েছিল যে শক্তি বিকাশ,—
"রহিবে সে শক্তি কার্য্যরূপে,
কভু তার হবে না বিনাশ।
"প্রতিভা নিঃসাড়ে মন্ত্র বলে,
যে শক্তি করিল সঞ্চালন,
"নব বল তাহাতে লভিয়া,
জাগিবে মা তোমার সন্তান।

(৩২)

"তোর প্রতি হইলা সদয়,
বিশ্বপতি বিধাতা আপনি,
"তাই বিধি করিলা আহ্বান,
স্বর্গে তিন জ্ঞান-স্রোতস্বিনী—
"সে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী,
পাঠাইলা তোর সন্নিধান,
"তোর এপ্রয়াগ ক্ষেত্রে মিশি,
মরুভূমে ঢালিলা জীবন।
"এবে তারা ভিন্ন পথ দিয়া,
সাগরেতে হইল মিলিতা;
"কিন্তু তোর চির অভিশাপ,
সে পরশে হইল দূরিত।"

(৩৩)

নিরবিল ওই মহা বাণী !
বঙ্গমাতা উঠিল শুনিয়া ;
শূন্য মনে যেন পাগলিনী,
মা কোথায় গেলেন চলিয়া।
শূন্য কোল হল সিংহাসন,
স্তব্ধ বঙ্গ শোকের স্বপনে ;
একবার ভাঙ্গি সে স্বপন,
চাহ অই বিশ্ব কেন্দ্র পানে !
নিজ কর্ম্ম করিয়া সাধন,
শ্রান্ত হয়ে লভিতে বিরাম,
আনন্দে ঘুমায় মার কোলে—

ব্রহ্মকোলে হের ব্রহ্ম-ছেলে !!

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র।

"Great geniuses have the shortest biographies. Their cousins can tell you nothing about them. They lived in their writings and so their house and street life was trivial and common place. If you would know their tastes and complexions, the most admiring of their readers most resembles them." *Emerson.*

ত্রয়োদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের কার্য্যকলাপ বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই ভাষা-সংস্কার, ধর্ম্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কার এই শতাব্দীর বিশেষত্ব। ইঁহাকে মহাত্মা রমেশচন্দ্র "রামমোহন-যুগ" নাম দিয়াছেন। এই শতাব্দীর সমস্ত লোক-সাগর ছাঁকিলে আমরা ৫টী অসাধারণ প্রতিভাশালী লোক দেখিতে পাই,—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, মাইকেল এবং বঙ্কিমচন্দ্র। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ঘটনা রামমোহনের অভ্যুত্থান ও তিরোধান, মধ্যের ঘটনা মাইকেল, কেশবচন্দ্র এবং বিদ্যাসাগরের অভ্যুত্থান ও তিরোধান, আর শেষ ঘটনা—বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গারোহণ। রামমোহন জ্ঞানবুদ্ধিতে, মাইকেল কবিত্বে, কেশবচন্দ্র প্রতিভা ও ভক্তিতে, বিদ্যাসাগর প্রেমে এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভায় এদেশে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাস ইঁহাদেরই কার্য্যকলাপে পূর্ণ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশ এবং বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির মূল ইঁহারাই। ধর্ম্ম-সংস্কার, ভাষা-সংস্কার, সমাজ সংস্কার, সকলই ইঁহাদিগের দ্বারা হইয়াছে। সুতরাং ইঁহারাই জাতীয় উন্নতির মূল। ইতিহাস এবং ভাবীবংশ অবশ্য এ সকল কথার সুবিচার করিবে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান, একথা ভাবিলে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন হইতে অশ্রু নিপতিত হয়, প্রাণ শোকে, বেদনায় আচ্ছন্ন হয়। কি অপরাধে, সোণার বঙ্কিমচন্দ্র, ধর্ম্ম-প্রচার ও সাহিত্যসেবার মায়া পরিত্যাগ করিলেন, জানি না। তিনি কথা প্রসঙ্গে এক দিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"বঙ্গদেশে, কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি সাহিত্যে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে, যার যা ইচ্ছা লিখিতেছে এবং করিতেছে, ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত।" এই দুঃখেই কি মহাত্মা অসময়ে প্রয়াণ করিলেন? ৩০ বৎসরাধিক কাল তিনি বাঙ্গালা ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট ছিলেন, এবং কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর হইতে ধর্ম্ম-সংস্কারের তিনি অজেয় নেতা ছিলেন, তাহা কি তিনি জানিতেন না? তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশ যে সম্রাটহীন এবং নেতাহীন হইবে, তাহা কি তিনি বুঝিতেন না? তবে কেন গেলেন, কেন কাঁদাইলেন? আকুল প্রাণে মহাশ্মশানে, মহাধ্যান-মগ্ন মহাযোগীকে একথা, ২৬ শে চৈত্র, রবিবার, জিজ্ঞাসা করিয়াছি, উত্তর পাই নাই। যখন দেখিতে দেখিতে প্রজ্জ্বলিত চিতায় মহাত্মার প্রতিভা-প্রদীপ্ত শরীর ভস্ম হইতে লাগিল, এবং সেই স্থানের অমূল্য পরমাণু-মিশ্রিত প্রতপ্ত বায়ু শরীরকে পবিত্র করিতে লাগিল, তখন আকাশের দিকে চাহিয়া, বিহ্বল প্রাণে মহাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, দেব, কেন যাও, কোথা যাও? কিন্তু উত্তর পাই নাই। তখন বুঝিলাম, তিনি গিয়াছেন, আর নাই; তখন বুঝিলাম, তিনি বঙ্গদেশের মমতা চিরকালের জন্য ভুলিয়াছেন। হা বঙ্গদেশ, হা বঙ্গভাষা!!

এই প্রবন্ধের শিরোদেশের উদ্ধৃতাংশে মহাত্মা এমারসন প্লেটো সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া-

ছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও আমরা এই কথা বলিতে পারি। প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় জীবন কাহিনীতে নয়,সৌন্দর্য্যগ্রহণে,পুস্তকের চরিত্র-সৃজনে ও কষ্টসহিষ্ণুতাতে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একথা খুব খাটে। এপর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের বাহিরের জীবন সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য, দশ বিশ কথায় সমাপ্ত, কিন্তু ভিতরের জীবন অমৃতের উৎস। তিনি তাঁহার লেখাতে, চরিত্র-সৃজনে, কষ্টসহিষ্ণুতাতে, সৌন্দর্য্য-গ্রহণে এবং উদার ধর্ম্মমতে যে অসাধারণ প্রদীপ্ত প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, অনন্তকাল তাহা মানব মনকে অনুপ্রাণিত করিবে;—তাহা অবিনশ্বর, অনন্তগর্ভ, অতুল সৌন্দর্য্যের আকর। সে সকল কথা এক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা অসাধ্য। সে চেষ্টার সময়ও এ নয়। আজ সংক্ষেপে তাঁহার অমানুষী শক্তির কথা কিছু লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন, ১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ়—মহাত্মা রামমোহনরায়ের মৃত্যুর ৫ বৎসর পরে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাঁটাল-পাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। তাঁহার যে চারিটী সন্তান পিতৃকুল পবিত্র করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তন্মধ্যে তৃতীয়। ভ্রাতাগণের মধ্যে শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন ; এখন রহিলেন, কেবল পূর্ণচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রতিভার রাজা, বাল্যেও সে প্রতিভার খুব পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ৫ বৎসর বয়সের সময় এক দিনে তিনি বর্ণমালা শেষ করিয়াছিলেন। ১২৫২ সালে ৭ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১২৫৭ সালে তাঁহার পিতা ২৪পরগণায় বদলী হইলে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজে প্রবেশ করেন। কাঁটালপাড়া হইতে হুগলি পড়িতে যাইতেন। এই কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা হয় এবং এক বৎসরের মধ্যে মুগ্ধবোধ, রঘু, ভট্টি ও মেঘদূত শেষ করেন। তিনি ৪ বৎসর টোলে পড়িয়াছিলেন। ১১ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। ৮।৯ বৎসরের পরে স্ত্রী বিয়োগ হয়। তিনি ১৯।২০ বৎসর বয়সে কাঁথিতে পুনঃ বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর নাম সূর্য্যমুখী। যখন হুগলি কলেজে পড়িতেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "সংবাদ-প্রভাকর" প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে ৮ দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ অধিকারী কবিতা লিখিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮ বৎসর বয়সে, এদেশে সর্ব্বপ্রথম বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আইন অধ্যয়ন করিতে তাঁহার কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আগমন, কিন্তু তাহা আর সম্যকরূপ হইল না। সেই সময়ের গুণগ্রাহী লেঃ গবর্ণর হেলিডে সাহেব তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিলেন। শুনা যায়, কলেজে সকল বিষয়েই তিনি পারদর্শী ছিলেন। ২০ বৎসর বয়সে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া যশোহর গমন করেন। এখানে দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ৭ মাস পর তিনি কাঁথিতে এবং এক বৎসর পর কাঁথি হইতে খুলনায় বদলী হন।

খুলনা তখন যশোহরের একটী মহকুমা ছিল। নীলকর মরেল সাহেবের অত্যাচার দেশবিখ্যাত ছিল। তিনিই এই অত্যাচার দমন করেন এবং কলিকাতা হইতে খুলনা যাওয়ার পথে যে ভীষণ ডাকাতের দল লুটপাট করিত, তাহা নির্ম্মূল করেন। খুলনা হইতে বারুইপুর বদলি হইলেন। এই সময়ে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার কয়েক মাস পরে বহরমপুরে গমন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ শক্তি দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বাঙ্গলা দপ্তরের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত করেন। এখানে মেকলে সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয়। তাঁহার সহিত বনিবনাও না হওয়ায় পুনঃ ডেপুটীগিরিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আলীপুরে অবস্থিতি করেন। এথানে থাকা সময়ে কমিসনার মনরো সাহেবকে এক দিন সেলাম না করায়, তাঁহার প্রতিকূল আচরণে জাজপুরে বদলী হন। সেখানে পৌছিবা মাত্র সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহাকে হুগলীতে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। হুগলীতে কয়েক বৎসর কাজ করিয়া আলীপুরে পুনঃ বদলী হন। শেষ পর্য্যন্ত এখানেই ছিলেন এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে পেন্সন লইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

যখন তিনি খুলনায় ছিলেন, তখন উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ কিশোরী চাঁদ মিত্রের Indian Field নামক পত্রিকায় "Raj Mohan's wife" নামক উপন্যাস ইংরাজিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই আপন ভুল বুঝিয়া ইংরাজি লেখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। খুলনা থাকিতেই দুর্গেশনন্দিনী লিখিতে আরম্ভ করেন, বারুইপুরে থাকার সময় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাহা প্রকাশ হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কপালকুণ্ডলা এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মৃণালিনী প্রকাশিত করেন। ১৮৭২ খ্রীঃ—১২৬৯ সালে, বহরমপুর থাকার সময়ে বঙ্গদর্শন প্রচার আরম্ভ করেন। ১২৭৯ সালে বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা ও সাম্য, ১২৮০ সালে চন্দ্রশেখর ও যুগলাঙ্গুরীয়, ১২৮১ সালে রজনী, ১২৮০।৮১।৯২ সালে কমলাকান্তের দপ্তর, ১২৮৪ সালে কৃষ্ণকান্তের উইল, ১২৮৫ সালে রাজসিংহ, ১২৮৭, ১২৮৮ ও ৮৯ সালে আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণী প্রকাশিত হয়। দেবী চৌধুরাণীর কতকাংশ মাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গদর্শন উঠিয়া যাইবার পর দুই তিন খানি পুস্তকের উপক্রমণিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচরিত্রের প্রথমাংশ প্রচারে প্রকাশিত হইয়া পরে পুস্তকাকারে বাহির হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ কৃষ্ণচরিত বাহির হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নবজীবনে ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারে গীতাধর্ম্ম ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া দুই ভাগ বিবিধপ্রবন্ধ, লোকরহস্য, বিজ্ঞান রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গদ্যপদ্য নামে আর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সময়ে আরো কত কি লেখা বাহির হইবে, কে জানে? পঞ্চদশবর্ষ বয়সে তাহার "ললিতা" ও "মানস" কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবুর পুত্র নাই। ৩টী মাত্র কন্যা জন্মিয়াছিল, একটী কন্যার শোচনীয় মৃত্যুতে তিনি দারুণ মনোকষ্ট পাইয়াছিলেন; এখন তাঁহার ২টী মাত্র কন্যা বর্ত্তমান। জীবনের শেষ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর এবং সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্টের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করার পর ভাল করিয়া বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্য্যা করিবেন, আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। সেইরূপ কাজ আরম্ভও করিয়াছিলেন, ইন্দিরা ও রাজসিংহ আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া কৃষ্ণচরিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গীতা-ব্যাখ্যা শেষ করিতে পারিলেই তাঁহার মহা জীবনের মহা উদ্দেশ্য পূর্ণ হইত। কিন্তু তাহা বিধাতার ইচ্ছা নয়। ভ্রাতৃবিয়োগে, কন্যার শোকে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর দারুণ বহুমূত্র রোগ তাঁহার শরীরের রক্ত শোষণ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। যখন কেহ কিছু জানে না, তখন তাঁহার ভিতরে ভিতরে ভয়ানক রোগের আধিপত্য প্রকাশ পাইতেছিল। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে যুবকদিগের উচ্চ নীতি-শিক্ষা-সভায় বেদসম্বন্ধে তিনি যখন বক্তৃতা প্রদান করেন, তখন স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই, অসময়ে বঙ্গপ্রদেশে অশনিপতন হইবে। তিনি আত্মপ্রকাশে সর্ব্বদা সংযত ছিলেন। অল্প-জ্ঞানী বুদ্ধিহীনদিগের ন্যায় বাহ্য-প্রকাশ-পিপাসা তাঁহার কখনও ছিল না।* সুতরাং নিকটস্থ বন্ধুগণ ভিন্ন কেহই তাহার ব্যাধি-বৃদ্ধির সংবাদ পায় নাই। যে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পীড়ার কথা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল, তখন তাঁহার অন্তিমশয্যা। ২৬:শ চৈত্র রবিবার হঠাৎ কলিকাতার রাস্তায়, অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় প্রকাশ হইল, বঙ্কিমচন্দ্র নাই। সংবাদ শুনিবার একটু পরেই শুনিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের শব কর্ণওয়ালিস্‌ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছে। যে অবস্থায় ছিলাম, ছুটিয়া গেলাম। দেখিলাম, সঙ্গে অধিক লোক নাই। শেষে ক্রমে ক্রমে কিছু লোক সংগ্রহ হইল বটে, কিন্তু সন্ধ্যার অল্প পরেই দেখিলাম, অনেক লোকই চলিয়া গিয়াছেন। দেশের গণ্য মান্য লোক বড় একটা দেখিলাম না। ক্রমে ক্রমে আত্মীয় স্বজনের দ্বারা শেষ আয়োজন হইল—বঙ্কিমচন্দ্রের পবিত্র শরীর শ্মশানে শেষবার স্নাত হইলে মুখে শেষ-অন্ন প্রদত্ত হইল, তারপর ধীরে ধীরে চিতায় মহা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—মহাত্মার অমূল্য শরীর নিমেষে নিমেষে ভস্মীভূত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সর্ব্বশরীর ভস্ম হইল, পাষাণবৎ দাঁড়াইয়া যেন ভেল্কি দেখিতে লাগিলাম। কি ভয়ানক দৃশ্য, কি মর্ম্মভেদী ঘটনা। এদেশের শেষ গৌরব, শেষ কীর্ত্তি, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ আগুন, শেষ প্রতিভার চিতা নিবিল। এদেশের গৌরব করিবার যাহা ছিল, নিমেষের মধ্যে তাঁহাকে হারাইলাম। শেষে—শেষে বিজয়াদশমীর পর কাঁদিতে কাঁদিতে, একাকী অবসন্ন হৃদয়ে বিষণ্ণ মনে বাড়ীতে ফিরিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন এই খানেই পরিসমাপ্ত, কিন্তু তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা এখানে সমাপ্ত নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত প্রতি শব্দে, প্রতি ছত্রে, প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি পুস্তকে তাঁহার প্রদীপ্ত প্রতিভা প্রস্ফুটিত, অঙ্কুরিত। অনন্তরূপে, অনন্ত ভাবে, অনন্ত ভাষায় তাহা অনন্তকাল পরিস্ফুট হইবে,

* মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"His learning was vast, but it was never displayed. It always went into the bottom of his faculty, sank into the bosom of his soul, and there produced the culture for which we all admire. Most young men, some of them of brilliant powers have a greater hunger to make a display of the literary learning they have scraped together and it is in the nature of these fatal tendency that it leads to the subversion of the substance that has been gathered together and the student is an empty headed fool,"

ব্যাখ্যাত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে চতুর্দ্দিকে তাঁহার জন্য শোকের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, দেখিয়া কিছু পরিতৃপ্ত হইতেছি বটে, কিন্তু ইহা এই মহাত্মার অমানুষী শক্তির উপযোগী পূজা নহে। কেহ কেহ আপন আপন পথ বাঁচাইয়া কথা বলিতেছেন। কবে তাঁহার চরিত্রে কি দোষ ছিল, এই সময়ে কেহ সে দিকে কটাক্ষপাত করিতেছেন, কেহ বা, তাঁহাদের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য ছিল, একথা ঘোষণা করিয়া উদারতা প্রকাশ করিতেছেন! কেহ প্রবন্ধ অপেক্ষা উপন্যাসের, কেহ বা উপন্যাস অপেক্ষা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের—কেহ বা সকল অপেক্ষা তাঁহার সমালোচনা শক্তির অধিক প্রশংসা করিতেছেন! আমাদের দেশের সম্পাদকগণের মধ্যে অসাধারণ চিন্তাশীল নেশন-সম্পাদক লিখিয়াছেন;—

"Baboo Bankim Chandra had a many sided mind and a varied activity, but it is a novelist that he will live."

"Baboo Bankim Chander's views on religion and social philosophy to have been in the course of formation." ‡

বিজ্ঞ সম্পাদকের এ কথা আমরা স্বীকার করি না। নেশন-সম্পাদক মহাশয় বিশেষ কোন প্রমাণ দেন নাই। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক সকল পড়িয়াছেন বলিয়াও বোধ হয় না। আমরা ক্রমে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইব, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ভাষা-সংস্কারে এবং উদার ধর্ম্মমত প্রচারেই অধিকতর স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, তাঁহার অপেক্ষা কালে ভাল উপন্যাসকার বা সমালোচক আবির্ভূত হওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে সুচিন্তাশীল পণ্ডিতের অভ্যুত্থান হওয়া কঠিন। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, তিনি প্রথম উপন্যাস লেখক এবং বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। একথা তিনি নিজেই অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। * আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দী সমালোচন কালে দেখাইয়াছি, বর্ত্তমান বাঙ্গালার সৃষ্টিকর্ত্তা ৺ প্যারীচাঁদ মিত্র। কিন্তু তা হইলে কি হয়? বর্ত্তমান ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা যিনিই হউন, বর্ত্তমান ভাষার জীবনী শক্তি কেশবচন্দ্র সেন ও বঙ্কিমচন্দ্র। এক সময়ে বাঙ্গালা ভাষাকে ঘৃণা করিত না কে? এখনই বা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ঘৃণা করে না কে? জাতীয় ভাষার উৎকর্ষ এবং শ্রীবৃদ্ধিসাধন ভিন্ন, জাতীয় উন্নতি অসম্ভব, এ কথা এদেশের কয়জন দেশহিতৈষী মানেন? কেশবচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষা আদরের জিনিস; বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ভিন্ন এ পতিত জাতির উদ্ধারের অন্য পথ নাই। তাঁহাদের উজ্জ্বল প্রতিভা বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চায় নিয়োগ হওয়ায় ভাষার গৌরব—দেশের গৌরব বদ্ধমূল হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা অমর হইয়াছেন। ইংরাজিভাষায় কোন্ গ্রন্থের অভাব আছে? বিদেশীয় কোন্ লোক ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া সেক্ষপীয়র, মিল্টন, বায়রণ, স্কট, ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রভৃতির সমকক্ষ হইতে পারিয়াছেন? হওয়া সম্ভব কি? যাঁহারা ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে চান, তাঁহারা মহাভ্রান্তিতে নিমগ্ন। বঙ্কিম বাবু অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভাবলে এ কথা বাল্যেই বুঝিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মহাশিক্ষা তাঁহার ভিতরে অবতীর্ণ হইয়াছিল,

‡ Indian Nation Vol XII. no 16. 1894.

* লুপ্ত রত্নোদ্ধার দেখ।

কেশবচন্দ্রের জীবন তাঁহাতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। আমাদের বন্ধু বাবু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় তাঁহার "সাহিত্য-মঙ্গল" নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কেশব ও বঙ্কিম উভয়ের সাহিত্য-জীবন উভয়ের ধর্ম্ম জীবনের-কারণ; অথবা উভয়ের ধর্ম্ম-জীবন সাহিত্য জীবনের কারণ। দেখাইয়াছেন, উভয়ের জীবনে খুব সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং কেশবচন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ভিন্ন এদেশের উদ্ধার নাই, এদেশের ধর্ম্ম জাগিবে না। এজন্যই উভয়ে এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের "সেবকের নিবেদন,জীবনবেদ, ও ব্রহ্মগীতোপনিষৎ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব,কৃষ্ণচরিত এদেশের সহজ, সতেজ ভাষার চরম নিদর্শন। এই জন্যই এই উভয়কে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রতিভাশালী লোকের লক্ষণ কি? সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ, তাঁহারা কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে পারেন না, কাহারও মতানুসরণ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। তাঁহারা সদাই এমন পথে বিচরণ করিতে চান, যে পথে কেহ কখনও পদনিক্ষেপ করে নাই। অথবা যে পথে অন্য লোকেরা অন্ধকার দেখেন, সেই পথে তাঁহারা উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পান। তাঁহারা গুরু মানেন না, নেতা মানেন না, শাস্ত্র মানেন না, দেশাচার মানেন না। তাঁহারাই নেতা, তাঁহারাই শাস্ত্রকার, তাঁহারাই গুরু। তাঁহারা যে কথা বলেন, পৃথিবী উৎকর্ণ হইয়া তাহা গ্রহণ করে এবং অনুসরণ করে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এ কথার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার জীবনবেদ পড়িয়াছেন,তাঁহারা, শত্রু মিত্র সকলেই, একবাক্যে স্বীকার করিবেন, তিনি ঈশ্বরকে মানিতেন বলিয়া আর কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিতে পারেন নাই। তাঁহার দল ভাঙ্গিয়া যখন ছিন্ন ভিন্ন হইল, তিনি ভ্রুক্ষেপও করেন নাই, যাহা বুঝিয়াছিলেন, অটল ভাবে তাহা ধরিয়াছিলেন। লোকেরা আঘাত করিয়াছে, নিন্দা করিয়াছে, তিনি বিধাতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অটল, নির্ভীক, অনুত্তেজিত। দল বাঁধিতে চাহিলে তিনি বাঁধিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন—"গুরুগিরি কখনও করি নাই,কখনও করিব না। কাহাকেও আপন পথে চালাইব না। * * এক জনকে মানি বলিয়া আর কাহাকেও মানিব না।" বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও সর্ব্বথা একথা খাটে। তাঁহার "সাম্য" নামক পুস্তকে তিনি যে সকল অমূল্য কথা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার প্রভাতকালীন উজ্জ্বল প্রতিভার এই অসাধারণ লক্ষণ পরিস্ফুট; আর প্রকাশ— ধর্ম্মতত্ত্বের ছত্রে ছত্রে, পত্রে পত্রে। সমস্ত পুস্তক খানি তুলিয়া দেওয়া সম্ভব নহে; একটী স্থান দেখাই।

"শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না?

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম,লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য; ইহা আপনি সম্মত মনে করেন?

গুরু। কেন করিব না? ঐ মহাত্মা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠগুণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র।

শিষ্য। আপনার এরূপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না।

গুরু। না দিক্; কিন্তু ইহাই ধর্ম্মের যথার্থ মত।" ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৩২ পৃষ্ঠা।

প্রতিভার দ্বিতীয় লক্ষণ, মতের স্থিরতা; তাহা কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। যাঁহাদের মত মিনিটে মিনিটে পরিবর্ত্তিত হয়, তাঁহারা প্রকৃত প্রতিভাশালী লোক নহেন। মহতের মহত্ত্ব এই খানে, তাঁহারা যাহা বুঝেন, তাহা জীবন বিসর্জ্জনেও পরিত্যাগ করেন না। অত্যাচার, নির্যাতন, উপহাস, দুঃখ দারিদ্র্য কিছুই তাঁহাদিগকে পদস্খলিত করিতে পারে না। খ্রীষ্ট অবিচলিত, গ্যালিলিও অবিচলিত, ম্যাট্‌সিনি অবিচলিত, রামমোহন অবিচলিত, কেশবচন্দ্র অবিচলিত, বিদ্যাসাগর অবিচলিত, গ্লাডোষ্টোন অবিচলিত, এবং আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র অবিচলিত। এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার নিন্দা বা উপহাস করে নাই, এমন লোক বিরল ছিল। বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ লেখা বুদ্ধিহীনের কাজ, সহজ বাঙ্গালা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা মূর্খের কাজ;—অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের এই ধারণা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কঠিন সমস্যার সময় অবিচলিত না হইলে, বাঙ্গালা ভাষা আজও বিকৃত হইয়া থাকিত। এই অবিচলিত ভাব তাঁহার জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত। একদিকে প্রাচীন সংস্কারের বশবর্ত্তী এক প্রবল দল, অপর দিকে নবীন পাশ্চাত্য শিক্ষার অত্যুন্নতির পরিপোষক দল, ইহার মধ্যে বীর বঙ্কিমচন্দ্র নির্ভীকচিত্তে সাম্যের উদারমত লিখিতেছেন; কৃষ্ণচরিত ও গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন, এবং ধর্ম্মতত্ত্বের কঠিন মীমাংসা করিতেছেন। তাঁহার ধর্ম্মমত যে অক্ষুণ্ণ, অবিচলিত, অপরিবর্ত্তিত, তাহা তাঁহার সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধীয় মতে শেষবার পরিব্যক্ত। কেশবচন্দ্র যে আমরণ আপন মত পরিত্যাগ করেন নাই, সকলেই জানেন; ঈশ্বর, মানব পরিবার, পরকাল, আদেশবাদ, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে বাল্যকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার এক মত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রেরও মত অক্ষুণ্ণ। আমরা তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধীয় মত, ১২৯৯ সালের ২৩ শ্রাবণের সঞ্জীবনী হইতে আমূল তুলিয়াদিলাম।

অশেষ গুণ-সম্পন্ন শ্রীযুক্ত কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব
আশীর্ব্বাদভাজনেষু

আপনি আমাকে যে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ীরাই তাহার উপযুক্ত উত্তর দিতে সক্ষম। আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী নহি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তার আসন গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহি। তবে সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার আমার আপত্তি নাই।

প্রথমতঃ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না। যখন মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখনও আমি এই আপত্তি করিয়াছিলাম, এবং এখনও পর্য্যন্ত সে মত পরিবর্ত্তন করায় কোন কারণ আমি দেখি নাই। আমার এরূপ বিবেচনা করিবার দুইটী কারণ আছে।

প্রথম এই যে, বাঙ্গালি সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে—দেশাচার বা লোকাচার বশীভূত। সত্য বটে যে, অনেক সময় লোকাচার শাস্ত্রানুযায়ী; কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, লোকাচার শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ, সেইখানে লোকাচারই প্রবল।

উপরিউক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজ সর্ব্বত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিলে সামাজিক মঙ্গল ঘটিবে কিনা সন্দেহ। আপনারা সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান সকল অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়া সমাজকে তদনুসারে চলিতে পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু সকল বিষয়েই কি সমাজকে শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিতে বলিতে সাহস করিবেন? ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী বিধি এই, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। বাঙ্গলার শূদ্রেরা কি সেই ধর্ম্মাবলম্বী? শাস্ত্রের ব্যবস্থা এখানে চলে না। আপনারা কেহ চালাইতে সাহসী হয়েন কি? চেষ্টা করিলেও এ ব্যবস্থা চালান যায় কি? হাই-কোর্টের শূদ্র জজ জজিয়তি ছাড়িয়া বা সৌভাগ্যশালী শূদ্র জমিদার জমিদারের আসন ছাড়িয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের গৌরবার্থ লুচি ভাজা ব্রাহ্মণের পদ সেবায় নিযুক্ত হইবেন কি? কোন মতেই না। বাঙ্গালি সমাজ প্রয়োজন মতে ধর্ম্ম শাস্ত্রের কিয়দংশ মানে; প্রয়োজন মতে অবশিষ্টাংশ অনেক কাল বিসর্জ্জন দিয়াছে। এবং সেইরূপ প্রয়োজন বুঝিলে অবশিষ্টাংশ বিসর্জ্জন দিবে। এমন স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা খুঁজিয়া কি ফল? আমার নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (Religious and moral Regeneration) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থ বিশেষের দোহাই দিয়া, সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্ত্তন করান যায় না।

আমার প্রণীত কৃষ্ণ চরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে ইহা আমি সবিস্তারে বুঝাইয়াছি। আমি উপরে বলিয়াছি যে, সমাজ দেশাচারের অধীন; শাস্ত্রের অধীন নহে। এই দেশাচার পরিবর্ত্তন জন্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সাধারণ উন্নতি কিয়ৎ পরিমাণে ঘটিয়াছে বলিয়াই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই উন্নতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, সমুদ্র যাত্রায় সমাজের কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না; কাহারও আপত্তি থাকিলেও, সে আপত্তির কোন বল থাকিবে না। কিন্তু যতদিন না সেই উন্নতির উপযুক্ত মাত্রা পরিপূর্ণ হয়, ততদিন কেহই সমুদ্র যাত্রা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিতে পারিবেন না। তবে ইহাই বক্তব্য যে, সমুদ্র যাত্রার পক্ষে বাঙ্গালি সমাজ বর্ত্তমান সময়ে কতদূর বিরোধী, তাহা এখনও আমাদের কাহারও ঠিক জানা নাই। দেখিতে পাই যে, যাঁহার অর্থ ও অবস্থা সমুদ্র যাত্রার অনুকূল, তিনিই ইচ্ছা করিলে, ইউরোপ যাইতেছেন। সমুদ্র যাত্রা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ যে যান নাই, ইহা আমার দৃষ্টিগোচরে কখনও আসে নাই। তবে, ইহা স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, যাঁহারা ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এক প্রকার সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের কি আমাদের সমাজের দোষে, তাহা ঠিক বলা যায় না। তাঁহারা এদেশে আসিয়াই সাহেব সাজিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বাঙ্গালি সমাজের বাহিরে অবস্থিতি করেন। বিদেশীয় ব্যবহার দ্বারা আপনাদিগকে পৃথক রাখেন। যাঁহারা ইউরোপ হইতে আসিয়া সেরূপ আচরণ না করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনায়াসে হিন্দু সমাজে পুনর্ম্মিলিত হইয়াছেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত মহাশয়েরা সকলেই দেশে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দু সমাজ-সম্মত ব্যবহার করিলে সাধারণতঃ তাঁহারা পরিত্যক্ত হইবেন, একথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

পরিশেষে আমার এই বক্তব্য, সমুদ্র যাত্রা হিন্দু-

দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহা বিচার করিবার আগে দেখিতে হয় যে, ইহা ধর্ম্মানুমোদিত কি না। যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা কি ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া পরিহার্য্য? অনেকে বলিবেন যে, যাহা ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত তাহাই ধর্ম্ম, যাহা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ, তাহাই অধর্ম্ম, একথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ কথা পাই না। মহাভারতে কৃষ্ণোক্তি এইরূপ আছে ;—

"ধারণাদ্ধর্ম্ম নিত্যাহুর্দ্ধর্ম্মোধারয়তি প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণ প্রযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥"
কর্ণ পর্ব্ব একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়, ৫৯ শ্লোক।

ধর্ম্ম লোক সকলকে ধারণ (রক্ষা) করেন, এই জন্য ধর্ম্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয়, ইহাই ধর্ম্ম নিশ্চিত জানিবে।

যদি মহাভারতকার মিথ্যা না লিখিয়া থাকেন, যদি হিন্দুদের আরাধ্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া সমাজে পূজিত কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী না হন, তবে যাহা লোকহিতকর তাহাই ধর্ম্ম। এই সমুদ্র যাত্রা পদ্ধতি লোকহিতকর কি না? যদি লোক হিতকর হয়, তবে ইহা স্মৃতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও, কেন পরিত্যাগ করিব?

আমি এইরূপ বুঝি, ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই আছে, তাহাই হিন্দুধর্ম্ম নহে,—হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় উদার। স্মার্ত্ত ঋষিদিগের হাতে—বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির হাতে—ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত্ত ঋষিগণ হিন্দুধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন, হিন্দুধর্ম্ম সনাতন—তাঁহাদিগের পূর্ব্ব হইতেই আছে, অতএব সনাতন ধর্ম্মে এবং এই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরোধ অসম্ভব নহে। যেখানে এরূপ বিরোধ দেখিব, সেখানে সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ধর্ম্মে এবং হিন্দু ধর্ম্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না। ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের যদি কোন বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব কি? উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিব কেন? এরূপ বিরোধ নাই। সমুদ্র যাত্রা লোক-হিতকর বলিয়া ধর্ম্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্র যাত্রা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত।"

কলিকাতা, ২৭ জুলাই, ১৮৯২। } আপনার একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

বঙ্কিমচন্দ্র, ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে প্রচারে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই শাখামাত্র এবং শশধর তর্কচূড়ামণি যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, আমাদের মতে তাহা কখনই টিকিবে না।" * আর সেই কথা ১২৯৯ সালে পুনঃ বজ্রগম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিতেছেন। এই খানেই বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয়। এই পরিচয় তাঁহার গীতার ব্যাখ্যায়, তাঁহার বেদ ব্যাখ্যায়, † তাঁহার কৃষ্ণচরিত ব্যাখ্যায় আরো স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সে সকল কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। ইচ্ছা আছে, কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিব। কিন্তু সে ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হইবে কি না, বিধাতাই জানেন। এইরূপ উদার মত ঘোষণায় তাঁহাকে নির্যাতন সহ্য করিতে হয় নাই, আমরা তাহা মনে করি না। পৃথিবীতে এমন কোন মহাপুরুষ আজ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই, স্বাধীন মত ঘোষণা করিয়া যাঁহাকে নির্যাতন সহ্য করিতে হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকেও তাহা সহ্য করিতে হইয়াছে। আমরা তাঁহার কথার আভাসে এ কথার পরিচয় পাইয়াছি, আর পরিচয় পাইয়াছি—এই ধর্ম্মধ্বজী চটুল ব্যক্তিগণের বাক্যবাণে, নিন্দাঘোষণায়। সে সকল কথারও বিস্তৃত আলোচনা করিতে চাহি না; তাহা জীবনীলেখকের কাজ। আদেশের মত প্রচার করিয়া কেশবচন্দ্রকে যেরূপ নির্যাতন ও উপহাস সহ্য করিতে

* প্রচার, শ্রাবণ, ১২৯১—১৫ হইতে ২১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

† University Magazine, March 1984, P. 41-44 & April P. 55-60.

হইয়াছিল, ইঁহাকেও তদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীন জীব, প্রতিভার খনি, তিনি কখনও পদ-স্খলিত হইবার নহেন। তিনি সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে যে উদার মত ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার গভীর ধর্ম্মমত ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"ধর্ম্মে এবং হিন্দুধর্ম্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না। ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের যদি কোন বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব কি? উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিব কেন? এরূপ বিরোধ নাই। সমুদ্রযাত্রা লোকহিতকর বলিয়া ধর্ম্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত।" সঞ্জীবনী, ২৩শে শ্রাবণ, ১২৯৯।

বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতাকে প্রতিভার অন্যতর লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * এ লক্ষণ বঙ্কিম বাবুতে প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান। কলেজের সহিত এ দেশের কৃতবিদ্যগণের শিক্ষা পরিসমাপ্ত হয়, ইহা এ দেশের প্রসিদ্ধ কথা। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সাধারণতঃ এদেশের কৃতবিদ্যগণ তাসপাশা খেলিয়া, বৃথা আমোদে মাতিয়া সময় কর্ত্তন করেন, কিন্তু বঙ্কিম বাবু তাহা করেন নাই। পাঠ্যাবস্থা হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত, অসাধারণ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পাঠেই তাঁহার জীবনের আরম্ভ, পাঠেই জীবন শেষ। তিনি চিরদিন ছাত্র। জীবনের শেষ যুগে গীতা অধ্যয়ন করেন। সমগ্র মহাভারত তারও পরে। পাঠের পিপাসা এতদূর বলবতী ছিল, পাঠের সময় যাইবে বলিয়া প্রায় কখনও কোন প্রকাশ্য সভায় যাইতেন না। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মক্ষেত্রের গাধার খাটুনি খাটিয়া, এদেশের আর কোন্ ব্যক্তি সাহিত্যকে এত অপরূপ বেশ ভূষায় উজ্জ্বল করিয়া যাইতে পারিয়াছেন? তাঁহার দিবারাত্রির অক্লান্ত পরিশ্রম ও চিন্তার ফল, তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাশি। তাঁহার ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তি এদেশে আর দেখা যায় না। এইখানেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয়।

প্রতিভার আর একটী লক্ষণ, সৌন্দর্য্যানুভূতি। আমরা সচরাচর যে সকল পদার্থ দেখি, তাঁহার ভিতরেই প্রকৃত প্রতিভাশালী কবি অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখেন। ফুল ফলে, চন্দ্র সূর্য্যে, পাহাড় পর্ব্বতে, নদী ব বন্যা সাগর উপসাগরে, এবং নর নারীর মুখ ইত্যাদি তাঁহারা এক অলৌকিক বিমল সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করেন। যে সকল ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, তাহার ভিতর হইতেই তাঁহারা অনন্ত সৌন্দর্য্য বাহির করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েসা, কপালকুণ্ডলা, প্রতাপ, কুন্দনন্দিনী, সূর্য্যমুখী, কমলমণি, রোহিণী প্রভৃতি চিত্র অনন্ত সৌন্দর্য্যের অনন্ত প্রস্রবণ। তাঁহার কমলাকান্তের দপ্তর ও সাম্য, ঘটনারাজ্যের, কর্ম্মক্ষেত্রের অসাধারণ সৌন্দর্য্যের আকর। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, এই সৌন্দর্য্য, বিশ্লেষণে আরো পরিস্ফুট হইবে, আরো উজ্জ্বল হইবে। বঙ্কিমের ভাষা কাব্যের উপযোগী নয় বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভুল কথা। হৃদয়ের ছবি যে ভাষায় অন্যের হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারা যায়, সেই ভাষাই প্রকৃত ভাষা। আর যে ভাষা তাহা পারে না, তাহা শব্দাড়ম্বর,

* প্রতাপ বাবুর বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দেখ;—National Guardian, April 15, 1894, P. 3.

অলঙ্কারের ছটা মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সহজ, সরল, সরস, আড়ম্বর-বিহীন হৃদয়ের ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ মনে করিয়াছেন, নিজমত সেইরূপে অন্যের হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এদেশের নর নারীর মধ্যে এমন পাঠক নাই, যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সৌন্দর্য্যে মোহিত না হইয়াছেন। একজন মহাত্মা বলিয়াছিলেন,—ভাষা এই মরজগতে এক অক্ষয় অমর শক্তি; এই শক্তির দ্বারা পৃথিবীতে অসাধ্য সাধন করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাষার সাহায্যে না করিয়াছেন, এমন কাজ নাই। ঘরে ঘরে তাঁহার নাম, তাঁহার ভাষা সহচরীর ন্যায় প্রচার করিয়াছে;—বিদ্যুৎবেগে তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর পুস্তকরাশি বাঙ্গালার নর নারীর হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। তিনি যদি বিদেশের কাহিনী অনুবাদ করিতেন, কখনও এরূপ হইত না। যে সকল ঘটনা সর্ব্বদা ঘটে, যে সকল চিত্র সর্ব্বদা দেখা যায়, তাঁহারই ভিতর হইতে তিনি এমন সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা পড়িয়া সকলে অবাক্। বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার অন্যতর পরিচয় এইখানে। তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়া মানুষ মজাইয়াছেন। একবার হাসাইয়া, একবার কাঁদাইয়া, একবার উঠাইয়া, একবার বসাইয়া, মানবরাজ্যে তিনি অসাধারণ ক্ষমতাবিস্তার করিয়াছেন। ভাষা স্বর্গীয় দূতের ন্যায় তাঁহার হাতে কাজ করিয়াছে। বিগত ত্রিশ বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধ, তাঁহার রচনা-চাতুর্য্য—ঘনিষ্টযোগে সম্বদ্ধ। তাঁহাকে অনুকরণ করে নাই, এমন লেখক, তাঁহার অভ্যুত্থানের পরে আর বড় একটা দেখা যায় নাই। তিনি ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট ছিলেন। তিনি সৌন্দর্য্যের রাজা।

প্রতিভার আর একটী লক্ষণ অজেয়তা। প্রতিভাশালী ব্যক্তি যখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, তখন আর সকলকে পরাস্ত হইতেই হইবে। রামমোহন রায়ের এ শক্তি প্রভূত পরিমাণে ছিল, বিদ্যাসাগরের ছিল, কেশবচন্দ্রের ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। প্রতিযোগিতায় কেহ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বড় একটা প্রতিযোগিতা করিতেন না, কিন্তু যখন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, কেহ তাঁহার সহিত পারিতেন না। অনেক সময় আমরা নিরপেক্ষ ভাবে তাঁহার তর্কবিচার দেখিয়াছি, দেখিয়া তাঁহার শক্তির শতমুখে প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছি। বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের সহিতই হউক, বাবু রবীন্দ্রনাথের সহিতই হউক, বা মিঃ হেষ্টিসাহেবের সহিতই হউক, তাঁহার প্রতিভার নিকটে তর্কে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। তিনি অজেয়, তিনি অমর।

প্রতিভার আর একটী লক্ষণ নির্ভীকতা। তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরি করিতেন, কিন্তু কখনও কাহাকে ভয় করিয়া চলিতেন না। ইহাতে তাঁহার খুব সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সাহসের পরিচয়, কাপালিকের সহিত সাক্ষাতে। গভীর রজনীতে কাপালিক বঙ্কিম বাবুকে সাহসের সহিত বালিয়াড়িতে যাইতে বলিতেছে, বঙ্কিম নির্ভীক ভাবে প্রতিরোধ করিতেছেন। কাপালিক বলিতেছে, তোমাকে যাইতেই হইবে, বঙ্কিমচন্দ্র নির্ভয়ে বলিতেছেন, "নেও দেখি!" একবার নয়, স্থানান্তরে পুনঃ এইরূপ ঘটনা। ইহাতে তাঁহার অমানুষী সাহসের

পরিচয়। খুলনার নীলকরের অত্যাচার নিবারণে, ও কলিকাতা-পূর্ব্ববাঙ্গালার পথের দস্যু নিপাতে তাঁহার এই সাহস আরো উজ্জ্বল। ভয় করিয়া চলিতে হইলে, প্রতিভা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল ধর্ম্মমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পদে পদে এই নির্ভীকতা প্রস্ফুটিত। হিন্দু সমাজের বক্ষে দাঁড়াইয়া, হিন্দুমত মানিয়া, হিন্দুজীবন রাখিয়া, এ দেশের আর কোন্ ব্যক্তি এরূপ সাহসের পরিচয় দিতে পারিয়াছে? ধন্য বঙ্কিমচন্দ্র, ধন্য তদীয় প্রতিভা।

প্রতিভাশালী লোকেরা যেন জগতের প্রজ্জ্বলিত আলো। প্রতি ব্যক্তির মধ্যেই একটু একটু এই আলো থাকে বটে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লোকের বিশেষত্ব এই, তাঁহার উজ্জ্বল আলোকে যেন আর সব প্রভাবান্বিত, শক্তি-সমন্বিত। প্রতি লোকের জীবনেই তাঁহার আধিপত্য। সূর্য্য যেমন আকাশে থাকিয়া সমগ্র জগতকে আলোকিত করেন, তাঁহারা তেমনি, পৃথিবীর মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া সকলকে আলোকিত করেন, সকলের মনের উপর রাজত্ব করেন। বংশ এবং জাতি পরম্পরা ক্রমে এই আধিপত্য অপ্রতিহত প্রভাবে চলিতে থাকে। মিল্টন, সেক্ষপীয়র, ভবভূতি ও কালিদাসের আধিপত্য জগতে এইরূপে প্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বঙ্গদেশের কোন্ প্রাণকে আলোকিত করে নাই? কাহার হৃদয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আধিপত্য নাই? আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, হিন্দু-ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টিয়ান—সকলে তাঁহার শক্তিতে অনুপ্রাণিত, তাঁহার আলোকে আলোকিত। তিনি যেন সকলেরই ধর্ম্মগুরু, শিক্ষাগুরু।

প্রতিভার আর একটী লক্ষণ, বহুমুখী কৃতকার্য্যতা। প্রতিভাশালী লোকেরা যে কাজে প্রবৃত্ত হন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হন। বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে এ কথা খুব খাটে। পাঠশালার অধ্যয়নে, কলেজের প্রগাঢ় শিক্ষায়, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যক্ষেত্রে এবং কাব্য জগতে সর্ব্বত্রই বঙ্কিমের বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। তিনি যখন যে কাজে হাত দিয়াছেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সাহিত্য জগতের কবিতা লেখায়, প্রবন্ধ রচনায়, উপন্যাসের চিত্র অঙ্কনে, দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনায়, ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধারে, পুস্তক সমালোচনায়, সব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কৃতী। এখানেই প্রতিভার বিশেষ পরিচয়।

প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ নূতন সৃষ্টিতে—নূতন আবিষ্কারে। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কাহারও চর্ব্বিতচর্ব্বণ করেন নাই। তাঁহার নূতন সৃষ্টি—বিষবৃক্ষ, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, প্রভৃতি—এ সকলই আশ্চর্য্য সৃষ্টি। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন এ সকল বর্ত্তমান থাকিবে।

তারপর নূতন সৃষ্টি তাঁহার কৃষ্ণচরিত, এবং তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের অনুশীলন-তত্ত্ব। ইহা গীতাপাঠের ফল; কিন্তু কয়জন লোক গীতাপাঠ করিয়া অনুশীলন তত্ত্বের এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাখা করিতে পারিয়াছেন? তিনি মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে এক নূতন আকারে জগতের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার কৃষ্ণব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অনেক লোক শ্রীকৃষ্ণচরিত সমালোচনা দ্বারা অমরত্ব লাভের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমরা জানি, এ পথের নেতা তিনিই। তিনি গীতার অনুশীলনতত্ত্বের এরূপ পরিস্ফুট ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কমটির প্রত্যক্ষবাদ এবং বার্কলীর এবং শঙ্করের মায়াবাদ অতি সুন্দররূপে বিমিশ্রিত

হইয়া এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে। পড়িতে পড়িতে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। ইহাতে গীতা আছে, ভাগবত আছে; বেদ আছে, পুরাণ আছে; ইতিহাস আছে, দর্শন আছে; যোগ আছে, কর্ম্ম আছে; মায়া কাছে, কায়া আছে; প্রেম আছে, জ্ঞান আছে;—অথবা, নাই যে কি, জানি না। ইহাতে ধর্ম্ম জগতের আবিষ্কৃত এবং অনাবিষ্কৃত সকল তত্ত্ব নিহিত হইয়াছে। গুরুবাদ এবং ভণ্ডামীবাদ উপেক্ষিত হইয়া ইহাতে চরিত্র এবং জীবনের ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা যে কি অমূল্য জিনিস, এখনও কেহ বুঝিবে না। যখন মানুষের বহির্মুখী দৃষ্টি অন্তরমুখী হইবে,—অনুষ্ঠান-সর্ব্বস্ব ধর্ম্ম, কর্ম্ম বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া যখন অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিবে,—যখন অনুষ্ঠান অপেক্ষা চরিত্রের আদর, বাহ্যপ্রকাশ অপেক্ষা জীবনের আদর অধিক হইবে, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিনব ধর্ম্মতত্ত্ব, এই অনুশীলন-তত্ত্ব এদেশের ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে। আমাদের সন্দেহ নাই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব একদিন হিন্দুসমাজের আমূল সংস্কারের কারণ হইবে। সত্যের জয় হইবেই হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বমুখী প্রতিভা ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মেরদিকে নমিত হইয়া এ দেশের ভাবী উন্নতির যে কারণ হইয়াছে, ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা তাহা বুঝিবে।

প্রতিভার আর যে সকল লক্ষণ আছে, সংক্ষেপে আলোচনা করা অসাধ্য। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া উঠিল, সুতরাং থামিতে হইল। কিন্তু বলিয়া রাখি, প্রতিভার যত প্রকার লক্ষণ আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের বাহিরের চেহারায় এবং অন্তরের প্রকৃতিতে তাহা প্রস্ফুটিত ছিল। বঙ্কিমের প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা প্রতিভার পরিচয় দেয়, উজ্জ্বল নয়ন প্রতিভার পরিচয় দেয়, সুপ্রশস্ত বক্ষ প্রতিভার পরিচয় দেয় এবং সুগঠিত মস্তক প্রতিভার পরিচয় দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দৈনিক জীবনের প্রতি-ঘটনায় তাঁহার প্রতিভা প্রস্ফুট। শেষ জীবনে, প্রায়শ্চিত্ত-স্বস্ত্যয়নের জন্য তাঁহার কুষ্ঠীর অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, শুনিয়াছি, তিনি তাহা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়াছিলেন এবং কুষ্ঠী দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই সামান্য ঘটনায়ও তাঁহার প্রতিভা প্রস্ফুটিত। বঙ্কিমচন্দ্রের আচার ব্যবহার, গঠন প্রণালী, হাবভাব, চলা ফেরা—সব তাঁহার অমানুষী প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা, তাহার জ্ঞান কর্ম্ম—সকলই প্রতিভার পরিচায়ক। যে দেশে কত শত রাম শ্যাম, জটা রাখিয়া, গৈরিক পরিধান করিয়া, ভস্ম লেপিয়া অবতার বলিয়া আজকাল প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, কেহ কেহ বা সফল-কামও হইতেছেন, সে দেশে, মহা প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছা করিলে একজন মহা অবতার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন। শিষ্য জুটাইতে চেষ্টা করিলে তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্য সংগ্রহ হইত। কিন্তু তিনি মহা শক্তিশালী হইয়াও আপন স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দল বাঁধেন নাই, অথচ তাঁহার অনুগত দল বঙ্গভূমিকে গ্রাস করিয়াছে; তিনি নেতৃত্ব করেন নাই, অথচ সমগ্র সমাজ অলক্ষিত ভাবে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেছে। মহা মহা পণ্ডিতেরা আজ তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিতেছে। কালে যখন এ প্রভাব আরো বদ্ধমূল এবং বিস্তৃত হইবে, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্য প্রভায় এদেশ আলোকিত হইবে, তাঁহার জন্মভূমি মহাতীর্থে পরিণত

হইবে। তখন দলে দলে লোক গগন কাঁপাইয়া "বন্দে মাতরং" মহাসঙ্গীত গাইবে, এবং মাতৃপূজার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের অমর এবং অক্ষয় প্রতিভার পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবে। স্বদেশপ্রেম, নিষ্কামধর্ম্ম যখন বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল করিবে, তখন ঘোরান্ধকারের মধ্যে 'প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র' উজ্জ্বল প্রভায় ফুটিয়া উঠিবেন। কতদিন পরে, কেহ তাহা জানে না। কিন্তু সেদিন নিশ্চয় আসিবে।

গরিব-সেবা।

ভিক্ষা দান। (১)

"অন্নদানাৎ পরং দানাৎ ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।" বায়ুপুরাণ

গরিবদিগকে মুখে মুখে শিক্ষা দিবার জন্য, সংবাদপত্রে সহজ ভাষায় উপযোগী প্রবন্ধ রচনা করিয়া, এবং তাহা গরিব সেবকদিগের দ্বারা কৃষিবৈঠকে পঠিত ও প্রচার হইবার সুবিধা ও প্রয়োজনের কথা আমি পূর্ব্বে "নব্যভারতে" ও "হিতবাদীতে" লিখিয়াছি।

খাঁটী রাজনীতি বা প্রজানীতিই বল, দেশের প্রকৃত উন্নতি ও সভ্যতাই বল, আর নিঃস্বার্থ ধর্ম্মই বল, সকলই দেশের দীনহীন কুটীরবাসী জনরাশির ভাগ্যের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। যাহাতে তাহাদিগের উন্নতি হইল না, তাহা দেশের উন্নতি নহে। যাহাতে তাহাদিগের শিক্ষা হইল না, তাহা শিক্ষা নহে। যে ধন বৃদ্ধিতে তাহাদিগের আহারের সংস্থানের বৃদ্ধি হইল না, তাহা ধন বৃদ্ধি নহে। যে সভ্যতা ও সমৃদ্ধির ভাগ অগণ্য দীনহীন জন পাইল না, তাহা সভ্যতা নহে। যে ধর্ম্ম, অগণ্য গরিব "ছোট"-লোকদিগকে ক্রোড়ে স্থান দিল না, দয়ার কমণ্ডলু হাতে করিয়া, গরিব কৃষাণ জয়ের প্রাঙ্গনে একদিনও দেখা দিল না, যে ধর্ম্ম, দীন দুঃখীজনের অস্থি মাংস মজ্জারূপ ইট চুন সুরকি দিয়া, উপাসনার মন্দির নির্ম্মাণ করিল, তাহা ধর্ম্ম নহে। এই সনাতন সত্য কথা কতবার প্রচারিত হইল, কতবার লুপ্ত হইল। অদ্য রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে হেনরি জর্জ্জ তাঁহার "Progress and Poverty" পুস্তকে এই সত্য কথার প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ধর্ম্ম ও সমাজক্ষেত্রে মহারথী বুথ (General Booth) তাঁহার "In Darkest England" পুস্তকে এই নূতন ভাষা ঘোষণা করিয়া, দরিদ্র ও নষ্টের উদ্ধারের জন্য, সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এবং বিচিত্র সেনাদল সংগঠন করিয়া, অপূর্ব্ব বীরত্ব ও কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। এই সত্য কথার গূঢ় মর্ম্ম একদিন হিন্দুর জীবনের অস্থি মজ্জাতে নিহিত ছিল, এই "দীন জনে দয়াময়তা" হিন্দু সমাজের অন্তরাত্মা, হিন্দু-সভ্যতার মূল মন্ত্র ছিল। প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতা দয়া বা সহযোগিতা বা Compassion এর উপর স্থাপিত ছিল। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা দ্বন্দ্ব বা প্রতিযোগিতা বা Competitionএর উপর স্থাপিত।

প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতায় দেওয়াদেয়ি;

আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতায় কাড়াকাড়ি। তবে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার দেওয়াদেয়ির ভিতর যে একটুকুও কাড়াকাড়ি ছিল না, তাহা নহে। এবং আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার কাড়াকাড়ির ভিতর যে একটুকু দেওয়াদেয়ি নাই, তাহা নহে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতা দয়াপ্রধান, এবং আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা দ্বন্দ্বপ্রধান। হিন্দুদিগের এই দয়া-প্রধান সভ্যতা, ইউরোপীয় দ্বন্দ্বপ্রধান সভ্যতার সংঘর্ষে এখন ক্রমেই লোপ পাইতেছে। একদিন যে জাতির লোকে প্রতিবেশী অভুক্ত থাকিলে, নিজে অন্নগ্রহণ করিত না, অদ্য সেই জাতির নরাধম সন্তানগণ পাশের ঘরে নিজের ভাই না খাইতে পাইয়া জঠরানলে ছটফট করিলেও মুখ তুলিয়া তাকায় না। পূর্ব্বে যে জাতির কুলবধূগণ, অভ্যাগত অপরিচিত অতিথির সেবা করিতে পাইলে, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন, মহানন্দে সহাস্যবদনে রন্ধনাদি কার্য্য করিয়া পরম পবিত্র সুখ লাভ করিতেন; অদ্য সেই জাতির অবলা কামিনীগণ ভাসুর দেবর-কেও দুই দিন রাঁধিয়া খাওয়াইতে হইলে রোষভরে মুখ ঘোর কৃষ্ণকালিমাময় করে, এবং আপনার ভর্ত্তা ও ভাগ্যকে শতবার ধিক্কার দেন। প্রাচীন কালে, যে দেশের গৃহলক্ষ্মীরা গৃহে বসিয়া অন্নপূর্ণার ন্যায় অকাতরে যাহাকে তাহাকে অন্ন বিতরণ করিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করিতেন, ইদানীং সেই দেশের মহিলাগণ ভাসুর বা দেবর বা তাহাদিগের নিরাশ্রয় সন্তানকে সমর্থ হইয়াও এক মুঠা করিয়া অন্ন দিতে হইলে, প্রাণে মরিয়া যায়। যে দেশের লোক পূর্ব্বে কৃতী ও বর্দ্ধিষ্ণু হইলেই, জ্ঞাতি কুটুম্ব যাহার যেখানে অভাব আছে, সকলকে নিজের পরিবারের মধ্যে টানিয়া আনিয়া খাওইয়া দাওইয়া সুখী করিত, অদ্য সেই দেশে নরপশুগণ বিদেশে সোহাগের পত্নীকে রত্নে বিভূষিত করিয়া, সুখ সম্ভোগে কাল কাটাইয়া, বাটীতে দুঃখিনী মা, মাসী, পিসি, বা খুড়ী জেঠী অন্নাভাবে মরিল কি না, তাহার খবরও লয় না। হা বিলাতী সভ্যতা, তোমার কৃপাতে কি অবশেষে আমাদের এই অবস্থা হইল! হা ইংরাজি সাহিত্য, তোমার শিক্ষার কি এই পরিণাম! হা ইউরোপীয় সভ্যতা, তুমিই কি শাস্ত্রোক্ত কলি!

যখন অকৃতী ভাইকে বা ভ্রাতুষ্পুত্রকে, দুঃখিনী মা মাসী পিসিকে ভাত দেওয়ার প্রথা দেশ হইতে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে, তখন যে ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়ার প্রথা ক্রমেই উঠিয়া যাইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যেখানে দিবার অনিচ্ছা, সেখানে দান না করার পক্ষে যুক্তি সকল আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। "Indiscriminate Charity" নির্ব্বিশেষ দাতব্য, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া ভিক্ষা দেওয়া বড় গর্হিত কার্য্য। পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করা উচিত, ইহা সত্য কথা। কিন্তু ইহার অর্থ এমন নহে যে, পাছে দান অপাত্রে পড়ে, তজ্জন্য একবারে দান করিবে না। ইহার অর্থ এই যে, দান করা ত কর্ত্তব্যই, কিন্তু কেবল দান করিলে কর্ত্তব্য সংসাধিত বা নিঃশেষ হইল না। দান করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া দিতে হইবে। কোন্ বস্তু কাহাকে কি ভাবে কখন দান করিলে, গ্রাহকের মঙ্গল বা শ্রেষ্ঠতম মঙ্গল সম্পাদন হইবে, ইহা বিচার করিয়া দান করিতে হইবে। দান করা কাহাকে বলে?

অধিকাংশ স্থলে যখন প্রত্যুপকার প্রত্যাশা না করিয়া মনুষ্যকে কোন দ্রব্য বা জড়পদার্থ দেই, তাহাকে দান বলে।

কিন্তু কেবল দিলেই প্রশস্ত দান হইল না। ভালবাসিয়া, দুঃখীর দুঃখে দুঃখী হইয়া, দান করিতে হইবে। আমি গরিবসেবার প্রথম প্রস্তাবে হিরণ্ময় রাজার গল্পের উপলক্ষে বলিয়াছি, দয়াহীন বা সহানুভূতি শূন্য দান ভগবান অনুমোদন করেন না, তাহা দাতার পুণ্যকল্পে দানই নহে। আমরা দেখিলাম, দানে জড়পদার্থ আছে, দানে হৃদয় বা প্রেম আছে। আমরা দেখিয়াছি, শ্রেষ্ঠ দানে বুদ্ধি আছে, অর্থাৎ পাত্রাপাত্র বিচারের প্রয়োজন আছে। আর দানে দাতার আধ্যাত্মিক মঙ্গল আছে। সুতরাং আমরা দেখিলাম, সচরাচর প্রশস্ত দান চতুরঙ্গ—

(১) জড়পদার্থ (দেয়),

(২) হৃদয় বা প্রেম (গ্রাহকের প্রতি),

(৩) বুদ্ধি বা বিচার (দাতার),

(৪) আত্মা বা মুক্তি (দাতার)।

প্রশস্ত দানে চিরকালই দয়া ও মেধা, প্রেম ও প্রজ্ঞা, বাগর্থের ন্যায়, হরগৌরীর ন্যায়, সংশ্লিষ্ট। এই কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু যাঁহারা আজি কালি দান করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা এই সত্য কথা হইতে এক অপরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহারা প্রকারান্তরে বলেন—"পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া দান করিতে হইবে, এই বিচার কার্য্য কঠিন; অতএব দান করা কঠিন; সুতরাং দান না করাই ভাল।

আবার, দানপরাঙ্মুখ শ্রেণীর কোন কোনও লোক বলেন;—"কে দানের পাত্র, কে দানের অপাত্র, তাহা জানি না। আজি যে ভিক্ষুককে অন্ন দিব, সে হয় ত সমর্থ হইয়া আলস্য-বশতঃ কোন কার্য্য না করিয়া অন্নধ্বংস-পূর্ব্বক সমাজকে বঞ্চিত করিবে। আমি যদি ভিক্ষুকগণকে অন্ন না দিয়া, আমার সুখ সম্ভোগের জন্য কোন বিলাস-দ্রব্য ক্রয় বা প্রস্তুতকরণার্থ, সেই অন্ন বা ধন ব্যয় করি, তাহা হইলে, ভিক্ষুকগণকে অন্ন দিলে যত জনকে অন্ন দান করা হইত, (শ্রমী) ততজনকে অন্ন দান করা হইল; অথচ তাহার উপর আমার একটা বিলাসের দ্রব্য প্রস্তুত হইল; এবং সেই পরিমাণে সমাজের ধন বৃদ্ধি হইল। অর্থাৎ আমি যদি দুই শত মণ অন্ন ভিক্ষুককে দেই, তাহাতে যত লোক খাইতে পারিবে, আর তাহা না করিয়া যদি দুই শত মণ অন্নে লোক খাটাইয়া আমার একটা বিলাস সামগ্রী করিয়া লই, তাহা হইলেও সমান লোক খাইতে পারিবে।

এই তর্কে হঠাৎ ধাঁধা লাগিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে ভোগী ও ত্যাগীর উভয়ের দ্বারা গরিবদিগের তুল্য উপকার হইত, অথবা ত্যাগীর অপেক্ষা ভোগীর দ্বারা অধিক উপকার হইত। তাহা হইলে বিলাসী ভোগ-হুতাশনে যত অধিক পরিমাণে বিলাসদ্রব্যের আহুতি দিবেন, তত অধিক পরিমাণে (তাঁহার বিলাসদ্রব্যনির্ম্মাতা) শ্রমীদিগের মুখে খাদ্য বর্ষিত হইত। যদি এরূপ হইত, তাহা হইলে বিলাসের কোমল কুসুমাস্তৃত সহজ সোপান দিয়া, ধনী বিলাসীগণ অনায়াসে ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিতেন। কিন্তু বিলাসীদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে এই মতটী সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। উদাহরণ দ্বারা এই ভ্রম প্রদর্শন করিতেছি।

ধরুন—সংযমী রামের ২০০ বিঘা জমী আছে, তাহাতে ৮০০ মণ চাউল উৎপন্ন হয়।

তাহা হইতে ২০০ মণ চাউল তিনি ভিক্ষুকদিগকে দান করেন। রামের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র শ্যাম ঐ ২০০ বিঘা জমী পাইলেন।

শ্যাম কিন্তু বিলাসী। তিনি ভিক্ষা দেওয়া একবারে বন্ধ করিলেন, এবং আদেশ দিলেন যে, "আমি ৮০০ মণ চাউল চাহি না। ৬০০ মণ চাউল চাহি এবং ২০০ মণ চাউলের পরিবর্ত্তে রেশম চাহি। সুতরাং এখন ১৫০ বিঘা জমীতে চাউল উৎপন্ন হইতে লাগিল, এবং বাকী ৫০ বিঘাতে তুতের আবাদ হইতে লাগিল।

এখন দেখুন, রামের সময় রামের জমীতে যাহারা চাস করিত, তাহারা তখন যেমন খাইতে পাইত, শ্যামের সময় এখনও তাহারা তেমনি খাইতে পাইতে লাগিল। কিন্তু ভিক্ষুকগণ, ত্যাগী রামের সময় খাইতে পাইত, ভোগী শ্যামের সময় মোটেই খাইতে পায় না। তবেই, এখানে শ্যামের রেশম উৎপাদন করাই ভিক্ষুকগণের অনাহারের কারণ, ইহা বুঝা যাইতেছে।

সুতরাং আমরা এখানে দেখিতেছি যে, ভিক্ষুকগণ সম্বন্ধে, ২০০ মণ চাউলের পরিবর্ত্তে রেশম উৎপাদন করাও যাহা, আর ২০০ মণ চাউল গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়াও তাহাই। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, বিলাস দ্রব্য প্রস্তুত করায়, মোটের উপর লোককে বর্দ্ধিত আহার দেওয়া হয় না, লোককে আহার হইতে বঞ্চিত করা হয়। কেহ কেহ আমার এই মীমাংসায় আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন,—

"ধরুন, রামের সময় যেমন সমুদয় জমীতে ধানের চাষ হইত, শ্যাম তাহা বজায় রাখিলেন, অর্থাৎ সমুদয় জমীতে ধানেরই চাষ করিতে লাগিলেন। রাম যেমন ভিক্ষুকদিগকে ২০০ মণ চাউল দিতেন, শ্যামও তাহাই দিতে লাগিলেন। কিন্তু ভিক্ষুকদিগের দ্বারা তিনি এখন রেশম প্রস্তুত করাইয়া লইতে লাগিলেন। এস্থলে খাদ্যের পরিমাণ কমিল না, ভিক্ষুকগণ পূর্ব্বে যেমন খাইতে পাইত, এখনও সেই পরিমাণে খাইতে পাইতে লাগিল, কিন্তু এখন আর ভিক্ষুক থাকিল না, এখন শ্রমী হইল। আর বাড়ার ভাগে, একটী নূতন দ্রব্য অর্থাৎ রেশম প্রস্তুত হইল। ইহাতে, গরিব লোকের খাদ্যের পরিমাণ না কমিয়া গিয়া, ধনীর বিলাসদ্রব্য প্রস্তুত হইল।"

ইহার উত্তর,—শ্যাম যদি তাঁহার সমুদয় জমীতে রামের ন্যায় ধান্যের আবাদ করেন, তাহা হইলে অবশ্য পূর্ব্বের অপেক্ষা খান্যের পরিমাণ কমে না।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, শ্যাম যদি তাঁহার সমুদয় জমীতে ধান্যের চাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহার রেশমের জন্য তুতের আবাদ হইবে কোন্ জমীতে? গাছ ছাড়া রেশম হয় না। জমী ছাড়াও গাছ হয় না। গাছ কেন, যে কোন দ্রব্য চাহ, তাহার উৎপাদনের জন্য মূলে জমীর আবশ্যক। সুতরাং বিলাসভোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে, অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, যে পরিমাণে সমাজে বিলাসোপকরণ বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে খাদ্যের পরিমাণ কমিয়া যায়। 'সভ্যতার' বা 'উন্নতির' সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বিলাসিতা আসিয়া প্রবেশ করে। বিলাসের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, শস্যক্ষেত্র হ্রাস করিয়া, বিলাসক্ষেত্র প্রসারিত করা হয়, খাদ্যের পরিমাণ কম হইয়া যায়, ঘোর দারিদ্র্যরূপী রাক্ষস নরনারীগণকে গ্রাস করে। এই জন্য (কতিপয়ের) "উন্নতির" সঙ্গে সঙ্গে (বহুলোকের) "দুর্গতি" প্রকটিত হয়।

একে ত যে পরিমাণে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি,

সেই পরিমাণে উর্ব্বরক্ষেত্র পাওয়া কঠিন। তাহার উপর আবার যে উর্ব্বরক্ষেত্র পাওয়া যায়, তাহাতে যদি শস্য উৎপাদন না করিয়া বিলাস ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলে শস্যের যে বিশেষ অনটন হইবে, ইহা অতি সহজ কথা। এইরূপে শস্যের অনটন হইলে, ভিক্ষুকগণকে ভিক্ষা দেওয়া দূরে যাউক, কতক শ্রমীদিগকে অন্ন দান করা যায় না, শ্রমীরা কাজ পায় না। কতকশ্রমী কার্য্যপ্রাপ্তি প্রতীক্ষা করিয়া ঘরে বসিয়া আছে, কেহ তাহাকে ডাকিতেছে না; কতক মজুর রোজ খাটিবার জন্য পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহ তাহাদিগকে লইতেছে না। বিলাস-প্রাণ সভ্যতাপীড়িত ইউরোপে আজি অনেক লোকের এই দশা ঘটিয়াছে। তাই সেখানে শ্রমচ্যুত ক্ষুধার্ত্ত গরিবগণ দল বাঁধিয়া সমাজকে লণ্ডভণ্ড করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং প্রতিদিন খুন খারাপি হইতেছে। ইহা দ্বন্দ্ব বা Competition প্রধান সভ্যতার ফল। তাই এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, আসুন, আমরা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের দয়া-প্রধান সভ্যতারদিকে ফিরিয়া যাই। এই দয়া-প্রধান সভ্যতার একটী প্রধান অঙ্গ ভিক্ষা দান, বা অন্ন দান। পরাশর বলেন,

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যুর্দ্দানমেকং কলৌযুগে॥

কলিযুগে একমাত্র দানই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আবার দানের মধ্যে অন্ন দানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান নাই। তাই আমরা বায়ুপুরাণে দেখিতে পাই,

"অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি"।

অন্ন লোকের প্রাণ, অন্ন লোকের বল, অন্ন লোকের সর্ব্বার্থ সাধক।

অন্নং প্রাণা বলঞ্চান্নং অন্নং সর্ব্বার্থসাধকং। *

অন্ন হইতে প্রাণী সকল জন্ম পায়, অন্ন দ্বারা জীবন ধারণ করে। অথবা,

অন্নাৎভূতানি জায়ন্তে জীবন্তি চ নসংশয়ঃ †

জীবন দান অপেক্ষা সংসারে শ্রেষ্ঠ দান আর কি আছে?

জীবদানাৎ পরং দানং ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে। †

জীবদান অপেক্ষা আর কোন দানই শ্রেষ্ঠ নাই। তাই,

শ্রান্তায় ক্ষুধিতায়ান্নং যঃ প্রযচ্ছতি ভূমিপ।
স্বয়ম্ভুবৎ মহৎস্থানং সগচ্ছতি নরাধিপ॥

মহাভারত

যিনি শ্রান্ত ক্ষুধিত ব্যক্তিকে অন্নদান করেন, তিনি স্বয়ম্ভুর ন্যায় মহৎ স্থান প্রাপ্ত হন। এমন কি যে মহাপাপী, সে যদি অন্নদান করে, তাহা হইলে সেও পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গ লাভ করে।

ব্রহ্মহত্যা কৃতং পাপং অন্নদানাৎ প্রণশ্যতি।
অন্নদঃ পাপকর্ম্মাপি পূতঃ স্বর্গে মহীয়তে॥

রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব।

তাই ভাই, আর কিছু কর আর না কর, ক্ষুধিত জনকে একমুঠা অন্ন দান করিও। মুষ্টি ভিক্ষা উঠাইয়া দিও না। সুশিক্ষিত স্বদেশীয় ভাইগণ, তোমাদিগের নিকট আমার এই ভিক্ষা যে, অন্ন ভিক্ষা দান উঠাইয়া দিও না। এই ভিক্ষা, এই নিষ্কাম দান, দয়ার রাজত্বে প্রধান আইন, প্রাচীন হিন্দুদিগের দয়াময় হৃদয়ের স্বর্গীয় স্ফূর্ত্তি। এই ভিক্ষার উপরে একদিন আমাদিগের অধ্যয়ন বল, অধ্যাপনা বল, রাজনীতি বল, পার্থিব জীবন বল, পারত্রিক মঙ্গল বল, সন্ন্যাস বল, সকলই স্থাপিত ছিল। তাই বলি, ভিক্ষুকগণকেই

* পরাশর।
† বায়ুপুরাণ।

ঘৃণা করিও না, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর যে দিন উপনয়ন হইল, সেই দিন হইতে "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিতে লাগিলেন। গুরুর গৃহে থাকিয়া প্রতিদিন ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া অধ্যয়ন কার্য্য করিতে লাগিলেন। গুরুও বিনা বেতনে ভিক্ষোপ-জীবী হইয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমাজের ব্যবস্থাপক পরি-চালক হইয়াও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া-ছিলেন, ইহার মহিমা অদ্য কয় জন বুঝেন?

"দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন; তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্য্যের পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটী উপ-জীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটী কি? যাহার পর দুঃখের উপ-জীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছু-তেই নাই—ভিক্ষা"। (ধর্ম্মতত্ত্ব)

তাই বলিতেছিলাম, যাঁহারা রাজনীতির শিক্ষক, পার্থিব জীবনের নিয়ামক, পারত্রিক মঙ্গলের পথপ্রদর্শক ছিলেন, সেই পবিত্র ব্রাহ্মণগণ ভিক্ষাজীবী ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ছাড়িয়া বৌদ্ধগণের জীবন দেখুন। যাঁহারা বুদ্ধ, সমাজের শিক্ষা ও মুক্তি-দাতা, তাঁহারা ভিক্ষু। একদিকে ভিক্ষুকগণকে সমাজ অন্ন ভিক্ষা, পার্থিব জীবনের অবলম্বন, দিতেন; অন্যদিকে বুদ্ধগণ সর্ব্ববিধ মায়া মোহ হইতে মুক্তি স্বরূপ যে নির্ব্বাণ, স্বর্গীয় জীবন লাভের যে উপায়, তাহাই ভিক্ষা দিতেন। যে দিকে দেখ দয়া দয়া দয়া, ভিক্ষা ভিক্ষা ভিক্ষা। যে দিন গিয়াছে, সে দিন কি আর আসিবে না? সে দিনের চিহ্ন স্বরূপ এখনও আমা-দিগের দেশে মুষ্টি ভিক্ষা প্রথা কথঞ্চিৎ প্রচলিত আছে। সেই মুষ্টি ভিক্ষা দান ভাল করিয়া, সুব্যবস্থা করিয়া, প্রচলিত করিতে হইবে। দীন দুঃখীদিগের প্রতি মুখ তুলিয়া আবার তাকাইতে হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

বৌদ্ধ-সঙ্ঘ।

ভিক্ষু-সঙ্ঘ।

মনীষিগণ সাধারণ সমাজের মতবিশ্বা-সের অতীত মতবিশ্বাস পোষণ করেন। উপনিষদ্ ও আরণ্যকের মত বিশ্বাস সাধারণ আর্য্য সমাজের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই। কখন কেহ আপন মত বন্ধু বান্ধব ও শিষ্য স্বজনের মধ্যে প্রচারিত করিয়া নিরস্ত হন, সাধারণ সকলে তাহার সম্বাদ প্রাপ্ত হয় না। কখন কেহ সাধারণ্যে প্রচারিত করিয়া দল পুষ্ট করিয়া লন।

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব বুদ্ধের অনেক পূর্ব্বে। মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে শাক্য গৌতম যেমন প্রাচীনের উত্তরাধিকারী, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সম্বন্ধেও তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাই লইয়াছিলেন। মত বিশ্বাস ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সাধারণ আর্য্যসমাজ তাঁহার ব্যবহারে স্বেচ্ছাচারিতা, বৈদেশিকতা, কি যাবনিকতার কোন নিদর্শন পায় নাই। কোনও মোহান্তের মত তিনি যদি কয়েক জনের মধ্যে আপন মত আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে অন্যান্য দার্শ-

নিকের মত একটী দার্শনিক মতরূপে তাঁহার বিশ্বাস ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ইতিবৃত্তে পর্য্যাপ্ত হইত। সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার অভিপ্রায় ও তৎসিদ্ধির কৌশল এই তাঁহার সৌদ্ভাবিত, তাঁহারই পন্থা অনুসরণ করিয়া মহাবীর জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন। নানক ও চৈতন্য তাঁহারই ছন্দানুবর্ত্তী। আর্য্যসমাজ দার্শনিক মতবৈপরীত্যের অনেক নিদর্শন পাইয়াছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস, ঈশ্বরে অবিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, পরকালে অবিশ্বাস, যাগ যজ্ঞের ফলাফল, জাতিভেদ ও তদস্বীকার দার্শনিক মতের বিশেষত্বে আর্য্য সমাজ কখন বিচলিত হয় নাই। সুতরাং শাক্যের মতামত প্রাচীন আর্য্যগণের নিকট আদৌ বিস্ময়জনক ছিল না। পরন্তু তিনি সুচরিত্র ও স্বাবলম্বনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, বৌদ্ধ শ্রমণগণের নিরীহ নির্দ্বন্দ্ব জীবনের কমনীয়তা যাবতীয় আর্য্যগণকে তাঁহার হিতৈষণায় আকর্ষিত করিয়াছিল। কিন্তু শাক্য গৌতম পণ্ডিতমণ্ডলীতে দার্শনিক মত আবদ্ধ করেন নাই—সমগ্র সমাজ তিনি আলোড়িত করিয়াছিলেন। নিরীহ বৌদ্ধ শ্রমণগণ কালক্রমে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতিদ্বন্দ্বী ও যজন যাজনের অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। দার্শনিক বৌদ্ধমত বৌদ্ধধর্ম্মে পরিণত হইয়া হিন্দুধর্ম্মকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। শাক্য গৌতমের দার্শনিক মত যে কারণে আর্য্যসমাজের ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল, সেই কারণেই কালক্রমে তাঁহার ধর্ম্ম আর্য্যবাস হইতে চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এজন্য আর্য্যসমাজের ইতিবৃত্তে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অপেক্ষা বৌদ্ধসঙ্ঘের প্রতাপ অধিক লক্ষিত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভিক্ষুর ধর্ম্ম। গৃহ ত্যাগ না করিলে নির্ব্বাণ লাভের সম্ভাবনা নাই। বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণ ভিক্ষু ও শ্রমণ নামে অভিহিত হন। যাঁহারা গৃহে বাস করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থা রাখেন, তাঁহাদিগকে উপাসক বলে। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ স্বীকার করা না হইলেও, ফলে শ্রমণ ও উপাসক দুই জাতির মত হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের যত উচ্চে, শ্রমণেরা উপাসকদিগের, তাহা অপেক্ষা, অনেক উচ্চে। ব্রাহ্মণের সাহায্যে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া শূদ্র স্বর্গবাসের আশা করিতে পারেন, কিন্তু শ্রমণের উপদেশ শ্রবণ ভিন্ন শ্রমণের ধর্ম্মমন্দিরের আলোচনার ত্রিসীমায় যাইতে উপাসকের অধিকার নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থা থাকিলেই লোকে উপাসক হইতে পারে। উপাসক হইবার বিশেষ কোন বিধি নাই। পঞ্চশীল গ্রহণে কোনও ধর্ম্মাবলম্বীর বাধা থাকিতে পারে না। হিংসা করিব না, চুরি করিব না, ব্যভিচার করিব না, মিথ্যা বলিব না, মাদকসেবন করিব না—এ কথা কয়টী স্বীকার করিতে কোনও ধর্ম্মাবলম্বীর আপত্তি হইতে পারে না। বস্তুতঃ বৌদ্ধত্রিসরণের অধীনতা স্বীকার করিয়াও অন্যান্য হিন্দুর মত বৈদিক যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়ম পালন করিত, প্রাচীনকালে এরূপ উপাসকের সংখ্যা সামান্য ছিল না। আর্য্যসমাজে আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাঁহারা পরিগণিত হইতেন, বৌদ্ধসমাজে বৌদ্ধ বলিয়া তাঁহারা পরিচিত ছিলেন। উপাসককে অহিন্দু বলিয়া কখন জাতিচ্যুত হইতে হয় নাই।

শ্রমণগণের দীক্ষার বিধি ছিল। ব্রতনিয়মের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য পরিহার করিয়া গৃহস্থ হইবার বাধা ছিল না। ব্রহ্মচারী ইচ্ছা হইলেই গৃহস্থ হইতে পারিতেন, আবার গার্হস্থ্যজীবনে বিতৃষ্ণা জন্মিলে

পুনরায় ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন। পতিত বলিয়া তাঁহারা অসম্মানিত হইতেন না। গৌতম কলুষিতচরিত্রদিগকে পলাইবার পথ খুলিয়া দিয়া সঙ্ঘের পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কাহাকে প্রতারিত করিয়া সঙ্ঘে সন্নিবেশিত করেন নাই, কাহারও পলাইবার পথে কণ্টক দিয়া ইচ্ছার স্বাধীনতা সংযত করেন নাই। এই কারণে বৌদ্ধ বিহারের পবিত্রতা এত অধিক দিন এত অধিক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছিল। আপন মরণান্তে কে সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্বাধিকারী হইবে, সে চিন্তায় বুদ্ধ আপন মস্তিষ্ক বিলোড়িত করেন নাই। সঙ্ঘের কোন সম্পত্তি থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। ভিক্ষোপজীবী ভিক্ষুগণের ধন রত্ন বিত্ত গ্রহণের অধিকার ছিল না যে, বিত্ত রক্ষার জন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষীয়ের আবশ্যক হইবে। সমুদয় ভিক্ষুমণ্ডলী, মহাজনসমাজ ভিক্ষুমাত্রের আদর্শ, ব্যক্তিবিশেষ নহে। বয়স বা বিজ্ঞতাহেতু কোন ভিক্ষু অন্য সকলের সম্মাননীয় হইলেও ভিক্ষুমণ্ডলীর সমক্ষে সকলেই সমান। গৌতমের অভাবে ভিক্ষুমণ্ডলী গৌতমের বৌদ্ধ ধর্ম্মের রক্ষয়িতা। এজন্য গৌতমের ন্যায় মণ্ডলী বৌদ্ধেরা সম্মাননীয়। প্রব্রজ্যাগ্রহণকালে বুদ্ধ ও ধর্ম্মের ন্যায় সঙ্ঘ বৌদ্ধের সরণীয়, বুদ্ধ সঙ্ঘ ও ধর্ম্ম, ইহাই বৌদ্ধের ত্রিসরণ।

ধম্মম্ সরণম্ গচ্ছামি
বুদ্ধম্ সরণম্ গচ্ছামি
সঙ্ঘম্ সরণম্ গচ্ছামি।

সঙ্ঘে সরণ লইবার সময় বৌদ্ধকে অঙ্গীকার করিতে হয় যে, স্বর্ণ রৌপ্য বিত্ত কখন স্পর্শ করিব না। বিত্তগ্রহণ ব্যভিচারের ন্যায় ভিক্ষুজীবনের অন্তরায়। সন্ন্যাস, সর্ব্বপরিত্যাগ সাধুজীবনের আদর্শ। সংসারে শান্তির অভাব। নির্দ্বন্দ্বতা সংসারে রক্ষা করা অসম্ভব। এজন্য গৌতম শিষ্যগণকে সংসার পরিহার করিয়া ভিক্ষুজীবন অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিতেন। যে সকল বিষয়লোভী মোহে অন্ধ হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইত না, তিনি তাহাদিগকে অধম পুরুষ বলিয়া গণনা করিতেন। মুনিসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—

"যিনি স্ত্রীকে পোষণ করেন ও সংসারের কর্ত্তা এবং যিনি নিঃসম্বল ও নিঃসঙ্গ হইয়া ধর্ম্মপথে বিচরণ করেন, ইহাঁরা তুল্য নহেন। সাংসারিকের জীবন অসংযত, তাহা হইতে অনেকের পতন হয়। সংযত প্রজ্ঞাপরায়ণ ভিক্ষু জীবিতগণের আশ্রয় স্বরূপ।"

সংসারের সকলেই মোহজটাজড়িত পঞ্চস্কন্ধের জ্বালায় দগ্ধ। এজন্য ভিক্ষুমণ্ডলীর দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। এক এক জন ভিক্ষু ভিক্ষুমণ্ডলীর প্রতিনিধি হইয়া যখন দেশে বিদেশে শাক্যের নবধর্ম্মের সুসমাচার প্রচারে ধাবমান হইয়াছিলেন, অনতিবিলম্বে দলে দলে লোক ভিক্ষুমণ্ডলীতে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল। তখন কত অনাথিনী কাঁদিতে কাঁদিতে গৌতমের নিকট আসিয়া আপন একমাত্র পুত্রের প্রত্যর্পণ প্রার্থনা করিয়াছিল, কত উত্তমর্ণ প্রবঞ্চিত হইয়াছিল, কত রাজা সৈন্য সামন্তের জন্য গৌতমের অপবাদ করিয়াছিল। এজন্য কালক্রমে সঙ্ঘমধ্যে প্রবেশাধিকার কিছু সঙ্কুচিত করিতে হইয়াছিল। দীক্ষাপ্রার্থীগণকে বৌদ্ধেরা দুই শ্রেণীতে বিভাগ করেন, প্রব্রাজিত ও উপসম্পন্ন। প্রব্রজ্যা সামান্য দীক্ষা। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে উপসম্পদা গ্রহণ করিতে হয়। উপসম্পদা গ্রহণ না করিলে কেহ মণ্ডলীর অন্যতমরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। আবার অপ্রব্রাজিত কখন, উপসম্পন্ন

হইতে পারে না। প্রব্রজ্যা গ্রহণার্থীর বয়স অন্যূন দ্বাদশ বৎসর। উপসম্পদা গ্রহণার্থীর বয়স অন্যূন বিংশতি বৎসর হওয়া আবশ্যক। পিতামাতার অনুমতি না থাকিলে কাহাকেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না। যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ধবল, গণ্ড ও অপস্মার প্রভৃতি কোন রোগ থাকিলে, কাহার ঋণগ্রস্ত থাকিলে বা কোন প্রকারের, রাজকর্ম্মচারী হইলে, বা দুর্ব্বৃত্ত বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত হইলে, ভিক্ষুসঙ্ঘে আশ্রয় পাওয়া যায় না। সৈনিক ও ক্রীতদাসদিগকে সঙ্ঘে গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই।

দীক্ষার জন্য প্রার্থী হইলে একটী দিন নির্দ্দিষ্ট করা হয়। সে দিন অন্যূন দশটী ভিক্ষু উপস্থিত হন, যিনি সে সঙ্ঘের আচার্য্য হইবেন, অন্যূন দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার উপসম্পদা গ্রহণ হইয়াছে। পর্ণাসনে ভিক্ষুগণ দুই পঙ্‌ক্তিতে পরস্পরের সম্মুখে উপবিষ্ট হন। এক পঙ্‌ক্তিতে আচার্য্য প্রথম আসন গ্রহণ করেন। অনন্তর দীক্ষার্থী তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে জনৈক শ্রমণ তাহার পরিচয় দেন। তখন দীক্ষার্থী আচার্য্যকে অভিবাদন করিয়া তিনবার বলেন "প্রভু আমাকে কৃপা করুন, আমার এই তিন খণ্ড বস্ত্র গ্রহণ করুন এবং আমাকে দীক্ষা দেন, তাহা হইলে আমি দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব এবং নির্ব্বাণ লাভ করিব।" আচার্য্য তখন সেই তিনখণ্ড বস্ত্র লইয়া দীক্ষার্থীর স্কন্ধে রাখিয়া দেন। স্থানান্তর হইতে গৈরিক পরিধান করিয়া শীলগ্রাহী মণ্ডপে প্রতিগমন করেন। গৈরিক পরিধানের সময় দীক্ষার্থীকে ভাবনা করিতে হয়, লজ্জা নিবারণ ও শীত গ্রীষ্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন, শোভার জন্য নহে। গৈরিক ধারণ করিয়া মণ্ডপে প্রত্যাগত হইয়া দীক্ষার্থী করযোড়ে তিনবার ত্রিসরণ গ্রহণ করেন—

বুদ্ধং সরণম্ গচ্ছামি
ধম্মম্ সরণম্ গচ্ছামি
সঙ্ঘম্ সরণম্ গচ্ছামি

তাহার পর তিনি তিনবার দশশীল গ্রহণ করিবেন।

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্কাপদং সমাদিয়ামি।

২। অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্কাপদং সমাদিয়ামি।

৩। কামেহুমিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্কাপদং সমাদিয়ামি।

৪। মুসাবাদা বেরমণী সিক্কাপদং সমাদিয়ামি।

৫। সুরামেরয় মজ্জপমাদঠ্‌ঠানা বেরমণী সিক্কাপদং সমাদিয়ামি।

৬। অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্কাপদং সমাদিয়ামি।

৭। বিকালভোজনা বেরমণী সিক্কাপদং সমাদিয়ামি।

৮। নচ্চগীত বাদিত বিসুক দস্‌সনা মালাগন্ধ বিলেপন ধারণ মণ্ডন বিভুসনঠ্‌ঠানা বেরমণী সিক্কাপদং সমাদিয়ামি।

৯। উচ্চাসয়ন মহাসয়না বেরমণী সিক্কাপদং সমাদিয়ামি।

১০। জাতরূপ রজতপটিগ্‌গহণা বেরমণী সিক্কাপদং সমাদিয়ামি।

দশশীল গ্রহণ করিলে প্রব্রজ্যা সমাপ্ত হয়। প্রব্রাজিতকে সাধারণতঃ শ্রমণ বলিয়া অভিহিত করা হয়। উপসম্পন্ন শ্রমণ বা ভিক্ষু অভিধান লাভ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে শ্রমণের উপসম্পদা গ্রহণে অধিকার হয়। উপসম্পদা গ্রহণের সময় গৈরিক পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ উপাসকের বেশে সঙ্ঘ মধ্যে উপস্থিত হইয়া, অভিবাদন পূর্ব্বক তিনবার একজন আচার্য্যকে প্রার্থনা করিতে হয়। তাঁহার প্রার্থনা অনুমোদিত হইলে, তিনি মণ্ডপের অপর প্রান্তে প্রস্থান করেন, সেখানে ভিক্ষাভাজন

তাঁহার গলদেশে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। যিনি সেই প্রব্রাজিতের উপসম্পদা প্রস্তাব করেন, তিনি তখন তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আচার্য্যের সমক্ষে উপস্থিত হন। এই সময় আর একজন ভিক্ষু যাইয়া তাঁহার অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে তিনি তাঁহাদিগকে আপন নাম ও যাঁহাকে আচার্য্যরূপে স্বীকার করিবেন, তাঁহার নাম বলিয়া দেন। এ কথাও বলেন যে, তিনখানি গৈরিক ও ভিক্ষাভাজন সংগ্রহ হইয়াছে এবং নিষিদ্ধ রোগ তাঁহার একটীও নাই, তাঁহার বয়স বিংশতি বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, তিনি কাহারও ভৃত্য বা ঋণগ্রস্ত নহেন এবং উপসম্পদা গ্রহণে তাঁহার পিতামাতার সম্মতি আছে। পরীক্ষকদ্বয় তখন সঙ্ঘের নিকট পরীক্ষাফল এইরূপে নিবেদন করিলে, আচার্য্যের অনুমতিক্রমে উপসম্পদার্থীকে আচার্য্যের সম্মুখে আনয়ন করা হয়, তিনি আবার তিনবার উপসম্পদা প্রার্থনা করেন। পরীক্ষকগণ আবার সঙ্ঘসমক্ষে পরীক্ষাফল নিবেদন করেন এবং তিন বার জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের প্রস্তাবিত ব্যক্তিকে সঙ্ঘমধ্যে গ্রহণ করিতে কাহারও কোন আপত্তি আছে কি না। সকলে মৌনভাবে বসিয়া থাকিলে, তাঁহারা আচার্য্যকে অভিবাদন ও সম্বোধন করিয়া বলেন, অমুক ভিক্ষুমণ্ডলীতে অতঃপর প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন, অমুক তাঁহার আচার্য্য হইলেন। সঙ্ঘমধ্যে সকলেরই ইহা অভিপ্রেত, এজন্য সকলে মৌন হইয়া আছেন; আমরা এইরূপ বুঝিলাম। অতঃপর ভিক্ষুর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে পাতিমোক্ষ হইতে কয়েকটী উপদেশ পাঠ করা হইলে, শ্রমণদিগের শ্রমণত্ব লাভ সম্পূর্ণ হয়। দণ্ডগ্রহণের পরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে দণ্ডীর নূতন নামকরণ হয়। সংসারের সহিত চিরবিচ্ছেদের নিদর্শন এই নূতন নামকরণ। বৌদ্ধসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া সংসারে পুনঃপ্রবেশে কাহারও নিষেধ নাই। এজন্য বৌদ্ধসঙ্ঘে নবদীক্ষিত ভিক্ষুর নূতন নামকরণের আবশ্যক হয় না।

নবশ্রমণ নির্ব্বাচিত আচার্য্যের অন্তেবাসী হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিবেন। আচার্য্য তাঁহার পিতৃস্থানীয় ও গুরুস্থানীয় হইয়া রোগ শোক সন্দেহে আধিব্যাধি পরিতাপে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। আত্মসংযম ও দীনতা ভিক্ষুর লক্ষণ। সংসার আত্মসংযমের অন্তরায়, এজন্য ভিক্ষুর আশ্রয় বৌদ্ধ-বিহার,—বিলাস আত্মসংযমের অন্তরায়, এজন্য দীনতা, নির্ধনতা, ভিক্ষা তাঁহার অবলম্বন। এই হেতু তাঁহার ভিখারী নাম ভিক্ষু। ধন জন সম্পদের অস্থিরতা, সামাজিক আধিপত্যের অসারতা, সংসারে দুঃখের অনিবার্য্যতা, প্রবৃত্তি চালনার অবশ্যম্ভাবিতা বুদ্ধকে সংসার পরিহারের একান্ত কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছিল। অন্য ধর্ম্মে সংসারাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। সে সকল প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম। দুঃখের আত্যন্তিক অভাব সে ধর্ম্মে স্বীকৃত হয় না। দুঃখের অনিবার্য্যতা স্বীকার করিয়া সে সকল ধর্ম্মে সুখের চেষ্টা প্রতিপাদিত হয়। প্রবৃত্তিমার্গে সুখ নাই, ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্র—সংসারের প্রবৃত্তির অনুশীলন অবশ্যম্ভাবী, এজন্য গৌতম সংসার পরিহারের কর্ত্তব্যতা নির্ব্বাণপ্রয়াসীকে বিশেষরূপে বুঝাইতেন। এজন্য তিনি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। এজন্য যাহার নিমিত্ত কোটী লোকে প্রাণান্ত প্রয়াস পায়, যাহার সাধনায় জীবনের দীর্ঘতা তাঁহাদিগের

নিকট অল্পস্থায়ী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, গৌতমের প্ররোচনায় শত শত জন সে সুখ সমৃদ্ধি অকিঞ্চিৎকররূপে উপেক্ষা করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিল। কেবল সাংসারিক লোক নহে, আর্য্যসমাজের পূজনীয় অনেক আচার্য্যও যাগ যজ্ঞ বিসর্জ্জন করিয়া স্বদলে বৌদ্ধসঙ্ঘে আশ্রয় লইয়াছিল। খণ্ডকগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, উরুবেলার বিখ্যাত মোহান্ত কাশ্যপ ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিলে বিস্মিত হইয়া কেহ কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কাশ্যপ, পঞ্চতপা ও কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য তোমার যশ দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত—আজ কি জন্য তুমি আজ্যবহ্নি ও যজ্ঞবেদী পরিহার করিয়া মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকধারী শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ সঙ্ঘে আশ্রয় লইয়াছ? কাশ্যপ উত্তর দিয়াছিলেন—যজ্ঞের ফল দর্শনীয়, শ্রবণীয় বা স্বাদনীয়—কামিনীকাঞ্চনবিলাসসুধা তাহার পরিণাম, যখন বুঝিলাম, এ সকল বিষবৎ পরিত্যজ্য, তখন আর যাগযজ্ঞের অপেক্ষা রাখিলাম না। তখন গৌতম কাশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি দর্শনীয়, শ্রবণীয়, স্বাদনীয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থে তোমার লোভ না থাকে, তবে স্বর্গের বা মর্ত্ত্যের কোন্ পদার্থের জন্য তোমার হৃদয় পিপাসিত? নবশ্রমণ যথোচিত অভিবাদন করিয়া বিনীতভাবে আচার্য্যকে নিবেদন করিলেন—পুনর্জ্জন্মের অঙ্কুর বিনাশ হইয়াছে, লোভ মোহ দ্বেষের অন্ত হইয়াছে, নবজীবনের বাসনা বিগত হইয়াছে, ভিক্ষুর এমন মধুর অপরিবর্ত্তনীয় নিরান্দোলিত শান্তজীবন যখন দেখিলাম, তখন কি আর আমি যাগযজ্ঞের কোলাহলে প্রতারিত হই? এই শান্তিময় জীবন ভিক্ষুর আদর্শ। সাংসারিক জীবনে এ শান্তির নিত্য অভাব।

নবদীক্ষিত উপসম্পন্নকে আচার্য্য এইরূপ উপদেশ দেন, গৃহছাড়িয়া যে গৃহত্যাগী হইয়াছে, ভিক্ষা-লব্ধ কণিকা সমষ্টি তাঁহার আহার্য্য, পথপার্শ্বে সংগৃহীত জীর্ণবস্ত্র তাঁহার পরিধেয়, বনে বৃক্ষমূল তাঁহার আশ্রয়, দুর্গন্ধ গোমূত্র তাঁহার ঔষধ। ধর্ম্মনিষ্ঠ উপাসক তাঁহাকে আহার্য্য বস্ত্র, আশ্রয় বা ঔষধ দান করিলে তিনি তাহা অস্বীকার করিতে না পারেন, কিন্তু কষ্টসাধ্য ভিক্ষুজীবন তাঁহার নিয়ত। উপসম্পন্ন ভিক্ষুর স্ত্রীসঙ্গ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। স্ত্রীসঙ্গী ভিক্ষু ভিক্ষুই নহে, সে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ নহে। মস্তক শূন্য দেহ যেমন জীবিত থাকে না, স্ত্রীসঙ্গী ভিক্ষুক তেমনি ভিক্ষুই হইতে পারে না—তিনি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ নহেন। (২) অদত্ত কুশাঙ্কুরও গ্রহণ করিতে ভিক্ষুর অধিকার নাই। উহা চৌর্য্য। পাদপরিমিত অদত্ত পদার্থ যে গ্রহণ করে, সে চৌর্য্যাপরাধী, সে কখন ভিক্ষু হইতে পারে না। সে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ নহে। (৩) উপসম্পন্ন ভিক্ষু জ্ঞাতসারে একটী কীট বা পিপীলিকা—কোন প্রাণীর প্রাণগ্রহণ করিতে পারে না। জ্ঞাতসারে একটী ভ্রূণেরও যে জীবন নাশ করে, সে ভিক্ষু নহে, সে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ হইতে পারে না। প্রস্তর একবার দ্বিখণ্ড হইলে যেমন আর কোন প্রকারে অখণ্ড হইতে পারে না, তেমনি যে ভিক্ষু জ্ঞাতসারে একটী ভ্রূণেরও জীবন নাশ করেন, তিনি কখন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ হইতে পারেন না। (৪) উপসম্পন্ন ভিক্ষু কখন ঋদ্ধির গর্ব্ব করিবেন না। দুরভিপ্রায়ে লোভহেতু মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক যে ভিক্ষু আপন ঋদ্ধির ধ্যানের বা সমাধির গর্ব্ব করেন, তিনি ভিক্ষু নহেন, তিনি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ হইতে পারেন না। তালবৃক্ষ

মস্তক বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন জীবিত থাকিতে পারে না, যে ভিক্ষু আপন ঋদ্ধি, ধ্যান বা সমাধির গর্ব্ব করেন, তিনি ভিক্ষু হইতে পারেন না, তিনি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ নহেন।

আহার্য্য, আশ্রয়, ঔষধ ও পরিধেয়, ভিক্ষুর ইহাই নিত্য প্রয়োজন। বিবাহ করিলে, সন্তান হইলে অর্থের প্রয়োজন হয়,—অর্থের জন্য বিষয়কর্ম্মের আবশ্যক। ভিক্ষু সংসার-বিরাগী, তাঁহার অর্থের প্রয়োজন নাই। কৃষিকর্ম্ম, বিষয় সম্পদ তাঁহার নিষিদ্ধ। ভিক্ষুর স্বর্ণ রজত গ্রহণে অধিকার নাই। ভিক্ষুসঙ্ঘেরও কোন বিষয় সম্পত্তি, অশ্ব-গাভী, উষ্ট্রদন্তী, বিত্ত বা ক্রীতদাস গ্রহণ করিবার, রাখিবার বা তত্ত্বাবধারণ করিবার অধিকার নাই। কোন উপাসক আহার্য্য, পরিধেয় বা ঔষধের মূল্য দিতে চাহিলে তিনি তাহা বিক্রেতার হস্তে দান করিবেন, ভিক্ষু তাহার নিকট প্রয়োজনীয় দ্রব্য লইবেন।

নগ্নতা, অপরিষ্কারতা, বিলাস বা কৃচ্ছ্র সাধন বৌদ্ধধর্ম্মের অননুমোদিত। নবদীক্ষিত শ্রমণ যাহাতে পূর্ণসংখ্যা পরিচ্ছদ পরিধান করেন, রীতিমত গৈরিকে রঞ্জিত করেন, নিত্য ধৌত করেন, এবং সূর্য্যতাপে উপযুক্ত রূপে শুষ্ক করেন, তাহার তত্ত্বাবধান ভার তাঁহার আচার্য্যের। গৃহমার্জ্জন, বায়ু-সঞ্চারণ, দ্রব্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন রাখিবার সম্বন্ধে বিনয়-সূত্রে বিস্তর বিধান করা হইয়াছে। জীর্ণবস্ত্রখণ্ডগুলি একত্র করিয়া উপাসকের প্রদত্ত বস্ত্রখণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া আবার তাহা সীবন করিয়া অথবা নূতন বস্ত্র যথাযথ রঞ্জিত করিয়া, কেবল ভিক্ষান্নে জীবন পোষণ বা আহূত হইলে ইচ্ছামত নিমন্ত্রণ গ্রহণ, রোগে কেবলমাত্র গোমূত্র সেবন বা কেহ দান করিলে ঔষধ গ্রহণ, এ সকল সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে ভিক্ষুর স্বাধীনতা ছিল। পরন্তু বাহুলক্ষণ অপেক্ষা চিত্তপ্রসাদ সাধনই ভিক্ষুর প্রধান কর্ত্তব্য। তবে স্বাধীনতা যথেচ্ছাচারিতায় না পর্য্যবসিত হয়, এজন্য প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা সম্পাদন করিতে হইয়াছিল। ভিক্ষুর সম্পত্তি সামান্য, (১) তিনখানি বস্ত্র—সংঘাতি কোমরে জড়াইবার জন্য, অন্তর্ব্বাস বুকে পিঠে জড়াইবার জন্য এবং উত্তরাসঙ্গ ইহা কাঁধ হইতে পা পর্য্যন্ত পড়ে। দুইপ্রস্ত বস্ত্রের অধিক কাহারও রাখিবার অধিকার নাই। (২) কোমরে—বাঁধিবার জন্য একটী কোমরবন্ধ, (৩) একটী ভিক্ষাভাজন, (৪) একখানি ক্ষুর, (৫) একটী নরুন, (৬) একটী ছাঁক্‌না ; ইহাতে ছাঁকা জল পান করিতে হয়। কোন কীট জলে পড়িয়া উদরস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ভিক্ষুর আহার ভিক্ষালব্ধ আহার্য্য। ভিক্ষাভাজন হস্তে লইয়া এদিক্ ওদিক্ না চাহিয়া ভিক্ষু গৃহস্থের দ্বারদেশে অধোবদনে দাঁড়াইবেন। তিনি কোন যাচ্ঞা করিবেন না। গৃহস্থ যাহা দিবেন, তাহা লইয়া অথবা কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া, কিছু না পাইলে পার্শ্ববর্ত্তী দ্বিতীয় দ্বারে দাঁড়াইবেন। দরিদ্রের দ্বার উপেক্ষা করিয়া, ধনবানের দ্বারে যাইবার তাঁহার অধিকার নাই। কিন্তু যে ভিক্ষা দিয়া উপবাসী থাকিবে, এমন দরিদ্রের দ্বারে যাওয়া নিষিদ্ধ। যে ভিক্ষা দেয়, ভিক্ষু তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না। যথেষ্ট আহার্য্য সংগৃহীত হইলে, তিনি বিহারে প্রত্যাগমন করিয়া দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে ভিক্ষাভাজনস্থিত সিদ্ধপক্ক ভোজন করিবেন। দ্বিপ্রহরের পরে ভিক্ষুর আহার্য্য গ্রহণের অধিকার নাই। কোনপ্রকার মাদক সেবন তাঁহার একান্ত নিষিদ্ধ। ভিক্ষুর আশ্রয় তরুমূল,—বিজন-

বনে সমাধির সুবিধা। কিন্তু আহার্য্য ও পরিধেয়ের জন্য ভিক্ষুকে উপাসকের উপর নির্ভর করিতে হয়। গ্রাম বা নগর প্রান্তে, উপবনে ভিক্ষু আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। শ্রদ্ধাশীল উপাসকগণের অনুগ্রহে এই সকল স্থানে কালক্রমে বিহার সকল স্থাপিত হইয়াছিল। নগর বা গ্রামের মধ্যে ভিক্ষুর বাস করিবার আদেশ নাই। দ্বিপ্রহরের পরে ও পরদিন প্রভাতের পূর্ব্বে নগর মধ্যে তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ। বৌদ্ধ-ভিক্ষু বৎসরের অধিকাংশ দিন নগর হইতে নগরান্তরে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেন। কিন্তু বর্ষার তিনমাস একস্থানে যাহার দ্বার বদ্ধ করা যায়, এমন স্থানে বাস করিতেন। এই তিন মাস ধর্ম্ম আলোচনায় ও উপাসকদিগকে উপদেশ দিতে অতিবাহিত হইত। তরুতলে বা প্রান্তরে বর্ষা অতিবাহিত করিবার আদেশ নাই।

ভিক্ষুর নিত্য কার্য্য অতি সামান্য। প্রত্যুষে উঠিয়া শুচি হইয়া বিহার এবং বিহার সম্মুখস্থ বটমূল মার্জ্জনা করিবেন। অনন্তর স্নান করিয়া পানীয় জল সংগ্রহ করিবেন। এবং উহা সীবনীতে পরিস্কৃত করিয়া ঢাকিয়া রাখিবেন। তদনন্তর নির্জ্জনে উপবেশন করিয়া বিনয় সূত্র ও বুদ্ধের সদ্‌গুণ এবং মৈত্র ভাবনা করিবেন। ধ্যান ধারণা সম্পূর্ণ হইলে, ভিক্ষাভাজন লইয়া ভিক্ষা করিতে যাইবেন। ভিক্ষা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আহার করিবেন, ভিক্ষাভাজন ধৌত করিবেন। আহারান্তে তিনি আবার ধ্যানে বসিবেন। এবার করুণা ভাবনা। যাবতীয় জীবের দুঃখজরা চিন্তা করিবেন ও তাহাদের শান্তি কামনা করিবেন। করুণা-ভাবনা সমাপ্ত হইলে শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা করিবেন। সূর্য্যাস্তে আবার বিহার ও বোধিমূল সম্মার্জ্জন করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া আচার্য্যের উপদেশ শুনিবেন এবং ধর্ম্মালোচনা করিবেন। দীর্ঘনিদ্রা ভিক্ষুর নিষিদ্ধ।

ভিক্ষুর জন্য নিত্য পাঁচটি ধ্যান বিহিত হইয়াছে। ১। মৈত্র-ভাবনা, ২। করুণা-ভাবনা, ৩। মুদিত-ভাবনা, ৪। অশুভ-ভাবনা, ৫। উপেক্ষা-ভাবনা। প্রাতঃকালে মৈত্র ভাবনা। অন্য চারিটী পরে পরে। মৈত্র-ভাবনায় ভিক্ষু সকল জীবের কথা স্মরণ করিয়া সকলের মঙ্গল কামনা করিবেন। দুঃখ রাগ বাসনা হইতে বিমুক্ত হইলে নিজে কতসুখী হইবেন, অন্যে যেন সেইরূপ সুখী হয়। শত্রুরও তিনি মঙ্গল কামনা করিবেন। ইহজন্মের শত্রু, হয় ত পূর্ব্বজন্মে তাঁহার বন্ধু বা আত্মীয় ছিল। ইহা স্মরণ করিয়া এবং তাহাদের সৎকার্য্য সকল স্মরণ করিয়া তিনি আপনার জন্য যে শান্তি কামনা করেন, তাহাদেরও জন্য সেই সুখশান্তি কামনা করিবেন। করুণা-ভাবনায় ভিক্ষু সকল জীবের জরা মরণ দুর্গতি স্মরণ করিয়া, জটাজটিত জীবমণ্ডলীর জন্য হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করিবেন। মুদিত-ভাবনায় ভিক্ষু জীবের সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া পরের সুখে সুখানুভব করিবেন। অশুভ-ভাবনায় ভিক্ষু দেহের মলিনতা, পীড়া ও যাতনার ভীষণতা, জলবুদ্‌বুদের ন্যায় দেহের অসারতা এবং জন্ম ও মৃত্যুর পৌনঃপুনিকতা স্মরণ করিবেন। উপেক্ষা-ভাবনায় ভিক্ষু সুখদুঃখ সম্পদ দারিদ্র্য প্রভৃতি দ্বন্দ্ব অবস্থা স্মরণ করিয়া সকল অবস্থা উপেক্ষা করিতে, চিত্তপ্রসাদ রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবেন।

হস্তসার নামক গ্রন্থ হইতে মৈত্র-ভাবনার ধ্যান ও তাৎপর্য্য এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

"সব্বেসত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। সব্বেসত্তা দুখ্‌খাপমুঞ্চন্তু। সব্বেসত্তা মা যথা লব্ধ সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু। সব্বেসত্তা কম্মসসকা, কম্মদায়াদা, কম্মযোনী, কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরণা যংকম্মম্ করিস্‌সন্তি কল্যাণম্ বা পাপকম্ বা তস্‌সদায়াদা ভবিস্‌সন্তি।"

"জগতের সকল জীব সুখিত হউক, অবৈর হউক, অবধ্য হউক, অহিংসিত হউক ও সুখী হইয়া কালহরণ করুক। সকল জীব দুঃখ হইতে প্রমুক্ত হউক, সকল জীব যথালব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক। সকল জীব কর্ম্মের স্বকীয়, কর্ম্মের দায়াদ, কর্ম্মযোনী, কর্ম্মবন্ধু ও কর্ম্মাশ্রিত, পাপ বা পুণ্য যে কর্ম্ম করিবে, তাহারই ফলভাগী হইবে।"

পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় ভিক্ষুর উপবাস বিহিত। এই উপবাস দিনে বিহারের নিকটবর্ত্তী সকল ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করা হয়, এবং সকলকে উপস্থিত হইতে হয়। যিনি উপস্থিত হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা না করেন, তিনি মণ্ডলীচ্যুত হন। পীড়িত বা অসমর্থ প্রতিনিধি করিয়া একজন ভিক্ষুকে না পাঠাইতে পারিলে, যানযোগে তাহাকেও লইয়া আসা হয়, অথবা অন্য সকলে যাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। একজন অনুপস্থিত হইলে উপবাস দিনের নিয়মিত কর্ম্ম হয় না। এ দিন পাতিমোক্ষ পাঠ করা হয়। ভিক্ষু এক পক্ষের মধ্যে বিনয়-নিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিয়া থাকিলে সঙ্ঘের সম্মুখে আত্মাপরাধ স্বীকার করেন। ভিক্ষু ভিন্ন আর কেহ—ভিক্ষুণী বা উপাসক—অন্য কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিতে পান না। সঙ্ঘের সম্মুখে অপরাধ স্বীকার করিলে অপরাধের লঘুতা হয়, বৌদ্ধ এইরূপ বিশ্বাস করেন। বোধ হয়, ভিক্ষুগণের শাসনের জন্য অপরাধ স্বীকারের নিয়ম করা হইয়াছিল। অন্যের অপরাধ, এ দিন, যে কেহ দেখাইয়া দিতে পারিতেন। বিহার ভিন্ন গিরিগুহা, বৃক্ষমূল বা অন্য স্থলেও এ কার্য্য সম্পন্ন হইবার বাধা ছিল না। সন্ধ্যার পরে প্রদীপ জ্বালিয়া সঙ্ঘের মধ্যে স্থবিরতম ভিক্ষু পাতিমোক্ষ পাঠ করেন। পাতিমোক্ষ অপরাধমালা, এক একটী সূত্র আচার্য্য পাঠ করেন, কেহ সে সূত্রে উল্লিখিত অপরাধে অপরাধী হইলে অপরাধ স্বীকার করেন। যাহারা অপরাধী নন, তাঁহারা মৌন থাকেন। যিনি অপরাধী হইয়াও তিন বার সূত্রপাঠ হইবার পরে মৌন থাকেন, তিনি মিথ্যাবাদ অপরাধে অপরাধী হন। প্রথমে গুরুতর দোষের ও শেষে লঘুতম দোষের উল্লেখ করা হয়। স্ত্রীসংসর্গ, চৌর্য্য, নরহত্যা ও ঋদ্ধিভাণ গুরুতর দোষ বলিয়া গণ্য। দুঃখত বা লঘু অপরাধের মধ্যে এই সকল গণ্য—মলিন মনে কোন রমণীর দেহস্পর্শ করা, ভিক্ষুকে অযত্ন করা, পান ভোজন পরিধান সম্বন্ধে বিনয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করা ইত্যাদি।

বর্ষার তিন মাস একসঙ্গে বাস করিয়া ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে পবারণা নামে আর একটী উৎসব হয়। এ দিন প্রত্যেকে আর আর সকলের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করেন, যদি তিন মাস একসঙ্গে থাকিবার সময় তিনি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, অন্যে অনুগ্রহ করিয়া তাহা দেখাইয়া দিবেন। যিনি আপনাকে অপরাধী বলিয়া জানেন, তিনি পবারণায় যোগ দিতে পারেন না।

উপাসকদিগের জন্য তীর্থভ্রমণ আদিষ্ট হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে চারিটী তীর্থ—(১) যেখানে গৌতম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—কপিলবস্তু। (২) যেখানে তিনি সম্বোধি লাভ করেন—বুদ্ধগয়া। (৩) যেখানে ধর্ম্মচক্র প্রথম প্রবর্ত্তন হয়—ঋষিপত্তন (সারনাথ)

হওয়াই আবশ্যক। ইংলণ্ডে স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে ১৮৭২ ও ১৮৭৫, এই দুই খ্রীষ্টাব্দে দুইটী আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এদেশেও এইরূপ কোন আইন হইলে ভাল হয়। প্রত্যেক "লোক্যাল্ বোর্ডে" কূপ, পুষ্করিণী, বিল ও প্রধান পয়ঃপ্রণালী (নালা) গুলির একটী করিয়া রেজিষ্টারি পুস্তক থাকা কর্ত্তব্য। এই পুস্তকে নিজ নিজ ভূমির মধ্যস্থ যে যে কূপ, পুষ্করিণী বা অন্যান্য স্থির পয়ঃবিশিষ্ট জলাধার আছে, সেই সকল প্রত্যেক গৃহস্থ বাধ্য হইয়া রেজিষ্টারি করিয়া যাইবে, এবং অন্ততঃ তিন বৎসর অন্তর যখন ঐ সকল জলাধারের পঙ্কোদ্ধার করিবে, তখনও লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারমানকে নোটিস্ দিবে, এরূপ কোন নিয়ম হইলে, নিয়মিত রেজিষ্টারি বা পঙ্কোদ্ধার না করিলে, প্রজাদিগের জরিমানার বন্দোবস্ত হইতে পারে। রেজিষ্টারি করিবার আবেদন পত্র বা পঙ্কোদ্ধার করিবার নোটিস, বিনা ব্যয়ে, ডাকযোগে যাইবার বন্দোবস্ত হইলে, নিতান্ত দরিদ্র গৃহস্থও লোক্যাল বোর্ডে লিখিতে বা লিখাইতে কুণ্ঠিত হইবে না। লোক্যাল বোর্ডের রীতিমমত তত্ত্বাবধারণ দ্বারা পঙ্কোদ্ধার কার্য্য সুচারুরূপেই চলিতে পারে। কোন বৃহৎ জলাশয় বা বিল যদি জমীদার বা অন্য কোন ব্যক্তির সম্পত্তিগত না থাকে, তবে সেই সকল জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার লোক্যাল বোর্ডের দ্বারাই হওয়া কর্ত্তব্য। যে সকল বিলে জল শুকাইবার পরে ফসল জন্মান হয়, সেই সকল বিলের পঙ্কোদ্ধার আবশ্যক করে না। ফসল জন্মান দ্বারা গলিত উদ্ভিজ্জ ও জন্তুজ পদার্থ সকল রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া, শস্য জন্মাইবার পক্ষে সহায়তা করে এবং ঐ সকল পদার্থ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বায়ু দূষিত করিতে পারে না।

উদ্ধৃত পঙ্ককে ভূমির উপরিভাগে ছিটাইয়া দিয়া কর্ষণ দ্বারা মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দিলে উহা হইতে শস্যেরও অধিক উপকার হয় এবং উহার দূষিত পদার্থ সকল শীঘ্রই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া দোষশূন্য হয়।

সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে ব্যবস্থা।— মনুষ্যের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ ইংলণ্ডে যেরূপ আইনের ব্যবস্থা আছে, জন্তুদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও কতকগুলি সেইরূপ ব্যবস্থা আছে। জন্তুদিগের কোন কোন রোগ উপস্থিত হইলে, ইংলণ্ডের কৃষক ও অন্যান্য ব্যক্তি ঐ সকল জন্তুকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ও পুতিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। এরূপ করিবার জন্য, গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু কিছু অর্থও প্রজারা পাইয়া থাকে। ইটালীদেশে তুঁতবৃক্ষের আবাদে একপ্রকার কীটজ সংক্রামক রোগ জন্মিয়া থাকে। এই রোগ নিবারণের উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায়, ব্যবস্থা দ্বারা নিবারণোপায় অবলম্বিত হইয়াছে। এ দেশে উদ্ভিদ ও জন্তুদিগের রোগ নির্ণয় হইয়া, এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইতে অনেক কাল লাগিবে, এরূপই বোধ হয়। কৃষকগণ যে যে জন্তু পালন করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে কেবল রেশম-কীটের রোগ নিবারণ বিষয়ে কি রূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, সেই সম্বন্ধেই বলিবার আমার ক্ষমতা আছে, এবং যথা স্থানে পরে এ বিষয়ের উল্লেখ করা যাইবে।

পয়ঃপ্রণালী সম্বন্ধে ব্যবস্থা।— এ দেশের কোন কোন ভূভাগে অতি বৃষ্টি নিবন্ধন কৃষিকার্য্যের ক্ষতি হইয়া থাকে, কোথাও বা অনাবৃষ্টি দ্বারা ক্ষতি হইয়া থাকে। কোথাও বা জল নির্গমের উপায়

অবলম্বন আবশ্যক, কোথাও বা জলাগমের উপায় থাকা আবশ্যক। কোথায় কি উপায় হইলে কৃষকদিগের সাধ্যায়ত্ত উপকার করা যাইতে পারে, ইহা স্থির করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কতকগুলি পয়ঃপ্রণালী দ্বারা কৃষকদের উপকার না হইয়া অপকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পয়ঃপ্রণালীর দুই পার্শ্বের ভূমিতে অনেক দূর পর্য্যন্ত একপ্রকার ক্ষার পদার্থ জন্মিয়া, ঐ ভূমিকে অনুর্ব্বরা করিয়া ফেলিয়াছে। কোথাও বা অতিবৃষ্টি নিবন্ধন বন্যা উপস্থিত হয় বলিয়া নদীর দুইপার্শ্বে বাঁধ দেওয়া আছে। এই বাঁধগুলি দ্বারা যে দেশের উপকার না হইয়া অপকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাও একপ্রকার স্থির। পর্ব্বত হইতে নদী-সংযোগে সারবান পদার্থ সকল আসিয়া বন্যা দ্বারা দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়াতে, দেশ ক্রমশঃ উচ্চ হয় ও কৃষিজাত শস্যেরও উপকার দর্শে। বাঁধ বাঁধিবার কারণ ঐ সকল পদার্থ নদীগর্ভেই নিমজ্জিত হইয়া, ক্রমশঃ নদীগর্ভ উন্নত হইতে থাকে। কাল সহকারে নদীর জল বাঁধ অতিক্রম করিলে আবার বন্যা হইতে থাকে। পর্ব্বত হইতে আনীত পদার্থ সকল দ্বারা বন্যা সহযোগে কোন ভূভাগ তিন চারি হাত উচ্চ হইতে হয় ত সহস্র বৎসরের আবশ্যক; কিন্তু নদীগর্ভ ঐ সকল পদার্থ দ্বারা ৪। ৫ হাত উন্নত হইয়া নদীর জল বাঁধ অতিক্রম করিতে ৫০ সৎসরেরও আবশ্যক করে না। এ কারণ বাঁধ বাঁধিবার জন্য যে কৃষিকার্য্যের ক্ষতি হইয়াছে, ইহা অনেক স্থলেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। কোন গ্রামে কি রূপ জল নির্গমের বা জলাগমের উপায় হওয়া উচিত, এ বিষয় বিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়ারগণই বিচার করিতে সক্ষম। জলাগম ও জলনির্গমন সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইবার আন্দোলন সম্প্রতি চলিতেছে। ব্যবস্থা বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু বিষয়টী বড় দুরূহ। জেলার ইঞ্জিনিয়ারগণের উপর সাধারণ ভারার্পণ ভিন্ন ব্যবস্থা দ্বারা যে বিশেষ বিশেষ উপায় নির্দ্দেশ সম্ভব, এরূপ বোধ হয় না। জেলার ইঞ্জিনিয়ারগণ, স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও সুখ্যাতির আশা দ্বারা পরিচালিত হইয়া কোন্ গ্রামে কি রূপ উপায় ব্যবস্থা দ্বারা কার্য্যে পরিণত করিয়া লইলে, জমীদার বা প্রজার প্রতি উৎপীড়ন না হইয়া, স্বাস্থ্যোন্নতি ও কৃষিকার্য্যের সহায়তা হইবে, এ বিষয়ে সুপরামর্শ দিতে পারেন। ইউরোপ খণ্ডে, গ্রাম্য প্রদেশে, অনেক স্থানেই বায়ু-পরিচালিত একপ্রকার কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র দ্বারা (উইণ্ড্‌মিল্) কূপ, পুষ্করিণী বা নদী হইতে জল উঠান হয়। এই বায়ুযন্ত্র এ দেশে কেন যে প্রচলিত হয় নাই, বলা যায় না। এই যন্ত্র গ্রাম্য সূত্রধর ও কর্ম্মকারেরাও প্রস্তুত করিতে পারে। ইহা বায়ুবেগে স্বতঃই পরিচালিত হইয়া বিলাতি-জল-তুলিবার-কল বা পম্প-সহযোগে জল উত্তোলন করে। প্রত্যেক গ্রামে দুই একটী উইণ্ড্‌মিল্ থাকিলে, কৃষকদের ভূমিতে জল দিবার অতি সুন্দর উপায় হয়। উইণ্ড্‌মিল্ সহযোগে কূপ বা পুষ্করিণী হইতে জল উচ্চ স্থানে উঠিয়া একটী জলকুণ্ডে সঞ্চিত হইবে। এই কুণ্ড হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রণালী দ্বারা, ঐ জল, ক্ষেত্র সমুদায়ে, কৃষকগণ পরিচালিত করিয়া দিতে পারে। এরূপ আয়োজন ব্যয়সাপেক্ষ, এবং ইহা জমীদারের সাহায্য বা তাগাবি ঋণের দ্বারাই কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভব। যে জলাশয় হইতে উইণ্ড্‌মিল্ দ্বারা ক্ষেত্রে জল দিবার আয়োজন হইবে, সেই জলাশয়টী

যদি সঙ্কীর্ণ ঝিলের স্থায় লম্বভাবে গ্রামের পশ্চাৎভাগে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তবে সমস্ত গ্রামের জল নির্গমও এই জলাশয়েই হইতে পারে। জল-নির্গম জলাশয় হইতে ক্ষেত্রসমূহে জলসেচন হইতে পারে বটে, কিন্তু পানের জন্য এই জলাশয়ের জল ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য। পানের জন্য পৃথক পুষ্করিণী গ্রামের সম্মুখ-ভাগে থাকা কর্ত্তব্য। এই পুষ্করিণীর চতু-স্পার্শ্ব উচ্চ হইলে, গ্রামধৌত জল ইহাতে প্রবেশ না করিয়া কেবল ঝিলটীতেই প্রবেশ করিবে। উভয় পুষ্করিণীরই তিন বৎসর অন্তর পঙ্কোদ্ধার করা আবশ্যক। একটী জলনির্গমের ও কৃষিসেচনের সহায়তা সম্পা-দন করিবে, অপরটী কেবল পানীয় কার্য্যে ব্যবহার হইবে। উভয় জলাশয়ই স্বাস্থ্যো-ন্নতির মূলাধার। প্রত্যেক গ্রামে যদি এই-রূপ ঝিল ও পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন সম্ভব থাকিত, তাহা হইলে স্বাস্থ্যোন্নতি ও কৃষিকার্য্যের সহায়তার পক্ষে বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু সকল গ্রামের অবস্থা সমান নহে, এবং সকল গ্রামের গঠনও সমান নহে। একটী নূতন গ্রাম বসাইতে গেলে, গ্রামের সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগ ঠিক করিয়া লইয়া, এক দিকে ক্ষুদ্র একটী পানীয় জলের পুষ্করিণী ও অপর দিকে জলনির্গমের ঝিল খনন করা অতি সহজ ব্যাপার। গৃহ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ভূমিটি উচ্চ করিবার জন্য এবং দেউল ও প্রাচীর প্রস্তুতের জন্য প্রত্যেক গৃহস্থের যে মৃত্তিকা আবশ্যক, ঐ মৃত্তিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া লম্বভাবে কাটিয়া গেলেই গ্রামের পশ্চাতে একটী ঝিল হইয়া পড়িবে। এরূপ কল্পনা-প্রসূত গ্রাম্যগঠন কোন কোন স্থানে লক্ষিত হয় বটে এবং নূতন গ্রাম বসাইবার জন্য গঠন সম্বন্ধে নিয়মও হইতে পারে বটে, কিন্তু উপ-স্থিত ক্ষেত্রে কোন্ গ্রামে যে কি উপায় করিলে জলাগম ও জলনির্গমের সুবিধা হয়, তাহা বলা বড় দুরূহ। কোন কোন গ্রামে কতকগুলি কূপ খনন ভিন্ন আর কোন শ্রেষ্ঠ উপায় নাই বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। কোথাও বা রীতিমত খাল প্রস্তুত হইলে কৃষি বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয় বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। জেলায় জেলায় জলা-শয় সম্বন্ধে যদি একটী করিয়া সরকারি সমিতি গঠন হয়, তবে জেলার ইঞ্জিনিয়ার প্রত্যেক গ্রাম সম্বন্ধে যে উপায় স্থির করি-বেন, তাহা সেই সমিতির অভিমতি অনু-সারে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। রাজপুরুষেরা ব্যবস্থা করিয়া কি কি উপায়ে কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিতে পারেন, এ বিষয় আমরা অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিচার করিলাম। সেই দৃষ্টান্তগুলি স্মৃতিপথে একবার আনাইয়া, কৃষি উন্নতির দ্বিতীয় প্রক-রণ অর্থাৎ শিক্ষাঘটিত উন্নতির বিষয় অব-তারণা করিব। প্রথম প্রকরণ বিচার করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি, গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া, কৃষিকার্য্যের সমূহ উন্নতিসাধন করিতে পারেন।

(১) কৃষিশিক্ষাসম্বন্ধে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্যে একটী শিক্ষাক্ষেত্রের আয়োজন করা।

(২) অস্থি সংরক্ষণ ও উহা সাররূপে ব্যবহারের উদ্যোগ করা।

(৩) তৈলপ্রদ বীজের খৈলভাগ দেশের বাহিরে না যাইতে দেওয়া।

(৪) মিউনিসিপালিটি সকলের সাহায্যে যবক্ষার প্রস্তুতের আয়োজন করা।

(৫) খাদ্যপ্রদ বৃক্ষরোপণের ভার জেলার ইঞ্জিনিয়ারগণের উপর ন্যস্ত করা।

(৬) কৃষকদিগকে অল্প সুদে ঋণ ও বীজ দেওয়া।

(৭) স্থির জলাশয়গুলির পঙ্কোদ্ধারের বন্দোবস্ত করা।

(৮) সংক্রামক রোগোপশমের উপায় অবলম্বন করা।

(৯) জলাগম ও জলনির্গমের জন্য জেলায় জেলায় সমিতি স্থাপন করা।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

মন্থরা।

রামায়ণের ঐশ্বর্য্য, অযোধ্যা ও লঙ্কা; মহাভারতের ঐশ্বর্য্য, হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ। বাল্মীকি ভালবাসিতেন, প্রভাত ও সান্ধ্য সূর্য্যের মনোহর মূর্ত্তি; ব্যাস ভালবাসিতেন, দিনদেবের বিরাট বিকাশ। বাল্মীকি একদা ভারতের মধ্যদেশে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, ঐশ্বর্য্যদেব তপনবৎ অযোধ্যার উদয়াচলে প্রভাসিত হইয়া তপ্তকিরণে জগৎ আলোকিত করিতেছেন; সেই অযোধ্যার প্রভাবরশ্মি হিমাচলের পার্ব্বত্যদেশ হইতে দক্ষিণে গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইয়াছে। আবার আর এক সময়ে ঋষি ফিরিয়া দেখিলেন—সন্ধ্যাগগনে হেমময় রূপবিভায় সেই দিনদেব লঙ্কার কনককিরীটে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া যেন অস্তাচলের চূড়াবলম্বী হইয়াছেন—লঙ্কার ঐশ্বর্য্য প্রভা সমুদ্র হইতে সেই গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছে। বাল্মীকি এইরূপ ঐশ্বর্য্যবিভায় অযোধ্যা ও লঙ্কাকে সাজাইয়াছেন; কিন্তু ব্যাস হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য্যকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কিরণবৎ প্রভাসিত করিয়া এত সমুজ্জ্বল করিয়াছেন, যেন বোধ হয়, সেই ঐশ্বর্য্য দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের ন্যায় অতি বিরাট ও রুদ্রমূর্ত্তিতে ভারতের মস্তকোপরি অবস্থান করিয়া সমগ্র ভারত একদা আলোকিত করিতেছে। বাল্মীকি ও ব্যাসের ঐশ্বর্য্য-কল্পনার এই রূপ প্রভেদ! অযোধ্যার প্রভাব যত দূর বিস্তীর্ণ ছিল, রামচন্দ্র তাহার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, হইয়া দেখিলেন, অযোধ্যার প্রভাব যে খানে শেষ হইয়াছে, সে খানে আর এক রাজ্যের প্রভূত বল-প্রভাব আসিয়া উপনীত হইতেছে। তিনি মনুষ্যধাম পার হইয়াছেন, আসিয়া পড়িয়াছেন, বানর ও রাক্ষস-রাজ্যে। তিনি মানবধামের দক্ষিণ প্রান্তে আসিয়া দেখিলেন, তথায় যমপুরীর দ্বারদেশ অবস্থিত। প্রাণে না মারিয়া কৌশলপূর্ব্বক যিনি তাঁহাকে এরূপ মৃত্যুমুখে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম মন্থরা। রামচন্দ্র—শূরবীর, মন্থরা—ছলনায় বীরাঙ্গনা। একদা শূরবীর ছলনায় পরাভূত হইয়া মৃত্যুমুখে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধবীর চাতুরীতে পরাস্ত। মন্থরা সেই চাতুরীর কুব্জামূর্ত্তি।

বাল্মীকির কল্পনায় অযোধ্যা ও লঙ্কা, এই দুই প্রধান প্রভাবশালী রাজ্য সজ্জিত হইয়াছে। এই দুই রাজ্য একদা সংঘর্ষে আসিয়া অন্ততর বলের বিনাশ সাধন করিয়াছিল। এই সংঘর্ষণে যে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাই রামায়ণের বৃহৎ ব্যাপার। এই বৃহৎ ব্যাপার রঘুবীর কর্ত্তৃক সমুৎপাদিত হয়। এই বৃহৎ ব্যাপার সংঘটনার্থ রামচন্দ্র গোদাবরী তীরে এক চতুরা অবলা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, অন্য এক বীরাঙ্গনা-রাক্ষসীর মোহিনী মায়া তাঁহাকে সেই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট করিয়া দেয়। মন্থরার চাতুরী-জালে আবদ্ধ হইয়া যখন তিনি অযোধ্যার শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি আর এক মোহিনীর জালে পতিত হইলেন। এই মোহিনীর মোহ জালে পড়িয়া তাঁহাকে গোদাবরী তীর হইতে লঙ্কার রাক্ষস-রাজ্যে আসিতে হইয়াছিল। ঘটনার এক তরঙ্গে গোদাবরীর তীর, আর এক তরঙ্গে লঙ্কার

দক্ষিণ সীমা। রামায়ণে এই দুইটি তুমুল কাণ্ড সংঘটিত হয়। এই দুই তুমুল কাণ্ডেরই মূলে দুইটি রমণীকে দেখিতে পাওয়া যায়। একজন মন্থরা, অন্য জন শূর্পনখা। সংসারের সমস্ত ব্যাপারই প্রবৃত্তি-মূলক। একদা প্রবৃত্তি মন্থরারূপে, অন্য সময়ে প্রবৃত্তি শূর্পনখার প্রলোভনীয় মোহিনী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল। প্রলয়-কাণ্ডের মূলে প্রবৃত্তির কৌশলময়ী কুব্জামূর্ত্তি, অথবা রাক্ষসীর মায়াময়ী মোহিনীমূর্ত্তি। আজি আমরা প্রলয়কারিণী মন্থরাকে দেখিব।

যে প্রলয় মন্থরা ঘটাইয়াছিল, তাহা বড় সামান্য নহে। সে প্রলয়ে রাজার রাজ্য গিয়াছে, অযোধ্যার অধীশ্বরের নিপাত হইয়াছে। অথচ যুদ্ধ ঘটে নাই, রক্তপাত হয় নাই। সকলই কৌশলে সম্পাদিত হইয়াছে। একদিনে রাম চৌদ্দ বৎসরের মত দণ্ডকারণ্যের ভয়সঙ্কুল মহাবনে প্রেরিত হইলেন, সম্পূর্ণ সম্ভাবনা তিনি আর ফিরিয়া আসিবেন না। আর এক দিনে রাজা দশরথ আস্তে আস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এক বাণে দুই জনেই গেল, কৌশল সিদ্ধ হইল। লেডি ম্যাকবেথ এরূপ করে নাই। মন্থরা ও লেডি ম্যাকবেথ দুই জনেই লোভে প্রতাড়িত হইয়াছিল। ম্যাকবেথ সম্মুখে রাজসিংহাসন দেখিয়াছিল। মন্থরা ঠিক্ রাজসিংহাসন দেখে নাই বটে, কিন্তু সেই সিংহাসন-লভ্য রাজসুখ তাহার সম্মুখে ছিল। সেই সিংহাসন ও সুখভোগ কিরূপে লব্ধ হইবে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণে যে পথ যে অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাই তাহাকে পৃথক করিয়া দেয়। ম্যাকবেথ একরাত্রে যে কাণ্ড ঘটাইয়াছিল, মন্থরাও একরাত্রে তদনুরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাইয়া তুলিল। উভয়ই যে অত্যল্প সময় পাইয়াছিল, সে সময় মধ্যে কার্য্যসিদ্ধি করিতে গেলে রক্তপাতই সহজ উপায় বলিয়া প্রতীত হয়। লেডি ম্যাকবেথ সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়া নিজ কার্য্য সিদ্ধ করিল, কিন্তু চতুরা মন্থরার উপায় অন্যবিধ; মন্থরার মন্ত্র, চাতুরী ও কৌশল। মন্থরা হিন্দুদাসী, ম্যাকবেথ ইংরাজ—উচ্চ-কুলোদ্ভবা রমণী। ইংরাজ রাজকুলবধূর নৃশংস ব্যবহারে হিন্দুদাসীও ভীতা হয়। হিন্দুরাজ-দাসী ততদূর কঠিন-হৃদয় হইতে পারে না। দাসী, বিনা রক্তপাতে ও কেবল চাতুরী-বলে একরাত্রে পৃথিবী উল্‌টাইয়া দিল। যে সুখের সূর্য্য অযোধ্যায় উঠিয়াছিল, সে সুখের সূর্য্য সেই রাত্রে যে অস্ত গেল, আর দেখা দিল না। দিবা প্রভাত হইল, কিন্তু সে দিবা কালরাত্রি অপেক্ষাও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। এই জগৎ সুখে ভাসিতেছিল, অমনি তাহা ঘোর দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইল। এত অল্পকালে সহজে এমত প্রলয়কাণ্ড কেহ কখন ঘটাইয়া তুলে নাই। একরাত্রে যেমন হাস্যময় শস্যক্ষেত্রে পঙ্গপাল আসিয়া সকল বিনষ্ট করিয়া যায়, একরাত্রে তেমনি মন্থরা অযোধ্যার সুখময় সমুদয় দেশকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দিল।

লেডি ম্যাকবেথ লোভের লোহিত ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি। মন্থরা লোভের কুচক্রী মন্ত্রণাময়ী মূর্ত্তি। ম্যাকবেথ শুদ্ধ লোভ, মন্থরা শুদ্ধ লোভ নহে। মন্থরার লোভ যত না ছিল, দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য্য তদপেক্ষা অধিকতর। মন্থরা মহিষীর সুখভাগিনী। শুদ্ধ মহিষীর সুখভাগিনী নহে, অধীশ্বরের অধীশ্বরীর সুখভাগিনী। যে সুখে কৈকেয়ী সুখিনী, মন্থরা সেই সুখের ভাগিনী। সার্দ্ধ সপ্তশত রাজ্যের অধীশ্বর দশরথ, দশরথের

অধীশ্বরী কৈকেয়ী; সার্দ্ধসপ্তশত মহিষীর স্বামী দশরথ, দশরথের স্বামিনী কৈকেয়ী। কৈকেয়ী যে উচ্চমঞ্চে অধিষ্ঠিতা ছিলেন, তথা হইতে দেখিতেন, তাহার নিম্নে সার্দ্ধসপ্তশত মহিষী, নিজে রাজা দশরথ, এবং দশরথের অগণ্য রাজ্য-দেশ। এই গরবে কৈকেয়ী রাজ-রাজেশ্বরী। কৈকেয়ী, কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে পরাভূত করিয়া দশরথের একাধীশ্বরী হইয়াছেন। একাধীশ্বরী গরবে ও রাজ-আদরে আদরিণী। কৈকেয়ীর দৃষ্টিতে একাধী-শ্বরীর আদরের গর্ব্ব, পরশ্রীকাতরতার বিদ্বেষ, এবং প্রভুত্বের উজ্জ্বলতা জাজ্বল্যমান ছিল। চলিবার সময় কৈকেয়ী আদরে খসিয়া পড়িত, বিদ্বেষভাবে এক একবার দূরে দৃষ্টিপাত করিত এবং মদগর্ব্বে ফুলিয়া বেড়াইত। এতদূর উচ্চতায় মন্থরা তাহাকে আনিয়াছিল। আনিয়াছিল, মন্থরা তাহারই সুখের ভাগিনী হইবার জন্য। যে চক্ষে কৈকেয়ী শত শত মহিষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিত, মন্থরাও সেই চক্ষে দেখিত। মন্থরার রাজ্য আরও অধিক; মন্থরা শুদ্ধ মহিষীগণের প্রতি সেই চক্ষে চাহিত না, সেই মহিষীগণের শত সহস্র দাসীগণের প্রতিও সেই চক্ষে চাহিত। এত মহিষী ও এত দাসী না থাকিলে কৈকেয়ীর গর্ব্ব এত উঠিত না। কৈকেয়ী যদি দশরথের একমাত্র মহিষী হইতেন, তাহা হইলে কৈকেয়ীর গর্ব্ব সামান্যই হইত। কিন্তু কৈকেয়ী শত শত মহিষীর মধ্যে দশরথের একমাত্র মহিষী। এই জন্যই তাহার এত গর্ব্ব, এত অহঙ্কার। শত শত মহিষীর মধ্যে কৈকেয়ী দর্প দেখাইয়া বেড়া-ইতেন, শত শত মহিষীর শ্রী বিদ্ধস্ত করিয়া কৈকেয়ী শত গুণ শ্রী ধারণ করিয়া তেজস্বিনী হইয়াছিলেন। তাহার তেজ এত লোককে দেখাইবার ছিল। ক্রীড়া করিয়া বেড়াইবার তিনি এত পরিসর পাইয়াছিলেন। মন্থরা আবার তদপেক্ষাও তেজস্বিনী হইয়াছিল। তাহার প্রখরতা কৈকেয়ীর অপেক্ষাও অধি-কতর ছিল। মন্থরা দেখিত, তাহারই শক্তিতে শত শত মহিষীর দশা কিরূপ ঘটিয়াছে; কৈকেয়ীও সেই দশা দেখিয়া সুখলাভ করিত। মন্থরা আবার সেই মহিষীগণের দাসীদিগেরও দুর্দ্দশা দেখিত। কাহারও একটু শির তুলিবার বা উচ্চ দৃষ্টিতে চাহিবার যো ছিল না। চাহিলেই দেখিতে পাইত, উপরে কৈকেয়ীর তেজ এবং তদ-পেক্ষাও তাহার দাসীর তেজ। সূর্য্য অপেক্ষা বালি অধিকতর উত্তপ্ত। সূর্য্যের উত্তাপ মস্তকেও সহ্য হয়, কিন্তু বালির উত্তাপ পদ-তলেও সহ্য হয় না।

কৈকেয়ী শত শত মহিষীকে পরাভূত করিয়া একাকিনী রাজ-আদরিণা হইয়াছি-লেন। এই জয়লাভ তিনি একদিনে করিতে পারেন নাই। শুধু সৌন্দর্য্য গুণে এতদূর ঘটে না। গুণ না থাকিলে কোন ললনার রূপ-মোহ বেশী দিন থাকে না। রমণীরা যে পুরুষের চিত্ত হরণ করে, সৌন্দর্য্য তাহার প্রথম উপায় বটে, কিন্তু সে উপায় শেষ উপায় নহে! রূপ-বল শীঘ্র বিনষ্ট হয়। প্রথমে রূপ, তারপর গুণ চাই। যে রমণী শুদ্ধ রূপ লইয়া স্বামীর নিকট আইসে, তাহার আদর অধিক কাল স্থায়ী হয় না। রূপের সঙ্গে গুণ চাই। শেষে গুণই প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। শুদ্ধ গুণে অনেক রমণী জগৎ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। গুণই রমণীগণের মহাস্ত্র। যে সংসারে কৈকেয়ী থাকিত, সে সংসারে ভূপতির চিত্তহরণ করিবার শত শত মহিষী বিদ্যমান। রূপে সবাই রাজান্তঃপুর

আলোকিত করিয়াছিল। কিন্তু রূপবল কাহার ক'দিন ছিল। গুণই উত্তর উত্তর শ্রেষ্টত্ব লাভ করিতে লাগিল। লাভ করিয়া কৈকেয়ীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা করিয়াছিল। কৈকেয়ীর গুণের এত কি গরিমা যে শত শত মহিষী পরাভূত হইল? কৈকেয়ীর অঙ্গে যে সমস্ত গুণগ্রাম ছিল, সে গুণ-গ্রামের মোহিনী শক্তি মন্থরার মন্ত্রণায় উত্তর উত্তর বাড়িয়াছিল। মন্থরাই কৈকেয়ীকে সর্ব্বজয়শীলা করিয়া তুলিয়াছিল।

অনেক সপত্নীর মধ্যে যে রমণী একাকিনী স্বামীর আদরিণী হয়েন, তাহার গর্ব্ব, প্রফুল্লতা, উল্লাস, উৎসাহ ও তেজ যেমন বাড়িতে থাকে, অন্যদিকে তাহার স্বভাব ততই নৃশংস হইয়া আইসে। অপরের পীড়া উৎপাদন না করিলে, নিজের জয়লাভ হয় না। এই পরপীড়া একদিনের জন্য নহে, চির-জীবনের জন্য। সপত্নীগণের প্রাণে চিরব্যথা দিয়া কৈকেয়ী একাকিনী পতি-আদরিণী হইয়াছিলেন। চিরদিন,প্রতিক্ষণে, তাহাকে সেই ব্যথা দেখিতে হইত। পরের গাত্র-দাহ কৈকেয়ীর সুখের কারণ হইয়াছিল। পরে ছট্ ফট্ করিতেছে, কৈকেয়ী হাসিতেছে। শুদ্ধ কৈকেয়ী নহে, মন্থরাও গাল-ফাত করিয়া হাসিতেছে। দু'জন নয়, দশজন নয়, সার্দ্ধ সপ্তশত মহিষীয় কাতরতা ও অন্তর্বেদনা কৈকেয়ী স্বচ্ছন্দে ও মনের আনন্দে দেখিত। একদিন নয়, দু'দিন নয়; এক বেলা নয়, দু'বেলা নয়; চিরদিন ও সর্ব্বক্ষণ কৈকেয়ী পরযন্ত্রণায় অকাতরা ও সুখিনী। এইরূপে কৈকেয়ী বিজয়িনী। মন্থরা সেই বিজয়ে উল্লাসিনী। কৈকেয়ীর স্বভাব কতদূর নৃশংস হইয়া আসিয়াছিল, মন্থরা তাহা বিলক্ষণ জানিত। যে দ্বেষে কৈকেয়ী পরতাপে অকাতরা, সেই দ্বেষে মন্থরাও অকাতরা।

রাজসংসারের অন্তঃপুরে মন্থরা এতদূর কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার সমস্ত ব্যাপার আমরা কৌশল্যার শোক-বাক্যে বুঝিতে পারি। রামের বনবাস-সংবাদ শুনিয়া স্বীয় পুত্রের নিকট কৌশল্যা দেবী এইরূপে রোদন করিতেছেনঃ—

"রাম, আমি স্বামীর রাজত্বে কল্যাণ বা সুখ লাভ করি নাই; পুত্রের পৌরুষে সুখ লাভ করিব, এই মনে করিয়া এতদিন জীবন ধারণ করিয়াছি; কিন্তু তোমার পৌরুষ প্রকাশের সময় উপস্থিত হইলেও প্রধানা হইয়া আমাকে অপ্রধানা হৃদয়-বিদারিণী সপত্নীদিগের উক্ত অমনোজ্ঞ বাক্য সমস্ত শ্রবণ করিতে হইবে! হাঃ আমার যে রূপ অসীম দুঃখ, মহিলাদিগের তাহা হইতে অধিকতর আর কি দুঃখ হইতে পারে? তুমি সন্নিহিত থাকিতেই আমি রাজা দশরথ কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইলাম! তুমি বিদেশস্থ হইলে, আমার আর কি ঘটিবে? নিশ্চয় মৃত্যু হইবে বোধ হয়! আমি চিরকালই স্বামীর অপ্রিয়, তিনি আমাকে অত্যন্ত নিগ্রহ করিয়াছেন,—তিনি আমাকে কৈকেয়ীর দাসীর সমান কি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়াছেন! হা! যে সকল ব্যক্তি আমার সেবা বা অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহারাও কৈকেয়ীর পুত্রকে অবলোকন করিয়া আমার সহিত সম্ভাষা করে না। হা পুত্র! তোমার বিরহে দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া, আমি কি প্রকারে সেই নিয়ত-কোপনা কটুভাষিণী কৈকেয়ীর বদন দর্শন করিব! হে রঘুনন্দন! তোমার অষ্টম বর্ষে উপনয়ন হয়, তদবধি আমি দুঃখের অবসান আকাঙ্খা করিয়া সপ্তদশ বর্ষকাল অতিক্রম করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে আমি এতাদৃশী জীর্ণা হইয়া আর বহুকাল সেই অসীম দুঃখজনক সপত্নীদিগের কুব্যবহার সহ্য করণে অধ্যবসায়ও করিতে পারি না!"

কৌশল্যার কাতর বাক্যে আমরা এই রাজ-অন্তঃপুরের সমুদয় রহস্যের পরিচয় পাই। মন্থরা কৈকেয়ীকে যেরূপ গড়িয়াছিল, সেই কৈকেয়ী দশরথকে তদনুরূপই

বশীভূত করিয়া আনিয়াছিলেন। দশরথকে এতদুর বশীভূত হইতে হইয়াছিল যে, তাহাকে পরমারাধ্যা কৈকেয়ীদেবীকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিতে হইত। কোথায় বৈজয়ন্ত ধামে দেবাসুরের যুদ্ধ ঘটিল, রাজা দশরথ যখন তৎসাহায্যে গেলেন, কৈকেয়ী অমনি সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রণয়াবদ্ধ দশরথের নড়িবার চড়িবার শক্তি ছিল না, তিনি চিনিতেন কৈকেয়ী-ভবন, কৈকেয়ী চিনিত দশরথকে। দশরথ কৈকেয়ীর জন্য অন্য কোন মহিষীর অন্তর্বেদনায় ভ্রুক্ষেপ করিতেন না। তাঁহাকে অনেকাংশে পরপীড়ায় অকাতর হইতে হইয়াছিল। কিন্তু দশরথ কৈকেয়ী দেবীর কণামাত্র মনোবেদনা সহ্য করিতে পারিতেন না। যিনি এত দূর আদরের আদরিণী, তাঁহার সর্ব্বদাই অভিমান জন্মিবারই কথা। বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। কথায় কথায় আদরিণী অভিমানিনী হইতেন, অভিমানিনী হইয়া ভূমিতলে পড়িতেন। ভূমিতলে পড়িতেন বলিয়া তাঁহার জন্য শ্বেতমর্ম্মরতল-নির্ম্মিত ক্রোধালয় প্রস্তুত হইয়াছিল। মিথ্যা হউক, সত্য হউক, একটু ছল পাইলেই কৈকেয়ীদেবী পতি-সোহাগে মানিনী হইতেন। যদি ভুল ক্রমে একদা নৃপতি কৌশল্যা দেবীর ভবনে পদার্পণ করিতেন, আর সেই সংবাদ মন্থরা আনিয়া তাহার কর্ণকুহরে পৌঁছাইয়া দিত, তবে আর কৈকেয়ীর ক্রোধ দেখে কে! ক্রোধে আট খানা হইয়া মানিনী অমনি ক্রোধাগারে চলিয়া যাইতেন। রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া প্রাণসমা প্রিয়তমাকে না দেখিতে পাইয়া একেবারে পৃথিবী শূন্য দেখিতেন। হা কৈকেয়ী, যো কৈকেয়ী বলিয়া ক্রোধাগারে যাইতেন। যাইয়া যাহা ভাবিতেন ও বলিতেন, এই দেখুন বাল্মীকি তাহার কিরূপ অনুলিপি দিয়াছেন।

"পরে তিনি দুঃখে অতীব উত্তপ্ত হইয়া সেই ক্রোধাগারে যাইয়া উত্তম শয্যা-শয়ন-যোগ্যা কৈকেয়ীকে ভূমিতে শয়ন-পরায়ণা দেখিলেন। সেই নিষ্পাপ বৃদ্ধ মহীপতি দশরথ প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা তরুণী ভার্য্যা ভূমিশয়না পাপমনোরথা কৈকেয়ীকে ছিন্ন লতা, স্বর্গ হইতে ভূতলে পতিতা দেবতা, পুণ্যক্ষয়ে স্বীয় লোক হইতে পতিতা কিন্নরী, স্বর্গপরিভ্রষ্টা অপ্সরা, আবদ্ধা হরিণী এবং স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্টা মূর্ত্তিমতী মায়ার ন্যায় দেখিলেন। পরে সেই বিমোহিত রাজা দশরথ অতীব দুঃখিত ও ত্রাসযুক্ত হইয়া যে রূপ অরণ্যে হস্তী ব্যাধকর্ত্তৃক বিষলিপ্ত বাণদ্বারা সমাহতা করেণুকে স্নেহ সহকারে হস্তদ্বারা মার্জ্জনা করে, সেই রূপ স্নেহ সহকারে কমলনয়নী কৈকেয়ীকে হস্তদ্বারা মার্জ্জনা করিলেন এবং কহিলেন, হে দেবি! যাহাতে তোমার ক্রোধ হইতে পারে, আমি এমত কোন কার্য্যই করি নাই, সুতরাং বোধ হইতেছে যে, কেহ তোমাকে পরাভব করিয়াছে, অথবা কেহ তোমার নিন্দা করিয়াছে; তজ্জন্যই তুমি আমাকে দুঃখ দিবার অভিলাষে ধূলিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। হে কল্যাণি! আমি তোমার প্রিয়সাধনে যত্নবান রহিয়াছি, তথাপি কেন তুমি ভূতাবিষ্টার ন্যায় আমার চিত্ত প্রমথন করিয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? * * * ।

কে তোমার অপ্রিয় কার্য্য সাধন করিয়াছে, আমার কোন্ অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিতে হইবে, তাহা তুমি বল। একে ত আমাকে নিতান্ত প্রণয়াধীন জানিয়া, তোমার আমার প্রতি শঙ্কা করাই উচিত নয়, তাহাতে আবার আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব। অতএব হে শোভনে কৈকেয়ি! তোমার এত আয়াস করিবার আবশ্যক নাই। সূর্য্য যতদুর প্রকাশ করিয়া থাকেন, ততদুর পর্য্যন্ত আমার অধিকার আছে—সুসমৃদ্ধ দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, কোশল কাশী, সৌরাষ্ট্র, মৎস্য, বঙ্গ, অঙ্গ, মাগধ, এবং দক্ষিণ রাজ্য প্রভৃতি সমুদায় রাষ্ট্রই আমার অধীন, এবং ঐ সমস্ত জনপদে জলজাবিক, ধন ধান্য প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য জন্মিয়া থাকে, তুমি সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে

যে দ্রব্য লইতে বাসনা কর, তৎসমুদয় আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে প্রদান করিব। হে কৈকেয়ি, যদি তোমার কোন ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে সেই ভয়ের কারণ ব্যক্ত করিয়া বল। যে রূপ সূর্য্যদেব অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন, সেই রূপ আমি সেই ভয়ের কারণের উচ্ছেদ করিব।"

কৈকেয়ী নৃপতিকে এতদূর অধীন করিয়া আনিয়াছিলেন! মন্থরা জানিত, কৈকেয়ীর জন্য মহীপতি "অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারেন, অথবা যে কোন প্রকারে হউক, তাহার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি কোন কারণেই তাহাকে ক্রোধিতা দেখিতে পারেন না।"

কৈকেয়ীর অন্তঃপুর-রাজত্ব কিরূপ ছিল, এখন বোধ হয় তাহার অনুরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। এই রাজত্ব মন্থরা গড়িয়াছিল। এই রাজত্বে কৈকেয়ী সুখিনী, মন্থরা তাহার সুখভাগিনী। এই রাজত্বের সমুদায় সৎপরামর্শ মন্থরা দিত। মন্থরা তজ্জন্য দাসী হইয়াও কৈকেয়ীর সখী হইয়া ছিল। তাহাদের উভয়েরই স্বার্থ এক, একত্রে বাস, একত্রে নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা। মন্থরার কথা কৈকেয়ী বুঝিত, কৈকেয়ীর কথা কেবল মন্থরা বুঝিত। দু'জনে সমবেদনায় গ্রথিত ছিল। যেমন মায়ের কথা শুদ্ধ ছেলে বুঝিতে পারে; ছেলের কথা শুদ্ধ মায়ে বুঝিতে পারে, যেমন স্ত্রীর কথা স্বামী বুঝে, স্বামীর কথা স্ত্রী বুঝে, আর কেহ বুঝিতে পারে না, অন্য লোকের কাছে তাহাদের ভাষা সমুদায় দোষার্হ, তদ্রূপ কৈকেয়ী ও মন্থরার ভাষা তাহারা পরস্পরেই বুঝিত, অন্য লোকের কাছে সে ভাষা ও কথাবার্ত্তা সমুদয় দোষার্হ। কৈকেয়ীর যে কোন ত্রুটি ঘটিত, মন্থরার পরামর্শে তাহার সমুদায় পরিশোধন হইত। কৈকেয়ীর হাতে যে রাজত্ব ছিল, মন্থরার হাতে তাহার শাসনরজ্জু। এ রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যত ভাবনা চিন্তা, তাহা কৈকেয়ীর নহে, তাহা মন্থরার বিষয়। এ সুখসম্পদ বজায় রাখিবার জন্য মন্থরা সর্ব্বদাই ভাবিত। মন্থরা ভাবিত, যত দিন রাজা দশরথ, ততদিন এই সুখ-সমৃদ্ধি। বৃদ্ধরাজ অযোধ্যার সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেই এ সুখ আর থাকিবে না। এ ভাবনার বিশেষ কারণও ছিল।

মন্থরা জানিত জ্যেষ্ঠাধিকার-রাজনীতি অনুসারে কৌশল্যা-নন্দন রঘুবীর রামচন্দ্রই দশরথের পর অযোধ্যার সিংহাসনের অধিকারী। বৃদ্ধরাজ শীঘ্রই রাজ-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন, তখন রামচন্দ্রই অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেই, কৈকেয়ীর সিংহাসন অধস্তলে গেল। কৈকেয়ী একেবারে পাতালে, কৌশল্যাদেবী স্বর্গে, মর্ত্তে সুমিত্রাদেবী ও অপরাপর রাজ-মহিলাগণ। তখন কোশল-রাজনন্দিনীর প্রাদুর্ভাব। কৌশল্যা তখন সমস্ত নিগ্রহের প্রতিশোধ তুলিবেন। অশ্বপতি-নন্দিনীর প্রতিফল হইবে। তার সঙ্গে সঙ্গে মন্থরা আপনার সমুদয় দুর্দ্দশা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইত।

নিজ তেজস্বিনী বুদ্ধি হেতু এ দুর্দ্দশা নিবারণের উপায় দেখিতে মন্থরার অনেক দিন বিলম্ব হইল না। মন্থরা ভাবিল, রামের বদলে ভরতের রাজ্য লাভ হইলেই এই অমঙ্গল অধিকাংশ নিবারিত হইবে। মন্থরা যখন এইরূপ ভাবনায় ব্যাকুলা, এমত সময় কৈকেয়ীদেবী বৈজয়ন্তধাম হইতে ফিরিয়া আসিলেন। দৈত্যসংগ্রামে বিক্ষত রাজা

দশরথের সেবা করিয়া কৈকেয়ীর যে ফললাভ হইয়াছে, তাহা মন্থরা শুনিল। অমনি উদ্ভাবিনী শক্তি প্রভাবে মন্থরা উপায় স্থির করিল। তাহার চক্ষে আশার আলোক প্রভাসিত হইল। মন্থরা শত গ্রন্থীতে সেই কথা মনে মনে গাঁথিয়া রাখিল।

মন্থরা ভাবিল, রাজা দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কৈকেয়ীদেবী সেই দুইটী বর তথন গ্রহণ না করিয়া যে বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন, কুব্জা মনে মনে সে বুদ্ধিকে শত সহস্রবার প্রশংসা করিল। ভাবিল, কুব্জাশিষ্যের এই উপযুক্ত বটে। তথন কুব্জা চাতুরী জালের তন্ত পাতিল। বিনাইয়া বিনাইয়া চাতুরীজাল প্রস্তুত করিল। দশরথ রাজা অতি সত্যবাদী, তিনি সত্য হইতে একপদ বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। এক দিকে সত্য, অন্য দিকে সমস্ত রাজ্য ও সংসার। চতুরা সেই ধর্ম্মকে আপনার অধর্ম্ম সাধনের বিশিষ্ট উপায় করিয়া লইল। যৌবরাজ্যে রামাভিষেকের পূর্ব্বেই কৈকেয়ীকে দিয়া দশরথকে এমত শপথ করাইতে হইবে, যেন তিনি সেই দুই বর তাহাকে প্রদান করিতে কুণ্ঠিত না হন। এক বরে রামের দণ্ডকারণ্যের বনবাস, অপর বরে ভরতের সিংহাসন-লাভ। রাম-প্রকৃতির পরিচয় মন্থরা যতদূর পাইয়াছিল, তাহাতে রাম যে স্বীয় জনককে সত্য হইতে বিচলিত হইতে দিবেন, তিনি এমত পাত্র নহেন। দণ্ডকারণ্যের মহাবনে গেলে, রামকে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না। ভরত চিরদিনের জন্য সিংহাসনে অধিষ্টিত থাকিবেন। ভরতের সিংহাসন বজায় থাকিলেই, কৈকেয়ী দেবীর রাজত্ব বজায় রহিল। তাহা হইলেই মন্থরাকে আর কে পায়!

মন্থরা এই কল্পনা আঁটিয়া বসিয়া রহিল। যথন রামাভিষেকের কথা উত্থাপিত হইবে, তথন তার কথা। কৈকেয়ীদেবীকে কোন কথা কহিল না, পাছে চঞ্চলা কৈকয়ীর পেটে সে কথা হজম না হয়। হজম না হইলেই সর্ব্বনাশ! রাজা ঘুণাক্ষরে সে কথার বাষ্প পাইলেই মন্থরার কল্পনা বিফল হইবে। কুব্জা এমন কাঁচা মেয়ে নয় যে, সে কথা কাহাকেও প্রকাশ করে। কুব্জা কেবল কাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

সে কাল শীঘ্র উপস্থিত হইল। রামাভিষেকের সম্বাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, কেবল জানিতে পারিল না, কৈকেয়ী ঠাকুরাণী, আর চতুরা মন্থরা। অনেক কৌশলে বৃদ্ধ রাজা তাহাদের নিকট একথা গোপন রাখিয়াছিলেন। কিন্তু চারচোকো চুলবুলে মন্থরা তাহা বাহির করিয়া ফেলিল। ঠাকুরাণী নির্ভাবনায় সুখপর্য্যঙ্কে শয়ানে আছেন, তাঁহার ভ্রুক্ষেপ নাই, কিন্তু দাসীর ঘুম নাই। দাসী সন্ধানে সন্ধানে টের পাইল, চারিদিকে কি একটা মহাব্যাপার হইতেছে। তাহার খবর কৌশল্যার ধাত্রীর নিকট জানা চাই। কারণ, অল্পবুদ্ধি মেয়ে মানুষেয় পেটে কোন কথা থাকে না; কুব্জা তাই বুঝিয়া ধাত্রীর সন্ধানে ছাদের উপর উঠিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতেই, সে অমনি কথা বাহির করিয়া দিল। কুব্জা আরও জানিল, আর কাল বিলম্ব নাই, কালই রামের অভিষেক হইবে।

এক দিনে কুব্জাকে সব গড়িতে হইবে। ঠাকুরাণী নিদ্রা যাইতেছেন; মন্থরা ক্রোধে প্রজ্জলিতা হইয়া সত্বরা তাঁহার ঘরে অগ্নি-শর্ম্মা মূর্ত্তিতে দাঁড়াইল। এইবারে কৈকেয়ীর সঙ্গে তাহার বুঝা পড়া। এই ঘোর বিপদ

কালে কৈকেয়ী কেন নিদ্রিতা? কুব্জা কোপনশব্দে সেই বিভীষিকার ঘোর রোল তুলিল। সেই রোলে যেন পৃথিবী কম্পিতা হইল। অন্তঃপুরের দূর দেশে যেন প্রতিধ্বনি গর্জ্জিয়া উঠিল। কৈকেয়ী দেবী চমকিলেন। চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বিভীষিকার কারণ কি? দশরথ রাজের বহুবিধ নিন্দা করিয়া কুব্জা কুসম্বাদ বিদিত করিল।

এই স্থলে আমরা মন্থরার সাক্ষাৎ পরিচয় পাই। দাসী যে সমস্ত কথায় ঠাকুরাণীকে নিজ অভিসন্ধিতে লওয়াইয়া আনিতেছেন, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

মানব প্রকৃতির অন্ধিসন্ধি মন্থরা কেমন বুঝিত, তাহা এই কথোপকথনে প্রকাশিত আছে। এক বাগ বিফল হইল, মন্থরা অমনি আর এক বাগে ঠাকুরাণীকে ধরিল। শেষে যখন মন্থরা তাহাকে পাড়িয়া ফেলিল, তখন ঠাকুরাণীকে এমন করিয়া সে বাগাইয়া দিল যে, কৈকেয়ী আর কিছুতেই ফিরিতে পারিলেন না। জগৎসংসার এক দিকে, কৈকেয়ী অন্যদিকে। ঠাকুরাণীকে লওয়াইবার সময়ে কুব্জা যে রূপ বুদ্ধিমত্তারপরিচয় দিয়াছে, সে রূপ গুণপনা কোন দাসীতে লক্ষিত হয় না। আমরা একে একে তাহার পরিচয় দিতেছি।

প্রথমে মন্থরা বলিল,—"হে দেবি' তোমার অক্ষয় সৌভাগ্য বিনাশকর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। এজন্য আমি দুঃখ ও শোকাকুলা হইয়া অগাধ ভয়ে নিমগ্না হইয়াছি, কেন না, তোমার দুঃখে আমার দুঃখ হয়।"

রাম যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলে কৈকেয়ীর কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে, প্রথমে চতুরা সেই কথা বলিয়া ঠাকুরাণী রাজা দশরথ কর্ত্তৃকই যে সেই রূপ দুর্দ্দশাপন্না হইবে, তাহাই উল্লেখ করিয়া রাজার প্রণয় যে কেবল শঠতা ও প্রতারণা মাত্র, তাহা বুঝাইয়া দিল। রাজার ব্যবহারের যতদূর পারে নিন্দা করিয়া শেষে কহিল—

"এক্ষণে তোমার নিজ কল্যাণ সাধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে,—তুমি আপনাকে, ভরতকে ও আমাকে রক্ষা কর।"

মন্থরা অবশ্য আপনার সুখ চাহিত; শুদ্ধ সুখ নয়, সেই তেজ ও দর্প সকলই বজায় রাখিতে চাহিত। কিন্তু সে সমুদায় কৈকেয়ীর ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতেছিল। সুতরাং কৈকেয়ীর যাহাতে সুখসম্ভোগ বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য তাহাকে উত্তেজিতা করিল। যে সুখরাজ্য কৈকেয়ী ও মন্থরা স্থাপন করিয়াছিল, আজি তাহা অবসানপ্রায় দেখিয়া দাসী কৈকেয়ীকে প্রথমে উদ্বোধিতা করিয়া ছিল।

কৈকেয়ীর বিশ্বাস ছিল, রাম-রাজত্বকালে তাহাকে যে নিতান্ত অসুখিনী হইতে হইবে, এমত নহে, রাম তাহাকে মাতৃনির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন। এজন্য রামের প্রতিও তাহার মাতৃস্নেহ ছিল। সেই স্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি রামাভিষেকের সংবাদে পরম আহ্লাদিতা হইলেন। সেই আহ্লাদে দাসীকে উত্তম আভরণ প্রদান করিলেন।

দাসী কিন্তু সে আভরণ-দানে ভুলিবার পাত্রী নহে। রাণীর হর্ষের কারণ দাসী বুঝিতে পারিল। রাম-রাজত্ব ও ভরত-রাজত্বে রাণীর সুখ-সৌভাগ্যের যে প্রভেদ আছে এবং তাহাদের অন্তঃপুর রাজত্বের যে রূপ ব্যাঘাত ঘটিবে, কুব্জা তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল। কিন্তু কৈকেয়ীর তাহা সম্যক

উপলব্ধি হয় নাই। তজ্জন্য দাসী ঠাকুরাণীর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বুঝাইতে গেল। বুঝাইতে গেল রাম রাজা হইলে, কৌশল্যা দেবীরই মহা প্রাদুর্ভাব ঘটিবে। তখন কৈকেয়ীর প্রভুত্ব গিয়া কৌশল্যার প্রভুত্ব-কালের উদয় হইবে। কৌশল্যা দেবী তখন সমুদায় নিগ্রহের প্রতিশোধ তুলিবেন। রাম তাহার প্রতি ভাল ব্যবহার করিলে কি হয়, কৌশল্যা দেবী কি রূপ ব্যবহার করিবেন? কৌশল্যা দেবীর ব্যবহার দূরে থাক, নিজ ভরতের অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

দশরথের নিন্দা করিয়া মন্থরা মনে করিয়াছিল, তাহাতে কৈকেয়ীর রোষাবেশ হইবে; কিন্তু দাসী দেখিল ঠাকুরাণী তাহা গায়ে মাখিলেন না। কারণ, রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে যাহা অবশ্য ঘটিবার তাহা ঘটিবে, এজন্য মহিষী রাজার কোন দোষ দেখিলেন না। মহিষী ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, রামের পর ভরতের রাজত্ব আসিবে। দশরথের কথাবার্ত্তায় তিনি হয়ত তাহাই বুঝিয়াছিলেন। রাণী আরও জানিতেন যে, রামরাজত্বে কোন অসুখের কারণ হইবে না। এই বিশ্বাসে কৈকেয়ী মন্থরার কথায় তত তাতিয়া উঠেন নাই। তাতিয়া উঠা দূরে থাক, আরও বরং মন্থরাকে পরমাহ্লাদে আভরণ প্রদান করিয়াছিলেন। মন্থরা তখন আর এক উপায় দেখিল। পুত্রের অনিষ্টের কথা বলিলে কোন্ জননীর প্রাণে আঘাত না লাগে? কৈকেয়ী শুদ্ধ রাণী নহে, শুদ্ধ সপত্নী নহে, গর্ভধারিণীও বটে। জননীর স্নেহ বড় সামান্য পদার্থ নহে। এখন মন্থরা সেই জননীর স্নেহ-পূর্ণ হৃদয়ে আঘাত দিতে গেল। মন্থরা জানিত, এই তাহার অমোঘ অস্ত্র। কারণ, দাসী পরামর্শ দিয়া কৈকেয়ীকে এমনি গড়িয়া রাখিয়াছিল যে, ভরতকে শৈশবাবধি নিজ পিত্রালয়ে রাখিয়া তবে কৈকেয়ীদেবী সুখে বিশ্রাম করিতেন। শত শত সপত্নীপুরে ভরতের পিত্রালয়ে থাকা যে নিশ্চয় বিপদজনক, দাসীর পরামর্শে কৈকেয়ী তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল। সেই পরামর্শানুযায়ী এখন মন্থরা রামরাজত্বে ভরতের যে প্রাণ-নাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, তাহাই কৈকেয়ীকে অনায়াসে বুঝাইতে গেল।

তখন কৈকেয়ী একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। তাহার শরীর লোমাঞ্চিত হইল। হৃদয়ে যেন কি একটা কণ্টক বিঁধিল। কৈকেয়ী নিজ বিশ্বাসানুসারে তর্ক করিতে বসিল। বলিল, ভরতও ত ক্রমে রাজত্ব লাভ করিবে। ভরতের প্রতি রামের ব্যবহার ত কখন বিরূপ নহে। তবে কিসের আশঙ্কা?

মন্থরা রাজদাসী, রাজ সংসারে থাকিয়া তাহার রাজনীতি শিখিতে অধিক কাল যায় নাই। সুতরাং মন্থরা ভ্রম সংশোধন করিয়া বুঝাইয়া দিল, রাম ও তাহার পুত্রাদি বিদ্যমান থাকিতে ভরতের রাজ্যলাভের কখন সম্ভাবনা নাই। রামরাজত্বকালে বরং ভরতের প্রাণ নাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

কৈকেয়ী তখন ফিরিয়া গেলেন। শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। উঠিয়া মহা চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে মন্থরা, উপায়?

মন্থরা তখন ঠাকুরাণীকে পাইয়া বসিল।

যে উপায় ভাবিয়া রাখিয়াছিল, একে একে তাহা সমস্তই বলিল। বলিয়া তাহাকে তখনই ক্রোধাগারে পাঠাইয়া দিল। মন্থরা জানিত, এখন রাজা দশরথ নিশ্চয়ই এই কুহক জালে পড়িবেন। তিনি এখনি অন্তঃপুরে আসিবেন, আসিয়া রাণীর ক্রোধ অপনয়নার্থ সকলই করিতে স্বীকৃত হইবেন। রাণী কিছুতে টলিবার পাত্রী নহেন। পুত্র-বৎসলা ভরতের কল্যাণার্থ এমনি বাঁকিয়া বসিবেন, যে কিছুতেই তাহাকে কেহ টলাইতে পারিবে না। পরের নিগ্রহে তাহার মন গলিবার নহে। পরের ক্রন্দনে তাহার হৃদয় ব্যথিত হইবার নহে। পাষাণী বুকে পাথর বাঁধিয়া নিশ্চয় রামকে বনবাসে পাঠাইতে পারিবেন। এ যদি মিথ্যা হয়, তবে মন্থরার কৈকেয়ী মিথ্যা। মন্থরা যাহা ভাবিল, তাহাই ঘটিল।

রামায়ণে এই মন্থরার চিত্র অতি প্রগাঢ় বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। অতি অল্প কালে মন্থরার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যে তাহার চিত্র যে রূপ বর্ণগৌরবলাভ করিয়াছে, আর কোন চিত্রে সেরূপ হয় নাই। কবি অনেক দিনে, অনেক স্থান লইয়া সীতার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু মন্থরার চিত্র এক দিনের ঘটনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। অযোধ্যার কোন রাজরাণীর চিত্র তত উজ্জ্বল নহে, যত উজ্জ্বল মন্থরার চিত্র। কৈকেয়ী মন্থরার বর্ণরাগে হীনপ্রভ। কৌশল্যা এবং সুমিত্রার চিত্র, তদপেক্ষাও দীন। মন্থরা যখন বর্ণরাগে উদ্ভাসিতা, সীতা চিত্রের তখন রেখাপাত মাত্র হইতেছে। বসন্ত-কালের সুখময় দেশে উজ্জ্বল বৈশাখী দিনমান-গগনে একদা প্রলয়-মেঘ যে রূপ প্রগাঢ়তম বর্ণে সহসা উদিত হইয়া সকলের নয়ন আকৃষ্ট করে, এবং জগৎ-সংসারের ত্রাসোৎপাদন করিয়া দেয়, অযোধ্যার সেই রূপ হাস্যময় দেশে ও সুখময় কালে, মন্থরা প্রগাঢ় ভয়ঙ্করা মূর্ত্তিতে একদা সেই রূপ উদিত হইয়া সকলেরই শঙ্কা উৎপাদন করিয়া দিয়াছিল। অযোধ্যাবাসিগণ মন্থ-রাকে ভুলিতে পারে নাই। মন্থরা সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে আজিও সকলের মন অধি-কার করিয়া আছে। হিন্দুকুলে এমত কেহই নাই, যিনি মন্থরাকে ভুলিতে পারেন এবং এমত কেহই নাই, যিনি এই জগৎ সংসারে অনেক মন্থরাকে চিনিয়া লইতে না পারেন। মন্থরা সকলেরই মানসপটে অঙ্কিত রহিয়াছে। যে দাসীতে তাহার ছায়াপাত হয়, সেই দাসীকে অনায়াসে চিহ্নিতে পারা যায়। অযোধ্যাবাসিগণ একদিন ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া এবং আশ্চর্য্যে সহসা স্তম্ভিত হইয়া যে কুমন্ত্রণার মূর্ত্তিমতী প্রতিমাকে দেখিয়াছিল, আজিও আমরা তাহার ছায়া-মাত্র প্রতিফলিত সশরীরী কোন মন্থরাকে দেখিয়া একদা তদ্রূপ ভয়ে ভীত হই। তাহাকে ভয়ে কোটি কোটি প্রণাম করি। বাল্মীকি আমাদের মনে যে মন্থরাকে চির-দিনের জন্য আঁকিয়া দিয়াছেন, আমরা সেই মন্থরাকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করি।

রামায়ণে আমরা মন্থরা-চরিত্রের এক-দেশ মাত্র দেখিতে পাই। মন্থরা কৈকে-য়ীর সঙ্গে রাজান্তঃপুরে কিরূপে আপনাদের সুখরাজ্য গড়িয়াছিল, তাহা মন্থরা-জীবনের প্রধান অংশ। কিন্তু এ চিত্র রামায়ণে নাই। সেই সম্পদ রক্ষার্থ মন্থরা কি করিয়াছিল, রামায়ণে তাহারই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মন্থরা-জীবনের এই দুই

অংশ একত্র করিলে তবে মন্থরাচরিত্র সম্পূর্ণ হয়। রামায়ণের যাহা বিষয়ীভূত হয় নাই, বাল্মীকি তাহা গ্রহণ করেন নাই। অন্য কোন কবি তাহা গ্রহণ করিয়া একখানি সুন্দর কাব্যরচনা করিতে পারেন। রামায়ণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে প্রদর্শিত হইতেছে যে, যে অভি-প্রায়ে রামায়ণ রচিত, সেই অভিপ্রায় সিদ্ধার্থ কবি যে কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন, মন্থরা তাহার দ্বার খুলিয়া দিল। রাবণবধ রূপ মহাব্যাপার ঘটাইবার জন্য কাব্য কল্পনার যে আয়োজন হইয়াছে, মন্থরা তাহার সূত্রপাত করিয়া দিল। পাপ রূপিণী মন্থরা যাহা আয়োজন করিয়া দিল, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই, অযোধ্যার রাজ ধামে যে ধর্ম্মের শিক্ষা হইতেছিল—রাজা দশরথ ও রামচন্দ্র যে শিক্ষার অবয়বী কল্পনা—সেই ত্যাগ-পথানুষ্ঠানের—সেই কর্ত্তব্য-সাধন-ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিশিষ্ট সুযোগ ঘটিল। এক সত্য পালনার্থ, রাজা দশরথ কি না ত্যাগ স্বীকার করিলেন, তজ্জন্য তাঁহার পুত্র গেল, হৃদয়ের গ্রন্থী ছিন্ন হইল, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জিত হইল। কৌশল্যা ও সুমিত্রা কেবল পতি শুশ্রূষার্থ স্নেহময় পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া রহিলেন। সীতা কেবল পতিসেবার্থ রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া বনে গেলেন। লক্ষ্মণও রাজ্যসুখ পরি-ত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃরক্ষার্থ বনবাসে গেলেন। আবার, যার জন্য এত কাণ্ড ঘটিল, সেই কৈকেয়ী-নন্দন ভরত কি করিলেন? তাঁহার জন্য রাজ্য সিংহাসন সকলই প্রস্তুত; কিন্তু ভরত কই সিংহাসনে বসিলেন, কই রাজ মুকুট গ্রহণ করিলেন? সে সিংহাসনে রামের পাদুকা স্থাপন করিয়া তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠান মাত্র করিতে লাগিলেন। এ কি রাজসংসার! না মহর্ষির পুণ্যাশ্রম? যে শিক্ষা কেবল মহর্ষির বনবাসাশ্রমে প্রতিলব্ধ, তাহা রাজ-সংসারে কিরূপে দেদীপ্যমান! সেই সংসার-পতি রাজা দশরথ, সত্যধর্ম্ম পাল-নই যাঁহার মহাব্রত, যে সংসার বশিষ্ঠের দীক্ষায় চালিত, সে সংসার ঋষির আশ্রম না হইবে কেন? যে রাজপুত্র বিশ্বামিত্র মুনির শিষ্য, সেই পুত্রের যে ত্যাগ-স্বীকারও সত্য-ধর্ম্ম-পথেই কেবল পালনীয় হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি! মন্থরা এই রাজর্ষি-সংসারের মহাকাব্য প্রকাশ করিয়া দিল। প্রকাশ করিয়া দিল, রাজসংসারেও সত্যপালনার্থ এবং কর্ত্তব্যসাধনার্থ কঠোর ত্যাগ-ধর্ম্ম পালনীয়। এই ধর্ম্ম যেমন রাজসংসারে প্রকৃষ্ট রূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এমত কুত্রাপি নহে। রাজসংসারে ও সুখসম্পদে যে ত্যাগ ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হই-য়াছে, সেই ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্। বনে সে ধর্ম্মের দৃঢ়তা যত না হয়, রাজসংসারে সে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, পরিণামে তাহা ততোধিক সুদৃঢ় হইয়া উঠে। সুখ সম্ভো-গের মধ্যে এ ধর্ম্ম সাধিত ও পালিত হইলে তাহা এতদূর প্রবল হয়, তাহার শক্তি এত বাড়ে যে, তাহা কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। যে ত্যাগ ধর্ম্মের তেজ ততদূর, সেই ধর্ম্মই রাবণবধে নিশ্চয় কৃতকার্য্য। মন্থরা সেই ধর্ম্মের তেজ দেখাইবার আয়ো-জন করিয়া দিল। যে ধর্ম্মতেজ রামচন্দ্রে নিহিত, যে দুর্দ্দম্য শক্তি সমস্ত ভারতের বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, মহারণে সমুদ্রে, বানররাজ্যে ও দৈত্যনিগ্রহে, জয়লাভ করিয়া পাপের মহা রাক্ষসী মায়াকে

বিনষ্ট করিয়াছে, সেই শক্তির প্রভূতবল, মন্থরার মন্ত্রণায় প্রকাশিত হয়।

মন্থরার কল্পনায় রামচরিত্রের একেবারে বিরাট বিকাশ হয়। রাজসংসারে লালিত এবং পালিত হইয়াও, প্রভূত ঐশ্বর্য্য এবং সুখ সম্ভোগের মধ্যে থাকিয়াও রাম চিরদিন নির্লিপ্ত ছিলেন। আশৈশব তিনি নির্লিপ্ত। তাঁহার নির্লেপ ভাব সমস্ত রামায়ণে প্রকটিত। গৃহমধ্যে যেমন বায়ু থাকে, পদ্মপত্রে যেমন বারি থাকে, রামচন্দ্র রাজসংসারে তেমনই নির্লিপ্ত ছিলেন। রাজসুখ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই—শৈশবে নয়, যৌবনেও নয়। আর কখন্ অভিভূত করিবে? যিনি রাজসুখে নির্লিপ্ত, তিনি যে অনায়াসে সে সুখ পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি! বন ও রাজসংসার তাঁহার পক্ষে সমান ছিল। মোহ তাঁহাকে কুত্রাপি ও কখন আচ্ছন্ন করে নাই। যিনি নির্লিপ্ত, ইন্দ্রিয়-সুখ যাঁহাকে কখনই মোহিত করিতে পারে নাই, তিনিই রাক্ষসী-মায়ার উপর বিজয়ী, তিনিই ইন্দ্রিয় সুখের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ, দশেন্দ্রিয় বিশিষ্ট দশমুখ রাবণের বিধ্বংসকারী। মন্থরার কল্পনায় রামচরিত্রের এই বিশুদ্ধ নির্লিপ্ত ভাব অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হয়। এই জন্য মহাকাব্য রামায়ণে মন্থরার স্থান। মন্থরা-কাব্যের এই নিগূঢ় তত্ত্ব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

কি ক্ষতি আমার?

১

কিসে কি ক্ষতি আমার?—
না হয়, আঁধার-মগ্ন
জীবনের সুখ স্বপ্ন,
না হয়, মলিন প্রাণ আরো অন্ধকার!
না হয়, আপনা ভুলে,
পড়েছি জলধি-কূলে,
না হয়, গ্রাসিতে আসে ভীম পারাবার!—
আমিতো তোমারি, বিভো! কি ক্ষতি আমার?

২

কিসে কি ক্ষতি আমার?—
আশা ছিল, বন-বালা
গাঁথিয়া মালতীমালা,
আদরে বসন্ত-ভোরে দিবে উপহার;
আশা ছিল হৃদিতলে,
আনন্দে পরিব গলে,
মনোরম সে মালিকা, দেব-বালিকার!
সে আশা "দুরাশা" তাহে কি ক্ষতি আমার?

৩

কিসে কি ক্ষতি আমার?—
ভেবেছিনু বসুন্ধরা,
বাসন্ত কুসুম-ভরা,
আঁচলে মলয়া চলে, শিরে তারা হার;
মুখে পাপীয়ার রব,
মধুর মধুর সব!—
দেখি যে বরিষা নেছে কেড়ে সে বাহার!
জলাভূমি ধরা, তাহে কি ক্ষতি আমার?

৪

কিসে কি ক্ষতি আমার?—
ঘর বেঁধে মহাবনে,
ভেবেছিনু মনে মনে,
"আনন্দ-আশ্রম" মম সোণার আগার!

অকস্মাৎ মহা ঝড়ে,
সে ঘর ভাঙিয়া পড়ে !
মাটিতে মিশিল হায়, হয়ে চুর মার !
ভাঙিল কুটীর যদি, কি ক্ষতি আমার ?

৫

কিসে কি ক্ষতি আমার ?—
ভেবেছিনু, কাছে গেলে
দিবে সখী সুধা ঢেলে,
আঁচলে মুছায়ে দিবে তপ্ত অশ্রুধার ;
প্রাণের লুকানো ব্যথা,
ভুলাইবে স্নেহলতা,
জুড়াবে তাপিত বুক ছায়া পেয়ে তার ;
সে নয় দেখেনি চেয়ে, কি ক্ষতি আমার ?

৬

কিসে কি ক্ষতি আমার ?—
বড় সাধ ছিল মনে,
স্বরগে কমল-বনে,
পাতিব আসন মম প্রীতি-প্রতিমার,
কনক মন্দার গলে,
কনকের শতদলে,
দাঁড়ায়ে কনকলতা ছড়াবে বাহার !
পূরিল না সে কামনা, কি ক্ষতি আমার ?

৭

কিসে কি ক্ষতি আমার ?—
আমা হেরি অহর্নিশ,
অমৃতে উপজে বিষ,
পলকে নন্দন বন হয় ছার খার ;
পাইলে আমার সাড়া,
মনে করে "লক্ষ্মীছাড়া"
বিরক্ত, আতঙ্কে কেহ খোলে না দুয়ার !—
(আমার বিষাক্ত হাওয়া, দোষ দিব কার ?)

৮

কিসে কি ক্ষতি আমার ?—
প্রাণের অসীম আশা,
বলিতে যা' হারে ভাষা,
হৃদয়ের অবক্তব্য সাধ আবদার,
সেই সব বোঝা লয়ে,
চিরকাল মরি ব'য়ে,
কিছুই মুহূর্ত্ত তরে পোরে না আমার !
আমি যদি সোণা ধরি,
ছাই হয়—ভয়ে মরি !
কপাল এমনি পোড়া দীন অভাগার !—
পোড়া কপালের ভস্ম,
তাই যার "সরবস্ব,"
তার কাছে চাও কেবা, কিবা সমাচার ?—
——সে সব আমারি থা'ক
আমাতেই মিশে যা'ক,
সবি হবে এক সাথে চিতার অঙ্গার !
পর বা অপর হও,
আমা হ'তে দূরে রও,
ছুঁলেই ফুরায়ে যাবে কুবের ভাণ্ডার !
আমারে বিধির লেখা,
আমি র'ব একা একা,
টানিব ভগন বুকে শত বোঝা ভার !
একলা একটী ধারে,
কাল—চিরকাল, হা'রে !
কাটাব, লইয়া চিতা সাধ বাসনার !
জগত জাগিয়া থা'ক্,
অথবা ভাঙিয়া যা'ক্,
আমারে সে ডাকিবে না, ভাগ নিতে তার !
আমি শুধু জানি, কিসে কি ক্ষতি আমার ?

৯

কি ক্ষতি আমার বিভো ! কি ক্ষতি আমার ?
পরে বলে আমি হরি !
নিষ্ফল তপস্যা করি,
মৃত্তিকা মিলেনা মম মাথা রাখিবার !—

তা হলেও দয়াময়!
এ পরাণে নাহি ভয়,
তুমি যে আমার দেব, কোটি পুরস্কার!
সংসারের শত ঝড়,
চলুক মাথার পর,
চাহিয়া দেখিতে মম নাহি দরকার;
তোমারে, আসন পেতে
হৃদয়ে রাখিব গেঁথে,
নিতি এ জীবনটুকু দিব "উপহার";
তব দত্ত সুখ দুখ,
তাহে ভরা মম বুক,
ভাবিলে পুলকে নাথ! বাঁচিনা যে আর,
সে তুমি আমারি, "ক্ষতি" কোথায় আমার?

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

ব্রহ্মের অপবাদ।

সকলেই স্ব স্ব অভীপ্সিত মার্গে সুখে অবস্থিতি করিতেছে, উপদেশ-কুশল শ্রেষ্ঠতর বাগ্মীরা নানা প্রকার যুক্তি ও উদাহরণের দ্বারা রুচির পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া তাহাদিগের প্রবৃত্তিকে মার্গান্তরে পরিচালিত করিতেছেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপদেশ চিরকালই অজ্ঞদিগের শিরোধার্য্য, কিন্তু বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহ বশতঃ, অমূল্য উপদেশ সকল রুচির অনুকূল না হওয়াতে সময় সময় প্রতিহত হইয়া যাইতেছে।

যে বিষয় যিনি অত্যন্ত উত্তম রূপে অবগত, সেই বিষয়ে তিনিই প্রকৃত উপদেষ্টা। সেই উপদেষ্টা লক্ষণের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তন করিয়াই যে সকলে শ্রোতৃসমাজে অবতরণ করিয়া থাকেন, এরূপ নহে। পূর্ব্বে, লিখিবার বা বলিবার পূর্ব্বে, বক্তব্য বিষয়ের প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ বলিবার প্রথা ছিল। এক্ষণ সে রীতি উঠিয়া যাওয়াতে, আমার ন্যায় অনেকে জিগীষোপহত হইয়া বৃথা মুখ ব্যাদান বা লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন। কাল দোষে উপদেশ্যের অপেক্ষা উপদেষ্টার সংখ্যা অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে; লোকের উপকার যত হউক বা না হউক, আমরা বলিতে পারিয়াই কৃতার্থ। লোকে আগ্রহ করিয়া আমার কথা শুনিতেছে কি না, সে তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি নাই, শিশুকে জোর করিয়া দুদ খাওয়াইবার মত আমি কল্যাণ বর্ষণে বদ্ধপরিকর।

এরূপ অবস্থায় উপদেশ্যগণ স্বভাবতঃ কেহ কেহ স্তম্ভিত ও কেহ কেহ একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এই সকল স্বচ্ছন্দজাত গুরুদিগের হাত হইতে আমাদিগের পরিত্রাণের উপায় কি? যে সকল গুরু কোন প্রতিদান না পাইয়া, কোন প্রত্যাশা না করিয়া, বচনামৃত-সিঞ্চনে ব্যাকুল, তাঁহারা বস্তুতঃ সাধারণের সময়াপহারী সখের গুরু কি না, ইহা ইদানীং একটা গুরুতর বিবেচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ঈশ্বর চিরকালই দিল্লীর লাড্ডু, কিন্তু লাড্ডু হইয়াও তিনি উত্তমরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। কারণ, আমরা সর্ব্বদাই নিরাপদে তাঁহার প্রতি বাণ বর্ষণ করিতেছি। সংপ্রতি আমরা এক জন আবিষ্কার করিয়াছি এবং তাঁহার অনুকূলে কোন প্রথিত নামা মনীষীর উক্তি দর্শাইতে পারিয়াছি যে, "ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান

বলিয়া প্রচার থাকিলেও, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাতে সর্ব্বশক্তির সত্তা নাই। তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সম্বন্ধে সর্ব্বশক্তিমান হইলেও আত্মস্বরূপের অন্যথা করিতে পারেন না।”

সর্ব্বশক্তিমান শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে, “সৃষ্টি লীলা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার সীমা নাই, কিন্তু তাঁহার আত্মস্বরূপ বিনাশ করিবার ক্ষমতা আছে, এরূপ স্বীকার করিলে ঈশ্বরে, ঈশ্বরত্ব থাকে না, এমন কি নাস্তিক হইতে হয়।”

যাঁহাকে ইউরোপীয়েরা গড বলিয়া উপাসনা করেন, মুসলমানেরা আল্লা বলিয়া ভজনা করেন, হিন্দুরা ঈশ্বর বলিয়া সেবা করেন, তিনিই বক্তার উপাস্য দেবতা হইলে, ইহা নিশ্চয়ই একটা লোমহর্ষণজনক আবিষ্কার! এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন জাতি ইহা অবগত আছে কি না, সন্দেহ!!!

পাশ্চাত্যগণ ভ্রমে পড়িয়া তাঁহাকে অমনিপোটেণ্ট নাম দিয়াছেন, মুসলমানেরা আল্লাহো আকবর বলিয়া বৃথা তাঁহার আজান দেন, এই সকল লোকেরা এই অভিনব আবিষ্কার শুনিলে পুলকে আমাদের বাড়ীতে পুরস্কার দিতে আসে কি না, তাহারই বা নিশ্চয় কি? যাঁহারা মোহ বশতঃ ভগবানকে প্রাণের সহিত সর্ব্বময় বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মনে আজ বজ্রাঘাত উপস্থিত হইয়াছে; আর যদি বক্তার নিজের ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এরূপ হয়েন, তবে আমরা সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ইনি ঋষিদিগের বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নহেন, কারণ “হেয়ত্বাবচনাচ্চ” সূত্রের দ্বারা তাঁহারা ভগবানের কোন হেয়ত্বসূচক বাক্য বেদে পান নাই বলিয়া জানা যায়।

কোন ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে ২য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটে অবনত করিলে তাহার ক্ষোভের সীমা থাকে না। আমরা যাহা করি, তাহা যদি ব্রহ্মের জানিবার ক্ষমতা থাকে, তবে তিনিও আজ সর্ব্বশক্তিমান্ পদ হারাইয়া ঘোর শোকে মগ্ন, করিবেন কি? তাঁহার দেহ নাই, আমরা বাক্‌ লেখনী সম্পন্ন দেহবান্ বীর, নিরাকার তিনি, তাঁহার কি সাধ্য আমাদিগকে প্রকৃতিস্থ করেন!

ঈশ্বর ত এইরূপ হইলেন; তাহাতে কতকগুলি বিষয় বিবেচ্য আছে। তিনি যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান ও অনন্ত বলিয়া বিখ্যাত, তখন এই সৃষ্ট্যাদি হইতেছে কোথায়? তাঁহার সেই নিজের অপরূপ গায়ের উপর, না গায়ের বাহিরে? আর এই সৃষ্ট্যাদি হইতেছে কি উপাদান দ্বারা? যে উপাদান দ্বারা তাঁহার অপূর্ব্ব নিজ দেহ গঠিত, তাহাই দিয়া, না যাহা তাঁহাতে সূক্ষ্মরূপেও কখনও ছিল না, তাহা দিয়া? “একমেবাদ্বিতীয়ং” “সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম” এ সকল উক্তির অর্থ কি? ইহা কি ঋষিদিগের প্রলাপ না বাক্‌জাল? “অনবস্থিতের সম্ভাবাচ্চ নেতবঃ” বেদান্তের এ সূত্রের অর্থ কি?

আমার মস্তকে যাঁহারা চরণ সমর্পণ করেন না, এরূপ পণ্ডিতগণের যুক্তি প্রতিহত হইয়াছে, সুতরাং আমি আর ইহাতে কি বলিব? যিনি সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ, যিনি দেশ কাল স্বরূপতঃ অনন্ত, যাঁহার জ্ঞানের কেশাগ্রের শতভাগের এক ভাগ পাইয়াছি বলিয়া আজ শিশুর কোলে বসিয়া বাবার দাড়ী উপড়াইবার ন্যায় তাঁহার শক্তি সকল অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, আমাদের বাতুলতায় তাঁহার কিছুই আইসে যায় না।

সাত্ত্বিকভাবেতে যিনি প্রকাশ স্বরূপ, রাজসিক ভাবেতে যিনি ক্রিয়াস্বরূপ ও তামসিক ভাবেতে যিনি অর্থস্বরূপ, সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের হৃৎসরোজ বিহারীর বালকের উপহাসে হানি কি? পিতৃদত্ত অস্ত্রের দ্বারা কোন পুত্র যেরূপ পিতৃহত্যা করে, তেমনি আমরা আজ তাঁহারই বিচারশক্তি দ্বারা তাহারই অক্ষমতা সকল আবিষ্কার করিতেছি। আমাদের ন্যায় দুর্বিনীত ভক্তের তিনি চিরকালই দুষ্প্রাপ্য। গুণ হইতে উত্থিত শরের ন্যায় নিজ দোষেই আমরা ক্রমশঃ তাহা হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছি।

গিরিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র যেমন গিরি না ভগ্ন করিয়া ক্ষেপককেই আহত করে, তদ্রূপ, সেই বিশ্বপিতার দোষ অন্বেষণ করিয়া আমরাই মরিতেছি, তাঁহার কিছুই হইতেছে না। এই প্রকার অক্ষমতা নির্দ্দেশ দ্বারা ব্রহ্মের মহিমার লাঘব করা হয় কি না, তাহা প্রত্যেকের আত্ম প্রত্যয়-সিদ্ধ। নিম্ব খাইয়া যদি কেহ বলেন, ইহা আমার চিনির ন্যায় মিষ্ট লাগিতেছে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সত্যবাদী হইলেও, আমরা তাঁহাকে রোগাক্রান্ত বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারি, সর্ব্বশক্তিমত্তার স্থানে অসর্ব্বশক্তিমত্তা স্থাপিত হইলে যদি তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হয়, তবে পণ্ডিতকে মূর্খ সাব্যস্ত করিতে পারিলে তাহার স্তব হয় না কেন? যশোলিপ্সার পাল তুলিয়া দিয়া আমরা যে কোন্ তামস সাগরে যাইতেছি, তাহার ঠিকানা নাই। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এ উপদেশের যদি কোন সার থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই আমাদের ন্যায় বিকৃত মস্তিষ্ক পথভ্রষ্ট দুর্ব্বলদিগের জন্য।

আমাদের সামর্থ্য যদিও গণ্ডূষ মধ্যস্থ সফরীর ন্যায়, তথাপি আর একটা গুরুতর বিষয় চিন্তা করা উচিত যে, জ্ঞানের সহিত শক্তির সম্বন্ধ কি, তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান নহেন বলিলে তাহার সর্ব্বজ্ঞতার হানি হয় কি না। ঋষিরা বলেন শক্তি "শক্তিমতোরভেদ" কিন্তু ঋষিদিগকে তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ত আমরা সকলে প্রস্তুত নহি। তবে ইহা আমরাও বিচার দ্বারা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিতেছি যে "আমি নাই" "আমি কিছুই জানিনা" "আমি পরিমিত" "আমি দুঃখী" এই সকল জ্ঞান অসর্ব্বশক্তি সম্পন্ন ঈশ্বর ধারণ করিতে অপারগ, অতএব সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহাতে থাকিতে পারিতেছে না। তিনি চির জ্ঞানময়, কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানময় কি খণ্ড জ্ঞানময়, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। খণ্ড জ্ঞানময় হইলে যে অনন্ত জ্ঞানময় হইতে পারেন না, ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদী সম্মত হইতে পারে। যাহা হইতে সর্ব্বশক্তিমত্তা সর্ব্বজ্ঞতা পলায়িত, এরূপ খঞ্জ ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে লোকের প্রবৃত্তি হইবে কেন? এরূপ ঈশ্বর মুক্তি প্রদান করিতে পারেন কিরূপে? যে যে অবস্থায় আমরা মূর্খতার পঙ্কে ডুবিয়া রহিয়াছি, ঠিক সেই সেই অবস্থায় নিজে না নামিতে পারিলে তুলিতে পারাও তাহার পক্ষে কঠিন দেখিতেছি। গীতার "যে যথা মাংপ্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং" এ উক্তিও ত হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে দেখিতেছি।

তিনি যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে সর্ব্বশক্তিমান তাহা কিরূপ? আমরা শুনিয়াছি, ঐ ৩টী ব্যাপার ভিন্ন তাহার আর কোন কাজই নাই, উহা দ্বারাই তাহার সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রমাণিত হইয়া থাকে। ঋষিরা বেদান্তে "সর্ব্বধর্ম্মোপ পত্তেশ্চ" দ্বারা তাহার

সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার করিয়াছেন। জীব কখনও ব্রহ্ম হইতে পারেন না, ইহাও একটী নূতন কথা, কিন্তু জীব কি তপস্যা প্রভৃতি আচার দ্বারা উন্নতিও করিতে পারেন না? এক জন পৌত্তলিক সমাজের কোন ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ দ্বারা জীবনের মার্গান্তর যদি আশ্রয় করেন, তাহাতে তাহার উন্নতি করা হইল বলা যাইতে পারে কি না? যদি জীবের কোন উন্নতির অবস্থা স্বীকার করেন, তবে সেই উন্নতি কত দূরে গিয়া থামিবে, তাহার একটা দুর্লংঘ্য সীমা আমাদিগকে দেখাইয়া দিউন। আর সেই সীমার রচয়িতা, রক্ষক ও প্রযোক্তা কে? বেদান্তের "মুক্তোপসৃপ্যত্ব ব্যপদেশাৎ" সূত্রের অর্থ কি?

পরমেশ্বরকে আমরা দয়াময় বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু দয়ার সঙ্গে বাধিয়া কি কি গুণ সমাগত হয়, তাহা আমরা বুঝি না। উঁহা তপোবল আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বয়ং কেহ বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারিলে শুদ্ধ তত্ত্বময় শঙ্করকে অবমাননা করিতাম না।

ধ্যান সম্বন্ধে ইদানীং নানা প্রকার কথা শুনিতে পাই। আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেন, স্থূল ধ্যান অপেক্ষা সূক্ষ্ম ধ্যান সহজ, কিন্তু চন্দ্রমৌলির ন্যায় ধ্যানতত্ত্ব বিশারদ সাধনা-প্রবীণ ধীর মহাপুরুষ ত্রিজগতে কে আছেন? তিনি বলিয়াছেন—

মহানির্ব্বাণ

"ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্বরূপারূপ ভেদতঃ
অরূপং তব যদ্ধ্যানং অবাংমনসগোচরং
অব্যক্তং সর্ব্বতোব্যাপ্তমিদমিথং বিবর্জ্জিতং
অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রৈর্বহু সমাধিভিঃ
মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভিষ্ট সিদ্ধয়ে
সূক্ষ্ম ধ্যান প্রবোধায় স্থূল ধ্যানং বদামিতে॥"

গীতায় ভগবান বলেন—

ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামব্যক্তা সক্তচেতসাং
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখ দেহ বদ্ভিব্ বাপ্যতে।

শিবগীতায় শিব বলেন—

এবং মনঃ সমাধায় সংযতোমনসিদ্ধিজঃ
অথ প্রবর্ত্তয়েচ্চিত্তং নিরাকারে পরাত্মনি!

ভগবতী গীতায় বলেন

"তস্মাৎস্থূলং হিমেরূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বমাশ্রয়েৎ"

এইত শাস্ত্র, জানিনা ইঁহারা ভ্রান্ত, কি প্রাচীন মহাত্মারা ভ্রান্ত। তাঁহারা উপস্থিত থাকিলে আজ আমাদের বক্তৃতা শুনিয়া নিশ্চয়ই বলিতেন "অমৃতং বাল ভাষিতং।" মূর্খ আমরা সেই সকল শাশ্বত পুরুষগণের নিকট বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করি।

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন ? (২)

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় নীতি সম্বন্ধেও ক্রমোন্নতি প্রতিপন্ন হইয়াছে। কোন কোন সুপণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মানবজাতির ইতিবৃত্তে নীতির ক্রমোন্নতি দেখিতে পান না। তাঁহারা বলেন, প্রাচীন কালে নীতি সম্বন্ধে যে অবস্থা ছিল, এখনও তদনুরূপ। কিন্তু অভিনিবিষ্ট চিত্তে জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে, এ কথা সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না। এস্থলে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে। তথাচ নীতির যে ক্রমোন্নতি হইতেছে, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন

করিতেছি। হার্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণ অসভ্য জাতি সকলের বিবরণ হইতে ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, মনুষ্যের আদিম অবস্থায় দাম্পত্যসম্বন্ধ ছিল না। বিবাহের প্রথা সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে প্রচলিত হইয়াছে। স্পেন্সর এত দূর পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অনেক আদিম অবস্থার নর নারীর মধ্যে সম্পর্কবিরুদ্ধ স্ত্রীপুরুষসহযোগ দোষ বলিয়া গণ্য ছিল না বা হয় না। বিবাহপ্রথা ও তৎসম্বন্ধীয় নীতি মানবের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিকসিত হইয়াছে। স্পেন্সর প্রদর্শন করিয়াছেন যে, প্রথমে বিবাহ প্রথা ছিল না। তৎপরে ক্রমোন্নতির ফলস্বরূপ নরনারী উভয়জাতিসম্বন্ধেই বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত হইল। ক্রমে অধিকতর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এক স্ত্রী বা এক পুরুষে দাম্পত্য সম্বন্ধ বদ্ধ হইতে লাগিল। সভ্যতার গতি, এক ব্যক্তির সহিত বিবাহ বন্ধনের দিকে। এক্ষণে সুসভ্য জগতে বহু বিবাহ প্রথা প্রায় প্রচলিত নাই। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই একগত হইয়া দাম্পত্যসম্বন্ধ রক্ষা করেন। মহাভারতের শ্বেত কেতুর গল্প স্পেন্সরের কথা সমর্থন করিতেছি।

প্রাচীন রোমনগরে যে গ্ল্যাডিয়েটরদিগের খেলা ছিল,—দুর্ভাগ্য ক্রীতদাসগণ বাধ্য হইয়া ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইত,—উহা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গেল। একজন সাধু খ্রীষ্টিয়ানের আত্মত্যাগে এই ভয়ঙ্কর কদাচার চিরদিনের জন্য পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা গ্লাডিয়েটারের খেলায় আমোদ পাইতেন,—উহা নীতি বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া স্বপ্নেও মনে করিতেন না,—এক্ষণে তাঁহাদেরই বংশসম্ভূত নরনারীগণ ইতিহাসে উহার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠেন, সংসার হইতে এই অমানুষিক কার্য্য উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

যে দাসত্ব প্রথা মহাপাপ বলিয়া সুসভ্য জগৎ হইতে বিদূরিত হইয়াছে,—মনুষ্য আপনার স্বাভাবিক স্বাধীনতাবিবর্জ্জিত হইয়া, ক্রীতদাস হইয়া, গো মেষের ন্যায় মনুষ্যের সেবা করিবে, ইহা বর্ত্তমান সুসভ্য জগতের চক্ষে নীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ, একান্ত গর্হিত কার্য্য। কিন্তু দাসত্ব প্রথা,—মনুষ্যকে ক্রীতদাস করিয়া রাখা যে অন্যায় কার্য্য, ইহা প্রাচীন কালে কোন দেশে কেহই মনে করিতেন না। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে বিন্দু বিসর্গও দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং অনেক স্থলে উক্ত প্রথার স্বপক্ষে অনেক কথা দেখা যায়। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রধান প্রচারক মহাত্মা সেণ্টপল, একজন ক্রীতদাস খ্রীষ্টিয়ান হইলে তাহাকে তাহার প্রভুর নিকট গমন করিতে পুনর্ব্বার আদেশ করিয়াছেন। সেণ্ট পলের ন্যায় একজন মহাপুরুষের মুখ হইতেও দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে একটী শব্দও নির্গত হয় নাই। কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেও দাসত্ব প্রথার নিন্দা করিয়া কোথাও কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান্ সময়ে সুসভ্য জগৎ দাসত্ব প্রথাকে যে একান্ত অন্যায় ও নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছে; ইহা মানবের ইতিবৃত্তে নীতি সম্বন্ধীয় উন্নতির একটী উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

ইতিহাস আলোচনা করিলে মানবজাতির নৈতিক জ্ঞানের উন্নতি বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না! অন্য প্রকারেও এ বিষয়ের

বিচার করা যাইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ স্পেন্সর সাহেবের রচিত নীতিবিজ্ঞান বিষয়ক একখানি পুস্তকে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, মানবের অন্যান্য বিষয়ে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার নৈতিক উন্নতিও সংসাধিত হইয়াছে। নৈতিক উন্নতি প্রতিপন্ন করিবার জন্য স্পেন্সর একটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা কিছু নীতিবিরুদ্ধ, তাহাই সমাজের অহিতকর। সুতরাং সমাজ অনেক স্থলে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে বাধা দিয়া আসিতেছে, চিরদিনই চৌর্য্য, হত্যা, প্রতারণা, পরদারগমন প্রভৃতি প্রধান প্রধান দুষ্কার্য্যের শাসন করিতেছে। প্রকৃতির নিয়ম এই, যাহা ক্রমাগত বাধা পায়, তাহার বর্দ্ধনের ব্যাঘাত হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। যে সকল নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য স্পষ্টভাবে জনসমাজের ক্ষতি করে, জনসমাজ স্বভাবতঃ তাহার বাধা দেয়, —তাহার শাসন করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং প্রধান প্রধান নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য ক্রমাগত বংশ পরম্পরায় বহুকালে ক্ষীণ হইয়া পড়িবেই পড়িবে। নীতিবিরুদ্ধ সুতরাং সমাজবিরুদ্ধ প্রবৃত্তি সকল সাধারণতঃ প্রশ্রয় পাইতেছে না। প্রত্যুত ক্রমাগত বাধা পাইতেছে। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সে সকল ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া যাইবেই যাইবে। অল্প দিনের মধ্যে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। কিন্তু বহুকালে, পরিণামে দুষ্প্রবৃত্তি ও দুষ্প্রনীতির হ্রাস একটী নিসংশয় সত্য।

দুর্নীতি যেমন ক্রমশঃ হ্রাস হইবেই হইবে, সেইরূপ সুনীতিও নিশ্চয় উন্নতি লাভ করিবে বা করিতেছে। যেমন, যাহা বাধা পায় তাহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়, সেই রূপ, যাহা উৎসাহ পায়, তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল হয়। একটি বৃক্ষ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিলে ক্রমে শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায়; অনুকূল অবস্থার মধ্যে থাকিলে উহা উন্নত ও বর্দ্ধিত হয়। সেই রূপ, মানবের যে সকল প্রবৃত্তি ও তজ্জনিত ব্যবহার বাধা ও প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয়, পদে পদে সামাজিক শাসনে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া যায়। আর যে সকল প্রবৃত্তি ও তজ্জনিত ব্যবহার জনসমাজের নিকট হইতে উৎসাহ পায়, তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও উন্নত হইতে থাকে। সৎপ্রবৃত্তি ও সৎকার্য্য জনসমাজের পক্ষে হিতকর। সুতরাং জনসমাজ উহার আদর করে। সৎকার্য্যশীল ব্যক্তিকে উৎসাহ দেয়। সুতরাং নৈতিক প্রবৃত্তি বা জনসমাজের পক্ষে হিতকর প্রবৃত্তি ক্রমশঃ উৎসাহ ও আদর প্রাপ্ত হইয়া উন্নত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পরস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হও, জনসমাজ তোমার প্রতি খড়্গহস্ত হইবে। পরোপকার ব্রত অবলম্বন কর, সকলে তোমাকে আদর করিবে, তোমার কার্য্যে উৎসাহ দান করিবে। সাধারণতঃ দুর্নীতি ও সুনীতি সম্বন্ধে এই প্রকার হইয়া আসিতেছে। সুতরাং প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়া দুর্নীতির গতি বিনাশের দিকে, সুনীতির গতি উন্নতির দিকে। বহু কালে (in the long run) পরিণামে সুনীতির জয় ও দুর্নীতির পরাজয় হইবেই হইবে। সত্যযুগ আমাদের পশ্চাতে নহে,—সম্মুখে। দুর্নীতি ক্রমশঃ কমিতেছে, সুনীতির উন্নতি হইতেছে, ইহা ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মের ফল। সুতরাং অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় নীতি সম্বন্ধেও পরমে-

...রে মঙ্গলাভিপ্রায় সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন ...তেছে।

পরমেশ্বর এই তিন প্রকারের কোন ...কার অবশ্য হইবেন। হয় তিনি নিষ্ঠুর ...তুল্য উদাসীন, নতুবা দয়ালু। জগৎ-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলা কি সঙ্গত হয়? যখন তিনি জগৎকে এমন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এমন ভাবে চালাইতেছেন যে জগৎ ক্রমশঃই কল্যাণের দিকে ধাবিত হইতেছে তখন কেমন করিয়া বলিব যে তিনি নিষ্ঠুর? তাঁহাকে কি উদাসীন বলিতে পারি? যখন দেখিতেছি যে, এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্য সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইতেছে, কোন বিষয়ের শৃঙ্খলা বা নিয়ম সম্বন্ধে কোন ত্রুটি লক্ষিত হয় না,—আশ্চর্য্য সুপ্রণালীতে সমগ্র জগতের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তখন তাঁহাকে উদাসীন কেমন করিয়া বলিব? অতি ক্ষুদ্র কীটাণু, যাহার কোটী কোটীটা একত্র হইলে একটা বালুকা কণাও হয় না, যিনি তাহাদেরও প্রত্যেকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাহাদের অতি ক্ষুদ্র দেহের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সুনিয়মে পরিচালিত করিতেছেন, তাহাদিগকেও সুনিয়মে আহার যোগাইতেছেন, তাহাদেরও সুখসাচ্ছন্দের উপায় বিধান করিতেছেন, তখন কেমন করিয়া তাঁহাকে উদাসীন বলিব? হয় তিনি নিষ্ঠুর, নতুবা উদাসীন, নতুবা দয়ালু। কিন্তু তাঁহাকে নিষ্ঠুর ও উদাসীন বলা যখন যুক্তিযুক্ত হইল না, তখন তাঁহাকে দয়াময় বলিতেই হইবে।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, তাঁহাকে দয়াময় বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার দয়া যে অসীম, এরূপ প্রমাণ হয় না; তাঁহার দয়ার সীমা থাকিতে পারে। একথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। পরমেশ্বর বলিলেই জগতের আদিকরণ বুঝায়। সকল কারণের কারণ, মূলকারণ যিনি, তাঁহাকেই আমরা জগদীশ্বর বলি। সকলই তাঁহা হইতে আসিয়াছে। তিনি কারণ, আর সকলই কার্য্য। সুতরাং সকলই তাঁহার অধীন, তিনি কাহারও অধীন নহেন। তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁহার শক্তিতে সকল পদার্থের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে। তিনি আদিকারণ অর্থাৎ সকলের মূলে; সকলই তাঁহার কার্য্যরূপে তাহার পরে তাঁহা হইতে উৎপন্ন। তাঁহার অগ্রে কিছু নাই। সুতরাং এমন কিছু নাই, যাহা তাঁহাকে বাধা দেয়, তাঁহার শক্তিকে প্রতিহত করে, সীমাবদ্ধ করে। কেবল শক্তি বলিয়া কেন, এমন কিছুই থাকিল না, যাহা তাঁহার কোন স্বরূপলক্ষণকে বাধা দেয় বা সীমাবদ্ধ করে। সীমাবদ্ধ আদি কারণ, ত্রিকোণবৃত্তের ন্যায় অসম্ভব কথা।

জগতে এমন অনেক দুঃখ যন্ত্রণা আছে, যাহার মধ্যে আমরা মঙ্গলময়ের মঙ্গলাভিপ্রায় বুঝিতে পারি না। আমাদিগের ক্ষুদ্র পরিমিত বুদ্ধিতে জগতের সকল কার্য্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা কখনই সম্ভব নহে।

এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড একটী আশ্চর্য্য যন্ত্র। ইহার সকল অংশের সহিত সকল অংশের সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহার সকল অংশের সহিত সকল অংশ সম্বদ্ধ। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাহা অল্পই প্রকাশিত হয়। কত যোজন দূরে চন্দ্র, অথচ তাহার

শক্তিতে নদী সমুদ্রে জোয়ার উপস্থিত হইতেছে। কত যোজন দূরে চন্দ্র, অথচ তাহার সহিত নরদেহের কেমন নিকট সম্বন্ধ। জ্বর ও বাত রোগে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় কষ্ট ভোগ করিতে হয়। চন্দ্র ত আমাদের কত নিকটে। অচিন্তনীয় দূরবর্ত্তী নক্ষত্রেরও সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই সম্বন্ধ বিজ্ঞান কিছু কিছু আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন। কিন্তু মনুষ্য এপর্য্যন্ত যাহা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা অতি সামান্য। এই সামান্য জ্ঞান লইয়া জগদীশ্বরের কার্য্যের সমালোচনা করা কি সামান্য স্পর্দ্ধার কথা! কোন মূর্খ লোক কোন কলের একটা চক্র দেখিয়া যদি বলে, ঐ চক্রটা কলের এই স্থানে না থাকিয়া ঐ স্থানে থাকিলে ভাল হইত, তবে তাহার কথা নির্ব্বোধের অসার কথা বলিয়া কি অগ্রাহ্য হইবে না? সেইরূপ জগৎ কার্য্যের সমালোচনা করিতে গিয়া যাঁহারা বলেন, ইহা এই রূপ না হইয়া ঐ রূপ হইলে ভাল হইত, তাঁহাদের কথাও কি অসার বলিয়া অগ্রাহ্য হইবার যোগ্য নহে? যদি একটী সুন্দর ছবির এক অংশ হস্ত দ্বারা ঢাকিয়া অপর অংশ আপনাদিগকে দেখাই, তাহা হইলে কি আপনারা বলিতে পারেন যে ঐ ছবিটী কেমন? সামঞ্জস্যে সৌন্দর্য্য হয়। সুতরাং ছবিটীর সকল অংশের সামঞ্জস্য অনুভব করিতে না পারিলে, উহার সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারা সম্ভব নহে। সেইরূপ জগৎ কার্য্যের প্রত্যেক অংশের সহিত প্রত্যেক অংশের সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য যখন আমরা বুঝি না, তখন জগৎকার্য্যের সমালোচনা করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করিতে সাহস করা কি মহানির্ব্বোধের কার্য্য নহে?

আংশিক দর্শনে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। জগৎ-কার্য্য সম্বন্ধে আমরা অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র দেখিতে পাই। সুতরাং জগৎ-কার্য্য সম্বন্ধে মানবের জ্ঞান অতি সামান্য মাত্র। নিকটে হস্তী আসিয়াছে শুনিয়া পাঁচ জন অন্ধ হস্তী দেখিতে গেল। অন্ধ কেমন করিয়া হস্তী দর্শন করিবে? তাহারা হাত বুলাইয়া হস্তী দেখিল। তৎপর স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিল, বল দেখি ভাই, হস্তী কেমন দেখিলে? কেহ বলিল হস্তী স্তম্ভের মত, কেহ বলিল হস্তী চামরের মত, কেহ বলিল কুলার মত, এবং কেহ বলিল হস্তী ঢাকাই জালার মত। এইরূপ মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের মধ্যে ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হইল, প্রত্যেকে আপনার মতকে নিশ্চয় সত্য জানিয়া উৎসাহের সহিত তর্ক করিতে লাগিল। বাস্তবিক কথা এই, প্রত্যেকেরই আংশিক দর্শন। সুতরাং কেহই প্রকৃত জ্ঞানে উপনীত হইতে পারে নাই। যে হস্তীর পদ দেখিয়াছে, সে বলিতেছে, হস্তী স্তম্ভের মত, যে লাঙ্গুল দেখিয়াছে, সে বলিতেছে চামরের মত, যে কর্ণ দেখিয়াছে, সে বলিতেছে কুলার মত এবং যে উদর দেখিয়াছে, সে বলিতেছে, ঢাকাই জালার মত। বাস্তবিক হস্তী উক্তরূপ কোন পদার্থের মতই নহে। যিনি হস্তীর সকল অংশই দর্শন করেন, হস্তীর আকার সম্বন্ধে তাঁহারই প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়। উদর কর্ণ প্রভৃতি কোন একটী বিশেষ অঙ্গ দেখিলে সেই বিশেষ অঙ্গের জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু হস্তীর আকার কেমন তাহা কেহ জানিতে পারে না,

...র আকার কেমন, এ প্রশ্নের প্রকৃত ...র দিতে পারে না। জগৎ-কার্য্যের ...দপি ক্ষুদ্রাংশ দর্শন করিয়া উহার দোষ ... বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে ...ান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। ইহা ভাল হয় ...ই, উহাতে ত্রুটি হইয়াছে, ভগবানের কার্য্য ...ন্ধে এইরূপ মতামত প্রকাশ করা ক্ষুদ্র ...ুষ্যের পক্ষে নিতান্তই বেয়াদবি।

পরমেশ্বর আমাদিগের পশ্চাৎ দিকে ...ইটা চক্ষু দিলেন না কেন—তাহা হইলে ...ম্মুখে যেমন দেখিতে পাইতেছি, পশ্চাতেও সেইরূপ দেখিতে পাইতাম? বিজ্ঞান আলোচনা করিতে গিয়া কেহ বলিতে পারেন, ঐ বিশেষ গ্রহটা ঐ বিশেষ পথে না চলিয়া অন্য পথে চলিলে ভাল হইত। ক্ষুদ্র অজ্ঞান মনুষ্যের পক্ষে বিশ্বকার্য্যের এইরূপ সমালোচনা, এইরূপ অর্থশূন্য স্পর্দ্ধা নিতান্তই হাস্যজনক।

ক্ষুদ্র কীটানুকীট মনুষ্য! তুমি এ অনন্তের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র দেখিয়া তাঁহার সৃষ্টি লীলার প্রকৃত মর্ম্ম কি বুঝিবে? ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অংশের সহিত প্রত্যেক অংশের যোগ। কোটী কোটী যোজন দূরে যে নক্ষত্র, তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ। এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডযন্ত্রের প্রত্যেক অংশের সহিত প্রত্যেক অংশের সম্বন্ধ না বুঝিয়া যন্ত্রের ক্রিয়া সম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার তোমার অধিকার কি? যখন তুমি জগৎকার্য্যের এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রাংশেরও প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পার না, তখন কোন্ সাহসে পরমেশ্বরের কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিতে যাও?

মানুষ না বুঝিয়া এমন অনেক কথা বলে, যাহাতে ঘোরতর নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ হয়। কিন্তু জগতের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া চির প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কি বলিয়াছেন? মহা জ্ঞানী সক্রেটিস বলিতেন, "আমি কেবল এই বুঝি যে কিছুই বুঝি না।" মহা বৈজ্ঞানিক নিউটন কি বলিয়াছেন? বলিয়াছেন, "আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমিতে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি, কিন্তু জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে"।

সৃষ্টিকার্য্য সম্বন্ধে আর একটী কথা এই যে, উহা এখনও পরিণত অবস্থায় উপনীত হয় নাই। বিজ্ঞান বলিতেছে যে, জগতের সংগঠন কার্য্য এখনও চলিতেছে, সৃষ্টি কার্য্য শেষ হয় নাই, পরমেশ্বরের সৃষ্টি লীলা ক্রমাগত চলিতেছে। সুতরাং উহার সমালোচনা সম্ভব নহে। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই অপূর্ণ ও অভাববিশিষ্ট হইবে। তবে পরমেশ্বর সৃষ্ট পদার্থকে উন্নতিশীল করিতে পারেন। তাহাই তিনি করিয়াছেন। জগৎ যখন আদিম অবস্থায় বাষ্পাকারে অসীম শূন্যে ঘূর্ণায়মান্ হইতেছিল, যদি কেহ সেই সময়ে জগতের অবস্থা দেখিত, সে কি ভ্রমেও মনে করিতে পারিত যে, সেই জগৎ বর্ত্তমান্ সুন্দর সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন সুকৌশল বিশিষ্ট প্রাণ ও জ্ঞানপূর্ণ জগৎরূপে পরিণত হইবে? সেইরূপ এখন জগতের যে অবস্থা, তাহা দেখিয়া কেহ কি বুঝিতে পারে যে, ভবিষ্যতে,—শত কোটী বৎসর পরে— ইহার কেমন অবস্থা হইবে? স্থপতি যখন কোন অট্টালিকার কিয়দংশমাত্র গঠন করিয়াছে, তখন সমগ্র অট্টালিকা সম্বন্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া, চিত্রকর যখন কোন ছবির কিয়দংশ মাত্র অঙ্কিত করিয়াছে, তখন সমুদায় ছবিটী সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা, যেমন অসঙ্গত ও অযৌক্তিক, সেইরূপ এই অসম্পূর্ণ, অপরিণামপ্রাপ্ত, অথচ

উন্নতিশীল জগতের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া কি সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ নহে? উন্নতিশীল বিষয়ের ভাবী অবস্থা না জানিয়া কেবল বর্ত্তমান্ দেখিয়া তাহার সমালোচনা করা নিতান্তই অসঙ্গত।

যে সকল বিশ্বাসী ভক্তজন মানবজীবনে বিধাতার হস্ত দর্শন করেন, তাঁহারা কোন আপাতপ্রতীয়মান্ অমঙ্গল দেখিলে মনে করেন যে, মঙ্গলময় পুরুষ তাহা হইতেই ভবিষ্যতে মঙ্গল উৎপন্ন করিবেন। পরমেশ্বরের কৃপায় অমঙ্গল হইতে মঙ্গল উৎপন্ন হয়, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। ভাবী বিষয় সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ বলিয়া তাহা দেখিতে পাই না।

এবিষয়ে একটী সুন্দর গল্প আছে। একজন রাজা সখ্ করিয়া একটী কলম কাটিতে গিয়া আপনার অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সভাসদ্ সকলে অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ জল আনেন, কেহ অঙ্গুলি বাঁধিয়া দেন, কেহ চিকিৎসককে ডাকিবার জন্য লোক পাঠান, এইরূপে সকলেই ব্যস্ত, সকলেই মহা দুঃখিত, কেবল রাজার প্রধান মন্ত্রী কিছুমাত্র ব্যস্ত হইলেন না। তিনি স্থির গম্ভীরভাবে আপনার কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাজা বিরক্ত হইয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, মন্ত্রী, তুমি বড় হৃদয়শূন্য লোক। আমার হাত কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, সকলেই ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু তুমি পাষাণের ন্যায় বসিয়া আছ; তোমার হৃদয় বড়ই কঠিন। মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ, এবিষয়ে চঞ্চল ও ব্যস্ত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। ভগবানের ইচ্ছায় এই দুর্ঘটনা হইতে বিশেষ কোন মঙ্গল উৎপন্ন হইতে পারে। রাজা এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। মন্ত্রীর উপরে মনে মনে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া থাকিলেন। কিছুদিন পরে রাজা, মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া অনেক সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় যাত্রা করিলেন, দূর বনে একটি মৃগের অনুসরণ করিয়া সৈন্য সামন্তদিগকে হারাইয়া ফেলিলেন। কেবল মন্ত্রী তাঁহার সঙ্গে। রাজা দেখিলেন, নিকটে একটি অন্ধকূপ রহিয়াছে। মন্ত্রীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক বিরক্তি ও ক্রোধ অদ্যাপি রহিয়াছে। তিনি ভাবিলেন, এ ব্যক্তি আমার শত্রু, ইহাকে কূপে ফেলিয়া বিনষ্ট করি। এই বলিয়া মন্ত্রীকে কূপে ফেলিয়া দিলেন। তৎপরে সৈন্যদিগের অন্বেষণে বন হইতে বনান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের কোন সন্ধান পাইলেন না। ক্রমে রাত্রি হইল। নিবিড় গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন বনে তিনি একাকী। এমন সময়ে তথায় একদল দস্যু আসিল। তাহারা কালী পূজা করিয়া দস্যুবৃত্তি জন্য যাত্রা করিবে। দস্যুদলের কর্ত্তা রাজাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। মনে করিলেন, এই ব্যক্তিকে মা কালীর নিকটে বলি দান দিলে দেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগের কার্য্যের সফলতা সম্পাদন করিবেন। এই মনে করিয়া রাজাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়া দিল। দেবীর পূজা হইয়া গেলে বলিকে স্নান করাইয়া লইয়া আসিল। তখন দস্যুদিগের দলপতি অনুচরদিগকে বলিলেন, উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখ, কোন স্থানে ক্ষত আছে কি না। ক্ষত থাকিলে মা কালী সে বলি গ্রহণ করেন না, প্রত্যুত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করেন। রাজার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, তাঁহার একটি অঙ্গুলিতে ক্ষত রহিয়াছে। তখন দলপতি বলিলেন, উহাকে

ছ ...৩, উহার দ্বারা আমাদের কোন ... হইবে না। তখন রাজা দস্যুহস্ত ... মুক্তিলাভ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন ...গ্যে আমার হাত কাটিয়া গিয়াছিল, ...জন্য অদ্য প্রাণ রক্ষা হইল, নতুবা অদ্য ...হস্তে জীবন অবসান হইত। রাজা এই... ভাবিতে ভাবিতে যে কূপে মন্ত্রীকে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, উহার নিকটে গমন করিলেন। গমন করিয়া কূপমধ্যস্থ মন্ত্রীকে ডাকিতে লাগিলেন। মন্ত্রী উত্তর করিলেন, মহারাজ, আমি ইহার মধ্যে নিরাপদে বসিয়া আছি। তখন রাজা একটি দীর্ঘ লতা ফেলিয়া দিয়া উহা ধরিয়া মন্ত্রীকে উঠিতে বলিলেন। মন্ত্রী লতা অবলম্বন পূর্ব্বক উপরে উঠিলেন। রাজা তখন যার পর নাই অনুতপ্ত হৃদয়ে মন্ত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, মন্ত্রি, তুমি বলিয়াছিলে পরমেশ্বর অমঙ্গল হইতে মঙ্গল উৎপন্ন করেন, অদ্য সে কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইলাম। তখন তিনি দস্যুহস্তে পতন এবং অঙ্গুলিতে ক্ষত থাকার জন্য মুক্তিলাভের বিষয় বর্ণনা করিয়া বলিলেন, মন্ত্রি! তুমি যে বলিয়াছিলে যে, এই সামান্য দুর্ঘটনা হইতে পরমেশ্বর বিশেষ মঙ্গল বিধান করিতে পারেন, তোমার এই বাক্য অদ্য সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। তোমাকে ক্রোধবশতঃ কূপে নিক্ষেপ করিয়া আমি তোমার নিকটে যারপর নাই অপরাধী হইয়াছি। মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ, কেবল আপনি দস্যু হস্তে মুক্ত হওয়াতেই যে আমার কথা সফল হইয়াছে, এরূপ নহে। আপনি যে আমাকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, উহাতেও মঙ্গল হইয়াছে। আপনার শরীরে ক্ষত আছে বলিয়া দস্যুরা আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু আমার শরীরে কোন ক্ষত নাই। আপনি আমাকে কূপে নিক্ষেপ না করিলে, দস্যুরা আমাকেই বলি প্রদান করিত। সুতরাং আপনি আমাকে কূপে নিক্ষেপ করাতে আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। পরমেশ্বর যথার্থই অমঙ্গল হইতে মঙ্গল উৎপন্ন করেন।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা আজ অন্ধ। সেই জন্য পরমেশ্বরের অনেক কার্য্যের অর্থ বুঝিতে পারি না। মানুষের কার্য্য দেখিয়াছি বলিয়া গর্ভস্থ শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অর্থ বুঝিতে পারি, নতুবা মাতৃগর্ভের মধ্যে ঐ সকলের কোন উপযোগিতা নাই। আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ, মহান্ পরমেশ্বরের সকল কার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝিব আমাদের এমন সাধ্য কি? ক্ষুদ্র শিশু পিতামাতার সকল কার্য্যের অর্থ কি বুঝিতে পারে? পিতামাতা তাহার মঙ্গলের যে কার্য্য করেন, সে অনেক সময় মনে করে যে, উহা তাহাকে কষ্ট দিবার জন্যই তাঁহারা করিতেছেন। একটি গল্প আছে যে, কোন শিশু গুরু মহাশয়ের নিকট বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া দেবতার নিকটে বলিয়াছিল, হে ঠাকুর, গুরুমহাশয় যেন মরিয়া যায়। একটি বুদ্ধিমান শিশু নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, গুরুমহাশয় মরিলে তোমার বাবা আর একটা গুরুমহাশয় আনিয়া দিবেন, ঠাকুরের কাছে বল যেন বাবা মরিয়া যায়। পিতামাতা শিশুর মঙ্গলের জন্য যাহা করেন, অনেক শিশু মনে করে যে, উহা তাহাকে কষ্ট দিবার জন্য করা হইতেছে। কিন্তু শিশু যখন বড় হয়, তখন পিতামাতার সদভিপ্রায় বুঝিতে পারে। আমরাও যত বড় হইব,— অনন্ত উন্নতি পথে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইব

ততই আমরা বুঝিতে পারিব, ততই আমরা জগতের পিতামাতার মঙ্গলাভিপ্রায় সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইব।

একদেশদর্শিতার জন্য মনুষ্য অনেক সময় প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে না। সকল বিষয়েই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, দর্শন, কি ধর্ম্ম, সকল বিষয়েই আংশিক দর্শন একটি ভ্রান্তির কারণ। একটি গল্প আছে যে, কোন উদ্যানে পাঁচজন লোক বহুরূপী নামক একটি জন্তু বিভিন্ন সময়ে দেখিয়াছিল। বহুরূপীর বর্ণ কি, তাহাদের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠিল। কেহ বলিল লোহিত, কেহ বলিল হরিদ্বর্ণ, কেহ বলিল পীত ইত্যাদি। মতের ভিন্নতা হওয়াতে এই কথা লইয়া তাহাদের মধ্যে বিষম বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। পরিশেষে সেই বাগানের মালী আসিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, বহুরূপী যেরূপ বর্ণ বিশিষ্ট পদার্থের উপরে বসিয়া থাকে, তাহার গাত্রের বর্ণও তদনুরূপ প্রতীত হয়। সুতরাং তাহাকে কোন অবস্থায় লোহিত, কোন অবস্থায় হরিৎ, কোন অবস্থায় পীত ইত্যাদি বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। বহুরূপী সম্বন্ধে যেরূপ ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা, সকল বিষয়েই সেই প্রকার হইয়া থাকে।

সমগ্র প্রকৃতির গতি কল্যাণের দিকে, ইহা আমরা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অনেক স্থল বুঝি না। জ্ঞানের যত উন্নতি হইতেছে, ততই মানুষ বুঝিতেছে। প্রবলঝটিকা হইতে যে অনিষ্টাপাত হয়, তাহা দেখিয়া অজ্ঞ মনুষ্য উহাতে কেবল অমঙ্গল দর্শন করে। যাহার হৃদয় বিজ্ঞানালোকে আলোকিত হয় নাই, সে কি কখন বুঝিতে পারে যে, বজ্রাঘাতের মধ্যেও পরমেশ্বরের শুভাভিপ্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে? ঝটিকা ও বজ্রাঘাত বায়ুকে বিশুদ্ধ করে। যে বিষ জীবের প্রাণসংহারক, তাহাই বিকারী রোগীর পক্ষে অমৃত হইয়া তাহার প্রাণরক্ষা করে। জীবনের পরীক্ষায় দেখা যায়, অনেক বিপদ সম্পদ অপেক্ষাও অনেক গুণে আমাদের কল্যাণ উৎপাদন করে। যদি উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতে বুঝিতে পারি যে সংসার অসার, পরমেশ্বরই সার,—যদি সংসারের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া পরমেশ্বরে হৃদয় মন অর্পণ করিতে পারি, তবে পুত্রের মৃত্যু আমার পক্ষে বিপদ নহে, উহা অনেক পার্থিব সম্পদ অপেক্ষা অনন্ত গুণে কল্যাণপ্রদ। "বিপদ সম্পদ তব পদ লাভে মৃত্যু সে অমৃত সোপান।" * "দুঃখ বেশ সুখ ধরে, জীব না চিনিতে পারে, সকলই আছে তাহার মঙ্গল ছায়ায়।" † ভগবানের সৃষ্টি-লীলায় যাহা ক্ষণকালের জন্য যন্ত্রণা ও মৃত্যু উৎপাদন করে, তাহাই চিরদিনের জন্য জীবন, সুখ ও স্বাস্থ্য বিধান করে। দুঃখ পরিমিত; কিন্তু তাহার গতি অনন্ত সুখের দিকে। দুঃখ ক্ষণিক; কিন্তু অনন্ত মঙ্গলের দিকে উহা জগতকে লইয়া যাইতেছে। সেই জন্য অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত মঙ্গল এইরূপ বিধান করিয়াছেন।

এক জন্তু আর এক জন্তুকে ধরিয়া আহার করে, ইহা দেখিয়া, অনেক সংসারবাদী পরমেশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় অস্বীকার করেন। পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, সকল স্থলে পরমেশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় আমরা বুঝিতে পারি না। এক জন্তু যে আর এক জন্তুকে ধরিয়া আহার করে, ইহার মধ্যে পর-

* শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

† শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু।

মেশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়াছি, এমন বলিতে পারি না, তথাচ এ বিষয়ে যাহা কিছু বুঝিবার, তাহা যথাসাধ্য প্রকাশ করিতেছি। কোন কোন ইউ-রোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, যখন কোন জীব হিংস্র জন্তুর মুখে পতিত হয়, তখন উহা মেস্‌মেরাইজ হইয়া যায়। এক প্রকার বৃহৎ সর্প আছে, তাহা কোন বৃক্ষতলে থাকিয়া বিশেষ কোন শব্দ করিলে বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট পক্ষী আপনা আপনি আকৃষ্ট হইয়া সর্পের মুখে পতিত হয়, তখন সর্প উহাকে ভক্ষণ করে। সর্পের সূক্ষ্ম শক্তিতে পক্ষী মেস্‌মেরাইজ্ হইয়া যায়। কোন জন্তু মেস্‌মেরাইজ হইলে তাহার আর বাহ্য জ্ঞান থাকে না, কোন প্রকার যন্ত্রণা-বোধ থাকে না। ক্লোরাফরমের দ্বারা রোগীকে অচেতন করিয়া অস্ত্র চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে কোন কোন ইউ-রোপীয় চিকিৎসক মেস্‌মিরাইজ করিয়া অস্ত্র চিকিৎসা করিতেন, তাহাতে অস্ত্র করি-বার সময়ে কিছুমাত্র যন্ত্রণা হইত না। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, হিংস্র জন্তু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে জীব সকলও ঐরূপ অবস্থা-পন্ন হয়। তাহাদের বিশেষ যন্ত্রণা বোধ থাকে না। সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী লিভিং-ষ্টোন্ সাহেবের জীবনের একটী ঘটনায় এই কথার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আফ্রিকার জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে করিতে লিভিংষ্টোন সাহেব হঠাৎ একটী সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। লিভিংষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন যে, সিংহ তাঁহাকে আক্র-মণ করিবামাত্র তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া-ছিলেন, তাঁহার কিছুমাত্র যন্ত্রণাবোধ ছিল না। কোন প্রকারে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। লিভিংষ্টোন সাহেব মনে করেন যে সকল সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহারা তাঁহার মত বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হইয়া যায়, বিশেষ কোন যন্ত্রণা বোধ থাকে না। সকল স্থলে এ কথা সত্য কি না, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কিন্তু অনেক স্থলে যে ইহা সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন কোন জন্তু আপনি ছুটিয়া হিংস্র জন্তুর মধ্যে গিয়া পড়ে, ইহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহা যে মেস্‌মেরা-ইজকারী সূক্ষ্মশক্তির ক্রিয়া, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মার্টিনো সাহেব হিংস্র জন্তু সকলকে জগতের স্বাস্থ্যরক্ষক কমিশনর বলিয়াছেন। কোন জন্তু মরিলে উহারা তাহার দেহ পঁচিতে দেয় না, শীঘ্রই তাহা উদরস্থ করিয়া বায়ু ও মৃত্তিকার স্বাস্থ্য-কারিতা রক্ষা করে। মার্টিনোর কথায় কেহ এই আপত্তি করিতে পারেন যে, মৃত দেহ পচিয়া যাইবে পরমেশ্বর যদি এরূপ বিধান না করিতেন, তাহা হইলেই বায়ু প্রভৃতির বিশুদ্ধতা রক্ষা হইতে পারিত; কিন্তু মৃত দেহ নষ্ট না হইলে জগতে জীবিত দেহের স্থান হইত না। জীব দেহ পচিয়া যায়, ইহার সহিত জগতের অন্যান্য পদার্থ ও ঘট-নার কি সম্বন্ধ, তাহা কি আমরা বুঝিতে পারি? আমরা অনেক সময়ে না বুঝিয়া পরমেশ্বরের ব্যবস্থার উপরে অনেক কথা বলিয়া থাকি। আমরা অনেক বিষয়েই না পড়িয়া পণ্ডিত হইতে ভালবাসি।

আর একটী বিশেষ কথা। রোগে মৃত্যু ও ব্যাঘ্রের মুখে মৃত্যুতে প্রভেদ কি? ব্যাঘ্রের মুখে মৃত্যু অথবা রক্ত-আমাশয় বা ক্ষয়কাশ বা ওলাউঠায় মৃত্যু, ইহার মধ্যে

কোন্ প্রকার মৃত্যুতে যন্ত্রণা অধিক? রোগে মৃত্যু অপেক্ষা হিংস্র জন্তুর মুখে মৃত্যুতে কি যন্ত্রণা অধিক? হিংস্রজন্তুর মুখে বরং শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া যায়। ভগবান্ জগতের কল্যাণের জন্যই মৃত্যুর বিধান করিয়াছেন। মৃত্যু আছে বলিয়া জগৎ নূতন জীবন ও নূতন সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইতেছে, পুরাতন চলিয়া না গেলে নূতনের স্থান হইত না। পুরাতন পত্র খসিয়া পড়িতেছে, নূতন পত্র নিচয় উৎপন্ন হইতেছে। কৃপাময় পরমেশ্বর জগতের কল্যাণের জন্য মৃত্যুর সহস্র দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। হিংস্রজন্তুর আক্রমণ তন্মধ্যে একটী দ্বার মাত্র। ইহাতে এমন কি আছে যে রোগাদিতে মৃত্যু অপেক্ষা ইহার প্রতি বিশেষ আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। মৃত্যুত হইবেই। তবে ব্যাঘ্রের মুখে মৃত্যু বা রোগে মৃত্যু, এ উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ কি? মানুষ হঠাৎ মৃত্যু ভালবাসে না। সেই জন্যই, বোধ হয়, বজ্রাঘাতে মৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা অল্প দুঃখকর হইলেও মানুষ উহাকে ঘৃণা করে। কিন্তু অনন্তপুরুষ মানুষের রুচি বা সাংসারিক সুবিধা দেখিয়া কার্য্য করেন না। সমগ্র জগতের সমগ্র কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির কি সাধ্য যে, তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায়ের মধ্যে সকল সময়ে প্রবেশ করিতে পারে? (ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অন্ত্যেষ্টি।*

১

জান না জান না, হা রে ভূপিশাচগণ!
মুখে শিষ্, হাতে তুরী, পণে সে মলয়া ছুঁরী
কাণে কাণে কয়েছে কি কথা কন্-কন্?
গঙ্গার গৈরিক'পর সে দিব্য ত্রিবেণী-থর
ফলিতেছে খুলি পাক ফণিনী মতন,
আঁধারে মা মাথা কুটে', কোঁফায়ে কোঁফায়ে লুটে—
আছাড়ে কাঁটালপাড়া কাঁপে ঘন ঘন!
যার সে কটাক্ষ-মন্ত্রে ঘুরিতি কুলাল-যন্ত্রে,
চিবাতেছ আজি তাঁর চিতার চন্দন?

*   *   *   *

যজ্ঞ-সূত্রে গরথিতা, দগ্ধ-বক্ষে ঝোলে গীতা,
শ্মশ্রুহীন শুকনাস পতিত ব্রাহ্মণ
ভুলেছে কন্যার শোক, রোমাঞ্চিয়া পিতৃলোক
স্ফুরিছে বিরল-দন্তে "বন্দে মাতরম্!"
ছিঁড়েছে হিক্কায় কার, কচ্ছপীর এক তার—
আলুথালু বীণাপাণি খুলেছে তোরণ!
সে স্বপ্ন আনন্দ-মঠে আজি কি ফলিবে বটে?
বঙ্কিম পশিছে ওই বৈকুণ্ঠ-ভবন!
রাখ্ রে তাণ্ডব রাখ্ ভূপিশাচগণ!

২

তুমি ত চলিলে, দেব বঙ্গ-দরশন!
অন্ধ বাঙ্গালার, আহা, কি হবে এখন?
বৈকুণ্ঠে দেখিলে বাণী, চপলা কমলা রাণী,
আলিঙ্গি' দক্ষিণে বামে মধ্যে নারায়ণ—
পুছিও মা ভারতীরে, আর কি হইবে ফিরে
সুপ্ত বঙ্গভূমে তাঁর মহা-উদ্বোধন?
ভারতের ঘুম ভেঙ্গে' বাজিবে হেমের শিঙ্গে?
নবীনের মহাশঙ্খে হবে ভূ-কম্পন?

---

* স্থানাভাবে গতবারে এই পদ্যটী প্রকাশিত হয় নাই। ন, স।

রাজকৃষ্ণ রামদাস ফুঁ দিবে অমৃত-শ্বাস,
ভারত-কলঙ্ককুষ্ঠ করি প্রক্ষালন ?
আবার কি কদাচিৎ বিশ্ববেদাঃ পুরোহিত
করিবে অনন্ত-ছন্দে বাণী-আবাহন ?
এ তব বাঙ্গালী জাতি, পোহাবে কি কাল-রাতি,
বিশ্বের সাহিত্য যাগে পাবে নিমন্ত্রণ ?
বঙ্গগুরু! বাঙ্গালার কি হবে এখন ?

৩

হা বঙ্কিম, কে না জানে তব অবদান ?—
কি জ্ঞানী অজ্ঞান, আর হিন্দু মুসলমান!
নাই ডাকাতের ডর, নাই আর নীলকর,
নিশীথে নিঃশঙ্ক-চিতে উতারি' উজান,
রূপসার * রূপা বুকে, বড়া বেয়ে, ধুঁয়া-মুখে,
বঙ্কিম বাবুর নাম আজো করে গান!
আশে পাশে নাহি আর, নাবিকের হাহাকার—
নীরন্ধ্র সুন্দর-বনে দুকূলে শ্মশান,
করে কেলি দম্পতি বলেশ্বর মধুমতী,
অচকিত পুলকিত, নিকাল-বিহান!
পুঁথীর পাতার' পরে শ্মশ্রুবাহি অশ্রু ঝরে,
আজিও আয়েষা লাগি কাঁদে ওস্‌মান!
কাফের লম্পট ঠক্, কত মূর্খ মবারক্
দলিত-দরিয়া-দম্ভে হারাচ্ছে প্রাণ!
হা বঙ্কিম, কে না জানে তব অবদান ?

৪

বৈকুণ্ঠে বঙ্গেরে, দেব, করিও স্মরণ,
ধরিয়া মা ইন্দিরার রাতুল চরণ!—
কত আর সে প্রথর ছিয়াত্তরে-মন্বন্তর
দগধ খাণ্ডব-বঙ্গ করিবে দহন ?
কবে রামধন পোদ, শোক দুঃখ দিবে শোধ,
বাঙ্গালার কৃষী বল হবে উজ্জীবন ?

ত্রিসন্ধ্যা জপিও আর, সে সাবিত্রী অনিবার—
উদাত্ত আগ্নেয় শ্রুতি, "বন্দে মাতরম্" ;
ক'ও—মাগো, আজি তা'রা—আজি বঙ্গ লক্ষ্মীছাড়া!
কাঁদাইয়া কমলার অমল-আনন!
বৈকুণ্ঠে বঙ্গেরে, দেব, করিও স্মরণ!

৫

শুনেছে তোমার ডাক—ছুটিল ব্রাহ্মণ!
বৈকুণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রে লহ নারায়ণ!
হা কৃষ্ণ! ডাকিলে তাঁয় ? মোরা সে ভুলেছি, হায়,
কুরুক্ষেত্র-প্রকম্পী সে পাঞ্চজন্য-স্বন!
আজি হা তোমারি নামে, এ পুণ্য ভারত-ধামে
নরনারী পাপপঙ্কে করে বগাহন!!
বঙ্গবধূ নিল কই সে দীক্ষা বজ্রময়ী—
নারী নহে উরবশী, এ নহে নন্দন;
সতী স্বাহা—পলে পলে, পাতিব্রত্য-তুষানলে
কামিনী-নিকষে হয় কামুক শোধন!
আজো বঙ্গ চিনিল না বঙ্কিমের মনোরমা—
পশুপতি-ললাটে সে লয় হুতাশন!
বিষবৃক্ষ বনে ঢুকি' ফোটে নি সূর্য্যমুখী,
প্রতাপ অমরনাথ লভে নি জনম!
বাঙ্গালী বিলের চিল—মেদিনীতে ভাবে বিল,
'ভোমরে' নখরে করে মধুর কূজন!
নবীন ভারতে, হায়, চাঁড়ালে দ্বিজত্ব চায়,
নরপূত হোম-হবিঃ চাটে শিবাগণ!
বঙ্কিম ভাবে না আর—সে ত ক্ষুদ্র বালু ছার—
খাপিবে তোমার ধর্ম্ম তুমি, ভগবান্!
সাশ্রু-নেত্রে, ফেলি' কাজ, চরণে চলিল আজ,
ভারতী মা! বরপুত্রে বরিস্ সান্ত্বন!
বৈকুণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রে লহ, নারায়ণ!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

* খুলনা নগরীর অনতিদূরবর্ত্তিনী নদী।

নিমাই চরিত। *

"আমার গৌরাঙ্গের গুণে, দারু পাষাণ কিবা
গলিয়া গলিয়া পড়ে অবণী।
অরণ্যের মৃগপাখী, ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে,
নাহি কান্দে হেন নাহি পরাণী॥"

শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি বিষয়ক গ্রন্থ সমালোচনা করিবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়ম আছে;--প্রণালী ও প্রকরণ আছে। কিন্তু ভক্ত-হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস—ভক্তি-গ্রন্থ সমালোচনার পন্থা কি?

কবির কাব্যের সূক্ষ্মতম অংশ, জটিল ও অতি অবোধ্য অংশ,—প্রেমিক প্রেমিকার উষ্ণ নিশ্বাস-কাহিনী। সে নিশ্বাস পরিমাপেরও তবুও একটী যেমন-তেমন মানযন্ত্র আছে;—বৈজ্ঞানিক না হউক, আলঙ্কারিক "থারমোমিটার" ও বৈচারিক "ব্যারোমিটার" আছে। কিন্তু ভগবদ্ভাবুকের বক্ষ-বিনির্গত ভক্তি-পারাবার পরিমাপের মান যন্ত্র কোথায়?

অসীম এবং অপরিমেয়, অতলস্পর্শ এবং উলঙ্গ, অধীর এবং অনেক সময়ে আত্মবিরোধী, উন্মত্ত এবং উগ্র, প্রচণ্ড এবং প্রমত্ত ভক্ত-হৃদয়ের ভাব-বারিধি;—সে বারিধির অবিশ্রান্ত উচ্চে উত্থিত ও নিম্নে পতিত, অসংলগ্ন, অনির্দ্দিষ্ট ও অভাবনীয় উচ্ছ্বাস,—উচ্ছ্বাস এবং আবল্য, আবল্য এবং অবসাদ, অবসাদ এবং সেই মুহূর্ত্তেই যুগপৎ উত্তাল তরঙ্গের তীব্র লীলা,—গণিবার এবং গণিয়া তাহার গুণাগুণ বিচার করিবার,—তাহার স্বরূপ ও সংখ্যা নির্ণয় করিবার,—তাহা বুঝিবার এবং বুঝাইবার আদৌ উপায় আছে কি?

উপায় নাই। কোনও উপায় উদ্ভাবন হয় নাই; হইবে না। হওয়া অসম্ভব।

যে প্রমত্ত উষ্ণ প্রস্রবণ সাংসারিক সভ্যতার ও সামাজিক শিষ্টাচারের সুকঠিন কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের অসংখ্য আবরণ ভেদিয়া, বিজ্ঞতার বিধি ব্যবস্থার বক্ষ বিদারিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল গ্রন্থি ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া এবং সংসার সমীচীন শাস্ত্রের সুদৃঢ়-প্রোথিত-বনিয়াদ আদেশ ও নিষেধ ফুৎকারে উড়াইয়া, সহস্র স্রোতে দিক্‌বিদিকে মহাদ্রাবক ছুটায়;—পৃথিবী প্লাবিত করে,—প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করে, সমাজ কেন্দ্রচ্যুত করে, সংসারের আকর্ষণ শিথিল করে; আর স্বর্গের পথ প্রশস্ত করে, তর্জ্জণী হেলনে পৃথিবীর উপর স্বর্গ আনয়ন করে, তাহা কিসের প্রসবণ, কোন দ্রব্য, কেমন দ্রাবক, কে বলিবে? কি দারুণ দ্রাবক তাহা, যাহার মৃদু স্পর্শে পাষাণ গলিয়া প্রবাহে বহে, পাপের পৈশাচিক আগুন নির্ম্মল পুণ্য সলিলে পরিণত হয়, মরুভূমে মন্দার ফুটে, বৈজ্ঞানিকের ও বৈদান্তিকের শুষ্ক বক্ষে অনুরাগ-রসের উৎস ছুটে; দেহ পুলোকাবেশে পূর্ণ, প্রস্ফুট কদম্ব কুসুমবৎ প্রতিভাত হয়; স্বভাবের সমস্ত আবরণ ছিঁড়িয়া যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান-গর্ব্বিত মনুষ্য দুর্ব্বল বালকের ন্যায় হাঁসে কাঁদে নাচে লম্ফ দেয়, হুঙ্কার করে; মূর্চ্ছিত হয়, মৃত হইয়া জীবিত,—মুহুর্ম্মুহু মৃত ও জীবিত হয়; একই মুহূর্ত্তে যুগপৎ আনন্দে অষ্ট ভাবাপন্ন ও শোকে মহা মুহ্যমান হইয়া, মনস্তত্ব বিদ্যা উলটাইয়া দেয়; পুনশ্চ যে দ্রাবকে জাতিভেদে দহন করিয়া মুসলমানকে হিন্দু করে,

* শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত; অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলা বর্ণন। শ্রী শিশিরকুমার ঘোষ দাস কর্তৃক গ্রন্থিত। প্রথম খণ্ড। কলিকাতা।

...কে মহর্ষি করে; জন্মজন্মান্তরের জগাই ...ইকে যোগ-সিদ্ধ পুরুষাপেক্ষাও পূত ...ত্র করে; পুণ্যশ্লোকদিগের প্রলোভনীয় ...নে উত্থীত করে; পক্ষান্তরে যাহাতে ...রিয়া গৃহী উদাসী হয়; উদাসীন গৃহবাসে ...সে,—কোণের কুলবধূ যে রস-পিয়াসে ...ল ত্যজে, প্রেমের ও স্নেহের সুকুমার ...ন্ধন স্বচ্ছন্দে ছেদন করিতে সাহসিনী হয়; অপিচ যাহার ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণে, কেবল মনুষ্য নয়, 'মৃগ পাখী কাঁদে' 'দারু পাষাণ' হইতে অশ্রুপাত হয়;—প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা কি পদার্থ! বহ্নি কি বারি, কিম্বা, বায়ু, তেজ কিম্বা তাড়িৎ; তাহা আলোকের জ্যোতি অথবা আলোকের ছায়া, তাহা সূর্য্য রশ্মির শুভ্রতা অধবা কুসুম সৌরভের মধুরিমা, তাহা উদ্বেগ-উত্তেজনা কিম্বা শান্তি-শীতলতা; হায়! তাহা আগ্নেয় গিরির অত্যুগ্র নিশ্বাস অথবা কুসুম-সৌরভের অতি কোমল স্পর্শ; সেই পদার্থাতীত পদার্থ কি? বৈরাগ্য না বিলাস? অথবা একাধারে এ সবই, কিম্বা ইহাদের কিছুই নয়!

এই অপার্থিব পদার্থের পার্থিব নাম, আভিধানিক সংজ্ঞা "ভক্তি।" কিন্তু নাম নামই। পৃথিবীর কোন নামই পদার্থ স্বরূপের সমস্তটা ব্যক্ত করিতে সক্ষম নহে। ভক্তি পদার্থের ত কথাই নাই। ভক্তি শব্দে, ভক্ত হৃদয়ের অনু পরমাণু, পরিমিত ভাবের সহস্রাংশের একাংশও প্রকট হইতে পারে কি না সন্দেহ।

যাহা বাক্যের অতীত, মনুষ্য বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অতীত, তাহার কেবল এক প্রীতি ও বিস্ময় অতীত আর কোনও সমালোচনা সম্ভবে না। ভক্তি-গ্রন্থের সমালোচনা অসম্ভব।

ভক্তি-গ্রন্থের বৈচারিক সমালোচনা * সম্ভবে না। তাহা বৈজ্ঞানিক সমালোচনারও † অতীত। বৈষ্ণব মহাজনদিগের "রসশাস্ত্র" ও তাঁহাদিগের হৃদয়ের উদ্দাম রস-বৈচিত্র্য সম্যক ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম কি না, সে বিষয়েও সবিশেষ সন্দেহ।

তবে রসাস্বাদন সম্ভব বটে। সমা-সমালোচন নহে,—আস্বাদন। কিন্তু, সে আস্বাদনের অধিকার সৌভাগ্য সাপেক্ষ, সাধনা সাপেক্ষ, সর্ব্বোপরি, শ্রীভগবানের সবিশেষ কৃপা সাপেক্ষ। স্বয়ং শচীদেবী, শ্রীগৌরাঙ্গের গর্ভধারিণী জননী হইয়াও, সে সৌভাগ্যে সম্যক সৌভাগ্যশালিনী হয়েন নাই। অতএব সামান্য জনের আর কি কথা! সে সৌভাগ্য সাধু, শান্ত, সিদ্ধ-দিগেরও পরম প্রার্থনীয়,—প্রলোভনীয়। অথচ অসাধুরও সে সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান হওয়া মুহূর্ত্তেকের কার্য্য!! কি বুঝিবে, কে বুঝাইবে বিচিত্র লীলা!

বুঝিবার বিষয় নয়, বুঝাইবারও বিষয় নয়,—পরখ পরীক্ষা ব্যাখ্যারও বিষয় নয়,—কেবল বিস্ময়েরই বিষয়,—বিচিত্র লীলা! নহিলে আর বিচিত্র কি? রহস্যই যদি উদ্‌ঘাটন করিতে পারিবে, তবে আর রস কি? আবরণই যদি উত্তোলন করিতে পারিবে, তবে আর আরাম কি?

বিচিত্র লীলাই বটে! বৈদিক, বৈদান্তিক, বিজ্ঞান-গর্ভ তত্ত্ব নয়, বহুকালের কথা নয়, বহু দূরের ঘটনা নয়,—সত্য—ত্রেতা—দ্বাপরে দৃষ্ট দৃষ্টান্ত নয়,—আমাদের এই "কলিরই" কথা, ঐতিহাসিক হিসাবে প্রায় কল্যকার কথা;—সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সে দিন-

* Judicial criticism.

† Scientific criticism.

কার ঘটনা; বঙ্গদেশের বক্ষের উপর বিচিত্র লীলা!

শুষ্ক প্রাণে, ততোধিক বিশুষ্ক বিশ্বাসে বিচিত্র লীলা কেমনে অনুভব করিব!! হায়! অবিশ্বাসীর আবার বিস্ময়ই বা কি!

বিচিত্র লীলা বঙ্গদেশের বক্ষের উপর। কিন্তু বাঙ্গালী উদাসীন! বাঙ্গালীর ঘরে, বাঙ্গালিণীর উদরে ভগবানের ভক্তি-অবতারের আবির্ভাব! কিন্তু বাঙ্গালী উদাসীন, বাঙ্গালী অন্ধ; অমূল্য নিধি অতি নিকটে, স্বকক্ষে, ক্রোড়াভ্যন্তরে,—তবুও দেখিতে পায় না, দেখিয়াও দেখে না; উপেক্ষা করে; ধর্ম্মান্বেষণে, পরিত্রাণের উপায়ান্বেষণে যায়, দূরে, অতি দূরে, প্রান্তরে, গিরি গহ্বরে, য়ুরোপে, আমেরিকায়, শাস্ত্র-পারাবারে, বিজ্ঞানে, দর্শনে "কূটস্থ চৈতন্যে"; হায়! কোথায় নয়? কিন্তু চৈতন্য সশরীরে তাহাদের স্বদেশে, তাহাদের জাতিতে, তাহাদেরই একজন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সম্মুখে, বামে, দক্ষিণে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, শত শত, সহস্র সহস্র লীলা-চিহ্ন তাঁহার, তাঁহার এবং তাঁহার অন্তরঙ্গবর্গের, অবিশ্বাসীর বিশ্বাস-কুসুমের, বিশ্বাসীর বৈকুণ্ঠ লাভের, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ পদ-চিহ্ন, এই, এইখানেই বিদ্যমান। বাঙ্গালী উদাসীন, ভাবান্ধ, তাই ঘরে ভগবানের ভক্তি অবতার সত্ত্বেও, ভবভয়ে ভীত। হায়! এই অধঃপতিত জাতির ঐহিক পারত্রিক উদ্ধারের সময় কি আজও উপস্থিত হয় নাই!

বিজ্ঞ বলিবেন, "প্রমাণ দাও, যুক্তি তর্কে বুঝাও, পরীক্ষায় প্রতিপন্ন কর;—চৈতন্য-লীলার Rational explanation চাই, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ চাই, বিচার করিতে বইস, লীলার "লজিক" দেখাও।"

হায়! বিজ্ঞবুদ্ধি কৌশলে বৈকুণ্ঠে যাইবেন, লজিকে গোলকপুরে পৌঁছিবেন। প্রাকৃত যুক্তি তর্কে, অপার্থিব পরম পদার্থের প্রমাণ তিনি চাহেন; অপার্থিব পরম পদার্থের প্রমাণ, পার্থিব প্রাকৃত পদার্থের দ্বারা! অসত্য অনিত্য ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল মনুষ্য-সৃষ্ট ন্যায়-শাস্ত্র দ্বারা! তা, ধন্য বুদ্ধি বটে; অসাধারণ বিজ্ঞতা বটে বিজ্ঞের! প্রমাণ পাইলে পর তবে তিনি পরমেশ্বরের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন!

কিন্তু কি প্রমাণ চাহেন আপনি প্রিয় মহাশয়? আপনার বিবেচনায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশ্য অন্য সকল প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। গৌরাঙ্গ অবতারের, গৌরাঙ্গ লীলার, গৌরাঙ্গ আদেশের, গৌরাঙ্গ অনুগ্রহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহেন কি? প্রত্যক্ষ কিম্বা ঐতিহাসিক প্রমাণ চাহেন? উভয় প্রমাণই আপনার সম্মুখে দেদীপ্যমান, অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখিলেই হয়।

অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে। প্রমাণ কি? প্রমাণ,—অগ্নি দাহ করে। এ প্রমাণ প্রত্যক্ষ। এখনি অগ্নিতে অঙ্গুলি স্পর্শ করুন, অঙ্গুলি দগ্ধ হইবে। গৌরাঙ্গের পাষাণ গলাইবার শক্তি আছে,—প্রমাণ গৌরাঙ্গ-প্রেমে পাষাণ গলে, পাষাণ গলিয়াছিল; পাষাণ গলিতেছে। এ প্রমাণও প্রত্যক্ষ;—প্রমাণ হাতে হাতে লউন। গৌরাঙ্গ-প্রেমে পাষাণ হৃদয় স্পৃষ্ট করিয়া দেখুন, পাষাণ গলে কি না! পাপ-তাপ দ্রবীভূত হইয়া পুণ্য প্রীতিতে পরিণত হয় কি না!

চৈতন্যলীলার ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ চাহেন? তাহাও যে অতি স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, জাজ্জ্বল্যমান! সে এত যে, তাহাও

আবার অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া ..ত হয়? চৈতন্যলীলার ঐতিহাসিক ..চ অতি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমার ..্ সম্মুখে! প্রমাণ,—বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষার বিকাশ;—বাঙ্গালা সাহিত্যের বনি-য়াদ! প্রমাণ,—চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য-মঙ্গল, চৈতন্যভাগবৎ; প্রমাণ,—ভক্তমাল; প্রমাণ অগণিত গৌরাঙ্গ গ্রন্থ, বঙ্গীয় সাহিত্য-সৌধের অক্ষয়, অক্ষত ভিত্তি-স্তম্ভ। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, যদি আপনি অতি অসাবধানেও পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হই-লেও, উপরোক্ত কথা অগত্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। এখন, মহাশয় ত বৈজ্ঞানিক, বলুন দেখি,—কেবল কৃত্রিম কল্পনায় কি কখনও একটা সাহিত্য সৃষ্টি হইতে পারে? মেকি মুদ্রা কতক্ষণ চলে,—কত কাল টিকে?

চৈতন্যলীলার লজিক নদীয়ার নৈয়ায়িক-দিগের লণ্ডভণ্ডে;—দীধিতি-কর্ত্তা রঘুনাথের হতাশ্বাস নিরুদ্দমে;—নৈয়ায়িক নিমায়ের ন্যায় গ্রন্থ গঙ্গা-গর্ভে বিসর্জ্জনে; দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের পরাজয়ে, পাণ্ডিত্য পরিবর্জ্জন করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণে! পরন্তু চৈতন্য-লীলার 'লজিক' অদ্বৈতবাদী ও তৎকালের অদ্বিতীয় পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভক্তি-দীক্ষায়! আর ন্যায়শাস্ত্র বিলোড়িত নবদ্বীপে হরিসংকীর্ত্তনের রোলে; বেদান্ত বিশুষ্ক বারাণসি ধামে বৈষ্ণব রসের তরল তরঙ্গে!

চৈতন্য-প্রেমে পাষাণ গলার প্রমাণ, মহা-পাতকী জগাই মাধাই ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্ধার। কিন্তু এ প্রমাণ অপেক্ষাও প্রবলতর ও প্রত্যক্ষতর প্রমাণ আছে। মহাপাতকী জগাই মাধায়ের হৃদয় যদি পাষাণ হয়,—সে পাষাণ অপেক্ষাও অধিকতর প্রচণ্ড, কঠিনতর পাষাণ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য আমলের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর হৃদয়—তাহা নীরস, নাস্তিকতাময়, যথেচ্ছাচারী, অব্যবস্থ; তাহা সন্দেহান্ধকারের অমাবস্যা; তাহা শুষ্কতায় সাহারা মরু; অথচ তাহা জ্ঞান গর্ব্বিত, বিজ্ঞান-মার্জ্জিত, সাহিত্য-বিধৌত; রাজনীতি বিলোড়িত; তাহা অবি-শ্বাসের একটা অত্যুচ্চ মাণমন্দির। তাহাতে বেদান্তদর্শনের "সোহহং" হইতে "এপিকিউ-রিয়ানিজেম"এর অসংযত অত্যাচার আছে; তাহার মধ্যে ভৃগু, অত্রি, মনু, পরাশর হইতে অগস্ত কোমতের শিষ্য উপশিষ্য অবধি আছেন; তাহাতে কপিল, কণাদ, পতঞ্জলী ও জৈমিনি হইতে, মিল বেন্থাম, হক্সলে, হার্বাট পর্য্যন্ত আছেন; ব্রাড্‌লা লাবুসিয়ার কর্ত্তৃকও তাহার অনেকখানি স্থান অধিকৃত; মেডেম ব্লাভাট্‌স্কী, মিসেস বেসেণ্ট ও কর্ণেল অল্কটাদিরও তাহা ক্রীড়াভূমি! তাহা আর্য্য মায়াবাদ ও য়ুরোপীয় জাতিভেদ সংমিশ্রিত এক মহা খিচুড়ী;—নব্য বাঙ্গালায় বাঙ্গালী হৃদয় যে কি বিষম বস্তু, তাহা কেবল নব্য বাঙ্গালীই জানেন। জগাই মাধাইকে তরাণ অপেক্ষাও নব্য বাঙ্গালীকে ভজান লক্ষ গুণ কঠিন। কিন্তু ঐ দেখ, আজ নব্য বঙ্গ নানা আকারে গৌরাঙ্গ গানে মাতিয়াছে। অতএব ইহার বাড়া বলবৎ প্রমাণ আর কি চাও? আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ এই

"শ্রীঅমিয় নিমাইচরিত"

নিজেই চৈতন্য-প্রেমের অতি প্রকৃষ্ট প্রবল, ও সাক্ষাৎ প্রতক্ষ্য প্রমাণ। গৌরাঙ্গের গুণে যে দারু পাষাণ গলে, অরণ্যের মৃগ পাখী ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে;—আর বিশুষ্ক বালুকা-স্বর্গের সুধা মন্দাকিনীতে পরিণত হয়,—তাহার হাতে হাতেই প্রমাণ এই শ্রীঅমিয়

নিমাইচরিত। গৌরাঙ্গ গুণের অদ্যকার এই প্রমাণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় বক্ষে ধারণ করুন; বঙ্গসাহিত্য মস্তক পাতিয়া লউন। ইহা বিস্ময়কর; ইহা অদ্ভুত, ইহা "ওয়ানডার", ইহা ইন্দ্রজাল; ম্যাজিক অপেক্ষাও আশ্চর্য্য, ইহা মিরাকাল। কিন্তু কেন?

কারণ,—"শ্রীঅমিয় নিমাইচরিত" শিশির-কুমার ঘোষ কর্তৃক প্রেমাবেশে গ্রন্থিত।

অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই ইঙ্গিতেই এ "ওয়াণ্ডারের" অন্তর্ভেদ করিতে পারিবেন। কেবল অনভিজ্ঞের উপকারার্থে এক বিন্দু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রয়োজন বলিয়াই আমি এই ব্যক্তিগত ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক "নিমাইচরিত" লিখিত,—ইহা মিরাকল, কিন্তু মিরাকল কেন? শিশিরকুমার ঘোষ কে?

শিশিরকুমার ঘোষ কে? অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, গুজরাট, আর্য্যাবর্ত্ত, দক্ষিণা-পথ, য়ুরোপ, আমেরিকা, স্বদেশ, বিদেশ, বহু দেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ, বহু লোকেই জানে, বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকেই চিনে, শিশিরকুমার ঘোষ ব্যক্তিটা কে? জীর্ণ-দেহ, শীর্ণ-স্বর শিশিরের শঙ্কায় মার্ত্তণ্ডমূর্ত্তি স্বয়ং এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান মাজিষ্টর মুহূর্ত্তের জন্যও মোলায়েম ভাব ধারণ করেন;—প্রবল প্রতাপান্বিত পুলিস প্রতিক্ষণে পশ্চাৎ ফিরিয়া চায়; শিশিরকুমারের শরে বিক্রম-কেশরী বিম্-সাদি বিদ্ধ, বিধ্বস্ত; গৌরব-গরিমান্বিত গ্রিফিতাদি কক্ষচ্যুত; শিশিরকুমার ঘোষের কথা ছোট লাট বড় লাট কাণ পাতিয়া শুনেন; তাহাতে সিবিলের আসন টলে; সৈনিকের টনক নড়ে; জবরদস্ত জন বুল বিচলিত হইয়া চাবুক সংযত করেন; স্বয়ং বৃটিশ সিংহ সচকিত হন। সামান্য গৃহস্থ গরিব শিশিরকুমারের দ্বারে সূর্য্য চন্দ্র বংশীয় রাজা রাজয়াড়ীও শিরস্ত্রাণ হেলাইয়া সেলাম করিয়া থাকেন। কিন্তু কেন? শিশির কুমার ঘোষকে লোকে জানে, মানে, চিনে, সম্ভ্রম ও সম্মান করে কেন? বিশাল ভক্তি-বৈভবের জন্যই কি তিনি এত বিখ্যাত; এতাধিক বিশিষ্ট,—কোটী কোটী লোকের মাঝখানে এপ্রকার একটী প্রসিদ্ধ লোক? ভক্তিপরায়ণ পরম ভাগ-বৎ বলিয়াই কি তিনি 'প্রকট'? না, তাহা নয়; ভক্ত বলিয়া শিশির কুমার ঘোষকে কয়টা লোকে জানে; অন্ততঃ এত কাল জানিত!! শিশির কুমার ঘোষের স্বদেশী,—অতি নিকট প্রতি-বেশী,—"দুগ্ধ-স্রোতঃ রূপী" কপোতাক্ষ-তীরে জন্মিয়া, "মাতৃভূমিস্তনে" কপোতা-ক্ষের ক্ষীর সম নীরে একত্রে বর্দ্ধিত ও পালিত হইয়াও, বাল্যকালাবধি "শিশির ঘোষের" শত শত কাহিনী, জীবনের কত কত ঘটনার কথা শুনিয়াও,—আমি, এই প্রবন্ধের লেখক, শিশিরকুমার ঘোষের সামান্য সমালোচক, আমি নিজেই, এত কাল জানিতাম না যে, শিশিরকুমার ঘোষ ভক্তি-বিগলিত গৌরাঙ্গ-প্রেমোন্মত্ত মহা বৈষ্ণব! কিরূপে জানিব? জানি-বার কারণ তখনও ছিল না। তিনি নিজেই কোন্ তখন জানিতেন যে, গৌর-প্রেমে তাঁহাকে মাতাইবে? জানিতাম, শিশিরকুমার ঘোষ সদ্বিদ্বান, সত্যবাদী, তেজস্বী, দেশহিতৈষী; জানিতাম, শিশির-কুমার সুলেখক, সুগায়ক; জানিতাম, শিশিরকুমার ঘোষ সমাজ-সংস্কারক; জানি-তাম, শিশিরকুমার কিছু "এক্সেণ্ট্রিক," শিশিরকুমার গরিবের বন্ধু, কৃষাণের

সহা... ...র বড়ই প্রিয়; শিশির ধারা-
... ...োকা মাতায় দিয়া খেতে খেতে
...; কৃষক কাদায় বসিয়া কিরূপে
...ং নিঙাড়ায়" তাহা দেখেন, নিজে
...ঙাড়ানি লইয়া নিঙাড়াইতে বসেন। ...নিতাম, "শিশির ঘোষ" জবরদস্তের যম, দুর্ব্বলের আশ্রয়। জানিতাম, শিশিরকুমার "যশুরে কায়স্থ" চতুরের চতুর; সহৃদয়-তায়, সরল; কৌশলে ও কূট বুদ্ধিতে কণিক। পরন্তু, সর্ব্বসাধারণে শিশির-কুমার ঘোষকে যে জন্য জানে, যাহা বলিয়া চিনে, তাহা ত নিশ্চয় জানিতামই। শিশিরকুমার ঘোষ "গ্রেট" "অমৃত বাজার পত্রিকার" সম্পাদক;—জীবন এবং আত্মা; জানিতাম, তিনি এদেশীয়দের মধ্যে এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতি বিশারদ; প্রচণ্ড "পোলিটিসিয়ন"।

নব্যবঙ্গের রাজনৈতিক আলোচনা, অনু-শীলন ও আন্দোলন,উহার রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খা, উদ্যম ও উত্তেজনা এবং আস্ফা-লনও বটে;—এ সকলের অর্থ যাহা হউক, অর্থ কিছু মাত্র থাকুক আর নাই থাকুক, ইহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ঘটনা, তাহাতে অবশ্য কাহারও কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, সন্দেহ হইতে পারে না। আমাদের এই রাজনৈতিক প্রবাহকে কেহ বলেন উন্নতি, কেহ বা বলেন উল্লম্ফন। তা, সে যাহাই হউক, উন্নতি বা উল্লম্ফনই হউক, উহা একটী ব্যাপার, বিরাট ব্যাপার, বড়ই বিষম ব্যাপার। এ ব্যাপার বঙ্গ দেশেই প্রথম উদ্ভূত; বঙ্গদেশের অনেক বিশিষ্ঠ ব্যক্তিই এ ব্যাপারে লিপ্ত, বিজড়িত। এ ব্যাপারে লিপ্ত থাকাতেই আবার অনেকে বিশিষ্ঠ। রামগোপাল ঘোষ হইতে দিগম্বর মিত্র ও কৃষ্ণ দাস পাল; এবং কৃষ্ণদাস পাল হইতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাগরেদ্ ও সাগরেদের সাগরেদ্ অনেকেই এ ব্যাপারের ব্যাপারী; কেহ জাহাজের ব্যাপারী, কেহ বা আদার ব্যাপারী। কিন্তু, শিশির কুমার এ ব্যাপারের বিশ্বকর্ম্মা। বক্তৃতা নাই, বাচা-লতা নাই, সভা সমিতিতে গমনাগমন নাই, কোন কালেই কোর্ট কৌন্সিলে, ব্যবস্থাপক বৈঠকে বসিবার বিন্দু মাত্র আকাঙ্খা নাই। বিশ্বকর্ম্মা নিরন্তর নির্জ্জনে বসিয়া আছেন, তর্জ্জণি হেলনে প্রজা-সভা সৃষ্ট হইতেছে; প্রজা-নীতি গঠিত হইয়া রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে, রাজনীতির সহায়তা করিতেছে।

শিশিরকুমার ঘোষকে প্রজা-নীতি সংগ-ঠনকারী সুচতুর রাজনৈতিক বলিয়াই লোকে জানে; ভগবদ্ভক্ত গৌর-প্রেমিক বলিয়া কেহই জানিত না; এখনও অনেকে জানে না। কিন্তু গৌরাঙ্গের এ কি লীলা! এ কি বিভূতি! এ কি বিক্রম! শুষ্ক-হৃদয় রাজনৈতিক প্রেম-বৈরাগ্যে বিভোর! প্রবীন সমীচীন কঠোর কর্ম্মী কান্ত-রসে মাতোয়ারা!!

প্রেমাবতার চৈতন্য মহা প্রভুর, আবি-র্ভাবের এবং লীলাধিপত্যের, ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে!

ইহারই নাম,—

আমার গৌরাঙ্গের গুণে, দারু পাষাণ কিবা
গলিয়া গলিয়া পড়ে অবনী
অরণ্যের মৃগ পাখী, ঝুরিয়া ঝুরিয়া-কান্দে
নাহি কান্দে হেন নাহি পরাণী।

রাজনৈতিক "পরাণী" "দারু পাষাণ" অপেক্ষাও অষ্ট সহস্র গুণ কঠিন; ইহা নিশ্চয়, ইহা সত্য প্রত্যক্ষ, ইহা সর্ব্ববাদী-

মত। কিন্তু তিনিও বা আবার গৌরাঙ্গের গুণে" "কান্দেন" শিশিরকুমার সমালোচ্য গ্রন্থের প্রারম্ভেই কাঁদিয়া কহিতেছেন,—

তপ্ত বালুকায়,　　আছিনু শুইয়া
চকিতের মত এলো।
শীতল নিকুঞ্জে,　　যথা ভৃঙ্গ গুঞ্জে
গৌর আমায় নিয়া গেল॥

কিন্তু কেন? বিজ্ঞান-প্রবণ রাজনৈতিকের বিশ্লেষণী বুদ্ধি সকল বিষয়েরই কার্য্য কারণ অনুসন্ধানে অগ্রসর। গৌর-লীলারও রহস্য উদ্ভেদ করিতে চায়। কিন্তু অসাধ্য, অসম্ভব। রাজনৈতিক লীলা রহস্য উদ্ঘাটন করিতে অক্ষম হইয়া বলিতেছেন,—

কি গুণে আইল,　　কেন দয়া হলো,
কিছু আমি নাহি জানি।
সরল বলিতে,　　শ্রীগৌর আমার
অসাধন চিন্তামণি॥

"অসাধন চিন্তামণির অমিয় উথলিল। কঠোর কর্ম্মীর রাজনৈতিক-নুঙ্গুর অমিয়-সাগরে থাই পাইল না। শিশির তাঁহার রাজ-নীতি-বিশুষ্ক জড়-বিজ্ঞান-বিচলিত হৃদয় সহ, শিশির বিন্দুবৎ গৌরের অমিয়া সাগরে গলিয়া গেলেন। রাজনৈতিক শিশির, দার্শনিক শিশির, সন্দেহবাদী শিশির, শুষ্ক-হৃদয় শিশির, দেব-দেবী-অবতারে অবিশ্বাসী শিশির, তার্কিক শিশির, বৈজ্ঞানিক শিশির গৌর প্রেমে বিভোর হইয়া, বিনা বাক্য-ব্যয়ে বৈষ্ণব হইলেন। স্বভাব-গম্ভীর বৈজ্ঞানিক বালকবৎ কাঁদিলেন। বিজ্ঞানগ্রন্থ, রাজ-নৈতিকগ্রন্থ, পোলিটিকেল একানমির পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করিয়া কৃত্রিম বিজ্ঞতার বক্ষে পরাঘাত করিয়া শিশির বৈষ্ণব গ্রন্থের জন্য, "বটতলার পুঁথির জন্য পথে পথে ফিরিতে লাগিলেন।

পুস্তক বিক্রেতা,　　পুঁথি শিরে করি
রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমে।
তার পাছে পাছে　　ঘুরিয়া বেড়াই
চেয়ে থাকি পুঁথি পানে।
বটতলা যাই　　দুধারেতে চাই
বৈষ্ণবের পুঁথি আছে।
ইহাই ভাবিয়া　　থাকি দাঁড়াইয়া
সেই দোকানের কাছে।

দেশে বিদেশে বিখ্যাত, দুর্দ্দান্ত অমৃত-বাজার-পত্রিকার সম্ভ্রান্ত, সুচতুর সম্পাদকের এই দারুণ দীনাবস্থা!! গৌর-প্রেমের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি চাহেন, মহাশয়? শিশিরের এই অবস্থা তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণের সমসাময়িক; স্বয়ং শিশির কর্তৃক বিবৃত। এ অবস্থার বেগ অতি তীব্র; নব প্রণয়ীর নবানুরাগ অপেক্ষাও অধিকতর উগ্র;—সভ্যতা-মার্জ্জিত সংযত ভাব এ অবস্থায় আদৌ সম্ভবে না। সুচতুর সম্পাদক এখন (সংসারের চক্ষে) ছেলে মানুষের ছেলে মানুষ;

খোল করতাল　　ধ্বনি কাণে গেলে
শ্রীগৌরাঙ্গ পড়ে মনে।
আনন্দিত মনে　　ধ্বনি লক্ষ্য করি
ধাই যাই সেই স্থানে॥
বৈষ্ণবের পুঁথি,　　চরিতামৃতাদি,
দেখিলে বুকেতে করি।
পড়িতে না পারি,　　সূচিপত্র হেরি
কান্দিয়ে কান্দিয়ে মরি॥

গৌরাঙ্গ-হস্তের ক্রীড়নকের বা লীলা-যন্ত্রের এই স্বভাবই স্বাভাবিক। শ্রীচৈতন্য চির-ক্রীড়াশীল, কি শচির ক্রোড়ে, কি শ্রীবাস গৃহে, রাজ-পথে, গঙ্গাতীরে, টোলে চৌপাঠীতে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কালে, কি বাল্যে কি যৌবনে, কি সংসারাশ্রমে, কি সন্ন্যাসে, কি আবির্ভাবে কি অন্তর্ধানে, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বব সময়ে বৈকুণ্ঠের সেই

ন ...ড়াশীল, ক্রন্দনশীল, লীলা-কার্য্য-...নন্দ-উৎসাহ-হাস্য-উচ্ছ্বাসময়; উদ্দাম ...অনুরাগে, বাল-চাপল্যে বৈরাগী। তিনি ...ার পূর্ব্বেই ষষ্ঠি ঠাকুরাণীর "সাট" ভক্ষণ ...রেন; নারায়ণের নৈবিদ্য কাড়িয়া খান; তিনি বলে বিষ্ণু-খট্টা লইয়া তাহাতে বার দিয়া বসেন; তিনি ব্রাহ্মণ পুত্র হইয়াও এঁটো ঝুঁটো স্পর্শ করেন, হাড়ি মুচি ছুইয়া অশুচি অঙ্গে শচী দেবীকে ছুইয়া দিবেন বলিয়া ভয় দেখান;—

ঘরে শিশু শুয়ে আছে নিমাই যাইয়া।
ধীরে ধীরে মুখে চিত্র করে কালি দিয়া॥
কারো ঘরে দুধ খাই পলাইবার বেলা।
চেঁচাইয়া বলে "তোদের দুধ খেয়ে গেলা॥"

নিমাই কাপড় চিবান, ঘরের হাঁড়ী কুঁড়ি ভাঙ্গেন, মায়ের অঞ্চল ধরিয়া এমন ক্রন্দন কাঁদেন যে পাড়া শুদ্ধ লোক জুড়িয়াও তাহা ক্ষান্ত করিতে পারে না। সর্ব্বশাস্ত্র বিদ নিমাই পণ্ডিত পথের লোকের পশ্চাৎ দৌড়িয়া ধরেন, তাহাকে তামাসা বিদ্রূপ করেন, তাহার সহিত ক্রীড়া কৌতুকে হাস্য রসের তুফান উঠান। ক্ষেপা নিমাই

সারাদিন খেলি বেড়ায় গঙ্গার বালিতে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা রৌদ্র বোধ নাহি নিমাই চিতে॥
ধরিবারে গেলে দ্রুত পলাইয়া যায়।

নাচুনি, কুঁদুনি, কাঁদনি আর মাতুনিই নিমায়ের নিয়ম।

ব্রজের খেলা দৌড়াদৌড়ি
নদের খেলা (ধুলায়) গড়াগড়ি।

ঠাকুরটী স্বর্গের স্বর্গীয় ছেলে মানুষ। কেহ ছেলে মানুষ না হইলে, জ্ঞান-বৃদ্ধ, বিজ্ঞ, বহুজ্ঞ, বৈষয়িক, বৈজ্ঞানিক যিনিই হউন, পুনঃ-সংস্কারে সরল বালকবৎ না হইতে পারিলে, এই ছেলে মানুষটীর স্বর্গ সান্নিধ্যে যাওয়া সম্ভবে না। সে ভাগ্যে যিনি ভাগ্যবান হইবার হন, নিমাই নিজেই তাঁকে বালক বানাইয়া, বৈরাগী বানাইয়া তবে বিভূতি প্রদান করেন।

অতএব আশ্চর্য্য নহে যে আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার যৎকালে রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জ্ঞানানুসন্ধানে গুরুগম্ভীর ভাবে দেশ বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন, তদ্ অব্যবহিত পরেই তিনি বালকবৎ সংসারী বিরাগীবৎ, উন্মত্তবৎ প্রতিভাত। তখন নিমায়ের নব প্রেমে তিনি পড়িয়াছেন, নিমায়ের লীলা-পুত্তলী হইয়া ভগবদ্ভাবে বিভোর, নাচিতেছেন, কাঁদিতেছেন, হাসিতেছেন, ধুলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। রাজনৈতিকের সে "রাশিভারি" তখন আর নাই; বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান-তর্ক উড়িয়া গিয়াছে;—বৈভবগর্ব্ব তখন এই প্রেম-বৈরাগীর নিকট তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ। শিশিরকুমার তখন গৌরাঙ্গের প্রেম রাজ্যে প্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। সে প্রবেশের কি পরমানন্দ, কি পবিত্র পুলক, তাহা কেবল প্রবেশকারীই বলিতে পারেন। তিনিও বোধ হয় বলিতে পারেন না; কারণ তাহা অনির্ব্বচনীয়! শিশির অকূল পাথারে কূল পাইয়া, নিরাশ আঁধারে আশার জ্যোতি দেখিয়া বলিলেন;—

এ ভবে আসিয়া, বেড়াই ভাসিয়া
সদা হাবুডুবু খাই।
বুঝিলাম মনে পানু এত দিনে
প্রাণ জুড়াবার ঠাঁই।
মনে বিচারিনু, যা হতে পাইনু
দুঃখ মাঝে সুখ এত।
সব তেয়াগিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া
তাঁহারে সঁপিব চিত।

আলোচ্য গ্রন্থ গ্রন্থকারের মধ্যমাগ্রজ

৺ হেমন্তকুমার ঘোষের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। হেমন্তকুমার শিশিরকুমারের হৃদয়ে ভগবদ্‌প্রেম সঞ্চারের এক প্রকৃষ্ট পার্থিবহেতু; শিশির ভগবদ্ভক্ত হইবেন, বৈষ্ণববর হেমন্তকুমার বহু অগ্রেই ভবিষ্য-বক্তার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শিশির এমন অনেক কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু যৎকালে জলদগম্ভীর ভাবে, স্বর্গের শিলমোহরে অঙ্কিত হইয়া ভ্রাতার ভবিতব্য বাণী শিশিরের নিকট পৌঁছিল, "মেজ দাদা" যখন লিখিয়া পাঠাইলেন;—

"শিশির! কোন দেবতা, আমি তাঁহাকে চিনি "না, আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, তোমার "কনিষ্ঠ শিশির শ্রীগৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস। ঐ "দেহ দ্বারা মহাপ্রভু অনেক কার্য্যসাধন করিবেন।"

তখন শিশির পরমেশ্বরের প্রেম-পথে প্রায় আনীত হয় হয় হইতেছেন। শিশির উপরোক্ত পত্র পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর রোদন করিতে লাগিলেন। হেমন্তের কথা শিশির বিশ্বাস করিলেন;—কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন;—

"এ আবার শ্রীভগবানের কি লীলা? আমি "কঠিন, কর্কশ, ভক্তিশূন্য, রাজনীতি লইয়া বিব্রত। "ইংরাজী পড়িয়া এক প্রকার নাস্তিক হইয়াছি।"

শিশিরকুমার ঘোষের ভগবদ্ভক্তি ও গৌরাঙ্গানুরাগের উৎপত্তির বিবরণ উৎসর্গ পত্রে কিঞ্চিৎ বিবৃত আছে। বিবরণ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অত্যন্ত আবশ্যকীয়। শিশিরের আশৈশব জীবন-ঘটনার সহিত এ ঘটনা তুলিত করিয়া মনোতত্ত্ববিদের অধ্যয়নীয় এবং বিশ্লেষনীয়। শিশির কুমারের মত একটী মানুষের মানস-বিকাশ স্তরে স্তরে স্তরে, কিরূপে, কোন্ অলক্ষ্য এবং অনবধারিত সূত্রে সংঘটিত হয়, অনুসন্ধান করা মনো-বিজ্ঞানের অযোগ্য নহে। শিশিরকুমার ঘোষের জীবনচরিত-লেখক,—(—আশা করি এ জীবন দীর্ঘস্থায়ী হইবে এবং উপযুক্ত ব্যক্তিই এ জীবনের জীবনী লিখিবেন) তাঁহার মানসিক বিবিধ বিবর্ত্তনের সবিশেষ ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করত বিবৃত করিতে যেন না ভুলেন।

শিশিরকুমার আশৈশব কার্য্যশীল, কার্য্যানুরাগী, কার্য্যতৎপর। শিশিরকুমার কার্য্য-পরায়ণ, কার্য্য অসংশ্লিষ্ট বাক্যের বৈরী। বিপুল কার্য্য স্রোতের মাঝখানেই গৌর-প্রেমে মাতিলেন। কার্য্যপরায়ণের পক্ষে প্রেমেরও পরিদৃশ্যমান কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারা সম্ভবে না। শিশির সচ্চিদানন্দে নবানুরাগের পূর্ণ জোয়ারে নবপ্রণয়ীর মত প্রতিজ্ঞা করিলেন;—

যেন উপকার, আপনি করিলে,
আমি শোধ দিব ধার।
এই জগ মাঝে, গৌরাঙ্গ গাওয়াব
যত দিন বাঁচি আর॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা, লিখিয়া লিখিয়া
আগে জানাইব জীবে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা, কর্ণেতে পশিলে
অবশ্য তোমার হবে॥
* * *
লীলা পড়ি জীবে, নির্ম্মল হইবে,
তখন কৌপীন পরি।
গৌর গুণ কথা দুঃখী জনে কব,
জনে জনে গলা ধরি॥

ইহা নবানুরাগীর অনুরাগ-উচ্ছ্বাস-প্লাবিত আন্তরিক এবং অকৃত্রিম সাধ। তবে কিনা, যখন ৺ কাশিধামে অভ্রভেদী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াও জননীর একধার স্তন্য দুগ্ধের 'ধার শোধ' দেওয়া সম্ভবে না; তখন ভগবান কর্ত্তৃক ভক্তি-দানের ধার-শোধ দেওয়া একান্তই অসম্ভব। একান্ত যে অসম্ভব, তাহা

প্রতিজ্ঞাকারীই পূর্ণ মাত্রায় বুঝেন। কিন্তু এখনই বলিয়াছি, এ প্রতিজ্ঞা অনুরাগ-রস-প্লাবিত হৃদয়ের স্বত উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস।

শিশিরকুমার ঘোষের ন্যায় কার্য্য-পরায়ণ গৌর-প্রাণ ব্যক্তি এ প্রতিজ্ঞা, সর্ব্বাঙ্গ পণে যথা সম্ভব পালন করিতেছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। আমাদের আলোচ্য এই "নিমাই চরিত" উপরোক্ত প্রতিজ্ঞারই অন্যতম এক অতি উপাদেয় ফল।

মহা প্রভুর লীলাবৃত্ত প্রাচীন ভক্তগণ কর্ত্তৃক এবং প্রভুর স্বগণ অন্তরঙ্গগণ কর্ত্তৃক বিবৃত আছে। সে সব প্রায়স পদ্যময়ী রচনা। গৌর-চরিতের গদ্যগ্রন্থ বিরল। তবে সৌভাগ্যক্রমে ইদানীং অতি বিরল নহে। ভক্তি-প্রাণ শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মার "চৈতন্য-চন্দ্রিকা" এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যসুধী গৌর-পরায়ণ ৺জগদীশ্বর গুপ্ত প্রণীত "চৈতন্য-লীলামৃত" যথাক্রমে চৈতন্য-চরিতের বৃহৎ এবং বৃহত্তর ও উত্তম গদ্যগ্রন্থ।

ভক্তি-পয়োধি পরম ভাগবৎ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত এ ক্ষেত্রে তৃতীয়; কিন্তু বৃহত্তম এবং অত্যুৎকৃষ্ট সাম্প্রদায়িক গদ্যগ্রন্থ।

আমরা যাহার আলোচনায় ব্রতী ;— ইহা "নিমাই-চরিতের" প্রথম খণ্ড,— সুবৃহৎ গ্রন্থ। ইহা আরও দুইখানি শাখায় সমাপনীয়। প্রথম শাখা উপক্রমণিকা বাদে উনবিংশ অধ্যায়ে সমাপ্ত; মহা প্রভুর জন্ম হইতে, জগাই মাধাই পরিত্রাণ পর্য্যন্ত ইহাতে গ্রন্থিত হইয়াছে। উপক্রমণিকায় চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবরণ ব্যাখ্যাত আছে।

সমালোচ্য গ্রন্থের এই প্রথম শাখায় প্রথম হইতে শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত গৌরাঙ্গ-লীলা এবং সে লীলার ঘটনাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রামাণিকগ্রন্থও প্রাচীন মহাজনদিগের পদাবলী হইতে উহা গৃহীত। জনশ্রুতি হইতেও দুই একটী লীলা-তত্ত্ব উদ্ধার করা হইয়াছে। গ্রন্থকার বলিতেছেন ;—

"শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু, ইহা লইয়া আমি প্রথম ও
"দ্বিতীয় খণ্ডে কিছু বিচার করি নাই।"

আমরাও এ বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং প্রামাণিক ঘটনায় প্রমাণীকৃত, তাহার বিচার করিতে বসা কেবল বিড়ম্বনা, আর সে বিচারে যিনি অবিশ্বাসী, তাঁহার কোনও উপকার নাই; অথচ বিশ্বাসী হৃদয়ে পদে পদে আঘাত লাগার সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে আমি এই প্রবন্ধের প্রথমাংশেই সূচিত করিয়াছি, লীলা-গ্রন্থের, ভক্ত হৃদয়ের ভক্তি-উচ্ছ্বাসের সাধারণ ভাবে আদৌ সমালোচনা সম্ভবে না। যদি তাহার কোন সমালোচনা সম্ভাবিত হয়, তাহা প্রেমানুরাগীর প্রেমানুরাগ-রঞ্জিত অপর একটী উচ্ছ্বাস। সে উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করিবার শক্তি আমার নাই। পরন্তু তাহার (বিফল) চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেও অপার একটী বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া উঠে।

'অমিয় নিমাই-চরিতের' প্রতি অক্ষরে অমিয় সিঞ্চিত। ভক্তহৃদয়ে, উহার প্রত্যেক অক্ষর অবিশ্রান্ত অমিয় উৎস ছুটায়, শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের সঞ্চার করে। কিন্তু গ্রন্থকার বলিতেছেন ;—

"প্রথমখণ্ডে আমি রস বিস্তারের চেষ্টা করি নাই।
"* * * তাহার কারণ যে, রস শাস্ত্রের নিয়ম
"এই যে, রস বিস্তার ক্রমে ক্রমে করিতে হয়। এক-
"বারে রস প্রস্ফুটিত করিলে উহা কেহ আস্বাদ করিতে

"পারে না। অনেক সময় অনিষ্ট হয় * * * 'দ্বিতীয় খণ্ডে আমি রস বিস্তারের প্রাণপণ চেষ্টা করি- "য়াছি। * * * দ্বিতীয় খণ্ড না পড়িলে, সকলে শ্রীগৌরাঙ্গ, কি তাঁহার ধর্ম্মকে, সম্যকরূপে আস্বাদন "করিতে পারিবেন না। যিনি গৌর-লীলা-রসে সাঁতার দিতে চাহেন, তাঁহাকে দ্বিতীয় খণ্ডও পড়িতে "হইবে।"

শুনিয়াছি, "দ্বিতীয় খণ্ড"ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা আমি অদ্যাপি দেখি নাই। বহু দিন হইতে চলিল, কিঞ্চিৎ আলোচনার জন্য, প্রথম খণ্ড থানি আমাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। নানা বিঘ্ন বশতঃ আমি এতদিন অভিপ্রেত আলোচনা করিয়া প্রকাশিত করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আমি কাতরান্তকরণে গ্রন্থকর্ত্তা মহোদয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

ঘোষজা মহাশয়ের ন্যায় প্রবীণ লেখকের ভাষা ও রচনা সম্বন্ধে এত কাল পরে কোনও কথা বলিতে, অপ্রশংসা বা প্রশংসা করিতে বসা ধৃষ্টতা বিবেচনা করি। অথাচ, সমালোচক যতই অযোগ্য হউক, সে কথা কিছু বলিতে বাধ্য; ন'হিলে তাহার মামুলী কাজ সম্পন্ন হয় না। কিন্তু, আমার পক্ষে এ মামুলীকাজ, বস্তুতেই, বামন হইয়া, চন্দ্রের উচ্চতা সমালোচনা করার ন্যায়। যাঁহার সম্পাদিত বাঙ্গালা অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে সংবাদপত্র পাঠ করিতে ও প্রথম প্রবন্ধ লিখিতে শিখিয়াছিলাম, তাঁহারই বাঙ্গালা রচনার বিচার ভার আমার উপর!! বিচিত্র অবস্থা! শিক্ষকের সমালোচক ছাত্র! তবে এটা নাকি কলি-যুগ, তাই সমালোচকের অধিকার সূত্রেই বলিতেছি যে, পরিপক্ক, প্রগাঢ় অথচ সজীব, প্রাঞ্জল ও পরিষ্কৃত;—'অমিয় নিমাই-চরিতের' ভাষা সর্ব্বত্রই শক্তিময়ী,—রচনা আদ্যপান্ত সুধা-সিঞ্চিনী।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

বঙ্কিমবাবু।

(বিদ্যমান)

বঙ্কিম চলিয়া গিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্য-সংসার আঁধার করিয়া, জাতীয় সাহিত্য-সিংহাসন খালি করিয়া, বঙ্কিম চলিয়া গিয়াছেন। দেশের লোক, আবাল বৃদ্ধ বনিতা "হা বঙ্কিম হা বঙ্কিম" করিয়া কাঁদিতেছেন। সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে সকলেই কাঁদিতেছে। বঙ্গের অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূ বাহিরের কোন খবরই রাখেন না, লেখা পড়ার মধ্যে কেবল একটু বাঙ্গালা পড়িতে পারেন। তিনিও বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনী মৃণালিনী প্রভৃতি উপন্যাস পড়িয়া আনন্দ-রসে উচ্ছ্বলিত হইয়াছেন। আর যে বাঙ্গালী ইংরাজী সাহিত্যের অকূল সাগরে পাড়ি দিয়াছেন, তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক পড়িয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের বিচিত্র লীলা লহরীতে আন্দোলিত হইয়াছেন। তাই বঙ্কিমের শোকে, শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত, আবাল বৃদ্ধ বনিতা অদ্য অধীর।

কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, যেন শোক করিবার কারণ নাই। কেন না,

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই, তিনি বদ্যমান রহিয়াছেন। আমার পিতৃদেবের বিয়োগে আমি একটা শিক্ষা পাইয়াছি;—যাঁহারা খুব বড় ও মহৎ, তাঁহারা মরেন না। শোকের অন্ধকারে, দিন কতক মাত্র তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই না। পিতৃ-দেব যখন স্বর্গারোহণ করিলেন, দিন কতক "কোথায় যাইলেন, কোথায় যাইলেন" বলিয়া কাঁদিলাম। কিন্তু যখন মোহ দূর হইল, দুঃখ রজনী অবসান হইল, বুদ্ধির আলোক ফুটিল, তখন পিতৃদেবকে আবার দেখিতে পাইলাম। এ আর সে দেহ নহে, এ নূতন দেহ। আগেকার সুন্দর দেহ হইতে এখনকার দেহ সুন্দরতর। সে দেহ বয়সে কথঞ্চিৎ জীর্ণ হইয়াছিল, এ দেহ নূতন। সে দেহ চর্ম্মচক্ষুতে দেখিতে পাইতাম, এ দেহ মর্ম্ম বা দিব্যচক্ষুতে দেখিতে পাইতে লাগিলাম। বুঝিলাম—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

"যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ, আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে।"

কিন্তু এই কথা গীতাকার যে ভাবে লিখিয়াছেন, আমি তাহা হইতে একটু পৃথক ভাবে অনুভব করিয়াছিলাম। যখন শোকের বেগ কমিল, তখন পুনর্ব্বার গৃহে পিতৃ-দেবের আবির্ভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। যে ঘরে তিনি বসিয়া লিখিতেন, পড়িতেন, বোধ হইত, তিনি আবার সেই ঘরে বসিয়া পূর্ব্বের মত লিখিতেছেন, পড়িতেছেন। কখন বা বোধ হইত, তিনি বেড়াইতেছেন। দেহের সেই (গম্ভীর) কনক কান্তি কত সময় যেন চক্ষুর উপর দেখিতাম। আবার যখন উদ্যানের দিকে তাকাইতাম, তখন তাহার রোপিত বৃক্ষাবলী, তাঁহার খাত সরোবর, তাঁহার নির্ম্মিত গৃহ—যে দিকে তাকাই, সকল বস্তুতেই, তাঁহার সত্তা, তাঁহার আত্মা, তাঁহার শোভা দেখিতে পাইতে লাগিলাম। এমন কি, উদ্যানের বায়ু যেন তাঁহার পবিত্র নিশ্বাসে অনুপ্রাণিত, সেই কানন মৃত্তিকা যেন তাঁহার পাদ-স্পর্শ-পূত হইয়া যাইল। তাঁহার বাস পবিত্র নিকেতন আমার নিকট শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি হইল। ব্যক্তি বিশেষের নিকট যেমন পিতা, বিশেষত ঋষিতুল্য পিতা, জাতীয় সাহিত্য পক্ষে তেমনি মহা গ্রন্থকার। বঙ্কিম বাবুর, মহাজন। মহাজন গুরু। গুরু পিতৃ-তুল্য। তাই বলিতেছিলাম, বঙ্কিম বাবু, বর্ত্তমান বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের নিকট পিতৃ-তুল্য। পিতার বিয়োগে যেমন সন্তান-গণের শোক হয়, বঙ্কিমবাবুর বিয়োগে অদ্য বঙ্গ-সাহিত্য-সেবিগণ সেইরূপ শোকাকুল। কিন্তু শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস এখন গিয়াছে। এখন আমরা আবার চৈতন্যলাভ করিয়াছি। এখন আমরা বুঝিতেছি, বঙ্কিমবাবু আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই। তিনি আমাদিগের হৃদয়ের গৃহে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে, তাঁহার জীবনের স্মৃতিতে, তাঁহার মানস পুত্রবৃন্দে, তাঁহাকে চতুর্দ্দিকেই দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গসাহিত্য অদ্য তাহার নিশ্বাসে অনুপ্রাণিত, তাঁহার জন্মস্থান তাঁহার পাদস্পর্শপূত, বঙ্গসাহিত্য-সাধকের একটী নূতন তীর্থভূমি।

সঞ্জীবচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, অক্ষয়চন্দ্র,

রবীন্দ্র, যোগেন্দ্র, রমেশ—বঙ্কিমচন্দ্র-প্রতিভার প্রভা। সঞ্জীববাবু, বঙ্কিম-রবি-প্রতিফলিত চন্দ্রালোক। চন্দ্রনাথবাবুর শকুন্তলাতত্ত্ব, বঙ্কিমবাবুর উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্বোধিত। তাঁহার হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণ বঙ্কিমের ব্রাহ্মণত্বে জীবিত। চন্দ্রশেখরবাবুর উদ্ভ্রান্ত প্রেম,বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের দপ্তরের এক খানি মাত্র কাগজ পরিবর্দ্ধিত; কমলাকান্তের নানাবিধ সুরের মধ্যে একটী সুর মাত্র গীতিপুঞ্জে দীর্ঘীকৃত, কলকণ্ঠে মধুর নাদিত। অক্ষয়বাবু "বঙ্গদর্শনে," "সাধারণীতে," "নবজীবনে" বঙ্কিমবাবুর মেধাবী শিষ্য,রবীন্দ্রবাবু বঙ্কিমবাবুর সহজ চলিত ভাষা আরও সহজ করিয়া, লিখিত ভাষায় কথিত ভাষার আরও সমাবেশ করিয়া, বঙ্কিমবাবুর কবিত্বময় গদ্য আরও কবিত্বময় করিয়া, সুন্দরে সুন্দর—মিশ্রিত করিয়াছেন। রমেশবাবুর "বঙ্গবিজেতা" বঙ্কিমবাবুর উৎসাহে লিখিত। যোগেন্দ্রবাবুর আর্য্যদর্শন বঙ্গদর্শনের অনুযাত্রী। আমাদিগের দেশের আরও অনেক সুলেখক আছেন, তাঁহারা নিজেরাই স্বীকার করিবেন যে,বঙ্কিম তাঁহাদিগের সাহিত্য জীবনের প্রবৃত্তি বা জন্মদাতা,তাঁহাদিগের রচনাতে আমরা বঙ্কিম চন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছি। তবে কেন না বলিব, বঙ্কিম বিলীন হন নাই। এক বঙ্কিম চন্দ্র, শত বঙ্কিমচন্দ্র হইয়া, শত লেখকের মস্তিষ্কে বিভাষিত দেখিতেছি। সেই শত মস্তিষ্ক হইতে আবার শত নবকুমার বঙ্কিমচন্দ্রের অংশে প্রসূত হইবে।

দেখিতে পাইতেছি, বঙ্গসাহিত্য-জগতে ভূতকালে যাহা কিছু ভাল ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সারাংশ বর্ত্তমানে আকর্ষণ করিয়া, নিজের প্রতিভা দ্বারা তাহা উজ্জ্বলীকৃত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া ভবিষ্য সাহিত্যের ক্রমিক উন্নতির অনন্ত পথে তাহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রত্যেক মহাপুরুষ ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমানে বিরাজ করেন। প্রত্যেক মহাপুরুষ নিজেই কতক পরিমাণে ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান। ভূতকালে যাহা ভাল ছিল, তাহা তাঁহাদিগের হৃদয়ে আকৃষ্ট ও ধৃত; বর্ত্তমান কালের যাহা ভাল আছে, তাহা ঘনীভূত; এবং ভবিষ্যতে যাহা ভাল হইবে, তাহা তাঁহাদেরই উৎকর্ষলাভের ফল। বঙ্কিম বাবু, তাঁহার রচিত গ্রন্থ এবং তাঁহার রচনা-প্রণোদিত লেখকবৃন্দ, এ সকল কথার জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

আমি বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থের ভিতর, তাঁহারি প্রতিভায় উন্মেষিত প্রতিভা-সম্পন্ন গ্রন্থকারগণের ভিতর, তাঁহার সহস্র পাঠকের হৃদয়-দর্পণের ভিতর, যুক্তি-মূলক হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের চেষ্টার ভিতর, এক বঙ্কিমচন্দ্রকে সহস্রধা দেখিতে পাইতেছি। অদ্য বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ বঙ্কিমময়। জাহ্নবীকূলে তাঁহার চিতার যে পাবক-শিখা উত্থিত হইয়াছিল, তাহার সহিত তাঁহার প্রতিভাবহ্নি আরও দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহার জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিত না,মানিত না,তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেছে, মানিতেছে, আরও চিনিবে, আরও মানিবে, বঙ্কিম-প্রতিভায় তাঁহাদিগের আঁধার হৃদয় আলোকিত হইবে।

(ইংরাজি না বাঙ্গালা)

ইংরাজি উপন্যাসকার থ্যাক্যারে তাঁহার জীবনচরিত লিখিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গালী উপন্যাসকার বঙ্কিম বাবুও নাকি বলিয়াছেন যে, বার বৎসরের মধ্যে যেন কেহ তাঁহার জীবনচরিত না লিখেন। থ্যাক্যারের অনুরোধ পালিত হয় নাই। বঙ্কিম বাবুর আদেশ পালিত হইবে কি না,

তাহা জানি না। কিন্তু আমি তাহার জীবন-বৃত্ত লিখিয়া তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে উদ্যত নহি। প্রধানতঃ বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া কয়েকটী কথা নিবেদন করিতে চাহি।

ইংরাজি ভাষায় বঙ্কিম বাবুর অসাধারণ দখল ছিল। বঙ্কিম-হেষ্টি যুদ্ধে, বঙ্কিমের ইংরাজির শক্তিতে, ইংরাজি নিপুণ হেষ্টিকে অস্থির হইয়া "ধন্য ধন্য" বলিতে হইয়াছিল। এমন কি, তখন কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমের ইংরাজি অধিক মিষ্ট বা বাঙ্গালা অধিক মিষ্ট, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

কিন্তু ইংরাজিতে এমন অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকা সত্বেও, তিনি ইংরাজি রচনাতে যশোলাভ করার কুহকে মজেন নাই, মাতৃভাষা-সেবা-পরাঙ্মুখ হন নাই। সত্য বটে, তিনি বাল্যবয়সে Raj Mohan's wife নামে একখানি ইংরাজি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। মধুসূদন প্রথমে The captive Lady নামক একখানি কাব্য বিদেশীয় ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই জনেই অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি, দুই জনেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন;—বঙ্কিম, শীঘ্র,—মধু বিলম্বে। তাঁহারা ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া একজন বঙ্গভাষাতে নূতন গদ্যে অমৃত ঢালিয়া দিলেন, আর একজন নূতন পদ্যে অপূর্ব্ব 'মধুচক্র' রচনা করিলেন।

উদ্ভ্রান্ত সাহেবিয়ানা-প্রিয় মধুসূদন শেষে অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেনঃ—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—
তা সবে' (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধনলোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!

* * *

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে;—
"ওরে বাছা, গৃহে তব রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই? যারে ফিরে ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।"

বঙ্কিম বাবু বাল্যকালের পর আর "পরধন লোভে মত্ত" হন নাই, পরধন ভিক্ষা করেন নাই, অল্প বয়স হইতেই তিনি মাতৃভাষা রূপ খনিতে মণিজাল আহরণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে অনুতপ্ত হইতে হয় নাই।

অদ্যাবধি কোন ব্যক্তি কোন পরকীয় ভাষাতে আদর্শ গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন নাই। যদি কেহ অমর বা স্থায়ী গ্রন্থ লিখিতে চাহেন, তাঁহাকে মাতৃভাষাতে রচনা করিতে হইবে। সুতরাং যাঁহারা সাহিত্য-যশোমন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের একমাত্র সোপান মাতৃভাষা। মাতৃভাষা জাতীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিবার সহজ পথ, আপামর সাধারণের কর্ণস্বরূপ। মাতার ক্রোড়ে বসিয়া স্তন্য পান করিতে করিতে, মাতার অমিয় ক্ষরিত মধুর বচনে যে ভাষা শুনিয়াছ,—পিতার ক্ষেমঙ্কর গম্ভীর উপদেশে যে ভাষা শুনিয়াছ, সহোদরার কোমল কমনীয় স্মিত সম্ভাষণে যে ভাষা বিভাষিত, প্রেয়সীর প্রাণারাম প্রণয়-পুষ্পাঞ্জলি যে ভাষায় স্বামী চরণে নিবেদিত, যন্ত্রণায় প্রাণ ছট ফট করিলে যে ভাষায় ভগবানকে ডাকি, অন্তিম কালে গঙ্গাতীরে বালুকাশয্যা-শায়ী হইলে যে ভাষায় পতিত পাবনের নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করে—বাল্যে বার্দ্ধক্যে, স্বাস্থ্যে রোগে, শোকে প্রণয়ে, উৎসবে বিপদে, জীবনে মরণে, যে ভাষা প্রাণের সহিত জড়িত;—সেই মাতৃভাষা, সেই

চিরপ্রিয়া, চিরপূতা, চিরপূজনীয়া মাতৃভাষা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ ভাষা কি আছে? জাতীয় হৃদয় আয়ত্ত করিবার, প্রশস্ত করিবার এমন ক্ষমতা-শালিনী শক্তি আর কিসের আছে? স্বদেশ-ব্যাপিনী সহানুভূতি, মহীয়সী প্রতিভার সহিত মিশ্রিত হইলে, স্বতই মাতৃভাষা ক্রোড়ে গড়াইয়া পড়ে, অকপট প্রেমে স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের গলা জড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া আলাপ করিতে আরম্ভ করে। স্বজাতির নিকট যদি কাহারও কোন সংবাদ প্রচার করিবার থাকে, মাতৃভাষা তাহার অবশ্য অবলম্বনীয়। স্বদেশে, ধর্ম্ম প্রচারে, গভীর ও বিস্তৃত রাজনৈতিক প্রচারে,জ্ঞান প্রচারে, মাতৃভাষা একমাত্র সম্বল। মহাপণ্ডিত বুদ্ধদেব মাতৃভাষায়, জনসাধারণের ভাষায়, তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তাঁহার শিষ্য বলিলেন "প্রভু, সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিলে ভাল হয় না কি?" সর্ব্বজীবের দুঃখে আর্দ্রহৃদয় বুদ্ধদেব বলিলেন "না, আমার ধর্ম্ম জনসাধারণের জন্য। হে ভিক্ষুগণ! আমার উপদেশ বাক্য তোমরা সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ করিও না। জনসাধারণের ভাবায় আমার ধর্ম্ম প্রচার হউক!" ঈশা মাতৃভাষায় তাঁহার প্রেম ও দয়ার ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। কেশব শেষ কালে দিন দিন মাতৃভাষা অধিকতর আশ্রয় করিতেছিলেন। (Wesley) ওয়েসলি টিবিতে দাঁড়াইয়া বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সমাগত ১০।১৫ হাজার কুলিকে মাতৃভাষায় ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন; মূর্খ অনক্ষর কুলিমজুর মাতৃভাষার দ্রাবক শক্তিতে দ্রবীভূত হইয়া যাইত, তাহাদিগের ধূলি-ধূষরিত বদনমণ্ডল ভগবদ্প্রেমাশ্রুর রজত ধারাতে উজ্জ্বল হইত; কত কুলিমজুর হৃদয়ের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছা যাইত, চৈতন্য-সংকীর্ত্তনে ভক্ত বৈষ্ণবের ন্যায় ধরাতলে লুণ্ঠিত হইত।

এই ওয়েস্‌লির ধর্ম্ম আপামার সাধারণের নিকট প্রচারিত হইল, আপামার সাধারণের চরিত্র প্রভূত রূপে সংশোধিত করিল। যেখানে জাতীয় চরিত্র সংশোধিত হইবে, সেখানে রাজনৈতিক সংস্কার আপনিই হইবে। সুতরাং ইংরাজের চরিত্র সংশোধন হওয়ায় রাজনৈতিক সংস্কার সম্পাদিত হইল। এমন কি, একজন বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ বলেন যে, আধুনিক সংশোধিত ইংরাজ চরিত্র ও সংশোধিত ইংরাজ-শাসন-তন্ত্র, আপামার সাধারণের ভিতরে ওয়েস্‌লির ধর্ম্ম প্রচারের দূরগামী ফল! আপামর সাধারণ উদ্ধৃত না হইলে, সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। তাই বঙ্কিম বাবু তার স্বরে বলিয়াছেন, "এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, অথচ ভদ্রলোকদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তাসম্পন্ন।" তাই সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্ কালে বুঝিবে না। বাঙ্গালায় তুমি যে কথা বলিবে না, তাহা চারি কোটি বাঙ্গালী বুঝিবে না, শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক কোন বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। তাই যতদিন রাজনৈতিক আন্দোলক, সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্মপ্রচারক—যতদিন জাতীয় নেতৃগণ বাঙ্গালা ভাবায় আপনাদের মন্তব্য না প্রচার করিবেন, তত দিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

ইহা অতি সহজ কথা। এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা আজিও যে সকলে বুঝেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। শুনিতেছি, "বঙ্গবাসী"র অদ্য ২০০০০ বিশ হাজার গ্রাহক। বঙ্গদেশে কোন্ ইংরাজি পত্রের অদ্যাবধি ইহার সিকি গ্রাহক হইয়াছে? বিংশতি সহস্র গ্রাহক! প্রত্যেক কাগজ খানির যদি পাঁচজন করিয়া পাঠক ধরা যায়, প্রতি সপ্তাহে ১ লক্ষ লোক বঙ্গবাসী পড়িয়া থাকে। দেখুন, লোক-শিক্ষা প্রচারের কি চমৎকার, কি বিশাল যন্ত্র! ইহার সম্পাদক যদি দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যা বুদ্ধি এবং সর্ব্বোত্তম দেশহিতৈষণা সমন্বিত হন, তাহা হইলে দেশে উন্নতির স্রোত চতুর্দ্দিকে কি অচিন্ত্য দ্রুতবেগে বিক্ষিপ্ত হয়! আবার, ইংলণ্ডের মাসিক পত্র Review of Reviewsএর সহিত Helpers নামক স্বদেশহিত-সাধক সভা যেমন সংযোজিত হইয়াছে, মার্কিন পত্র Arenaর সহিত Union of Practical Progress সভা যেমন এই বৎসর সংস্থাপিত হইয়াছে, তেমনি যদি বঙ্গবাসীর সহিত, প্রত্যেক সহরে, প্রত্যেক গ্রামে এক একটী দেশহিতকরী সভা গঠিত ও সংলগ্ন থাকে এবং নগরবাসী এবং পল্লিগ্রামবাসিগণ যদি এই সকল সভা দ্বারা সদনুষ্ঠানে, সংস্কার-কার্য্যে, "বঙ্গবাসী" দ্বারা উচিতভাবে শিক্ষিত, চালিত ও সমন্বিত হয়,—তাহা হইলে কি একটা বিচিত্র অপূর্ব্ব কাণ্ডের সংঘটন হইতে পারে! বাঙ্গালা ভাষাতে এই ব্যাপার সম্ভবপর, ইংরাজিতে নহে। আবার, বাঙ্গালা উপন্যাস ভাল হইলে কত বাঙ্গালীতে পড়ে। উপন্যাস জনসমাজের শিক্ষাদাতা। ডিকেন্সের উপন্যাসে বিলাতে স্কুলের ও জেলের সংস্কার হইয়াছে। Uncle Tom's Cabin উপন্যাস পাঠে, দাসের পদযুগল হইতে শৃঙ্খল খসিয়া পড়িয়াছিল। রমেশবাবুও মাতৃভাষায় লিখিত উপন্যাসের শক্তি বুঝেন। তাই দেখিতেছি, তিনি সমাজের দোষগুলি উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিতেছেন। তাই বলি, বক্তৃতাতে বল, সংবাদ পত্রে বল, উপন্যাসে বল, নাটকে বল, বাঙ্গালা ভাষাতে বঙ্গ সমাজের যে সংস্কার ও উন্নতি হইতে পারে, তাহা ইংরাজীতে কদাপি হইতে পারে না। ইংরাজির প্রয়োজন নাই, তাহা বলি নাই। সাহেবদিগকে যাহা বলিতে হইবে, তাহা ইংরাজিতে অবশ্য বক্তব্য। সমুদয় ভারতকে যাহা বলিতে হইবে, তাহা ইংরাজিতে বক্তব্য। কিন্তু যাহা কেবল বাঙ্গালীকে বলিতে হইবে, তাহা বাঙ্গালাতে বলিতে হইবে, ইংরাজীতে নহে। হে স্বদেশীয় সুশিক্ষিতগণ, বাঙ্গালীর শ্রোতব্য কথা ইংরাজিতে বলিয়া বা লিখিয়া আপনাদিগকে আর বিড়ম্বিত করিবেন না, দেশের অগণ্য লোককে আর বঞ্চিত করিবেন না। বঙ্কিম বাবু যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করুন, তিনি যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করুন। বিপুল গৌরব আপনাদিগকে প্রতীক্ষা করিতেছে। দেশের সার্ব্বজনীন মঙ্গল আপনাদিগের আয়ত্তাধীন রহিয়াছে।

(সাধুভাষা না চলিতভাষা)

বঙ্কিমবাবুর স্বাধীন প্রবৃত্তি, যেমন এক দিকে, তাঁহাকে ইংরাজি ভাষার দাসত্ব হইতে রক্ষা করিয়াছিল, তেমনি অন্যদিকে, তাঁহার বাঙ্গলা ভাষাকে সংস্কৃতের অতিশাসন হইতে মুক্ত করিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর পূর্ব্বে, সংস্কৃত না জানিলে যেন কাহারও বাঙ্গালা লেখার অধিকার ছিল না। লিখিত ভাষার সহিত কথিত ভাষার বিচ্ছেদ ছিল। কোনও গুরুতর বিষয় প্রবন্ধ লিখিতে হইলে সংস্কৃত

শব্দ প্রয়োগ না করিলে, লেখা মঞ্জুর হইত না। বঙ্কিমবাবু চতুষ্পাঠীতে রীতিমত পড়িয়া ও সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও তাঁহার রচিত গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া,কথিত ভাষার যথাযোগ্য প্রভুত্ব সংস্থাপন করিলেন। এক সময় লোকে তাঁহাকে ইহার জন্য পরিহাস করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল, বঙ্কিমি ভাষা পিতা পুত্রে এক সঙ্গে পড়া যায় না। কিন্তু এখন সেই ভ্রম অপনীত হইয়াছে। এ দিকে, বঙ্কিমের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সরল ভাষা আরও সরল হইয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র তাহার প্রধান প্রমাণ। এত কঠিন বিষয়, সূক্ষ্মবিচার,বঙ্কিমবাবু কেমন সরল ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। যেখানে গভীর বিজ্ঞতা, সেখানে সরলতা। অলঙ্কারের পরাকাষ্ঠা, সরলতা। বঙ্কিমবাবু কতকটা সংস্কৃত বর্জ্জিত করিয়া, প্রচলিত কথা অধিকতর সন্নিবেশিত করিয়া, বাঙ্গালাকে অধিকতর বাঙ্গালা করিয়াছেন। ইহাও বঙ্কিমের স্বাতন্ত্র্যের বিশেষ পরিচয়।

ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমের স্বাধীনতা যাহা, তাহা বলিলাম। এখন চিন্তা সম্বন্ধে বলি। বঙ্কিমের স্বাধীন প্রবৃত্তি অনুবাদমার্গ অনুসরণ করে নাই! কেবল বিদেশীয় চিন্তা স্বকীয়-ভাষা পরিচ্ছদে সাজাইয়া তাঁহার প্রতিভা পরিতৃপ্ত হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে পূজ্যাস্পদ বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মাননীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এক অপূর্ব্ব সুন্দর বাঙ্গালা-গদ্য রচনা-প্রণালী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাতে বঙ্কিমবাবুর রচনার পথ পরিষ্কার হইয়াছিল। আমি যাহা লিখিতেছি, তাহাতে কেহ এমন মনে না করেন, আমি বঙ্কিম গুণকীর্ত্তনে,বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা ভাষা যে কত ঋণী, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষাতে এক নবযুগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ঐ যুগের অবতার তিনি। বঙ্কিমবাবু তাহার পর আর এক যুগের অবতারণা করিলেন এবং তিনি এই যুগের দিগন্তবিচারী বিজয়ী বীর, অনুশীলনের অবতার। বাঙ্গালা ভাষা রাজ্যের সম্রাটবংশে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে বঙ্কিম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন, এবং তাঁহার বিবিধবিষয়িণী বুদ্ধি দ্বারা, রাজ্যের সীমা ও গৌরব বৃদ্ধি করেন। বঙ্গের সিংহাসন এখন খালি। এমন কাহাকে দেখি না,যিনি বঙ্কিমের স্থানে বসিবার যোগ্য।

আমি বঙ্কিমের স্বাধীন চিন্তার কথা বলিতেছিলাম। তিনি যে ডার্বিন,স্পেন্সরের ন্যায় কোন একটা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, কোন একটা নূতন মত, নূতন চিন্তা জগৎকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি না। আমি বলিতেছি যে, তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং সংস্কৃত শাস্ত্র একটু নূতনভাবে বুঝাইয়াছেন। ইংরাজি বিজ্ঞান সংস্কৃত শাস্ত্রের দীপে, সংস্কৃত শাস্ত্র ইউরোপীয় আলোকে, পাঠককে নূতন ভাবে দেখাইয়াছেন। সাহিত্যের তিনটী যুগ আছে (১) অনুবাদ যুগ, (২) অনুরচনা যুগ, (৩) মূল রচনা যুগ। ইংরাজি সাহিত্যের সংঘর্ষণে এবং বাঙ্গালীদিগের স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা বশতঃ, অন্য দেশে দুই শতাব্দীতে সাহিত্যের যে পরিমাণে বিকাশ হয়,আমাদিগের দেশে এক শতাব্দীতে সেই পরিমাণে সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছে। এক শতাব্দীতে সাহিত্যের দুইটী যুগের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তৃতীয় যুগের সূত্রপাত হইয়াছে। রাজা রাম-

মোহন রায়ের সময় হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগ, অনুবাদের যুগ, আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যের স্থষ্টির যুগ। বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে বঙ্কিমবাবুর যুগ, অনুকরণ বা অনুরচনার যুগ। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কেবল মাত্র অনুরচনাতে নিঃশেষ হন নাই, তিনি অনুরচনার যুগের শেষভাগে মূল রচনার আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ইংরাজপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান ছিল যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদিগের বিবেচনায়, বাঙ্গালা ভাষার লেখক হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য, নয়ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল "যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র। ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? তখন সুশিক্ষিতে বাঙ্গলা পড়িত না। সুশিক্ষিতে যাহা পড়িত না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহিত না। "লেখক মাত্রেই যশের অভিলাষী। যশঃ সুশিক্ষিতের মুখে। অন্যে সদসৎ বিচারক্ষম নহে, তাহাদিগের নিকট যশ হইলে, তাহাতে রচনার পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না।" সুশিক্ষিতে না পাড়িলে সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিবে কেন? কিন্তু সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা পড়িত না কেন? বাঙ্গালার মূল রচনা ছিল না বলিয়া। বঙ্কিমবাবু তাঁহার মধুর উপন্যাসে, তাঁহার প্রতিভান্বিত "বঙ্গদর্শনে," পাঠ্য মূল রচনা বাহির করিলেন। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী, বাঙ্গালা রচনা আদরে পড়িতে লাগিলেন। সুতরাং বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালার আদর বাড়াইয়া গিয়াছেন। ইহা বঙ্কিমবাবুর স্বাতন্ত্র্যের আর একটী পরিচয়। সেদিন বাঙ্গালা দেশের একজন প্রধান চিন্তাশীল এবং ইংরাজিতে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি আমাকে বলিলেন যে, "এখনও বাঙ্গালা ভাষার মূল রচনা করিবার সময় আসে নাই। এখন ইংরাজি ও সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করা উচিত। অনুবাদ করিতে করিতে ভাষা যখন পুষ্ট হইবে, তখন তাহা মূল রচনার যোগ্য হইবে।" ইহার উত্তর,—যাহারা কেবলমাত্র বাঙ্গালা জানে, তাহারা এই সকল অনুবাদ গ্রন্থ বুঝিবে না। যাঁহারা ইংরাজি ও সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা মূল গ্রন্থ ছাড়িয়া অনুবাদ গ্রন্থ পড়িবেন কেন? অনেক দিন পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবু এই কথা বুঝিয়াছেন এবং বুঝাইয়াছেন।

স্বাধীনভাব বঙ্কিমবাবুর জীবনের সকল বিষয়েই পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমবাবু চাকুরী করিতেন। চাকুরী করিয়াও এমন স্বাধীন ভাবে ও তেজের সহিত চলিতেন যে, ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী মাত্রই তাহা অনুভব করিতেন। কোন সাহেবের বাটীতে তিনি জীবনে কখনও দেখা করিতে গিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। তিনি ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিন্দা বা প্রশংসা গ্রাহ্য করিতেন না। একদিন তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার যেরূপ সর্ব্বমুখী দক্ষতা, আপনি অমুক কার্য্যবিভাগে সেরূপ সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই।" তাহাতে তিনি হাঁসিয়া উত্তর করিলেন,—"ঐ বিভাগে আমার দক্ষতা বুঝিতে সক্ষম এমন কোন কর্ম্মচারী আছেন?" আমাদিগের দেশের লোকে হাকিম হইলে আপনাকে বড়লোক বিবেচনা করে, তাহাদিগের সহিত দেখা হইলে তাহাদিগের দাসত্বমূলক তুচ্ছ প্রভুত্বের কত জারি জুরি করে, সাহেব-

চরণারবিন্দবন্দনার হেয় কাহিনী পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিয়া কত সুখী হয়। বঙ্কিমবাবুর জীবনের শেষ বৎসরে আমি তাহার নিকট শুনিয়াছিলাম—"আমি বিবেচনা করি,চাকুরী আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দুর্ভাগ্য।" এখন কত শিক্ষিত ব্যক্তি "বাবু" ত্যাগ করিয়া Mr. লাভ করিবার জন্য লালায়িত। একজন "মিষ্টার" উপাধিধারী বাঙ্গালী সিভিলিয়ান, বঙ্কিমবাবুর নামের সহিত Mr. যোগ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম তাহার উত্তরে লিখিয়া দিলেন যে "আমাকে 'মিষ্টার' না লিখিয়া 'বাবু' লিখিলেই আমি যথেষ্ট সুখী হইব"। বঙ্কিমবাবুর এই উত্তর পড়িয়া বাঙ্গালী "মিষ্টার" লজ্জাতে অধোবদন হইলেন।

এই ইংরাজি-ক্ষিপ্ত যুগে, ইংরাজি ভাষাতে যশোলাভ করা, ইংরাজি পোষাকে দীপ্তি পাওয়া, ইংরাজি "মিষ্টার"শব্দে গৌরবান্বিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার কখনও দেখি নাই।

দেশের ভিতর বঙ্কিম বাবু অদ্বিতীয় সমালোচক ছিলেন,এ বিষয়ে সংশয় নাই। তাঁহার সমালোচনায় অনেক সময় অতি তীব্র হইত। কিন্তু তিনি শক্রতা বা দ্বেষে কখন তাঁহার লেখনীকে বিষ-প্রদীপ্ত করেন নাই, এবং মিত্রতাতে কখন অনুচিত প্রশংসা করেন নাই। সাহিত্যের এজলাসে, বঙ্গদর্শনের চৌকিতে বসিয়া, তিনি স্বাধীন ও অপক্ষপাতভাবে রায় ফয়সলা লিখিতেন। আবার কেহ তাঁহার নিজের লেখার প্রতিকূল সমালোচনা করিলে তাহাতে তিনি চটিয়া লাল হইতেন না, বরঞ্চ বিশেষ উদারতা দেখাইতেন। প্রায় ৯ বৎসর হইল তিনি "সুখ স্ফূর্ত্তি ও অনুশীলন" বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লেখেন। আমি "নব্যভারতে" তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম এবং আমার বিবেচনায় তাঁহার যে গুলি ভ্রম, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধে আমার নাম প্রকাশ করি নাই, "মীমাংসা-প্রার্থী" বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার কয়েকদিন পরে আমি বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি এইবার আমার প্রতি পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক যত্ন ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন। আমি তাহাতে মনে করিলাম, বঙ্কিমবাবু জানেন না যে, আমি "মীমাংসা প্রার্থী" নাম লইয়া তাঁহার প্রবন্ধের নিন্দা করিয়াছি। একটু কথার পরে তিনি বলিলেন, "তুমিই কি মীমাংসা-প্রার্থী?" ইহার পূর্ব্বে—"বঙ্গবাসী"তে তাঁহার রচনার কোন কোন ভাবের বিরুদ্ধে আমি তীক্ষ্ণ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতেও অভ্রভেদী-ভূধর, অটল বঙ্কিমবাবুর স্নেহ ও অনুগ্রহ আমার প্রতি কখনও ন্যূন হয় নাই। আমি বঙ্কিমবাবুর স্বাধীন ভাবের কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম, এখন বঙ্কিমবাবুর সমন্বয়ের ভাব সম্বন্ধে বলিব।

(সমন্বয়)

প্রাচীনকালে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ, কেবল মাত্র সংস্কৃত শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া, আপনাদিগের জীবনের পথ নির্দ্ধারণ করিতেন। পরে ইংরাজ শাসন প্রচলিত হইল। ইংরাজি-সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ হইল। এ দেশের লোক ইংরাজির সাহিত্যের চক্রে ঘুরিতে লাগিল। এই সাহিত্য-চক্রের বেগ প্রচণ্ড। আবার সেই বেগে আমাদিগের দেশের লোক অনভ্যস্ত। সুতরাং তাহাদিগের মাথা ঘুরিয়া গেল। ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বদেশীয় শাস্ত্র-কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া

বিশৃঙ্খলা-ব্যোম-মার্গে ছুটিতে লাগিল। পরে,—মোক্ষমূলর প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ সাহেবদিগের হিন্দু-মহিমা-প্রচার হেতুই হউক, অথবা "থিয়সফি" সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন বশতই হউক,—অথবা একটী ক্রিয়া অতিরিক্ত হইলেই প্রতিক্রিয়া তাহার প্রতিকার করে, এই সাধারণ নিয়ম বশতই হউক, অথবা দৈবানুগ্রহেই হউক, কিয়ৎকাল পরে জাতীয় কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে লাগিল, জাতীয় ক্ষেত্রজাত ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি আলোচনা করিতে লাগিল। এইরূপে,একদিকে ইউরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞান, অন্যদিকে সংস্কৃত শাস্ত্র, একদিকে প্রাচীন আধ্যাত্মিক ভাব, আর একদিকে নূতন জড়বাদ পরিণত বিজ্ঞান-তত্ত্ব, একদিকে জাতীয় আকর্ষণ শক্তি,আর একদিকে বিজাতীয় বিপ্রকর্ষণ শক্তি—এই দুইটী শক্তির অধীন হইয়া জাতীয় জীবন উন্নতির নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থগুলিও এই দুইটী স্বতন্ত্র শক্তির সমন্বয়ের ফল। তিনি ইংরাজি সাহিত্যচক্রে ভ্রমিত হইয়াও, প্রশান্ত সংস্কৃত শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন—বঙ্কিমবাবু হিন্দুদিগের দুর্জ্ঞেয় সাংখ্যদর্শন, অত্যুন্নত গীতাধর্ম্ম, বহু পল্লবিত পুরাণ মর্ম্ম, অপূর্ব্ব-সমাজ-তত্ত্ব, নব্য হিন্দুদিগের বোধগম্য ও বিলাতি যুক্তি প্রণালী দ্বারা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, অনেক স্থানে ইউরোপীয় শিক্ষার ফল এবং সংস্কৃত শিক্ষার ফল সমন্বিত করিয়াছেন। এই সমন্বয়ে বঙ্কিম, শাস্ত্র এবং যুক্তির, যথাসাধ্য সামঞ্জস্য করিয়াছেন। তাই তিনি এই বচন—

কেবলম্ শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়।
যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্ম্মহানি সংজায়তে॥

তুলিয়া প্রচার করিয়াছেন,শাস্ত্র আশ্রয় করিতে হইবে,কিন্তু কেবল মাত্র শাস্ত্র আশ্রয় করিলে চলিবে না, বিচার কালে শাস্ত্র এবং যুক্তি, উভয়ই প্রয়োগ করিতে হইবে। কেন না,যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়। বঙ্কিমবাবু,হিন্দুশাস্ত্র ও বিলাতি বিজ্ঞান, শাস্ত্র ও যুক্তি, সংরক্ষণ ও উন্নতি, Conservatism ও Liberalism, এই উভয়ের সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন। "অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বিচ্ছেদ"কে তিনি বড় ভয় করেন। কেন না,বিচ্ছেদে বিপ্লব, সমন্বয়ে ক্রম-বিকাশ। তিনি বলেন,—দেখুন প্রাচীন ঋষিগণ প্রথমে বিচার করিলেন যে, স্ত্রীলোক ও শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। পরবর্ত্তী ঋষিরা দেখিলেন যে, স্ত্রীলোকের এবং শূদ্রগণের পক্ষে শিক্ষা ও ধর্ম্ম জ্ঞান প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীন ঋষিদিগের ব্যবস্থা "রিপীল" করিলেন না। কিন্তু স্ত্রীলোক ও শূদ্রগণের শিক্ষার জন্য মহাভারত ইত্যাদি অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিলেন। Female education and mass education,স্ত্রীশিক্ষা ও শূদ্রশিক্ষা বিস্তার করিতে লাগিলেন।" তেমনি,বঙ্কিমবাবু বলেন, হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা আছে,হিন্দুসমাজে যে সকল প্রথা আছে, হঠাৎ তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন না করিয়া ক্রমে ক্রমে বুঝিয়া সুজিয়া, উপযোগী পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিয়া, সমাজকে সংশোধিত করিতে হইবে। ইহাই বঙ্কিমবাবুর শিক্ষা। খ্রীষ্ট আমাদিগের জাতীয় আদর্শ নহে। শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের জাতীয় আদর্শ। খ্রীষ্টের আদর্শ আমাদিগের চক্ষে না ধরিয়া, তিনি শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ আমাদিগকে অধ্যয়ন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এবং এই আদর্শে যেখানে বিকৃতি বা অপভ্রংশ হইয়াছে, তাহা তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দ্বারা স্থির করিয়া প্রকৃত আদর্শ চরিত্র উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই কৃষ্ণ চরিত্র নির্দ্ধারণ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমার অনেক স্থলে সংশয়

আছে। কিন্তু আমি ইহাতে বঙ্কিম বাবুর উজ্জ্বল জাতীয় ভাব ও প্রদীপ্ত প্রতিভা, এবং সমন্বয়ের ভাব দেখিতে পাইতেছি। বঙ্কিম বাবুর সমন্বয়ের ভাব আর এক বিষয়ে দেখিতে পাই। তিনি মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন কেন? তাহার একটী কারণ, দেশের উচ্চ শ্রেণীর ও নিম্ন শ্রেণীর সমন্বয় করিবার জন্য। তিনি বলিয়াছেন, আমাদিগের উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্র, ধনবান এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। এই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুতরাং যে ভাষায় লিখিলে এই পার্থক্য নষ্ট হয়, সেই ভাষায় লেখা উচিত।

(উন্নতি)

স্বাতন্ত্র্য ও সামঞ্জস্য, এই দুইটী গুণে বঙ্কিম বাবু দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সাহিত্যে, বঙ্কিম বাবুর স্বাতন্ত্র্য ও সামঞ্জস্য কিরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এখন সমাজ-সংস্কার দেখি। বঙ্কিম বাবু স্বীকার করেন যে, গৃহস্থালী স্ত্রীলোকের প্রধানধর্ম্ম। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধ নহেন। বিরুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকে যদি Miss Fawcett এর মত First wrangler হয়, তাহাতেও তাঁহার আপত্তি নাই! বঙ্কিম বাবু কেবল স্ত্রীশিক্ষা নহে, তিনি নারীদিগের উচ্চ শিক্ষার পোষক। তাই তাঁহার প্রফুল্লকে (দেবীচৌধুরাণীকে) ব্যাকরণ, ভট্টি, রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা, সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, যোগশাস্ত্র পড়াইলেন। পরে তাহাকে রাণীগিরি করাইলেন। তাহার পর তাঁহাকে পতিপাদপদ্ম অর্চ্চনা করিতে সংসারে আনিলেন। সংসারে আসিবার পূর্ব্বে প্রফুল্লকে তাহার সপত্নী সাগর জিজ্ঞাসা করিল "এখন গৃহস্থালীতে কি মন টিকিবে? রূপার সিংহাসনে বসিয়া, হীরার মুকুট পরিয়া রাণীগিরির পর কি বাসন মাজা, ঘর ঝাঁটদেওয়া ভাল লাগিবে? যোগ-[illegible]র পর কি ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর রূপ কথা ভাল লাগিবে? যার হুকুমে দুই হাজার লোক খাটিত, এখন হরির মা, প্যারির মার হুকুম বরদারি কি আর ভাল লাগিবে?"

প্রফুল্ল উত্তর দিল,—"ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি, এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার ধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়।" প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল, তার কোন কামনা ছিল না, কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। * * সে যে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়ের শিষ্য—নিজে পরম পণ্ডিত, সে কথা দূরে থাক্, কেহ জানিল না, যে তাহার অক্ষর পরিচয়ও আছে। গৃহ ধর্ম্মে বিদ্যা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। গৃহ ধর্ম্ম বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের স্থান সে নয়।" দেখুন, বঙ্কিম বাবু উচ্চশিক্ষার সঙ্গে গৃহস্থালীর কেমন সামঞ্জস্য করিয়াছেন। তিনি তাঁহার শিক্ষিত স্ত্রীলোককে Quida-নিন্দিত বিলাতের এই যুগের "The new woman" করিয়া তুলেন নাই, অথবা Primrose League এর Countess of Jerseyতে পরিণত করেন নাই। দেখুন, প্রফুল্লতে বিদ্যার ও গৃহস্থালীর সমন্বয়, সংসার ধর্ম্ম আর নিষ্কাম ধর্ম্মের সমন্বয়। বঙ্কিম বাবু যদি আর

কিছু না লিখিয়া কেবল মাত্র দেবীচৌধুরাণী লিখিতেন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিতাম। আবার, রাজনীতিতেও দেখুন, একদিকে হিন্দুদিগের যোগ, আর একদিকে সাহেবদিগের বিজ্ঞান বল, এই দুইটীর সমন্বয়ে উন্নতির কথা তিনি তাঁহার "আনন্দমঠে" প্রচার করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু স্বাতন্ত্র্য ও সামঞ্জস্য অবলম্বন করিয়া ক্রম উন্নতির যে চরম উন্নতি, তাহাতে, অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্বে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন এবং কোমতের একস্বরে বলিয়াছিলেন,—

"The general law of Man's Progress, whatever the point of view chosen, consists in this that man becomes more and more Religious."

আমরা বঙ্কিম বাবুর পুস্তকে প্রথমে দেখিতে পাই, Religion of (conjugal) Love, তার পর Religion of Patriotism, অবশেষে Religion of Humanity. কিন্তু এই Religion of Humanity কোমতের নিরীশ্বর religion নহে, ইহা Religion of Humanity plus God. বঙ্কিম বাবুর হৃদয়ের ত্রিধারা, স্বাতন্ত্র্য, সামঞ্জস্য ও উন্নতি, এ পথ সে পথ দিয়া, শেষে ভক্তি-সাগরাভিমুখে প্রবাহিত। বঙ্কিম বাবু যখন এই সাগর সঙ্গমে উপনীত, তখন ভগবদ্গীতা উচ্চারণ করিলেন, তখন তিনি সর্ব্বশিক্ষার চরম শিক্ষা প্রচার করিলেন যে, ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত জাতীয় চরিত্রের উন্নতির সম্ভাবনা নাই; জাতীয় চরিত্রের উন্নতি ব্যতীত সামাজিক উন্নতি বল, রাজনৈতিক উন্নতি বল, সবই মিছা, সবই অসম্ভব। এই কথা নূতন নহে, অতি প্রাচীন কথা। কিন্তু বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক কোলাহলের মধ্যে এই প্রাচীন কথা ডুবিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই প্রাচীন কথা নূতন করিয়া প্রচার করার প্রয়োজন হইয়াছে, বঙ্কিম বাবু তাহা করিয়াছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

ধর্ম্মের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ।

প্রকৃতি বহুরূপী। তন্মধ্যে দুই রূপ প্রধান,—স্থূল ও সূক্ষ্ম, জড় ও চেতন, অর্থাৎ বাহির ও ভিতর। সকল জিনিসের কতকটা স্থূল, কতকটা সূক্ষ্ম, অথবা কতকটা জড় কতকটা চেতন। স্থূল বা জড়বোধ সকলেরই ভাগ্যে অল্পাধিক পরিমাণে ঘটে, কিন্তু সূক্ষ্মবোধ বা চেতন-বোধ অল্প লোকেরই হয়। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এমারসন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ স্থির করিয়াছেন, জড় আর কিছুই নহে, চেতনশক্তির পুঞ্জীকৃত অবয়ব মাত্র, অথবা ঘনীভূত, জমাট শক্তি তরঙ্গ মাত্র। জড় ও চেতনের দার্শনিক ভিত্তি যাহাই হউক, স্থূলের ভিতরে সূক্ষ্ম যে নিত্য স্পষ্ট অনুভব করা যায়, এ কথা কেহই বড় একটা অস্বীকার করেন নাই। সকল বস্তুরই দুইটা দিক্, একটা স্থূল, একটা সূক্ষ্ম,—অথবা একটা বাহির, একটা ভিতর। মানুষের শরীর ও আত্মা, এ কথার জীবন্ত প্রমাণ স্থল। স্থূল শরীরের ভিতর সূক্ষ্ম আত্মা বাস করেন। একটা অনুভূত, অন্যটী সাধারণত অননুভূত। একটার আদর অধিক, আর একটা সাধারণত অনাদৃত। শরীরের সৌন্দর্য্যে জগৎ মুগ্ধ, আত্মার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ অতি অল্প লোক। স্থূল রূপের

সৌন্দর্য্যে জগতের নরনারী আত্মহারা, সূক্ষ্ম রূপে কিন্তু মানুষ সেরূপ নয়। মানুষ প্রকৃতির অসার বাহির লইয়াই সংসার করে, ঘর বাঁধে,—অন্তর, ভিতর, সার লইয়া মজে অতি অল্প লোক।

মানুষ সাধারণত স্থূলে মজে,সুতরাং মানবের সমষ্টি সমাজও স্থূল লইয়া আইন কানুন করেন। ধর্ম্মনীতি এবং সমাজ—সাধারণত মানুষের স্থূল জ্ঞানের স্থূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সূক্ষ্মাংশ বুঝিতে, ধারণ করিতে, অবলম্বন করিতে চায় অতি অল্প লোক;—পারে আরো অল্প লোক' যাঁহারা পারেন, তাঁহারা অসাধারণ ব্যক্তি।

ধর্ম্মের স্থূল ভিত্তি কি? মত, পূজা, উপাসনা, অনুষ্ঠান, ক্রিয়া কর্ম্ম। ইহার দৃষ্টান্ত সকল সম্প্রদায়ে পাওয়া যায়,ইহার নাম সামাজিক ধর্ম্ম। সূক্ষ্ম ভিত্তি কি?—বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি, সেবা, চরিত্র ও জীবন। ইহার দৃষ্টান্ত সাধু ও মহাপুরুষগণের জীবন। নীতির স্থূল ভিত্তি কি? অনুশাসন ও দণ্ড; অর্থাৎ এটা কর, ওটা করিও না; এটা অবলম্বনের জিনিষ, ওটা নহে, এইরূপ আদেশ। ইহার দৃষ্টান্ত,—বিধি ব্যবস্থা, লৌকিক ধর্ম্মজ্ঞান। নীতির সূক্ষ্ম ভিত্তি কি? অনুজ্ঞান, অনুপ্রাণন, আদেশ। ইহার দৃষ্টান্ত বুঝান একটু কঠিন।

"মিথ্যা কথা বলা অন্যায়"—ইহা একটী নীতির সাধারণ জ্ঞান। ইহা মহাপুরুষ-প্রচারিত, শাস্ত্রানুমোদিত কথা, ইহা নীতির স্থূল ভিত্তি। সূক্ষ্ম ভিত্তি, এই কথার সারত্বের অনুজ্ঞান। অর্থাৎ লোকের কথায় ইহা বিশ্বাস করা এক কথা, এবং বিধাতার অনুপ্রাণনে, আদেশে বা অনুজ্ঞানে ইহা বিশ্বাস করা আর এক কথা। অথবা ইহা কণ্ঠস্থ করা এক কথা এবং ইহা অনুসরণ করা আর এক কথা।

সমাজের স্থূল ভিত্তি আইন কানুন, বিধি ব্যবস্থা, আচার ব্যবহার, নিয়ম প্রণালী। সূক্ষ্ম ভিত্তি—আত্মীয়তা, ভালবাসা, পরোপকার, লোকহিতব্রত, একতা। ইহার দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে।

এখন বুঝাইতে কষ্ট হইবে না যে, মনুষ্য স্থূল লইয়া সদা ব্যতিব্যস্ত। ধর্ম্ম-মত, নীতির অনুশাসন,সমাজের নিয়ম প্রণালীর পক্ষপাতী জগতের বারো আনা লোক। ভিতরের সারবস্তুর অন্বেষণ করে, অতি অল্প লোক।

তিনটী বিষয়কে আমরা পৃথক করিয়া দেখাইলাম, কিন্তু ইহা তিন নহে, ধরিতে গেলে একই। তিনে এমনি দুশ্ছেদ্য বন্ধন, এক হইতে অপরকে পৃথক করা কঠিন। একে তিন, তিনে এক। এক মহান ঈশ্বরের তিন প্রকাশ, অথবা এই তিন মিলিয়া বিধাতৃত্ব। আমরা এই তিনে এক, একে তিন অবলম্বন করিয়া আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি।

একটী পৌরাণিক গল্প আছে। এই গল্পটী আমাদের বক্তব্যের অনুকূল। প্রথমত এই গল্পটী বিবৃত করিতেছি।

এক স্থানে একজন সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী এবং তাহার নিকটে একজন বারনারী বাস করিত। সন্ন্যাসী নিষ্ঠাবান্, গায়ে গৈরিক, কপালে তিলক, অঙ্গে বিভূতি ভূষিত থাকিতেন, এবং ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই ধর্ম্মের কথা, সাংসারিকতার নিন্দা উচ্চারিত হইত। যাহারা ধর্ম্মের কোন অনুষ্ঠান করে না, সর্ব্বদাই তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। নিকটে যে বেশ্যা বাস করিত, তাহাকে

ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, সর্ব্বদাই তাহার নিন্দা করিতেন, পশুর জীবনের সহিত তাহার জীবনের তুলনা করিতেন। জাতি-ভেদ না মানিয়াও, ভেদ-বোধ রূপ-গরল পানে সদা তিনি বিভোর থাকিতেন। পাপী পুণ্যাত্মার ভেদ, তাহার অন্তর বাহির গ্রাস করিয়াছিল! যখন তখন বলিতেন, পাপীর সংস্পর্শে এবং তাহাদের সহিত আহারে বিহারে ধর্ম্ম লোপ পায়। আত্মাভিমানে সদা তিনি স্ফীত ছিলেন।

আর ঐ অস্পৃশ্যা, সর্ব্বজন-নিন্দিতা, কলুষিতা বেশ্যা, আপন অবস্থায় সদা ম্রিয়মানা থাকিত। নিজ অবস্থায় একদিনও সুখী ছিল না। অবস্থার পীড়নে বাধ্য হইয়া যে জঘন্য কাজ করিত, তজ্জন্য অনুতাপে সদা হৃদয় মন অবসন্ন থাকিত। বাধ্য হইয়া, বেশ-ভূষার পারিপাট্য করিতে হইত, কিন্তু সেজন্যও মনে ক্লেশ হইত। বাহিরে বাহিরের অনুষ্ঠান, অন্তরে অনুতাপ, আত্মগ্লানি, ধর্ম্মে ঐকান্তিক মতি, হরির প্রতি গভীর ভক্তি ছিল, কিন্তু পৃথিবীর কেহ তাহা জানিত না। সংসারে যেরূপ সচরাচর হইয়া থাকে, সকল লোকই তাহাকে ঘৃণা করিত। ঐ সাধু সন্ন্যাসীও ঘৃণা করিত।

ঘটনাচক্রে যথা সময়ে উভয়ের মৃত্যু হইলে, সাধু সন্ন্যাসীর মৃতদেহ ফুল চন্দনে সজ্জিত করিয়া বহুলোক শেষ সম্মান রক্ষা করিল; আর ঐ বেশ্যার কেহ নাই—মৃতের সঙ্গী ডোমেরা প্রকাশ্য রাস্তা দিয়া শব টানিয়া শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষণের জন্য ফেলিয়া দিল। মৃত্যুর পর উভয় আত্মার গতি কি হইল? সন্ন্যাসীর আত্মার নরকের দিকে গতি হইতে লাগিল, আর ঐ বেশ্যার আত্মার গতি স্বর্গের দিকে। সন্ন্যাসী বিধাতার এই অবিচার দেখিয়া ক্রোধে, ক্ষোভে, দুঃখে অভিভূত হইলেন। এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ সেই স্থলে উপস্থিত। সন্ন্যাসী, ক্রোধভরে নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, বৈকুণ্ঠপতির এ কি বিচার? আমি কত ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছি, আমার নরকে গতি হইতেছে, আর ঐ বেশ্যা চিরকাল অধর্ম্মের কাজ করিয়াছে, উহার স্বর্গে গতি হইতেছে? বিধাতার এ কি লীলা?" দেবর্ষি নারদ ক্ষণকাল ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "বিধাতার লীলা কে বুঝিবে? তাঁহার বিচার ঠিক হইয়াছে। তুমি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অনেক করিয়াছ, সত্য; বৈরাগ্যের কঠোর শাসনে শরীরকে পবিত্র রাখিয়াছ, তাহাও সত্য। তোমার শরীরকে পবিত্র রাখার ফল তুমি হাতে হাতে পাইয়াছ। পৃথিবীর লোকেরা তোমার পূজা করিয়াছে, অসংখ্য শিষ্য তোমাকে দেবজ্ঞানে মান্য করিয়াছে, এবং শেষে, মৃত্যুর পর, তোমার পবিত্র শরীরকে পুষ্প চন্দনে চর্চ্চিত করিয়াছে। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তোমার মনে সর্ব্বদা অহঙ্কার ছিল যে, তুমি বড় ধার্ম্মিক। এজন্য তুমি পৃথিবীর সকল লোকের নিন্দা করিয়া বেড়াইতে। আত্মা যার বিনীত নয়, ধর্ম্মে তার অধিকার জন্মে নাই। বাহিরের সাধন করিয়া বাহিরের পুরস্কার পাইয়াছে, এখন অন্তরের সাধনের জন্য কিছু দিন নরকবাসী হও। যখন বুঝিবে, তুমি কিছুই নও, তোমার মান অভিমান যখন ভুলিতে পারিবে, যখন যশ নিন্দা ভুলিবে, তখন স্বর্গে তোমার অভ্যুত্থান হইবে। আর ঐ বেশ্যা শরীরকে অপবিত্র করিয়াছিল, শরীর ব্যাধিতে পচিয়াছে, তারপর ডোমেরা রাস্তায় টানিয়া ফেলিয়াছে, শৃগাল শকুনী শরীরের শেষ পরিণাম

করিয়াছে। ঐ বেশ্যার আত্মা সদা অনুতপ্ত ছিল, বহু লোকের ন্যায়,পাপ করিয়া অহঙ্কার পোষণ করে নাই, তাহার অভিমান ছিল না, আপনার অস্তিত্বে সে এক দিনও সুখী ছিল না। কখনও কাহারও নিন্দা করিত না— কখনও আপনাকে বড় মনে করিত না। সদা হরির উপর নির্ভর করিয়া থাকিত এবং নীরবে বলিত—"হরি, কবে আমার এ দশা ঘুচিবে?" হরি তাহার ঐকান্তিক অনুরাগ ও অনুতাপ দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। এজন্য স্বর্গে তাহার আত্মার গতি হইতেছে। অহঙ্কার জীবের সর্ব্বনাশের মূল। অহঙ্কার পাপীরও সর্ব্বনাশ কহইতেছে।-ত্মারও করে। সন্ন্যাসী, দেবর্ষি নারদসমাজে, শুনিয়া অবাক্ হইলেন। খ্রীষ্ট-

আর একটী গল্পের কথা উল্লেখ করিতেছি। কোন স্থানে একজন গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী পতিপরায়ণা, সাধ্বী, দশকর্ম্মান্বিতা, পুণ্যশীলা, কিন্তু অহংবোধে একটু আত্মহারা। তিনি সদা পূজা অর্চ্চনায় দিন কাটাইতেন। স্বামী কিন্তু ধর্ম্মের কোন কথাই বলিতেন না, কোন প্রকার পূজা অর্চ্চনা করিতেন না, কোন প্রকার অনুষ্ঠান করিতেন না, তিনি বিনয়ী, দীন কাঙ্গালের ন্যায় থাকিতেন। ঈশ্বরের, কি ইষ্ট দেবতার নামও কখন উচ্চারণ করিতেন না। এজন্য তাহার স্ত্রী বড়ই কষ্ট পাইতেন, ভাবিতেন, আমার স্বামী একবার ভ্রমেও ঈশ্বরের নাম মুখে আনেন না! কি দুঃখের কথা! এ দুঃখ কিন্তু স্বামী জানিতেন না। স্বামী সুখে সচ্ছন্দে দিন কাটাইতেন। হঠাৎ এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া স্বামী ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। স্ত্রী, স্বামীর মুখে, রাত্রে ঈশ্বরের নাম শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলেন, বিধাতাকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন, এবং পরদিন পূজা অর্চ্চনার বিশেষ আয়োজন করিলেন। স্বামী এ সকল কিছুই জানেন না। তিনি বাড়ী আসিয়া পূজার বিশেষ আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে আজ বিশেষরূপ আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন দেখিয়া আরো আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এ সকলের কারণ কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, শেষে ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভার্য্যা প্রফুল্ল চিত্তে বলিলেন, "এতদিন তোমার মুখে ইষ্টদেবতার নাম না শুনিয়া মর্ম্মে আমি মরিয়াছিলাম; তুমি ধর্ম্মের কোন অনুষ্ঠান কর না দেখিয়া মনে ভাবিতাম, তুমি নাস্তিক। এ জন্য কত অশ্রুপাত করিয়াছি, কত কষ্ট সহিয়াছি, বিধাতাই জানেন। কাল রাত্রে আমার পরম সৌভাগ্যে তোমার মুখ হইতে ঈশ্বরের নাম বাহির হইয়াছিল, সে জন্য আমার এত আনন্দ হইয়াছে যে, বলিতে পারি না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এই সব আয়োজন।"

এই কথা স্বামীর প্রাণে শেল সম বিদ্ধ হইল, ইষ্টদেবতার নাম আমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, অন্তরের জিনিষকে অন্তরে রাখিতে পারিলাম না, এই কষ্ট দারুণ আঘাত করিল। শরীর মন অবসন্ন হইয়া আসিল, তিনি হঠাৎ সংজ্ঞা হারাইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। জনশ্রুতি এইরূপ, এই পতনেই তাঁহার মৃত্যু হইল। স্ত্রী, স্বামীর গভীর অন্তরমুখী ধর্ম্মভাবের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া অবাক্ হইলেন, আপনার জীবনকে ধিক্কার দিয়া, অনুতাপে, পতির অনুসরণ করিলেন। গ্রামের সকল লোক জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।

যে দুটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম, ইহাতে প্রতিপন্ন হইবে, মানুষের বাহিরের আচার ব্যবহার ধর্ম্মভাব জড়িত হইলেও, অন্তর পরিশুদ্ধ না হইতে পারে; দ্বিতীয় কথা, বাহিরে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও, ভিতরে একজনের ধর্ম্মগত জীবন থাকিতে পারে। আমাদের বিবেচনায়, ধর্ম্ম বাহিরে দেখানের জিনিস নয়, ইহা যত সংযত ভাবে অন্তরে থাকে, ততই মঙ্গল এবং তাহাতে অহঙ্কার স্ফূর্ত্তি পায় না। মানুষের বিমল চরিত্রে ধর্ম্মের কোনরূপ বহিপ্র্রকাশ হয়, হউক, আপত্তি নাই, কিন্তু চরিত্র ভিন্ন আর যে প্রকার বহিপ্র্রকাশ হয়, তাহাই মারাত্মক, তাহাতেই অহঙ্কার প্রসব করে। ভক্ত, যোগী, সাধু এ সকলেরও অহঙ্কার সাধন পথের বিঘ্ন ঘটায়—স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ করে। পাপীর ত কথাই নাই, অন্তরে পাপ করিয়া যাহারা বাহিরে ধার্ম্মিকতার ভাণ করিয়া অহঙ্কারে মত্ত থাকে, তাহাদের ত কথাই নাই। ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি অন্তরে পড়িলে, মুখে তার ছবি প্রতিভাত হয়, একথা অস্বীকার করি না। প্রকৃত ধার্ম্মিক পাপী তাপীর জন্য জীবন বলি দিতে একটুও কুণ্ঠিত হন না। পাপী মানব, ধর্ম্মের আদর্শে জীবন গঠনে যখন সমর্থ হয়, তখন বিনয়ে তাঁহার মূর্ত্তি নমিত হয়, তখন সর্ব্বপ্রথম তাঁহার দৃষ্টি পড়ে, পাপীদিগের প্রতি। পাপীদিগের প্রতি সহানুভূতি, তাহাদিগের উদ্ধারের চেষ্টা, প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষন। প্রকৃত ধার্ম্মিক এইখানে মানবের নিকট ধরা পড়েন। ইহাতে দোষ নাই। জেনেরেল বুথ, মুর প্রভৃতি মহাজন এইখানে ধরা পড়িয়াছেন, ঈশা, মহম্মদ, গৌর নিতাই এই প্রেমে বাঁধা। নচেৎ তাঁহারা কি ধর্ম্ম সাধন করেন বা করিতেন, মানুষ তাহা জানে না। ইহারা তৃণের ন্যায় দীন, বৃক্ষের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি, বড় ছোট, ধনী দরিদ্র, পাপী পুণ্যাত্মা—এ ভেদ রাখেন না। তাঁহারা মানবের জন্য কাঁদিয়া আকুল। কিসে মানুষের কল্যাণ হইবে, দিবানিশি কেবল এই ভাবনা। আর যাঁহারা মতের দাস, অনুষ্ঠানের দাস—বাহ্য ব্যাপারে মত্ত,—জ্ঞান ভক্তিতেও তাঁহাদের অহঙ্কার। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের ন্যায় জীব এই পৃথিবীতে আর নাই। ভেদ-বুদ্ধি তাঁহাদের অন্তর বাহিরকে জর্জ্জরিত করিয়া সর্ব্বনাশ কে[illegible]াতিভেদ না মানিয়াও তাঁহারা নব নব [illegible] সৃষ্টি করেন। হিন্দুসমাজ মত ও [illegible] সর্ব্বস্ব বাহ্য জ্ঞান লইয়া ডুবিয়াছে, এ[illegible]াজ ক্রমে ক্রমে সেই দিকে ঝুঁকিতেছে। নানা ঘটনায় দেখিতেছি, ভূতলশায়ী জাতিভেদ-বৃক্ষের নব নব অঙ্কুর এই সমাজের ভিতর পুনঃ গজাইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিতেছেন যে, ভিতরের ধর্ম্মভাব ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে বলিয়া ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মের বহিরঙ্গ জাতিভেদের পোষকতায় এখন মনোনিবেশ করিতেছেন। নীচ বর্ণে আদান প্রদান করিতে, এখন দিন দিন দেখিতেছি, অনেকেরই অনিচ্ছা হইতেছে। হিন্দুসমাজের জাতিভেদ বর্ণগত, সেই বর্ণগত জাতিভেদ, চরিত্র, ধন, বিদ্যার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, এখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছে। অনেক মহারথী ইহা বুঝিতেছেন, কিন্তু কেহই এই বিষ-বৃক্ষ বিনাশে বদ্ধপরিকর নহেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, ব্রাহ্মসমাজ যেন কিছু মত ও অনুষ্ঠানের দাস হইয়া পড়িতেছেন। অন্তরমুখী ধর্ম্মভাব ক্রমেই

যেন হ্রাস হইতেছে। ধর্ম্ম ও সমাজ—দুটী মূল বিষয়ে একীভূত, মিলিত—প্রথম বিবাহ-প্রথা, দ্বিতীয় জাতিভেদ-প্রথা। বিবাহ-প্রথা সংস্কার সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ কতকদূর অগ্রসর হইয়া এখন স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, স্বেচ্ছাচারিতা, বিলাসিতা এখন ব্রাহ্মসমাজকে যে দিকে লইয়া যায়, সেই দিকেই গতি হইবে। দ্বিতীয় কথা, জাতিভেদ-নাশ বাহিরে কতক হইয়াছিল, অনেক ব্রাহ্মণ পৈতা ফেলিয়াছেন, জানি, কিন্তু অহঙ্কারের উত্তেজনায় এখন পুত্রকন্যার বিবাহের সময়, দেখিতেছি, অনেকেই ফিরিয়া দাঁড়াইতেছেন। ভয় হইতেছে, বুঝি বা শেষে জাতিনাশ, ব্রাহ্মসমাজে, আহার-গত হইয়া দাঁড়ায়। একজন খ্রীষ্ট-মহিলা কোনবন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "আমরা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা পাপীদের জন্য, ব্রাহ্ম, তোমরা পুণ্যাত্মাদের জন্য!" বাস্তবিক যেন কথাটা কাজে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। জাতিভেদ-নাশ, কেবল আহারের সময়, করিলে হয় না। পাপীদিগের প্রতি ঘৃণা, অন্য বর্ণের প্রতি ঘৃণা, অন্য সমাজের লোকদিগের প্রতি ঘৃণা, ব্রাহ্মসমাজে বড়ই বাড়িয়া যাইতেছে। পাপী উদ্ধারের জন্য এখন ব্রাহ্মসমাজ বড় একটা চেষ্টা করিতেছেন না। দ্বারে পাপী ও পতিত জন উপস্থিত হইলেও, ব্রাহ্ম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উপেক্ষা করেন। পাপের প্রতি ঘৃণা থাকা মঙ্গলের কথা, কিন্তু পাপীর প্রতি নহে। পাপীর প্রতি জীবন্ত ঘৃণা-বোধ ব্রাহ্মসমাজে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিতেছে। ইহা যে অহঙ্কারের ফল,সন্দেহ নাই। অন্তরঙ্গ-সাধন হীন হইলেই অহঙ্কার বাড়ে, দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান গিয়াছে। এখন কে সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন যে, ব্রাহ্মসমাজ অন্তরঙ্গ ধর্ম্মসাধনে সিদ্ধ হইতেছেন? হিন্দুসমাজের বহু লোক দশকর্ম্মান্বিত,—পূজা অর্চ্চনা করে,গৈরিক, নামাবলী, তিলক ধারণ করে, কিন্তু মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, ব্যভিচার, মদ্যপান, চৌর্য্য, বিবাদ বিসম্বাদ এ সকলে লিপ্ত হইতে কাতর অতি অল্প লোক। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য না পারে এমন কাজ নাই। বড় বড় নেতারা ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান না, অন্য সম্বন্ধে আর কথা কি? হিন্দুসমাজে আজকাল ধর্ম্মের নামে না চলে,এমন কাজ নাই। যার যা ইচ্ছা করিতেছে, অথচ তাহারা সমাজের নেতা। আর ব্রাহ্মসমাজ,ভারতের আশা ভরসার সমাজ;—এখানে কি দেখি? এখানে দুবেলা উপাসনা আছে, উৎসবাদি আছে,অনুষ্ঠানাদি সবই আছে, কিন্তু দিন দিন জাতিভেদ আবার জাগিতেছে, পাপের প্রতি ঘৃণা হ্রাস হইতেছে, পাপীর প্রতি ঘৃণা বাড়িতেছে, বিবাহাদিতে নানা দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে,আর ঘরে ঘরে,ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে সমাজে বিবাদ বিসম্বাদ দিন দিন আরো সজীব হইয়া উঠিতেছে। এই সকল দেখিয়া একদিন একজন প্রবীণ ব্রাহ্মসাধু বলিয়াছিলেন, বহির্মুখী সাধনার পরিণাম যাহা, তাহাই হইতেছে। বহির্মুখী সাধনার যাহা মত,অন্তরমুখী সাধনায় তাহা বিশ্বাস; বহির্মুখী সাধনায় যাহা ভাব, অন্তরমুখী সাধনায় তাহা ভক্তি; বহির্মুখী সাধনায় যাহা অনুষ্ঠান,অন্তরমুখী সাধনায় তাহা অনুরাগ; বহির্মুখী সাধনায় যাহা পূজা, অন্তর্মুখী সাধনায় তাহা সম্ভোগ; বহির্মুখী সাধনায় যাহা মত্ততা, অন্তরমুখী সাধনায় তাহা সমাধি; বহির্মুখী সাধনায় যাহা কল্পনা,অন্তরমুখী সাধনায় তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান; বহির্মুখী সাধনায় যাহা বক্তৃতা, অন্তরমুখী

সাধনায় তাহা সেবা। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, একটী কত সহজ, অন্যটী কত কঠিন। গুরুমুখে মন্ত্র শুনিয়া সেই মন্ত্র উচ্চারণ করা ও মত বিশেষ ধরিয়া থাকা সহজ, অতি সহজ। অনুষ্ঠানাদি করা ও ধর্ম্মের পোষাক পরিধান করা আরো সহজ। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান-সিদ্ধ বিধাতার অনুপ্রাণনে বিশ্বাসের উদয় হওয়া ও তাহা ধারণ করা অতি কঠিন। ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা শক্তিসঞ্চার করাইয়া ধেই ধেই করিয়া উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করা সোজা কথা, কিন্তু প্রত্যক্ষ মাতৃ-দর্শন-জনিত অলৌকিক বিহ্বল-চিত্তের তন্ময়ত্ব লাভ করা বড়ই কঠিন। জটা রাখিয়া, বিভূতি মাখিয়া, গৈরিক ও নামাবলী পরিধান পূর্ব্বক ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হওয়া খুব সোজা, কিন্তু অন্তরে প্রেম-বিহ্বল চিত্তের নির্ভরশীলতা ও বিমল-চরিত্র লাভ করা অতি কঠিন। উদ্দাম নৃত্য কে না করিতে পারে? কিন্তু আত্মহারা ভাবে তাঁহাতে মজিয়া ডুবিয়া থাকিতে পারে কয় জন? ধর্ম্মের নামে বক্তৃতা করিতে সকলেই পারে,কিন্তু নর-সেবা দ্বারা শরীর মনকে পবিত্র করিতে পারে কয় জন? বাহিরের সাধনায় জগতে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হওয়া যায়, কিন্তু পরিত্রাণের একটুও উপকার হয় না। আমরা যে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে বুঝা যায়, ভিতর-সার-শূন্য বাহ্যানুষ্ঠান নরকের পথ প্রস্তুত করে। বাহিরের সাধনায় অহঙ্কার জন্মে—অহংটা সর্ব্বময় হয়; অন্তরের সাধনায় বিনয় জাগিয়া উঠে, আত্মনাশ বোধ জন্মে। আমি কিছুই নই, কেবল তিনি, এই বোধ না হইলে ধর্ম্ম রাজ্যের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করা যায় না। বাহিরের কাজ ধরিয়া বাহিরেই মানুষ মজিতে পারে; অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। যে সকল মৎস্য জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়, তাহারা গভীর জলে ডুবিতে পারে না। যাহারা গভীর জলে ডুবিয়া থাকে, তাহারা সর্ব্বদা ভাসিয়া বেড়াইতে চায় না—গভীর শান্তি এবং শীতলতায় তাহারা নিমগ্ন; উপরের তরঙ্গের উত্তেজনায় তাহাদের কিছুই আসিয়া যায় না। সেইরূপ যাহারা সংসারে ভাসিয়া বেড়ায়, যশোনিন্দার তরঙ্গে, তাহারাই আন্দোলিত হয়,—লোকের প্রশংসায় তাহারা নাচে, লোকের নিন্দায় বসিয়া পড়ে—অথবা তাহাদের সকল অনুষ্ঠান লোকের প্রবর্ত্তনায় অঙ্কুরিত। আর যাঁহারা সংসারের সার বিধাতার গভীরতম ক্রোড়ে নিমগ্ন, বাহিরের যশো-নিন্দার বাহ্য তরঙ্গে তাঁহাদের কিছু করিতে পারে না,তাঁহারা চির শান্তিতে, পবিত্রতাতে সংসারের ঝড় তুফানের অতীত হইয়া বাস করেন। পাহাড়ের উপর উঠিলে নিম্ন প্রান্তরের সব যেমন সমান দেখা যায়, তাঁহাদের আত্মার নিকট, তেমনই সব, বড় ছোট সমান হইয়া যায়। গভীর রাজ্যে—সমত্ব, সাম্য, একত্ব, মিলন; পৃথক পৃথক বোধ, বৈচিত্র্য, বহু-বোধ, বিচ্ছেদ—সংসারজ্ঞানের কথা। সংসারের অতীত কথা—একের অস্তিত্বে সকলের অস্তিত্ব, —একে সব স্থিত। সুতরাং অনন্তত্ব আছে বটে, কিন্তু সেখানে বৈচিত্র্য-নাই। ভেদ-বোধ বা বৈচিত্র্য-বোধ—সংসারের কথা। সম্প্রদায়, সংসার-ধর্ম্মে সম্ভব। কিন্তু সংসারের অতীত মাতৃধর্ম্মে সমতা, একতা, চির-মিলন। পৃথিবীতে বহু নদ নদী আছে, কিন্তু সে সকল যখন সাগরে সম্মিলিত হয়, তখন সব একাকার। কোন্ নদী বড়, কোন্ নদী ছোট,—কোন্‌টী কৃষ্ণা, কোন্‌টী কাবেরী—এ বিচার করে সাধ্য করে?—সব একাকার

হইয়া গিয়াছে। রেখা-বোধ, সীমা-বোধ, ক্ষুদ্র-বোধ,—সকল ভেদ-বোধ সংসারের কথা; ধর্ম্মের কথা—অনন্তত্ব ও ভেদাভেদ-রহিতত্ব-বোধ। তুমি মাটীর নশ্বর দেহ পুষ্পচন্দনে সজ্জিত করিয়া ভাবিতেছ, তুমি বড় ধনী, বড় ধার্ম্মিক, বড় বিদ্বান? হায়, হায়, হায়, তুমি জান না, শ্মশানে তোমার এই শরীরের পরিণাম কাঠ-লেখনী অগ্নি-কালীতে কিরূপ লিখিবে!! তোমার শরীরের পরিণাম ঐ চিতার ভস্ম! যে ভস্মে দীন দরিদ্র, পাপী তাপী বিমিশ্রিত, ঐ সামান্য, উপেক্ষিত—চিতার ভস্ম! কিসের অহঙ্কার তোমার ভাই? তুমি বৈচিত্র্যই দেখিতেছ, বৈচিত্র্যই গণিতেছ। শ্মশানে যাইয়াও তোমার সমত্ব জ্ঞান জন্মিতেছে না! কি আর বলিব! দেখ মৃত্যুর পর ঐ অহঙ্কার বর্জ্জিত অনুতপ্ত বেশ্যার গতি কোথায়, আর সাধু সন্ন্যাসীর গতি কোথায়? ভিতরে তুমি কি, তাহার অন্বেষণ কর, ভিতরে যাহাতে সৎ হইতে পার, তাহার চেষ্টা কর। আত্মার মূলে অবগাহন না করিলে, কেহই কাশী বৃন্দাবন, গয়া, মক্কা বা জেরুজালমে যাইয়া ধার্ম্মিক হইতে পারে না। আত্মার মূলে যাইয়া বাসনার আগুন নিবাইতে না পারিলে, কেহই যাগ যজ্ঞ বাহ্য অনুষ্ঠানের আগুন জ্বালিয়া স্বর্গে যাইতে পারে না। আত্মার মূলে ডুবিলে মানুষ আপনাকে চিনিতে পারে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মাকে চিনিতে পারে। পরমাত্মা—আত্মার মূলে। তুমি গয়া কাশী বেড়াইলে, শত শত অরণ্য পর্ব্বত ঘুরিয়া মরিলে, কত সাধু সঙ্গ করিলে, অবিচারিত ভাবে কত গুরুর উপদেশ পালন করিলে, কত অনুষ্ঠান ক্রিয়া কাণ্ড করিলে, কত পুস্তক পড়িলে, কিন্তু এক বারও আত্মার মূলে অবগাহন করিলে না! ধিক্ তোমাকে! চিনিলে না তুমি কে, বুঝিলে না—তোমার পরিণাম কি? আপনি পাপরাশিকে দিন রাত্রি অমৃতের ন্যায় পান করিয়া বিভোর হইয়া রহিলে এবং অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অন্যের সামান্য অপরাধকে গুরুতর মনে ধারণা পূর্ব্বক ঘৃণা করিলে। আপনাকে চিনিতে পারিলে কখনও এরূপ করিতে না। আপনি কত পাপ করিয়াছ, বুঝিলে অন্যকে ঘৃণা করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইত না। যে নিজে মরিয়া রহিয়াছে, সে অন্যকে কি ঘৃণা করিবে? অন্যকে ঘৃণা করিতে তোমার অধিকার নাই। আপনাকে চিনিয়া লও, এবং তাঁহাতে মজ, তাঁহাতে ডুব দেও। ঘৃণা বিদ্বেষ, রোগ শোকের অতীত তবেই হইতে পারিবে। আর যদি বাহির লইয়াই থাক, তবে কখনও বুঝিতে পারিবে না, অন্তরের ধর্ম্ম কি?

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ। (১)

অনাদি ধর্ম্ম অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ প্রত্যক্ষ বিরাটরূপে জগৎ পিতা, জগন্মাতা, জগদ্গুরু, জগদাত্মা বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যগণের আজ কি দুর্দ্দশা না হইয়াছে!! সে ধৈর্য্য নাই, সে তেজ নাই, সে সাহস নাই, সে বিক্রম নাই, সে একতা নাই, সে কার্য্যতৎপরতা নাই, সে ধৈর্য্য নাই, সে তিতিক্ষা নাই, সে নিষ্ঠা নাই, সে ভক্তি নাই, সে দয়া নাই, সে ধর্ম্ম নাই, সে সাধনা নাই, সুতরাং সে সিদ্ধিও নাই, সর্ব্ববিষয়েই বলহীন হইয়া রহিয়াছে। বাল্যকালে

পুত্র কন্যাকে সৎ উপদেশ, সত্যধর্ম্ম ও সৎ শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য; কিন্তু অল্প পিতামাতাই এ কার্য্য করিয়া থাকেন। যদি পূর্ব্বকালের অর্থাৎ বৈদিক সময়ের ন্যায় পিতামাতা পুত্রকন্যাকে শিক্ষা দীক্ষা দিতেন, তাহা হইলে জগতের যে কত মঙ্গল সাধিত হইত, তাহা বলিতে পারি না। বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত জ্ঞান ও মুক্তি উপার্জ্জন করিয়া যদি সংসারে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা সংসার যে সুচারুরূপে চলে, তাহা বলা বাহুল্য। সে আপনাকে প্রথমেই ত উদ্ধার করে, এবং সংসারে প্রবেশ করিয়া সংসারকেও উদ্ধার করে। কিন্তু বৃদ্ধ কালে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে গেলে সিদ্ধ হওয়া বড়ই কঠিন। কেন না, বাল্যকাল হইতেই মন অসৎ পদার্থে লিপ্ত থাকে, যৌবনে ইন্দ্রিয়ের প্রবল প্রতাপে তাহারই বশীভূত হয়, সুতরাং বৃদ্ধকালে মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতাও আর থাকে না, এজন্য মন সংযত হয় না। যে অভ্যাস সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হইয়া আসিয়াছে, সে অভ্যাস আর কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্ম কার্য্য অর্থাৎ সাধনাও সুচারুরূপে, কি আদৌ হয় না? জীব যে সংসারে থাকিয়া নিয়ত নানাপ্রকারে কষ্ট ভোগ করে, সাধন-বল না থাকাই তাহার একমাত্র কারণ। এই জন্য অনাদি হিন্দুধর্ম্মে, বরাবরই, বাল্য কালে বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে, ধর্ম্ম অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান ও মুক্তি উপার্জ্জন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা আছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের যখন উপনয়ন হয়, সেই সময় তাহাদিগকে সৎ উপদেশ ও সৎশিক্ষা এবং দীক্ষা দেওয়া হয়। তখন তাহাদিগকে এই মাত্র বলা হয় যে, আজ হইতে তোমরা দ্বিজ হইলে, তোমাদের কার্য্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদ পাঠ করা, ওঁকার ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, সাবিত্রী জগৎজননী বলিয়া সূর্য্যনারায়ণকে ধ্যান ধারণা করা। এই সকল কার্য্য করিলে তোমাদের জ্ঞান ও মুক্তি হইবে।

উপনয়ন হইবার সময় বেদ পাঠ করিতে বলিবার কারণ এই যে, বেদ পাঠ করিলে ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা ও গুরু সত্য আছেন, তাহা মনে বিশ্বাস হইবে, মন পবিত্র হইবে। ওঁকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিতে বলিবার অর্থ এই যে, পূর্ণ ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নাম ওঁকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী। সেই মন্ত্র অর্থাৎ নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। সূর্য্যনারায়ণকে সাবিত্রী বলিয়া ধারণ করিতে বলিবার কারণ এই যে, নিরাকার ব্রহ্মকে প্রথমে ধারণা করিতে পারিবে না। নিরাকার ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ সাকাররূপ তেজোময় জ্যোতি সূর্য্যনারায়ণ রূপে বিরাজমান আছেন। এই জন্য পরমাত্মার রূপ ও আপনার রূপ সূর্য্য নারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া ধারণা করিতে হয় ও নিরাকার সাকার পূর্ণ রূপে উপাসনা করিতে হয়। আরও কথা এই যে, যেমন আপনারা আহার না করিলে স্থূল শরীরে উঠিবার সামর্থ্য থাকে না এবং আহার করিলে স্থূল শরীরে বল হয় ও উঠিবার ক্ষমতা হয়, সেইরূপ, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আপনারা তেজহীন, বলহীন হইয়া আছেন, সেই জগৎ পিতা, জগৎ মাতা জগদ্গুরু ও জগদাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণকে ধারণ করিলে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি হয়, তেজ হয়, বল হয়,

বুদ্ধি হয় ও জ্ঞান হয়। আর পূর্ণরূপে পরমাত্মাকে ধারণ করিবার শক্তি জন্মে। মনে নিষ্ঠা ও ভক্তি হয়। এইরূপে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণকে ধারণ করিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ দেখিতে পাইবেন। এবং কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক, উভয় কার্য্য বুঝিয়া করিতে পারিবেন এবং সর্ব্বদা নির্ব্বিকার হইয়া পরমানন্দে থাকিতে পারিবেন। গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়াও কোন বিষয়ে আসক্তি জন্মিবে না। লাভে ও লোকসানে, সুখে ও দুঃখে সমভাবে থাকিবেন। দেখিবেন, লক্ষ টাকা লাভ হইলে নিজে কিছুই লাভ হই নাই এবং লক্ষ টাকা লোকসান হইলেও নিজে কিছুই লোকসান হই নাই; আমি যাহা, তাহাই আছি। ত্যাগ ও গ্রহণ সম্বন্ধে দেখুন যে, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমার এমন কি বস্তু আছে যে, তাহা আমি ত্যাগ বা গ্রহণ করিব? যদি আমার নিজের কোন বস্তু হইত, তাহা হইলে আমি তাহা ত্যাগ বা গ্রহণ করিতাম। এই বিশ্ব মধ্যে যখন আমার কোন বস্তুই নিজের নহে, এমন কি, এই যে সুন্দর স্থূল দেহ, তাহাও যখন আমার নহে, কেন না, আমি মৃত্যুকালে ইহা যখন সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিব না, তখন আমার মধ্যে ত্যাগ ও গ্রহণ কিছুই নাই। আমার অজ্ঞানতাতে ত্যাগ ও গ্রহণ, আমি ও পরমাত্মা ইত্যাকার বোধ হইতেছিল; কিন্তু তাহা নহে; এই সকল লইয়া তিনি পরিপূর্ণ আছেন। জ্ঞানিগণ ত্যাগ ও গ্রহণের ভাব বুঝিয়া সংসারে পরমানন্দে থাকেন।

অগ্নিতে আহুতি দিবার অর্থ এই যে, উহাতে জগতের হিত হয়। যেরূপ কৃষক জমি চাষ করিয়া ধান্য বপন করে, পরে উহাতে অঙ্কুর হইয়া গাছ হয়, পরে উহাতে ফুল হইয়া ফল অর্থাৎ ধান্য হয়। এক বিঘা জমিতে চারি অথবা পাঁচ সের ধান্য বুনে, কিন্তু তাহাতে ২০।২৫ মণ ধান্য হয়; যেরূপ পৃথিবী তত্ত্বে ধান্য জন্মে, সেইরূপ, অগ্নি-তত্ত্বে উত্তম উত্তম দ্রব্য আহুতি দিলে তাহার ধূম আকাশে যাইয়া মেঘ হয়; পরে দেব প্রসন্ন হইয়া ঐ মেঘ হইতে সময়ে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্দ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া প্রজাগণ পালন করেন। আর যজ্ঞীয় ধূম দ্বারা বায়ু পরিষ্কার হয়। ঐ অগ্নির তেজে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়; অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পরমাত্মাতে নিষ্ঠা ভক্তি জন্মে। অগ্নিতে আহুতি দিলে বিবেকের উদয় হয়; কেন না দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোন বস্তু অগ্নিতে দেওয়া যায়, তৎ সমস্তই ভস্ম করত আপনার রূপ করিয়া নিরাকার হইয়া যায়। সেই সমস্ত দ্রব্য কোথা যাইতেছে, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে করিতে বিবেক আপনা হইতেই আসিয়া উদয় হয়, এবং জগৎসংসারকে অসার বলিয়া ইহাতে আর আসক্তি জন্মে না।—এই জন্য শ্মশানে যাইয়া যোগ করিতে শাস্ত্রকর্ত্তাগণ বলিয়াছেন।

সর্ব্ব শাস্ত্রে সূর্য্যনারায়ণে সর্ব্ব দেবতার ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন, তিন সময়ে; প্রাতে ব্রহ্মা রূপে, মধ্যাহ্নে বিষ্ণু রূপে এবং সায়াহ্নে শিব রূপে,—প্রাতে ঋক্‌বেদ অর্থাৎ কালীমাতা রূপে, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ অর্থাৎ দুর্গা রূপে এবং সায়াহ্নে সামবেদ অর্থাৎ সরস্বতী রূপে সূর্য্যনারায়ণের ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে।

যথা—প্রাতে ব্রহ্মারূপে—

"ওঁ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসাসন সমারূঢ়ং ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ।"

ইহার অর্থ অনেকে অনেক প্রকার করেন। এই জন্য, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ খ্রীষ্টান ও মুসলমান ইত্যাদি ধর্ম্মাবলম্বীগণ হিন্দুদিগকে ঘৃণা করেন। তাঁহারা বলেন যে, হিন্দুদিগের দেবতা কেহ হাঁসের উপর, কেহ পাখীর উপর, কেহ ষাঁড়ের উপর চড়িয়া বেড়ায়। কাহারও চারি হাত, কাহারও দশ হাত; কাহারও চারি মুখ, কাহারও পাঁচ মুখ ইত্যাদি। এইরূপ অনেক কথা কহিয়া থাকেন, ও বিদ্রূপ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই তাঁহাদিগকে ইহার সার মর্ম্ম বুঝাইয়া তাঁহাদের ভ্রম নিরাকরণ করেন না এবং তাঁহারাও অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ইহার সার ভাব বুঝিতে পারেন না। যাহা হউক, ইহার সার মর্ম্ম এইরূপ জানিবেন।—"রক্তবর্ণং" অর্থাৎ প্রাতঃকালে যখন সূর্য্যনারায়ণ লাল তেজোময় জ্যোতিঃ বালক স্বরূপ নিরাকার হইতে সাকার রূপে প্রকাশ হয়েন, সেই প্রাতঃ সময়ের রূপ "রক্তবর্ণং"; "চতুর্ম্মুখং" অর্থে চতুর্দ্দিকে যাঁহার মুখ আছে, যথা অগ্নি জ্যোতির দশ দিকেই মুখ আছে, যে দিক্ হইতে হাত দিবে, সেই দিক হইতেই হাত পুড়িবে। এইরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপের দশদিকেই মুখ আছে, অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপ প্রকাশ হয়েন, ঐ জ্যোতিঃস্বরূপের দশ দিকেই মুখ আছে; মুখ অর্থে জ্যোতিঃ। সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা যখন উদয় হয়েন, তখন তাঁহাদের জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকেই অর্থাৎ সমস্ত জগতেই নিপতিত হয়। এই জন্য মুনি ঋষিগণ প্রাতঃকালে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণের চতুর্ম্মুখ কল্পনা করিয়াছেন। প্রাতে যখন ঐ জ্যোতিঃ ব্রহ্মা রূপে প্রকাশ হয়েন, তখন রাজা প্রজা, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলেই ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার ও ধ্যান ধারণা করিবেন। "দ্বিভুজং" অর্থে দুই হাত। যিনি নিরাকার জ্যোতিঃস্বরূপ, তাঁহার আবার দুই হাত কোথা হইতে আসিবে? ইহার অর্থ এই রূপ বুঝিবেন; যথা, বিদ্যা আর অবিদ্যা (জ্ঞান ও অজ্ঞান) তাঁহার দুই হস্ত। অবিদ্যা রূপ হস্ত দ্বারা তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতেছেন। আর বিদ্যারূপ হস্ত দ্বারা সকলকে লয় করিয়া আপনার কারণে যাইয়া স্থিতি করিতেছেন। "অক্ষ সূত্র"—"অক্ষ" অর্থে অক্ষয় অর্থাৎ যাহার ক্ষয় নাই; অবিনশ্বর। "সূত্র" শব্দে জ্যোতিঃ; অর্থাৎ যে জ্যোতির ক্ষয় নাই, এমন জ্যোতিঃ। "কমণ্ডলু করং" শব্দে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল শরীর জ্যোতিঃ সূত্রে গাঁথিয়া নিজের হস্তে রাখিয়াছেন। অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেরই তাঁহা হইতে উৎপত্তি ও তাঁহাতেই লয় হইতেছে; আর তাঁহাতেই সমস্ত স্থিতি আছে। হংস শব্দে প্রথম বিবেকী পুরুষ। অর্থাৎ হরিভক্ত জনের নাম হংস। হংস যেমন নীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর অর্থাৎ দুগ্ধ পান করে, সেইরূপ হরিভক্ত জন এই সংসারকে জলবৎ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মারূপ অমৃত পান করেন। এই জন্য তাঁহাদের নাম হংস। সেই ভগবদ্ভক্ত বিবেকী পুরুষরূপী হংসের উপর ব্রহ্মা অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আরুঢ় আছেন। অর্থাৎ তিনি সেই হরিভক্ত জনের হৃদয়েই বাস করেন। অবশ্য তিনি সকলের মধ্যেই পরিপূর্ণরূপে আছেন, কিন্তু বিবেকী পুরুষেই তাঁহার বিশেষ প্রকাশ। যখন এ বিবেকী পুরুষ (হংস) পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহাকে পরমহংস বলে। অর্থাৎ যাঁহার জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই পরমহংস।

নাভি মধ্যে ধারণ করিবার অর্থ এই যে, আপনার ক্ষুদ্র নাভিতে এবং বিরাট ব্রহ্মের আকাশরূপ নাভিতে তেজোময় জ্যোতিঃ অর্থাৎ জগৎপিতা জগন্মাতা জগদ্গুরু জগদাত্মা সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ আছেন, সেই পরমাত্মাকে ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করিও অর্থাৎ চিন্তা করিও।

মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপে—

"ওঁ হৃদি নীলোৎপলদল প্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খঃচক্রগদা পদ্ম হস্তং গরুড়াসন সমারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়েৎ।"

আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ও বিরাট-ব্রহ্মের আকাশরূপ হৃদয়ে "নীলোৎপলদল প্রভং" অর্থাৎ নীলপদ্ম সদৃশ বিষ্ণু ভগবান পরম জ্যোতিঃ সূর্য্য নারায়ণ প্রকাশমান আছেন। "শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তং", শঙ্খ অর্থে সমষ্টি চরাচরের মস্তক, যখন বিষ্ণু ভগবান চেতনরূপী শঙ্খ বাজান, তখন সমষ্টি চরাচর সকল কার্য্য করেন, ও বাইবেল, কোরাণ, বেদান্তশাস্ত্রাদি পাঠ করেন; যখন আপনার চেতন শক্তি সংকোচ করিয়া লয়েন, তখন চরাচর শঙ্খ সুষুপ্তি অবস্থাতে পড়িয়া থাকে। আর কোন কার্য্য করে না। "চক্র" অর্থে জ্ঞান। সেই জ্ঞান-চক্র দিয়া অজ্ঞানরূপী রাক্ষসকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ করিয়া, পরমানন্দে আনন্দরূপী রাখেন। "গদা" অর্থে অবিদ্যা। অহঙ্কারী অর্থাৎ পরমাত্মা-বিমুখী লোককে ঐ অবিদ্যারূপী গদা দ্বারা তাড়না করেন। এবং পদ্ম শব্দে মন। এই মন রূপ পদ্মে সমষ্টি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ধারণ করিয়া আছেন। মন দিয়া জয় ও পরাজয় করেন। মন জয় হইলে সকলই জয় হয়, বিষ্ণু ভগবানের যে চারিটী হস্ত কল্পনা করা হইয়াছে, উহা চারি অন্তঃকরণ। অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। এই চারি হস্ত দ্বারা চরাচরকে পালন করিতেছেন। "গরুড়াসনসমারূঢ়ং"। গো শব্দে চরাচরের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। সেই চরাচরের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভিতর বাহিরে বিষ্ণু ভগবান আরূঢ় অর্থাৎ বিরাজমান আছেন। সেই বিষ্ণু ভগবানকে নমস্কার ও ভক্তি করা চাই। তিনি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ, এই বিশ্বে পরিপূর্ণ আছেন।

সায়ংকালে উঁহাকে শিব রূপে—

"ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশুল ডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং। ত্রিনেত্রং বৃষভাসনস্থং শম্ভুং ধ্যায়েৎ॥"

"ললাটে" নিজের ক্ষুদ্র কপালে এবং বিরাট ব্রহ্মের আকাশরূপ ললাটে, শ্বেত অর্থে শুভ্রবর্ণ। সায়ংকালে যখন চন্দ্রমা জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন, সেই সময়ে শিবরূপে সেই চন্দ্রমা-জ্যোতিকে ধারণ করিতে হয়। দ্বিভুজং অর্থে বিদ্যা ও অবিদ্যা। ত্রিশুল অর্থে সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ; ডমরু (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) চরাচরের শরীর। এই চরাচরের শরীর রূপী বাদ্য যন্ত্র হইতে কত প্রকার রাগ রাগিণী বাহির হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই শরীররূপী ডমরু বাদ্যযন্ত্রকে শিবজি চেতন অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ বাজাইতেছেন; আর ইহা হইতে নানা প্রকার সুর বাহির হইতেছে। "অর্দ্ধচন্দ্রং" অর্থে ভুষণ সংযুক্ত চন্দ্রমা-জ্যোতি। আর তাহাতে শিবজি বাস করেন। ইহার অর্থ ভুষণ জগৎমায়া—শিব শব্দে জ্যোতিঃ।

"পঞ্চবক্ত্রং" পাঁচটি মুখ অর্থাৎ ক্ষিত্যপ-তেজ মরুৎব্যোম এই পাঁচ তত্ত্ব। এই বিরাট ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। "ত্রিনেত্রং" অর্থে জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি, চন্দ্রমা ও সূর্য্য-

নারায়ণ। অর্থাৎ অজ্ঞান, জ্ঞান ও বিজ্ঞান। অজ্ঞান-নেত্রে গৃহস্থ ব্যবহারিক কার্য্য করিতেছে। জ্ঞাননেত্রে সদসৎকে বিচার করিতেছেন ও বিজ্ঞান নেত্রে জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ দেখিয়া অর্থাৎ এক হইয়া পরমানন্দে থাকেন। ললাটে ধ্যায়েৎ অর্থে সেই পরম জ্যোতিঃ মস্তকে আছেন। তাঁহাকে প্রীতি ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করিবে। অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সূর্য্যনারায়ণরূপে মস্তকে ধারণা করিতে হইবে। এবং সেই জ্যোতিকে বেদমাতা বলিয়া অর্থাৎ ঋক, যজু ও সাম বলিয়া সূর্য্যনারায়ণকে ধ্যান করিতে হইবে। ইহা শাস্ত্রের বিধি। প্রাতে ঋকবেদ অর্থাৎ কালীমাতারূপে, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ অর্থাৎ দুর্গামাতারূপে ও সায়ংকালে সামবেদ অর্থাৎ সরস্বতীমাতারূপে সূর্য্যনারায়ণকে ধ্যান করিবার বিধি আছে। ব্রহ্ম-গায়ত্রী ও সাবিত্রী সন্ধ্যা আহ্নিক প্রভৃতি সকল নামের ধ্যান সূর্য্যনারায়ণেতে আছে; ইহার প্রমাণ। যথা—

"ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডল মধ্যস্থা রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধরা হংসাসনারূঢ়া ব্রহ্মাণী ব্রহ্ম দৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

প্রাতে গায়ত্রীকে (কুমারী ঋগ্বেদ স্বরূপা ব্রহ্মরূপিণী, হংসারূঢ়া, অক্ষ সূত্র ও কমণ্ডলু হস্তা, রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে আছেন।) এইরূপ চিন্তা করিবে।

মধ্যাহ্নে ;—

"ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডল মধ্যস্থা কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তা যুবতী গরুড়ারূঢ়া বৈষ্ণবী বিষ্ণু দৈবত্যা যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে যুবতী, যজুর্ব্বেদ স্বরূপা বিষ্ণুরূপিণী গরুড়ারূঢ়া, কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারিণী সাবিত্রী-রূপা সূর্য্যমণ্ডলে আছেন, এইরূপ চিন্তা করিবে।

সায়াহ্নে ;—

ওঁ সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডল মধ্যস্থা শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশুল ডমরুকরা বৃষভাসনারূঢ়া বৃদ্ধা রুদ্রাণী রুদ্র দৈবত্যা সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

সায়াহ্নে গায়ত্রীকে সামবেদ স্বরূপা শিবরূপিণী বৃষভারূঢ়া, শুক্লবর্ণা, দ্বিভুজা, ত্রিশুল ও ডমরুধারিণী সরস্বতীরূপা সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে আছেন, এইরূপ চিন্তা করিবে।

মনু বলিয়াছেন ;—

"অগ্নির্বায়ু রবিভ্যেস্ত ত্রয়োব্রহ্ম সনাতনং।" "অগ্নির্বা ঋকবেদ যায়তে, বায়ুর্বা যজুর্ব্বেদ যায়তে, সূর্য্যাতু সামবেদঃ।" সতপথব্রাহ্মণ অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ, অগ্নি ও বায়ু, এই তিন সনাতন ব্রহ্ম। অগ্নি হইতে ঋক্‌বেদ হইয়াছে, এইজন্য অগ্নির নাম ঋকবেদ-মাতা, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ হইয়াছে, এজন্য বায়ুর নাম যজুর্ব্বেদমাতা এবং সূর্য্যনারায়ণ হইতে সামবেদ হইয়াছে, এজন্য সূর্য্যনারায়ণকে সামবেদমাতা বলে। অর্থাৎ একই বিরাট্ পূর্ণপরব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপাধি ভেদে নানা প্রকার নাম কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি বহু নহেন, একই পুরুষ নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। অজ্ঞান ব্যক্তি ঐ সকল কল্পিত নাম ও তাহার অর্থ লইয়াই ব্যস্ত থাকে, মূল বস্তু পরমাত্মার প্রতি তাহার আদৌ দৃষ্টি থাকে না। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ সকল নাম অর্থ ত্যাগ করিয়া মূল বস্তু আত্মাকে ধারণ করেন। যেমন জলের নানা প্রকার নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া জল যে বস্তু, তাহাকে তুলিয়া পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়, সেইরূপ, সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ

মাতা পিতা গুরু আত্মার নানা প্রকার কল্পিত নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ধারণ করিলে অর্থাৎ জ্যোতিকে ধারণ করিলে সহজেই মনে শান্তি আইসে। নিরাকার ও সাকার পূর্ণরূপে উপাসনা করা গৃহস্ত লোকের কর্ত্তব্য। সেই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ গুরু মাতা পিতার প্রতি সর্ব্বদা নিষ্ঠা ভক্তি প্রীতি রাখিবে। তাঁহার আপনার মন্ত্রের রূপ প্রত্যক্ষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ একই জানিয়া ধ্যান ধারণা করিবে। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে যখন নিরাকার হইতে সাকার রূপে প্রকাশ হয়েন, তখন সকলে বালক বৃদ্ধ যুবা, পুরুষ স্ত্রী সকলেই ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করিবে। মনে রাখিবে যে ইনি আমার মাতা পিতা গুরু ও আত্মা। তিনি তোমাদের মনের সকল প্রকার ভ্রম কুসংস্কার দূর করিয়া পরমানন্দে আনন্দ স্বরূপ রাখিবেন। এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধ ফল প্রদান করিবেন। এক অক্ষর প্রণব মন্ত্র জপ করিবে। কেন না, চারিবেদের মূল হইলেন চব্বিশ অক্ষর ব্রহ্মগায়ত্রী, ব্রহ্মগায়ত্রীর মূল হইলেন ওঁকার, প্রণব মন্ত্র। আবার ওঁকারে মূল হইলেন, তেজোময় জ্যোতিঃ স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ জগৎগুরু জগদাত্মা। যদ্যপি কেহ সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া কেবল ব্রহ্মগায়ত্রী যপ করে, তাহা হইলে তাহার সন্ধ্যা আহ্নিক করার ফল হয়। আবার সন্ধ্যা আহ্নিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী, দুই না করিয়া যে কেবলমাত্র একাক্ষর ওঁকার জপ করে, তাহা হইলে তাহার সন্ধ্যা আহ্নিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী দুইই জপ করার ফল হয়। এ সকল কিছুই না করিয়া যদি সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা জ্যোতির সম্মুখে ভক্তি প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার করে, তাহা হইলে তাহার উপাসনার সমস্ত ফলই লাভ হয়, ও মনে শান্তি আইসে। ওঁকার মন্ত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবানের নাম। বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম দেবতা ও দেবী। বেদেতে স্পষ্টই লেখা আছে যে, সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা, অগ্নি ও বায়ু, দেব ও দেবী মাতা। এই আপনার ইষ্ট ও গুরু হইতে বিমুখ হইয়া আর্য্যজাতির এই অধঃপতন হইয়াছে। কিন্তু এখনও চৈতন্য নাই। আজ কাল সকলেই আপনাকে এক একজন অভ্রান্ত ধর্ম্মবেত্তা বলিয়া জগতে প্রচার করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা অনেকেই যে সত্যকে ত্যাগ করিয়া অসার কল্পিত বস্তু লইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের আদৌ ধারণা নাই। পণ্ডিতগণ, পাদরীগণ, মৌলবীগণ আপনাপন শাস্ত্রের অর্থবাদ লইয়াই ব্যস্ত; সার ভাব কেহই গ্রহণ করেন না। সুতরাং তাঁহাদের শাস্ত্র পাঠ করা যে বৃথা, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই স্থানে একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। একজন তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি তৃষ্ণা নিবারণ জন্য এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল যে, ভাই, আমার অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে, জল এখানে কোথা পাওয়া যায়, জান কি? তাহাতে সে ব্যক্তি বলিল যে, এই স্থানের ঠিক উত্তর দিকে একটি পুষ্করিণী আছে। আপনি প্রথমতঃ এই রাস্তা দিয়া গমন করুন, কিছু দূর যাইলে সম্মুখে তিনটা রাস্তা দেখিতে পাইবেন। বামদিকের দুইটা রাস্তা ছাড়িয়া ডাহিনের রাস্তা ধরিয়া যাইতে হইবে, এইরূপে আর কিছু দূর যাইলে সম্মুখে নয়টা রাস্তা দেখিতে পাইবেন, তাহার মধ্যে বাম দিকের আটটি রাস্তা ছাড়িয়া দক্ষিণের রাস্তা

ধরিয়া কিছুদূর যাইলেই সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড পুষ্করিণী দেখিতে পাইবেন। চারিধারে চারিটা বাঁধা ঘাট আছে, কিন্তু পুষ্করিণীর জল পানাতে ঢাকা আছে। আপনি সিঁড়ি দিয়া ঘাটে নামিবেন এবং হাত দিয়া পানা নাড়িলেই পরিষ্কার জল দেখিতে পাইবেন। পরে ঐ জল তুলিয়া পান করিলেই আপনার পিপাসার শান্তি হইবে। এখন সেই ব্যক্তি ঐ সকল কথা ক্রমাগত আবৃত্তি করিতে লাগিল যে, এখান হইতে খানিক আগে গেলে তিনটা রাস্তা, তাহার পরে আর কিছুদূর গেলে নয়টা রাস্তা, তাহার দক্ষিণের রাস্তা ধরিয়া গেলে সম্মুখে বড় পুষ্করিণী, তাহার চারিধারে বাঁধা ঘাট আছে, ইত্যাদি; কিন্তু জল যে পদার্থ, তাহা সে আদৌ পান করিল না। সুতরাং তাহার পিপাসারও শান্তি হইল না। এইরূপ বেদ, বাইবেল, কোরাণ, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র রাত্রি দিন পণ্ডিত মৌলবী ও পাদরীগণ পাঠ করুন না কেন, যত দিন তাঁহারা তাহার সার ভাব গ্রহণ করিতে না পারিবেন, অর্থাৎ, সকল শাস্ত্রের মূল যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, তাঁহাকে ধারণ না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল। অজ্ঞানরূপী অন্ধকার কখনই তাঁহাদের হৃদয় হইতে, মন হইতে দূর হইবে না। অতএব আপনারা আপনাদের জাতিগত সংস্কার, মান অপমান, জয় পরাজয়, সমস্ত ত্যাগ করিয়া, সেই একমাত্র সার বস্তু সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ, জগৎপিতা জগন্মাতা জগদ্গুরু জগদাত্মা, নিরাকার ও সাকার প্রত্যক্ষ বিরাট রূপে বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে ধারণ করুন, তাঁহাকে প্রীতি ভক্তি করুন, আপনাদের কল্যাণ হইবে, সন্দেহ নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আর কয়েকটী প্রশ্নোত্তর।

বিপিন বাবুর দ্বিতীয় প্রশ্ন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর গণের ভিতর কয়জন দামোদর ছিলেন? তন্মধ্যে কোন দামোদর বাক্যদণ্ড করেন?

উত্তর।—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতীর্ণ কালে তদীয় পূর্ব্ব সহচর দামোদর নামে তিনজন ভক্ত ছিলেন।

(১) স্বরূপ দামোদর, পূর্ব্বাশ্রমে ইঁহার নাম শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য, ইনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার কালে যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই এইজন্য গুরুদত্ত নাম শ্রীস্বরূপ দামোদর। এই দামোদর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ, আর সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের অষ্ট সখীর প্রধানা শ্রীললিতা সখী, মাধুর্য্য রসের ভাণ্ডারী প্রভুর ছায়া স্বরূপ প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া প্রভুকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিদিত আছে—

"স্বরূপ গোসাঁই প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
যা হৈতে জানেন প্রভু রসের তরঙ্গ॥
বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে, প্রভুর আনন্দ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম, বুদ্ধে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর, নাহি মহামতি॥"

শ্রীগণোদ্দেশ দীপিকায়া আছে;—

"ললিতা নন্দদো নিত্যমুক্তয়ে কুঞ্জ রাজকঃ।
স্বরূপ দামোদরতাং প্রাপ্তা গৌররসেন্তয়া॥"

"ললিতা বলিয়া নাম ছিল পূর্ব্বকালে।
স্বরূপ দামোদর নাম, এবে হৈলা ভালে॥"

(২) পণ্ডিত দামোদর। ইনি, শ্রীনবদ্বীপ হইতে শ্রীনীলাচলে আগমন করিয়া, একটী বিধবা ব্রাহ্মণ রমণীর নাবালক পুত্রকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অতি স্নেহ করিতেন বলিয়া ইঙ্গিতের দ্বারা প্রভুকে বাক্যদণ্ড করিয়াছিলেন। ইনি, নিরপেক্ষ ভক্ত নামে প্রসিদ্ধ। ইনি, পূর্ব্ব যুগে শ্রীবৃন্দাবনে শৈব্যা নামে শ্রীরাধিকার প্রিয় সখী ছিলেন। যথা, গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায়;

"শৈব্যা যাসীদ্‌ব্রজে চণ্ডী স দামোদর পণ্ডিতঃ।
কুতশ্চিৎ কার্য্যতো দেবী প্রাবিশত্তং সরস্বতী॥"

অস্যার্থ—"গোকুলে প্রখরা শৈব্যা হন যেই জন।
তিঁহো এবে দামোদর পণ্ডিত রতন॥
সরস্বতী দেবী তাতে পশি কার্য্য বশে।
নিতি নিতি প্রভু সেবি ভাসে প্রেমরসে॥"

অপিচ, বৈষ্ণবাচার দর্পণে—

"শৈব্যা সখী ব্রজে যাঁর বক্রতা চরিত।
এবে গৌরাঙ্গের সঙ্গে, দামোদর পণ্ডিত॥
চৈতন্যের শাখাবাস, অভিরাম পুরে।
প্রেমের চন্দল বিহোঁ, প্রভু সঙ্গে করে॥"

বর্ণিত আছে। শ্রীশ্রীমুরারি গুপ্ত প্রথমে যে, শ্রীচৈতন্য চরিত লেখেন, এই দামোদরই তাঁহার প্রশ্ন কর্ত্তা এবং শ্রীমুরারি বক্তা ও দামোদর শ্রোতা। বিদিত আছে, গীত, বাদ্য, নৃত্য, এই তিনটী সঙ্গীত অর্থাৎ সংকীর্ত্তনের প্রধান অঙ্গ। তন্নিবন্ধন এই দামোদর "সঙ্গীত দামোদর নামে" একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থের ত্রয়োদশ শ্লোকে আছে;—

"সঙ্গীত সৎকার্য্য গুণা ন ভিজ্ঞ।
খ্যাত পশু পুচ্ছ, বিষাণ হীন॥
চরত্য সৌ কিন্তু তৃণং ন ভুক্তে।
পরমপশুনাং মপি ভাগ্য হেতোঃ॥"

সঙ্গীত দামোদর গ্রন্থের ভিতর মৃদঙ্গ সাধনের বহু শত বোল আছে। মনোহরসাহী কীর্ত্তনে সেই সকল বোল বাদিত হয়।

(৩) শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী। ইনি, ক্ষেত্রবাসী শ্রীনীলাচলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সঙ্গে যে ১০ জন সন্ন্যাসী ছিলেন ইনি, সেই অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন।

যথা গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায়;—

"অনন্তস্য, সুখানন্দো, গোবিন্দো, রঘু নাথক।
কৃষ্ণানন্দ, কেশবঞ্চ, শ্রীদামোদরো, রাঘবো॥"

সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে কাহা কর্ত্তৃক কোন বিগর্হিত কার্য্য দেখিলে এই দামোদর তাঁহার দণ্ড বিধান করিতেন। ইনি, সন্ন্যাসী দলের মধ্যে তপস্বী ছিলেন। তাই ইহাঁর নাম ব্রহ্মচারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দক্ষিণ গমনের কালে ভক্তগণের সমীপে বলিয়াছিলেন;—

"আমিত সন্ন্যাসী, দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদারহে আমার উপরে দণ্ড ধরি॥"

তৃতীয় প্রশ্ন।—শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রয়াগধামে গমনকালীন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সমভিব্যাহারে যে কয়জন ভক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে কয়জন পশ্চিমা ও কয়জন গৌড়ীয়া?

উত্তর।—যৎসময়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে প্রয়াগে গমন করেন, তৎ সময়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গে (১) পুরী গোস্বামীর শিষ্য মাথুরী ব্রাহ্মণ (২) কৃষ্ণদাস রজঃপুত "এই দুই পশ্চিমা" (৩) বলভদ্র ভট্টাচার্য্য (৪) তাহার সঙ্গী জনৈক বিপ্র (৫) জনৈক সৎ শূদ্র ভৃত্য। এই "তিন জন গৌড়ীয়া।" সাকল্যে ৫ জন ছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে পাঠান উক্তি।

"পাঠান কহে তুমি, পশ্চিমা দুইজন।
গৌড়ীয়া ঠক এই, কাঁপে তিন জন।"

পুনরুক্তি—

"এই পঞ্চ মেলি তোমায় ধুতরা খাওয়াইয়া।
তোমার ধন নৈল তোমায়, পাগল করিয়া॥"

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উক্তি ;—

"প্রভু বলে ঠক নহে, মোর সঙ্গীগণ।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি, নাহি কিছু ধন॥
মৃগি ব্যাধিতে আমি হই অচেতন।
এই পঞ্চ দয়া করি, কর'য়ে পালন॥"

পাঠক ইহার পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ দেখিবেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যৎকালে নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন, সেই কালে শ্রীস্বরূপ দামোদরের উক্তি।

"স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুখিন্দ বড় পণ্ডিত সাধু আর্য্য॥
ইহার সঙ্গে আছে "বিপ্র এক ভৃত্য"।
ইহোঁ পথে করিবেন সেবা ভিক্ষা, কৃত্য॥"

"বিপ্র এক ভৃত্য" এই পাঠ লইয়া অনেকে বিবেচনা ও বিতর্ক করেন। (১) বলভদ্র (২) তদীয় ভৃত্য স্বরূপ একজন ব্রাহ্মণ, এই দুই জন মাত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; পরন্তু শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রয়াগ গমন কালীন শেষ তিন জন কোথা হইতে হইল ?—

মীমাংসা।—দুই জন নহেন ; তিন জন। "বিপ্র (এক) ভৃত্য" পূজ্যপাদ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী পদ্য লিখিবার নিয়মে এবং ছন্দানুরোধে (এক) শব্দটী মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দুঃখের পরিচয় দিয়াছেন। যথা কোন শব্দ মধ্যগত থাকিলে পর পূর্ব্ব শব্দের সহিত বিনিয়োগ হয়। ব্রাহ্মণের ভৃত্য ব্যবসা নহে। শূদ্র দ্বারা ভৃত্যের কার্য্য সমাহিত হয়।

"অবোধ বা সুবোধবা ব্রাহ্মণ মামুকী তনুঃ।"

ব্রাহ্মণ অবোধ হউক বা সুবোধ হউক, ঈশ্বরের তনু স্বরূপ। ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের বাক্য। যে ব্রাহ্মণের পদ স্বয়ং ভগবান বক্ষে ধারণ করিয়াছেন এবং ভীষ্মক রাজদুহিতা স্বয়ং লক্ষ্মী রুক্মিনী দেবীর প্রেরিত ব্রাহ্মণের পদ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সেবা করিয়াছিলেন, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে ভৃত্য ভাবে সঙ্গে লইবেন, একথা কখন কি সম্ভব হয় ? পাক কার্য্য নির্ব্বাহ করা ব্রাহ্মণের এবং পথক্লান্ত হইলে পদ সেবা এবং পদ ধৌতের নিমিত্ত জল যোগান সৎ শূদ্রের কার্য্য। এই জন্যই শূদ্র দাস নামে পরিচিত। বলভদ্রের সহিত একজন বিপ্র ও একটী শূদ্র ভৃত্য ছিল। তাই, শ্রীস্বরূপ দামোদর সঙ্কেতে দুয়ের কথা বলিয়াছিলেন। এইরূপ অর্থই পূর্ব্ব হইতে জানা আছে। ভিতরে আর কোন তাৎপর্য্য আছে কি না, তা, প্রভু জানেন।

চতুর্থ প্রশ্ন।—"তুমিহ নিজ ছায়া সঙ্গে আসিবে মোর ঘরে"।

ইহার অর্থ কি ?

উত্তর।—এই পয়ারের অর্থ সম্বন্ধে সাহজিক এবং বাউল সম্প্রদায় যে অর্থ সমন্বয় করেন, তাহা অসঙ্গত। সে অর্থ কর্ণে স্থান দিতে নাই। তাহা বিশেষতঃ "নিজ ছায়া সঙ্গে" এ কথা মূল গ্রন্থে নাই। পূজ্যপাদ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী কৃত এবং তাঁহার স্বহস্ত লিখিত মুল গ্রন্থ দৃষ্টে বিষ্ণুপুর মল্লরাজের সভাপণ্ডিত শ্রীশ্রীব্যাস আচার্য্য দেব যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং যে গ্রন্থের আদর্শ প্রাচীন গ্রন্থ আমার বাড়ীতে আছে, তাহাতে এই পাঠ আছে ;—

"তুমিহ নিজেচ্ছায়ে আসিবে মোর ঘরে।
কভু সঙ্গে আসিবে, স্বরূপ দামোদরে॥"

বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহার ভিতর তর্ক কিছুই নাই। অর্থ সহজ, যথা-"নিজ ইচ্ছায়" নিজেচ্ছায়, ইকার স্থানে একার যোগ হইয়াছে। তবে এখনকার ছাপার পুস্তকে

"তুমিহ নিজ ছায়ে" যে এই পাঠ আছে, তাহা ভুল, তাহার কোন মানে নাই। সে দোষ গ্রন্থকারের নহে। দোষ কলিকাতার বটতলার। তা যাহাই হউক, মূলকথা ;— শ্রীনীলাচল ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত ১০ জন সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীশ্রীমাধবিন্দ পুরী গোস্বামী স্বতন্ত্র। তিনি, প্রতি মাসে ৫ দিন করিয়া শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে ভিক্ষা করিতেন। ১০ জন সন্ন্যাসী ২।২-দিন করিয়া ভোজন করিতেন এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিজ ইচ্ছা ক্রমে ভিক্ষা করিতেন। ইহাই নির্ব্বন্ধ ছিল। মধ্যে ২০ দিন অর্থাৎ পূর্ণ এক মাস প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত শ্রীভট্টাচার্য্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা করেন। পরন্তু, প্রভু তা অঙ্গীকার করিলেন না। উত্তরে বলিলেন, একস্থানে প্রতি দিন ভিক্ষা যতি ধর্ম্ম নহে। শ্রীভট্টাচার্য্য ৩০ দিনের ১০ দিন কমাইয়া ২০ দিনের নিমিত্ত জিদ্ করিলেন ; প্রভু, তদুত্তরে বলিলেন, ১ দিন। শ্রীভট্টাচার্য্য "নাছোড়বন্দা" শেষে প্রভুর শ্রীচরণ ধারণ করিয়া ২০ দিনের ৫ দিন ঘটাইয়া ১৫ দিন, শেষ আবার ১৫ দিনের ৫ দিন কমাইয়া ১০ দিনের নিমিত্ত বিস্তর অনুনয় ও যত্ন করিলেন। ভক্তাধীন ভগবান তখন আর অন্যথা করিতে পারিলেন না। ভক্তবাঞ্ছা পূরণার্থে ৫ দিন ভিক্ষা অঙ্গীকার করিলেন। তখন ভট্টাচার্য্য সাহসী হইয়া পুনরুক্তি করিলেন। যথা ;—

"তবে সার্ব্ব ভৌম কবে আর নিবেদন।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশজন॥
পুরী গোসাঁইর ভিক্ষা মোর পাঁচ দিন ঘরে।
পূর্ব্বে আমি কহিয়াছি তোমার গোচরে॥"
দামোদর স্বরূপ এই বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবে কভু একেশ্বর॥
আর অষ্ট সন্ন্যাসীর, দুই দুই দিবসে।
একেক দিন এক এক জন পূর্ণ হইল মাসে॥"
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঁই।
সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই॥
তুমি নিজেচ্ছায়ে, আসিবে মোর ঘরে।
কভু সঙ্গে আসিবে, স্বরূপ দামোদরে॥

পাঠক এখন ঠিক মিলাইয়া দেখুন দেখি ; শ্রীশ্রীপুরী গোস্বামীর ৫ দিন, আর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ৫ দিন, আর ৮ জন সন্ন্যাসীর ২।২ দিন করিয়া ১৬ দিন, এইত মোটে ২৬ দিন, ৩০ দিন পূর্ণ হইতে এখন ৪ দিন বাকী। ইহাতে "এক এক দিন এক এক জন পূর্ণ হইল মাসে"-কেমন করিয়া ৩০ দিন পূর্ণ হইল ?

ইহার ভিতর শ্রীশ্রীভট্টাচার্য্যের বলিবার এবং পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীকবিরাজের কেমন লিখিবার কৌশল দেখুন। "দামোদর, আর স্বরূপ" এই দুইজন, ঐ ১০ জন সন্ন্যাসীর ভিতর, অর্থাৎ তদন্তর্গত। কিন্তু ভট্টাচার্য্য ৮ জনের কথা বলিলেন। দামোদর ও স্বরূপের ২।২ দিনের কথা খুলিয়া বলিলেন না। কারণ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত ভট্টাচার্য্যের যখন ঐ কথা হয়, তখন দামোদর ও স্বরূপ উভয়েই শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকটে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের ২।২ দিনের কথা খুলিয়া বলিলে তাঁহারা দুই দুই দিনের বেশী গমন না করেন। এই জন্য তাঁহাদের মর্য্যাদা স্থাপনার্থে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন ; এই দামোদর স্বরূপ আমার বান্ধব ; কখন একে একে আগমন করিবেন, কখন বা আপনার সঙ্গে গমন করিবেন। পাঠক, এখন দেখুন দেখি, ভট্টাচার্য্যের এই উক্তি দ্বারা এখন ৩০ দিন পূর্ণ হইল না কি ?

ভিতরে আরো অন্য কথা আছে ; শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যেখানে কোন নিমন্ত্রণে যাইতেন, নিজগণ সহিত যাইতেন, বিশেষত স্বরূপ দামোদর ছাড়া কোথাও একা যাইতেন না। ভট্টাচার্য্যের

পূর্ব্বোক্ত ও পরোক্তির দিকে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন"যেখানে অগ্রে দামোদর স্বরূপ" এই পাঠ আছে, সেখানে এক নহেন দুই অর্থাৎ দামোদর ব্রহ্মচারী ও স্বরূপ দামোদর। আর যেখানে "স্বরূপ দামোদর" অগ্রে স্বরূপ পাঠ আছে, সেখানে দুই নহেন, এক অর্থাৎ স্বরূপ দামোদর।

বহুত সন্ন্যাসী যদি, আইসে এক ঠাঞী,

ভট্টাচার্য্যের এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য? কি জানি যদ্যপি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দলপুষ্টি বর্জ্জন করিয়া গমন করেন, অপরাধী হইতে হইবে। তজ্জন্য সঙ্কেত নিবেদন; দ্বিতীয়ত, প্রভু যেরূপ নিজ ইচ্ছায় গমন করেন, তাহার অন্যথা না হয়, তজ্জন্য বিশেষ করিয়া বলিলেন; আপনি "নিজ ইচ্ছায়" গমন করিবেন আর কখন কখন স্বরূপকে সঙ্গে লইবেন।

ভট্টাচার্য্যের এইরূপ সঙ্কেত বাণীতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিলেন না। মৌন ভাব অবলম্বন করিলেন। তদ্দ্বারা ভট্টাচার্য্য বুঝিলেন "মৌন সম্মতি লক্ষণং" এইজন্য পরের পয়ারে আছে;—

"প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা' আনন্দিত মন।
সেই দিন মহা প্রভুর, কৈল নিমন্ত্রণ॥"

পূজ্যপাদ বৃদ্ধ মাতামহ মহাশয়ের সরল শিক্ষা দানে, এই অর্থ সদর্থ বলিয়াই আমাদিগের জ্ঞান ও বিশ্বাস।

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর।—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শাখার ভিতর যে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজের নাম আছে, তাঁহারা স্বতন্ত্র, অর্থাৎ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সমকালীন ভক্ত শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য নহেন। পশ্চাৎ শ্রীশ্রীআচার্য্য প্রভুর অবতার কালে বুধরী গ্রামে যে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ দুই ভাই জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই শ্রীশ্রীআচার্য্য প্রভুর শিষ্য। বলা বাহুল্য, এক নাম ও এক উপাধি-ভুক্ত জগতে বহু নাম আছে ও তা থাকিবারও সম্ভব।

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর।—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই রায় রমানন্দের অন্তর্দ্ধান হয় নাই। কিছু পরে অর্থাৎ শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সহিত রামানন্দ দেখা সাক্ষাৎ করিয়া, ১৪৫৬ শকের মাঘ মাসে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন। অন্যান্য বিষয় পরে প্রকাশ্য।

শ্রীহারাধন দত্ত।

বর্ত্তমান বঙ্গভাষা।* (৩)

সাধারণ ভ্রম।

সংস্কৃত ভাষা-সম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কেহ কেহ বিভিন্নরূপ ভাবিয়াছেন। তাঁহাদের সুগোচরার্থে দৃষ্টান্ত দ্বারা অতি সংক্ষেপে আমাদের মত পরিস্ফুট করা যাইতেছে। "পূর্ব্ব" শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে বেদের প্রয়োগে "পূর্ব্বেভিঃ" হয়। লৌকিক প্রয়োগে ঐ স্থলে "পূর্ব্বৈঃ" হইয়া থাকে। বেদে যেখানে "গমামঃ" হইয়া থাকে, তথাকার লৌকিক প্রয়োগ "গচ্ছামঃ"। আর্ষ প্রয়োগ গুলিও শিষ্টপ্রয়োগ বলিয়া গণ্য হয় না। সুতরাং পরিদৃশ্যমান অধুনা-প্রচলিত সংস্কৃত ভাষা পরিবর্ত্তিত, এ কথা কি ভাবে বলা গিয়াছিল, সকলে বুঝিয়া লউন।

"জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ" যে ধরণের বঙ্গভাষায়

* এই প্রবন্ধ বহুদিন পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল। স্থানাভাবে মুদ্রিত হয় নাই। ন, স।

সুপ্রণালীসিদ্ধ রচনা, ইংরেজিতে তদনুরূপ আর কতকগুলি দৃষ্টান্ত কেহ কেহ দেখিবার বাসনা রাখেন। ঐ বিষয়েরই ইংরেজিতে অনুরূপ বাক্যাংশ প্রচলিত আছে। যথা—

বার্থ, ডেথ, ম্যারেজ (Birth, Death, Marriage)। বার্থ জন্ম, ডেথ মৃত্যু, ম্যারেজ বিবাহ। সুতরাং আর অধিক উদাহরণের আবশ্যক কি?

এক সম্প্রদায় বলিতেছেন, আমাদের প্রদর্শিত ভ্রম, ভাল ভাল লেখকদের রচনায় দৃষ্ট হয় না। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, "করতঃ" লিখিতেন। তিনি অনেক পরে তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কোন কোন পুস্তকের নূতন সংস্করণে সে দোষগুলি অদ্যাপি শোধিত করা হইতেছে না। পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ও "করতঃ" লেখেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাভূষণ "উজ্জ্বলিত" "শৃঙ্খলিত" প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন। ওগুলি কদাপি বিশুদ্ধ নয়। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাভূষণ দ্বিতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত লেখক, প্রথম প্রস্তাবেই তাহা বলিয়াছি। বাবু রজনীকান্ত গুপ্তও "পর্য্যটক" "প্রজ্জ্বলিত" "সম্বন্ধীয়" "পক্ষীগণ" ইত্যাদি অবিশুদ্ধ ও অসংস্কৃত পদ লিখিয়া থাকেন। পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও রজনীকান্ত বাবু প্রথম দলের লেখক-শ্রেণীভুক্ত। বিদ্যারত্নকে ও রজনীকান্ত বাবুকে আমরা প্রথম দলের লেখক বলিলাম কেন, তাহার কারণ আছে। তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার নিয়ম রক্ষার পক্ষপাতী; অথচ উল্লিখিত অশুদ্ধ পদাবলি ভাষায় প্রয়োগ করিয়াছেন! বাবু রজনীকান্তের বাজারে বিশুদ্ধ লেখক বলিয়া খ্যাতি আছে। অনেকেই তাঁহার বিশুদ্ধির বড়াই করেন। আমরাও তাঁহাকে বিশুদ্ধ ভাষা-লেখক জানিতাম। অতি অল্প দিবস হইল, কোন কোন কারণে তাঁহার পুস্তক আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার ঐ সকল ভুল দেখিতেছি। আশা করা যায়, ওগুলি শোধিত হইবে। বাবু মনোমোহন বসু অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দুইখানি পুস্তক, পাঠ্য-তালিকার অন্তর্গত। তথাপি তাহাতে কিছু কিছু ভুল রহিয়াছে। এ বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগের দৃষ্টি পতিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। "প্রকৃতি"-নাম্নী পত্রিকায় পাঠ্য-পুস্তকের যে দোষালোচনা হইয়াছিল, তাহাতে রজনীকান্ত বাবুর বা মনোমোহন বাবুর কোন দোষোল্লেখ ছিল না। বরং "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় রজনীকান্ত বাবুর ত্রুটির নির্দ্দেশ হইলে, "প্রকৃতি" পত্রিকায় সেই লেখক, সেগুলির সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

গত সংখ্যায় "২৫ শে" লেখা হইয়াছে দেখিয়া, অনেকেই আমাদিগকে প্রশ্ন করিতেছেন। কেন না, "অনুসন্ধান" পত্রিকায় আমরা "২২ শে" লেখার পরিবর্ত্তে "২২ এ" প্রচলনের উদ্যোগী হইয়াছিলাম। এখন আমরা অনুশীলন করিয়া বুঝিয়াছি, আমাদের সেই মতে কিছু কিছু দোষ ঘটে। তজ্জন্য সেই মত পরিত্যাগ করা গেল। মত-পরিবর্ত্তনের কারণ, প্রবন্ধান্তরে বলা যাইবে।

৯। হংসিনী, চাতকিনী, গোপিনী।—"পদ্মিনী" ও "কুমুদিনী" সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে দেখিয়া কতিপয় লেখক—হংসিনী, চাতকিনী, গোপিনী ইত্যাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা যদি কিছু ভাবিয়া দেখিতেন, তবে

ওরূপ পদ-বিন্যাসে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইত না, অনায়াসে নির্দ্দেশ করিতে পারি। যাঁহারা "পদ্মিনী" "কুমুদিনী" এই যুগ্ম শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গের আদর্শ ধরিয়াছেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা এই,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ।
পদ্ম	পদ্মিনী।
কুমুদ	কুমুদিনী।

উক্ত অভিমত ভ্রমসঙ্কুল। সংস্কৃত ভাষায় "পদ্ম" শব্দ ক্লীবলিঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুই এক স্থলে কেবল উহার পুংলিঙ্গে প্রয়োগ আছে। যথা,—

১। "ভাতি পদ্মঃ সরোবরে।"

২। "প্রকটতি যদি পদ্মঃ পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।"

যদি কেহ তর্ক করিয়া বলেন, ক্লীবলিঙ্গ হইতেও তো স্ত্রীলিঙ্গের স্থলে স্থলে ব্যবহার দেখা যায়। তদুত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, এখানে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? কবিগণ, পদ্মকে সূর্য্যের প্রণয়িনী কল্পনা করিয়া উহাকে 'পদ্মিনী' ও কুমুদকে চন্দ্র-দেবের প্রণয়ভাগিনী বলিয়া উহাকে 'কুমুদিনী' বলিয়া গিয়াছেন। পদ্মিনী অর্থে সুতরাং পদ্মের পত্নী নয়। কুমুদিনীর অর্থও কুমুদের পত্নী হইল না। ভানু পদ্মবন্ধু, ইন্দু কুমুদবন্ধু—ইহা কবি-প্রয়োগ। পদ্মিনী শব্দে পদ্মলতা, কুমুদিনী শব্দে কুমুদলতা বুঝাইয়া থাকে। অতএব ইহার নজীর ধরিয়া চাতকিনী, গোপিনী, হংসিনী পদগুলি সিদ্ধ হইতে পারে না। কবিতায় ও গানে ছন্দের অনুরোধে কোন স্থানে যুক্তাক্ষর ভাঙিয়া ছন্দকে বড় করিতে হয়। কোথায় বা নূতন পদ বিন্যস্ত করিতে হয়। ছন্দঃপতন, রসভঙ্গ, শ্রুতি-কঠোরতা প্রভৃতি দোষ পরিহার করিতে গিয়া সীমাবদ্ধ ছন্দোবন্ধনের মধ্যে পড়িয়া গীত-রচকগণকে ও কবিদিগকে সময়ে সময়ে ভাষার নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয়। সেই কারণেই তাঁহারা "চাতকিনী" "কুমুদিনী" "পদ্মিনী" "গোপিনী" লিখিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। কবিদের ও সঙ্গীত-রচকদের যে যে পদাবলি-দৃষ্টে লোক-সাধারণ চালিত হন ও যাহাকে তাঁহারা প্রমাণ-কালে আবৃত্তি করেন, সে গুলি এই—

"যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন-দরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু-মিলনে॥"

—মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

"কে কে যাবি সঙ্গে তোরা গিরিজায়া যায় রে।
ঘন-দরশনে আজি চাতকিনী ধায় রে॥"

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"যোল শ' গোপিনী তোমার।"

—গোবিন্দ অধিকারী।

উক্ত স্থলে কবিতাকারগণকে ও গীতরচককে ছন্দাদির অনুরোধে যাহা করিতে হইয়াছে, তাহার অনুকরণ,গদ্য লেখকগণের পক্ষে নিয়ম হইলে চলিবে না। গীতিকারগণ ও কবিরাও "গোপী" বিশুদ্ধ বলিয়া জানেন। তাহার নিদর্শন দেখুন—

"বাঁকা বংশীবদন! দাঁড়াও
ত্রিভঙ্গ হৃদয়-কমলে।
যাতে গোপীর মন ভুলালে॥"

আরও একটী সঙ্গীত দেখান যাউক না কেন?

"কোথা যাও হে গোপীকান্ত
কাঁদায়ে গোপিনীগণে।"

এই শেষোক্ত সঙ্গীতে "গোপী" ও "গোপিনী" দুই পদই ব্যবহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু "গোপী" দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি, গানে ও কবিতায় "গোপিনী" লেখার চলন আছে। ফল কথা, গদ্যে "গোপিনী" লেখা

অবৈধ। "চাতকিনী" না হইয়া 'চাতকী' এবং "হংসিনী" না হইয়া 'হংসী' হইবে। একটী সঙ্গীতেও "চাতকী"প্রয়োগ শুনিয়াছি। আপাততঃ সেই সঙ্গীতটি উদ্ধৃত করিতে পারা গেল না। "আর্য্যদর্শনের" প্রসিদ্ধ লেখক বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু "পুরোহিত"-নামক মাসিক পত্রিকায় "গোপিনী" লিখিয়াছেন।* তাঁহার নিজের বিশেষ মতামত অনবগত থাকায়, তাঁহাকে কোন্ শ্রেণীতে নিবিষ্ট করিব, এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। "নাপিত্নী" পরিবর্ত্তে 'নাপিতী' হওয়া আবশ্যক। নিতান্ত চলিত বাঙ্গালায় "নাপিত্নী" বলিলে হানি হয় না। ফলতঃ অশ্ব, অজ, দ্বিজ, মূষিক, চটক ইত্যাদি নির্দিষ্ট জাতিবাচক শব্দ ব্যতীত জাতিবোধক অপর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ "ঈ" হইবে, কিন্তু উক্ত-প্রকারে "আনী" প্রত্যয়যুক্ত হওয়া অবিধি—নিয়ম-বিরুদ্ধ।

১০। পারক।—'আমি এ কাজ করিতে সমর্থ'—এইরূপ স্থলে অনেকেই "পারক" লিখিয়া বসেন। কথাটা শুদ্ধ করিয়া বলিতে গেলে, 'পারগ' হইবে। † যিনি পারে গমন করেন, তাঁহাকে 'পারগ' বলে। 'পারগ' পদের অর্থ পারদর্শী, নিপুণ। এই দুই অর্থ হইতে "সমর্থ" এই অর্থও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ওরূপ স্থলে "পারক" লিখিলে ভুল হয়। যাঁহারা 'পারগ' লিখিতে "পারক" প্রয়োগ করেন, আমরা তাঁহাদের ঐ "পারক" বজায় রাখিতে একান্তই 'পারগ' নই। "ঐতিহাসিক রহস্য" পুস্তক প্রভৃতি প্রচলিত কোন কোন পুস্তকে এই ভুল চলিয়া আসিতেছে।

১১। বক্তৃতা প্রদান, বক্তৃতা দেওয়া।—টু ডিলিভার্ এ ডিস্‌কোর্স, টু ডিলিভার্ এ লেক্‌চার (To deliver a discourse, to deliver a lecture) এই বাক্যের অনুবাদ "বক্তৃতা প্রদান করা" বা "বক্তৃতা দেওয়া" করিলে অবিকল ভাষান্তর করা হয়। টু গিভ্ লেক্‌চার্ (To give lecture) যেমন প্রশস্ত ইংরাজি নয়, "বক্তৃতা দেওয়া" সেইরূপ প্রশস্ত বাঙ্গালা বলিয়া গণ্য হয় না ‡। তাহাতে ভাষার দোষ ঘটে। উহার পরিবর্ত্তে 'বক্তৃতা করা' বলাই বিশুদ্ধ। সুখের বিষয়, নূতন লেখকেরাই "বক্তৃতা দেওয়ার" পক্ষপাতী। ঐ লেখকেরা যখনই প্রবীণ হন, তাঁহারা এতাদৃশ বিসদৃশ শব্দ ব্যবহারে ক্ষান্ত হন। "লেক্‌চার" শব্দের অনুবাদে "বক্তৃতা" লেখাও সর্ব্বত্র সমীচীন নয়। লেক্‌চারার্ সংস্কৃত কলেজ (Lecturer, Sanskrit College)—এখানে 'সংস্কৃত কালেজের বক্তা' এইরূপ অনুবাদ করিলে ভাষায় এক অপূর্ব্ব বস্তুর সমাবেশ করা হইবে। "লেক্‌চারার্" অর্থে উপদেষ্টা, শিক্ষাদাতা, অধ্যাপক প্রভৃতির প্রতীতি করিয়া না দিলেই ভুল হইবে। বিদ্যাসাগর মহোদয় "চরিতাবলী" ও "জীবনচরিত" পুস্তকে "লেক্‌চার্"

* বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "কৃষ্ণ-চরিত্রের" সর্ব্বত্রই "গোপী" লিখিয়াছেন। ভ্রম ক্রমেও কোন স্থানেই "গোপিনী" ব্যবহার করেন নাই।

† সংস্কৃতে উহার এইরূপ বাক্য,—
"পারং গচ্ছতি যঃ সঃ পারগঃ।"

‡ ভেরারেণ্ড ডল্ সাহেব, কেবল এই প্রকার লিখিয়াছেন,—"A Score of facts on Tobaco being the substance of a *lecture given* at the Barabazar Literary Club, by C. H. Dall. M A. ইটালিক অক্ষর মৎ কৃত।

শব্দের অর্থ, সর্ব্বত্রই 'উপদেশ' 'শিক্ষা' শব্দে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১২। "তৎকালীন" বলিলেন, "যৎকালীন" লিখিতেছিলাম।—"তৎকালীন" "যৎকালীন" অবিশুদ্ধ নয়। কিন্তু উক্ত দুই স্থানে উহারা ভ্রমপূর্ণ অর্থে ব্যবহৃত। "যৎকালীন" "তৎকালীন" শব্দ-দ্বয়ের অর্থ—যৎকাল-সংক্রান্ত, তৎকাল-সংক্রান্ত। সুতরাং উহারা বিশেষণ। উহাদের পর বিশেষ্য পদের ব্যবহার থাকিলে উহারা বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে; অন্যত্র উহার অন্যথাভাব; সুতরাং উক্ত দুই বাক্যের পর বিশেষ্য পদের প্রয়োগ আবশ্যক। কেবল বিশেষ্যের প্রয়োগ হইলেই চলিবে না; সেই বিশেষ্যটী অধিকরণ কারকে প্রযুক্ত হওয়া চাই। তাহা করিতে গেলে, "তৎকালীন" পরিবর্ত্তে 'তৎকালে' এবং "যৎকালীন" স্থলে 'যৎকালে' লেখা উচিত। মহামান্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর প্রথমে ঐরূপ লিখিয়াছিলেন। তিনি ওরূপ লেখা ত্যাগ করিয়া নিজের মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া আমাদের আদর্শস্বরূপে বিরাজ করিতেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার অনুবর্ত্তী বলিয়া পরিচিত কতকগুলি লোক, এখনও ঐ ভ্রান্তি-বিজড়িত হইয়া মোহাচ্ছন্ন থাকিতেছেন। তবে ভরসার মধ্যে ঐ সকল লোক নবীন লেখক। কালে তাঁহারাও ভ্রম নিরসন করিয়া মহান্ হইবেন, এরূপ আকাঙ্ক্ষা অসম্ভব বা অসঙ্গত নয়।

১৩। আমার "সাবকাশ" নাই।—এই বাক্যে "সাবকাশ" বিশেষণ। উহার অর্থ 'অবকাশের সহিত বর্ত্তমান'। কিন্তু এখানে ঐ বাক্যে বিশেষ্য পদ প্রয়োগ করিতে হইবে, নতুবা ভুল হইবে। উহাকে এই স্থানে শুদ্ধ করিয়া 'অবকাশ' লিখিলেই, উহাতে কোন ভুল রহিল না। 'অবসর' শব্দ, ওখানে বসাইলেও হানি হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া "সাবসর" লিখিলে কোন ক্রমেই চলিবে না। আর এক প্রকারে ঐ বাক্যটী সংশুদ্ধ করা যায়। যথা,—'আমি সাবকাশ নই।' ইহার অর্থ—আমি অবকাশবিশিষ্ট নই।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

ঐতিহাসিক মীমাংসা। (১)

যুধিষ্ঠিরের কালনির্ণয় উপলক্ষে প্রসঙ্গতঃ বৃহদ্রথবংশীয় মাগধ রাজগণের রাজ্যকাল স্থির করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। আমি বিগত আশ্বিন সংখ্যার নব্যভারতে এই বিষয়ের যেরূপ মীমাংসা করিয়াছিলাম, শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। "মগধের রাজবংশ" প্রবন্ধে গত চৈত্র সংখ্যার পত্রিকায় দেউস্কর মহাশয় আমার মীমাংসাটীকে "পুরাণ-বিরুদ্ধ" বলিয়াছেন এবং বায়ু, মৎস্য, ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হইতে বার্হদ্রথ রাজগণের বংশতালিকা ও রাজ্যকাল উদ্ধৃত করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি যেরূপ দূরদর্শনের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি। এরূপ প্রতিবাদী পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি। কিন্তু দেউস্কর মহাশয় যেরূপ গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে দুঃখের সহিত বলিতে

হইতেছে যে, তাঁহার পৌরাণিক ইতিহাসাভিজ্ঞতা অপেক্ষা তদীয় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন অনেক অধিক বলিয়া বোধ হয়।

আমি যেরূপ মীমাংসা করিয়াছিলাম, তাহা আমার "চাতুর্য্য প্রকাশ" নহে। অথবা বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত মীমাংসাও নহে। প্রকৃত অর্থ গোপন করিয়া অভিনব অর্থ প্রকাশ করিয়া আমি লোক-বিমোহনেরও চেষ্টা করি নাই। যত দিন জীবিত থাকিব, উক্তরূপ গর্হিত কার্য্য দ্বারা আমার লেখনী কখনও দূষিত হইবে না। পুরাণে কথিত হইয়াছে, বৃহদ্রথবংশীয় রাজগণ, মগধে সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। দেউস্কর মহাশয় ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সোমাপি হইতে সেই সহস্র বৎসর ধরিতে চাহেন। আমার মতে বৃহদ্রথ (বংশের আদিপুরুষ) হইতে সেই সহস্র বৎসর ধরিতে হইবে। সোমাপি হইতে ঐ সহস্র বৎসরের কয়েক শত ভুক্তাবশিষ্ট বর্ষ মাত্র ধরা উচিত। ইহাই এক্ষণে বিবাদের বিষয় হইয়াছে। দেউস্কর মহাশয় যে বংশ-তালিকার বলে আমার মত-খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই তালিকার দোষগুণ বিচার করিবার পূর্ব্বে আমায় বলিতে হইতেছে যে, আমি বায়ুপুরাণ অবলম্বন করিয়া উক্তরূপ মীমাংসা করিয়াছিলাম। কল্পনা-বলে উক্ত মীমাংসা করি নাই। বায়ুপুরাণে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে, বৃহদ্রথ হইতে ৩২ বত্রিশ জন রাজার রাজ্যকাল সহস্র বৎসর। দেউস্কর মহাশয় সে কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহেন। যাহা হউক, তিনি যখন "সত্যের অনুরোধে" আমার মতখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন আশা করি, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এইরূপ সত্যের অনুরোধেই তিনি তর্করত্ন মহাশয়ের 'পুরাবৃত্ত' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া যুধিষ্ঠিরের স্থিতিকাল দ্বাপরান্তে সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। এইরূপ "সত্যের অনুরোধেই" তিনি কানাই বাবুর মত সমালোচনা করিয়া যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল কলির প্রথম শতাব্দীতে আনিয়াছিলেন। এইরূপ "সত্যের অনুরোধেই" তিনি রাজতরঙ্গিণীর মতানুসারে যুধিষ্ঠিরের জন্ম ৬৫৩ কল্যব্দে বিশ্বাস করিতেন, এবং "সত্যের অনুরোধেই" তিনি যুধিষ্ঠিরের কাল এক্ষণে নন্দাভিষেকের পনর শত বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিতেছেন। আজ ছ মাস হয় নাই, তিনি যুধিষ্ঠিরকে কলির প্রথম শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আর ইহারই মধ্যে আবার কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে ধর্ম্মরাজকে আনিতেছেন। কি সুন্দর সত্যের অনুরোধ! যেরূপ দ্রুতগতিতে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহাতে আশা হয়, আর দু চারি শত বৎসর তিনি যুধিষ্ঠিরকে লইয়া অগ্রসর হইবেন এবং আমারও সহিত মতের ঐক্য হইবে। দেউস্কর মহাশয় যে সত্যের অনুরোধেই লেখনী ধরিয়াছেন, ইহাই দেখান আমার উদ্দেশ্য। তবে যদি কেহ বলেন, তিনি জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া সকলের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি কি করিতে পারি? আমি তো বলি, দেউস্কর মহাশয়ের জিগীষার লেশমাত্রও নাই।

এক্ষণে দেউস্কর মহাশয়ের দু একটী প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারত-যুদ্ধকালে যুধিষ্ঠির নবতি বৎসর বয়স্ক হইয়াছিলেন। কিন্তু দেউস্কর মহাশয় আমাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন, তিনি (ধর্ম্মরাজ) তাহা হইলে গুরু দ্রোণ অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের বড় হইতে-

ছেন। মহাভারত দ্রোণপর্ব্বে দেউস্কর মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ভারত যুদ্ধকালে আচার্য্য মহাশয়ের বয়স ৮৫ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। আমার বক্তব্য এই— আমি নিজে কল্পনা দ্বারা যুধিষ্ঠিরের বয়স নির্দ্দেশ করি নাই। রাজবারা দেশের প্রসিদ্ধ ইতিহাস রাজাবলী গ্রন্থ হইতে উক্ত মত সংগ্রহ করিয়াছিলাম এবং উক্ত গ্রন্থের নামও উল্লেখ করিয়াছিলাম। এক্ষণে দেউস্কর মহাশয়ের আবিষ্কৃত মতটী ঠিক্ হইলে, রাজাবলীর মতটী খণ্ডিত হই-তেছে। কিন্তু একটী সামান্য কথার উল্লেখ করিলে এবিষয়টী বিশদরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। রাজা শান্তনু মৃগয়ায় যাইয়া কৃপ-কৃপী-নামক বালক বালিকাকে পাইয়া-ছিলেন এবং তাহাদিগকে নিজ-সংসারে রাখিয়া প্রতিপালন করেন। এই কৃপী, দ্রোণা-চার্য্যের স্ত্রী ও অশ্বত্থামার জননী। রাজা শান্তনুর মৃত্যুর অন্ততঃ দশ বার বৎসর পরে ধৃতরাষ্ট্রাদির জন্ম হয়। সুতরাং কৃপী ধৃত-রাষ্ট্র অপেক্ষা ১২।১৪ বৎসরের বড়। ধৃতরাষ্ট্রও অন্ততঃ ২৫।৩০ বৎসর যুধিষ্ঠির অপেক্ষা বড়। কাজেই কৃপী, যুধিষ্ঠিরের অপেক্ষা প্রায় ৪০ চল্লিশ বৎসরের বড় হইতেছেন।

দেউস্কর মহাশয় স্বকপোল-কল্পিত যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীধর স্বামিধৃত শুকো-ক্তির দোষ দেখাইয়াছেন ও ভারত-যুদ্ধকালে যুধিষ্ঠিরের বয়স ৬৯ বা ৭৯ বৎসর ধরিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলে, ভারত-যুদ্ধকালে কৃপীকে ১১০ বা ১২০ বৎসর-বয়স্কা বলিতে হয়। দ্রোণগুরু তাহা হইলে নিজের পত্নী অপেক্ষা অন্ততঃ ২৫ বৎসরের ছোট হইতেছেন। আচার্য্য মহাশয় কি পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে বিবাহ করিয়াছিলেন নাকি? পৌরাণিক ইতিহাসে সবিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দেউস্কর মহাশয় কি বলেন? যদি বলেন, দ্রোণাচার্য্যের বয়স ঠিক্ পঁচাশী বৎসর হইয়াছিল এবং কৃপী তাঁহার চেয়ে কিছু ছোট ছিলেন, তাহা হইলে ভারত-যুদ্ধ-কালে ধর্ম্মরাজের বয়স ৪০ বৎসরের অধিক হয় না। ইহার ৩৬ বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু ও যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান ঘটিয়াছিল। কাজেই সে সময় ধর্ম্মরাজের বয়স ৭৬ বৎসরের অধিক হয় নাই। কিন্তু পুরাণকার বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ "বর্ষাণাম্ অধিকং শতং" অর্থাৎ এক শতেরও অধিক কয়েক বৎসর পৃথিবীতে ছিলেন। দেউস্কর মহাশয়ের মতে এক শত পাঁচ বৎসর ধরিলেও, যুধিষ্ঠিরের বয়সের সহিত ঐক্য হয় না। সুতরাং দেউস্কর মহাশয়ের কল্পিত যুক্তি একেবারেই ভিত্তি-হীন। শ্রীধর স্বামীর মত ও রাজাবলীর মতে ঐক্য আছে। শ্রীধর স্বামী শুকোক্তি ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইহলোক ত্যাগ ১২৫ বৎসরে স্থির করিয়াছেন। যুধি-ষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কিছু বড় ছিলেন। ভারত-যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে যদুবংশ-ধ্বংস অস্বীকার করিবার যো নাই। কাজেই ভারত যুদ্ধকালে যুধিষ্ঠিরের বয়স ৯০ বৎসর নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে। পৌরাণিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেউস্কর মহাশয় একথা বুঝিতে পারিবেন।

অনন্তর সপ্তর্ষি মণ্ডলের গতি আলোচনা কালে দেউস্কর মহাশয় বলিতেছেন, "সপ্তর্ষি সম্বন্ধে অনেক গোল। পুরাণে সপ্তর্ষি সম্বন্ধে যে সকল উক্তি আছে, তাহার প্রকৃত তাৎ-পর্য্য আমি বুঝিতে পারি নাই। যাহা বুঝিতে পারি নাই, তাহার সম্বন্ধে বিচার করিতে আমি অসমর্থ।" বেশ, সরল ভাবে

দেউস্কর মহাশয় একথাগুলি বলিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তবু তিনি সপ্তর্ষি সম্বন্ধে কয়েক দফা আপত্তি তুলিতে ক্ষান্ত হন নাই। বুঝেন নাই, তাই রক্ষা, নচেৎ তাঁহার আপত্তির চোটে অস্থির করিয়া তুলিতেন। যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতেই সপ্তর্ষিগণ অগতিতে মারা পড়িলেন।

সপ্তর্ষির গতি লইয়া আমি বিচার করিতে চাহি না। কেন না পূর্ব্বাপর আর্য্য জ্যোতিষিগণ সপ্তর্ষির গতি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বরাহমিহির, শাকল্য, মুনীশ্বর সকলেই সপ্তর্ষির গতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া পুরাণকারগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চয়ই আছে। জ্যোতিষিগণ সপ্তর্ষির গতি ধরিয়া কালগণনার যে পন্থা বাহির করিয়াছিলেন, পুরাণেও, সেই ভাবে কালসংখ্যা কথিত হইয়াছে। সুতরাং যদি বিচার করিবার কিছু থাকে, তবে তাহা জ্যোতিষিগণের সহিত,পুরাণকারদিগের সহিত নহে। এজন্য সপ্তর্ষির গতি বিষয়ক শ্লোকগুলিকে আমি মূল্যহীন বিবেচনা করিতে পারি না। যদি এরূপ একটী অঙ্ক থাকে যে "কর্ড মেলট্রেণ ঘণ্টায় ৩০ মাইল চলিয়া ১৬ ঘণ্টায় মোগল সরাইয়ে পৌঁছিয়া থাকে, তাহা হইলে হাওড়া হইতে মোগল সরাইয়ের দূরত্ব অথবা অমুক সময় হাবড়া ছাড়িলে অমুক সময় সরাইয়ে পৌঁছিবে—এরূপ সমাধান কি করা যায় না? এখানে কি এ সকল তর্ক তুলিতে হইবে যে, মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন গুলিতে কতকক্ষণ করিয়া গাড়ী থামে, সকল গুলিতে সমান থামে কি না? এ সম্বন্ধে আর একটী কথা এই যে, সপ্তর্ষিগণের গতি যদি জ্যোতিষিগণের কল্পিত কথাই হয়, তাহা হইলেও উপস্থিত বিচারস্থলে সে কথা উঠিতে পারে না। কেন না, যদি পুরাণকার বলিতেন মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়ায় যাইতে সপ্তর্ষির যে সময় লাগে, তত দিন পরে নন্দরাজ্য হইবে। ইহা হইতে আমরা যদি সিদ্ধান্ত করিতাম, ইহার অন্তরকাল ১০১৫ বৎসর,তাহা হইলে দোষের হইত ও সপ্তর্ষির গতি আছে কি না, এই প্রশ্ন কাজের হইত। কিন্তু কেবল যদি সপ্তর্ষিগণ এক এক নক্ষত্রে এক শত বৎসর করিয়া থাকেন এবং অমুকের সময়ে মঘায় থাকিয়া অমুক রাজার রাজ্যকালে পূর্ব্বাষাঢ়ায় যাইবেন, এইরূপ নির্দ্দেশ থাকে, তাহা হইলে সামান্যতঃ মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়ার অন্তর আমাদের গণিতে হইতেছে। সপ্তর্ষির গতি-বিষয়ক কথা তো উঠিতেছে না। আমার মতে পুরাণোক্ত সপ্তর্ষির গতি-বিষয়ক শ্লোকগুলি কালগণনার সমস্যা নির্দ্দেশ-মাত্র। জ্যোতিষশাস্ত্রের সমস্যা নহে।

এক্ষণে শাকল্যসংহিতার কথা বলিয়া আপাততঃ ক্ষান্ত হইব। দেউস্কর মহাশয় বলিতেছেন, "চারু বাবু স্বীকার করিয়াছেন যে, পুরাণ-বিরুদ্ধ মত গ্রাহ্য নহে, তবে তিনি শাকল্যের মতগ্রহণ করিতেছেন কেন?" শাকল্যের মতে কলি-প্রারম্ভকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল শ্রবণা নক্ষত্রে ছিলেন। আমিও এই মতের পক্ষপাতী। এ মত যে পুরাণবিরুদ্ধ নহে, ইহাই আমার বিশ্বাস। কেন না, পরীক্ষিতের রাজ্যকালে কলি প্রবৃত্ত হইলেও, তৎপূর্ব্ব হইতে কলির আবির্ভাব হইয়াছিল। কেবল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে ছিলেন বলিয়া কলি-বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই। বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশ শেষ অধ্যায় ও তট্টীকা দেখিলেই ইহা

বুঝিতে পারা যায়। কাজেই কলির আরম্ভকালে সপ্তর্ষিগণ কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছিলেন, (তর্করত্ন মহাশয়ের মতে সম্ভবতঃ রেবতীতে) রাজতরঙ্গিণীধৃত বরাহমতে আমি আস্থাবান্ হইতে পারি নাই। যুধিষ্ঠিরের কালনির্ণয় প্রবন্ধের ২৯১—৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বার্হদ্রথ রাজগণের বংশতালিকা আগামী বারে যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বসন্তের বোধন।

১

জীবনের অর্দ্ধ অংশ হ'ল সমাপন ;
এ বিরহ-বিষ-জ্বালা বহিয়া কপালে
প্রতীক্ষায় কত কাল করিনু ক্ষেপণ ;—
শুষ্ক ক্রমে আশা-পদ্ম হৃদয়-মৃণালে।
বিগত কৈশোর-শিশু, যৌবন ফুরায় ;
হে প্রেম ! কোথায় তুমি ? এলে না তো হায় !

২

হেরি আমি, তারা-বধূ মেলিলে নয়ন
খদ্যোত তাহারে চাহি' উড়িয়া আকুল ;
উন্মত্ত মধুপ-তানে উথলে কানন
প্রভাতে প্রফুল্ল ৰবে ফুটে ফুল-কুল ;
নিকুঞ্জে বিহগবর বিহগীর সনে
প্রেমসুখে বাঁধি' নীড় বিহরে বিজনে।

৩

গৃহে গৃহে তব দীপ উঠিছে জ্বলিয়া,
এই রুদ্ধ গৃহে শুধু ঘোচে না আঁধার !
দিবানিশি আকাঙ্ক্ষায় একান্তে বসিয়া
ভাবি তাই,—অশ্রুনীরে ভাসি অনিবার।
চরাচর বিশ্ব মুখে হাসি অনুপম,
তাই মাঝে হেন অশ্রু বহে কি বিষম !

৪

দেখিছ দুর্দ্দশা মোর ;—কত বর্ষ-দিন
চ'লে যায়, আসে নাক নবীন উচ্ছ্বাস ;—
সেই সে পুরাণ স্ফূর্ত্তি, আধেক বিলীন,
তাই নিয়ে ভাঙি আর গড়ি বার মাস !
ফুটিছে সৌন্দর্য্য নব, উঠিছে কাকলি ;—
দেখি, শুনি ;—প্রাণ আর উঠে না উথলি।

৫

ভীষণ-শ্মশান-সম আজি এ জীবন ;—
কবিত্ব, কল্পনা, ধ্যান, মানস-আগারে
লুপ্ত প্রায় বহুদিন ; তুষ্ট দুঃস্বপন
শুধু মরীচিকা-সম জ্বলিছে আঁধারে !—
বর্ত্তমান বিভীষিকা, শূন্য ভবিষ্যৎ,
সংশয়-সন্দেহ ভরা বিষণ্ণ জগৎ।

৬

প্রথম বয়স যবে, প্রস্ফুট যৌবন,
আহা ! সে কি দিব্য মোহ, কি মূর্ত্তি সুন্দর
দেখাইলে ! কি সঙ্গীত করিনু শ্রবণ !
দেবের কলিকা নারী, দেবশিশু নর,
সেই দিনে বুঝিলাম ; সেদিন ভাবিয়া
মুগ্ধ আমি আজও প্রাণ রেখেছি ধরিয়া।

৭

নবীন বসন্ত আজি, আকুল কামনা ;—
এস সখা ! গৃহে মোর হের বিকশিত
নবীন কামিনী-কলি ; বিশদ-বরণা,
সরমে, সম্ভ্রমে আঁখি আধ-নিমীলিত ,—
এস গো সরমজয়ি ! শ্রান্ত তনু-হিয়া
ওই সে সৌরভে আজি দাও ডুবাইয়া।

৮

হৃদয়-প্রান্তরে মোর, মরুভূ-মাঝার,
পুণ্য-প্রেম মন্দাকিনী কর বহমান;
চাহি না ঐশ্বর্য্য, গর্ব্ব, ধরার বিকার;—
এস তুমি, বাসনার কর অবসান,
এস ল'য়ে ফুলধনু, ফুলের বাঁধন,
হানো বাণ স্বার্থ-ত্যাগ, আত্ম-বিসর্জন।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা। (৩) *

আধ্যাত্মিক জগতে ব্রহ্মজ্ঞান।

এখন আধ্যাত্মিক জগতে ঈশ্বর-সম্বন্ধে কি প্রকার জ্ঞান হয়,দেখা যাউক। জড় জগতের গুণবাচক পদার্থের জ্ঞানের ন্যায়, আমাদের মন ও মানসিক অবস্থা সকলের জ্ঞানও বাহ্যিক জগতের সাকার জ্ঞানের পরবর্ত্তী ও তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিও মন দ্বারা আমরা বাহ্যিক জগতের জ্ঞান লাভ করি, তথাচ মন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও বাহ্যজগৎ আমাদিগকে সাহায্য করে। যদিও মন আমাদের সকলেরই আছে, মন লইয়া সর্ব্বদা আমরা কারবার করিতেছি, কিন্তু "মন কি?" এই প্রশ্নের উত্তর আজ পর্য্যন্ত কয় জন লোকে দিতে পারিয়াছে? প্রথমতঃ মন যখন বাহ্য জগতের সংস্পর্শে না আসে, আমাদের তাহার তখনকার অবস্থা জানিবার কোন উপায় নাই। তৎপরে আমরা যখন মনের কিছু কিছু অবস্থা জানিতে আরম্ভ করি, তখন সে আমাদিগকে তাহার আদি ও অকৃত্রিম অবস্থা জানিতে দেয় না। তখন কেবল, সে বাহ্য জগতের যে সকল চিত্র সংগ্রহ করিয়া নিজে সজ্জিত হইয়াছে, আমাদিগকে তাহাই দেখায়। যখন মনুষ্যসমাজে মনকে জানিবার প্রথম উদ্যোগ হইয়াছিল, তখন এই সকল চিত্র স্থূল জড়জগতের প্রতিকৃতি মাত্র ছিল। এই জন্য, ইংরেজী ভাষায় মনকে Mind বলে; Mind যে শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ breath, বায়ু। বিখ্যাত দার্শনিক Locke, মন কি তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, Mind is a *tabula rasa*; অর্থাৎ মন একটী শূন্য টেবিল। তার পরে মানুষের চিন্তাশক্তি যখন আরও বাড়িতে লাগিল, তখন মনের জ্ঞান কোন বস্তু বিশেষের প্রতিকৃতি দ্বারা না হইয়া কতকগুলি জাতি ও গুণবাচক ভাবের সমষ্টিতে পরিণত হইল। এই সকল ভাব ক্রমে জ্ঞান(knowing), অনুভব (feeling) ও ইচ্ছা (willing) এই তিন ভাগে বিভক্ত হইল। একটু ভাবিয়া দেখিলে, স্পষ্টই দেখা যায়, যেমন বৃক্ষত্ব জ্ঞান অনেক বৃক্ষ জ্ঞানের পরবর্ত্তী ও তাহা হইতে জাত, সেইরূপ প্রত্যেকটী মানসিক বৃত্তির জ্ঞানও সেই সকল বৃত্তির অনেক অনেক ক্রিয়া দর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠিত। "দয়া" এই বৃত্তিটীর জ্ঞান, অনেক গুলি দয়ার কার্য্য দেখিয়া জন্মিয়াছিল। সেইরূপ, প্রত্যেকটী বৃত্তি সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমাদের জন্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব-সংস্কার আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারি না, সেই জন্য, এখনও আমরা যখন "দয়া" এই গুণবাচক শব্দটী ভাবি, তখন একটী দয়ার বিশেষ

* এই প্রবন্ধ শেষ হইলে নগেন্দ্রবাবু উত্তর দিবেন, সাধারণকে তিনি জানাইতে বলিয়াছেন। ন, স।

ক্রিয়া আমাদের মনে আসে। যেমন, রাম একটী ভিক্ষুককে দেখিয়া একটী পয়সা দিতেছে; রামের সেই ভিক্ষুকের কাতরতা দেখিয়া চক্ষুদিয়া জল পড়িতেছে ইত্যাদি। এই সকল দয়ার চিত্র অবশ্যই সাকার। সুতরাং গুণবাচক নিরাকার দয়ার জ্ঞান আমাদের জাতিবাচক সাকার দয়ার জ্ঞানের উপর নির্ভর করিল। এইরূপে প্রত্যেক মানসিক অবস্থার জ্ঞানই সাকার জ্ঞানের পরবর্ত্তী ও তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মন নিরাকার হইলেও আমাদের মনের জ্ঞান নিরাকার নহে, সাকার।

এখন মন ও মানসিক অবস্থা সকলের জ্ঞান আমাদের সাকার হইলে, তদবলম্বনে আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাও সাকার, এই কারণে, নগেন্দ্র বাবু, "নিরুপম মাতৃস্নেহে", ও "সাধ্বী সতীর পবিত্র প্রেমে" যে নিরাকার ঈশ্বরোপাসনার কথা বলেন, বাস্তবিক তাহাও সাকার উপাসনা। কারণ একটী মাতার চিত্র মনে অঙ্কিত না করিয়া আমরা কখনও মাতৃস্নেহের বিষয় চিন্তা করিতে পারি না। একটী সাধ্বী সতীর চিত্র মনে চিত্রিত না করিয়া, আমরা কখনও তাহার পবিত্র প্রেমের বিষয় চিন্তা করিতে পারি না। এই সকল চিত্র অবশ্যই সাকার। সুতরাং এই সকল চিত্রের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করিতে গেলে তাহাও সাকার উপাসনা হইল।

সাধনার জন্য আমি স্নেহময়ী জননী ও পতিপ্রাণা স্ত্রীর চিত্র সর্ব্বদাই সম্মুখে রাখিতে চাই। এই সকল জীবন্ত স্ত্রীমূর্ত্তি সর্ব্বদা দর্শন করা আমার ঘটিয়া উঠে না। এখন যদি আমি কোন সুনিপুণ শিল্পকার দ্বারা এই সকল জীবন্ত মূর্ত্তির অনুরূপ প্রতিকৃতি চিত্রে, মৃত্তিকায় কিম্বা প্রস্তরে নির্ম্মাণ করাইয়া লই, তবে জীবন্তমূর্ত্তি দর্শনে আমার মনে যে সকল ঐশ্বরিক ভাবের উদয় হইয়া থাকে, এই সকল চিত্র কিম্বা প্রতিকৃতি দর্শনেও সেই সেই ভাব উদিত হইতে পারে। সুতরাং জীবন্ত মাতা কিম্বা স্ত্রীর মূর্ত্তি দর্শনে আমি যে সাধনা করিতে পারি, এই সকল চিত্রগত কিম্বা প্রতিমূর্ত্তিগত স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়াও আমার সাধনার সেইরূপ সুগম হইতে পারে। বরং লাভের মধ্যে এই সুবিধা হয় যে, আমি যখন ইচ্ছা, তখনই এই সকল চিত্রগত কিম্বা প্রতিমাগত স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিতে পারি; কিন্তু আমার পক্ষে জীবন্তমূর্ত্তি দর্শন করা সর্ব্বদা ঘটিয়া উঠে না। অতএব জীবন্ত স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শনে যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনা করিতে বিধান করেন, এই প্রতিকৃতিগত স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শনে ঈশ্বরোপাসনা করিতে তাঁহারা কোনই আপত্তি করিতে পারেন না। এখন এই সকল চিত্রে ঈশ্বরোপাসনার সহিত মৃত্তিকা কিম্বা প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তিতে হিন্দুর ঈশ্বরোপাসনার কোনই প্রভেদ নাই। সুতরাং হিন্দুর দেবদেবীর জড়মূর্ত্তিতে ঈশ্বরপূজা যদি পৌত্তলিকতা ও সাকার উপাসনা হয়, তবে জীবন্ত নারী মূর্ত্তির প্রতিকৃতিতে ঈশ্বরোপাসনা পৌত্তলিকতা না হইবে কেন?

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইল, আমরা জড় জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগতের বিষয় চিন্তা না করিয়া কখনও ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারি না। আমাদের জড় জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগতের সহিত মিলিতভাবে ঈশ্বরের চিন্তা করিতে হয় বলিয়া আমরা কখনও নিরাকার ও নিগুণ

ঈশ্বরের চিন্তা করিতে পারি না। নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্ম আছেন, কিন্তু আমাদের চিত্তবৃত্তি দ্বারা আমরা তাঁহার স্বরূপের ধারণা করিতে পারি না। সেজন্য আমরা যখনই তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে প্রয়াস পাই, তখন কোন না কোন একটা জড়জ গুণ বা ভাব তাঁহাতে আরোপ করিয়া থাকি। আমরা তাঁহাকে বলি "পিতা," "মাতা," "দয়াময়," "প্রেমময়," সে কেবল আমাদের লৌকিক আচারের অনুসরণ করিয়া; আমরা তাঁহাকে পূজা করি, ভয় করি, ভক্তি করি, ভালবাসি, সেও কেবল আমাদের লৌকিক আচারের বশবর্ত্তী হইয়া। ব্রাহ্মগণ, যখন প্রথমতঃ তাঁহাদের জড়-বিদ্বেষ খুব প্রবল ছিল, তখন যতদূর সম্ভব জড়জগুণ প্রকাশক শব্দ সকল তাঁহাদের নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের উপাসনা সম্পূর্ণরূপে ভাববিহীন (Colourless) হইয়া পড়িল। কিন্তু মানুষের মন কখনও সহজে আপন স্বভাব ছাড়িতে পারে না। তাঁহাদের ঐরূপ শুষ্ক উপাসনায় আর মন ভিজিল না। তাঁহারা দেখিলেন, জড় জগতের সম্পর্ক বল পূর্ব্বক একেবারে ত্যাগ করিলে, হৃদয়ে আর ভাবের তরঙ্গ খেলে না। তাই তাঁহারা অবশেষে নিরাকার ব্রহ্মের প্রতি "রাঙ্গাচরণ", "পাদপদ্ম", প্রভৃতি আরোপ করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র বাবু তাহা সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"এইরূপ ভাব ঈশ্বরে আরোপ করা স্বাভাবিক, কারণ মানুষ স্বভাবতঃ ভাবুক ও কবি।" কিন্তু আমি বলি, ইহা স্বাভাবিক, কারণ মানুষ সহজে আপনার স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। মানুষের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দ্বারা সে ঈশ্বরকে নিরুপাধি, নির্গুণ, নিরাকার ভাবে ভাবিতে পারে। সুতরাং তাহাকে ঈশ্বরচিন্তা করিতে হইলেই সে ঈশ্বরকে সগুণ ও সাকার করিয়া লয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই, নিরাকারবাদী যদি নিরাকার ব্রহ্মকে একটা আকার দিয়া, সত্য পদার্থে অসত্যের আরোপ করিয়া, মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তবে সাকারবাদী হিন্দু সেইরূপ করিয়া মুক্তিলাভ হইতে কি দোষে বঞ্চিত হইবেন?

ইহার পরে আমরা নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান কি, তাহা আলোচনা করিব।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

কর্ম্মযোগী ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বৈশাখ মাসের নব্যভারতে, ত্রয়োদশ শতাব্দী সমালোচন কালে যখন আমরা মহাত্মা ভূদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছিলাম, তখন ভাবিতে পারি নাই যে, অল্প কাল পরেই ভূদেব বঙ্গদেশকে আঁধার করিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু বিধাতার লীলা কে বুঝিবে? গত ১লা জ্যৈষ্ঠ, মহা কর্ম্ম-যোগী ভূদেব অনন্তধামে আনন্দ-নিকেতনে প্রস্থান করিয়াছেন। বঙ্গদেশ অমূল্য রত্ন হারাইয়া হাহাকার করিতেছে।

ভূদেব-জীবনী বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে একজন অসাধারণ কর্ম্মযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহার জীবনী প্রকাশের এখনও সময় হয় নাই; যখন বিস্তৃত জীবনচরিত প্রকাশিত হইবে, তখন সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। বাল্যকালে পড়ার প্রতি তাঁহার

প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল; এমন কি, শুনা যায়, পাঠে ব্যাঘাত হইবে বলিয়া ১৪ গ্রাসের অধিক ভাত খাইতেন না। পাঠের প্রতি এই প্রকার অনুরাগ তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ছিল। এরূপ অধ্যয়ন-পিপাসু ব্যক্তি সাধারণত এদেশে প্রায় দেখা যায় না।

এদেশের অনেক ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিয়াছেন। কিন্তু চাকরী করিয়া ভূদেবের ন্যায় উচ্চ সম্মান অতি অল্প লোকে পাইয়াছেন। কারণ আর কিছুই নহে, তিনি যে কাজ হাতে লইতেন, তাহাই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। এইরূপে তাঁহার মাসিক বেতন ১৫০০৲ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এদেশে শিক্ষিত, শিক্ষা-বিভাগের আর কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে এত অধিক বেতন-প্রাপ্তি আর কখনও ঘটিবে কি না, জানি না।

ইহাও তাঁহার কাজের বহিরঙ্গ। তিনি স্বদেশ এবং মানব পরিবারের উন্নতি সাধনের জন্য চিরকাল অম্লান চিত্তে খাটিয়াছেন। বাল্যে কবিবর মধুসূদন এবং নবাব আবদুল লতিফ তাঁহার সহিত এক সঙ্গে পড়িতেন। এক দিন তিন জনের ভাবী জীবন সম্বন্ধে পরস্পরের কথাবার্ত্তা হয়। মধুসূদন বলেন, "বায়রণের তুল্য কবি হইতে ইচ্ছা করি।" নবাব সাহেব বলেন "অত্যুচ্চ পদলাভ করা আমার ইচ্ছা।" ভূদেব বলেন—"দেশের কল্যাণ সাধনে আমার জীবন অতিবাহিত হয়, এই আমার অভিলাষ।" বালক ভূদেবের মনে কেমন স্বদেশ-প্রেম, বিদ্যালয়-জীবনের সময় হইতে অঙ্কুরিত হইতেছিল। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মাতৃভূমির উন্নতির কথা তিনি চিন্তা করিতেন এবং সে জন্য প্রাণপণে খাটিতেন। অর্থ উপার্জ্জন, তাহাও স্বদেশের উন্নতির জন্য। এ পরিচয় সকলে পাইয়াছেন। তাঁহার বাড়ী সকলের নিকট অবারিত-দ্বার ছিল, অবসর পাইলে কাহারও উপকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দেশের কথা শেষ রোগ-শয্যাতেও যে ভুলেন নাই, দেড় লক্ষ টাকা দেশের উন্নতির জন্য দানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্য অবস্থাপন্ন লোকের এরূপ দানের কথা, এদেশে, এই নূতন। আমরা ভূদেবের এই এক অসাধারণ কাজ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি, মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, তিনি ভূদেবতাই ছিলেন। স্বার্থপরতা যে দেশের হৃদয়ে হৃদয়ে বদ্ধমূল, সে দেশে তিনি নিজ স্বার্থ ত্যাগের যে মহা দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, এদেশ কখনও তাহা ভুলিবে না।

সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার স্থান কত উচ্চ, ত্রয়োদশ শতাব্দী সমালোচন কালে তাহা দেখাইয়াছি। ৭০ বৎসর বয়সে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, এই বয়স পর্য্যন্ত তিনি সাহিত্য-সেবা করিয়াছেন। তাঁহার পারিবারিক ও সামাজিক প্রবন্ধ বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য জিনিস। ইহা প্রতি জনের পাঠ করা উচিত; প্রতি গৃহে পঞ্জিকার ন্যায় রাখা উচিত।

সর্ব্বোপরি, আমাদের অনুকরণের জন্য, ভূদেবতা, দীর্ঘকালব্যাপী একটী বিশুদ্ধ, আদর্শ, ধর্ম্ম-যোগময় জীবন রাখিয়া গিয়াছেন। এরূপ সৎকর্ম্মশীল যোগী এবং সাধু এদেশে অতি বিরল। বঙ্গদেশ সৌভাগ্যশালী যে, এরূপ অমূল্য জীবন প্রসবে সক্ষম হইয়াছেন। বাঙ্গালীজাতি সৌভাগ্যশালী যে, তাহাদের মধ্যে এরূপ চরিত্রবান ব্যক্তির অভ্যুত্থান হইয়াছে। বাঙ্গালা-সাহিত্য ধন্য যে, এরূপ গভীর জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি ইহার উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আর আমরা ধন্য যে, এরূপ আদর্শ-মানব-চরিত্র সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। ভূদেব এদেশে চিরদিন ভূদেবতা রূপে পূজিত হইবেন।

পৃথিবীতে জীবোৎপত্তি।

রহস্যময়ী প্রকৃতির সহস্র সহস্র প্রহেলিকার মধ্যে এই পৃথিবীতে জীবের প্রথম আবির্ভাব এক অতিগূঢ় রহস্যপূর্ণ ব্যাপার। এ মহাব্যাপার আজও গাঢ়তম অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আধুনিক বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ আলোক প্রকৃতির অনেক অন্ধকারপূর্ণ গুপ্ত প্রদেশকে বিদ্যালোকে আলোকিত করিয়াছে বটে, কিন্তু এই যে বিশাল জীবনস্রোত—যে স্রোত সহস্র সহস্র বৎসর নয়, কিন্তু কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া এই পৃথিবীর উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে—এই স্রোতের মূল উৎপত্তি স্থান কোথায়, কিরূপে এই স্রোত প্রথম এই পৃথিবীতে সংগঠিত হইল, এই অতি গভীর মহাপ্রশ্নের সদুত্তর দানে বিজ্ঞান আজও অক্ষম; এসম্বন্ধে পরীক্ষাসিদ্ধ স্থির সিদ্ধান্তে বিজ্ঞান আজও উপনীত হইতে পারেন নাই। তথাপি বিজ্ঞান নিরস্ত নন; গভীর উৎসাহে বিজ্ঞান এসম্বন্ধে অনেক কার্য্য করিয়াছেন, অনেক আনুষঙ্গিক তথ্য নির্ণয় করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই সকল তথ্য ও বিশুদ্ধ যুক্তির সাহায্যে বিজ্ঞান আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাব্যাপার সম্বন্ধে কি পূর্ব্বাভাস দেন, প্রিয় পাঠক চলুন আমরা আজ তার আলোচনা করি। সমুজ্জ্বল আলোক পাইব না, জানি; কিন্তু এসম্বন্ধে পূর্ব্বাভাসও কি অমূল্য মহাপদার্থ!

পৃথিবীতে জীব প্রথমে কিরূপে কোথা হইতে আসিল, বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কি বলেন, এবিষয়ের আলোচনা করিতে গেলেই আগে এই প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতঃই উত্থিত হয়—বর্ত্তমান কালে কোন জীব* পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জীবের কোন সংশ্রব বা সাহায্য ব্যতীত কেবল জড় পদার্থ হইতে উদ্ভূত হয় কি না? অনেকে মনে করেন, মশা প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীব জল কিম্বা স্বেদ হইতে আপনা আপনি জন্মে, অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মশা বা অন্য কোন জীবের সংশ্রব ব্যতীত জল স্বেদ কিম্বা এইরূপ কোন জড় পদার্থ হইতে আপনা আপনি উৎপন্ন হয়।† এখন প্রশ্ন এই, বাস্তবিক তাহা হয় কি না? বিজ্ঞান যদি বলিতেন যে, হাঁ তা হয়,—বর্ত্তমান কালে কোন কোন নিকৃষ্ট জীব জড় পদার্থ হইতে উদ্ভূত হয়;—এমন কি, বিজ্ঞান যদি শুধু এইটী বলিতে পারিতেন যে—না মশার ন্যায় উচ্চশ্রেণীর জীব নয়, কিন্তু সেইরূপ জীব, যাদের সম্বন্ধে মশাকে উচ্চ শ্রেণীর জীব বলিতে হয়,—সেইরূপ জীব, যারা অনুবীক্ষণে একটু স্বচ্ছ জেলির (Jelly) মত দেখায়, এমন যে নিকৃষ্টতম জীব, কেবল এইরূপ জীবই বর্ত্তমানকালে জড়পদার্থ হইতে উদ্ভূত হয়,—বিজ্ঞান যদি শুধু এই টুকুও বলিতে পারিতেন, তাহা হইলে সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইত। কেননা, তাহা হইলে আমরা সহজে বুঝিতে পারিতাম যে, যদি বর্ত্তমানকালে কোন জীব জড় পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইতে পারিল, তাহা হইলে ঘোর ভূতকালে কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে যে সময়ে জীবের প্রথম আবির্ভাব হইল, সে সময়েও ঐ রূপে অর্থাৎ জড়পদার্থ হইতেই আদি জীবের প্রথম উত্থান হইয়াছিল। কিন্তু বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারিলেন না—বিজ্ঞান

---

* 'জীব' শব্দে আমরা বুঝিব যার জীবন আছে; একটী উদ্ভিদও 'জীব' একটী জন্তুও 'জীব'।

† এই রূপ জন্মই ('Generatio Equivoca') 'spontaneous Generation' এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'Abiogenesis' নামে আখ্যাত।

নিকৃষ্টতম জীব সম্বন্ধেও একথা বলিতে পারিলেন না যে বর্ত্তমান কালে ঐ জীব, জল, স্বেদ, ক্লেদ, পাঁক বা এই রূপ কোন জড় পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান তাঁর উচ্চ সিংহাসন হইতে গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন—"না, আমি যতদূর জানি, তাহাতে সকল জীবই পূর্ব্ববর্ত্তী জীব হইতে উৎপন্ন হয়; কোন জীব যে কেবল মাত্র মৃত জড় পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, তার প্রমাণ নাই।" আমরা অনেকবার 'বর্ত্তমান কালে' এই শব্দ দুটী প্রয়োগ করিলাম, কেন করিলাম, তা পরে প্রকাশ পাইবে। এখন পাঠক আসুন, দেখা যাউক, বিজ্ঞান কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ঐ কথা বলিলেন।

প্রমাণ অতি সহজ। যে পরীক্ষার (experiment) উপর এ প্রমাণ সংস্থাপিত, আজ তাহা পাঠক একটু কষ্ট স্বীকার করিলে আপনিও করিতে পারেন, আমরাও পারি। কিন্তু পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রমাণ লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে কি তুমুল যুদ্ধই বাধিয়াছিল! এই যুদ্ধের প্রধান যোদ্ধা এক দিকে ডাক্তার ব্যাষ্টিয়ান (Bastian) আর অপর দিকে প্যাষ্টর, টিণ্ডেল এবং হক্সলি। ইহাঁদের বয়স তখন বেশী হয় নাই, জ্বলন্ত উৎসাহে ইঁহারা তখন স্বীয় স্বীয় বিভাগে প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারে নূতন নূতন সত্যরত্ন আবিস্কারে প্রমত্ত। ব্যাষ্টিয়ান বলিলেন, বর্ত্তমান কালে যূষ, স্বেদ, ক্লেদাদির ন্যায় কেবল মাত্র জড় উদার্থ হইতেই কতকগুলি নিকৃষ্টজীব আপনা আপনি হয়; প্যাষ্টর, টিণ্ডেল, হক্সলি বলিলেন, না, বর্ত্তমানকালে তা হয় না, —বর্ত্তমানকালে কেবল জড়পদার্থ হইতে যে কোন জীবের উৎপত্তি হয়, তার কোন প্রমাণ নাই। ঘোর যুদ্ধ বাধিল; এক্সপেরিমেণ্ট ও লেখালেখির ধূম পড়িয়া গেল; আর—আর, হা হতভাগ্য মনুষ্য স্বভাব! অবনত মস্তকে আজ আমাদিগকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, অবশেষে গালাগালিরও ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। বলিতে বাধ্য, অনেক অযথা গালাগালি ব্যাষ্টিয়ানকে খাইতে হইয়াছিল।* যা হউক, আমরা সকলে জানি, যুদ্ধে শেষে প্যাষ্টর, টিণ্ডেল হক্সলিরই জয় হয়। এখন দেখা যা'ক, পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাটী—যে

* এখানে ব্যাষ্টিয়ানের সহিত চার বৎসর পূর্ব্বে লেখকের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তার দুএকটা কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না; এই সঙ্গে ব্যাষ্টিয়ানের একটু পরিচয়ও পাঠককে দিব। ইনি এখনও জীবিত, ইহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইবে। ইনি আজকাল লণ্ডনের এক জন বড় ডাক্তার, University College এ চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যাপক। স্নায়বীয় রোগে ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা; মস্তিষ্কের কার্য্য প্রণালী ও মনোবিজ্ঞানে ইহার দৃষ্টি অতি গভীর—অতি কম লোকই ও বিষয়টি উঁহার মত বোঝেন। ডাক্তারি বই ও কাগজ পাতি ছাড়া, International Scientific Series এ ইহার Brain as an organ of mind নামক এক খানি অতিসুন্দর পুস্তক আছে। আমি একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি এখনও বিশ্বাস করেন যে, বর্ত্তমান কালে কোন জীব জড় হইতে উৎপন্ন হয়? তিনি বলিলেন—"হাঁ তা বিশ্বাস করি; যুক্তি (logic) আমার দিকে।" তারপর একটু গোলযোগ করিয়া বলিলেন 'আমিত, যে এক্সপেরিমেণ্টের উপর আমার ঐ বিশ্বাস সংস্থাপিত, তাহা প্যাষ্টরের সম্মুখে করিতে চাহিয়াছিলাম, তা উঁহারা এগলেন না; আরও দেখুন, আমিত ঐ যুদ্ধ লইয়াই থাকিতে পারি না, আমাকে ক'রে খেতে হবে, কাজেই আমাকে নিরস্ত হইতে হইল। তা ছাড়া শেষে ওঁরা আমাকে গাল দিতে আরম্ভ করিলেন।" শেষ দুটী কথা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিলেন। যা হউক, পাঠক, দেখিবেন, যদিও অপক্ষপাতী প্রায় সকল লোকেই বলিলেন, ব্যাষ্টিয়ান পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধে হারিয়া গিয়াছেন, তবুও তিনি আপনার মতে আজও বিশ্বাস করেন।

পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিয়া ইঁহারা জয়ী হইলেন, যার বলে বিজ্ঞান আজ বলিতেছেন, "বর্ত্তমানকালে সকল জীবই পূর্ব্ববর্ত্তী জীব হইতে উৎপন্ন হয়, কোন জীব যে কেবল মাত্র মৃত জড় পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হয়, তার প্রমাণ নাই"— এই পরীক্ষাটী কি রূপে করিতে হয়? সের টাক জল ধরে এমন তুইটী ফ্ল্যাস্কের * (flask) আবশ্যক। এদের প্রত্যেকটীর মধ্যে পো দেড়েক খড় পচা কি শুষ্ক ঘাস পচা জল কিম্বা কোন শাক শবজী বা মাংসের যূষ রাখ। তারপর ঐ তুই ফ্ল্যাস্কের মধ্যস্থিত ঐ জল কি যূষকে আধঘণ্টাটাক ধরিয়া ভাল করিয়া অগ্নির উত্তাপে ফুটাও। ফুটাইবার প্রয়োজন এই যে, ঐ জল কিম্বা যূষে এবং ফ্ল্যাস্ক তুটীর ভিতরে শূন্য অংশে যা কিছু জীব বা জীবের বীজ আছে, তা মরিয়া যাইবে। (আবশ্যকীয় উত্তাপে সকল প্রকার জীব ও জীবের বীজ মারিয়া যায়।) তার পর জীবশূন্য একটু পরিষ্কার তুলা ঐ তুইটীর মধ্যে একটী ফ্ল্যাস্কের মুখে সাবধানে সংন্যস্ত কর। অপরটীর মুখ খোলাই রহিল। এখন ফ্ল্যাস্ক তুটীকে চার পাঁচ দিন ধরিয়া কোন স্থানে রাখিয়া দাও। চার পাঁচ দিন পরে দেখা যাইবে যে, যে ফ্ল্যাস্কের মুখে তুলা ছিল, সে ফ্ল্যাস্কের অভ্যন্তরস্থ জল কিম্বা যূষে কোন জীবেরই আবির্ভাব হয় নাই; কিন্তু যেটীর মুখে তুলা ছিল না, সেটীর ভিতরকার জলে কিম্বা যূষে জীবের অর্থাৎ অযুত অগণ্য ব্যাকটেরিয়ার (ব্যাকটেরিয়া অতিক্ষুদ্র চক্ষের অগোচর আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদ; ইহাদের অতিক্ষুদ্র, অদৃশ্য, আনুবীক্ষণিক বীজ—spores—রাশি রাশি ঘরে দ্বারে বাহিরে সকল স্থানের বায়ুতে আছে) সঞ্চার হইয়াছে। এরূপ বিভিন্ন ফল কেন ফলিল? একটু তুলার যোগাযোগ ছাড়া ঐ তুইটী ফ্ল্যাস্ককে সর্ব্বতোভাবে সমান অবস্থায় প্রথম থেকেই রাখা হইয়াছে। আর ঐ তুলার ভিতর দিয়া ফ্ল্যাস্কের ভিতর বায়ু বেশ গমনাগমন করিতে পারে, তবুও কেন যে ফ্ল্যাস্কের মুখে তুলা ছিল, তার ভিতর কোন জীবের আবির্ভাব হইল না, আর যে ফ্লাস্কের মুখে তুলা দেওয়া যায় নাই, তার ভিতর জীবের সঞ্চার হইল? ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল এই যে, তুলার ভিতর দিয়া যদিও বায়ু যাইতে পারে, তথাপি ব্যাকটেরিয়ার বীজ—যদিও আনুবীক্ষণিক—যাইতে পারে না, তারা আটকাইয়া যায়। সুতরাং যে ফ্ল্যাস্কের মুখে তুলা ছিল, তার অভ্যন্তরে তুলার ভিতর দিয়া বাহিরের বায়ু যাইতে পারিত, কিন্তু বাহিরের বায়ুতে যে অসংখ্য ব্যাক্টেরিয়ার বীজ আছে, সে বীজ যাইতে পারিত না, আটকাইয়া যাইত; তুলা এখানে উক্ত বীজ সম্বন্ধে ঠিক যেন ছাকনি বা চালুনীর মত কাজ করে। ইহার ফল এই হইল যে, যে ফ্ল্যাস্কের মুখে তুলা দেওয়া হইয়াছিল, তার অভ্যন্তরস্থিত জল বা যূষে ব্যাক্টেরিয়াদি কোন জীবের উৎপত্তি হইল না। আর যে ফ্ল্যাস্কের মুখে তুলা দেওয়া হয় নাই—যার ভিতর বাহিরের বায়ু হইতে ব্যাক্টেরিয়া বা ব্যাক্টেরিয়ার বীজ প্রবেশ করিবার পথ উন্মুক্ত ছিল, সেই ফ্ল্যাস্কটীর জল বা যূষেই অযুত অগণ্য ব্যাক্টেরিয়ার সঞ্চার হইল।

* ফ্ল্যাস্ক আর কিছুই নয়, ভাল কাচে নির্ম্মিত বেশ তাপ সইতে পারে এমন শিশি; আকারে অনেকটা আতর গোলাপ জল যারা বেচে, তাদের দোকানে পেট মোটা, গলা সরু, ছোট শিশি যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ।

এই পরীক্ষাটী হইতে পাঠক কি সিদ্ধান্ত করিতে পারেন? কেবল এই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, যদি কোন জল, যূষ, বা স্বেদ, ক্লেদ পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে জীব এবং জীব-বীজ শূন্য করা যায় এবং পরেও তার মধ্যে বহির্দ্দেশ হইতে কোন জীব বা জীব-বীজের প্রবেশ-পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করা যায়,তাহা হইলে উক্ত জল, যূষ বা স্বেদ, ক্লেদে কোন জীবের উৎপত্তি হয় না। পরীক্ষাটী এবং পরীক্ষোপরি সংস্থিত যুক্তির মূল প্রণালী অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইল। কিন্তু পরীক্ষাটী যত মনে হয়, তত সহজ নয়। এতে কৃতকার্য্য হইতে হইলে, এ সম্বন্ধে অতি সামান্য সামান্য বিষয়ে (detailsএ) বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। ব্যাষ্টিয়ানের এ সতর্কতা ছিল না, তাই তিনি ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, আমরা দেখিতেছি, ব্যাকটেরিয়া নিকৃষ্টতম উদ্ভিদ; সুতরাং জীবজগতে আমরা ইহাদিগকে নিকৃষ্টতম জীবের মধ্যে গণ্য করিতে পারি। এমন যে নিকৃষ্টতম জীব ব্যাকটেরিয়া, পরীক্ষাতেত আমরা দেখিলাম,ইহারাই মৃত জড় পদার্থ হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হইতে পারিল না, আর ইহাদিগকে কেহ কখনও এরূপ স্বতঃ উৎপন্ন হইতে দেখেনও না। এই নিকৃষ্টতম জীব সম্বন্ধে যদি এরূপ হইল, তবে উচ্চতর জীব সম্বন্ধে ত কথাই নাই। স্বতঃ-জনন মতের বিশেষ পক্ষপাতী যিনি, তিনিও কিছু বলিবেন না যে, একটা মাছ বা একটা চটাই পাখী, একটা ছাগল বা একটা গরু মৃত জড় পদার্থ হইতে আপনা আপনি উৎপন্ন হয়। তাই এই সব দেখিয়া শুনিয়া এবং উপযুক্ত পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া,বিজ্ঞান সতর্কতার সহিত বলিতেছেন ঃ—

"আমরা যতদূর জানি, তাহাতে বর্ত্তমান কালে পূর্ব্ববর্ত্তী জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি দেখিতেছি। বর্ত্তমানে মৃত জড় পদার্থ হইতে যে কোন জীবের উৎপত্তি হয়, তার প্রমাণ নাই।"

পাঠক দেখিবেন, কি সতর্কতার সহিত বিজ্ঞান ঐ কথাগুলি বলিতেছেন। 'যতদূর জানি তাহাতে', 'বর্ত্তমানকালে', 'প্রমাণ নাই' এ কথাগুলি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই বিজ্ঞান ব্যবহার করিতেছেন। পাঠক বিশেষ করিয়া দেখিবেন যে, বিজ্ঞান এ কথা বলিতেছেন না যে, বর্ত্তমানে মৃত জড়পদার্থ হইতে জীবের উৎপত্তি হয় না; খালি বলিতেছেন যে, বর্ত্তমানে মৃত জড়পদার্থ হইতে যে জীবের উৎপত্তি হয়, তার প্রমাণ নাই। এ দুই কথা ঠিক এক নয়। পাঠক আরও দেখিবেন, বর্ত্তমানকালে জড় হইতে জীবের উৎপত্তি দেখা যায় না বলিয়া বিজ্ঞান কিছু এ কথা বলিতেছেন না যে, পৃথিবীর জন্ম হওয়া অবধি কোন কালে কখন জড় হইতে জীবের উৎপত্তি হয় না। না, এ কথা বলিবার বিজ্ঞানের কোন অধিকার নাই, আর তা বলেনও না। বিজ্ঞান বরং ঐ দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন যে, ঘোর ভূতকালে অগম্য, অবোধ্য অবস্থা সমূহের সমাবেশে পৃথিবীতে প্রথমে জড় হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল।

যদি প্রথমে জড় হইতে জীবের উৎপত্তি হয় নাই, তবে জীবের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? জীব কিছু পৃথিবীতে অনাদিকাল হইতে ছিল না। এ পৃথিবীই অনাদিকাল হইতে ছিল না। অনাদি অনন্তকালের তুলনায় এ পৃথিবী সেদিনের। যে ক্রমবিকাশবাদ দিনের পরদিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইতেছে; যে ক্রমবিকাশবাদ আজ আর বৈজ্ঞানিক কল্পনা

নয়, কিন্তু একটী অমূল্য বৈজ্ঞানিক সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; যে ক্রমবিকাশবাদ মানবের চিন্তা জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, এবং প্রত্যেক উচ্চ চিন্তার অস্থি মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সেই ক্রমবিকাশবাদ দেখাইতেছে যে, এ পৃথিবী চিরদিনই পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতায় সুশোভিত রমণীয় ধরা ছিল না, কিন্তু একদিন কেবল উত্তপ্ত বাষ্পরাশি ছিল। সে উত্তপ্ত বাষ্পরাশিতে জীবন অসম্ভব। এ উত্তপ্ত বাষ্পময় পৃথিবী অপেক্ষাকৃত শীতল হইল, জলের প্রথম আবির্ভাব হইল, তবে পৃথিবী জীব আবাসের উপযোগী হইল। প্রথম আদি জীব বোধ হয় একবিন্দু স্বচ্ছজেলির মত আনুবীক্ষণিক জীব যে 'অ্যামিবা' (Amæba) সেইরূপ এক প্রকারের জীব ছিল। সে যাহা হউক, এ আদি জীব পৃথিবীতে কোথা হইতে আসিল? আকাশ হইতে আসিল, না ঈশ্বর একদিন পৃথিবীতে আসিয়া মাটীতে ফুৎকার দিয়া নিমেষে জীবের সঞ্চার করিয়া গেলেন? আমরা এ সব অমূলক কল্পনায় বিশ্বাস করিতে পারি না। ক্রমবিকাশবাদে বিশ্বাস করিয়া আমরা এ বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, একদিন নিশ্চয়ই জড় হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল। পাঠক শুনুন, জীবনতত্ত্ব-বিশারদ সত্য-প্রাণ হক্সলি এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন :—"If the hypothesis of evolution is true, living matter must have arisen from not-living matter; for by the hypothesis the condition of our glove was at one time such that living matter could not have existed in it, life being entirely incompatible with the gaseous state" ইহার মর্ম্ম এই :—"ক্রমবিকাশবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জীবন্ত পদার্থ একদিন নিশ্চয়ই জড়পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কেন না, ঐ ক্রমবিকাশবাদই বলিতেছে, আমাদের এ পৃথিবীর অবস্থা একদিন এরূপ ছিল যে, তাহাতে জীবন্ত পদার্থ কখন থাকিতে পারিত না, যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন বাষ্পময়গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।"

পৃথিবীতে প্রথমে মৃত জড়পদার্থ হইতেই যে জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল, এ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হয়, যখন আমরা এ বিষয়ের আরও আলোচনা করি। পাঠক দেখুন, বিচিত্রলীলা-পূর্ণ এই যে জীবজগৎ, এ জীবজগতের মূলে প্রোটোপ্ল্যাজম (Protoplasam)। তরুলতা, পশু পক্ষী সকল জীবদেহের মূলে ঐ আদি জীবন্ত উপাদান—প্রোটোপ্ল্যাজম। এই যে আপনার, আমার দেহ, এ দেহ আজ যেন অপরিবর্ত্তিত, বিশুদ্ধ প্রোটোপ্ল্যাজম (যেমন রক্তের শ্বেত কণিকা) রূপান্তরিত প্রোটোপ্ল্যাজম (যেমন মাংসপেশী,) এবং প্রোটোপ্ল্যাজম-প্রসূত দ্রব্য (যেমন চুল, নখ, অস্থি প্রভৃতি) এই সকলের সমষ্টি; কিন্তু এমন সময় ছিল, যখন (মাতৃগর্ভে) এ দেহ কেবল একটু অপরিবর্ত্তিত বিশুদ্ধ প্রোটোপ্ল্যাজম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। এই বর্ত্তমানকালে এমন শত শত নিকৃষ্টতম জীব আছে, যাদের দেহ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আর কিছুই নহে, কেবল একটু বিশুদ্ধ প্রোটোপ্ল্যাজম মাত্র। আরও দেখুন, জীবের আহার, পরিপাককরণ, চলন, জনন, চিন্তন এ সকল ক্রিয়াও মূলতঃ ঐ প্রোটোপ্ল্যাজমেরই ক্রিয়া। তাই আমরা বলিতেছিলাম, জীবজগতের মূলে প্রোটোপ্ল্যাজম। সেই জন্যই পৃথিবীতে জীবের প্রথম আবির্ভাব, আর পৃথিবীতে প্রোটোপ্ল্যাজমের প্রথম আবির্ভাব, এ দুই কথা সম্পূর্ণরূপে এক কথা। পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি প্রথমে কোথা হইতে হইল, এ অনুসন্ধানও যা, আর পৃথিবীতে প্রোটোপ্ল্যাজমের উৎপত্তি প্রথমে কোথা

হইতে হইল, এ অনুসন্ধানও ঠিক তাই। এখন দেখুন, এই প্রোটোপ্লাজম অনুবীক্ষণে দেখিতে স্বচ্ছ জেলির মত; তবে চর্ম্মচক্ষে ভাল ঘৃত যেমন দানা দানা (granular) দেখায়, প্রোটোপ্লাজমও অনুবীক্ষণে দেখিলে সচারাচার সেইরূপ দানা দানা দেখায়। যাহা হউক, এই প্রোটোপ্লাজমে এমন কোন ভূত অর্থাৎ মৌলিক উপাদান (element) দেখা যায় না, যা পৃথিবীর অন্যত্রে ভূরি পরিমাণে নাই। রাসায়ণিক বিশ্লেষণ দ্বারা জানা গিয়াছে যে, প্রোটোপ্লাজম প্রধানতঃ অঙ্গার, অম্লজান, যবক্ষারজান, উদজান, একটু গন্ধক ও একটু ফস্‌ফরস্ এই কয়েকটী মৌলিক উপাদানে নির্ম্মিত। আরও, ইহাতে এমন কোন শক্তির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যা প্রাকৃতিক শক্তি নয়। তবে এ কথা সত্য যে, ঐ প্রাকৃতিক শক্তি নিচয় ইহাতে অতি **জটিল** ভাবে কার্য্য করে। যদি তাহাই হইল—যদি প্রোটোপ্লাজমের মৌলিক উপাদান পৃথিবীর সর্ব্বত্র সচারাচার পরিদৃষ্ট হয়, এমন কতকগুলি মৌলিক উপাদান হইল; যদি ইহা কেবল প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়েরই জটিল ক্রিয়া-ভূমি হইল, তাহা হইলে ইহা যে একদিন মৃত জড়পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল, তা আর বিন্দুমাত্র অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এখানে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি প্রোটোপ্লাজম কি কি ভূতে নির্ম্মিত, তা জানা গিয়াছে, এমন কি কোন্ ভূত কত পরিমাণে আছে, তাও জানা গিয়াছে, তবে সেই সকল ভূত হইতে রসায়ণশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাঁর ল্যাবরেটরিতে প্রোটোপ্লাজম প্রস্তুত করিতে পারেন না কেন? প্রশ্নটী অতি সঙ্গত। উত্তর এই যে, কোন জৈবিক যৌগিক পদার্থ (Compound organic substance) কি কি মৌলিক উপাদানে নির্ম্মিত, এটী জানিলেই, সে পদার্থটীকে উহার উপাদান হইতে ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত করা যায় না। ঐ যৌগিক পদার্থের উৎপত্তির অন্যান্য অবস্থা, বিশেষতঃ উহার মৌলিক উপাদানগুলির পরমাণু নিচয় উহাতে কি প্রকারে সন্নিবিষ্ট, এই **সন্নিবেশের** একটা প্রকৃত ভাব জানা চাই। তবে ঐ যৌগিক পদার্থকে উহার মৌলিক উপাদানগুলি হইতে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রোটোপ্লাজম একটী অতি জটিল যৌগিক পদার্থ। ইহাতে ইহার মৌলিক উপাদান নিচয়ের পরমাণুগুলি কিরূপে সন্নিবিষ্ট, তৎসম্বন্ধে কোন আভাস এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সেই জন্যই রসায়ণশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাঁর ল্যাবরেটরিতে বসিয়া প্রোটোপ্লাজম প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। মনে করুন, একটী অতি প্রকাণ্ড বাটী—যাতে সর্ব্বতোভাবে এক প্রকারের, কিন্তু রাজমিস্ত্রীর নানা কারুকার্য্যযুক্ত, অতি বিচিত্র শত শত ঘর আছে—এমন একটী প্রকাণ্ড বাটী নির্ম্মাণার্থে দুই কোটী, সচরাচার ব্যবহৃত এগার ইঞ্চি ইট, পঁচিশ লক্ষ সচরাচার ব্যবহৃত টালি, সহস্র মণ শেগুণ কাঠ, আর পাঁচ শত মণ লোহার বল্টু লাগিয়াছে,—শুধু এইটী জানিলেই বাটী নির্ম্মাণের অন্যান্য অবস্থা বিশেষতঃ একটী ঘরে ('একটী', কেন না সব ঘরগুলি সর্ব্বতোভাবে সমান) তার ইট, টালি, কাঠ, বল্টু কিরূপে সন্নিবিষ্ট, ইহা না জানিয়া, কি ঠিক ওরূপ আর একটী বাটী নির্ম্মাণ করা যায়? কখনই না। প্রোটোপ্লাজম সম্বন্ধেও ঠিক তাই।

রসায়ণশাস্ত্র প্রোটোপ্লাজ্‌মের মৌলিক

উপাদানগুলি হইতে প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম প্রস্তুত করণে আজ অসমর্থ। কিন্তু কে বলিবে, উহা চিরদিন অসমর্থ থাকিবে? কে বলিতে পারে যে, সহস্র বৎসর পরেও রসায়ণ শাস্ত্র প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মের মৌলিক উপাদান গুলি হইতে প্রোটোপ্ল্যাজম প্রস্তুত করিতে পারিবে না? বিগত পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে রসায়ণ বিদ্যা এ সম্বন্ধে যে সকল বিজয়কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া সকলেই বলিবেন যে, একদিন যে উক্ত বিদ্যা বর্ত্তমানের এই অলৌকিক কার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তা অসম্ভব নয়। পাঠক দেখুন, সিট্রিক অ্যাসিড্ (citric acid) নামক একটী যৌগিক পদার্থ পাতি, কাগজী ও কমলা লেবুর রসে পাওয়া যায়। ঐ সকল ফলের অম্লত্ব ঐ পদার্থেরই দরুণ। ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হয় বলিয়া উক্ত অ্যাসিড্, ইক্ষুরস হইতে যেমন মিশ্রী প্রস্তুত হয়, সেইরূপ কাগজী লেবুর রস হইতে বহু পরিমাণে প্রস্তুত হয়। ইহা দেখিতে অনেকটা মিশ্রার দানার মত। যাহা হউক, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সকলে মনে করিত যে, উক্ত অ্যাসিড্ কেবল উদ্ভিদ জগৎ বা প্রাণীরাজ্য হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে; তখন সকলেই মনে করিত যে, রসায়ণ-বিদ্যা উক্ত আসিড্ কেবলমাত্র উহার মৌলিক উপাদান নিচয় (অঙ্গার, অম্লজান, উদজান) হইতে, কোন লেবুর রস বা অন্য কোন ঔদ্ভিদিক বা জান্তব রস বা দ্রব্য না লইয়া প্রস্তুত করণে অসমর্থ। আজ কিন্তু বিজয়ী রসায়ণ-শাস্ত্র উক্ত অ্যাসিড্, কেবলমাত্র উহার মৌলিক উপাদান নিচয় হইতে, অর্থাৎ অঙ্গার আর অম্লজান, উদজান নামক দুটী গ্যাস হইতে প্রস্তুত করণে সমর্থ। আরও দেখুন, নীল (Indigo) একটী উদ্ভিদজাত যৌগিক পদার্থ। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কে ভাবিত যে, রসায়ণশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ঠিক ঐ নীল কোন তরু লতা বা অন্য কোন জীবের কোন অংশ বা সাহায্য না লইয়া, কেবলমাত্র উহার মৌলিক উপাদান সমূহের অর্থাৎ অঙ্গার আর অম্লজান, উদজান, যবক্ষারজান নামক তিনটী গ্যাসের সংযোগে নিজের ল্যাবরেটরিতে বসিয়া প্রস্তুত করিবেন? আজ কিন্তু তাহা করিতে পারেন। এইরূপে সিট্রিক অ্যাসিড্, নীল প্রভৃতি শত শত জৈবিক যৌগিক পদার্থ (Organic oubstances)—যা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সকলেই মনে করিত, কেবল তরু লতা, পশু পক্ষী হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে; যা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সকলেই মনে করিত, উহাদের স্ব স্ব মৌলিক উপাদান নিচয় হইতে প্রস্তুত করণে রসায়ণ শাস্ত্র অসমর্থ—এইরূপ শত শত জৈবিক যৌগিক পদার্থ আজ উক্ত শাস্ত্র কেবলমাত্র উহাদের মৌলিক উপাদান নিচয় হইতে, কোন জীবজ পদার্থের কোন অংশ না লইয়া, কোন সাহায্য না লইয়া অনায়াসে প্রস্তুত করণে সক্ষম। এই সে দিন রসায়ণ বিদ্যা দ্রাক্ষা শর্করা (grape sugar, যে চিনি দ্রাক্ষা ফলে পাওয়া যায়, আর যার জন্য ঐ ফলের মিষ্টতা) উহার মৌলিক উপাদান নিচয়—অঙ্গার, অম্লজান, উদজান—হইতে কোন দ্রাক্ষার, কোন ঔদ্ভিদিক বা জান্তব কোন পদার্থের কোন অংশ বা সাহায্য না লইয়া ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত করিল। এই সকল দেখিয়া কে বলিতে সাহসী হইবেন যে, রসায়ণ শাস্ত্র একদিন প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মও, ঐরূপে, অর্থাৎ কেবলমাত্র উহার মৌলিক উপাদানগুলি হইতে, কোন জীবের কোন

অংশ বা কোন সাহায্য না লইয়া প্রস্তুত করিতে পারিবে না?

আরও দেখুন যে অদ্ভুত কার্য্য—মৌলিক উপাদান হইতে প্রোটোপ্লাজ্‌ম প্রস্তুত করণ—আজ মানবজ্ঞানের অতীত, যা আজ মানবের সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানদৃষ্টিকে পরাভব করিয়াছে—বর্ত্তমানের সেই অলৌকিক কার্য্য উদ্ভিদ জগৎ এই মুহূর্ত্তে আমাদের চক্ষের সম্মুখে সংসাধন করিতেছে। মাটী, জল, বায়ু হইতে এই মুহূর্ত্তে উদ্ভিদ-জগৎ শত শত মণ প্রোটোপ্লাজ্‌ম প্রস্তুত করিতেছে। এই যে সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ, ইহাতে অন্ততঃ দুই তিন মণ বিশুদ্ধ অরূপান্তরিত প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম উহার জৈবনিক কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু ঐ বৃক্ষস্থ এত প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম কোথা হইতে আসিল? পাঠক একবার ভাবুন দেখি। শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ বৃক্ষ একটী অতি ক্ষুদ্র বীজ ছিল। ঐ ক্ষুদ্র বীজাভ্যন্তরস্থ বিন্দুপ্রায় প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম ধীরে ধীরে চতুষ্পার্শ্বস্থ মাটী, বায়ু, জল হইতে অযুত, অগণ্য পরামাণু সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগকে স্বীয় গূঢ় প্রণালীতে এক অনবগাহ্য ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া নূতন প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মে পরিণত করিয়াছে। এইরূপে আমরা দেখিতেছি, মাটী, জল, বায়ু হইতেই পূর্ব্বোক্ত দুই তিন মণ প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মম নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী বীজাভ্যন্তরস্থ বিন্দুপ্রায় প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মের কর্ত্তৃত্ব থাকুক, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, মাটী, জল, বায়ুর পরমাণুই এক গূঢ়ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম হইয়াছে। ইহা দেখিয়া ঘোর ভূত কালে অনবগাহ্য অবস্থা সমূহের সমাবেশে এক সময়ে মাটী, জল, বায়ু হইতেই যে প্রথমে পৃথিবীতে আদি প্রোটোপ্লাজমের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা অসম্ভব, কে বলিবে?

সকল কুসংস্কার, অমূলক বিশ্বাস দূরে ফেলিয়া দিয়া, সত্য-প্রাণ হইয়া আমরা যখন দেখি, এ পৃথিবীর উত্তপ্ত শৈশবাবস্থায় ইহাতে কোন জীব ছিল না, থাকিতে পারে না; যখন দেখি, তার পর পৃথিবী অপেক্ষাকৃত শীতল হইলে ইহাতে প্রোটোপ্ল্যাজমের বা নিকৃষ্টতম জীবের প্রথম সঞ্চার হইল; যখন দেখি, ঐ প্রোটোপ্ল্যাজমে এমন কোন মৌলিক উপাদান নাই যা পৃথিবীর অন্যত্র প্রচুর পরিমাণে নাই, এবং ঐ প্রোটোপ্ল্যাজম এমন কোন শক্তির ক্রিয়া ভূমি নয় যা প্রাকৃতিক শক্তি নয়; যখন দেখি, রসায়ণবিদ্যার উন্নতির সহিত ভবিষ্যতে এক দিন ঐ প্রোটোপ্ল্যাজম উহার মৌলিক উপাদান নিচয় হইতে কোন জীবের কোন অংশ বা সাহায্য ব্যতীত ল্যাবরোটরিতে প্রস্তুত হইতে পারে; যখন দেখি, এই মুহূর্ত্তে আমাদের চক্ষের সম্মুখে উদ্ভিজ্জগতে মাটী, জল, বায়ু এক গূঢ় অনবগাহ্য **সন্নিবেশন** প্রভাবে প্রোটোপ্ল্যাজমে পরিণত হইতেছে;—যখন এই সকল দেখি, তখন আমরা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না—বাস্তবিক বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই যে, ঘোর ভূতকালে বিশেষ অবস্থা সমূহের সমবায়ে একদিন জড় হইতেই এ পৃথিবীতে আদি প্রোটোপ্ল্যাজমের বা জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল।

প্রিয় পাঠক, এখন আমরা একি দেখিতেছি! বিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য-বিনাশী সুতীব্র আলোকে এ বিশ্ব সংসার যে রূপান্তরিত প্রতীত হইতেছে! আমরা যে দেখিতেছি, প্রকৃতির অন্তস্তলে জীব জগৎ ও জড় জগৎ

একীভূত! দেখিতেছি এক অতি গভীর সার্ব্বভৌমিক একত্ব এ বিচিত্র বৈষম্যপূর্ণ বিশ্বের সমস্ত খণ্ড অস্তিত্বকে এক অতি গূঢ়, অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!!

শ্রীশশি ভূষণ মিত্র।

স্বদেশ-প্রেম।

কি সভ্য কি অসভ্য, পৃথিবীর প্রায় সমুদয় জাতির ইতিহাসে স্বদেশ-প্রেমিকতার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। মানুষের অন্যান্য বৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বৃত্তিটিরও বিকাশ স্বাভাবিক। কিন্তু অপ্রকৃত অবস্থায় পড়িলে ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয়। আনুষঙ্গিক অবস্থার প্রতিকূলতা ও অনুকূলতার উপর যেমন মানবের অন্যান্য বৃত্তির সম্যক বা আংশিক পরিস্ফুটন, অথবা একবারেই অবিকাশ নির্ভর করে, স্বদেশ-প্রেম-বৃত্তির ক্রম-বিকাশও তদ্রূপ। যে জাতি চিরদিন স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে জাতীয় জীবন পরিগঠিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতেছে, তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেম জাগ্রত। স্বদেশের জন্য ধন মান জীবন পর্য্যন্ত অকাতরে দান করিতে কখনই কেহ বিমুখ হয় না। স্বদেশের কোন স্বার্থ যদি প্রতিহত হয়, স্বদেশের কোন গৌরব যদি ক্ষুণ্ণ হয়, স্বদেশের কোথাও যদি "একটু চুণ খসিয়া পড়ে," স্বদেশ-প্রেমীর হৃদয়ে অমনি ব্যথা লাগে। স্বদেশ-প্রাণতা বাস্তবিকই কল্পনার কথা নহে। যেমন দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি, অনুরাগ, স্নেহ, মমতা মনুষ্য হৃদয়ের গুণবিশেষ, স্বদেশ-প্রেমও তেমনি একটি।

আমরা হয়ত আমাদের জাতীয় জীবনে স্বদেশপ্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই না। স্বদেশ-প্রেমের উত্তেজনায় আত্ম বিসর্জ্জন, এ দৃষ্টান্ত আমাদের জাতির মধ্যে একেবারেই বিরল। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা কখনই মনে করিতে পারি না, স্বদেশপ্রেম আমাদের হৃদয়ের একটি ধর্ম্ম নহে। তবে কালে ও নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের সেই বৃত্তিটিকে মুসড়াইয়া দিয়াছে। তাই আমরা স্বদেশের হিত তরে আত্ম বিসর্জ্জন জানি না। স্বদেশের তরে স্বার্থত্যাগ জানি না, স্বদেশের তরে ত্যাগ স্বীকার জানি না। স্বদেশের প্রতি একটা কর্ত্তব্য জ্ঞান, স্বদেশের প্রতি একটা স্বাভাবিক অনুরাগ, স্বদেশের মঙ্গল ও উন্নতির একটা প্রবল বাসনা, আমাদের হৃদয়ের কোন অংশকে কখন স্পর্শ করে কি না, সন্দেহ। আমরা ক্রমে শিক্ষিত হইতেছি, আমাদের মস্তিষ্কের জাতীয় গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি, অপহৃত জ্ঞানরত্নের যথাসাধ্য উদ্ধার সাধনের জন্য আমরা এখন সচেষ্টিত; কিন্তু আমাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতা এখনও মোচন করিতে পারিতেছি না। তাই আমাদের দেশে স্বদেশ-হিতৈষী লোক এত বিরল। তাই দেশ-হিতৈষণা বৃত্তি ফুটিয়ায় পরিস্ফুটিত হইতে পারিতেছে না। তাই যৌবনে যাঁর একটু দেশানুরাগ দেখা গেল, প্রৌঢ়ে তিনি একজন দেশ বিরাগী হইয়া বসিয়া রহিলেন।

অন্যূন সাতশত বৎসর আমরা স্বাধীনতারত্ন হারাইয়াছি। পরাধীনতা ও অত্যাচারের অধীনে, আজ এই এত শতাব্দী হইল, আমা-

দিগকে কোন এক প্রকারে আমাদের জীবন রক্ষা করিয়া আসিতে হইতেছে। এই সুদীর্ঘ কালে প্রতি একশত বৎসরে তিল তিল (যদিও প্রকৃততঃ প্রতি পঞ্চবিংশ বৎসরে নূতন বংশ জন্মগ্রহণ করে) ধরিলেও একবিংশ বংশ পর্য্যায়ক্রমে চলিয়া গিয়াছে। ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে ইহা কখনই সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হইবে না যে, যে স্বদেশপ্রেম কেবল প্রশস্ত ও উদার হৃদয়ের ধর্ম্ম এবং যে হৃদয়ের প্রশস্ততা ও উদারতা স্বাধীনতায় প্রমুক্ত ও স্ফূর্ত্তভাবের ভিতরেই কেবল সম্ভব হয়, সে স্বদেশ-প্রেম স্ফূর্ত্ত হইবার অবকাশাভাবে, সে উচ্চ বৃত্তির আলোচনার সুবিধা বিনা, বংশ পরম্পরায় লোপ না পাইয়া মনুষ্য হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে। তাই আমরা আমাদের মধ্যে স্বদেশ-প্রেমের অভাব দেখিয়া নিরাশ হই না। আমাদের আশা হয়, মস্তিষ্কের প্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের প্রসরতা বর্দ্ধন করিতে পারিব। যে প্রেম এখন কেবল নিজের পুত্র কলত্র, পরিবার, স্বজন, নিজের সুখ সাচ্ছন্দ্য, স্বার্থ ও উন্নতি-স্পৃহার অতি সংকীর্ণ চতুঃসীমার ভিতরেই আবদ্ধ থাকিয়া আমাদিগকে পশু অপেক্ষা একপদ উন্নত হইতে দিতেছে না, সেই প্রেমকে ইচ্ছা ও অধ্যবসায় বলে ব্যাপক করিয়া বংশানুক্রমে অচিরে আবার স্বদেশ-প্রেমের অত্যুজ্জ্বল দেবভাবে পরিণত করিতে পারিব।

আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য বশতঃ পরাধীনতার বন্ধন হইতে কখন যে মুক্ত হইব, তার সম্ভাবনা অতি সুদূরপরাহত। যাহা হউক, যখন আমরা এখন আমাদের প্রকৃত দুর্দ্দশার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি, যখন পাশ্চাত্য অধিবাসীদের সংসর্গে আসিয়া স্বদেশ প্রেমের অতি উচ্চ ও সুন্দর ভাবের ছবি দেখিয়া মুগ্ধপ্রাণ হইতেছি; তখন আমরা একদিকে জ্ঞানী ও শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিয়া অপরদিকে স্বদেশ-বিরাগী হই কিরূপে? আমাদের সে দিন চলিয়া গিয়াছে, যখন আমরা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার সমাচ্ছন্ন ছিলাম। এখন আমরা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করি, কিন্তু এই অভিমান মূল্যহীন হইয়া পড়ে, যদি ইহার সহিত শিক্ষার অবশ্য-সম্ভব গুণগুলির সমবায় না হয়। আমরা এইরূপ শূন্যগর্ভ শিক্ষার অভিমান করি বলিয়াই কি নয় প্রকৃত শিক্ষিত জাতির বিদ্রূপের পাত্র হই?

পরাধীন হইলেও, প্রকৃত শিক্ষা কখনই হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলিকে অপরিস্ফুট রাখিতে পারে না। আয়র্লণ্ড-বাসীগণ ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। আজ অষ্ট শত বর্ষ ব্যাপিয়াও যে হতভাগ্য আইরিশ জাতি স্বজাতির রুধিরপাতে অক্লান্ত উদ্যমে নিরত হইল না, ইহার প্রধান কারণ এই যে, আইরিশগণ প্রকৃত শিক্ষার রসাস্বাদন করিয়াছে। তাই স্বদেশের উন্নতি কল্পে সহস্র সহস্র জীবন উৎসাহ ও উত্তেজনাপূর্ণ প্রেমে প্রদীপ্ত। আমাদের এই হতভাগ্য দেশেও কি প্রকৃত শিক্ষার ফল কিছু দেখিতে পাই না? অবশ্য পাই। কিন্তু তাহা এতই অসন্তোষকর, এতই নিরাশাময় যে, আমরা বিষাদিত চিত্তে না ভাবিয়া থাকিতে পারি না, সে অগ্নিময় স্বদেশ-প্রেম এখনও ঢের দূরে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকগণ যখন সংসারে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন স্ব স্ব স্বার্থ চিন্তাতে এমনিই জর্জ্জর-প্রাণ হইয়া পড়েন যে, কেবল আপনার ও পরিজনের সুখ শান্তির পন্থোদ্ভাবন বই আর কোন ভাবনার রেখা কপালে পতিত

হইতে দেন না। দেশের কথা ভাবিবে কে, দেশের জন্য কাঁদিবে কে, দেশের জন্য শরীর পাত করিবে কে? যে কোন প্রকারে অর্থাগমের সুবিধা করিয়া স্বীয় ও স্বকীয় স্ত্রী পুত্রের সুখ সচ্ছন্দ নিরাপদে সম্পন্ন হইলেই জীবনের সার্থকতা হইল! যে দেশে এমন শিক্ষা, যে দেশে এমন উপাদানের লোকের অধিবাস,সে দেশে যে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেম বিরল হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, কেবলি স্বার্থচিন্তায় নিমজ্জিত-প্রাণ হইয়া স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য অবহেলা করা কি প্রকৃত মনুষ্যত্বের, প্রকৃত শিক্ষার অগৌরব করা হয় না? পরকবলিত দেশের শ্রীহীন, শোভাহীন সহস্র অভাবে নিষ্পেষিত অবস্থা কি আমাদের মর্ম্মকে স্পর্শ করে না? কবির

"সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

এই মর্ম্মস্পর্শী অনাহত ভেরী নিনাদে এখনও কি আমরা অসাড় থাকিব? সংকীর্ণ নীচ স্বার্থের পাশে আবদ্ধ হইয়া চিরদিন অধোগতি লাভ করিব? দেশ রসাতলে যাইবে? কেন না আমরা একটু স্বার্থত্যাগ করিয়া দেশের জন্য এক বিন্দু শোণিতপাত করিতে পারি? ইহা আমাদেরই দেশ; এখানে আমাদেরই জন্ম; এখানে আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং এখানেই আমাদের ভাবী বংশধরগণও জন্মগ্রহণ করিবে। পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব ও সম্মান রক্ষার জন্য এবং ভবিষ্য বংশের কল্যাণ জন্য, আমরা কেন না এক বিন্দু প্রশস্তচেতা ও স্বার্থত্যাগী হইয়া দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য যত্নপরায়ণ হইব? দূর দূর দেশে স্বদেশের হিত ও উন্নতি সাধনার্থ কত শত বীর প্রাণ অম্লান বদনে স্ত্রী পুত্র ধনজনের মায়া অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব জীবন দান করিতেছেন। এ দৃশ্য কত সুন্দর, এ দৃশ্য কত উপকারী।

কিন্তু আমরা এমনি কাপুরুষ ও অস্থির-প্রতিজ্ঞ, এতই নীচ স্বার্থ পাশে এবং এই অসার ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মায়ায় বিজড়িত যে, দেশের কার্য্য সাধনে কৃত-সংকল্প ও বদ্ধ-পরিকর হইয়াও যদি কাহারও ভ্রুকুটি দেখি, অমনি সভয়ে স্বকার্য্য সাধন হইতে বিরত হই। কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, উচ্চ কর্ত্তব্য-সাধন-জনিত সুবিমল আত্মপ্রসাদ কি আমাদের অনিত্য জীবনের মহামূল্য পুরস্কার স্বরূপ মনে করিতে পারি না? তুচ্ছ জীবনের মায়া, লোকের ভ্রূভঙ্গী এতই কি হইল? তবে আর স্বদেশ-প্রেম কোথায়? তবে আর স্বদেশ-হিতৈষণা কি? তবে আর মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কোথা?

ঐ শোন স্বদেশ-প্রেমিক সংগীত তুলিয়াছেন—

"বধ্য মঞ্চপরে কিংবা রণস্থলে
মরি না যেখানে কি ভয় মরণে
মরিব যখন প্রিয় জন্মভূমি তরে।"

আমরাও কি একদিন স্বদেশ-প্রেমে উন্মত্ত-প্রাণ হইয়া এই উত্তেজনাপূর্ণ সংগীতের সহিত স্বর মিলাইয়া,এমনি মুক্ত কণ্ঠে, এমনি মুক্ত হৃদয়ে, এমনি উৎসাহ ভরে,এমনি জ্বলন্ত প্রাণে, এমনি জীবনকে তুচ্ছ করিয়া এই অগ্নিময় অমর গান গাহিতে পারিব না?

এ দেশে স্বদেশের জন্য স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল। আমরা স্বার্থপর জাতি; স্বার্থের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়াই মরিয়া যাই। পরার্থপরতা, স্বদেশ-

হিতৈষণা, আমরা মনুষ্যের কর্ত্তব্যের মধ্যে করি না। নানা অপরিহার্য্য কারণে স্বদেশ-প্রেম আমাদের ভিতরে এখন নির্ব্বাপিত, কিন্তু সে বৃত্তি প্রস্ফুটিত করার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের জন্য নিঃস্বার্থ অথচ অদম্য অনুরাগে প্রজ্বলিত হইতে না পারিলে, দেশের কোন মঙ্গল নাই, বিশেষ পরাধীন দেশের।

তাই আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে সাস্থনয়ে এই অনুরোধ করি, যেমন স্বকীয় পরিবার মধ্যে দয়া, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রেম প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের সৎবৃত্তি গুলিকে সম্যক রূপে পরিচালনা করিয়া,উহাদের পূর্ণ-বিকাশ সাধন করিয়া থাকেন,তেমনি স্বদেশ-প্রেম-প্রেমরূপ এই একটি উচ্চ ও সাধু বৃত্তিকে সম্যক পরিস্ফুট করিবার জন্য তাঁহারা যেন প্রতিদিন এক একবার দেশের দুরবস্থার কথা চিন্তা করেন। যার যতটুকু সাধ্য, তত-টুকু পরিমাণেও যদি এদেশের জন্য করিয়া যাইতে পারি, ইহাতে যদিও সমগ্র দেশের কোন প্রত্যক্ষ উপকার নাও ঘটে, ইহাতে এই এক প্রধান লাভ হইবে যে, আমাদের জাতীয় এক উচ্চ বৃত্তির বিকাশ সাধন হইবে। যে বৃত্তি হারাইয়া আমরা আজ জগতের চক্ষে নিতান্ত হেয় ও অপদার্থ, যে বৃত্তিটির অবকাশ নিবন্ধন স্বাধীন ও স্বদেশ-প্রেমিক জাতির চক্ষে আমরা নিন্দনীয় ও উপহাসের পাত্র, যে বৃত্তির অভাব জন্যই আমরা দাসত্বের বোঝা অম্লান বদনে বহিতেছি, সেই স্বদেশপ্রেম, সেই স্বজাতি-বাৎসল্য আবার আমাদের হৃদয়ে জাগরূক হইবে এবং আমরা তখনই প্রকৃত উন্নতির সোপানে অবরোহণ করিতে পারিব।

আমরা তাই প্রত্যেক শিক্ষিতা মহিলাকে এই অনুরোধ করি, যখন জননী ফুল্ল-ফুল প্রফুল্ল-আনন কোমল শিশুকে স্তন-ধারা পান করাইবেন, তখন হইতে যাহাতে শিশুর প্রাণে অপর সদ্বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ প্রেমও স্ফূর্ত্ত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নশীলা হন। দয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান, নীতি, স্নেহ, প্রীতি প্রভৃতি সাধু বৃত্তিগুলি যেমন মানুষকে দেবতার মত করে, স্বদেশ-প্রেমও মানুষকে দেবভাব বই অন্য ভাবে ভূষিত করে না। সবাই জানেন, বীর প্রসবিনী রোমীয় মাতা-গণ সন্তানদিগকে যখন স্বদেশের জন্য রণ-ক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেন, তখন স্নেহবৎসলা জননী স্বহস্তে পুত্রকে বর্ম্ম-ফলক অর্পণ করিয়া বলিয়া দিতেন, "বৎস! ইহা লইয়া ফিরিও, নতুবা ইহার উপরে শায়িত হইয়া আসিও।" অর্থাৎ হয়, রণে জয়ী হইয়া বর্ম্ম-ফলক হস্তে ধারণ করিয়া বিজয়ীর মত সগর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগমন করিও, নতুবা রণে আহত হইয়া ফলকোপরি শায়িত হইয়া চরমসংকারের জন্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিও। সে বীরাঙ্গনাদিগের স্বদেশ-রাগ কত, যাঁহারা অকাতরে স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি, বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠারূপী আপন সন্তানদিগকে স্বদেশের জন্য কঠোর মৃত্যুর সদনে প্রেরণ করিতেও কাতর হইতেন না! স্বদেশ-প্রেমের এমন উজ্জ্বল, গভীর ও উন্মাদকারী ভাব কোমল-প্রাণা, সন্তান-বৎসলা রোমীয় জননীর হৃদয়ে যেমন সম্যক্ বিকাশ লাভ করিয়া-ছিল, হায় বিধি, কবে এই মৃত-প্রায় বঙ্গদেশে আবার সেইরূপ সুন্দর ভাবের দৃশ্য পরিদর্শিত হইবে! কবে শিক্ষিতা জননী সন্তানদিগকে দেশ-হিতত্তরে জীবন দান করিতে দিবেন, কবে শিক্ষিত সুসন্তান-গণ স্বদেশ-প্রেমের অগ্নিময় উত্তেজনায়

উত্তেজিত হইয়া স্বদেশের জন্য জীবন শোণিত পাত করিতে মুহূর্ত্তের তরেও পশ্চাৎপদ হইবেন না! কবে আবার আমরা, স্ত্রী পুরুষ, স্বদেশের জন্য, স্বদেশবাসীর জন্য স্বার্থ-শূন্য, পবিত্র প্রাণে এই অসার জীবন পাত করিতে করিতে সহাস্য বদনে ও উৎসাহপূর্ণ প্রাণে গাহিতে পারিব।

মরিনা যেখানে কি ভয় মরণে,
মরিব যখন জন্মভূমি তরে!

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

কেন কাঁদ ?

১

বহিল বসন্ত অনিল বঙ্গেতে
আহা কি মধুবতর!
বাজিল বাঁশরী বঙ্কিম অধরে
কি সুন্দর মনোহর!
কল্পনা-প্রসূত প্রসূন কতই
স্বর্গের সুষমা ধরি,
ফুটিতে লাগিল অতুল ছটায়
বঙ্গ-প্রাণ মন হরি।
উল্লাসে উৎসাহে মাতিয়া উঠিল
বঙ্গ নরনারীগণ।
ছিল মরুময় বঙ্গের সাহিত্য
হ'ল সে নিকুঞ্জবন!

২

যাদুকর যেন কৌশলে দেখায়
কতই বিচিত্র ছবি,
তেমতি বিচিত্র চিত্র নব নব
ভাষায় আঁকিল কবি।
প্রতিভা-ছটায় অপূর্ব্ব শোভায়
গাঁথিয়া ঘটনাবলি,
'নভেলে'র ছলে নব রসে খেলে
করে কত চতুরালি!
কখন(ও) হাসায় কখন(ও) কাঁদায়
কখন(ও) আশায় ছলে,
মাতাইয়া প্রাণ গায় বীরগান
"বন্দে-মাতরং"-ব'লে॥

৩

কভু ধর্ম্মসার— কভু কর্ম্মভার—
নিগূঢ় তত্ত্বের কথা—
বাখানে সুচারু সরল ভাষায়
ধরিয়ে নূতন প্রথা।
বাখানে আবার ইতিহাসবাণী
ভারত নির্ঘণ্ট করি—
কিবা অকলঙ্ক পূর্ণ নরদেব
ভারত কাণ্ডারী হরি।
নাহিক এমন সাহিত্য ভাণ্ডার
সুদৃষ্টি ছিল না যায়,
একা ছিল এক সহস্র জিনিয়া
ধীরেন্দ্র বীরেন্দ্র প্রায়।

৪

কোথা আজ তুমি কোথা সে তোমার
জ্ঞান পারিষদ যত,
গেলে কি ছাড়িয়া প্রিয় জন্মভূমি
পূরণ না হ'তে ব্রত?
কে পারিবে তব রাজদণ্ড নিতে
তিলক ধরিতে ভালে?
তোমার মতন সাধক রতন
পা'ব আর কত কালে?
বিহনে তোমার করে হাহাকার
বঙ্গ নর নারী আজ,
হে বঙ্গভূষণ প্রিয় অতুলন
বঙ্গের সাহিত্য-রাজ!

৫

ধন্য ক্ষণজন্মা জনমিলে ভাই
আত্মজন্ম দুখিনী কোলে,
ভুলালে বঙ্গের নর নারীগণে
অমিয়া মধুর বোলে ;—
গেলে কীর্ত্তি রাখি চিরদিন তরে
এ ভারত মহীতলে !
দিয়ে জীবদান বাঙ্গালীর দেহে
জ্বালাইলে শিখা তায়,
জাগ্রত করিয়া বঙ্গ নারী নরে
ভাতিলে নব বিভায়।
আপনি গঠিলে আপনার দল
সোদর সদৃশ প্রেমে,
শত ডোর দিয়া হৃদয়ে বাঁধিলে
কত রবি চন্দ্র হেমে !

৬

সে মলয়ানিল সহসা থামিল
ফুরাল বঙ্কিম-আয়ু,
সমূহ বাঙ্গালা কাঁদিয়ে আকুল
যেন হারা প্রাণ-বায়ু !
কেন কাঁদো বঙ্গ এ প্রাণীর তরে
এঁর যে মরণ নাই,
ধরার বিজলি এ জীবমণ্ডলী
এ নহে এঁদের ঠাঁই !
যে দেবমণ্ডলে মহাপ্রাণী দলে
জ্বলে চির জ্যোতির্ম্ময়,
হের কি শোভায় সেই দেবধামে
বঙ্কিম উদয় হয় !
পেয়ে যাঁর সঙ্গ পবিত্র এ বঙ্গ
গাও তাঁর চির জয়।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নব্যবঙ্গ।

নব্যবঙ্গ—সামাজিক উপন্যাস—কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, বঙ্গাব্দ ১৩০০। গ্রন্থকারের নাম অপ্রকাশিত।

নব্যবঙ্গ একখানি সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাস বলিয়া ইহার সকল অংশই ঠাকুরমার উপকথার ন্যায় অমূলক ঘটনা-সম্বদ্ধ নহে এবং বঙ্গের সাধারণ নভেলের ন্যায় মান্ধাতার আমলের রাজপুতানার বকেয়া রাজা রাণী রাজকন্যাদির আজগুবি গল্পে পূর্ণ নয়। ইহা বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজাংশের একখানি চিত্র, সুতরাং অধিকাংশই সমূলক ঘটনা-সম্বদ্ধ। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে এইরূপ প্রকাশও করিয়াছেন।

যাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান সমাজের ভিতরে প্রবেশ করত দৈনিক ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অতি সহজে দেখিতে পাইবেন, গ্রন্থকার নিত্য-সংঘটিত অনেক জীবন্ত ব্যাপার অবলম্বন করিয়া উজ্জ্বল চিত্র আঁকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কোন সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ দৃশ্য পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; যিনি যতটুকু পারেন, যদি এই ভাবে দেখাইতে যত্ন করেন, বিশেষ উপকার আশা করা যাইতে পারে। অনেকে মনে করিতে পারেন, এরূপ গ্রন্থ দ্বারা সুফলের সম্ভাবনা কোথায়? পাঠকবর্গ মধ্যে কেহ আমোদের জন্য, কেহ সময় কাটাইবার জন্য, কেহ বা গ্রন্থকারের লিপিচাতুর্য্য পরীক্ষার্থ, কেহ বা গ্রন্থের দোষানুসন্ধান হেতু এই

শ্রেণীর পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন; আসল উদ্দেশ্যে কয়জন অধ্যয়ন করেন? যাঁহারা এরূপ ভাবেন, তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, হৃদয়ের ভাব যাহা সমগ্র ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, মুখের কথা যাহা শ্রুতমাত্র বায়ুতে বিলীন হইয়া যায়, তাহাও এ সংসারে বৃথা নষ্ট হয় না, তাহারও ছাপ অনন্তকাল পর্য্যন্ত বিশ্বসংসারে স্থায়ী; সে স্থলে সাদার উপর কালীর আঁচড় কথনই বিফলে যাইবার জিনিস নয়; সহস্র পাঠকের মধ্যে একজনেরও হৃদয়ে একটু দাগ বসিলেই অনেক কাজ হইল, বুঝিতে হইবে। এক্ষেত্রে যিনি যাহা ভাল বুঝেন, তাঁহার উচিত সে বিষয় সরলভাবে অকুতোভয়ে লোক সমক্ষে প্রচার করিয়া যান; তারপর ফলাফল-দাতা বিশ্বভুবনের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা ভগবান।

উপন্যাসের যে সকল উপকরণ চাই, তন্মধ্যে প্রকৃতি, স্থান, ঘটনা, নরনারী ও লোক-চরিতের বর্ণনা প্রধান। মধ্যে মধ্যে বর্ণনার কারিগরি দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট না হইলে, পাঠক উপন্যাস পড়িয়া সুখ পান না। সমালোচিত গ্রন্থখানিতে তাহার অভাব নাই। পাঠকগণের বিচারার্থ স্থান বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। শব্দবিন্যাস ও রচনা-কৌশলে বর্ণনাগুলি কোন অংশে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস-লেখকগণের লেখনীর নিকট নিতান্ত খাটো নয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ, ১-২ পৃষ্ঠা:—

"মধ্যাহ্ন কাল—চৈত্র মাসের মধ্যাহ্ন কাল। প্রখর রবিতাপে চতুর্দ্দিক প্রতপ্ত। দক্ষিণ বায়ু মধ্যে মধ্যে প্রবাহিত হইয়া তাপরাশিকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। পথিকদের কেহ তরুতল আশ্রয় করিতেছে, কেহ চটিতে গিয়া বিশ্রাম করিতেছে। রাখাল বৃন্দ আপন আপন পশুপাল পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষ ছায়ায় উপবেশন করিতেছে, কেহ গান গাইতেছে, কেহ নিদ্রা যাইতেছে, এবং কেহ বা তরুলতাশ্রিত পথিককে তামাক সাজিয়া খাওয়াইতেছে। শকুনি ও চিল ভিন্ন বিহঙ্গ বংশের সকলেই এখন আলয়োপবিষ্ট। শকুনি ও চিল ভারি ব্যস্ত,—এই কারণ তাহারা আপন আপন প্রশস্ত পক্ষপুট ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিয়া কখন সমানভাবে, কখন বক্রভাবে এবং কখন বা উচ্চাবনত ভাবে আকাশে উড়িতেছে। আলয়োপবিষ্ট বিহঙ্গ দলের প্রায় সকলেই তন্দ্রান্বিত। কিন্তু কোকিলের তন্দ্রা নাই—নিদ্রাও নাই—সে বিরহবিধুরা কুলবধূর মত নবপল্লবপরিবৃত বৃক্ষশাখা হইতে মধ্যে মধ্যে ঝঙ্কার তুলিয়া রাজ পথকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে। তাহার দেখাদেখি দুই একটা বাঙ্গালিচরিত্র বিহঙ্গও ডাকিয়া উঠিতেছে। রাজ মার্গের উভয় পার্শ্ব নবমুঞ্জরিত মহীরুহদলে পরিশোভিত। মহীরুহদলের নবোদ্গাত হরিদ্বর্ণ পত্রাবলী সূর্য্যকিরণ সম্পাতে কচিৎ ঝলসিত, এবং মলয়ানিলের মন্দ মন্দ সঞ্চাতে কচিৎ স্পন্দিত হইতেছে।"

কলিকাতার অধিবাসীগণ মধ্যে যাঁহারা কখন জন্মস্থান ত্যাগ করেন নাই, হুগলি যাঁহাদের পক্ষে ইংলণ্ড ও বর্দ্ধমান যাঁহাদের নিকট আমেরিকা কিম্বা যাঁহারা কেবল মাত্র সখের খাতিরে রেলপথে, বজরা বা ষ্টীমার যোগে দুই চারি বার দেশান্তরের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা এই দুরন্ত চৈত্র মাসের মফস্বল রাজপথের মধ্যাহ্নকালীন অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, চন্দ্রলোকের কোন স্থান বিশেষের অবস্থার মত বোধ হইবে। কিন্তু আমাদের এরূপ বর্ণনা বড় মিষ্ট বোধ হয়, কারণ আমরা অনেক সময় এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছি। প্রকৃতির ক্রোড়ে জন্মিয়া প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত পালিত ব্যক্তিগণের নিকট ধাত্রী মাতার কোন অবস্থার স্বরূপ বর্ণনা অতি উপাদেয়, বিশেষ যখন বাধ্য হইয়া তদবস্থা হইতে দূরে রাজধানীর ঐশ্বর্য্য মধ্যে অপ্রা-

কৃতিক ভাবে কপট কৃত্রিম জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। এই জন্ত আর এক বার বলি, বর্ণনাটী বেশ হইয়াছে; কেবল এক জায়গা বুঝিতে পারিলাম না "বিরহ-বিধুরা কুলবধূর ঝঙ্কার।" যদি "নব পল্লব পরিবৃত অবস্থা" মাত্র কুলবধূর মত হয়, তাহা হইলে শব্দের সামান্ত দোষ হইয়াছে। যাহা হউক, ছিদ্রানুসন্ধান আমাদের কাজ নয়, ওরূপ ভুল সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষণীয়; কিম্বা হয়ত আমারই বুঝিবার ভুল। তবে কেবল নিরপেক্ষ সমালোচনার খাতিরে যাহা কিছু বলিতে হইল। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—২১ পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্রের বিধবা শ্যালি ওরফে গৃহিণী বিমলার বর্ণনা বেশ হইয়াছে।

বিমলার ন্যায় বাল বা যৌবন বিধবা আত্মীয় কুটুম্ব অনেক মৃতদার ব্যক্তির গৃহে থাকিয়া যে সর্ব্বদা নানাপ্রকার অনিষ্টোৎপাদন করে, তাহা বোধ হয় বেশী কাহাকেও বলিতে হইবে না। এবং এরূপ চরিত্রের বিধবার সংখ্যাও যে সমাজে কম নয়, তাহাও বলা বাহুল্য। তবে একবার কোন দেশীয় রাজপুরুষ প্রকাশ্যভাবে একথার উল্লেখ করায় দেশে হুল স্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, এই জন্য উহার আলোচনা করিতে ভয় হয়। গ্রন্থকার বিমলার চরিত্র আঁকিতে গিয়া আর একটী সমাজ-কলঙ্কের ইঙ্গিত করিয়াছেন। সেটীও কম গুরুতর নয়। আমাদের বাসর দেশের একটী প্রাচীন অন্তর্ব্যবস্থান (Institution) হইলেও বর্ত্তমান শতাব্দীতে একটু ভীষণ ভাব ধরিয়াছে বলিতে হইবে। প্রতিপোষকগণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহ তর্ক করিতে আসেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী সব দিক বন্ধ করিয়া চাপ দিলে ফাটিয়া বাহির হইবার সম্ভাবনা, সেই জন্য, এক দিকে এই একটু ছিদ্র রাখিয়া চলিতেই হইবে। মন্দ কথা নয়। সব দিক ওরূপ ভাবে বন্ধ রাখিবার আদৌ দরকার দেখিতে পাওয়া যায় না; যাহা হউক, চিরাগত প্রথা ভগবান স্থানীয়, তাহাতে হাত দিবার কাহারও অধিকার নাই। আর তাহাই যদি করিতে হয়, বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এই যে, প্রকৃতির ইহাও অখণ্ডনীয় নিয়ম যে, বার মাস চাবি তালায় আটক রাখিয়া এক দিন ষোল আনা স্বাধীনতা দিয়া ছাড়িয়া দিলে বিষম কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। মনোরাজ্যের সেই প্রাকৃতিক নিয়মের বাসর একটী জীবন্ত দৃষ্টান্ত। সমাজ-পরিচালক মহোদয়গণ স্বীকার করুন বা নাই করুন, উক্ত স্বেচ্ছাচারিতার লীলা-ক্ষেত্রে অনেক সময় মহা অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাঁধা গরু ছাড়িয়া দিলে যথেচ্ছব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। আর এক কথা, ধামা ঢাকা কি আছে, মা বারণ করিয়াছেন খুলিয়া দেখিতে হইবে; শিশু আর থাকিতে পারে না, মাতার গোপনে ধামা খুলিবে, তন্ন তন্ন করিয়া সব দেখিবে, এবং যে প্রকারে হউক, যতদূর পারে সম্ভোগ করিতে ত্রুটী করিবে না। শুধু তাই নয়, চুরি করিয়া অন্যায় সম্ভোগের স্বভাব বদ্ধমূল হইয়া যাইবে। আমাদের পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পক্ষে ঠিক তাই:— কখন যাহাকে মুখ তুলিয়া দেখিতে পাই না, তফাৎ হইতে যাহার একটা কথা শুনিবারও অধিকার নাই, এরূপ পরপুরুষ ও পরনারীর সঙ্গে কথা-বার্ত্তা, আলাপ-পরিচয়, আদর-অভ্যর্থনা, আচার-ব্যবহার করিবার সম্পূর্ণ ছুটি পাওয়া গিয়াছে, এখন কর্ত্তব্য

কায়মনোবাক্যে পরস্পরের ভিতর প্রবেশ করা ; এবং সে বিষয়ে বিশেষ তৎপরতা চাই, যে হেতু অবকাশ অল্প, দেখিতে দেখাইতে, বলিতে ও শুনিতে হইবে অনেক, এরূপ স্থলে সাক্ষাৎমাত্রে একেবারে ষোল আনা খোলাখুলি না হইলে কার্য্য শেষ হয় কৈ, সময়ে যে কুলায় না।

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন, ইউরোপীয় সভ্যতার হিসাবে নারীকুলের, বিশেষতঃ সীতা সাবিত্রীর জাতীয়া রমণীগণের কলঙ্ক এ প্রকারে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা সুরুচি-বিরুদ্ধ। তাঁহাদিগকে বলিতে হয় যে শারীরিক রোগ যেমন, সমাজের ব্যাধিও সেইরূপ, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইলে প্রতিকারের আশা কম। আর ওবিষয়ে লজ্জা বোধ করা আমাদের অন্যায় :—যে দেশে অষ্টমবর্ষীয়া শিশু কন্যাকে পিতা মাতা জোর করিয়া যুবা স্বামীর শয়নগৃহে নিশি-যাপনার্থ প্রেরণ করত মহা কর্ত্তব্য সম্পাদন-জনিত বিমলানন্দ উপভোগ দ্বারা আপনা-দিগকে কৃতার্থ বোধ করেন, সে দেশে লজ্জা শরম রুচি নীতির কথা তোলা বাতুলতা মাত্র।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—৬৬ পৃষ্ঠা—"বসন্তের রাত্রি,—রাত্রি চন্দ্রমাশালিনী—সুতরাং রাত্রি মনো-হারিণী। রাত্রি মালতী যূথি মল্লিকাদি ফুল্ল কুসুমদল-শোভিনী, রাত্রি ক্বচিৎ পিককুল কলরব-বিস্তারিণী, রাত্রি—মন্দ মন্দ মলয়ানিলবাহিনী,—সুতরাং রাত্রি প্রমোদিনী। রাত্রি—গন্ধামোদিতা, বৃক্ষব্রততীর শ্যামল সুন্দর পল্লব-বিকাশে মোহনবেশ বিভূষিতা, রাত্রি—কন্দর্পানুগতা,—সুতরাং রাত্রি বিরহোৎপাদিকা। রাত্রি শীতাধিকা নহে, গ্রীষ্মাধিকাও নহে,—সুতরাং রাত্রি মধুরা।"

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে বর্ণনার অভাব নাই, বিশেষ "চন্দ্রমাশালিনী বাসন্তী রাত্রির" বর্ণনা বোধ হয় ভূরি ভূরি আছে। উপরোক্ত বর্ণনা যদি তাহার কোন একটীর অনুবাদ না হয়, উহাতে অভিনবত্ব ও মধুরতা আছে। আমাদের দেশের কোন বিভাগে বাহাদুরীর ক্রটি নাই। সাহিত্য জগতে অনেক ধুরন্ধর নভেলকার নাটককার অন্য ভাষা হইতে ভাব অবিকল নকল করিয়া "টাট্‌কা মৌলিক মাল" বলিয়া বাজারে ছাড়িতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। শেষে কিন্তু ধরা পড়িয়াছেন। বহুবার এইরূপ হই-য়াছে, তাই উল্লিখিত রূপ বলিলাম, গ্রন্থকার যেন কিছু মনে না করেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—৭১ পৃষ্ঠা—"সংসারে সূর্য্যের গতি নিরূপিত হয়, চন্দ্রের গতি নিরূপিত হয়, তরঙ্গাবর্ত্তিতা তটিনীর গতিও নিরূপিত হয়,—হয় না কেবল ভ্রষ্টাচারিণীর গতি। ভ্রষ্টাচারিণীর ঈক্ষণ, পদ-ক্ষেপণ, কথোপকথন সমস্তই দুর্ভেদ্য, দুরবগাহ্য। ভ্রষ্টাচারিণী-চরিত্রের আদ্যোপান্তই রহস্যাত্মক। মদা-কুলিত মাতঙ্গকে বিশ্বাস করিতে পারি, দংশনোদ্যতা কালভুজঙ্গিণীকেও বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু ভ্রষ্টা-চারিণীকে কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। ভ্রষ্টাচারিণী চরিত্রে যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি বিপদাপন্ন হন।"

গ্রন্থকার কখন এরূপ বিপদাপন্ন হইয়া-ছিলেন কিনা, জানি না ; কিন্তু যেরূপ চোটের সহিত কলম চালাইয়াছেন, তাহাতে যেন ঠিক প্রাণের পর্দ্দা পর্দ্দা ভেদ করিয়া কথাগুলি বাহির হইতেছে। ব্যক্তিগত বিষয়ের আলোচনা দূষণীয়, কিন্তু এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, এ স্থানে কলমের বড় জোর। ঠেকিয়া শিখা ও দেখিয়া শিখাতে অনেক তফাৎ, যিনি দেখিয়া ঠেকিয়া শিখার মত জ্ঞান পান, তিনি ধন্য। ভরসা করি। গ্রন্থকার সেই শ্রেণীর লোক, আর আমরা, আমরা আজ পর্য্যন্ত ওরূপ

ভাবে বিপদাপন্ন হই নাই। তবে চল্লিশের পর "A man is either a fool or a physician" ইংরাজীতে বলে; সেই আইনে যদি fool হইয়া বুঝিতে অক্ষম হই, বলিতে পারি না।

গ্রন্থের অন্যান্য অংশের বিষয়ে অধিক বলিয়া পুঁথি বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। শেষটা মোটামুটী দুই চারি কথায় সারিতে চাই।

গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রন্থকার যাহাতে হাত দিয়াছেন, তাহা ঢোঁড়া বা হেলে সাপ নহে, ভয়ানক বিষধর অজাগর। সুতরাং হস্তদাতার দিকে না দেখিয়া, বিষয়টীর দিকে তাকাইয়া কাজ করিতে হইবে। অনেক শিশু অজ্ঞানতা বশত গোক্ষুরা ফণিধরের গায়ে হাত দিতে কিছুমাত্র শঙ্কা করে না; হয়ত সর্প তাহার নিরীহতা ও সরল প্রেম দেখিয়া তাহাকে কিছু না বলিতে পারে, (এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে)। কিন্তু তাই বলিয়া শিশু শিশুই, বিষধর বিষধরই। তাই এ শিশুকে বলিহারি যাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

বাক্‌টিরিয়া।

রোগ-নিদান-শাস্ত্রের চর্চ্চায় বাক্‌টিরিয়া বাসিলি প্রভৃতি জীবাণুগণের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। কচ সাহেবের কলেরা বাসিলি, জলাতঙ্ক রোগ চিকিৎসার জন্য পাস্তর সাহেবের টীকার ব্যবস্থা, সংবাদপত্রের বহুল প্রচারে কাহারও অজ্ঞাত নাই। বিশেষ বিশেষ জীবাণু দ্বারা বিশেষ বিশেষ রোগোৎপত্তি হয় কি না, তাহা আধুনিক রোগ নিদানের বিচার্য্য বিষয় হইয়াছে। উক্ত জীবাণুগণের জীবন পুষ্টি জনন প্রভৃতি জীবনেতিহাস, জীববিদ্যারও আলোচ্য বিষয়। তাহাদের দ্বারা বিশেষ বিশেষ রোগোৎপত্তি জীবাণুগণের জীবনেতিহাসের একাঙ্গ মাত্র। বিগত ১৪।১৫ বৎসরের মধ্যে বাক্‌টিরিয়াতত্ত্ব এতদূর আলোচিত হইয়াছে যে, তাহার অল্প মাত্র বর্ণনা করিতে গেলে একখানা প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য তাহার কয়েকটী স্থূল স্থূল বিষয় এখানে প্রকটিত করা গেল।

(১) জীবনেতিহাস।

কিঞ্চিৎ জলে বৃক্ষের পত্র বা এক খণ্ড মাংস ভিজাইয়া রাখিলে কয়েকদিবস মধ্যে উহার উপরিভাগে একটা পাতলা সর পড়িতে দেখা যায়। এই সরের একটুকু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে, তাহাতে অসংখ্য ছোট বড় জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বড় গুলিও খালি চক্ষে দেখা যায় না। ছোটগুলির ত কথাই নাই। যে অণুবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্ট বস্তু চারি পাঁচ শত গুণ বড় না দেখায়, তাহাতেও তাহারা প্রায় অদৃশ্য থাকে। যাহা হউক, উক্ত সব দেখিলে তাহাতে সচরাচর দুই প্রকার জীব দেখিতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত বড়গুলিকে সহজেই জীব বলিয়া প্রতীতি হইবে; কেন না, তাহারা যেন ব্যস্ত হইয়া এদিক্ ওদিক্ গমনাগমন করিতেছে। এ গুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীস্থ প্রাণী। চমৎকারজনক হইলেও এখন উহাদের

কথা থাক্। যেগুলি ছোট, সে গুলিও নিশ্চেষ্ট নহে। উহাদের দুই প্রকার গতি দেখা যাইবে; (১) দ্রুতকম্পন, (২) স্থানান্তর সরণ। দ্রুত কম্পন দ্বারা জৈবক্রিয়া বুঝায় না। কেন না, জৈব বা অজৈব, কোন প্রকার সূক্ষ্ম চূর্ণ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে সেই চূর্ণ-কণার এই প্রকার গতি দৃষ্ট হয়। এই গতি প্রথমতঃ ব্রাউন সাহেব বর্ণনা করেন। তদনুসারে ইহার নাম ব্রাউনীয় বা ব্রুনীয় গতি হইয়াছে। কারণ, বিচার করিলে জানা যায় যে, ইহা আণবিক ব্যাপার মাত্র। যাহা হউক, অন্যবিধ গতি দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, উহারা জীব বিশেষ। এই অতীব ক্ষুদ্র জীবগুলির নাম বাকৃটিরিয়া।

পক্ক অন্ন আলু মৎস্য মাংস ডিম্ব প্রভৃতি সামগ্রী কয়েক দিবস রাখিয়া দিলে তাহাদের স্থান বিশেষের বর্ণ পরিবর্ত্তন দ্বারা তথায় বাকৃটিরিয়ার সঙ্ঘের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। ইহারা সমুদায় সামগ্রীতে ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সকল স্থানে একটা সূচী বিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা খোলা শূন্য সিদ্ধ ডিম্ব স্পর্শ করিলে দুই এক দিনের মধ্যে তথায় অগণ্য বাকৃটিরিয়া জন্মিতে দেখা যায় এবং উক্ত ডিম্ব হইতে পূতিগন্ধ বহির্গত হয়। গলিত জৈব পদার্থের উৎকট পূতিগন্ধ দ্বারা তথায় বাকৃটিরিয়ার অস্তিত্ব সহজেই জানা যায়।

বাকৃটিরিয়া সকলের নানাবিধ আকার। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তিন প্রকার আকারে সকলগুলি বর্ণিত হইতে পারে। যথা,—(১) গোলাকার গুটিকা সদৃশ। (২) দণ্ডসদৃশ, এবং (৩) কুণ্ডল সদৃশ। (১) আকারানুসারে বাকৃটিরিয়াগণের জাতীয় নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যাহাদের গোল গুটিকা সদৃশ আকার, তাহাদের বৈজ্ঞানিক নাম মাইক্রোককাই (২) বা অণুগুটিকা। দণ্ডাকার বাকৃটিরিয়ার দৈর্ঘ্যানুসারে দুইটী জাতীয় নাম হইয়াছে। যাহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাহারা বাকৃটিরিয়া (৩) নামক বিশেষ নামে এবং যাহারা দীর্ঘ তাহারা বাসিলি (৪) নামে কথিত হয়। বাকটিরিয়া ও বাসিলি শব্দের অর্থ যষ্টি ও দণ্ড। তৃতীয় প্রকার আকার বিশিষ্ট বাকৃটিরিয়ার নাম স্পাইরিলি (৫)। ইহার অর্থ আবর্ত্তিত কুণ্ডল। পাঠক দেখিবেন, বাকৃটিরিয়া এই সমুদায় জীবাণুর সামান্য নাম হইলেও, ইহা কয়েক প্রকার জীবাণুর বিশেষ নামও বটে। বিশেষ না করিলে বাকৃটিরিয়া শব্দ দ্বারা আমরা সমুদায় জীবাণুবর্গ বুঝিব।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে বাকৃটিরিয়ার বংশ বৃদ্ধি হয়। কোন একটি বাকৃটিরিয়া দুই ভাগে বিদীর্ণ হয়, এই দুই ভাগের প্রত্যেকটি এক একটি বাকৃটিরিয়া হয়। আবার এই দুইটির প্রত্যেকটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এইরূপ একটি হইতে দুইটি, দুইটি হইতে চারিটি, চারিটি হইতে আটটি, এই ক্রমে বাকৃটিরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাকে "বিদারণ প্রণালী" বলা যায়। অধ্যাপক ফ্রাঙ্কলাণ্ড বলেন যে, এইরূপে প্রায় প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টায় বাকৃটিরিয়ার এক এক পুরুষের জন্ম হয়। একটি বাকৃটিরিয়া হইতে ২৪ ঘণ্টায় এত বংশ বৃদ্ধি হয় যে, তাহা লণ্ডন নগরের লোক সংখ্যার চতুর্গুণ। ৪৮ ঘণ্টায় একটির সন্তান সংখ্যা

(১) Spiral.

(২) Micrococci. (৩) Bacteria. (৪) Baccilli. (৫) Spirilli. ইহারা বহুবচনান্ত।

২৮,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ আটাইশ লক্ষ অর্ব্বুদ হয়। এইরূপে দ্রুত বৃদ্ধি বশতঃ ইহাদিগকে এক এক স্থানে অগণনীয় দলে দলে দেখা যায়। এই বিদারণ-প্রণালীর দ্বারা সমুদায় বাক্‌টিরিয়ার বংশ বৃদ্ধি হয়।

বাসিলি নামক বাক্‌টিরিয়া অন্তর্বিধ প্রণালীতেও বৃদ্ধি পায়। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মে, একথা সকলেই জানেন। ফলের বীজ, সন্তান ব্যতীত অন্য কিছু নহে এবং তাহার উৎপাদন জন্য স্ত্রী পুরুষের সংযোগ আবশ্যক। নিম্ন জাতীয় কতকগুলি উদ্ভিদ্ আছে, তাহাদের বীজরূপ সন্তান হয় না। কতকগুলির উল্লিখিত বিদারণ-প্রণালীতে বংশবৃদ্ধি হয়। কতকগুলির বীজবৎ কার্য্যকারী এক প্রকার অঙ্কুর জন্মে। ইহাদের উৎপাদন নিমিত্ত স্ত্রী পুরুষের সংযোগ আবশ্যক হয় না। যাঁহারা ফারণ্ (১) বা পর্ণ গাছ (পাষাণ-ভেদী ঢেঁকি প্রভৃতি) চেনেন, তাঁহারা পর্ণ গাছের পাতার নিম্ন পৃষ্ঠে পিঙ্গল বর্ণের পুষ্প রেণুবৎ পদার্থ বিশেষ দেখিয়া থাকিবেন। সেই রেণু হইতে পর্ণ গাছের উৎপত্তি। এই পদার্থকে আমরা বীজ-রেণু (২) বলিব। ঐ নাম যাহাই হউক, কথাটা এই যে, বাসিলির এই প্রকার অযৌন বীজ উৎপন্ন হয়। পুষ্ট হইলে বাসিলির বীজ-রেণু দেখিতে অণ্ডাকার। বাসিলির উদরে তাহার জন্ম। বাসিলির বীজ-রেণু উপেক্ষণীয় নহে। কেন, তাহা পরে বলা যাইবে। যে জলে কোন প্রকার জৈব পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহাই বাক্‌টিরিয়ার আবাস ভূমি। উদ্ভিদ বা প্রাণী দেহ জলে ভিজাইয়া রাখিলে তাহাতে বাক্‌টিরিয়া বিলক্ষণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ কি জলে, কি স্থলে, কি বায়ুতে এই সকল জীবাণু সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। এই জন্যই ব্যাধিকর বাক্‌টিরিয়া-তত্ত্ব চিকিৎসক ও নগরের স্বাস্থ্যরক্ষকগণের এতদূর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

উপরে আমরা এক প্রকার বলিয়াছি যে, বাক্‌টিরিয়া উদ্ভিদ বিশেষ। উহারা উদ্ভিদ না প্রাণী, এই তর্কের মীমাংসা করিতে কত কত অভিজ্ঞ জীব-বিজ্ঞানবিৎ হতবুদ্ধি হইয়াছেন। এই তর্কের শেষ না পাইয়া ফরাসী জীববিজ্ঞানবিৎ সেডিলট সাহেব খ্রীঃ ১৮৭৮ অব্দে উহাদের "মাইক্রোব (১)" বা অণুজীব নামকরণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বাক্‌টিরিয়া নামের পরিবর্ত্তে আজ কাল অনেকেই মাইক্রোব বা অণুজীব নাম ব্যবহার করিতেছেন।

বাক্‌টিরিয়া উদ্ভিদ না প্রাণী? অনেক পাঠক হয়ত ইহার উত্তর সহজ মনে করিতেছেন এবং বৈজ্ঞানিকগণ এটা গাছ কি জন্তু, তাহা নির্ণয় করিতে এত কোলাহল করিয়াছেন শুনিয়া হয়ত বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু জীববিদ্যার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, উক্ত প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে। প্রকৃতির মধ্যে যিনি জীব জাতির সৃষ্টির পরিচ্ছেদ অনুসন্ধান করেন, তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত। এই পর্য্যন্ত প্রাণী, তাহার পর উদ্ভিদ, এ কথা বলিতে যিনি চাহেন, তাঁহার বিবর্ত্তবাদ শিক্ষা করা হয় নাই। খনিজ, উদ্ভিদ ও প্রাণী, এই তিন রাজ্যে যাবতীয় পদার্থ শ্রেণীবদ্ধ

(১) Ferns. (২) Spores. ইহাদিগকে বীজ-রেণু বলা গেল। পাঠক "বীজ" শব্দ দ্বারা যৌনবীজ বুঝিবেন না।

(১) Microbes

করা গিয়া থাকে। বড় বড় গাছের ও বড় বড় জন্তুর মধ্যে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে, এমন কি, তাহাদিগকে এক বলিয়া ভ্রম জন্মাইবার কোন সাদৃশ্যই দেখা যায় না। কিন্তু ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে বৈসাদৃশ্য কম, সাদৃশ্যই বেশী। এজন্য অনেকে এই সকল জীবগণের এক সাধারণ নাম (১) দিয়াছেন।

স্বাভাবিক হউক, বা অস্বাভাবিক হউক, শ্রেণী বিভাগ না করিলে জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না। অমুকটা বানর, অমুকটা বনমানুষ, এক এক শব্দ দ্বারা কত অর্থ ব্যক্ত হইতেছে। চেতন ও উদ্ভিদের যে লক্ষণ পাঠকের স্মরণ আছে, তাহা এখানে চলিবে না। কেন না, অনেক প্রকৃত উদ্ভিদ সময় বিশেষে গমনাগমন করে। উচ্চ জাতায় বৃক্ষাদির পত্র, কাণ্ড, মুকুল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অংশেরও গতি আছে। ইহারা স্থানান্তরে গমন করে না সত্য, কিন্তু সেইরূপ অনেক প্রাণীও আছে। উদ্ভিদের হরিদ্বর্ণ পত্র যে রঙ্গের (২) জন্য হরিৎ দেখায়, তাহা প্রাণীদিগের নাই। সে রঙ্গ কোন প্রাণীর নাই, আর সকল উদ্ভিদেরই আছে, এই দুইটী বলা ভুল। বেঙের ছাতি হরিদ্বর্ণ নহে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। হরিদ্বর্ণ প্রাণীর দৃষ্টান্ত সকলের তত জানা নাই। যাহা হউক, নিম্ন-জাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীকে হরিদ্ বর্ণ দ্বারা প্রভেদ করিতে পারা যায় না। আর একটি লক্ষণ আছে, ইহা অপেক্ষাকৃত সন্তোষ-প্রদ। উদ্ভিদগণের খাদ্য একরূপ, প্রাণী-গণের খাদ্য অন্যরূপ। উদ্ভিদগণ সামান্য খনিজ বা অজৈব পদার্থ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে, প্রাণীগণের সে ক্ষমতা নাই। প্রাণী-গণ অপর প্রাণী বা উদ্ভিদ দেহ না পাইলে বাঁচে না। অণুজীব সকল গলিত জৈব পদার্থের সঙ্গে দেখা যায় সত্য, কিন্তু নানা-বিধ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, তাহারা অচেতন অজৈব পদার্থ হইতেও আহার সংগ্রহ করিতে পারে এবং আমোনিয়া ঘটিত লবণাদি হইতে সোরাজনক (১) পদার্থ লইয়া দেহ পুষ্টি করে। বাস্তবিক, এই লক্ষণ ও অন্যান্য কয়েকটী যুক্তি দেখিলে বাক্টিরিয়াকে আর প্রাণী বলিতে পারা যায় না।

যদি বাক্টিরিয়া উদ্ভিদই হইল, উহাদের জ্ঞাতিগণ কাহারা? কোন্ বংশের উদ্ভিদের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ? এখন ইহার উত্তর সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

সপুষ্পক ও অপুষ্পক ভেদে যাবতীয় উদ্ভিদকে দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। অর্থাৎ কতকগুলি উদ্ভিদের পুষ্প হয়, আর কতকগুলির পুষ্প হয় না। পুষ্প কাহাকে বলে? প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, পুষ্পের অন্তর্গত পুং ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ই তাহার সার অংশ। তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এবং তাহা-দিগের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিবার অভি-প্রায়ে পুষ্প সকলের সুগন্ধ, সৌন্দর্য্য যুক্তদল প্রভৃতি চিত্ত-বিনোদক অঙ্গগুলির আবির্ভাব। অতএব পুষ্পের সঙ্কীর্ণ অর্থ ত্যাগ করিয়া যাহাতে পুং বা স্ত্রী জননেন্দ্রিয় আছে, তাহা-কেই পুষ্প বলা যায়। জননেন্দ্রিয়ের অভি-প্রায় সন্তানোৎপাদন। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের সার অঙ্গ গর্ভ, গর্ভের প্রধান ব্যাপার বীজো-ৎপাদন, বীজের অর্থ সন্তান অর্থাৎ পিতা

(১) Protista.

(১) Chlorophyl,

(১) Nitrogen.

মাতার সদৃশ ক্ষুদ্রাবয়ব জীব মাত্র। এই বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, কতকগুলি উদ্ভিদের বীজরূপ সন্তান তাহাদের দেহে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাহারাই সপুষ্পক। বাক্‌টিরিয়ার পুষ্প হয় না, তজ্জন্য তাহারা অপুষ্পক উদ্ভিদ্ শ্রেণীর অন্তর্গত।

অপুষ্পক উদ্ভিদ সকলের কতকগুলির আদৌ বীজ হয় না। অপর কতকগুলির বীজরূপ সন্তান প্রসব গূঢ় ব্যাপার। এজন্য তাহাদের বীজ হয় না, এরূপ সচরাচর বলা যায়। তবে কিরূপে তাহাদের জন্ম ও বংশ বৃদ্ধি হয়? পূর্ব্বে বাক্‌টিরিয়ার বংশ বৃদ্ধি বলিবার সময় ইহার উত্তর কতকটা দেওয়া গিয়াছে। নানাজাতীয় ফারণ্ বা পর্ণ, শৈবাল প্রভৃতি জলজ গাছ, বেঙের ছাতি ইত্যাদি দেখিলেই অপুষ্পক শ্রেণীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। পর্ণ ও শৈবালের কাণ্ড পত্র মূল দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্য ইহাদের সাধারণ নাম সকাণ্ডক। ছত্রাকের কাণ্ড পত্র ভেদ নাই। সেইরূপ দোয়াতের কালিতে, ভিজা দেওয়ালে, নষ্ট দুগ্ধে, গলিত ফলে, বৃক্ষের বল্কলে, আর্দ্র বস্ত্রে, পুষ্করিণীর জলে হরিৎ ও কপিল বর্ণের কণাবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল উদ্ভিদ দেখা যায়, তাহারা অকাণ্ডক। অকাণ্ডক উদ্ভিদ সকলকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। কতকগুলি হরিদ্‌বর্ণ, অপরগুলি হরিদবর্ণ নহে। এই শেষোক্ত অহরিদ্‌বর্ণ নিম্নশ্রেণীস্থ উদ্ভিদগণকে ইংরাজীতে ফাঙ্গী বলে। বাক্‌টিরিয়া এই ফাঙ্গী শ্রেণীর অন্তর্গত। উপরে উদ্ভিদগণের যে শ্রেণী বিভাগ করা গেল, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

উদ্ভিদ

সপুষ্পক	অপুষ্পক
সকাণ্ডক	অকাণ্ডক
হরিদ্‌বর্ণ	অহরিদবর্ণ
আল্‌গী (১)	ফাঙ্গী (২)

নানাবিধ উদ্ভিদ লইয়া ফাঙ্গী শ্রেণী। ইহাও নানাবিধ গণে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাক্‌টিরিয়া নিজ দেহ বিদারণ করিয়া বৃদ্ধি হয় বলিয়া ইহারা বিদারক ফাঙ্গী (৩) নামে অভিহিত হইয়াছে।

বাক্‌টিরিয়া সকলের আকার এত ক্ষুদ্র যে, উহাদের আভ্যন্তরিক গঠন সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা দুরূহ। সাধারণ পাঠকের অবগতির নিমিত্ত বলা আবশ্যক যে, কি প্রাণী কি উদ্ভিদ, যাবতীয় জীবদেহ ক্ষুদ্র বৃহৎ কোষ দ্বারা নির্ম্মিত। শৈশবাবস্থায় পরিপুষ্ট কোষের এই তিনটি অংশ থাকে, যথা—(১) আবরণ (Cellwall) (২) জীবনাধার (৩) (Protoplasm) এবং (৪) জীবকেন্দ্র (Nucleus)। অনেক জীবকোষের আবরণ থাকে না। অতএব জীবনাধারই জীবগণের দেহ নির্ম্মাণের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ।

বাক্‌টিরিয়ার দেহ এক একটি কোষ মাত্র। সেই কোষের আবরণ আছে, কিন্তু কোষ মধ্যস্থিত জীবনাধার পদার্থে জীবকেন্দ্র দৃষ্টিগোচর হয় না।

সকল বাক্‌টিরিয়ার স্থানান্তর সরণের ক্ষমতা নাই। যে গুলির এক বা দুইটি

(১) Algæ. (২) Fungi.

(৩) Schizomycetes. (৪) ইহাকে কেহ কেহ জীবনাঙ্কুর ও জৈবনিক বলিয়াছেন। কোন নামই সুস্পষ্ট হয় নাই।

শুঁয়া (৩) আছে, তাহারাই দ্রুতবেগে আবাস-রসে সঞ্চরণ করে। যে পাত্রে বাক্‌টিরিয়া জন্মে, তাহা স্থির না রাখিলে, তাহাদের জননের ব্যাঘাত হয়। কোন কোন বাক্‌টিরিয়া বায়ু ব্যতীত জন্মে না, কোন কোনটা তদ্‌ব্যতীতও স্বচ্ছন্দে জন্মে। শেষোক্ত বাক্‌টিরিয়াগণ খাদ্যস্থিত অম্লজনক শোষণ করিয়া জীবিত থাকে। বলা বাহুল্য, উপযুক্ত খাদ্য ব্যতীত বাক্‌টিরিয়া জন্মিতে পারে না। খাদ্যের মধ্যে জল অত্যাবশ্যক পদার্থ। ফুটন্ত জলের উষ্ণতায় অধিকাংশ বাক্‌টিরিয়া মরিয়া যায়। অনেকগুলি তাহার অর্দ্ধেক উষ্ণতায় জীবিত থাকে না। বিশেষতঃ যে সকল বাক্‌টিরিয়া দ্রব পদার্থ ব্যতীত জীবিত থাকে না, তাহারা এইরূপে অপেক্ষাকৃত অল্প উষ্ণতায় মরিয়া যায়। বাসিলির বীজরেণু বিনষ্ট করা সহজ নহে। যে উষ্ণতায় বাসিলি মরিয়া যায়, তাহাতে বীজরেণুর কিছুই হয় না। শুষ্ক করিলে বাক্‌টিরিয়া মরিয়া যায়, কিন্তু বীজরেণু এরূপ অবস্থায় অনেক বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। পাস্তুর সাহেব বলেন যে, বীজরেণু অবিমিশ্র সুরাসারে জীবিত থাকিতে পারে। বিফ্রেও সাহেব দেখিয়াছেন যে, খাদ্য মিশ্রিত দ্রব পদার্থস্থিত বীজরেণু ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত ফুটাইলেও সকলেই জীবিত ছিল, অর্দ্ধ ঘণ্টা ফুটাইতে অনেকগুলি, এক ঘণ্টা ফুটাইতে অত্যল্প জীবিত ছিল। তিন ঘণ্টা ফুটাইবার পর একটিও জীবিত ছিল না। কিন্তু ফুটন্ত জলের উষ্ণতার অধিক উষ্ণতায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই বীজরেণু মরিয়া যায়। এদিকে জল জমাইলে অনেক বাক্‌টিরিয়া মরিয়া যায়, কিন্তু বীজরেণুর কিছুই হয় না। ফ্রিসচ্‌ সাহেব দেখিয়াছেন যে, যে সকল বাক্‌টিরিয়া গলিত দ্রব্যে জন্মিয়া থাকে, তাহারা—১১১°শ উষ্ণতাতেও জীবিত ছিল।

(৩) Cilia.

কোন্ দ্রব্যে সকল প্রকার বাক্‌টিরিয়া মরিয়া যায়, তাহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে কার্বলিক, সালি-সাইলিক প্রভৃতি অম্লরসে অধিকাংশ বাক্‌টিরিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অনেক বাক্‌টিরিয়া তাহাতে মরিয়াও যায়। রসকর্পূর নামক পারদ-ঘটিত বিষাক্ত পদার্থ বাক্‌টিরিয়ার পরম শত্রু।

১৫০০০ ভাগ জলে এক ভাগ মাত্র রসকর্পূর মিশ্রিত করিলে তাহাতে বাক্‌টিরিয়ার বৃদ্ধি নিরুদ্ধ হয়। কিন্তু ইহাতেও বাক্‌টিরিয়া সকল ধ্বংস হয় না। যদ্দ্বারা বাক্‌টিরিয়া বিনষ্ট হইতে পারে, এমন ঔষধ আবিষ্কৃত হইলে চিকিৎসার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে।

জীবনোপায় ক্রমভেদে বাক্‌টিরিয়া সকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কতকগুলি মৃত ও গলিত জৈব পদার্থে জন্মে, তাহাই তাহাদের আবাসভূমি। তাহাদিগকে মৃত-জীবি বলা যায়। অপর কতকগুলি বাক্‌-টিরিয়া জীবিত পদার্থে জন্মে, তাহাদিগকে পরজীবী বলা যায়। (১) মৃতজীবী বাকটি-রিয়ার মধ্যে অনেকগুলি নানাবিধ সন্ধানের (২) কারণ,অনেকগুলি মৃতজীব দেহ পচাইয়া

(১) অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ এইরূপ মৃতজীবী (Saprophytes) ও পরজীবী (Parasites)। ছত্রাক গলিত জৈব পদার্থে ও অর্কিড প্রভৃতি পর গাছা অন্য জীবিত বৃক্ষে জন্মে। প্রাণীবর্গের মধ্যে কীট প্রভৃতি মৃতজীবী, উৎকুণাদি পরজীবী।

(২) Fermentation.

তাহাকে গলিত পদার্থে পরিণত করে। পরজীবী বাক্‌টিরিয়াগণ আশ্রয় দাতার শরীরাভ্যন্তরে বাস করে। আক্রমণ প্রণালী-ভেদে তাহাদের জন্ম প্রণালী পরিবর্ত্তিত হয়। বীজরেণুরূপে কিম্বা স্বাভাবিক আকারেই বাহির হইতে মুখ কিম্বা ক্ষত পথে শরীরে প্রবেশ করে। তথায় তাহারা নিজের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন করিতে গিয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। ইহাদের কয়েকটির বিষয় পরে বলা যাইতেছে।

(২) অণুজীবগণ কি সংক্রামক রোগের কারণ ?

আজ কাল অনেক পাশ্চাত্য ডাক্তার বিশেষ বিশেষ বাক্‌টিরিয়া বিশেষ বিশেষ সংক্রামক রোগের মুখ্য কারণ বলিয়া অনুমান করিতেছেন। অনেক ডাক্তার বাক্‌টিরিয়াকে অধিকাংশ রোগের কারণ বলিয়া তদনুসারে চিকিৎসা প্রণালী উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, সকল রোগের না হউক, ইহারা যে কতকগুলি রোগের কারণ, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। রোগগ্রস্ত জীবদেহে বাক্‌টিরিয়া দেখিতে পাইলেই যে তাহা সেই রোগের কারণ, এমন অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। উক্ত রোগের ও বাক্‌টিরিয়ার নিত্য সম্বন্ধ থাকিলেও উভয়ের মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ না থাকিতে পারে। বস্তুতঃ এ সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে কচ সাহেবের উপদেশ কয়েকটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ইহাদের কোন একটি অসিদ্ধ হইলে সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। উপদেশগুলি এই (১) রোগাক্রান্ত জীবদেহে বাক্‌টিরিয়া থাকা আবশ্যক। (২) উক্ত বাক্‌টিরিয়া নীড় হইতে সংগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র কৃত্রিম বাস ভূমিতে জন্মাইতে হইবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মাইয়া রোগীর দেহের ক্লেদাদি দূরীভূত করিতে হইবে (১)। (৩) অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত সেই সকল বাক্‌টিরিয়া এইরূপে জন্মাইয়া সুস্থকায় জন্তুদেহে প্রবিষ্ট করিলে সেই জন্তু সেই রোগে আক্রান্ত হয় কি না, তাহা দেখিতে হইবে। এবং (৪) এই শেষোক্ত রোগাক্রান্ত জন্তু শরীরে সেই প্রথম দৃষ্ট অণুজীব পাওয়া যায় কি না, তাহা দেখিতে হইবে। অনেক লোকের বিশ্বাস যে, ডাক্তারগণ মূলভিত্তি দৃঢ় না করিয়াই অণুজীব হইতে রোগোৎপত্তিবাদ পোষণ করিতেছেন।

কিরূপে ব্যাধিকর অণুজীবের অনুসন্ধান করিতে হয় এবং কিরূপেই বা কৃত্রিম খাদ্যে তাহাদিগকে রোপণ করিয়া তাহাদিগকে পরিদর্শন করিতে হয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এখানে কয়েকটি অণুজীবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া তদ্দ্বারা রোগোৎপত্তির আধুনিক মত বলা হইতেছে। পূর্ব্বে বাক্‌টিরিয়ার যে শ্রেণী ভাগ করা গিয়াছে, তাহা এখানে অবলম্বিত হইবে।

(১) অণুগুটিকা বা মাইক্রোককী। ইহারা গোল বা ডিম্বাকার। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে, বার সহস্র হইতে পঞ্চাশ সহস্র একত্র করিলে এক ইঞ্চির অধিক হইবে না। কতকগুলি গুটিকা দল বাঁধিয়া বাস করে, কতকগুলি পুঁতির মালার ন্যায় পরস্পর সংলগ্ন থাকে।

---

(১) এখানে বলা আবশ্যক যে নীড় (nidus) হইতে বাক্‌টিরিয়া সংগ্রহ করিবার সময় রোগীর দেহের বিষময় ক্লেদাদি তৎসঙ্গে সংগৃহীত হয়। তদ্ভিন্ন, উক্ত বাক্‌টিরিয়া তাহার সহিত মিশ্রিত থাকিতে পারে। এইরূপে শঙ্কা বাক্‌টিরিয়াকে পৃথক করিবার অভিপ্রায়েই এই নিয়ম।

বায়ুতে ইহারা প্রচুর পরিমাণে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। প্রাণীদেহের কোন অংশ গলিত বা মৃত হইলে ইহারা অসংখ্য পরিমাণে তথায় আশ্রয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুস্থ অবস্থায় জিহ্বার উপর পৃষ্ঠের রসে, সামান্ত সর্দির শ্লেষ্মায়, পুঁজ রক্তে, এই সকল অণুজীব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাই প্রস্রাবের বিকৃত অবস্থার কারণ। ক্ষত, ফোঁড়া প্রভৃতির পুঁজে, উদরাময় রোগের বিষ্ঠায়, বসন্তের বীজে, প্রভৃতি নানাস্থানে ইহারা বিদ্যমান। পাগলা কুকুরের মুখের লালাতে পাস্তর সাহেব এক প্রকার অণুগুটিকা দেখেন। কৃত্রিম খাদ্যে রোপণ করিয়া সেই অণুগুটিকাময় বীজে জলাতঙ্ক রোগীর টীকা দিতেছেন। তিনি মনে করেন যে, এই অণুজীবই জলাতঙ্ক রোগের কারণ। (১) ইরিসিপেলাস রোগের কারণ এক প্রকার অণুগুটিকা, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন, ডিপ্‌থিরিয়া, নিউমোনিয়া, গণোরিয়া প্রভৃতি রোগেও বিশেষ বিশেষ অণুগুটিকা দৃষ্ট হয়। ইহাদের নিত্য সম্বন্ধ দৃষ্ট হইলেও কার্য্য কারণ সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় নাই।

(২) বাকৃটিরিয়া। ইহারা কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকৃতি। এক একটী দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চির প্রায় দ্বাদশ সহস্র অংশ মাত্র। সকলগুলির দৈর্ঘ্য সমান নহে। এক প্রকার মৃতজীবী বাকৃটিরিয়া জৈব পদার্থের পচিবার কারণ। দধ্যম্ল (২), শুক্তাম্ল (৩) প্রভৃতির কারণও বিশেষ বিশেষ বাকৃটিরিয়া। গলিত মাংসের রস দিয়া শশকের টীকা দেওয়াতে কচ সাহেব তাহার মৃত্যু ঘটিতে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তন্মধ্যস্থ এক প্রকার বাকটিরিয়াই মৃত্যুর কারণ। পাস্তর সাহেব বলেন যে, পাখীদিগের ওলাউঠা রোগের কারণও আর এক প্রকার বাকটিরিয়া। (১)

(৩) বাসিলি। বাসিলি সকল দণ্ডাকার। ইহাদের দৈর্ঘ্যের বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। ইহাদের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির দুই তিন শতাংশ হইতে দ্বাদশ সহস্রাংশ পর্য্যন্ত দেখা যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অবস্থা বিশেষে বাসিলির বীজরেণু উৎপন্ন হয়। জলে খড় মাংস মৃতদেহ পচাইলে তথায় অগণ্য বাসিলি দেখা যায়। কয়েক প্রকার ব্যাধিকর বাসিলি জানা গিয়াছে। কয়েকটী বাস্ত-

(১) সুস্থ কুকুরের ও মানুষের লালা দ্বারা ও শশকের দেহে টীকা দেওয়াতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। যাহা হউক, এই অণুজীবময় বীজের টীকা দিয়া পাস্তর সাহেব যে জলাতঙ্ক রোগ চিকিৎসা করিতেছেন, তাহা অনেক ডাক্তার অনুমোদন করেন না। সম্প্রতি তাঁহার চিকিৎসালয়ের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার অবলম্বিত চিকিৎসা প্রণালীর উপকারিতা দূরে থাক, অপকারিতাই প্রমাণিত হয়। ডাঃ বুইসন আবিষ্কৃত উষ্ণ জলের বাষ্প-সেবন বিধি জলাতঙ্ক রোগে কেন প্রযুক্ত হইতেছে না, তাহা বুঝা যায় না। শুনিয়াছিলাম, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহনগরে এক ব্যক্তি উক্ত প্রণালীমতে জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করিতেছেন। তাঁহার চিকিৎসার পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক।

(২) Lactic acid. (৩) Acetic acid.

(১) অষ্ট্রেলিয়া ও নবজীলণ্ডে অসংখ্য শশকের উপদ্রবে তথায় কৃষিকার্য্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মিতেছে। এই কৃষিকণ্টক সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য পাস্তর সাহেব পাখীদিগের ওলাউঠার বীজ দিয়া কয়েকটি শশককে টীকা দিবার প্রস্তাব করেন। এই রোগ শশকজাতীয় মধ্যে বিলক্ষণ সংক্রামক। সুতরাং তাহা তথাকার অগণ্য শশক বংশ নির্ম্মূল করিতে পারিবে, এই তাঁহার অভিপ্রায়। তাঁহার মতে এই বাকটিরিয়া পাখীর ও শশকের পক্ষে ব্যাধিকর, কিন্তু অপর জন্তু ও মানুষের পক্ষে নহে।

বিকই ব্যাধিকর কি না, তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। কচ সাহেবের কলেরা বাসিলির নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। এগুলি কিঞ্চিৎ বক্রাকার। এজন্য ইহাদের বাসিলি নাম না দিয়া "স্পাইরিলি" দিলে ভাল হইত। ওলাউঠা রোগীর মলে এই বাসিলি কখন অসংখ্য, কখন অত্যল্প পরিমাণে দেখা যায়। যাহা হউক, এই বাসিলি যে ওলাউঠা রোগের কারণ, তাহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। জলের সহিত ওলাউঠা রোগীর মল মিশ্রিত হইয়াছিল। সেই জল অনেক লোক পান করিয়াও উক্ত রোগগ্রস্ত হয় নাই (১)। এইরূপ ম্যালিরিয়া, (২) ক্ষয়কাশ, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তির রক্তে বিশেষ বিশেষ বাসিলি দৃষ্টিগোচর হয়। গরুদিগের আনথ্রাক্স (anthrax) নামক রোগের কারণ যে এক প্রকার বাসিলি তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। এই বাসিলি লইয়া বিস্তর পরীক্ষা হইয়াছে। সিদ্ধান্তে কোন প্রকার ভ্রম দৃষ্ট হয় না। (৩)

(১) See Klein's Micro-organisms and disease. 3rd edition P. 180.

(২) ম্যালেরিয়া রোগে বঙ্গদেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। কিন্তু উহার নিদান নিরূপণে সকলেই উদাসীন। অল্প দিনের পরীক্ষায় নাকি আসামের কালাজ্বরের নিদান বাহির হইয়াছে। আজ বিশ বাইশ বৎসর ব্যাপিয়া ম্যালেরিয়া ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে, তাহার কিছুই হইল না। রাজা দিগম্বর মিত্রের ভ্রান্ত মত আলোচনা করিতেই কি এত দিন গেল? ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শোণিতের রক্তকোষাণুতে (red corpuscles) নাকি এক প্রকার অণুবীজ জন্মে। বাস্তবিক, কোন অণুজীব ম্যালেরিয়া রোগের কারণ কি না, তদ্বিষয় পরীক্ষা করা হয় না কেন?

(৩) জলাতঙ্ক ও আনথ্রাকস রোগ চিকিৎসার টীকা দিবার ব্যবস্থা পাস্তর সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়াছে। Anthrax গো মহিষাদির পক্ষে মারাত্মক। ইহার ও জলাতঙ্ক রোগের বীজ জন্তু শরীর হইতে মনুষ্য দেহে সংক্রামিত হইতে পারে। মানুষের বসন্তের রসে ও গোবসন্তের রসে টীকা দেওয়ার যে প্রভেদ, তাহা অনেকেই জানেন। উভয়ের অণুজীব এক নহে। তবে তাহারা পরস্পর নিকট সম্পর্কিত। যাহা হউক, মানুষের বসন্তের রস দিয়া টীকা দেওয়াও যেমন, পাগলা কুকুরের লালা দিয়া জলাতঙ্ক রোগে পাস্তর সাহেবের অবলম্বিত টীকার ব্যবস্থা প্রায় তেমনই। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, পাগলা কুকুরের লালার অণুজীব দিয়া একবারে জলাতঙ্ক রোগীর দেহে টীকা না দিয়া, প্রথমতঃ কৃত্রিম খাদ্যে ও অপর প্রাণীর দেহে তাহাকে তিনি জন্মাইতেছেন। ইহাতে সেই অণুজীবের উগ্রতা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হয়।

ডাঃ হাফকিন কলিকাতা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনেককে কলেরা টীকা দিয়া তাহাদিগকে উক্ত রোগ হইতে রক্ষা করিতেছেন। সে দিন কাগজে দেখিতে ছিলাম, তিনি নাকি বিশ ত্রিশ হাজার লোককে টীকা দিয়াছেন। এত পরীক্ষার মধ্যেও কি উক্ত টীকার কার্য্যকারীতা প্রমাণিত হইল না? সুখের বিষয় এই যে, পাস্তর সাহেবের টীকার ন্যায় ডাঃ হাফকিনের টীকায় তত বিপদ নাই।

আমরা এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম। উপরের দৃষ্টান্ত হইতে এই অণুজীব তত্ত্বের আবশ্যকতা উপলব্ধ হইবে। অণুজীবগণের জীবনেতিহাস ও রোগোৎপাদিকা শক্তি আলোচনা করিলে আমাদের দেহ শত সহস্র অণুজীবের ক্রীড়া ভূমি হইয়াও কেন নষ্ট হয় না, তাহা বিস্ময়কর মনে হয়। জলে, স্থলে, বায়ুতে, সর্ব্বত্র অণুজীব। নিশ্বাসের সঙ্গে (১)

(১) সমুদ্র জলসীমা হইতে ৪০০০ হইতে ৮০০০ হাত উচ্চে একটিও অণুজীব কিংবা ছত্রাকের বীজরেণু দৃষ্ট হয় নাই। পারীস নগরের রিভোলি নামক পথের দশ ঘন হস্ত পরিমিত বায়ুতে ৫৫০০° অণুজীব দেখা গিয়াছিল। বার্লিন নগরের একটা পথের উন্মুক্ত চত্বরের ২৫ সের (মাপের) বায়ু হইতে ৩ লক্ষ বাক্টিরিয়া ও

ভক্ষ্য দ্রব্যের সঙ্গে তাহারা শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। নিরন্তর দেহ মধ্যে কি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছে! কিন্তু পূতিকর অণুজীবের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের কোন অনিষ্ট করে না। জীব শরীরে প্রবিষ্ট করাইলে তাহারা সেখানে বৃদ্ধি হয় না, এজন্য শরীরের কোন অনিষ্টও ঘটে না।

যদিও এই সকল পূতিকর বাক্‌টিরিয়া সাধারণতঃ দেহের কোন অনিষ্ট করে না, অবস্থা বিশেষে তাহাদের রূপ ও গুণের প্রভেদ ঘটে। বস্তুতঃ যাবতীয় বাক্‌টিরিয়াই একেরই রূপান্তর, কি তাহার ভিন্ন ভিন্ন জীবজাতি, এ প্রশ্নের এখনও সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। আম্, জাম, গো, মেষ প্রভৃতি জীবগণ বিভিন্ন জাতীয়। নানাবিধ বাক্‌টিরিয়া কি এইরূপ বিভিন্ন জাতীয়? বাক্‌টিরিয়া কেন, অবস্থাবিশেষে অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবের এত রূপান্তর ঘটে, যে উহারা একেরই বংশ মাত্র, এ কথা অস্বীকার করা সহজ নহে। অধিকাংশ বাক্‌টিরিয়া ক্ষুদ্র, প্রায় একই প্রকার আকৃতি-বিশিষ্ট, এবং অনেক জাতি একত্রে দৃষ্টিগোচর হয়। বাহ্য কারণের প্রভেদে বাকটিরিয়ার আকৃতির প্রভেদ ঘটিতে পারে। যাহা হউক, প্রমাণাভাব বলিয়া এই মত এখন প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে।

যাবতীয় জৈব পদার্থ পচিবার কারণ তবে বাক্‌টিরিয়া। বাকটিরিয়া সংস্পর্শে আসিতে না পারে, এমনভাবে জৈবপদার্থ রাখিলে তাহা পচে না। জৈব পদার্থ হইতে বাকটিরিয়া নিজ দেহ নির্ম্মাণোপযোগী সোরাজনক, অঙ্গারক প্রভৃতি পদার্থ বহিষ্কৃত করিয়া লওয়াতে তাহা বিশ্লিষ্ট হয়। ইহার ফল স্বরূপ তথায় নূতন সামগ্রীও উৎপন্ন হয়। এই সকল নূতন পদার্থের অধিকাংশই গরম বিশেষ। এই জন্যই গলিত জৈব পদার্থ শোণিতের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে স্থল বিশেষে সাংঘাতিক হইয়া উঠে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বাকটিরিয়ার বৃদ্ধিতে খাদ্য বস্তুতে এমন পদার্থ নিচয় উৎপন্ন হয় যে, তাহাতে তাহাদের বৃদ্ধি অবাধে ঘটিতে পারে না।

আর একটী কথা। এত প্রকার ব্যাধিকর বাকটিরিয়া শরীরে প্রবেশ করিতেছে, তথাচ শরীর সুস্থ থাকে কিরূপে? সুস্থ দেহের রক্ত মাংসে একটীও অণুজীব দৃষ্ট হয় না, অথচ অসুস্থ বা মৃত হইলে সেই দেহের স্থান বিশেষে বা সর্ব্বত্র তাহারা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ফল কথা, সুস্থ দেহের অণুজীব ধ্বংসকারী এমন কি গুণ আছে যে, তাহা শত শত্রুর আক্রমণ অনায়াসে প্রতিরোধ করিতে পারে? এই জটিল প্রশ্ন লইয়া অনেক বাক্ বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। বিগত খ্রীঃ ১৮৯২ অব্দে মেচনি কফ সাহেব এ সম্বন্ধে যে অভিনব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, যদিও তাহা বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে এখনও তাদৃশ সমাদর পায় নাই, কিন্তু শীঘ্রই তদ্দ্বারা প্রাচীন মতের বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। মেচনি কফ সাহেব পূর্ব্বে ওডেসা নগরে প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। সম্প্রতি ইনি পারিস নগরে পাস্তুর চিকিৎসালয়ের একজন প্রধান ডাক্তার। ইনি যে তত্ত্বের আবি-

১৬ জাতীয় ছত্রাক উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্কুলের ছুটী হইবা মাত্র স্কুল ঘরের ২ সের বায়ু হইতে ৩৭টি বাক্‌টিরিয়ার সজ্ঞ এবং ৩৩ জাতীয় ছত্রাক জন্মে। স্কুল ঘরে বায়ু গমনাগমনের আবশ্যকতা অনেকে বুঝেন না।

ক্রিয়া করিয়াছেন, তাহাকে অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি দারবীনের আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বাদের সমতুল্য মনে করেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি এই তিনটী প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। (১) দেহের কোন স্থানে অণুজীবগণের সংগ্রাম, (২) কাহার সহিত তাহাদেব সংগ্রাম এবং (৩) কি ভাবে সংগ্রাম চলিতেছে। তাঁহার যুক্তি প্রণালী এক কথায় বলিতে পারা যায় না। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে,দেহের শোণিতাদিতে যে এক প্রকার শ্বেত-কোষাণু * নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহারাই বাক্টিরিয়াগণকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। তাহারা যে বাক্টিরিয়াকে গ্রাস করে, তাহা তাহাদের উদরস্থ বাক্টিরিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে। যাবতীয় বাক্টিরিয়া উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে জন্মে না বা বলবান হয় না। যে দেহে তাদৃশ খাদ্য থাকে, তথায় তাহারা তাহাদের চিরশত্রু শ্বেত-কোষাণুকে পরাজয় করে এবং তাহার ফলস্বরূপ সেই দেহ ব্যাধি-পীড়িত বা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। †

বড় লোকের কথা সহসা খণ্ডন করিলে ধৃষ্টতা প্রকাশিত হয়। কিন্তু-নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং—হাস্‌কিন, বুচনার প্রভৃতির মত এখনও অপ্রমাণিত হয় নাই। অনেক রোগ একবার হইলে তাহা আর প্রায় হয় না, কিম্বা হইলেও তাহার আক্রমণ তাদৃশ ভয়াবহ হয় না। এই যে রোগ হইতে নির্ভয়ত্ব কিরূপে প্রতিপন্ন হয়? যিনি যাহাই বলুন, যতদিন রোগগ্রহণশীলতার সম্যক কারণ বুঝা না যায়, ততদিন সকল মতই প্রায় সমান হিতকর। শরীরে কোন বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব বশতঃই হউক, বা শ্বেত-কোষাণুর প্রবল পরাক্রম বশতঃই হউক, ফল একই দাঁড়াইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর শরীরের উপাদান কখনও ঠিক এক বলিতে পারা যায় না। আপনাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা সুস্থ দেহের আছে। দেহ বিকৃত হইলেই তাহা নানা জীবের আশ্রয় স্থান হয়।

নবাবিষ্কৃত আর একটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হওয়া যাইতেছে। কলিকাতা ঢাকা প্রভৃতি নগরের দুর্গন্ধময় নর্দমা হইতে উত্থিত গ্যাসে অণুজীব সংখ্যা অধিক কি? পূর্ব্বে লোকে মনে করিত যে, নর্দমার দুর্গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে অনিষ্টকর অণুজীব সকলও বায়ুর সহিত যথেষ্ট মিশ্রিত হয়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিতান্ত দুরূহ। শরীরের "ধাতুভেদে" ইহার অনেক বিষয়ের বৈলক্ষণ্য ঘটে। যাহাতে এক ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হয়, তাহাতে অপরের কিছুই না হইতে পারে। আবার স্বাস্থ্য বিষয়ে ইচ্ছা শক্তি, অভ্যাস গুণ প্রভৃতির প্রভাবও অল্প নহে। এই সকল কারণে স্বাস্থ্য বিষয়ক অলঙ্ঘনীয় নিয়ম সকলের পক্ষে. প্রকটন করা দুঃসাধ্য। নর্দমা পায়খানার পূতিগন্ধময় গ্যাস মেথরদিগকে আঘ্রাণ করিতে হয় তাহাদের

* White corpuscles or Leucocytes. ইনি ইহাদের নাম দিয়াছেন phagocytes। ডাঃ কচ সাহেব ইহার মতের পোষকতা করেন।

† মেচনি কফের মত প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আর এক মত প্রচারিত ছিল। প্রায় অধিকাংশ জীববিজ্ঞানবিৎ এই মত পোষণ করেন। মতটি এই যে, দেহ মধ্যে অণুজীবগণের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হেতু তথায় এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই পদার্থ উক্ত অণুজীবগণের গরল স্বরূপ। সুতরাং যত দিন ইহার প্রভাব থাকে, ততদিন সেই দেহে উক্ত অণুজীব জন্মিতে পারে না।

মৃত্যুর সংখ্যা অধিক, একথা বলা যায় না। তাহারা যে হস্ত পদাদি কার্ব্বলিক সাবান দিয়া পরিষ্কার করে, তাহাও দেখা যায় না। "অভ্যাস গুণ" এই কথাটায় অনেক অজ্ঞানতা আচ্ছাদিত হয়। যাহা হউক, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডননগরে নর্দ্দমার গ্যাসে অণুজীব সংখ্যা নিরূপণ করিবার জন্য বিস্তর পরীক্ষা করা হইয়াছে। পরীক্ষকগণের রিপোর্ট দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, নর্দ্দমার গ্যাস হইতে ব্যাধিকর অণুজীব বায়ুতে বিক্ষিপ্ত হয় না।

এই প্রবন্ধে অনেক কথার অবতারণা করা গিয়াছে। অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে, একটাও "কাজের কথা" নয়। বিপদ্ দেখাইয়া তাহার উদ্ধারের পথ না বলিলে বিপদ্ প্রদর্শনে ভয়েরই সঞ্চার হইল মাত্র। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা পর্য্যালোচনা না করিলে উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা হইবে কেন? যাবতীয় ব্যাধিকর অণুজীবের ধ্বংসকারী ঔষধাদির আবিষ্কার হইতে কালবিলম্ব আছে। তবে আলোক যে অণুজীবের প্রধান শত্রু, তাহা সম্প্রতি পরীক্ষিত হইয়াছে। বহুকাল হইতে জীববিদ্যাবিদেরা অবগত ছিলেন যে, আলোক অনেক বাক্‌টিরিয়ার বৃদ্ধির অনুকূল নহে। অন্ধকারেই তাহারা সমধিক পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। সূর্য্যের আলোক ইহাদের শত্রু, সূর্য্যের তাপ শত্রু নহে। সূর্য্যের অলোকে নানাবর্ণ কিরণ আছে। সেদিন অধ্যাপক মার্শেল ওয়ার্ড সাহেব এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, নীলবর্ণের আলোক পাইলে বাক্‌টিরিয়া মরিয়া যায়। স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোকের প্রভাব আমরা বিস্মৃত হই। অণুজীব পূর্ণ জলে তড়িৎ সঞ্চালিত করিলেও নাকি তাহারা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ফট্‌কিরিও অণুজীবগণের শত্রু, এ কথাও অনেকে বলেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

কৃষি-কার্য্যের উন্নতি। (৯)

দ্বিতীয় ভাগ।

শিক্ষা ঘটিত উন্নতি।

প্রথম অধ্যায়।

শিক্ষক।

কৃষি সম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষা করিতে গেলে অনেক গুলি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের কিছু না কিছু জ্ঞান আবশ্যক। কৃষি শিক্ষার আনুষঙ্গিকরূপে কোন্ কোন্ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা বিলাতের কৃষিবিদ্যালয় গুলির পাঠ্য বিষয় সকল পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। বিলাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কৃষিবিদ্যালয়ে অধীত হইয়া থাকে।—(১) কৃষি-তত্ত্ব। (২) ভূতত্ত্ব। (৩) উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান। (৪) প্রাণি-বিজ্ঞান। (৫) রসায়ন শাস্ত্র। (৬) জরিপ ও পরিমিতি। (৭) জমীদারীর তত্ত্বাবধারণ। (৮) জঙ্গল মহলের তত্ত্বাবধারণ। (৯) প্রাণি-চিকিৎসা। (১০) হিসাব-শিক্ষা (Book-keeping)।

উল্লিখিত বিষয়ের প্রায় সকল গুলিরই স্থানীয় জ্ঞান মাত্র বিশেষরূপে দেওয়া কৃষিবিদ্যালয় গুলির উদ্দেশ্য; অর্থাৎ, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান, জমীদারীর তত্ত্বাবধারণ ইত্যাদি বিষয়গুলি এমন করিয়া বিলাতে শিক্ষা দেওয়া হয়, যেন ছাত্রেরা বিলাতের কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ্ বা খনিজ

পদার্থ ইত্যাদি দেখিলেই তাহাদের কৃষি সম্বন্ধে উপকারিতা বা অপকারিতা, সহজেই বলিতে পারে। অন্যান্য দেশে জমীদারী কিরূপে চালাইতে হইবে, অন্যান্য দেশের জঙ্গলে বা ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বৃক্ষ বা ওষধি জন্মে, এ সকল বিষয়ে বিলাতে কার্য্যকারী (Practical) শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে বলিয়া এ সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় না। যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সমস্তই কার্য্যে পরিণত হইতেছে বা হইয়াছে, এমন অবস্থা সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তবে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিলাতের কৃষিবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ স্থানীয় গাছ ও আগাছা সমস্তেরই নাম ও ব্যবহার জানে। আমরা কেহ কেহ এ দেশেও উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছি, বিলাতে কৃষি-বিদ্যালয়েও উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছি। এদেশের অতি অল্প পরিমাণ বৃক্ষ, গুল্ম বা ওষধির নাম ও ব্যবহার আমরা অবগত আছি,অথবা শিক্ষকদিগের নিকট অবগত হইবার আমাদিগের সুবিধা জন্মিয়াছে। বিলাতে দুই চক্ষে যে সকল গাছ, আগাছা বা ঘাস দেখিতাম, তাহাদেরই চিনিতাম। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান এদেশে বৈজ্ঞানিক ভাবেই শিক্ষা হইয়া থাকে, ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যখন এদেশে ব্যবহারিক ভাবে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের শিক্ষা পাইবে, তখন কৃষি-শিক্ষার আনুষঙ্গিক ভাবে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকও পাওয়া যাইবে। আপাততঃ কৃষি বিষয়ে শিক্ষা দানের উদ্যোগ করিতে গেলেই দেখা যাইবে, শিক্ষা নিতান্ত অঙ্গহীন হইবে। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের বিষয় যাহা বলা হইল, ভূতত্ত্ব এবং প্রাণি-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। পুস্তক পাঠ করিয়া ভূতত্ত্ব ও প্রাণি-বিজ্ঞানের জ্ঞানলাভ করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য সেই জ্ঞান ব্যবহার করা অসম্ভব। ভারতবর্ষীয় ভূতত্ত্ববিৎ ও প্রাণিবিজ্ঞানবিৎ যে কয়েক জন পণ্ডিত আছেন, তাঁহারাই ছাত্রগণকে সঙ্গে সঙ্গে মাঠে ঘাটে লইয়া গিয়া এ সকল বিষয়ের ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে পারেন। আমরা প্রায় যে সমস্ত উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান অথবা ভূতত্ত্ববিষয়ক শিক্ষক এদেশে দেখিতে পাই, তাঁহাদের মাঠে ঘাটে লইয়া গিয়া যে সে উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ বা খনিজ পদার্থের নাম জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় তাঁহারা হাঁ করিয়া থাকেন। বিলাতের কোন উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের শিক্ষককে যদি যে সে একটী গাছ বা পাতা দেখাইলে তিনি তাহার নাম তৎক্ষণাৎ না বলিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি মর্ম্মান্তিক লজ্জিত হয়েন। এদেশে বৈজ্ঞানিক তথ্য (Scientific theories) সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তির আদর, যতদিন না হ্রাস হইয়া বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের (Scientific practices) আদর বাড়িবে, ততদিন কৃষি শিক্ষার আনুষঙ্গিক বিজ্ঞান বিষয়ের উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাইবে না। উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাউক বা না যাউক, উপরিলিখিত কয়টী বিষয়েরই শিক্ষা দিবার জন্য এক প্রকারের শিক্ষক পাইবার যে এদেশে উপায় হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। বিষয় বিশেষের অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকিয়া যে তাঁহারা ক্রমশঃ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, তাহারও সন্দেহ নাই।

বিলাতের কৃষিবিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই কার্য্যক্ষেত্রেও ব্যাপৃত থাকেন। অর্থাৎ যিনি ভূম্যধিকার প্রভৃতি কৃষি সম্ব-

ক্ষীয় ব্যবস্থা (Agricultural law) বিষয়ে উপদেশ দেন, তিনি একজন আদালতের উকিল। যিনি জমীদারী ও জঙ্গল মহলের তত্ত্বাবধারণ সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তিনি এক-লর্ড্ এর জমীদারীর তত্ত্বাবধারক। যিনি কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাঁহার নিজের প্রায় ১০০০ বিঘা চাষের জমী আছে। যিনি কৃষি ইমারত প্রস্তুতের শিক্ষা দেন, তিনি একজন সর্দ্দার-মিস্ত্রি। যিনি রসায়ন শাস্ত্রের উপদেশ দেন, তিনি কৃষকদের জন্য মৃত্তিকা, সার, প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দিয়া, পৃথক্ অর্থ উপার্জ্জন করেন। এদেশেও কৃষি-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে হইলে শিক্ষক-দিগের বিদ্যালয়ের বাহিরেও স্ব স্ব বিষয়ে কার্য্য করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে তাঁহাদিগের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আরও গভীর ভাবে জন্মিয়া, অধ্যাপনা সম্বন্ধে সবি-শেষ সুবিধা ঘটিবে। কার্য্যক্ষেত্রে ব্যাপৃত থাকিয়া কোন বিষয়ে যেরূপ ঠিক্ ঠিক্ জ্ঞান জন্মে, কেবল পরীক্ষা দ্বারা অথবা ছাত্র অধ্যাপনায় সেরূপ জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা কখনই থাকে না। কৃষিবিষয়ক আইন ও জমীদারীর তত্ত্বাবধারণ সম্বন্ধে যিনি শিক্ষক হইবেন, তিনি উকীল বা মোক্তার হইলে এবং জমীদারী সেরেস্তায় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে যেরূপভাবে শিক্ষা দিতে পারিবেন, কেবলমাত্র শিক্ষকতা করিয়া সেরূপভাবে কখনই তিনি শিক্ষা দিতে পারিবেন না। যিনি ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন, তিনি গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ব বিভাগের কর্ম্মচারী হইলে যেরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে পারিবেন, পুস্তক পাঠ করিয়া, বি-এ, পরীক্ষায় ভূতত্ত্ব বিষয়ে উত্তীর্ণ হইয়া, কেবল মাত্র শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে সেরূপ ভাবে কখনই শিক্ষা দিতে পারিবেন না। যে কয়েকটী বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ প্রত্যেকটীর সম্বন্ধেই এইরূপ ব্যবস্থা অনায়াসে হইতে পারে। অর্থাৎ, গবর্ণমেণ্টের, জমীদারদিগের অথবা ইংরাজ সওদাগর নীল ও চা-করদিগের অধীনে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত, কতক গুলি লোককে মনোনীত করিয়া কৃষি-বিদ্যালয়ে বৎসরে এক বা দুই মাস করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করিলে, সকল বিষয়েরই ব্যবহারিক শিক্ষা হইবে। শিক্ষা প্রধানতঃ কৃষক বালকদিগের জন্যই হওয়া উচিত। একারণ সকল বিষয়েই দেশীয় ভাষায় শিক্ষার বন্দোবস্ত না হইলে শিক্ষা ব্যবহারিক হইবে না। যে কৃষক-বালক ভাল করিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছে, সে এক রকম কাজের বাহির হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। সে যে কৃষিতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া শিক্ষা সমস্ত কার্য্যে পরিণত করিয়া অন্নের উপায় করিতে সক্ষম হইবে, তাহার আশা অতি অল্প। এদেশে ইংরাজী শিক্ষা, আর বিলাতের গ্রীক ল্যাটিন শিক্ষা প্রায় একই রূপ। বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা শিক্ষা করিতে যান, তাঁহারা প্রধানতঃ পাদ্রি হইবার উদ্দেশেই এইরূপ শিক্ষালাভে কালা-তিপাত করেন। বিদেশীয় ভাষায় কোন ব্যবসায় শিক্ষা করিতে হইলেই শিক্ষাটী অল্প বিস্তর অব্যবহারিক হইয়া পড়ে। বিলাতে কোন ব্যবসায় শিক্ষা বিদেশীয় ভাষায় হয় না। কৃষিকার্য্যের উন্নতি কৃষক-দের দ্বারাই করিয়া লইতে হইবে। কৃষি বিষয়ের শিক্ষা পাইতে হইলে যদি কৃষক-বালকের ইংরাজী শিক্ষা করা আবশ্যক হয়, তবে ইংরাজী শিক্ষা করিতে করিতে যে কালক্ষেপ হইবে, তাহাতেই কৃষক বালকগণ অভ্যাস-ভ্রষ্ট হইয়া কৃষকত্ব হারাইবে।

বাঙ্গালী কৃষক বালকদিগের শিক্ষা দিবার জন্য কার্য্যান্তরলিপ্ত বাঙ্গালী শিক্ষক নিযুক্ত করিলে কৃষিশিক্ষার ব্যয়ও অতি অল্প হইবে। জমীদারী সেরেস্তায় নিযুক্ত স্থানীয় কোন মোক্তার মাসে ৫৲ টাকা পাইলেই সপ্তাহে এক ঘণ্টা করিয়া একটী বিষয় কৃষি বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়া যাইতে পারেন। অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষক অপেক্ষাকৃত দুর্ম্মূল্য হইলেও উক্ত বন্দোবস্তে কার্য্য করিলে স্বল্প বেতনে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতে পারে।

প্রত্যেক বিষয়ে কি ধারায় শিক্ষকদিগকে উপদেশ দিতে হইবে, তাহা বিলাতের কৃষিবিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সহজেই স্থানীয় শিক্ষকদিগের নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন। কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা উক্তরূপে শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিরই সম্পূর্ণ ভার থাকা কর্ত্তব্য। অন্য সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা যাহাতে কৃষিকার্য্যের সহায়তা সম্পাদন করে, এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইলে, কৃষিতত্ত্বের শিক্ষককেই বিদ্যালয়ের সাধারণ অধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য।

কি কৃষিতত্ত্ব কি কৃষিতত্ত্বের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি, আপাততঃ সকলেরই শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইবে। কালসহকারে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া শিক্ষকগণ ক্রমশঃ ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষা দিতে পারিবেন। শিক্ষার সহিত নানাবিধ কৃষি বিষয়ক পরীক্ষা শিক্ষা স্কুলের অনতিদূরে অনুষ্ঠিত হইলে, শিক্ষার মর্ম্ম সকল ছাত্রদিগের হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া যাইবে।

কৃষি-বিজ্ঞান অতি বিশাল শাস্ত্র। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই শাস্ত্রের কোন অঙ্গেরই আপাততঃ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষীয় কৃষিবিদ্যার এক একটী অঙ্গ লইয়া বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলায় উহাদিগের বর্ণনা করিয়া যাওয়া আপাততঃ অসম্ভব। প্রত্যেক অঙ্গ সম্বন্ধেই কিছু কিছু বলা যাইতে পারে। ভবিষ্যতে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইবে, উহাতে কৃষি সম্বন্ধে এইরূপ অঙ্গহীন শিক্ষা মাত্র সন্নিবিষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উদ্ভিদ্ ও জন্তুর সংক্রামক রোগ।

এ বৎসর মধ্যভারতবর্ষে গোধূম সমস্ত 'ধসা' লাগিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দারজিলিং পাহাড়ের উপর আলুর গাছে এক প্রকার রোগ হইয়া গাছগুলি পচিয়া যাইত। এই রোগের কারণ দারজিলিং হইতে কলিকাতার সহরে আলুর চালান প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসরই 'গুটি' হইয়া, 'গলাফুলারোগ' হইয়া বা "বদ্‌লান রোগ" হইয়া অনেক গোরু মারা যায়। 'কটা', 'কালশিরা' ও 'চুনা' রোগ হইয়া রেশম-পোকা একেবারে নিপাত হইয়া যায়। যে স্থলে বহুল পরিমাণে উদ্ভিদ্ বা জন্তু মরিতে থাকে, অথচ এরূপ মরণের কারণ বুঝা যায় না, সেই স্থলেই প্রায় বুঝিতে হইবে, আণুবীক্ষণিক কোন না কোন সূক্ষ্ম জীবিত পদার্থ ঐ উদ্ভিদ্ বা জন্তুর মধ্যে জন্মিয়া ও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উহাদিগের সত্ব গ্রাস করিয়া উহাদিগকে মারিয়া ফেলিতেছে। একই স্থানে অনেক গাছের বা জন্তুর একই রকম রোগ হইলে তাহাদিগকে সংক্রামক রোগ অর্থাৎ আণুবীক্ষণিক জীবিত পদার্থ ঘটিত রোগ, বলিতেই হইবে, এরূপ নহে। হটাৎ যদি কোন স্থানে কোন গূঢ় কারণ বশতঃ গাছ মরিতে থাকে, তবে

প্রথমেই কীট দ্বারা এইরূপ হইতেছে কি না দেখা উচিত। শিকড়ের মধ্যে, স্কন্ধের মধ্যে, পাতার পশ্চাৎ ভাগে, নবপল্লবের অন্তরে, অনুসন্ধান করিলে প্রায়ই কীট দেখা যাইবে। গোরুর, মহিষের ও ছাগলের 'হাওয়ার ব্যারাম' নামে এক প্রকার ব্যাধি হয়। তাহাতে তাহারা ঘাড় বক্র করিয়া মাথা চালাইতে থাকে। এই ব্যাধির কারণও মস্তিষ্কের মধ্যে এক প্রকার কীট। কীট যদি অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়া যায়, তাহা হইলেই যে সাধারণ ব্যাধি বিশেষ জীবিতাণু-ঘটিত ও সংক্রামক বলিতে হইবে, তাহাও নহে। হটাৎ শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষাধিক্য বশতঃ জন্তুদিগের কোন কোন সাধারণ ব্যাধি জন্মে। এই সকল ব্যাধি জীবিতাণু-ঘটিত হইতেও পারে, না হইতেও পারে। উদাহরণ স্থলে, রেশম ও তসর কীটের 'রসা' ব্যারাম, অন্যান্য জন্তুর 'পেট্-ফুলা' ব্যারাম ও শর্দ্দি, এই সকল ব্যাধির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে শর্দ্দি শীত উত্তাপের উপর নির্ভর করে না, অথচ সংক্রামক ভাব ধারণ করে, ঐ শর্দ্দি নিশ্চয়ই জীবিতাণু ঘটিত। অশ্ব ও মনুষ্যের 'ইন্‌ফ্‌ুয়েঞ্জা' এই জাতীয় শর্দ্দি। কীট বা হঠাৎ ঋতু পরিবর্ত্তন ঘটিত নহে, এমন কোন রোগ একই স্থানে অনেকের ঘটিলে তাহা যে জীবিতাণু দ্বারা ঘটিয়াছে ও সংক্রামক, এরূপই যে স্থির করিতে হইবে, তাহাও নহে। উদাহরণ স্থলে মনুষ্যের গলগণ্ডের কথা বলা যাইতে পারে। মালদহ জেলার একটী গ্রামের প্রায় সকল লোকেরই গলগণ্ড আছে, কিন্তু পার্শ্বস্থ কোন গ্রামেই লোকের এরূপ গলগণ্ড নাই। ঐ গ্রামটীতে যে কোন বিশেষ প্রকার জীবিতাণু আছে, এরূপ মনে করিতে হইবে না। ঐ গ্রামের কূপ ও পুষ্করিণীর জলে চূণাধিক্য বশতঃই বোধ হয় এই রোগটী ঐ গ্রামে এত প্রবল।

সাধারণতঃ যখনই রাশি রাশি গাছ বা জন্তু কোন গূঢ় কারণ বশতঃ মরিতে থাকে, এবং কীট বা ঋতু পরিবর্ত্তন এই মৃত্যুর কারণ নহে বলিয়া বোধ হয়, তখনই ঐ রোগ জীবিতাণুঘটিত বলিয়া অনুমান করা উচিত। জীবিতাণুঘটিত রোগগুলি অতি সহজে (বায়ু সংযোগে ইত্যাদি) ও অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সকল রোগের দমন ও প্রতিকার বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান সকল কৃষকেরই থাকা আবশ্যক। বহির্লক্ষণ মাত্র দেখিয়া রোগগুলি স্থির রূপে নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের দ্বারা রোগ নির্ণয় করাইয়া লইয়া রোগের ব্যবস্থা আনিতে হইলে কৃষকের একটা কার্য্য করা আবশ্যক। কার্য্যটী বড় দুরূহ নহে; এক দিবস মাত্র শিক্ষা করিলেই শিক্ষাটী কৃষকেরা পরে নিজে নিজেই কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে। পূর্ব্ব কথিত ভাবে, যখন কোন গাছ বা গৃহ-পালিত জন্তু জীবিতাণুঘটিত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ অনুমিত হইবে, তখন,সদ্যঃমৃত গাছ বা জন্তুটীর যে অবয়বটী বিশেষ অস্বাভাবিক মনে হইবে, সেই অবয়ব হইতে কিঞ্চিৎ রস লইয়া কতকগুলি ছোট পাতলা কাচ খণ্ডের উপর ঐ রস মাখাইয়া দিতে হইবে। রস যদি ঘন হয়, অথবা রোগ-গ্রস্ত অবয়বটী যদি শুষ্ক হয়, তবে ঐ পাত্‌লা কাচগুলির উপর পরিষ্কার জল এক এক ফোঁটা দিয়া, কাচগুলি রোগগ্রস্ত অবয়বের উপর ঘসিয়া লইলে ঐ গুলিতে পাত্‌লা ভাবে রস লাগিয়া যাইবে। জন্তু মরিলে তাহার কোন্ অবয়ব বা যন্ত্রটী বিশেষ অস্বা-

ভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা স্থির করিবার জন্য ডোমের দ্বারা জন্তুটীকে কাটাইতে হইতে পারে। শিক্ষিত কৃষকদিগের আবশ্যক মতে এটুকু উদ্যোক করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। সূক্ষ্ম কাচগুলির (Cover-glass) উপর পাত্‌লাভাবে রস লইয়া তৎক্ষণাৎ স্পিরিট ল্যাম্পের শিখার উপর দ্রুত অঙ্গুলি চালন দ্বারা রসটী শুকাইয়া লইতে হয়। অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী দ্বারা কাচগুলি একে একে ধারণ করিয়া স্পিরিট-দীপের শিথার উপর কাচের যে দিকে রস দেওয়া হয় নাই, সেই দিকটী রাখিয়া দ্রুত অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে থাকিলে কাচও ফাটিয়া যাইবে না এবং রসও শুকাইয়া যাইবে। পরে কাচের শুষ্ক রসের উপর দুই তিন ফোঁটা করিয়া, জেন্‌সান্ ভাইওলেট্ (Gentian violet), ফিউশিন্ রেড্ (Fuchsin red), অথবা অন্য কোন পাথরিয়া কয়লা-জাত রঙ্গের আরক ঢালিয়া দিতে হয়। কোন কাচখানির উপর পাঁচ মিনিট কাল, কোন কাচখানির উপর দশ মিনিট কাল, কোন কাচখানির উপর অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল, এবং কোন কাচখানির উপর ১০।১২ ঘণ্টা কাল, রং রাখিয়া, পরে পরিষ্কার জল আল্গা ভাবে কাচগুলির উপর পাত করিয়া রং ধুইয়া ফেলিতে হয়। তৎপরে দুই তিন ফোঁটা স্পিরিট কাচগুলির উপর ফেলিয়া আবার জল দ্বারা ভাল করিয়া রং ধৌত করিয়া ফেলিতে হয়। তখন কাচগুলিকে পূর্ব্বের ন্যায় বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী দ্বারা ধারণ করিয়া, কাচের যে দিকে রস দেওয়া হয় নাই, অর্থাৎ যেদিক এতক্ষণ নিম্নদিকে আবৃত অবস্থায় ছিল, সেই দিকটী পরিষ্কার কাপড় দ্বারা ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া, আবার স্পিরিট ল্যাম্পের শিখার উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা রঞ্জিত ও শুষ্ক রসযুক্ত পৃষ্ঠাটী শুকাইয়া লইতে হয়। পরক্ষণেই এক বা দুই খণ্ড অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের মোটা পরিষ্কার কাচের উপর (slides) পাত্‌লা কাচগুলি এক এক ফোঁটা ক্যানেডা বল্‌সাম্ সোলুসান্ (Solution of Canada Balsam) নামক এক প্রকার স্বচ্ছ আঠা দ্বারা যুড়িয়া দিতে হয়। সূক্ষ্ম কাচ গুলির যে পৃষ্ঠে রস দেওয়া হইয়াছিল, সেই পৃষ্ঠ যেন আঠার সহিত সংলগ্ন হইয়া মোটা কাচের উপর পতিত হয়। এক দিবস রাখিয়া দিলেই আঠাটী শুকাইয়া যায়। আঠা শুকাইয়া গেলে কৃষিতত্ত্ববিৎ কোন পণ্ডিতের নিকট রোগ নির্ণয়ের জন্য ঐ কাচগুলি সাবধানে তুলা ও কাগজ দ্বারা মুড়িয়া ছোট একটী বাক্‌সে করিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া দিতে হয়। রোগের বাহ্যিক লক্ষণ সকলও ঐ সঙ্গে লিখিয়া পাঠান কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত প্রকরণে শুষ্ক রস, রঞ্জিত ও ধৌত করিলে, কেবল জীবিতাণু গুলিতে রং থাকিয়া যায়। কোন কোন জীবিতাণুতে রং ধরিতে কেবল ৪।৫ মিনিট্ মাত্র লাগে, আবার কোন কোন অণুতে রং ধরিতে ১০।১২ ঘণ্টা লাগে। সূক্ষ্ম কাচগুলির কোন্‌টীর উপর কতক্ষণ রং রাখা হইয়াছে, ইহা কাচগুলির পার্শ্বে পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা ঐ কাচগুলি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিবেন, রোগটী কোন্ জাতীয় এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে রোগের নাশ বা উপশম হইতে পারে। কৃষক বালকদিগের উপর উক্ত প্রকরণটী শিখাইয়া দিলে দেশের কৃষি উন্নতির একটী প্রধান সোপান স্থাপিত হয়। প্রকরণটী

শিক্ষা করিলে, তাহাদিগের যখন পালে পালে গোরু বা রাশি রাশি শস্য নষ্ট হইবে, তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাহারা ৪।৫ টাকা খরচ করিয়া উপরি উক্ত কয়েকটী সামগ্রী ঘরে আনিয়া রাখিয়া, পুনর্ব্বার ঐ রোগের অথবা জীবিতাণু-ঘটিত অন্য কোন রোগের আবির্ভাব হইলে, তাহারা রোগীর তত্ত্ব জানিবার জন্য উৎসুক হইবে ও বিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা করিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবে। এরূপ উদ্যোগ দ্বারা কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মৌলিক গবেষণারও সহায়তা হইবে। সকল প্রকার জীবিতাণু-ঘটিত রোগই যে আবিষ্কৃত অথবা বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ নহে। কাচগুলি পরীক্ষা করিয়া ও শিক্ষিত কৃষকদের রোগ সম্বন্ধে বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কৃষিতত্ত্ববিৎ যদি দেখেন যে, রোগটী আদৌ এ পর্য্যন্ত জানা নাই, তবে তিনি তখনই মৌলিক গবেষণার অনুষ্ঠান করিতে বা অন্য কোন অণুতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত (Bacteriologist) দ্বারা করাইয়া লইতে পারেন।

কৃষিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের উপদেশ আসিতে আসিতে হয়ত অনেক সময় ক্ষেত্রের ঔষধি অথবা গোষ্ঠের গোরু মরিয়া যাইবে। এরূপ স্থলে ভবিষ্যতে ঐ রোগ হইলে উপদিষ্ট উপায় অবলম্বন ভিন্ন অন্য কোন উপকার হইবে না। আবার শিক্ষিত কৃষক মাত্রেই যে এতদূর উদ্যোগ করিয়া কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের উপদেশ লইতে অগ্রসর হইবে, তাহারও আশা করা যায় না। একারণ, সংক্রামক রোগগুলি নিবারণ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রকরণও কৃষকদিগকে শিখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তৃতীয় অধ্যায়ে এই সকল প্রকরণ বর্ণনা করা যাইবে।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা উপন্যাসের বিশেষত্ব।

নভেল বা উপন্যাস ঊনবিংশ শতাব্দীর সম্পত্তি। এ শতাব্দীতে অনেক নূতন দ্রব্যের আমদানি হইয়াছে। শিক্ষিত লোকের কাছে এ শতাব্দীর বড় আদর। কেন না, তাহাদের বিশ্বাস, এ শতাব্দীতে রেলওয়ে টেলিগ্রাফের সৃষ্টির সহিত, সেইরূপ দ্রুত গতিতে, সমগ্র মানবজাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

উন্নতি হউক আর না হউক, একটা যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই শতাব্দী মধ্যে মানবজীবনের গতি অন্য পথে ফিরিয়াছে। এ শতাব্দীর মূল মন্ত্র—স্বার্থ; কার্য্য—struggle

* আমার কোন সাহিত্য-সেবক বন্ধুকে একখানি "প্রতিভা পূজা" উপহার দিয়াছিলাম। তিনি ইংরাজী নভেল পাঠক, বঙ্কিম বাবুর নভেলকে তিনি ভাল বলিতে চান না। তিনি বঙ্কিমবাবুর প্রতিভা স্বীকার করেন না, তিনি আমার প্রতিভা-পূজায় অসন্তুষ্ট হইয়া এক পত্র দিয়াছিলেন। সেই পত্রের যে উত্তর লিখিয়াছিলাম, তাহাই অবলম্বনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। নভেল-লেখক স্বরূপ বঙ্কিমবাবুর স্থান কোথায়, ইহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। যাঁহারা ইংরাজী নভেলকেই আদর্শ করিয়া লন, তাঁহাদিগের নিকট বঙ্কিমবাবুর নভেল তত উচ্চশ্রেণীর বলিয়া অনুমিত হয় না। তাহা না হইলেও, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস বিচারের স্বতন্ত্র মাপকাঠী আছে। তাহা না পাইলে বঙ্কিমবাবুর নভেল বুঝিতে পারা যায় না। নিম্নের প্রবন্ধে তাহার যথাসাধ্য আভাস দেওয়া হইয়াছে।

for existence অথবা trampling the weak। ইহার একমাত্র যোগ, অর্থ সংগ্রহ,—একমাত্র সাধনা, আত্মসুখ বৃদ্ধি। এ শতাব্দীতে অভিধান হইতে 'পরকাল' কথা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে—'ইহকাল' সার হইয়াছে। উৎকট সুখ, আমোদ বা ভোগের দিকে একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। এ শতাব্দীতে নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞান কেবল মানুষের বিনাশের জন্য নানারূপ নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়াছে। দর্শন—ঈশ্বর ও পরকাল উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। ইতিহাস—রক্তাক্ষরে সাধারণ-তন্ত্র ঘোষণা করিতেছে।

সুতরাং সাহিত্যও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। এই সুখভোগ-প্রবৃত্তি সাহিত্য-কেও নূতন করিয়া সংগঠিত করিয়াছে। পূর্ব্বে সাহিত্য আমাদের শিক্ষার উপকরণ যোগাইত। আর আমাদের জ্ঞানবৃত্তি, চিত্তবৃদ্ধি ও আর সকল বৃত্তির উপযুক্ত অনু-শীলন জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন হইত। এখন বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ জন্য সাহিত্যের উপরও লোকের দৃষ্টি পড়িল—বিলাস বাসনা মানুষকে চারিদিক হইতে এমনি অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। একটু অবসর পাইলে মানুষ কেবল আমোদ খুঁজিতে লাগিল। থিয়েটারে যাইতে হইবে, আমোদের জন্য—সেখানে ফার্স চাই, রং তামাসা চাই—হাল্‌কা 'গান চাই', আমোদ চাই—উচ্চ শ্রেণীর নাটক অভিনয় থিয়েটরে দেখা হইবে না। সাহিত্য সেবা করিতে হইবে, সেও আমোদের জন্য—আরামের জন্য।

উপন্যাসই সেই আরামের জিনিষ। কেন, তাহা বলিতেছি। ছেলেরা ঠাকুরাণী দিদির কাছে অদ্ভুত গল্প শুনিতে ভালবাসে। একটু বড় হইলে ঠাকুরদাদার কাছে বীরত্ব কাহিনী শুনিয়া সুখভোগ করে। আর একটু বয়স পাকিলে পাড়ায় দুই পাঁচ জনে মিলিয়া পাড়ার লোকের কার্য্য সমালোচনা বা কুৎসা করিয়া সুখ পায়। এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের অনেক নিষ্কর্ম্মা লোক ইহাই আমোদের পরাকাষ্ঠা মনে করে। কিন্তু বিলাতের লোক তত মিশুক নহে। পাঁচ জনে মিলিয়া এরূপ গালগল্প করা বা পাড়াচর্চ্চা করা তাহাদের অভ্যাস নাই, বা অবসর নাই, কি প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু গল্প শুনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহাদের কোথায় যাইবে? এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ জন্যই প্রথমতঃ, বোধ হয়, ইউরোপে নভেলের সৃষ্টি হইয়াছে। আর সেই জন্যই, বোধ হয়, সেখানে নভেলের এত আদর। যে সামান্য শ্রমজীবী দিনান্তে উৎকট পরিশ্রমের পর একটু অবসর পায়, সেও যদি একটু পড়িতে পারে, তবে সস্তায় ছাপা নভেল কিনিয়া পড়ে। অনেকটা সেই কারণেই, বোধ হয়, আমা-দের দেশেও দোকানি পসারির কাছে বটতলার রামায়ণ ও মহাভারতের এত আদর। [illegible]ন হউক, কেবল যে গল্পের খাতিরে অধি[illegible] বিলাতের লোক নভেল পড়ে—তাহা বেশ বুঝা যায়, শিক্ষার জন্য বড় কেহ নভেল পড়ে না। তাহা হইলে বিলাতে রেণল্ডের নভেলের, রেলওয়ে নভেলের, সেনসেসনল নভেলের বা ফ্যাসনেবল নভেলের, কি সেই রূপ শুধু গল্প-সম্বল অন্য অসার নভেলের এত আদর ও কাট্‌তি হইত না। আর তাহা হইলে বিলাতে পুলিস রিপোর্ট লোকে এত আগ্রহের সহিত পাঠ করিত না।

আমাদের দেশেও বিলাতী সভ্যতার

অনেকগুলি উপকরণের আমদানি হইয়াছে। সাহিত্যের মধ্যেও বিলাসের উপকরণ প্রবেশ করিয়াছে। অনেকটা সেই কারণে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যেও অনেক নভেল বা উপন্যাস দেখিতে পাই। 'হরিদাসের গুপ্তকথা' শ্রেণীর অনেক নভেল যে সেই কারণে বাঙ্গালা ভাষায় স্থান পাইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক, প্রথম অবস্থার নভেল যেরূপই থাকুক, দ্বিতীয় স্তরে উহার অনেক অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমরা সেই দ্বিতীয় স্তরের কথাই বলিব। গল্প আবাল বৃদ্ধ সকলেরই মনোরঞ্জন করে, সুতরাং এই গল্প উপলক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় স্তরে অনেক প্রতিভাশালী লোক সাধারণকে নৈতিক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন—ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সহজ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, সমাজতত্ত্বের কূট বিষয় সাধারণের বুদ্ধিগম্য করিতে চেষ্টা করিলেন—মানুষের হৃদয় বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন, বাহ্যজগতের সহিত মানব মনের সম্বন্ধ দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতে লাগিলেন। কেহ বা উপন্যাসকে আপনার কল্পনার উদ্ভাবনী শক্তির শিল্পচাতুর্য্যের বা উৎকৃষ্ট কবিত্ব-বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র করিয়া লইলেন। অন্যদিকে অনেক হৃদয়বান লোক উপন্যাস-রূপ উপকরণ দ্বারা সাধারণকে মাস্‌কে (mass) উন্নত করিতে চেষ্টা করিলেন। এখন অনেক উপন্যাস হইয়াছে, যাহার গল্পাংশ নাম মাত্র বা উপলক্ষ্য মাত্র, কিন্তু যাহাতে ভাবিবার, বুঝিবার বা চিনিবার জিনিষ অনেক আছে। পূর্ব্বে একবার এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সুতরাং আজ তাহার উল্লেখ করিব না।

কেবল একজনের যত্নে, চেষ্টায় ও প্রতিভাবলে বাঙ্গালা নভেলও এই দ্বিতীয় স্তরে আরোহণ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে—বাঙ্গালা নভেলের অনেক বিশেষত্বও জন্মিয়াছে। সে বিশেষত্ব বাঙ্গালীর অথবা হিন্দুর জাতীয় জীবনের বা জাতীয় সংস্কারের পরিচায়ক। আমরা আজ সেই কথাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কিন্তু এ কথা বুঝিবার আগে, পূর্ব্বকার কথা বুঝিতে হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও ইউরোপে উপন্যাস ছিল, আর আধুনিক বাঙ্গালা উপন্যাসের আগেও এ দেশে উপন্যাস ছিল। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর উপকরণে কিছু বিশেষত্ব আছে। ওদেশের ইনিয়ত, ইলিয়ড্, অডেসির সহিত আমাদের দেশের মহাভারত, রামায়ণ বা পুরাণের বিশেষত্ব আছে। ওদেশের বাকেসিওর ডিকামিরণ ডনকুইকসট্ প্রভৃতির সহিত বা আরব্য কি পারস্য উপন্যাসের সহিত এ দেশের কাদম্বরী বা দশকুমার-চরিতের পার্থক্য আছে। সে দেশের ঈষপের গল্পের সহিত আমাদের দেশের পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ বুঝিলে অমরা আধুনিক দেশী ও বিদেশী নভেলের পার্থক্য বুঝিতে পারিব। কেন না, যে কারণে পূর্ব্বে উক্তরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছিল, সে কারণ এখনও অনেকটা বিদ্যমান আছে।

এই বিশেষত্বের প্রথম কারণ, হিন্দুর ধর্ম্মভাব। এই ধর্ম্মভাব কিরূপ হিন্দুর হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া আছে—ইহা কিরূপে হিন্দুর প্রত্যেক কার্য্য নিয়মিত করিতেছে, তাহা আর হিন্দুকে বুঝাইতে হইবে না। এই জন্য, উপন্যাস লিখিতে গিয়াও হিন্দু এই ধর্ম্ম

for existence অথবা trampling the weak। ইহার একমাত্র যোগ, অর্থ সংগ্রহ,—একমাত্র সাধনা, আত্মসুখ বৃদ্ধি। এ শতাব্দীতে অভিধান হইতে 'পরকাল' কথা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে—'ইহকাল' সার হইয়াছে। উৎকট সুখ, আমোদ বা ভোগের দিকে একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। এ শতাব্দীতে নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞান কেবল মানুষের বিনাশের জন্য নানারূপ নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়াছে। দর্শন—ঈশ্বর ও পরকাল উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। ইতিহাস—রক্তাক্ষরে সাধারণ-তন্ত্র ঘোষণা করিতেছে।

সুতরাং সাহিত্যও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। এই সুখভোগ-প্রবৃত্তি সাহিত্য-কেও নূতন করিয়া সংগঠিত করিয়াছে। পূর্ব্বে সাহিত্য আমাদের শিক্ষার উপকরণ যোগাইত। আর আমাদের জ্ঞানবৃত্তি, চিত্তবৃদ্ধি ও আর সকল বৃত্তির উপযুক্ত অনু-শীলন জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন হইত। এখন বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ জন্য সাহিত্যের উপরও লোকের দৃষ্টি পড়িল—বিলাস বাসনা মানুষকে চারিদিক হইতে এমনি অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। একটু অবসর পাইলে মানুষ কেবল আমোদ খুঁজিতে লাগিল। থিয়েটারে যাইতে হইবে, আমোদের জন্য—সেখানে ফার্স চাই, রং তামাসা চাই—হাল্‌কা 'গান চাই', আমোদ চাই—উচ্চ শ্রেণীর নাটক অভিনয় থিয়েটরে দেখা হইবে না। সাহিত্য সেবা করিতে হইবে, সেও আমোদের জন্য—আরামের জন্য।

উপন্যাসই সেই আরামের জিনিষ। কেন, তাহা বলিতেছি। ছেলেরা ঠাকুরাণী দিদির কাছে অদ্ভুত গল্প শুনিতে ভালবাসে। একটু বড় হইলে ঠাকুরদাদার কাছে বীরত্ব কাহিনী শুনিয়া সুখভোগ করে। আর একটু বয়স পাকিলে পাড়ায় দুই পাঁচ জনে মিলিয়া পাড়ার লোকের কার্য্য সমালোচনা বা কুৎসা করিয়া সুখ পায়। এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের অনেক নিষ্কর্ম্মা লোক ইহাই আমোদের পরাকাষ্ঠা মনে করে। কিন্তু বিলাতের লোক তত নিশুক নহে। পাঁচ জনে মিলিয়া এরূপ গালগল্প করা বা পাড়াচর্চ্চা করা তাহাদের অভ্যাস নাই, বা অবসর নাই, কি প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু গল্প শুনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহাদের কোথায় যাইবে? এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ জন্যই প্রথমতঃ, বোধ হয়, ইউরোপে নভেলের সৃষ্টি হইয়াছে। আর সেই জন্যই, বোধ হয়, সেখানে নভেলের এত আদর। যে সামান্য শ্রমজীবী দিনান্তে উৎকট পরিশ্রমের পর একটু অবসর পায়, সেও যদি একটু পড়িতে পারে, তবে সস্তার ছাপা নভেল কিনিয়া পড়ে। অনেকটা সেই কারণেই, বোধ হয়, আমাদের দেশেও দোকানি পসারির কাছে বটতলার রামায়ণ ও মহাভারতের এত আদর। যাহা হউক, কেবল যে গল্পের খাতিরে অধিকাংশ বিলাতের লোক নভেল পড়ে—তাহা বেশ বুঝা যায়, শিক্ষার জন্য বড় কেহ নভেল পড়ে না। তাহা হইলে বিলাতে রেণল্ডের নভেলের, রেলওয়ে নভেলের, সেনসেসনল্ নভেলের বা ফ্যাসনেবল নভেলের, কি সেইরূপ শুধু গল্প-সম্বল অন্য অসার নভেলের এত আদর ও কাট্‌তি হইত না। আর তাহা হইলে বিলাতে পুলিস রিপোর্ট লোকে এত আগ্রহের সহিত পাঠ করিত না।

আমাদের দেশেও বিলাতী সভ্যতার

অনেকগুলি উপকরণের আমদানি হইয়াছে। সাহিত্যের মধ্যেও বিলাসের উপকরণ প্রবেশ করিয়াছে। অনেকটা সেই কারণে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যেও অনেক নভেল বা উপন্যাস দেখিতে পাই। 'হরিদাসের গুপ্তকথা' শ্রেণীর অনেক নভেল যে সেই কারণে বাঙ্গালা ভাষায় স্থান পাইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক, প্রথম অবস্থার নভেল যেরূপই থাকুক, দ্বিতীয় স্তরে উহার অনেক অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমরা সেই দ্বিতীয় স্তরের কথাই বলিব। গল্প আবাল বৃদ্ধ সকলেরই মনোরঞ্জন করে, সুতরাং এই গল্প উপলক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় স্তরে অনেক প্রতিভাশালী লোক সাধারণকে নৈতিক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন—ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সহজ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, সমাজতত্ত্বের কূট বিষয় সাধারণের বুদ্ধিগম্য করিতে চেষ্টা করিলেন—মানুষের হৃদয় বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন, বাহ্যজগতের সহিত মানব মনের সম্বন্ধ দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতে লাগিলেন। কেহ বা উপন্যাসকে আপনার কল্পনার উদ্ভাবনী শক্তির শিল্পচাতুর্য্যের বা উৎকৃষ্ট কবিত্ব-বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র করিয়া লইলেন। অন্যদিকে অনেক হৃদয়বান লোক উপন্যাসরূপ উপকরণ দ্বারা সাধারণকে মাস্‌কে (mass) উন্নত করিতে চেষ্টা করিলেন। এখন অনেক উপন্যাস হইয়াছে, যাহার গল্পাংশ নাম মাত্র বা উপলক্ষ্য মাত্র, কিন্তু যাহাতে ভাবিবার, বুঝিবার বা চিনিবার জিনিষ অনেক আছে। পূর্ব্বে একবার এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সুতরাং আজ তাহার উল্লেখ করিব না।

কেবল একজনের যত্নে, চেষ্টায় ও প্রতিভাবলে বাঙ্গালা নভেলও এই দ্বিতীয় স্তরে আরোহণ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে—বাঙ্গালা নভেলের অনেক বিশেষত্বও জন্মিয়াছে। সে বিশেষত্ব বাঙ্গালীর অথবা হিন্দুর জাতীয় জীবনের বা জাতীয় সংস্কারের পরিচায়ক। আমরা আজ সেই কথাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কিন্তু এ কথা বুঝিবার আগে, পূর্ব্বকার কথা বুঝিতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও ইউরোপে উপন্যাস ছিল, আর আধুনিক বাঙ্গালা উপন্যাসের আগেও এ দেশে উপন্যাস ছিল। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর উপকরণে কিছু বিশেষত্ব আছে। ওদেশের ইনিয়ত, ইলিয়ড্, অডেসির সহিত আমাদের দেশের মহাভারত, রামায়ণ বা পুরাণের বিশেষত্ব আছে। ওদেশের থাকেসিওর ডিকামিরণ ডনকুইকসট্ প্রভৃতির সহিত বা আরব্য কি পারস্য উপন্যাসের সহিত এ দেশের কাদম্বরী বা দশকুমার-চরিতের পার্থক্য আছে। সে দেশের ঈষপের গল্পের সহিত আমাদের দেশের পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ বুঝিলে অমরা আধুনিক দেশী ও বিদেশী নভেলের পার্থক্য বুঝিতে পারিব। কেন না, যে কারণে পূর্ব্বে উক্তরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছিল, সে কারণ এখনও অনেকটা বিদ্যমান আছে।

এই বিশেষত্বের প্রথম কারণ, হিন্দুর ধর্ম্মভাব। এই ধর্ম্মভাব কিরূপ হিন্দুর হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া আছে—ইহা কিরূপে হিন্দুর প্রত্যেক কার্য্য নিয়মিত করিতেছে, তাহা আর হিন্দুকে বুঝাইতে হইবে না। এই জন্য, উপন্যাস লিখিতে গিয়াও হিন্দু এই ধর্ম্ম

ভাব ত্যাগ করিতে পারে নাই। হিন্দুর কাব্য, ইতিহাস প্রায় সকলই ধর্ম্মগ্রন্থ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুর নাটক নভেলেও এই ধর্ম্মভার প্রবেশ করিয়াছে। আগেকার কথা ছাড়িয়া দাও, এই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-শিক্ষা-প্রাপ্ত দেশে এখন থিয়েটারে ধর্ম্মগ্রন্থ অভিনীত হইতেছে, উপন্যাসে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝান হইতেছে, কাব্যে (কুরুক্ষেত্র প্রভৃতিতে) ধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে।

আরও এক কথা আছে। পিতৃ মাতৃ ভক্তি, সন্তান বৎসলতা, দাম্পত্য-প্রণয়, দেশ-ভক্তি, প্রভৃতি আমাদের যে সকল মনোবৃত্তি আছে ঈশ্বরে ভক্তি অথবা সাধারণ ধর্ম্ম প্রবৃত্তিও সেইরূপ আমাদের মনের একটা অতি প্রধান বৃত্তি। এই ভক্তি বৃত্তি বা ধর্ম্মভাব কত রূপে মানুষের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইতে পারে—কিরূপে তাহা মানুষের সমস্ত জীবন রঞ্জিত করিতে পারে, কিরূপে মানুষের অন্য সমস্ত বৃত্তির উপর একাধিপত্য করিতে পারে, তাহা জগতের মধ্যে কেবল হিন্দু কবিই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, বশিষ্ঠ, প্রভৃতির চরিত্র-সৃষ্টি কেবল একমাত্র হিন্দু কবিই করিতে পারিয়াছেন। আজিও হিন্দু-কবি ধর্ম্ম জীবন চিত্রিত করিতে চেষ্টা করেন। ধর্ম্মবৃত্তির স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও প্রভাব দেখাইতে যত্ন করেন। তাই বিল্বমঙ্গলে, দেবীচৌধুরাণীতে বা চন্দ্রশেখরে কবি ধর্ম্ম-চরিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইউরোপে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বুঝি এত স্ফূর্ত্তি হয় নাই। সেখানে এত নভেল, নাটক ও কাব্য সৃষ্টি হইলেও, একখানা নভেল কি নাটকে এই ধর্ম্ম বৃত্তির গতি ও কার্য্য দেখাইতে চেষ্টা করা হয় নাই। হুগো, ব্যালসাক্ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখকগণ মানুষের এক একটা বৃত্তি লইয়া, অন্য সমুদায় বৃত্তিগুলিকে তাহাতে ডুবাইয়া, শুধু একটী বৃত্তিকে অত্যন্ত প্রবলা করিয়া, কৌশলে তাহার গতি ও পরিণতি এবং মনুষ্য হৃদয়ের উপর তাহার আধিপত্য বুঝাইয়াছেন। যেন এই বৃত্তি-গুলিকে একে একে লইয়া, তাহাদের রক্ত মাংসের শরীর দিয়া মানুষ সাজাইয়া তাহার কার্য্যপ্রণালী বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু কেহই ধর্ম্ম বৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়া দেখান নাই। এই ধর্ম্ম বৃত্তির বিশ্লেষণ হিন্দুর নিজের সম্পত্তি, আর ইহাই বিলাতী ও দেশী উপন্যাসের পার্থক্যের প্রধান কারণ।

এই পার্থক্যের দ্বিতীয় কারণ—হিন্দুর দর্শন। হিন্দু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকার এই দুইটী শক্তি মানুষকে নিয়মিত করে। ইউরোপীয় দার্শনিকগণ Free-will ও Necessity লইয়া বহুদিন ধরিয়া তর্ক বিতর্ক করিয়া, শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, Necessity ই সব; অর্থাৎ মানুষ ঘটনাচক্রের দাস—অবস্থার ক্রীড়া পুত্তলি, তাহার স্বাধীন ইচ্ছা নাই—কেন না, সে ইচ্ছাও এই অবস্থার দ্বারা নিয়মিত। সুতরাং হিন্দুর অদৃষ্টবাদ ও ইউরোপের অদৃষ্টবাদে অনেক প্রভেদ। আর এই প্রভেদ জন্য দেশী ও বিলাতী চরিত্র সৃষ্টিতেও প্রভেদ জন্মিয়াছে। বিলাতী দর্শন মতে মানুষ যেন কাদার ডেলা, কি মোমের বাতি, ঘটনার পর ঘটনা আসিয়া তাহাকে বাছিয়া ছাঁকিয়া একরূপ করিয়া গড়িয়া লয়। বিলাতী দর্শনকার মানুষের পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন না। মাতৃগর্ভে তাহার প্রথম জন্ম হয়—এবং সে কেবল পিতামাতার নিকট কিছু সংস্কার লইয়া এই

সংসারে প্রথম প্রবেশ করে। কাজেই সংসার তাহাকে গড়িয়া লয়।

হিন্দুর মতে মানুষ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার-আবরণে আবৃত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সে আবরণ বড় কঠিন। শম্বুকের বাহিরের খোলার মত কঠিন। সংসারের ঘটনার পর ঘটনার আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া যায় না, তাহার আকার বড় পরিবর্ত্তন হয় না। যদি ভাঙ্গে, তবে বোধ হয় তাহার জীবত্ব পর্য্যন্ত লোপ হয়। হিন্দুর মতে মানুষ অদৃষ্টরূপ হল (Hall) মার্কা রূপা। তাহাতে বড় খাদ চড়ে না।

এই দুই দার্শনিক মতের পার্থক্য হইতে দেশী ও বিলাতী উপন্যাসে ও কাব্যে চরিত্র সৃষ্টির প্রভেদ হইয়াছে। বিলাতী উপন্যাস-লেখক ঘটনার পরে ঘটনা আনিয়া তাহার দ্বারা মনুষ্য চরিত্র গড়িয়া লন—বা চরিত্রের কার্য্য প্রণালী দেখাইয়া দেন। মানুষের চারিদিকের অবস্থাগুলি বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার দ্বারা চরিত্র সৃষ্টি করেন।*

হিন্দু-উপন্যাস-লেখককে সেরূপে মনুষ্য চরিত্র বুঝাইতে হয় না। হিন্দু-উপন্যাস-লেখক দেখাইতে চান যে, বাহ্য ঘটনায় বা অবস্থায় মানুষকে বড় পরিবর্ত্তিত করে না। সে অবস্থাগুলি অর্থাৎ মানুষের চারিদিকের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অবস্থাগুলি তাহাকে ক্লেশ দিতে পারে, কিন্তু অভিভূত করিতে পারে না—ভাঙ্গিতে পারে কিন্তু নোয়াইতে পারে না।

এই জন্যই দেখা যায়, হিন্দু কবি প্রায়ই আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করেন। পূর্ব্বকার রামায়ণ, মহাভারত হইতে আধুনিক উপন্যাস পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই হিন্দু কবির চেষ্টা, আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি। অদৃষ্ট ও পুরুষকারের সহিত দ্বন্দ্বে, পুরুষকারের জয় ঘোষণা করাই হিন্দু কবির প্রধান উদ্দেশ্য। আদর্শ চরিত্রে পুরুষকারের প্রাধান্য দেখান হয়, সংসারের বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কারের সহিত সংগ্রাম করিয়া, মানুষ আপনার মনুষ্যত্ব অক্ষুণ্ন রাখিতেছে, ইহাই দেখান হয়। এই আদর্শ চরিত্র মানুষের শিক্ষার স্থান। এই

"উচ্চতর আদর্শ সৃজন,
জীবনের আঁধার সাগরে
নাবিকের আলো-নিদর্শন।"

কিন্তু ইউরোপীয় কবিগণ কাব্যে বা উপন্যাসে প্রায়ই এরূপ আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা করেন নাই। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, অর্জ্জুন প্রভৃতির ন্যায় আদর্শ চরিত্র কোন পুরাতন ইউরোপীয় কাব্যে চিত্রিত হয় নাই। পূর্ব্বকার কথা যাউক, আমাদের দেশের চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, সত্যানন্দ, সূর্য্যমুখী, লবঙ্গলতা, প্রফুল্ল ও শ্রীর মতও আদর্শ চরিত্র-চিত্র বিলাতী নভেলে বড় বেশী পাওয়া যায় না।*

* গত মে মসের নাইন্‌টিনথ্‌ সেঞ্চুরিতে (P 719) নিম্নোদ্ধৃত কয়টী কথা পাইলাম। বিলাতী নভেল যে কিরূপ উপকরণে বা কি ধাতুতে গঠিত—বিলাতী পণ্ডিত তাহা এক্ষণে কতকটা বুঝিতে পারিতেছেন, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।ঃ—

"Literature is following as it always must, the metaphysics, or antimetaphysics which prevail in its time; and we observe accordingly a marvellous decline in the poetical value of the writings now held up to our admiration. A crude and violent Realism, falsely so-called, usurps the place of honor, while trifling personal gossip, fills our journals and is advertised as their most notable attraction at every railway bookstall."

* পণ্ডিত চূড়ামণি রাস্কিন তাঁহার Queen's Gardens শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, বিলাতী কবি সেক্সপিয়র বা স্কট্‌ কেহই বড় আদর্শ নর-চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই, কয়টী বিলাতী আদর্শ নারী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। অন্য কবির ত কথাই নাই।

এই আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা দেওয়া, মানুষকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দেওয়া। হিন্দুর আজিও শিক্ষার প্রবৃত্তি আছে, তাই এ দেশে আদর্শ চরিত্র চিত্র চলিতে পারে। কিন্তু ইউরোপের লোক কাব্য ও উপন্যাসে শিক্ষা বড় চাহে না। তাহারা আমোদ চায়, চিত্ত রঞ্জন চায়। সেই জন্য ইউরোপে আদর্শ চরিত্র বড় চিত্রিত হয় না।

পূর্ব্বোক্ত হিন্দুর দর্শনের বিশেষত্ব হইতে উপন্যাসে আর একরূপ বিশেষত্ব হইয়াছে। হিন্দু কার্য্যানুসন্ধান করেন—ইউরোপীয় দার্শনিক কারণানুসন্ধান করেন। হিন্দুর চিন্তাপ্রণালী *á priori*, ইউরোপীয় চিন্তা-প্রণালী *a posteriori*। হিন্দু সেই জন্য উপন্যাস ও কাব্যে চরিত্র সৃষ্টি করেন—ইউরোপীয় কবি দার্শনিক চরিত্র বিশ্লেষণ করেন। মানুষ বিশেষে অবস্থা ও অনুবর্ত্তী ঘটনার সহিত কিরূপ সংগ্রাম করে, চরিত্র সৃষ্টি করিয়া হিন্দু কবি তাহাই দেখান। বিলাতী কবি, ঘটনার দ্বারা—অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে চরিত্র কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, গঠিত হয়, আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হয়, তাহাই দেখান। হিন্দুর চরিত্র চিত্র synthetic। বিলাতী কবির চরিত্র চিত্র analytic। একজন প্রাণবিশিষ্ট জীবের বিশেষত্ব দেখান; আর একজন শবচ্ছেদ করিয়া ভিতরের শিরা, ধমনি বা হৃদয়ের অবস্থান বা বিশেষত্ব বুঝাইয়া দেন। একজন স্থপতি—বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দর্শককে মোহিত করেন; আর একজন, পুরাতন প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া, তাহার কোন্ স্থান জীর্ণ হইয়াছে, দেখাইয়া দেন বা ইট কাটের পরিমাণ করেন। একজন জীবন্ত মানুষকে দেখান—সমাজতত্ত্ব বুঝান; আর একজন মানুষ মারিয়া তাহার শবচ্ছেদ করিতে বসেন, সমাজ ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরের ক্ষত বাহির করেন। একজন গড়েন, আর একজন ভাঙ্গেন। এই কারণে দেশী উপন্যাসের আর এক বিশেষত্ব হইয়াছে। ইউরোপীয় কবি চরিত্র বুঝাইবার জন্য, বাহ্য জগতের সহিত মানব মনের সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য বাহ্য ঘটনাগুলিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দেন। সেই ঘটনার সহিত মানব মনের ঘাত প্রতিঘাত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অঙ্কিত করেন। রামা মুদী বা পুঁটেতেলী যে কোন লোকের হউক, চরিত্র লইয়া তাহার বিশ্লেষণ করিতে বসেন। সে কোন দিন কি দিয়া ভাত খাইল, কোন্ মুখে বসিয়া কাহার সহিত কিরূপ কথা কহিল, খুঁটী নাটী সমস্তই বিলাতী কবি অঙ্কিত করেন। বিলাতী পাঠকেরও ধন্য সহিষ্ণুতা, ধন্য পরচর্চ্চা-প্রবৃত্তি যে সেই সব পড়িয়া আমোদ পান।

হিন্দু কবি কখনও এত খুঁটী নাটী চিত্রিত করিতে চান না। আর সেরূপ খুঁটী নাটী চিত্রিত করার তাঁহার প্রয়োজনও হয় না। হিন্দু কবি অএলপেণ্টিং করেন—বিলাতী কবি ওয়াটার কলার পেণ্টিং করেন। কাছে হইতে অএলপেণ্টিং বড় কদাকার দেখায়। বোধ হয় যেন কতকগুলা রং যথেচ্ছা লাগান হইয়াছে—যেন রং ধেব্‌ড়ে আছে, প্রায় যেন কালীঘাটের পট। তাহাতে একটা সূক্ষ্ম লাইন নাই—সব মোটা। কিন্তু সেই চিত্রই আবার দূরে উপযুক্ত স্থানে ধরিলে অমূল্য বলিয়া মনে হইবে—কবিত্বের, সৃষ্টি কৌশলের চরম বিকাশ বলিয়া বোধ হইবে। ওয়াটার কলারের ছবি হঠাৎ চটক্‌দরে বটে

তাহাতে সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম লাইনগুলি বেশ ফুটান থাকে, কাছ হইতে বেশ সুন্দর বোধ হয়। কিন্তু ওয়াটার পেণ্টিং যত ভাল হউক না, তাহার অয়েলপেণ্টিংয়ের সহিত তুলনাই হয় না। ওয়াটার কলার পেণ্টিংয়েতে মূল ছবি বুঝাইবার জন্য আস্‌পাস্‌ যেমন পরিস্কার করিয়া আঁকিতে হয়, বিলাতী নভেল-লেখক সেইরূপ আস্‌পাসে অধিক লক্ষ্য রাখেন। যে অয়েলপেণ্টিং করে, তাহার সেরূপ লক্ষ্য রাখিতে হয় না।

এই বিশেষত্বের আর এক ফল—দেশী উপন্যাস খুব বড় হয় না। যে চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে বা যে ঘটনা চিত্র করিতে দেশীয় কবির বিশ পৃষ্ঠার প্রয়োজন হয়—বিলাতী কবির সেখানে অন্ততঃ এক শত পৃষ্ঠা চাই। বিলাতী সভ্য (fashionable) নভেল—তিন বালাম করা চাই। অল্প করিয়া, সহজ করিয়া সমস্ত বুঝান উচ্চ দরের কবির কাজ। কোন সমালোচক বলিয়াছেন "Talent for easy writing—which is easy reading is almost unknown among German Novelists." জর্ম্মান নভেল লেখক কেন—প্রায় সকল ইউরোপীয় নভেল লেখকের সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। উক্ত সমালোচক (G. Gorden.) বলিয়াছেন,—

"Can any one point out to us one of their novelists, who is capable of making his hero and heroine enter a room, at the very climax of their fate, without delaying the catastrophe, to tell us, that it is a square room, with four walls, and three windows, that each window has two white muslin curtains, carefully tucked back, that there are six chairs and a sofa; * * ; we may be thankful if we are spared a description of the artificial ivy in the windows, and the Vienna Pianoforte, if the scene lies among such luxiries." অর্থাৎ ইউরোপীয় নভেল লেখকগণের খুঁটী নাটীর দিকে দৃষ্টি এত অধিক যে, বিয়োগান্ত উপন্যাসে বিষাদের শেষ ভীষণ দৃশ্য দেখাইবার সময়ও আনুষঙ্গিক সামান্য বিষয়ের বিবরণ না দিয়া থাকিতে পারেন না। এই সমালোচক আর এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"If men write profusely, what do the women do? if they use ten words when five would do and tell how many branches there are on every tree in the landscape, the women, good souls, count the leaves on each twig, with an abundance of exclamations and expletives, which take away one's breath." অর্থাৎ বিলাতে এই বিষয়ে মহিলা-উপন্যাস-লেখকগণ, পুরুষ উপন্যাস লেখকদের ছাপাইয়া উঠিয়াছে, একজন ডালে ডালে বেড়ায়—আর একজন পাতায় পাতায় যায়। সুখের বিষয় যে, বিলাতী অনুকরণ প্রবৃত্তি বশে আমাদের দেশে উপন্যাসে এখনও এ দোষ বড় দেখা যায় নাই।

এই বিশেষত্ব হইবার আর এক কারণ, হিন্দু অল্প কথায় চিরকালই অনেক ভাব ব্যক্ত করিতে পারে। পূর্ব্ব হইতেই হিন্দু কবি দার্শনিকদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। সূত্র যুগে এই প্রথার কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। টীকা বা টীকার টীকা না হইলে সূত্র বুঝা যায় না। অনেক সময় মল্লিনাথ না থাকিলে কাব্যও বুঝা যাইত না। কাজেই পূর্ব্ব হইতেই আমাদের দেশে অল্প কথায় অনেক ভাব বুঝাইবার ক্ষমতার চর্চ্চা হইয়াছিল। হিন্দু কবি সেই জন্য আজিও বিলাতী শিক্ষা পাইয়াও এত দূর খুঁটী নাটীর দিকে যাইতে চাহেন না। ইহা আমাদের শুভগ্রহ সন্দেহ নাই। কেন না, "art is long, life is short"। যে শিক্ষা চাহে, বৃত্তির অনুশীলন চাহে, কাব্য উপন্যাস হইতে যে কেবল জ্ঞানার্জ্জন করিতে বা চিত্তবৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হয়, যে অসার আমোদ চাহে না—ঠাকুরাণীদিদির গল্প চাহে না, শ্যাম রাম কি দিয়া খায়, কেমন করিয়া শোয়, জানিতে ইচ্ছা করে না, লোকের কুৎসা করিয়া যে

কুৎসা পড়িয়া সময় নষ্ট করিতে চাহে না— সঙ্গী জুটিল না, সুতরাং তাস পাসা খেলা হইল না, বলিয়া নভেল পড়িয়া সময়টা কোন রকমে কাটাইতে চাহে না—তাহার পক্ষে ইহা শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবে। তাহাকে অবগাহন জন্য বিস্তীর্ণ নদীতে নামিয়া সারা নদী ঘুরিয়া, বিঘত প্রমাণের অধিক জল না পাওয়ায়, বৃথা ফিরিয়া আসিতে হয় না। অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশ করাই প্রকৃত কবিত্ব, যে তাহা পারে না, সে প্রকৃত কবি নহে। উহার উপন্যাসে যতই চটক্ থাকুক্ না কেন, প্রকৃত কবিত্ব তাহাতে নাই। "Brevity is the soul of wit" বিলাতী কবি তাহা বুঝে না।

হিন্দুর উপন্যাসে বা কাব্যে বর্ণনা বাহুল্যের অভাবের আর এক কারণ আছে। হিন্দুর দূর দৃষ্টি। সৃষ্টিতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি উৎকট বিষয়গুলি হিন্দুর কাছে অতি সহজ ও বোধগম্য বিষয়। ইউরোপীয় দার্শনিকগণ এই সব তত্ত্ব লইয়া আজিও মারামারি করিতেছে। তাহাদের নিকট এ সকল তত্ত্ব অন্ধকারময় ধোঁয়া ধোঁয়া। হিন্দুর কাছে, এমন কি সামান্য কৃষকের কাছেও, এ সকল তত্ত্ব প্রতিভাত। জ্ঞানের গভীরতা না থাকা জন্যই বল, আর যে কারণেই বল—এই সকল বিষয় হিন্দুর নিকট আলোময়। প্রাচীন আর্য্যঋষির শিক্ষা তাহার হাড়ে হাড়ে এইরূপ বিঁধিয়াছে। সে সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎটাকে ভগবানের উদরে হস্তামলকবৎ দেখিতে পায়। যাহার এত দূরদৃষ্টি, সামান্য বিষয়ে তাহার কাজেই অমনোযোগ।

ইহা ছাড়া আরও এক কথা আছে। কবির দর্শন দুইরূপ—এক দূরদর্শন, আর এক সূক্ষ্মদর্শন। একজন, দূরবীক্ষণ ধরিয়া, আমাদের চর্ম্ম চক্ষের অগোচর বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের দূরস্থিত বিষয় দেখাইয়া দেন। উচ্চ হইতে আমাদের ডাকিয়া লইয়া উপরে তুলিতে চেষ্টা করেন। আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া আমাদের আহ্বান করেন। ব্যক্ত জড়ের অন্তরালে অব্যক্ত আত্মা দেখাইয়া জগতের সহিত, সংসারের সহিত আমাদের নূতন সম্বন্ধ পাতাইয়া দেন। আর একজন অণুবীক্ষণ ধরিয়া আমাদের সাধারণ চক্ষের অগোচর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বস্তুটীকেও দেখাইয়া দেন। হৃদয়ের অন্ধতম প্রদেশের অতি সঙ্গোপনে লুক্কাইত ভাবগুলির গতি ও প্রবৃত্তি বুঝাইয়া দেন; বাহ্যজগতে সামান্য ফুল বা তৃণের মধ্যে এমন সৌন্দর্য্য, এমন উদ্দীপনা, এরূপ ভাব দেখান যে, তাহা "too deep for tears" হয়, আমাদের অধীর করিয়া তুলে। তাঁহারা বিন্দুর মধ্যে ব্রহ্ম দেখেন, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নীচজাতীয়, দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থায় অভিভূত মানুষের মধ্যেও ব্রহ্মত্ব দেখাইয়া দেন—ক্ষুদ্রতম ঘটনার মধ্যেও বিধাতার বজ্রহস্ত দেখান—সমস্ত জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়মের ছায়াপাত করান।

এই দূরদর্শন হিন্দু কবির, আর সূক্ষ্মদর্শন পাশ্চাত্য কবির। আমাদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে এই দূরদর্শন আছে। আর ইউরোপের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস শেষোক্ত কবির রচিত, তাহাতে অন্তর্দর্শন ও সূক্ষ্মদর্শন আছে। এ সূক্ষ্ম দর্শনের জন্য বৃথা বাগাড়ম্বর প্রয়োজন হয় না—খুঁটী নাটী লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয় না। যিনি প্রকৃত কবি—তাঁহার এরূপ কাব্যাংশে দোষ হয় না।

অতএব দেখা গেল, বিলাতী উপন্যাস analytic বা বিশ্লেষণ পূর্ণ, দেশী উপন্যাস

synthetic বা সংগঠন মূলক। বিলাতী নভেল অধিকাংশ Realistic, দেশী উপন্যাস—idealistic। দেশী উপন্যাস সৃষ্টি করে, বিলাতী উপন্যাস ধ্বংস করে। দেশী উপন্যাস আদর্শ গড়ে—বিলাতী উপন্যাস আদর্শ ভাঙ্গে। দেশী উপন্যাস সমাজ সংস্কার করে—বিদেশী উপন্যাস সমাজবিপ্লব ঘটায়। দেশী উপন্যাস আমাদের দূরবীক্ষণ দেয়, বিলাতী উপন্যাস অনুবীক্ষণ করায়। দেশী উপন্যাস অয়েল-পেণ্টিং, আর বিলাতী উপন্যাস ওয়াটার-কলার-পেণ্টিং। দেশী উপন্যাস শিক্ষা দেয়, বিলাতী উপন্যাস আমোদ দেয়। দেশী উপন্যাস ধর্ম্মবৃত্তি অঙ্কিত করে, ভক্তিবৃত্তির গতি ও কার্য্য দেখায়—বিলাতী উপন্যাস ধর্ম্মবৃত্তির চিত্র অঙ্কিত করে না। ধর্ম্মতত্ব বুঝায় না, কেবল বিষয় বাসনা বাড়ায়। আমরা বিলাতী উচ্চ-শ্রেণীর উপন্যাসের কথা বলিতেছি, নতুবা বলিতাম যে, বিলাতী উপন্যাসে আমাদের অধর্ম্ম বৃত্তি অঙ্কিত করে, উত্তেজিত করে। দেশী উপন্যাসে মনুষ্যত্বের ও পুরুষকারের স্ফূর্ত্তি পায়—বিলাতী উপন্যাসে তাহা লোপ পায়। দেশী উপন্যাসে অদৃষ্ট ও দৈবের কথা মৌখিক, আত্ম নির্ভরতার কথা মনুষ্যত্বের কথা আন্তরিক; বিলাতী উপন্যাসে আত্মনির্ভরতা মৌখিক, অবস্থার আধিপত্য আন্তরিক। বিলাতী নভেলে বর্ণনায় বাহুল্য; দেশী উপন্যাসে বর্ণনা নিয়মিত। বিলাতী উপন্যাস, পণ্ডিতবর রাস্কিনের কথিত "Books of the hour," দেশী উপন্যাস—"Books for all times."। বিলাতী উপন্যাস নভেল; দেশী উপন্যাস নাটক। বিলাতী উপন্যাস ইতিহাস বা জীবন চরিত, দেশী উপন্যাস কাব্য। বিলাতী উপন্যাসের কবি দ্রষ্টা (Seer), তিনি মানবচরিত্র তত্ব ও জগৎতত্ব পর্য্যালোচনা করেন; দেশী উপন্যাসের কবি স্রষ্টা (Creator) তিনি কাল্পনিক প্রকর্ষ-চরিত্র (ideal) সৃষ্টি করেন, অথবা নূতন ও কাল্পনিক সৌন্দর্য্যময় জগৎ সৃষ্টি করেন। বিলাতী উপন্যাস Theorem বা উপপাদ্য, নির্দ্দিষ্ট ঘটনার দ্বারা চরিত্র বিশেষের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রণালী দেখান হয়; দেশী উপন্যাস Problem বা সম্পাদ্য, নির্দ্দিষ্ট ঘটনায় চরিত্র বিশেষের অনির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রণালী স্থির করা হয়। বিলাতী নভেলের চরিত্র প্রবৃত্তি বশে, অবস্থার বশে, necessityর বশে, ঘটনা বিশেষে অভিভূত হইয়া কার্য্য করে; দেশী উপন্যাসের চরিত্র নিবৃত্তির বলে, Free will এর বলে, পুরুষকারের জোরে, সংস্কারের বলে অবস্থাকে বশীভূত করিয়া, ঘটনাকে আয়ত্ত করিয়া কার্য্য করিতে পারে; তাহাই প্রধানতঃ দেখাইতে চেষ্টা করা হয়। বিলাতী নভেলে নায়ক নায়িকার (বা গল্পের প্রধান চরিত্রের) কথা থাকে, hero, heroine এর সৃষ্টি থাকে না; দেশী উপন্যাসে নায়ক নায়িকার স্থলে প্রধানতঃ hero,heroineএর সৃষ্টি করা হয়। বিলাতী উপন্যাসে পাপকে ও পাপীকে এত মোহকর করিয়া চিত্রিত করা হয়—পাপীকে অবস্থার দাস বলিয়া তাহার পক্ষে এত ওকালতি করা হয় যে, তাহাতে আমাদের আকৃষ্ট করে। দেশী উপন্যাসে পাপকে ও পাপীকে তাহাদের স্বরূপ অবস্থায় দেখান হয়, তাহাতে পাপের প্রতি আমাদের ঘৃণা ও পাপীর প্রতি দয়া জন্মাইয়া দেয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নভেল বা উপন্যাস সাধারণ পাঠককে বড় আকৃষ্ট

করে। চুম্বকও লৌহকে আকৃষ্ট করে। চুম্বকের উত্তরমুখী শক্তি, লৌহের দক্ষিণ মুখী শক্তিকে সংযত করিয়া, তাহার উত্তর মুখী শক্তির স্ফূরণ করে। উপন্যাসেও সেইরূপ আদর্শচিত্র থাকিলে তাহা পাঠকের অধর্ম্ম বৃত্তি সংযত করিয়া ধর্ম্মবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি করিতে পারে। দেশী উপন্যাস এই ধর্ম্মবৃত্তি যত স্ফূর্ত্তি করে, বিদেশী নভেল তত পারে না।

এ স্থলে আর একটী কথার অবতারণা করা আবশ্যক হইতেছে। অনেকে উৎকৃষ্ট বিদেশী নভেলে শিল্প-চাতুর্য্য বা art দেখিয়া মোহিত হন। তাঁহারা হয়তঃ মনে করেন যে অগ্নি, যেমন লৌহকেও দীপ্তিমান করে, art ও তেমনি কাব্য ও উপন্যাসের অনেক দোষ ঢাকিয়া দেয়। স্ত্রীলোকের যেমন রূপ, কাব্যের তেমনি আর্ট বা শিল্প-চাতুর্য্য। অনেকের কাছে রূপ অনেক দোষ ঢাকিয়া রাখে। কথায় বলে গোরা সর্ব্ব-দোষহরা, কিন্তু যিনি আপনার সৌন্দর্য্য-জাল পাতিয়া অন্যকে কুপথে লইয়া যান, তাঁহার রূপ যেমন নিন্দনীয় ও সর্ব্বথা পরিহার যোগ্য, আর যিনি সেই সৌন্দর্য্য বলে spiritual beautyর আকর্ষণে অন্যের মনে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়া তাহাকে উন্নত করেন—পবিত্র করেন, তাহার মনে প্রেম ও আনন্দ উৎপাদন করেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য যেরূপ প্রশংসার বা আরাধনার উপযুক্ত-সেইরূপ, যে শিল্পী আশ্চর্য্য কৌশলে আদর্শ সৃষ্টি করিয়া, তাহার দ্বারা আমাদের উন্নত করেন, তিনিই কেবল প্রশংসনীয়; কিন্তু যিনি সেই artএর অপব্যবহার করেন, তাহার মোহিনীজাল বিস্তার করিয়া আমাদের বৃথা আমোদ জন্মাইয়া কুপথে লইয়া যান—তিনি নিন্দার পাত্র। গত মে মাসের Nineteenth Centuryতে কোন লেখক লিখিয়াছেন,—

"My faith is small in leaders or prophets, who varnish over with a little enthusiasm the ugliness of brute appetite."

একটা চলিত শ্লোক আছে,—

"বিদ্যা বিবাদায়, ধনংমদায়,
শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়
খলস্য ; সাধোর্বিপরীতমেতৎ—
জ্ঞানায়, দানায় চরক্ষণায়।"

যিনি সাধু, তিনি বিদ্যা ধন বা শক্তির সদ্ব্যবহার করেন, কেবল খলেই তাহাদের অসদ্ব্যবহার করে; আর যে কবি-শিল্পী সাধু ও পূজনীয়, তিনি তাঁহার কবিত্ব শক্তির সদ্ব্যবহার করেন—তাহার দ্বারা উচ্চ ideal বা আদর্শ সৃষ্টি করিয়া আমাদের নানারূপ বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও উন্নতির চেষ্টা করেন। কিন্তু যে কবিশিল্পী অসাধু, তিনি তাঁহার শক্তির অপব্যবহার করেন—তাহার দ্বারা আমাদের মোহিত করিয়া পদস্খলিত করাইতে চেষ্টা করেন। বাইরণ এত বড় কবিশিল্পী হইলেও, ধার্ম্মিক লোকে তাহার মোহিনী শক্তির আকর্ষণের বাহিরে থাকিতে চাহেন। আমাদের মাইকেল এত বড় কবি হইলেও, কালে এই কারণেই, তাঁহার সিংহাসন অনেক নিম্নে স্থাপিত হইবে। সে যাহা হউক, এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সুধু art দেখিয়াই বিলাতী উপন্যাসের উৎকর্ষ সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য নহে—ইহাই আমাদের বুঝিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

দেশী ও বিলাতী উপন্যাসের মধ্যে আরও এক পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য বাহ্য জগতের সহিত মানুষের সম্বন্ধ চিত্র লইয়া। হিন্দু—জগৎকে ব্রহ্মময় দেখেন, জীবে আত্ম-দর্শন করেন, জড়ে প্রাণ উপলব্ধি করেন,

কাজেই বাহ্য জগতের সহিত হিন্দুর বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বাহ্য প্রকৃতি, হিন্দুর জননী স্বরূপা। জীবের সহিত হিন্দুর ভাই ভাই সম্বন্ধ—জড়ে তাহার প্রীতি। হিন্দু সূর্য্য চন্দ্রের সহিত কমল নলিনের দাম্পত্য সম্বন্ধ পাতায়, বায়ুর সহিত ফুলের বিবাহ দেয়, ভ্রমরকে ফুলের প্রেমে মাতায়, প্রকৃতিকে লইয়া বালকের মত খেলা করে। সমুদ্র বা পর্ব্বত দেখিয়াও তাহার এ ক্রীড়া, এ রঙ্গ ঘুচে না। প্রকৃতি যখন তাহাকে বড় ভীষণ মূর্ত্তি দেখায়, তখনও তাহার মধ্যে শক্তির কালীরূপে বিকাশ দেখিয়া তাহার ক্রোড়ে হাসিয়া লুকাইতে যায়। তাই বাহ্য জগত তাহাকে বড় অভিভূত করিতে পারে না। কিন্তু ইউরোপীয় কবি প্রকৃতিকে—বাহ্য জগৎকে এ ভাবে দেখিতে পারে না। তাহাদের কাছে প্রকৃতি জড় রূপা সৌন্দর্য্যময়ী, মাহিমাময়ী বিশাল—sublime, grand beautiful। ইউরোপীয় কবি প্রকৃতিতে এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন; আর যখন প্রকৃতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে তাহার নিকট আসে—তখন সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। এই কারণে হিন্দু কবির প্রকৃতি চিত্র ও বিলাতী কবির প্রকৃতি চিত্র মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যে প্রকৃতিতে কেবল সৌন্দর্য্য দেখিতে যায়, সে তাহাকে বিশ্লেষণ করে, উলঙ্গ করে, তন্ন তন্ন করিয়া দেখে, তাহাকে প্রণয়িনী সাজাইতে চাহে। আর যে প্রকৃতি মধ্যে ঐশি শক্তি দেখিয়া মাতৃভাবে তাহার নিকট অগ্রসর হয়, সে কখনও প্রকৃতিকে এত বিশ্লেষণ করিয়া, এত তন্ন তন্ন করিয়া তাহাকে দেখিতে পারে না, সে তাহার কেবল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে না—সে তাহার কোলে বালকের মত মুখ লুকাইয়া জুড়াইতে যায়। তাহাকে Fetish বলিতে হয় বল, বালক বলিতে হয় বল, অশিক্ষিত বলিতে হয় বল, তথাপি সে তোমার কথা শুনিবে না। আশ্চর্য্য যে, যে পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রকৃতির দ্বারা, বাহ্য অবস্থার দ্বারা অভিভূত, প্রকৃতি যাহাকে ক্রীড়ার পুত্তলি করিয়াছে, সেই প্রকৃতিকে লইয়া খেলা করে, তাহাকে মানে না। আর যে প্রকৃতির আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিতে পারে, দূরে থাকিতে চায়, প্রকৃতিকে যে মায়া বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, এই হিন্দুই প্রকৃতির শক্তি দর্শনে মোহিত হইয়া, চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত করিয়া, বালকের মত তাহার কাছে অগ্রসর হয়—বালকের মত তাহার সহিত ক্রীড়া করে। বোধ হয়, বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত রেলওয়ে টেলিগ্রাফ্ হওয়ায়, ইউরোপীয় পণ্ডিতের বিশ্বাস হইয়াছে যে, সে প্রকৃতির রাজা, প্রকৃতির উপর একাধিপত্য করিতে পারে। আর বোধ হয়, এই ভাবই ইউরোপীয় কাব্যে প্রবেশ করিয়াছে।

যে কারণেই হউক, দেশী ও বিদেশী কবি প্রকৃতিকে ভিন্ন রূপে দেখিয়া থাকেন ও বুঝাইয়া থাকেন ও সেই জন্যই দেশী ও বিদেশী উপন্যাসে এই স্বভাব বর্ণনায় ও প্রকৃতি চিত্রনে কিছু পার্থক্য প্রবেশ করিয়াছে।

ইহা ব্যতীত হিন্দু সমাজের বিশেষত্ব আছে, হিন্দুর চরিত্রের বিশেষত্ব আছে, রাজনৈতিক প্রভৃতি অন্যান্য অবস্থা সম্বন্ধেও তাহার বিশেষত্ব আছে। এই সমস্ত বিশেষত্ব জন্য পূর্ব্বকার দেশী ও ইউরোপীয় কাব্যে অনেক পার্থক্য হইয়াছিল। ইউরোপের উপন্যাসেও, ইউরোপীয় কবি, এই

বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। আর যদি তোমাদের শ্রেষ্ঠ কবি বাঙ্গালার উপন্যাস রচনা প্রবর্ত্তিত না করিতেন, তাহা হইলে হয়তঃ হিন্দু কবির যে বিশেষত্ব, তাহা বাঙ্গালা উপন্যাসে দেখা যাইত না। তাহা হইলে, হয়ত বাঙ্গালা উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় লেখা বিলাতী উপন্যাসের সমান হইত। বাঙ্গালার প্রধান কবি, তাঁহার অতুল্য প্রতিভা বলে, তাঁহার উপন্যাসে এই বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। সেই জন্য, বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস গুলি বাঙ্গালায় এক নূতন জিনিষ হইয়াছে। সুধু বাঙ্গালায় কেন, যখন জগতের সাহিত্য মধ্যে এই উপন্যাস গুলি প্রচার হইবে (আশা করা যায়, সে দিন আসিতে বড় অধিক বিলম্ব নাই) তখন উল্লিখিত বিশেষত্ব জন্যই এই সকল উপন্যাস সমস্ত জগত মধ্যে বিশেষ আদৃত হইবে এবং সেগুলি জগতের উপন্যাস মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে এই সকল বিশেষত্ব অধিক রক্ষিত বলিয়া আমরা এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিলাম; অনাবশ্যক বলিয়া বাঙ্গালার অন্য উপন্যাসের কোন উল্লেখ করিলাম না।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

গরিব সেবা। (২)

ভিক্ষাদান।

ভূদেব, তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে উপদেশ দিতেন,—

"প্রত্যহ কিছু না কিছু দান করিও। তাদৃশ অর্থ না থাকিলে, অন্ততঃ প্রত্যহ এক পয়সাও দান করিও। দানের অভ্যাস না থাকিলে, শুভ সময়ে, সম্পদকালে, সে দাতা হইতে পারেনা। অভ্যাস না থাকিলে, দান শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইযা, মানুষকে পাষণ্ড করিয়া ফেলে।" (ভূদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী।)

"I am certain that there is a party in this country, unnamed as yet, that is disconnected with any existing organisation—a party that is inclined to say, "A plague on both your houses, a plague on all your parties, a plague on all your politics, a plague on your unending discussions, which yield so little fruit. Have done with this unending talk and come down and do something for the people."—*Lord Rosebery*.

যেখানে যে গরিব-সেবক আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা জানি আর না জানি, তাঁহারা আমাদিগের এক সভার সভ্য, তাঁহারা এক প্রভুর দাস, আমাদিগের সহিত এক প্রাণে গাঁথা। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, হে শ্রদ্ধেয় বন্ধু, আসুন, একযোগে কাজ করিতে আরম্ভ করি। গরিবদিগের দুঃখ যাহাতে অন্ততঃ কতকটা দূর হয়, এমন একটা উপায় স্থির করি। গরিবসেবকগণ মিলিত হইয়া, পরস্পর পরামর্শ করিয়া, দীন দুঃখী কাঙ্গাল যাহাতে এক মুটা করিয়া খাইতে পায়, আসুন, তাহার একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করি। দেখুন, গরিবের চোখের জলে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে, অসংখ্য গরিবের হাহাকারে সংসার পুড়িয়া গেল। তুমি আমি দুই বেলা ভাত খাইতেছি, কতজন এক বেলাও খাইতে পাইতেছে না। তুমি আমি নানা ব্যঞ্জন, মৎস্য, সূপ ও দুগ্ধ দিয়া বেশ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছি, কতজন দিনান্তে একমুটা ভাতও পাইতেছে না। না খাইতে পাইয়া ধুঁকিতেছে।

আমাদিগের দেশে নারীগণ বলিতেন যে, খাইবার সময় কেহ দৃষ্টি দিলে পরিপাক হয় না। অর্থাৎ তুমি যখন খাইতেছ, তখন আর একজন খাইতে না পাইয়া, লালায়িত হইয়া যদি তোমার খাদ্য দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়, তাহা হইলে তাহাতে তোমার মঙ্গল নাই। এ কথা মিথ্যা নহে, কুসংস্কার নহে। ক্ষুধার্ত্ত কাঙ্গালীকে বঞ্চিত করিয়া, তাহার লালায়িত দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া, তুমি যে গ্রাস মুখে তুলিতেছ, তাহা কখনই হজম হইবে না, তাহা পীড়াজনক। তুমি ধনী ও সমর্থ—শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, কাঙ্গালী ও অসমর্থকে না দিয়া, তুমি যাহা খাইবে, তাহা বিষ্ঠা। এই পুরীষ মহাবিষ, ইহা যে কেবল নশ্বরদেহকে নষ্ট করে, তাহা নহে, ইহা অমরাত্মাকে জর্জ্জরিত করিতে থাকে, মহাপাতকস্বরূপ যে মহাব্যাধি আত্মাতে তাহাই জন্মাইয়া দেয়, এবং রোরব নরকের পথ প্রশস্ত করে। এই নির্দ্দয়তা স্বরূপ মহাব্যাধির বীজ যেন হৃদয়ে প্রবেশ না করে।

এস গরিব সেবক ভাই, আমরা নিজে যাহাতে ব্যাধিগ্রস্ত না হই, সমাজ যাহাতে ব্যাধিগ্রস্ত না হয়, দীন দুঃখী কাঙ্গালীরা যাহাতে এক মুঠা করিয়া ভাত পায়, তাহার চেষ্টা করি। ঘরে ঘরে মুষ্টিভিক্ষা যাহাতে না উঠিয়া যায়, তাহার জন্য যত্ন করি। মুষ্টিভিক্ষাতে যে যে অসুবিধা বা অকুলান আছে, তাহার প্রতিকার করি।

কাণা, কালা, নুলো, খোঁড়া ইত্যাদি যে দয়ার পাত্র, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। তাহাদিগের এক মুঠা করিয়া চাউল দেওয়া যে ধর্ম্মের কাজ, তাহাদিগকে যাহা দেওয়া যায়, তাহা যে ভগবানকে নিবেদন করা যায়, এ অতিশয় সোজা কথা। কিন্তু যাহারা এত অক্ষম যে নড়িতে পারে না, তাহাদিগের উপায় কি হইবে? আর ভদ্রপরিবারের অনাথিনী বিধবা, তাহাদিগের উপায় কি হইবে? যাঁহারা না খাইতে পাইয়া বরঞ্চ ঘরে শুকাইয়া মরিয়া যাইবেন সেও স্বীকার, তথাপি লোকলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, ঘরের বাহির হইয়া, দ্বারে দ্বারে কখন ভিক্ষা করিতে পারেন না, সেই অনাথিনী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যাদিগের উপায় কি হইবে? আবার মাতৃপিতৃহীন শিশু, যাহারা ভিক্ষা করিতেও জানে না, তাহাদিগের উপায় কি হইবে? এই সকল অনাথ অনাথিনীদিগের জন্য গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে, একটা একটা সভা করা বা দল বাধা আবশ্যক।

এই সকল গরিবসেবা সভা স্থাপন করিবার জন্য নিম্নলিখিত বা তদনুরূপ নিয়ম সকল করা যাইতে পারে।

শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে গরিবসেবকগণ, একত্র হইয়া, হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, সমুদয় সহর-প্রদক্ষিণ করিয়া, সভাগৃহে প্রবেশ করিবেন এবং সেখানে গিয়া সভা প্রতিষ্ঠা করিবেন। সভা প্রতিষ্ঠার সময় নিম্নলিখিত বা তদনুরূপ মন্তব্য প্রস্তাবিত ও গৃহীত হইতে পারে।

(১) এই স্থানের গরিবদিগের দুঃখমোচনের জন্য একটী গরিবসেবা-সভা প্রয়োজন।

(২) অদ্য—মাসে -তারিখে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অমুক অমুক "গরিব সেবক," অর্থাৎ এই সভার সভ্য হইলেন। অমুক সম্পাদক, ও অমুক কোষাধ্যক্ষ, অমুক সভাপতি, এবং অমুক সহকারী সভাপতি হইলেন।

(৩) প্রত্যেক গরিব সেবক প্রতি রবিবারে গরিব-সেবার জন্য চাঁদা তুলিবেন। গরিবদিগের অবস্থা অনুসন্ধান করিবেন। দাতব্য বিতরণ করিবেন। এবং অন্য যে কোন উপায়ে পারেন, গরিবদিগকে সাহায্য করিবেন।

(৪) চাঁদা তুলিবার জন্য ও গরিবসেবার সব কাজ ভাল করিয়া চালাইবার জন্য, মিউনিসিপালিটির মত, সহর ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ভাগ করা হইবে। প্রত্যেক গরিবসেবক বিশেষতঃ নিজের ওয়ার্ড বা পাড়াতে কাজ করিবেন; সাধারণত সমুদয় গ্রামে বা সহরে কাজ করিবেন। অমুক অমুক এই এই "ওয়ার্ডে" বা পাড়ায় কাজ করিবেন স্থির হইল। যখন কোন গরিব সেবক তাঁহার পাড়ায় গরিবসেবার কাজে ঘুরিবেন, তখন সেই পাড়ার মিউনিসিপাল কমিশনর অথবা একজন অন্য ভদ্রলোক যদি পান, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গরিবদিগের অবস্থা অনুসন্ধান করিবেন। এবং গরিবসেবা সভার সম্পাদক, সম্ভবমত মিউনিসিপাল সভার সভাপতি বা সহকারী সভাপতি এবং মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি স্থানীয় প্রধান গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর সহিত সদ্ভাব রাখিয়া কার্য্য করিবেন।

(৫) যে সকল "গরিবসেবকদিগের" আয় পঞ্চাশ টাকার অধিক, তাঁহারা তাঁহাদিগের আয়ের উপর প্রতি টাকায় আধ পয়সা করিয়া চাঁদা দিবেন। যাঁহাদিগের আয় ১০০৲ এক শত টাকার অধিক, তাঁহারা টাকায় এক পয়সা করিয়া চাঁদা দিবেন।

(৬) গরিবসেবকগণ প্রত্যেক সঙ্গতি সম্পন্ন গ্রাম বা নগরবাসীর নিকট মাসিক এক আনা চাঁদা ভিক্ষা চাহিবেন। এবং বিবাহাদি উৎসবকার্য্যে এবং শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্ম কার্য্যে কিছু ভিক্ষা যাচ্ঞা করিবেন। যে কোনও চাঁদা আদায় হইবে, তাহা কোষাধ্যক্ষের নিকট প্রেরিত হইবে। হিসাব রাখিবার জন্য তাহার সংবাদ সম্পাদককে দেওয়া হইবে। কোষাধ্যক্ষ সেভিংসব্যাঙ্কে টাকা রাখিবেন। সেভিংসব্যাঙ্কের পাশবুক সম্পাদকের নিকট রাখিবেন। গরিবসেবক তাঁহার পাড়াতে কাহাকে এককালীন দান বা মাসিক দান করা উচিত, তাহা সম্পাদককে লিখিবেন ও সম্পাদক আয়ের অবস্থা এবং অন্যান্য পাড়ার অভাব ইত্যাদি সমুদয় সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষের নিকট নিবেদন করিবেন। তাঁহারা দুইজন একমত হইয়া যে টাকা দিবার আদেশ করিবেন, সেই টাকা আনাইবার জন্য সম্পাদক কোষাধ্যক্ষের নিকট পাশবুক পাঠাইবেন এবং সেই টাকা আসিলে যে গরিবকে টাকা দিতে হইবে, তাহার পাড়ার গরিবসেবকের নিকট সেই টাকা পাঠাইয়া দিবেন।

(৭) যে সকল গরিব সেবক প্রকাশ্যভাবে গরিব সেবকের কাজ করিবেন, তাঁহারা বাহিরে কাজ করিবার সময় গরিবসেবক সূচক চিহ্ন ধারণ করিতে পারেন। যখন চাঁদা আদায় করিতে যাইবেন, তখন গেরুয়া রঙ্গের একটী ভিক্ষার ঝুলি লইলেই বোধ হয় আড়ম্বর-শূন্য চিহ্ন হইতে পারে।

গরিব সেবকগণ প্রতিমাসে শুক্লপক্ষে একাদশীতিথিতে নগর সঙ্কীর্ত্তন করিবেন। নগর সঙ্কীর্ত্তন করিবার সময় প্রত্যেক গরিব সেবকের হাতে ভিক্ষার ঝুলি বাঁধা কাটী থাকিবে। রাস্তায় যদি ভিক্ষা পাওয়া যায়, সেই ঝুলিতে সংগৃহীত হইবে।

গরিবসেবার অনেকগুলি বিভাগ হইতে

পারে। অন্নদান বিভাগ, ঔষধদান বিভাগ, দাতব্যশিক্ষা দান বিভাগ, প্রচার বিভাগ, অল্প সুদে ঋণদান বিভাগ ইত্যাদি। প্রথমে অন্নদান বিভাগ ও দাতব্য শিক্ষাবিভাগের কার্য্য চলিতে পারে। প্রতি রবিবারে গরিবসেবক একটী পাঠশালায়, পুস্তক পড়াইয়া বা কথাবার্ত্তায়, বা বক্তৃতা দ্বারা শিক্ষা দিবেন। ইহার নাম "রবিবার পাঠ-শালা" হইবে। প্রচার বিভাগে যাহাতে গরিবসেবকের সংখ্যা এবং সভার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি বিষয়,, বক্তৃতা করা হইবে।

তাহার পর, ভগবানের কৃপায়, গরিব-সেবকগণের শ্রমে, দাতাদিগের দয়ায়, যদি প্রচুর অর্থ-সংগ্রহ হয়, তাহা হইলে অনাথা-শ্রম স্থাপন করা যাইতে পারে এবং যাহাতে অনাথ ও অনাথিনীগণ নিজের নিজের ক্ষমতানুসারে উপযুক্ত কাজ করিয়া কতক পরিমাণে স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতে পারে, তাহারও উপায় হইতে পারে। কিন্তু সে সব পরের কথা।

আমি গত দুই বৎসরকাল গরিবসেবার কার্য্যে পাঠকদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিবার জন্য কেবল প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু উপরি উক্তভাবে সভাগঠন নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হই নাই। কিন্তু এইরূপ গরিবসেবার জন্য সভা স্থাপন ও অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবার জন্য নানাদিক হইতে অনুরোধ করা হইতেছে। আমি দুই বৎসর কাল এ বিষয় আলোচনা করিয়া সভা স্থাপন ও চাঁদা সংগ্রহ আবশ্যক বুঝিতেছি। যেখানে যেখানে চাঁদা সংগ্রহ করা হইবে, সেই সেই স্থানের সভার হস্তে চাঁদা সংগ্রহ ও ব্যয়ের ভার থাকিলেই চলিতে পারে। এই সকল সভা সমন্বয় করিবার জন্য একটী মূল বা কেন্দ্র সভার প্রয়োজন হইবে। সেই সভার বিষয় যথা সময় বিস্তৃতভাবে লেখা হইবে।

আপাততঃ আমার প্রার্থনা, যিনি যেখানে পারেন, গরিবসভা উপরি উক্তভাবে বা তৎ তৎ স্থানের উপযোগী কথঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্নভাবে সংস্থাপন করুন। গরিবসেবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। আমাদিগের দেশে গরিবসেবকগণ একটী নূতন সমাজ স্থাপন করিবেন, গরিবদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য নূতন ধর্ম্মমন্দির প্রস্তুত করিবেন। মনুষ্য প্রীতি দ্বারা চালিত হইয়া,গরিবদিগের দুঃখে গলিয়া গিয়া, তাহাদিগের প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া দিয়া, যাঁহারা গরিবদিগের সেবা করিবার জন্য, দুঃখ মোচন করিবার জন্য সম্মিলিত, তাঁহাদিগকে লইয়া এই সার্ব্ব-কালিক সমাজ, এই সর্ব্বগ্রাহী ধর্ম্মতন্ত্র।

"What is the Church? It is the Union of all who love in the service of all who suffer."

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

মৃত্যু।

নদীর কূলে আমার শয়ন গৃহ। এক সময়ে বৈশাখ মাসে গৃহের জানালা সকল উদ্ঘাটিত ছিল, আমি নিদাঘ সন্তপ্তদেহে সলিল-স্নাত মৃদু সমীরণের ব্যজন উপভোগ করিতে করিতে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা "হরিবোল হরিবোল" এই গভীর ধ্বনি তীক্ষ্ণ সূচিকাবৎ কর্ণ-কুহরে বিদ্ধ হইল—অমনি আমার নিদ্রাভঙ্গ

হইয়া গেল। সন্ত্রাস্ নয়নে চাহিয়া দেখিলাম, গৃহ অন্ধকারাচ্ছন্ন, বাহিরেও অন্ধকার। গৃহের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান, তত্তল দেশ দিয়া নদী প্রবাহিতা হইতেছিল, সেই নদীর উপকূল হইতে আবার ঐ গভীর ধ্বনি নৈশনিস্তব্ধতা ছিন্ন করিয়া, পত্র রাজির মধ্য দিয়া বহিয়া আমার আতঙ্কিত হৃদয়ে প্রতিঘাত করিল। অমনি হৃদয় অজ্ঞাতত্রাসে কম্পিত হইল। সেই সুষুপ্ত নৈশ আঁধারে, আর সেই মর্ম্মভেদী গভীর রোলে কি যেন এক অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে! তাই সেই বিষাদময় শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের মধ্যে একটি বিষণ্ণতা, আঁধারের ছায়া আসিয়া পতিত হইল—আবার সেই আতঙ্কময় ধ্বনি! আমি নীরব আতঙ্কে জড়ীভূত, উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম—যেমন দীপরশ্মি-প্রলুব্ধ পতঙ্গ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আকৃষ্ট হইয়া শুনিতে লাগিলাম—নিকটে, দূরে, দূরে দূরে, সেই বিষাদের পুণ্যগীতি নৈশ গভীরতায় ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া যাইতেছে। একাগ্র চিত্ততায় হৃদয় অবশ হইয়া আসিল। চিন্তার প্রবল স্রোত উদ্ঘাটিত হইল। স্বতঃই মনে আসিল—হায়! কাহার অন্ত জীবনমেলা ফুরাইল, কাহার এত সুখ, এত প্রেম, এত আশা সকলই ভাঙ্গিয়া গেল! কাহার আজ সকলই ফুরাইল, পশ্চাতে কেবল স্মৃতির সম্বন্ধ পড়িয়া রহিল! স্মৃতির সম্বন্ধ! এই স্মৃতিই অনন্ত অতীতের ও সান্ত বর্ত্তমানের সংযোজক বন্ধন, এই স্মৃতির বিচ্ছেদ, প্রকৃত বিচ্ছেদ। যে গিয়াছে, তার কি স্মৃতি আছে? সে কি ইহলোকের সকল সূত্রই ছিন্ন করিয়া গেল, তাহাতে আমাতে কি কোনই অদৃশ্য সূত্রে একত্র আবদ্ধ নই! বিজ্ঞানবিদ্, হাসিও না, তোমারই বিজ্ঞানকে আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বিজ্ঞান পরমাণুর অবিনশ্বরতা প্রমাণ করিয়াছে, বিজ্ঞানই আমার জিজ্ঞাস্য মীমাংসা করিতে পারে।

হিন্দুর মতে পঞ্চভূতই (ক্ষিত্যপতেজঃ মরুৎ ব্যোম) মৌলিক পদার্থ, কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই মত ভ্রম পূর্ণ প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অনেকগুলি পরমাণু অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ আছে, এই সকল পরমাণুর সংযোগ, বিয়োগরূপ বিবর্ত্তনে, এই অপূর্ব্ব শোভাশালী সৌর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। বিজ্ঞানবিদ্ আরও বলেন যে, ঐ সকল পরমাণু কোন এক আদি পরমাণুর আকর্ষণ বিকর্ষণ সম্ভূত ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র। হিন্দু শাস্ত্রেও ঐরকম একটা কথা আছে। শতপথব্রাহ্মণে আছে ঃ—

"সোঽকাময়ত। বহুঃস্যাং প্রজায়েয়েতি।
সঃতপোঽতপ্যত।
সঃ তপ স্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বম সৃজত।

অর্থাৎ—তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি প্রজা সৃষ্টির জন্য বহু হইব। তিনি তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিয়া এই সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে ও আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মধ্যে জগতের আদি সম্বন্ধে প্রভেদ বড়ই কম। এখন আমরা বলিতে পারি যে, পরমাণুর সংযোজন হইতেই পদার্থের উৎপত্তি, এবং উহাদের বিচ্ছেদ হইতেই পদার্থের লোপ। সুতরাং মৃত্যু ইহা ব্যতীত আর কি! দেহানুরূপ পরমাণুসমষ্টির স্বতন্ত্রতা মাত্র। ঐ যে দেহ এত দিন কত যত্নের, কত 'পুতুপুতুর' সামগ্রী ছিল, আজ তাহা গভীর নিশাতে দারুণ জ্বালা-বিশিষ্ট

অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছে। উত্তাপের সাহায্যে দেহ পরমাণু সকলের কত প্রকার রাসায়ণিক প্রক্রিয়া হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? কিন্তু মোট কথা ইহাতে কেবলমাত্র আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ, কেহই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে না, কাহারও ধ্বংস নাই। যাহারা এতাবৎকাল একত্রে এক-রূপে অবস্থিতি করিতেছিল, আজ তাহারা নূতন রূপে পৃথকভাবে অবস্থিতি করিতেছে মাত্র। তাহা এখন—

"——neither hear nor sees;
Rolled round in earth's diurnal course
With rocks and stones & trees."

এই ত গেল স্থূল দেহের কথা, কিন্তু এই অপার্থিব দেহের যে একটী অপার্থিব চেতনা আছে, তাহার সম্বন্ধ কি? অনেকে আত্মার কথা বিশ্বাস করে না। তাহাদের মতে, শোণিত অস্থি মেদ ইহাদের কোন এক অনৈসর্গিক সংযোগে জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়। এবং যতদিন ঐ শক্তি শোণিত অস্থি মেদে অবস্থিতি করে, ততদিন প্রাণী সজীব থাকে। কথাগুলি ভাবিয়া দেখা যাক্। পরমাণু সকল মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে, রাসায়নিক ক্রিয়ায় সেই শক্তির আবির্ভাব হয়, ইহা বিজ্ঞানবিদ্ মাত্রেই জানেন। ঐ পদার্থ নিচয়ের অন্তর্নিহিত শক্তি কোথা হইতে আসিল? বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষক যন্ত্র তাহা প্রমাণ করিতে পারে না। যে শক্তি অজ্ঞেয়, তাহাই জগতের আদি কারণ। শক্তির বিনাশ নাই। আদি কারণেরও বিনাশ অসম্ভব। তবে দেহের বিনাশে জীবনী-শক্তির কেন বিনাশ হইবে? জীবনীশক্তিই ত আত্মা, তবে আত্মার বিনাশ নাই। বিনাশ নাই, কিন্তু পরমাণুতে কি পুনঃ বিলুপ্ত হইবে? না এই শক্তি অশরীরি জীবনী প্রতিরূপই থাকিবে?

আমি বিবর্ত্তনবাদ দিয়া এই কথাটী বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, প্রথমে জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বব্যাপী শক্তি ছিল, সেই শক্তির বিবর্ত্তনে ক্রমে ক্রমে জগৎ, জীব প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়াছে। বিবর্ত্তনবাদে সেই আদি শক্তি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। উদ্ভিদজগতে শক্তির যে ভাব বিকাশ পাই-য়াছে, প্রাণী জগতে অবশ্য সেই ভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই, নতুবা উভয়ের পার্থক্য হইত না। শক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ বহি-র্জগতে কেমন স্পষ্ট! যে শক্তির বিকাশে আমরা কেবল মাত্র অনুভব দ্বারা উত্তাপ উপলব্ধি করি, সেই শক্তি আর একটু পূর্ণতা বা প্রবলতা প্রাপ্ত হইলে জ্যোতিঃশালিনী আলোকে পরিণত হয়। এই আলোক মধ্যে আবার কত প্রকার স্ফূরণ আছে। প্রদী-পের শিখায় আর বৈদ্যুতিক জ্যোতিতে যে ব্যবধান,ইহা দেখিয়া কোন্ অশিক্ষিত ব্যক্তি বলিতে পারে যে, উভয়েই সেই এক শক্তির ভিন্ন ভিন্ন আবির্ভাব মাত্র। আবার উত্তাপ হইতেই শব্দরূপ শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। সংক্ষেপেত সর্ব্বত্রই সেই এক শক্তি, বাষ্পীয় মহাতেজই বল, চিন্তাদূরাতিক্রম্য বৈদ্যুতিক গতিই বল, আর বারুদের ভীষণ গর্জ্জনই বল, সকলই সেই এক শক্তি সম্ভূত।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, প্রাণী জগত কি নৈসর্গিক নিয়ম দ্বারা শাসিত হয় না? উদ্ভিদ হইতে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রাণী কি সেই আদি শক্তির ভিন্ন ২ বিকাশ মাত্র নয়? উদ্ভিদে যাহা গতিহীন, কেবল বর্দ্ধনশীল গুণবিশিষ্ট, পশুতে যাহা পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রয়াস মাত্র, বর্ব্বরে যাহা পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রথম বিকাশ, শ্রেষ্ঠ সভ্য মানবে তাহাই পার্থিব পূর্ণতার

পরিসীমা। কথাটা কি অবৈজ্ঞানিক হইল? মানবের হৃদয়ে যাহা চৈতন্য, পশু হৃদয়ে তাহা instinct, উদ্ভিদ মধ্যে কি?' হিন্দুর কাছে এ সকল এক। সর্ব্বভূতে অহং, হিন্দুর শাস্ত্রের কথা, বৈজ্ঞানিক কথাও ত বটে। তাই হিন্দু পশু পক্ষী উদ্ভিদে প্রণয়শালী, মমতাপূর্ণ। হায়, এমন উদার ধর্ম্মকে কে সঙ্কীর্ণ করিল? কিন্তু বিবর্ত্তনের কথা বলিতেছিলাম। পূর্ব্বেই বাহ্যজগতে বিবর্ত্তনের উদাহরণ দেখাইয়াছি, আরও বলিতেছি। পৃথিবী নিয়তই বিবর্ত্তন করিয়া দিবারজনী প্রকটিত করিতেছে, চন্দ্রের কলা আরও একটা স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। অন্তর্জগতে দেখ, ঐতিহাসিক ঘটনার কেমন বিবর্ত্তন আছে। History repeats itself, ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন। জাতীয় জীবনে জাতীয় উন্নতি ও পতনে কেমন বিবর্ত্তনবাদ।

এখন কথা, বহির্জ্জগতে এত আবর্ত্তন, প্রাণীর অন্তর্জ্জগতে কি সেই আবর্ত্তন নাই? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই আবর্ত্তন স্বীকার করিতেছে। ডারবিন সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, ক্রমোন্নতি দ্বারা উদ্ভিদ হইতে প্রাণী, পশু হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে। হিন্দুর দশ অবতারবাদ, কথাটার কি কোন গূঢ় অর্থ নাই? প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তও পর্য্যবেক্ষণ করিলে কি মনে হয় না যে, হিন্দু ক্রমোন্নতির ও ক্রমবিকাশের কথাটা কিছু কিছু উপলব্ধি করিত। যিনি ত্রিদশ অবতার চিত্রখানি বিশেষ স্মরণ করিতে পারেন না, আমার অনুরোধ যেন তিনি একখানি চিত্র আনাইয়া ইহার আদ্যোপান্ত দেখেন। হিন্দুর কল্পনা বড়ই বিজ্ঞান-মূলক।

এক্ষণে কতদূর আসিয়াছি, দেখা যাক্। (১) শক্তি সর্ব্বত্রই এক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র। (২) বিবর্ত্তনবাদ অনুসারে নীচ হইতে উচ্চ প্রাণীর উৎপত্তি। তবে এখন কি বলিতে পারি না যে, মৃত্যু এই ক্রমবিকাশের একটা ছেদ মাত্র। ক্রমোন্নতি এই খানেই কেন সমাপ্ত হইবে? মৃত্যুর উপর কি আর কোন উন্নতিরূপ বিকাশ নাই! কথাটা বিজ্ঞান-সম্মত বটে, কি নয়?

কিন্তু ঐ আবার "হরিবোল হরিবোল!" চিন্তার একাগ্রতা বজ্রতাড়িত বায়ুর স্তরের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। অনন্ত প্রবাহিনী কল্পনা মুহূর্ত্তে কোথায় লুকাইল। সংসারের কঠিন চিত্র সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মমতার ছবিগুলি বড়ই প্রাণের ভিতর আসিয়া এক অনির্ব্বচনীয় শোকে ও সুখে জড়িত হইতে লাগিল। এই আমার প্রেমের, ঐ আমার স্নেহের, সে আমার বড় আদরের, সকলই আমার বড় যত্নের! সকলেরই শেষ কি ঐ শোক-ভরা হরি শব্দ! ঐ কি শেষ বিচ্ছেদ? বিজ্ঞান আমি মানি না, বিজ্ঞানের জটিল তর্ক মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার হৃদয়ের কোমলতা হারাইতে চাহি না। আমি মূর্খ অন্ধ, সেও ভাল। হৃদয়ের শান্তি যদি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে যাহাতে সেই শান্তি পাই, সেই পথই অনুসরণ করিব। দূরে থাক তোমাদের বিজ্ঞান, জ্ঞানালোক, তোমাদের শান্তিশূন্য দর্প। আমার সরল বিশ্বাস আমাতেই থাক্, পরকালের আশা আমি ছাড়িতে পারিব না। পরকাল ছাড়িলে মানুষ মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়ে। বিবেক, বুদ্ধি, যুক্তি, এ জটিল সংসারে কয়জনকে সোজা পথে চালাইতে পারে? কয়জনকে সর্ব্ব মুহূর্ত্তেই সদাচারে আটক রাখিতে সক্ষম? আমার বিশ্বাস, যাঁহারা জ্ঞানের দ্বারা সমাজ পরিষ্কার করিতে চান,

তাঁহাদের যত্ন সফল হওয়া দুরূহ, কেন না, জ্ঞান সর্ব্বব্যাপী নহে, কখনও হইবে না। অন্য পক্ষে, উচ্চ সরল বিশ্বাস দ্বারা সমাজের বিস্তর উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কেন না, বিশ্বাস হৃদয়কে কোমল করে, এবং যে হৃদয় কোমল, তদ্দ্বারা কখনই গুরুতর অনিষ্ট সম্পাদন সম্ভবে না। তাও বটে, আরও কথা, পরকাল ছাড়িলে আমার সকল প্রিয় পদার্থই ত ছাড়িতে হয়। তাহাত পারিব না। বিশ্বাসের জোরে আমি ইহজীবনে ও পরজীবনে একটী মধুর সম্বন্ধ বাঁধিয়া রাখিয়াছি, তাহা ছিন্ন হইলে আমার মনুষ্যত্ব যাইবে। কিন্তু যেখানে বিশ্বাসে ও বিজ্ঞানে কোন মতানৈক্য পাইলাম না, সেখানে কেন কাল্পনিক বিরোধ বাধাইয়া হৃদয়ের শান্তি হারাই! সহসা পূর্ব্ব-কথিত ভাবুক মহোদয়ের কথা মনে আসিল, হৃদয় শান্ত হইল—

"The Soul that rises with us, our life's Star
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar ;"

শ্রীদাশরথি ঘোষ।

অসমীয়া কি স্বতন্ত্র ভাষা ?

"যোজনান্তে পৃথক্ ভাষা"—পূর্ব্বাপর প্রচলিত এ প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। রেলযোগে কলিকাতা হইতে দিল্লী যাত্রা কালে এই ভাষার ক্রমভেদ কেমন অলক্ষ্যে উদ্গত হয়, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরের ভাষাগত পার্থক্য ত দূরের কথা, এক জেলার মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়,—গঙ্গাতীরবর্ত্তী লোকদিগের সহিত কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তী লোকের কথার তুলনা করিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে। স্থানের দূরতা অনুসারে ভাষাগত বিভিন্নতা বাড়িতে থাকে ;—কলিকাতার কথার সহিত বাকুড়া-বীরভূম বা শ্রীহট্ট চট্টগ্রামের গ্রাম্য কথা তুলনা করিলে পরস্পর এত পার্থক্য দেখা যায় যে, তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিলেও অত্যুক্তি বোধ হয় না। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্যে মনুষ্যের এই ভাষা বৈচিত্র্যও অদ্ভুত রহস্যময়, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষাও [illegible] এ রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ কি না, সন্দেহ। অসমর্থ হইলেও, মনুষ্যের চেষ্টা ও উদ্ভাবনী শক্তি সুদূর প্রসারিণী—এই ভাষাভেদের একটা হেতু নিরূপণেও মনুষ্য-চেষ্টা নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই। ভাষা-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নানারূপ গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—দুরারোহ গিরিশ্রেণী, দুর্লঙ্ঘ্য সাগরমালা, প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যবচ্ছেদই এই ভাষাভেদের প্রধান হেতু।* কথা অযৌক্তিক নহে,—ভারতে এইরূপ প্রাকৃতিক ব্যবচ্ছেদ অধিক বলিয়াই ভাষাগত পার্থক্যও প্রভূত।

ভারতে নানা ভাষা ও উপভাষা বর্ত্তমান থাকিলেও, সংস্কৃত মূলক হিন্দী, বাঙ্গালা, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী, পালী ও সিংহলী—এই কয়েকটী আর্য্যভাষার প্রধান শাখা বলিয়া

---

* পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহন্মনুবচন দ্বারা এই কথাই প্রতিপাদন করিয়াছেন—

"বাচো যত্র বিভিদ্যন্তে গিরির্ব্বা ব্যবধায়কঃ।
মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তরমুচ্যতে ॥"

পরিবর্ত্তিত আকারে উহা পাঠ করিলেই পাওয়া যায়—গিরি বা মহানদীর ব্যবধান-ভূত দেশান্তরেই ভাষার বিভিন্নতা হইয়া থাকে।

পরিগণিত। অধুনা, অনেক পণ্ডিত এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন ভাব সংস্থাপনে যত্নবান হইয়াছেন। অন্য দেশের কথা ধরি না—আমাদিগের বাঙ্গালার অন্তর্গত উড়িয়া ও অসমীয়া ভাষা এখন পৃথক্ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এ দুইটীকে স্বতন্ত্ররূপে স্বীকার করিতেছেন। প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল, পুরাতত্ত্ববিদ সুপণ্ডিত স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এবং বালেশ্বর সরকারী বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় উড়িয়া ও বাঙ্গালা ভাষার স্বাতন্ত্র্য অপনোদনে যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, সম্প্রতি, আসামী ভাষায় লিখিত "জোনাকী" নামক সাময়িক পত্রে "অসমীয়া ভাষার উন্নতি সাধিনী সভা"র সম্পাদক, ধীমান শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়, বাঙ্গালা ও আসামী ভাষার স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদনে ততোধিক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তৎপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বাঙ্গালা বা অসমীয়া—কোন ভাষাতেই আমাদিগের অভিজ্ঞতা নাই ; এরূপ অবস্থায় এই গুরুতর বিষয়ে বাক্যব্যয় করা আমাদিগের পক্ষে বাতুলতা মাত্র। তবে, বহুদিন আসাম-প্রবাসের স্মৃতির সহিত এই উভয় ভাষার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সংজড়িত, সেই স্মৃতির কুহকেই দুই এক কথা কহিতেছি—ভরসা করি, সহৃদয় অসমীয় বন্ধুগণ আমাদিগের এই ধৃষ্টতা উপেক্ষা করিবেন।

বঙ্গভাষার সৃষ্টিকালে কতদূর পর্য্যন্ত উহার প্রসার ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। বর্ত্তমান কালে ভাষাগত যে কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, উত্তরে হিমালয়-তল-দেশ, পশ্চিমে মিথিলা, দক্ষিণে উড়িষ্যা এবং পূর্ব্বে আসাম—এই চতুঃসীমার মধ্যে প্রথমতঃ বঙ্গভাষার বসতি স্থান ছিল। হিমালয়-সন্নিহিত রঙ্গপুর-দিনাজপুর আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ বলিয়া পরিচিত এবং বঙ্গভাষাই তথায় কথিত হইয়া থাকে ; মিথিলার অন্যতর রাজধানী, "দ্বারভাঙ্গা, দ্বার-বঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ" এবং "সেনরাজদিগের বঙ্গরাজ্যের পশ্চিমদ্বার বলিয়া" নির্দ্দিষ্ট। * বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার ভাষা এক, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে ; আসামীয় ভাষাও এতকাল বাঙ্গালা ভাষার রূপান্তর মাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং বাঙ্গালার হতাদর ও অসমীয়ার স্বাতন্ত্র্য স্থাপন অকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। † কালসহকারে, স্থান সমূহের নিত্য নব কৃত্রিম বিভাগানুসারে, ভাষারও রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। মিথিলা ও বঙ্গদেশ পূর্ব্বে এক রাজ্যভুক্ত ছিল, তাই মৈথিল কবি বিদ্যাপতির 'প্রেমময় পদসমূহ' আজি পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য সম্পত্তি বলিয়া আমরা স্পর্দ্ধা করিতে পারি। এখন মিথিলা ও বঙ্গদেশ পৃথক হওয়ায়, বিদ্যাপতির বাসস্থান লইয়া বিলক্ষণ বিবাদ উপ-

* শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সম্পাদিত "বিদ্যাপতির পদাবলী" গ্রন্থে তল্লিখিত উপক্রমণিকার ৷৹ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন।

† "A few years ago it was the fashion for Government officials to assert that Assamese was only a corrupt and vulgar dialect of Bengali, a *patois* bearning to it the same relation which Yorkshire bears to the Literay English and that it ought in no way to be encouraged, but to be crushed out as quickly as possible by using Bengali as the offical tongue and teaching it in schools."—Extract from a quotation from the Census Report of 1881, para. 160. Chap. VIII. Part II. Vol. I. of the Census of Assam, 1891.

স্থিত হয় -তাঁহাকে অবিমিশ্র বঙ্গবাসী প্রতিপন্ন করিবার জন্য, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তৎকালীন সৌহৃদ্য এবং উভয়ের কাব্যগত সৌসাদৃশ্য সূত্রে, বাঁকুড়া বা বীরভূমে তাঁহার বাসস্থান নির্ণীত হইয়া থাকে। ‡ ইদানীং মিশনারী মহাশয়গণের মন্ত্রণায় ও স্বদেশ বৎসল জন কয়েক অসমীয়া বন্ধুর চেষ্টায় আসামের ভাষাও পৃথক্ বলিয়া পরিচিত হইতেছে। এই পার্থক্য প্রচলন কতদূর ন্যায়ানুমোদিত এবং স্বদেশের সুমঙ্গল-সাধক, এখন তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

'জোণাকী'র উল্লিখিত প্রবন্ধ-লেখক অসমীয়া ভাষার প্রধানতঃ তিনটী যুগ নিরূপণ করিয়াছেন ;—অসমীয়া ভাষার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ৺শঙ্করদেবের জন্মের প্রাক্‌কাল প্রথম যুগ, শঙ্করদেবের জন্মের পর ইংরাজ রাজ কর্তৃক আসাম অধিকার কাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যুগ, এবং ইংরেজাধিকারের সূত্র হইতে আজি পর্য্যন্ত তৃতীয় যুগ। এই যুগত্রয় বিভাগে আমাদিগেরও বিশেষ মতভেদ নাই ; তবে প্রথম যুগের অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় যুগের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল কি না এবং প্রথম যুগের ভাষাই পরিমার্জ্জিত হইয়া দ্বিতীয় যুগের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল কি না—এতৎ পক্ষে আমাদিগের ঘোর সন্দেহ, এবং সে সন্দেহ অপনোদনে গোস্বামী মহাশয় বিশেষ সফলকাম হইয়াছেন বলিয়াও বোধ হয় না। হিন্দুগণের আধিপত্যকালে ভগদত্ত, নরকাসুর প্রভৃতি নৃপতিবর্গের কীর্ত্তির কথা কাহারও অবিদিত নাই ; প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রসিদ্ধি এবং তৎকালীন সংস্কৃত ভাষার প্রচলন বিষয়েও মতদ্বৈধ সম্ভবে না। এই অবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গেই গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"যিবিলাক আৰ্য্যই কামৰূপত ঘর বাড়ী ললেহি, প্রথমতে সংস্কৃতেই তেঁওবিলাকর ভাষা থাকিলেও, সময়ৰ লগে লগে তেঁওবিলাকৰ মাতবোলেও পুরুষে পুরুষে অল্প লৰচৰ হৈ গঢ় লৰাবলৈ ধৰিলে ; তাত বাজেও অনাৰ্য্য-জাতিবিলাকৰ ভাষায়ো তেঁওবিলাকৰ ভাষাক আক্রমণ কৰিছিল ;—এই বোৰ কাৰণত তেঁও-

‡ পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য "বিষয়ক প্রস্তাবে" লিখিয়াছেন, "চণ্ডীদাসের বাটী বীরভূম জেলার মধ্যে ছিল। তাঁহার সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার বর্ণিত আছে। তদনুসারে বীরভূমের সন্নিহিত কোন স্থানেই বিদ্যাপতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। * * বিষ্ণুপুরস্থ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক মহাশয় * * লোক পরম্পরায় জানিতে পারিয়াছেন যে, বাঁকুড়া জেলার ছাহনা প্রদেশে বিদ্যাপতির বাস ছিল। তিনি ঐ প্রদেশের এক সামান্য রাজা শিবসিংহের সভাসদ্ ছিলেন।" পক্ষান্তরে, উল্লিখিত মনস্বী সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তৎসম্পাদিত "বিদ্যাপতির পদাবলী" গ্রন্থের ভূমিকায় নানা ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন, "মিথিলা অর্থাৎ দ্বারভাঙ্গা প্রদেশও যবন কবলস্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তত্রস্থ সমস্ত রাজকার্য্য হিন্দুরাজগণের হস্তগত ছিল। * * তন্মধ্যে ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিথিলায় এক বংশীয় ব্রাহ্মণ রাজত্ব করেন ; এবং তদ্বংশীয় তৃতীয় রাজা শিবসিংহ ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিন বৎসর নয় মাস সিংহাসন অধিকার করেন। * * বিদ্যাপতি এই যশোবন্ত নৃপতির সভাসদ্ ছিলেন। * * * চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমকালবর্ত্তী ছিলেন এবং তিনিও বিদ্যাপতির ন্যায় কৃষ্ণলীলা-গর্ভ পদ-রচনা দ্বারা খ্যাতিলাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। উভয়ে উভয়ের যশঃসৌরভে মোহিত হইয়া পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। * * প্রবাদ আছে যে ভাগীরথী তীরেই কবিদ্বয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে বাস করিতেন ; এই জন্য পূর্ব্বে আমাদের সংস্কার ছিল যে, বিদ্যাপতিও বীরভূম বা বাঁকুড়া জেলায় বাস করিতেন।

ৰিলাকৰ ভাষা সংস্কৃতৰ পৰা বহুত আঁতৰ হৈ হৈ অন্তত অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম হল।”

পৌরাণিক যুগে ‘আসাম’ নামে কোন জনপদ ছিল না, সুতরাং তৎকালে ‘অসমীয়া’ ভাষার উৎপত্তি হইতেই পারে না। ‘অসমীয়া’ শব্দ ‘অসম’, আর ‘অসম’ শব্দ ‘আহম’ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—এ কথা গোস্বামী মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন, অতএব আহমদিগের রাজত্বকালেই অসমীয়া ভাষার সৃষ্টি ঘটে, ইহা অস্বীকার করা অসঙ্গত বোধ হয়। “অসমীয়া ভাষা আহম জাতির ভাষা বা সিবিলাকৰ ভাষার পরা ওলোরা এটা ভাষা ন হয়”—একথা সম্পূর্ণ সত্য বটে; কিন্তু ঐ ভাষা যে আহোম রাজার রাজত্বকালে সৃষ্ট নহে, তাহার যুক্তিযুক্ত প্রমাণ কোথা? প্রত্যুত, আহম রাজত্বকালেই বর্ত্তমান অসমীয়া ভাষা সংগঠিত হয়—‘জোণাকী’র প্রবন্ধ পাঠে এইরূপই প্রতীতি জন্মে। আর্য্যনৃপতিকুলের তিরোধানের পর আসামে ঘোর অরাজকতা এবং অনার্য্য বর্ব্বরজাতির প্রাদুর্ভাব ঘটে; এই অরাজকতার সময়ে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের আদিম বাসীগণের বংশ পরম্পরা একরূপ নির্ম্মূল হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে তৎকথিত ভাষারও মহাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। এরূপ অবস্থায়, অনার্য্য ভাষার সংক্রমণে আর্য্য সংস্কৃত ভাষাই অসমীয়া ভাষায় পরিণত হওয়া সমীচীন বোধ হয় না; বরং বহুকাল-ব্যাপী অনার্য্যজাতির সংঘর্ষণে মূল ভাষা একরূপ উৎসন্ন হইয়া অনার্য্য ভাষাতেই পরিণত হইয়াছিল বোধ হয়। আর্য্যজাতির প্রভুত্বকালে কামরূপ যেরূপ সমৃদ্ধিশালী জনপদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, অনার্য্যজাতির প্রাদুর্ভাব সময়ে সে সমৃদ্ধির কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না, বরং বর্ব্বরের রাজ্য কেবল বন জঙ্গলেই ব্যাপ্ত ছিল—ইহারই লক্ষণ দেখা যায়; এই অবস্থায় ভাষা গঠন কোন মতেই সম্ভবে না। প্রত্যুত, আহমগণের শুভাগমনেই আসামের নবজীবন সঞ্চারিত হয়, শ্মশানের প্রেতভূমি অপরূপ রাজসদনে পরিণত হয়, ঘোর অমান্ধকারের পর চন্দ্রকিরণ প্রতিভাত হয়;—পুরাতন বিস্মৃতির অন্তরালে বিলুপ্ত হইয়া, এই সময়ে এক নবীন রাজ্য সংগঠিত হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান যুগে আসামের প্রাচীন সমৃদ্ধির যে কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই ঐ আহোম রাজদিগের কৃত; সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য, সম্পদ ও সভ্যতার সহিত ভাষা সৃষ্টিরও প্রয়োজন ঘটে, এই অবস্থায় অমানুষী প্রতিভাসম্পন্ন শঙ্করদেব আবির্ভূত হয়েন, এবং তাঁহারই প্রসাদে নূতন ‘অসমীয়া’ ভাষা সৃষ্ট হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

“ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।”

ধর্ম্মরাজ্যে ঘোর অরাজকতার পর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়া, নব ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন এবং মধুর হরিনামের রোল তুলিয়া পাপী-তাপীর পরিত্রাণ সাধন করেন। অনার্য্যজাতি সমাগমে আসামে লৌকিক অরাজকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়েও ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। আহম রাজার অভ্যুত্থানে বাহ্য সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক অধোগতির তখনও নিরসন ঘটে নাই; এই অধোগতি দূর করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনের উদ্দেশেই মহানুভব শঙ্করদেবের আবির্ভাব বোধ হয়। শঙ্করদেব চৈতন্যদেবের সমসাময়িক,—অথবা চৈতন্যদেবই শঙ্করদেবের

সময়ে নবদ্বীপ ধামে প্রাদুর্ভূত হয়েন; শ্রীচৈতন্যের জন্মের ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাঁহার তিরোধানের ৩৬ বৎসর পরে মানবলীলা সম্বরণ করেন; মহাপ্রভু ৪৮ বৎসর মাত্র মর্ত্ত্যলীলা করিয়াছিলেন; * অতএব, দেখা যায়, শঙ্করদেব কলিযুগের পূর্ণ পরমায়ু সম্ভোগ করিয়া শাস্ত্রের বচন সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রতিভাশালী পুরুষের প্রথমাবস্থা হইতেই বুদ্ধি ও মহত্বের লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়; স্বজাতিপ্রেম ও স্বধর্ম্মানুরাগ শঙ্করদেবের শৈশবাবধি অন্তরে জাগরূক ছিল, তিনি প্রথমতঃ স্বদেশেই যথাসম্ভব বিদ্যানুশীলন ও ধর্ম্মচর্চ্চা করেন, পরে তাহাতে সম্যক্ তৃপ্তি না হওয়ায় জ্ঞানার্জ্জনোদ্দেশে বঙ্গদেশে গমন করেন। বাঙ্গালার তখন বিলক্ষণ উন্নত অবস্থা; এক দিকে শ্রীচৈতন্য হরিপ্রেম বিতরণে মাতুয়ারা, অন্য দিকে রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী, গোপালভট্ট, কর্ণপুর, প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থরচনায় তৎপর, অধিকন্তু অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি এবং স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের নবজীবন সংসাধনে সম্পূর্ণ সফলকাম। বাঙ্গালা ভাষারও, প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহাই উৎপত্তিকাল; ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী ভিন্ন বঙ্গ ভাষায় লিখিত উল্লেখযোগ্য অপর কোন গ্রন্থই ছিল না, এখন চৈতন্য শিষ্যগণ তদীয় ধর্ম্মপ্রণালী সাধারণের গোচর করিবার নিমিত্ত চলিত ভাষা বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। † এই শুভক্ষণে স্বর্গীয় শঙ্করদেব বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। বহুদিন বঙ্গদেশে অবস্থান করায় ও বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনায় তৎকালীন প্রচলিত বঙ্গভাষা একরূপ তাঁহার নিজস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, লোক-শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত ভাষা সংগঠন নিতান্ত আবশ্যক—ইহাও তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছিল; তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক চিরপোষিত হৃদয়ের ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য বলে অচিরেই নূতন ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে কৃতার্থতা লাভ করিলেন। ইঁহার আচার-ব্যবহার এবং পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্ম প্রচার শীঘ্রই তদানীন্তন আহোম রাজার চিত্তাকর্ষণ করিল, এবং বঙ্গদেশই তাঁহার এই সমস্ত গুণগ্রামের মূল বুঝিয়া তথাকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতি সহজেই ভক্তি সঞ্চারিত হইল; রাজা অনতিবিলম্বেই ৺শঙ্করদেবের নির্ব্বাচিত চারিজন সুপণ্ডিত ও সদ্ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। তদবধি আসামে হিন্দুধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব; ঐ ব্রাহ্মণ চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণপটে, কুরবাহী, গরমুর এবং আউনীহাটী নামক চারিটী প্রধান সত্র আজি পর্য্যন্ত অসমীয়া হিন্দু সন্তানের হৃদয়ে ধর্ম্মবারি সিঞ্চনে নিযুক্ত রহিয়াছে, এবং ৺শঙ্করদেব প্রতিষ্ঠিত ভাষা আজি পর্য্যন্ত 'অসমীয়া' ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এই

* চৈতন্যদেবের অবস্থান কাল ১৪০৭ শক হইতে ১৪৫৫ শক পর্য্যন্ত ৺শঙ্করদেবের অবস্থান কাল ১৩৭১ শক হইতে ১৪৯১ শক পর্য্যন্ত।

† পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" —৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা।

সকল তথ্যের অধিকাংশই আমরা আলোচ্য প্রবন্ধ হইতে শিক্ষা পাই, কেবল বাঙ্গালার সহিত অসমীয়ার সম্বন্ধ ঘুচাইবার উদ্দেশ্যেই, বোধ হয়, প্রবন্ধ-লেখক গোস্বামী মহাশয় দেশের উল্লেখ না করিয়া ৺শঙ্করদেব "জ্ঞান অর্জ্জিবর নিমিত্তে বিদেশঁলে যায়"—এই কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার যে উদ্দেশ্যই হউক, শঙ্করদেবের জ্ঞানোপার্জ্জনার্থ বঙ্গদেশে যাওয়ার কথা আমরা পরিচিত অসমীয়া বন্ধুমাত্রেরই মুখে শুনিতে পাই। এখন তাঁহার গঠিত ভাষাই প্রকৃত 'অসমীয়া' নামের যোগ্য কি না, এবং বঙ্গভাষাই উহার প্রাণ কি না, ইহা বুদ্ধিমান পাঠকবর্গের বিবেচনাধীন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ৺শঙ্করদেব যে সময়ে বঙ্গদেশে গমন করেন, বঙ্গভাষা সেই সময়ে নব কলেবরে গঠিত হইতেছিল,—তৎপূর্ব্বে কেবল বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী বঙ্গসাহিত্যের পরিচয় দান করিত। ঐ দুই বিখ্যাত কবির মধ্যে বিদ্যাপতির রচনাতেই অধিকতর লালিত্য ও মধুরতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগে বঙ্গসাহিত্য সেবক মাত্রেই যেরূপ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে, ন্যূনাধিক, নিজ রচনার লালিত্য বর্দ্ধনে চেষ্টা করিয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্য ও শঙ্করদেবের সময়ে, সেইরূপ, লেখক মাত্রেই বিদ্যাপতির ছাঁচে আপন রচনা গঠন করিতে যত্ন করিতেন। "তাঁহারই আদর্শ লইয়া গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস, নরোত্তমদাস, জ্ঞানদাস, শ্রীনিবাস ও নরহরিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ পদরচনা করিয়া স্ব স্ব নাম চিরস্মরনীয় করিয়া গিয়াছেন।" শঙ্করদেব বঙ্গদেশে অবস্থান কালে তৎকালীন বঙ্গভাষার গঠন-পদ্ধতি শিক্ষা করায়, তাঁহার "লেখাও অনেক অংশে, তেঁওবিলাকৰ (বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের) লেখাৰে সৈতে মিলে।" জোনাকীর প্রবন্ধ-লেখক বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস এবং শঙ্করদেবের কবিতাখণ্ড উদ্ধৃত করিয়া স্বয়ং এ কথা প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতএব তৎসম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করা অনাবশ্যক। দুঃখের বিষয়, এ সূত্রেও বঙ্গভাষার সহিত 'অসমীয়া ভাষা'র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা গোস্বামী মহাশয় কৌশলে লোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ৺শঙ্করদেবের নাটকাদিতে মৈথিল ও উড়িয়া কথার ব্যবহার নিরূপণে গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"মানুহে বিদেশী মাত শুনিবলৈ বেছি ভাল পায়; আমার কাণত বাঙ্গালী কথা যিমান মিঠা লাগে, আরু বাঙ্গালীৰ কাণত অসমীয়া মাত যিমান মিঠা লাগে, আপোন ভাষা সদাই কৈ থাকা বাবে সিমান মিঠা না লাগে; সেই বাবেই বিদেষী ভাষাৰ ভাঁজ দি তেঁও নাট আদি লেখিছিল।"

এ অতি আশ্চর্য্য যুক্তি! কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস ও সেক্ষপীয়রের নাটক সমূহে ভাষার মিষ্টতা বৃদ্ধির জন্য বিদেশী 'ভাঁজ' মিলাইবার চেষ্টা দেখা যায় না, বরং রমণী ও ইতরশ্রেণীস্থ লোকের কথায় প্রাকৃত বা provincialism এর অবতারণা দেখা যায়। নাটক-নামধেয় বাঙ্গালার বর্ত্তমান কোন গ্রন্থেও বিদেশী বাক্য ব্যবহৃত হয় না, বরং স্বদেশের সরল কথাই যথাসম্ভব ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রত্যুত, শঙ্করদেবের সময়ে মিথিলা ও উড়িষ্যা বঙ্গদেশভুক্ত ছিল, ঐ সমস্ত প্রদেশের কথাও বঙ্গভাষার অঙ্গভূত ছিল—সুতরাং শিক্ষা ও সংশ্রব গুণে ঐ সকল স্থানের কথা তাঁহার রচিত গ্রন্থে সহজেই প্রবিষ্ট হইয়াছে।

অতঃপর বর্ত্তমান যুগের কথা। ইংরাজ

শাসনাধিকার-কালেই বর্ত্তমান যুগ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; অসমীয়া ভাষাকে বর্ত্তমান ছাঁচে ঢালা ও উহাকে পৃথক্ ভাষা বলিয়া পরিচয় দেওয়া এই শেষ যুগেই ঘটিয়াছে। 'জোণাকী'র প্রবন্ধ লেখকগণ এবং তাঁহাদিগের সহযোগীবর্গই বর্ত্তমান যুগের লেখক সমাজের ও ভাষাস্রষ্টার শীর্ষ-স্থানীয়। শিক্ষাগুণে স্বদেশীয় ভাষার স্বাতন্ত্র্য সাধনে সচেষ্ট হইলেও, ইঁহাদিগের ভাষার আদিতেও বাঙ্গালা ভিন্ন অপর কিছু দেখা যায় না। ইংরাজের শুভাগমনের সঙ্গেই তদীয় পার্শ্বচর বাঙ্গালী আসামে আগমন করিয়াছেন, আর তাঁহাদিগের দ্বারাই প্রধানতঃ অসমীয়া বন্ধুগণের শিক্ষা দীক্ষা সংসাধিত হইয়াছে। বাঙ্গালী শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করেন নাই, বাল্যে বাঙ্গালাই মাতৃভাষার ন্যায় বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নাই, বাঙ্গালার কাব্যোপন্যাস তাঁহার রচনাপ্রণালী সংগঠনে সহায়তা করে নাই,—নব্য অসমীয়া লেখকগণের মধ্যে এরূপ কথা কয়জন সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারেন ? জনকয়েক বাঙ্গালী কুলাঙ্গারের অবৈধ ব্যবহার অসমীয়া বন্ধুগণের বিসদৃশ বোধ হইলেও, শিক্ষিত অসমীয়ামাত্রের বসন-ভূষণে, চাল-চলনে, সাহিত্য-গঠনে, সমাজ-সংস্থাপনে যে বাঙ্গালা ভাব ওতঃপ্রোতঃ ভাবে সংজড়িত, ইহা নিঃশঙ্কচিত্তে ঘোষণা করা যাইতে পারে। কৃতবিদ্য অসমীয়া বন্ধুগণও একবাক্যে বাঙ্গালীর নিকট এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কৃপণতা করেন না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে বাঙ্গালীর সহিত অটুট সংশ্রব এবং অসমীয়ার পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষা শিক্ষা অসমীয়া বন্ধুগণের স্বকীয় ভাষার সমৃদ্ধি বর্দ্ধনে কি পরিমাণে কার্য্যকরী, তাহাও সুহৃদয় পাঠকবর্গের বিবেচ্য।

এখন এই অসমীয়া বাঙ্গালার সংশ্রব ঘটিত অবান্তর দুই-এক কথার আলোচনা পূর্ব্বক প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। শ্রুতি ও স্মৃতির কাল অতীত হওয়ার পর, ভাষা সৃষ্টির সঙ্গে অক্ষরোৎপাদনের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী বোধ হয়। অসমীয়া গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য কোন্ সময়ে অক্ষর সৃষ্টি হইয়াছিল, আলোচ্য প্রবন্ধে তাহার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় অসমীয়া ভাষায় বঙ্গাক্ষরই অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়,—এক রকার ও অন্তঃস্থ বকার ব্যতীত কোন বৈলক্ষণ্যই বোধ হয় না; এ দুই অক্ষরও প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের অনুরূপ। এই দুই অক্ষর সম্বন্ধে পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় যে তথ্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা গেল—

"এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়দিগের গৃহে ৩।৪ শত বৎসরের হস্তলিখিত যে সকল সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অক্ষর সকল এক্ষণকার অক্ষর অপেক্ষা অনেকাংশে বিভিন্ন। সচারাচর ঐ সকল অক্ষরকে 'তিরুটে' (ত্রিহুতী) অক্ষর বলে। ঐ অক্ষরে দেবনাগরের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। দেবনাগরে অন্তঃস্থ ব ও বর্গীয় ব বিভিন্ন প্রকার; ঐ তিরুটে অক্ষরেও দুই বকারের বিভিন্নতা দেখা যায় —যথা অন্তঃস্থ বকার (ৱ) এইরূপ, বর্গীয় বকার (ব) এইরূপ এবং রকার (ৰ) এইরূপ। এক্ষণকার বাঙ্গলা বর্ণমালায় বকারদ্বয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই এবং রকার পূর্ব্বকালীন অন্তঃস্থ বকারের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন রকার যে অধিক দিন ভিন্নবেশ হইয়াছে, তাহা নহে। অদ্যাপি পল্লীগ্রামের সাবেক গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় 'কর-পারা ব পেটকাটা' বলিয়া রকার লেখান হইয়া থাকে।" *

* বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—৪-৫ পৃষ্ঠা।

আসামে ঠিক প্রাচীন রকার ও অন্তঃস্থ বকার আজি পর্য্যন্ত চলিতেছে; অন্তঃস্থ বকারের তলদেশে বিন্দুর পরিবর্ত্তে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু ঐ হসন্ত চিহ্ন বিন্দুরই রূপান্তর মাত্র, আর আমাদিগের স্মরণ হয়, ত্রিহুত-প্রবাস-কালে মৈথিল পণ্ডিতগণের লেখাতেও আসামের ন্যায় অন্তঃস্থ বকারের তলে বিন্দুর পরিবর্ত্তে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহৃত হইতেই দেখিয়াছি। ফলতঃ, ত্রিহুতী, অসমীয়া ও বাঙ্গালা—এই ত্রিবিধ অক্ষর যে এক, এ পক্ষে কোন মতভেদের আশঙ্কা দেখা যায় না। ৺শঙ্করদেবের সময়ে বঙ্গ ও মিথিলায় একই অক্ষর চলিত। তিনিও বঙ্গদেশে ঐ অক্ষর শিখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সেই অক্ষরেই আপন গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও অসমীয়া ভাষার অবিচ্ছিন্ন ভাবের ইহাও অন্যতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

আলোচ্য প্রবন্ধের মুখবন্ধেই যে কয়েকটী কথা লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা দেখা যাউক, বর্ত্তমান অসমীয়া ও বাঙ্গালা ভাষার কতদূর প্রকৃতি ও রচনাগত পার্থক্য। লেখক লিখিয়াছেন—

"আলোচনা আরু আন্দোলনেই সকলো বিধ উন্নতিৰ মুল। আজি কালি অনেকে অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ধৰিছে. আরু কোনো কোনোৱে আন্দোলন কৰিবলৈকো আগ বাঢ়িছে; এই বিলাক দেখি শুনি, আমার মনত অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতিৰ আশাই বৰ দকৈ শিপাইছে। জগদীশ্বৰৰ ওচৰত একান্ত মনে প্রার্থনা কৰোঁ যেন, আমাৰ এই আশাৰ পুলিটি দুপতীয়তে ঘঁহ ন পৰে। বৰ বেজাৰৰ কথা আজিলৈকে, বিদেশীৰ কথাকে নকওঁ, অনেক অসমীয়া মানুহৰ মনতো অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে বহুত খুঁকুৰি আছে—কোনোৱে কয়, অসমীয়া ভাষা এটা বেলেগ সাহিত্য থকা স্বতন্ত্ৰীয়া ভাষা ন হয়, ইহা বাঙ্গালী ভাষাৰ চহা অৱস্থা মাথোন; কোনোৱে ইয়াক এটা বেলেগ ভাষা বুলি স্বীকাৰ কৰিও ইয়াৰ আৱশ্যকত্ব স্বীকাৰ ন কৰে; কোনো কোনৱে, আকৌ ইয়াক এটা বেলেগ ভাষা বুলিও গন্তি কৰে, আরু ই যে অসমীয়া মানুহৰ পক্ষে নিতান্ত লাগতীয়াল তাকো মানে, কিন্তু তাৰ উন্নতি কৰা পক্ষত তেনেই উদাস; তেঁও বিলাকৰ মতে বঙ্গালী আরু অসমীয়া দুইটা সংস্কৃত মূলক ভাষা, সেই গুণে অসমীয়াৰ ভাষাৰ উন্নতি কৰিবলৈ গলে কি বঙ্গালী ভষাৰ ফাললৈ চাল লব আরু শেহত বঙ্গালী ভাষাৰে সৈতে এটা ভাষা হৈ পৰিব।"

উল্লিখিত অংশের রচনা প্রণালী (style) এবং বাক্য যোজনা (diction) যে আধুনিক বঙ্গভাষার অনুরূপ, বঙ্গভাষাভিজ্ঞ মাত্রেই ইহা সহজে অনুভব করিতে পারেন,—ফলতঃ, বাঙ্গালা ভাব ও বাঙ্গালা ভাষার সহিত দুই চারিটী অসমীয়া গ্রাম্য শব্দের সংমিশ্রণে উহা গঠিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। 'আরু' 'আন্দোলনেই' 'সকলো' প্রভৃতি কয়েকটী কথায় উকার, একার এবং ওকার সংযোজিত করিয়া বাঙ্গালার সহিত পার্থক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা হইয়াছে; পরন্ত, 'ধরিছে', 'বাঢ়িছে', 'দেখি শুনি', 'গলে', 'পরিব' প্রভৃতি বাক্যে 'য়া', 'তে' ও 'এ'কার লুপ্ত করিয়া স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে—এই সকলের লোপ, গদ্যে না হইলেও, বাঙ্গালা পদ্যে এখন পর্য্যন্ত সাধিত হইয়া থাকে। 'করিবলৈ' 'কোনোৱে', 'আজিলেকে', 'সি' প্রভৃতি কথা 'করিবার জন্য', 'কোন', 'আজি পর্য্যন্ত', 'সে' প্রভৃতি কথা বাঙ্গালা কথার রূপান্তর মাত্র। কলিকাতা অঞ্চলের শৌণ্ডিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি কয়েক জাতি এবং কৃষ্ণনগর, বীরভূম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের অনেক লোক 'ড়' উচ্চারণ করিতে পারেন না—'র' বলিয়া থাকেন; অসমীয়া 'বর', 'পরিব' প্রভৃতি কথায় সেই

কারণেই 'ড়' স্থানে 'র' ব্যবহৃত হইয়াছে—প্রভেদের মধ্যে 'ড়'—উচ্চারণে অসমর্থ বাঙ্গালী লিখিবার সময় 'ড়'ই লিখিয়া থাকেন, আর তদ্রূপ অক্ষম অসমীয়া উচ্চারণমত অক্ষরই ব্যবহার করেন। 'মানুহর' এবং 'শেহত' এই দুই বাক্যে অসমীয়া কোন্ ব্যাকরণ মতে 'ষ'র পরিবর্ত্তে 'হ' ব্যবহৃত হইয়াছে,—আমরা বলিতে অক্ষম; আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে লিখিবার সময় 'ষ' ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য, কেবল ঐ বর্ণ উচ্চারণে অসামর্থ্য প্রযুক্ত তাহা 'হ' বলিয়া উচ্চারিত হয় মাত্র।* এই 'ষ' স্থানে 'হ'র উচ্চারণ শ্রীহট্টাঞ্চলেও কিয়ৎ পরিমাণে শুনা যায়, কিন্তু তজ্জন্য লিখিত ভাষায় 'হ'র ব্যবহার চলে না, উহা একটা ভাষা বিভিন্নতার লক্ষণ বলিয়াও গণ্য হয় না। 'আগ বাঢ়িছে', 'পুলিটি' (নব তৃণাঙ্কুর; বাঙ্গালায় ক্ষুদ্রার্থে—যথা, ছেলে-পুলে), 'বেজারর', 'খুঁকুরি' (সন্দেহ), 'গস্তি', 'লাগতীয়াল' (বাঙ্গালায় 'লাগমত') 'ঢাল' প্রভৃতি বাঙ্গালার দেশজ শব্দ মাত্র (only a corrupt and vulgar dialect of Bengali); অসমীয়ার স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন চেষ্টায় বিশুদ্ধ লিখিত ভাষায় এরূপ অপভাষার অবাধ ব্যবহার সদ্বিবেচনার কার্য্য বোধ হয় না। 'মনত', 'ওচচত', 'পক্ষত' প্রভৃতি সপ্তম্যন্ত পদে 'ত'এর ব্যবহার বাঙ্গালার 'তে'র অনুরূপ; মনেতে, গোচরেতে পক্ষতে প্রভৃতির 'তে'র কার্য্য আজি কালি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় মাত্র একার দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, অসমীয়াতে এখনও পূর্ব্ব রীতি বিদ্যমান। 'জগদীশ্বরর' 'বেজারর', 'মানুহর' প্রভৃতি পদস্থিত সম্বন্ধ সূচক র-এর পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণগত এ কার বিলোপ দ্বারা বাঙ্গালার পদ্ধতি হইতে পার্থক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে; উড়িয়া ভাষাতেও অবিকল ঐ ভাবে র ব্যবহৃত হইয়া থাকে—ইহাতেও আমাদিগের পূর্ব্বকথিত মিথিলা, উড়িষ্যা ও আসাম সীমা পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার বিস্তৃতিরই পরিচয় বুঝা যায়। 'দকৈ শিপাইছে' = বদ্ধমূল হইয়াছে, 'বেলেগ' = পৃথক্, 'মাথোন' = মাত্র, 'বিলাক' = সমূহ, 'ফাললৈ' = দিকেই, প্রভৃতি কয়েকটী কথা বাঙ্গালা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রতীয়মান হয় বটে; নচেৎ 'ওচরত' = গোচরে, 'দুপতিয়াতে' = দুই পাতায়, 'জঁয়' = যায়, 'স্বতন্তরীয়া' = স্বতন্ত্র, 'ইয়ার' = ইহার, প্রভৃতি কথায় বাঙ্গালার প্রকৃতি ও পরিচ্ছদ সম্যক্ পরিদৃশ্যমান। "অসমীয়া ভাষা"র প্রবন্ধ-লেখক গোস্বামী মহাশয় নিজ প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ব্রাউন সাহেবের মতে, অসমীয়া ভাষার মধ্যে শতকরা ৭ টী অকা, ৫ টী মগ, ১ টী খাম্টী, ১ টী আবর, ২৩ টী মিশমি এবং ৬৩ টী সংস্কৃত মূলক শব্দ; উপরি উদ্ধৃত অংশে, এবং অসমীয়া ভাষার সর্ব্বত্রই দেখা যায়—সংস্কৃত মূলক শব্দ মাত্রেরই আকার ও পরিচ্ছদ বাঙ্গালার ন্যায়; কেবল অনার্য্য অকা, মগ, খাম্টী, আবর প্রভৃতি জাতির ভাষা উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে পৃথক্ ভাষারূপে পরিণত করিয়াছে এবং লিঙ্গ, বচন, কারক, ক্রিয়াদিতেও, বাঙ্গালার তুলনায়, কিঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটাইয়াছে। এরূপ অবস্থায়, যে সমস্ত অসমীয়া

* There is a further difference in pronunciation, which more than anything else tends to make interchange of ideas difficult between a speaker of Bengali and of Assamese, *viz.*, the change of the letters *sh* and *s* to *h* and of *chh* and *ch* to *s*.—Report on the Census of Assam, 1891 Part II. Chap. VIII. para. 160.

ভদ্রলোকের মতে "বাঙ্গালা এবং অসমীয়া দুইটাই সংস্কৃত মূলক ভাষা, তজ্জন্য অসমীয়া ভাষার উন্নতি করিতে গেলে বাঙ্গালা ভাষার দিকেই পরিণতি দাঁড়াইবে এবং শেষে উভয় ভাষা একীকৃত হইবে", * তাঁহাদিগেরই পরিণামদর্শিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের ন্যায় দুঃখ করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। শব্দ শক্তির অনির্ব্বচনীয় প্রভাব; ভিন্ন ভিন্ন রাজার শাসন কালে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার বিস্তর কথা আমাদিগের ভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছে—বাঙ্গালার গ্রাম্য ভাষায় এজন্য অনেক আরব্য, পারস্য প্রভৃতি যাবনিক কথা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, অধুনা চলিত ভাষায় অনেক ইংরাজি কথাও অলক্ষ্যে প্রবেশলাভ করিতেছে। লিখিত ভাষায় ঐ সমস্ত গ্রাম্য ও দেশজ কথা পরিহার এবং ভাষার তেজ ও বিশুদ্ধতা বর্দ্ধন করিতে গেলেই আমাদিগকে সংস্কৃতের আশ্রয় লইতে হয়; স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক ইংরাজি কথার প্রতিশব্দ সংস্কৃত-মূলক করিয়া বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, এখনও অনেক কৃতবিদ্য বঙ্গীয় লেখক তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথ অনুসরণ করিতেছেন। অসমীয়া ভাষার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে গেলেও উহা হইতে ঐরূপ অনার্য্যজাতির কথা সমস্ত দূর করিয়া, তাহার স্থানে সংস্কৃত মূলক বিশুদ্ধ বাক্য সন্নিবিষ্ট করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, আর তাহা হইলেই বাঙ্গালা ও অসমীয়ার অভেদ অবস্থা দাঁড়াইবার সম্ভাবনা।

ইংরাজি ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত আসামের আদালত ও বিদ্যালয় সমূহে বঙ্গভাষাই প্রচলিত ছিল। তখন পর্য্যন্ত বঙ্গ ও অসমীয়া ভাষা বিভিন্ন বলিয়া কোন অসমীয়ারই বোধ ছিল না,—অসমীয়া মাত্রেই মাতৃভাষা নির্ব্বিশেষে বঙ্গভাষার পরিচর্য্যা করিতেন। পরে, নব্য অসমীয়া বন্ধুগণের মতে, আসামের সাহিত্য-আকাশে সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইল;—বিখ্যাত Baptist Mission Society নামক খ্রীষ্টশিষ্যগণ আসামের সাহিত্য-গঠনে তৎপর হইলেন,—শিবসাগরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক অসমীয়া ভাষায় খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়ও এ পক্ষে সামান্য সহায়তা করেন নাই, তাঁহাদিগের যত্নেই নবগঠিত অসমীয়া ভাষায় 'বাইবেল' অনুবাদিত হইল; মাননীয় Robinson এবং Brown সাহেব কর্ত্তৃক অসমীয়া ভাষার ব্যাকরণ বিরচিত হইল; পাদরি পুঙ্গবদিগের দ্বারা 'অরুণোদয়' নামক অসমীয়া ভাষায় প্রথম মাসিক সমালোচনা-পত্র প্রকাশিত হইল; এবং ক্রমশঃ Branson নামক জনৈক সাহেব কর্ত্তৃক অসমীয়া ভাষার অভিধানও আবিষ্কৃত হইল। এ ঘটনা অসমীয়া বন্ধুগণের বিবেচনায় সৌভাগ্যের বিষয় হইতে পারে এবং তাঁহারা তদ্দ্বারা জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা ইহাতে দুই বিন্দু অশ্রুবর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারি না। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নবজীবন সঞ্চারের নিমিত্ত স্বর্গীয় মহানুভব শঙ্করদেব কর্ত্তৃক যে ভাষা গঠিত হইয়াছিল, আজ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য ইংরাজ হস্তে সেই ভাষার নূতন পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইল। বাটীর পার্শ্বের বাঙ্গালী বিদেশী হইল, আর সাগর-পার হইতে সাহেব আসিয়া স্বদেশী হইলেন!—

* উপরি উদ্ধৃত অংশের শেষাংশ দেখুন।

মাতৃভাষায় অভিধান ও ব্যাকরণ ম্লেচ্ছ মিশনারী আসিয়া প্রণয়ন করিলেন! পতিত ভারতের পক্ষে ইহাপেক্ষা সৌভাগ্যের পরিচয় আর কি হইতে পারে? মিশনারী সাহেবগণ কর্ত্তৃক যেরূপ পরিমার্জ্জিত ভাষা সৃষ্ট হইয়া থাকে, "মথি লিখিত সুসমাচার" পরিজ্ঞাত পাঠককে তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না; আর উল্লিখিত অভিধান সম্বন্ধে উত্তর-পূর্ব্ব বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক পোর্টর সাহেব ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের স্বীয় বিজ্ঞাপনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "আসামীদিগের জন্ম আসামে মিশনারীদের কীর্ত্তি স্থানে কিত্তি, অকির্ত্তন—অকীত্তন, অকৃতজ্ঞ—অক্রিতজ্ঞ, অক্ষয়—অখাই, অশ্রদ্ধা—অচধ্যা, অচিহ্ন—অচিন, যবক্ষার—জখার, ইত্যাদি সন্নিবেশ করিয়া স্বতন্ত্র অভিধান লিখিবার কিছুই আবশ্যকতা নাই। ইহাতে কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গালাকে নাশকরা হয় মাত্র।"* অসমীয়া ও বাঙ্গালার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস, বুদ্ধিমান পাঠক ইহা হইতেই বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আমাদিগের আলোচ্য বিষয় এত গুরুতর যে, সামান্য প্রবন্ধে তাহার সম্যক্ বিচার সম্ভবে না, আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। 'জোনাকী'র প্রবন্ধাতীত ইতিহাসও আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি। ঐ প্রবন্ধ হইতেই আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, হিন্দুরাজত্ব কালে আসাম প্রদেশে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল; মধ্যে অনার্য্য জাতির অভ্যুদয়ে আসামের স্বাধীনতার সহিত ভাষাও বিলুপ্ত হইয়াছিল; পরে আহম-প্রাধান্য-যুগে ৺শঙ্করদেব কর্ত্তৃক বঙ্গভাষা এদেশে প্রবর্ত্তিত হয় এবং ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হইতে বঙ্গদেশীয় শিক্ষকগণের শিক্ষায় ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত লিখিত ভাষায় বাঙ্গালাই অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ইত্যবসরে মিশনারী সাহেবগণের চেষ্টায় বাঙ্গালাকে বিকৃত করিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিগত কতকগুলি শব্দ মিশ্রিত কনিয়া অসমায়া ভাষার নব কলেবর গঠিত হইয়াছে, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া অসমীয়া নব্য কৃতবিদ্য বন্ধুগণ অসমীয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্য নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং সরকার বাহাদুরও তাহাতে পোষকতা করিতেছেন।. ভাষাভেদ যে ভারতের অধঃপতনের অন্যতম হেতু, ইহা সকলেই আজ-কাল অনুভব করিতে পারেন; ঐক্য-বল-সংস্থাপনের চেষ্টায়, সে জন্য, আজ কাল জাতীয় মহা সমিতিতে পরস্পর চিত্ত-বিনিময়ের উৎকৃষ্ট উপায় এক ভাষা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এবং ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্য উপায় না থাকায়, ইংরাজির দ্বারা সে প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায়, কৃত্রিম উপায়ে এক ভাষার মধ্যে গৃহ বিচ্ছেদ সাধন করিয়া,অসমীয়া বন্ধুগণ কিরূপ সদ্বিবেচনার কার্য্য করিতেছেন—ইহা স্থির চিত্তে চিন্তা করিতে অনুরোধ করাই আমাদিগের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

* "উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নহে" নামক গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

এক অপরিজ্ঞাত কবি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সঘন কোলাহল হইতে দূরে, লোক-সাধারণের অপরিজ্ঞাত জনৈক বাঙ্গালী কবি জন্মিয়াছিলেন। স্বতঃ সৌন্দর্য্য-ধ্যান-নিরত—স্বভাবের অতি নিভৃত সারস্বত-শিবিরে, এই কবি সৌন্দর্য্যের ধ্যানে সততঃ নিমগ্ন থাকিতেন। সে ধ্যান প্রশান্ত, প্রগাঢ়, পবিত্র; এবং এই অপরিজ্ঞাত কবি-প্রকৃতির সর্ব্ব প্রধান অংশ, উপাদান, প্রাণ বা যথা-সর্ব্বস্ব ছিল। এই কবি, কবি-জনোচিত গীতি না গাইতেন, না গাইয়াছিলেন, এমন নয়;—আত্ম-ভাবে বিভোর হইয়া, বিগলিত এবং বিমোহিত হইয়া, ইনি আপন মনে আপনি গাইতেন,—সে গান মিষ্ট ও মহানও বটে; কিন্তু, গান অপেক্ষা ধ্যানেই ইহাঁর অধিকতর প্রবণতা; ইহার কবি-জীবন এবং কবিত্বের জীবনী-শক্তি গান অপেক্ষা ধ্যানেই অধিক পরিমাণে বাহ্মিত হইয়াছিল; পরন্ত, গান অপেক্ষা ধ্যানেই ইহাঁর বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব অধিকতর অনুভবনীয়। ব্যক্তিত্ব খুব বৃহৎ নয়, বিশেষত্বও বেশী বিস্তীর্ণ নয়; কিন্তু, বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব ইহাঁর কিছু ছিল। তাহা ছিল গানে, ততোধিক তাঁহার ধ্যানে। গান ধ্যানেরই ক্ষণিক অনিবার্য্য উচ্ছ্বাস স্বরূপ উত্থিত হইত। কবি ক্বচিৎ আত্ম-সংযমে যেন অসমর্থ হইয়াই গান গাইতেন; সে গান কতক কেহ কেহ শুনিয়াছিল; তাহার অনেক অদ্যাপি অশ্রুতও আছে; অশ্রুতই হয় ত থাকিবে। ধ্যানশীল কবি-সম্প্রদায় তাঁহাদের সব গান শুনাইতে চাহেন না। এই কবি, এমন অনেক গান গাহিতেন, যাহা লোককে শুনাইবার জন্য গীত হইত না—গীতের জন্য গীত হইত, অর্থাৎ স্বভাবের ঐকান্তিক উত্তেজনা নিবারণার্থে গীত না হইলেই চলিত না। গানশীলতা গীত শুনায়; ধ্যানশীলতা গান গোপন করে। গান গোপন করা, এই অজ্ঞাত কবির অভ্যাস ছিল। তিনি গান গোপন করিতেন এবং শুনিয়াছি গোপনে গান করিতেন। সে গান কত সময় সূত্রহীন, সংসার-সঙ্গতি হীন, আদ্য-মধ্য-অন্ত-হীন—

"অচেতনে চেতন! ঘুমন্তে জাগা!
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা।"

সে গান অশরীরী সৌন্দর্য্যের "airy nothing" অজ্ঞাত দেশের অস্ফুট বার্ত্তা; অপরিজ্ঞাত বীণার অপরিচিত ধ্বনি;—তাহা

"The forms of things unknown."

সে গান কবি-কথিত ("aerial kisses of shapes that haunt thought's wildernesses") কল্পনা-কানন-বিহারী অশরীরী অঙ্গের সমীর-চুম্বন;—এক অতি সুমধুর সত্তা; অস্থি-মজ্জা-মেধ-মাংস-হীন, আকার-অবয়ব-হীন; অথচ সম্মুখস্থ সজীব মনুষ্য-দেহ অপেক্ষা অধিকতর অস্তিত্ব-সম্পন্ন, দৃঢ়তর সত্য প্রত্যক্ষ, তাহা অমর

More real than living man, nurslings of immortality.

কবি গোপনে, অল্পাধিক পরিমাণে এই প্রকৃতির গীত গাইতেন; কখন কখনও এই গীতের অশরীরী স্বরূপের শরীর "ছন্দ বন্দ" দ্বারা গঠিতও করিতেন। যাহা গঠিত হইত, তাহা অপেক্ষা অধিক অগঠিত থাকিত;—অথচ ইহাঁর অসাধারণ গঠন-নৈপুণ্য ছিল। যাহা গঠন করিতেন, তাহা সুগঠিত হইত; কিন্তু তদীয় গীত-স্বরূপের সর্ব্বাঙ্গ গঠনে তিনি

সমর্থ ছিলেন, এখনও বলিতে পারি না। গান, সান্ত, সঙ্কীর্ণ; ধ্যান অসীম অনন্ত। অসীম সৌন্দর্য্য সসীম দ্বারা সুব্যক্ত করিতে কে কবে পারিয়াছে? কবি তদীয় আত্মার আভ্যন্তরীণ ভাব-স্রোতে ভাসিয়া অজ্ঞাতে ইন্দ্রিয়াতীতের এক মহা দেশে, কল্পনার কি এক মায়া-রাজ্যে, কিম্বা স্বপ্নের কেমন-এক ছায়া-রাজ্যে চলিয়া যাইতেন;—শরীরী ও অশরীরী উভয় রাজ্য ব্যাপিয়া এক অবিমিশ্র অতি কোমল, তরল এবং শীতল সৌন্দর্য্য-স্রোত প্রবাহিত হইত; ধ্যান-মগ্ন কবি আত্মস্থ বা আত্ম বিস্মৃত হইয়া তাহা উপভোগ করিতেন, তাহাতে অবগাহন করিতেন; ইহ সংসারের কোলাহলের সহিত সংস্রব রাখিতে চাহিতেন না;—গান তিনি অতি অল্পই গাইয়াছিলেন।

সে গান সাঙ্গ হইয়াছে। সে ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতের সহিত মিশিয়াছে। জীবন-সঙ্গীত সাঙ্গ করিয়া,লোক-অপরিজ্ঞাত আমাদের এই কবি, যেমন লোক-দৃষ্টির অগোচরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং লোক-দৃষ্টির বাহিরে কবি-জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তেমনি লোক-বিখ্যাতির অতীত ভাবেই অন্তর্হিত হইয়াছেন!

কবি গিয়াছেন। কবিতা কিছু আছে। সে অতি কোমল কবিতা। কোমলাদপি কোমল। মিষ্ট, মসৃণ, মোলায়েম। আবেশ-ময়ী;—ইথরবৎ আকাশ-বিহারিণী।

"সুকোমল চরণ-কমল দুটি
ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটি, আঁচল ধরায় পড়ে লুটি,
করে পদ্ম-ফুল
করে ঢুল-ঢুল,
অলসিত আঁখি-সম আধো আধো ফুটি,

কঠিন মাটির কর্কশ স্পর্শ সহে না। অতি সাবধানে তাহা ছুঁইতে হয়। নহিলে নবনীতবৎ এলাইয়া যায়,—নক্ষত্রবৎ ছুটিয়া পলায়। এই ধরি ধরি ধরিলাম, ভাবিতেছি, অমনি তখনি কোথায় চলিয়া গেল, সে সূত্র নাই—সে সৌন্দর্য্য নাই, অপর এক অলক্ষ্য সূত্র সহযোগে ভিন্ন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত! একই মুহূর্ত্তে বহুমূর্ত্তিমতী,—বহুরূপিনী, বহু ভাবময়ী এই কবিতা। স্বপ্নরাজ্যের সূত্র দ্বারা যেন ইহা গ্রন্থিত, সন্ধি ও মিলন-স্থল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যেন ভিত্তিহীন এক অপরূপ অট্টালিকা; শূন্যের পরে কুসুম-সৌরভের সমুন্নত সৌধ সৌন্দর্য্য-গ্রন্থিতে স্তরে স্তরে গাঁথা! সৌন্দর্য্য-রাজ্যের রসাভিজ্ঞেরই তাহা উপভোগ্য। উপভোগের সন্ধান ও সঙ্কেত না জানিলে সৌধ খসিয়া পড়ে; সৌরভ সরিয়া যায়; সে কবিতা খাঁটি সৌন্দর্য্যের খাদহীন স্বর্ণ; সুতরাং তাহাতে গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী বাসন কোষণ বা গৃহিণীর গহনা গঠিত হইবার উপায় নাই। এ হিসাবে, তাহা একান্ত অব্যবহার্য্য; কারণ খাদহীন। কিছু খাদ মিশ্রিত থাকিলে লোকের ব্যবহারোপযুক্ত হইতে পারিত। খাঁটি সোণা মানুষ মানুষীর সৌন্দর্য্য-স্পৃহা পরিতৃপ্ত করিতে পারে, কিন্তু ঘর সংসারে ব্যবহারে আসে না;—শেকবা সোণায় খাদ মিশাইলেই তবে তাহা সুন্দরীর সংস্পর্শ-যোগ্য হয়, তিনি তাহার অস্তিত্ব মঞ্জুর করেন।

কবি গিয়াছেন। কবিতা আছে। চিরকাল থাকিবে। তাহা অতি জীবন্ত কবিতা। অথচ তাহার কবি অপরিজ্ঞাত। অপরিজ্ঞাত ছিলেন; তদ্রূপ গিয়াছেন। অমর কবিতার কবি লোক সাধারণের অজ্ঞাত,—হেতু কি?

তদীয় কবিতা অমর, উজ্জ্বল, কোমল, মিষ্ট, হৃদয়ে সুধা-সিঞ্চিনী। কিন্তু, সৌন্দর্য্য-রাজ্যের এমন সূক্ষ্ম কথায় পূর্ণ সে কবিতা যে, তাহা প্রচলিত সাহিত্য-সমালোচকের অনায়ত্ত, সাহিত্য-ব্যবসায়ের অবিজ্ঞাপিত; তাহা সৌন্দর্য্য-মন্ত্রে অদীক্ষিত লোক সাধারণের অবোধগম্য; অথচ সংসারে সেইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক। অতএব এই কবিতা সাহিত্য-বিপণিতে বিরল, অবিক্রেয়। কবি অপরিজ্ঞাত।

কিন্তু ইহাও এই কবির সৌভাগ্য। কারণ আমি বিবেচনা করি, তাঁহার কবিতা জন সাধারণের মধ্যে বহু বিস্তার লাভ করিলে, তাহা নিশ্চয়ই ইতরীকৃত হইত; তাহার আত্মায় অপবিত্রতা স্পর্শিত। * কোনও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, র'থো সাহিত্য (Street literature) হয় না; হওয়া উচিত নয়। উৎকৃষ্ট গান গাড়োয়ানের মুখে মারা পড়িয়াই থাকে। পক্ষান্তরে, গাড়োয়ানী গীত গাড়োয়ানে রচিলেই তাহার অধিক আদর হয়; হওয়া স্বাভাবিক, হইয়াও থাকে তাই। অপিচ, গর্দ্দভ-সমাজে যদি গ্রন্থ প্রেরণের আবশ্যক হয়, তবে রজক-গৃহই বোধ হয় তাহার রচনা কার্য্যের পরিপাটী স্থান। অন্যথা, মনুষ্যকেই মুহূর্ত্তের জন্য সেই গরীয়ান আসন গ্রহণ করিয়া গ্রন্থ লিখিতে হয়। নহিলে সে সুবিজ্ঞ "পাবলিকে" পাঠ্য বিষয়ের পশার সম্ভবে না। ফলতঃ উপযোগিতা অনুসারেই দ্রব্যের আদর হয়। যাহা সাধারণ রুচি প্রবৃত্তির পরিপোষক নয়, তাহা যতই উৎকৃষ্ট, উপাদেয় বা উন্নত হউক না, সাধারণ্যে আদৃত হইতে পারে না। আবশ্যকতা তাহার প্রভূত পরিমাণেই থাকে; কিন্তু আদৃত হয় না।

অতএব এই অপরিজ্ঞাত কবি, আমাদের মধ্যে যদি অপরিজ্ঞাতই থাকেন, আমরা তদীয় কাব্যের আদর, আহ্বান ও অনুসন্ধান না করিয়া, গর্দ্দভেশ চন্দ্রদিগের গাড়োয়ানী গ্রন্থ গাদা গাদা সংগ্রহ করি,—সে দোষ আমাদের নহে। স্বভাব, শিক্ষা ও সাহিত্য-সমাজের অবস্থা, তাহার জন্য দায়ী।

কিন্তু, এই অপরিজ্ঞাত কবি কে? অভিজ্ঞের পক্ষে ইঙ্গিতই যথেষ্ট। সৌভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্মশানে, শতকরা অন্ততঃ একজন করিয়া লোকও এখনও থাকা অসম্ভব নহে, যাঁহারা অনুশীলনে ও উদারতায় অবস্থাজ্ঞ। অবস্থাজ্ঞ ইঙ্গিতেই বুঝিয়াছেন, এই কবি কে? কিন্তু, সকলে বুঝিবেন না। বিশেষতঃ গৌড়ীয় সাহিত্যের উপস্থিত অতিসার অবস্থার অধ্যাপক ও ছাত্রেরা যদি ঘটনাক্রমে এই প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাঁহাদের সাহায্যার্থে সবিস্তারে আমার বলা কর্ত্তব্য, এই কবি কে? কিন্তু

* উচ্চ শ্রেণীর কবিদিগকে ইতরের হাতে ইতরীকৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বিশেষতঃ যে সকল কবি আত্ম প্রকাশে অকাতর এবং যাঁহাদের অভিনব সুর ও ছন্দের কবিতা, তাঁহাদিগকে প্রায়ই উপহাসের বিষয়ীভূত হইতে দেখা যায়। মেঘনাদ বধ কাব্যের কবির দুর্গতি আমরা অনেক দেখিয়াছি। তাঁহার সুরের ছন্দের ইতরীকরণ অদ্যাপিও একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। রবীন্দ্র বাবুর কবিতা তাঁহার শত্রু মিত্র উভয় শ্রেণীর লোকই ইতরীকৃত করিয়া থাকে। অনুকারীদের হস্তে ইনি অধিক পরিমাণে ইতরীকৃত। উপরে যে কবির কথা বলা হইতেছে, তাঁহার কোনও কাব্যের দুই চারিটি শ্লোক কোনও বিষয়ী ব্যক্তি পাঠ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন;—তাহা আদৌ বলিবার নয়। কবি-হৃদয়ের বিমলানন্দের অস্তিত্ব যে থাকিতেই পারে, এমন ধারণাই কত লোকের নাই। তাহারা সে কথা শুনিয়া উপহাস করে, গালাগালি দেয়।

মিনতি করি, কেহ খুব একটা প্রকাণ্ডতার কল্পনা করিবেন না। এই কবি, যেমন বিখ্যাত নহেন, তেমনি বৃহতও নহেন, আমি অগ্রেই বলিয়াছি। খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং বৃহত্ব, ইনি বুঝিতেনও না তেমন। এই শব্দ কয়টী তাঁহার অভিধানে একেবারে ছিল না বলিয়াই আমার আশঙ্কা হয়। এই কবি, কলিকাতা রাজধানীর সঙ্কীর্ণ অবস্থাপন্ন কোনও গৃহস্থ সন্তান। কিন্তু, রাজধানীর রাজা, রাজার রাজা অপেক্ষাও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী। সে অলিক বা অমূলক ঐশ্বর্য্য নহে, অধিকারসত্বে তিনি তাহা অতি মাত্র উপভোগ করিতেন। এবং সে উপভোগ রাজৈশ্বর্য্যের আরাম অপেক্ষা অধিকতর সুখ-প্রদ, তাহা শান্তি রাজ্যের সৌন্দর্য্যোপভোগ। সৌন্দর্য্যের সংখ্যাতীত মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া এই সংকীর্ণ অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ শান্তি-সম্পদে, আপনাকে "ব্রহ্মাণ্ডের পতি" বিবেচনা করিতেন। নিঃস্বার্থ সৌন্দর্য্যানুভব আনন্দ, হায়! এমনই বটে! এখনকার কোনও গৃহী লোক ধন মানের মায়া কাটাইয়া কোনও একটী মানসিক আনন্দে একেবারে ডুবিয়া যাইতে পারে, চিরজীবন তাহাতে ডুবিয়া থাকিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন বটে। বিশ্বাস ত বিশ্বাস; ইহা এখন বিদ্রূপই আকর্ষণ করে। কথাটা শুনিলে আমরা হাসিয়াই খুন হই। তা হউক। এই ব্যক্তি বস্তুতই সৌন্দর্য্য-সাগরে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিলেন:—তিনি আত্মহারা হইয়া তাহার উপাসনা করিতেন, তাহাকে উপভোগ করিতেন, তাহার সহিত যেন মিলিত হইয়া যাইতেন।

"ক্ষুধা তৃষা দূরে রাখি,
ভোর হ'য়ে বসে থাকি,
নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার।
তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
হোগ্‌গে এ বসুমতী যার খুসি তার!"

সৌন্দর্য্যের শান্তি সম্ভোগে ইহার এই প্রকারের উক্তি। এরূপ উক্তি আরও অনেক আছে এবং আমি যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে এই ব্যক্তির জীবন কার্য্য, সেই সকল উক্তির সম্পূর্ণ অনুরূপ। অথচ ইনি খুব সেকালের লোক নহেন। খুব সেকালেরও নহেন, খুব একালেরও নহেন, মধ্য-সময়ের, বরং নাতি মধ্য সময়ের লোক। এই সম্ভ্রম-সমালোচনা-সম্পদ পিপাসাতুর সময়েরই লোক! ধর্ম্মযোগী বা কর্ম্মযোগীও নহেন। কাব্য-কবিতার উপাসক লোক, অপরিজ্ঞাত কবি। ইহাঁর নাম ছিল বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী। নেহাত অজ্ঞাত নাম নয় কি?

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীকে আমি স্বচক্ষে কখনও দেখি নাই। * তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার কখনও পরিচয় ছিল না। তৎকৃত কবিতা কখনও কখনও পাঠ করিয়া এবং তদীয় শান্তি-সেবিত জীবনের ও সৌন্দর্য্য-ধ্যান নিমগ্নতার কোন কোনও কথা কচিৎ শুনিয়া, আমি তাঁহাকে মানস চক্ষে যেরূপ দেখিতে পাইতাম, উপরে

* স্বচক্ষে দেখার সুযোগ বহুকালাবধি ছিল না; তাহার পরে হইয়াছিল। কিন্তু, কখনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ার অভিলাষ হয় নাই। অথচ সাহিত্য-চর্চ্চায়, কেবল সাধারণভাবে নহে, সবিশেষ ভাবে তাঁহার নিকট হইতে আমি উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যে অনুগ্রহ তিনি অনেককে করেন নাই, অপরিচিত সত্বেও তাহা এই লেখককে করিয়াছিলেন। কিন্তু, তথাচ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার অবসর হয় নাই। আমাদের কবিত্বানুরাগ ও হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা এমনি অপরিমেয় পদার্থ!!

তাঁহার তদনুরূপ একটী প্রতিরূপ অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। হইতে পারে, উহা প্রকৃত প্রতিরূপ নহে; হইতে পারে, উহা অতিরঞ্জিত বা অপূর্ণ। তাহা হইবারই সমূহ সম্ভাবনা। আমি নিজের চক্ষে যেমন দেখিতাম, তাহাই বলিয়াছি। কিন্তু পাঠককে পরের চক্ষে দেখার অনুরোধ করি না। সহৃদয়ের হৃদয়ে এই কবিকে কিঞ্চিন্মাত্রায় প্রতিভাত করিবার জন্য, তদীয় কবিতা এক্ষেত্রে, অল্লাধিক পরিমাণে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। উপরে এ আলোচনা যতটুকু করিয়াছি এবং যেরূপ ভাবে করিয়াছি, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে।

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী প্রকৃতির অতি কোমল অংশের উপাসক। সে অংশ বিশাল স্বভাবের সুকুমার সৌন্দর্য। চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেই সৌন্দর্য্যের কবি। খাঁটী, অবিমিশ্র, নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্য অথবা সেই সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে, ইঁহার ধ্যান ধারণা ও উপাসনার বিষয়ীভূত; এবং সেই উপাসনা অর্চ্চনা হইতেই ইহঁার সঙ্গীত উদ্ভূত। সৌন্দর্য্য বা সুকুমার কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে এদেশীয়েরা বলেন, সরস্বতী, ইয়ুরোপীয়েরা বলেন "Muse"। গ্রীসে ইঁহার অপর এক নাম ছিল "Grace"। সৌন্দর্য্যের সারভূতা এই মহাদেবী, দেশীয়, বিদেশীয় সকল কবি কর্ত্তৃকই সেবিতা;—আমাদের এ কবিও অবশ্য ইঁহারই সেবক। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যেশ্বরীকে সাধারণতঃ অন্যান্য কবি যেরূপভাবে দেখিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র ভাবে, এই কবি তাঁহার সত্তানুভব করিতেন। সে অনুভূতি কিছু অসাধারণ এবং অভিনব। পরন্তু সেই অনুভূতিই এই কবির একমাত্র "আইডিয়া"—তাঁহার যাবতীয় কাব্যের যথাসর্ব্বস্ব। সেই অনুভূতির আকুঞ্চন, প্রসারণ হইতে উৎপন্ন বিবিধ সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্য, তাহাদেরই সমাবেশ এবং অতি মহৎ চিত্র এই কবির কাব্যে। একদিকে সৌন্দর্য্য সাধারণতঃ এই কবি কর্ত্তৃক গীত; পক্ষান্তরে, পার্থিব সৌন্দর্য্যের জীবন্ত প্রতিকৃতি,—রমণী-জাতির মাহাত্ম্য-মাধুরী ইহঁার সঙ্গীতে প্রতিভাত। দ্বিতীয়, প্রথমেরই রূপান্তর। কিন্তু, এরূপভাবে, একাধারে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং জগদ্ধাত্রী রূপিণী রমণীকে, জগতের অতি অল্প কবিই অর্চ্চনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে একজন ব্যতীত অপর কেহ নারীজাতি সম্বন্ধে, ইহার ন্যায়, উচ্চ আদর্শ কখনও অনুভব ও অভিব্যক্ত করেন নাই; অন্ততঃ আমার এইরূপ ধারণা।

এখন মোটের উপর কথা এই যে, প্রথমতঃ সৌন্দর্য্য এবং দ্বিতীয়তঃ পার্থিব সৌন্দর্য্যের সারভূতা রমণীজাতি এই কবির কবিতার বা সঙ্গীতের উদ্দীপনা ও উপজীব্য। অতএব তাঁহার কবিত্বানুভব কল্পে কেবল এই দুই বিষয় অনুধাবনীয়। কিন্তু বড়ই বিস্তৃত এই বিষয় দুইটী।

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী নিছক সৌন্দর্য্যের কবি। তাঁহার কবিতা ও কবিত্ব কি প্রকারের, বুঝাইতে হইলে, সৌন্দর্য্য পদার্থের স্বরূপ কি, বুঝাইতে হয়। কিন্তু তাহা সহজ নহে। তাহা সহজ ত নহেই, তাহা, আদৌ সাধ্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইহা মনো-বিজ্ঞানের একটী মহা জটিল তত্ত্ব। সাংখ্য পতঞ্জলী বা প্লেটো পিথাগোরাস হইতে এ কাল পর্য্যন্ত কোনও মনস্বী এ তত্ত্বের সম্যক মীমাংসা করিতে পারিয়াছেন কিনা,

সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা নিজেই সংশয়ী।* অধ্যাত্মবাদী (idealist) দার্শনিকদিগের মতে সৌন্দর্য্যের আদৌ কোনও বহিঃসত্বা নাই; তাহা সম্পূর্ণরূপে অন্তরের বস্তু। মনুষ্যের মনে সৌন্দর্য্যানুভব শক্তি না থাকিলে বাহিরের কোন বস্তুতেই তাহা অনুভূত হইত না। সৌন্দর্য্য-মাধুরী মনেরই সৃষ্টি মাত্র; কুৎসিৎ কদাকারও তাহারই সৃষ্টি। সে সৃষ্টি স্বতঃনিঃসৃত ও অনুশীলন-মার্জ্জিত মানসিক শক্তিসম্ভূত। বস্তুগত দ্রব্য স্বরূপের কোনও স্বাধীন সত্বা নাই; কেন না, মনের অনুভব শক্তি ব্যতীত তাহা অনুভূত হইবার উপায়াভাব। অগ্নির উত্তাপ বা শর্করের মিষ্টত্ব তোমার অনুভূতি ও স্বাদ-গ্রহণ শক্তির পরিচায়ক অথবা উক্ত দুই দ্রব্যের বস্তুগত উত্তাপ ও মিষ্টত্ব স্বরূপ বিদ্যমান আছে। দার্শনিক বলেন, অগ্নি নিজের উত্তাপ যখন নিজে অনুভব করে না; এবং শর্কর যখন নিজের মিষ্টত্ব স্বাদ নিজে গ্রহণ করিতে অসমর্থ; তখন বস্তুগত ঐ সকল গুণ উহাদেরই, ইহা বলিতে পারি না। পরন্তু, উহাদের স্বরূপ যখন তোমা কর্তৃক অনুভূত হইতেছে, দেখিতেছি, তখন ঐ স্বরূপ তোমারই মানসিক শক্তিসম্ভূত অবশ্যই বলি।† অনুভূতি উত্তেজনার্থে বহিঃপদার্থ কেবল উপলক্ষ মাত্র; আর কিছুই নহে। মানুষের যদি মিষ্ট রসাস্বাদ-শক্তি না থাকিত, তবে শর্করের শর্করত্ব সম্ভাবিত না। বহিঃদ্রব্যের স্বরূপ মাত্রেই এই কথা। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও কথা এই। তোমার যদি সৌন্দর্য্যানুভব ক্ষমতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই কোনও দ্রব্য সুন্দর হইতে পারে না। সৌন্দর্য্য কুসুমেও নহে, কামিনীর কোমল কটাক্ষেও নহে, উহা তোমার মনে।

ইয়ুরোপীয় আইডিয়ালিজিম বা অধ্যাত্মবাদের অভিমত এইরূপ। এদেশীয় দার্শনিক মতও এতদনুরূপ। জড়বাদের মত ইহার বিপরীত। কিন্তু জড়বাদের কঠোর আক্রমণে এবং বহুকালের তর্ক যুদ্ধেও আইডিয়ালিজিমের উপরোক্ত অভিমত অদ্যাবধি খণ্ডিত হয় নাই। ইয়ুরোপে বার্কেলে এই মতের অধিনায়ক। এ সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি তর্ক একরূপ অখণ্ডনীয়। জড়বাদী হিউম বলেন, দ্রব্য স্বরূপের স্বাধীন সত্তাভাব সম্বন্ধে বার্কেলের যুক্তি তর্ক (admits of no answer) খণ্ডন করিয়া কোনও উত্তর দেওয়া যায় না। পরন্তু, আলেকজেণ্ডার বেইন বলেন;—"All the ingenuity of a century and a half has failed to see a way out of the contradiction exposed by Berkeley.' ইহার তাৎপর্য্য হিউমের উক্তিরই অনুরূপ। ফলতঃ আইডিয়ালিজিম এতাবৎকালাবধি অখণ্ডনীয়। তথাচ ইহাই যে পূর্ণ সত্য, এমনও বলা যায় না। কোনও ইয়ুরোপীয় লেখক বলেন, "Idealism is but the moiety of a more comprehensive truth."

* "The science of aesthetics—the causes or conditions of beauty and sublimity seems to be still unsettled. Plato and Leibnitz, Hutcheson and Hogarth, Burke and Reynolds, Diderot and Alison have attacked the subject theorising and refuting, composing and criticising and they have done well, for any man who has anything to offer on such an issue is bound to put it forth and let it go for what it is worth." —The Science of Beauty By A. W. Holmes-Forbes.

† Applied to beauty the idealism would show that beautiful qualities are mental creations; that they have no more existence in the objects themselves than heat in the fire or sweetness in sugar." The Science of beauty.

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব সর্ব্ববাদীসম্মত হইলেও, তাহার অবস্থিতি স্থানের থিয়োরী সম্বন্ধে প্রথমেই মহা বিতণ্ডা। পরন্তু, সৌন্দর্য্যের উপাদান কি, তাহা কি কি উপকরণে গঠিত, তাহার প্রকৃত স্বরূপ ও স্বভাব কি প্রকার, এক কথায় প্রকৃত প্রস্তাবে সুন্দর কি অথবা সৌন্দর্য্য কেমন পদার্থ,—এবিষয়েও দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গণ্ডগোল আরও বেশী। দ্রব্যের উপকারিতা ও উপযোগিতায় সৌন্দর্য্য, তাহার পূর্ণতায় অথবা উচ্চতায় কিম্বা এক মাত্র মনোহারিতার উপরেই মাধুরী নির্ভর করে? তাহা বর্ণে, রূপ, রস গন্ধে অথবা ভাব-বৈচিত্র্যে? এই সকল প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর আছে এবং তাহাদের মধ্যে সত্যাসত্য উভয়ই অল্পাধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু, সৌন্দর্য্য তত্ত্ব বিশ্লেষণের স্থান ইহা নহে। এবং তদ্দ্বারা উপস্থিতক্ষেত্রে ফলও যে কিছু হইবে, তাহাও নহে। সৌন্দর্য্যকে তাহার উপাদান, আধার ও আধেয়কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া তাহার শিরা ধমনী নাড়ী নক্ষত্র নথ দর্পণে রাখিলেও হয় ত বুঝা যাইবে না, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে পদার্থটী কি? পরন্তু, তাহা যদি বুঝাও যায়, তথাচ শক্তির বিরহে তাহা সম্যক অনুভব করিয়া আরাম অনুভব করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। সৌন্দর্য্য যত না বুঝিবার বস্তু, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে অনুভব ও উপভোগের বস্তু। তাহা বরং বুঝান যায়, কিন্তু অনুভব করাইয়া দেওয়া যায় না। কবি ও ভাবুক, দর্শনে ও বিজ্ঞানে সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব পাঠ করিয়া কবিও ভাবুক হয়েন না। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যানুভব শক্তি অনুশীলনে উন্নত ও মার্জ্জিত হইয়া কবিকে কবি ও ভাবুককে ভাবুক করে। ফলতঃ সৌন্দর্য্য কি, তাহা বরং বুঝাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু, কেহ কাহাকেও তাহা অনুভব করাইয়া দিতে পারে না। সৌন্দর্য্য বস্তুগত বা হৃদয়গতই হউক, তাহার উপাদান কারণ যাহাই হউক, তাহা আত্ম-শক্তি দ্বারা অনুভবনীয়। সে শক্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, সৃষ্ট করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। স্বয়ং কবিগুরু বাল্মীকি আসিয়া অজগর গর্দ্দভের পেটে সে শক্তি পূরিয়া দিতে পারেন না। কালিদাস পণ্ডিত যেমন এক গণ্ডূষে কবিত্ব সাগরটা সটান উদরস্থ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত; এখনকার অনেক কুষ্মাণ্ড চন্দ্রেরা তেমনি কয়ের আঁকুড়ি টানিতে শিখিয়াই কাব্য কবিতার সৌন্দর্য্য সুখানুভব করা সম্ভব মনে করেন; সেটা সম্ভব হয় না; সুতরাং কাব্য কবিতা ও কবিদিগের স্কন্ধে আপনাদের কুষ্মাণ্ডত্বের অপরাধটা আরোপ করিয়াই পুরুষার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে এরূপ কুষ্মাণ্ড প্রকৃতির কবিরও বাজারে অভাব নাই। কবিত্বটা তাঁদের অত্যুর্ব্বর হৃদয়-কাননে কলা কচুর মত অনবরতই ফলবান।

সৌন্দর্য্য আদৌ দ্রব্য স্বরূপগত নহে, আমি এমন কথা বলিতে পারি না। তবে স্বাধীন ভাবে দ্রব্যস্বরূপে তাহার সত্বা না থাকিতে পারে। কিন্তু, সৌন্দর্য্য যে একেবারেই শূন্য পদার্থ, এমনও নয়। তাহা পদার্থের স্বরূপগত বটে। কিন্তু, তাহা হইলেও ত সেই স্বরূপগত সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শক্তি চাই। সৌন্দর্য্য এক দিকে পদার্থের স্বরূপ সাপেক্ষ বটে; কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে উহা অনুভব শক্তির অস্তিত্ব, উপযুক্ততা এবং তীক্ষ্নতা

সাপেক্ষ। দ্রব্যস্বরূপে হৃদয়ে একটী আঘাত মাত্র করে; সেই আঘাতজনিত হৃদয়ের যে ভাব, অর্থাৎ সৌন্দর্য্যানুভূতি এবং তজ্জনিত সুখানুভব, প্রীতি বিস্ময় প্রশংসাদি (admiration and appreciation of beauty) তাহা হৃদয়েরই ক্রিয়া। তাহা অর্থাৎ সেই ভাব উৎপাদনার্থে বুদ্ধি-শক্তি ও হৃদয় বৃত্তি পরিচালনার আবশ্যক। সে পরিচালনায় যে যে পরিমাণে সমর্থ, ঠিক সেই পরিমাণে সে সৌন্দর্য্যানুভবক্ষম এবং সেই অনুভূতির অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অধিকারী। অতএব সাধারণতঃ বুদ্ধি শক্তির মার্জ্জিত বা অমার্জ্জিত ভাব এবং হৃদয় বৃত্তির অনুশীলন বা তদ্বিরহ ভেদে সৌন্দর্য্যানুভূতি ও তজ্জনিত আনন্দের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। * ইহা সহজ কথা, তথাচ আরও বিস্তার ভাবে এ কথাটী বুঝাইতে পারিলে ভাল হইত, কারণ বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার সবিশেষ আবশ্যকতা আছে বলিয়া বিবেচনা করি;— কিন্তু, এক্ষেত্রে তাহার স্থান হইবে না।

সাধারণতঃ সৌন্দর্য্যানুভব সম্বন্ধেই যখন এই, তখন কাব্য-সৌন্দর্য্যানুভব কল্পে কি পরিমাণে অনুশীলন (Culture) আবশ্যক, তাহা কেবল অনুভবনীয়। ইতর লোকে যে উচ্চতর কাব্যের রসাস্বাদনে সমর্থ হয় না; তাহার প্রধান কারণ, ইতরের অনুশীলনাভাব; তাহা উচ্চতর কাব্যের অপরাধ নহে। পরন্তু, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে, তথা কাব্যরসের বিষয় সম্বন্ধে বিকৃত সংস্কার যে সমাজে প্রচলিত আছে, তাহাও ইতরের এই ইতরতা ও অনুশীলনের অভাব জনিত, ইহাও এ স্থলে বক্তব্য।

কবিতা ও কাব্য-রসের অর্থাৎ তদন্তর্গত সৌন্দর্য্যের অবশ্য নানা লক্ষণ আছে। সকল লক্ষণই যে বিষয়ের স্বরূপ ব্যঞ্জক, তাহা নহে। এমন কি, প্রায় এমন একটী লক্ষণও কচিৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা সম্যকরূপে কবিতার বা কাব্য-রসের সম্যক স্বরূপ ব্যঞ্জক। কবি সম্প্রদায়ের নিজের এবং আলঙ্কারিকদিগের লক্ষণ ছাড়িয়া দিয়া, কবিতার বৈজ্ঞানিককৃত লক্ষণ কি, বারেক দেখা যাউক। বৈজ্ঞানিক বলেন;—

"Poetry consists in the liberation of beautiful analogies. * * It is the people's part to experience beautiful analogies, it is the poet's province to liberate those analogies, and it is the people's again to appreciate them." বৈজ্ঞানিকের এই লক্ষণ, অগ্রেই বলা আবশ্যক, বিলক্ষণ অসম্পূর্ণ;— কিন্তু তাই বলিয়া একান্ত অর্থশূন্য নহে। আলঙ্কারিক যাহা বহু কথায় বুঝাইয়াছেন, বৈজ্ঞানিক তাহা এক কথায় সারিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্যের সৌসাদৃশ্য সৃষ্টিই কবিতা। এক কথায়, সুন্দর উপমার অভিব্যক্তিতেই, বৈজ্ঞানিকের মতে কবিতা। কথাটা শুনিতে খুব উদ্ভট বটে, কিন্তু, বিজ্ঞানবিদ্ বিশ্লেষণ দ্বারা এ কথা প্রমাণ করিতে অগ্রসর। বৈজ্ঞানিক পুনশ্চ বলেন যে, জন সাধারণে সুন্দর সৌসাদৃশ্য বা উপমেয় উপমানের বস্তুগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, কবি সেই সৌসাদৃশ্য-

* "The appreciation of beauty * * * requires intelligence and if upon examination, it be found that some sentient creatures do not exhibit that appreciation, we may conclude that they want the requisite amount of intelligence or are possessed of a lower order of mind than those who do exhibit such an appreciation; and further, if we find that some persons exhibit that appreciation in a lower or less perfect manner we may conclude that their intellect has been inciously or imperfectly developed."—*The Science of Beauty.*

দিগকে স্বাধীন জীবন দেন, পুনঃ জনসাধারণ তাহা উপভোগ করিয়া আনন্দ অনুভব করে।

এখন বৈজ্ঞানিক দিক হইতে দেখা যাইতেছে,—সুন্দর সৌসাদৃশ্য নিচয়কে স্বাধীনতা দান (অথবা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি?) কবির কার্য্য। তিনি ভাব-বৈচিত্র্য দেখাইবেন,—কিন্তু, পাঠকের মনে যদি ভাবেরই একান্ত অভাব হয়,—"এনালজির এক্সপিরিয়েন্স" যদি একেবারেই না থাকে, তবে কবি বেচারী তাহা কিছু আর উৎপন্ন করিয়া দিতে পারেন না।

বিষয়টী একদিকে যেমন সহজ ও স্বাভাবিক, অপরদিকে তেমনি কঠিন ও জটিল। সৌন্দর্য্য পদার্থ কি এবং তাহা অনুভব করার প্রক্রিয়া কিরূপ, বুঝাইয়া দেওয়া বড়ই দুষ্কর। অথচ সৌন্দর্য্যানুভূত হইয়া আনন্দ উপভোগ হওয়ার মত সহজ ও স্বাভাবিক আর কিছুই নাই। "আনন্দ" পদার্থটী কি, অশেষ চেষ্টা করিয়াও যেমন কেহ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারে না, সৌন্দর্য্যের সত্ত্বা কি, বুঝান প্রায় তদনুরূপ কঠিন। পরন্তু, সৌন্দর্য্য উপভোগ কল্পে উহার ফলও কিছু নাই, অগ্রেই বলিয়াছি। আনন্দ উপভোগ করার ক্ষমতাই যদি আমার না থাকে, তুমি কি আমায় বুঝাইয়া দিতে পার, আনন্দ সামগ্রী খানা কি? তাহা পাতিয়া শুইতে বা গায়ে প্রলেপ দিতে হয়? সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও প্রায় এই কথা। পরন্তু, বৈজ্ঞানিক-শীলে ছেঁচিয়া গুঁড়া গুঁড়া করিলেও সুন্দরের টিকা সম্ভবে না। সৌন্দর্য্য যদি আদৌ উপভোগ্য হয়, তাহা অখণ্ডভাবেই উপভোগ্য, কাটিয়া চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া নহে।

আমাদের আলোচ্য কবির সৌন্দর্য্যময়ী এবং সৌন্দর্য্যের কবিতা। কিন্তু সৌন্দর্য্য কি পদার্থ, আমি তাহা বুঝাইতে অক্ষম। পরন্তু, তদীয় কবিতার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষ করিয়াও আমি তাহার ব্যাখ্যা করিব না; সেরূপ ব্যাখ্যা এস্থলে নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। এই কবি কিরূপভাবে সৌন্দর্য্যানুভব করিয়াছিলেন এবং সৌন্দর্য্যেশ্বরী সারদাকে অবলোকন করিতেন, তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র আভাস তাঁহার কবিতা হইতে দেওয়া যাইবে। সৌন্দর্য্য পদার্থ কি, পুনঃ বলিতেছি, আমরা বুঝাইতে অক্ষম। কবি নিজেও বুঝ বুঝার পর তবে তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি বলেন—

"বুঝিতে পারি না, শুধু আঁখি ভরি' দেখি তায়"

প্রাজ্ঞ গণনাপর বটেন। সকল বিষয়েই তিনি পূর্ব্বাপর নিরূপণ ও "কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ" করিয়া কার্য্য করিতে চাহেন। কিন্তু পড়িয়া পড়িয়া, ঘসা মাজা করিয়া বোধ হয় রূপ লাবণ্য দেখা চলে না, প্রণয় পীরিতি করাও সম্ভবে না। প্রাজ্ঞ যাহাই করুন, প্রেমিকের রীতি স্বতন্ত্র।

অগ্রেই উল্লেখ করিয়াছি, ধ্যানই এই কবির কবিত্বের প্রাণ,-পরমাত্মা। কিন্তু, সে ধ্যান, প্রকৃত প্রস্তাবে, কাহার উদ্দেশে,—সে ধ্যান কি প্রকারের এবং কিসের জন্য? ইহ-সংসার হইতে পরিত্রাণার্থে, পারলৌকিক নির্ব্বাণ মুক্তি কামনাতেই কি কবি ধ্যান-নিমগ্ন? না, তাহা নহে। তবে কি? কি, তাহা, কবি নিজেও বলিতে অক্ষম। কেন না, তাহার কারণ নির্ণয় কল্পে তিনি কখনও উদ্যোগ করেন নাই,—তাহার অবসর পান নাই; সে কথা, তাঁহার মনেই কখনও উদয় হয় নাই। কাজেই বলেন—

"ধেয়াই কাহারে দেবি! নিজে আমি জানিনে"

ইহা ভিন্ন আর কি বলিবেন? আর কিছুই ঠিক বলিবার নাই। কবি ধ্যান-নিমগ্ন। কাহার ধ্যান করেন, ঠিক জানেন না। কিন্তু, ধ্যান-নিমগ্ন তাঁহাকে রাখে কিসে? কবি আত্ম-প্রকাশে কাতর নহেন। সরলভাবে আপাদ মস্তক আত্ম প্রকাশেই তাঁহার কবিতা। কবি এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন ;—

মধুর মাধুরী বালা,
কি উদার করে খেলা!—
অতি অপরূপ রূপ!

কবি এইরূপে মোহিত ; ধ্যান-মগ্ন! এরূপ 'কেবল হৃদয়ে দেখেন' সম্যকরূপে 'দেখাইতে পারেন না।' সে "রূপ" জগতে অতি জগতে ব্যাপ্ত—বিস্তৃত।

কহে সে রূপের কথা
বসন্তের তরুলতা ;
সমীরণ ডেকে বলে নির্জ্জনে কানন ফুল ;
শুনে, সুখে হরিণীর আঁখি করে ঢুল ঢুল্।
হাসি হাসি ইন্দ্রধনু নীল গগনে ভায়,
শারদ নীরদ গণে কি কথা বলিতে চায়!
স্বপনে কি দ্যাখে শিশু নিমীলিত নয়নে,
ঘুমা'য়ে ঘুমা'য়ে হাসে, জানি না কি কারণে।
ভোরে সুখতারা রাণী
কি যেন দেখায় আনি,
বুঝিতে পারি না, শুধু আঁখি ভরি' দেখি তা'য়।

সুষুপ্ত শিশু কি স্বপ্ন দেখে, কি স্বপ্ন দেখিয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া হাসে, কেহ জানেন কি? জানিবার কিছু উপায় আছে কি? যদি না থাকে, তবে এই কবির স্বপ্ন কি, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা জানা অসম্ভব। স্বভাবের সরল শিশু সৌন্দর্য্য-মগ্ন, স্বপ্ন-সেবিত সুপ্তবৎ হাসেন, কাঁদেন। চেতনায় অচেতনে, স্মৃতি বিস্মৃতিতে, ইহলোক পরলোকে, যেন এক সঙ্গম সূত্রে সংমিশ্রিত হইতেছে ; স্মৃতি, সুপ্ত, সজাগ, যেন কেমন ছায়ালোকের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে, সব কথা স্মরণ হয় না, অথচ বিস্মৃতিও নহে ; আত্মার এই অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় কবি বলিতেছেন—

প্রাণের ভিতরে থেকে কে যেন আমারে ডাকে,
ভুলিবার নয়, তবু ভুলে যেন গেছি কাকে।

সৌন্দর্য্য-মাধুরীর যত মূর্ত্তি এই কবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কোথায়ও একটী নির্দ্দিষ্ট সূত্র বদ্ধ নহে। যখন যে মূর্ত্তি হৃদয়ে উদিত হইয়াছে, ঠিক তাহাই চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মুন্সিআনার মাপে সৌন্দর্য্যটাকে সার্ভে করিয়া, তিনি তাহার ছবি তুলেন নাই। সুতরাং পদার্থের প্রকৃতি অনুসারে পরে পরে তাহা সাজান নহে। এই দেখিলাম,—

চলেছে যুবতী সতী
আলো কোরে' বসুমতী,
স্নানান্তে প্রসন্ন-মুখী, বিগলিত কেশপাশ ;
প্রাণপতি দরশনে
আনন্দ ধরে না মনে,
বিকচ আননে কিবে মৃদুল মধুর হাস।

ইহার পর পর্য্যায়েই সৌন্দর্য্যের এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূর্ত্তি ;—

উদার অনন্ত নীল হে ধাবন্ত অম্বুরাশি
আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে কোথায় দেয়েছ ভাই!
বল, কা'রে দেখিয়াছ? কোথা গেলে দেখা পাই!

তুমি, সৌন্দর্য্যের এই মহান বিশাল মূর্ত্তি ভাল করিয়া অনুধাবন করিতে না করিতেই, তাহার অপর মহিয়সী মাধুরী তোমার সম্মুখে প্রতিভাত! কবি সহসা সৌন্দর্য্যেশ্বরীকে উপস্থিত করিলেন ;—

অহো! বিশ্ব-পরকাশী
উদার সৌন্দর্য্য রাশি
জলে স্থলে আকাশে সদাই বিরাজিত ;
যে দিকে ফিরিয়া চাই
সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাই ;
অত্যুল্লাসকারী, অয়ি
পরম আনন্দময়ী!—
কে তুমি, মা! কান্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিভাবিত!

ইহা উন্নত, মহৎ, সুব্লাইম, কিন্তু, ইহার অব্যবহিত পরেই আবার ললিত, মধুর, মনোমোহিনী মূর্ত্তি—

সৌন্দর্য্য-সাগর মাঝে
কে গো এ সুন্দরী রাজে
আকাশের নীল জলে প্রফুল্ল নলিনী!

পরে পরে সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যের এই রূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মূর্ত্তি। অপর্য্যায়ে কখনও কোমল, কখনও করুণ, কখনও ললিত মধুর, কখনও বিরাট, বিস্ময়কর, সুব্লাইম সৌন্দর্য্য! ইহা যেন মনুষ্য-মনের সচরাচর পরিলক্ষিত ভাব যোগের (association of ideas) অতীত এক অভিনব নিয়মে উদ্ভূত। কবি মধুর হইতে পুনঃ মহানে উপস্থিত। সৌন্দর্য্য-দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন;—

কে তুমি জননী, পিতা
নন্দিনী, রমণী মিতা,
প্রেম-ভক্তি-স্নেহ-রস-উদার-উচ্ছ্বাস?
কে তুমি মা জল স্থল,
মহান্ অনিলানল,
নক্ষত্র খচিত নীল অনন্ত আকাশ?
কে তুমি? কে তুমি এই বিরাট বিকাশ?

*　　*　　*

নিতি নিতি তরুলতা
নধর নূতন পাতা,
কেমন প্রফুল্ল আহা কুসুম সুন্দর!
ঝরে যায় পরক্ষণ
বাথিয়া নয়ন মন,
আবার তেমনি ফুল ফোটে থরে থর!

*　　*　　*

আকাশ, পাতাল, ভূমি
সকলি; কেবল তুমি।
এক করে বরাভয়,—
বিশ্বের নিয়তোদয়;
প্রলয় হয় অন্য করতলে।
দশদিকে পায় স্ফূর্ত্তি,
তোমার মহান্ মূর্ত্তি
অনাদি অনন্তকাল লোটে পদতলে!

*　　*　　*

প্রত্যক্ষে বিরাজমান
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান
তুমি বিশ্বময়ীকান্তি, দীপ্তি অনুপমা;

এই দেবী, সৌন্দর্য্য-বিধায়িত্রী,—ইহাঁকে সারদাই বল বা সর্ব্বমঙ্গলা বল, মিউজই বল, আর মহেশ্বরীই বল,—ইনিই এই কবি কর্ত্তৃক অর্চ্চিত, পূজিত, ইহাঁরই মঙ্গল গীতি তিনি গাইয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কাব্য "সারদা-মঙ্গলে" ইহাঁরই মহাগীতি; তাঁহার সব কয়খানি কাব্যেই এই একই আইডিয়ার অপূর্ব্ব সম্প্রসারণ।

কবির শেষ এবং অসম্পূর্ণ খণ্ড কাব্য "সাধের আসন" হইতে উপরের সমস্ত কবিতাগুলি উদ্ধৃত। "সাধের আসনের" সর্ব্বপ্রথম অধ্যায় হইতে আমরা যাহার আভাস দেখাইয়াছি, "সারদামঙ্গলে" তাহারই বিবিধ বিকাশ;—"সারদামঙ্গল" এক অপূর্ব্ব কাব্য। অপূর্ব্বত্বের কারণ উপরেই উল্লেখ করিয়াছি। সৌন্দর্য্যের অসাধারণ তীক্ষ্ণানুভূতি, তাহার সূত্রহীন সুধা-সিঞ্চিনী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিত্র; পরন্তু, সারদাকে এক অভিনব ভাবে অর্চ্চনা, আমরা সারদামঙ্গলে দেখিতে পাই। জীবনের যত কিছু কোমল, করুণ ও মধুর বন্ধন আছে,—তাহার সবই সারদা এই কবির। সারদা কখনও জননী, কখনও নন্দিনী, কখনও প্রণয়িনী,—প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বরী! শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর, প্রায় সকল রসেই এই কবি সৌন্দর্য্যেশ্বরীর সেবা করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণের প্রেমোচ্ছ্বাস কোমলতায় পৃথিবীর কোনও প্রধান কবি অপেক্ষা ন্যূন নহে। "সারদামঙ্গল" কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। এ কবির সব রচনাই এইরূপ। কিন্তু এখন সারদামঙ্গল হইতে কিছু সৌন্দর্য্য চয়ন করা যাউক।

সারদা মঙ্গলের আরম্ভে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আদি কবি বাল্মীকের পুণ্য তপোবনে করুণ কবিতা-সমভিব্যবহারিণী সারদা-দেবীর আবির্ভাব কল্পনা করিয়াছেন। গভীর নিশীথ কাল,—বসুমতী তিমির বসনাবৃতা ;—

নাহি চন্দ্র সূর্য্য তারা,
অনল-হিল্লোল-ধারা,
বিচিত্র-বিদ্যুত-দাম-দ্যুতি ঝল মল ;
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব,
কেবল মরুত রাশি করে কোলাহল।

পরন্তু, বসুন্ধরা ধীরে ধীরে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন খুটাইতেছেন, উষা আসিয়া তাঁহার অধর প্রান্তে মৃদু চুম্বন করিতেছে। তমঃ অবসানে উষার আবির্ভাব সহিত, তাহার সেই কোমল করুণ কিরণে স্নাত হইয়া সরস্বতী আদি কবির কবিত্ব-সম্পদ হস্তে দেখা দিতেছেন। সারদার শুভাগমনের ইহা অতি প্রশস্ত সময় বটে। পাঠক প্রথমতঃ উষার কোমল-কান্তি উপভোগ করুন ;—

হিমাদ্রি শিখর পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি ওই পুণ্য তপোবনে!
বিকচ নয়ন চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে,—
তামসী তরুণ উষা কুমারী রতন।
কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণে
হাসিল অম্বর তলে
পারিজাত দলে দলে
হাসিল মানস সরে কমল কানন।

কবির রচনা-ঐশ্বর্য্য পাঠক অনুধাবন করিবেন। একদিকে উষার কোমল কিরণ; অপরদিকে ক্রৌঞ্চ-বধে ক্রৌঞ্চীর কাতর ক্রন্দন ;—তপোবন করুণার স্তন্য-দুগ্ধে প্লাবিত! কবিতাদেবী, সর্ব্ব প্রথম, করুণ রসেই, আদি কবির ললাটে উদিতা হইলেন!

সহসা ললাট ভাগে
জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে।
কিরণে কিরণময়
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মান রবিছবি ভুবন উজলে।
চন্দ্র নয়, সূর্য্য নয়,
সমুজ্জ্বল শান্তিময়,
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে!
*   *   *
কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্য রাশি,
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে।

কবি-প্রতিভার আদ্যাশক্তি,—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের জননী ইনি। আমাদের কবির অস্তিত্ব এই দেবী-মন্দিরে বিলুপ্ত। তিনি আর কিছুই চাহেন না, আর কাহাকেও চাহেন না। সংসারীর সর্ব্বশুভদায়িনী লক্ষ্মীকে পর্য্যন্ত তফাৎ হইতে বলেন ;—

যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগী-জন-তপোবন-স্থলে!

কবি লক্ষ্মীকে চাহেন না। সারদা বা সৌন্দর্য্য-দেবীকে বলেন ;—

তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে ;
গিরিমালা কুঞ্জবন
গৃহনাট নিকেতন,
যখন যেখানে যাই যাও আগে আগে।
জাগরণে জাগি হেসে
ঘুমালে ঘুমাও শেষে
স্বপনে মন্দার মালা পরাইয়া দাও গলে।
*   *   *

থাক হৃদে জেগে থাক
রূপে মন ভরে রাখ
তপোবনে ধ্যানে থাকি এনগর কোলাহলে।

কবি, প্রকৃতই, "এ নগর কোলাহলে" তপোবন-তপস্বীর মত ধ্যান-মগ্ন ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশকে সম্বোধন করিয়া "বন্দে মাতরং" অমর গীত গাইয়াছিলেন। চাই কি, এই একটী মাত্র গীতে স্বদেশীয় সাহিত্যে চিরজীবী হইতে পারিতেন। গ্রে এক "এলিজি"তে ইংরেজী সাহিত্যে অমর। বাঙ্গালীর কোনও ব্যক্তি তাঁহার "যমুনা-লহরী" সঙ্গীতে বিখ্যাত। বঙ্কিমবাবুর "বন্দে মাতরং" ইহাদের সমশ্রেণীস্থ সুমহান সঙ্গীত। "বন্দেমাতরং" এর একটী চরণে গীত হইয়াছিল—

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

বঙ্কিমের এই মহা গীতির বহুপূর্ব্বে বিহারিলাল সৌন্দর্য্য-জননীকে সম্বোধন করিয়া গাইয়াছিলেন ;—

তুমিই মনের তৃপ্তি
তুমি নয়নের দীপ্তি
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণ হারা হই ;
*　　*　　*
যে ক'দিন আছে প্রাণ
করিব তোমার ধ্যান
আনন্দে ত্যজিব তনু ও রাঙ্গা চরণ তলে।

কভু বিরহ, কভু বিলাস, কভু উপাসনা, কখনও অভিমান, কবি ভাবুক ভক্তের এবং অত্যগ্র অনুরাগী প্রেমিকের যাবতীয় আবেগে উন্মত্ত। হৃদয়বাসিনীর বিলাসে এই তিনি সর্ব্বপৃথিবীর সম্রাট অপেক্ষাও সুখী,—পর-ক্ষণেই হৃদয়েশ্বরী যেন কোথায় লুকাইলেন, কবির করুণ ক্রন্দনে দারু পাষাণ গলিতেছে! কিন্তু, কাতরতার মধ্যেও তিনি কর্ত্তব্য-পরায়ণ ধীর ;—তিনি "অমরাবতীর বর-মালার" কামনায় মনুষ্যত্বের কর্ত্তব্য বিস্মৃত নহেন ; স্বর্গের মোহে তিনি নরকের জীবের প্রতি উদাসীন নহেন ; --

*　　*　　*
যাই যাব রসাতল
চাইনে এ বরমালা, এ অমরাবতী
*　　*　　*
নরকে নারকী-দলে
মিশিগে মনের বলে
পরাণ কাতর হ'লে ডাকিব তোমায় ;
*　　*　　*
মর যদি মরা চাই মানুষের মত ;
থাকি বা প্রিয়ার বুকে,
যাই বা মরণ-মুখে,
এ আমি, আমিই রব ; দেখুক জগত।
মহান মনেরি তরে
জ্বালা জ্বলে চরাচরে,
পুড়ে মরে ক্ষুদ্রেরাই পতঙ্গের প্রায় ;
জ্বলুক যতই জ্বলে
পর জ্বালা মালা গলে,
নীলকণ্ঠ কণ্ঠে জ্বলে হলাহল দ্যুতি ;
হিমাদ্রিই বক্ষ পরে
সহে বজ্র অকাতরে,
জঙ্গল জ্বলিয়া যায় লতায় পাতায় ;
অস্তাচলে চলে রবি,
কেমন প্রশান্ত ছবি।
তপনো কেমন আহা উদার বিভূতি !!

এ গীতি অসাধারণ। বিশেষতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের বক্ষপরে এরূপ গীতি মরকত-মালার অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান।

কোমল, করুণ,মহান, মহিমান্বিত সৌন্দর্য্য-মঙ্গল-সঙ্গীত মন্দাকিনী-প্রবাহবৎ অমৃত-লহরী ছুটাইয়া চলিয়াছে! কখনও মধুর

মোলায়েম মৃদু মলয় নিশ্বাস, কখনও উচ্চ, উচ্চাদপি উচ্চ প্রীতি-বিস্ময়কর সুব্লাইম সংগীতোচ্ছ্বাস! কত উদ্ধৃত করিব, কোন্‌টী ছাড়িয়া কোন্‌টী শুনাইব? কবি হিমালয়ের বিশালত্ব বর্ণনা করিতেছেন;—

বিশ্ব যেন ফেলে পাছে
কি এক দাঁড়ায়ে আছে!
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান ব্যাপার।
* * *
পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে;
সমুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।
* * *
ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে
বুকে খেলা করে ধেয়ে
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে।
জ্বলন্ত অনল ছবি
ধ্বক ধ্বক জ্বলে রবি,
কিরণ-জ্বলন-জ্বালা মালা শোভে গলে।
* * *
সানু আলিঙ্গিয়ে করে
শূণ্যে যেন বাজি করে
বপ্র-কেলি-কুতুহলে মত্ত করিগণ;
নবীন নীরদমালা
সঙ্গে সঙ্গে করে খেলা,
দশন বিজলী-ঝলা বিলসে কেমন!
* * *
ফেনিল সলিল রাশি
বেগ ভরে পড়ে খসি
চন্দ্রলোক ভেঙ্গে যেন পড়ে পৃথিবীতে
সুধাংশু প্রবাহ পারা
শত শত ধায় ধারা,
ঠিক্‌রে অসংখ্য তারা ছোটে চারিভিতে।

পরন্তু, এক স্থানের এক বিন্দু মোলায়েম ভাব অনুভব করুন;—

মধুর রজনী
মধুর ধরণী
মধুর চন্দ্রমা মধুর সমীর!
ভাগিরথী বুকে
ভাসি ভাসি সুখে
চলে ফুলময়ী তরী ধীর ধীর।
আলু থালু কেশ
আলু থালু বেশ,
ঘুমায় কামিনী রূপসী রুচির।
অপরূপ হাস
আননে বিকাশ
অধর পল্লব অলস অধীর!
না জানি কেমন
দেখিছে স্বপন
মধুর—মধুর—মুরতি মদির।

পুনশ্চ, সৌন্দর্য্য-প্রীতিতে বিভোর হইয়া সৌন্দর্য্য সম্বোধন করিতেন;—

নয়ন-অমৃত রাশি প্রেয়সী আমার!
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার!
মধুর মুরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখ-শশি জাগে অনিবার!
কি জানি কি ঘুম ঘোরে
কি চোকে দেখেছি তোরে
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর!

এ সোহাগ স্বর্গের! পৃথিবীর ময়লা মাটীর নহে। কিন্তু, এই কবি, সৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গীন উপভোগ করিয়াও, পরিতৃপ্ত নহেন। সৌন্দর্য্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইতে চাহেন;—

সেই আমি, সেই তুমি
সেই এ স্বরগ ভূমি,
সেই সব কল্প-তরু সেই কুঞ্জবন;
সেই প্রেম, সেই স্নেহ,
সেই প্রাণ, সেই দেহ;
কেন মন্দাকিনী-তীরে দুপারে দুজন?

সেক্ষপীয়র বলেন "সৌন্দর্য্যের বদন সরোজের উপরে

ভগবানের আদেশাবলী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অঙ্কিত।" কবি কিটস্ বলেন "সৌন্দর্য্যই সত্য, সত্যই সৌন্দর্য্য, জগতে ইহাই তুমি জান, ইহাই জ্ঞাতব্য, ইহাই জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।" বায়রণ বলেন, "সৌন্দর্য্যের স্বর্গীয় জ্যোতির কণিকামাত্র অঙ্কিত করা সুকঠিন।" টেনিসন বলেন, "সৌন্দর্য্যই জগৎকর্ত্রী।" বিদ্যাপতি সৌন্দর্য্য-সন্দর্শন স্বল্পতায় অতৃপ্ত হইয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন,—

"সজনি ভাল করি পেখন না ভেল
মেঘমালা সঙে তড়িত-লত জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল।"

চণ্ডীদাস সৌন্দর্য্যের অসীমতায় মজ্জিত হইয়া গাইয়াছিলেন ;—

"জনমি অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

রস্কিন বলেন ; "পাপ-প্রলোভ-সংস্পর্শ-শূন্য স্বাস্থ্যকর বিমলানন্দ কেবল সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে।" বঙ্কিম বাবু বলেন ;—"সৌন্দর্য্য-স্পৃহা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়া ও পরিপোষণীয়া। মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সুখ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কেন না, ইহা পবিত্র, নির্ম্মল, পাপসংস্পর্শ-শূন্য ; সৌন্দর্য্যের উপভোগ কেবল মানসিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই। সত্য বটে, সুন্দর বস্তু অনেক সময়ে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ; কিন্তু সৌন্দর্য্যজনিত সুখ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হইতে ভিন্ন।"

ফলতঃ সৌন্দর্য্য অপার্থিব বা পার্থিব হউক, সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ জনিত যে সার সুখ, তাহা অপার্থিব। পৃথিবীর ময়লা এক বিন্দুও তাহার সহিত মিশ্রিত নহে। অপার্থিব সৌন্দর্য্যের পূর্ণপ্রভা—পরম রমণীয় শোভা কবি কল্পনায় ও জ্ঞানীর অন্তর্দৃষ্টিতে, কেবল সেইখানে তাহা অভিব্যক্ত, যেখানে—

'রূপ আছে, নাহি রিপু দুরন্ত'

সক্রেটিশ সমস্ত সৌন্দর্য্যের সমাহার করিয়া বলেন ;—"পর্য্যায়ানুক্রমে সৌন্দর্য্যের অনুধাবন ও ধ্যান করিয়া সৌন্দর্য্যের প্রতি যাহার প্রেম নিয়মিত ও কেন্দ্রীভূত হয় ; তিনি অকস্মাৎ এক অতি আশ্চর্য্য ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন। সে সৌন্দর্য্য অসীম, অনন্ত, অব্যয় ও অবিনশ্বর ;—সে সৌন্দর্য্যের ক্ষয় নাই, তাহা কোনও প্রকার পদার্থেরই অনুরূপ নহে ; আংশিক সুন্দর ও আংশিক অসুন্দর নহে ; তাহা কোনও দ্রব্য সম্বন্ধে সুন্দর, কোনও দ্রব্য সম্বন্ধে অসুন্দর নহে ; তাহা এক স্থলে সুন্দর, অপর স্থলে অসুন্দর নহে ; * * সেই সৌন্দর্য্যেরই প্রভায় সংসারের ও স্বর্গের অন্যান্য দ্রব্য সুন্দর। * * সে অনন্ত সৌন্দর্য্য-সাগরের ক্ষয় নাই, বৃদ্ধিও নাই ; অল্পত্ব, আধিক্য ও পরিবর্ত্তন নাই। যখন মনুষ্য প্রকৃত সৌন্দর্য্য-প্রেমের নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া সেই অপার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন ও তাহার ধ্যান ধারণা করিতে সমর্থ হয়, তখনি তাহার জীবনের সার্থকতা ঘটে। * * বহুবিধ বিশ্বাস ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তৎকালাবধি যে কাল পর্য্যন্ত অনন্ত সৌন্দর্য্য-প্রেম প্রস্ফুট না হয়, তাহা প্রস্ফুটিলে তাহারই জ্ঞানে ও তাহারই ধ্যানে, মনুষ্য অনির্ব্বচনীয় অনন্ত আরাম লাভ করে।" *

এ "আরাম" আমাদের এই কবি কি পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, অন্ততঃ, অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার কবিতাই বলিয়া দিতেছে।

আমি উপরে বলিয়াছি, সৌন্দর্য্যের অদ্বিতীয় পার্থিব প্রতিকৃতি রমণী জাতি এই কবির কবিত্বের অন্যতম এক অতি প্রধান উদ্দীপনা। ইঁহার সর্ব্বপ্রথম কাব্য এই উদ্দীপনা হইতে উদ্ভূত এবং তৎপরবর্ত্তী কবিতা নিচয়েও ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমি এ সম্বন্ধে, বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ এই ;—"নারীজাতির প্রতি কবি-হৃদয়ের প্রগাঢ় পবিত্র প্রীতি, আধ্যাত্মিক স্নেহভক্তি, অনুরাগ এবং আন্তরিক উদারতা, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ব্যতীত কেবল এক বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী প্রদর্শন করিয়া গেলেন। রমণীকে অনেকেই,

* "The Banquet of Plato." Shelley's Translation.

অনেকেই কেন, সকলেই সচরাচর দেবী বলে; কিন্তু, দেবী বলিয়া অর্চ্চনা, আরাধনা, প্রকৃত প্রস্তাবে দেবীবৎ-ব্যবহার তাঁহাকে কয়জন লোকে করিয়া থাকে;—এই পাপ পৃথিবীতে একাল পর্যন্ত ছোট বড় কয়জন লোকে করিয়াছে? অস্মদ্দেশীয় আর্য্যশাস্ত্রে নারী পূজার ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু, পূজকের পবিত্রতা এবং আন্তরিকতার অভাবে তাহার আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হইয়া, সে ব্যবস্থা ক্রমে কৃত্রিম, প্রাণশূন্য এবং শুষ্ক লোকাচারে, কিম্বা জঘন্য, বিকৃত ব্যভিচারে পরিণত হইয়াছিল;—পরিণত হইয়াই আছে। পরন্তু, পাশ্চাত্য পৃথিবীতে পুরাকালের • পণ্ডিত সমাজের মধ্যে নারীসমাজ বা সমষ্টিত নারী জাতির প্রতি আধ্যাত্মিক অনুরাগের অভিমত আমরা দেখিতে পাই, কেবল প্লেতোতে। পাশ্চাত্য ভূমে প্লেত রমণী পূজার প্রবর্ত্তক। সে পূজা ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ-শূন্য প্লেতনিক প্রণয় সম্ভূত। পরবর্ত্তী কালে মহাত্মা অগস্ত কোমৎ এ পূজার আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠাতা; মহা মনস্বী জন ষ্টুয়ার্ট মিলেও আমরা এই অনুরক্তির আভাস পাই। ইঁহারা সকলেই দার্শনিক। কিন্তু, কবিকুলে এই মহামন্ত্রের উপাসক লোক কই? মহাজন বৈষ্ণব কবিগণ? হাঁ, এ কথা অসত্য নহে। বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায় এবং শাক্ত কবিদিগেরও কেহ কেহ বটে রমণী মাহাত্ম্য অনেক বর্ণনা করিয়াছেন। রমণীর সর্ব্বাঙ্গীন শক্তিও তাঁহারা অনুভব না করিয়াছিলেন, এমন নহে। কিন্তু, তাহা সুরলোকের আদর্শ বা অবতাররূপিণী দেবী মাহাত্ম্যের বিবৃতি মাত্র, কচিৎ আন্তরিক অনুভূতিও বটে। এই সকল কবিদিগের কেহ নরলোকের নারী জাতির সমষ্টিতে জগদ্ধাত্রী ও জগৎ-পালয়িত্রী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া সম্যক রূপে মোহিত হইয়াছিলেন এবং তাহার আধ্যাত্মিকতা অনুভব করিয়া কবিতা উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিলেন, এমত বলা যায় না। পক্ষান্তরে, কালিদাস হইতে একালের কালাচাঁদ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই কেবল রমণীর রূপ বর্ণনা ও রমণীকে লইয়া ফষ্টি নষ্টি মাত্র করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক ভাবে রমণী মাহাত্ম্য প্রায় কেহই সর্ব্বাঙ্গীন অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন নাই! পাশ্চাত্য কবিদিগের মধ্যেও প্রায় এই ভাব! রমণীসমাজের মাহাত্ম্যানুভব কল্পে শেলির সুনাম আছে বটে, কিন্তু সুনামের সহিত দুর্নামও জড়িত। অতএব, কিঞ্চিৎ আত্মগর্ব্ব প্রকাশিত হইলেও আমরা সত্যের খাতিরে বলিতে পারি যে, আমাদের এই অধঃপাতিত বাঙ্গালী জাতির আধুনিক কালের বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমন দুইটী কবি জন্মিয়াছিলেন, যাঁহাদের অকৃত্রিম কাব্যোচ্ছ্বাস রমণী মাহাত্ম্য মূলক এবং সে উচ্ছ্বাস, করুণ ও অকৃত্রিম, মর্ম্মস্পর্শী এবং সার্ব্বভৌমিক; সুতরাং পৃথিবীর কোনও কবির গীতি-উচ্ছ্বাস অপেক্ষা হীন নহে। আমরা উপরেই বলিয়াছি, এই দুই কবির এক জন "মহিলা" নামক ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থের চির স্মরণীয় কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার; অপর "বঙ্গসুন্দরী" ও "সারদা-মঙ্গল" প্রণেতা বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী; যাঁহার মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া অদ্য আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের হট্টগোলের ভিতর উপরোক্ত কথাটী বলিতে সাহসী হইয়াছি।"

কিন্তু, কবির এতৎ সম্বন্ধীয় সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতে স্থান নাই। এ বিষয়টীও বিস্তৃত। ইহার বরং স্বতন্ত্র আলোচনা হওয়া উচিত।

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী যে প্রকৃতির কবি-তাহা আমি কিয়ৎ পরিমাণে বলিয়াছি। ইনি অপরিজ্ঞাত কবি, সুতরাং ইহাঁর জীবনীও অজ্ঞাত। জীবনীর যাহা জ্ঞাত হইয়াছি, তাহা তিন কথায় সমাপ্ত।

১২৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, ১৩০১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ। পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্ত্তী। নিবাস কলিকাতা। প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলেন, কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে।

ইহার অধিক আমরা আর কিছুই জানি না। তবে ইহা জানি বটে যে, বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর পরবর্ত্তী প্রধান-দিগের মধ্যে অন্যতম প্রধান। এই উভয় চক্রবর্ত্তীই প্রকৃতির 'মঙ্গল' গীতির কবি। বিহারিলাল অমঙ্গল বা বিষাদ সঙ্গীতের গায়ক নহেন। আনন্দ মঙ্গল ইহার মজ্জাগত, মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতিভাত। অতৃপ্তি-জনিত অথবা সংসার-সংগ্রামের নীচতা ও নিষ্ঠুরতা-জনিত অমঙ্গল, অশান্তি কোথাও কোথাও

কবি-হৃদয়ের একটা প্রবণতা বটে; উদাহরণ হেনরিচ্ হায়েন, কাউপার প্রভৃতি। কিন্তু ইহা যে খুব স্বাভাবিক, তাহা নহে। বরং বিকৃত ও মানসিক অস্বাস্থ্যজনিত বলিয়াই পরিগণিত। কিন্তু, এ আলোচনাও বিস্তার সাপেক্ষ। অতএব আপাততঃ ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। এ সম্বন্ধে বিহারিলাল বাবুর দুই একটী উক্তি এই ;—

এত যে কঠিন ধরা
বজ্রাতি-বিষের ভরা ;
মনের আনন্দে আছি অন্তরে যন্ত্রণা নাই।

* * *

এস বোন, এস ভাই
হেসে খেলে চলে চাই
আনন্দে আনন্দ করি আনন্দ কাননে!
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে!

বিহারিলালের দুইখানি সম্পূর্ণ ও এক খানি অসম্পূর্ণ কাব্য বিদ্যমান আছে। ঘটনা ক্রমে এই তিনখানি কাব্যই প্রথমতঃ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। "বঙ্গসুন্দরী" "অবোধ বন্ধু"তে এবং "সারদামঙ্গল" "আর্য্য-দর্শনে" প্রকাশিত হওয়ার পর পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশিত হয়। "সাধের আসন" এই প্রবন্ধের লেখক কর্ত্তৃক এক সময়ে সম্পাদিত একখানি মাসিক পত্রে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বঙ্গসুন্দরীর ২য় সংস্করণ আমাদের সম্মুখে দেখিতেছি। "সারদা মঙ্গলের" বোধ হয় ২য়সংস্করণ হয় নাই। "সাধের আসন" সম্পূর্ণ হয় নাই।

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী (জীবিতাবস্থার ন্যায়) মৃত্যুর পর অন্য কাহারও কর্ত্তৃক অর্চ্চিত না হউন, এ সময়ের শ্রেষ্ঠতর কবির হস্তে সুবিচার প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবু, সুদীর্ঘ সমালোচনায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বভাব-কবির হস্তে স্বভাব কবির সমালোচনা কবির পক্ষে সামান্য সৌভাগ্য নহে। কবি-হৃদয় কবির ন্যায় আর কেহই বুঝিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বাবু এই কবির নিকট আত্মঋণ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ইহা তাঁহার মত মহত্তের মাহাত্ম্যেরই পরিচায়ক। বিহারি বাবুর কাব্য রবীন্দ্র বাবুকে বাল্যকাল হইতে প্রভাবিত করিয়াছিল। রবীন্দ্র বাবু বলেন ;—

"বাল্যকালে বাল্মীকি প্রতিভা নামক একটি গীতি নাট্য রচনা করিয়া "বিদ্বজ্জন সমাগম" নামক সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটিকটি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি, স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষা পর্য্যন্ত বিহারিলালের সারদা-মঙ্গলের আরম্ভ ভাগ হইতে গৃহীত।"

পুনঃ—

"বর্ত্তমান সমালোচক এক কালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদা-মঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্য শিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, বলা যায় না, কিন্তু, এই শিক্ষাটী স্থায়ীভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্য-সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ; ছন্দে এবং ভাষায় সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক।"

সর্ব্ববিধ প্রাথমিক শিক্ষাতেই অনুকরণ আবশ্যক। অতএব রবীন্দ্রনাথ বাবুও বিহারিলালের অনুকরণ করিয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। রবীন্দ্রবাবু, তাহাতে "কতদূর কৃত-কার্য্য" হইয়াছেন, তাহা বলিবার স্থান ইহা নহে। প্রসঙ্গক্রমে কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, অনুকরণে কৃতকার্য্য হওয়ার আবশ্যকতা রবীন্দ্রনাথ বাবুর কিছুমাত্র নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে, রবীন্দ্র বাবু কাহারও অনুকারী কবি বলিয়া আমার মনে হয় না। তদীয় কবি প্রতিভা নিজেই মৌলিক ভাবাপন্না।

বাঙ্গালা ভাষার উপর বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর অসাধারণ প্রভুত্ব ছিল। ছন্দ শৃঙ্খলায় তিনি অদ্বিতীয়, কিন্তু তাঁহার ছন্দের সুর তাঁয় সৌন্দর্য্যের নিজেরই সুর। ভাব সম্পদের নিজেরই সুর, নিজেরই নূতন নূতন ছন্দ থাকে। অন্ততঃ আমার ইহা ধারণা। ভাষা ভাবের অভ্যন্তর হইতে স্বতঃ নির্ম্মিত হইয়া আসে। ভাবের সহিত তাহা অবিচ্ছিন্নভাবে সংমিলিত; যে কাব্যে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, তাহা শাব্দিক কবির কবিতা।

এই অকিঞ্চিৎকর আলোচনা, রবীন্দ্র বাবুর সমালোচনার সহিত সকল বিষয়ে এক মতাবলম্বী না হইলেও, তাঁহার নিকট অঋণী নহে। শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

রূপ ও সনাতন গোস্বামী।

মালদহ জেলায় রূপ ও সনাতন গোস্বামীর অনেক কিম্বদন্তী আজিও শুনিতে পাওয়া যায়। এই দুই ভ্রাতার প্রকৃত অর্থাৎ পিতা মাতার রক্ষিত নাম কি ছিল, তাহা জানা যায় না। তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে উপরোক্ত নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজবাজারের অপর পাঁরে মহানন্দা তীরে এক্ষণে যে গ্রাম শা-পুর বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাহার কিঞ্চিদধিক এক ক্রোশ পূর্ব্বে বরেন্দ্র ভূমির সীমার মধ্যে মোরগ্রাম মাধাইপুর নামে দুইটি সংশ্লিষ্ট গ্রাম দেখা যায়। কথিত আছে, এই মোরগ্রাম মাধাইপুরে রূপ ও সনাতনের মাতুলালয় ছিল। এবং এই মাতুলালয়েই তাঁহারা বাল্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। উক্ত গ্রামের সন্নিকটে "সাকরমা" বলিয়া আর একটি গ্রাম আছে, তাহা অধিকাংশই কাঠাল বা জঙ্গলময়। ঐ জঙ্গলও সাকরমার কাঠাল বলিয়া বিখ্যাত। সাকর মল্লিক হইতে সাকরমা শব্দের উৎপত্তি, এবং এইরূপ কথিত হয় যে, রূপ—যিনি পূর্ব্বে সাকর মল্লিক নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া এই গ্রামে নূতন বাটী নির্ম্মাণ করেন। তিনি বসতি করায় এই স্থান সাকর মল্লিকের গ্রাম বলিয়া বিখ্যাত হয়। তাহা ভাষা কথায় সাকরমা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গৌড়নগরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে যে স্থানে বড়সোনামসজীদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহারই অনতিদূরে রামকেলি নামক গ্রাম। বৎসর বৎসর এইখানে বৈষ্ণবদের একটি মেলা হয়। এখানে একটি পুষ্করিণী আছে, তাহা রূপসাগর নামে বিখ্যাত।

রূপ সনাতন কোন্ জাতীয় লোক ছিলেন, ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণের সন্তান। কেহ বলেন, তাঁহারা মুসলমানের সন্তান। কেহ বলেন, তাঁহারা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু মুসলমান রাজসরকারে চাকুরি করার সময় মুসলমান হইয়াছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায়, তাঁহাদের এক তৃতীয় ভ্রাতা ছিল। তাঁহার আদিম নাম অনুপম এবং তিনি বৈষ্ণব হইলে তাঁহার নাম হয় শ্রীবল্লভ। ইনিই জীব গোস্বামীর পিতা। অনুপম হিন্দু নাম। তাহাতে তিনি জাতিতে হিন্দু ছিলেন দেখা যায়। সুতরাং রূপ ও সনাতনকেও হিন্দু পিতা মাতার সন্তান বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। অপিচ শ্রীকান্ত নামে সনাতনের এক ভগিনীপতিও গৌড়ের রাজ সংসারে চাকুরী করিতেন বলিয়া উক্ত গ্রন্থে প্রকাশ। যৎকালে সনাতন গৌড় হইতে পলাইয়া যান, পথে হাজিপুরে শ্রীকান্ত বাদসাহের জন্য ঘোড়া খরিদ করিতেছিলেন, তথায় সনাতনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হাজিপুরের নিকট হরিহর ছত্রে অদ্যাপিও ঘোড়া ক্রয় বিক্রয় হয়। শ্রীকান্তও হরিহর ছত্রে ঘোড়া কিনিতে গিয়াছিলেন বোধ হয়। শ্রীকান্তও হিন্দু নাম; এবং তিনি যখন সনাতনের ভগিনীপতি ছিলেন, তখন সনাতনকেও হিন্দুর সন্তান না বলিয়া থাকা যায় না।

তাহার পর রূপ ও সনাতন সংস্কৃতে যেরূপ কৃতবিদ্য ছিলেন দেখা যায়, তাহাই তাঁহাদের আদিম ব্রাহ্মণত্বের সম্পূর্ণ পরিচায়ক। উদাহরণ স্বরূপ রূপ গোস্বামীর একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—,

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণায়াবতীর্ণঃ কলৌ।
"সমর্পয়িতুমুন্নতো জ্জলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ং।
"হরিঃ পুরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ।
"সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতুবঃ শচীনন্দনঃ॥"

বাল্যে সংস্কৃতে শিক্ষিত না হইলে এমন কবিতা লেখনীতে আসা অসম্ভব।

কথিত আছে যে দুই ভ্রাতাই বাল্যে নবদ্বীপে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। বোধ হয়, পঠদ্দশাতেই প্রথমে বিশ্বম্ভর মিশ্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হইয়াছিল।

দুই ভ্রাতার মধ্যে কে বড়, কে ছোট, এ বিষয়েও মতামত দেখা যায়। কবি কর্ণপূর, যিনি সনাতনের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি সনাতনের কথা এইরূপ লিখেন—

গৌড়েন্দ্রস্য ধভাবিভূষণ মণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং।
"রূপস্যাগ্রজ এব এয তরুণীং বৈরাগ্য লক্ষ্মীং দধে।"
ইত্যাদি।

ইহাতে সনাতনকে রূপের অগ্রজ বলা হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে যেখানে হুসেন সাহ সনাতনকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন,—

"তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
"জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ॥"

এখানে রূপেরই কথা হইতেছে বলিয়া বুঝা হইয়া থাকে। তাহা হইলে চরিতামৃতের মতে রূপই জ্যেষ্ঠ। ফলতঃ আমি এই মতদ্বৈধের মীমাংসায় সক্ষম নহি।

বৈষ্ণব হইবার পূর্ব্বে গৌড়ের রাজসরকারে নিযুক্ত থাকার সময়ে সনাতন "দবীর খাস" ও রূপ "সাকর মল্লিক" বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। দবীর শব্দের অর্থ লেখক—কায়স্থ বা কেরাণী। সনাতন গৌড়াধিপতি হুসেন সাহার "খাস কেরাণী" বা প্রাইবেট সেক্রেটারী ছিলেন। সাকর মল্লিকের অর্থ—বড় পরিষ্কার নহে। বোধ হয় ইহা "সাকের মল্লিক"।—সে যাহা হউক, রূপ বাদসাহের এক জন সভাসদ্ বা মোসাহেব গোছের লোক ছিলেন বলিয়া বিবেচনা হয়।

ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও দুই ভ্রাতাতেই যবনাচারী হইয়াছিলেন জানা যায়। রীতিমত কল্মা পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিলেন কি না, প্রকাশ নাই; কিন্তু তাঁহারা যে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। চৈতন্যের অনুচরবর্গের মধ্যে কেবল তিন জন জগন্নাথের মন্দিরের ভিতরে যাইতেন না, হরিদাস, রূপ ও সনাতন। ইহাতে হরিদাসের ন্যায় রূপ সনাতনও যে একদা যবন ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট জানা যায়। তাই তাঁহারা সঙ্কুচিত হইয়া জগন্নাথের মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতেন না। রামকেলীতে চৈতন্যের সহিত যখন তাঁহাদের কথোপকথন হয়, তখন (চৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে) উভয় ভ্রাতাই আপনাদিগকে "ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম" বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করেন। এবং জগাই মাধাইএর সহিত আপনাদের তুলনা করিয়া চৈতন্যকে বলেন—"প্রভু! জগাই মাধাই মহাপাপী হইলেও তাহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করা আপনার পক্ষে সহজ। কিন্তু আমরা পাপী, তাহার উপর ম্লেচ্ছ জাতি, আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন কি রূপে?" এই উক্তিতে তাঁহারা যে ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়াছিলেন, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। অপিচ যখন সনাতন কারাগারে আবদ্ধ হইয়া কারারক্ষকের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, তখন বলিয়াছিলেন, "ভাই আমাকে ছাড়িয়া দাও, তোমার কোন ভয় নাই; কেননা আমি

দরবেশ হইয়া মক্কায় যাইব। এদেশে আর আসিব না। গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে বলিলে কেহ তোমাকে অবিশ্বাস করিতে পারিবে না।” কারারক্ষকও মুসলমান। সনাতন যদি তখন হিন্দু থাকিতেন, তবে দরবেশ হইয়া মক্কা যাইব, একথা তিনি বলিতেন না, বলিলেও কারারক্ষক বিশ্বাস করিত না। অবশেষে ইহাও লিখিত আছে যে, কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া যখন তিনি কাশীতে চৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার বেশভূষা সম্পূর্ণ মুসলমানের ন্যায় ছিল।

পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও রূপসনাতন অর্থ লোভে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ও যবনাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা অতি শোচনীয় ঘটনা। তাঁহারা যদি মহম্মদীয় ধর্ম্মকে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বলিবার কোনও কথা ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের শেষ জীবনের বৃত্তান্তে জানা যায় যে, মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহাদের অণুমাত্র আস্থা ছিল না। এরূপ অবস্থায় মতিচ্ছন্নতা বশতই তাঁহারা যে যবনাচারী হইয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হয়। বিষয় বৈভবের প্রলোভনই ঐরূপ মতিচ্ছন্ন হওয়ার কারণ ছিল। অন্য কারণ দেখা যায় না।

এমন এক দিন আসিল, যখন দুই ভ্রাতা আপনাদের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। কিরূপ ঘটনায় এইরূপ ভাবের উদয় হয়, তাহা বলা যায় না। কিন্তু দেখা যায়, দুই ভ্রাতা অবশেষে রাজপ্রসাদ হারাইয়াছিলেন। যে রাজানুগ্রহের কুহকে পড়িয়া তাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যখন সেই রাজানুগ্রহ হারাইলেন, তখন অনুতাপ হইবারই কথা। জাতিও গেল পেটও ভরিল না! রূপ দণ্ডভয়ে গৌড় হইতে পলায়ন করিলেন, সনাতন কারারুদ্ধ হইলেন। কি জন্য তাঁহারা রাজার বিষনয়নে পতিত হয়েন, বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত লিখিত হয় নাই। আভাসে জানা যায়, রূপকে হুসেন সাহ প্রজাপীড়ক অত্যাচারী দস্যু বলিয়া জানিতে পারেন—

“তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
“জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ।”

ইহাই যদি রূপের প্রকৃত চিত্র হয়, তবে তিনি যে রাজার কোপ দৃষ্টিতে পড়িবেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

সনাতনের কি দোষ ছিল, তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। এই পর্য্যন্ত লিখিত আছে যে, রূপ পলাইয়া গেলে পর তিনি হঠাৎ পীড়ার ভান করিয়া রাজবাটীতে যাওয়া আসা বন্ধ করিলেন। হুসেন সাহ বৈদ্য পাঠাইয়া দিয়া জানিলেন, পীড়ার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইহাতে আভাসে সনাতন যে মিথ্যাবাদী ও কপটাচারী ছিলেন, তাহা জানা যায়। হুসেন সাহা ক্রুদ্ধ হইয়া তুমি আমার সকল কর্ম্মনাশ করিয়াছ বলিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। ফলতঃ এ ব্যক্তিও দুষ্কর্ম্ম করিয়া ভ্রাতার ন্যায় পলাইবার ফিকিরে আছে, এই সন্দেহ করিয়াই তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল, অনুমান হয়। তাঁহার দোষের কোনও বিচার হওয়ার কথা প্রকাশ নাই। বৈষ্ণবেরা বিবেচনা করেন যে, কেবল বৈরাগ্য বশতই রূপসনাতন রাজকার্য্য পরিত্যাগ করেন। ইহা প্রকৃত বিবেচনা হয় না। চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহাদের বিষয়-ত্যাগের যেরূপ বিবরণ আছে, তাহা অসংলগ্ন বোধ

হয়। প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইলে এক্‌খানা কৌপীন পরিধান করিয়া বাহির হইয়া গেলেই হয়; তাহার জন্য বড় ভাবনা চিন্তা বা ফন্দী ফিকির করিতে হয় না। রূপসনাতনের স্পষ্টই তাদৃশ বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লেখেন—

"শ্রীরূপ সনাতন রামকেলি গ্রামে।
"প্রভুকে মিলিয়া গেল আপন ভবনে।
"দুই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজিল।
"বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল।
"কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চারণ।
"অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য চরণ।"

এ কথা বিশ্বাস করা দুরূহ। তাঁহারা যখন পতিত হইয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্মণে তাহাদের পুরশ্চারণ করিবে কেন? তবে হইতে পারে, বহু ধনের লোভে কোনও ব্রাহ্মণ ঐরূপ করিয়াছিল। কিন্তু পুরশ্চারণের কথা সত্য হইলেও, তাহার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভিন্নরূপ ছিল। গ্রহ দুর্ব্বিপাকের কোন শান্তি কার্য্য করাইয়াছিলেন, হইতে পারে—নতুবা চৈতন্য চরণ পাইতে দুই ভ্রাতার পুরশ্চারণ করার কোনও আবশ্যক ছিল না। কন্থা বগলে করিয়া বাহির হইলেই চৈতন্য চরণ পাওয়া যাইত।

তাহার পর কবিরাজ মহাশয় বলেন—

"শ্রীরূপ গোসাঞী তবে নৌকাতে ভরিয়া।
"আপনার ঘরে আইলা বহু ধন লঞা।"

এত " পাগল-বুচ্‌কী আগলের " কথা! এখানে ত বিষয়ত্যাগ বৈরাগ্যের কোনও চিহ্নই দেখি না। চৈতন্য চরণ পাইবার জন্য এক নৌকা ভরা ধনের আবশ্যক কি?

কবিরাজ মহাশয় পরে বলেন—

"ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে
"এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে।
"দণ্ড বন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
"ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল।
"গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
"সনাতন ব্যয় করে রহে মুদি ঘরে।"

এ বড় বিচিত্র বৈরাগ্যের কথা! বৈরাগী হইয়া পলায়নের সম্বল স্বরূপ সনাতন দশ হাজার মুদ্রা রাখিলেন!—স্বর্ণ না রৌপ্য মুদ্রা তাহা লেখা নাই। রৌপ্য হইলেও তখনকার দশ হাজার এখনকার অন্যূন সার্দ্ধ লক্ষ। ইহা বৈরাগীর উপযুক্ত পুঁজি বটে। কিন্তু এখানে প্রকৃত কথার একটুকু আভাস রহিয়াছে। রূপ যে বহুতর অর্থ লইয়া গৌড় হইতে সাকরমায় পলাইয়া আসিলেন, তাহার সিকি বিশ্বাসী ব্রাহ্মণের নিকট পুতিয়া গচ্ছিত রাখিলেন কেন?—রাজদণ্ড ভয়ে। রাজদণ্ডের ভয় কেন? তিনি কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে রাজদণ্ডের ভয়?—সে কথা প্রকাশ নাই। তবে তাঁহার যে রাজদণ্ডের ভয় ছিল, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। সেই রাজদণ্ডের ভয়েই তিনি গৌড় হইতে পলায়ন করিলেন, বৈরাগ্যের খাতিরে বোধ হয় না। তিনি বিশেষ কোনও রাজকর্ম্মে আবদ্ধ ছিলেন না—সুতরাং তাঁহার পলায়ন অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। কিন্তু সনাতন কেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তাঁহার পলায়ন তত সহজে সিদ্ধ হয় নাই। রূপ পলায়ন করিয়াছে প্রকাশ হইলেই হুসেন সাহ সনাতনকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু তিনিও অবশেষে কারারক্ষককে উৎকোচ দিয়া পলায়ন করেন।

বৈষ্ণবগ্রন্থে যতদূর লেখা আছে, তাহা বিশেষ প্রতিধানের সহিত আলোচনা করিলে জানা যায়, রূপ ও সনাতনের পূর্ব্ব জীবন পাপপঙ্কে মলিন ছিল। রাজস্ব বিভাগের রাজকীয় কার্য্য হিন্দু রাজাদের আমলে

যেমন কায়স্থেরা নির্ব্বাহ করিতেন, মুসলমান রাজাদের আমলেও তাঁহারা তেমনি নির্ব্বাহ করিতেন। সনাতন দবীরখাস প্রকৃত পক্ষে একজন কায়স্থের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে কায়স্থদের রীতি চরিত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজই অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি লেখেন "লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।" সনাতনও এই "লোভী কায়স্থগণের" অন্যতর ছিলেন। এই লোভেই তিনি জাতি দিয়াছিলেন; এবং ঐ লোভপ্রসূত দুষ্ক্রিয়াতেই বোধ হয় রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন। রূপ বোধ হয় কোনও নিয়মিত বেতন পাইতেন না; সনাতনেরও বেতন একজন বড় মুহুরির বেতন মাত্র ছিল। ঠিক তাহা কত ছিল, জানা যায় না—তবে বড় বেশী হইবে না। অথচ দেখা যায়, তাঁহারা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। আর চোরের ন্যায় অন্যের নিকট সেই সঞ্চিত অর্থ লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। গৌড়ে একজন মুদির নিকট তাঁহাদের ধন স্থাপ্য ছিল—দেশেও বিশ্বাসী ব্রাহ্মণদের ঘরে স্থাপ্য ছিল।

বোধ হয়, যে সময়ে তাঁহাদের রাজদণ্ডের সম্ভাবনা হয়, সেই সময়েই তাঁহারা চৈতন্যকে স্মরণ করেন। তাঁহারা জানিতেন যে, চাকুরি গেলে এবং রাজানুগ্রহ হারাইলে তাঁহাদের আর সমাজে দাঁড়াইবার স্থল নাই। রাজধানী হইতে পলাইতে হইবে; কিন্তু যান কোথা?—এই সময়ে চৈতন্য এক নূতন সমাজ গঠন করিতে আরম্ভ করেন। সেই সমাজে জাতি বিচার ছিল না। এমন কি, মুসলমানকেও তিনি বৈষ্ণব করিয়া আপন সমাজে স্থান দিতে ছিলেন। তাঁহার এই অভিনব কার্য্যে রাঢ়ে বঙ্গে ধূম পড়িয়া গেল। দেশ বিদেশে তাঁহার নাম বিখ্যাত হইল। রূপসনাতন বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে চিনিতেন। তাঁহারা এক্ষণে চৈতন্য সমাজে প্রবেশ লাভের অভিসন্ধি করিলেন। গোপনে গোপনে তাঁহারা চৈতন্যকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। সেই সকল পত্রে কি লেখা ছিল, তাহা অপ্রকাশ, কিন্তু শুনা যায়, চৈতন্য প্রত্যুত্তরে এক সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া পাঠান, তাহার মর্ম্ম এই—

"উপপতিতে আসক্তা কুলকামিনী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত-থাকিয়াও মনে মনে নব সঙ্গমজাত রস বিশেষ আস্বাদন করিয়া থাকে।"

উপমাটা বড় নোংরা—সন্দেহ নাই। ইহা চৈতন্যের উপযুক্ত হয় নাই। চৈতন্য মোটের উপর কুলটা স্ত্রীলোকের ন্যায় কিছুকালের জন্য কপটাচরণ করিয়া মনের ভাব গোপন করিয়া থাকিতে রূপসনাতনকে পরামর্শ দিলেন!

এই পরামর্শ অনুসারে রূপসনাতন এক বারে বিষয় ত্যাগ না করিয়া রাজকার্য্যে রহিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ এক দিন চৈতন্য রামকেলীতে উপস্থিত। বৃন্দাবন যাইবার ছলে বহির্গত হইয়া তিনি বাঁকিয়া গৌড়ে আসিলেন। রূপসনাতনের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। হবে কি? মুণ্ডিতমস্তক কৌপীনধারী চৈতন্য-সহচরেরা মুসলমান রাজধানীতে হরিবোলের সুর উঠাইলে মুসলমানেরা ক্ষেপিয়া উঠিল;—কতকগুলা ন্যাংটা সন্ন্যাসীতে আসিয়া হাঙ্গামের সূত্রপাত করিয়াছে, এ কথা হুসেন সাহের কর্ণগোচর হইল। এক্ষণে ব্রহ্মহত্যার যোগাড় হইয়া দাঁড়াইল। কেশব ছত্রি নামে হুসেন সাহের এক জন বিশ্বাসী হিন্দু শরীর রক্ষী সেনাপতি ছিলেন; হুসেন সাহ তাহাকে চৈতন্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ছত্রি দেখিল বিপদ। সে বাদ-

শাকে কহিল,—"ও এক জন সামান্য ফকির তীর্থ যাত্রা যাইতেছে। উহা হইতে কোনও বিপদ আশঙ্কা নাই। উহাকে মারিয়া কোনও ফল নাই।" এ দিকে গোপনে এক জন ব্রাহ্মণকে চৈতন্যের নিকট পাঠাইয়া দিয়া বলিল "ঠাকুর দেখ কি? শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন কর।"

রূপসনাতন সাহস করিয়া দিবাভাগে চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা আজিও চৈতন্যের সমাজে প্রবিষ্ট হইতে প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। বিষয় বৈভবের একটা কিনারা বা বন্দোবস্ত হয় নাই—একবারে রাজকর্ম্ম ধনসম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে তখনও তাঁহারা কৃতনিশ্চয় হয়েন নাই। করেন কি? রাত্রি দুই প্রহরের সময় ছদ্মবেশে চৈতন্যের নিকট গেলেন, অনেক দৈন্য প্রকাশ করিলেন; কিন্তু অবশেষ সনাতন প্রভুকে কিছু মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া শীঘ্র রাজধানী হইতে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে চৈতন্য সনাতনকে বলিতেছেন,—

"গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন,
"তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন।
"এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে,
"সবে বলে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে?"

চৈতন্য নিশ্চয়ই অতি সরল-হৃদয় লোক ছিলেন, মনে যাহা হইত, তাহাই করিয়া ফেলিতেন, বড় ভাল মন্দ ভাবিতেন না। তিনি এইরূপ ভাল মন্দ না ভাবিয়াই গৌড়ে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণবেরা তখন তাঁহাকে এখানে কেন আইলা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। রূপসনাতনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি কহিলেন "দেখ আমার অনুচরেরা আমাকে তিরস্কার করিতেছে, আমার কেবল তোমাদের দুই জনের জন্যই এখানে আসা।" পরে দবীরখাস-মহাশয় অর্থাৎ সনাতন প্রভুকে বিদায় দিবার সময় বলিতে লাগিলেন;—

"ইহাঁ হইতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ,
"যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ।
"তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি,
"তীর্থ যাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি।
"যাহা সঙ্গে বলে এই লোক লক্ষ কোটি,
"বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটি।
"যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভু কিছু নাহি ভয়,
"তথাপি লৌকিক লীলা লোকচেষ্টাময়।
"এত বলি চরণ বন্দি গেল দুই জন,
"প্রভুর সেই গ্রাম হইতে চলিতে হইল মন।"

চৈতন্য এত বলিলেন, তোমাদের দুই জনার জন্যেই আমি বাঘের মুখে মাথা দিয়াছি, তত্রাচ রূপসনাতন বৈষ্ণব হইলেন না, এমন কি, প্রকাশ্য ভাবে চৈতন্যের সহিত দেখা পর্য্যন্ত করিলেন না। রাত্রিতে গোপনে গিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যাউন বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিয়া আসিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ হুসেন সাহার মুখে চৈতন্যের কিছু গুণানুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত খাপছাড়া হইয়াছে। বস্তুত হুসেন সাহার নিকট চৈতন্যের কিছুমাত্র সমাদরের সম্ভাবনা বা প্রত্যাশা ছিল না, বরং নিগ্রহের সম্ভাবনা ছিল, তাহা কেশব ছত্রির ব্যবহারে জানা যায়।

অবশেষে যখন রাজদণ্ডের ভয়ে দুই ভ্রাতা গৌড় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন, তখন তাঁহারা চৈতন্যের সমাজভুক্ত বৈরাগী হইলেন। ভগ্নাঃকৃষের্ভাগবতা ভবন্তি—রূপসনাতন ইহারই উদাহরণ! জীবনের এই শেষ দশায় তাঁহারা ভক্ত বলিয়া বিখ্যাত

হইয়াছিলেন। চৈতন্যের পরামর্শ অনুসারে তাঁহারা অধিক সময় বৃন্দাবনে থাকিতেন, মধ্যে মধ্যে শ্রীক্ষেত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। চৈতন্যের অন্যান্য অনুচরের ন্যায়, বৌদ্ধরীতি অনুসারে, ভিক্ষান্ন দ্বারা তাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আপনাদের পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তাঁহারা ঘোর অনুতাপ করিতেন, এমন কি, এক সময়ে সনাতন আত্মহত্যারও প্রস্তাব করেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাকে নিবারণ করেন। তাঁহাদের কীর্ত্তির মধ্যে শুনা যায় যে, তাঁহারা বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থের আবিষ্কার করেন। আর দুই ভ্রাতা ভক্তি শাস্ত্রীয় কিছু কিছু গ্রন্থও লেখেন, কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের বাহিরে সে গ্রন্থের বিশেষ প্রতিপত্তি নাই। তবে রূপের সংস্কৃত রচনা স্থানে স্থানে মধুর বলিয়া বোধ হয়। বৈষ্ণবদের বৃন্দাবন এক বড় বিচিত্র জিনিস; কখনও তাহা আধ্যাত্মিক পদার্থ, আবার কখনও তাহা ইন্দ্রিয়-গোচর স্থান। মহাপ্রভুর রামানন্দ রায়ের সহিত যে-রূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে জানা যায়, বৃন্দাবন পৃথিবীর দেশ বিশেষ নহে। সুতরাং বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থের আবিষ্কারের কোনও অর্থ নাই। সনাতন যদি পৃথিবীর কোনও স্থানকে বৃন্দাবন বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, এ মনে হয়, তবে তিনি মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্মই বুঝেন নাই।

ফলতঃ রূপসনাতনের জীবনে অনুকরণীয় কিছুই নাই। তাঁহারা উভয়েই জীবন যাত্রার পথহারা পথিক। উভয়েরই গতি সরল পথ ছাড়িয়া কুটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল। ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অর্থ কামের সেবাই জীবনের সরল পন্থা; তাহার এক দিকে পাপের পঙ্ক, অন্য দিকে বৈরাগ্যের মরু। তাঁহাদের জীবনের এক ভাগ সেই পঙ্কে, অপর ভাগ সেই মরুতে যাপিত হয়। তবে যদিও তাঁহারা আমাদের অনুকরণের যোগ্য না হয়েন, তত্রাচ আমাদের শিক্ষার স্থান বটেন। লোভ পরতন্ত্র হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কি বিষময় ফল ফলে, মনুষ্য কিরূপে ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হয়, তাহা এই দুই ভ্রাতার জীবনে দেখা যায়।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

সুখী।

১

ভেবনা "অভাগা" মোরে
ভেবনা "জনম দুখী"
আমার সুখের কথা
শুন আজি বিধুমুখি!

২

চিরদিন পথে পথে
ফিরিয়াছি শ্রান্ত দেহ,
চাহেনি মুখের পানে
নিকটে ডাকেনি কেহ;

৩

একেলা, ঢেলেছি অশ্রু
মুছেছি সে আঁখি-জল;
রাখিতে তপত মাথা
মিলেনি কো তরুতল!

৪

চাঁদেতে ছিল না সুধা
ঊষাতে ছিল না হাসি,
ছিল না, ফুলেতে শোভা
সঙ্গীতে অমিয়া রাশি!

৫

হৃদয়ে ছিল না টান
মরমে ছিল না আশা,
ছিল না আমার তরে
এক ফোঁটা ভালবাসা !

৬

দাঁড়া'তে মিলেনি ঠাঁই,
কাঁদিতে মিলেনি বন,
মিলেনি ব্যথার ব্যথী
ধরাতলে একজন !

৭

অনাথ ভিখারী হেন
ফিরিয়াছি দো'রে দো'রে,
একটু আদরে কেউ,
নিকটে ডাকেনি মোরে !—

৮

সেধে সেধে কাছে গেছি
প্রাণ বিকাইব বলে,
নিঠুর সংসার হায়,
চরণে দিয়েছে দলে !

৯

কি দারুণ সে আঘাত
কি যে হৃদি চুরমার,
কি বেদনা কি যাতনা,
নহে তা তো কহিবার !

১০

এমনি অভাগা দেখি
তুমি ত্রিদিবের বালা,
সাধিয়া লইলে কাছে
আঁচলে মুছায়ে জ্বালা !

১১

সে শুভ মাহেন্দ্র যোগ
জীবনে রয়েছে লেখা—
মানসে দেবতা-পূজা
স্বপনে স্বরগ-দেখা !

১২

শুকানো পরাণ মম
অই স্নেহ ধারা পেয়ে,
বরিষার দূর্ব্বা সম
আবার উঠিল ছেয়ে !

১৩

তোমার মমতা, দয়া,
তোমার সোহাগ, প্রীতি,
এ বুকে, নীরবে দিল
জাগায়ে অমৃত-স্মৃতি !

১৪

অনন্ত অভাব মম
মুহূর্ত্তে পূরিয়া গেল,
শূন্য বুকে, মৃত বুকে
অমর জীবন এল !

১৫

ভ'রে গেল সারা ধরা,
পূরে গেল প্রাণ মন,
সে হ'তে হলেম আমি
সংসারের "একজন" !

* * *

১৬

আজি যদি ঠাঁই মোর
নাহি থাকে ধরাতলে,
আমারে জগত যদি
শত পদাঘাতে দলে,

১৭

সুখ-সাধ সুখ-আশা
হয় যদি অবসান,
শ্মশানে মিশিয়া যায়,
সে পূরবী বীণাতান,

১৮

তবু,ও' অমর-গাথা
এ পরাণ জুড়ি' রবে
তাতেই মরমে মম
অমৃত তুফান ব'বে !

১৯

জপিয়া তোমারি নাম
আনন্দে সকলি স'ব,
দেখেছি যে প্রেমময়ী,
তাই পূজি সুখী হ'ব!

২০

এ বুকে, ও পূত গন্ধ
উথলিবে যত বার,
ততই হইব আমি
জগতের "আপনার"!

২১

কেন "ভাগ্যবান" আমি,
কেন আমি "চিরসুখী"
সে সুখের ইতিহাস
শুনিলে তো বিধুমুখি?

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

বৌদ্ধ-সঙ্ঘ।

ভিক্ষুণী সঙ্ঘ।

কথিত আছে, মাতৃষ্বসা বিমাতা এবং পালয়িত্রী মহাপ্রজাপতির একান্ত অনুরোধে বুদ্ধদেব ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহাপ্রজাপতি তিনবার পুত্রের নিকট উপসম্পদা প্রার্থনা করেন, তিনবার প্রত্যাখ্যাত হন। তখন তিনি মস্তক মুণ্ডন ও গৈরিক পরিধান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আনন্দের নিকট উপস্থিত হন। আনন্দ, প্রতিপালক, সেবক, সখা ও শিষ্য—বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে গৌতম অনিচ্ছাক্রমে সম্মত হন। ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর ব্রত কোমল-হৃদয় কামিনীগণের সাধ্যায়ত্ত কি না, সে বিষয়ে তাঁহার সংশয় ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষে মহিলাগণকে কখনও স্বতন্ত্রতা দেওয়া হয় নাই। বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, অতি বৃদ্ধ হইলেও জননী পুত্রের অনুযায়িনী। কামিনী ও কাঞ্চনের মধ্যে, বুদ্ধ কাঞ্চন অপেক্ষা কামিনীকে অধিক ভয় করিতেন। "মস্তকশূন্য মনুষ্য কেবল দেহ লইয়া যেমন জীবিত থাকিতে পারে না, স্ত্রীসংসর্গী তেমনি ভিক্ষু হইতে পারে না।" "শুষ্ক পত্র বৃক্ষচ্যুত হইলে যেমন পুনরায় হরিদ্বর্ণ হয় না—কাঞ্চনকামী তেমনি ভিক্ষু হইতে পারে না।"

বুদ্ধ শিষ্যগণকে বার বার বলিতেন, স্ত্রীলোকের মুখপানে তাকাইও না। সঙ্ঘমধ্যে নারীগণকে আশ্রয় দিয়া গৌতম ভিক্ষুগণের নিপাতের পথ নির্ব্বিঘ্ন করিয়া দিতে বিমুখ হইবেন,সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিনয়সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ব্রহ্মচারীকে পরীক্ষা সময়ে, অন্যান্য প্রশ্নের সময়, ইহাও জিজ্ঞাসা করা হইত যে, তিনি পুরুষ কি না। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, যখন বৌদ্ধসঙ্ঘের সূচনা হয়, তখন গৌতম ভিক্ষুণীসঙ্ঘের কল্পনা করেন নাই। এবং ভিক্ষুণী সঙ্ঘ ভিক্ষুসঙ্ঘের পরে গঠিত হইয়াছিল। বিনয়সূত্রে গৌতম কর্তৃক ভিক্ষুণী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমার অনুমান হয়, ভিক্ষুণীসঙ্ঘ গৌতমের পরবর্ত্তী। ভিক্ষুণীসঙ্ঘের প্রাচীনতা প্রতিপাদনের জন্য গৌতমের ভিক্ষুণী প্রতিষ্ঠা আরোপিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘ একত্রে উভতো সঙ্ঘ নামে উল্লিখিত হইলেও, উভয় সঙ্ঘের নামে প্রদত্ত উপহারে ভিক্ষুণী সঙ্ঘের অর্দ্ধেক অধিকার

থাকিলেও, বস্তুতঃ ভিক্ষুণীসঙ্ঘ সর্ব্ব বিষয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘের আদেশানুবর্ত্তী, হিন্দু সমাজের অস্বাতন্ত্রতা বৌদ্ধসঙ্ঘে গৌতম আরও সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন। মালতীমাধব প্রভৃতি নাটকে ভিক্ষুণীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্থবিরা গাথা বা থেরীগাথা গ্রন্থে ভিক্ষুণীর আত্মপরিচয়ে যে আশা ভরসার চিত্র দেখা যায়, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, গৌতমের আশঙ্কা অমূলক প্রতিপাদিত হইয়াছিল। সংযম সাধনে ভিক্ষুণী ভিক্ষুর সম্পূর্ণ সমকক্ষতা করিয়াছিলেন। এবং ব্যভিচারে বৌদ্ধসঙ্ঘ কখন কলুষিত হয় নাই। কিন্তু গণনায় ভিক্ষুণী সংখ্যা কখন ভিক্ষু সংখ্যার সমতুল্য হয় নাই। চরিত্রের কোমলতা, মধুরতা ও পবিত্রতায় কলুষচরিত্র উচ্ছৃলিত বারাঙ্গনাও ভিক্ষুণীর সমক্ষে তটস্থ, সঙ্কুচিত ও ভীত হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। তথাপি ভিক্ষুণীসঙ্ঘ চিরদিন ভিক্ষুসঙ্ঘের অভিভাবকতায় পরিচালিত হইয়াছে।

১। শত বৎসর পূর্ব্বে উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া থাকিলেও সদ্যোপসম্পন্ন ভিক্ষুকেও তিনি যথোচিত সম্মান করিবেন, তাঁহাকে ভক্তির সহিত অভিবাদন করিবেন, তাঁহার সমক্ষে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিবেন। আজীবন তিনি ভক্তির সহিত এই আদেশ পালন করিবেন।

২। বর্ষার তিন মাস (চাতুর্মাস্ত) তিনি একাকিনী কোথায়ও থাকিবেন না। যেখানে ভিক্ষুগণ বর্ষাপাত করিবেন, তিনিও সেইখানেই কিন্তু অন্য গৃহে থাকিবেন।

৩। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় ভিক্ষুণীগণ একজন প্রতিনিধিকে পাঠাইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘে উপসোথ ও বিনয় প্রার্থনা করিবেন। ভিক্ষুণীগণের পাতিমোক্ষ কিছু স্বতন্ত্র। উহার নাম ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ। ভিক্ষুণীদিগকে পাতিমোক্ষ পাঠ শিখাইতে এবং অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে ভিক্ষুগণ আদিষ্ট হইয়াছেন।

৪। চাতুর্মাস্য অতীত হইলে বিদায়ের পূর্ব্বে ভিক্ষুণীগণ পরস্পরের নিকট পবারণা প্রার্থনা করিবেন। তদনন্তর প্রতিনিধি দ্বারা ভিক্ষুগণের নিকট পবারণা প্রার্থনা করিবেন। প্রতিনিধি ভিক্ষুসঙ্ঘে উপস্থিত হইয়া সমবেত ভিক্ষুগণের নিকট তিনবার প্রার্থনা করিবেন, একসঙ্গে থাকিবার সময় যদি কোন ভিক্ষুণীর কোন অপরাধ দৃষ্ট, শ্রুত বা সন্দিগ্ধ হইয়া থাকে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা দেখাইয়া দিবেন। ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীদিগের নিকট পবারণা প্রার্থনা করেন না।

৫। গুরুতর বা পারাজিক, কি সঙ্ঘাতিশেষ অপরাধে অপরাধিনী ভিক্ষুণীকে উভতোসঙ্ঘের সমক্ষে মানত্ত করিতে হয়।

৬। প্রব্রজ্যা গ্রহণের দুই বৎসর পরে এবং "ছসু ধর্ম্মেবু" বিনীত হইয়া থাকিলে প্রব্রাজিতা উভতো সঙ্ঘের অনুমতিক্রমে উপসম্পদা গ্রহণে অধিকারিণী হন। কেবল ভিক্ষুণী সঙ্ঘের সমক্ষে উপসম্পদা গ্রহণ করিলে কেহ উপসম্পন্না বলিয়া পরিগণিত হন না। প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় প্রব্রাজিতাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় ;—(১) তিনি কোন প্রাণীকে হিংসা করিবেন না। (২) চুরি করিবেন না। (৩) ব্যভিচার করিবেন না। (৪) মিথ্যা কথা বলিবেন না। (৫) মাদক সেবন করিবেন না এবং (৬) বিকাল ভোজন করিবেন না। ইহারই নাম ষড়ধর্ম্ম। প্রব্রাজিতের উপসম্পদা গ্রহণ উপধ্যায় প্রস্তাব করেন, কিন্তু প্রব্রাজিতার উপসম্পদা কোন ভিক্ষুণীকে প্রস্তাব করিতে হয়। তাঁহার নাম প্রবর্ত্তিনী। ভিক্ষুদিগের তিন

খানি বস্ত্র। কিন্তু ভিক্ষুণীদিগকে একখানি স্নানবস্ত্র উদক সাটিকা ও একটী সংকচ্ছিকম্ কঞ্চুলিকা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত।

৭। কোনও কারণে ভিক্ষুকে নিন্দা বা তিরস্কার করিবার অধিকার ভিক্ষুণীর নাই।

৮। উপসম্পদা গ্রহণের দিন হইতে আজীবন ভিক্ষুর বিরুদ্ধে বচন-পথ ভিক্ষুণীর আবদ্ধ। কিন্তু ভিক্ষুণীর বিরুদ্ধে নিন্দা বা অভিযোগের অধিকার ভিক্ষুর সম্পূর্ণ আছে।

পাতিমোক্ষ ও বিনয় শ্রবণের জন্য ভিক্ষুণীদিগকে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। আচার্য্য একাকী পাতিমোক্ষ পাঠ শিখাইতে পারেন না। আর একজন উপাধ্যায় তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকে! নির্দ্দিষ্ট স্থানে আচার্য্য উপাধ্যায় সঙ্গে পূর্ব্বেই উপবিষ্ট হন। ভিক্ষুণীগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পুরঃসর তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইলে আচার্য্য এই অট্ঠ গরু ধর্ম্মা পাঠ করেন এবং ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা উপলক্ষে তিনি কোন জাতকের কথা উল্লেখ করিয়া বা অন্য প্রকারে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং তাহাদের অপরাধ স্বীকার গ্রহণ করেন।

বিশেষ কারণ না থাকিলে আচার্য্যেরও অধিকার নাই, ভিক্ষুণী বিহারে প্রবেশ করেন। কোন ভিক্ষুণী সাঙ্ঘাতিক পীড়িত হইলে এবং আচার্য্যের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেই আচার্য্য ভিক্ষুণী বিহারে প্রবেশ করিতে পারেন। ভিক্ষুণী সঙ্গে পাদচারণা করিতে, তাঁহার সঙ্গে এক নৌকায় চড়িয়া দূরদেশে যাইতে, নির্জ্জনে তাঁহার নিকট বসিতে ভিক্ষুর বিশেষ নিষেধ। নির্জ্জনবাস ভিক্ষুর জন্য উপযোগী বলিয়া বিহিত হইয়াছে। নির্জ্জনবাস ভিক্ষুণীর জন্য বিধান করা হয় নাই। বনবাস তাঁহার নিষিদ্ধ। ভিক্ষু নগর প্রান্তে বাস করিবেন, ভিক্ষুণী নগর মধ্যে দ্বার বিশিষ্ট গৃহে দুই বা ততোধিক ভিক্ষুণী সঙ্গে বাস করিবেন। একাকিনী বাস করিবার তাঁহার অধিকার নাই।

আনন্দের অনুরোধে গৌতম ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা করিবার পরে গৌতম আনন্দকে বলিয়াছিলেন,—

"আনন্দ! মহিলাগণকে গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রাজিতা হইতে যদি অনুমতি না দিতাম, তবে তথাগতের বিমল ধর্ম্ম জগতে চিরকাল প্রচারিত থাকিত—ভিক্ষুণী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমি সেই বিমল ধর্ম্মের জীবন মাত্রা অর্দ্ধেক সঙ্কুচিত করিয়াছি, অতঃপর পাঁচশত বৎসরের অধিক সে নির্ব্বাণপ্রদ বিমল সত্য ভারতে প্রতিভাত হইবে না। যে গৃহে পুরুষের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, রমণীর সংখ্যা অধিক, চোর ও দস্যুগণ সে গৃহে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। যে ধর্ম্ম নারীগণকে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসিনী করে, সে ধর্ম্ম অধিক দিন স্থায়ী হয় না। শস্যপূর্ণ হরিদ্‌ক্ষেত্রে কীট সঞ্চার হইলে ক্ষেত্র অবিলম্বে শস্যশূন্য হয়। যে ধর্ম্মে রমণীগণকে সংসার ছাড়িয়া বিরাগিনী করে, সে ধর্ম্ম অধিক দিন স্থায়ী হয় না। শোভন ইক্ষুক্ষেত্রে কীটসঞ্চার হইলে অনতিবিলম্বে ক্ষেত্র বিনাশ হয়। যে ধর্ম্মে রমণীগণকে সংসার ছাড়িয়া পান্থবাসিনী করে, সে ধর্ম্ম অধিক দিন স্থায়ী হয় না। উদ্বেল তরঙ্গিণীর উপদ্রব নিবারণ হেতু লোকে বন্ধনী প্রস্তুত করে, আমিও পূর্ব্ব হইতে এই অষ্টগুরু ধর্ম্ম বন্ধন করিলাম।"

কুল্যবর্গে লিখিত হইয়াছে, আনন্দ এই অষ্টবিধি মহাপ্রজাপতিকে নিবেদন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"আনন্দ, অলঙ্কারপ্রিয় যুবক ও যুবতীগণ কমলমালা, মালতীমালা বা অতিমুক্ত কুসুম মঞ্জরী পাইলে দুই হস্তে ধরিয়া যত্নে যেমন শিরোধার্য্য করে—তথাগতের অষ্ট সন্নিধান আমি তেমনি সমাদরে শিরোধার্য্য করিলাম।"

ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে মহাপ্রজাপতি, উৎপলবর্ণা, নন্দা অম্বপালী পতাচার এবং রাজকুমারী সুমেধা ও সঙ্ঘমিত্রা সুবিখ্যাত। অশোকের রাজ্যকালে ভিক্ষুণীসঙ্ঘের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বৈরাট গিরিশাসনে অশোক ভিক্ষুণীসঙ্ঘের উল্লেখ করিয়াছেন। "ভিক্ষুপা যেচ ভিক্ষুণী যেচ অভিক্ষুণায় সুনয়ুচা উপধালিয়ে য়ুচ হেমমেব উপাসকা চ উপাসিকা চ এতোনুভুন্তে ইমাম লিখাপিয়ামি অভিপেতি মে জানন্তিতি।" কিন্তু কি ভারতবর্ষে, কি সিংহলে ভিক্ষুণীসঙ্ঘে রমণীগণকে সংগ্রহ করিতে, গৃহত্যাগিনী করিতে, কখন উৎসাহ দেওয়া হয় নাই। সিংহলে এখন আর একটীও ভিক্ষুণী দেখা যায় না। ব্রহ্মদেশে এখনও বিস্তর ভিক্ষুণী দেখা যায়।

তথাগত সমুদ্রের সহিত সঙ্ঘের তুলনা করিতেন। সমুদ্রের আটটী গুণ আছে। (১) সমুদ্রের গভীরতা—গভীর হইতে গভীরতম হইয়া শেষে অতল হইয়াছে। বৌদ্ধসঙ্ঘে ধ্যান, ধারণা, ও সমাধিও গভীর হইতে গভীরতর, ক্রমে অতলস্পর্শ প্রজ্ঞা সমাগত হইয়াছে। (২) গোদাবরী বা আশীবরতী সিন্ধু বা কাবেরী সমুদ্রে সমাগত হইলে সকলেই আপনার বিশেষত্ব হারাইয়া সমুদ্রের নীলজলে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র তথাগতের সঙ্গমে উপস্থিত হইলে সকলেরই ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যায়, নাম জাতি হারাইয়া সকলেই "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ" নামে অভিহিত হন। (৩) সমুদ্র মৃতদেহ পোষণ করে না—তরঙ্গের পর তরঙ্গ তাড়নায় মৃতদেহ তটোৎক্ষিপ্ত হইয়া সমুদ্রের পবিত্রতা কলঙ্কমুক্ত করে। ব্যভিচারীও প্রবৃত্তিপরায়ণ বৌদ্ধসঙ্ঘে আশ্রয়লাভ করে না, তাড়নার পর তাড়নায় সঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া সংসারে বা অন্য মণ্ডলীতে শরণ গ্রহণ করে। (৪) বাত্যাপীড়িত হইলেও সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তাহার ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য এতই প্রবল। সহস্র বাধা বিপত্তিসত্ত্বে ভিক্ষু তথাগতের বিনয়সূত্র কখন অতিক্রম করেন না। (৫) সমুদ্রের সকল অংশে একই স্বাদ—লবণতা। সকল ভিক্ষুর একই সাধনা—নির্ব্বাণ লাভ। (৫) সহস্র নদীর জলপ্রপাতে বা বরষার অযুত ধারায় সমুদ্রের বৃদ্ধি নাই—মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড দহনে বা কোটী কলস আকর্ষণে সমুদ্রের হ্রাস নাই। সহস্র ভিক্ষুসঙ্ঘে আশ্রয় লইলে বা অযুতজনে পরিত্যাগ করিলে সঙ্ঘের হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষিত হয় না। (৭) মণি মুক্তা প্লক্ষ ও মরকতে মহোদধি পরিপূর্ণ। ধর্ম্ম ও সূত্র, চতুরিদ্ধি পঞ্চশীল ও অষ্ট সন্মার্গে বৌদ্ধসঙ্ঘ উজ্জ্বলিত। (৮) তিমি, তিমিঙ্গিল, নাগ অসুর ও গন্ধর্ব্ব শত সহস্র মহাবল জীব সমুদ্রে সঞ্চরমান—তথাগতের বৌদ্ধসঙ্ঘে শ্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হতগণ সেইরূপ নিত্য বিদ্যমান। ইঁহাদের তেজস্বিতার পরিধি নাই।

তথাগতের অকুপার সমান বৌদ্ধসঙ্ঘের আজ চিহ্নমাত্র ভারতে নাই। যে বৌদ্ধধর্ম্ম জগতে ভারতের নাম প্রথম ঘোষণা করিয়াছিল—আজি ভারত হইতে তাহা নির্ব্বাসিত। প্রাচীন জীবের কঙ্কালাবশেষ অনুসন্ধান করিতে আবিসিনিয়ার ভূগর্ভে ডো ডো ও আমেরিকার ভূস্তরে মামথের অনুসন্ধান করিতে হয়—তথাগতের তিমি তিমিঙ্গলের কঙ্কালাবশেষ সন্ধানে সিংহলের তালবনে, চীনের প্রাচীর পার্শ্বে বা তিব্বতের গিরিগুহায় আজ আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইতেছে।

আনন্দের অনুরোধে গৌতম ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এজন্য ভিক্ষুণীগণ চিরদিন সসম্মানে আনন্দের নামে কৃতজ্ঞতা উপহার দিয়াছেন। বিশিষ্ট বৌদ্ধমঠে সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ণ ও আনন্দের মঠ প্রতিষ্ঠিত হইত। ফাহিয়ান বলেন, ভিক্ষুণীগণ আনন্দমঠ ও শ্রমণের গণ রাহুল্ মঠের বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ফাহিয়ানের সমগ্র ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভিক্ষুণী সঙ্ঘ সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ নাই। মঠে কোথায় কতশত বা সহস্র ভিক্ষু বাস করিত, তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু সিংহলে কি ভারতবর্ষে তিনি কোথায় কত ভিক্ষুণী দেখিয়াছিলেন বা তাহাদের আচার ব্যবহার কিরূপ, সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই। ফাহিয়ান খ্রীষ্টের পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার দুইশত বৎসর পরে হুয়েনসাঙ্ এদেশে আসেন। তিনি বহুদিন ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল খণ্ডে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগেরও মত বিশ্বাস আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বৃহৎ ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভিক্ষুণীদিগের একবার উল্লেখও করেন নাই। বোধ হয় ফাহিয়ান ও হুয়েনসাঙের পূর্ব্ব হইতেই ভিক্ষুণীসঙ্ঘ ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। দু চারিটী ভিক্ষুণী কোথাও থাকিলেও ভিক্ষুণীসঙ্ঘের তখন অস্তিত্ব ছিল না। ভিক্ষুণী সমিতি আর্য্যপ্রকৃতির অননুমোদিত, গৌতম অনিচ্ছায় তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অশোকবর্দ্ধনের রাজত্বকালে তাহা উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করে। তার পর ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম যত তান্ত্রিক ধর্ম্মে বিকৃত হইতে আরম্ভ করিল, শুদ্ধাচারিণী ভিক্ষুণীগণ ভারতভূমি হইতে ক্রমে অন্তর্দ্ধান করিলেন। হুয়েনসাঙ্ বিশাখা ও প্রজাপতির মঠগুলি ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন। দীপবংশে লিখিত হইয়াছে যে, অশোকবর্দ্ধনের রাজত্বকালে বৌদ্ধসঙ্ঘে অশিতিকোটি ভিক্ষু ও ষড়নবতি সহস্র ভিক্ষুণী বাস করিত। সংখ্যা যতই হউক, অশোকের সময়ে যে ভিক্ষুণী সঙ্ঘ শ্রীবৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্ররায়।

আকাশের খুকী।

আকাশের খুকী,
এ মেঘের কোল থেকে, ও মেঘের কোলে যায়,
লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া হইয়ে কৌতুকী!
কোলে কোলে করে খেলা, শাওণে সারাহ্ন বেলা,
এই দেখি এই নাই এই মারে উকি!
হাসিয়া ভৈরব রবে, বাখানে জলদ সবে,
করতালি শু'নে উঠে ধরণী চমকি!
আমি ও চপলা মেয়ে, বড় সাধে দেখি চেয়ে,
জলদের "বাহবায়" আমি বড় সুখী!
আমারো পরাণ নাচে, যাইতে ওদের কাছে,
আমারো আছিল এক মেয়ে সোণামুখী!
আমি বড় ভালবাসি আকাশের খুকী!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ঐতিহাসিক মীমাংসা। (২)

যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় করিতে আমি পৌরাণিক মতই প্রশস্ত বোধ করিয়াছিলাম। কেন না, পুরাণে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত যত বৎসর অতীত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা ধরিয়া দেওয়া আছে। যদিও পরীক্ষিতের বংশধরগণ হস্তিনা বা কৌশম্বীতে কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা প্রদত্ত হয় নাই, তথাপি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক মগধরাজ জরাসন্ধের বংশধরগণের রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট থাকায় সে অভাব দূরীভূত হইয়াছে। জরাসন্ধ ও তাঁহার পরবর্ত্তী ভূপতিগণ বংশপিতা বৃহদ্রথের নামানুসারে বার্হদ্রথ নামে খ্যাত। ভারতযুদ্ধের পরবর্ত্তী বার্হদ্রথ রাজগণ মগধে কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহা স্থির করা আবশ্যক হইয়াছিল। এজন্য পুরাণবিশেষ অবলম্বন করিয়া আমি বলিয়াছিলাম যে, জরাসন্ধের পৌত্র সোমাপি রাজার পরবর্ত্তী ভূপালগণের রাজ্যভোগকাল ছয় শত বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু দেখিতেছি, শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় আমার মতটী "পুরাণবিরুদ্ধ" বলিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, মৎস্য, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সোমাপি হইতে বৃহদ্রথ বংশীয় রাজগণ মগধে "সহস্র বা হাজার থানেক" বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল প্রমাণের সাহায্য লইয়াছেন, সেগুলি আলোচনা করিবার অগ্রে যে শ্লোকটী লইয়া বিবাদ, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। শ্লোকটী এই—

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্ বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং॥ ৩২।২৪।৪। বিঃ পুঃ.

ইহার চির প্রচলিত অর্থ এই যে "পরীক্ষিতের জন্ম অবধি নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত (১০১৫) এক সহস্র পঞ্চদশ বৎসর গত হইয়াছিল।"

পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এই অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন—

"এই বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চদশোত্তরং" "এই স্থানের 'পঞ্চদশ' শব্দটী একশেষ সিদ্ধ বলিতে হয়। যেমন 'ঘটৌ' বলিলে দুইটী ঘট বুঝায়, 'ঘটায়' বলিলে বহু ঘট বুঝায়, তদ্রূপ উক্ত পঞ্চদশ কথাটী বহু পঞ্চদশের অর্থাৎ চতুস্ত্রিংশ গুণিত পঞ্চদশের বোধক বলিয়া বোধ হয়। ১৫কে ৩৪ দ্বারা গুণ করিলে ৫১০ই হইয়া থাকে। অথবা উক্ত শ্লোকে লিপিকর প্রমাদ বশতঃ (শতং) স্থলে (জ্ঞেয়ং) হইয়াছে। এইরূপে একটু কষ্ট কল্পনা করিতেই হয়।"

তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত "নন্দ ও যুধিষ্ঠিরের অন্তরকাল সম্বন্ধে" দেউস্কর মহাশয়ের কোন মতভেদ ছিল না; এবং এখনও নাই। তবে দেউস্কর মহাশয় এবার একটু সন্দিগ্ধ ভাবে বলিয়াছেন "জ্ঞেয়ং পঞ্চ শতোত্তরং" স্থানে লিপিকরপ্রমাদবশতঃ—

"জ্ঞেয়ং পঞ্চ দশোত্তরং" হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে বিষ্ণুপুরাণের একটা সমগ্র অধ্যায়কে (যে অধ্যায়ে জরাসন্ধের পরবর্ত্তী নৃপতি সমূহের নাম কীর্ত্তিত ও অবস্থিতিকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে) ভ্রমপূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অপেক্ষা একটী শ্লোকের অন্তর্গত একটী পদকে লিপিকর প্রমাদ-জনিত অশুদ্ধ মনে করা আমি অধিক দোষাবহ মনে করি না।"

বিষ্ণুপুরাণের উক্ত অধ্যায় (৪র্থ অংশের ২৩ অধ্যায়) সম্বন্ধে তিনি বলেন,—

"বিষ্ণুপুরাণের এই অধ্যায়ে বৃহদ্রথ বংশীয় যে ভবিষ্যৎ ভূপালগণের কথা বলা হইয়াছে, জরাসন্ধ পৌত্র সোমাপি তাঁহাদের প্রথম। তার পর এই অধ্যায়ের উপসংহার এইরূপ করা হইয়াছে। এই বার্হদ্রথ নৃপতিগণ এক সহস্র বর্ষ রাজত্ব করিবেন। * * * *।

বিষ্ণুপুরাণকারের মতে বৃহদ্রথ বংশীয়গণের স্থিতিকাল সহস্র বৎসর নহে—উক্ত বংশের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ জরাসন্ধপুত্র সহদেবের পরবর্ত্তী নৃপতিগণেরই রাজ্যকালের সমষ্টি সহস্র বৎসর। কেন না, এই অধ্যায়ে কেবল "ভবিষ্যৎ" নরপতিগণের কথাই বলা হইয়াছে।"

প্রথমতঃ, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের সাহায্য লইয়া দেউস্কর মহাশয় পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের প্রামাণিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, মৎস্য, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হইতে, সোমাপি হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত বার্হদ্রথ রাজগণের বংশ তালিকা ও রাজ্যকাল উদ্ধৃত করিয়াছেন। এবং মৎস্যপুরাণ মতে ৯৩৫, বায়ু মতে ৯২১, ব্রহ্মাণ্ড মতে ৮৮১ বৎসর—উক্ত "ভবিষ্যৎ" রাজগণের রাজ্যভোগ কালের ঐ তিনটী সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি প্রধানতঃ ঐ তিনটী সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়াছেন।

এক্ষণে আমরা দেউস্কর মহাশয়ের প্রধান যুক্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বিবাদাস্পদীভূত শ্লোকে লিপিকর প্রমাদ ঘটিয়াছে কি না, তাহাই দেখা যাউক। দেউস্কর মহাশয় যেরূপ পুরাণ-বর্ণিত বংশ তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাই আমরা আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইতেছি। তাহা হইলে বায়ুপুরাণমতে সোমাপি হইতে বার্হদ্রথগণের রাজ্যকাল ৯২১ বৎসর হইতেছে। উক্ত পুরাণমতে প্রদ্যোত বংশের রাজ্যকাল ১৩৮ বৎসর এবং শৈশুনাগ বংশের রাজ্যকাল ৩৩২ বৎসর। সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৯১ বৎসর সোমাপি ও নন্দের অন্তর হইতেছে। কোথায় ১৫১০ আর কোথায় ১৩৯১! বেচারা লিপিকরের দোষ আর কি করিয়া বিশ্বাস হয়? না হয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মত ধরা হউক। ৮৮১+১৩৮+৩৬২=১৩৮১ বৎসর হইল। এতদনুসারেও ১৫১০ বৎসর সংস্থান হয় কি? এক্ষণে নির্দ্দোষী লিপিকরগণ অব্যাহতি পাইতে পারিবে বোধ হয়? এত 'একশেষ সিদ্ধ' করিয়া, অর্থের মারপেঁচ করিয়া, কষ্টকল্পনা করিয়া ১৫১০ বৎসর দেখাইতে পারিলেন কৈ? না হয়, ১৫০০ শত বৎসর দেখাইলেও চলিত। অভাব পক্ষে ১৪৯৮ হইলেও হইতে পারিত।

দেউস্কর মহাশয় বার্হদ্রথ ভূপতিগণের যে রাজ্যকাল উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদপেক্ষা ন্যূন সংখ্যা ঐ তালিকা হইতেই সংগ্রহ করা যাইতেছে। কিন্তু আপাততঃ আমি দেউস্কর মহাশয়ের সংগৃহীত তালিকা হইতেই যাহা দেখাইলাম, তাহাতে সকলে বুঝিবেন যে, উক্ত-বংশতালিকার বলে বিষ্ণুপুরাণ বচনে লিপিকর-প্রমাদ কল্পনা করা অনভিজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র। এই বংশতালিকা হইতে যে সংখ্যা গৃহীত হইতে পারে, তাহা স্পষ্টই দেউস্কর মহাশয়ের মতের প্রতিকূল। স্থানান্তরে ইহার আলোচনা করিব।

অতঃপর বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশের ২৩ অধ্যায় দেউস্কর মহাশয় কিরূপ বুঝিয়াছেন, দেখা যাউক। তিনি কোন্ যুক্তিবলে সোমাপিকে ভবিষ্য রাজগণের প্রথম ধরিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক। যে সময়ে যে কথা বলা যায়, তাহার ভাবীকালকেই ভবিষ্যৎ বলে। ২৩ অধ্যায়বর্ণিত ভবিষ্যৎ রাজগণের নাম পরীক্ষিতের রাজ্যকালে পরাশর ঋষি মৈত্রেয় নামক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন। তৎকালে যে পরীক্ষিৎ রাজ্য করিতেছিলেন, তাহা পরাশর ১৯ অধ্যায়ে বলিয়াছেন। তাহা হইলে পরীক্ষিতের পরবর্ত্তীরাজগণই "ভবিষ্যৎ" নামে অভিহিত হইবেন। কিন্তু দেউস্কর মহাশয়ের মতে সোমাপি পরীক্ষিতের পরবর্ত্তী হইতেছেন। যখন পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে বাস করিতেছিলেন,

তখন সোমাপি রাজাসনে উপবিষ্ট। যখন পরীক্ষিৎ সূতিকাগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া অর্জ্জুনের সহিত সোমাপির মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। সুতরাং দেউস্কর মহাশয়ের মতে পরীক্ষিতের পরবর্ত্তী সোমাপিকে হইতেই হইবে! এরূপ চাতুর্য্য প্রকাশ, এরূপ গোঁজামিলনের চেষ্টা বাহাদুরী বটে! ইচ্ছা করিয়া দেউস্কর মহাশয় এরূপ করিয়াছেন কি না, জানি না; কিন্তু শ্রীধর স্বামীর টীকা দেখিলে ত এই ভ্রম হইত না। পাঁচখানি পুরাণ লইয়া বিচার করিতে বসিয়াছেন, কিন্তু দেখিতেছি, মূলেই ভুল করিয়াছেন। স্বামীজী কি বলেন, দেখিয়াছিলেন কি? বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের ১৯ অধ্যায়টীতেও কি দেখেন নাই যে, সোমাপি ও শ্রুতশ্রবা পরীক্ষিতের সমসাময়িক নরপতি। স্বামীজী কি ২৩ অধ্যায়ের টীকায় সোমাপি হইতে তৃতীয় ব্যক্তিকে (অযুতায়ুকে) ভবিষ্যরাজগণের প্রথম ধরেন নাই? পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই দেউস্কর মহাশয় প্রামাণিক মনে করিয়াছেন, কিন্তু যুক্তিহীন বিচারে যে ধর্ম্মহানি ঘটিয়া থাকে, এ কথাটা ভাবিবারও কি সাবকাশ হয় নাই; বিতণ্ডা করিবার ইচ্ছা এতই বলবতী!

ভাগবতের "ভাব্যা" কথাটা লইয়াও তিনি একটু গোল করিয়াছেন। "ভাব্যা" অর্থে সোমাপি হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত রাজগণকেই অর্থাৎ ভারতযুদ্ধের পরবর্ত্তী নৃপতিদিগকে গণিয়াছেন। কিন্তু ঐ "ভাব্যা" কথার অর্থ ভাগবতের অন্যতম টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কি বুঝিয়াছেন? তিনি বলেন "জরাসন্ধাৎ সহস্র বৎসর পর্য্যন্তং" অর্থাৎ বৃহদ্রথের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ভূপতি হইতেই ঐ সহস্র বৎসর ভোগ হইয়াছে। কেন না, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারত মতে জরাসন্ধ বৃহদ্রথেরই পুত্র। যদিও হরিবংশের মত অধিক আদরণীয়, তথাপি টীকাকার ভাগবতের মতেই বৃহদ্রথের অব্যবহিত পরে জরাসন্ধকেই ধরিয়াছেন। আর যদি টীকাকার বিশ্বনাথের মতে আস্থা স্থাপন না করেন, তাহা হইলে "ভাব্যা" অর্থে ভবিষ্যৎ রাজগণ অর্থাৎ অযুতায়ু হইতেই গণিতে হইবে। কেন না, ভাগবতেও সোমাপি ও শ্রুতশ্রবাকে পরীক্ষিতের সমসাময়িক বলা হইয়াছে। কিন্তু দেউস্কর মহাশয় যাহা দেখাইয়াছেন, তাহাতে সোমাপি হইতেই সহস্র বৎসর সংস্থান হয় না। অযুতায়ু হইতে ৯২১ – ১২২ = ৭৯৯ বৎসর হইবে। সুতরাং মানিতে হইতেছে, টীকাকার বিশ্বনাথের মতে জরাসন্ধ হইতে ঐ সহস্র বৎসর ভোগ ধরাই প্রশস্ত।

এক্ষণে আর একটী কথার উত্তর দিয়া আপাততঃ এ প্রবন্ধের শেষ করিব। বিষ্ণুপুরাণের ২৩ অধ্যায় (৪র্থ অংশ) কি ২৪ অধ্যায়ের ৩১।৩২ প্রভৃতি শ্লোকগুলি অধিক প্রামাণিক? অর্থাৎ বিবাদস্থলে কাহার প্রামাণ্য অধিক? দেউস্কর মহাশয়ের মতে ২৩ অধ্যায়ই অধিক প্রামাণিক। কিন্তু আমার মতে উক্ত দুই স্থলে বিবাদ নাই। আর যদি বিবাদের কারণ হয়, তাহা হইলে ২৪ অধ্যায়ের ৩২।৩৪ প্রভৃতি শ্লোকগুলিই মানিতে হইবে। কেন না, পুরাণকার ঐ শ্লোকগুলি "অত্রোচ্যতে" বলিয়া প্রামাণিক স্থল হইতে নিজের সমর্থনের জন্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এইরূপ বিষ্ণুপুরাণের স্থানে স্থানে বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ)

প্রথম অধ্যায়।

অর্জ্জুন-বিষাদ।

"যদ্বক্ত্র পঙ্করূহ সম্প্রসূতং
নিষ্ঠামৃতং বিশ্ববিভাগ নিষ্ঠং।
সাধোতরাভ্যাং পরিনিষ্ঠিতাস্তং
তং বাসুদেবং সততং নতোহস্মি॥"

ধৃতরাষ্ট্র—

সঞ্জয়! যুদ্ধার্থে মিলি পুণ্য কুরুভূমে,
কি করিলা—আমার ও পাণ্ডবের দলে? ১

সঞ্জয়—

ব্যূহিত পাণ্ডবসেনা দেখি দুর্য্যোধন,
আচার্য্য সমীপে গিয়া কহিলা বচন—২
"হের গুরু! পাণ্ডবের অই মহা চমু,
ব্যূহিত করেছে তব সুশিষ্য দ্রৌপদ। ৩
"হোথা বীর মহাধন্বা—যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন—
যুযুধান্ বিরাট দ্রুপদ মহারথ, ৪
"ধৃষ্টকেতু চেকিতান কাশীরাজ বীর,
পুরুজিৎ কুন্তীভোজ শৈব্য নরোত্তম, ৫
"মহাবল যুধামন্যু উত্তমৌজা বীর,
সৌভদ্র-দ্রৌপদীসুত-সবে মহারথ! ৬

টীকা।

(১) পুণ্য কুরুভূমে—কুরুক্ষেত্র—ধর্ম্মক্ষেত্র। এই স্থানে কুরুরাজ তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হন। দেবগণ এই স্থানে যজ্ঞে উপস্থিত থাকেন। তাঁহারা এই স্থানে দেবযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। (মধু)

কি করিলা—অভিপ্রায় এই যে, স্থানমাহাত্ম্যে ধর্ম্মপ্রভাবে তাহারা যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছিল কি না? (মধু ও গিরি)

(২) ব্যূহিত—যুদ্ধকালে ও অভিনির্য্যাণকালে সেনাপতি যে বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে সেনা বিন্যস্ত করেন,তাহাকে ব্যূহ বলে। ব্যূহ সাধারণতঃ ছয় প্রকার। যথা,—মকর, শ্যেন, সূচী,শকট, বজ্র ও সর্ব্বতোভদ্র, পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রে বজ্রব্যূহ সাজাইয়াছিলেন। (মধু)

(৩) সুশিষ্য—মূলে আছে ধীমান শিষ্য। টীকাকারেরা বলেন, ব্যঙ্গচ্ছলে দুর্য্যোধন এরূপ বলিয়াছিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন শিষ্য হইয়া গুরুবধার্থে এইরূপ উদ্যোগ করিতেছিল, এই জন্য। (মধু) দ্রোণবধ জন্য দ্রুপদ-রাজ যজ্ঞকুণ্ড হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, এই জন্য। (বলদেব) এ দূরার্থের বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয় না।

(৪।৫।৬)—যুযুধান—সাত্যকি। ধৃষ্টকেতু—চেদীরাজ। পুরুজিৎ ও কুন্তীভোজ—পুরুজিতের ভ্রাতা কুন্তীভোজ বসুদেব কন্যা কুন্তীদেবীকে দত্তক কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সৌভদ্র—অভিমন্যু। দ্রৌপদী-সুত—দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, যথা, প্রতিবিন্ধ্য, সুত-সোম, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানীক ও শ্রুতসেন। মহারথী—মহারথীর লক্ষণ এই—

"একাদশ সহস্রাণি যোধয়েৎ যস্তুধন্বিনা
শস্ত্র শাস্ত্র প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ।"

অনুবাদকের নিবেদন।

* আজ প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল, আমি পদ্যে গীতার অনুবাদ করিয়াছিলাম। তখন গীতার উপর নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়িতেছিল; গীতার অনেকগুলি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছিল। **নবীন** বাবু তখন গীতার পদ্যানুবাদ করিতেছিলেন, শুনিয়াছিলাম। একারণ আমার এ অনুবাদ প্রকাশ করা অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, আমি যে ভাবে অনুবাদ করিয়াছি, ও সকল সংস্কৃত প্রসিদ্ধ টীকাকারদের টীকার সার সংগ্রহ করিয়া ইহাতে যেরূপে আবশ্যকমত টীকা সন্নিবেশিত করিয়াছি—সেরূপ আর কেহই করেন নাই। এরূপ টীকা সহ গীতার বঙ্গানুবাদ সাধারণের প্রয়োজন হইতে পারে,এই বিবেচনায় এবং নব্যভারতের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদকের অনুরোধে ইহা নব্যভারতে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আবশ্যক হইলে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে পারিব। শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

"আমাদের(ও) বিশিষ্ট যে সেনার নায়ক,
জ্ঞাতার্থ তোমায় কহি, শুন দ্বিজবর—৭
"আপনি ও ভীষ্ম কর্ণ কৃপ রণজয়ী,
অশ্বত্থামা বিকর্ণ ও সোমদত্ত স্থত—৮
"আরও কত শূর—নানা প্রহরণ-ধারী,
যুদ্ধবীর—মম তরে প্রাণ দিতে রত! ৯
"অপর্য্যাপ্ত বল মম ভীষ্ম স্থরক্ষিত,
পর্য্যাপ্ত এদের সেনা ভীমের রক্ষিত। ১০
"সকল অয়নে থাকি যথাভাগ মত,
ভীষ্মকে করুন তবে রক্ষা মিলি সবে।" ১১
কুরুবৃদ্ধ পিতামহ তারে উল্লাসিতে,
ধ্বনিলা প্রতাপে শঙ্খ উচ্চ সিংহনাদে। ১২

(৮) বিকর্ণ—দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সোমদত্তস্থত—ভুরিশ্রবা।

(১০)—অপর্য্যাপ্ত ও পর্য্যাপ্ত—(১) অপর্য্যাপ্ত—যুদ্ধ করিতে অসমর্থ; পর্য্যাপ্ত—যুদ্ধ করিতে সমর্থ। (স্বামী ও রামানুজ) (২) অথবা—অপর্য্যাপ্ত—অপরিমিত ও অপরিগণিত; পর্য্যাপ্ত—পরিমিত। (গিরি, মধু ও বলদেব)। এই দুই বিপরীত অর্থ মধ্যে শেষ অর্থ অধিক সঙ্গত। প্রায় সকল টীকাকারগণই বুঝাইতে চান—যে দুর্য্যোধন-পাণ্ডবকুলের মধ্যে ভীমার্জ্জুন সম অনেক যোদ্ধা মহারথী ও তাহাদের মহাচমু ব্যূহবদ্ধ দেখিয়া কিছু ভগ্নমন হইয়াছিলেন ও সেই জন্য ভীষ্ম তাঁহার হর্ষোৎপাদন জন্য পরে শঙ্খধ্বনি করেন। স্থতরাং তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে স্বভাবতঃই যুদ্ধ করিতে অসমর্থ ও কৌরবসেনাকে যুদ্ধ করিতে সমর্থ মনে করিতে পারেন। প্রথম টীকাকারগণ এই কথা বলেন। দ্বিতীয় টীকাকারগণ বলেন যে, দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিণী সেনা অপেক্ষা তাঁহার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা অনেক অধিক এবং তাহা ভীম অপেক্ষা অধিক রণনিপুণ ভীষ্ম কর্তৃক রক্ষিত দেখিয়া তখন বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন।

(১১) অয়ন—মর্য্যাদাক্রমে অগ্রপশ্চাৎ অবস্থিতির স্থান। (গিরি ও মধু) ব্যূহপথ (স্বামী ও বলদেব)

ভীষ্মকে রক্ষা—ভীষ্ম প্রধান সেনাপতি বলিয়া ব্যূহ মধ্যস্থলে থাকিবেন ও অন্য সেনাপতিগণ তাঁহাকে পার্শ্ব হইতে রক্ষা করিবেন—তবে সকলে রক্ষিত হইবে। যুদ্ধকালে প্রধান সেনাপতিকে বিনাশ করার জন্য প্রধানতঃ বিপক্ষগণ চেষ্টা করিত। (মধু)

গোমুখ পণবানক শঙ্খ ভেরী তবে
সহসা বাজিল, শব্দ হইল তুমুল। ১৩
"তবে শ্বেত অশ্বযুত মহারথে থাকি,
নিনাদিল দিব্যশঙ্খ—মাধব অর্জ্জুন—১৪
কৃষ্ণ—পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত—ধনঞ্জয়;
নাদে পৌণ্ড্র মহাশঙ্খ ভীমকর্ম্মা ভীম; ১৫
যুধিষ্ঠির নির্ঘোষিলা—অনন্তবিজয়;
স্থঘোষ-নকুল, মনিপুষ্প-সহদেব। ১৬
ধৃষ্টদ্যুম্ন কাশীরাজ পরম ধানুকী,
বিরাট শিখণ্ডী রথী, অজিত সাত্যকি, ১৭
দ্রুপদ, দ্রৌপদীপুত্র, বীর ভদ্রাস্থত,
হে রাজন্, সবে ঘোষে শঙ্খ নিজ নিজ। ১৮
কাঁপাইয়া নভঃ পৃথ্বী তুমুল আরবে,
বাজিল সে ধ্বনি গিয়া কৌরবের বুকে। ১৯
তবে পার্থ কপিধ্বজ—শরক্ষেপ হেতু
ধনু তুলি—রণোদ্যত কৌরবেরে হেরি,
হৃষীকেশে হে রাজন্, কহিল এ কথা। ২০

অর্জ্জুন—

অচ্যুত! রাখ এ রথ উভসেনা মাঝে—২১
যাবৎ না হেরি আমি যুদ্ধকামীগণে—
কে যুঝিবে মম সনে উপস্থিত রণে; ২২

(১৩) পণব—মাদল। আনক—পটহ। গোমুখ—শৃঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র।

(১৫) পাঞ্চজন্য—কৃষ্ণ প্রভাশকুলে গুরু সন্দীপনির পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য পঞ্চজন নামক সমুদ্রবাসী দৈত্যকে হত্যা করিয়া, তাহার অস্থি হইতে এই শঙ্খ প্রস্তুত করেন।

(২০) কপিধ্বজ—হনুমান অর্জ্জুনের ধ্বজে অধিষ্ঠিতছিল।

(২১) অচ্যুত—যাহার চ্যুতি বা বিকার নাই। রণক্ষেত্রে অবিচলিত থাকা সারথির প্রধান গুণ। (মধু)

দেখি যারা রণ আশে আসিয়াছে হেথা—
দুর্য্যোধন দুর্বোধের যুদ্ধে-প্রিয়কারী। ২৩

সঞ্জয়—

নিদ্রাজয়ী অর্জ্জুনের বাক্য শুনি তবে,
হৃষীকেশ স্থাপি রথ সেনা সন্ধিস্থলে—২৪
ভীষ্ম দ্রোণ নীত যত মহীপতি মাঝে,
কহিলেন "হের পার্থ অই কুরুদলে।" ২৫
দেখে পার্থ আছে তথা উভ-সেনা-দলে
পিতৃব্য ও পিতামহ আচার্য্য মাতুল
পুত্র পৌত্র ভাই বন্ধু শ্বশুর সুহৃৎ; ২৬
সেই সব বন্ধুগণে হেরি অবস্থিত,
কহিল অর্জ্জুন—বড় দুঃখ কৃপাযুত—২৭

অর্জ্জুন—

হেরি এ স্বজনগণে রণ আশে স্থিত—
অবসন্ন দেহ মম—বিশুষ্ক বদন—২৮
কাঁপে অঙ্গ মম কৃষ্ণ—হয় রোমাঞ্চিত—
জ্বলে দেহ—হাত হতে খসিছে গাণ্ডিব—২৯
মোহ উপজিছে মম—না পারি থাকিতে—
হেরি কৃষ্ণ! বিপরীত লক্ষণ সকল। ৩০
স্বজনে বধিয়া রণে নাহি হেরি লাভ।
হে কৃষ্ণ চাহি না জয়—কিম্বা রাজ্যসুখ; ৩১
কেন রাজ্য, ভোগ, কৃষ্ণ কেন বা জীবন—
যাহাদের তরে চাহি রাজ্যভোগ সুখ; ৩২
অই তারা যুদ্ধে স্থিত—ত্যজি ধন প্রাণ—
আচার্য্য পিতৃব্য আর পুত্র পিতামহ: ৩৩
মাতুল শ্বশুর পৌত্র সম্বন্ধি শ্যালক।
মরিলেও—ইচ্ছা নাহি মারি এ সবারে। ৩৪
ত্রিলোকের(ও)রাজ্যতরে—ধরার কি কাজ?
কি প্রীতি লভিব বধি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে? ৩৫
এই আততায়ী বধে হবে পাপাশ্রয়;
বন্ধুসহ কুরুগণে বধি নাহি কাজ—
কেমনে হইব সুখী স্বজন বধিয়া! ৩৬
লোভ-হত-চিত্ত এরা, যদি নাহি হেরে
কুলক্ষয় কৃতদোষ—মিত্রবধ পাপ। ৩৭
কুলক্ষয় কৃত দোষ জেনে কেন মোরা
নিবৃত্ত না হব কৃষ্ণ হেন পাপ হতে? ৩৮
কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নাশে,
ধর্ম্ম-নাশে কুল হয় অধর্ম্মে পূরিত, ৩৯
অধর্ম্মেতে কুলস্ত্রীরা ব্যভিচারি হবে—
জন্মিবে শঙ্করবর্ণ নারী দুষ্টা হলে—৪০

---

(২২) কে যুঝিবে—অর্জ্জুনের সমকক্ষ কেহ যোদ্ধা ছিল না বলিয়া এই কথায় কিছু ব্যঙ্গ বা কৌতুকের ভাব আছে। (মধু)

(২৪) হৃষিকেশ—(হৃষীক) বিষয়েন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা, ইন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক ও অন্তর্যামী। (মধু)

(২৬) পিতৃব্য—মূলে আছে পিতৃগণ, অর্থাৎ পিতৃ স্থানীয় ব্যক্তিগণ—ভুরিশ্রবা প্রভৃতি; পিতামহ —ভীষ্ম, সোমদত্ত প্রভৃতি; আচার্য্য—দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি; মাতুল—শল্য শকুনি প্রভৃতি; ভ্রাতা—দুর্য্যোধন ইত্যাদি; পুত্র—লক্ষণ ইত্যাদি। পৌত্র —লক্ষণের পুত্র ইত্যাদি। বন্ধু—অশ্বত্থমা, জয়দ্রথ প্রভৃতি; সুহৃদ—কৃতবর্ম্মা, ভগদত্ত প্রভৃতি (এবং সকল উপকারক ও মাতামহ প্রভৃতি)।

(৩০) বিপরীত লক্ষণ—যথা, বামনেত্র স্পন্দন। (গিরি) শকুনি প্রভৃতি দর্শন (স্বামী) অশ্ব ব্যতীত রথের আপনাপনি গতি ইত্যাদি।

(৩১) নাহি হেরি লাভ—যুদ্ধে মারিলে লাভ নাই, যদিও শাস্ত্র মতে মরিলে স্বর্গলাভ হয়, যথা,—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডল ভেদিনৌ।
পরিব্রাড় যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ॥"

(৩৬) আততায়ীঃ—যে অগ্নি দ্বারা গৃহদাহ করে, যে বিষপান করায়, যে বিনাশার্থ খড়্গ ধারণ করে, যে ধনাপহরণ করে, যে ভূমি অপহরণ করে, ও পরস্ত্রী হরণ করে "সেই আততায়ী।" এই সকল উপায়েই দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের বিনাশ চেষ্টা করিয়াছিল। আর্য্য শাস্ত্র মত আততায়ী বধে পাপ না থাকিলেও ধর্ম্ম শাস্ত্র মতে আছে। (মধু) অথবা আততায়ী বধে পাপ না থাকিলেও স্বজন বধ বা গুরুজন বধ জন্য পাপ আছে। (গিরি)

(৩৯) সনাতন—পরম্পরা প্রাপ্ত। কুল—অবশিষ্ট কুল।

(৪০) জন্মিবে শঙ্কর—পুরুষেরা যুদ্ধে হত হইলে স্ত্রীলোকে কুল ধর্ম্ম পালনে অক্ষম বলিয়া তাহা

সঙ্কর নরকহেতু—কুলঘ্নের কুলে
পতিত তাদের পিতা—জল পিণ্ড লোপে। ৪১
এই সঙ্করের সৃষ্টি দোষে কুলঘ্নের
চিরজাতি-কুল-ধর্ম্ম হইবে উচ্ছেদ ;
শুনিয়াছি জনার্দ্দন কুলধর্ম্ম নাশে,
নরগণ করে বাম নরকে নিয়ত। ৪৩
হায় মোরা হেন মহা পাপে সমুদ্যত,
রাজ্যসুখ লোভে ব্যস্ত বধিতে স্বজন! ৪৪
অস্ত্রহীন নিরুদ্যম মোরে বধে যদি
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রণে সেও ভাল মম।" ৪৫

সঞ্জয়—

এত বলি ধনুঃশর ত্যজি রণস্থলে,
বসে পার্থ রথক্রোড়ে শোক-মুগ্ধমনে। ৪৬

লোপ হইবে। এবং স্ত্রীলোকে বাধ্য হইয়া অসবর্ণ বিবাহ করিবে অথবা ব্যভিচারী হইবে ও সে কারণ বর্ণ সঙ্কর জন্মিবে।

(৪১) জলপিণ্ড লোপ—পুত্রগণ যুদ্ধে হত হইয়াছে বলিয়া।

(৪২) কুল ধর্ম্ম—আশ্রম ধর্ম্ম চিরন্তণ অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াকলাপ। জাতি ধর্ম্ম—বর্ণধর্ম্ম।

অভ্রান্ত গুরু কে?

পৃথিবী প্রকৃত তত্ত্ব গ্রহণ করিতে উদাসীন কেন? ইহার মূল অন্বেষণ করিলে ইহাই দেখা যায়, মানব-প্রকৃতি স্বভাবতই কল্পনা-প্রসূত অলৌকিক ঘটনার অধীন, জড়বিজ্ঞানের শক্তিকেই মহাশক্তির ব্যাপার সিদ্ধান্ত করিয়া পরিতৃপ্ত হয়; সুতরাং সত্যানুসন্ধানে পরাঙ্মুখ হইবে, আশ্চর্য্য কি? সাধু ও সাধকগণ যতই কেন উচ্চতম প্রদেশে অবস্থিতি করুন না, যদি জাত্যাভিমান, স্বার্থ, ও সম্মানকে পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তবে অবশ্যই বলিতে পারি, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অনুদার ভেদ-ভাবকে প্রশ্রয় দেন। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন এবং বিবিধ পুরাণ-প্রমাণে গুরু ভার দ্বারা মানব শক্তিকেই ঐশীশক্তি প্রদর্শিত করা হইয়াছে। ইহাতেই জানা যাইতেছে, বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান, স্বাভাবিক জীবন-বেদ, মধুর ভ্রাতৃত্ব তত্ত্বকে বিনাশ করিয়াছে। সংসার পরপিণ্ড-প্রত্যাশী হইয়া স্বয়ং শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

এস্থলে স্পষ্টই বলিতে পারি, গুরুবাদই ভেদের বীজ পুরুষ। ইহা হইতেই জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, মতভেদাদির সৃষ্টি হইয়াছে। কেন না, (গুরু-শিষ্য) শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভাবের আতিশয্য বশতঃ স্বার্থপরতা দ্বেষ হিংসাদির আক্রমণে উদার সরলতত্ত্ব পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছে। জটা, তুলসী, রুদ্রাক্ষধারী মানব-গুরু, ব্যাঘ্র ধর্ম্মের আসনে বসিয়া, শূদ্র শিষ্যের হস্তে একবিন্দু জল কিরূপে গ্রহণ করিবেন? একাসনেই বা কিরূপে বসিবেন? ভেদের কারণ দেখাইতে বাধ্য হইয়া, এই কথাটি বলিতে হইল। যাহা হউক, এক্ষণে যে বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

আহা! এক বিন্দু শুক্র-শোণিত হইতে অস্থি মেদময় দেহভাবে ভূমিষ্ঠ হইলে মাতৃস্তন্য ধরিয়া দুগ্ধপান করিবার জ্ঞান পাইয়াছি, উঠিতে, চলিতে, বসিতে শিখিয়াছি, ওঁমা শব্দে প্রথমেই আপনা হইতে কথা বলিয়াছি ইত্যাদি। ইহার উপদেষ্টা কে? কাহার শক্তি হইতে শিশুর ভিতরে যুবা, যুবার

ভিতরে বৃক্ষ, বৃক্ষের ভিতরে স্থবীর এবং ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া বৃহৎ হয়? ইহা কি কোন মানুষে গড়াইয়া দেয়? যদি বলেন —না। তবে ইহার কর্ত্তা কে? একমাত্র ব্রহ্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। আমার প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন। শরীরস্থ যন্ত্র সকলের কার্য্য সুশৃঙ্খলা মত চালাইয়া দিতেছেন। রক্তস্থলি হইতে প্রত্যেক শিরায় রক্ত সঞ্চালন দ্বারা জীবিত রাখিয়াছেন। দর্শন, শ্রবণ, আহার, নিদ্রা প্রভৃতির জ্ঞান এবং দুর্গন্ধ সুগন্ধ অনুভব শক্তি স্বাভাবিক ভাবেই পাইয়াছি। সেই জীবন্ত গুরু জীবনের সমস্ত কার্য্য করিতে পারেন, ঐ পরিত্রাণের পথটাই কেবল দেখাইতে পারেন না? তিনি কি এখন বার্দ্ধক্যের যাতনায় অক্ষম যে, এক একটি মানুষের প্রতি উদ্ধারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন!

অপূর্ণ মানব শক্তির প্রতি নির্ভর করিলে জীবের মুক্তি হয়, ইহা কি ভ্রান্তির কথা নহে? মানব ব্রহ্মে ডুবিলেও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। পল্বল যেমন সমুদ্রের তরঙ্গে মগ্ন হইয়াও ক্ষুদ্রাবস্থাতেই অবস্থিতি করে, সেইরূপ, মানব শক্তিও মহাশক্তির নিকট বিন্দু তুল্য সীমাবদ্ধ। কাজেই, অন্যকে পরিত্রাণের পথ দেখাইতে পারে না। হয়ত অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি সাধুভক্ত এবং জাহাজের খালাসী মুটে মজুর সকলইত মনুষ্য। তবে এই উভয়বিধ ভাবে মানব শক্তি বিভিন্ন দেখিতে পাই কেন? ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, ঈশ্বর জগতের পরিত্রাণের জন্য ব্যক্তি বিশেষে ঐশী শক্তি প্রদান করেন। এই প্রশ্নের কথা চিন্তা করিলে ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব দোষ ঘটে। কেন না, তিনি দয়াময়। পাপীই হউক বা সাধুই হউক, সমভাবেই মানব যন্ত্রোপযুক্ত সকল শক্তি দিয়াছেন। মনুষ্য স্বাধীন শক্তি প্রভাবে উন্নতি অবনতির অবস্থায় অবস্থিতি করে। যেমন দুইটি লাণ্টন মধ্যে একটি স্বচ্ছ বা পরিষ্কৃত, তাহার ভিতর দিয়া আলো উজ্জ্বল রূপে ফুটিয়া উঠিতেছে; অপরটি ধূলাদি আবর্জ্জনায় প্রচ্ছন্ন, ভিতরে আলো সমান জ্বলিতেছে, কিন্তু তাহার জ্যোতিঃ আদবেই দেখা যায় না। দোষ কি আলোকের, না পাত্রের? সেইরূপ, নিশ্চেষ্ট-মানব পরপিণ্ডপোষিত হয়, স্বয়ং শক্তি প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না; সুতরাং দুরবস্থায় অবস্থিতি করে, মানব শক্তি ধরিয়া কৃতার্থ হইতে থাকে। এস্থলে বিজ্ঞানেরও একটি আপত্তি আছে। আপত্তিটি এই, পিতা মাতার শরীরের এবং মনোবৃত্তির অবস্থাভেদে সাধু অসাধু, জ্ঞানী মূর্খ ইত্যাদি ভাব সন্তানেও সংঘটিত হয়। কিন্তু মনুষ্যের তাহাতেও নিজের শক্তি প্রয়োজন হয়। প্রাণগত অধ্যবসায় এবং সাধন দ্বারা অসাধু—সাধু, মূর্খ—তর্কচূড়ামণি হইতে পারে। বর্ষা-তরঙ্গিণীর কলুষিত জল কি নির্ম্মল হয় না?

বাস্তবিক ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, সকল প্রকার মানবাত্মার ভিতরেই জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু স্থিতি করিতেছেন। অনন্ত মহাশূন্যে পিতা পুত্র ভিন্ন আর কিছুই নাই। কীটাদি পর্য্যন্ত সকলেই ভ্রাতৃ সম্বন্ধে আবদ্ধ। মানব কোন্ প্রাণ ধরিয়া গুরু বা আচার্য্য হইতে ইচ্ছা করেন, সমাসনে বসিতে ক্লেশ বোধ করিয়া গুরু-সম্মানিত স্বতন্ত্র আসন গ্রহণে সুখী হন? ইহাতে যে উদার প্রেম কলঙ্কিত হয়, দেখিতে পান না। এই ভেদজনিত পাপের প্রভাবেই ত প্রকৃত সত্য প্রকাশ

পাইতেছে না। বিন্দুমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান বোধ থাকিতে উদার প্রেমে জগৎকে কেহ আলিঙ্গন করিতে পারিবেন না। শ্বপচাদির অন্ন গ্রহণ করিলেই যে উদার প্রেম স্থাপিত হইল, তাহা নহে। অপ্রভেদ জীবভক্তি, সর্ব্বগত অবিচ্ছিন্ন প্রেম ও অকৃত্রিম দীনতার সাধন না হইলে ব্রহ্ম দর্শন হইবে না।

হে মানব ভাই! তুমি গুরু হইয়া কিরূপে ব্রহ্মকে দর্শন করিবে? অধ্যাত্মযোগে (ইন্দ্রজালের ন্যায়) কল্পিত কৃষ্ণ-চৈতন্যের মূর্ত্তি দেখিয়া এবং আত্মার পরিমিত শক্তি সঞ্চালন করিয়া কি হইবে? উহা যে ব্রহ্মের পরীক্ষা। সাধক বাহ্যিক খণ্ড মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলে, অনন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবিতে পারে না, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। মানবগুরুর বিজ্ঞানতত্ত্ব ধরিয়া কোথায় যাইব? পরিমিত জলবিম্ব কোটি কোটি বিম্বতে মিশিলেও ক্ষুদ্র; পরস্পর শক্তি একত্র হইলেও অপূর্ণ। তবে বলিতে পারেন, মানব হৃদয় হইতে যে সকল ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ হয়, তাহা কি ঈশ্বরের উপদেশ নয়? এ কথা অবশ্যই স্বীকার করি। ব্রহ্ম অসঙ্খ্য-জগৎ এবং জীবশক্তিকে ভেদ করিয়া নিত্য ভাবেই রহিয়াছেন। পশু পক্ষী মানব সকলেই উপদেশ দিতেছে। একটি পত্রের নিকটেও শিক্ষা পাইতেছি। চৈতন্য, ব্যাধকেও গুরু বলিয়াছেন।

ধীর গম্ভীরভাবে দেখিলে সকলেই ত গুরু। যখন অখণ্ড চৈতন্যময় ব্রহ্ম সমস্ত জীবে বর্ত্তমান আছেন, তখন ঐ বিদ্যারত্ন মহাশয় গুরু, বোসজা বা সাজী মহাশয় গুরু হইতে পারেন না, নিতান্ত ভ্রমের কথা। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মানুষ নিজেই আপনার শক্তিকে দুর্ব্বল করে। তাই বলিয়া কি মানব খণ্ডভাবে গুরু হইতে পারে? মানবাধারে ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ দেখিয়া কি মধুর ভ্রাতৃত্বতত্ত্ব হারাইব? ভ্রাতৃভাবে উপদেশ গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? পৃথিবী বুঝিতেছে না যে, অবতারবাদ, প্রেরিতবাদ, গুরুবাদ, এই সকল প্রভেদ ভাবের সংস্পর্শে নিষ্কলঙ্ক উদার প্রেম কলঙ্কিত হইতেছে। জীবসকল ভেদ-ব্যাদের করাল গ্রাসে ভীষণ যন্ত্রণায় অভিভূত। জ্ঞানে ভেদ, প্রেমে ভেদ, ভক্তিতে ভেদ, যোগসাধনে ভেদ, আহার, বিহার সমস্ত কার্য্যে ভেদ, নির্ভিকান্তঃকরণে বলিতে পারি, উদার ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেও এই রোগ দেখা দিয়াছে। কেহ বা সাধুভক্তির তরঙ্গে ভাসিতেছেন, কেহ বা গুরুভক্তির আবর্ত্তে ঘুরিতেছেন। ভাবেন না যে, অপ্রভেদ জীবভক্তির অভাবে ব্যক্তিগত সাধু ও গুরুভক্তি, উভয়ই ভুজঙ্গ স্বরূপ; সময় পাইলে দংশন করিবে।

এখন দেখা যাক্, এই ঘোরতর যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি। দেখিতেছি, এক মাত্র ভ্রাতৃভাব ব্যতীত কোন প্রকার পার্থক্য ভাবে প্রেমের মিলন হইবে না। গুরুশিষ্য, সাধু অসাধু, রাজা প্রজা, এক প্রেমের শৃঙ্খলে বদ্ধ না হইলে উপায় নাই। একথা শুনিবামাত্র অনেকেই চটিয়া বলিবেন, কি, ব্যক্তিবিশেষে গুরু বা সাধুভক্তি উড়িয়া যাইবে? কলিকাতার ব্যারিষ্টার আর মফঃসলের ফড়ে মোক্তার সমান হইল? ভাই! চটিবেন না, ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখুন, পিতার পিতৃত্বসম্বন্ধে সকলেরই পুত্র ভাবে সমান অধিকার আছে। সাধুকে সাধু-ভ্রাতা বলিতে দোষ কি? অসাধুকে ভাই বলিয়া কি ভক্তি করিতে হইবে না? তাহা হইলেত ব্রাহ্মধর্ম্ম টিকে না। আমার

মত পাপীকে ভ্রাতৃ সম্বোধনে মুখ চুম্বন করিলে প্রেম কি থাকিবে না? আহা! ব্রহ্মস্বরূপে সংসারের পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি সকলই ত পুত্র ভাবে রহিয়াছেন। সুতরাং নিত্য সম্বন্ধে ভ্রাতৃত্ব মধুর তত্বের মিলন ভিন্ন আর কি আছে? নিরাকারে পিতা পুত্রের লীলা নিত্যকাল একই ভাবে হইতেছে। * এই জন্যই, পরস্পর ভ্রাতৃভাবের মিলনে আপত্তি করিতে পারেন না। দুঃখের কথা বলিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হয়। আবার সাধক শ্রেণীর মধ্যেও ভ্রাতৃভাবের বিচ্ছিন্নতা দেখিতেছি। উপাসনার সময় ভাবের উচ্ছ্বাসে এবং প্রেম ভক্তির তরঙ্গে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল; পরক্ষণে সংসারের বাতাসে শিশির কর্পূর কোথায় উড়িয়া যায়, গন্ধও থাকে না। একটি ভ্রাতার একটুক অসুস্থ অবস্থা দেখিয়াই সরিয়া পড়েন। ভাইটির এক দিনের জন্য থাকিবার স্থান ও এক মুষ্টি অন্ন দুর্ল্লভ। এইরূপ অনেক উপাসকের প্রাণের অবস্থা দেখিলে, মিলনের আশা অতি অসম্ভব। বাস্তবিক, প্রকৃত দীনতার অভাবে, মতের অনৈক্যতা প্রযুক্ত, তর্ক বিতর্ক ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। গুরুবাদ পৃথিবীকে আক্রমণ করিবে, সন্দেহ কি?

অনেকে বাহিরের ভাবে বদ্ধ থাকিয়া প্রকৃত সত্যকে ঢাকিতেছেন। হায়! জীবনের মধ্যে মহাগুরু, যিনি প্রতি মুহূর্ত্তকাল উপদেশ দিতেছেন—তাঁহার অব্যর্থ আদেশ উপেক্ষা করিয়া মানুষ অপূর্ণ মানবের উপদেশেই পরিতৃপ্ত। বিবেকের মঙ্গল সম্বাদ বুঝিতে না পারিয়া, অসার ক্রিয়া পদ্ধতির অনুষ্ঠানে সতত ব্যাপৃত। প্রাণায়াম দ্বারা আত্মাকে সীমাবদ্ধ বায়ুকোষে রাখিলে কি ব্রহ্ম কৃপার প্রতি অবিশ্বাস করা হয় না? যদি প্রক্রিয়ার বশীভূত হইয়া "ব্রহ্ম কৃপাহিকেবলম্," এই মহাতত্ত্বকে বিশ্বাস না করি, নিশ্চয়ই আমি প্রভুর নিকট অবিশ্বাসী। স্বাভাবিক ব্রহ্ম কৃপার প্রতি নির্ভর করিলে যে সহজেই জীবন্মুক্তি হয়, ইহার অন্যথা কে করিবে? আত্মা যতই ব্রহ্মে মজিবে, ততই শ্বাস প্রশ্বাস কমিয়া যাইবে। পরিমিত বায়ুকোষ-বদ্ধ জীবের যন্ত্রণা হইতে কি ইহা সহজ নহে? আত্মা মহাকাশ অতিক্রম করিয়া চিন্ময় ব্রহ্মসাগরে বিরাজ করে, একথা কি মিথ্যা? তবে বলুন, গুরু কে? একমাত্র অখণ্ড পুরুষ ভিন্ন গুরু আর কাহাকে স্বীকার করিবেন? মানব শক্তি কিছুতেই ব্রহ্ম শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারে না। যেমন নদী সকল পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, কিন্তু সমুদ্রকে কখনই পর্ব্বতে আনিতে পারে না, সেইরূপ, মানবাত্মা ব্রহ্মে ডুবিয়াও অন্যকে ব্রহ্মদর্শন করাইতে সক্ষম হয় না।

ব্রহ্ম কৃপাই পরিত্রাণের একমাত্র সহায়। জগতের সমস্ত মানব একত্র হইয়া শিক্ষা বা উপদেশ দিলেও তাহা বন্ধ্যার স্তনের ন্যায় বিফল। এস্থলে অবশ্যই কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে সাধু বা সৎসঙ্গের প্রয়োজন কি? মনে করুন, একটী চতুষ্কোণ কাচপাত্রের অভ্যন্তরে একটী দীপ জ্বলিতেছে। কিন্তু দর্শকগণ উহার চারিদিকে চারিটি ঐরূপ আলো দেখিতেছেন সত্য কথা। ফলতঃ ঐ পাত্রের গায় হাত দিলে ধরা যায় না কেন? আবার ক্ষীপ্র হস্তেই বা হউক, প্রকৃত দীপকলিকাকে স্পর্শ করিলে চারিটিকেই স্পর্শ করা যায়। তবে প্রকৃত গুরুকে ছাড়িয়া

* খ্রীষ্ট এই স্বর্গীয় গূঢ়তত্ব বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই ভ্রাতৃভক্তিতে সঙ্গীগণের চরণ ধৌত করিতেন।

অপ্রকৃত মানবকে অভ্রান্ত গুরু বলিবার প্রয়োজন কি? উচ্চ নীচ সকলের নিকট ভ্রাতৃভাবে সৎসঙ্গ করিতে কোন বাধা নাই। ভ্রাতৃ সহবাসে ঈশ্বরের তত্ত্ব গ্রহণ করিলেই যে গুরুভক্তি প্রকাশ পাইল, তাহা নহে। জীবশক্তি যতই উজ্জ্বল হউক না কেন, মহাশক্তি অনন্ত জ্যোতির নিকট পরাভূত। এই জন্য বলিতেছি, মনুষ্য গুরু শব্দের বাচ্যই হইতে পারে না। ব্রহ্মই অভ্রান্ত গুরু। জীব মাত্রই তাঁহার শিষ্য। শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা ভাবিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "এই হিন্দুয়ানীর পুনরুত্থান ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অনেক কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে।" গবর্ণমেণ্টের ভাবনা গবর্ণমেণ্ট ভাবুন, হিন্দু সাধারণেরও এক ভাবনা আছে। এই প্রবন্ধে আমরা তাহারই উল্লেখ করিব।

পুনরুত্থিত হইতেছে কি হিন্দুধর্ম্ম, না ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম? ইহার উত্তরের পূর্ব্বে, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভেদ বুঝিতে হয়। যে সকল হিন্দু বেদধ্বনিতে পঞ্চনদ-তীর নিনাদিত করিয়া ভারত বিজয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি ব্রাহ্মণ? সেই সময়ের সাহিত্য অর্থাৎ বেদমন্ত্র সাক্ষ্য দেয়, তাঁহারা বর্ণভেদহীন এক মহা তেজস্বী আর্য্যজাতি। তাঁহারা দেবদেবীর অর্চ্চনায় যজ্ঞ করিতেন, পিতৃমাতৃ কার্য্য করিতেন; কিন্তু যাঁর কার্য্য তিনি করিতেন। ইহাঁরা যদি হিন্দু, তবে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য হিন্দুধর্ম্ম নহে—হিন্দুধর্ম্মের বিকার। বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম পুনর্ব্বার উপনিষৎ, দর্শন ও বৌদ্ধ সাহিত্যের দ্বারা নবীভূত হয়, এবং সেই সময় আর্য্যানার্য্য-মিশ্রিত জাতি সাধারণের প্রীতির উপর দেশের জাতীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করে। এই জাতীয়ধর্ম্ম, যাহাকে আমরা হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া বুঝি, ইহাও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যকে প্রশ্রয় দেয় না।

ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ব্রাহ্মণসাহিত্যের প্রাদুর্ভাবে অঙ্কুরিত। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ রূপ আত্মকলহ ইহার প্রথম ফল। বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধানের সহিত ইহার পুনরুত্থান এবং এই পুনরুত্থানের চরম ও স্থায়ী ফল, হিন্দুর জাতীয় জীবনের পর্য্যবসান। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অর্থাৎ জাতিভেদ-মূলক-ধর্ম্ম অনৈক্যের উপর সংস্থাপিত, সুতরাং ফল, হয় ভয়ানক আত্মকলহ যথা কুরুপাঞ্চাল সমর, নয় রাজনৈতিক মৃত্যু, যথা ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা।

পুনরুত্থিত হইতেছে কি এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম? যদি তাহা হয়, তবে গবর্ণমেণ্টের যেমন ভাবিবার কথা, সকল হিন্দুরই সেইরূপ ভাবিবার কথা।

আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যই পুনরুত্থিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও ভূদেবের জীবনের মর্ম্মভেদ করিলে এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের ক্রমবিকাশের লক্ষণ পাওয়া যায়। বিধবা বিবাহের আন্দোলন ও বহুবিবাহ-নিবারণ-যত্ন কেবল ব্রাহ্মণ বংশ বৃদ্ধির জন্যই সূচিত হইয়াছিল। সর্ব্ব

সাধারণ হিন্দু জাতির ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক গণ্ডূষ চিন্তারও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র কেবল ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপনের যত্ন মাত্র। ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধ ও টোলের নিমিত্ত দান ব্রাহ্মণ্যের জন্য অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট যত্ন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র সকলের সম্পাদকতার অন্তস্তলে দৃষ্টি করিলে ব্রাহ্মণের হাতই প্রবল দেখা যাইতেছে। যোগেন্দ্রনাথ বসুর অর্থবল ও চন্দ্রনাথ বসুর জ্ঞানবল ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের জন্য ব্যয়িত দেখিয়া কে এই যাদুকর ধর্ম্মের অঙ্কুরোদ্গম সম্বন্ধে সন্দিহান থাকিতে পারে ?

আমরা সর্ব্ব সাধারণ হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি আমাদের মঙ্গলের জন্য হইতেছে ? যে জাতি আপনা হইতে ধর্ম্ম-স্বাধীনতা পরপদে অর্পণ করে, তাহার কি কর্ম্ম-স্বাধীনতা কখন ঘটে ? মনে বল সঞ্চিত না হইলে, কি হাতে বল আসে ?

শঙ্করাচার্য্যের উত্থানের পর যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল—মহাভারত পুরাণ কৃত্রিমতা প্রাপ্ত হইয়া যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছিল, তাহাতে হিন্দুর জাতীয় জীবন কয়দিন স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিল ? হিন্দু জাতি আবার কেন সেই ভুলের পথে অগ্রসর হয় ? ইহাই আমাদের প্রশ্ন। প্রশ্ন—যাহারা হিন্দু জাতির মঙ্গল কামনা করে, তাহাদের প্রতি ; যাহারা কেবল ছলে বলে কলে কৌশলে বা অর্থলোভে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য প্রচার করে, তাহাদের প্রতি নহে।

বর্ণ-ভেদ-প্রধান-ধর্ম্ম অভিমানমূলক এবং অভিমান নিশ্চয়ই পতনের কারণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যাঁহারা ষড়্-রিপু দমনই হিন্দুধর্ম্মের মূল প্রকৃতি মনে করেন, তাঁহারাই, রিপুর মধ্যে প্রধান রিপু অহঙ্কার-ভিত্তিতে—হিন্দুধর্ম্ম স্থাপন করিতে চাহেন ! আমি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; আমি কায়স্থ, বৈশ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; বা আমি বৈশ্য, কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; আমি শৌণ্ডিক, নবশূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; আমি নবশূদ্র, চর্ম্মকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; ইত্যাদি প্রকারের অভিমানের বণ্টনে জাতিভেদের উৎপত্তি। ইহার সহিত অনৈক্য নিত্য বর্ত্তমান। এই বর্ণ-ভেদ লইয়া হিন্দুধর্ম্ম যদি পুনরুত্থিত হয়, তবে হিন্দুর দুর্ভাগ্যের আর শেষ থাকিবে না।

এ ত গেল হিন্দুর ঘরের কথা। বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের গ্রীবাভঙ্গি আরও চিন্তার বিষয়। কেননা, উহা অশান্তির কথা। এই অশান্তির লক্ষণ এক্ষণ আর অস্পষ্ট নাই। গো-বিভ্রাট ব্যাপারে মুসলমান ও গবর্ণমেণ্ট ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গ্রীবা-ভঙ্গি দমনার্থে যে মুদ্গরাঘাত করিতেছেন, তাহা, বোধ হয়, কাহার অবিদিত নাই ; কিন্তু ইহাতে যে সকল হিন্দুর রক্তপাত হইতেছে, বা কারাবাস হইতেছে, তাহারা কি ব্রাহ্মণ, না নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর হিন্দু ? বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, তাহারা ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, সর্ব্বসাধারণ হিন্দুকে, মুসলমান ও দেশীয় খ্রীষ্টানের বিরুদ্ধে সুতরাং ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া মহানিষ্টের সূত্র তুলিয়াছেন। মধ্য ও নিম্ন-শ্রেণী হিন্দুর ইহা ভাবিবার কথা, সন্দেহ নাই।

তাহাদের বিশেষ ভাবনার বিষয় এই হওয়া উচিত যে, ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণ্যের জন্য চেষ্টা করে, হিন্দু কেন হিন্দুত্বের জন্য চেষ্টা করিবে না। বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব সত্যধর্ম্ম। সকল ধর্ম্মের

সহিত অবিরোধই বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব। কোরাণ পাঠ, পুরাণ পাঠ বিশুদ্ধ হিন্দুর নিকট তুল্য, কেননা সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক—ঈশ্বরে ভক্তি ও মানবে প্রীতি। তাহা কোরাণে ও পুরাণে উভয়েই আছে। সকল মনুষ্য সমান, ইহাও বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব। ধর্ম্মকর্ম্মে সকলেরই সমাধিকার, ইহাও বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব। ব্রাহ্মণ, যেমন বর্ণপ্রাধান্য রক্ষার জন্য জাগরুক হইয়াছে, হিন্দুর সেইরূপ হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য জাগরুক হওয়া উচিত।

হিন্দুধর্ম্মকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে হইলে নিম্ন লিখিত পন্থা অবলম্বনীয়।

(১) বেদের মন্ত্রভাগের সমাদর।

(২) পুরাণের প্রতি সাধারণতঃ অশ্রদ্ধা।

(৩) কোরাণের যে যে অংশ উপনিষদের মর্ম্মের সহিত সমপ্রকৃতিক, দেব ও পৈতৃক কার্য্যে তাহার পাঠ বা তাহার অনুবাদ।

(৪) সর্ব্ব জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সজল ব্যবহার।

(৫) দেব ও পিতামাতার কার্য্যে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার। বঙ্গদেশে চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ বা বৃষোৎসর্গের মন্ত্র বাঙ্গলায় পাঠ হউক, ইত্যাদি।

(৬) বর্ণ নির্ব্বিশেষে পুরোহিত নিয়োগ।

(৭) ক্রমশঃ বর্ণভেদ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া।

এ প্রস্তাব ব্রাহ্মধর্ম্মের নহে। ইহা খ্রীষ্ট বা মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রস্তাব নহে। ইহা হিন্দুত্বের ভিত্তিতে, ভারতাগত সর্ব্ব ধর্ম্মের সঙ্গে, সখ্য স্থাপনের প্রস্তাব। আচণ্ডাল সর্ব্ববর্ণের উন্নতির পথে ইহাতে কণ্টক প্রদান করিবে না। কোরাণিক ধর্ম্মের সহিত সখ্য স্থাপিত হইবে। ইংরেজরাজের শাসন, সুগম ও সুশৃঙ্খল হইবে। যদি ইহা না হইয়া, বর্ণভেদমূলক, বিষবীজ স্বরূপ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রবল হয়, তাহা হইলে, জাতিভ্রষ্ট ও জাতিযুক্ত, অর্থাৎ কোরাণিক ও পৌরাণিক সকল হিন্দুরই অমঙ্গল।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি। (১০)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জীবিতাণুর সংহার প্রকরণ।

কি পাতা, কি ফল, কি ফুল, কি জন্তুগণের মৃত শরীর, যাহা কিছু পচিয়া যায়, তাহাতেই এক বা ততোধিক প্রকার জীবিতাণু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়। জল, বায়ু, কাঁচা ফল, পাতা ও ঘাস, ইত্যাদি পদার্থের সহযোগে নানা প্রকার জীবিতাণু সর্ব্বদাই জন্তুগণের শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছে। কখন কখন জীবিতাণু সকল গাছের পাতার নিম্নভাগে যে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে, ঐ ছিদ্র মধ্যে স্থান লইয়া থাকে। জীবিতাণু সকল সর্ব্বদা বায়ু, জল প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য পদার্থে সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে বলিয়াই যে সর্ব্বদাই উদ্ভিদ্ ও জন্তুর সংক্রামক রোগ হওয়া সম্ভব, এরূপ মনে করা উচিত নহে। (১) সকল প্রকার অণু হইতেই যে ব্যাধি উৎপত্তি হয়, এরূপ নহে। (২) অণু সকল উদ্ভিদ্ ও জন্তুর শরীরের মধ্যে

প্রবেশ করিবার বড় সুবিধা পায় না। নাসিকারন্ধ্রের মধ্যে কেশ ও সর্দ্দিতে অণু সকল আট্‌কাইয়া গিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার অবসর পায় না। পত্রের নিম্নভাগে ছিদ্র সকল থাকিবার কারণ এবং ছিদ্র গুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইবার কারণ, কোন অণুই সহসা উদ্ভিদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। (৩) অণু সকল জন্তুদিগের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিক সুবিধা পাইলেও, এই গুলির নাশের জন্য জন্তুদিগের শরীরের মধ্যে কতকগুলি উপায় আছে। পাকস্থলির অম্লরস, যকৃত নিঃসৃত পিত্তরস, এবং রক্তের শ্বেত কণিকা স্বভাবতঃই অণু-নাশক। বাস্তবিক সুস্থ শরীরি জন্তুর রক্ত যেরূপ অণু-বিবর্জ্জিত, অন্য কোন স্বাভাবিক রস, এরূপ অণু-বিবর্জ্জিত আছে কি না, সন্দেহ। জগৎপাতা যে আশ্চর্য্য কৌশলে জন্তুদিগের শরীর গঠিত করিয়াছেন ও এই শরীর পোষণের জন্য যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ শোণিতের মধ্যে ব্যাধিজনক জীবিতাণু জন্মিবার অতি অল্পই সম্ভাবনা। (৪) জীবিতাণুগুলি প্রায়ই নিজ নিজ নাশের উপাদান প্রস্তুত করিয়া থাকে। অণুতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া যে এক কালে সমস্ত সংক্রামক রোগের নিরাকরণোপায় স্থির করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা নিতান্ত দুরাশা বোধ হয় না। এক প্রকার অণু দ্বারা শর্করা বিশ্লিষ্ট হইয়া মদিরা উৎপাদিত হয়। এই অণু মদিরা সংযোগে বৃদ্ধি হইতে পারে না, মদিরার সারভাগ ইস্পিরিট্‌ দ্বারা বিনষ্ট হয়। আবার আর এক প্রকার অণু সংযোগে মদিরা হইতে শির্কা প্রস্তুত হয়; শির্কার সারভাগ এসিটিক্‌ এসিড্‌ দ্বারা এই অণুর নাশ হয়। আর এক জাতীয় অণু দ্বারা ওলাউঠা জন্মে। এই অণুর নাইট্রিক্‌ এসিড্‌ উৎপাদন করা আর একটী কার্য্য। নাইট্রিক্‌ এসিড্‌ দ্বারা এই অণুর নাশ হয়। যে জাতীয় অণু যে অণু-নাশক পদার্থ উৎপাদন করে, সেই পদার্থ যে কেবল সেই জাতীয় অণুকেই নাশ করিতে সমর্থ, অন্য অণু নাশ করিতে সমর্থ নহে, এরূপ নহে। ইস্পিরিট, এসিটিক্‌ এসিড্‌ ও নাইট্রিক্‌ এসিড্‌ সকল প্রকার অণুই নাশ করিতে সমর্থ। তবে যে অণু যে অণুনাশক পদার্থ উৎপাদন করে, সেই পদার্থ সেই অণুকে যত অল্প পরিমাণ ব্যবহার দ্বারা নিবারণ বা নাশ করিবে, অন্য অণুকে তত অল্প পরিমাণ ব্যবহার দ্বারা নিবারণ বা নাশ না করিতে পারে। জীবিতাণু গুলি (Schizomycetes) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্‌। কেবল যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্‌ই আত্মনাশের উপাদান উৎপন্ন করে, এরূপ নহে। বৃহৎ জাতীয় উদ্ভিদ্‌গণও অল্প বিস্তর আপন আপন জীবনের অস্বাস্থ্যকর পদার্থ উৎপাদন করে। বৃক্ষ, গুল্ম, ওষধি প্রভৃতি বৃহজ্জাতীয় উদ্ভিদ্‌ সকলের শিকড় হইতে এক এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়। যে উদ্ভিদ্‌ হইতে ঐ রস নিঃসৃত হয়, ঐ উদ্ভিদের পক্ষে প্রায়ই ঐ রস হানিজনক। তবে ঐ রস অম্ল বলিয়া মৃত্তিকার উপাদান সকল গলিত করিয়া শিকড় মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা জন্মাইয়া দেয়। ক্লোভার নামক এক জাতীয় উদ্ভিদ্‌ যে জমিতে এক বৎসর জন্মান যায়, প্রায় পর বৎসর ঐ জমিতে পুনরায় ক্লোভার জন্মান অসম্ভব হইয়া পড়ে। ক্রমাগত একই জমিতে একই প্রকার উদ্ভিদ্‌ জন্মাইয়া ঐ জমি ক্রমশঃ ঐ উদ্ভিদ্‌ জন্মিবার পক্ষে অল্প বিস্তর অনুপ-

যুক্ত হইয়া পড়ে। জমির ক্লোভার-বিতৃষ্ণ ভাব (Clover sickness) অন্য উদ্ভিদের পক্ষে তাদৃশ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত না হইলেও, এই ভাবটী কৃষি বিজ্ঞানের একটী মূল-সূত্র বিজ্ঞাপক বলিয়া মানিতে হইবে। কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ কতকাল একই স্থানে জন্মিলে, ঐ উদ্ভিদ ঐ স্থানটীতে জন্মিবার অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে, তাহা বলা যায় না। ম্যালেরিয়া-অণু যে ভূভাগে জন্মিয়া থাকে, ক্রমশঃ ঐ ভূভাগটী ঐ অণু জন্মিবার পক্ষে নিশ্চয়ই অনুপযুক্ত হইয়া পড়িবে। মুরশিদাবাদ, বর্দ্ধমান, প্রভৃতি যে সকল ভূভাগ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঘোর ম্যালেরিয়ার আবাস স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত, এক্ষণে যে ঐ সকল ভূভাগে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ্রাস হইয়া আসিতেছে, এবং ভবিষ্যতে যে ঐ সকল ভূভাগে ম্যালেরিয়া দেবীর একবারে অরুচিকর হইয়া পড়িবে, তাহা এক প্রকার স্থির। 'এক প্রকার' শব্দ ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য এই, স্বভাবের গতি অতি জটিল ও বিচিত্র। বিল, ডোবা প্রভৃতি স্থানে ম্যালেরিয়ার অণু ক্রমাগত জন্মিয়া, ঐ বিল, ডোবা প্রভৃতি আধারে ঐ বিশেষ অণুনাশক একপ্রকার পদার্থ জন্মিয়া, ঐ গুলি ঐ অণু জন্মিবার পক্ষে ক্রমশঃই অনুপযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু প্রতি বৎসরে যদি বন্যায় ঐ অণু ও অণুনাশক পদার্থ উভয়ই ধৌত করিয়া লইয়া যায়, তবে অবস্থাগুলির সমগ্র সমষ্টি কি হইয়া দাঁড়ায়, কে বলিতে পারে? (৫) রৌদ্র, বায়ুর অম্লজান ও ওজোন্, সুগন্ধ পুষ্প, এই সমস্তও অনুনাশক বা অনুরোধক।

ব্যাধিজনক অণু জন্মিবার ও ক্রমশঃ বংশ পরম্পরায় বৃদ্ধি হইয়া যাইবার পক্ষে নানাপ্রকার নৈসর্গিক অন্তরায় থাকাতেও, মনুষ্য ও ইতর জন্তু এবং উদ্ভিদের মধ্যে প্রায়ই সংক্রামক রোগ জন্মিবার কথা শুনা যায়। এ কারণ সংক্রামক রোগ জন্তু বা উদ্ভিদের মধ্যে দেখা দিলেই কতকগুলি সাধারণ প্রতিকার পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। (ক) সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে জঙ্গল কাটা, পুষ্করিণী ঝালা, নর্দ্দমা পরিষ্কার আরম্ভ করা, অথবা অন্য কোন পূতিগন্ধ বিশিষ্ট পচা দ্রব্য আলোড়িত করা, উচিত নহে। এ সকল বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতে হয়। কিন্তু রোগ উপস্থিত হইলে এইরূপ আলোড়ন দ্বারা রোগের বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হওয়ার সম্ভব নাই। ফল, পাতা, জল, ময়লাদ্রব্য, ইত্যাদি যাহাতে পচিবার না অবসর পায়, এ বিষয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে এইটী বুঝিতে হইবে, পচন প্রক্রিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে জল ও বায়ুর সহিত পচনাণু মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে এবং অপরিষ্কার দ্রব্য সমুদায়ের আলোড়ন দ্বারা ঐ বিশেষ অণু আরও অধিক পরিমাণে জল ও বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া পীড়ার বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে।

(খ) গোষ্ঠের যদি একটী গাভির গুটি, গলাফুলা বা অন্য কোনরূপ সংক্রামক রোগ উপস্থিত হয়, তবে যেন ঐ গাভিটী অন্যত্রে লইয়া যাওয়া না হয়। ঐটীকে ঐ স্থানেই রাখিয়া সুস্থ গাভিগুলিকে স্থানান্তরিত করিতে হয়। গো-মড়ক উপস্থিত হইলে এইরূপ স্থানান্তর করণের হুকুম কখন কখন গবর্ণমেণ্ট হইতে বাহির হয়। প্রায়ই দেখা যায়, কৃষক ও গোয়ালাগণ অজ্ঞানতাবশতঃ পীড়িত গোরুগুলিকেই স্থানান্তরে লইয়া যায়। ইহা দ্বারা এই ফল হয়, যে পীড়িত গোরুটী যে

গোষ্ঠে ছিল, ঐ গোষ্ঠে সুস্থ গোরুগুলি থাকিয়া ক্রমশঃ তাহাদিগেরও পীড়া হয়, এবং পীড়িত গোরুটী স্থানান্তরিত করিবার কারণ অন্যান্য স্থানে পীড়াদায়ক অণুগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া অন্যত্রেও মড়ক উপস্থিত হয়।

(গ) স্থানান্তরিত করিবার সময় সুস্থ জন্তু গুলির সমুদায় গাত্র তুঁতিয়ার জল দ্বারা ধৌত করিয়া ও তাহাদিগকে হিরাকষ খাওয়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

(ঘ) আলু, গোধুম বা অন্য কোন ওষধির সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইবার পরে, যে ফসল হইবে, তাহা অন্যত্র স্থানান্তরিত না করিয়া, যে ক্ষেত্রে ঐ সকল জন্মিয়াছে, ঐ ক্ষেত্রেই রাখিবার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। যদি ব্যাধিগ্রস্ত শস্য অন্যত্রে স্থানান্তরিত করিবার নিতান্ত আবশ্যক হয়, ঐ শস্য তুঁতিয়ার জলে ডুবাইয়া ও তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া স্থানান্তরে গিয়া শুকাইয়া লইয়া পরে ঐ শস্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

(ঙ) যে কোন বীজ হউক না কেন, উহা অণুনাশক কোন পদার্থে ডুবাইয়া লইয়া, পরে উহাকে বপন করা উচিত। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ কর্পূরের জলে ভিজাইয়া বপন করিলেও চলিতে পারে। সাধারণ কৃষিকার্য্যের উপযোগী বীজ সকল (ধান্য, গম, গহমা, আলু ইত্যাদি) তুঁতিয়ার জলে ডুবাইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে চুণ ও ভস্ম দ্বারা শুকাইয়া লইয়া বপন করিলে, ধসা লাগিয়া গাছ নষ্ট হইবার সম্ভব থাকে না।

(চ) উদ্ভিদ্ ও জন্তু উভয় প্রকার জীবই সবল হইয়া জন্মিতে থাকিলে, ব্যাধিজনক অণুদ্বারা উহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। উদ্ভিদের পক্ষে জল ও সার এবং জন্তুর পক্ষে খৈল, কলাই, ছোলা, গমের ভূসি, লবণ, মেথি, ইত্যাদি তেজস্কর ও মুখরোচক খাদ্য, জীবিতাণু সকল শরীর মধ্যে জন্মিবার পক্ষে প্রতিবন্ধক।

(ছ) জন্তুদিগের মধ্যে কোন প্রকার সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে, সুস্থ জন্তু গুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া শুদ্ধ উহাদের তেজস্কর খাদ্য খাইতে দিয়া নিরস্ত থাকা উচিত নহে। উহাদের অণুনাশক কোন না কোন পদার্থ কয়েক দিবস ধরিয়া প্রত্যহ খাইতে দেওয়া উচিত। যত দিবস কোন মারিভয় প্রবল থাকিবে, তত দিবস পর্য্যন্ত সুস্থ ও অসুস্থ সকল জন্তুকেই এইরূপ কোন পদার্থ প্রত্যহ খাওয়ান উচিত। কুইনাইন্, তুঁতিয়া, হিরাকষ, চুণ, রসকর্পূর, কর্পূর, খাঁটি রাইয়ের তৈল, সোহাগা, শেঁকোবিষ, পুদিনা, লেবুর রস, ঘোল, গোলমরিচ ও শির্কা, এই কয়েকটী অণুনাশক পদার্থ প্রায় সর্ব্বত্রেই পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে যেটী বা যে গুলি ব্যবহার করা সুবিধা মনে হইবে, সেইটী বা সেই গুলিই ব্যবহার করা উচিত। ইহাদের মধ্যে রসকর্পূর, শেঁকোবিষ, ও কুইনাইন কিছু অধিক বিষাক্ত বলিয়া অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার করা অথবা একেবারে ব্যবহার না করা বিধেয়। খাঁটি রাইয়ের তৈল যেরূপ উৎকৃষ্ট অণুনাশক পদার্থ, সাধারণ ব্যবহারোপযোগী এরূপ উৎকৃষ্ট অণুনাশক পদার্থ আর নাই। ২০০০ ভাগ অন্য পদার্থে এক ভাগ মাত্র রাইয়ের তৈল (Mustard oil) মিশ্রিত থাকিলে উহাতে প্রায় কোন প্রকার অণুই জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। খাঁটি রাই-সর্ষের তৈল গাত্রে মর্দ্দন করা ও উহা দ্বারা ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া খাওয়া ও ভাতের সহিত প্রত্যহ লেবু ও দধি বা ঘোল খাওয়া যে কত উৎকৃষ্ট প্রথা,

তাহা বলা যায় না। গোয়ালারাও খাঁটি রাইয়ের তৈল, ঘোল ও মরিচ, গোরুর অনেক গুলি গূঢ় ব্যাধিতে ব্যবহার করিয়া উপকার পায় বলিয়া প্রকাশ করে।

(জ) কোন জন্তু বা উদ্ভিদ্ সংক্রামক রোগে মরিয়া গেলে, উহার দেহ ও উহার সংশ্রবে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই অগ্নি দ্বারা নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত। অগ্নি দ্বারা যদি কোন বস্তু নষ্ট করিলে অধিক ক্ষতি হয়, তবে ঐ বস্তু তুঁতিয়ার জলে ডুবাইয়া লওয়া উচিত। পাস্তুর সাহেবের পরীক্ষাগারে যে সমস্ত জন্তু মরিয়া যায়, উহাদের একটী তুঁতিয়ার জলের চৌবাচ্চায় ফেলিয়া রাখা হয়। এক দিবস কাল তুঁতিয়ার জলে থাকিবার পরে কৃষকগণ এই সকল মৃত দেহ সাররূপে নিজেদের জমিতে ব্যবহার করে। ইহাতে পাস্তুর সাহেবের কারখানায় যে সমস্ত উৎকট রোগের বীজ লইয়া পরীক্ষা করা হয়, এই সকল উৎকট রোগের অণু অন্যত্রে গিয়া ক্ষতি করিতে পারে না। গোরুর গুটীর (Anthrax) বা অন্য কোন উৎকট রোগের টিকা-রস যদি কখন অসাবধানতা বশতঃ এই কারখানার কোথাও ছিট্‌কাইয়া পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ তুঁতিয়ার জল ছিটাইয়া দেওয়াতে, উহা দ্বারা কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা থাকে না।

কোন্ পদার্থ কি অনুপাতে ব্যবহার করিলে অণু সকল মৃত অথবা নিবারিত (Inhibited) হয়, তাহার একটী সাধারণ তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। সকল প্রকার অণুতেই যে এই অনুপাত খাটিবে, এরূপ নহে। ইহার মধ্যে কতকগুলি পদার্থ কেবল ওলাউঠার অণুতেই পরীক্ষিত হইয়াছে। আবার কতকগুলি ব্যাধিজনক অণুতে পরীক্ষিত না হইয়া, কেবল চিনির জলের গাঁজ্‌লা (Saccharomyces cerevisæ) অথবা মদিরার গাঁজ্‌লা (Bacillus Aceti) এইরূপ দুই একটী নির্দ্দোষ অণু সম্বন্ধেই পরীক্ষিত হইয়াছে। কি পরিমাণে কোন্ পদার্থ ব্যবহার করিয়া উপকার পাওয়া যাইবে, নিম্নলিখিত তালিকা দ্বারা এ বিষয়ে একটী সাধারণ জ্ঞান মাত্র জন্মিবে। অণু বিশেষে ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন পদার্থ অধিক পরিমাণে ব্যবহার না করিলে উপকার দর্শিতে না পারে।

আইয়োডাইড অব্-মার্কারি (দুই লক্ষ ভাগের এক ভাগ)	১ : ২,০০,০০০
বাইক্লোরাইড্-অব্-মার্কারি (=রসকর্পূর) …	১ : ১,০০,০০০
নাইট্রেট্-অব্-সিল্‌ভার (=কাষ্টিকি) …	১ : ৫০,০০০
হাইড্রোজেন পেরক্সাইড্ …	১ : ৮,০০০
আইয়োডিন্ … …	১ : ৬,০০০*
কুইনাইন্ … …	১ : ৫,০০০
আইয়োডো ফর্ম্ …	১ : ৫,০০০
ন্যাপ্‌থালিন্ … …	১ : ৪,০০০
তুঁতিয়া … …	১ : ২,৫০০
খাঁটি রাই-সর্ষপের তৈল …	১ : ২,০০০
স্যালিসিলিক্ এসিড্ …	১ : ২,০০০
পুদিনার তৈল … …	১ : ২,০০০
বেন্‌জোইক্ এসিড্ …	১ : ১,৫০০
পার্‌মাঙ্গানেট্-অব্-পটাশ্ …	১ : ১,০০০
ইউকালিপ্টস্ তৈল …	১ : ৬০০
কার্‌বলিক্ এসিড্ …	১ : ৫০০
হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ …	১ : ৫০০

* জর্ম্মণ পণ্ডিত কোথ্ ওলাউঠা অণুর জন্য ১:১০০ অনুপাতে আইওডিন্ আবশ্যক ইহা স্থির করেন।

সোহাগা	... ...	১:৩৫০
কর্পূর	... ...	১:৩০০
শেঁকো বিষ (আর্সেনিক্)		১:২৫০
ক্লোরাইড্-অব্-জিঙ্ক	...	১:২৫০
ল্যাক্টিক্ এসিড্ (ঘোল-অম্লসার)		১:১২৫
কার্বনেট্-অব্-সোডিয়াম্	...	১:১০০
আল্কোহল্ (খাঁটি মদ)	...	১:১০

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

স্ত্রীশিক্ষা-বিবরণ। (৩)

স্ত্রীশিক্ষার প্রতিষ্ঠা।

স্ত্রীশিক্ষার এতদূর চর্চ্চা ও বিস্তার হইলেও, তাহা এতদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে কিনা,—তাহা চিরদিন চলিবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। ক্রমে ক্রমে সে সন্দেহের নিরসন হইতে লাগিল।

১৮৪৯ হইতে ১৮৫৯ অব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর কাল স্ত্রীশিক্ষা যে প্রণালীতে চলিয়া আইল, তাহাতে তাহার এই লক্ষণ প্রকাশ পায় যে,—

"পরান্নে বাঁচিল প্রাণ পরের পালনে।"

বিদেশীয় সাহেবেরা উপদেশ দিলেন, উৎসাহ দিলেন, পুস্তক রচনার নিমিত্ত ইংলণ্ডীয় উপাদান দিলেন, টাকা দিলেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং আপনারা বহু আয়াস স্বীকার করিয়া সেই সকল বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তবে এ দেশের স্ত্রীদিগের বিদ্যাধ্যয়ন ধীরে ধীরে প্রচলিত হইতে লাগিল।

পরন্তু হিন্দুসমাজের পত্তনগত যে সংস্কার বা নির্ম্মাণ-কার্য্য, তাহা বিদেশীয় ব্যাপার হইয়া কতদিন চলিবে? অন্তরালযুক্ত অন্তঃপুরের যে শিক্ষা-বিধান, তাহার অস্তিত্ব ও জীবন বিদেশীয় সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া কতদিন থাকিতে পারে? অর্থ ও তত্ত্বাবধানের গোলযোগে এক সময় হিন্দু-কলেজ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ও টলমল হইয়াছিল। গবর্নমেণ্টের আনুকূল্যে এই দুই বিদ্যালয় রক্ষা পাইল। কিন্তু এই সময়ে বালকদিগের শিক্ষার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাদের যত্নে যে সকল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, সে সকল বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব পক্ষে তেমন কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই।

স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইবার পক্ষে সন্দেহের কারণ এই যে, (১) উহার বিপক্ষ লোক বিস্তর, (২) বাল্যবিবাহ নিবন্ধন স্ত্রীদিগের শিক্ষার সময় অল্পই থাকে, (৩) স্ত্রীশিক্ষা কি কার্য্যে আসিবে, তাহার কোন পরিচয় নাই, (৪) বিদেশীয় লোকের বা গবর্নমেণ্টের অর্থ সাহায্যের উপর কোন ভরসা করা যায় না। এই সকল বিঘ্ন অতীব গুরুতর; সহজে অনতিক্রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল। ঘরে ঘরে স্ত্রীশিক্ষা আত্মগুণেই প্রচলিত হইল। স্ত্রীশিক্ষা এদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, আর লুপ্ত হইবে না; উহা রুদ্ধ করিতে লোকের আর প্রবৃত্তি জন্মিবে না; এমন সম্ভাবনা হইল।

কিরূপে এই মহৎফল সাধিত হইল, তাহা বুঝিতে হইলে এ দেশীয় কৃতবিদ্য যুবকদিগের নানা চেষ্টা, উদ্যোগ ও আয়োজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়।

THE SOCIETY FOR THE ACQUISITION OF GENERAL KNOWLEDGE.

"সাধারণ-জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা।"*

আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন মহামনা ইংরাজগণ এদেশীয় বালক ও বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত যে প্রভূত যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহারা অনুর্ব্বর ভূমিতে বীজ বপন করেন নাই। হিন্দুদিগের বিপুল ফলশালী চিত্তক্ষেত্র কিছুদিন কর্ষণ-বিরহিত হইয়া পতিত ভূমির লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই ক্ষেত্রেরই পূর্ব্বোপজাত বীজ পুনর্বপন করিলে যেমন ফল উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, তাহাই অবশ্য হইবে।

আমরা ১৮১৮ অব্দের স্থাপিত স্কুল সোসাইটীর কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেই সোসাইটীর সাহায্যে যিনি প্রথমে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, তিনি এখন ইংরাজী ভাষায় সুবক্তা ও বহু ভাষায় সুপণ্ডিত, রেভেরণ্ড পদে প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহাকে লইয়া হিন্দুকলেজের অন্যান্য উত্তীর্ণ ছাত্রেরা † উপরোক্ত নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায় স্বল্প সঞ্চিত জ্ঞানের বৃদ্ধি করা আবশ্যক এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত জন্মভূমির উন্নতির উদ্দেশে পরস্পরের সম্মিলন ও সদ্ভাব সঞ্জাত করা আবশ্যক। এই নিমিত্ত এই সভার অনুষ্ঠান হয়। প্রায় দুই শত যুবক ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সংস্কৃত কলেজ গৃহে সভার অধিবেশন হইত। ১৮৩৮ অব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী ইহার অনুষ্ঠানপত্র প্রচারিত, ১২ মার্চ্চ ইহা স্থাপিত এবং ১৬ই মে ইহার কার্য্যারম্ভ হয়।

ইহাতে ধর্ম্ম প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য সকল হিতকর বিষয়ের আলোচনা হইত। ইহার সভ্যেরা যে দুই ইংরাজ মহাপুরুষের অক্লান্ত চেষ্টায় কৃতবিদ্য হইয়াছেন, দুই মহতী সভায় তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এক্ষণে তাঁহাদেরই আশানুরূপ আত্মোন্নতি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশোন্নতির জন্য এই সভা স্থাপন করিয়াছেন।

এই সভার ১৮৩৯ অব্দের ৯ জানুয়ারী দিবসীয় অধিবেশনে বাবু মহেশচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক হিন্দু স্ত্রীদিগের অবস্থা বিষয়ে ইংরাজীতে এক বক্তৃতা হয়। তাহাতে বক্তা স্ত্রীদিগের বর্ত্তমান নানাপ্রকার হীনাবস্থার বিষয় বর্ণন করিয়া শেষে বলিলেন, দ্বিতীয় বারে আমি স্ত্রীদিগের শিক্ষার বিষয় বলিব,

"For that alone furnishes a remedy to all those heavy evils which I have endeavoured to deleneate above."

কারণ, স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে যে অনিষ্ট রাশির কথা উপরে ব্যক্ত করিলাম, কেবল শিক্ষাদান দ্বারাই তাহার প্রতিকার হইতে পারে।

১৮৪০ অব্দের ৮ই মে দিবসে উক্ত সভার এক অধিবেশনে, রেভেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ সংস্কার বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। তাহাতে বাল্য-বিবাহের দোষ এবং স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, এই দুই বিষয় বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছিল।

হিন্দু স্ত্রীদিগের শিক্ষা প্রদান জন্য

* অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, বঙ্গভাষার উন্নতি এই সভার বিশেষ লক্ষীভূত ছিল। ১৮৩৮ অব্দের ১৩ই জুন উক্ত সভায় বাবু উদয়চন্দ্র আঢ্য কর্ত্তৃক "এতদ্দেশীয় লোকদিগের বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করণের আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব" পঠিত হয়। সেই প্রবন্ধের শিরোদেশে এই বাঙ্গালা নাম লিখিত হইয়াছিল।

† বাবু রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ি, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রাজকৃষ্ণ দত্ত প্রভৃতি।

১৮১৯ অব্দে পিয়ার্স সাহেব যুবেনাইল সোসাইটী স্থাপন উপলক্ষে ইংরাজ মহিলাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, পাঠকগণ তাহা জানিয়াছেন। তাহার ২০ বৎসর পরে হিন্দু যুবকেরা * কি বলিয়া পরস্পরকে জাগাইয়া তুলিতেছেন, তাহা একবার দেখুনঃ—

"It is impossible that a nation can take rapid strides to civilization while half the members that compose it are sunk in ignorance and degradation. The very persons who are to instil the first elements of knowledge into the tender mind and after whom the little infant learns to lisp broken sentences are suffered to continue uneducated and uninstructed. Can the nation then make any high progress towards refinement? Can the people reap the advantages and enjoy the blessings of education to a considerable extent, while their partners in life grovel on the dust of superstition and darkness? Can the tide of improvement run on with progressive strength from generation to generation, if the infant mind can never be educated and if we can never impart instruction to those "that are weaned from the milk and drawn from the breasts?" The fact can never be so and therefore we must educate our daughters with the same care as our sons, if we are to expect the advancement of our country in the scale of happiness."

তত্ত্ববোধিনী সভা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানোন্নতি সভার যে উদ্দেশ্য, তত্ত্ববোধিনী সভারও প্রায় সেই উদ্দেশ্য। বিশেষ এই যে, জ্ঞানোন্নতি সভাতে ধর্ম্ম প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত না, তত্ত্ববোধিনী সভাতে প্রচুররূপে ধর্ম্ম চর্চ্চা ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি উদ্দীপনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। জ্ঞানোন্নতি সভার কার্য্যারম্ভের ১৭ মাস পরে, ১৮৩৯ অব্দের অক্টোবর মাসে, তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হয়। * উক্ত সভা দেশের হিত ও ধর্ম্মোন্নতি সাধন বিষয়ের আলোচনায় পরিপক্কতা লাভ করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাসে এই পত্রিকার জন্ম হয়। এই সভার সহিত তদানীন্তন প্রায় সকল সুশিক্ষিত, দেশ-হিতৈষী, ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিবর্গের যোগ ছিল। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ, এই দুই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষিত সর্ব্বোত্তম গুণসম্পন্ন যুবাপুরুষেরা, ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় প্রকার ভাষার গ্রন্থ হইতে জ্ঞানরত্ন সংগ্রহ করিয়া, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে আলোকিত ও অলঙ্কৃত করিতেন। এই পত্রিকা প্রকাশের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে তাহাতে স্ত্রীদিগের দুরবস্থা ও তাহাদের বেদাদি শাস্ত্রে অধিকার বিষয়ে ২।৩টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানোন্নতি সভায় এবং তাহার পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এইরূপে উদ্বোধন মাত্র হইয়াছিল। ইহার পর প্রায় দশ বৎসর এই যুবকেরা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আর কোন চেষ্টা করিতে পারেন নাই। এই দশ বৎসরের শেষভাগে বেথুন সাহেব বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

এতদ্দেশীয়েরা কেবল যে স্ত্রীশিক্ষারই বিরোধী ছিলেন, তাহা নহে। ১৮১৭ অব্দে যখন হিন্দু কলেজ স্থাপন হয়, ১৮৩৫ অব্দে যখন মেডিকেল কলেজ স্থাপন হয়, এবং শেষে ১৮৪৯ অব্দে যখন বেথুন সাহেব বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, এই তিন ঘটনাতেই তাঁহারা নির্ব্বিকার চিত্তে এই

* এই সভা হিন্দু নামে আপনাদের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দলভুক্ত হইয়া প্রথম দিবসাবধি সভার উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত বক্তৃতা করিয়াছেন।

* ১৭৬১ শকের ২১এ আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী।

তিন মহৎ অনুষ্ঠানের বৃহৎ দোষ ঘোষণা করিয়াছিলেন। দ্বাত্রিংশদ্বর্ষব্যাপী এই নিন্দা বর্ষণের মধ্য দিয়া উক্ত তিন হিতকর বিদ্যালয়ের গুণগরিমা যে বিদ্যোতিত হইতে লাগিল, তাহার প্রধান কারণ এই যে ঐ তিন বিদ্যালয়ের দ্বারাই বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। সর্ব্বসাধারণে স্বীকার করুন্ বা না করুন্, ফলতঃ ইহা তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছিলেন যে, তাঁহাদের ঘরে ঘরে কি অনিন্দনীয় জ্ঞানরত্ন সুগম ভাষার মনোরম পত্রে বিতরিত হইতেছে। এই বঙ্গভাষা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন, সুমার্জ্জিত ও অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অঙ্গকে সুশোভিত করিত। তাহাতে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণের কার্য্যক্ষেত্র নানাদিকে বিস্তারিত হইল এবং তাঁহাদের সকল কথা ও সকল কার্য্যই যশোমণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইল। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানোন্নতি সভার প্রাণ মানবীয় উৎসাহমাত্রকে অবলম্বন করিয়াছিল, অতএব তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইল না। তত্ত্ববোধিনী সভা, অনন্ত অক্ষয় পুরুষের অবলম্বনে, অক্ষয় লেখনী দ্বারা, অক্ষয় ফল উৎপাদন করিতে লাগিল।

ভক্তিযোগ।

যে সকল সদাশয় ইংরাজ নানা প্রকারে আমাদিগের মহোপকার সাধন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা আমাদিগকে দীন দেখিয়া দয়া করেন, কেহ বা এক রাজার প্রজা ভাবিয়া আমাদের প্রতি সহানুভূতি করেন, কেহ বা এক ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আমাদিগের প্রতি ভ্রাতৃভাবাপন্ন ও অনুরক্ত হয়েন; কিন্তু যাঁহারা ভারত মাতার গর্ভজাত সন্তান, তাঁহারা পরস্পরকে আরো কিছু গভীর সম্বন্ধে নিবদ্ধ দেখিবেন। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বা সহানুভূতি বা দয়া প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যাহাকে ভক্তি বলা যায়, স্বদেশের সর্ব্ব শুভ বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের সেই ভক্তি চাই, বিরুদ্ধ-ভাব-শূন্য ভক্ত পুত্রের ন্যায় প্রতিনিয়ত জন্মভূমির সেবা করা চাই, এবং ভারতমাতার নিজের ক্ষেত্রজাত নব নব দ্রব্যে, অনাঘ্রাত পুষ্প চন্দনে তাঁহার অর্চ্চনা করা চাই। যাঁহারা ভগবৎ পূজা জানেন, তাঁহারাই এইরূপে মাতৃপূজা করিতে পারিবেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্বার্থ সাধনের প্রত্যাশা করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের সভা স্থাপনের প্রথমাবধি এই তথ্য দেখিয়া আইলেন যে, হতভাগ্য ভারতভূমির মঙ্গলের জন্য যিনি যে কোন অনুষ্ঠান করিতে চান, তিনি বহু বিঘ্ন দ্বারা পর্য্যাকুলিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা দেখিলেন, বেথুন প্রভৃতি মহাত্মাগণ এদেশের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও বালিকা বিদ্যালয়ের যে ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে রাজা, প্রজা, কোন পক্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন না। সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়স্থ হিন্দু যুবকেরা যাহা আলোচনা করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না। রাজপুরুষেরাও বায়ব্য ইংলণ্ডের বায়ুর গতি অনুসারে অদ্য এক ব্যবস্থা, কল্য অপর এক ব্যবস্থা করিতেছেন; সুতরাং তাঁহাদের প্রতি লোকের বিশ্বাস স্থির থাকিতেছে না।

এই সকল লক্ষণ দেখিয়া, তত্ত্ববোধিনী সভা ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের দিকে চাহিলেন; দীন দুস্থ হইলেও আপনাদের মর্য্যাদা বুঝিলেন;

এবং একাগ্র চিত্তে ভক্তিযোগে স্বদেশীয় লোকের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ঈশ্বর তাঁহাদের সহায়। তাহাতে ঈশ্বরের অপরাপর পুত্রেরাও তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট ও তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃত্ব-রক্ষা করিতে উন্মুখ হইলেন।

জন্মলাভের অল্প দিন পরেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নানা সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের ব্যবহারের দোষ গুণ বিচার করা অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলেন। পরন্তু অকৃত্রিম সরলতা, অটল ব্রতশীলতা, নিরবচ্ছিন্ন দেশহিতৈষিতা, এবং ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য থাকাতে তত্ত্ববোধিনীর কথা লোকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অবহিত হইয়া শুনিতে লাগিল।

হিন্দুধর্ম্ম-দ্রোহী খ্রীষ্টান মিশনরিগণ ও তাহাদের সপক্ষ লোকেরা তাহার প্রথম লক্ষীভূত হইলেন। দ্বিতীয়, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি এবং নীতি শিক্ষার প্রতি অবহেলাকারী শিক্ষা-সমাজ-সংক্রান্ত কর্ম্মচারীগণ। তৃতীয়, প্রজা পীড়নকারী জমিদারগণ। চতুর্থ, কৃষক-শোষণকারী নীলকরগণ।

১৭৬৫ হইতে ১৭৭২শকাব্দ (১৮৪৩ হইতে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত ৮ বৎসরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "কলিকাতার বর্ত্তমান সময়ের দুরবস্থা", "হিন্দু স্ত্রীদিগের দুরবস্থা", এবং "পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা" পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অতি সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত হইয়াছিল। আর "স্বদেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস" ও "হিন্দুকলেজের শিক্ষা প্রণালী" সম্বন্ধে যথার্থ কৃতবিদ্য লোকের ন্যায় সমীচীন সমালোচনা করা হইয়াছিল। তাহাতে ঐ পত্রিকার লেখকগণ যশস্বী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের কেমন অকৃত্রিম মিত্র, সুবুদ্ধি মন্ত্রী, সুবক্তা উকীল, ধর্ম্মনিষ্ঠ উপদেশক, এবং কেমন বিনীত ভক্ত, তাহা উজ্জ্বল অক্ষরে সর্ব্ব হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল।

অতঃপর উক্ত পত্রিকায় বাল্যবিবাহাদি সামাজিক কুসংস্কারের নিরাকরণ নিমিত্ত যে সকল আলোচনা হইয়াছিল এবং যে ধর্ম্মনীতির শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তৎপ্রতি লোকের বিদ্বেষবুদ্ধি অধিক কাল স্থান পায় নাই। ক্রমে ক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এদেশের সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞানদায়িনীরূপে পরিগৃহীত হইল। তদন্তর্গত প্রবন্ধাবলি হইতে সঙ্কলিত হইয়া ধর্ম্মনীতি, পদার্থবিদ্যা, এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার অধীত * ভূগোলাদি পুস্তক বিদ্যালয় সমূহের পরমোৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইল।

শাস্ত্রানুশীলন।

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের হৃদয়ে যে ভক্তি যাগের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার প্রথম কার্য্য সেই ভক্তিবর্দ্ধনকারী শাস্ত্রানুশীলন।

ইংরাজী ভাষায় যাঁহারা সুশিক্ষিত, তাঁহাদের দৃষ্টি স্বদেশীয় ভাষার প্রতি ব্যাবৃত্ত হইলে অচিরকাল মধ্যে জ্ঞানের অনন্ত আকর স্বরূপ সংস্কৃত শাস্ত্রের মহিমা উক্ত কৃতবিদ্যগণের জ্ঞানগোচর হইল। তাঁহারা ইউরোপের আদি, মধ্য ও বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও ইতিহাসে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। অতএব স্বদেশের চারি যুগজাত গ্রন্থাবলী হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সার সঙ্কলন করিতে তাঁহাদের সম্যক্ পারগতা জন্মিয়াছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চিরদিন বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রের মহাবাক্য রূপ দিব্য অলঙ্কারে

* ১৭৬২ শকে অধীত এবং ১৭৬৩ শকে মুদ্রিত হয় (১৮৪০।৪১ খ্রীষ্টাব্দে)।

বিভূষিতা হইয়া আসিতেছেন। তাহার জন্মের পর তৃতীয় বর্ষ (১৭৬৭ শক) হইতে মহাভারতীয় শ্লোকমালা তাহার কণ্ঠে বিলম্বিত হইয়াছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমাবধি তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা অষ্টাদশ পুরাণ ও চতুর্ব্বেদ সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছিল এবং অনুবাদ সমেত ঋগ্বেদ সংহিতা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল। ১৭৭০ শকের ফাল্গুন মাসের পত্রিকাতে মহাভারতের রঙ্গানুবাদ আরম্ভ হয়। তদুক্ত স্থান ও পুরুষগণের পরিচয় নানা গ্রন্থ হইতে সমাহৃত হইয়া টীকার আকারে বিন্যস্ত হইয়াছিল।

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক অমৃতোদ্ধারে কেমন নিপুণ হইয়াছিলেন, ১৮৪৮-৫১ খ্রীষ্টাব্দের (১৭৬৯-৭২ শক) পত্রিকাতে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন প্রদত্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের অনুবাদের কতিপয় পংক্তি বিশিষ্ট ভূমিকায় এবং "পাণ্ডু পুত্র ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের অস্ত্র পরীক্ষা," "মহাভারতীয় সভাপর্ব্ব" "প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা" ও বাণিজ্য বিবরণ, "ভারতবর্ষ মধ্যে হিন্দু সন্তানদিগের বসতি বিস্তার", (মানচিত্র সমেত) এবং উপাসক সম্প্রদায় সংক্রান্ত অন্যান্য বৃহৎ প্রবন্ধে অমৃতভাণ্ডরূপিণী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যে সত্যামৃত সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা উক্ত পত্রিকাকে চিরজীবিনী করিয়া রাখিয়াছে। সেই সকল প্রবন্ধ গুণেই অক্ষয়কুমার বঙ্গভাষার অক্ষয়কুমার হইয়া রহিয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা, এইরূপে ঋষিতর্পণ করিয়া, ভারতের যথার্থ ভক্ত সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইলেন। যখন মূল শাস্ত্রামৃতের অপূর্ব্ব আস্বাদ বঙ্গীয় সমাজের বহুলোকে জানিতে পারিয়াছিলেন, তখন স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষার অধিকার ও ঔচিত্য বিষয়ে পণ্ডিত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার যে প্রবন্ধ সকল প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যুক্তি, ও সহৃদয় বর্ণনা এদেশের লোকের গ্রহণীয় হইয়াছিল। তখন বেথুন বিদ্যালয়ের অঙ্কিতঃ—

"কন্যাপেবাং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ"

এইমহাবাক্যের তাৎপর্য্য লোকের উপলব্ধি হইয়াছিল। তখন অনেকের নিকট প্রতিপন্ন হইল যে, স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা স্বভাববিরুদ্ধ বা সাহেবী কাণ্ড নহে; উহা হিন্দুধর্ম্ম-সঙ্গত এবং পূর্ব্বাপর ব্যবহার-সিদ্ধ।

ফলতঃ স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে সকল বিরুদ্ধ সংস্কার ছিল, তাহা একে একে অপগত হইল। তাহাতে স্ত্রীশিক্ষার সুদৃঢ় বিঘ্নকারীরা ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন এবং তাহার অনুরাগীদিগের উদ্যম জয়যুক্ত হইতে লাগিল।

স্ত্রীদিগের শিক্ষণীয় বিষয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি লোকের বিপক্ষতার হ্রাস হইল বটে, কিন্তু এখনো একটী সমস্যা রহিল।

স্ত্রীদিগের কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত? তাহাদের পঠনীয় পুস্তক কি প্রকার? কাহাদিগের দ্বারা কুলকন্যাগণের সুশিক্ষার আধান হইতে পারে? এই সকল বিষয়ের বিচার বড় গুরুতর। বিশেষতঃ স্ত্রীদিগের পাঠ্যপুস্তকের প্রকৃতি অতীব বিচারণীয়। স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগী ও উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গ বিপক্ষদিগের তাড়নায় উপরোক্ত বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে দুই মহাত্মার পুস্তক

ও উপদেশ বিবরণ ব্যক্ত করিয়াছি, তাঁহাদের লিখন ও কার্য্য দ্বারাও ঐ তথ্য বিদিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী সভা স্থানে স্থানে বালকদিগের শিক্ষার্থ পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা তাদৃশ কোন আয়োজন করেন নাই। তাহার কারণ এই হইতে পারে যে, তাঁহারা উল্লিখিত সমস্যার পূরণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই।

এই সময়ে সুবিখ্যাত বিদ্যাসাগর-রচিত কথামালা, চরিতাবলী প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকের প্রচার হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনখানিই স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উপযোগী নহে।

সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপার কিছুদিন ইংরাজদিগের উপরে নির্ভর করিয়া রহিল। তাঁহারা যে কোনরূপে হউক, স্ত্রীশিক্ষার চর্চ্চা জাগাইয়া রাখিলেন। বিদেশীয় ব্যক্তির সাধ্য পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

স্কুলবুক সোসাইটী এবং বর্ণেকিউলর লিটরেচর কমিটী বা সোসাইটী দ্বারা গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ নামধেয় যে পুস্তকাবলী প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

সেই পুস্তক-স্তবকের মধ্যে কতকগুলি বিচিত্র গল্প কথায় রচিত; আর কতকগুলি বীরাঙ্গনাচরিত। বালিকাদিগের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা গল্প-পুস্তকগুলির উদ্দেশ্য। তাহার অধ্যাপনার ফল লাভ হইয়াছে কি না, বলা যায় না। বীরাঙ্গনা চরিত পাঠের ফল কিছু হয় নাই বলিয়া বোধ হয়।

"স্ত্রীরা স্বভাবতঃ অবলা, কোমল স্বভাবান্বিতা ও বীর্য্যহীনা বলিয়া প্রসিদ্ধা। পরন্তু অনেক নারী রণস্থলে স্বয়ং সৈন্য চালনা করতঃ যেরূপ বীর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে অনেক পুরুষকে বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয়দিগকে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়;—" এই বলিয়া বিবিধার্থ সংগ্রহকার জাহানিরা, নুরজাঁহা, বোয়াডেসিয়া ও দুর্গাবতী প্রভৃতি রণরঙ্গিণী ও রাজ্যপালনক্ষমা স্ত্রীদিগের আদর্শ এদেশীয়দিগকে দেখাইয়া "বিস্ময়ান্বিত" করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বিস্ময়ের কোন ফল এই সমাজে সম্প্রতি সমুদ্ভূত হইবার নহে। তথাপি ঐ সকল স্ত্রীর উপাখ্যান দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইল যে স্ত্রীরাও "পুরুষজাতির মত কি রাজ্য রক্ষা, কি যুদ্ধবিগ্রহ, কি প্রতিজ্ঞাপালন, সকল কার্য্যই সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে, সন্দেহ নাই।" *

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনুবাদক সমাজের পুস্তক ও পত্রিকাদি দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এইরূপ চর্চ্চা হইতেছিল।

বালক বালিকার স্বভাব সুন্দরমূর্ত্তি সর্ব্ব অবস্থাতেই নূতন নূতন সৌন্দর্য্য ধারণ করে। কখন দন্তবিরহ, কখন দন্তোদ্গম, কখন অর্দ্ধ-পরিস্ফুটভাষা, কখন নানা কথা, কখন রাখালবেশ, কখন রাজপরিচ্ছদ, শৈশবের সকল শ্রী মনোহর হয়। মূলে যখন বিশ্বাস হইল যে স্ত্রীশিক্ষা অস্বাভাবিক বা বৈজাত্য ব্যাপার নহে, তখন বালিকাদিগের বিদ্যালয় গমনের নিমিত্ত চঞ্চলতা, বিভিন্ন প্রকার পরিচ্ছদ, পুস্তকাদির ব্যবহার, নানা পাঠের আবৃত্তি এবং অনুবাদক সমাজের পুস্তকাবলীর স্ত্রী-আদর্শ,—নূতন বলিয়া এ সকলই ভাল লাগিয়াছিল। শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

* জাহানিরার চরিত্র—১২৬৫ সাল।

বেঙ্গল স্যানিটারী ড্রেণেজ বিল। (১)

গুরুতর প্রশ্ন। গবর্ণমেণ্ট লোক সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার কল্পনা করিয়া, একটী অভিনব কৃষি-কর স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

এক দিকে অসুস্থ বঙ্গভূমির স্বাস্থ্য রক্ষার কল্পনা; অপর দিকে করভার-পীড়িত দরিদ্র কৃষি-বলের উপর পুনঃ নূতন কর;—প্রশ্ন উভয় দিকেই গুরুতর।

আপাততঃ এক বস্তু অপেক্ষা অপর এক বস্তুর অধিকতর আবশ্যকতা যদি এ দেশে থাকে, সে বস্তু,—স্বাস্থ্য। বাঙ্গালীর অসংখ্য অভাবের মধ্যে স্বাস্থ্যের অভাব সর্ব্বোপরি। পশ্চিম, উত্তর, মধ্য বাঙ্গালার অস্থি মর্জ্জায় ম্যালেরিয়া; জ্বর-জ্বালা, মহামারির মর্ম্মান্তিক দংশনে কত জনাকীর্ণ নগর আজ বন-পূর্ণ, সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রাম অধঃপাতিত, কত প্রফুল্ল পল্লী পরিত্যক্ত, প্রায় শ্মশান-দৃশ্যে পরিণত হইয়াছে;—কত বা হইতে বসিয়াছে। ম্যালেরিয়ার মহামারি নিত্য, নৈমিত্তিক;—উহা অবিচলিত আহ্নিক ও বার্ষিক গতিতে রাশিচক্রবৎ বঙ্গীয় গ্রাম পল্লী পরিক্রমণ করে, প্রহার ও প্রপীড়ন করে;—প্রজ্জলিত হুতাশন-মুখে পতঙ্গবৎ বঙ্গীয় প্রজা ম্যালেরিয়াবিষে মরিয়াছে, মরিতেছে। কিন্তু এই বিষ-বৃক্ষের ফল কেবল মৃত্যু নহে,—ততোধিক কঠোর,—জীবন্মৃত্যু! বালক বৃদ্ধবৎ বিকলাঙ্গ, বুদ্ধিহীন, স্ফূর্ত্তিহীন, শোণিত-মাত্র-পরিশূন্য-দেহ-যষ্ঠি! যুবক যৌবনে জরাগ্রস্ত, কঙ্কালসার, অকর্ম্মন্য! নেত্র কোঠোরাভ্যন্তরগত, মলিন দীপ্তি;—উদর আকণ্ঠ অম্ল-ক্লেদ-শ্লেষ্মা পূর্ণ, স্ফীত, প্লীহা যকৃতের প্রমোদোদ্যান! হস্তপদ সর্ব্বাঙ্গ শরীর শিথিল,—সূক্ষ্ম শলাকাবৎ প্রতিভাত;—রক্ত-মাংস-বিহীন কলেবরের অস্তিত্ব কেবল একখানি অতি বিবর্ণ, রূক্ষ চর্ম্মাভ্যন্তরে, বিলুপ্ত স্বাস্থ্যকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই যেন বিদ্যমান!—মানুষ মানুষী ম্লান মুখে কুইনান্ খায়, আর মৃত্যু কামনা করে!! 'কোয়াকী', কবিরাজী, আধিভৌতিক এবং অবধৌতিক প্রভৃতি প্রেতভূমি-জাত এবং প্রেতাবিষ্কৃত 'পেটেণ্ট' ঔষধাবর্জ্জনার প্রবঞ্চনা-প্রবাহে বঙ্গীয় পল্লী, এ মুহূর্ত্তে, প্রকৃত প্রস্তাবে, প্লাবিত!

ইহা অতিরঞ্জিত চিত্র নহে;—ম্যালেরিয়া-পীড়িত গ্রাম এবং নগর পল্লীর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান দৃশ্য! যথাসর্ব্বস্ব বিনিময়েও যদি এ অসুস্থ দেশ স্বাস্থ্য পায়, তাহাতেও আমরা অসম্মত নহি। স্বাস্থ্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এদেশে, উপস্থিত অবস্থায়, সর্ব্বথা সে প্রয়োজনীয়তা অতীব প্রবল।

রাজ-শক্তি লোক সাধারণের স্বাস্থ্য বিষয়ে উদাসীন নহে, তজ্জন্য আগ্রহের সহিত উদ্যোগী. ইহা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহা আনন্দের বিষয়,—এদেশীয় লোকের সবিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে। অতএব স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও তাহার উপস্থিত অধিনেতা স্যর চার্লস ইলিয়ট-কৃত এই স্যানিটারী ড্রেণেজ বিল অর্থাৎ স্বাস্থ্য রক্ষার্থে গ্রাম্য পয়োপ্রণালী সৃষ্টি বা সংস্কার-বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে অন্য কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে, এবং তাহার বিরুদ্ধে শত প্রতিবাদের উপর আমাদের সহস্র প্রকারের প্রতিবাদ থাকিলেও আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি যে, এ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সৎ এবং অভিপ্রায় মহৎ; পরন্তু, এ সম্বন্ধে সকার্য্য-

পালনানুরাগের জন্য স্যর চার্লস লোক সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু এই ম্যালেরিয়া-নিপীড়িত দেশে স্বাস্থ্য বিধানের উপায় কি? কোনও প্রকৃষ্ট উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে কি? ম্যালেরিয়া বীজ কিসে এবং কোথা হইতে উৎপন্ন, তাহা আদৌ বৈজিক কিনা? ম্যালেরিয়া-জাত জ্বরের কেবল একটী মাত্র কারণ অথবা তাহা কারণ পরম্পরার সমষ্টি-সঞ্জাত, আধুনিক এবং উন্নত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান এসম্বন্ধে কি উত্তর দেন? আদৌ কোনও সদুত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না? অপিচ ম্যালেরিয়ার কারণ অনুসন্ধান কল্পে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত যত সমীচীন চিকিৎসক ও প্রবীণ পণ্ডিত সরকার বাহাদুর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের অনুসন্ধান-ফল ও অভিমত কি? পরন্তু এক্ষণ গবর্ণমেণ্ট উহার যে কারণের কল্পনার উপর অতিমাত্র নির্ভর করিয়া আইন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ম্যালেরিয়ার প্রতিকার কল্পে, তাহার মূল্য কত, উপকারিতা কি এবং তাহার উপকারিতা অপেক্ষা, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পথে অপকারিতা অধিক কিনা? স্যর চার্লস ইলিয়টের বেঙ্গল স্যানিটারি ড্রেণেজ বিল সাবধানে ও শীতল চিত্তে যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, ইহার আমূল ইতিবৃত্ত ও মূলতত্ত্ব যাঁহারা অবগত আছেন, প্রথমেই এই সকল প্রশ্ন তাঁহাদের মনে উদয় হয়। এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সৎ, অভিপ্রায় মহৎ; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কোন্ উদ্দেশ্য সৎ এবং মহৎ নয়? রাজকীয় বিধি ব্যবস্থার ফলাফল ভবিষ্যতে যাহাই ঘটুক, মূলে তাহার উদ্দেশ্য অসৎ নয়। তাহাতে অসৎ অভিসন্ধি আরোপ করা অন্যায়। যে প্রজা-নীতি পদে পদে রাজ-নীতির উপর অভিসন্ধি আরোপ করে, আমরা তাহার পোষকতা করিতে পারি না। তাহা রাজা প্রজা উভয়কেই প্রবঞ্চিত করে। এই স্যানিটারি ড্রেণেজ বিল যেরূপ ভাবে গঠিত ও তৎপরে বঙ্গেশ্বরের নিজ মুখে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা সুবুদ্ধিসঞ্জাত না হইতে পারে, সুবুদ্ধিসঞ্জাত নয়, কারণ তদ্দ্বারা কুফল ফলিবে; কিন্তু তাহা অসদভিপ্রায়ে অনুপ্রাণিত নহে, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি।

ম্যালেরিয়ার যে কল্পিত কারণের উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই (তথা কথিত) স্বাস্থ্য-আইনটীর আয়োজন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত এবং পূর্ণ কারণ কিনা এবং তাহা নিবারিত হইলে স্বাস্থ্য-বিধানের সম্ভাবনা কি পরিমাণ আছে, আদৌ আছে কিনা, অন্যান্য বিষয়ের সহিত তাহার অপক্ষপাত পর্য্যালোচনা এই প্রবন্ধের যথাস্থানে করা যাইবে। এস্থলে কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে স্বাস্থ্যের এই কল্পনা, কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই আইনের আয়োজনে আমরা দেখিতে পাইতেছি, এক দিকে একটী কল্পনা, অপর দিকে একটী কর। কল্পনা সূক্ষ্ম, সৎ এবং স্বাস্থ্যের কল্পনা,—অতি উপাদেয়; কিন্তু কেবল কল্পনা মাত্র, অনির্দ্দিষ্ট, অনিশ্চিত, ম্যালেরিয়া নিবারণ কল্পে একরূপ "অজগর ভিক্ষা" স্বরূপ। এক দিকে এই; অপর দিকে একটী বৃহৎ কর,—সে কর প্রধানতঃ দেশের দরিদ্র কৃষি-বলের উপর প্রযুক্ত। স্বাস্থ্য সর্ব্বাগ্রে প্রার্থনীয় এবং যথা সর্ব্বস্ব বিনিময়েও তাহা বাঞ্ছনীয় হইলেও, আমাদের আলোচ্য এই আইনে আছে কেবল তাহার একটী অতি অনির্দ্দিষ্ট কল্পনা। তদ্দ্বারা

নিরূপিত করটী কিন্তু কল্পনা নহে। তাহা নিশ্চিত, অতি নির্দ্দিষ্ট কঠোর সত্য;—ম্যালেরিয়ায় মুহ্যমান, বহুকরভারে-ক্লিষ্ট-কঙ্কাল-কৃষক সম্প্রদায়ের শেষ এক বিন্দু শোণিতের সহিত সংমিশ্রিত।

এখন জিজ্ঞাস্য, এ ব্যাপারে তুলাদণ্ডের কোন্ দিক গুরুভারে অবনত,—স্বাস্থ্যের কল্পনা কিম্বা কৃষি-করের দিক? আলোচ্য, স্বাস্থ্যের একটী কল্পনার জন্য, বঙ্গীয় কৃষকের শেষ শোণিত বিন্দু হইতে কর নিষ্কাসিত করা উচিত কিনা?

এ দেশীয় কৃষকের অবস্থা যিনিই যাহা ভাবুন, স্ব স্ব সুখ-স্বপ্নে যিনি যাহাই কল্পনা করুন,—কৃষক সম্প্রদায় সাধারণতঃ নিরন্ন। তাহারা অন্ন উৎপন্ন করে বটে, কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া অন্ন আহার করিতে পায় না। 'সুজন্মার' বৎসর যদি তাহারা ছয়মাস খাইতে পায়, অবশিষ্ট ছয় মাস, একেবারে অনসনে না হউক, অর্দ্ধাসনে থাকে। সুজন্মার বৎসরে এই,—অজন্মার বৎসরের কথা কেবল অনুমেয়। আমাদের এ উক্তি অসত্য নয়, অতিরঞ্জিতও নয়। গবর্ণমেণ্ট কৃষকের দ্বারে কমিসন বসাইয়া, সাক্ষাৎ দর্শনের সাক্ষ্য গ্রহণ যদি করেন, উপরোক্ত উক্তি অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইতে পারে। অন্য কমিশনই বা কেন, পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত ম্যালেরিয়া কমিসনেও (Epidemic Commission) ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। খাদ্য শস্য দুর্ম্মূল্য হওয়াতে কৃষকের অবস্থা সচ্ছল হয় নাই; * প্রত্যুত প্রভূত পরিমাণে অসচ্ছল হইয়াছে। ইহা ইয়ুরোপীয় অর্থশাস্ত্রের যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে কিনা দেখিতে চাই না;—কারণ ইহা দেদীপ্যমান দৃশ্য, হৃদয়-বিদারক ঘটনা;—ইহা প্রত্যক্ষ সত্য! প্রত্যক্ষ সত্যের অন্য প্রমাণের প্রয়োজনাভাব। অবাধ রপ্তানির অশুভ ক্ষণ হইতে এদেশে দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট বৎসরের প্রায় বারমাসই বিদ্যমান। গবর্ণমেণ্টের জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত উভয় প্রকারের দুর্ভিক্ষ, এদেশে হইয়া থাকে, প্রায় বারমাসই লাগিয়া আছে। জ্ঞাত দুর্ভিক্ষ বরং মন্দের ভাল, কারণ গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কিঞ্চিৎ রিলিফের আয়োজন করিয়া থাকেন; কিন্তু অপরিজ্ঞাত দুর্ভিক্ষের দাবানলে প্রতিদিন কত প্রাণী পুড়িয়া মরে, গবর্ণমেণ্ট কি কখনও তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন? পক্ষান্তরে, অন্ন অমিল ও অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য না হইলেও এদেশে দুর্ভিক্ষ হয়। উদাহরণ অধিক দিনের নয়,—এবারকার ফরিদপুর ও ত্রিপুরার দুর্ভিক্ষ। এই দুই স্থলে অন্ন অমিল হয় নাই, অত্যন্ত দুর্ম্মূল্যও হয় নাই; চারিদিক হইতে তথায় চাউল আমদানি হইয়াছে; চাউলের মণ ৩।০ হইতে ৪৲, টাকার অধিক হয় নাই; অথচ তথাকার রায়ত সাধারণ অনশনে কাটাইয়াছে, অন্নকষ্টে হাহাকার করিয়াছে! এ সমস্যা নিশ্চয়ই সুকঠিন। এ সুকঠিন সমস্যা অল্লাধিক পরিমাণে দেশের প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত। ইহাতেই অধিক পরিমাণে বুঝা যায়, দেশ দিন দিন কিরূপ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। অন্ন অমিল হওয়াকেই সাধারণতঃ দুর্ভিক্ষ বলে। গবর্ণমেণ্টের ফেমিন-কোডেও' দুর্ভিক্ষের এইরূপ লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু উপরোক্ত প্রকৃতির দুর্ভিক্ষকে কি বলিবে? অন্ন আছে; অথচ অন্ন ক্রয় করিবার অর্থ নাই। ইহা কি খুব ভয়ানক দৃশ্য নহে! এমন দিন যায় না,—এমন

* সচ্ছল হইয়াছে বলিয়া লেঃ গঃ সার চার্লস বিবেচনা করেন।

গ্রাম এবং পল্লী নাই, যে দিন এবং যে স্থানে আমরা এরূপ ভয়ানক দৃশ্য না দেখিতে পাই। ইতর ভদ্র উভয় শ্রেণীরই গ্রাম্য লোকের গৃহে, কৃষিজীবী স্বয়ং কৃষকের ঘরে এ দৃশ্য বিদ্যমান। কৃষকের শ্রমে শস্য উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কি? সে সবই স্থায্য ও অন্যান্য করের দায়ে কারবারির গোলায় চলিয়া যায়। কৃষক তাহা ক্রয় করিয়া খাইতে বাধ্য। কিন্তু, অর্থাভাব। একমাত্র উপায় দ্বিগুণ ত্রিগুণ স্থধে ঋণ। ঋণ না পাইলে অনাহার।

সাধারণতঃ কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা এই! এক বৎসরের খাদ্য শস্য বাঁধিয়া রাখিতে পারে, এমন কৃষক এদেশে হাজার-করা একজনও আছে কি না সন্দেহ। সেন্‌সাস্ গ্রহণের সময় গবর্ণমেণ্ট যদি এবিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করেন, দেশের অবস্থা অধিকতর সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইতে পারে।

ফলতঃ কৃষকশ্রেণী গ্রাম্য উচ্চতর বর্ণের ভদ্র সম্প্রদায়ের মত অন্নকষ্টে ক্লিষ্ট। প্রত্যুত এই অন্নকষ্ট "সংক্রামক ম্যালেরিয়া জ্বরের" একমাত্র কারণ না হউক, অন্যতম প্রধান কারণ। অবরুদ্ধ পয়ো-প্রণালী যদি ম্যালেরিয়া সৃষ্টির একটী কারণ হয়, তবে তদ্দ্বারা সংহারের অতি প্রধান, এমন কি একমাত্র কারণ অন্নকষ্ট। প্রথমোক্ত কারণটী কল্পিত; কিন্তু শেষোক্তটী সাক্ষাৎ দৃষ্ট। অবরুদ্ধ পয়োপ্রণালী অনিষ্টকর, অস্বাস্থ্যকর, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতেই যে ম্যালেরিয়া জন্মে, ইহা অদ্যাবধি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রমাণিত হয় নাই। কখনও প্রমাণিত হইবে কিনা, সে বিষয়েও ঘোর সন্দেহ। পক্ষান্তরে, অন্নকষ্টে—অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে, পরন্তু অসার ও অস্বাস্থ্যকর আহারে, ম্যালেরিয়া উত্তেজিত ও আকৃষ্ট হয়,—এবং তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঔষধ পথ্যের অভাবে অধিক লোক মরে, ইহা সকলেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং দেখিতেছেন। ম্যালেরিয়ার কারণ অনুসন্ধান কল্পে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত উচ্চপদস্থ, প্রবীণ এবং বিচক্ষণ রাজপুরুষগণ স্বয়ং ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

ডাক্তার লেথব্রিজ সাক্ষ্য দিয়াছেন, কর্ণেল্ হেগস্ দিয়াছেন। ডাক্তার সণ্ডারস্ ওজস্বিনী ভাষায় ইহা বিবৃত করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট-রেজলিউসনে এ কথা ব্যক্ত আছে। বর্ত্তমান বঙ্গাধীপ বেঙ্গল স্যানিটারি ড্রেণেজ বিলের কর্ত্তা স্বয়ং স্যর চার্লস্ ইলিয়ট * অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করিতে সমর্থ হন নাই।

ডাক্তার লেথব্রিজ ও সণ্ডারস্ এবং কর্ণেল হেগস্ সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, অন্নকষ্ট অনুপযুক্ত ও অপর্য্যাপ্ত আহার-জনিত ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব ও প্রকোপ। কেবল ইহাই নহে। ইহাঁরা অবরুদ্ধ পয়োপ্রণালী (obstructed drianage) জনিত ম্যালেরিয়া জ্বরের কল্পনা একেবারেই অস্বীকার করিয়াছেন। ইহাঁদের বহুদর্শনে ও বিবেচনায় অবরুদ্ধ ড্রেণের দরুণ ম্যালেরিয়া জন্মে নাই; তাহার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধানীয়। পরন্তু, ম্যালেরিয়ার এতাধিক প্রাদুর্ভাব এবং তদ্দ্বারা অসংখ্য লোকের মৃত্যু, লোক সাধারণের অন্নকষ্টাতিশয্যেই ঘটিয়াছে। ইহাঁরা স্ব স্ব অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, যে স্থলে অবরুদ্ধ পয়ো-প্রণালী, নিম্ন-ভূমি এবং তন্নিবন্ধন সর্ব্বদা সলিল-সিক্ত নিম্নস্থ মৃত্তিকা, হয় ত

* সচ্ছল হইয়াছে বলিয়া লেঃ গঃ স্যর চার্লস ইলিয়ট বিবেচনা করেন।

সে স্থলে ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভূত হয় নাই; অথচ অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ও অনবরুদ্ধ পয়োনালী সংযুক্ত অঞ্চলে ম্যালেরিয়া জ্বর মহা তেজে মানুষ মানুষী আক্রমণ করিয়াছে। অতএব ইহাঁদের মতে, অবরুদ্ধ পয়োনালী জনিতই যে ম্যালেরিয়া, এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া আদৌ সুসঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে, অন্নকষ্ট, অপর্য্যাপ্ত আহার ও ঔষধ পথ্যের অভাবে ম্যালেরিয়ার মহামারি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, ইহা ইহাঁদের সাক্ষাৎদৃষ্ট ঘটনা।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে ডাক্তার লেথব্রিজের অভিমতের উল্লেখ করিয়া গবর্ণমেণ্ট-রেজলিউসনে লিখিত হইয়াছিল ঃ—

"Dr. Lethbridge is unable to accept the view that dampness of subsoil could be the sole and only cause of the fever. * *" Bengal Govt. Resolution, Dated 31-7-77.(১)

পরন্তু, ডাক্তার লেথব্রিজ ১৮৭৭ সালের ম্যালেরিয়া কমিসনের সভাপতি স্বরূপ, তদীয় রিপোর্টে লিখেন :—

"The poor condition of the people, the practice of steeping jute &c., as causes which in a measure influenced fever out-breaks" (২)

কর্ণেল হেগ বলেন :—"* * I do not look upon drainage *per se* as a complete cure or even as the principal means of cure, for the fever which has so desolated the Hooghly and Burdwan Districts. * * * * The excessive mortality must be due to the failing stamina of the population generally, to a de-generation and loss of vital energy which render them less capable of resisting the moribific influences to which they have always been exposed. And I conceive that this is due chiefly to the increase of population having out-stripped the means of production, to an impoverished and under-fed condition of the great mass of the people; in fact, that we now witness the last stage of that process (hastened in this instance by unhealthy conditions of climate, and perhaps also by excessive rents) by which our population, in the absense of any special counteracting or remedial measures works its own cure." Note on the drainage of the Hooghly District of the 27th February, 1873. By Col. Haig. as quoted in the Hindoo Patriot. (৩)

ডাক্তার সণ্ডার্স লিখেন;—"It is sudden variations of temperature and variations in the hygromatric condition of the air * * that is so trying to the impoverished,—half-clad and underfed inhabitants of these provinces. * * * I have frequently gone into a home-stead and examined the daily meal,—usually one meal a day only—and that consisting of little rice, with what is called vegetable curry but consisting of 3 or 4 chuttacks of *Sag* and half an anna of oil for the whole family and this was the ordinary daily food." Dr. G. Saunder's report as Deputy Inspector General, dated March 1872, as extracted by H. P. (৪)

পরন্তু, স্বয়ং লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যর চার্লস ইলিয়টও বলিয়াছেনঃ—

"No doubt it (malaria) might be aggravated by poverty"—Vide His Honor's speech at Dacca. July, 1894. (৫)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, অবরুদ্ধ পয়োনালী হইতে ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয় এবং পয়োনালী পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত হইলে ম্যালেরিয়া থাকিবে না,—ইহা কেবল একটী কল্পনা নহে, এ কল্পনা সম্বন্ধে সর্ব্বথা মত ভেদ

---

(১) নিম্ন মৃত্তিকা সিক্ত ও সর্দ্দিযুক্ত হওয়াই যে ম্যালেরিয়া জ্বরের একমাত্র কারণ ডাক্তার লেথব্রিজ এ মত গ্রহণ করিতে পারেন না।

(২) লোকের দরিদ্রতা জনিত হীন অবস্থা, পানীয় জলে পাট পচান প্রভৃতি কারণে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রাদুর্ভূত হওয়ার কতক কারণ।

(৩) যে জ্বরে হুগলি ও বর্দ্ধমান জিলা ধ্বংস করিয়াছে, ড্রেণেজ দ্বারা আদৌ তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আরোগ্য হওয়ার উপায় বিধান হইবে, আমি এমন বিবেচনা করিনা। (উদ্ধৃতাংশের অবশিষ্ট টুকুর মর্ম্মানুবাদ উপরে দেওয়া হইল।)

(৪) বায়ুর আকস্মিক পরিবর্ত্তন ও নিরতিশয় সিক্ততা দারিদ্র্যে দুর্ব্বল, লোকের অর্দ্ধাবৃত অঙ্গে, অল্প ও অপ্রচুর আহার ক্ষীণদেহে সাংঘাতিকভাবে কার্য্য করে; সুতরাং তাহারা অতি সহজেই এই জ্বরাক্রান্ত হয়। (অবশিষ্ট অংশের মর্ম্মানুবাদ প্রবন্ধের স্থানান্তরে দেওয়া হইল।

(৫) ম্যালেরিয়া জ্বর নিশ্চয়ই দরিদ্রতা দ্বারা বর্দ্ধিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিদ্যমান। ডাক্তার লেথব্রিজ, সণ্ডারস প্রভৃতি বড় বড় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক পয়োনালী কল্পনা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতেই সম্মত নহেন। কিন্তু এ কল্পনা, অন্ততঃ আমরা একেবারে অস্বীকার করিতেছি না। কেন, তাহা পরে বলিব। এ স্থলে কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে, কল্পনা কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না এবং ম্যালেরিয়া প্রসঙ্গে এই পয়োনালী কল্পনা সম্বন্ধে সমূহ মতভেদ আছে। কিন্তু, অন্নকষ্টে এবং অপ্রচুর আহারে, এক কথায় দারিদ্র্যের তীব্র দংশনে ম্যালেরিয়া বীজ সৃষ্ট না হউক, তাহা যে বিপুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়,ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত; ইহাতে মতভেদ মাত্র নাই। পয়োপ্রণালীর একান্ত পক্ষপাতী স্যরচার্লস নিজেও একথা অস্বীকার করেন না। পয়োপ্রণালী কল্পনার প্রধান প্রবর্ত্তক স্বয়ং রাজা দিগম্বর মিত্রও ইহা অস্বীকার করেন নাই। ম্যালেরিয়া তথ্যানুসন্ধানের কোনও কমিসনের কোনও মেম্বরই কখনও দেশের নিদারুণ দরিদ্রতা এবং তন্নিবন্ধন ম্যালেরিয়ার মহামারি ও মৃত্যুর আধিক্য, একথা অস্বীকার করেন নাই; প্রত্যুত উহা একটী প্রধান কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"অসার এবং অপ্রচুর আহারে লোক-সাধারণের শরীর জীর্ণ শীর্ণ, ক্রমে কঙ্কাল সার হইয়া এবং জীবনের জীবনী শক্তি বিকৃত ও হ্রাস হইয়া দূষিত জল বায়ুর অবসাদময়ী শক্তি নিচয় প্রতিরোধ করিতে পারে না, কাজেই তাহাতে করিয়া অনেক লোকের মৃত্যু হয়; অতএব ম্যালেরিয়ার অত্যধিক মৃত্যু সংখ্যার জন্য দেশের দরিদ্রতাই দায়ী।"—ইহা আমাদের নিজের কথা নহে; গবর্ণমেণ্টের নিজের বিশ্বাস্য কর্ম্মচারী কর্ণেল হেগের কথা। পরন্তু,—

"অত্যধিক করভার-নিপীড়িত প্রজাপুঞ্জ, প্রজাপুঞ্জের সংখ্যাধিক্য, উৎপন্ন দ্রব্যের অপ্রাচুর্য্য, অতএব অপর্য্যাপ্ত আহার; তাহার উপর জলবায়ুর অস্বাস্থ্যকর অবস্থা;—মহামারির মৃত্যু দ্বারা লোক সংখ্যা হ্রাস করিয়া প্রকৃতি সাংঘাতিক অবস্থার এই শেষ স্তরে আত্মকার্য্যই সাধন করিতেছে।"

ইহাও আমাদের নিজের উক্তি নহে; উপরি উদ্ধৃত উক্ত কর্ণেল সাহেবের উক্তি। অপিচ,—

"দরিদ্র রায়তের দিন রাত্রে সাধারণতঃ এক বারের অধিক আহার জুটিবার সংস্থান নাই। অল্পপরিমাণে অন্ন ও কাঁচ্চামাত্র তৈলে সিক্ত তিন চারি ছটাক শাক ছেঁচকি সচরাচর তাহাদের সমগ্র পরিবারের দৈনিক আহার্য্য"

এ কথাও আমাদের নিজের নহে; সরকারী কর্ম্মচারী ডাক্তার সণ্ডারস স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ইহা লিখিয়া গিয়াছেন। রাজপুরুষদিগের কথা রাজদ্বারে অধিকতর বিশ্বাস্য, এই জন্যই আমরা তাহা উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করিয়াছি; নহিলে তাহার কিছু মাত্র আবশ্যকতা ছিল না। নিজে আমরা এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রাতেই অবগত আছি; অষ্টপ্রহরই অনুভব করিতেছি।

ফলতঃ অন্নকষ্টে ম্যালেরিয়াকে অধিকতর কঠোর করে, তদ্দ্বারা ম্যালেরিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং রায়ত সাধারণ অন্নকষ্টে ক্লিষ্ট; ও অন্নকষ্টে ক্লিষ্ট বলিয়াই ম্যালেরিয়া দ্বারা অধিকতর দষ্ট, ইহা সর্ব্ববাদী স্বীকৃত,—ইহাতে মতদ্বৈধ নাই। পরন্তু, উপস্থিত করভারের উপর স্বাস্থ্যের নামে পুনঃ আর একটা কৃষিকর বসিলে, অন্নকষ্ট এখন যেরূপ আছে তাহা অপেক্ষা অধিকতর বাড়িবে ইহা সহজ কথা। এ কথা বালকেও বুঝে। পুনশ্চ অন্নকষ্ট বৃদ্ধির অনুপাতে ম্যালেরিয়া ও তন্নিবন্ধন মৃত্যু সংখ্যা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি হইবে, ইহা আমরা এই মাত্র প্রতিপন্ন করিলাম। অতএব যে ম্যালেরিয়া হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য

এই স্যানিটারী ড্রেণেজ বিলের ব্যবস্থা, সেই ম্যালেরিয়াই এ ব্যবস্থায় নিবারিত না হইয়া অধিকতর বর্দ্ধিত হইবে, অগত্যাই ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। সুতরাং এই বিল, এই হিতে-বিপরীত ফল-প্রদ ব্যবস্থা কি রূপে সমর্থনীয় হইতে পারে। ফলতঃ সরকারের সদুদ্দেশ্য ব্যতীত, এই বিলে আদ্যোপান্ত আর কিছুই সমর্থনীয় নাই। বেঙ্গল স্যানিটারী ড্রেণেজ বিল একটী অভিনব কৃষিকরের নামান্তর মাত্র। কৃষকের স্বাস্থ্যের নাম করিয়া, সমগ্র দেশের স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়া কৃষক-সমাজের উপর এই কঠোর-কৃষিকর বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

সুতরাং সদুদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক অনুষ্ঠান প্রজা মাত্রের সমর্থনীয় হইলেও, উপরোক্ত ও ক্রমে নিম্নে প্রদর্শিত কারণ পরম্পরায়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এই স্যানিটারি ড্রেণেজ বিল আদৌ সমর্থন করিতে পারি না। ইহা আইনে পরিণত করিয়া প্রবর্ত্তিত করিবার পথে গবর্ণমেণ্টকে সহায়তা করিবার জন্যও কোনও সৎযুক্তি ও সৎপরামর্শ খুঁজিয়া পাইতেছি না। যে রূপ ভাবে এই বিল প্রস্তুত হইয়াছে ও পরে স্যর চার্লস কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাতে উহার প্রতিবাদ করা ভিন্ন, কোনও পরামর্শ দেওয়া আদৌ সম্ভবে না। এই বিল একেবারে প্রত্যাহার করা অথবা ইহার আমূল পরিবর্ত্তন করাই সুপরামর্শ। নহিলে ইষ্টের পরিবর্ত্তে রাজ্যের মহা অনিষ্ট হইবে, ইহা নিশ্চয়। তবে ম্যালেরিয়া নিবারণ কল্পে নিশ্চেষ্ট থাকিতেও আমরা বলিতে পারি না; নিবারণ করার চেষ্টা সর্ব্বথা প্রয়োজন। কিন্তু কৃষকের শেষ শোণিতবিন্দু দ্বারা নহে।

এই বিলের এখন কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিলখানি ক্ষুদ্র বটে; কিন্তু বিষয়টী বিস্তীর্ণ। স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক প্রশ্ন, বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক গঠন, তথা লোক-সাধারণের অবস্থা, জমিজমার উপসত্বের ভাগ বিভাগ, রায়ত জমিদারের সম্বন্ধ, নানা দিক দিয়া এই বিল আলোচ্য। প্রথমতঃ ইহার ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয়তঃ ইহার মূল তত্ত্ব, তৃতীয়তঃ এই বিলের গঠন, চতুর্থতঃ ইহার উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা, পঞ্চমতঃ ইহার ন্যায় নিষ্ঠার পরিমাণ, ষষ্ঠতঃ ইহার কর ও তাহার ব্যবহার, সপ্তমতঃ এই বিলের ফলাফল; এতদুপলক্ষে রাজনীতি ও প্রজানীতির গতি অনেক কথাই আলোচ্য। কিন্তু, সব কথার সম্যক আলোচনার স্থান হইবে না। সংক্ষেপে যত দূর হইতে পারে, চেষ্টা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ ইহার পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত কিরূপ, কিঞ্চিৎ দেখা যাউক। আক্ষেপের বিষয়, এই বিলের আন্দোলনে অদ্যাবধি কোনও লেখক ইহার আদি ইতিবৃত্ত-ঘটিত কথা উদ্ঘাটিত করেন নাই। অন্ততঃ লোক সাধারণের জ্ঞাতার্থেও তাহার আবশ্যকতা আছে।

পৃথিবীর ইতিবৃত্তে মহামারির ভীষণ চিত্রের অভাব নাই। সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত পুষ্কর ও বিসূচিকা ব্যাধির বিষম তরঙ্গে পৃথিবীর এক এক স্থল একেবারে প্রাণীশূন্য হইত। প্রাচীন আথেন্স নগরে বিষম জ্বর-রূপী "প্লেগের" বর্ণনা থাইসিডাইডিস রাখিয়া গিয়াছেন। ডিফোঁ-বর্ণিত লণ্ডনের মহামারি ও বোকাসিও-বর্ণিত ফ্লরেন্সের প্লেগ-বৃত্তান্ত সাহিত্যে বিখ্যাত,—এক কথায় তাহা লোমহর্ষণ। গৌড় নগর, প্রাচীন বঙ্গের বৃহৎ, বহুজনপূর্ণ, সমৃদ্ধিশালী রাজধানী, শৌর্য্য বীর্য্য

আনন্দ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বঙ্গের লক্ষ্মণাবতী দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীতে গৌরব গরিমার রাজপতাকা উড়াইয়া, কি এক সাংঘাতিক ব্যাধি-বীজে সপ্তাহকাল মধ্যে সংহারের শূন্যত্বে পরিণত হইয়াছিল!! * এই মহামড়কে পর্ণকুটীরের প্রজার ন্যায় রাজসিংহাসনে রাজা মরিয়াছিলেন। ইতিহাসাভিজ্ঞ জানেন সে নেহাত অধিক কালের কথা নয়; তিনশত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক বৎসর মাত্র হইয়াছে। কিন্তু তদবধি গৌরবান্বিত গৌড় নগর পরিত্যক্ত, পতিত, অরণ্যময়, বন্যপশুর বিলাসভূমি;—গৌড়ের পুনরুত্থানের আর আশা নাই। কিন্তু তবুও, ইহা প্রাচীন কালের কথা। এ মুহূর্ত্তে হঙকঙ্ হইতে মহামারির যে সকল সাংঘাতিক সংবাদ আসিতেছে, তাহা শুনিয়া কে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন? তাহা একদিকে হৃদয়বিদারক, অপর দিকে বিভৎস। বিজ্ঞানের বিপুল উন্নতি সত্ত্বেও প্রকৃতির এই সকল প্রচণ্ড সংহার-লীলার প্রকৃত কারণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

একালের মহামারির বদ্ধমূল ব্যাধি,—কলেরা ও ম্যালেরিয়া। ইহাদের উভয়েরই বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ার বাঙ্গালা নাম অভিধানে নাই,—অদ্যাবধি উদ্ভাবিত হয় নাই। বোধ হয় কখনও হইবে না। ইংরেজের আমলের রোগ ইংরেজী নামেই বাঙ্গালীর দেশে বিরাজ করিবে। কলেরা মহাকালের খাড়া ওয়ারেণ্ট; বেঙ্গল পুলিসের A Form এর চালান। ম্যালেরিয়া যদি কলেরার জ্যেষ্ঠ না হয়, অব্যবহিত কনিষ্ঠ সহোদর! কিন্তু কলেরা অপেক্ষা কুটিল, কুৎসিৎ।

* রাজা দিগম্বর মিত্র বলেন, ম্যালেরিয়া জ্বরে গৌড় ধ্বংস হইয়াছিল, ম্যালেরিয়া এদেশে নেহাত নূতন নয়, তাঁহার মতে।

ডাক্তার ইলিয়ট বলেন;—It was as bad as, if not worse than cholera. ইহা যথার্থ কথা। ম্যালেরিয়াল জ্বরের লক্ষণ কি, আমরা বিবৃত করিতে বসিব না। সে লক্ষণ বাঙ্গালার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সবিশেষ অবগত আছেন। কিন্তু এই বিষম জ্বর কবে হইতে, কিরূপে, এ দেশে ব্যাপ্ত হইল?

ম্যালেরিয়া আমাদের ইংরাজ রাজের এই ঊনবিংশ শতাব্দীর অভিসম্পাৎ। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে,—১৮০৪ সালে, বহরমপুরে ইহা প্রথম দেখা দেয় বলিয়া কথিত। ২০ বৎসর পরে (১৮২৪-২৫ সাল) ইহার দ্বিতীয় আক্রমণ যশহরে। মহম্মদপুর, নলডাঙ্গা এবং এলেনখালি ও চিত্রা নদী তীরস্থ স্থান নিচয় নিদারুণ ভাবে আক্রান্ত হয়। ১৮৪০ সালে এই মহাজ্বর গধখালি নামক গণ্ডগ্রাম জনশূন্য করে। গধখালী হইতে উহা তীরবেগে ছুটে, বহুস্থানে ব্যাপ্ত হয়, বহু গ্রাম বিপর্য্যস্ত করে। উলায় গিয়া পৌঁছে, ১৮৫৬ সালের বর্ষাকালে। উলা গ্রাম উজাড় হয়, শান্তিপুরও হয়। পর বৎসর উহা চাকদহে যায়। চাকদহ হইতে কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর, নৈহাটী ও তন্নিকটস্থ গ্রাম কি গ্রাম গ্রাস করে। ১৮৬০ সালে ত্রিবেণী হইয়া কালনায় যায়,—বর্দ্ধমান জিলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তখন ইহার নাম ছিল "নূতন জ্বর"—সাহেবেরা বলিতেন;—Burdawn Fever, কাঁচড়াপাড়া ও হালিসহরের বর্ত্তমান মূর্ত্তিও যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারেন, ম্যালেরিয়া তথায় কি বিভ্রাট ঘটাইয়া, আজও ঘরে ঘরে ঘুরিতেছে। ভিটা কি ভিটা উজাড়; পাড়া কি পাড়া পয়মাল। বড় বড় অট্টালিকা বন জঙ্গলে

পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পাহাড় প্রমাণ ইষ্টক-স্তূপ, ভাঙ্গা আধভাঙ্গা ইষ্টকালয় জঙ্গলের মধ্যে; এক একখণ্ডে, এমন কি ২০।৩০ বিঘা করিয়াও ভূমি এইভাবে পড়িয়া রহিয়াছে;—মনুষ্য নাই। কতক ম্যালেরিয়ার উদরে গিয়াছে, কতক তাহার ভয়ে পৈতৃক স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইয়াছে। কাঁচড়াপাড়ার কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের বাড়ী দেখিতে গিয়াছিলাম। দিব্য দোতালা বাড়ী। জনপ্রাণীশূন্য জঙ্গলময়! এই অট্টালিকা ও উহা যে পল্লীতে অবস্থিত, তাহার শ্মাশানিক অপ্রফুল্ল অবস্থা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই; সে দৃশ্য এমনি পীড়াদায়ক।

১৮৬০ সালের ঘটনা উপরে বিবৃত হইয়াছে। ১৮৬১-৬২ সালের ইতিবৃত্ত অধিকতর ভীষণ। ১৮৬১ সালে উত্তর ও পশ্চিমদিকে দ্বারবাসিনী হইতে বর্দ্ধমান, এবং পূর্ব্বদিকে বারাসত ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান ব্যাপিয়া ম্যালেরিয়া একাধিপত্য করে। ত্রিবেণী, কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর প্রভৃতি গ্রাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আক্রান্ত হয়। এক একটী পরিবার একেবারে উৎসন্ন হইয়া যায়; বংশে বাতি দিতে লোক থাকে না। সহস্র সহস্র লোক মরে; দলে দলে লোক দেশ ছাড়িয়া পলায়। শত শত লোক এই বিষম জ্বরে আক্রান্ত হইয়া গৃহে পড়িয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে থাকে। কবিরাজী, ডাক্তারি এবং দৈব চিকিৎসা, মন্ত্র তন্ত্র, পূজা অর্চ্চনা, একে একে নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়া সবই বিফল হয়; কিছুতে কিছু হয় না। ম্যালেরিয়া অপরাজেয়, মনুষ্য-বুদ্ধিবিদ্যার উদ্ভাবিত উপায়ে আরোগ্যের অতীত বলিয়া প্রতীত হয়। লোক সাধারণ আতঙ্কে অস্থির, অবসন্ন; নিরাশ, রোগাক্রান্ত-জীবনভার-পীড়িত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়; মাজিষ্টর, কলেক্টর, কমিসনরেরা ব্যস্ত হইয়া পড়েন। চারিদিকে হাহাকার উঠে। বৎসরের শেষে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন, সরকার হইতে ঔষধ বিতরণ ও ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য বেঙ্গল গবর্নমেণ্টে আবেদন করেন। সরকার হইতে ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ম্যালেরিয়া তাহাতে একটা বিভৎস হাসি হাসিয়া, পর বৎসর (১৮৬২ সালে) অধিকতর আবেগ সহকারে আত্ম রাজত্বের বিস্তার করে। দেশ মধ্যে মহা জ্বরের উত্তাল তরঙ্গ উঠে। উত্তরাঞ্চলে, পশ্চিমে, কাটোয়া ও পূর্ব্বে মেহেরপুর এবং দক্ষিণাংশে,—এক দিকে দ্বারবাসিনী ও অপর দিকে গোবরডাঙ্গা; পরন্তু আরও দক্ষিণে খড়দহ ও বেলঘরিয়া ব্যাপিয়া, ম্যালেরিয়া বিদ্যুৎ বেগে ছুটে। বহু গ্রাম, নগর, পল্লী ধ্বংস হইয়া যায়। কালনা গ্রাম জনশূন্য হয়। দ্বারবাসিনী হয়। কোনও গ্রামেই প্রায় এমন পরিবার ছিল না যাহার কতক লোক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় নাই। বহু বংশ লোপ হইয়া বাস্তুভিটা শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। প্রত্যেক গৃহের "পিঁড়ায়" প্রাঙ্গনে "পাটেপাট" রোগী শায়িত, কঙ্কালাবশেষ, কাহারও বা কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত;—সে করুণ দৃশ্য বর্ণনাতীত! বর্দ্ধমান সহরে প্রতি দিন শত শত লোক মরিয়াছিল। শব দেহের সৎকার হয় নাই; দাহ হয় নাই। শকটে পূরিয়া শবদেহ সাফ করিতে হইয়াছিল। অনেক গ্রামেই শবদেহের শ্মশান-সৎকার হয় নাই; গৃহ হইতে বাহির করারই লোক হয় নাই। গৃহ হইতে শৃগাল কুকুরে তাহা টানিয়া খাইয়াছিল। এসব একটীও কল্পিত ও অতি-

রঞ্জিত কথা নয়। সরকারী কাগজপত্র হইতে সঙ্কলিত। উলা শান্তিপুর উৎসন্ন হইয়াছিল, অগ্রেই বলিয়াছি। কাঁচড়া পাড়ায় তিনহাজার অধিবাসীর প্রায় দেড় হাজার মরিয়াছিল। হালিসহর দীর্ঘে প্রস্থে তিন ক্রোশ ব্যাপী বৃহৎ গ্রাম। বহু পরিবার, বহু লোকের বাস; অগণিত লোক মরিয়াছিল, বহু লোক পলাইয়াছিল, সুবৃহৎ সহরটী ভীষণ শ্মশান দৃশ্যে প্রতীত হইতেছিল! এই সকল গ্রামের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকাইয়া নদীয়ার ডিবিসনাল কমিসনর লিখিয়াছিলেন ;—

"প্রত্যেক গ্রামেই কত কত গৃহ-ভদ্রাসন শূন্য পড়িয়া আছে ; মৃত্যু উহা শূন্য করিয়াছে ; মহামারির অভিসম্পাৎ এড়াইবার জন্যও কত গৃহস্থ গৃহ-ভদ্রাসন শূন্য করিয়া অন্যত্র গিয়াছে। যত লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাদের প্রায় প্রত্যেক লোকেরই এক একটী করুণ কাহিনী আছে, তাহাদের কাতর কঙ্কালসার মূর্ত্তি সে কাহিনীর সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। প্রত্যেকেরই স্ব স্ব যাতনার এক একটী করুণ কাহিনী আছে ; আর আছে মৃত্যুর এক একটী তালিকা ;— পিতা মাতা, পত্নী, পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন, এই তালিকাভুক্ত, যমালয়ে নীত। কোন কোনও গ্রামে এক তৃতীয়াংশের অধিক লোক নিশ্চয়ই মারা পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হালিসহরের দুইটী সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে আমি সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াছি যে, এখন যে সকল পরিণত বয়স্ক লোক জীবিত আছে, তাহারা এতাধিক জীর্ণ ও জীবনীশক্তি-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং সে জীর্ণতা ও জীবনী শক্তিবিহীনতা এরূপ সর্ব্বব্যাপী যে, স্বাভাবিক নিয়মে জন সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার পথও প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।"

এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৬২সালে ম্যালেরিয়ার একটা কারণ কল্পিত হয় এই যে, কোনও অজ্ঞাত কারণে ভাগিরথীর জল দূষিত হওয়াতেই তত্তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে ম্যালেরিয়া হইতেছে। কিন্তু এই কল্পনা টিঁকে নাই। কারণ, এই জ্বর যে কেবল ভাগিরথী বা হুগলী নদীর তীরস্থিত স্থানে হইতেছিল, তাহা নহে। এই নদীতট হইতে বহু বহু দূরে, হুগলী ও ২৪ পঃ জিলার অতি অভ্যন্তরস্থ ও সীমান্ত পল্লীতেও হইতেছিল। অথচ এই নদীতটস্থ দুইচারি স্থলে হয়ও নাই। পুনঃ আর এক কল্পনা হইয়াছিল এই যে, পল্লী-গ্রামের অস্বাস্থ্যকর আবর্জ্জনা, বন জঙ্গল বাঁস ঝাড়, সুগাছা ও কুগাছার আওতা, বন বাদাড়ের পচানী ও পানাপুকুরের পলিত জল হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইতেছে। পল্লীগ্রাম মাত্রই সাধারণতঃ অপরিষ্কার, পরিষ্কার করার প্রথা আবহমান কাল হইতে নাই ; তজ্জন্যই ম্যালেরিয়া রোগ দেখা দিয়াছে। এ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া কত কত পল্লীর গাছ গাছড়া বন বাদাড় কাটা হয়, আগাছার সঙ্গে, ভাল ভাল গাছও মারা পড়ে। কিন্তু এ কল্পনাও সবিশেষ বিশ্বাস্য হয় নাই। কেন না, গাছ পালা বাঁস বাগান পানা পুকুর বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে চিরকালই আছে ; অথচ এরূপ জ্বর আর কখনও ছিল না ; পরন্তু, যে সব গ্রাম অনতিকাল পূর্ব্বে খুব স্বাস্থ্যকর বলিয়া পরিচিত ছিল তথায়ও এই জ্বর বিদ্যমান ; তা ছাড়া বন বাগান বিহীন নদীর চরের উপর অবস্থিত কত গ্রামেও ম্যালেরিয়া হইয়াছিল।

১৮৬৩ সালে বৃষ্টিপাত কম হয়, জঙ্গলও কাটা হইয়াছিল। এবৎসর পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যেন কিছু কম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান। কিন্তু, সাধারণের ভীতি কমে নাই। মৃত্যুও লোকের কম হয় নাই। পাণ্ডুয়ার এলাকায় ছয়মাসে শতকরা ২৫ জন করিয়া লোক মরিয়াছিল। একজন

রাজপুরুষ রিপোর্ট করিয়াছিলেন "এই রোগ নিবারণের কোনও উপায় অদ্যাপি অবলম্বিত হয় নাই এবং মনুষ্য অবলম্বিত কোনও উপায়ে আদৌ ইহা নিবারিত হইতে পারে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ"। অপর এক রাজপুরুষ কমিসন বসাইয়া ইহার আমূল অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ করেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনও আবেদন দ্বারা কমিসন তদন্তের জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন।

১৮৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে "এপিডেমিক ফিবার কমিসন" নিযুক্ত হয়। তিন জন সাহেব ডাক্তার, একজন সাহেব সিবিলিয়ান এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার নির্ব্বাচিত রাজা (তখন বাবু) দিগম্বর মিত্র এই কমিসনের সদস্য নিযুক্ত হয়েন। কমিসন হুগলি, বর্দ্ধমান, নদীয়া, ও ২৪পরগণা জিলার ম্যালেরিয়া পীড়িত অনেক স্থানে যাইয়া তদন্ত করেন। কমিসনের কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম জ্বরের নিদান স্থির ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া জ্বরাক্রান্ত জন সাধারণের ক্লেশ নিবারণ করা; দ্বিতীয়,—জ্বরের মূল কারণ নিদ্ধারণ করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট দেওয়া। প্রথমোক্ত কার্য্য সম্বন্ধে কমিসন তখন যাহা কিছু করণীয় হইতে পারিয়াছিল তাহা সবই অবশ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তদ্দ্বারা যে ক্লেশ নিবারণের আশা খুব কমই ছিল, তাহাও স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। এই জ্বরের হটকারিতা ও চিকিৎসাতীত উগ্রতা সম্বন্ধে কমিসন লিখিয়াছিলেন,—

"It must be borne in mind that, do what we may, the disease must run a certain course, which is neither to be accelerated, nor retarded by any means within our reach."

শেষোক্ত কার্য্য ব্যপদেশে কমিশন এই জ্বরের নিম্নলিখিত কারণ নির্ণয় করিয়া রিপোর্ট করেন;—

(১) Miasm অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার বিষবাষ্প; (২) Polluted drinking water অর্থাৎ পলিত পানীয় জল; (৩) Vitiated air and deficient ventilation অর্থাৎ দূষিত বায়ু ও বায়ু চলাচলের ব্যাঘাৎ; (৪) excessive use of farinacious food অর্থাৎ মণ্ড আহার্য্যের অতিরিক্ত ব্যবহার; (৫) contagion to a slight extent অর্থাৎ অত্যল্প মাত্রায় সংক্রামতা। *

কমিসনের অনুসন্ধানে ম্যালেরিয়া জ্বরের ঐ কারণ পঞ্চ পরিকল্পিত হয়। ১ম কারণ অর্থাৎ ম্যালেরিয়া বা তজ্জনিত বিষবাষ্প দূরিকরণ কল্পে কমিসন দেশের স্বাভাবিক পয়োপ্রণালী (যাহা রেলরোডে অবরুদ্ধ ও কালক্রমে দূষিত হইয়া গিয়াছে) সংস্কারের প্রস্তাব করেন। কমিসন লিখেন;—

"জ্বরোৎপাদক ম্যালেরিয়া বা বিষবাষ্প যথাসম্ভব দূরীকরণ বা হ্রস্বীকরণ প্রথম প্রয়োজন। বর্ষার পর জলসিক্ত ভূমি, মৃত্তিকা শুষ্ক হইবার সময় এবং সেই প্রক্রিয়ায় সিক্ত মৃত্তিকা হইতে বিষবাষ্প ম্যালেরিয়া উদ্গীর্ণ হয় এবং তাহাতেই জ্বর জন্মে। অতএব মৃত্তিকা যাহাতে শীঘ্র ও সহজে শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা করা প্রয়োজন। তাহা করিতে হইলে, দেশের পয়োপ্রণালীর সংস্কার ও উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। পলি ও বালি পড়িয়া খাল ও নদী প্রবাহ খর্ব্বীকৃত হওয়াতে এবং ঢালুভূমি ক্রমে সমতল হইয়া যাওয়াতে, পয়োণালী অর্থাৎ গ্রাম্য জল নিকাশের পথ অবরুদ্ধ হইয়া

* এই কমিসন ম্যালেরিয়া জ্বরের সংক্রামকতা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন নাই। বরং অনেকাংশে অস্বীকারই করিয়াছিলেন; কমিসন লিখেন;—"Our enquiries have not established the contagious nature of this fever. * * * Viewing contagion in the widest meaning usually attached to the term we have no sufficient grounds for stating that it is characteristic of the present fever. Still it is highly probable that the disease may be directly communicated by the effluvia of numerous sick persons congregated together in small ill ventilated houses."

গিয়াছে। পরন্তু, রেলরোড হইয়া নদীতীরস্থ গ্রাম নিচয়ের জল নিকাশের পথ নদীর উভয় তীরেই রোধ করিয়াছে; ইহাও অবধারণ করিতে আমরা কাঠিন্য অনুভব করি নাই; কেন না নদী তীরস্থ গ্রামের জল বহির্গত হইবার স্বাভাবিক পথ ভূমধ্য প্রসারী গ্রামস্থ অর্থাৎ গ্রামের ভূমির উপরি পতিত বর্ষার জল নিকটস্থ নদী খাল বা বিলে অথবা নদ্যাদির অভাবে গ্রামের বহিস্থ পুষ্করিণী নালা বা ঝিলে সটান যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তদর্থে খোলা পয়োনালী প্রস্তুতের জন্য আমরা সবিশেষ অনুরোধ করি।"

ইহা ভিন্ন এই কমিসন ম্যালেরিয়া প্রশমন কল্পে আরও কতকগুলি পরামর্শ দেন। তাহা, (১) জঙ্গল পরিষ্কার, (২) পুষ্করিণী সংস্কার, (৩) নিম্নস্থ মৃত্তিকার জল নিকাশের নালী গঠন, (৪) গ্রাম্য গৃহ-সংস্কার, (৫) গ্রামের বাহিরে গোরস্থান নির্ব্বাচন এবং (৬) স্বাস্থ্যকর দ্রব্যের আহার।

এই ছয়টী এবং উপরে পাঁচটী সর্ব্বশুদ্ধ ১১টী কারণ স্থির করিয়া উহা নিরাকরণার্থে ম্যালেরিয়া কমিশন সর্ব্ববাদীসম্মত হইয়া পরামর্শ দেন।

কমিসনের পয়োনালী বা ড্রেণেজ থিয়োরীর উপর উহার অন্যতম সদস্য দিগম্বর মিত্র অধিকতর গুরুত্ব স্থাপন করেন। এবং তৎ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র দুইটী মিনিট বা মন্তব্য লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে দাখিল করেন। কিন্তু, দিগম্বরের ড্রেণেজ মত কমিসনের মত হইতে কিয়ৎপরিমাণে স্বতন্ত্র; এবং সে মত প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি জীবনব্যাপী পরিশ্রম ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। কতকাংশে তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ফলতঃ দিগম্বর মিত্রের ড্রেণেজ থিয়োরি অনুসারে যদি এত দিন কার্য্য হইত, তাহা হইলে এখন কাহাকেও এই ড্রেণেজ বিল লইয়া এত বিব্রত হইতে হইত না। দিগম্বর মিত্রের মত একটু পরে আলোচনা করিব; এখন ইতিহাসের অনু- সরণ করা যাউক।

এপিডেমিক কমিসনের রিপোর্ট দাখিল হওয়ার পর, বহু বৎসর তদন্ত তাদারক ও লেখা লিখিতে কাটিয়া যায়। ১৮৭০-৭১সালে বেঙ্গল কৌন্সিলে এ সম্বন্ধে একখানা বিল পেস হয়। সে বিল খানার নাম Drainage and Irrigation Bill। তাহা আমাদের এই আলোচ্য বিলের মতই এক উদ্ভট সৃষ্টি। তাহাতে, বিল, জলা ধান্যক্ষেত্রের ড্রেণেজ করার কল্পনা করা হইয়াছিল। কিন্তু, তখন দিগম্বর মিত্র জীবিত এবং বেঙ্গল কৌন্সিলের মেম্বর; তিনি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া অক্ষরে অক্ষরে বুঝাইয়া দেন যে, উক্ত কল্পনা মহা অনর্থকর; কেবল অসম্ভব ও বিপুল ব্যয়াতীত নহে, বিষম অনিষ্টকর। তদ্দ্বারা গ্রাম্য জল নিকাসের সম্ভাবনা নাই; ম্যালেরিয়ার যে কারণ কল্পিত, তাহা বিদূরিত হইবে না, অথচ ধান্য ক্ষেত্র শুষ্ক হইয়া গিয়া দেশ শুদ্ধ লোক অনাহারে মরিবে। পরন্তু, আরও বুঝান যে নদ্যাদির প্রবাহ অল্পাধিক পরিমাণে অবরুদ্ধ বা মৃদু হইয়া গ্রাম্য জল নিকাশের স্বাভাবিক পয়োনালীর ব্যাঘাত করেন নাই; ধান্যক্ষেত্রস্থ জলেও ম্যালেরিয়া জন্মিয়া মানুষ মারে না; প্রত্যুত দেশের যথা তথা আবাধ নির্ম্মিত কাঁচা পাকা রাস্তা, বড় বড় বাঁধ ও রেলওয়ে হইয়া স্বাভাবিক ও সাবেক গ্রাম্য পয়োপ্রণালী রোধ করিয়াছে, যে উপায়ে তাহার নিরাকরণ হইতে পারে, তাহাই উদ্ভাবন করিয়া আইন করা আবশ্যক। না বুঝিয়া, উদ্ভট আইন করিলে কালে দেশের অনিষ্ট হইবে। দিগম্বর মিত্রের এ মতের অনেক শত্রু ব্যবস্থাপক সভায় ছিলেন। কিন্তু, মিত্রজের যুক্তি তর্ক

অকাট্য, তদীয় সাক্ষাৎ সংগৃহীত তথ্যরাশি দুর্দমনীয়। সুতরাং শত শত্রু সত্বেও তাঁহারই জয় হয়। তদানীন্তন ছোটলাট স্যর উইলিয়ম গ্রে ডেণেজ বিল প্রত্যাহার করেন। কেবল ধানকুনির বিল ড্রেণের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু, তাহাতে যে অনর্থ ঘটিয়াছিল; উক্ত বিলের সত্বাধিকারী রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় অবগত থাকিতে পারেন এবং তজ্জন্যই বোধ হয়, বেলভিডিয়ারে এই স্যানিটারি বিলের অঙ্কুরেই আপত্তি করিয়াছিলেন।

যাঁহার যুক্তিতে স্যর উইলিয়ম গ্রের মত ফিরিয়াছিল, আক্ষেপ, তিনি এখন জীবিত নাই। তাঁহার যুক্তিগুলি সাক্ষাৎলব্ধ জ্ঞানে সজীব করিয়া স্যর চার্লসের সম্মুখে ধরে, এমন একটী লোকও এখন দেশে নাই। দিগম্বর মিত্র ও কৃষ্ণদাস পালের মত ব্যক্তি এমনতর সব সময়ে না থাকা দেশের বিষম দুর্ভাগ্য। এখনকার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা এবং হিন্দু-পেট্রিয়ট যেরূপভাবে উপস্থিত বিলের প্রতিবাদ করিতেছেন, তাহা হৃদয়গ্রাহী নহে। যে জমিদার সভায় ও জমিদারী পত্রে ড্রেণেজ তত্ত্ব তন্ন তন্ন করিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হইয়াছিল, তাঁহাদের পক্ষে, দিগম্বর ও কৃষ্ণদাসের অবর্ত্তমানে ড্রেণেজ-থিওরি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া অতীব আশ্চর্য্য। পরন্তু, বঙ্গীয় লাট বাহাদুর যে ভাবে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিতেছেন, তাহা ততোধিক আশ্চর্য্য। কিন্তু যাউক আপাততঃ একথা।

ড্রেণেজ ও ইরিগেসন বিলের পর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (১৮৭২ খ্রীঃ) বিভিন্ন আকারে এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট বিল নামক এক বিল উপস্থিত করা হয়। তখনও দিগম্বর মিত্র (৩য় বার) কৌন্সিলের মেম্বর। এই বিলের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন সম্বন্ধে মিত্রজা মহাশয় অনেক সহায়তা করেন। ১৮৭৩ সালে, ইহা আইনে পরিণত হয়। এই এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট আইনানুসারে কার্য্য হইলে বিশেষতঃ দিগম্বর মিত্র উহার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন, সেই ভাবে কার্য্য হইলে, এ সম্বন্ধে আর কোনও আইন করিবারই আবশ্যক হয় না। কিন্তু, কার্য্য করা ও করাইবার প্রবৃত্তি অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের অনর্থক আইন করার ইচ্ছাই প্রবল। কাজেই, এই সাংঘাতিক স্যানিটারী আইনের অবতারণা হইয়াছে।

১৮৭৬ সালে দ্বিতীয় বার এপিডেমিক কমিসন বসে;—সরকারি সেরেস্তায় ম্যালেরিয়া দমনের নানা কল্পনা জল্পনা হইতেছিল বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়া তাহাতে ত আর ভয় পায় না। দুই এক বৎসর একটু গা ঢাকা থাকিয়া আবার দাবাগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিতেছিল। এই দ্বিতীয় কমিসনেও দিগম্বরকে ডাকা হয়। তিনি শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ কমিসনে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিতে পারেন নাই। কতকগুলি মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই কমিসনের সভাপতি হয়েন ডাক্তার লেথব্রিজ। লেথব্রিজ ড্রেণেজ-থিওরী প্রায় একেবারে উড়াইয়া দেন। তাঁহার মতের আভাস আমরা অগ্রেই দিয়াছি।

স্বাস্থ্যে ড্রেণ এবং ড্রেণে স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যাপারের পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত এই। আলোচ্য বিলের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ইতিবৃত্ত ১৮৯২ সালের ১৮ই জুলায়ের বেলভিডিয়ার সভা। এই সভার চতুর্থ মন্তব্যে এই বিলের অঙ্কুর। ঐ মন্তব্যের মর্ম্ম এই যে, দেশের

কোনও স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইলে এবং তথাকার লোক আবেদন করিলে অথবা ড্রেণের অভাবে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু সংখ্যা অধিক হইতেছে সাব্যস্থ হইলে, গবর্ণমেণ্ট অধিবাসীদিগের অধিকের মত গ্রহণ পূর্ব্বক আইনানুসারে তথায় ড্রেণ করিতে ও তজ্জন্য কর স্থাপন করিতে অধিকারী হইবেন। কিন্তু এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট আইনে, অন্ততঃ তাহার কিছু কিছু সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া কি এ কার্য্য সাধিত হইতে পারিত না? বলিবে, উক্ত আইন সর্ব্বব্যাপী নহে। কিন্তু ম্যালেরিয়াও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সর্ব্বত্র নাই। পূর্ব্ব বঙ্গে নাই। বিহারেও নাই। পরন্তু কেবল মাত্র ড্রেণ দ্বারা ম্যালেরিয়া নিবারিত হইতে পারে, ইহাও সাব্যস্ত হয় নাই। পুনশ্চ, আলোচ্য বিল ও তল্লিখিত ড্রেণের ব্যাখ্যা এই মন্তব্যের ঠিক অনুরূপ নহে। দৃষ্টান্ত, বিলের ১ম খণ্ডের ২য় অধ্যায়ের ৩য় ধারা। ফলতঃ এই বিলের অঙ্কুরেই অনবধানতা। আর এই অঙ্কুর হইতেই রাজনীতি ও প্রজা-নীতি, বিশেষতঃ সুরেন্দ্রনাথ বাবু-প্রমুখ প্রজা-নীতি যেরূপ ভাবে চলিয়াছে, তাহা বস্তুতই অদ্ভুত। রাজনীতি অনাবশ্যক সত্বেও এক অতিরিক্ত ও অন্যায় আইনের সূচনা করিলেন। সূচনায় মন্তব্য হইল একরূপ, আইনের খশড়া হইল অন্যরূপ, তাহার ব্যাখ্যা হইয়াছে তৃতীয় প্রকারের। এক পক্ষের প্রজানীতি পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া সূচনায় সমর্থন করিলেন; কংগ্রেসের প্রাদেশিক কনফারেন্সে দুই নৌকায় পা দিলেন। এখন কর দিতে আপত্তি করিতেছেন। কেন? করের কথা ত সূচনাতেও ছিল। তবে সমর্থন করিলে কি বুঝিয়া? ফলতঃ রাজনীতি ও সুরেন্দ্র বাবুর প্রজা-নীতি এ ব্যাপারে, এক এক দিন এক এক তালে নাচিতেছে।

এই বিলের ইতিবৃত্ত আমরা কিছু বিস্তারে বলিয়াছি। ইহার মূল তত্ত্বের কথা সংক্ষেপে বলা ভিন্ন উপায় নাই। মূল তত্ত্ব ম্যালেরিয়া। অর্থাৎ তন্নামধেয় অথবা ম্যালেরিয়া-জাত জ্বর। কিন্তু, এই জ্বর যে কেবল ম্যালেরিয়া সঞ্জাত, তাহার প্রমাণ কি? এবং ম্যালেরিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে পদার্থই বা কি? তাহা বাকটেরিয়া ব্যাসিলি, পলিত পঙ্কের বিষ-বাষ্প, অথবা ধাতব, জান্তব কিম্বা বিকার প্রাপ্ত উদ্ভিদ পদার্থ হইতে উদ্ভূত, অথবা এ সকলের সমবায়ে সৃষ্ট, অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে কি? ম্যালেরিয়া পানীয় জলে, ভূমধ্যস্থ পলিত পঙ্কে, মনুষ্যের ব্যবহার্য্য বায়ুতে অথবা ম্যালেরিয়া কেবল মনে? শুনিতে পাই, ম্যালেরিয়া পীড়িত রোগীর শোণিতের রক্তকোষাণুতে এক প্রকার অনুবীজ (red corpuscles) জন্মে।* কিন্তু তাহা কিরূপে কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, অদ্যাবধি কোনও পরীক্ষার দ্বারা তাহা নির্ণীত হয় নাই। ডাক্তার স্কচ্ প্রভৃতির জীবনব্যাপী তত্ত্বানুসন্ধানেও অদ্যাপি কলেরা ব্যাসিলি সম্পূর্ণরূপে নিরুপিত হইল না, আর বিনা অনুসন্ধানেই ভিজা মাটি ফুঁড়িয়া ম্যালেরিয়া-ব্যাসিলি বাহির হইয়া পড়িল, ইহা যারপর নাই আশ্চর্য্য বটে। ছোটলাট স্যর চার্লস ইলিয়ট তদীয় ঢাকা বক্তৃতায় অম্লান বদনে বলিয়াছেন যে,—

"The disease itself was without doubt due to a special bacillus bred chiefly in low lying parts where there was much decaying vegetable matter, but which no doubt spread to other healthier parts through human agency." অর্থাৎ ম্যালেরিয়া জ্বর এক

* নব্যভারত ১২শ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা ১৭২ পৃঃ ফুটনোট।

বিশের বীজাণু হইতে জন্মে এবং সে বীজাণু, নিম্নভূমি কি না, বিল জোল জলার পলিতোন্মুখ উদ্ভিজ পদার্থ হইতে উদ্ভূত এবং মনুষ্য কর্ত্তৃক স্বাস্থ্যকর স্থানেও নীত। †

এই উক্তির আরম্ভেই বঙ্গেশ্বর চিকিৎসা-শাস্ত্র ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতির দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্র ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান কবে ও কোথায় এ অভিনব তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাহা কিছুই বলেন নাই। তাহা বলিলে অনভিজ্ঞ লোকের কিছু উপকার হইতে পারিত। স্যর চার্লস ইলিয়ট যেমন অন্য কর্ত্তৃক উদ্ধৃত প্রমাণের (authority) পরিচ্ছেদ ও পৃষ্ঠা তাহাদের নিকট হইতে পাইতে প্রত্যাশা করেন;—অন্যেও তেমনি তাঁহার কথার প্রমাণ কোথায় প্রাপ্তব্য জানিতে প্রার্থনা করিতে পারে।

নর্দ্দামার পচানি-প্রসূত বেসিলি বায়ুতে প্রবেশ করিতে পারে না, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শুনিতে পাই, পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছে। অথচ নিম্নভূমির মধ্যস্থিত অবিচলিত বেসিলি বহির্ব্বায়ুতে অবাধে প্রবেশ করিয়া মানুষের প্রাণবায়ু দূষিত করে, ইহাই আবার (স্যর চার্লসের অধিত) স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের মত হইতে পারে, বিনা প্রমাণে লোকে কিরূপে বিশ্বাস করিবে?

ফলতঃ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান অদ্যাপি সূতিকা-গৃহ পার হয় নাই। বাকটিরিয়া-তত্ত্বও এখনও তাহার বিজ্ঞান-জননীর জঠরাভ্যন্তরে অবস্থিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বেঙ্গল কৌন্সিলের আইন করার জাঁতা কল অনিবার্য্য। আবিষ্কারের পূর্ব্বেই অনুষ্ঠান। তা, অনুষ্ঠান দ্বারা এক্সপেরিমেণ্ট আবশ্যক বটে। কিন্তু সেটা ধন-কুবেরের ধনে, ও সরকার বাহাদুরের নিজ অর্থে সম্পন্ন হইলেই কোনও কথা থাকে না। দরিদ্র রায়তের হৃদ্‌পিণ্ড নিঙ্গড়ান রক্তের দ্বারা তাহা করা হয় বলিয়াই ত এত বাগ্‌বিতণ্ডা।

পরন্তু, যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কথা তুলিয়া ড্রেণ করার প্রস্তাব, সেই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানই ত আবার পক্ষান্তরে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ু ড্রেণ দ্বারা বিতাড়িত করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর। হায়েজেনিক ডাক্তার ও স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারেরাই ত ইহা বলিয়া থাকেন। অভিমত অক্ষরে অক্ষরে উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। কিন্তু স্থান হইবে না! বঙ্গদেশ যখন ম্যালেরিয়ায় মর মর; বিহারে তখনও উহা ছিল না। কিন্তু, আরার ইরিগেসন কেনাল হইয়া আরা ও গয়া জিলায় ম্যালেরিয়া হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অন্যের কথা যাউক। গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত সেক্রেটারী মিঃ অডলিঙ নিজেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইরিগেসন কেনাল সলিলের কৃত্রিম সন্নিপাতে স্বাস্থ্যের পীঠস্থান আরা ও গয়ায় ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপন্ন করিয়াছে *। এখন বক্তব্য এই যে, ইরিগেসন কেনাল ও ড্রেণেজ ক্যানাল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রায় একই পর্য্যায়ভুক্ত। অপিচ, জলীয় বাষ্প বা সর্দ্দি সংযুক্ত বায়ুর ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধেও হঠাৎ একটা হটকারী সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না।

স্বাস্থ্য শাস্ত্রবিদ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার Parkes তাঁহার Hygiene নামক গ্রন্থে বলেন, শ্বাস কাশ প্রভৃতি হৃদরোগ সাধারণতঃ শুষ্ক

† কেন না অস্বাস্থ্যকর ও স্বাস্থ্যকর স্থান সর্ব্বত্রই কৃষিকরটা হওয়া চাই। ইহাকেই বলে এক তীরে দুই পক্ষী মারা।

* Vide his lecture in Sibpur Civil Engineering College.

বায়ুতেই বর্দ্ধিত হয়। উহাদের চিকিৎসা ও উপকারার্থে সর্দ্দি-সিক্ত বায়ু (moist climate) অতীব ইষ্টকর।

অতএব দেখা যাইতেছে, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান মূলতঃ মতভেদের আকর। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধীয় মত সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনির্দ্দিষ্ট ও অন্ধকারময়। এ সম্বন্ধে কোনও কথাই অসন্দিগ্ধচিত্তে ও একান্ত নিশ্চয়তার সহিত বলা যায় না। ম্যালেরিয়ায় আদৌ রোগ জন্মে কি না, তাহাই এখন অনিশ্চিত। স্যর জোসেফ্ ফেরার বলেন ;—

"The truth is that the whole subject of causation of disease by maismata of this or similar character is too much involved in obscurity to satisfy dogmatic assertion that such is the case."

বিলের মূল তত্ত্ব এই ; এবং মূল তত্ত্বেই মর্ম্মান্তিক মতভেদ ; সপক্ষ অপেক্ষা বিপক্ষ মতেরই অধিক আধিপত্য। বিলের অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা অপর একটী প্রবন্ধে, করা যাইবে। ইত্যবসরে, আমরা আশা করি, এই বিল ব্যবস্থায় পরিণত হইয়া, বঙ্গীয় কৃষকের মস্তকে বজ্রাঘাত করিবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

অন্ধকার।

১

অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার !
গ্রাসি ধরণী, গ্রাসি গগন,—
তিমির-গহ্বর ব্যাদান যেমন
রক্তবীজ বধে কালিকার !
ঘোর অন্ধকার !—
অনন্তের মূর্ত্তি, কৃতান্তের ছায়া,
অনাদি পরম কারণের কায়া,
অসীমে সসীমে একাকার !

২

জগৎ চরাচর যে দিন না ছিল,
ব্যোম উপরে মহাব্যোম বিথার,
স্তব্ধ প্রকৃতি সনে অনাদি পুরুষ
বিশ্বসৃজন তরে করিল বিহার,—
না ছিল শব্দ, স্পর্শও না ছিল,
রূপ নাহিক ছিল অভিন্নতায়,
নিরম্বু শূন্যে রস নাহি সম্ভবে,
অক্ষিতি-মধ্যে গন্ধ কোথায় ?—
কেবল সে ছিল অন্ধকার !—
প্রকৃতির যেন এই বিশ্ব প্রসব তরে
দিগন্ত ব্যাপিয়ে গর্ভের প্রায় !

৩

আবার সে হবে অন্ধকার !—
শম্ভু-নিনাদিত প্রলয়-বিষাণে
শব্দ-তরঙ্গিত ক্ষুব্ধ আকাশ ;
বিচ্যুত-কক্ষ গ্রহগণ খসিয়ে,—
চূর্ণ-বিচূর্ণিত লুপ্ত-বিভাস,—
অনন্ত শূন্যে যে দিন মিশিবে ;
লুকাবে যে দিন দেশ ও কাল
ব্রহ্ম-সুষুপ্তির নিশ্বাস-মাঝে ;—
সে দিন ফিরিবে তিমির করাল !

৪

এখন ত নাহি অন্ধকার ;—
ক্ষুদ্র, বৃহৎ বা, সসীম সকলি,
ব্যক্ত নয়নপথে ধরিয়ে আকার,—
অমানিশা কোলে তারকা হাসে,
গভীর ঘনগলে বিদ্যুৎ-হার !
কোথা অন্ধকার !

৫

এসো অন্ধকার!
বিনাশ সীমা, প্রসার হৃদয়,
নিবার ভিন্নতা, ক্ষুদ্রতা আর,—
অনন্ত অব্যয় আলোক তুমি যে,
অভেদ-কারণে দৃষ্টির পার!

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

সৌন্দর্য্য।

নয়ন-প্রীতিকর গুণ অথবা গুণসমষ্টির নাম সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে? এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। কিন্তু ঐকমত্যই অধিক, মতভেদ অল্প। কোন সুন্দর জিনিষ বা মানুষকে অধিকাংশ লোকেই সুন্দর বলে। যাহাকে অধিকাংশ লোক 'সুন্দর' বলে, এবং যাহা বহুলোকের নয়নতৃপ্তিকর হয়, তাহাই 'সুন্দর' বলিয়া পরিচিত। সক্রেটিস্ তাঁহার মোটা নাককে সুন্দর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার মতে যাহা প্রয়োজনীয়, তাহাই সুন্দর। এমন কি, গোময় ফেলাইবার কদর্য্য টুক্‌রিও তাঁহার মতে সুন্দর। কিন্তু জনসাধারণ তাঁহার মতে সায় দেয় না। সক্রেটিসের ন্যায় যদি সকলের মত হইত, তবে লোকে মণি মুক্তার জন্য লালায়িত হইত না, হীরক বা স্বর্ণাভরণের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিত না। গোলাপ সুন্দর কেন? দুর্ব্বাদল-বিলম্বী নীহার-বিন্দু সুন্দর কেন? বালকের হাসি সুন্দর কেন? এই সকল ত বড় একটা কাজে আসে না। ইহা বুঝা যায় না বলিয়া সক্রেটিসের মতের সহিত সায় দেওয়া কঠিন। 'সুন্দর' 'সুন্দর' বলিয়া জগৎ ব্যাকুল, সুন্দরের জন্য সকলেই অস্থির। বহুদিন হইল একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম,

"সুন্দরে হৃদয় কাহার মাতে না?"
কোন্ পোড়া প্রাণ সুন্দর চাহে না?"

প্রকৃতই ঠিক কথা। কিন্তু সুন্দর জিনিষটা কি, তাহা কি বুঝান যায়? ইহাকি 'মুক্তা ফলে ছায়ার তরলতার' ন্যায় কোমলত্ব না আর কিছু? ইহা বুঝান যায় না বটে, কিন্তু বুঝা যায়। তুমি 'সুন্দর কি,' এই কথা যদি না বুঝিবে, তবে কিসের জন্য এত লালায়িত? সৌন্দর্য্যকে নয়ন-তৃপ্তিকরগুণ অথবা তদ্রূপ গুণের সমষ্টি বলা হইয়াছে। নয়নের তৃপ্তি কিসে হয়? নয়ন দ্বারা যে পদার্থ বা দৃশ্য দেখিলে মনে আনন্দের উদয় হয়, তাহাই সুন্দর। কুৎসিৎ পুত্র সন্তান, যাহাকে বহুকাল দেখিতে পাওয়া যায় নাই, তাহাকে দেখিলে কি মনে আনন্দ হয় না? কাজেই দেখা যায়, কেবল চক্ষে নয়, ইহার অভ্যন্তরে আরও কিছু আছে। কবি লিখিয়াছেন—

Love sees Hellen's beauty on the brow of Egypt."

যাহা সকলের নিকট সুন্দর নয়, তাহাও অবস্থা বিশেষে কোন কোন লোকের নিকট সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রূপকে অনেকে অসার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অসার হইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া কয়জন রূপ তুচ্ছ করিতে পারিয়াছে? বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যকে নারিকেলের ছোবার সহিত তুলনা করিয়াছেন। বলিয়াছেন, দুইই অসার। নারিকেলের ছোবায় রজ্জু হয়, তাহা দ্বারা রথ টানা যায়; রূপও ভারী ভারী মনোরথ টানিয়া থাকে। রূপের মোহিনী

শক্তি কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে তাহাকে অসার অপদার্থ জিনিষ বলিয়া কেহ কেহ কেবল মুখের বড়াই করিয়াছেন। যখন নবীন প্রেমিক রূপের মোহ অতিক্রম করিতে না পারিয়া মর্ম্মান্তিক স্বরে বলেন—

"Is this her fault or mine?
The tempter or the tempted who sins most? Ha?
Not she; nor doth she tempt &c."

আমরা কি তাঁহাকে একটা বিকৃত-বুদ্ধি পশু বলিয়া মনে করি? এইরূপ মনের অবস্থা স্থল বিশেষে স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। পার্থিব অপরাপর জিনিষের মত সৌন্দর্য্যও জ্ঞানীর চক্ষে অসার হইতে পারে, কিন্তু ঐরূপ জ্ঞানীর সংখ্যা অল্প। রূপের মোহে সংসারে কতই না অনর্থ ঘটিয়াছে? সীতার জন্য লঙ্কা বিধ্বস্ত হইল, ক্লিওপেট্রার রূপে মোহিত হইয়া বীর এণ্টনি সকল হারাইলেন, হেলেনার জন্য ট্রয় ধ্বংশাবশেষ হইল। পৃথিবীতে এইরূপ কত ঘটনা প্রতিদিন ঘটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সৌন্দর্য্য লইয়া কিন্তু কাহাকেও সুখী হইতে দেখিলাম না। সকল স্থানেই দেখিলাম 'Beauty and anguish walking hand in hand.' যেখানে সৌন্দর্য্য, সেইখানেই লাঞ্ছনা দেখিলাম। সীতাদেবী, হেলেনা, ক্লিওপেট্রা, কেহই সুখে কাল কাটাইতে পারে নাই। পদ্মিনী সৌন্দর্য্যের অপবাদে জলন্তচিতা আরোহণ করিলেন; নুরজাহান স্বামীহন্তাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। ইহাদের অপরাধই বা কি? ধন সম্পত্তির অধিকারীরা যেরূপ নিশ্চিন্তে কাল কাটাইতে পারেন না, সুন্দরী রমণীগণেরও সৌন্দর্য্য সম্পত্তি থাকাতে তদ্রূপ অবস্থা। "Beauty provoketh thieves sooner than gold." কেবল রমণীগণের কথা বলিতেছি কেন? সকল স্থলেই এইকথা প্রযুজ্য। সুন্দর পাখীটী কেন খাঁচায় পূরিয়া রাখি? সুন্দর কুসুম কেন বৃন্তচ্যুত করিয়া শুকাইতে দিই? ঐশ্বর্য্যশালী লোকদিগের সম্মান আছে, গৌরব আছে, অনেক সুবিধা আছে। সৌন্দর্য্যের অধিকারীদিগেরও তাই। তাহারা না চাহিতে আদর পায়, প্রশংসা পায় এবং স্তুতি পায়। অতএব সৌন্দর্য্য একটা সম্পত্তি ও ইহার অধিকার স্পৃহনীয়। 'সুন্দর' সম্বন্ধে মতভেদও যথেষ্ট আছে। এই বিভিন্নতা দেশ বিশেষে, বয়স বিশেষে এবং ব্যক্তি বিশেষে পরিলক্ষিত হয়। কেহবা সুন্দর করিবার জন্য লৌহ-বেষ্টন দ্বারা পা ছোট করিয়া বাঁধিয়া রাখে। কেহবা কটিদেশ সরু করিতে করিতে মৃতপ্রায় হয়। কাহারও মতে শাদা দাঁত ভাল দেখায়, কাহারও মতে বা কাল দাঁত ভাল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছোট শিশু লাল জিনিষটা বড় সুন্দর দেখে; উজ্জল একটা কিছু দেখিলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তাহারা জিনিষের আর কিছু মূল্যামূল্য নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে এবং উহার অধিক আর কিছু হইতে পারে, ইহাও অবগত নহে। যুবক আবার যে সৌন্দর্য্যে মোহিত, বৃদ্ধ হয়ত সে সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃক্পাত করে না। অজ্ঞান যাহাকে সুন্দর বলে, জ্ঞানী তাহা সুন্দর মনে করিতে না পারেন। গুণকে রূপ হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে সকলেই বলেন এবং তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু যেখানে রূপ ও গুণের একত্র সমাবেশ, সেই খানেই স্বর্গ হইল। কেবল সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হওয়া জ্ঞানী জনোচিত নয়, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে পতনশীল পতঙ্গ ঐরূপ অজ্ঞানতার নিদর্শন।

শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন।

ধ্যান ও ধারণা।

চঞ্চল কনঁকধারা তরঙ্গিনী-উপকূলে
ভ্রমর-গুঞ্জিত মধুবন ;
নিরজন, জগতের রবহীন প্রান্তদেশ,
নাহি বিধি বাদ কি বন্ধন—
কোমল সৈকত মাটী নব তৃণ পরিপাটী,
প্রকৃতির ঘুমঘোরা ললিত বিলাস
নয়ন-নন্দন রূপ অলোক-প্রভাস ! !

দশধারে ফুলে ফুল লতার সীমন্ত-শোভা
সুফলে আচ্ছন্ন তরুশির ;
সৌরভ-সুধার স্রোত শূন্য ব্যাপি বহিতেছে
বসন্তের শয়ন-মন্দির ! !
প্রভাতে বকুল ঝোরে পাছে দেছে পথ কোরে
রাশি রাশি, শুভ্র, শিশু, বেদীর আকার—
হেথা হোতা পদ-চিহ্ন বন-দেবতার।

শাখীতে অজস্র পাখী শতকণ্ঠে করে গান,
মন্দ মন্দ মধু-সমীরণ—
পাখী যত গায় তত ফুলের উন্মাদ, করে
করে শত প্রাণে সুধা বিতরণ।
সে বনে অমর চাঁদ, জ্যোৎস্নার অনন্ত সাধ
পূর্ণ তথা—কান্তমুখী অনিদ্রা সুহাসি—
অবিশ্রান্ত কোথা হতে ভেসে আসে বাঁশী।

সে বনে সে নদীকূলে বকুলের পথে, এক
ঘুমাইয়া অনিন্দ্য-সুন্দরী—
অঙ্গে অঙ্গে জ্যোৎস্না, এলোমেলো দেহবাস,
খুলে খুলে পড়িছে কবরী।
পবন নিরখি তাকে কুসুমে না অনুরাগে,
তটিনী চমকি থামে ফুল নাহি ফোটে,
জ্যোৎস্না ভাবে "ধিক মোরে রূপসী ওবটে"!!

* * *

জীবন হইবে হেন কল্পনার কুঞ্জবন
মমতা-বারিধি-বেলা 'পরে—
শ্রান্তিহীন, শব্দহীন, দ্বেষ-ক্লেশ-শেষ-হীন,
ছিল সুখ-কল্পনা কৈশোরে।
চিত্ত-শাখী-অঙ্গ'পরে আশালতা শোভা কোরে
আকাশে নক্ষত্র মত ফুটাইবে ফুল ;
সুচিন্তা-সুগন্ধ প্রাণ করিবে আকুল।

হৃদয় হইবে শুভ্র পাপ-তাপ-বৃন্তহীন
বাসনা-বকুল-বৃন্দাবন—
কক্ষে কক্ষে প্রেমপাখী অমিয়া-ঝঙ্কারে মত্ত
উদ্‌ভ্রান্ত করিবে অনুক্ষণ।
শান্তি-শশধর-করে জীবন রাখিবে ভরে,
চেতনে নিদ্রায় শ্রমে বিশ্রামে কি ধ্যানে
সুখের মহন বাঁশী সদা রবে কাণে।

সে জীবন আলো করে ঘুমাবে মোহিনী মোর
স্বপ্ন-হাসি-প্রফুল্ল-শয়ানে ;
প্রভাত-কমল-ভাঙ্গা দেহ-লতা লগ্ন রবে
বাসনা-কুসুম-উপাধানে।
তারে দেখ হবে ভুল আশার ফোটাতে ফুল,
চিত্ত গতি-হীন স্তব্ধ তাহার পশ্চাতে ;
না পাব আপনা খুঁজি ডুবিয়া তাহাতে।

* * *

কোথা কল্পনার নিধু-অরণ্য আমার—
মধু-মমতার মন্দাকিনী কই ?
এ যে ঘোর মরুভূমি তপ্ত বালু-সিন্ধু
নাহি অভিশাপ-অগ্নিবৃষ্টি বই।
হৃদয় জ্বলন্ত খার ভস্ম পাঁশে একাকার,
কোকিল-কণ্ঠ কি ওই শিবার কল্লোল ?
একি এ প্রেতের হাট পিশাচের গোল ?

এই চিতা ধূমাচ্ছন্ন করাল শ্মশান, এই
প্রিয়-স্মৃতি-কঙ্কাল-বেষ্টন,
এই মানবের স্বষ্টে শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ ? এই
মানবের পরম জীবন ?
প্রতি পদে বজ্রবোধ ডোবাডুবি শ্বাসরোধ—
গাত্রে ভুজঙ্গের বিষ দগ্ধ শলা শিরে—
এই কামনার পদ্ম জীব-জন্ম-নীরে ?

এযে পিপাসার এক প্রখর দাহন, তীব্র
যাতনার ক্রূর ক্ষয়কাশ—
এযে মাত্র পুড়ে পুড়ে ক্ষয়ের পদ্ধতি এক,
প্রাণঘাতী অনল-উচ্ছ্বাস।
এ কেবল দীর্ঘমাত্রা যমদণ্ডাঘাত যাত্রা—
এ জীবন অশ্রুহীন ব্যথিতের শূল ;
ভ্রমণ কণ্টকবনে অন্ধের আকুল।

কোথা সে কৈশোর? কোথা অনন্ত জীবন-সাধ?
কোথা শুভ্র সরল কল্পনা ?
কোথা সে দিনের আমি? কোথা সে হেমাঙ্গী
মোর?
মনোময়ী চম্পক-গঠনা।
আজি কেন যাই যাই—কেন প্রাণে সাধ নাই—
কোন্ ভুলে এ গভীর পতন আমার ?
তুমি জান—তুমি মাত্র—জীব-জন্ম কার !!

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গের আদি কবি শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুর। (১)

আমরা ভক্তি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই, এবং বিজ্ঞজন মাত্রেই বলিয়া থাকেন, মহাত্মা চণ্ডীদাসই বঙ্গের আদি কবি। তাঁহা হইতেই বঙ্গ ভাষার অত্যুজ্জ্বল মধুর পদাবলী কীর্ত্তনের স্বষ্টি। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে সংস্কৃত ভিন্ন কোন ভাষা-গ্রন্থ ছিল না।

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ত্রি অশীতি বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা চণ্ডীদাস এই বঙ্গভূমির রাঢ়দেশে অর্থাৎ বীরভূম জেলার মধ্যস্থিত নান্নুর গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালাবধি এখন পর্য্যন্ত ঐ গ্রামে অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীবিশালাক্ষি বা বাশুলী নামে "শিরোপরি সংস্থিতা" পাষাণময়ী চতুর্ভুজা চণ্ডীদেবীর প্রতিমূর্ত্তি, যথা, "নান্নুরের মাঠে হাটের নিকটে ইত্যাদি" বিরাজমান আছেন। পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের পিতা ঐ দেবী আরাধনা করিয়া পুত্ররত্ন চণ্ডীদাসকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবী দত্তা বলিয়াই "চণ্ডীদাস" নামকরণ হইয়াছিল। পরন্তু, চণ্ডীদাসের পিতা মাতা বিধিকৃত বিড়ম্বনায়, চণ্ডীদাসের উপনয়নাদি সংস্কার না হইতে হইতেই কাল প্রবাহে পুত্ররত্ন-সুখলাভে বঞ্চিত হইয়া একে একে যোগাধামে গমন করেন।

চণ্ডীদাস বাল্যকালে মাতা পিতার বিয়োগে অসহায় ও নিরাশ্রয় হন্। পরন্তু, "একটী প্রসিদ্ধ কথা আছে "নিরাশ্রয়ের রক্ষক জগদীশ্বর"। ঐ গ্রামে বিস্তর রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের বসতি ছিল, তাঁহারা দয়াপরতন্ত্র হইয়া চণ্ডীদাসকে যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করেন। পশ্চাৎ চণ্ডীদাসের উপনয়নের কাল সমুপস্থিত হইলে যাবতীয় ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়া বিধিপূর্ব্বক চণ্ডীদাসের উপনয়নাদি সংস্কার

কার্য্য সম্পন্ন এবং ব্রাহ্মণের যে সকল করণীয় কার্য্য, অর্থাৎ পূজা, পদ্ধতি ও গায়ত্রী ও সন্ধ্যাবন্দনাদি ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম সকল শিক্ষা দিয়া, শেষে তাঁহাকে তাঁহারই পৈতৃক ঐ দেবী পূজার কার্য্যে পূজারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস তৎকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রতিদিন দেবী পূজা করিতেন। আর দেবীর নিত্য সেবার বরাদ্দ অন্নাদি পাক করিয়া দেবীকে ভোগদিতেন। এবং সেই ভোগ সেবাইতদিগকে বিতরণ করিয়া শেষে নিরামিষ প্রসাদ পাইতেন। আর দেবীর শ্রীমন্দিরের নিকট মঠের মধ্যে অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে পাতের কুটীর বাধিয়া থাকিতেন। পদে আছে ;—

"নান্নুরের মাঠে পাতের কুটীর নিরজন স্থান অতি।
বাশুলী আদেশে, চণ্ডীদাস তথা, ভজন করয়ে নিতি॥"

* * * * পদসমুদ্র।

সেই সময় রামমণি, নামান্তর রামিণী বা রামী নামে একটী রজকী কন্যা বালিকাবস্থায়, মাতা পিতার বিয়োগে অভিভাবক-শূন্য হইয়া, আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত ও কোথাও অন্ন ও কোথাও বা অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী যাহা কিছু যাচিঞা করিয়া পাইত, তাহাই আহার করিয়া উদর পূর্ণ করিত। আর "শয়ন হট্টমন্দিরে" হাটে বাজারে অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকিত। ক্রমে বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে (রামমণি) যখন একটুকু চতুর ও কাজকর্ম্ম করিতে পটু হয়, তখন গ্রামস্থ সকলে দয়া করিয়া তাহাকে (রামমণিকে) দেবীমণ্ডপ সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। পদে আছে ;—

"অল্প বয়সে দুখিনী রামিণী কাজেতে নিযুক্ত হল।
চণ্ডীদাস কহে,প্রসাদ ভুঞ্জিয়ে,ক্রমে বাড়িতে লাগিল"॥

রামমণি পরিচারিকা স্বরূপ কাজে নিযুক্ত হইয়া প্রতিদিন গোময় লেপন ও মার্জ্জনী দ্বারা (দুবেলা) দেবী মণ্ডপ পরিষ্কার করিতেন। আর সেই কার্য্যের বৃত্তি স্বরূপ প্রাত্যহিক একপাত করিয়া পানড়া অর্থাৎ প্রসাদ অন্ন পাইতেন। এবং তাহাই স্বচ্ছন্দে আহার করিয়া কাল কাটাইতেন। আর কোন উদ্যম করিতে হইত না। দেবীর প্রসাদ অন্ন ভোজন করিয়া রামমণি হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হন্। কিন্তু বয়স্থা হইয়াও তিনি বিবাহ কি অন্য পতি সঙ্গ করেন নাই। বড়ই শুদ্ধমতি ছিলেন। দেবীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। ঐ প্রদেশের লোক (ঝির পরিবর্ত্তে) বাড়ীর চাকরাণীকে কামীন বলে। এজন্য সকলেই আহ্লাদ করিয়া রামমণিকে কামীন বলিয়া ডাকিত। পদে আছে ;—

"রামিণী কামিনী, কাজেতে নিপুণা,সকলের প্রিয়তমা।
চণ্ডীদাস কহে, তাহার পিরীতি, জগতে নাই উপমা॥"

* * * * পদসমুদ্র।

সংক্ষেপে রামমণির পরিচয় এই পর্য্যন্ত। এখন অন্য বাশুলীর কথা ; পদে আছে ;—

"সালতোড়গ্রাম, অতিপীঠস্থান, নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাশুলী, নিত্যাসহচরী, বসতি করয়ে তথা॥
চণ্ডীদাস কহে, সে এক বাশুলী, প্রেম প্রচারের গুরু।
তাহারি চাপড়ে, নিদ ভাঙ্গিল, পিরিতি হইল সুরু॥

* * * * পদসমুদ্র।

কিম্বদন্তী, পূর্ব্বকালে সালতোড়া নামক গ্রামে বনদেবী অর্থাৎ শ্রীশ্রীনিত্যা নামে প্রস্তরময়ী মনসা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল। অভিধানে দৃষ্ট হয়, নিত্যা শব্দে "মনসাদেবী" অপর নাম পোদমা কুমারী। সেই কালে ঐ দেবী বড়ই প্রভাবশালিনী ছিলেন।

এমন কি, ঐ দেবীর নামে দোহাই দিয়া অর্থাৎ "কার আজ্ঞা, পোদমাকুমারীর আজ্ঞা!"

এই বাক্যের সহিত মহামন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ঝাড় ফুক করিলে তৎক্ষণাৎ বিষক্ষয় ও রোগী আরোগ্য হইত। এখনও সেই সকল মন্ত্র আছে, কিন্তু প্রভাব নাই।

এ কথা প্রসিদ্ধ আছে, ঐ দেবীর শ্রীমণ্ডপের নিকট একটী পঞ্চ মুণ্ডির আসন ছিল; তন্ত্রে আছে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, যবন, এই তিন নর কপাল, আর শৃগাল ও বানর এই দুই পশু কপাল অর্থাৎ এই পঞ্চ মুণ্ডে যে বেদী নির্ম্মাণ হয়, তাহারই নাম পীঠ। তাহারই নাম "পঞ্চমুণ্ডি" আসন। অনেক সাধকে সেই বেদীতে বসিয়া মন্ত্র সাধনা করিতেন ও নায়িকা সিদ্ধ হইতেন।

নিত্যাদেবীর পরিচারিকা স্বরূপ, কয়েকটী ডাকিনী ছিল, দেশ বিদেশ হইতে সর্প ওঝাগণ তাহাদের নিকট আসিয়া সর্পমন্ত্র শিক্ষা করিত। জ্যৈষ্ঠমাসে দশহারার যোগে ঐ মনসাদেবীর ঝাপান নামে এক পর্ব্ব অর্থাৎ মহা মেলা হইত। ঝাপান শব্দে "সর্প লইয়া ক্রীড়া করণ।"

নানা স্থান হইতে ব্যালগ্রাহীগণ নানাজাতি বিষধর সর্প লইয়া ঐ কালে দর্শকদিগকে নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক দেখাইত। ঐ কালে পরস্পর গুণীনে গুণীনে মন্ত্র পরীক্ষা হইত। ওঝাগণ মন্ত্রবলে সর্পকে নির্জীব করিত, আবার মন্ত্র বলে জাগাইত। কেহ কেহ সর্পের মুখ হইতে গরল বাহির ও তাহা ভক্ষণ করিয়া মন্ত্র বলে বা জটাবুটী দ্রব্যগুণে অনায়াসে বিষ জীর্ণ করিত। কেহ বা হড়পি-স্থিত সর্প মন্ত্রবলে উড়াইত, কেহ বা রজ্জুকে সর্প করিয়া মঞ্জুষা মধ্যে পুনঃ স্থাপন করিত।

এখন আর সেকাল নাই, সে খেলাও নাই, সে গুণীনও নাই, কালে সকলই লোপ হইয়াছে। দেবদেবীও এক প্রকার নিদ্রিতা হইয়াছেন। ঐ সালতোড়া গ্রাম জেলা বাঁকুড়ার অধীন থানা গঙ্গাজলঘাটীর নিকট।

আর এক কথাও প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত দেবী ঝুমুর গান শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। গণিকাগণ দলপুষ্ট হইয়া যে রঙ্গ রসের গান করে, তাহার নাম ঝুমুর বা খেউড়। সেই সকল গানে কেবল পিরীতের কথা। দেবী সেই গান শুনিয়া অধিক প্রীত হইতেন। এখনও ঐ প্রদেশের স্থানে স্থানে ঝুমুরের দল আছে, এখনও বন্যজাতিগণ দলে দলে স্ত্রী, পুরুষে মিলিত হইয়া মাদল বাজাইয়া খেউড় গান করে। নিত্যাদেবীর যে কয়েকটী সহচরী বা ডাকিনী ছিল, তাহার মধ্যে বাশুলী নামা দ্বিজ কন্যা প্রধানা ছিলেন।

একদা, শ্রীশ্রীনিত্যাদেবী ঝুমুর গানের পরিবর্ত্তে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-ঘটিত পরিশুদ্ধ গীত চলন ও যাহাতে সহজ ভজন সর্ব্বত্র প্রচার হয়, বাশুলীর প্রতি সেই আজ্ঞা করেন, বাশুলী তদনুসারে, একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে নান্নুর গ্রামে উপনীত হইয়া এবং ক্ষেত্রে চণ্ডীদাসকে নিদ্রিত অবস্থায় নির্জ্জন গৃহে পাইয়া তাঁহার পৃষ্ঠ দেশে চাপড় মারেন। সেই চপেটাঘাতে চণ্ডীদাসের নিদ্রা ভঙ্গ হয়; বাশুলী সেইকালে চণ্ডীদাসকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বোপদেশ দিয়া শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর আশ্রয়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা-রসের গীত প্রচার করিতে ও শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে পরামর্শ দেন। আর রামীর সহিত প্রবৃত্ত হইতে বলেন। এ তত্ত্বপদে আছে; যথা—

"নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিলা সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে প্রবেশ যাইয়া করে॥

বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া, চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন, ইহা ছাড়া কিছু নয়॥
ছাড়ি যপতপ, করহ আরোপ, একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি, তাহা কর তুমি ভজহ চৌষট্টি সনে॥

* * * *

"রতি পরকিয়া, যাহারে কহিয়া, সেই সে আরোপ সার
ভজন তোমারি, রজক ঝিয়ারি, রামিণী নাম যাহার॥"

* * * * *

চণ্ডীদাস ইহা শ্রবণে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন; হে দ্বিজ কন্যে! আমি উত্তম কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, রামীর সহিত সাধ্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে আবার কোন্ বর্ণ প্রাপ্ত হইব? যে বৃন্দাবনের কথা বলিতেছেন, সে বৃন্দাবন কোথায়? আর কিশোর কিশোরী কোথায় আছেন? সে সাধনার অঙ্গ কি? এই বলিয়া যে একটী পদ্য প্রকাশ করেন, তাহা এই;—

প্রবর্ত্ত দেহের সাধনা করিলে, কোন্ বরণ হব।
কোন্ কর্ম্ম যাজন করিলে, কোন্ বৃন্দাবনে যাব॥
নব বৃন্দাবনে নব নাম হয়, সকল আনন্দময়।
কোন্ বৃন্দাবনে, ঈশ্বর মানুষে, মিলিত হইয়া রয়॥
কোন্ বৃন্দাবনে, বিরোজা বিলাসে, তরু লতা চারি পাশে।
কোন্ বৃন্দাবনে, কিশোরা কিশোরী, শ্রীরূপ মঞ্জরী সাথে॥
কোন্ বৃন্দাবনে, রস উপজয়ে, সুধার জনম তায়।
কোন্ বৃন্দাবনে, বিকশিত পথ, ভ্রমরা পশিছে তায়॥
গোপনের পথ, না হয় ব্যাকত রসিক জনার সনে।
উপাসনা ভেদ, যাহার হয়েছে, সেই সে মরম জানে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস, না জানিয়ে তাতে, কেমনে হইবে পার।
উত্তম কুলেতে লভিয়া জনম, ছি? নীচ সহ ব্যবহার॥

" " " " পদসমুদ্র।

বাশুলী শুনিয়া প্রশ্ন দূত পদে উত্তর করিলেন;—

"বাশুলী কহিছে শুনহে দ্বিজ।
কহিব তোমার সাধন বীজ॥
প্রথম দুয়ারে মদের গতি।
দ্বিতীয় দুয়ারে, আসক স্থিতি॥
তৃতীয় দুয়ারে, কন্দর্প রয়।
কন্দর্প রূপেতে, শ্রীকৃষ্ণ কয়॥
আসক রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কই।
মদরূপ ধরি, আশ্রিত হই॥
সাতাইস আঁখরে, সাধিতে তিনে।
একত্র করিয়া আপন মনে॥
রতির আকৃতি অনেকে রয়।
রসের আকৃতি কন্দর্প হয়॥
তিনটী আঁখরে রতিকে যজি।
পঞ্চম আঁখরে বানকে ভজি॥
দ্বিতীয় আসকে, সামান্য রতি।
তবে সে পাইবে, বিশেষ স্থিতি॥
চতুর্থ আঁখরে, সামান্য রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী (বশ)
বাশুলী কহয়ে, এই সে সার।
নিত্য বৃন্দাবন, বেদান্ত পার॥

* * * পদ-সমুদ্র।

চণ্ডীদাস এই সমস্যা শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। বাশুলী সেই অবস্থায় কৃতকার্য্য হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান অর্থাৎ নিত্যাস্থানে গমন করেন। পদে আছে;—

"চণ্ডীদাস প্রেমে, মূর্চ্ছিত হ'ল।
বাশুলী চলিয়া নিত্যতে গেল॥"

বাশুলীর এইরূপ প্রত্যাখ্যানে, মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর চণ্ডীদাসের মন উচাটন হয়। চণ্ডীদাস লেখা পড়া জানিতেন না। পরন্তু "বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য ছিলেন," তিনি কাহারও নিকট দীক্ষিত হন নাই। দেবীর প্রতি তাঁহার দৃঢ় ভক্তি ছিল। কে তাঁহার গুরু হইবেন, কেই বা সাধক শিক্ষা দিবেন, উত্তম কুলে জাত হইয়া কেমন করিয়া নীচাশ্রয় হইবেন, এই চিন্তায় আকুল হইলেন।

পাঠক, এই বাশুলী সেই ডাকিনী বাশুলী নহে, "নান্নুরের স্বয়ং অধিষ্ঠাত্রীদেবী," তিনি চণ্ডীদাস ও রামীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক "রাধাকৃষ্ণ" এই চতুরাক্ষর মহামন্ত্র দান করেন। আর গৌতমী তন্ত্র অর্থাৎ নির্য্যাস তন্ত্রের মতানুসারে সাধনা করিতে

বলেন। এবং তাহার প্রণালী. অর্থাৎ ক্রম সকল স্বয়ং গুরুরূপে শিক্ষা দেন। বলা-বাহুল্য, এই সাধন তন্ত্রের নাম "গোপীভজন"। ইহা এক প্রকার সর্প লইয়া খেলা। অনন্তর চণ্ডীদাস ও রামী শ্রীশ্রী বাশুলীদেবীর কৃপায় সেই মন্ত্রাশ্রয় করিয়া উভয়ে সাধন শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। অনুক্ষণ সেই মন্ত্র যজন যাজন করিতেন। মহামন্ত্র ও সাধনার প্রভাবে রামীর দর্শনে এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল-রূপের ভাবোদ্দীপনে চণ্ডীদাসের বদন হইতে ব্রজলীলার মধুর মধুর পদ গান স্ফুরিত হইত। তিনি, রামীকে আশ্রয় করিয়াই (গোপী ভাবে) সঙ্গীতোপযোগী পদ রচনা করিতেন। রামিণী সেই সকল পদ কণ্ঠস্থ ও নিজকৃত কোন কোন পদের সহিত যোগ করিয়া তান, মান, লয়, ও স্বর সংযোগে ঘরে ঘরে গান করিয়া বেড়াইতেন।

নান্নুরের ব্রাহ্মণগণ সকলেই দেবীভক্ত ছিলেন। চণ্ডীদাসের পদ ও রামমণির গীতা তাহাদিগকে বড় ভাল লাগিত না; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে পিরীতি ভাবের গীত শুনিলে তাহাদিগের কর্ণজ্বালা ও অঙ্গজ্বালা হইত। সেই সকল গান শুনিলে অন্তঃপুর-চারিণী ললনাগণের চিত্ত বিচলিত হইবার সম্ভব, এইজন্য ঐ সকল গীত যাতে রহিত ও চণ্ডীদাস ও রামমণি স্থানান্তরিত হয়, সেই চেষ্টায় সকলে একটা ঘোট করেন। সেই ঘোটে এই এই কথাগুলি উত্থাপন হয়, যথা"—(১) চণ্ডী ও রামী উভয়েই অনূঢ়, (২) পরস্পর সংঘটনে সঙ্গ অর্থাৎ উভয়েই সঙ্গ দোষে দোষী, (৩) রামী ধোপার মেয়ে, চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ হইয়া যখন নীচগামী হইয়াছে, তখন চণ্ডীর সহিত আহার ব্যবহার ও পুঁক্তি ভোজন ও তাঁহার হস্তের পাক অন্ন দেবীকে অর্পণ করা কর্ত্তব্য নহে, (৪) উভয়কেই গ্রাম হইতে দূর করিয়া দেওয়া ও অশ্লীল গান রহিত করা কর্ত্তব্য, (৫) অন্যান্য গ্রামে গিয়া উহারা কোন আশ্রয় না পায়, তজ্জন্য এ কথা ঘোষণা দিয়া গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র ও সকলকে সাবধান করা উচিত।" গ্রামের কি ছোট কি বড়, সকলেরই এই প্রস্তাবে একমত হওয়ায় তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। সেই দিন হইতে দেশচক্রে চণ্ডীদাস পড়িলেন ও দেবী সেবার কার্য্যে অধিকার-চ্যুত ও দেবীর প্রসাদ অন্নে রামমণি বঞ্চিতা হইলেন।

অনন্তর, ঢক্কার বাদনে উভয়ের ঐ কলঙ্ক দেশে বিদেশে রাষ্ট্র হইল; ইহাতে রামমণি মিছা কলঙ্কে অত্যন্ত দুঃখিতা ও ম্রিয়মানা হইয়া খেদোক্তি দ্বারা চণ্ডীদাসের নিকট নিজ মনোগত ভাব পদ্যে প্রকাশ করেন, যথা,—

"কি কহিব বঁধুহে, কহিতে না যুয়ায়।
কাঁদিয়া কহিতে, পোড়া মুখে হাসি পায়॥
প্রেমের পশরা মোর, দরিয়ায় ভাসে হে!
না খাইনু না ছুঁইনু, স্রোতে ভেসে যায় হে॥
অনামুখ মিন্‌সেগুলার, কিবা বুকের পাটা।
কলঙ্ক রটয় আর, কুলে দেয় বাটা॥
ঢাক পিটীয়া সহজ বাদ, গ্রামে গ্রামে দেয় হে॥
চক্ষে না দেখিয়া মিছে, কলঙ্ক রটায় হে॥
ঢাক ঢোলে যে জন, সুজন নিন্দা করে।
ঝন্‌ঝনা না পড়ে কেন, মস্তকোপরে।
অবিচার পুরী দেশে আর না রহিব।
যে দেশে পাষণ্ড নাই, সেই দেশে যাব॥
বাশুলী দেবীর যদি, কৃপা দৃষ্টি হয়।
মিছা কথা সেঁচা জল, কতক্ষণ রয়॥
আপনার নাক কাটি, পরে বলে বোঁচা।
সেভয় করে না রামা, নিজে আছে সাঁচা॥"

পদসমুদ্র

চণ্ডীদাস শুনিয়া উত্তর করিলেন;—বিদগ্ধে! দুঃখ দ্বারা হতাশ হইও না। এইত অভিসারের সময়, যথা;—

"রূপিলে বিষের গাছ, হৃদয় মাঝারে।
গরলে জ্বলিল অঙ্গ, দোষ দিবে কারে॥
যদি ঘরে রৈতে নার, কর অভিসার।
চণ্ডীদাসেতে কহে, এই সে বিচার!"

পদসমুদ্র

আরো বলিলেন, শ্যাম-কলঙ্কী হওয়া ভাল, কিন্তু শ্যাম-বৈরী হওয়া ভাল নয়। রামমণি বলিলেন, সে আবার কি? চণ্ডীদাস উল্লাসে বলিলেন;—

"চণ্ডীদাস বলে, শুনলো সুন্দরী একথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম বন্ধুগণে পিরীতি করিয়া কেবা কোথা সুখে আছে॥
আপনা বুঝিলে, লাখে এক মিলে ঘুচিলে মনের ধাঁদা।
চণ্ডীদাস বলে পাবে হাতে হাতে চারি অক্ষরে থাক বাঁধা

* * * *

চারি অক্ষর কি? শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চতুরাক্ষর মহামন্ত্র। এই চারি অক্ষর মহামন্ত্রে বাঁধা থাকিলে সকল আপদ বালাই দূর হয়। যথা;—

"রাধাকৃষ্ণ পদে ভক্তি, কা চিন্তা মরণে রণে"

এই কথায় রামমণিকে আশ্বস্ত করিয়া গুপ্তভাবে থাকিতে বলিলেন। অনন্তর, লোক শিক্ষা দিবার নিমিত্ত চণ্ডীদাস পীড়ার ভান করিয়া কুটিরের মধ্যে শয়ন করিয়া রহিলেন। আর বমনের ছলে সতৃষ্ণ হইয়া প্রতিবাসীদিগের নিকট মুহুর্মুহু জল যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতিবাসীগণ সেই কালে এতদূর দুষ্ট ব্যবহার করিল, যে জল দান দূরের কথা, চণ্ডীদাসের কাতরোক্তি শুনিয়াও শুনিল না; পীড়া দেখিয়াও দেখিল না; এমন কি, চণ্ডীদাসের আশ্রম পর্য্যন্ত মাড়াইল না।

চণ্ডীদাস এই অবস্থায় দুই দিন অনসনে কুটির মধ্যে শয্যায় পতিত থাকিয়া কাল কাটাইলেন। তৃতীয় দিন উপস্থিত, সেই দিন চণ্ডীদাসের পূর্ব্ববৎ আর সাড়া নাই, শব্দও নাই। পশ্চাৎ ঐ কথা গ্রামস্থ লোকের কাণে উঠিল। সকলে প্রকৃত বিষয় অনুসন্ধানের নিমিত্ত উগ্রচণ্ডাগোচ জনকয়েক ব্রাহ্মণকে চণ্ডীদাসের আশ্রমে পাঠাইলেন।

ব্রাহ্মণগণ কুটিরের নিকট উপস্থিত হইয়া দ্বারদেশে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, চণ্ডীদাস প্রকৃত মৃত্যুমুখে পতিত। পুনঃ পুনঃ উচ্চ ডাকেও উত্তর নাই, নিকটেও কেহ নাই; কেবল কুটির মধ্যে খট্টাসনে কতিপয় শ্রীশালগ্রাম শ্রীবিষ্ণু এবং ধাতু নির্ম্মিত শ্রীবাস গোপাল প্রতিমূর্ত্তি বিনা সেবা পূজায় উপবাসী আছেন। তদ্দৃষ্টে তদ্দণ্ডেই গ্রামস্থ লোককে সেই কথা জানাইলেন। তৎশ্রবণে তৎকালে সকলের একটা বিষম দায় উপস্থিত হইল। দায় কি?

শাস্ত্রে আছে, গণ্ডকি-জাতঃ শীলারূপী শ্রীসালগ্রাম শ্রীবিষ্ণু যে কোন জাতির গৃহে থাকুন না কেন, ব্রাহ্মণ মাত্রেই তাঁহার সেবা পূজা করিবার অধিকারী। নীচাশ্রমে থাকিলে যদি কোন ব্রাহ্মণ তাচ্ছিল্য বা অগ্রাহ্য করিয়া সেবা পূজা না করেন, মহাপাপ ও মহা অপরাধ হয়, সে অপরাধের মোচন নাই।

পক্ষান্তরে যে কোন জাতি হউক না কেন, গ্রামের মধ্যে কোন গৃহস্থের বাটীতে বিনা সংকারে মড়া অর্থাৎ মৃত কায়া পড়িয়া থাকিলে যাবৎ সেই শবের সংকার, অথবা সেই শব স্থানান্তর না হয়, তাবৎ গ্রামে শ্রীবিষ্ণু পূজাদি কার্য্য একেবারে নিষিদ্ধ। কারণ তৎসময়ে সেই মৃতাশৌচ সকলকেই স্পর্শকরে।

চণ্ডীদাস নিজে অনূঢ় বিশেষ পতিত, তাহার আত্মীয় অর্থাৎ আপনার বলিতে কেহই নাই; কে তাহার গতি কার্য্য করিবে। কেমনেই বা ধর্ম্ম রক্ষা ও বিষ্ণুপূজা হইবে? এই ভাবনায় সকলে বিষম সঙ্কটে পতিত

হইয়া শেষ ব্যবস্থার নিমিত্ত অধ্যাপকের নিকটে গমন করেন। অধ্যাপক মহাশয়, ব্রাহ্মণগণ প্রমুখাৎ সকল কথা অবগত হইয়া বলিলেন, "চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ, তাঁহার গতিকার্য্য করিতে শূদ্রের অধিকার নাই; সংহিতাকার যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণের গতি ব্রাহ্মণ," তাঁহার দাহন বহন ব্রাহ্মণকেই করিতে হইবে। যাবৎ চণ্ডীদাসের গতিকার্য্য না হয়, তাবৎ বিষ্ণুপূজা নিষিদ্ধ, অতএব সকলে মিলিয়া চণ্ডীদাসের মৃত দেহ শ্মশান ভূমে লইয়া গিয়া অগ্নি দাও, পশ্চাৎ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সকলে শুদ্ধি হইবে, অন্যথা বিষ্ণুপূজা হইবে না।" (ক্রমশঃ)

শ্রীহারাধন দত্ত।

ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ।

ইতিহাস।

১৩০০ সাল ফরিদপুরের পক্ষে অতি দুর্বৎসর। ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের অসাময়িক প্লাবনে ফরিদপুরের বহুস্থানের ধান বিনষ্ট হইয়া যায়। এজন্য ভাদ্র মাসে সমস্ত জেলায় হাহাকার উঠে। আষাঢ় মাসে (১৩০০) ফরিদপুর সুহৃদ্‌সভার সম্পাদক বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী জলপ্লাবন দেখিতে গমন করেন। পরিদর্শনান্তে, তিনি কলিকাতা পৌঁছিয়া, সুহৃদ্‌সভার নিকট ভাবী আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেন এবং শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এক খানি পত্র লেখেন। তাহার উত্তরে তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গ্রাউজ সাহেব ৪ঠা আগষ্ট, ১৮৯৩ যে উত্তর প্রদান করেন, তাহা এই;—

"Sir, I have the honour in reply to your letter of the 1st instant to inform you that although it seems from the expression used therein that you take an exaggerated view of the distress that is likely to occur in the southern portion of this district, it has already engaged my attention, and I have just returned from a tour in those parts and you may rest assure that necessary measures will be taken." Sd. E. F. Growse, Magistrate. No. 1739—4th August, 1893.

ভাদ্রমাসে আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত হইলে, চতুর্দ্দিকের অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য, নানাস্থানে মুদ্রিত পত্র প্রেরণ করা হয়। মুদ্রিত পত্র পাওয়ার পর চতুর্দ্দিক হইতে রাশি রাশি পত্র পাওয়া যাইতে লাগিল। এই কার্য্যে শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় অগ্রণী হইয়াছিলেন। গোপালগঞ্জ ও কোটালিপাড় থানা বাদে, ফরিদপুরের অন্যান্য থানার বহুগ্রাম হইতে অন্ন কষ্টের বিবরণ সহ ৫০।৬০ খান পত্র আসিয়াছিল। তাহাতে জানা যায় যে, প্রায় ১০০০ গ্রামে অন্নকষ্ট। এই সময় কি করা যাইবে, খুব চিন্তার বিষয় হইল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানে যাইয়া কাজ করিতে পারেন, এমন ৮।১০ জন উপযুক্ত লোকের অনুসন্ধান করা হইল, দুঃখের বিষয়, তাহা পাওয়া গেল না।

তখন নিরুপায় হইয়া, সমস্ত বিবরণের সংক্ষিপ্ত চুম্বকসহ, ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ও বোর্ডে আবেদন প্রেরণ করা হইল, এবং এই কথা মুদ্রিত পত্রদ্বারা সমস্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে ঘোষণা করা হইল। এই সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট কুল-তিলক শ্রীযুক্ত বিটসন্ বেল সাহেব ফরিদপুরের অফিসিয়াটিং ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং সহৃদয় বাবু হরিশচন্দ্র সেন ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান ছিলেন। বোর্ড হইতে ২৫শে আগষ্ট (১৮৯৩) পত্র পাওয়া

গেল যে, বোর্ড বিধিমত চেষ্টা করিতেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ। তিনি লিখিয়াছিলেন ;—

"Sir, with reference to your letter of the 15th instant, I have the honour to inform you that a sum of Rs. 5000 has been given by the District Board as a loan to the people in distress and a further sum of Rs. 20,000 has been asked from Government for the purpose. Besides some of the resident and non-resident Zemindars and well-to-do men of this District were requested to contribute something for the immediate relief of the distressed people. Some of them have already complied with the request and the other are expected to do so shortly.

2. I beg also to state that some of the gentlemen have been requested to arrange to supply rice to those who are absolutely indigent and unable to work from age, infirmity or sex, or to send some money that rice may be bought for this purpose.

3. A Committee has also been formed for proper distribution of Rs. 300 given in addition by Maharajah Sir Jotindra Mohan Tagore, K. C. S. I., especially for the relief of his ryots in the Ainpur Thanah.

4. Two native Doctors have been sent to the Palong quarters for the treatment of cholera patients." Sd. B. Bell., off. Magistrate, Faridpur, 19th Sep. 1893.

ইহার পর তদানীন্তন কালের অফিসিয়াটিং ছোট লাট সাহেব, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ খ্রীঃ এক বিস্তৃত রিজলিউসনে লেখেন,—(২৬ শে সেপ্টেম্বরের ষ্টেটস্‌ম্যান, ১৮৯৩।)

"In the Dacca Division there is a small tract known as the *Bil* country, in the Backerganj and Faridpur Districts, with a population of about 40,000 persons, in which there is likely to be some scarcity, possibly even distress. * * *

* * * * * * *

The supply of fish is inexhaustible and part of the population being fishermen, food is procurable by them independently of their rice crops. The remainder of the population consists mostly of Christians, Mussalmans and Namas. These have been accustomed to move elsewhere in search of labour; but as the *aus* crop is light, and as earth-work does not in these districts begin before December, these people, if not assisted, will be pinched, if not subjected to still greater distress.** * * * They (complaints) have been again raised and Sir Antony Mac-Donnell has again ordered test relief works to be started. The District officers are carefully watching for signs of distress, and have been instructed to make agricultural loans and to take such other measures as they may on personal enquiry find to be necessary. In making agricultural loans care is necessary lest the amounts advanced are expended on payment of rent, and not in the support of the recipients."

ইহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পুনঃ যে পত্র লেখা হয়, তদুত্তরে তিনি লেখেন যে, "গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রচুর নহে ; পুনঃ টাকার জন্য লেখা হইয়াছে।" তাঁহার পত্র এই—

"Sir,—With reference to your note of 26th September, I beg to inform you that there is no change in the prospects of the district at present, except that the floods are gradually subsiding and the price of rice falling in the affected area, owing to increased importation. We are taking all necessary measures to cope with the distress.

A sum of Rs. 5,000 from the District Board and a sum of Rs. 3,000 from the Government is being distributed as loans to those in need. At present we are chiefly engaged in making enquiries to find out the really deserving cases: of course the applicants cannot all receive sums out of our small allotment. I am in daily hopes, however, of receiving more money from Government.

We are offering work at the rate of 2 annas per day to those in distress, but none will accept our rates so far. We are distributing rice to the infirm and widows, from funds raised by private subscriptions.

I am very grateful to those who have come forward to help us, but our funds for this purpose are always, as you may imagine, running short.

I start the day after to-morrow for a tour through the distressed area, and shall do all I can to alleviate the sufferers.

The Civil Surgeon is dealing with the cholera outbreak: he is at present sending down more men to cope with the work, and is probably going himself next week."

Yours sincerely,
N. D. BEATSON BELL,
offg. Magistrate.

Faridpur, Sept. 29. 1893.

এইরূপ ভাবে, বোর্ডের ও গবর্ণমেণ্টের

চেষ্টায় একরূপ দিন কাটিতে লাগিল। সুহৃদ্ সভার সম্পাদক বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়, বাবু রসিকলাল রায় মহাশয়ের সমভিব্যাহারে, কতক টাকা লইয়া, দুর্ভিক্ষের সাহায্য ও পালংথানায় ওলাউঠার ঔষধ বিতরণ করিতে কার্ত্তিক মাসে গমন করেন। ভাঙ্গা, মাদারীপুর থানার কতকাংশ দেখিয়া, তাঁহারা পালং থানায় গমন করেন। এই সময়ে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় যে, পালং থানায় ২০০০ লোক ওলাউঠায় মরিয়াছে, এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া তাঁহারা পালং গমন করিলেন। কোটালিপাড় থানায় আর যাওয়া হইল না। মাদারিপুর লোকাল বোর্ড যাহা যাহা করিয়াছেন, বিবরণ অবগত হইয়া তাঁহারা মনে করিলেন, এদিকের কার্য্য বেশ চলিতেছে। পালং থানার বহুগ্রাম পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা দেখিলেন, সেদিকে দুর্ভিক্ষের তত আশঙ্কা নাই, কিন্তু অনেক লোক ওলাউঠায় মরিয়াছে ও মরিতেছে। থানায় যাইয়া মৃতুসংখ্যা জানিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা জানিতে পারিলেন না, থানার লোকেরা বলিল যে, গবর্ণমেণ্ট হইতে বিবরণ দেওয়ার নিষেধ-পত্র আসিয়াছে। শেষে নানাগ্রামে ওলাউঠার ঔষধ বিতরণ করিয়া তাঁহারা ফিরিলেন। শীতকালে বোর্ড হইতে কোটালিপাড় একটী বড় রাস্তা ও ছোট ছোট গ্রাম্য রাস্তা হইতে লাগিল, এবং ধানভানার কাজ চলিতে লাগিল। তাহাতে একরূপ চলিতেছিল। কিন্তু ফাল্গুন মাসের শেষে আবার ভীষণ সংবাদ পাওয়া গেল যে, কোটালিপাড়ে খুব অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে রাধাগঞ্জ যাইয়া অতি ভয়ানক পত্র সকল লিখিতে লাগিলেন। লোক অনাহারে মরিতেছে, তাঁহার পত্রে অবগত হইয়া ফরিদপুর সুহৃদ্‌সভা হইতে, মাদারিপুরের সবডিভিসনাল অফিসার, ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মাদারিপুর লোকাল বোর্ড এবং আরো বহু স্থানে পত্র লেখা হইল। গোপালগঞ্জের শ্রীযুক্ত রেঃ মথুরানাথ বসু, বি,এ, মাদারিপুর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার বাবু কুলচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম,এ, উনসিয়া আর্য্যবিদ্যালয়ের কতিপয় পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত রেঃ জেমস্ সাহেব মহোদয়ের অধীনস্থ কতিপয় খ্রীষ্ট-মিশনরী প্রভৃতি মহাশয়গণের ও আরো বহু লোকের এবং সর্ব্বোপরি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পত্র পাইয়া সভা বড়ই দুঃখিত হইলেন। মাদারিপুরের সবডিভিসনাল অফিসার বা লোকাল বোর্ড উত্তর দিলেন না। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পত্র এই,—

From R. R. POPE. Esquire C. S.,
Chairman, District Board, Faridpur;
To the Secretary, Faridpur Suhrid Sava,
Dated Faridpur, The 2nd April, 1894.

Sir,

In reply to your vernacular letter of the 13th Chaitra, 1300 B. S. I have the honour to state that the District Board have taken all measures that lie in their power to put down the distress complained off. They have started relief works in the neighbourhood and introduced the system of husking Dhan by the old and poor women to help with certain amount of rice thus produced by them. The resources of the District Board have nearly been all exhausted and the Magistrate who has been on the spot personally, has written to the Commissioner of the division, a few days ago to ask help from Government.

I have the honour,
Sir,
Your most obedient servant,
Sd. R. R. POPE,
Chairman.

এই পত্রের পর আর অপেক্ষা করা উচিত নহে, মনে করিয়া, ফরিদপুর সুহৃদ্‌সভা, কিছু টাকা ঋণ করিয়া, বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ২১শে চৈত্র, ১৩০০, কোটালিপাড় প্রেরণ করেন, এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য বিশেষ

চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। বিহারী বাবু অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে প্রায় ৫০ খান গ্রামের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া, ৮ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত উত্তরপাড় হাটে দরিদ্রদিগকে চাউল, বস্ত্র, পয়সা ইত্যাদি দান করিয়াছেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ কাজের জন্য সভা চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। এরূপ পরিশ্রমী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, পরদুঃখকাতর লোক আমাদের দেশে বিরল। কোটালিপাড়ের লোকের মুখে তাঁহার প্রশংসা ধরে না। তিনি যে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিয়াছেন, এই প্রবন্ধের সহিত তাহা সংলগ্ন করিলাম।

এই সময়ে নানা কাগজে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখা হইয়াছিল। সেই সকল প্রার্থনাপত্রে দুর্ভিক্ষের যথাযথ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছিল। তাহা পাঠ করিয়া, মাদারীপুরের সবডিভিসনাল অফিসার সভার নিকট যে পত্র লেখেন, তাহা এ স্থলে তুলিয়া দিলাম—

No. 238.—G.

From

MAULVI FAZLAL KARIM,
Sub-Divisional Officer, Madaripore.
To Babu Kali Prasanna Ray-Chaudhuri.
Secretary, Faridpore Shurit-Skabka.
Dated, Madaripore, the 16th May, 1894.

Sir,

In your communication published in the *Dainik* and *Samachar Chandrika* of the 5th April, 1894, it is stated that some people are dying of starvation and some are committing suicide in shere distress. I shall be much obliged if you would please to give me the names and addresses of the persons therein referred to at an early date.

I have the honour to be,

Sir,
Your most obedient servant,
Sd. F. Karim.
Sub-Divisional Officer.

এই পত্রের উত্তরে, সুহৃদসভা হইতে, স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির পত্রের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত পত্র লেখা হয়; দুঃখের বিষয়, এ পত্রের উত্তর প্রদান করা দূরে থাকুক, তিনি প্রাপ্তিস্বীকারও করেন নাই।

ফরিদপুর সুহৃদ সভার কার্য্যালয়;
২১০।৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১।
মাননীয় শ্রীযুক্ত মাদারীপুর সবডিভিসনাল অফিসার
মহোদয় বরাবরেষু।

সসম্মান বিনীত নিবেদন,—

আপনার ২৩৮ জি নম্বর অঙ্কিত, ১৬ই মে (১৮৯৪) তারিখের বাবু কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর নামের পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম। ফরিদপুর সুহৃদসভার সম্পাদক আমি বলিয়া এ পত্র খুলিয়াছি। আপনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের বিবরণ জানিতে চাহিয়া যে সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অত্যন্ত বাধিত হইলাম। দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহাষ্যার্থ ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা হইতে বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রেরিত হইয়াছেন। তিনি উত্তরপাড় হাটে চাউল বিতরণ করিতেছেন। সাহায্যার্থ চাঁদা আদায় করিবার জন্য আমি যে আবেদন পত্র বাহির করিয়াছি, তাহা ইতিপূর্ব্বে মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছি। দৈনিকপত্রিকাতে উহাই ছাপা হইয়া থাকিবে। আমি স্বতন্ত্র কোন পত্র লিখি নাই। গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে কখনও চলি নাই, কখনও চলিব ও না। গবর্ণমেণ্টই আমাদের ভরসা। আমি বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে কোটালিপাড়, মাদারিপুর ও গোপালগঞ্জ থানা পরিদর্শন করি, ভাদ্র মাসে সমস্ত দেশের বিবরণ সংগ্রহ করি, তৎপর কার্ত্তিক মাসে পালং থানার অধিকাংশ গ্রাম পরিদর্শন করি। এ সকল স্থানের বিবরণ কোন কাগজে না লিখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ও বোর্ডে প্রেরণ করি। বোর্ড এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দেশের জন্য অনেক করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে, টাকার অভাবে রিলিফ ওয়ার্ক বন্ধ হইয়াছে, যখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লিখিলেন (২রা এপ্রেল, ১৮৯৪), তখনই সুহৃদ্ সভা সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝিলেন। এই সময়ে সভার হস্তে বহু পত্র উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে কয়েক খানি পত্র হইতে কিছু কিছু তুলিয়া দিলাম। ইহাতেই, সাহায্য প্রার্থনার আবেদনের বর্ণিত কথা প্রতিপন্ন হইবে। এবং আমি ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার প্রতিনিধি মহাশয়কে বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া

আপনার নিকট পাঠাইতে লিখিলাম, আপনি তাঁহার নিকট লিখিলেই তিনি সবিশেষ জানাইবেন। আপনি একটু চেষ্টা করিলেই স্থানীয় অবস্থা জানিতে পারিবেন। আশা করি, ইহাতেই আপনি পরিতুষ্ট হইবেন। স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে আর আন্দোলন না করিয়া, আপনি যথাসাধ্য প্রতিবিধানের চেষ্টা করিলে একান্ত বাধিত হইব। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আপনার নিকট (২৬শে মার্চ্চ, ১৮৯৪) পত্র লিখিয়া উত্তর না পাইয়া দুঃখিত আছি। আপনারা প্রতিবিধান করিলে দরিদ্র নিরন্ন ব্যক্তিদিগের জীবন ধারণের উপায় কি?

Extract. No. 1. From the letter No. 1, dated 2nd April, 1894 of R. R. Pope Esquire, C. S, chairman District Board, Faridpur.—"The resources of the District Board have nearly been all exhausted and the Magistrate who has been on the spot personally, has written to the Commissioner of the division, a few days ago to ask help from Government."

Ex. No. 2. From the letter, dated 17th April, 1894 of Babu Avinas Chandra Ray, Chairman, Local Board, Madaripore.

"ষোল সের ধান ভানিয়া ৵৯ নয় সের চাউল তাহারা ফেরত দেয়, বক্রী যাহা থাকে, তাহা তাহারা পায়। আপাততঃ ঐ কার্য্য বন্ধ করা হইয়াছে।"

Ex. No. 3. From the letter, dated 30th March, of Babu Kula Chandra Roy-Chowdury, M.A., Head Master, Madaripore School.

"মদারীপুরের মিসন হইতে কয়েকটী খ্রীষ্টান আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা যাহা বলিলেন, তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। দুইটী লোক অন্নাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে। চারিদিকেই হাহাকার এবং আর্ত্তনাদ। তাঁহাদের সহিত ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রেরিত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি যাহা পত্রিকায় লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টান মিসনারীগণ তাহা সত্য বলিলেন।"

Ex. No. 4. From the letter, dated 2nd April, 1894, of Rev. M. N. Bose, B.A., B.L., Missionary of Gopalganj.—"The condition of Katawalipara is dreadful, several cases of suicide have taken place and many more will *surely* die if help be not at once. I am afraid Government is not going to do much for them."

Ex. No. 5. From the 2nd letter, dated 3rd May, 1894, of Rev. M. N. Bose, "why do you withdraw from the relief while the poeple are dying from hunger every week."

Ex. No. 6. From the letter, dated ২২শে চৈত্র, ১৩০০ of Pandit Revati Mohan Kabyaratna and Kali Das Bidyabinode of উনসিয়া।

"এমন কি, দুর্ভিক্ষ-ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া রাধাগঞ্জ, গোয়ালক্ষ এই দুই স্থানে ২টী লোক অকালে উদ্বন্ধনে জীবন ত্যাগ করিয়াছে। আমাদিগের সাধারণ বয়সে এরূপ দুর্ভিক্ষ আর দেখি নাই।"

Ex. No. 7. From the letter, dated Radhaganj, 28th March, 1894, of Babu Kasi Chandra Ghosal, delegate, Brahmo Samaj.

"না খেতে পেয়ে দুটী স্ত্রীলোক গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। একটী একমাস হইল মরিয়াছে, আর একটী ১০।১২ দিন হইল মরিয়াছে। আর একটী স্ত্রী লোকও মাঠে মরিয়াছে; তাহার শব শেয়াল কুকুরে খাইয়াছে।

আজ ২০ দিন হইল এক মুসলমান মাঝির গলা কাটিয়া টাকা লইয়া গিয়াছে। রাধাগঞ্জের নিকট একটা বাড়ীতে ৮১ খানা ঘর পোড়াইয়া দিয়াছে। আরও ৩ খানা বড় বাড়ী পোড়াইয়া দিয়াছে।

শুনিলাম আমবাড়ীতে একটী পুরুষ মরিয়াছে।"

Ex. No. 8. From the letter, dated Radhaganj, 3rd April, 1894, of Babu Chandra Kumer Sarkar and Babu Sasadhar Chakervarti, Missionaries.

"সাতমাস যাবৎ গরীব দুঃখীর উপকারার্থ ইহাদিগেরই মধ্যে বাস করিতেছি। কোটালিপাড় সার্কেলে ৩৩০০০ তেত্রিশ হাজার লোকের বাস, তন্মধ্যে কুড়ি হাজাব লোকেরই ভয়ানক অন্নকষ্ট। এমন কি, কোলের ঝি বউ দুধের ছেলে মেয়ে ফেলিয়া পেটের জ্বালায় হাটে বাজারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়। কাশী বাবুর পত্রে আপনারা যে সকল লোমহর্ষণ হৃদয়-বিদারক কাণ্ড শ্রুত হইয়াছেন, তৎপরও ঐ প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছে। অদ্য ৫দিন হইল গোয়ালক্ষ নিবাসী শশী কুমার দে দাস নামক জনৈক বহু পরিবারের কর্ত্তা, ৩ দিনের মধ্যে আহারের সংস্থান করিতে না পারিয়া, গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।"

Ex. No. 9. From the letter, dated Radhaganj, 3rd Baisack, 1301 B. S. of Babu Behari Lal Chakervati, delegate F.S. Sava.

"শুনিলাম অদ্য ১০ দিন হইল বাইনারী গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র দাইড় নামক একটী লোক না খাইতে না খাইতে

মরিয়া গিয়াছে। তাহার পরিবারের মধ্যে ১২।১৩ বৎসরের বালকই অধিক বয়স্ক পুরুষ।"

একান্ত বাধ্য,—শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, সম্পাদক।

আষাঢ় মাসের শেষাংশে বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী লিখিলেন যে, "অবস্থা কতক ভাল হইয়াছে, এখন কাজ বন্ধ করা যাইতে পারে।" সুহৃদ্‌সভা মনে করিলেন যে, স্থানীয় অবস্থা আর একবার পরিদর্শন করিয়া কাজ বন্ধ করা উচিত। ইহার পূর্ব্বে মাদরা হইতে বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, মহাশয় মাদ্‌রার দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সে স্থান ও কোটালিপাড় পরিদর্শন করিবার জন্য সুহৃদ্‌সভার সম্পাদক বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় ২১শে আষাঢ় মফঃস্বল যাত্রা করেন। নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া শেষে মাদ্‌রা পরিদর্শন করেন। মাদ্‌রা অন্নক্লিষ্ট লোকদিগকে কিছু কিছু প্রদান করিয়াছিলেন। শশি-বাবু তখন বাড়ীতে না থাকায় কোন বিশেষ বন্দোবস্ত না করিতে পারিয়া, তিনি মাদারিপুর আসিয়া, লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মাদ্‌রার অবস্থা জ্ঞাত করেন। তৎপর আফাসী পরিদর্শন করেন ও কিছু কিছু সাহায্য প্রদান করেন। তৎপর কোটালিপাড় উপস্থিত হন। কোটালিপাড়ের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ধারণা হয় যে, কিছুতেই আপাততঃ সাহায্য বন্ধ করা উচিত নয়। লোকের যে কি দুঃখে দিন যাইতেছে, দেখিলে পাষাণও ফাটিয়া যায়। এইরূপ অবস্থা, অথচ বিহারী বাবুরও অধিক দিন থাকার যো নাই, কেন না, তাঁহার কলেজ খুলিয়াছে, অবশেষে লোকের বন্দোবস্ত করিতে, ফরিদপুর হইয়া, তিনি কলিকাতা প্রত্যাগত হন। গোপালগঞ্জ, উলপুর, উজানি, মুকসুদপুর প্রভৃতি স্থান ও তৎ পথের সমুদয় স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। সেই সময়ে পাকা আউস ধান্য ডুবিয়া যাইতেছিল। বোরো ধান হওয়ায় গোপালগঞ্জ থানার অন্নকষ্ট অনেকটা থামিয়াছিল। কিন্তু আউস ধান্য ডুবিয়া যাওয়ায় আবার লোকের কষ্ট হইতেছে। কিন্তু সে কষ্ট এখনও মারাত্মক নহে। ফদিরপুর যে দিন উপস্থিত হন, সে দিন ছোট লাট তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত করার জন্য শ্রীযুক্ত রেঃ মথুরানাথ বসু, বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার, বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার ও বাবু দীননাথ দাস মহাশয়দিগকে তিনি বিশেষরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। লাট সাহেবকে যে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে দুর্ভিক্ষের বিষয় উল্লেখ ছিল। তৎপর তিনি কলিকাতা আসিয়া কোটালিপাড় ও মাদ্‌রা লোক পাঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লোক না পাওয়ায় বড়ই দুঃখিত হইয়া শেষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লেখেন এবং সঞ্জীবনীতে দুর্ভিক্ষের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ৫ খান পত্র প্রকাশ করেন। ইত্যবসরে বিহারী বাবু কলিকাতা আগমন করেন। তৎপর কোটালিপাড় হইতে পত্র পাইয়া অবগত হওয়া গিয়াছে, একটী লোক ১৫৲ টাকায় একটী ছেলে বিক্রয় করিয়াছে, এবং একটী স্ত্রীলোক অনাহারে মরিয়াছে, তাহার মৃতদেহ শৃগালে খাইয়াছে, এবং আর একটী লোক অনাহারে মারা গিয়াছে। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায় ৩জন সহৃদয় লোক পাওয়া গিয়াছে। বাবু হরিমোহন ঘোষাল, ব্রাহ্মসমাজের সাহায্য লইয়া মাদ্‌রা গিয়াছেন; এবং সুহৃদ্‌সভার সভ্য কুঞ্জলাল ঘোষ আর একটী ভাইকে লইয়া ঔষধ, বস্ত্র ও টাকা সহ ২৯শে শ্রাবণ উত্তরপাড় গিয়াছেন।

তাঁহারা যাইয়া চাউল, বস্ত্র ও ঔষধ বিতরণ আরম্ভ করিয়াছেন, দিন দিন ভিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। কোটালিপাড়ে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত প্রায় ২০০০ লোককে সাহায্য দিতে হইবে। তাঁহারা যতদিন থাকিবেন, সাহায্য প্রদান করা হইবে। তাঁহারা সহৃদয় ব্যক্তি,তাঁহাদের দ্বারা অনেক উপকার হইবে, আশা করা যায়। এস্থলে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজকে বিশেষরূপ ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সুহৃদ্‌সভার কৃত কার্য্য।

সুহৃদ্ সভার প্রতিনিধি বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী তাঁহার কার্য্যের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এই স্থানে সংলগ্ন করিলাম—

"আমি বিগত ২১ শে চৈত্র, মঙ্গলবার, ফরিদপুর সুহৃদ্‌সভার প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া কোটালিপাড় দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদিগের অবস্থা পরিদর্শনার্থে কলিকাতা হইতে রওয়ানা হই। রাজবাড়ী, ফরিদপুর এবং মাদারিপুর প্রভৃতি স্থানে ক্রমে কয়েকদিন অতিবাহিত করি। মাদারিপুরে ৩ দিবস থাকিয়া তথাকার হেডমাষ্টার, সুহৃদ্‌সভার সভ্য বাবু কুলচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম, এ, মহাশয়ের সাহায্যে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করি। স্থানীয় উকীল বাবু ললিত মোহন সেন, বি, এল,মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ যত্ন প্রকাশ করেন এবং আমার কার্য্যের সহায়তা করিয়া অনেক সংবাদাদি দেন। গত ২রা বৈশাখ (১৩০১) আমি কোটালিপাড় থানার অধীন রাধাগঞ্জ নামকস্থানে উপস্থিত হই। অন্নাভাবে কোটালিপাড়ের লোকের বহুল কষ্ট হইতেছে শুনিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগে, তাঁহারা সমাজের পক্ষ হইতে অসহায় দরিদ্রগণের সাহায্যার্থ বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়কে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। কাশী বাবু রাধাগঞ্জ হাটে থাকিয়া প্রতিদিন অসহায় দরিদ্রদিগকে বস্ত্র ও চাউল বিতরণ করিতেছিলেন।

আমি রাধাগঞ্জে যাইয়াই প্রথম কাশী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে অতি সাদরে গ্রহণ করিয়া, বড়ই আদর করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহার সহিত আমার কখনও আলাপ ছিল না, কিন্তু বহুদিন পরে সহোদর ভ্রাতার মিলনে যেরূপ সুখানুভব হয়, কাশীবাবু আমাকে পাইয়া সেইরূপ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার ভালবাসা ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া যেন আত্মহারা হইলাম। কাশীবাবুর নিকট স্থানীয় অবস্থা অনেক অবগত হইয়া, পরদিন নিকটবর্ত্তী ৪। ৫ খানি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। কাশীবাবুর অনুরোধ মতে আমি সেই দিন কয়েকখানি নূতন বস্ত্র ক্রয় করিয়া বিতরণ করিলাম, পরে নিজে দেশের অবস্থা পরিদর্শন করিতে বাহির হইলাম। আমি যখন যেস্থানে উপস্থিত হইয়াছি, তখনই তথাকার সম্ভ্রান্ত, ধনী, দরিদ্র, সকল শ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছি। আমাদের সুহৃদ্‌সভার অনেক সভ্য ও স্থানীয় অনেক ভদ্র লোকে আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এস্থলে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব। ফলে আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছি। ১০। ১২ দিন অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রম করিয়া আমি প্রায় ৪০। ৪৫ খানি গ্রাম পরিদর্শন করি। তখন দেশের সাধারণ অবস্থা অতীব শোচনীয়। তখন যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা আমি জীবনে কখনও দেখি নাই—দেখিব কিনা, ভগবানই জানেন। আমি সংবাদ পত্রে তখনকার অবস্থা কিঞ্চিৎ বিবৃত করিয়াছিলাম। ফলকথা, যাহা দেখিয়াছিলাম ও যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, এক মুষ্টি ভাতের জন্য বালক বালিকাগণের সকরুণ ক্রন্দন ধ্বনি ও কঙ্কালাবশিষ্ট-দেহ বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া এবং যুবতীগণের কাতর উক্তি শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়।

গ্রাম পরিদর্শন কালে আমি স্থানে স্থানে চাউল, কাপড় ও পয়সা আদি দান করিয়াছি, সেই সময় আমি শুনিয়াছি যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অন্ন বস্ত্রাদির ক্লেশ ভোগ করিয়া, অসহনীয় যাতনার হাত হইতে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ও কেহ কেহ ক্রমাগত অনাহারের পর বন্য শাক সবজি দ্বারা উদরাগ্নির নিবৃত্তি করিতে যাইয়া কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া ইহলোক ছাড়িয়া দুঃখ কষ্টের অবসান করিয়াছে।

১। শশিমোহন দাস পিপ্পলী

২।	ঈশ্বরচন্দ্র দাইড়	বাইনারি
৩।	ফটিক দাই	ডহরপাড়া
৪।	নিধিরাম ঢুঙ্গি	তারাকান্দর
৫।	দিনবাগানির স্ত্রী	মাদারবাড়ী
৬।	একটী স্ত্রীলোক	লাখিরপাড়
৭।	স্বরূপ দত্ত	বাঁধাবাড়ী
৮।	লক্ষণ মণ্ডল	মাদারবাড়ী
৯।	রূপচাঁদ বালা	আঠাসিবাড়ী

আমি ১২ই বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া ৮ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত, কোটালিপাড়ের অন্তর্গত উত্তরপাড় হাটখোলায় নিয়ত থাকিয়া, ৩ শত হইতে ৮ শত পরিবারকে প্রথমতঃ প্রতিদিন, পরে সপ্তাহে ২ দিন করিয়া চাউল বিতরণ করিয়াছি। স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকাতে কখন কখন ১৫০০। ২০০০ লোক চাউল লইত। সর্ব্ব সমেত প্রায় ৬০। ৬৫ খানি গ্রামের লোকে সুহৃদ্ সভার সাহায্য পাইত। অধিকাংশই স্ত্রীলোক। অন্নক্লিষ্ট ভদ্র লোকেরা গোপনে সাহায্য লইতেন।

এতদ্ভিন্ন যখন কোটালিপাড়ে ভয়ানক ওলাউঠার প্রকোপ আরম্ভ হয়, তখন বহুলোককে ঔষধাদি দিয়াছি। বলিতে কি, এই ঔষধে অনেক লোকের উপকার হইয়াছে। স্থানীয় অবস্থা সংবাদপত্রে ও ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট বিশেষ করিয়া লিখিয়াছি; তৎপর সবডিভিসনাল অফিসারের অনুরোধ মতে, আমি ক্রমে ৮।১০ দিন ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া, ২৮ খানি গ্রামের মধ্যে প্রায় ৬ শত লোকের নাম ধাম ও জমির পরিমাণাদি-সংগ্রহ করি, কারণ ঐ বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রজাদিগকে ঋণ দেওয়া হয়। আমার লিখিত লিষ্ট হইতে কতক লোক টাকা পায় এবং প্রায় ৮।৯ খানি গ্রামের লোকেরা, টাকা কম পড়ায়, কিছুই পায় না, এজন্য খুব দুঃখিত হয়। কোটালিপাড়ের রেভারেণ্ড মথুরানাথ বসু এবং মিঃ জেমস্ সাহেবের সঙ্গে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা হয়। এই কাজ ভিন্ন আমি উনশিয়া আর্য্যবিদ্যালয়, পিওলপাড়া বালিকা বিদ্যালয়, কাজুলিয়া স্কুল, বান্ধাবাড়ী বালিকা বিদ্যালয়, পিঞ্জরী পাঠশালা ও বালিকা বিদ্যালয় এবং উনসিয়া বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শন করি।

উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ হইতে নাপিত, ধোপা, মুচি, সাহা, নমশূদ্র, জিয়ানি, খ্রীষ্টান, মুসলমান, কারিকর, দাই, বাদ্যকর, বেহারা ও বাজারের বেশ্যা পর্য্যন্ত নিয়ত এইরূপ সাহায্য পাইয়াছে। ফলতঃ ১৬টী ভিন্ন সম্প্রদায়ে সাহায্য পাইয়াছে, বহুসংখ্যক স্ত্রীলোককে বস্ত্রাদিও দেওয়া হইয়াছে। নূতন বস্ত্র ১৮৪খানা ও পুরাতন বস্ত্র ১৮খানা দিয়াছি।

ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের ২। ১ টী কথা এস্থানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এবার সুহৃদ্ সভা দ্বারা একটী মহদনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সুহৃদ্ সভার কার্য্যভার সৌভাগ্যক্রমে আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, আমি যথাসাধ্য স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ফলকথা, বলিতে কি, আমি সুহৃদ্‌সভার কৃপায় ধন্য হইয়াছি, আমার জীবনে আর এরূপ কাজ হয় নাই, হইবারও সম্ভাবনা নাই। নিজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি কেবল সুহৃদ্ সভার অনুগ্রহে, স্বদেশের উপকারার্থে ব্যয়িত করিতে পারিয়া স্বীয় জীবন সার্থক করিয়াছি। বলিতে কি, সুহৃদ্‌সভার সুযোগ্য সম্পাদক, আমার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ই আমার জীবনের এই সদনুষ্ঠানের পথ-প্রদর্শক এবং শিক্ষাগুরু। আমি তাঁহার নিকট চির ঋণে বদ্ধ রহিয়াছি এবং স্বীয় অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিনিময়েও যদি সুহৃদ্ সভার কার্য্য করি, তবুও ইহজন্মে সুহৃদ্ সভার ঋণ-মুক্ত হইতে পারিব না, ইহা নিশ্চয়।

কোটালিপাড়ের লোকের কথাও ভুলিতে পারিব না, তথাকার ছোট বড় ধনিদরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকে আমার প্রতি যেরূপ ভালবাসা দেখাইয়াছে, তাহা অতুলনীয়। শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী,

সুহৃদ্‌সভার প্রতিনিধি।”

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বিহারী বাবু যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এজন্য সভা হইতে তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন দেওয়া হইবে। পুষ্পমাল্য দ্বারা ভূষিত করিয়া তাঁহাকে বিশেষ রূপে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কথা লিখিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। তবে

একথা না বলিলে নয় যে, নানা স্থানের নানা ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে চৌদ্দরশির বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় ও মানিকদহের বাবু বিপিনবিহারী রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। রাজেন্দ্র বাবু ভাদ্র মাসে (১৩০০) ১৫দিন অকাতরে ক্ষুধিতদিগকে অন্ন দান করিয়াছিলেন। সুহৃদ্ সভা হইতে এ জন্য তাঁহাকে বিশেষ অন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে। তিনি এই কাজে যে মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। আর পরিচয়ের উপযুক্ত সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বেল সাহেব। তিনি দেবতার রূপ ধারণ করিয়া ফরিদপুরে, দারুণ দুঃখের দিনে, উপস্থিত হইয়াছিলেন। মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গ্রাউজ সাহেব ও তাঁহার চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট ২৩০০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, যাহাদের জমী ইত্যাদি আছে ও যাহারা জামিন দিতে পারিয়াছে, তাহারাই ঋণ পাইয়াছে। দুঃখিনী, নিরাশ্রয়া, অসহায়া স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ কিছুই উপকার হয় নাই। তৎপর শ্রীযুক্ত পোপ সাহেবের চেষ্টায় আর ৩০০০৲ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বেল সাহেব ফরিদপুর যাহা পাইয়াছিলেন, সমস্ত দান করিয়া গিয়াছেন, কাদা ভাঙ্গিয়া, নিজে বাড়ী বাড়ী যাইয়া, অবস্থা দেখিয়া দান করিয়াছেন। এরূপ লোক প্রায় দেখা যায় না। ফরিদপুরের দুর্ভাগ্য যে, এরূপ সহৃদয় ব্যক্তি দীর্ঘকাল ফরিদপুর থাকেন নাই। বিধাতা তাঁহার মঙ্গল করুন। তারপর আমাদের বোর্ড। আমাদের বোর্ড দুর্ভিক্ষের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এমন সহৃদয়তার ছবি, শীঘ্র দেখা যায় নাই। বোর্ডের সভ্যগণ বিশেষ ভাবে কাজ না করিলে কত লোক যে মরিত, তাহার সংখ্যা নাই। তারপর দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল, মাদারিপুরের শ্রীযুক্তরেঃ জেমস্ সাহেব ও তাঁহার দলের লোক এবং গোপালগঞ্জের শ্রীযুক্তরেঃ মথুরানাথ বসু মহোদয়গণ যে কত কাজ করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ হয় না। উক্ত জেম্স্ সাহেব এখনও ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাজ করিতেছেন। তিনি দেবতার ন্যায় ব্যক্তি। গুয়াগ্রামের বাবু শশধর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও বরিশাল হইতে টাকা ও বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অনেক লোকের উপকার করিয়াছেন। এই সকল মহোদয়গণকে বিশেষরূপ ধন্যবাদ দিতেছি। এবং সর্ব্বোপরি যে সকল সভ্য, এবং দেশের সহৃদয় ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করিয়া সভার সাহায্য করিয়াছেন, এবং যাঁহারা অকাতরে অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ঋণ অপরিশোধ্য, কেবল ধন্যবাদে তাঁহাদের ঋণ শোধ হয় না। লক্ষ্ণৌ বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ফরিদপুর বাবু শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, বিদেশী লোক হইয়াও, যেরূপ ক্লেশ সহ্য করিয়া, টাকা ও বস্ত্র আদায় করিয়াছেন, ভাবিলে চক্ষের জল পড়ে। এইরূপ কষ্ট সকলে অন্ততঃ কিছু না কিছু করিয়াছেন। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি এই সকল মহাজনদিগকে চিরশান্তি ও মঙ্গল বিধান করুন। আমরা অসহায়, নিরূপায়, আমাদিগের সম্বল কেবল বিধাতার কৃপা। যাঁহারা অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন, নব্যভারতে তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইতেছে।

এদেশের সম্পাদক মহোদয়গণ, একবাক্যে, সম্বৎসর ধরিয়া, ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষের কথা ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। সকলকে এস্থলে ধন্যবাদ দিতেছি। বিশেষতঃ সঞ্জীবনী ও

অমৃতবাজার পত্রিকা, দরিদ্র ফরিদপুরের জন্য বহুস্থান দিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেশের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

সঞ্জীবনীতে আমার যে ৫ খান পত্র প্রকশিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

দুর্ভিক্ষের বর্ত্তমান অবস্থা।

প্রথম পত্র—সঞ্জীবনী,—১৩ই শ্রাবণ, ১৩০১ সাল।

ফরিদপুরের ভীষণ দুর্ভিক্ষের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিবার জন্য, ২রা জুলাই (১৮৯৪) সোমবার কলিকাতা পরিত্যাগ করি। সদরপুর, মানিকদহ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া মাদারিপুর উপস্থিত হই। মাদারিপুর সবডিভিসনই দুর্ভিক্ষের প্রধান দুর্গ, ওলাউঠায় এবং দুর্ভিক্ষে এই সবডিভিসনের কত গৃহে যে হাহাকার উঠিয়াছে, সংখ্যা নাই। পালং থানায় ওলাউঠায় প্রায় ৬০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বিগত কার্ত্তিক মাসে এই থানার বহুগ্রাম পরিদর্শন করিয়া ঔষধ বিতরণ করিয়াছিলাম। এখন পালং থানায় ওলাউঠা থামিয়াছে; কিন্তু গোপালগঞ্জ, মাদারিপুর ও কোটালিপাড় থানায় দুর্ভিক্ষের ভীষণ পরাক্রম সম্বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বেল সাহেব, গ্রাউজ সাহেব মহোদয়গণের চেষ্টায় এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্যগণের সহৃদয়তায় অনেক দরিদ্র ব্যক্তি এবার রক্ষা পাইয়াছে। তদুপরি, খ্রীষ্টান মিসনরিগণের চেষ্টায়, ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায় এবং ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার চেষ্টায় অনেক লোক রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু তবুও অনাহারে অনেক লোক মরিয়াছে। মাদারিপুরের সবডিভিসনাল অফিসার মহোদয় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিছুই দেখেন না—তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা পাওয়ার জন্য সব চাপা দিতে প্রস্তুত। যাঁহারা সংবাদ পত্রে মধ্যে মধ্যে পত্রাদি লিখেন, তিনি তাঁহাদিগকে ধমকাইতেও ছাড়েন না। তাঁহার তিরস্কারে আমাকেও একবার পড়িতে হইয়াছিল। তাঁহার ভয়ে সকলে যেন সঙ্কুচিত। এদিকে মাদারিপুরের চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি! কত লোক যে দুই তিন দিন ধরিয়া উপবাস করিতেছে, সংখ্যা নাই!!

আমি কলিকাতা থাকিতেই, মাদারিপুরের খুব নিকটবর্ত্তী মাদরা নামক গ্রামের দুর্ভিক্ষের কথা শুনিয়াছিলাম। আমি মাদারিপুর পৌঁছিয়াই একখানি ডিঙ্গি ভাড়া লইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাদরা যাত্রা করিলাম। মাদরা পৌঁছিতেরাত্রি হইল। মধ্যে ঝাউদি প্রভৃতি গ্রামের অবস্থা অবগত হইলাম। শুনিলাম, বহু লোক, কাঁচা কলা, কচু, পাটপাতা সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। এ অঞ্চলে আউস ধান্য প্রায়ই হয় না—আমন ধান্যের অবস্থা মন্দ নয়, কিন্তু তাহা পৌষ মাসে পাকিবে। এই সময় পর্য্যন্ত কত লোক যে অনাহারে মরিবে, বিধাতাই জানেন।

রাত্রে মাদরা যাইয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ীতে অবস্থিতি করিলাম। যে বন্ধু কলিকাতায় আমার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি তখন বরিশাল চলিয়া গিয়াছেন। আমি একটু অসুবিধায় পড়িলাম। কিন্তু কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির নিকট কতকটা অবস্থা জ্ঞাত হইলাম। পর দিন রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র দেখিলাম, সংবাদ পাইয়া, বহু অনাহারক্লীষ্ট লোক আমাকে আসিয়া বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তাহাদের কাতরোক্তি শুনিয়া, জীর্ণ শীর্ণ মলিন কঙ্কালবিশিষ্ট শরীর ও পরিধানের বস্ত্র দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমি সকলকে আশ্বাস দিলাম এবং কেবল আশ্বাসে জীবন রক্ষা হয় না মনে করিয়া উপস্থিত সকলকেই

কিছু কিছু দিলাম। তৎপর গ্রামের অবস্থা দেখিতে চলিলাম। গ্রাম জলে ডুবিয়া গিয়াছে, সুতরাং নৌকায় উঠিয়া বাড়ী বাড়ী যাইতে হইল। যে দৃশ্য দেখিলাম, লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ৮টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত বাড়ী বাড়ী ঘুরিলাম, ইহার মধ্যে কোন বাড়ীতেই রান্নাঘরে আগুন দেখিলাম না। আহার-বিষয়ে সব লোকই নিশ্চিন্ত। কোন কোন বাড়ীতে দেখিলাম, রাশিকৃত কলার খোলা পড়িয়া আছে, কোথাও কাঁচা কলার বাকল, কোথাও কচুর বাকল। অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, কাল কি খাইয়াছ, কেহ বলিল কচু, কেহ বলিল থোর, কেহ বলিল কাঁচা-কলা সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছি, দুই তিন জন বলিল যে একবেলা ভাত খাইয়াছি। অবস্থা শুনিয়া চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলাম না—ডাকিয়া ডাকিয়া সকলকেই কিছু কিছু দিলাম। দেখিলাম, অনেক বাড়ীতে কেবল স্ত্রীলোক ও ছোট ছেলে মেয়ে আছে; জিজ্ঞাসা করিলাম, বাড়ীর পুরুষেরা কোথায়? অনেক স্থলেই উত্তর পাইলাম, ছেলে মেয়ে পরিবারকে উপবাস করিতে দেখিয়া, সহ্য করিতে না পারিয়া, ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, খবর নাই। কি শোচনীয় ব্যাপার! মানুষ ছেলে মেয়ের মমতা ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারে, এ অবস্থা প্রায়ই দেখা যায় না—কিন্তু যখন প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে, তখন মানুষের আর কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, মানুষ পশুর অপেক্ষাও হেয় হয়। ছেলে মেয়েরা পেট ভরিয়া না খাইতে পাইয়া শুকাইয়া গিয়াছে—স্ত্রীলোকদিগের উদরে অন্ন নাই—পরিধানে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নাই, কেহ কাঁথা, কেহ ছিন্নবস্ত্র পরিয়াছে—শুষ্ক শরীরে, মলিন মুখের দুগণ্ড বহিয়া কেবল চক্ষের জল পড়িতেছে। এই অবস্থা দেখিতে দেখিতে ও কিছু কিছু দিতে দিতে শুনিলাম, এক স্থানের স্বামী-পরিত্যক্তা একটী স্ত্রীলোক ৩। ৪টী শিশু লইয়া ৩ দিন কলার পাতা খাইয়া আছে। সেই স্থানে গেলাম। লজ্জায় সে স্ত্রীলোকটী আমাদের নৌকার নিকটে আসিল না। অনেক স্ত্রীলোককে যখন পয়সা দিতেছিলাম, তখন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ, সুদ সহ পয়সা আবার ফেরৎ দিতে হইবে, এই আশঙ্কায় নিতে চাহিতেছিল না। বারম্বার বলিলেও বিশ্বাস করে না—কিছুতেই ইহার বিনিময়ে যে কিছুই দিতে হইবে না, একথা বুঝান যায় না। ইহার কারণ এই, নিঃস্বার্থ ভাবে কেহ কিছু দিতে পারে, এ ধারণা এদেশের লোকের নাই। যাহারা ধান দেয়, দেড়গুণ, চতুর্গুণ আদায় করে; যাহারা টাকা ঋণ দেয়, টাকায় ৵০, ৶০, ।০ আনা সুদ আদায় করে। এই দারুণ দুর্ভিক্ষে বহুলোক এইরূপ ব্যবসা করিয়া বড় ধনী হইয়া উঠিতেছে। অনেক স্থলে শুনিলাম, ৪০।৪৫ তোলা রূপা বন্ধক রাখিয়া ৮। ১০৲ টাকা মহাজনেরা দিতেছে; থালা বাসন আর বড় কেহ রাখে না। গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কোন কোন স্থলে যে টাকা দেওয়া হইয়াছে, সুদসহ তাহাও আদায় করিতে হইবে। জমীদারেরা কোথাও কোথাও যে সাহায্য দিতেছেন, তাহাও প্রতিদান করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট কোটালিপাড়ে ১৲ টাকার ধান দিয়া, বাজার দরে যে এক টাকার চাউল গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে কাহারও ⁄১॥ সেরের অধিক চাউল প্রাপ্য হয় না। এই অবস্থায়, কেহ নিঃস্বার্থ ভাবে পয়সা দিতেছে কেন, ইহাতে তাহাদের সন্দেহ হইবারই কথা। সেই স্ত্রীলোকটী আসিতে সঙ্কুচিতা হইল দেখিয়া, বাড়ীর আর আর

সকলের নিকট অবস্থা শুনিয়া ১৲টী টাকা দিলাম। সলজ্জ ভাবে হাত পাতিয়া তাহা লইল। বাড়ীর অন্যান্য সকলকেও কিছু কিছু দিলাম। এইরূপ দিতে দিতে প্রায় ২টার সময় বাড়ীর দিকে ফিরিতে লাগিলাম। পথের মধ্যে আবার নৌকায় উঠিয়া দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকও আসিতে লাগিল। সকলেরই নিবেদন এই "বাবু, আমাদের অবস্থা একবার দেখিয়া যান।" বেলা অধিক হইতে লাগিল বলিয়া, সকলের অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া, চাটুয্যে বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিলাম—সেখানে ৬০। ৭০ জন লোক বসিয়া রহিয়াছে। আমার নিকট যে টাকা ছিল, সব ফুরাইয়া গিয়াছিল। আর উপায় না দেখিয়া, হাওলাত করিয়া কয়েকটী টাকা লইলাম এবং তাহা সকলকে দিলাম। এদিন আর আহার করিতে ইচ্ছা হইল না—অতি কষ্টে চাটুয্যে মহাশয়দিগের অনুরোধে কিছু আহার করিলাম, আহারান্তে লোকদিগকে কিছু ২ দিয়া বিদায় করিয়া, নৌকায় উঠিয়া, মাদারিপুরে গেলাম। তথাকার লোকাল-বোর্ডের চেয়ারম্যান মহাশয়ের নিকট সবিশেষ বলিলাম। তিনি সবডিভিসনাল অফিসার বাহাদুরের কীর্ত্তির কথা বলিয়া আক্ষেপ করিলেন। হা বিধাত, দরিদ্রদিগের যে জগতে কেহ নাই, তুমি একবার সদয় হও।

রাত্রেই আফাসী যাত্রা করিব, মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু মাদরার যে বন্ধু বরিশাল গিয়াছিলেন, তাঁহাকে আনার জন্য টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল, সেই টেলিগ্রামের প্রতীক্ষায় ৯টা রাত্রি পর্য্যন্ত মাদারিপুর থাকিতে হইল। তার পর মাদারিপুরের বন্ধুগণ, চোর ডাকাতের বড় ভয় হইয়াছে বলিয়া, নৌকা খুলিতে দিলেন না। সমস্ত রাত্রি আর চক্ষে ঘুম আসিল না। আহারেও মন উঠিল না। পরদিন প্রত্যূষে আফাসী রওনা হইলাম। আফাসীর অন্য নাম চর-কুনিয়া। আফাসী মাদারিপুরের পশ্চিমে অবস্থিত। আফাসী একখানি দরিদ্র পল্লী। আফাসীর অবস্থা যাহা দেখিলাম, সংক্ষেপে লিখিতেছি। এইরূপ অবস্থা মাদারিপুরের চতুর্দ্দিকস্থ বহু গ্রামের।

আমি যে ডিঙ্গিতে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, এই ডিঙ্গির মাঝীর বাড়ী এই আফাসী গ্রামে। মাঝী না বলিয়া, গ্রামের অবস্থা দেখাইতে, নৌকা এই পথে আনিয়াছে। মাঝীর বাড়ীর ঘাটে যখন নৌকা পৌছিল, তখন চিৎকার করিয়া বাড়ীর লোকেরা কাঁদিয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম, কেহ বুঝি মারা গিয়াছে। পরে শুনিলাম, তাহা নয়, মাঝী যে দুই দিন বাড়ী আইসে নাই, সেই দুই দিন উপবাস গিয়াছে। মাদরার চাটুয্যে বাড়ী হইতে মাঝী যে অন্ন পাইয়াছিল, তাহা না খাইয়া, কতক রাখিয়াছিল, আজ তৃতীয় দিনে সেই পর্য্যষিত অন্ন ও পচা ডাইল বাড়ীর সকলকে আহারের জন্য তুলিয়া দিতেছে দেখিয়া, আমি ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমি মানিকদহের বন্ধুর বাড়ী হইতে কয়েকখানি যে লুচি পাইয়াছিলাম, তাহা লোকের কষ্ট দেখিয়া আহারে প্রবৃত্তি না হওয়ায়, মাঝীকে পূর্ব্বদিন খাইতে দিয়াছিলাম। সেই কথা মাঝীর বৃদ্ধ পিতা শুনিয়া "আমার জন্য আনিলি না কেন" বলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে যে কি মর্ম্মভেদী দৃশ্য, বর্ণনা করিতে পারি, আমার সে সাধ্য নাই। আমি কিছু দিলাম। তার পর দলে দলে বিধবা স্ত্রীলোকেরা কঙ্কাল-বিশিষ্ট ছেলে মেয়ে লইয়া আমার নিকট উপস্থিত

হইতে লাগিল। হায়, যে মুসলমান কুলবধূরা কখনও কোন বিদেশী লোকের নিকট যায় না, পেটের দায়ে দলে দলে তাহারা আসিতে লাগিল! আমি সকলকেই কিছু কিছু দিলাম। ক্রমেই জনতা বাড়িতে লাগিল—ক্রমেই অভাবের ক্রন্দন-উচ্ছ্বাস উঠিতে লাগিল। আমি অস্থির হইলাম। সকলকে কিছু কিছু দিলাম বটে, কিন্তু মন শান্তি পাইল না। না জানি, তাহাদের অবস্থা এখন আরো কত শোচনীয় হইয়াছে! সমস্ত দিন আমি আর কিছু আহার করিলাম না। আমি ১৫ দিন গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়াছি, ইহার মধ্যে ৬ দিন কিছুই আহার করি নাই। নিজে চেষ্টা করিয়া কিছুই খাইতে ইচ্ছা হইত না। এই ১৫ দিনের মধ্যে ৩। ৪ রাত্রি বই ঘুমাইতে পারি নাই। যাহার দেশের লোকের এত দুরবস্থা, তাহার জীবন ধারণে প্রয়োজন কি, সর্ব্বক্ষণ কেবল এই চিন্তা মনে জাগিত। মনের কথা নীরবে বিশ্বপতির নিকটে বলিতাম। তিনি ভিন্ন কাঙ্গালের আর আশ্রয় কোথায়?

দ্বিতীয় পত্র, সঞ্জীবনী, ২০শে শ্রাবণ, ১৩০১।

আফাসী বিষণ্ণ মনে পরিত্যাগ করিয়া সেই দিন অপরাহ্নে রাধাগঞ্জে পৌছিলাম। রাধাগঞ্জ কোটালিপাড় থানার অধীন একটি হাট। এই স্থানে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় কিছুদিন থাকিয়া চাউল ও বস্ত্র বিতরণ করিয়া অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

কোটালিপাড়, দুর্ভিক্ষের প্রধান দুর্গ। বোরোধান প্রচুর পরিমাণে হওয়ায়, গোপালগঞ্জ থানার অধিকাংশ স্থানের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হাহাকার একটু থামিয়াছে,—এখন প্রধান দুর্গ কোটালিপাড়। কাশী বাবু কিছুদিন রাধাগঞ্জে থাকার পর, অসুস্থ হইয়া, কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন। তাঁহার লেখাতেই আমরা ফরিদপুর সুহৃদ্‌সভা হইতে বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে কোটালিপাড় প্রেরণ করি। তিনি সাড়ে তিন মাস যাবৎ কোটালিপাড়ের অধীন উত্তরপাড় হাটে চাউল ও বস্ত্র দিতেছিলেন। উত্তরপাড় রাধাগঞ্জ হইতে চারিদণ্ড ব্যবধান। রাধাগঞ্জের অবস্থা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া, আমি সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে, উত্তরপাড় হাটে পৌছিলাম, আমার জন্য বিহারী বাবু পথপানে তাকাইয়াছিলেন। আমাকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তাঁহার বিমল আনন্দ দেখিয়া আমি সমস্ত দিনের কষ্ট ভুলিলাম। বিহারী বাবু একজন জীবন্ত ব্যক্তি।

বিহারী বাবু আমার একজন বন্ধু, ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার একজন সভ্য, তাঁহার কথা অধিক লিখিতে আমি সঙ্কুচিত হই। কিন্তু তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা, এই কথাসর্ব্বস্ব যুগে, প্রায় দেখি না। তিনি দরিদ্রের মা বাপ। নিজ সুখ পরিহার করিয়া, অশেষ ক্লেশ মস্তকে লইয়া, অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি কাজ করিয়াছেন। তাঁহার প্রশংসা কোটালিপাড়ের লোকের মুখে আর ধরে না। আমি বিহারী বাবুর বন্ধু, ইহা মনে করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছি। রাত্রে বিহারী বাবুর নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইলাম। অনেক কথা হইল। শেষে বিশ্রাম করিলাম।

পরদিন প্রত্যূষে গ্রামের অবস্থা দেখিতে রওয়ানা হইলাম। সকল গ্রাম ডুবিয়া গিয়াছে, বলা বাহুল্য, নৌকায় উঠিয়াই যাইতে হইল। বিহারী বাবু ৫৬টী গ্রাম পরিদর্শন করিয়া দরিদ্রদের নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই

৫৬টী গ্রাম হইতে পূর্ব্বে অনেক লোক অনাহারে মরিয়াছে। ইহার মধ্যের দুই একটী গ্রামে গেলাম। যাইয়া দেখি, বহু ঘরের চালে ছোন নাই, বেড়া নাই, স্ত্রীলোকেরা গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিয়াছে। যাহারা উত্তরপাড় হইতে পূর্ব্বদিন চাউল আনিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহার কাহারও খোলা ঘর হইতে সেই চাউল চুরি গিয়াছে বলিয়া কাঁদিতেছে, দেখিলাম। অনেক স্ত্রীলোককে উলঙ্গবৎ দেখিলাম। অবস্থা দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল, আমি কিছু কিছু দিতে লাগিলাম। বিহারী বাবু আমাকে বলিলেন যে, এরূপ করিয়া দিয়া পারিবেন না। বাস্তবিক কথা সত্য। কত লোকের যে শোচনীয় অবস্থা দেখিলাম, বর্ণনা করিতে অক্ষম। শেষে আর পয়সায় কুলায় না, যাহা ছিল, শেষ হইয়া আসিল। শেষ দৃশ্য যাহা দেখিলাম, তাহা লিখিয়া এবারকার কথা শেষ করি। শুয়াগ্রামের এক বাড়ীতে যাইয়া দেখিলাম, এক বারেন্দায় একটী দেড় বৎসর বয়সের শিশু, তিন বৎসর বয়সের বোনের গলা ধরিয়া কাদায় শুইয়া রহিয়াছে। তাহাদের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। এই নিদ্রা যেন জীবনের শেষ নিদ্রা; পরস্পরের উপর এতই নির্ভর, উভয়ে পরস্পরের গলা ধরিয়া রহিয়াছে। সেরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য এজীবনে আর কখনও দেখি নাই। দেখিয়া যেন জীবন ধন্য হইল। সেখানে ভালবাসা আর কবিত্ব, পবিত্রতা আর মধুরতা, পুণ্য এবং প্রেম যেন মেশামেশি হইয়া রহিয়াছে, অথবা মনে হয় যেন দুর্ভিক্ষ সেখানে প্রেমরূপ ধারণ করিয়া মূর্ত্তিমান। দেখিলাম এবং মজিলাম, অলক্ষিত ভাবে চক্ষের জল পড়িল। এই শিশুদের পিতা কোথায়, মাতা কোথায়, খোঁজ পাইলাম না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে বড় মেয়েটীকে তুলিতে চেষ্টা করা গেল; মেয়েটী দুই একবার চাহিয়া দেখিয়া দেখিয়া আবার চোক বুজিল। মৃত্তিকাশয্যা, অবসন্ন দেহের পক্ষে, বড়ই আরামদায়ক হইয়াছে। ইত্যবসরে এই শিশুদের মা জল ঝাঁপাইয়া অন্য বাড়ী হইতে আসিলেন। শিশু দুটী মায়ের আগমন-শব্দে উঠিল। ছোটটী মাই খাইবার জন্য, বড়টী, মা কাপড়ে করিয়া যাহা আনিয়াছে, তাহা খাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। পাখী-মাতা যেন নীড়ে শাবক রাখিয়া গিয়াছিল, মা আহার আনিয়াছে—শাবকেরা জাগিয়াছে। এ কি মধুর দৃশ্য! কিন্তু মায়ের সম্বল কি? মা বস্ত্র ভিজাইয়া, ভিক্ষা করিয়া এক পোয়া পরিমাণ চাউলের কুড়া (তুষের ন্যায় এক পদার্থ) আনয়ন করিয়াছেন! হা বিধি, এ কি দৃশ্য! মায়ের বয়স ১৭।১৮ বৎসরের অধিক হইবে না, কিন্তু বোধ হইল যে, ৬।৭ মাসের ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত রোগী—শরীরে রক্ত মাত্র নাই, মাংস নাই, তেজ নাই, স্ফূর্ত্তি নাই—আছে কেবল চর্ম্মাবৃত কয়েক খানি অস্থি। এই কঙ্কালধারিণী জননীর কোলে অবোধ ক্ষুধিত শিশু অমৃত পানে মাতোয়ারা, কিন্তু অমৃত কোথায়, দুধ কোথায়? হায়, মাতৃ ক্রোড়ে ক্ষুধা-কাতর শিশু দুধ না পাইয়া যখন কাঁদিতে লাগিল, আমি আর আত্ম সম্বরণ করিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কাল কি খাইয়াছ, উত্তর করিল, কচু সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছি। পরশ্ব কি খাইয়াছ, জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর হইল, ভাতের মাড় ভিক্ষা করিয়া শিশুদের খাওয়াইয়াছি। এই কথা শুনিয়া এবং এই দৃশ্য দেখিয়া আত্মহারা হইলাম। যাহা সঙ্গে ছিল, দিলাম এবং "বুধবার উত্তরপাড়ে চাউল ও কাপড় দেওয়া

হইবে, সেখানে যাইও” বলিয়া বিষাদ-মাখা প্রাণে উত্তরপাড়ে ফিরিলাম।

সোমবার বৈকালে ফরিদপুরের শেষসীমা দেখিলাম এবং বরিশালের কোন কোন গ্রাম দেখিলাম। মঙ্গলবার বৈকালে আবার উত্তরপাড় ফিরিলাম। দেশের অবস্থা সাধারণত এইরূপ। আমন ধান্য খুব হইয়াছে, পৌষ মাস আসিলে লোকের অবস্থা কতক ভাল হইবে। আউস ধান্য যাহা হইয়াছিল, অনেক ডুবিয়া যাইতেছে। গোপালগঞ্জ, মুকস্থদপুর, ভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের আউস ধান্য একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে।

বুধবার উত্তরপাড়ে চাউল দিবার দিন ছিল। প্রাতঃকালে নৌকা করিয়া পুত্রকন্যা সহ দলে দলে স্ত্রীলোক আসিতে লাগিল। পূর্ব্বে প্রত্যহ চাউল দেওয়া হইত। লোক সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ায়, এবং বর্ষায় আসিতে কষ্ট হয় বলিয়া, সপ্তাহে দুই দিন, রবিবার ও বৃহস্পতিবার দেওয়া হইতেছিল। আমার আগমন-উপলক্ষে, বিহারী বাবু, বৃহস্পতিবারের চাউল বুধবার দেওয়া হইবে, ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। এই পরিবর্ত্তনের জন্য সকল লোক আসিতে পারে নাই, তবু ১০।১১ টার সময় দেখিলাম, প্রায় ৮০০।৯০০ স্ত্রীলোক ও শিশু উপস্থিত। অন্যান্য দিন শুনিলাম, ১২০০।১৫০০ লোক হইয়া থাকে। অধিকাংশই স্ত্রীলোক। এত লোকের মধ্যে কেবল ৩০।৪০ জন বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য পুরুষ। এ এক কি দৃশ্য! দেখিলাম, বালিকা আসিয়াছে, বৃদ্ধ আসিয়াছে, যুবতী আসিয়াছে, প্রৌঢ়া আসিয়াছে, পেটের দায়ে লজ্জা শরম ডুবাইয়া, হায় হায়, কত কুলবধু আসিয়াছে! শরীর জীর্ণ শীর্ণ, পরিধানে অনেকেরই বস্ত্র নাই বলিলে হয়। সে যে কি দৃশ্য, কে ব্যাখ্যা করিতে পারে? আমি অবস্থা জানিবার জন্য সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, আর দলে দলে স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া মনের কথা বলিতে লাগিল। আমি সে দিন যেন শত শত জননীর পুত্র হইয়াছি, আমি সে দিন যেন শত শত ভগ্নীর ভাই হইয়াছি। আমার এক একখানি হাত ২০।৩০ জন ধরিয়া টানিতেছে, আর কত নির্ভরের সহিত মনের কথা বলিতেছে, “বাবু, আমি কাল খাই নাই, আমার এই বাছাদের আর বাঁচাইতে পারিলাম না; বাবু, আমার নৌকা নাই, আমি আর চাউল নিতে আসিতে পারিব না, ঘরে মরিয়া থাকিব।” ইত্যাদি কতরূপ দুঃখের কথাই যে কত জন বলিল, আমি লিখিতে অক্ষম। এই দিন কিছু লবণ, চাউল এবং কয়েক খানি নূতন বস্ত্র দেওয়া হইল। কিন্তু সে বস্ত্রে কুলাইল না, আর ২০০ বস্ত্র হইলে কোনরূপে সে দিন মান ও লজ্জা রক্ষা করা যাইত। শেষে আমি বড়ই অপ্রস্তত হইলাম। লোকের ক্রন্দনে অস্থির হইলাম। চাউল বিতরণের সময় বিষাদিত মনে দেখিতেছিলাম, একটী চাউল মাটীতে পড়িলে তখনই তাহা খুটিয়া বালক বালিকা ও বৃদ্ধেরা মুখে দিতেছে! এরূপ দৃশ্য আর জীবনে কখনও দেখি নাই। প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দলে দলে লোকেরা আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের কাতরোক্তি, এ প্রাণে শেল সম বিদ্ধ হইতে লাগিল, আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া, শেষে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে কিছু কিছু ভাত দিয়া, উনদিয়া আর্য্য-বিদ্যালয় দেখিতে চলিলাম। সেখানে, বিদ্যালয় পরিদর্শনের পর, অনেক সহৃদয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহারা বলিলেন যে, সুহৃদ্ সভার

সাহায্য প্রদত্ত না হইলে শত শত লোক মরিত। অনুসন্ধানে জানিলাম, ১৫ দিনের মধ্যে স্বরূপ দত্ত ও লক্ষ্মণ নামে দুই ব্যক্তির অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। দেশের অবস্থা ভাবিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়।

* * * *

সুহৃদ্ সভার অবস্থা নিতান্ত খারাপ—সহৃদয় ব্যক্তিগণের সাহায্যে সাড়ে তিন মাস বহু লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে—বিধাতা তাঁহাদের মঙ্গল করুন। কিন্তু এখন উপায় কি, কে অন্ন যোগাইবে, কে অসহায় রমণীদিগের বস্ত্র দিয়া লজ্জা নিবারণ করিবে? ১০০০ লোককে সপ্তাহে দুই দিন চাউল দিতে হইলে মাসিক অন্যূন ৭০০।৮০০৲ টাকার প্রয়োজন। সর্ব্বত্রই দেখিলাম, মোটা চাউলের মণ ৪৲। গড়ে প্রত্যেককে ⁄১সের চাউল দিলেও সপ্তাহে ৫০ মণ চাউলের প্রয়োজন। এই সময়ে কে রক্ষা করিবে? ছোটলাট সাহেব ফরিদপুর গত সোমবার, ১লা শ্রাবণ, ১৮৯৪, উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমিও ছুটিয়া সেখানে গিয়া, সবিশেষ অবস্থা লাটসাহেবকে জানাইতে বন্ধুদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট, বালাচুন-হত্যাকাণ্ডের বিখ্যাত হেরাল্ড সাহেব এবং মাদারিপুরের কর্ত্তা বাহাদুর সব উড়াইয়া দিতে চেষ্টিত, লাটসাহেব যে কি করিবেন, জানি না। জেমস্ সাহেব ও মথুর বাবু মহোদয়গণ যথেষ্ট করিতেছেন, কিন্তু তাহা প্রচুর নহে। ১৲ টাকার ধানভানিতে দিয়া ১৲ টাকার চাউল গ্রহণে কোনই উপকার হয় না। এখন কে দরিদ্রদিগকে রক্ষা করিবে? যে দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা বরাবর অন্য দেশ অপেক্ষা ভাল ছিল, যে দেশ অন্য দেশকে অনেক ধান চাউল যোগাইত, সেই দেশে হাহাকার উঠিয়াছে—কোলের ছেলে ফেলিয়া পিতা পলায়ন করিতেছে—কেহ বা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত—কেহ আত্মহত্যা করিতেছে—কেহ না খাইয়া মরিতেছে! চতুর্দ্দিকে হাহাকার কিন্তু এদেশের ধনী শ্রেণী নিশ্চিন্ত, উদাসীন। ভারতসভা, আজ কোথায়? ব্রাহ্মসমাজ, গরীবের মা বাপ, আজ সহায় না হইলে আর রক্ষা নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সুহৃদ্ সভার হস্তে ৫০৲ টাকা প্রদান করিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কিন্তু এখন ব্রাহ্মসমাজ অগ্রসর হউন। মানবপরিবারের দুঃখে যাঁহাদের প্রাণে একটুও আঘাত লাগে; তাঁহারা এই সময়ে অগ্রসর হউন। সর্ব্বোপরি বিধাতা দরিদ্র দেশের সহায় হউন।

অদ্য পত্র দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অন্যান্য স্থানের অবস্থা অবসর পাইলে পরে লিখিব।

তৃতীয় পত্র—সঞ্জীবনী, ৩রা ভাদ্র, ১৩০১।

অন্যান্য কথা বলিবার পূর্ব্বে, অদ্য দু চারিটী অপ্রাসঙ্গিক কথার উল্লেখ করিতেছি। আশা করি, পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন।

আমি সঞ্জীবনীতে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া অনেক সহৃদয় ব্যক্তি পত্র লিখিতেছেন, কেহ কেহ কিছু কিছু প্রদান করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট চির কৃতজ্ঞ হইতেছি। আমি একদিন অপরাহ্নে কার্য্যালয়ে বসিয়া রহিয়াছি, এমন সময়, ৩টি ছাত্র আফিসে আসিয়া উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দেবী বাবু কোথায় থাকেন? আমি বলিলাম, যাহা বক্তব্য আমাকেই বলিতে পারেন। তখন একটী ছাত্র বলিলেন যে, আমরা মেট্রোপলিটান বৌবাজার ব্রাঞ্চের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমরা, ফরিদপুর দুর্ভিক্ষের জন্য, আমাদের শ্রেণী হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা আপ-

নার নিকট দিতে আসিয়াছি। ছাত্রটী তার পর পকেট হইতে ১১৸৵০ বাহির করিয়া আমার হাতে প্রদান করিল। আমি বালকগণের এই সহানুভূতি দেখিয়া অবাক্ হইলাম, চক্ষু হইতে জল পড়িল, টাকা কয়েকটী মস্তকে লইলাম, বিহ্বল চিত্তে বালকদিগকে ধন্যবাদ দিলাম। পূর্ব্বে এক সময়ে শুনিয়াছিলাম, কোন দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ইংলণ্ডের বালকেরা চায়ের সহিত চিনি খাওয়া ছাড়িয়া পয়সা জমাইয়াছিল। আর আমাদের দেশের এই ঘটনা! বালকেরা দেবতা বিশেষ, সংসারের কুবাতাস বহিয়া উহাদিগকে অপবিত্র না করিলে, কত মহৎ কার্য্য উহাদের দ্বারা সাধিত হইতে পারে। ভাবিলাম, এইরূপ করিয়া সকল স্কুলের ছাত্রগণ যদি কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া,মহৎ কার্য্যে প্রদান করে, দেশের রাজারাজড়ারা যাহা না পারে, ইহারা তাহা করিতে পারে। বিধাতা বালকদিগের সহায় হউন।

টাঙ্গাইল হইতে বাবু রামপ্রাণ দত্ত তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲টী টাকা দুর্ভিক্ষের জন্য প্রদান করিয়াছেন। ইহা দেখিয়াও অবাক্ হইয়াছি। অন্নবস্ত্রহীনা নিরাশ্রয়া রমণীগণের জন্যও যদি সকলে কিছু কিছু প্রদান করেন, কত বৃহৎ কার্য্য হইয়া যাইতে পারে। আর একজন বন্ধু বস্ত্রের জন্য ৩০৲ দিয়াছেন। কিন্তু এস্থানে একটী কথা! আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক সকল বিষয়েই উদাসীন। বিপদের দিনে, প্রত্যেকের যে কিছু কিছু কর্ত্তব্য আছে, অনেকেরই ধারণা নাই। অনেক লোক বাক্যবাগীশ, কাজের বেলায় পাওয়া যায়—অতি অল্প লোক। তারপর পরস্পরের প্রতি অসদ্ভাব এবং অবিশ্বাস। এজন্য কোন মহৎকাজ এদেশে প্রায় সাধারণ চাঁদায় সম্পন্ন হইতে পারে না। আমি অত্যন্ত ব্যথিতপ্রাণে শুনিয়াছি, সঞ্জীবনীতে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া কেহ বলিয়াছেন যে, আমি অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিয়াছি, কেহ বলিয়াছেন যে, মফঃস্বলে গেলে সকল লোকই অভাব জানায়, দেবী বাবু সহৃদয় লোক, তাহা দেখিয়া গলিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার চেয়ে শক্ত ভাষাও প্রয়োগ করিয়াছেন। এ সকল কথা শুনিয়া দারুণ আঘাত পাইয়াছি। প্রথমতঃ আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহার শতাংশের একাংশ লিখিতে পারি, আমার এমন সাধ্য নাই। আমি পাষাণ, তবুও আমি রাত্রে ঘুমাইতে পারি না, দিবসে সুস্থির থাকিতে পারি না, দিবানিশি দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের করুণ আর্ত্তনাদ প্রাণে জাগিতেছে। যাঁহারা বলেন,অল্প ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়াছি, তাঁহারা একবার মাদরা, আফাসী, কোটালিপাড় যাইয়া দেখুন, অবস্থা কি শোচনীয়, বুঝিবেন। দ্বিতীয় কথা, আমি কোন দরিদ্রের বাড়ী, পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া, যাই নাই। বড় মানুষের মতও যাই নাই। সামান্য লোকের ন্যায় গিয়াছিলাম, তাহাতেই যাহা দেখিয়াছি, তাহার শতাংশেরও কম লিখিয়াছি। আজ এই পত্রের শেষে, আরো কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিব।

আমাদের দেশের লোকেরা অবিশ্বাস করেন, ইহাতে বড়ই প্রাণে আঘাত লাগে। গবর্ণমেণ্টেরত কথাই নাই। গত বৎসর শ্রীযুক্ত গ্রাউজ এবং বেল সাহেবের চেষ্টায় সহৃদয় অস্থায়ী ছোট লাট ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব বিল-প্রদেশের দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া যে অনেক সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

এবার আমাদের বর্ত্তমান লেপটেনেণ্ট গবর্ণর ইলিয়ট সাহেব, গত ১৭ই জুলাই, (১৮৯৪) সোমবার, ফরিদপুর গিয়াছিলেন। ঐ দিন আমিও ফরিদপুরে গিয়াছিলাম। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান সহৃদয় ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া, মিউনিসিপালিটি হইতে তাঁহাকে যে অভিনন্দন দিয়াছিলেন, তাহাতে দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ ছিল এবং গবর্ণমেণ্ট যে উপযুক্তরূপ সাহায্য করেন নাই, একথাও লিখিত ছিল। এই অভিনন্দন শ্রবণ করিয়া লাট সাহেব বলিয়াছিলেন যে, অভিনন্দনের দুর্ভিক্ষের কথা সত্য নহে। তাঁহার কথা এই :—

"They had said that the prevailing opinion about the distress was supported by successive District officers in that the measures hitherto adopted had been inadequate to the actual necessities of the occasion. He considered that statement to be inaccurate, for he was not aware of any such opinion expressed by the District officers". *Amrita Bazar Patrika*, 31st July, 1894.

ইহার পর ৩০শে ও ৩১শে জুলাই তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় সমস্ত পত্রাদি ছাপাইয়া দেখান হইয়াছে যে, লাট সাহেবের ঐ উক্তি নিতান্ত অমূলক। এ সম্বন্ধে ৬ই আগষ্টের (১৮৯৪) ইণ্ডিয়ান নেসন-সম্পাদক লিখিয়াছেন—

"Sir Charles Elliott, speaking at Faridpur, refused to accept unsupported statements in the Municipal address to the effect that local District officers have borne testimony to the distress in the district and the necessity of Government help. His Honour made some very caustic remarks, dwelling on the general and, so to say, voucherless character of the complaint. He wanted references to chapter and verse, or at any rate 'clues.' Two letters which appeared in the *Amrita Bazar Patrika* of Monday and Tuesday last furnish authorities enough. Since the commencement of the distress in July 1893, there have been four district officers:—Mr. E. F. Growse, Mr. Beatson Bell, Mr. R. Pope and Mr. J L. Herald. The correspondent makes some extracts from the letters of Mr. Growse and Mr. Pope which bear out the statements in the address, and he states that if the letters written by the other two Magistrates to the Commissioner are called for, they also will be found to be to the same effect. A reply, which has been quoted, of the Commissioner to a letter of Mr. Herald's indicates pretty plainly the kind of views that must have been expressed in the letter."

সুহৃদ্ সভার সম্পাদকের নিকট মাজিষ্ট্রেটগণ যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার একখানি পত্র মাত্র অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য পত্র আমার নিকট আছে। তাহা প্রকাশ করিলে লাট সাহেব দেশের অবস্থার কথা শুনিয়া অবাক্ হইবেন। তাহাই বা কেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লাট সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, অফিসরগণ এক বৎসর ধরিয়া ফরিদপুরের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছেন। বিরোধী কেবল মাদারিপুরের সুযোগ্য ডেপুটী সাহেব! বিধাতা তাঁহার জন্য স্বর্গে রত্ন সিংহাসন নির্ম্মাণ করুন, এবং গবর্ণমেণ্ট নবাব উপাধিতে তাঁহাকে ভূষিত করুন। শুনিয়াছি, ইতি মধ্যেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি অফিসিয়াল পত্রেরও উত্তর প্রদান করেন না, তিনি সুযোগ্য কর্ম্মচারীই বটে। আমি সুহৃদ সভার সম্পাদকরূপে তাঁহাকে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে সকল পত্র লিখিয়াছি, এক খানিরও তিনি উত্তর দেন নাই। দুর্ভিক্ষে লোক মরিয়াছে, ইহা কাগজে লিখিয়াছিলাম বলিয়া একবার কর্ক্শ ভাষায় আমার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কোটালিপাড়ের বর্ত্তমান অবস্থা চাপা রহিয়া যাইতেছে। দুটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কোটালিপাড়ে, আমি যখন, অনাহারে

কেহ মরিয়াছে কি না, অনুসন্ধান করিতেছিলাম, তখন অনেকেই বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছিল। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যখন বলিল যে, লক্ষ্মণ ও স্বরূপ দত্ত সম্প্রতি মরিয়াছে, তখন চতুর্দ্দিক হইতে আর আর স্ত্রীলোকেরা বলিতে লাগিল, " বলিলি কেন, ইহার পর সরকার হইতে শাস্তি পাইবি।" বৃদ্ধা মিনতি করিয়া তখন আমাকে বলিল যে, "বাবু দেখিও যেন আমরা, অবলা, বিপদে না পড়ি।" আমি বলিলাম, কোন ভয় নাই। চাউল বিতরণের দিন, কোটালিপাড়ের পুলিস-দারোগা মহাশয় একটী চুরির অনুসন্ধান করিতে উত্তরপাড় হাটে আসিয়াছিলেন, তিনি রমণীগণের দুর্দ্দশা ও শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শেষে এত ব্যথিত হইয়াছিলেন যে, অপরাহ্নে অনেককে একটী করিয়া পয়সা দিয়াছিলেন। তিনি এক জন সহৃদয় ব্যক্তি, তিনি বন্ধু বিহারী বাবুর নিকট বলিয়াছিলেন, "সকলই দেখিতেছি,সকলই বুঝিতেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুই লিখিবার যো নাই।" এমনই কঠিন আদেশ।

যাক্, পর নিন্দায় আর কাজ নাই। সহৃদয়তার কথা স্মরণ করি, এই দুঃখের দিনে অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যাইবে। ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিতে আহ্বান করিয়াছিলাম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অগ্রসর হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এদেশের গরিবের মা বাপ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোক সাহায্য লইয়া মাদরা গিয়াছেন, আর সুহৃদ্‌সভা হইতে দুই জন সহৃদয় ভাই কোটালিপাড় গিয়াছেন। ইঁহারা যাইয়া চাউল, ঔষধ, ও বস্ত্র বিতরণ করিতেছেন। এখন দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণ অগ্রসর হউন। অবিশ্বাস, অসদ্ভাব দূরে রাখিয়া অগ্রসর হউন। আমাদিগকে অবিশ্বাস করেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট টাকা প্রেরণ করুন; তাঁহাদিগের প্রতি সদ্ভাব না থাকে, সুহৃদ্‌সভার সম্পাদকের নিকট ২১০।৪ কর্ণওয়ালিস্‌ষ্ট্রীটে প্রেরণ করুন। ৫ ১০ পয়সা করিয়া সংগ্রহ করিলে কত টাকা হইয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট কিছু করুন বা না করুন, সে বিচারে কাজ নাই। বিদেশী গবর্ণমেণ্ট যাহা করেন, তাহাই ভাল। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করিয়া ধন্য হই। সহৃদয় ব্যক্তিগণের শ্রীচরণে একান্ত অনুরোধ, অগ্রসর হউন, উপহাস, অবিশ্বাসের সময় আর নাই; দুঃখী বিপন্নের সহায় হউন। একবার চাহিয়া দেখুন, কি শোচনীয় অবস্থা!!

আমি এক বাড়ীতে যাইয়া দেখিলাম, ঘরে একটী বৃদ্ধ শুইয়া কাঁদিতেছে, পাড়ার লোকেরা বলিল, "বাবু, ঐ বৃদ্ধ অনাহারে মরিতেছে, উহাকে কিছু দাও।" আমি কাছে গেলে, হাউ হাউ করিয়া বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগিল। দেখিয়া সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, চক্ষু হইতে জল পড়িল, কিছু না বলিয়া কয়েকটী পয়সা দিলাম। আর এক বাড়ী যাইয়া দেখিলাম, আর একটী বৃদ্ধ কাঁদিতেছে, অনাহারে তাহার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ঘরে বেড়া নাই, চালে ছোন নাই। ভিক্ষার চাউল কে যেন চুরি করিয়া লইয়াছে,তাই দুই দিন আহার হয় নাই,আমাদিগকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তাহাকেও কিছু দিলাম। কোন কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, সভার সাহায্য না হইলে তোমরা কি করিতে? তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, মরিয়া এত দিন জলে ভাসিয়া বেড়াইতাম! এক জন সহৃদয় বন্ধুকে

জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা এই দেশে ভিক্ষা পায় না? বন্ধু বলিলেন, ভিক্ষা দিবে কে? অনেক ভদ্র লোকের দু-বেলা আহার জুটে না—চৌদ্দ আনা ঘরে অন্নকষ্ট—এরূপ অবস্থা কোটালিপাড়ে কেহ কখনও দেখে নাই। এইরূপ কথা যে কত লোকের নিকট শুনিয়াছি, সংখ্যা নাই। বন্ধু বলিলেন, "এক জন ভিখারী সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যার সময় আমাকে দেখাইল —এক মুষ্টি চাউলও সংগ্রহ হয় নাই। কি শোচনীয় ব্যাপার!! ক্ষুধায় যখন বালকেরা অস্থির হইয়া, পিতা মাতার কাপড় ধরিয়া টানে, তখনকার পিতা মাতার নিরাশার ক্রন্দন শুনিয়াছি। পিতা মাতা কাঁদিয়া বলিতেছে—"বাবু, এই ছেলে পিলে তোমাকে দিলাম, লইয়া যাও।" তখন আমার পাষাণ সদৃশ প্রাণও ফাটিয়া গিয়াছে। কলিকাতা আসিয়া আমার বন্ধু, মাণিকদহের জমিদার বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয়কে বলিয়াছিলাম,"আমি পাষাণ,তবু আমি অস্থির হইয়াছি, আপনি গেলে না জানি কেমন হইয়া যাইতেন।" বাস্তবিক হৃদয় যাঁহার আছে, তাঁহার গলিবেই গলিবে। হরিণহাটীতে একটী ১৩ বৎসরের বালিকার উপর তিন চারিটী ভাই ভগ্নীর ভার পড়িয়াছে। দুঃখিনীর এ পৃথিবীতে আর কেহ নাই। ঘর ছিল না, শুনিলাম, ফরিদপুরের ইঞ্জিনিয়ার, আমার বন্ধু নিবারণ বাবু তাহাকে একখানি কুঁড়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেই বালিকাটীর এমন অবস্থা যে কাঁদিতেও পারে না। দেড় প্রহর জল ঝাঁপাইয়া উত্তরপাড় চাউল লইতে আসিয়া থাকে। যাহারা চাউল নিতে আসে, তাহারা বৃষ্টি মানে না, ঝড় মানে না, বর্ষার প্লাবন মানে না! দেখিয়া বোধ হইল, ঐ বালিকাটী ছয় মাসের মধ্যে মাথায় তেল দেয় নাই। আমি একটী পয়সা তেল কিনিয়া মাথায় দিতে দিয়াছিলাম, দুঃখিনীর আর আনন্দ ধরে না। আধ আধ ক্রন্দন স্বরে সে বলিয়াছিল—'বাবু, ছোট ভাইদের যখন খাইতে দিতে পারি না, তখন তাহারা আমার চুল, আমার কাপড় টানিয়া ছিঁড়ে ও আমাকে প্রহার করে।" দুঃখিনী প্রহারের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখাইল। তাহার চুল নাই বলিলেই হয়, সমস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। বস্ত্র মলিন, ছিন্ন, আর্দ্র। ইহাকে একখানি নূতন বস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল। ১৲ টাকা হইলে একখানি নৌকা পাওয়া যায়; দুঃখিনী একখানি নৌকা পাইলে, ভিক্ষা করিতে আসিতে পারিবে, এই কথা বলিয়া সমস্ত দিন আমাকে কাঁদাইয়াছিল। *

শুয়াগ্রামের যে জননীর কথা আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, সে আমার নিমন্ত্রণ অনুসারে উত্তরপাড়ে আসিয়াছিল। তাহাকে একখানি নূতন বস্ত্র, ৪।৫ সের চাউল এবং প্রায় একসের লবণ দেওয়া হইয়াছিল। জননী আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন। ৭।৮ শত জননীর কথা লিখিতে পারি, সে সাধ্য আমার নাই, সংবাদপত্রে সে স্থানও নাই। প্রতি জনের বিষাদের কাহিনী শুনিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। হাটের বারবনিতারা পর্য্যন্ত তাহাদের কষ্ট দেখিয়া ম্রিয়মানা। ৩০। ৪০ জন নিরাশ্রয়া জননী ও পিতা শিশুদের আনিয়া উত্তরপাড়ে আশ্রয় লইয়াছে।

* এই ঘটনাটী পাঠ করিয়া, আমার বন্ধু বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায়, এই বালিকার নৌকা ও চাউল কিনিতে ২টী টাকা দিয়াছেন। বৈকুণ্ঠ বাবুর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, তাঁহার চক্ষু দুটী গিয়াছে। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমার পূর্ব্বের ন্যায় চক্ষু থাকিলে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম।" কি সহৃদয়তার ছবি!!

বিহারী বাবু যে দিন আগমন করেন, সে দিন তিনি যখন বলিলেন—"আজ আমি যাইব," তখন ১০০০ লোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া আকাশ কাঁপাইয়াছিল। বিহারী বাবু বলেন, সে ক্রন্দন, সে বিষাদের স্বর এখনও তাঁহার কাণে বাজিতেছে।

পত্র বড় হইল, আজ আর না। বলিয়াছি, সুহৃদ্‌সভার সভ্য বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ, একজন বন্ধু সমভিব্যাহারে, ঔষধ, বস্ত্র, ও সাহায্য লইয়া সুহৃদ্‌সভা হইতে উত্তরপাড়—কোটালিপাড় গিয়াছেন এবং দেশের মা বাপ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাবু হরিমোহন ঘোষাল সাহায্য লইয়া মাদ্‌রা (মাদারিপুর) গমন করিয়াছেন। ইহাঁরা উভয়ই সহৃদয় ব্যক্তি। গরিব দুঃখীর জন্য কিরূপ খাটিতে হয়, উভয়ই জানেন। বিধাতা ইহাঁদের ও আমাদের সহায় হউন। দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণ অগ্রসর হউন, দুর্ভিক্ষের ভীষণ অনলে যাহারা দগ্ধ হইতেছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করুন।

৪র্থ পত্র—সঞ্জীবনী, ১০ই ভাদ্র, ১৩০১।

* * * * * *

দুর্ভিক্ষের প্রথম অবস্থা হইতে এপর্য্যন্ত আমি মফঃস্বলের বহুপত্র পাইয়াছি। বিগত ভাদ্র (১৩০০) মাসে একবার বিবরণ সংগ্রহ করি। জ্যৈষ্ঠ (১৩০০) মাসে একবার মফঃস্বল পরিভ্রমণ করি। তার পর কার্ত্তিক (১৩০০) মাসে আর একবার মফঃস্বল পরিদর্শন করি। এ সকল ভ্রমণের কথা কোন সংবাদপত্রে আমি লিখি নাই। আমার নিকট বহুস্থানের কষ্টের কথা-সম্বলিত পত্র আছে, অনাহার-ক্লিষ্ট মৃত্যু-কাহিনীর বিবরণ আছে; সে সকল কিছুই উল্লেখ করার আবশ্যকতা বুঝি নাই। আমি পূর্ব্বে যে সকল অনাহারের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছি, তাহাও লিখি নাই। কিন্তু এবার স্বচক্ষে দেখিয়া আমার প্রাণ কেমন হইয়া গিয়াছে, সেজন্য আর নিরস্ত থাকিতে পারিতেছি না। ৮ই শ্রাবণ চাউল বিতরণ করিয়া বিহারী বাবু চলিয়া আসিয়াছেন। ২৯শে শ্রাবণ বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ কোটালিপাড় গিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে সকল পত্র আসিয়াছে, তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। অধিক স্থান নাই, ৩ খানি পত্র হইতে একটু একটু তুলিয়া দিতেছি। উনসিয়া আর্য্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রেবতীমোহন কাব্যরত্ন আমাকে লিখিয়াছেন ;—

২০শে শ্রাবণ, ১৩০১—"যাহারা এপর্য্যন্ত সুহৃদ্‌সভার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহারা বর্ত্তমান সময় অন্নাভাবে মৃতপ্রায় আছে এবং কবে বাবু আসিবেন, নিয়ত অনুসন্ধান করিতেছে।" শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস, উত্তরপাড় হাট হইতে বিহারী বাবুকে লিখিয়াছেন-- ২৬শে শ্রাবণ, ১৩০১, "আর মহাশয়কে নূতন সংবাদ কি লিখিয়া জানাইব, সমস্ত লোক অন্নাভাবে এই সমস্ত কাজ করিতেছে, জানিবেন যে, এখান হইতে যখন যান, তখন ফটিক মণ্ডল বাগানীর ছেলে ২৩টাকায় বিক্রয় করিত, কিন্তু আপনার জন্য পারিয়াছিল না, এক্ষণ তিন দিন অনাহারে থাকিয়া ছেলেটাকে শয্যাগত করিয়া, না বাঁচাইতে পারিয়া, উত্তরপাড় বাজারে আসিয়া সমস্তকে বলিল, যেরূপ হউক, আমি এক্ষণ পর্য্যন্ত একবেলা খাইয়া বাঁচিয়াছিলাম, এক্ষণ আমি বাঁচি না ও ইহাদের বাঁচাইতে পারি না। পরে পূর্ব্বপাড় নিবাসী শ্রীচণ্ডীচরণ বাড়ৈকে সকালে বলিয়া, তাহার নিকট হইতে ১৩ টাকা লইয়া ছোট ছেলেকে বিক্রয় করিয়াছে। আর শুনিতে পাইলাম যে, দেড় আনী জমীদারের বাজার খোলাতে একটা লোক অন্নাভাবে জীবন ত্যাগ করিয়াছে।"

বাবু শশধর চক্রবর্ত্তী বিহারী বাবুকে লিখিয়াছেন— ১০ই আগষ্ট, ১৮৯৪—"দেশের অবস্থা দিন দিন আরো ভীষণ হইতেছে। সে দিন বাজার খোলা স্কুল ঘরের সামনে একটা লোক আহারাভাবে পড়িয়াছিল, প্রাতে সকলে দেখিতে পাইল যে, শেয়ালে তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। অবশিষ্ট কুকুরে খাইতেছে। হায় রে অন্ন! * * আমি ঐ স্ত্রীলোকটীর নাম জানিয়া লিখিব।"

আমি যেরূপ অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, না জানি, এই কয়েক দিনে কত লোকের ঐরূপ দশা হইয়াছে! তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করে, এমন লোকও নাই; সকলেই আপন আপন চিন্তায় অস্থির। দিনব্যাপী ব্যবধান ৬০। ৭০ খানা গ্রাম হইতে লোক আসিয়া চাউল নিত, এত গ্রামের বিবরণ কে লিখিবে? ১৫৲ টাকায় ছেলে বিক্রয়ের কথা শীঘ্র শুনা যায় নাই। কত লোকের মান ইজ্জত, কত সতীর সতীত্ব, কত লোকের ধর্ম্ম পুণ্য, পেটের দায়ে লোপ পাইতেছে, কে জানে? ছেলের আহার কাড়িয়া মা খাইতেছেন, এ দৃশ্য আর দেখি নাই, এবার দেখিয়াছি। অন্নাভাবে জননীকুল, কোটালিপাড়ে উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। একজন স্ত্রীলোককে শৃগালে খাইয়াছে, সংবাদ পাইয়াছি; কিন্তু কত স্ত্রীলোক, কত দূরবর্ত্তী গ্রামে যে এই সময়ের মধ্যে মরিয়াছে, কে লিখিবে? কত অসংখ্য ছেলে-মেয়ের চক্ষের জলে জননীর চক্ষের জল মিশিতেছে—রজনী প্রভাত হয়ত দিন কাটে না; দিন কাটে ত রাত্ পোহায় না—উদরের জ্বালায় কত উষ্ণ নিশ্বাস যে আকাশে উঠিতেছে—৬০। ৭০ খানা গ্রামের সংবাদ কে জানাইবে? আর কেই বা অসংখ্য রমণীর দারুণ জ্বালা নিবারণ করিবে? আমি আজ জননীকুল, ভগিনীকুলকে, জননী ভগিনীদিগের কথা একবার ভাবিতে অনুরোধ করিতেছি। সমবেদনা, সমদুঃখী ভিন্ন কে বুঝিতে পারে? ছেলে মেয়ের আহার দিতে না পারিলে, মায়ের কত কষ্ট, তাঁহারাই জানেন; ছোট ভাই ভগিনীর আহার যোগাইতে না পারিলে, কত দুঃখ, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। রমণীকুল দয়ার জলধি—দয়া মায়া যাহা কিছু দেবযোগ্য জিনিস, তাহা তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, কোটালিপাড়ের জননী ভগিনীদিগের অভাব দূর করিতে তাঁহারা চেষ্টা করুন। তাঁহারা চেষ্টা করিলে, না হইতে পারে, এমন কাজ নাই। বিধাতার দোহাই, তাঁহারা অসহায়াদিগের, নিরাশ্রয়াদিগের সহায় হউন। আর দুঃখ দূর করিতে, অভাব মোচন করিতে, রমণীকুলের লজ্জা নিবারণ করিতে, আমি বঙ্গের দীনজননী, দরিদ্রের আশ্রয়-দায়িনী **শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীকে** আহ্বান করিতেছি! তিনি দয়া না করিলে আর দেশ রক্ষা পায় না।

পত্র বড় হইয়া উঠিল, সুতরাং আজ আর না। পত্র বড় হয়, কিন্তু কথা ফুরায় না।

৫ম পত্র—সঞ্জীবনী, ১৭ই ভাদ্র, ১৩০১।

* * * *

আজ কাল দেশের সহৃদয়তার কথা ভাবিতেছি, আর চক্ষের জলে ভাসিতেছি! মৈমনসিংহের অধীন কালিকাপুরের জমীদার বাবু ধরণীকান্ত লাহিড়ী মহাশয় ১০০ খানি নূতন বস্ত্র দিয়াছেন। আরো বহু সহৃদয় ব্যক্তি কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন। বাবু হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় দরিদ্রদের জন্য অস্থির হইয়া, কলিকাতার বাড়ী বাড়ী, রাস্তায় রাস্তায়, ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছেন। বোধ হয় যেন বিধাতা দরিদ্রদের জন্য দয়ারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন!!

আমি যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার একটু একটু আভাস দিয়াছি। আজ যে বন্ধুরা মাদরা ও কোটালিপাড় গিয়াছেন, তাঁহাদের চারিখানি সুদীর্ঘ পত্রের একটু একটু স্থান

তুলিয়া দেখাইব, দিন দিন অবস্থা কিরূপ ভীষণ হইতেছে। কিন্তু হৃদয় থাকিতে যাঁহারা হৃদয়-শূন্য, কর্ণ থাকিতে যাঁহারা বধির, কে তাঁহা-দিগকে গলাইতে পারে? পূজা আসিতেছে, কতলোক, কত নরনারী, আনন্দে পূর্ণ হইতে-ছেন! আর এই সময়ে শত শত জননী, পুত্র কন্যার অন্তিম-অবস্থা চিন্তনে অশ্রুজলে ভাসি-তেছেন। সে সকল দৃশ্য কে ভাবিয়া সুখ বিস-র্জ্জন দিবে? ঘটনা স্মরণ করিলে প্রাণ অস্থির হয়! বিধাতঃ! আর যে সহিতে পারি না!!

উত্তরপাড়ের দোকানদারদিগের ঘরে বহু বৎসরের কতকগুলি মসুরি ও ছোলার ডাইল ছিল, তাহা বিবর্ণ হইয়াছিল, সার ভাগ পোকায় খাইয়াছিল, অবশিষ্ট রাবিসে পরিণত হইয়া মুদিদের দোকানের কোণে কোণে পড়িয়াছিল। তাহার একমুষ্টি হাতে লইয়া দেখিয়াছি, হাত ধুইলেও দুর্গন্ধ যায় না। এই রাবিসগুলি, জঠরানল নিবৃত্তির জন্য, নিরাশ্রয়া রমণীরা কিনিয়া খাইয়াছে!! পাখী যাহা খায় না, মানুষে তাহা খাইয়া প্রাণধারণ করিয়াছে! কেহ এ কথা বিশ্বাস করিবেন কি? সত্য ঘটনা, উত্তরপাড়ে অনু-সন্ধান করুন, জানিবেন।

এক জন বৃদ্ধার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। বৃদ্ধা আমাদিগকে দেখিয়া বলিল, "বাবা, চাউল দেওয়ার সময় সন্দেহ করিয়া থাক, আজ দেখিয়া যাও, আমার ঘরে কি আছে, আর আমি কি সুখে আছি!" বৃদ্ধা ব্যাকুলচিত্তে ঘর দেখাইতে লইয়া চলিল। ঘরের চালে ছোন নাই, বেড়া নাই, সেত দূরের কথা; দেখিলাম, ঘরে একখানি ছিন্নবস্ত্র বা ছিন্ন শয্যা বা একটী মেটে জলপাত্র, একটী হাঁড়ি বা কোন আসবাব নাই—বলিতে কি, কিছুই নাই। জীবনে কখনও এরূপ শূন্য ঘর দেখি নাই; দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। বৃদ্ধাকে কিছু দিয়াও আশ মিটে নাই।

এক ঘরে বেলা আনুমানিক ১১টার সময় দেখিলাম, একটী জীর্ণা শীর্ণা যুবতী শুইয়া আছে। উঠিতে পারে না, নড়িতে পারে না। পার্শ্বের ঘরে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ মেয়েটী ওরূপে পড়িয়া রহিয়াছে কেন? উত্তর হইল, তিন দিন আহার নাই!!

একটী বৃদ্ধা ও একজন বৃদ্ধ উত্তরপাড় হাটে চাউল নিতে আসিয়াছিল। ঐ বৃদ্ধ, ঐ বৃদ্ধার স্বামী। তিন চারিটী পুত্র কন্যা, বৃদ্ধ অন্ধ। দুই প্রহর দূর হইতে ইহারা আসিয়া-ছিল। বৃদ্ধা বুকে পীঠে করিয়া পুত্র কন্যা লইয়া যখন আসিয়াছিল এবং কাঁদিয়া মনের দুঃখ, কষ্টের কথা বলিতেছিল, আমি ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারি নাই। একখানি বস্ত্রের জন্য, সমস্ত দিন, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কাঁদিয়া ২ আমাকে কাঁদাইয়াছিল। বস্ত্র ফুরাইয়া গিয়াছিল বলিয়া দিতে পারি নাই। এখন পাঠাইয়াছি।

স্নান করিবার সময় দেখিলাম, তিন চারিটী ছেলেমেয়ে লইয়া এক জননী, ভিক্ষার চাউল-সহ জল ঝাঁপাইয়া যাইবার সময়, একটী ছেলেকে জলে নিমগ্ন করিয়া বলিতেছিল— "মরিয়া যা, আমি আর সহিতে পারি না!" আমি দেখিয়া ঠিক থাকিতে না পারিয়া, তাহাকে জল হইতে তুলিয়া, কাকুতি মিনতি করিয়া, এক মাঝীর দ্বারা জলাপার করাইয়া দিয়াছিলাম।

আমার কথা আজ এই খানেই থাকুক। আমি অতিরঞ্জিত করিয়াছি, এই অভিযোগ উঠিয়াছে, ভাল কথা। কোটালিপাড় হইতে বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ, এবং মাদরা হইতে বাবু হরিমোহন ঘোষাল কি লিখিতেছেন, দেখুন।

বাবু কুঞ্জলাল ঘোষের প্রথম পত্র—উত্তরপাড়, ১৬ই আগষ্ট, ১৮৯৪। "কোনমতে কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এখানে

আসিয়া পৌছিয়াছি। কিরূপে জানি না, আমি আসিবার পূর্ব্বেই খবর পাইয়া, অনেক লোক উপস্থিত ছিল। উপস্থিত লোকের অবস্থা দেখিয়া এবং সকলের মুখে দুঃখের সমাচার শুনিয়া প্রাণে অসীম যন্ত্রণা পাইলাম। যে কয়েক মুষ্টি আউসধান হইয়াছিল—তাহা তো হাতির মুখে দুর্ব্বাঘাস! তাহা কেবল এ হতভাগ্যদের জঠরানল আরো জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে।

আজ প্রাতঃকাল হইতে জল ঝাঁপাইয়া বুকে পিঠে সন্তানগুলি বহন করিয়া কত দুঃখিনী উপস্থিত হইতেছে! আজ বড়ই দুর্দ্দিন। নানা স্থান খুঁজিয়া এক মোণ বই চাউল পাওয়া গেল না। তাহা ত মুষ্টিতে মুষ্টিতে শেষ হইয়া আসিল।

স্থানীয় যাঁহারা কিছু বুদ্ধিমান এবং একটু হৃদয়বান লোক (বলিয়া বোধ হইতেছে) তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন—পূর্ব্বাপেক্ষা অবস্থা মন্দ হইয়াছে। ভাদ্র ও আশ্বিন, এই দুই মাস উত্তরোত্তর অবস্থা আরো শোচনীয়ই হইবে। এই দুই মাস পিতা যদি ইহাদিগকে বাঁচান, কার্ত্তিক মাসে ইহারা ঘরের বাহির হইতে পারিবে,—মাঠে কাজ করিয়াও অনেক লোক উদরান্ন সংগ্রহ করিতে পারিবে। ঘরে পড়িয়া মরার কথা শুনিয়াছেন—কি? আজ কালকার অবস্থা ঠিক তাহাই। দেখিয়া শুনিয়া আমারও বিশ্বাস জন্মিয়াছে—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসময়। * * *

এই পর্য্যন্ত লিখিতে লিখিতে রাজেন্দ্রপাড়ার ভরতের মা, ভরত এবং দুটী বালক উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল—"তিন দিন পেটে ভাত নাই।" দেহ কখানি কঙ্কাল সার, চাহিয়া দেখা যায় না! স্ত্রীদেহে বস্ত্র নাই, বৃদ্ধা কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমাকেও কাঁদাইল! তাহারা আর বলিবে কি—দেখিয়াই সব বুঝিলাম। খাতা খুলিয়া দেখিলাম—বস্ত্র দিবার কথা আছে। চাউল ও বস্ত্র দিয়া বিদায় করিলাম। দাদা, অনেক সহিতে শিখিয়াছি—তবু এ সব সহ্য হয় না।"

বাবু কুঞ্জলাল ঘোষের দ্বিতীয় পত্র—২০ আগষ্ট, ১৮৯৮—"কাল রবিবার গিয়াছে। কি বিষম দিন! আমার আসার সমাচার সুদূর স্থানে পৌছে নাই। তথাপি ৬৫০ জন ভিক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব হাটের কেনা চাউলের মধ্যে প্রায় ৯ মোণ চাউল ছিল। উপস্থিত লোক দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, প্রাণ অস্থির হইল। আধসের চাউলে এক জনের ৩।৪ দিন কি হইবে, আমি কি করিয়া ইহা তাহাদের হাতে দিয়া বিদায় করিব, এই চিন্তা আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। যখন চাউল দিয়া যাইতে লাগিলাম, চারি দিক হইতে হাহাকার উঠিল। "আজ দুদিন পেটে কিছু নাই, "ঘরে ৪।৫টী গুঁড়োগাঁড়া" ইত্যাদি ইত্যাদি কত কাকুতি মিনতি!! অন্যদিকে!! আমার ভাণ্ডার শূন্য, ইচ্ছা থাকিলেও উপায় করিতে সাধ্য নাই, কি পরিতাপ! কি পরিতাপ!! দাদা, ডাকিয়া আনিয়া এ যাতনায় আমাকে কেন ফেলাইলেন? আপনি নিজে কখনই এ দৃশ্য সহিতে পারিতেন না, নিশ্চয়ই বাড়ীঘর বেচিয়া, ইহাদিগের অন্তত এক সন্ধ্যা পেট ভরিয়া খাইবার জোগাড় না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তবে আমাকে এ বিপদ-সাগরে ভাসাইলেন কেন? চক্ষুর অগোচরে যাহা হইবার হইতেছিল, সাম্‌নের উপর ইহা কে দেখিতে পারে? আমি আপনাদের কাছে এমন কি অপরাধ করিয়াছিলাম, যাহার জন্য এ দুরন্ত শাস্তি বিধান করিয়াছেন? আমি আপনাদের পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, ত্বরায় ৭০০ শত লোকের সপ্তাহে এক সন্ধ্যা পেট ভরিয়া খাইবার আয়োজন করুন, নতুবা মানুষের জীবন লইয়া এ খেলা খেলিতে আমি পারিব না। এই হতভাগ্যদিগের ক্ষুধানলে ঘৃতাহুতি দিবার জন্য আমি কখনই এখানে জীবিত থাকিতে পারিব না।

আজ ৬ দিন এখানে আসিয়াছি। ইহার মধ্যেই অভিজ্ঞতার একশেষ হইয়াছে! এ দুরন্ত অভিজ্ঞতা যদি না হইত!! ভদ্রাভদ্র অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছে। সকলেই একই কথা বলেন—"এমন মন্বন্তর কখনই হয় নাই।" যাঁহারা অতিশয় বৃদ্ধ, তাঁহারা বলেন "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেখিয়াছি—তাতেও লোকের এত কষ্ট হয় নাই।" আমি জীবনেও মানুষের এমন দুর্দ্দশা দেখি নাই। ৩০টী টাকায় এক হতভাগ্য পুত্র বিক্রয় করিয়াছে!! বিহারী বাবুর এ স্থল পরিত্যাগ এবং আমার আসার মধ্যে ২টী লোক অনাহারে মরিয়াছে!! কিন্তু "অনাহার" নামক একটী রোগের নাম চিকিৎসা-শাস্ত্রে নাই বলিয়া, থানাওয়ালারা, নিতান্ত নাচার হইয়া, অন্য headএ এ মৃত্যু গণনা করিয়াছে।

একটী মুসলমান বালককে তাহার পিতা মাতা

আহার দিতে না পারিয়া বাজারে ফেলিয়া গিয়াছিল! আমি তাহাকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছি।”

বাবু কুঞ্জলাল ঘোষের তৃতীয় পত্র—২৪শে আগষ্ট, ১৮৯৪—“কালকার মহাযজ্ঞ প্রভু সমাপন করিয়াছেন। প্রায় ১২টার সময় যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, প্রায় ১২০০ (বার শত) ভিক্ষার্থী উপস্থিত। আমার পুঁজি ১২ মোণ চাউল বই নয়। *** ভাই জগন্নাথ প্রসাদ সাত হাঁড়ি ভাত রান্না করিয়া বালকবালিকাদিগের কান্না থামাইলেন। তার পর বস্ত্র দানের পালা। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর কার্য্য। ৮৫ খানা কাপড় ভাণ্ডারে ছিল। আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কয়েকজনকে পূর্ব্বেই দিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। অবশিষ্ট লোক লিষ্ট এবং চেহারা দেখিয়া মনোনীত করি। সকল কাপড় মুহূর্ত্তের মধ্যে নিঃশেষ হইল। লোকের আর্ত্তনাদে থাকিতে না পারিয়া, দুখানি কাপড় এখান হইতে কিনিয়া দিলাম। তারপর একখানি একখানি করিয়া আমার পরিধানের ২ খানি এবং জগন্নাথের ১খানিও দিলাম। আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া ও সন্ধ্যা হইয়া গেল দেখিয়া সকলে সে দিনের মত গৃহে ফিরিয়া গেল। সমস্ত দিন-ব্যাপী নিদারুণ মনোবেদনায় আর আহার করিতে প্রবৃত্তি হইল না। পিতাকে ডাকিয়া শয্যায় আশ্রয় লইলাম। *** সে দিন জগন্নাথ প্রসাদ ৮।১০ খানি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। যে সমাচার পাইয়াছি, তাহাতে প্রাণ অস্থির হয়! নৌকার অভাবে অনেক লোক সাহায্য লইতে পারিতেছে না। কেহ তিন দিন, কেহ চারি দিন খায় নাই, কেহ চাউলের ভুসী, কেহ নাইল ও কচু এবং পাতা সিদ্ধ করিয়া খাইয়া কোন প্রকারে বাঁচিয়া আছে। জগন্নাথ এক মোণ চাউল লইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে দিয়া আসিয়াছে। মধ্যবিধ ঘরের স্ত্রীলোক কেহ কেহ ছেঁড়া কাঁথা পরিয়া তাহাকে দুঃখ জানাইতে আসিয়াছিল। ইহারা ঘরের বাহির হইতে পারে না—আর ভিক্ষায় আসিবে কি!।

*** আর একটী বিশেষ কথা! অনেক লোক ৪।৫ তোলা রূপা বন্ধক রাখিয়া একটী টাকা মাসিক ৵০ সুদে কর্জ্জ লইতেছে। বহু সংখ্যক লোক যথাসর্ব্বস্ব বন্ধক দিয়া এইরূপ ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে এক বিঘা জমি বন্ধক রাখিয়া ২০।২৫ টাকা পাইত, এবার ধান সহিত এক বিঘা জমি বন্ধক রাখিয়া মাত্র ৫ টাকা পাইতেছে। বহু সংখ্যক লোক এই প্রকার করিতেছে। ইহার পরিণাম ইহাই দেখিতেছি, ধান উঠিবা মাত্র এই সমস্ত লোক ঋণদায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইবে এবং আগামী বৎসরও ইহারা অনাহারে মরিবে। আমার বোধ হয়, এ অত্যাচার গবর্ণমেণ্টে জ্ঞাপন করা উচিত। এরূপ সর্ব্বনেশে সুদের হার কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। সুহৃদসভা হইতে ত্বরায় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন প্রেরিত হওয়া কর্ত্তব্য। আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যে যাহারা ঋণ শোধ করিতে পারিবে, তাহাদিগের নিকট হইতে ন্যায্য সুদ আদায় করা হয়, এই প্রকার বন্দোবস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা আগামী বৎসরও এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিতে হইবে এবং দুর্ভিক্ষের সাহায্য করিতে হইবে।”

বাবু হরিমোহন ঘোষালের দ্বিতীয় পত্র, মাদরা, ২২শে আগষ্ট,—১৮৯৪;—“সঞ্জীবনীতে আপনার চিঠি দেখিয়া কেহ কেহ অতিরঞ্জিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ কেহ একেবারেই অবিশ্বাস করিয়াছেন, এজন্য আপনি দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু আমি দুঃখিত হইবার কোন কারণ দেখি না। কারণ ঘরে বসিয়া বিজ্ঞের ন্যায় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা এদেশের লোকের স্বভাব। একজন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া, নানারূপ কষ্ট সহ্য করিয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া তাহাদের শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দেখিলেন এবং তাহা মোচনের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, আর স্বীয় গৃহ-প্রাচীরের ত্রিসীমায় যাহারা বাহির হয় নাই, অনায়াসে তাহারা তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়া অবিশ্বাস করিল। এরূপ বিজ্ঞতা প্রকাশ আমাদের দেশেই সম্ভব।

আমি দৃঢ়তার সহিত আহ্বান করিতেছি, কে আসিবেন আসুন, অনাহারে লোকের কেমন ভয়ানক আকৃতি হইয়াছে, একবার আসিয়া দেখুন। স্বামী উদরের জ্বালা ও পরিজনের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আর দুঃখিনী রমণী সন্তান গুলিকে লইয়া এবাড়ী ও বাড়ী জল ঝাঁপাইয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে, কেহ এক মুষ্টি অন্ন দিতেছে না, শেষে পাটপাতা, শালু, কলা সিদ্ধ খাইয়া কোনও মতে সন্তান গুলিকে রাখিয়াছে, নিজে মৃতপ্রায়, এ ভয়ানক

দৃশ্য কে দেখিতে চাহেন, আসুন এই খানে, আমি এরূপ কত পরিবার দেখাইয়া দিব। আমি মাদ্‌রা, ব্রাহ্মণদ্বি, ঝাউদি, কলাইমারা প্রভৃতি এগার থানা গ্রামের অধিকাংশ লোকের বাড়ীতে গিয়া দেখিয়াছি, তাহারা অনেকেই একবেলা খাইতে পায় না। এই সকল লোক যদি এখন সাহায্য না পায়, তবে মারা যাইবে। * * * * * যদি কেহই সাহায্য না দেন, তবে অবিলম্বে আমি এস্থান পরিত্যাগ করিব, লোকের এ কষ্ট আর দেখা যায় না। সর্ব্বদা দলে দলে লোক আসিয়া আমার নিকট কাঁদিতেছে, তাহাদের চেহারা দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। কাল এরূপ প্রায় ২৫ জন দুঃখীকে ফিরাইয়া দিয়াছি, কিছু ছিল না। প্রাণে যে কি যাতনা পাইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। * * *

অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই কাপড় নাই, লজ্জায় ঘরের বাহির হইতে পারে না। আমি তাহাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া কাপড় দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। আপাততঃ এক শত খণ্ড কাপড় চাই। মহালানবিশ মহাশয়কে লিখিয়াছি, আপনিও দেখিবেন, শীঘ্র এই কাপড় চাই। সমাজ দিতে না পারিলে, আপনারা যেরূপেই হউক, যোগাড় করিয়া দিবেন।"

আমার কথা যাঁহারা অবিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল পত্র পড়িয়া কি বলিবেন, জানি না। বোধ হয়, অনেকের অবিশ্বাস দূর হইবে। এই দারুণ বর্ষার সময় ঘরের চালে ছোন নাই, বেড়া নাই, অনাবৃত স্থানে, বর্ষার ধারা মাথায় পাতিয়া লইয়া ছেলে মেয়ে সহ কত পরিবার অনাহারে থাকিতেছে, সংখ্যা নাই। পূজা আসিতেছে, বঙ্গে মহা আনন্দ-উৎসবের আয়োজন হইতেছে; ঠিক এই সময়ে, কত পরিবার মৃত্যু-সঙ্কটে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে! সহৃদয় ব্যক্তিগণ মহোৎসবের খরচের তালিকায়, নিরন্নদিগের জন্য কিছু কিছু লিখিবেন, এই তাঁহাদের শ্রীচরণে অনুরোধ। নচেৎ চক্ষের জলে, উষ্ণ নিশ্বাসে বঙ্গ ডুবিয়া যাইবে। যিনি যাহা দিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী,
২১০।৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।—৯ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বহু দিন হইতে এই পত্রিকাখানি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। ডাক্তারী, কবিরাজী, উভয়বিধ চিকিৎসা-প্রকরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু এ সকল কথা বলিবার জন্য এ সমালোচনা করিতেছি না। এই সংখ্যায়, দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের ভোজনানুসারে সত্ত্বাদি গুণভেদ সম্বন্ধীয় চরক হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অতি সুন্দর মত অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্লোকগুলি এত সুন্দর যে, পড়িলে বিমোহিত হইতে হয়। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, প্রবন্ধটী আমূল উদ্ধৃত করি, দুঃখের বিষয়, স্থান হইল না। দুটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, পাঠকগণ ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন, শ্লোকগুলি কেমন সুন্দর—

"শুদ্ধস্য সত্ত্বস্য সপ্তবিধং ভেদাংশং বিদ্যাৎ কল্যাণাংশত্বাৎ তৎ সংযোগাত্তু ব্রাহ্ম্যমত্যন্তশুদ্ধং ব্যবস্যেৎ।"

অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বের সপ্ত প্রকার ভেদ জানিবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মসত্ত্ব শুভকারী ও অত্যন্ত শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। নিম্নে শুদ্ধসত্ত্বের সাত প্রকার ভেদ ও লক্ষণ বলা হইতেছে।

"শুচিং সত্যাভিসন্ধং জিতাত্মানং সংবিভাগিনং জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপ্রতিবচনসম্পন্নং স্মৃতিমন্তং কামক্রোধলোভমানমোহের্ষ্যামর্ষাপেতং সমং সর্ব্বভূতেষুব্রাহ্ম্যংবিদ্যাৎ।"

অর্থাৎ যিনি শুচি, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, যাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিভাগ করণে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, যিনি জ্ঞান, বিজ্ঞান, বচন ও প্রতিবচন বিষয়ে উৎকৃষ্ট শক্তিসম্পন্ন, স্মরণশক্তি বিশিষ্ট, যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা এবং অমর্ষ প্রভৃতি দোষে দূষিত নহেন, এবং যাঁহার সর্ব্বভূতেই সমান জ্ঞান, তাঁহাকে ব্রাহ্ম্য বলিয়া জানিবে।"

স্থানাভাব প্রযুক্ত অন্যান্য পুস্তকের সমালোচনা কম্পোজ হইয়াও এবার গেল না; গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য

ধর্ম্মের প্রামাণ্য লইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ পৃথিবীতে মহা শব্দ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, কেবল আমাদের ধর্ম্মেরই প্রামাণ্য আছে, আর কোন ধর্ম্মের প্রামাণ্য নাই। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য চান। কিন্তু ধর্ম্মের যে প্রামাণ্য আবশ্যক, একথা প্রথমে হিন্দুরাই তোলেন। শুধু তুলিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, দর্শনে যেমন ধর্ম্মের অনেক কথার বিচার ও মীমাংসা হইয়াছে, তেমনি হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্যেরও বিচার এবং মীমাংসা হইয়াছে। বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের নিকট নূতন কথা কেহ বলিতে পারিবেন না। নিজ ধর্ম্মের প্রামাণ্য বলিয়া খ্রীষ্টানগণ যাহা প্রচার করেন, তাহার সহিত সনাতন ধর্ম্মের প্রামাণ্যের তুলনা করিলে, তাহাদের প্রামাণ্য নগণ্য হইয়া পড়ে। সে কথা দূরে যাক্, এখন খ্রীষ্টানেরা আসিয়া বলিতেছেন, হিন্দু, তোমার ধর্ম্মের প্রামাণ্য কি? এ বড় বিচিত্র কথা, প্রামাণ্যের আদি শিক্ষককে আসিয়া অন্য লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, প্রামাণ্য কি, তাহা তুমি কি বলিতে পার? খ্রীষ্ট মিশনরিগণ হিন্দুকে ঠিক্ এই প্রশ্ন করেন।

হিন্দু শুনিয়া বলিতেছেন, যদি কোন ধর্ম্ম বাস্তবিক ধর্ম্ম নামের যোগ্য হয়, তাহা সনাতন ধর্ম্ম; আর কোন ধর্ম্মের যদি প্রামাণ্য থাকে, তাহাও সেই সনাতন ধর্ম্মের আছে। খ্রীষ্টান! তোমার ধর্ম্মের প্রামাণ্য, প্রামাণ্যই নহে। কেন, তাহা বলিতেছি:—

পরমেশ্বর ও পরলোক লইয়া ধর্ম্ম। ধর্ম্ম সেই পরমেশ্বরের সহিত আত্মার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেয়। পরলোক ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বিষয়, সুতরাং তাহা সামান্য মনুষ্যের জ্ঞান-গোচর নহে। তাই যদি হইল, তবে খ্রীষ্টধর্ম্ম যে সকল পারলৌকিক বিষয় প্রচার করিয়াছে, তাহা বাস্তবিক সত্য কি না? একথা বিচার করিতে হইলে জিজ্ঞাস্য এই, যিনি সে সকল কথা বিদিত করিয়াছেন তিনি কি সামান্য মনুষ্য? যদি সামান্য মনুষ্য হন, তবে তাঁহার যাহা জ্ঞানাতীত, তাহা যদি প্রচার করিয়া থাকেন, সে সমুদায় অনুমান-মূলক কথা। কিন্তু তিনি তা না হইয়া যদি এমত পুরুষ হন, লোকাতীত বিষয় যাঁহার গোচর, তবে তাঁহার কথা গ্রাহ্য হইতে পারে। এজন্য খ্রীষ্টানেরা বলিলেন, ঈশা সেইরূপ পুরুষ; ঈশা ঈশ্বর। তবে প্রমাণ করা চাই, ঈশা ঈশ্বর কি না? সেই প্রমাণার্থ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ বলিলেন, ঈশা কতকগুলি অদ্ভুত, এবং অলোকসাধারণ ক্রিয়া কলাপ দ্বারা আপন ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস এই সমস্ত ক্রিয়া কলাপের সাক্ষী। এই ঐতিহাসিক প্রামাণ্যের উপর খ্রীষ্টধর্ম্ম স্থাপিত। সামান্য লোকের নিকট এরূপ প্রামাণ্য গণ্য হইয়াছিল, কিন্তু খ্রীষ্ট-ইউরোপ যখন ক্রমশঃ জ্ঞানবৃদ্ধ হইতে লাগিল, তখন তাহা নিজেই সে প্রামাণ্যকে অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। কারণ, মূর্খের নিকট যাহা প্রামাণ্য, জ্ঞানীর নিকট তাহা প্রামাণ্য নহে। এজন্য এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, খ্রীষ্ট-ইউরোপে Straus, Renan, Mill প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এবং Huxley প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এপ্রামাণ্যের উপর আর আস্থা স্থাপন করেন না। খ্রীষ্টধর্ম্মের এই ঐতিহাসিক প্রামাণ্য নিম্নলিখিত কারণে অগ্রাহ্য।

খ্রীষ্টধর্ম্ম ঈশার বাক্য। The New Testament বা নূতন বাইবেল ঈশ্বর-উপদিষ্ট-বাক্য; সুতরাং বাইবেল অপৌরুষেয় নহে। এখন কথা এই, খ্রীষ্টধর্ম্মের পৌরুষেয়বাদের পুরুষ ঈশা ঈশ্বর কি না? যদি তিনি ঈশ্বর হন, তবে তাঁহার অলৌকিক বিষয়ের উপদেশ সমুদায় সত্য, নহিলে নহে। বাইবেলের সত্যতা প্রতিপাদনার্থ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ দ্বিবিধ প্রমাণ প্রদর্শন করেনঃ—

প্রথমতঃ। বাইবেলের পরতঃ-প্রমাণ বা External Evidence.

দ্বিতীয়তঃ। বাইবেলের স্বতঃ-প্রমাণ বা Internal Evidence.

প্রথমতঃ আমরা পরতঃ-প্রমাণ গ্রহণ করিলাম। পরতঃ-প্রমাণ, প্রমাণান্তর হইতে বাইবেলকে সত্য রূপে প্রতিপন্ন করিতে চায়। এই প্রমাণান্তর ইতিহাস। ইতিহাস স্থাপন করিতে চাহে যে, ঈশা অদ্ভুত এবং অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ করিয়াছিলেন বলিয়া ঈশ্বর। একথার আপত্তি এইঃ—

(১) অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপ ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হইতে পারে না। আজ যাহা অদ্ভুত, কাল তাহা বিজ্ঞান-জ্যোতিঃতে সামান্য ও প্রাকৃত। অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপ যদি ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হয়, তবে প্রতি বাজিকর ঈশ্বর।

(২) ইতিহাস ঘটনাবলির যে সাক্ষ্য দেয়, তাহার প্রামাণ্য কি? তাহার প্রামাণ্য যাহা দিবে, তদুত্তরে বলিতে হইবে, সে প্রামাণ্যের আবার প্রামাণ্য কি? ঐতিহাসিক প্রমাণের এইরূপ অনন্ত-পরম্পরায় প্রমাণের আবশ্যকতা হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক প্রমাণে অনবস্থা দোষ (Argumentum-ad-infinitum) ঘটে। অতএব ইতিহাস ঈশ্বরত্ব স্থাপনে অসমর্থ। তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে, পরতঃ-প্রমাণে বাইবেল প্রামাণ্য নহে।

হিউম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মীয় পরতঃ-প্রমাণ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। সে সমস্ত আপত্তি আজিও অখণ্ডিত রহিয়াছে। এই প্রমাণে ইতিহাস অগ্রাহ্য। তবে কি ইতিহাস একেবারেই অগ্রাহ্য? আমরা এমত কথা বলিতে চাই না। আমাদের অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরত্ব স্থাপন পক্ষে ইতিহাস প্রামাণ্য নহে। লৌকিক ব্যাপার স্থাপন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণের তত বাধা নাই। তবে তাহাতেও প্রমাণের প্রকৃতি এবং বিষয় বিচার্য্য।

এই ইতিহাস প্রতিপন্ন করে যে, পূর্ব্বতন মিশর-ধর্ম্ম হইতে ইহুদী ধর্ম্মের উৎপত্তি। পুরাতন বাইবেলেও তাহা সপ্রমাণ। প্রাচীন মিশরধর্ম্মের সহিত আর্য্যধর্ম্মের যে অনেক সাদৃশ্য ছিল, এমত নহে; আর্য্যগণের সহিত মিশরবাসিগণের সংমিশ্রণও ছিল। সুতরাং পূর্ব্বকালে বৈদিক ধর্ম্ম মিশরে প্রচার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। সেই মিশর হইতে প্রাচীন জুডিয়ায় বৈদিক-তত্ত্ব সকল প্রচার হইয়া থাকিবে। হিব্রুগণ সেই সমস্ত মূল তত্ত্বের উপর আপনাদের ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। ঈশা অতি আধুনিক কালের লোক। তিনি যে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিত অলৌকিক তত্ত্ব সমুদায় হিব্রুধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিয়া নিজ অনুমান দ্বারা তাহা হইতে এক বিশেষ ধর্ম্মমতের সৃষ্টি করেন নাই, এমত প্রমাণের নিতান্ত অভাব।

ফরাশীদেশীয় নটোভিক্ (M. Notovitch) নামক কোন ভ্রমণকারী সম্প্রতি তিব্বৎদেশীয় লী নগরীর হেমিস অভিধেয় বৌদ্ধমঠ হইতে একখানি পালীভাষায় লিখিত ঈশার জীবনী সমুদ্ধার করিয়া ফরাশী ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন। সেই জীবনীতে

প্রতিপন্ন যে, ঈশা ভারতে আসিয়া এতদ্দেশীয় ধর্ম্মতত্ত্বের অনেক উপদেশ গ্রহণ করিয়া গিয়াছিলেন। একথা যদি অপ্রামাণ্য না হয়, তাহা হইলে বৈদিক ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বেদই অলৌকিক তত্ত্ব সকল জগতে প্রচার করিয়াছে।

এক্ষণে দ্বিতীয় বা স্বতঃ-প্রমাণের কথা। স্বতঃ-প্রমাণের যুক্তি-পথ এই রূপ :—

নূতন বাইবেলে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সমুদায় নির্দ্দোষ। এরূপ নির্দ্দোষ বাক্য অভ্রান্ত পুরুষ ভিন্ন উক্ত হইতে পারে না। কারণ, সামান্য ভ্রান্ত মনুষ্যোক্ত বাক্য হইলে তাহা অভ্রান্ত হইত না। ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ অভ্রান্ত নহে। সুতরাং বাইবেল ঈশ্বরোক্ত বাক্য এবং ঈশা সেই ঈশ্বর।

এ যুক্তির সমস্ত বল বাইবেলের সত্যাসত্যের উপর নির্ভর করিতেছে। আজি যদি বাইবেলের কোন অংশ ভ্রান্ত বা দোষযুক্ত প্রমাণিত হয়, অমনি এ যুক্তির সমস্ত বল বিনষ্ট হইল। এ যুক্তি বাইবেলের নিজ বাক্য হইতে তাহাকে সত্য রূপে প্রমাণ করিতে চাহে। এ যুক্তির দোষ এই যে, বাইবেলকে সত্য বলিয়া প্রমাণ যে করিবে, সে ত ভ্রান্তিশীল মনুষ্য; ভ্রান্তিশীল মনুষ্য কিরূপে অভ্রান্তের প্রমাণ হইতে পারে? যে প্রমাণ করিবে সেই মনুষ্যের প্রমাণ কি? যদি তাহার কিছু প্রমাণ থাকে, তবে সেই প্রমাণান্তরের প্রমাণ কি? সুতরাং এস্থলেও অনবস্থা দোষ ঘটে। অতএব বাইবেল স্বতঃ-প্রামাণ্যও নহে।

খ্রীষ্টধর্ম্মের যাহা পরতঃ-প্রমাণ, তাহা কি হিন্দুধর্ম্মে আছে? হিন্দুধর্ম্মেরও প্রমাণ পরতঃ এবং স্বতঃ। হিন্দুধর্ম্মের পরতঃ প্রমাণ বুঝাইবার পূর্ব্বে এই কয়েকটী বিষয় জানা উচিতঃ—

(১) পৌরাণিক এবং বৈদিক ভেদে হিন্দু ধর্ম্মের দুই অঙ্গ। বেদই হিন্দুধর্ম্ম, পৌরাণিক ধর্ম্ম সেই বেদের বিস্তৃতি মাত্র।

(২) জনসমাজের জ্ঞানাধিকার বিভিন্ন বলিয়া সনাতন ধর্ম্ম এই রূপ দ্বিধা বিভক্ত। জ্ঞানিগণের জন্য যাহা প্রতিপাদ্য, অজ্ঞানীর কাছে তাহা অগ্রাহ্য। সকল অজ্ঞানীকে জ্ঞানী করা অসম্ভব; এজন্য হিন্দুধর্ম্ম নিজেই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অধিকার ভেদের উপযোগী হইয়াছে।

(৩) যেমত অধিকার ভেদে জ্ঞানী অজ্ঞানী এই দুই প্রধান শ্রেণী হইল, তেমতি জ্ঞানিগণের মধ্যেও অনেক অধিকার ভেদ আছে। যেমন শাস্ত্রজ্ঞানী, দার্শনিক, বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, তার্কিক, বিজ্ঞানবিৎ, মুনি, ঋষি, মহর্ষি দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, ইত্যাদি। জ্ঞানিগণের মধ্যে যাঁহারা এক এক বিশেষ মত প্রচারক, তাঁহারাই মুনি নামে প্রথিত।

(৪) অদ্ভুত লীলা খ্রীষ্টধর্ম্মে ঈশ্বরত্বের প্রমাণ। হিন্দুধর্ম্মে তাহা নহে। হিন্দুধর্ম্মে লীলার প্রমাণ ঈশ্বর। শাস্ত্র-প্রমাণ ঈশ্বরাবতার বিশ্বাস্য বলিয়া তাঁহার লীলা দেবলীলা। হিন্দু অগ্রে স্বীকার করে যে রাম, কৃষ্ণ, ভীম, যুধিষ্ঠির, হনুমান প্রভৃতি দেবাবতার, তার পর, কাজেই স্বীকার্য্য যে, তাঁহাদের লীলা সকল দেবলীলা বলিয়া অদ্ভুত এবং অলৌকিক। কিন্তু সকল হিন্দুই যে ঈশ্বরাবতার বিশ্বাস করে, এমত নহে। যে হিন্দু নিম্নাধিকার জ্ঞানে ঈশ্বরাবতার স্বীকার করেন, তিনি হয় ত উচ্চাধিকারে উঠিয়া তাহা স্বীকার করেন না। তবেই দেব-দেবীর সৃষ্টি হিন্দুধর্ম্মে নিম্নাধিকারীর জন্য। উচ্চাধিকারী সাকার ও সগুণ ঈশ্বরবাদী * নহেন। দৃষ্টান্ত

* হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপাদ্য নির্গুণ ঈশ্বর। নির্গুণত্বই মুক্তি। সগুণ ঈশ্বর নিম্নাধিকারীর উপাস্য।

স্বরূপ দেখ, ব্যাস মহাভারত সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, তাহা কাব্য; কিন্তু অজ্ঞানী এবং নিম্নাধিকারী জ্ঞানী সমাজে তাহা ইতিহাস-রূপে গৃহীত। যে জ্ঞানিগণ এবং অজ্ঞানিগণ ঈশ্বরাবতারে বিশ্বাস করেন, যাঁহারা অত্যন্ত বিশ্বাসপ্রবণ, সমগ্র মহাভারত প্রকৃত ঘটনা-রূপে তাঁহাদের গ্রহণ করাতে বাধা কি? তাঁহাদের নিকট প্রাকৃত অপ্রাকৃত সমস্ত বিষয়ই গ্রাহ্য।

তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে, হিন্দুজনসমাজে ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিবার আবশ্যকতা নাই। পুরাণোক্ত বলিয়াই যাঁহারা সহজেই লোকের ঈশ্বরত্বে অথবা অবতার-বাদে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত প্রামাণ্যের প্রয়োজন কি? এজন্য খ্রীষ্টধর্ম্মের যাহা পরতঃপ্রমাণ, তাহা হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য নহে। যাহারা কোন প্রামাণ্য চাহে না, তাহাদের কাছে প্রামাণ্য ধরা বৃথা। সেই নিমিত্ত হিন্দু ধর্ম্ম কেবল জ্ঞানিগণের জন্য প্রামাণ্য দিয়াছে।

খ্রীষ্টধর্ম্মেও দেখা যায় যে, সামান্য জনগণ ধর্ম্মের তত প্রামাণ্য চাহে না; সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্বে তাহাদের দৃঢ় আস্থা। ধর্ম্মের প্রামাণ্য চায় কেবল সংশয়ী জনগণ। সেই সংশয়ী জনগণের নিমিত্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ স্বতঃপ্রমাণ-পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের স্বতঃপ্রমাণ তত প্রবল যুক্তিবিশিষ্ট নহে বলিয়া, খ্রীষ্টানগণ পরতঃ-প্রমাণকে বিধিমত প্রকারে প্রবল করিতে চাহেন। চাহিলে কি হইবে, সংশয়িগণ সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ ছেদন করিয়া উঠেন। তাঁহারা প্রমাণের পর প্রমাণ চাহিয়া সর্ব্ব প্রমাণের উপরে উঠিয়া পড়েন।

ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি সামান্য জনগণের অচলা ভক্তি। শাস্ত্র সকল চিরমান্য এবং মহাজন-অবলম্বিত। এই কারণে সাধারণ জনগণ শাস্ত্রোক্ত বিষয় সমুদায় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে। কি অদ্ভুত, কি অযৌক্তিক, কি প্রাকৃত, কি অপ্রাকৃত,—কোন বিষয় বিচার না করিয়া তাহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে। সেই সাধারণ লোকমণ্ডলীর জন্য পুরাণোক্ত ধর্ম্ম। এই পুরাণোক্ত হিন্দুধর্ম্মে কথিত যে, ঈশ্বর জীবের কল্যাণার্থ শরীরধারণ ও লীলা বিগ্রহ করিয়া থাকেন। রামাদি সেইরূপ বিষ্ণুর অবতার। সাধারণ জনগণ এই অবতারবাদ পুরাণ-প্রমাণ অবলম্বন করিয়া রামাদির লীলা সকলকে দেবলীলা বলিয়া অনায়াসে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সেই সমস্ত লীলা বিশ্বাস্য কেন? যেহেতু তাহারা দেব-লীলা। সেই দেবতা বিশ্বাস্য কেন? যেহেতু তাহা শাস্ত্রানুমত। শাস্ত্র গ্রাহ্য কেন? যেহেতু তাহা ঋষি-প্রোক্ত এবং মহাজন-অবলম্বিত। তবেই দাঁড়াইতেছে, সেই অজ্ঞানিগণ, জ্ঞানী ও মহাজন-আচরিত পথের অনুগামী। যাহা চিরকাল মান্য হইয়া আসিতেছে, যাহা সমাজের মধ্যে গণ্য মান্য ও পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক আদৃত এবং অবলম্বিত, তাহা সামান্য জনগণ কখন অমান্য করিতে পারে না। এই পরতঃ-প্রমাণে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম সাধারণ জনগণ কর্ত্তৃক গ্রাহ্য।

তথাপি, খ্রীষ্টধর্ম্মের পরতঃ প্রমাণ যে হিন্দুজনসমাজে একেবারেই নাই, এমত কথা আমরা বলিতে চাহি না। তাই সাধারণ লোকমণ্ডলীর মধ্যেও কেহ কেহ সেই প্রামাণ্যও গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা শাস্ত্রে তাহার এইরূপ আভাস পাই।

"পরাশর কহিলেন—ইন্দ্র গমন করিলে পর, গোপালগণ কৃষ্ণকে বিনা ক্লেশে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে প্রীতি সহকারে কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো! অদ্য আপনি আমাদিগকে

ও গোপগণকে এই পর্ব্বত ধারণ করিয়া, মহাভয় হইতে রক্ষা করিলেন। আপনার এই অতুলনীয় বালক্রীড়া, অথচ নিন্দিত গোকুলে জন্ম, আবার এই প্রকার দিব্য কর্ম্ম এ সকল কি? হে তাত, তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনি কালিয়কে দমন করিয়াছেন, প্রলম্বাসুরকেও বধ করিয়াছেন, আবার আজ এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলেন। আপনার এই সকল বিচিত্র কর্ম্ম অবলোকন করিয়া আমাদের অন্তঃকরণ শঙ্কিত হইতেছে। হে অমিতবিক্রম! আমরা হরিপদ উদ্দেশে সত্য সত্যই শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমরা আপনার এ প্রকার বীর্য্য অবলোকন করিয়া, আপনাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। হে কেশব! এই ব্রজের কি স্ত্রী, কি কুমার, সকলেই আপনার উপর প্রীত হইয়াছে। আপনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন, সমুদয় দেবগণও একত্রিত হইলে এ কর্ম্ম করিতে পারেন না। হে অমেয়াত্মন্ কৃষ্ণ! আপনার এই প্রকার বালত্ব, এই অতিবীর্য্য ও আমাদের ন্যায় নীচগণের কুলে জন্ম, এ সকল বিষয় যতই চিন্তা করিতেছি, ততই আমরা শঙ্কান্বিত হইতেছি।"

বিষ্ণুপুরাণ। ৫ম অংশ। ১৩ অধ্যায়।

অন্যত্র :—

"তোমার মহিমা এবং এই বিশ্বরূপ না জানিয়া আমি প্রমাদবশতঃ বা প্রণয়বশতঃ সখা মনে করিয়া হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে, ইত্যাদি হঠাৎ তিরস্কার ভাবে যাহা বলিয়াছি, হে অচ্যুত! বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনকালে যখন অনুপস্থিত তোমাকে বা সাক্ষাৎ উপস্থিত তোমাকে পরিহাসার্থ যে অনাদর করিয়াছি, আমি অচিন্ত্যপ্রভাব তোমার নিকট তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।"—গীতা, ১১ অঃ ৪১।৪২ শ্লোক।

স্থানান্তরে :—মহাভারতীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বান্তর্গত উতঙ্কোপাখ্যানে প্রকাশ যে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগমন কালে উতঙ্ক মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মুনি কুরু-পাণ্ডবগণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে যখন কুরু-বংশের ধ্বংসের কথা শুনিলেন এবং বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই সংহার নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াও নিবারণ করেন নাই, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাকে শাপোদ্যত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-পরিচয়ে বলেন, আমি স্বয়ং বিষ্ণু। উতঙ্ক তখন সেই বিষ্ণুরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিতে অভিলাষী হইলেন। উতঙ্ক সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং শাপ হইতে নিরস্ত হইলেন।

অতএব পুরাণেই প্রতিপন্ন যে, অদ্ভুত লীলা হিন্দুর নিকটও ঈশ্বরত্বের প্রমাণ। এই প্রামাণ্যে শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব পুরাণে স্থাপিত হইয়াছে। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণোক্ত বাক্য সকল প্রামাণ্য।

এই দ্বিবিধ পরতঃ-প্রামাণ্য হিন্দুধর্ম্মে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা ধর্ম্মের চূড়ান্ত প্রামাণ্য নহে। সাধারণ জনগণের জন্য এই প্রামাণ্য স্বয়ং ব্যবস্থিত। নৈয়ায়িকেরা বেদের পৌরুষেয়বাদ স্থাপনার্থ যে তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের এই পরতঃ-প্রামাণ্য বললাভ করিয়াছে। নৈয়ায়িকেরা বলেন :—

"যদি বল ঈশ্বরের শরীর নাই। সুতরাং তালু প্রভৃতি স্থানের অভাব বশতঃ বর্ণোচ্চারণ সম্ভব না হওয়াতে, বেদের প্রণয়ন কিরূপে ঘটিতে পারে? এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন না, স্বভাবতঃ শরীর হীন হইলেও তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ লীলা বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।"

জৈমিনি নৈয়ায়িকদের বিপক্ষে যাহাই বলুন না কেন, যাঁহারা ঈশ্বরের অবতারবাদ স্বীকার করেন, তাঁহারা তত যুক্তি দ্বারা পরিচালিত নহেন। তবু তাঁহাদেরও কিছুই যুক্তি নাই, এমত নহে। সে যুক্তি এই :—

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। সর্ব্বশক্তিমানের স্বেচ্ছানুমত কার্য্য করিবার বাধা নাই। পৃথিবীর পাপ ভার মোচনের জন্য তিনি দেহ পরিগ্রহ করিয়া অমানুষী ক্রিয়া কলাপদ্বারা

সেই ভার মোচন করেন। যাহা মানুষে সম্ভব নহে, তাহা সর্ব্বশক্তিমানে সম্ভব।

এ যুক্তি যদিও অত্যন্ত দুর্ব্বল বটে, কিন্তু সাধারণ জনগণ এই যুক্তিতে পরিচালিত। খ্রীষ্টানগণও এই যুক্তি অবলোকন করিয়া ঈশার অবতরণ ও অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপের সমর্থন করেন। নিম্নাধিকারী হিন্দু এবং খ্রীষ্টানের যুক্তি অথবা বিশ্বাস যাহাই হউক, খ্রীষ্টানের অবতারবাদের সহিত হিন্দুর অবতারবাদের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। খ্রীষ্টানের ঈশ্বরাবতার পৃথিবীতে আপ্তবাক্য দিতে আসিয়াছিলেন। হিন্দুর আপ্তবাক্যের অভাব কোন কালেই হয় নাই। হিন্দুর আপ্তবাক্য শ্রুতি এবং তদ্‌প্রামাণ্য ধর্ম্ম-শাস্ত্র। তবে হিন্দুর অবতারের প্রয়োজন কি? হিন্দুর ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন গীতায় উক্ত হইতেছে।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

এই উক্তি অনুসারে পুরাণেও দেখা যায়, বিষ্ণু, রাম ও কৃষ্ণাদি রূপে জগতের ভার মোচনের জন্য, উদয় হইয়াছিলেন। শুদ্ধ জগতের পাপ ভার মোচন করিয়া যান নাই, তাঁহারা বেদকেও প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। পুরাণ তাহার সাক্ষী। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য স্বরূপ এই অবতারগণের উপদেশে সাধারণ হিন্দু-জনসমাজ চালিত হইয়া থাকেন। হিন্দুর চক্ষে বেদের এই প্রামাণ্য বড় সামান্য নহে। অন্য কোন ধর্ম্মীয় আপ্তবাক্যের যদি এরূপ প্রামাণ্য থাকিত, তাহা হইলে আজি সেই ধর্ম্মাবলম্বিগণ পৃথিবীতে ডঙ্কা মারিয়া বেড়াইতেন।

খ্রীষ্টধর্ম্ম ঈশা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, এজন্য খ্রীষ্টধর্ম্মের যাথার্থ্য প্রমাণার্থ ঈশার ঈশ্বরত্ব স্থাপন আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে সেরূপ ঘটে নাই। হিন্দুধর্ম্ম বেদ হইতে সমুৎপন্ন, বেদ কোন মনুষ্য কর্ত্তৃক কৃত নহে। বেদে যে ঋষিগণের ধ্বনি আছে, তাঁহারা বৈদিক সম্প্রদায়ের কর্ত্তা মাত্র। তাঁহারা বৈদিক গুরু বা প্রচারক। পাণিনির অনুশাসনে প্রকাশিত যে, বৈদিক ঋষি কর্ত্তৃক বেদ উক্ত হইয়াছে, এইরূপ সমাখ্যাই দেখা যায়, তাঁহারা যে বেদের কর্ত্তা এমত বাক্য কোথাও উক্ত হয় নাই। তৈত্তিরিয়, কাঠক, কালাপ প্রভৃতি ঋষিবাক্য, তিত্তির, কঠক, কলাপ কর্ত্তৃক উক্ত বাক্য বলিয়াই প্রচারিত। নহিলে বেদ চিরকালীন শ্রুতি পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। শ্রুতির কর্ত্তা কেহ নাই। যাহার কর্ত্তা নাই, তাহার কর্ত্তার ঈশ্বরত্ব স্থাপন করা আবশ্যকও নহে।

পুরাণোক্ত দেবলীলা যেমন শরীরধারী ঈশ্বরাবতার কর্ত্তৃক কৃত, বেদের কর্ত্তা তেমনি কোন শরীরধারী বিশেষ ঈশ্বরাবতার বলিয়া শ্রুতিতে প্রথিত নাই। যখন জ্ঞানিগণের নিকট ঈশ্বরাবতরণ গ্রহণীয় নহে, তখন তাঁহাদের কাছে সেরূপ প্রামাণ্য স্বীকার্য্যও নহে। এখন কথা এই, জ্ঞানিগণ যদি ঈশ্বরাবতার স্বীকার না করিলেন, তবে তাঁহারা পুরাণোক্ত দেবলীলা সমস্ত কিসের প্রামাণ্য রূপে স্বীকার করেন। সামান্য জনগণ ত এই সমস্ত লীলাকে দেবলীলা বলিয়া গ্রহণ করেন, সুতরাং তাহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ এক প্রাচীন কালের ঈশ্বরাবতার, এবং তাঁহার লীলাদি প্রাচীনকালের দেবলীলা। সামান্য লোক এই সকল লীলার কথা শুনিয়াই তাহাতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেন। যে পরোক্ষ প্রমাণের উপর খ্রীষ্টধর্ম্ম স্থাপিত,

অজ্ঞানী হিন্দুর নিকট তাহা অপ্রামাণ্য নহে। কিন্তু, পরোক্ষ প্রমাণ ও ইতিহাস জ্ঞানবান্ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুর নিকট ধর্ম্মের প্রমাণ নহে। যদি বল, বেদ যে অপৌরুষেয়, একথা হিন্দু জ্ঞানী কেন শ্রুতি প্রমাণে গ্রহণ করিলেন? একথা তিনি শ্রুতি প্রমাণে গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিলেন, বেদ যে কোন পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত, এমত প্রমাণের নিতান্ত অভাব। পৌরুষেয় বাদ অপ্রামাণ্য বলিয়া হিন্দু বেদকে অপৌরুষেয় বলেন। তদ্রূপ দেবলীলার ঐতিহাসিক প্রমাণ হিন্দুজ্ঞানীর নিকট অগ্রাহ্য।

হিন্দুজ্ঞানী প্রত্যক্ষবাদী। তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ব্যতীত কোন প্রমাণ গ্রাহ্য করেন না। যে দেবলীলা সমস্ত অজ্ঞানী হিন্দুর নিকট পরোক্ষ প্রামাণ্য, হিন্দুজ্ঞানীর কাছে তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয়। কিরূপ প্রত্যক্ষ, তাহা বলিতেছি।

যাঁহার নিকট ঈশ্বরাবতারই সিদ্ধ নহে, তাঁহার নিকট দেবলীলা কিরূপে সম্ভবে? হিন্দুজ্ঞানী বলেন, এই সমস্ত দেবদেবী কল্পনা মাত্র। বেদেও তাহা ব্যক্ত আছে।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতিয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থে ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যঙ্গাস্ত্রাদিকল্পনা।
দ্বিচত্বারি ষড়ষ্টাসাং দশ দ্বাদশ ষোড়শ॥
অষ্টাদশাপি কথিতা হস্তাঃ শঙ্খাদিভির্যতাঃ।
সহস্রান্তাস্তথা তাসাং বর্ণবাহনকল্পনা॥
শক্তিসেনাকল্পনা চ ব্রহ্মণ্যেবং হি পঞ্চধা।
কল্পিতস্য শরীরস্য তস্য সেনাদিকল্পনা॥
রামতাপনীয়োপনিষৎ। পূর্ব্বভাগ, প্রথমখণ্ড।

ব্রহ্ম চিন্ময়, অদ্বিতীয়, মায়াতীত ... রীরী হইলেও উপাসকাদগের কার্য্যসাধনার্থ তাঁহার রূপ কল্পনা হইয়া থাকে। যদি ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইল, তবে তাঁহার অস্ত্রাদিও কাল্পনিক। যে সকল দেবতা রূপবান্, তাঁহাদের পুংস্ব, স্ত্রীত্ব, অঙ্গ, অস্ত্র, সেনাদি, বর্ণ, বাহন প্রভৃতি সমুদায় কল্পিত।

তৎপরে বেদ সেই সমস্ত দেব-কল্পনার ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। গোপালতাপনীয়োপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের সমুদায় রূপক-তত্ত্ব এবং অস্ত্রাদি ও আভরণের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

হিন্দুজ্ঞানীর নিকট দেবদেবী সমস্ত যেমন ঈশ্বরতত্ত্বের কল্পিত রূপ, তাঁহাদের লীলা সকলও দেবত্বের কল্পিত রূপ। হিন্দুধর্ম্ম এই কৌশলে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীদের নিকট প্রামাণ্য।

হিন্দুধর্ম্ম দেখাইয়াছে, ভক্তের নিকট যাহা বাহ্য জগতের ঘটনা বলিয়া প্রথিত, জ্ঞানীদের নিকট তাহা অধ্যাত্ম-জগতের সত্য বলিয়া উপলব্ধ। যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই, যাহারা কেবল উপর উপর দেখে, তাহারা সেই সকল লীলাকে ঐতিহাসিক ঘটনা রূপেই দেখিতে পায়, কিন্তু যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রবল, তাহাদের নিকট সেই সমস্ত লীলা পরমেশ্বরের অন্তর্জগতীয় আভ্যন্তরিক ব্যাপার। যাহা ভক্তি ও জ্ঞান-যোগ-পথের আশ্চর্য্য ব্যাপার, তাহাই ঈশ্বরের লীলা রূপে হিন্দু জ্ঞানী অতি আহ্লাদ সহকারে উপলব্ধি করেন। সাধক সেই সমস্ত লীলা অন্তর্জগতে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। যাহা অজ্ঞানীর পরোক্ষ জ্ঞান ও ভূতসাক্ষী, তাহা জ্ঞানীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং বর্ত্তমান প্রমাণ। হিন্দুধর্ম্মে সুতরাং যাহা অতীতকালের ঐতিহাসিক প্রমাণ, জ্ঞানীদের জন্য, খ্রীষ্টধর্ম্মের ন্যায় সেই প্রমাণকে নানা বন্ধনে আরও ব... করিবার প্রয়োজন হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্ব... আমরা বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত রাসলীলা বর্ণনের এক স্থান তুলিয়া দিতেছি।

"অনন্তর কৃষ্ণ, নির্ম্মল আকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা সৌরভ ভরে দিক্ সমূহের আমোদবর্দ্ধিনী ফুল্ল কুমুদিনী ও মধুকর গুঞ্জিত মনোরম বনরাজি অবলোকন করিয়া গোপীগণের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন। তখন কৃষ্ণ, বলভদ্রের সহিত অতি অব্যক্ত অথচ মধুর পদবিন্যাস করিয়া গান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ গীত অতীব মধুর ও বণিতাপ্রিয় এবং ঐ গানে বাবা তীব্রস্বরের সুন্দর সংমিশ্রণ হইয়াছিল। অনন্তর সেই মনোহর গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অনেক গোপী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যেখানে মধুসূদন বিরাজমান, সেই স্থানে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। কোন গোপী সেই গানের লয়ানুসারে শনৈঃ শনৈঃ গান করিতে আরম্ভ করিতে লাগিল। কেহ বা তাহাতেই অবধান করিয়া মনে মনে কৃষ্ণকেই স্মরণ করিতে লাগিল। কোন গোপী, বারম্বার কৃষ্ণ কৃষ্ণ রবে ডাকিয়া লজ্জিতা হইল। আবার কোন প্রেমান্ধা গোপী বহির্ভাগে অবস্থিত গুরুজনকে দেখিয়া গৃহের মধ্যেই অবস্থান করিয়া নিমীলিত লোচনে..তন্ময়ভাবে গোবিন্দকে চিন্তা করিতে লাগিল। অন্য কোন গোপকন্যা নিরুচ্ছ্বাস ভাবে পরব্রহ্মস্বরূপী জগৎকারণ কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে মোক্ষপ্রাপ্ত হইল।"

বিষ্ণুপুরাণ এই মোক্ষের দুইটী কারণ দর্শাইতেছেন ঃ—

প্রথম। ভগবানের চিন্তাজনিত বিপুল আহ্লাদভোগে গোপীর অশেষ পুণ্যক্ষীণ হয়।

দ্বিতীয়। ভগবানের অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন মহাদুঃখভোগে তাহার অশেষ পাপক্ষীণ হয়।

হিন্দুধর্ম্মের একটী সারকথা এই, পাপ ও পুণ্য উভয়ই নষ্ট না হইলে মোক্ষ হয় না, অথচ এ উভয়ের ভোগ না হইলে বিনাশ হয় না। এই হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মফলবাদ। এই কর্ম্মফলবাদই হিন্দুধর্ম্মের পাপের শাসন ও পুণ্যের উদ্বোধন। কর্ম্মফল-বাদের [illegible] পর্য্য এই, সুখভোগ হইলে তৎকার[illegible] ক্ষীণ হয়, আর, দুঃখভোগ হইলে দুঃখক[illegible] পাপ নষ্ট হয়। এই গোপীর কৃষ্ণচিন্তারূপ অনন্ত সুখভোগ হওয়াতে তৎকারণ পুণ্য ক্ষীণ হইল এবং ভগবানের অপ্রাপ্তি নিমিত্ত দারুণ দুঃখভোগে পূর্ব্বসঞ্চিত পাপও নষ্ট হইল। সুতরাং সংসারস্থিতির কারণ পাপ ও পুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইল বলিয়া গোপী মোক্ষ (সুখদুঃখ-রাহিত্য) প্রাপ্ত হইল।

বাস্তবিক, হিন্দুধর্ম্মে দ্বিবিধ জগৎ এককালেই প্রদর্শিত হইয়াছে, অজ্ঞানীর জন্য বাহ্যজগৎ এবং জ্ঞানীর জন্য অন্তর্জগৎ। স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, ও নরকাদি সমস্ত অন্তর্জগতের বিষয় স্থূল অবয়বে প্রকটিত। সূক্ষ্ম, সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব তদ্রূপ স্থূল অবয়বে দেবদেবী রূপে প্রতীয়মান। ভক্তিযোগের সমস্ত ব্যাপারই কৃষ্ণলীলা। যাঁহারা সংসার হইতে দূরে গিয়াছেন, অথচ নামমাত্র সংসারে (পদ্মপত্রে জলবৎ) লিপ্ত আছেন, তাঁহারাই ব্রজধামে আসিয়াছেন। ব্রজপুর শব্দের অর্থই তাহাই। ব্রজধামে গোপরূপ জীব আসিয়া দেখেন, সেখানে যখন সংসারের বিষময় চিন্তারূপী কালিয় এবং পাপপ্রলোভনের ভীষণ প্রলম্বাসুর ব্রজের উৎপাত আরম্ভ করে, তখন জীবে সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং ভগবান রূপে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করে। যাঁহার হাতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, তিনি নিজে ব্রজের অনিষ্টপাত নিবারণ করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করেন। কৃষ্ণের এই সমস্ত লীলা অন্তর্জগতের নিত্য ব্যাপার। হিন্দু শাস্ত্রে অনেক গুলি রূপক ভাঙ্গা আছে, অনেক নাই। কিন্তু যাহা ভাঙ্গা আছে, তাহাতেই প্রতিপন্ন [illegible] নীয় সমস্ত লীলা সেই এক শ্রেণীর [illegible]দার্থ। নহিলে [illegible] হইবে বাস্তবিক ঐতিহাসিক ঘটনা [illegible] অন্যটি হইবে রূপক এমত যুক্তিসিদ্ধ [illegible] হইতে পারে না। এই

দেখুন মহাভারত সম্বন্ধে নিজে ব্যাস কি বলিতেছেন—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতম্
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিল গুরো দূরীকৃতং যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্‌বিকলাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

হে জগদীশ! তুমি রূপবিবর্জ্জিত, অথচ আমি ধ্যানে তোমার রূপকল্পনা করিয়াছি। তুমি অখিল গুরু এবং বাক্যাতীত, অথচ আমি স্তবদ্বারা তোমার সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি। তুমি সর্ব্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তোমার সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব বিনষ্ট করিয়াছি। হে পরমেশ! তুমি আমার এই ত্রিবিধ দোষ ক্ষমা কর।

ব্যাসেরই কৃত সমুদায় পুরাণ। তিনি পুরাণে যে কবিত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এই স্থানে খুলিয়া বলিলেন। নিম্নাধিকারী জনগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্যই তিনি কাব্যাকারে জাজ্বল্যরূপে ব্রহ্মকে প্রদর্শন করিয়াছেন। সামান্য জনগণের ভক্তি উদ্রেকের জন্যই দেবদেবীর সৃষ্টি। যাহাতে সেই ভক্তি অপনীত না হয়, তজ্জন্য তিনি পৌরাণিক সৃষ্টি ও কল্পনার বিষয় সাধারণের নিকট গোপন রাখিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কারণ, গোপন না রাখিলে বিপরীত ফল ঘটিবারই সম্ভাবনা। যখন লোকে অধিকারী হইবে, তখন পৌরাণিক রহস্য সমুদায় আপনিই আলোকের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের সপ্তষষ্ঠি শ্লোক এই রূপ একটি উপদেশ-বাক্য। এই উপদেশ-বাক্যই পৌরাণিক রহস্যের আর একটি প্রমাণ।

হিন্দু জ্ঞানিগণ যদি হিন্দু দেবদেবী এবং তাঁহাদের লীলাদি রূপক বলিয়াই জানিলেন, তাহা হইলে গীতোক্ত অবতারবাদের সামঞ্জস্য হয় কই? যাঁহারা ঈশ্বরের অবতারবাদ স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন:— যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার শরীর ধারণেরই বা প্রয়োজন কি? শরীর ধারণ করিলে বরং তাঁহার শক্তি পরিমিত হইয়াই যাইবে। অনন্ত কখন পরিমিতদেশে নিঃশেষিত হইতে পারেন না। অনন্ত যাঁহার শক্তি, বিশ্বরূপ দেহও তাঁহার অনন্ত। পরিমিত দেহধারণের কোন আবশ্যকতা নাই।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কোন নিগূঢ় শক্তিরই বিকাশ বলিয়া প্রতীত হয়। সেই শক্তিকে ব্রহ্মই বল, বা ঈশ্বরই বল, বা অদৃষ্ট বল, সে সমস্তই এক কথা। যখন ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য প্রণালী এই শক্তির অধীন হইয়া চিরদিন চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাতেই বিশ্ব সুনিয়মিত ও সুশাসিত হইয়া রহিয়াছে, তখন তদতীত একজন মাত্র দেশকালদ্বারা পরিমিত পুরুষ কি করিবেন? তাঁহার আবশ্যকতাই বা কি? গীতার অভিপ্রায় যাহা, তাহা মনুষ্যের স্থূল দৃষ্টির অতীত, এই অদৃষ্ট শক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইবার বাধাই বা কি? আর তাহা যদি তদ্রূপে সিদ্ধ হয়, তবে কি তাহা ঈশ্বর কর্তৃক ঘটিতেছে না? যদি ঘটে, তবে গীতোক্ত বচন অপ্রামাণ্য নহে। যখনই বিশ্বে দৈবশক্তি ও সত্বগুণের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই বলা যাইতে পারে:—

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ না করিলে যে ধর্ম্ম সংস্থাপন হইবে না, এ শ্লোকের এমত অভিপ্রায় নহে। সত্বগুণের প্রাদুর্ভাব অথবা যে তমোগুণদ্বারা পাপনাশ হয়, তাহার আবির্ভাব, ঈশ্বরত্বের সম্ভব। সর্ব্বশক্তিমান যদি শরীর ধারণ না করিয়া কার্য্যসিদ্ধি না করিতে

পারেন, তবে তাঁহার নিজ নামের সার্থকতাই থাকে না। অতএব ঈশ্বরে সকলই সম্ভব।

ঈশ্বরাবির্ভাবের নামই যে ঈশ্বরের সম্ভব, পুরাণেও তাহা কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ। সেই পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে, দেখুন ঃ—

"যৎকালে কাল সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং সাতিশয় রমণীয় হইয়া উঠিল;—রোহিণী নক্ষত্র উদিত ও তাহার সহিত অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রসকল ও গ্রহগণ প্রসন্ন হইল; দিঙ্মণ্ডল নির্ম্মল হইয়া উঠিল; যখন আকাশে তারকা সমূহ স্বচ্ছরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল; নদী সকলের সলিল নির্ম্মলভাব ধারণ করিল; কমল জন্য জলাশয়ের শোভা হইল; বনবৃক্ষগণের স্তবক ফুটিয়া উঠিল এবং তাহাতে বিহঙ্গকুল মনের আনন্দে গান করিতে লাগিল; সমীরণ সুগন্ধবাহী, পবিত্র এবং সুখস্পর্শ হইয়া বহিতে লাগিল; যৎকালে দ্বিজাতিদিগের অগ্নি সকল শান্তভাবে জ্বলিতে লাগিল; অসুরদ্বেষী সাধুদিগের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল; বিষ্ণুর সম্ভব কাল আসন্নপ্রায় দেখিয়া কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ গান, সিদ্ধ ও চারণগণ স্তব এবং বিদ্যাধরী সকল অপ্সরাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল; তৎকালে দেব ও ঋষিসমূহ হর্ষান্বিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তৎকালে সাগরের সঙ্গে সঙ্গে জলধর মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল, পূর্ব্বদিক্ হইতে পুর্ণিমা চন্দ্রের ন্যায়, দেবশক্তিরূপিণী দেবকীর গর্ভ হইতে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন ঃ—

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কল ঃ॥"
ভাগবত। ১০-৩-৮।

এস্থলে বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন, এই শব্দেরই প্রয়োগ আছে। বিষ্ণুর আবির্ভাব কোন্ সময়ে ঘটে? যখন সাত্ত্বিক ভাবে বিশ্ব আনন্দে ভাসিতে থাকে, সেই সময়েই বিষ্ণুর আবির্ভাব হয়। জগতে সেই সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব ভাগবত পৌরাণিক ভাষায় অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন। এই আবির্ভাবই শ্রীকৃষ্ণের সম্ভব। পুরাণ স্থূলাবয়বী হইলেও বেদের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল কেমন বজায় রাখিয়াছে!

নিজে গীতা বলিতেছেন ঃ—

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোক মহেশ্বরম্।
অসং মূঢ়ঃস মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"
১০অ—২।৩।

স্বামী এইরূপ অর্থ করেন। "আমার প্রভব অর্থাৎ আমি জন্ম রহিত হইলেও নানা বিভূতি দ্বারা আমার যে আবির্ভাব, তাহা দেবতা ও মহর্ষিগণও অবগত নহেন। কারণ আমিই দেবতা ও মহর্ষিগণের উৎপাদক এবং তাঁহাদের বুদ্ধ্যাদির প্রবর্ত্তক। যে ব্যক্তি আমাকে অজ (জন্মরহিত) অনাদি এবং মহেশ্বররূপে জানেন, তিনি মোহ ও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন।" তবেই দাঁড়াইতেছে, তিনি দেবতুল্য মহাজনগণের বুদ্ধ্যাদিতে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর কার্য্যসাধনার্থ অবতীর্ণ হয়েন।

এখন কথা এই, নিজ কৃষ্ণরূপ যে অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রতিরূপ এবং কৃষ্ণলীলা যে অধ্যাত্মজগতের সত্য, অধ্যাত্ম-জগতের সেই অধ্যাত্মতত্ত্ব সমুদায় কি সত্য যে, তাহাদের প্রতিরূপকে সত্য বলিতেছ? সেই অধ্যাত্মজগৎ যদি সত্য হয়, তবে তাহার নিয়মাবলির প্রতিরূপ সত্যকেই প্রদর্শন করিতেছে, আর যদি মিথ্যা হয়, তবে এই লীলা সকলও মিথ্যা। অনেকগুলি লীলা ঈশ্বরসাধনতত্ত্বের প্রতিরূপ। যাহা সাধনার বিষয়ীভূত, তাহা ভক্তিজগতে প্রতীয়মান। ভক্ত নিজ জীবনে তাহা অনুভব করেন। ভক্তির সাধন সমস্তই ভক্তিযোগ। কতকগুলি লীলা এই ভক্তিযোগের নিদর্শন মাত্র। অপর

কতকগুলি তদ্রূপ জ্ঞানযোগের নিদর্শন। যাঁহারা সেই ভক্তি অথবা জ্ঞানযোগে নিরত, তাঁহারাই তাহাদের প্রামাণ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন, অন্যে পারিবে না।

কিন্তু, যে কৃষ্ণরূপ পরমাত্মতত্ত্বের প্রতিরূপ এবং সেই পরমাত্মতত্ত্বের সহিত জীবের মিলন যে কৃষ্ণরাধার মিলনে এবং ব্রজলীলায় পরিব্যক্ত, তাহার প্রামাণ্য কোথায়? বেদ এই সমস্ত নিগূঢ় আত্মতত্ত্ব ও আত্মজ্ঞান বিকাশ করে। তাই যদি হইল, তবে বেদের প্রামাণ্য কি? এই বেদের প্রামাণ্য লইয়া হিন্দু-দর্শন অনেক বিচার করিয়াছে। আমরা একে একে তাহা প্রদর্শন করিতেছি। আমরা দেখাইতেছি, হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ যে বেদ, সেই বেদপ্রচারিত অলৌকিক তত্ত্বাবলির প্রমাণ আত্মপ্রত্যক্ষ। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ আত্মপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কোন শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নাই। অতএব, হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ অলঙ্ঘনীয়।

(১) লোকসমাজে প্রধান প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দুধর্ম্ম এই প্রত্যক্ষকেই প্রামাণ্যরূপে স্থির করিয়া সেই নিকষে বৈদিক ধর্ম্মতত্ত্ব সকল পরীক্ষা করিতে চান। প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ,—বাহ্য প্রত্যক্ষ এবং আভ্যন্তরিক প্রত্যক্ষ। বাহ্য জগৎ, বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ-বিষয়; সুতরাং বাহ্য জগতের প্রামাণ্য পঞ্চ বাহ্য ইন্দ্রিয়। কিন্তু যাহা বাহ্যজগৎ হইতে অতীত, তাহার প্রমাণ কিছু বাহ্য ইন্দ্রিয় হইতে পারে না। বাহ্য ইন্দ্রিয়গণকে পারলৌকিক বিষয়ের প্রামাণ্য রূপে স্থির করিলে, ধর্ম্ম যে রূপ হাস্যাস্পদ হয়, চার্ব্বাকদর্শন তাহা প্রদর্শন করে। ধর্ম্ম যে সেরূপ প্রমাণে পরীক্ষিত হইতে পারে না, চার্ব্বাকদর্শন তাহা নির্ণয় করিয়া দিয়াছে। এজন্য চার্ব্বাকদর্শনও হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কারণ, তাহা স্পষ্টই বলিতেছে, জ্ঞানি! তুমি যদি স্থূলদর্শীর ন্যায় বাহ্যেন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ দ্বারা ধর্ম্মের পারলৌকিক বিষয় বিচার করিতে চাও, তবে তুমি ধর্ম্মের সত্য কিছুই বুঝিতে পারিবে না। ধর্ম্মের সত্য প্রতিপাদনার্থ অন্যরূপ প্রত্যক্ষের প্রয়োজন। এই জন্য চার্ব্বাক দর্শন বলিলেন, প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ, বাহ্য প্রত্যক্ষ এবং অন্তর্প্রত্যক্ষ।

"কঃ খলু জ্ঞানোপায়ো ভবেৎ। ন তাবৎ প্রত্যক্ষং তচ্চ বাহ্যমান্তরং বাভিমতম্।
সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ।

চার্ব্বাক বলেন, এই আভ্যন্তরিক প্রত্যক্ষই প্রকৃত প্রত্যক্ষ। বাহ্যপ্রত্যক্ষের ভ্রান্তি হইতে পারে, আভ্যন্তরিক প্রত্যক্ষই প্রকৃত প্রমাণ। দেখুন, বাহ্য প্রত্যক্ষে ইন্দ্রধনু একখানি ধনু, আভ্যন্তরিক জ্ঞানে তাহা ধনুই নহে। বাহ্য প্রত্যক্ষে চন্দ্র অতি ক্ষুদ্র বস্তু, আভ্যন্তরিক জ্ঞানে, তাহা এক বৃহদায়তন জ্যোতিষ্ক। এই ভ্রান্তিপূর্ণ বাহ্য প্রত্যক্ষ কি ধর্ম্মের প্রামাণ্য হইতে পারে? হিন্দুধর্ম্ম বলেন, ধর্ম্মে যাহা বাহ্যপ্রত্যক্ষের বিষয়, তাহা বাহ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণে সিদ্ধ কর, যাহা নহে, সেই অলৌকিক বিষয়সকলকে বাহ্যপ্রত্যক্ষের কষ্টি দিয়া যদি পরীক্ষা করিতে চাও, তবে ধর্ম্মের দশা যাহা হয়, তাহা চার্ব্বাক দর্শনে দেখ। অলৌকিক ধর্ম্ম পরীক্ষার নিমিত্ত যে বাহ্যপ্রত্যক্ষ গ্রহণ করা ন্যায়সঙ্গত নহে, চার্ব্বাকদর্শন তাহা প্রতিপন্ন করে। চার্ব্বাকদর্শন এজন্য অভাব পক্ষে প্রমাণ, ভাব পক্ষে নহে।

২। বেদের ভাবপক্ষীয় প্রমাণ আভ্যন্তরিক প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগীরা এই পথের নেতা। বৈশেষিক দর্শনকার

কণাদ তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ধর্ম্ম কি, তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। বেদমতে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ নিয়ম। হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্ম শব্দ এই বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধর্ম্ম সাংসারিক নিয়ম,আহারের নিয়ম, সংযমের নিয়ম, পারিবারিক নিয়ম—যে সমস্ত নিয়ম আত্মাকে পরমার্থপথে নিয়োজিত, শাসিত ও উদ্বোধিত করে, সেই সমস্ত নিয়মই হিন্দুধর্ম্ম। সর্ব্ববিধায়ে ধর্ম্ম মনুষ্যকে নিয়মিত করে। নিয়মিত করে কি অভিপ্রায়ে? মনুষ্যকে নিঃশ্রেয়স পথে আনিবার জন্য। তাই বৈশেষিক দর্শনকার বলিলেন ঃ—

"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।"

যদ্দ্বারা নিঃশ্রেয়স সাধন হয়, তাহাই ধর্ম্ম। নিঃশ্রেয়স কি? নৈয়ায়িকদিগের মতে অপবর্গই নিঃশ্রেয়স। তবে অপবর্গ কি? আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নাম অপবর্গ। ন্যায়-দর্শনে তাহা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঃ—

"তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়, মিথ্যাজ্ঞান নাশে দোষ নষ্ট হয়, দোষের নাশে প্রবৃত্তি নষ্ট হয়। প্রবৃত্তি নাশে জন্ম নষ্ট হয়। জন্মের নাশে দুঃখ নষ্ট হয় এবং এই দুঃখের নাশেই অপবর্গ লাভ। অপবর্গই নিঃশ্রেয়স এবং পরম পুরুষার্থ।" বাৎস্যায়ণ।

নৈয়ায়িকেরা নিঃশ্রেয়স কি তাহা বলিয়া সেই নিঃশ্রেয়স লাভের সাধন-প্রণালীও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কণাদ বলেন, এই নিঃশ্রেয়স লাভ করাই ধর্ম্ম। নৈয়ায়িকেরা বলিলেন, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই ধর্ম্ম লাভ হয়। তত্ত্বজ্ঞান কি? তত্ত্বসকল নিরূপণ করাই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্ব কি, তাহা দর্শনকারেরা বিবৃত করিয়াছেন। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই আত্মজ্ঞান জন্মে। আত্মার সহিত জগতের এবং ব্রহ্মের সম্বন্ধ জানিলে যে বিবেকোদয় হয়, তাহাই আত্মজ্ঞান। এই বিবেকোদয় শুদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞান নহে। তাহা যোগোপলব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। শাস্ত্রজ্ঞানের পরিপাক সাধন হইলে যখন তাহা আত্মাতে উপলব্ধ হয়, তখনই তাহা বিশিষ্ট-জ্ঞান বা বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হইতে ক্রমে বিবেকোদয় হয়। বিবেকোদয়ে প্রকৃত আত্ম-জ্ঞান লাভ হয়। এই আত্মজ্ঞান-লাভে ধর্ম্ম অর্জ্জিত হয়। এই আত্মজ্ঞান অনুষ্ঠানের ফল। তুমি মহর্ষিগণ-নির্দ্দিষ্ট যোগ পথ অবলম্বন করিয়া অষ্টসাধন কর, সিদ্ধ হইবে; সিদ্ধ হইয়া বেদোক্ত বাক্যের সত্য উপলব্ধি করিবে। এই জন্য কপিল বলিয়াগিয়াছেন, বেদ স্বতঃ-প্রামাণ্য।

"নিজ শক্ত্যভিব্যক্তঃ স্বতঃ-প্রামাণ্যং।"

নিজ শক্তিতে বেদ অভিব্যক্ত হইয়া আপনাকে আপনি সপ্রমাণ করে। এই শক্তি যোগবল। যোগবলে বেদ স্বতঃই প্রকাশিত এবং প্রমাণিত হয়। বেদের অন্য প্রমাণ আবশ্যক করে না। এই যোগধর্ম্মে বেদের সত্য প্রতীয়মান বলিয়া কণাদ বলিতেছেনঃ—

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।"

ধর্ম্মের বচন হইতে বেদের প্রামাণ্য। ধর্ম্মই বেদকে প্রমাণ করিতেছে। যে ধর্ম্ম নিঃশ্রেয়স সাধন করে, সেই ধর্ম্ম বেদকে প্রমাণ করে। শঙ্কর মিশ্র এ সূত্রের এইরূপ অর্থ করেন। কারণ, তাহা ধর্ম্মব্যাখ্যার পর সূত্রেই কথিত হইয়াছে।

কিন্তু কেহ কেহ "তদ্বচনাৎ" পদের অর্থ "ঈশ্বরবচনাৎ" বলিয়া অর্থ করেন। কারণ দার্শনিক ভাষায় তদ্ শব্দের অর্থ অনেক স্থলে ঈশ্বরকে বুঝায়। তদ্ শব্দের অর্থ অনেক স্থলে ঈশ্বরবাচক হইলেও আমরা এস্থলে তাহার পক্ষপাতী নহি। কারণ,কণাদ তাঁহার দর্শনের অন্য কোন স্থলে ঈশ্বরের নাম মাত্র করেন নাই। তিনি এক অদৃষ্টশক্তি স্বীকার

করিতেন। যাহা মনুষ্যের সামান্য চক্ষে দৃষ্ট নহে, সেই অদৃষ্টশক্তি যিনি স্বীকার করেন, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞাদি গুণবাচক ঈশ্বর মানিবার প্রয়োজনই বা কি ? সুতরাং যিনি অদৃষ্টবাদী ছিলেন, তিনি তদ্ শব্দ ঈশ্বরকে বুঝাইবার জন্য যে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এমত যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ শঙ্কর-মিশ্র বলিয়াছেন যে "তদ্বচনাৎ" এ কথা ১ম সূত্রে লিখিত ধর্ম্মবচনের পরেই স্থাপিত হওয়াতে সেই ধর্ম্মবচনই বুঝাইবে। অতএব, শঙ্করমিশ্রের অর্থ গ্রহণ করিলেই বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে, কণাদ মোক্ষধর্ম্মকেই বেদের প্রামাণ্য বলিয়া গিয়াছেন।

কৈবল্যদায়ক মোক্ষধর্ম্মই যে বেদের প্রামাণ্য, তাহা সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগে প্রতীয়মান। এই দুই যোগ-পথের প্রধান বিভিন্নতা "প্রণিধানের" অবলম্ব লইয়া। সাংখ্যযোগ বিনা ঈশ্বরাবলম্বে যোগ সাধন করে, পাতঞ্জল যোগের প্রধান অবলম্ব ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর কিরূপ ? তাহা সর্ব্বজ্ঞাদি গুণবাচক ঈশ্বর নহে, যোগের ঈশ্বর যোগের বিষয়ীভূত পুরুষ। তাহা :—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।

যিনি ক্লেশের হেতু অবিদ্যা এবং কর্ম্ম-ফলের অতীত বা নির্লিপ্ত পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর।

যে তত্ত্বের জন্য যোগের সাধনা, ঈশ্বর সেই তত্ত্ব। এই ঈশ্বরত্বে উপনীত হইলেই যোগ-সিদ্ধি লাভ হয়। তখন বেদ স্বতঃ সপ্রমাণ হইয়া যায়। বেদে যে মোক্ষপদের কথা লিখিত আছে, তাহার সমুদায় যাথার্থ্য তখন বিলক্ষণ প্রতীত হয়। যোগের প্রমাণ যোগ-সিদ্ধি। যদি তুমি যোগসিদ্ধ হইতে পার, তবে তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে, এবং বেদোক্ত মুক্তিলাভ করিয়া আত্মাকে শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত করিয়া তাহার স্বরূপ পূর্ণতা দর্শন করিতে পারিবে। যোগসিদ্ধি-তেই আত্মপ্রত্যক্ষ হয়। আত্মপ্রত্যক্ষই যোগের প্রমাণ এবং বেদবাক্যেরও অকাট্য প্রমাণ। হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ বেদ, বেদের প্রমাণ আত্মপ্রত্যক্ষ। অতএব হিন্দুধর্ম্ম আত্ম-প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

৩। বেদের তৃতীয় প্রামাণ্য দার্শনিক অনুমানমূলক। জৈমিনি এই অনুমানতর্কের স্থাপয়িতা। বেদ যে প্রামাণ্য বাক্য, তাহা কি জৈমিনি, কি গৌতম উভয়েই স্বীকার করেন। সে প্রামাণ্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়াতে তৎসম্বন্ধে কাহারই বিবাদ নাই। তাঁহাদের বিবাদ বেদের কর্ত্তা লইয়া। বেদের কর্ত্তা কে ? নৈয়ায়িক বলেন, বেদ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক প্রণীত; জৈমিনি বলেন, বেদ যে কোন পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত, এমত প্রমাণ হয় না। নৈয়ায়িকের তর্ক এই ন্যায়াবয়বে আইসে :—

প্রতিজ্ঞা—বেদবাক্য পৌরুষেয়।

হেতু—বেদবাক্য উচ্চারিত বাক্যবিশেষ।

দৃষ্টান্ত—কালিদাসাদির বাক্য।

অতএব, বেদবাক্য পৌরুষেয়।

কিরূপ পুরুষের বাক্য ? বেদবাক্য শব্দ দ্বারা উচ্চারিত হয় বলিয়া তাহা অবশ্য পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে। কারণ, কোন পুরুষ ভিন্ন শব্দোচ্চারণ করিতে পারে না। কিন্তু যখন এই বাক্য সমুদায় নির্দ্দোষ বাক্য, তখন তাহা অবশ্য অভ্রান্ত বাক্য। স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন এমত অভ্রান্ত বাক্য কেহ প্রকাশ করিতে পারেন না। ঈশ্বর মানবলীলা পরিগ্রহ পূর্ব্বক বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন। এ তর্ক এই ন্যায়া-বয়ব ধারণ করিয়াছে :—

"বেদবাক্যান্যাপ্তপ্রণীতানি প্রমাণত্বেসতিবাক্যত্বাৎ মন্বাদি বাক্যবদিতি।"

প্রতিজ্ঞা—বেদবাক্য আপ্তবাক্য।
হেতু—বাক্যত্ব।
দৃষ্টান্ত—মন্বাদি বাক্য।
অতএব, বেদ আপ্তবাক্য।

এ যুক্তি বেদকে প্রমাণ করিবার জন্য নহে, কিন্তু বেদের কর্ত্তা-নিরূপণ জন্য। সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্মীয় পূর্ব্বোক্ত স্বতঃ প্রমাণের আপত্তি এ যুক্তি নিরসনে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

নৈয়ায়িকের এই পৌরুষেয়বাদ সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, তাহাও অপৌরুষেয়বাদে পরিণত হইতে পারে। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমানের ব্যক্তিত্ব রূপ (Personal God) নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া সকলে তাহা স্বীকার করেন না। তবেই দাঁড়াইতেছে, ঈশ্বর যদি ব্যক্তিত্ব বিরহিত হন, তাহা হইলে বেদ অপৌরুষেয়। জৈমিনি ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। জৈমিনি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর পুরুষ স্বীকার করেন না। যাঁহার ব্যক্তিত্ব ও শরীরআছে,শরীরের ব্যবধান বশতঃতাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না। সাংখ্যকার কপিলও বলেন, বেদ এমত গ্রন্থাবলি, যাহা কোন ভ্রান্তিবিশিষ্ট, অমুক্ত, বদ্ধাত্মা কর্তৃক লিখিত হইতে পারে না। আর যিনি শুদ্ধ,বুদ্ধ ও মুক্ত, তিনি সর্ব্ববাসনা পরিশূন্য, এই নিমিত্ত বেদের কর্ত্তৃত্বও তাঁহাতে সম্ভবে না। অতএব বেদ অপৌরুষেয়।

জৈমিনি এই পৌরুষেয়বাদ অন্য এক তর্কেও প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। তিনি বলেন,শব্দ নিত্য; বেদ সেই নিত্য শব্দবিন্যাস মাত্র, এজন্য বেদ নিত্য। বেদ নিত্য বলিয়া আত্মার ন্যায় অপৌরুষেয়। শব্দের নিত্যত্ব সপ্রমাণ হইলেই এ তর্ক দাঁড়াইতে পারে। এজন্য জৈমিনি অনেক তর্কজালে শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

স্মার্ত্তচূড়ামণি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন এই তর্কের যে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তন্মাত্র উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। মূলে তাহার বিস্তৃত বাদ আছে, কাহারও প্রয়োজন হইলে তিনি তাহা দেখিতে পারেন। মাধবাচার্য্য কৃত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামক গ্রন্থেও তাহার কথঞ্চিৎ সমালোচনা পরিদৃষ্ট হইবে।—

"নৈয়ায়িকেরা শব্দের নিত্যত্ব অস্বীকার করিয়া তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত যুক্তি গুলি প্রদান করেনঃ—

(১) "কর্ম্ম একে তত্র দর্শনাৎ।

শব্দ যত্ন করিলেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং শব্দ যত্নসাপেক্ষ এবং কর্ম্ম। অতএব, শব্দ নিত্য হইতে পারে না। যেহেতু যাহা নিত্য, তাহা সর্ব্বকালে বিদ্যমান থাকিবে এবং যত্ন দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে না।

(২) অস্থানাৎ।

শব্দ ক্ষণস্থায়ী, যে সময়ে উৎপন্ন সেই সময়েই বিনষ্ট হয়, সুতরাং শব্দ নিত্য হইতে পারে না।

(৩) করোতি শব্দাৎ।

শব্দং করোতি—শব্দ করে, এই রূপ ব্যবহার হয় বলিয়া শব্দ নিত্য হইতে পারে না; কারণ ইহা কৃত।

(৪) সত্বান্তরে যৌগপদ্যাৎ।

এক কালেই নিকটস্থ এবং দূরস্থ বহু ব্যক্তির কর্ণগোচর হইয়া থাকে। সুতরাং শব্দ এক ও নিত্য কি রূপে হইবে?

(৫) প্রকৃতি বিকৃত্যোশ্চ।

যে পদার্থ পরিবর্ত্তনশীল তাহা নিত্য হইতে পারে না। শব্দেরও প্রকৃতি বিকৃতিভাব দৃষ্ট হয়। যথা—দধি অত্র-দধ্যত্র। সুতরাং শব্দ নিত্য নহে।

(৬) বৃশ্চিক কর্ত্তৃভূয়াস্ত।

শব্দকর্ত্তার সংখ্যাভেদে শব্দের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। দশ ব্যক্তি যদি এককালীন গো শব্দ উচ্চারণ করেন, তবে দশটি গো শব্দ একেবারে উচ্চারিত হইল। সুতরাং মীমাংসকদিগের নিত্যত্ব স্বীকার নিষ্ফল। এইরূপ শব্দের নিত্যত্বে বেদের প্রামাণ্য রক্ষা পায় না।

মীমাংসকেরা এই আপত্তি গুলির বক্ষ্যমাণ প্রকারে উত্তর দেন। যথা—

(১) সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ।

শব্দ নিত্য হইলেও যে সর্ব্বকালে উপলব্ধ হয় না তাহার হেতু এই যে, সর্ব্ব সময়ে উচ্চারণকারী ব্যক্তির সহিত শব্দের সন্নিকর্ষ থাকে না। গ কার এই শব্দ শ্রবণ করিলেই আমাদিগের এই রূপ জ্ঞান হয় যে, সর্ব্বদা আমরা যে গ কার শ্রবণ করিয়া থাকি ইহাও সেই গ কার, তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র গ কার নহে।

(২) প্রয়োগস্য পরমং।

শব্দং করোতি—এই বাক্যের অর্থ শব্দ নির্ম্মাণ নহে, কিন্তু শব্দের উচ্চারণ মাত্র।

(৩) আদিত্যবৎ যোগপদ্যং।

যেরূপ এক সূর্য্য নিকটস্থ এবং দূরস্থ সকল লোকেরই দৃশ্য হইতেছে, তদ্রূপ এক শব্দ বহু ব্যক্তির শ্রাব্য হইতে পারে।

(৪) বর্ণান্তরমবিকারঃ।

বর্ণান্তরকে বর্ণের বিকার বলা উচিত নহে। যেহেতু ইকার স্থানে যকার হইলে বর্ণান্তর প্রয়োগ হইল। ইকারের কোন বিকার হইল না।

(৫) নাদবৃদ্ধিঃ পরা।

দশ ব্যক্তি এক গো শব্দ উচ্চারণ করিলে দশটি গো শব্দ উচ্চারিত হইল বটে; কিন্তু তাহা কেবল নাদবৃদ্ধি মাত্র; শব্দ বৃদ্ধি নহে। এক গো শব্দ একই রহিল। তবে দশবার উচ্চারিত হইল বলিয়া গোলমাল অধিক হইল। অতএব, কোন প্রকারেই শব্দের একত্ব এবং নিত্যত্বের হানি হইতে পারে না। সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব অব্যাহত রহিল। অতঃপর মীমাংসাকার শব্দের নিত্যত্ব-প্রমাণের নিমিত্ত নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন :—

(১) নিত্যস্তু স্যাৎ দর্শনাস্য পরার্থত্বাৎ।

শব্দ উচ্চারিত হইলেই অন্যব্যক্তি ঐ শব্দের অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারেন, এজন্য শব্দ অবশ্য নিত্য হইবে। যদি শব্দ নিত্য না হইত,তবে কেহই শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিত না। কারণ, শব্দ উচ্চারণ মাত্র বিনষ্ট হইবে। এবম্বিধায় উচ্চারণ অবধি অর্থবোধ পর্য্যন্ত শব্দের স্থিতি মানিতেই হইবে, নচেৎ বিষম দোষ ঘটে। এইরূপ শব্দের স্থিতি মানিলেই স্বীকৃত হইল যে, তাহা বস্তু। কোন বস্তুর ঐকান্তিক বিনাশ নাই। স্থিতি মানিলেই শব্দের নিত্যত্ব স্বতঃপ্রমাণ হইল।

(২) সর্ব্বত্র যৌগপদ্যাৎ।

ভিন্ন ভিন্ন পুরুষেরা এককালে এক শব্দের সমভাবে এবং অভ্রান্তরূপে প্রত্যভিজ্ঞা * করিতে পারেন, যেহেতু শব্দ নিত্য এবং এক স্বরূপ।

(৩) সংখ্যাভাবাৎ।

শব্দের সংখ্যাবৃদ্ধি নাই। একটি গো শব্দের বারম্বার উচ্চারণ করিলে ঐ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত শব্দগুলি সংখ্যাবচ্ছেদে পরস্পর বিভিন্ন নহে। মস্তকের কেশ কাটিয়া

* প্রত্যভিজ্ঞা—জ্ঞানের প্রতীতি। গ বলিলে কেহ ঘ মনে করেন না। পূর্ব্বকালেও গো শব্দে যে প্রতীতি হইত, আজিও তাহা হইতেছে। তুমি, গ, এই ধ্বনি উৎপন্ন হইলে তাহাকে গ বল কেন? তোমার মনে যে গ শব্দের প্রতীতি আছে, তাহার সহিত মিলে বলিয়া।

ফেলিলে যে নূতন কেশের উদ্ভব হয়, সেই নূতন কেশের মত বারম্বার গো শব্দ উচ্চারিত করিলে প্রতিবার নূতন শব্দের উদ্ভব হইতেছে না, সেই একই গো শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইতেছে মাত্র। প্রত্যভিজ্ঞা তাহার প্রমাণ।

(৪) অনপেক্ষত্বাৎ।

শব্দের বিনাশ অনুমান করিবার কোন কারণ বা অবলম্বন নাই, সুতরাং শব্দ অনিত্য কেন হইবে?

(৫) লিঙ্গ দর্শনাৎ চ।

বেদ সংহিতাতেও শব্দের নিত্যত্ব পরিস্ফুট রহিয়াছে। যথা—

বাচা বিরূপ নিত্যয়া।

ঋগ্বেদ ৮মং ৬৪ সূ, ৬ ঋক্।

এইরূপ বহুবিধ যুক্তি দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণ করিয়া মীমাংসকেরা বেদের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করেন। বেদ শব্দরাশি মাত্র। শব্দ নিত্য এবং প্রামাণ্য।"

জৈমিনির মতে যখন শব্দ নিত্য, তখন আত্মার ন্যায়, নিত্য শব্দের কল্পে কল্পে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়।

শব্দ যদি নিত্য হইল, তবে শব্দ-বিন্যস্ত অন্য গ্রন্থ নিত্য নহে কেন? অন্য গ্রন্থ নিত্য নহে এজন্য যে, তাহা কোন না কোন কালে শরীরী মনুষ্যকৃত। যাহা এক বিশেষকালে এবং বিশেষ পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত, তাহা নিত্য নহে; এজন্য অভ্রান্তও নহে। শ্রুতিতে এ দোষ স্পর্শ করে না। খ্রীষ্টধর্ম্মীয় বাইবেলাদি গ্রন্থ মনুষ্যরচিত, এজন্য অনিত্য এবং ভ্রান্ত। যাহা নিত্য তাহাই সত্য।

বেদের নিত্যত্ব এবং অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া জৈমিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যাহা নিত্য ও অপৌরুষেয়, তাহা স্বতঃ-প্রমাণ। সেই স্বতঃ-প্রমাণ, জৈমিনি অনুমান তর্কে এইরূপ স্থাপন করিলেন।

(১) স্বতঃ-প্রমাণ বলিলে এমত বুঝাইবে না যে, প্রামাণ্যই প্রামাণ্যের জন্মদাতা। যে হেতু, সেরূপ তর্কে কারণ হইতে কার্য্য এবং কার্য্য হইতে কারণের উদ্ভব বুঝায়। কার্য্য কারণ একই হইয়া যায়। সুতরাং আত্মাশ্রয় দোষ পড়ে।

(২) তাহার অর্থ এমতও নহে যে, স্বাভাবিক সামান্য জ্ঞান সমস্তই প্রামাণ্যের কারণ। যেহেতু, জ্ঞান সমস্ত কারণ হইলে, তাহা উপাদান কারণ (Material cause) বা সমবায়িকারণ হইল। সমবায়ি কারণ অবশ্য দ্রব্য হইবে; কিন্তু জ্ঞান তো দ্রব্য নহে, জ্ঞান গুণ মাত্র। অতএব স্বাভাবিক জ্ঞান প্রামাণ্যের কারণ নহে।

(৩) তবে কি জ্ঞান-সামগ্রীই প্রামাণ্যের উদ্ভব-ক্ষেত্র? তাহাও নহে। যেহেতু ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানই সকল জ্ঞানের সামগ্রী। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান হয় উপাধি-জ্ঞান, না হয় জাতি-জ্ঞান। উপাধিজ্ঞান কি? যেমন আম্রবৃক্ষ, অশ্বজ্ঞান ইত্যাদি। এস্থলে বৃক্ষ উপাধি; অশ্ব উপাধি। এই উপাধি-জ্ঞানই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান। দ্বিতীয় প্রকার ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান জাতি-জ্ঞান; যেমন বৃক্ষত্ব জ্ঞান, অশ্বত্বজ্ঞান। এই দ্বিবিধ জ্ঞানেরই অন্য প্রামাণ্যের জনন শক্তি নাই। বৃক্ষত্ব-জ্ঞান বলিলে কেবল বৃক্ষেরই প্রামাণ্য হয়। তাহাতে অশ্বত্বের প্রামাণ্য হইতে পারে না। অতএব, জ্ঞানসামগ্রী হইতে সমগ্র বেদের প্রামাণ্য হয় না।

(৪) জ্ঞানসামগ্রী জনিত বিশেষ জ্ঞান কি প্রামাণ্যের আশ্রয়-স্থান? তাহাও নহে। যে হেতু আম্র বৃক্ষ এই একটি বিশেষ জ্ঞান; এই বিশেষ জ্ঞানের মধ্যে দুই প্রকার জ্ঞান

আছে। প্রথমতঃ, আম্র উৎপাদক বৃক্ষের বিশেষ লক্ষণাদি বিশিষ্ট বিশেষ জ্ঞান। আম্র বৃক্ষ বলিলে কাহারই কদলী বৃক্ষের জ্ঞান হয় না। এই জ্ঞানই বিশেষ জ্ঞান। দ্বিতীয়তঃ, আম্রবৃক্ষেতে বৃক্ষত্ব আছে। বৃক্ষ বলিলে যাহা বুঝায়, তাহার সমুদায় লক্ষণ সেই আম্রবৃক্ষে আছে। এই জাতি-জ্ঞানই সামান্য জ্ঞান। সুতরাং সামান্য জ্ঞানও বিশেষ জ্ঞানের অন্তর্গত। পূর্ব্বেই সপ্রমাণ হইয়াছে,জাতি জ্ঞান বৈদিক জ্ঞানের প্রামাণ্য হইতে পারে না। আর আম্রবৃক্ষজ্ঞান কেবল আম্র বৃক্ষেরই প্রামাণ্য, তাহা কদলী বৃক্ষের প্রামাণ্য নহে। এজন্য জ্ঞান-সামগ্রী জনিত জ্ঞানবিশেষেও বেদের প্রামাণ্য অধিষ্ঠিত নহে।

(৫)তবে কি বেদের প্রামাণ্য জ্ঞান-সামগ্রী-মাত্র জন্য হয়? জ্ঞান-সামগ্রীমাত্র জন্যও নহে; যেহেতু বেদ যখন নির্দ্দোষ বাক্য,তখন সেই জ্ঞানের সঙ্গে দোষের অভাব সহকৃত আছে। নির্দ্দোষ জ্ঞান নহিলে বেদের প্রামাণ্য হইবে না। তবেই দোষের অভাব সহকৃত না হইলে প্রামাণ্য জ্ঞান হয় না। স্বাভাবিক জ্ঞান মাত্রই বেদের প্রামাণ্য নহে,তাহা দোষ-রহিত হওয়া চাই। জ্ঞান দোষশূন্য হইতে হইলে তাহার প্রমাণান্তর আবশ্যক। যাহার প্রমাণান্তর আবশ্যক, তাহা পরতঃ-প্রমাণ-সাপেক্ষ। এরূপ পরতঃ-প্রামাণ্য দোষযুক্ত জ্ঞান বেদের প্রামাণ্য হইতে পারে না। পরতঃ-প্রামাণ্যে অনবস্থা দোষ ঘটে।

তবেই জৈমিনি প্রতিপন্ন করিতেছেন, পরতঃ-প্রামাণ্যের কোনরূপ দোষাশ্রিত জ্ঞান স্বতঃ-প্রামাণ্য নহে। জৈমিনির যুক্তি এই:—

পরতঃ-প্রামাণ্য মাত্র দোষাশ্রিত। তদ্দ্বারা আপ্তবাক্য বেদ প্রমাণিত হয় না। বেদ অপ্রা-মাণ্যও নহে; যেহেতু তাহা নিত্য সত্য। বেদ অপ্রামাণ্য নহে,পরতঃ-প্রামাণ্য ও নহে; অতএব, বেদ স্বতঃ-প্রামাণ্য।

আত্ম-জ্ঞানই বেদ। যাহা অধ্যাত্মজগতের নিত্য নিয়ম, তাহাই বেদ। এজন্যও বেদ নিত্য। আত্মা, বেদ, নিত্যবস্তু ব্রহ্ম, স্বপ্রকাশ চিন্ময়ত্ব, এ সমস্তের একই প্রমাণ। চিন্ময়ত্বই স্বপ্রকাশ ও স্বপ্রামাণ্য। সেই চিন্ময়ত্বই বেদ, চিন্ময়ত্বই আত্মা, চিন্ময়ত্বই ব্রহ্ম। বেদ নিত্য শব্দব্রহ্ম *। এই জন্য ব্যাস বলিয়াছেন যে, বেদই ব্রহ্ম †। বেদ নিত্য বলিয়া বৈদিক ধর্ম্মের নাম সনাতন ধর্ম্ম হইয়াছে।

এই সনাতন ধর্ম্ম যেমন অধ্যাত্ম-জগতের নিত্য নিয়মাবলি প্রচার করিতেছে, তেমনি তাহার অভ্রান্ত প্রচারকও দিয়াছে। নিত্য নিয়ম গ্রন্থে আবদ্ধ থাকিলে কি হইবে? তাহা তো মনুষ্য কর্তৃক বিচারিত, উপদিষ্ট এবং গৃহীত হইবে? তোমার বাইবেল, কোরাণ ও ত্রিপীটক বিদ্যমান থাকিলে কি হইবে? ভ্রান্তিবিশিষ্ট মনুষ্য তো তাহা গ্রহণ করিবে? ক্ষুদ্রাশয় মনুষ্য নিজ মত সমস্তই ক্ষুদ্র করিয়া লইবে। নানাবিধ মনুষ্য তাহা-দের নানা ব্যাখ্যা বাহির করিবে। এই নিমিত্ত অসংখ্য সম্প্রদায় হইবারই সম্ভাবনা। তাহাতে মূল বস্তুর বিলক্ষণ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। অন্যান্য ধর্ম্মে এই দোষ ঘটিয়াছে। কিন্তু

---

* গীতায় বেদ শব্দ-ব্রহ্মরূপে উক্ত হইয়াছে।
"জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতি বর্ত্ততে।"
৬অ—৪৪।

ব্রহ্মের রূপ যেমন প্রতিমায় প্রকাশিত, তেমনি মন্ত্রেও অভিব্যক্ত। বেদ মন্ত্র-ব্রহ্মময়। বেদজ্ঞান—আত্ম-জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান।

† ব্যাস মহাভারতের গোড়াতেই মূলমন্ত্রে বলিয়া-ছেন যে, ধর্ম্মরূপী যুধিষ্ঠির-রূপ মহাবৃক্ষের মূলে আছে—শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম; ব্রহ্মরূপ বেদ এবং ব্রাহ্মণ।
"মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণশ্চ"—।

সনাতন ধর্ম্মে তাহা ঘটিবার যো নাই। কারণ, বেদের উপদেশক গুরুগণ সমস্তই সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহারা আত্মজ্ঞানে বেদকে অভ্রান্ত দেখিয়াছিলেন। সেই সিদ্ধপুরুষগণ বেদ-পাঠ যেরূপে নিয়মিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা বেদার্থের যাথার্থ্য সম্যক্ প্রতীত হয়। অনধিকারী ব্যক্তি বেদপাঠ করিবেন না। বেদপাঠের নিমিত্ত অধিকারী হইতে হইলে পূর্ব্বে তজ্জন্য জ্ঞানাধিকার হওয়া চাই। সেই জ্ঞানাধিকার জন্মিলে তবে নিয়মমত পাঠ করিতে হইবে। অনধিকারী ব্যক্তি বেদের তাৎপর্য্য-গ্রহণে অসমর্থ। সেই তাৎপর্য্য গ্রহণের নিমিত্ত বেদোপদেশকগণ বেদাঙ্গ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই বেদাঙ্গ ছয় প্রকার—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ এবং জ্যোতিষ। এই বেদাঙ্গে বেদ-পাঠের নিয়ম সমস্ত প্রকাশিত আছে। তাহা-রাই বেদের চক্ষু স্বরূপ। সেই চক্ষু ব্যতীত বেদকে দেখিলে বেদার্থের প্রতীতি হইবে না। তুমি অনধিকারী, তুমি পাঠ করিতে যাও, তোমার চক্ষে সমস্ত বিকৃত, বিশৃঙ্খল, বিসম্বাদী বোধ হইবে। কিন্তু অধিকারী হইয়া ঐ ছয় চক্ষু দিয়া বেদ পাঠ কর, বেদকে নির্দ্দোষ দেখিতে পাইবে। যাঁহারা বেদের দোষ দেখিতে পান, তাঁহারা অনধিকারী এবং যথানিয়মে বেদপাঠ করেন নাই।

অন্যান্য ধর্ম্মে আপ্তবাক্য আছে, একথা যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই আপ্তবাক্যের অভ্রান্ত উপদেশক কই? সেই অভ্রান্ত গুরূপদিষ্ট আপ্তবাক্য বুঝিবার অভ্রান্ত পথ কই? সেই আপ্তবাক্য বুঝিবার জন্য যে জ্ঞানাধিকার আবশ্যক, সে জ্ঞানাধিকার কিসে জন্মিবে? যাঁহারা সে আপ্তবাক্যের প্রমাণ, তাঁহাদের প্রত্যক্ষে কিছুই উপলব্ধ নহে। সুতরাং তাঁহারা অভ্রান্ত ভাবে কিরূপে উপদেশ দিবেন? তাঁহাদের অনুমান মাত্র প্রমাণ। কিন্তু সে অনুমানের প্রমাণ কি? আপ্তবাক্য থাকিলে কি হইবে? অভ্রান্ত উপদেশক বিহনে সে আপ্তবাক্য সাধা-রণ জনসমাজে ভ্রমবিহীন হইতে পারে না।

বেদে যে মুক্তিপথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই বেদ প্রতিপন্ন। সেই মুক্তিপথে আসিবার সময় যোগী যখন যোগৈশ্বর্য্য লাভ করেন, তখন তিনি সমাবিস্থ হইয়া বেদের সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ দেখিতে থাকেন। তখন তিনি ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া ত্রিকালজ্ঞ হয়েন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হয়। যোগী জাতিস্মর হইয়া পূর্ব্ব-জন্ম পর্য্যন্ত জাজ্বল্যমান দেখিতে পান। তখন তিনি কর্ম্মফলবাদের সত্যতা উপলব্ধি করেন।

হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মফলবাদ ইহজন্মে সামান্য বুদ্ধিতেও প্রতীত হয়। জীবের স্বাভাবিক পার্থক্য পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেরই প্রমাণ। লোকে যাহা অদৃষ্ট শক্তি বলে, তাহাও এই কর্ম্মফলবাদের প্রমাণ। লোকের বিদ্যা-বুদ্ধির স্বাভাবিক পার্থক্য আর কিসে মীমাং-সিত হয়? সদ্যোজাত শিশুর হাস্য ক্রন্দন ও ক্রীড়াদি পূর্ব্বজন্মের সংস্কারাধীন বলিয়াই প্রতীত হয়। কিন্তু এ সমস্ত কথা অনুমান-মাত্র। চূড়ান্ত প্রমাণ যোগের আত্মপ্রত্যক্ষ।

বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড মুক্তি-পথের সোপান মাত্র। তাহাদিগকে সেই ভাবেই দেখা উচিত। বেদের ব্রহ্মবিদ্যা তদ্রূপ নানা আকারে প্রথম অধিকারীর নিমিত্ত বিবৃত হইয়াছে। নানাদেবদেবী নির্গুণ পরব্রহ্মের বিশ্বরূপের প্রতিরূপ মাত্র—যে বিশ্ব রূপে তিনি প্রথম অধিকারীর নিকট ব্যক্ত—যে বিশ্বরূপ ধরিয়া উপাসক ক্রমে নিস্ত্রৈগুণ্যে

উঠিতে পারেন। এজন্য হিন্দুধর্ম্মে সগুণ ও সাকার * এবং নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সমস্ত উপাসনা পথের সর্ব্বশেষ পরিণাম মুক্তি হওয়াতে তাহারা বিভিন্ন হইয়াও একই হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপাদক হইয়াছে। বেদ ও হিন্দুধর্ম্ম এই ব্রহ্মেরই সাক্ষীস্বরূপ। সুতরাং বেদ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছে। যাহা ব্রহ্মস্বরূপ তাহা আত্মজ্ঞানে প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্বতঃ-প্রামাণ্য। হিন্দুধর্ম্মে এই জন্য ব্রহ্মের প্রমাণ দেবলীলা নহে, কিন্তু দেবলীলার প্রমাণ ব্রহ্ম হইয়াছে। কারণ, হিন্দুধর্ম্মে ব্রহ্মই সর্ব্বস্ব। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরব্রহ্মেরই রূপ মাত্র, পরব্রহ্ম বিশ্বরূপে অবস্থিত এবং বিশ্বরূপেই লীলা করিতেছেন।

এক্ষণে বোধ হয় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল যে, হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য ত্রিবিধ—পৌরাণিক, দার্শনিক এবং যোগসিদ্ধ। জনসমাজের জ্ঞানাধিকার ভেদোপযোগী এই ত্রিবিধ প্রমাণ। যাঁহারা পৌরাণিক প্রমাণে পরিতুষ্ট নহেন, তাঁহারা নৈয়ায়িকের অনুমান গ্রহণ করিতে পারেন, যাঁহারা সে প্রমাণেও পরিতুষ্ট নহেন, তাঁহারা মীমাংসকের অনুমান অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের কাছে, পৌরাণিক ও আনুমানিক প্রমাণ, এই উভয়বিধ প্রমাণই দুর্ব্বল, তাঁহাদের জন্য যোগপথের প্রামাণ্য। হিন্দুধর্ম্মের এই প্রমাণত্রয় অন্য কোন ধর্ম্ম প্রণালীতে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাহা কেবল হিন্দুধর্ম্মেরই বিশেষ উপযোগী। যোগপথের প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের আর উৎকৃষ্ট প্রমাণ নাই। এই প্রামাণ্য আর কোন ধর্ম্মে নাই। এ প্রামাণ্য কাহারও অগ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ হিন্দু ধর্ম্ম বলিতেছেন, যোগপথ ত পড়িয়া রহিয়াছে; যোগ করিয়া দেখ, হিন্দুধর্ম্ম স্বতঃই সপ্রমাণ হইয়া যাইবে। তৎপূর্ব্বে, হিন্দুধর্ম্মকে অপ্রামাণ্য বলিবার যো নাই। বেদ প্রামাণ্য হওয়াতে তদনুযায়ী সমস্ত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র প্রামাণ্য হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম প্রত্যক্ষ প্রমাণে সিদ্ধ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

* হিন্দুধর্ম্মে সাকার উপাসনা দ্বিবিধ, সূক্ষ্ম বা মানসিক সাকার এবং স্থূল বা বাহ্য সাকার। উভয়বিধ সাকারই সগুণ ঈশ্বরের শক্তিরূপ মাত্র। মন্ত্র ও প্রতিমা সগুণ ব্রহ্মের শক্তিরূপ। মন্ত্র মানস-রূপের বিকাশ, প্রতিমা মন্ত্রের বিরাট বিকাশ।

মাংসাদ উদ্ভিদ।

আজ প্রায় দশ বৎসর হইল, আমরা শীর্ষস্থ আখ্যায় একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম। ইহার কিয়দংশ ভারতীর কোন দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং অবশিষ্টাংশ আজও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সম্প্রতি ভারত-বিজ্ঞান-সভার সুপ্রশস্ত গৃহে এতৎ সম্বন্ধে Dr. S. B. Mitra, B. Sc., M.B. (London) একটি অতি সুন্দর, সারগর্ভ এবং হৃদয়গ্রাহী ইংরাজী বক্তৃতা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সাধারণ বঙ্গীয় পাঠকগণের জন্য, যদি আমরা মাংসাদ উদ্ভিদ সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করি, বোধ হয় আমাদের অপরাধ অমার্জ্জনীয় হইবে না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান প্রবন্ধ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই পুনর্লিখিত হইল।

আমেরিকার উদ্ভিদবেত্তা কার্টিস ও

কব সর্ব্বপ্রথমে (১৮৩৪ খৃঃ অব্দে) উদ্ভিদ্‌দিগের এই জান্তব ধর্ম্মের অর্থাৎ জন্তুর ন্যায় আহার ক্রিয়ার উল্লেখ করেন। ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে, স্বনাম খ্যাত উদ্ভিদ-বেত্তা হুকার উদ্ভিদদিগের এই নবাবিষ্কৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্রীটিশ য়্যাসোসিয়েশনে প্রথম আধিবেশনিক বক্তৃতা করেন। হুকারের পূর্ব্বে পণ্ডিত গ্রে উল্লিখিত আমেরিকান উদ্ভিদবেত্তাদ্বয়ের মত সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত মাংসাদ উদ্ভিদ একটি কৌতূহলাবহ বিষয় ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ইহার পর প্রকৃতি-তত্ত্ববিশারদ অমর চার্লস ডারউইন অবিশ্রাম পঞ্চদশ বর্ষ পতঙ্গ ভোজী কতকগুলি প্রধান প্রধান উদ্ভিদ সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক ও সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া স্বকীয় অভিজ্ঞান পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে, মাংসাদ উদ্ভিদ, বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক—সাধারণের পরিচিত হইয়াছে।

মাংসাদ উদ্ভিদগুলি সাধারণতঃ আমেরিকা, ইয়ুরোপ ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির স্থানে স্থানে জন্মিয়া থাকে। অবশ্য সকল বিভাগ (Order) বা সকল বংশের (Species) মাংসাদ উদ্ভিদ কোন এক দেশে পাওয়া যায় না। তবে আমেরিকায় অধিকাংশ গুলি পাওয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষে সচরাচর দুই তিন প্রকারের মাংসাদ উদ্ভিদ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে এক প্রকার অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমরা যথা স্থানে তাহার বিষয় উল্লেখ করিব। মাংসভোজী উদ্ভিদগণ প্রায় সকলেই অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে ও জলা স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকটী প্রধান প্রধান ও সুপরিচিত মাংসাদ উদ্ভিদের বিবরণ প্রদান করিব। পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রবন্ধ বর্ণিত মাংসাদ উদ্ভিদগুলির মধ্যে কাহার কাহারও এক একটী পত্রের ছবি দেওয়া হইল।

সূর্য্যশিশির। ইহার ইংরাজী নাম ড্রসেরা। ইহা ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলে এবং ভারতবর্ষের সিকিম, আসাম, বর্ম্মা, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, হুগলী, মগরা, বর্দ্ধমান, প্রভৃতি স্থানের বালুকাময় স্থানে ও জলাভূমিতে পাওয়া যায়*। ইহার পত্রগুলি গোলাকার ও ক্ষুদ্র; মূলের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃন্তদ্বারা সংলগ্ন হইয়া মৃত্তিকার উপরেই অবস্থান করে। বস্তুতঃ ইহাদের কাণ্ড একেবারেই নাই বলিয়া, পত্রগুলি যেন মাটির সহিত মিশাইয়া থাকে। পুষ্প বিকাশের কালে মূলদেশ হইতেই একটি শীষ উত্থিত হয় এবং ইহার শিরোদেশে পুষ্প বিকাশ হয়। এইরূপ শীষ উঠিলে কোন কোন সূর্য্যশিশির অর্দ্ধ হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়, কিন্তু সাধারণতঃ শীষ এত বড় হয় না। উচ্চতার গড় চার পাঁচ ইঞ্চি হইয়া থাকে। পত্রের উপরিভাগের সমুদয় অংশ শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশে পূর্ণ। প্রত্যেক কেশের শিরোদেশে একটি করিয়া কোষ-গ্রন্থি (Gland) থাকে। এই কোষ-গ্রন্থি বেষ্টন করিয়া শীত, বাত, গ্রীষ্ম সকল কালেই প্রাকৃতিক শিশির কণার ন্যায় সুনি-

* গত বৎসর শীতকালে আমরা ড্রসেরার অন্বেষণে মগরা ও বর্দ্ধমান গিয়াছিলাম। বর্দ্ধমানে দুই দিবস ও মগরায় একদিবস পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জলা, মাঠ, নদীতীর, বালুময় স্থান এবং অন্য নানা স্থান অন্বেষণ করিয়াও দুর্ভাগ্য বশতঃ একটিও ড্রসেরা দেখিতে পাই নাই। সম্ভবতঃ সে সময় ড্রসেরা জন্মিবার সময় নয়। আরো একটু বিলম্বে অর্থাৎ বসন্তের প্রারম্ভে বা মাঝামাঝি সময়ে হয় ত ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। ডাঃ ওয়াট হুগলী, মগরা, বর্দ্ধমান এই তিন স্থানেই ড্রসেরা পাইয়াছিলেন।

শ্মল কিন্তু চট্‌চটে একবিন্দু নির্য্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যোদয় হইলেও এই নির্য্যাস বিন্দু অদৃশ্য হয় না। এই নিমিত্ত ইংরাজী চলিত ভাষায় এই উদ্ভিদ "সূর্য্যশিশির" (Sun-dew) নামে আখ্যাত। সূর্য্যশিশির পত্রের কিনারার কেশগুলি মধ্যস্থ কেশ নিচয় অপেক্ষা দীর্ঘতর ও ঈষৎ বেগুণে বর্ণের। ডারউইন এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশ গুলিকে উত্তেজনীয় বা অনুভব শক্তি বিশিষ্ট শুয়া (Sensitive tentacles) বলেন। * সূর্য্যশিশির পত্রের শুয়াগুলির স্পর্শানুভব শক্তি এত তীক্ষ্ণ ও প্রবল যে, যদি ক্ষুদ্রতম মশকের ক্ষীণতম চরণ কোন একটি কেশের শীর্ষস্থ শিশির কণা স্পর্শ করে, উক্ত কেশটি তৎক্ষণাৎ তাহা অনুভব করিতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে,এক গ্রেণের ৭৮,৭০০ অংশ পরিমিত ভার, যাহা স্থূল কথায় বলিতে গেলে অনন্তগুণে অল্প ভার, অর্থাৎ যাহা কিছুই নয় বলিলেই হয়, শুয়ার শিশিরোপরি সংন্যস্ত হইলে, উহা তৎক্ষণাৎ তাহা অনুভব করিয়া আনত বা বক্র হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও একদিকে এত সামান্যতম ভারেই ইহা উত্তেজিত হইতে পারে বটে,অপরদিকে অপেক্ষাকৃত একটু গুরুভার অর্পিত হইলে ইহা তাহাতে অনুত্তেজিতই থাকে। এই নিমিত্ত বায়ুসঞ্চালনে কি বৃষ্টি পতনে কি অন্য নানা কারণে আলোড়িত হইলেও শুয়া তাহা গ্রাহ্য করে না অর্থাৎ তাহাতে উত্তেজিত হয় না।

কোন ক্ষুদ্র কীট বা মক্ষিকা সূর্য্যশিশিরের কোন একটী শুয়ার শিশির কণার উপর বসিলেই প্রথমে আঠাতে জড়িতহইয়া আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এদিকে সেই শুয়া বা কেশ গাছি ধীরে ধীরে বাঁকিতে আরম্ভ করে এবং তৎসঙ্গে অপর কেশগুলিও বাঁকিতে থাকে। এই বাঁকিবার সম্বন্ধে দুটি প্রধান নিয়ম দেখা যায়। একটী এই যে, যদি মক্ষিকা পত্রের মধ্যদেশস্থ কোন কেশের শিশিরে বসে, তাহা হইলে উক্ত কেশের কোষগ্রন্থি এমনি একটি শক্তি চতুঃপার্শ্বস্থ কেশনিচয়ে সঞ্চালিত করিয়া দেয় যে, তদ্দ্বারা উত্তেজিত হইয়া উক্ত কেশ নিচয় বাঁকিতে আরম্ভ করে—এবং এরূপ ভাবে ক্রমশঃ বাঁকে যে উহাদিগের কোষগ্রন্থিগুলি মক্ষিকার উপর আসিয়া পড়ে। সেই সঙ্গে কোষগ্রন্থি হইতে প্রচুর পরিমাণে রস নিঃসারিত হইয়া হতভাগ্য মক্ষিকার উপর বর্ষিত হইতে থাকে। অপরটি এই যে, যদি মক্ষিকা কিনারার কোন একটি কেশের শিশির বিন্দুর উপর বসে, তাহা হইলে সেই কেশটি প্রথমে নুইয়া (পত্রের মধ্যদেশের দিকের) পরবর্ত্তী কেশটিকে,এ কেশ গাছি নুইয়া তৎপরবর্ত্তী কেশটিকে, সেটি আবার নুইয়া তৃতীয় পরবর্ত্তী কেশের উপর মক্ষিকাকে স্থানান্তরিত করিয়া,ক্রমে উহাকে পত্রের মধ্যদেশে লইয়া ফেলে। এখানে পৌঁছিলে পর, পূর্ব্বের ন্যায় চারিদিক হইতে শুয়াগুলি বাঁকিয়া আসিয়া হতভাগ্য মক্ষিকার উপর রস নিঃসরণ করিতে থাকে। এই দুটি নিয়ম হইতে আমরা দেখি যে, যদি মক্ষিকা নিজে পত্রের মধ্যস্থ শুয়াতে আসিয়া না বসে, তবে শুয়াগুলি আপনারা তাহাকে মধ্যদেশে আনিয়া স্থাপন করে। ইহার পর পত্রের মধ্যদেশও ক্রমশঃ একটু গর্ত্তের মত হয়। সমুদয় শুয়াগুলি বাঁকিতে ও পত্র-মধ্যদেশ একটু গর্ত্তের মতন হইতে ৪ ঘণ্টা হইতে

* আমরা এই প্রবন্ধে 'অনুভব' শব্দটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিলাম। প্রচলিত সংজ্ঞা বা বোধ পরিজ্ঞাপক অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয় নাই।

১৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগে। কীটেরা নিঃসারিত অম্লরসে ডুবিয়া ১৫।২০ মিনিটের মধ্যেই মরিয়া যায়। আমাদের ছবিতে একদিককার শুয়াগুলিকে আনত ও অপর দিকের শুয়াগুলিকে স্বাভাবিক ভাবে দেখান হইয়াছে। ছবি দেখুন।

বস্তু বিশেষ অনুসারে সূর্য্যশিশির পত্রের সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ কালের ব্যবধানের তারতম্য হইয়া থাকে। যবক্ষারজান যুক্ত পদার্থ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলেই ইহার সঙ্কোচন কাল সুদীর্ঘ হয়। এমন কি সময়ে সময়ে দশ দিবসের মধ্যেও পুনঃ প্রসারিত হয় না। কিন্তু যদি স্পৃষ্ট পদার্থ যবক্ষারজান বিহীন হয়, যেমন, অঙ্গার, শৈবাল, কাগজ ইত্যাদি, তাহা হইলে শীঘ্রই, ১৭।১৮ ঘণ্টার মধ্যে পাতা খুলিতে আরম্ভ করে। একবার কুঞ্চিত হইয়া পুনঃ প্রসারিত হইবার সময় রসনিঃসরণকারী কোষ-গ্রন্থি সমূহ রস নিঃসরণ করে না; পত্রপৃষ্ঠ শুষ্কভাব ধারণ করে। পরে যখন পাতাটি সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া পড়ে, তখন কোষ-গ্রন্থিগুলি পুনরায় রস জমাইতে আরম্ভ করে। এইরূপে প্রত্যেক গাছি কেশের মস্তকে শিশির বিন্দুটি পূর্ণমাত্রা প্রাপ্ত হইলে, সূর্য্যশিশির পত্রটি দ্বিতীয়বার মক্ষিকা সংহারে সক্ষম হয়। একটি পত্র দুই চারি বারের অধিক ঈদৃশ ক্ষমতা পুনঃ প্রাপ্ত হয় না। তদনন্তর ইহা শুষ্ক হইয়া যায় এবং নূতন পত্র তৎস্থানাধিকার করে। যদিও এত অল্পে অল্পে সূর্য্যশিশির পত্রের কীট-সংহারী-কার্য্য সাধিত হয় বটে, তাহা হইলেও একটি গাছ দ্বারা বড় অল্প সংখ্যক কীট নষ্ট হয়না। ডারউইন একটী পত্রে ত্রয়োদশটি মক্ষিকার মৃতাবশেষ দেখিয়াছিলেন। সুতরাং যদি আমরা মনে রাখি যে একটি সূর্য্যশিশিরের সচরাচর ছয়টি, সাতটি পাতা থাকে, এবং সূর্য্যশিশিরও প্রচুর পরিমাণে জন্মে, তাহা হইলে আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি সূর্য্যশিশির কত শত কীট নাশ করিয়া থাকে।

জীব শরীরে যে মূলপ্রণালীতে মাংস কিম্বা তৎসদৃশ পদার্থ ভুক্ত হইবার পর দ্রবীভূত হইয়া শরীর সাধনোপযোগী উপাদানে পরিণত হয়, ঠিক সেই উপায়ে সূর্য্যশিশিরের পত্রোপরি মাংস বা কীটদেহ পরিপাক অর্থাৎ দ্রবীভূত হইয়া উহার দেহ পোষণের সাহায্যতা করে। পাঠকেরা জানেন মাংস হজম করিবার জন্য দুটি প্রধান উপাদান আবশ্যক। একটি, অম্লরস; অপরটি পেপসিন নামক এক প্রকার ফার্ম্মেণ্ট। এই দুইয়ের কোন একটির অভাবে, মাংস বা য়্যালবিউমেন ঘটিত পদার্থ জীর্ণ হইবার নয়। জন্তু শরীরে মাংস পাকস্থলীতে উপস্থিত হইয়া, একপ্রকার অম্লরস ও পেপসিন নামক ফার্ম্মেণ্টের সমবেত কার্য্য দ্বারা জীর্ণ হইয়া জলবৎ হয়, এবং ইহাই পাকস্থলীর গাত্রস্থ অসংখ্য কোষ-গ্রন্থি দ্বারা শোষিত হইয়া এবং পরে রক্তের সহিত মিশিয়া শরীর পোষণ করে। সূর্য্যশিশিরের পত্রোপরি কোষ-গ্রন্থি বিশিষ্ট বহুল শুয়া হইতে যে রস নিঃসৃত হইয়া কীটদেহকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে, সেই রস অম্লাক্ত। এই অম্লাক্তরসে কীটদেহ বা মাংস ক্ষণকাল থাকিলেই পেপসিন ফার্ম্মেণ্ট উপজিত হয়। অতঃপর, অম্লরস ও পেপসিন সহযোগে কীটদেহ দ্রবীভূত হইয়া পড়ে। এই দ্রবীভূত কীটদেহ পত্রপৃষ্ঠস্থ উল্লিখিত শত শত কোষ-গ্রন্থি দ্বারা শোষিত হইয়া সূর্য্যশিশির দেহের পোষণকার্য্য সমাহিত হয়।

প্রকৃত পরিপাক ক্রিয়া সময় সাপেক্ষ। এইজন্য যবক্ষারজান বিহীন পদার্থ সহ শুটা-

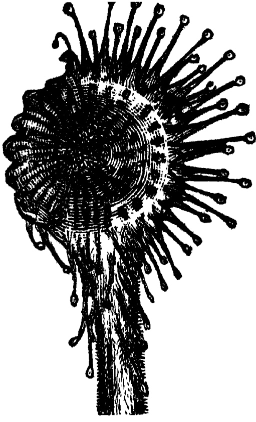
ইলে পত্র শীঘ্রই পুনরুন্মুক্ত হয়। কিন্তু জান্তব-পদার্থ-সহ আকুঞ্চিত হইলে পুনঃ প্রসারণ বিলম্ব সাপেক্ষ। ডারউইন সূর্য্যশিশিরের এই ব্যবহার দেখিয়াই প্রথমে অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে, হয় ত সূর্য্যশিশির জন্তুদিগের ন্যায় উহার আহার্য্য সামগ্রী পরিপাক করিতে পারে। পরে বহুল পরীক্ষা দ্বারা স্বীয় অনুমানকে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্যশিশির বাস্তবিক পরিপাক করে কি না এবং কি রকম পদার্থ পরিপাক করিতে পারে, ইহা নিশ্চয় জানিবার জন্য ডারউইন নানাবিধ খাদ্য ব্যবহার করিতেন। ডিম্বের শ্বেতাংশ, অপক্ক ও পক্ক মাংস, বিড়ালের কাণের টুকরা, কুকুরের দাঁতের চোকলা, সিদ্ধ কপি, পনীর, পুষ্পরেণু, মানুষের নখের টুকরা, বেঙের অস্থির ছিলকে, মানুষের মাথার চুল ইত্যাদি নানাবিধ পদার্থ দিয়া নিঃসংশয়িতরূপে দেখিয়াছেন যে, সূর্য্যশিশির যবক্ষারজান সম্বলিত পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই পরিপাক করিতে পারিত না। জন্তু-শরীর-ধর্ম্মের সঙ্গে সূর্য্যশিশিরের আর একটী বিশেষ সাদৃশ্য এই যে, চর্ব্বি, তৈল, পত্রের সবুজ অংশ (Chlorophyll), শ্বেতসার (Starch), সূত্র প্রভৃতি যবক্ষারজান সংযুক্ত পদার্থ যেমন জন্তুর পাকস্থলী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় অর্থাৎ জীর্ণ হয় না, সেইরূপ সূর্য্যশিশির কর্ত্তৃকও পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

সূর্য্যশিশির মাংসাদ বলিয়া যে একেবারেই মাংস ভিন্ন উদ্ভিদ সম্পর্কীয় কোন পদার্থ গ্রহণ করে না, এমত নহে। সূর্য্যশিশির-পত্র দিবানিশি প্রসারিতই থাকে; অন্য অনেক উদ্ভিদের পত্রের ন্যায় রাত্রিকালে মুদ্রিত হয় না। এই জন্য কীট পতঙ্গ ব্যতীত অন্য অনেক জিনিসের উহার উপর পড়িবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ বায়ু সহযোগে অনেক পুষ্পরেণু ও বীজ শুয়ার উপর আসিয়া পড়ে এবং উহাকে উত্তেজিত করিয়া রস নিঃসারণ করায়। এই রসে নিমজ্জিত হইয়া পরাগ বা বীজ উহার যবক্ষারজান অংশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, এবং তাহাই পত্রের আহার্য্য হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত, পক্ক অর্থাৎ সিদ্ধ শাক সবজি, কপি, ইহারা পরিপাক করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং সূর্য্যশিশির আমাদের অনেকের ন্যায় আমিষ ও নিরামিষ উভয়ভোজী। অপক্ক মাংস বা পনীর অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে, অনেক পেটুক মনুষ্যের ন্যায়, সূর্য্যশিশিরও অতিভোজন দোষে অকালে মরিয়া যায়।

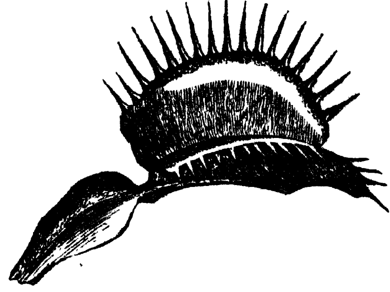
কেহ কেহ বলিতেন যে সূর্য্যশিশির হয় ত মক্ষিকা ও কীট ধরিয়া, ঔষধের ন্যায় তাহাদের মাংস গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সন্দেহ মীমাংসা করিবার জন্য ফ্রান্সিস ডারউইন (চার্লস ডারউইনের পুত্র) কয়েক বৎসর হইল কতকগুলি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। জার্ম্মেণির কতিপয় পণ্ডিতও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সকলেই পরীক্ষা-লব্ধ অভিজ্ঞান-বলে মুক্তকণ্ঠে ও সুদৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন, সূর্য্যশিশিরের কীট পতঙ্গ সংহার ক্রিয়া ঔষধ সেবনার্থ নহে, শরীর পোষণের জন্য। ফ্রান্সিস ডারউইন দুটি স্বতন্ত্র সুপ-প্লেটে কতকগুলি সূর্য্যশিশির রাখেন। পাছে উড্ডীয়মান মক্ষিকা বা কীট কোন গাছের পত্রের উপর পড়িয়া পরীক্ষার ব্যাঘাত জন্মায়, এইজন্য উভয় প্লেটস্থ গাছগুলিকে সর্ব্বক্ষণ সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা ঢাকিয়া রাখিতেন। দুটি প্লেটের গাছগুলির অন্যান্য সব অবস্থা সমান ছিল। কেবল, একটি প্লেটের

গাছগুলিকে সিদ্ধ মাংস খাওয়াইতেন, অপরটির গাছগুলিকে অভুক্ত রাখিতেন অর্থাৎ তাহারা অন্যান্য উদ্ভিদের ন্যায় মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে আপনাদের খাদ্য সংগ্রহ করিত। যথাসময়ে দুই পাত্রস্থ সূর্য্যশিশিরগুলি পুষ্পিত হইল। সমুদয় ফলগুলিও পরিপক্ক হইল। তখন দেখা গেল,ভুক্তমাংস সূর্য্যশিশিরগুলিই অপেক্ষাকৃত সতেজ ও বড় এবং বীজ সংখ্যায় ভুক্তমাংস সূর্য্যশিশিরের বীজই বেশী; অভুক্তের অপেক্ষা প্রায় আড়াই গুণ অধিক। আর ভুক্তমাংস সূর্য্যশিশিরের বীজগুলি অভুক্তমাংস সূর্য্যশিশিরের বীজাপেক্ষা চারিগুণ ভারী। এই চরম ফল দেখিয়া বোধ হয় কেহ আর সন্দেহ করিতে সাহসী হইবেন না, কীট পতঙ্গ সূর্য্যশিশিরের ভোজ্য কি ঔষধ। যদি ঔষধই হইত,তাহা হইলে ভুক্তমাংস সূর্য্য শিশির কখনই এত অধিক পরিমাণে এরূপ সারবান্ বীজ প্রসব করিত না। আমরা যদি স্মরণ রাখি যে, সারবান ও অধিক সংখ্যক বীজোৎপাদন করাই এ সংসারে—যেখানে সকলেই বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ব্যস্ত, যেখানে কেবল যোগ্যতমদেরই উদ্বর্ত্তিত, দীর্ঘজীবী, ও স্বকীয় বংশ স্থায়ী করিবার সবিশেষ সম্ভাবনা—প্রত্যেক জন্তু বা উদ্ভিদের পক্ষে নিতান্তই দরকার, তাহা হইলে সহজে বুঝিতে পারি যে, সূর্য্যশিশির মক্ষিকা ও কীট বধ করিয়া অপেক্ষাকৃত সারবান্ ও পুষ্টিকর আহার করে কেবল নিজের পুষ্টিসাধন জন্য এবং নিজের বংশের কল্যাণের জন্য, অন্য কোন কারণের জন্য নহে।

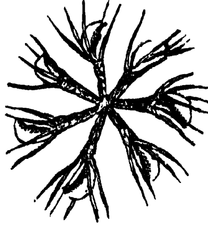
মক্ষিকাপাশ। ইহা ড্রসেরা অর্থাৎসূর্য্য শিশির পরিবারান্তর্গত। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ডাইওনিয়া এবং ইংরাজী চলিত নাম Venus' fly trap "মক্ষিকাপাশ"। (ছবি দেখুন।) ইহা উত্তর কারোলিনার পূর্ব্বাংশেই কেবল পাওয়া যায়; সূর্য্যশিশিরের ন্যায় আর্দ্রস্থান ও জলাভূমিতে উৎপন্ন হয়। ইহার কাণ্ড নাই; পাতাগুলি মূল হইতেই উঠিয়া থাকে। পত্র সদৃশ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও লম্বা বোঁটার পর পাতাটি অন্য সাধারণ পত্রের ন্যায় দুই অংশে (lobes) বিভক্ত হয়। পত্রের একটি অংশ অপরটির সহিত প্রায় সমকোণ করিয়া খাড়া থাকে। পত্রাংশের কিনারা খাঁজ কাটা কাটা অর্থাৎ মূষিকহারী জাঁতিকলের যেমন দাড়া বা দাঁত থাকে, মক্ষিকাপাশ পত্রের কিনারায় তেম্নি কিন্তু খুব সরু সরু ও নমনীয় দাঁত থাকে। মূষিক পড়িলে জাঁতিকলের দুটি ভাগ যেমন খাঁজে খাঁজে পড়িয়া বদ্ধ হইয়া যায়, মক্ষিকাপাশে পোকা মাকড় পড়িলে পত্রের অংশদ্বয়ও বদ্ধ হইবার সময় কিনারার দাঁতগুলি ঠিক তেমনি খাঁজে খাঁজে পড়িয়া বদ্ধ হয়। প্রত্যেক পত্রের অংশের উপরিভাগে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুয়া এরূপে উত্থিত হয় যে, যদি রেখা দ্বারা তাহাদের মূলদেশ কি শিরোদেশ পরস্পরের সহিত সংযোজিত হয়, একটি ত্রিভুজ অঙ্কিত হইবে। শুয়াগুলি প্রত্যেকে এক ইঞ্চির কুড়ি ভাগের অপেক্ষা একটু বড়। এই শুয়াগুলির উত্তেজনীয়তা বা স্পর্শানুভব শক্তি অতি প্রখর ও আশ্চর্য্য জনক। অতি মৃদু ও ধীরভাবে কোন একটি শুয়া স্পর্শ করিলে সমুদয় পাতাটী তৎক্ষণাৎ খাঁজেখাঁজে বদ্ধ হইয়া যায়। সূর্য্যশিশিরের শুয়ার ন্যায় ইহার শুয়া কুঞ্চিত বা আনত হয় না। উহা স্পর্শ করিলেই,বৈদ্যুতিকশক্তি সঞ্চারের ন্যায় সে স্পর্শন সমুদয় পত্র শরীরকে উত্তেজিত করে এবং নিমেষের মধ্যে পত্রাংশদ্বয় জাঁতি কলের ন্যায় বদ্ধ হইয়া পড়ে। সূর্য্যশিশিরের ন্যায়



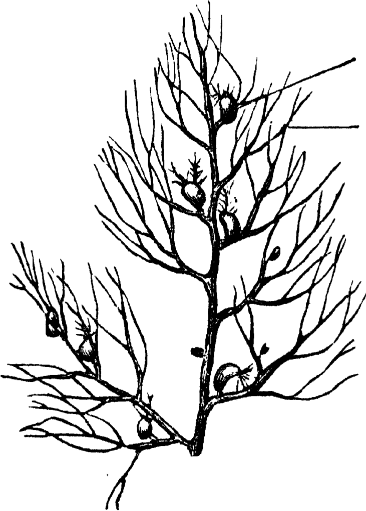
সূর্য্যশিশির।



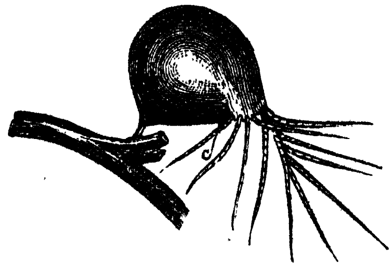
মক্ষিকাপাগ।



আলদ্রোভাণ্ডা।



স্থালী উদ্ভিদ।



একটী স্থালী।
(অনেক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত।)

মক্ষিকাপাশের পত্রকার্য্য ধীরে ধীরে সম্পাদিত হয় না। ইহার কারণ এই যে, সূর্য্যশিশিরের চট্‌চটে শিশিরের উপর বসিলেই ক্ষুদ্র কীট আবদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং ধীরে ধীরে পত্রকার্য্য সম্পন্ন হইলেও শিকারের পলায়নের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। বাস্তবিক, সূর্য্যশিশিরের শিশিরকণার উপর যে কীট একটিবার বসে, তাহার নিয়তির পরিণাম নিতান্তই অতি অদূরে। কিন্তু মক্ষিকাপাশের শুয়াতে তেমন কোন নির্য্যাস থাকে না; শুয়ার স্পর্শানুভব শক্তিই অতি প্রবল। এই জন্য পতঙ্গ বা মক্ষিকার ক্ষীণতম চরণ-স্পর্শে একেবারে উত্তেজিত হইয়া নিমেষের মধ্যে দুর্ভেদ্য কবাটের ন্যায় বন্ধ হইয়া হতভাগ্য কীটকে হঠাৎ পত্র মধ্যে বদ্ধ করিতে না পারিলে, শিকার সংগ্রহের সম্ভাবনা অতি অল্প। সেই নিমিত্ত মক্ষিকাপাশের পত্র এত সত্বর উত্তেজিত হয় এবং এত হঠাৎ বন্ধ হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র মক্ষিকার বা পতঙ্গের ক্ষীণতম চরণ বা সূক্ষ্মতম পক্ষ সংস্পৃষ্ট হইলেই, তৎক্ষণাৎ জাঁতি কলের ন্যায় সবেগে বন্ধ হইয়া পত্রাংশদ্বয় শিকারকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। একবার আবদ্ধ হইলে হতভাগ্য কীটেরসে ভীষণ কারাবরোধ হইতে পলায়ন করিবার কোন পথই উন্মুক্ত থাকে না। আবদ্ধ কীট অতিশয় ক্ষুদ্র হইলে, কখন কখন, পত্রদন্তের সম্মিলন পথের সূক্ষ্মতম ছিদ্র-দ্বার দিয়া টানাটানি করিয়া পলাইয়া থাকে। কখন বা কোন প্রবল কীট পাতা কাটিয়াও পলাইয়া যায়। কিন্তু সচরাচর এরূপ ঘটে না। কারণ পত্রাংশদ্বয় খাঁজে খাঁজে বন্ধ হইয়া নিবদ্ধ কীটকে চাপিয়া মারিয়া ফেলে এবং পত্রের দুটি অংশ এরূপ দৃঢ় ভাবে সংলগ্ন হয় যে, বল পূর্ব্বক স্বতন্ত্র করিয়া ছাড়িয়া দিলেও পুনর্ব্বার সবেগে ও সশব্দে বন্ধ হয়।

শুয়ার কার্য্য সম্বন্ধে মক্ষিকাপাশ ও সূর্য্যশিশিরের ভিন্নতা এই যে, মক্ষিকাপাশ মৃদুতম বারেক স্পর্শনেই কার্য্য আরম্ভ করে। সূর্য্যশিশির সামান্যতম কিন্তু অপেক্ষাকৃত অধিকতর কাল স্থায়ী সংস্পর্শনে উত্তেজিত হয়। অতি মৃদু ভাবে ক্ষণকাল ধরিয়া স্পর্শ কর, মক্ষিকাপাশ অনুত্তেজিত থাকিবে; কিন্তু একটি বার অতি ধীরে স্পর্শ কর, পত্র তৎক্ষণাৎ মুদ্রিত হইবে। দেখা গিয়াছে, এক টুকরা চুল, যাহার দশমাংশ মাত্র সূর্য্যশিশিরকে উত্তেজিত করিয়া আকুঞ্চিত করিতে পারে, যদি ধীরে ধীরে অতি সাবধানে মক্ষিকাপাশের শুয়ার উপর সংস্থাপিত হয়, উহার পত্র মুদ্রিত হয় না। কিন্তু যদি এক ইঞ্চ পরিমিত কেশ দ্বারা একবার মাত্র স্পৃষ্ট হয়, তৎক্ষণাৎ পত্রাংশদ্বয় পরস্পরের দিকে আনত হয়। সূর্য্যশিশিরের ন্যায় মক্ষিকাপাশও বৃষ্টিধারা বা বায়ু সঞ্চালনে বা অন্য কোন কারণে বেগে আলোড়িত হইলে মুদ্রিত হয় না।

মক্ষিকাপাশ-পত্র যদিও সূর্য্যশিশির-পত্র অপেক্ষা অতি শীঘ্র মুদ্রিত হয়, তথাপি উহার পুনঃ প্রসারণ অনেক বিলম্ব সাপেক্ষ। কোন কীট পতঙ্গ না ধরিয়া, অপর কোনরূপ উত্তেজনায় বারেক মুদ্রিত হইলে, পুনঃ প্রসারিত হইতে ৩৮ ঘণ্টা লাগে। একটি ছোট গোছের পোকা লইয়া বন্ধ হইলে ৮।১০ দিবসের কম পুনরুন্মুক্ত হয় না। অনেক সময় একটি পত্র যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য সহ মুদ্রিত হইয়া আর প্রসারিত হয় না, ক্রমে শুকাইয়া যায়। সতেজ পত্র স্বদেশে দুই তিনবার মুদ্রিত ও প্রসারিত হয়, এরূপ উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ট্রিট নাম্নী জনৈক আমেরিকান প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ মহিলা বলেন, মক্ষিকা-

পাশ-পত্র তৃতীয়বার মক্ষিকা বা পতঙ্গ পরিপাক কালে পরিশ্রান্ত হইয়া মরিয়া যায়।

পত্রের উপরিভাগ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও ঈষৎ বেগুণে বর্ণের কোষ-গ্রন্থি পূর্ণ। এই কোষ-গ্রন্থিনিচয়ের পরিপাক ও শোষণ ক্ষমতা আছে। যবক্ষারজান সম্বলিত পদার্থ সহ সংস্পৃষ্ট না হইলে কোষ-গ্রন্থি রস নিঃসারণ করে না। সূর্য্যশিশির জান্তব বা অজান্তব যে কোন পদার্থ দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেই রস নিঃসরণ করিয়া থাকে। মক্ষিকাপাশ যদি কাষ্ঠ, প্রস্তর, শৈবাল বা কাগজের টুকরা সহ মুদ্রিত হইয়া পুনঃ প্রসারিত হয়, উক্ত পদার্থ শুষ্কই থাকে। কিন্তু যদি এক টুকরা মাংস শুয়াতে না ছোঁয়াইয়া পত্রের উপরেই রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে মাংসস্থ যবক্ষারজান সমক্ষে কোষ-গ্রন্থিগুলি প্রচুর পরিমাণে রস নিঃসরণ করিতে থাকে এবং পত্রের পুনঃ প্রসারণ হইতেও অনেক বিলম্ব হয়। সূর্য্য শিশিরের ন্যায়, মাংস বা কীটদেহ এই রস মধ্যে জীর্ণ হয় অর্থাৎ জলীয় অবস্থাপন্ন হয় এবং পরে উল্লিখিত কোষ-গ্রন্থি নিচয় দ্বারা শোষিত হইয়া পত্রের পোষণ কার্য্য সম্পন্ন করে। সূর্য্য-শিশির যেমন অনেক পরিমাণে মাংস পরিপাক করিতে পারে, মক্ষিকাপাশ তদ্রূপ পারে না। ইহার পরিপাক শক্তি দুই চারিটি পোকার দেহ পরিপাক করণেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়।

আলদ্রোভাণ্ডা। ইহাও ড্রসেরা পরিবার ভুক্ত। ইহা সম্পূর্ণ রূপেই জলজ। শিকড় আদৌ হয় না; স্রোত বিহীন জলে ভাসিয়া থাকে। ইহার পাতাগুলি কাণ্ড পরিবেষ্টন করিয়া এক একটী আবর্ত্তের (whorl) ন্যায় স্তবকে স্তবকে জন্মায়। (আমাদের ছবিতে সেইরূপ একটী আবর্ত্তের স্তবক দেখান হইয়াছে।) পত্রের বৃন্ত অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও কিছু বড়। পত্রগুলি মক্ষিকা-পাশের পত্রের ন্যায় দ্বিভক্ত। বৃন্তের বহিঃপ্রান্ত হইতে বিভক্ত-পত্র ও পত্র বেষ্টন করিয়া চারিটি কিম্বা ছয়টি অতি সরু সরু কাঁটার মত অংশ (process) উঠিয়া থাকে। পত্রের উপরে মধ্য শিরার (mid rib) সন্নিকটস্থ স্থান কোষ-গ্রন্থি বিশিষ্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশে পূর্ণ। পত্রাংশ দ্বয় ঈষৎ স্বচ্ছ, এবং সচরাচর ঝিনুকের দু'টী খোলার মত অর্দ্ধোন্মুক্ত থাকে। আলদ্রোভাণ্ডার পত্রকার্য্য ও গঠন, অনেকাংশে মক্ষিকাপাশের ন্যায় বলিয়া ইহাকে একপ্রকার ক্ষুদ্র "জলজ মক্ষিকাপাশ" বলিলেও হয়।

ষ্টিন্ নামক জনৈক প্রকৃতিতত্ত্ববিদ সর্ব্বপ্রথমে আলদ্রোভাণ্ডা পত্রের উত্তেজিত হইবার গুণ ও তদুদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। ইহার পরে কোন্ নামক অপর একজন প্রকৃতিতত্ত্ববেত্তা বর্দ্ধিষ্ণু আলদ্রোভাণ্ডার পত্রাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের মৃতাবশেষ দেখিয়া ষ্টিনের অনুমান সমর্থন করেন। আলদ্রোভাণ্ডা পৃথিবীর অনেক দূর ব্যাপিয়া বাস করে। কিন্তু যেখানে জন্মে, তাহার অল্প সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। কোন এক স্থানে হয় ত দুই চারিটি গাছ হইলে, তারপর দুহাজার পাঁচহাজার ক্রোশ অন্বেষণ করিলেও আর একটীও আলদ্রোভাণ্ডা খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ। ইহা অষ্ট্রেলিয়া, ইয়ুরোপ, ভারতবর্ষ প্রভৃতির স্থানে স্থানে জন্মে। সমুদয় ফ্রান্সের মধ্যে কেবল দুটি স্থানে ইহা পাওয়া যায়। আমাদের কলিকাতার দক্ষিণে কোন কোন ঝিলে এবং মাতলার সান্নিধ্যে ইহা পাওয়া গিয়া থাকে। আমরা কিন্তু এক দিবস মাতলার সমস্ত পুকুর, ডোবা ও জলযুক্ত স্থান এবং

বাদা খুঁজিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও এক-টিও আলদ্রোভাণ্ডা খুঁজিয়া পাই নাই। মাতলার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেসন বাঁশড়ার কাছে, যেখানে আগে লবণ প্রস্তুত হইত, সেখানকার বাদায় (Salt pans) বোধহয় আলদ্রোভাণ্ডা পাওয়া যাইতে পারে। কেননা যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা সল্ট-প্যানেই পাইয়াছেন বলেন। আমরা সল্ট-প্যান কোথা ঠিক না জানিয়াই নিজ মাতলা বা পোর্টক্যানিংয়ে গিয়া পড়িয়াছিলাম। বোধ হয় সেই জন্যই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয় নাই। কলিকাতার রয়াল বটা-নিকাল গার্ডেনের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ কলিকা-তার সন্নিহিত স্থান হইতে আলদ্রোভাণ্ডা সংগ্রহ করিয়া ডারউইনকে পাঠাইয়াছিলেন। আলদ্রোভাণ্ডা অতি অল্প পরিমাণে ও অল্প-স্থানে জন্মে বলিয়া ইহা উদ্ভিদ-জগতে একটী দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ।

আলদ্রোভাণ্ডা-পত্রের মধ্যশিরা ও তৎসন্নিকটস্থ প্রদেশে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষ-গ্রন্থি থাকে, সে গুলি উত্তেজনীয়তা গুণ-সম্পন্ন। ক্ষুদ্র কীটাণু, উন্মুক্ত পত্রাংশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে এই কোষ-গ্রন্থি নিচয় স্পর্শ করিলে, এক উত্তেজনা প্রভাবে পত্রাংশদ্বয় মক্ষিকা-পাশের ন্যায় মুদ্রিত হয় এবং আবদ্ধ কীট বা কীটাণু পত্রাংশদ্বয়ের পেষণে মরিয়া যায়। পরে উল্লিখিত কোষ-গ্রন্থি নিচয় হইতে প্রচুর রস নিঃসৃত হইয়া উহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলে এবং জীর্ণ অর্থাৎ দ্রবীকৃত কীট-দেহ কোষ-গ্রন্থি নিচয় দ্বারা শোষিত হইয়া আলদ্রোভাণ্ডার শরীর পোষণ করে।

সূর্য্যশিশির, মক্ষিকাপাশ ও আলদ্রো-ভাণ্ডা ব্যতীত এই বিভাগে (Order) আরো অনেকগুলি মাংসভোজী উদ্ভিদ আছে। ইহাদের সকলেরি একটু না একটু বিশেষত্বও আছে। কিন্তু ড্রসেরা বিভাগ ছাড়া অন্য দুটি তিনটি বিভাগে অনেক উদ্ভিদ পাওয়া যায়, যাহারা কতক পরিমাণে মাংসাদ এবং কীট পতঙ্গ ধরিবার জন্য অত্যাশ্চর্য্য গঠন সম্বন্ধীয় উদ্ভাবন বিকাশ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বটারওয়ার্ট পরিবারান্তর্গত পিঙ্গি-কুলা নামক এক প্রকার উদ্ভিদ পার্ব্বত্য ও জলাময় দেশে জন্মে। পত্রগুলি এক ইঞ্চ হইতে দেড় ইঞ্চ লম্বা হয়। পত্রোপরি কোষ-গ্রন্থি বিশিষ্ট কেশ বা শুয়া থাকে। কোষ-গ্রন্থি অত্যন্ত চট্‌চটে এক রকম রস নিঃসরণ করিতে পারে। এই আঠাময় রসে অনেক ছোট ছোট কীট পতঙ্গ আবদ্ধ হইয়া, পরে উক্ত উদ্ভিদের ভোজ্য হয়। ইহারও পরিপাকক্রিয়া পূর্ব্ব বর্ণিত মাংসাদ উদ্ভিদের ন্যায়। অর্থাৎ এক প্রকার অম্ল রস ও পেপসিন ফার্মেণ্ট সাহায্যে, ধৃত কীট-দেহকে দ্রবীভূত করিয়া ইহা শরীরসাৎ করে। ইহার পত্র এক বার মুদ্রিত হইয়া সূর্য্যশিশির অপেক্ষা অতি শীঘ্রই পুনরুন্মীলিত হয়। এমন কি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পত্র পুনঃপ্রসারিত হইয়া থাকে।

স্থালী-উদ্ভিদ।—ইহা পিঙ্গিকুলা পরি-বারান্তর্গত ও আট্রিকুলেরিয়া জাতি (Genus) ভুক্ত। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম আট্রিকুলেরিয়া এবং চলিত ইংরাজী নাম (Bladder-wort) অর্থাৎ "স্থালী উদ্ভিদ"। (আমাদের ছবিতে ইহার একটি গাছের খানিক অংশ এবং উহার একটি স্থালীকে অনেক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেখান হইয়াছে।) স্থালী উদ্ভিদের অনেক প্রকারের বিভিন্ন বংশ (Species) আছে। ইহারা প্রায় সকলেই

পচা, বদ্ধ অগভীর জলাশয়ে ও আবর্জ্জনা পূর্ণ খানাখন্দের মধ্যে জন্মে। আমাদের দেশে ইহা অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমরা কলিকাতার সান্নিধ্য হইতে মাতলা, হুগলী, মগরা, বর্দ্ধমান, মধুপুর প্রভৃতি নানা স্থানে পচা পুষ্করিণী, নর্দ্দমা ও খানা খন্দের মধ্যে ইহাকে দেখিয়াছি। যেখানে হয়, সেখানে ইহা প্রচুর পরিমাণে পানা ও ঝাঁজির দামের মত জলাশয়কে পূর্ণ করিয়া রাখে। ইহাদের পত্র পালকের মত সরু সরু এবং ক্রমাগত দ্বিভক্ত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। (চিত্র দেখুন।) বিভক্ত পত্রের গায়ে বা মূলদেশে দুটি তিনটি এবং কোন কোন জাতীয় স্থালী উদ্ভিদে (আমরা এদেশে যেরূপ দেখিয়াছি) অসংখ্য পরিমাণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল ও ঈষৎ স্বচ্ছ স্থালী ছোট ছোট বৃন্ত সহ সংলগ্ন থাকে। আমরা যখন প্রথম একটা পচা পুকুর হইতে স্থালী উদ্ভিদের একটা গাছ তুলিয়া দেখি, তখন মনে হইয়াছিল যে, এই স্থালীগুলি ছোট ছোট গেঁড়ি শাবক; বাস্তবিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেঁড়ি শাবকের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য এত যে, আমরা অনেকক্ষণ ধরিয়া ছোট লেন্স দিয়া দেখিবার পর বুঝিয়াছিলাম যে এগুলি গেঁড়ি শাবক নহে। অবশ্য তখনও আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, ঐ ক্ষুদ্র স্থালীগুলি, উহাদের অপেক্ষা আরো ক্ষুদ্রতর কীটগণের, অতি ভীষণ জীবন্ত সমাধি-মন্দির। বড় অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে স্থালীগুলির প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলাম।

লোকে পূর্ব্বে মনে করিত, এই স্থালীগুলিই বয়ার ন্যায় সমস্ত গাছটিকে জলের উপর ভাসাইয়া রাখে। কিন্তু স্থালীর কার্য্য প্রকৃত, তাহা নহে। সহজ দৃষ্টিতে মনে হয়, যেন স্থালীটি আগাগোড়া মোড়া; উহার মধ্যে প্রবেশের কোন পথ নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে স্থালীর কোন একদিকে কতক গুলি সরু সরু শুয়া রহিয়াছে। এই দিকেই স্থালীর মুখ। এখানে একটি অতি সূক্ষ্ম ত্বক্ দ্বারস্বরূপ স্থালীর মুখদেশকে বন্ধ করিয়া রাখে। এই দ্বার বা ভ্যালভ্ এম্নি কৌশলে স্থাপিত যে, ভিতর হইতে কোন মতেই খোলা যায় না, কিন্তু অনায়াসেই বাহির হইতে ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করা যায়। ইঁদুর ধরিবার খাঁচা কলের দ্বার দেখিয়া অনেক পরিমাণে ভ্যাল্ভের কার্য্য বোঝা যাইতে পারে। এই ভ্যালভ্ স্থিতি-স্থাপক ধর্ম্মী। ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় সহজেই নুইয়া দ্বার অবারিত করিয়া দেয়, কিন্তু পরে আপনাআপনিই স্প্রিংয়ের দ্বারের ন্যায় বদ্ধ হইয়া যায়। এই ভ্যালভের উপরে এক যোড়া করিয়া দু যোড়া—চারিটি, এবং উহার যে অংশ ঠেলিয়া ভিতরে যাইতে হয়, সেই দিকে স্থালীতে সংলগ্ন অনেকগুলি সূচল শুয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, এই শুয়াগুলি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের ন্যায় ভ্যালভ্ পথ রক্ষা করে। চিংড়িমাছের জাতীয় এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু (ইহাদিগকে ইংরাজীতে Cypris বলে) সচরাচর এই স্থালীতে আবদ্ধ হয়। পোকার মধ্যে মশার পোকা (Larvae) ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। আমরা অনেক স্থালীর মধ্যে জীবন্ত সাইপ্রিস বদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে চারি দিকে ছুটিতেছে ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অনেক স্থালীতে সাইপ্রিসের ঝিনুকের ন্যায় কঠিন আবরণ পড়িয়া রহিয়াছে, সহজ চক্ষেও দেখা যায়। ডারউইন এক একটি স্থালীতে দশটি সাইপ্রিসের খোলা

পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন। আমরা পাঁচটি ছয়টির খোলা পর্য্যন্ত দেখিয়াছি।

স্থালীর ভ্যালভের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে উক্ত চিংড়িমাছের জাতীয় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুগুলি ভ্যালভ্ ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। বহির্গমনের কোন পথ না পাইয়া অবশেষে অম্লজান অভাবে স্থালী মধ্যে মরিয়া যায়। স্থালী সাধারণতঃ জলে পূর্ণ থাকে, কখন বা এক এক বিন্দু বুদ্বুদও ইহার মধ্যে দেখা যায়। এই জলে নিমজ্জিত সাইপ্রিস দেহ পচিতে থাকে। স্থালীর গাত্রে ও ভ্যালভে যে নানা কোষ-গ্রন্থি থাকে, তাহাদের শোষণ ক্ষমতা আছে। এই কোষ-গ্রন্থি গুলিই পচিত জান্তব পদার্থ শোষণ করিয়া উদ্ভিদের পরিপোষণ করে।

স্থালী-উদ্ভিদ সূর্য্যশিশির বা মক্ষিকা পাশের ন্যায় জান্তব পদার্থ পরিপাক করিতে পারে না। কিন্তু উহা পচিলে তাহা শোষণ করিয়া আপনার পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এই জন্য ইহা অনেকটা পচন-ভোজী (Putrivorous); কিন্তু তাহা হইলেও, তাহাতে ইহার মাংসাদ আখ্যার কিছুই অসঙ্গততা দেখা যায় না। কারণ পরিপাক করিতে না পারিলেও ইহা পচিত জান্তব পদার্থ হইতেই আপন কোষগ্রন্থি দ্বারা আহার্য্য শোষণ করিয়া থাকে।

ঘট-উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম নেপেন্থেস, ইংরাজী চলিত নাম Pitcher plants "ঘট-উদ্ভিদ"। আমরা আমাদের চিত্রে ইহার ছবি দিই নাই। কারণ, ইহার জীবন্ত নমুনা কোম্পানীর বাগানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সিংগাপুর, পিনাং ও অষ্ট্রেলিয়ায় সচরাচর পাওয়া যায়। ঘট-উদ্ভিদের পত্রের ডগা হইতে একটি করিয়া ঘট ঝুলিয়া থাকে। প্রত্যেক ঘটের একটি করিয়া ঢাকনি থাকে এবং উহা ঘটের মুখদেশে কব্জার মত কৌশলে আবদ্ধ থাকে। সকল ঘটের মধু নিঃসরণকারী কোষ-গ্রন্থি থাকে না। যাহার থাকে, তাহার দ্বারপথ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় না; আর যার সুগন্ধ মধু না থাকে, তার দ্বারপথ সম্পূর্ণরূপেই খুলিয়া থাকে। মধু নিঃসরণকারী কোষ-গ্রন্থিগুলি সাধারণতঃ ঘটের মুখের কাছেই থাকে। ঘটের মুখ হইতে অভ্যন্তর দেশের গাত্রের খানিকটা চতুর্দ্দিকে সরু সরু নিম্নমুখী কেশে পূর্ণ থাকে। কেশগুলি অতি মসৃণ ও নিম্নমুখী হওয়াতে উহাদের উপর দিয়া ঘটের ভিতরে যাইবার পথ বিলক্ষণই পিচ্ছিল হয়। কিন্তু ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার কালে নিম্নমুখী কেশগুলি বড়ই অসুবিধা জনক হয়। এই কেশময় অংশের পরই ঘটাভ্যন্তর নির্ম্মল বারিতে পূর্ণ থাকে। এই অংশে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষ-গ্রন্থি সকল বিদ্যমান থাকে এবং ইহারাই প্রচুর পরিমাণে রস নিঃসরণ করে। এই জলরাশিতে নিমজ্জিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গগণ মরিয়া যায়।

মধু লোভেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, ক্ষুদ্র কীটগণ ঘটের মুখদেশে আকৃষ্ট হয়। যে দুর্ভাগ্য কীট মুখদেশ অতিক্রম করিয়া একবার নিম্নমুখী কেশময় পথে বিচরণ করিতে সাহসী হয়, ঘটস্থ সঞ্চিত জল মধ্যে তার নিমজ্জন অবশ্যম্ভাবী। কীট জল মধ্যে নিমজ্জিত হইলেই ঘটের কোষ-গ্রন্থি সকল কীটদেহস্থ জান্তব পদার্থ সংস্পর্শনে রস নিঃসরণ করিতে থাকে। ঘটের এই রস অম্লাক্ত। এখানেও পেপসিন ফার্মেণ্ট জন্মে। অম্লরস ও পেপসিন সহযোগে কীট-দেহ দ্রবীভূত হয় এবং পরে কোষ-গ্রন্থি নিচয় দ্বারা শোষিত হইয়া ঘট-উদ্ভিদের শরীর

পোষণ করিয়া থাকে। সূর্য্যশিশিরও মক্ষিকা-পাশের ন্যায় ঘট-উদ্ভিদ প্রকৃত পক্ষেই মাংসাশী।

ভেরী। ইহার ইংরাজী নাম (Sarracenia) সারাসেনিয়া। ইহা সচরাচর উত্তর আমেরিকায় পাওয়া যায়। ইহা জলা ভূমি-তেই উৎপন্ন হয়। ঘট-উদ্ভিদের সহিত সারা-সেনিয়ার সম্পর্ক অতি নিকট। ইহাকে ঘট-উদ্ভিদের এক উপবংশ (Variety) বলিলে অন্যায় বলা হয় না। ইহার কতকগুলি পত্র মুড়িয়া ভেরীর ন্যায় এক চমৎকার আকার ধারণ করে। এই ভেরীগুলি-৩।৪ ইঞ্চ গভীর, এক ইঞ্চ দেড় ইঞ্চ প্রশস্ত হইয়া থাকে। ঘট-উদ্ভিদের ন্যায়, ইহারও একটী করিয়া ঢাকনি থাকে। এই ঢাকনি নিয়মিত সময়ে উন্মুক্ত বা বন্ধ হয়। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে ঢাকনি খুলিয়া যায়, নিশাগমে পুনরায় বন্ধ হয়। সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে ভেরী স্ফটিক বারিতে পূর্ণ হয় এবং তখন মুখাবরণটি আবদ্ধ থাকে। দিবসের উত্তাপে উন্মুক্ত ভেরীর সুনির্ম্মল বারির প্রায় অর্দ্ধাংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, কিন্তু রাত্রির মধ্যে ভেরী পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণ হইয়া পড়ে। এই-রূপ প্রণালীতে ভেরীর দৈনন্দিন কার্য্য চলিতে থাকে।

পূর্ব্বে অনেকে মনে করিতেন, তৃষাতুর পক্ষী পতঙ্গমের জন্য বিধাতা সারাসেনিয়ার ভেরীর মধ্যে সুনির্ম্মল পানীয় সঞ্চিত রাখিয়া-ছেন। স্মরণীয় লিনিয়স, যাঁহা হইতে উদ্ভিদ শাস্ত্রের প্রকৃত সূচনা হইয়াছে, সেই তীক্ষ্ণ-দর্শী লিনিয়সও এই প্রবাদে ভুলিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত পেলী প্রকৃতি মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও সংকল্প দেখাইতে গিয়া তাঁহার Natural Theology গ্রন্থে ঘট-উদ্ভিদের জল সঞ্চয়ের কথা উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই বর্ত্তমানে সেরূপ ভ্রম সঙ্কুল প্রবাদ ও মতবাদ কেহই আর বিশ্বাস করিবেন না। সারাসেনিয়ার এই সঞ্চিত রস জীবন-প্রদায়ী সুশীতল পানীয় নহে। প্রত্যুত ইহা এরূপ তীক্ষ্ণ যে অর্দ্ধমিনিট নিমজ্জিত থাকিলে কীট পতঙ্গমেরা মৃতকল্প হইয়া পড়ে।

উড্ডয়নশীল ছোট ছোট পোকা ভিন্ন পক্ষবিহীন কীটেরাও সারাসেনিয়ার পানীয় লোভে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে দেখা যায়, সারাসেনিয়ার পত্র পিপীলিকা ও পিপীলিকা-ধেনু (Aphides) দ্বারা আচ্ছা-দিত থাকে। ইহারা রস পান করিয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না। কীটেরা ভেরীর জল পান করিলে মাতালের মত সংজ্ঞাবিহীন হইয়া পড়ে। চারিটি ছয়টি পা থাকিলেও মত্তাবস্থায় দ্বিপদ মনুষ্যের ন্যায় ইহাদেরও পায়ের ঠিক থাকে না; টলিয়া ভেরী মধ্যে নিপতিত হয়। কেহ কেহ রস-বিজড়িত পক্ষ ছাড়াইবার জন্য চরণ উত্তোলন করিতে গিয়া সাম্য হারায়, আর তৎসঙ্গে উল্টাইয়া ভেরী মধ্যে চিরজীবনের জন্য নিমগ্ন হয়। রমণী ট্রিট একদা একটা তৈলপায়ীকে একটা নূতন ভেরীর টাট্‌কা রস পানকরিতে দেখিয়া ছিলেন। দুর্ভাগ্য তৈলপায়ী লোভান্ধ হইয়া কোন প্রকারে ভেরী মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আর বাহির হইতে পারে নাই। পরদিবস প্রাতঃকালে ভেরী কাটিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তৈলপায়ীর আপাদ-মস্তক অভ্যন্তর দেশ হইতে নিঃসৃত একপ্রকার রস দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। আর্স-লাটি তখনও জীবিত, কেবল পা গুলি খসিয়া গিয়াছে। সারাসেনিয়ার পরিপাক প্রণালী ঘটউদ্ভিদের ন্যায়। পরিপাকের সময় ও পরে,

সারাসেনিয়ার পত্র হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু ধৃত কীট পতঙ্গের সংখ্যা অল্প হইলে দুর্গন্ধ বড় অধিক হয় না।

জনৈক লেখক এই 'ঘট' ও 'ভেরী'র কথা বলিতে বলিতে বলিয়াছেন —

The Pitcher plant dies if it eats excess of animal food, but is the least fastidious and most carnivorous of all carnivorous plants. Flies, beetles, cockroaches disappear in three or four days leaving wings etc.,

ইহার অর্থ এই—

ঘট-উদ্ভিদ অধিক পরিমাণে মাংস খাইলে মরিয়া যায়। অন্যান্য মাংসভোজী উদ্ভিদের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মাংসখোর। আর মাংস সম্বন্ধে ইহার কোন বাছ বিচার নাই। মক্ষিকা, গুবরেপোকা, আর্সলা ইহার মধ্যে পড়িলে দুই তিন দিবসের মধ্যেই ডানা পালকগুলি রাখিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়!!

এই প্রবন্ধ মধ্যে যে যে মাংসাদ উদ্ভিদের উল্লেখ করা হইল, অনুল্লিখিতগুলির তুলনায় উহারা অতি সামান্য। উদ্ভিদরাজ্যে অনেক গাছ গাছড়া মাংসাদধর্ম্মী। বলা বাহুল্য এখনও আবিষ্কার করিবার অনেক অবশিষ্ট আছে। মাংসাদধর্ম্মী উদ্ভিদের পত্রের সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা, উহার শুয়ার উত্তেজনীয়তা, কীট পতঙ্গ ধরিবার নিমিত্ত নানাবিধ ফন্দী ও গঠনগত বিচিত্র উদ্ভাবন এবং সর্ব্বাপেক্ষা জন্তুদিগের ন্যায় জান্তব পদার্থ পরিপাক করিয়া যবক্ষারজান সংগ্রহ করণ— উদ্ভিদ রাজ্যে অতীব বিস্ময়কর ও রহস্য পূর্ণ ব্যাপার। সাধারণতঃ উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতেই প্রয়োজন মত যবক্ষারজান সংগ্রহ করিয়া থাকে। বায়ুরাশি মধ্যে যবক্ষারজান বাষ্প প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও, এরূপ বিমুক্ত যবক্ষারজান গ্রহণ করিতে উদ্ভিজ্জ সকল নিতান্ত অক্ষম। মৃত্তিকার সহিত যে যবক্ষারজান নানাপ্রকারে মিশ্রিত থাকে, তাহাই শিকড় দ্বারা জলীয় রস সাহায্যে শোষণ করিয়া, তরুলতা আপনাদের আবশ্যক পূরণ করিয়া লয়। মাংসভোজী উদ্ভিদ সে সাধারণ পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, জন্তুদিগের ন্যায় সাক্ষাৎভাবে জান্তব পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া, সন্নিহিত যবক্ষারজান অংশ সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব জীবন ধারণ করে। উদ্ভিদের ঈদৃশ ক্ষমতা অথবা জন্তুর সহিত উদ্ভিদের এই সাদৃশ্য নিতান্তই বিস্ময়কর।

আমরা সচরাচর উদ্ভিদ ও জন্তুর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।

১: খাদ্য ও খাদ্য পরিপাক প্রণালী।

২: গতি শীলতা।

৩: জনন ক্রিয়া।

৪: বোধশক্তি।

আমরা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে মাংসাদ উদ্ভিদতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে প্রথম পার্থক্যটি টিকিল না। কারণ, আমরা জানিলাম যে, অনেক না হইলেও কতকগুলি উদ্ভিদ ঠিক জন্তুদিগের ন্যায় জান্তব পদার্থ পরিপাক করিয়াই আপনাদের পুষ্টিসাধন করে। কেবল তাহাই নয়। আমরা দেখাইতে পারি, এমনও আবার কতকগুলি জন্তু আছে, যাহারা উদ্ভিদের ন্যায় খাদ্য সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা অলবণাক্ত জলজাত স্পঞ্জের (Fresh water sponge বা Spongilla) কথা উল্লেখ করিতে পারি।

গতিশীলতার মঞ্চে দাঁড়াইয়াও আমরা উদ্ভিদ ও জন্তুর মধ্যে পার্থক্য পরিজ্ঞাপক কোন রেখা টানিতে পারি না। বড় বড়

বৃক্ষলতা গতিশীল নয় বটে, কিন্তু এমন সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জ আছে, যাহারা জন্তুর ন্যায় সম্পূর্ণরূপেই গতিশীল। দৃষ্টান্তঃ—ভলভক্স,প্যাণ্ডোরাইনা,প্রটোককস ইত্যাদি। আমরা এস্থলে অনেক উদ্ভিজ কোষের গতি-শীলতার কথা ইচ্ছা করিয়াই উল্লেখ করিলাম না। আবার এমনও অনেক জন্তু আছে, যাহারা বৃক্ষলতার ন্যায় স্থিতিশীল ও গতি-হীন। যেমন স্পঞ্জ,পলিপ্স,প্রবাল ইত্যাদি।

জনন ক্রিয়া সম্বন্ধে আপাততঃ মনে হয়, উদ্ভিদ ও জন্তু স্বতন্ত্র। কিন্তু অনেক প্রাচীন কাল হইতেই জানা আছে যে, মূলতঃ দুইটুকু প্রোটোপ্লাজমের সংমিশ্রণ বই জনন-রহস্য আর কিছুই নহে। এই সংমিশ্রণ প্রণালী উদ্ভিদ ও জন্তু মধ্যে সম্পূর্ণরূপেই একরূপ। সুতরাং এ বিভিন্নতাও কোন কাযের নয়।

বোধশক্তি। সাধারণতঃ ইহা একটি বিশেষ পার্থক্য বলিয়া সকলেই মনে করেন। কিন্তু ইহাও বালির বাঁধের ন্যায় গভীর গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভারে ভাঙ্গিয়া যায়। আমরা মনে করি সকল জন্তুই বোধ-শক্তি বিশিষ্ট। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান স্পষ্টা-ক্ষরে দেখাইয়া দেন, সহস্র সহস্র, কোটি কোটি, অগণ্য এমন কত নিকৃষ্ট জন্তু আছে, যাহারা সম্পূর্ণরূপেই বোধশক্তি বিহীন। অথবা যদি ইহাদের বোধশক্তি আরোপ করা যায়, তাহা হইলে এমন অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর উদ্ভিদ আছে,যাহাদের উপর বোধশক্তি আরোপ না করিয়া থাকিবার নয়। সুতরাং বোধ-শক্তির একটা পার্থক্যও সমগ্র উদ্ভিদ ও সমগ্র জন্তু মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়কে স্বতন্ত্র করিতে পারে না।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, উদ্ভিদ ও জন্তু মধ্যে কোন বিষয়েতেই একটা বিশেষ পার্থক্য নাই, কোন বিশেষ কারণ দর্শাইয়া কেশাপেক্ষাও সূক্ষ্মতর রেখার সম্পাতে এত-দুভয়কে স্বতন্ত্র করা যায় না। আমরা অগত্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, উদ্ভিদ ও জন্তু, জীবনরূপী এক মহাকাণ্ডের দুই মহাশাখা মাত্র। জন্তু-জগতের শ্রেষ্ঠ-বিকাশ মনুষ্য এবং উদ্ভিদ-জগতের শ্রেষ্ঠ-বিকাশ এক বিশালায়তন বনস্পতি, যদিও পরস্পর হইতে অনেক স্বতন্ত্র, তথাপি মূলে এক। উক্ত দুই মহাশাখার শীর্ষদেশ হইতে যতই কাণ্ডাভি-মুখে অবতরণ করা যায়, ততই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় যে, উদ্ভিদ ও জন্তু এই দুইয়ের উৎপত্তি স্থান, দুইয়ের মূল এক, দুইই এক। যে মৌলিক উপা-দানে জন্তুশরীর পরিগঠিত, সেই মৌলিক উপাদানেই উদ্ভিদ শরীর পরিগঠিত। সেই একই প্রোটোপ্লাজম—যাহা অঙ্গার, যবক্ষার-জান, অম্লজান,উদজান,গন্ধক ও ফসফরাসের সমষ্টি—জন্তুশরীর ও উদ্ভিদ শরীর গঠনের মূলভিত্তি। সুতরাং উদ্ভিদ ও জন্তুর মধ্যে যে এক কাল্পনিক প্রাচীরস্থাপন করিয়া উহা-দিগকে স্বতন্ত্র করিতে যাই, সে প্রাচীর অরু-ণোদয়ে কুজ্ঝটিকা জালের ন্যায় বিজ্ঞানের সমুজ্জ্বল আলোক সম্মুখে অদৃশ্য হইয়া যায়, এবং এক অতি সুন্দর, বিস্ময়কর ও সুগভীর একত্বের দৃশ্যপট স্বতঃউন্মুক্ত হইয়া মানব-জ্ঞানকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিয়া ফেলে। জড় উদ্ভিদ জন্তু ; চেতন অচেতন ; মনুষ্য পশু পক্ষী তরু লতা গুল্ম ; সূর্য্য চন্দ্র তারকা ; গিরি নদী সাগর ;—সকলি মূলতঃ এক, সকলেই সেই এক মৌলিক উপাদান নিহিত। আমরা মাংসাদ উদ্ভিদতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে যখন কঠোর বিজ্ঞান চর্চ্চা হইতে, দার্শনিকভাবে, চিন্তা পথে, স্থান কালের ব্যবধান অতিক্রম

করিয়া, বিশ্ব রহস্যের মূলদেশাভিমুখে অগ্রসর হই, তখনি এই এক সার্ব্বভৌমিক মহাতথ্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই এবং ইহা এতই অনিবার্য্যবেগে ও অসংশয়িতরূপে আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হয় যে, চিরাগত মত ও বিশ্বাসের বিরোধী হইলেও স্থির অবিচলিত মহান্ সত্যের দিকে দৃষ্টি করিলে ইহা না মানিয়া কোন সুধীজন স্থির হইতে পারেন না।

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

খ্রীষ্টের জন্মকাল এবং খ্রীষ্টীয় শক।

খ্রীষ্টীয় শক এবং খ্রীষ্টের জন্মকাল বহু বিতণ্ডার বিষয় হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ বিষয়ে যতই গবেষণা করা যায়, ততই খ্রীষ্টীয় শক অথবা খ্রীষ্টের জন্মকাল নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব বিবেচনা হয়। মহাবিজ্ঞ বর্ষীয়ান্, ইহাদের ঐকমত্য সংস্থাপনার্থ ঐকান্তিক যত্ন এবং ঐকাগ্র্য স্বীকার করিয়া হতাশ হইয়াছেন; সুতরাং খ্রীষ্টীয় শক গণনায় খ্রীষ্টের জন্মকাল অবধারণ করা ঠিক নহে।

বিখ্যাত ঘটনাসূত্রে শক গণনারম্ভ হইয়া থাকে। সংবৎ,শকাব্দা,ওলিম্পিয়ড্, হেজিরা, রোমনির্ম্মাণ প্রভৃতি অব্দ প্রসিদ্ধ ঘটনাসূত্রে আরব্ধ হইয়াছিল; খ্রীষ্টীয় শক খ্রীষ্টের জন্মসূত্রে আরম্ভ হইয়াছিল, আপনি এ কথা বলিতে পারেন না। কোন্ সময়ে, কিরূপে কাহা কর্ত্তৃক খ্রীষ্টের জন্মাব্দ প্রচারিত হইয়াছিল, ইহার চিন্তা করা আবশ্যক; বস্তুতঃ খ্রীষ্টের জন্ম দিনে, জন্ম পক্ষে, জন্ম মাসে অথবা জন্ম বৎসরে খ্রীষ্টীয় শক গণনার উপক্রম হয় নাই। যিশু খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ৫৩২ বৎসর পরে ইতালিতে দাওনিসিয়স্ নামে এক খ্রীষ্টীয় যাজক খ্রীষ্টীয় শকের প্রচার আরম্ভ করেন; দাওনিসিয়স্ একৃসিগুয়স্ খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের যে কাল অবধারিত করেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ; ফরাসী খ্রীষ্টোপাসকেরা উক্ত ভ্রমাত্মক শক খ্রীষ্ট জন্মের ৮০০ আট শত বৎসর পরে স্বদেশে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তদ্দর্শনে স্পেনবাসিগণ খ্রীষ্ট জন্মের ১৪০০ শত এবং পোর্টুগালের খ্রীষ্টোপাসকেরা ১৫০৪ শত বৎসর পরে প্রচার করেন। পরে সমস্ত খ্রীষ্টোপাসক মণ্ডলীতে ভ্রমাবহ খ্রীষ্টাব্দ প্রচারিত হইয়াছিল। তীব্র সমালোচনা নাই,সুতরাং ইহার সম্বন্ধে লোকের বাঙ্নিষ্পত্তি হয় না। ভ্রমের অন্ধকারে ভ্রম বিশ্বময় হইতেছে। সচরাচর আমরা বলিয়া থাকি, খ্রীষ্ট অমুক সালে জন্মিয়াছেন, প্রত্যুত যিশু কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা আদৌ জানি না।

"Christian era is usually supposed to begin with the year of the birth of Christ, but there are various opinions with regard to the year in which that event took place."
Britanica.

খ্রীষ্টের জন্ম হইল আশিয়ায়,খ্রীষ্টীয় শকের আরম্ভ হইল ইউরোপে, খ্রীষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দ পরে। আবার ইউরোপীয়েরা চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দ পরে স্বদেশে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, খ্রীষ্টীয় শক খ্রীষ্ট জন্মের বহু পরবর্ত্তী। পঞ্চদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দে ইউরোপের কোন কোন দেশে খ্রীষ্টীয় শকের আদৌ ব্যবহার ছিল না,

ইদানীং খ্রীষ্টীয় শক ইউরোপে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।

জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, প্রাচীন খ্রীষ্টীয় সমাজ কিরূপে খ্রীষ্টের জন্মকাল অবধারিত করিয়াছিলেন? এস্থলে বলা বাহুল্য যে, পৌত্তলিকদিগের ক্রিয়াকলাপ সংযুক্ত শক আদি খ্রীষ্টোপাসকগণ অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া ইহুদী শাস্ত্র সম্মত গণনার অনুবর্ত্তী হন। কারণ উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট অব্দ গণনার রীতি ছিল না।

"The Jews had no general era properly so called." Britanica.

কিন্তু ইহুদী শাস্ত্রীয় গণনা খ্রীষ্টীয় শক নিরূপণ বিষয়ে যথোপযুক্ত হইতে পারে না। ওল্ড টেষ্টমেণ্টের সৃষ্টিকাল সম্বন্ধীয় গণনা অতিশয় ভ্রান্তিমূলক বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"In the system of chronology generally adopted, the date of the creation of the world is fixed at 4004 B. C.; but this is uncertain, and many different dates have been assigned to this event: thus according to the Septuagint it took place in the year 5872 B. C.; according to the Julian period, 4710 B. C.; and according to the mode of reckoning used by the Jews 3761 B. C." * Beeton's Dict.

ইহুদী শাস্ত্রীয় গণনা যে কিরূপ অকিঞ্চিৎকর, উপরোক্ত লিপি দৃষ্টে অনুভূত হইতে পারে। খ্রীষ্টোপাসকেরা উক্ত শাস্ত্রীয় অবলম্বনে খ্রীষ্টের জন্মকাল স্থির করিয়াছিলেন। ইহাতে খ্রীষ্টের জন্মকাল কতদূর প্রামাণ্য হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞ লোকেই বুঝিতে পারিবেন।

Chronology of sacred History নামক গ্রন্থের ভূমিকায় দে ভেগ্নোল সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে, সৃষ্টি সম্বন্ধীয় দুইশত প্রকার গণনা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সৃষ্টি অবধি খ্রীষ্টের জন্ম পর্য্যন্ত ন্যূন কল্প গণনায় ৩৪৮৩ বর্ষ অতীত, এবং সুদীর্ঘ কল্পে ৬৯৮৩ বৎসর গত হইয়াছে। সৃষ্টিকাল গণনা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যবাসীদের কিরূপ বোধ বিকশিত হইয়াছিল, পাঠকগণ বিবেচনা করুন। এই জন্য একজন সহৃদয় লেখক বলিয়াছেন,—

"From computation founded on loose and conflicting date, it would be vain to look for knowledge or even for concord of opinion. From the very nature of the case discussion is hopeless labour. The subject is one to which the saying "*quod homenes tot sentintioe* (নানা মুনির নানা মত) applies with almost literal truth."

এক্ষণে সপ্রমাণ হইতেছে যে, আদি খ্রীষ্টীয় সমাজ ইহুদীয় শাস্ত্র মতের গণনার অনুগামী হইয়া ঘোর বিপাকে নিপতিত হইয়াছিলেন, কালদীয় দেশের সৌর অব্দ, গ্রীসের ওলি-

* The chronological elements on which both Jews and Christians founded their computations for determining this period were derived from the Old Testament-narratives which have been transmitted to us though three distinct channels. There are the Hebrew text of the Scriptures, the Samaritan text and the Greek version known as the Septuagint, in respect of chronology the three accounts are totally irriconcilable with other and no conclusive reason can be given for prefering any one of hem to another. We have no concurrent testimony with which to compare them nor is it even known which of them was regarded as the most probable by the Jews themselves when the books of the Old Testament were revised and transcribed by Ezra. The ordinary rules of probabi lity cannot be applied to a state of things in which the duration of human life is represented as extending to nearlya thousand years.

Britanica.

স্পিয়ড্ অব্দ এবং রোমের ইণ্ডিক্সন অব্দের অনুগামী হইলে খ্রীষ্টীয় শক এত অন্ধকারময় হইত না। প্রাচীন ইতিবৃত্ত অন্ধকারাবৃত,কাল নিরূপণের জন্য যে শকের আড়ম্বর করা হইয়াছে, তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই বলিয়াছেন।

"The history of the early ages of the world is involved in almost impenetrable obscurity, and chronology, comparatively speaking is only of recent origin."
Britanica.

রোম ধ্বংসাবধি আমেরিকা আবিষ্কার পর্য্যন্ত কালকে পাশ্চাত্য লোকেরা মধ্য সময় বলেন, উক্ত সময়ে কাল গণনা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক।

"In the chronicles of the Middle Ages much uncertainty frequently arises respecting dates." Britanica.

প্রাচীন খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর পঞ্জিকার গণনা ভ্রান্তিমূলক।

"The ancient church calendar was founded on two suppositions both erroneous." Britanica.

বাইবেলে এবং যোষেফসের লিপি মধ্যে ঘোর বিসম্বাদ ঘটিয়াছে। বাইবেলে উক্ত আছে,হেরোদ রাজার রাজত্ব কালে কুরিনীয় সুরিয়া দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু যোষেফস্ তাহার বিপরীত কথা বলিয়াছেন।

"During the last years of Herod Sentius Saturninus and after him Quintilius Varus were governors of Syria. And it was not till long after the death of Herod that Quirinus undertook a census of Judea we know certainly from Josephus."*

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* Antique. 18, 1, 1.

বঙ্গের আদিকবি শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস ঠাকুর। (২)

সাধুগণ কখন কাহারও দোষ গ্রহণ করেন না। চণ্ডীদাস সেই কালে প্রসন্নবদনে সকলের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া তুষ্ট করেন ও বহু প্রকার শিক্ষা দেন। চণ্ডীদাসের গুণে সেই কালে সকলে বাধ্য হইয়া সেই দিন হইতে অনেকেই শ্রীচণ্ডীদাসের নিকট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চতুরাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শিষ্য ও বৈষ্ণব হন।

পূর্ব্বে যাঁহারা গণতা করিয়া চণ্ডীদাসের কীর্ত্তন রহিত করিবার বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিল, শেষে গ্রামের কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ, কি ভদ্র, কি ইতর সকলেই সেই কীর্ত্তন গানে অর্থাৎ ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের সেই অলৌকিক ঘটনা শেষে দেশবিদেশে রাষ্ট্র হয়। সেই কালে সাধারণ কর্ত্তৃক ইহাই রটনা হইয়াছিল,—

"রামী সত্য প্রাণপ্রিয়া হোল।
নিশ্চয় সাধন গুরু, সেহ রসের কল্পতরু
তাই ছলে চণ্ডীদাস মোল॥"

রামমণির সহিত যে চণ্ডীদাসের কোন গুপ্ত প্রণয় ছিল না, ঐ পদে তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত আছে। মহাত্মা চণ্ডীদাস সঙ্গীতোপযোগী সাধনতত্ত্ব ও নির্য্যাসতত্ত্ব চৌষট্টি রস পরিপূর্ণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলার পদপদাবলীরচনা ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা প্রকাশ নাই। কেবল নানা ছন্দোবন্ধে গদ্য পদ্য লিখিয়াছিলেন। ফলতঃ সেকালের গদ্য একালের মত নহে; চণ্ডীদাসের কৃত যে ছন্দের প্রথম চরণের সহিত দ্বিতীয় ছন্দের মিল নাই অর্থাৎ ছন্দভঙ্গ তাহারই নাম গদ্য।

আর যে ছন্দের প্রথম চরণাবধি শেষ পর্য্যন্ত মিল আছে, অথচ যতি পতন দোষ নাই, তাহারই নাম পদ্য।

চণ্ডীদাসের সমকালীন কবি বিদ্যাপতি ঠাকুরও গদ্য পদ্যময় গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, এইজন্য প্রাচীন কবি, বৈষ্ণবদাস, উভয় কবি সম্বন্ধে এই মত লিখিয়াছেন ;—

"জয় জয়দেব কবি, নৃপতি শিরোমণি,বিদ্যাপতি রসধাম
জয় জয় চণ্ডীদাস, রসশেখর, অখিল ভুবন অনুপাম ॥
যা'কর রচিত, মধুর রস নিরমল, গদ্য পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র, আস্বাদিলা,রায় স্বরূপ সহিত ॥"

মহাত্মা চণ্ডীদাস, ভক্তিরসে বিভোর হইয়া উদ্ভাবন শক্তিতে যে কত শত পদ প্রকাশ করিয়াছিলেন,তা কে বলিতে সক্ষম? তাহার সংখ্যা নাই। পূর্ব্বে একজন সহজ সম্প্রদায়ের নেতা বিবর্ত্ত-বিলাস নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,মহাত্মা চণ্ডীদাস জীবিতকালে লক্ষ পদ রচনা করিয়াছিলেন। কবিদিগের তুণ্ডে যখন সরস্বতীর অধিষ্ঠান, তখন সেকথা বড় বিচিত্র নহে।

মহাভারতে ব্যক্ত আছে, দেবগণের মধ্যে অদ্বিতীয় লেখক গণপতি গণরাজের সাহায্যে ভগবান বেদব্যাস এমন ভাবে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন যে, নিমেষ কালের জন্য গণপতিকে কলম বিশ্রাম করিতে দিতেন না, অনর্গল কবিতা প্রকাশ করিতেন, আর গণপতি লিখিতেন। বড়ই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে, চণ্ডীদাসের রচনাকালে যদি কেহ লেখার সাহায্য করিতেন বা লিখিয়া রাখিতেন, ভাবনা কি ছিল? লেখা নাই বলিয়া পদের অভাব হইয়াছে। যাহা কিছু লোকে অভ্যাস করিয়াছিলেন,অর্থাৎ লোকের শিক্ষা ও অভ্যাস ছিল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ অতীব কষ্টে স্বষ্টে তাহাই সংগ্রহ বা উদ্ধার করিয়া অতি প্রাচীন পদসমুদ্র নামা প্রকাণ্ড গ্রন্থ অর্থাৎ যাহার ভিতর পূর্ব্ব পূর্ব্ব যাবতীয় মহাজনকৃত কিছু কম পঞ্চদশসহস্রের অধিক পদ আছে, সেই গ্রন্থের মধ্যে মহাত্মা চণ্ডীদাস কৃত পাঁচ শতের অধিক পদ বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়।

মহাত্মা চণ্ডীদাসের উপনাম বড়ু। বড়ু শব্দের প্রকৃত অর্থ (১) পূজারী ব্রাহ্মণ, (২) অবিবাহিত। মহাত্মা চণ্ডীদাস পূজারী ছিলেন এবং বিবাহ করেন নাই ; এজন্য অনেকেই পরিহাস বা আহ্লাদ করিয়া তাঁহার নামের পূর্ব্বে বড়ু শব্দ ব্যবহার করিতেন। তিনিও কোন কোন পদের ভণিতা স্থলে ঐ বড়ু শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং কোন কোন পদে দ্বিজ শব্দেরও পরিচয় দিয়াছেন। এবং একটী পদের ভিতর যে একটী সঙ্কেত অঙ্কের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কাল নির্ণয় কি শক সংখ্যা, তা বুঝিবার যো নাই। সেই পদটী এই ;—

"বিধুর নিকট নেত্র, পক্ষ পঞ্চবাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস, ইহ পরিমাণ ॥
পরিচয় সঙ্কেত, অঙ্কে নির্জ্জা।
চণ্ডীদাস রস, কৌতুক কির্জ্জা ॥"

বিধু (১) নেত্র (৩) পক্ষ (২) বাণ (৫) একত্রে ১৩২৫। নির্জ্জা শব্দে লওয়া,কির্জ্জা শব্দে কিয়া, ইহা ব্রজবুলী যথা, লিজীয়ে, কিজীয়ে ; যদি ইহা কৌতুক স্থলে শক গণ্য করা যায়, তাহা হইলে ১৩২৫ শকে তৎকর্ত্তৃক নবহুঁ নবহুঁ অর্থাৎ নূতন নূতন রসে কবিতাকুসুম বিকশিত হইয়াছিল। ধরিতে গেলে সে আজি ৪৯০ বৎসরের কথা।

বিদিত আছে, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ১৪০৭শকে প্রকট হইয়াছিলেন। সেই শকের সহিত পূর্ব্বোক্ত শক বিয়োগ করিলে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ৮৩ বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীদাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আরো

এক কথা; বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ঠাকুর এক সময়ের লোক, পরস্পর মিলনও হইয়াছিল; যথা, পদে আছে;—

"চণ্ডীদাস শুনি; বিদ্যাপতি গুণ,
দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি শুনি, চণ্ডীদাস গুণ,
দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল। ইত্যাদি

বিদ্যাপতির জীবনী সম্বন্ধে এই এক কথা বিদিত আছে, ১৩২৩ শকে বিদ্যাপতি ঠাকুর রাজা শিবসিংহের নিকট উপহার স্বরূপ বিদকী গ্রামপ্রাপ্তহন; এইসময়েই তাঁহারকবিতাকদম্ব-রাজী প্রস্ফুটিত হইয়া ভাবুক ভ্রমরবৃন্দের চিত্ত উদ্ভ্রান্ত করিয়াছিল। অতএব চণ্ডীদাসের লিখিত অঙ্কগুলি শক গণনারই সংখ্যা, ইহাই বোধ হয়। এবং এই অনুমান অযৌক্তিক নহে। কেননা উভয় কবিই সমসাময়িক।

শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর নিজের কবিতায় যে সঙ্কেত-পরিচয় দিয়াছেন, চণ্ডীদাস ঠাকুর কোন পদে সেইরূপ আপনার পরিচয় দেন নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, বিদ্যাপতি ঠাকুরের পরিচয় কি? তা তাহার কৃত পদে এই রূপ পাওয়া যায়;

"জন্মদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর,
মৈথিলী দেশে করু বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ, শিবসিংহ ভূপ,
কৃপাকরি লেউ নিজপাশ॥
বিদকী গ্রাম, দান করল মুঝে,
রহতহি রাজ সন্নিধানে।
লছমী চরণ ধ্যানে, কবিতা নিকসয়ী,
বিদ্যাপতি ইহ ভাণে॥"
* * * * পদসমুদ্র।

ইতিহাসে ব্যক্ত আছে;—

"সারস্বতা কান্যকুব্জা, গৌড় মৈথিলিকোৎকলা।
পঞ্চ গৌড়া ইতি খ্যাতঃ বিন্ধ্যাসোত্তরবাসিন॥"

রাজা শিবসিংহ যৎকালে এই পঞ্চগৌড়ের রাজা ছিলেন, সেইকালে বিদ্যাপতি ঠাকুর ঐ রাজসংসারে সভাপণ্ডিত বা রাজার প্রধান অমাত্য ছিলেন। মৈথিলী দেশে তাঁহার বাস ছিল। রাজা তাঁহাকে (বিদ্যাপতি ঠাকুরকে) যে গ্রাম দান করিয়াছিলেন, সেই গ্রামের নাম বিদকী (ঐ গ্রাম দ্বারবঙ্গের নিকট)। বিদ্যাপতি ঠাকুরের পিতার নাম গণপতিঠাকুর। রাজা শিবসিংহের পত্নীর নাম শ্রীলছিমাদেবী, এই লছিমাদেবীর সন্দর্শনে শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুরের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের-লীলা বিষয়ক কবিতা স্ফুরিত হইত। রাজা শিবসিংহের পারমার্থিক নাম শ্রীরূপনারায়ণ; তাঁহার রাজত্বকালে, সংবৎ,শকাব্দ, লক্ষ্মণাব্দ এবং বঙ্গে বঙ্গাব্দ এই কতিপয় শক প্রচলিতছিল; তৎসম্বন্ধে যাহাকিছু নিদর্শন আছে, তাহা পরে বলিব।

কিম্বদন্তী, রাজা শিবসিংহ (বা রূপনারায়ণ) রাজ্যসীমা পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর ও অন্যান্য পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে মধ্যে মধ্যে গৌড়ে আগমন করিয়া মঙ্গল-কোটে দরবার করিতেন। বীরভূমের মধ্যস্থিত অধুনা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গল-কোট একটী প্রসিদ্ধ স্থান।

মহাত্মা শ্রীমুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ঐ স্থান গৌড় উজ্জয়িনী বলিয়া পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন; এবং মহাভারত-রচয়িতা মহাত্মা কাশীরামদাস আত্মপরিচয়ে ঐ প্রদেশ ইন্দ্রাণী নামে প্রদেশ বলিয়া লিখিয়াছেন। ঐ মঙ্গল-কোটে পূর্ব্ব রাজধানী ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশিষ্ট বহু চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

ঐ প্রদেশ মধ্যে যে কয়েকটী স্রোতস্বতী নদনদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মধ্যে দামোদর নদ সর্ব্বপ্রধান। ঐ নদ আত্মগঙ্গা

দামোদর নামে প্রসিদ্ধ। রাঢ় দেশের লোকে পূর্ব্বে ও এখনও ঐ নদকে সুরনদী গঙ্গাজ্ঞানে গঙ্গাস্নান যোগে স্নানাবগাহন করিয়া পবিত্র বলিয়া মনে করে।

রাজা রূপনারায়ণ যে সময় বিদ্যাপতি ঠাকুর সমভিব্যাহারে গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় মহাত্মা চণ্ডীদাসের মৃত্যু ও পুনর্জীবন প্রাপ্তির অলৌকিক ঘটনা লোক পরম্পরা অবগত হইয়া তাঁহার সহ মিলন ইচ্ছায় (বিদ্যাপতি ঠাকুর) বিশেষ উৎকণ্ঠিত হন্। শেষে বিদ্যাপতি ঠাকুর, রূপনারায়ণ সমভিব্যাহারে সেই উৎকণ্ঠাতিশয়ে মঙ্গলকোট হইতে নান্নুর গ্রামে যাত্রা করেন। সেইকালে, শ্রীশ্রীবাশুলীদেবীর প্রত্যাদেশে রাজা রূপনারায়ণ সমভিব্যাহারে বিদ্যাপতি ঠাকুর আগমন করিতেছেন, চণ্ডীদাস ইহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে সম্মানের সহিত অগ্রবর্ত্তী হইয়া গ্রহণ করিবার অভিলাষে উৎকণ্ঠিত হইয়া নান্নুর গ্রাম হইতে মঙ্গলকোটাভিমুখে শুভযাত্রা করেন।

ইত্যবসরে দৈবানুকূলে দিবা ২ প্রহরের সময় পথিমধ্যে অর্থাৎ ঐ আদ্যগঙ্গা সরিত্তীরে উভয়ের প্রিয়দর্শন ও শুভ সম্মিলন হয়। পদে আছে ;—

"সময় বসন্ত, যাম দিন মাঝই, বটতলে সুরধুনী তীর।
চণ্ডীদাস, কবি রঞ্জনে, মিলিল পুলকে কলেবর গীর॥"

বিদ্যাপতি ঠাকুরের উপাধি কবিরঞ্জন। "গীর শব্দে" ধরায় পতিত। যে সময়টীতে পরস্পর সাক্ষাৎ মিলন হয়, সে সময়টী মধু চৈত্র মাস। একটুকু প্রখর রৌদ্র জন্য উভয়ে একটী বটবৃক্ষ তলে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্রাম-সুখ অনুভব করেন। সেইকালে গুরুজাতীয় ভজনতত্ত্ব লইয়া ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে পরস্পর অনেক কথা ও পরস্পর পদে পদে অনেক প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়। উভয়ের বর্ণিত সেই সকল পদ্যে আধ্যাত্মিক ও প্রশ্নদূত তত্ত্ব আছে। সে সকলের অর্থ বড়ই কঠিন এবং জটিল। নির্য্যাস তত্ত্ব ভেদ না করিলে ও তাহাতে জ্ঞান না থাকিলে, সহজে সে রস বোধগম্য হইবার নহে। বিশেষতঃ সাধক ভিন্ন অপরে তা জানেও না, বুঝেও না।

বর্ত্তমানে সাহজিক সম্প্রদায় যাহা কিছু অর্থ ও অনুকরণ করে, সে সকল পদকর্ত্তার অভিপ্রায়ের বিপরীত ও ঘৃণিত। আর সে কেবল প্রজ্বলিত প্রদীপের অগ্নিতে দগ্ধ হইবার নিমিত্ত পতঙ্গের ন্যায় পাখা ধারণ। মহাত্মা চণ্ডীদাস নিজেই বলিয়াছেন ;—

"সে রসতত্ত্ব বুঝিবে কে?
রসিকা রমণী পেয়েছে যে॥
চণ্ডীদাস কহে, বুঝন কেরে।
অনলে পড়িয়া, পুড়িয়া মরে॥"

তা যাহাই হউক ; সে বিচার অন্য প্রবন্ধে প্রয়োজন, ইহাতে নহে।

অনন্তর, বিশ্রাম সুখলাভের পর বিদ্যাপতি ঠাকুর এবং রূপনারায়ণ শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুরের সমভিব্যাহারে নান্নুর গ্রামে আগমন এবং শ্রীশ্রীবাশুলী দেবীর দর্শন এবং রামমণির সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া প্রীত হওনান্ত কয়েকদিন সুখে অতিবাহিতযাবৎ করিয়া পশ্চাৎ মৈথিল দেশে গমন করেন। সেই হইতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয় ঠাকুরের অচ্ছেদ্য সৌহার্দ্দ প্রণয়-বন্ধনে উভয় রচিত পদ আদান প্রদান ও সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছিল। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুর এক সময়ের লোক ছিলেন বটে, কিন্তু বয়সে কে ছোট ও কে বড় ছিলেন, তা জানিবার যো নাই, তবে পদের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিলে চণ্ডীদাসই বড় বলিয়া বোধ হয়। কেন না, তিনি পদের এক স্থানে ধরা দিয়াছেন ; যথা ;—

"পঞ্চরস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়॥" ইত্যাদি।

এই আদি শব্দ লইয়া তিনিই বড়। তাঁহা কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে রস প্রচার হয়। মহাত্মা চণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধে অনেক আষাঢ়ে গল্প আছে। কিন্তু সে সকল কথা শুনিতে নাই ও বিশ্বাস করিতে নাই। কারণ, পূর্ব্ব মহাজন শ্রীজ্ঞানদাস, শ্রীশ্রীঠাকুর নরহরিদাস এবং বুধরীর কবিনৃপবংশজ শ্রীগোবিন্দ, শ্রীঘন শ্যাম ও শ্রীবলরামদাস প্রভৃতি মহাত্মা চণ্ডীদাস সম্বন্ধে পদ পদাবলীতে যাহা কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন, পদসমুদ্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া ও পদে পদে পদগুলি মিলাইয়া দেখিলে তাহা অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। পদে আছে ;—

"ভজমন, কিশোর কিশোরী।
রাধানামে দেহ ডঙ্কা, ঘুচিবে শমন শঙ্কা,
অবহেলে ভবে যাবে তরি॥
গোবিন্দ ভজরে মন, কি করিতে পারে যম,
রাধাকুণ্ডের তীরে কর বাস।
আসিবে এক সহচরী, লয়ে যাবে করে ধরি,
দেখাইবে, রাসবিলাস॥"
* * * * ইত্যাদি

চণ্ডীদাস ঠাকুর শেষদশায় শ্রীবৃন্দাবন আনন্দধামে স্বজ্ঞান স্বইচ্ছায় গমন করিয়া এবং শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগত হইয়া ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল পদ সেবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনেই সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

আজি পর্য্যন্ত সেই অনন্ত সুখধামে তাঁহার সমাধিক্ষেত্র বর্ত্তমান আছে। পশ্চাৎ রামমণিও সেই পথ অনুসরণ করেন। ইহাই চণ্ডীদাস ঠাকুরের জীবনের আখ্যায়িকা। এবং ইহাই তাঁহার শেষ জীবনের পরিচয়!!

এখন সমালোচনা স্থলে কিছু বলিতে হইতেছে। একটা ভাষাকথায় আছে যে, "শুনা ভাণা কাণা, পথ পায় না, এ তিন জনা", কোন উদ্ভটকারও বলিয়াছেন ;"অন্ধস্য স্কন্ধ গমনে, তস্য বিঘ্ন পদে পদে।" বস্তুতঃ কথা সত্য "কাণার কাঁদে গমন করিলেই খানায় পড়িতে হয়।" কারণ, যে কথার মূল নাই, সে কথা বিশ্বাস করা বড় দোষ। আর যে কথার কোন না কোন মূল আছে, তাহা অসম্ভব হইলেও সম্ভব হয়। যথা রামায়ণে ; 'শীলা তরতি পানীনাং' ইত্যাদি।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধে আমি কাহারও নিন্দা করিতেছি না, আমার সে উদ্দেশ্যও নহে। তবে এই একটা কথা ; বাঙ্গালা-সাহিত্যের ওয়ারিস নাই ; কোন এক প্রাচীন ঘটনার অনুসন্ধান করিবার কালে, হয় লিখিত কথা, নয় লোকের কথার উপর বিশ্বাস করিতে হয়। মনে করুন, অনুসন্ধান কালে কেহ বলিল, চণ্ডীদাস শাক্ত ও ঘোর মাতাল ও বামাচারী এবং অধিক মাত্রায় তামাক-খোর ছিল; এজন্য সকলে "চণ্ডে" মাতাল বলিত। আবার কোন লেখক সংবাদ পত্রে লিখিয়া প্রকাশ করিলেন, চণ্ডীদাস বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তাঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী। আবার কেহ বলিল, "চণ্ডে" একটা ধোপানীর সহিত প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া সমাজচ্যুত হইয়াছিল ; তন্নিবন্ধন চণ্ডীর পিতা মাতা বিষম দায়ে পড়িয়াছিলেন। শেষে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সমাজ কর্ত্তৃক উদ্ধার হয়।" আবার সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন পোষকতা করিল, "চণ্ডে" যখন সমাজ হইতে উদ্ধার হয়, আর যেদিন তাঁহার বাটীতে সমন্বয় ও কুটুম্ব ভোজন, সেদিন স্বজাতিবর্গের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভোজনের কালীন চণ্ডীদাস অন্নাদি পরিবেশন করিতেছিল, এমন সময়ে রামী ধোপানী হঠাৎ সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, "কিরে চণ্ডে, তুই আমায় ছেড়ে জেতে উঠেছিস্" এই বলিয়া

ভোজনের বাধা দেওয়ায়, সেই একটা হুলস্থূল ব্যাপারেচণ্ডদাস পুনর্মূষিক অবস্থা প্রাপ্ত হন।

আবার অন্যান্য অনুসন্ধানকালে অন্য এক জন বলিল, একদা চণ্ডীদাস মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, চিতা সজ্জিত হইয়াছে, এমন সময় রামিনী উপস্থিত হইয়া চিতার উপর লাথী মারিয়া বলিল, "কিরে চণ্ডে, তুই আমায় ছেড়ে কোথা যাচ্ছিস্" এই বলিয়া বারবার তিনবার পদাঘাত করায়, সেই (লাথীর) চোটে ঘুম ভাঙ্গিবার ন্যায় চণ্ডীদাস পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হয়।

আবার অন্যজন বলিল, একদা, চণ্ডীদাস মতিপুরে গান করিতে গিয়াছিল, কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় নাটমন্দিরের ছাদ পতনে চণ্ডীদাস ও রামীর এককালে অপমৃত্যু হয়। আর আর কথাগুলি এস্থলে বলিবার আবশ্যক নাই।

প্রণিধান করিয়া দেখিলে, এ সকল কথার যখন মূল নাই, কেমনে তা সামঞ্জস্য হইতে পারে? পরন্তু, অনুসন্ধিৎসু মহোদয়গণ, বাস্তবিক কথাগুলি কতদূর সত্য, তা আর উল্টাইয়া দেখিলেন না। তাহাই বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া অবিকল কথাগুলি রঞ্জিত ও অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিয়া সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিলেন।

একটা কথা আছে "নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল", এখনকার কালে যাঁহারা বাগ্দেবীর বরপুত্র এবং সমাজের অগ্রণী, যাঁহাদের তেজস্বিতা লেখনীর মুখে কাহারও কোন বাঙ্নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা নাই, সে কথা কে অন্যথা করিতে পারে? তাহাই একালে সাহিত্যজগতে "মহাজন পন্থা" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ ইহা সত্যকাল নয়, ত্রেতাও নয়, দ্বাপরও নয়, কলিকাল। একালে সকলই সম্ভব। প্রকৃত পক্ষের কথা বলিতে গেলে বহু দূরে পড়িতে হয়। সে অনেক কথার কথা; এস্থলে কিছু বলিব। পুরাণে আছে, একদিন, বকরূপী ধর্ম্ম, পাণ্ডুকুলভূষণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কাহাকে পথ বলে?" ইহাতে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির উত্তর দান করেন, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" অর্থাৎ মহাজন যাহা দ্বারা গমন করিয়াছেন, তাহারই নাম পথ। আর এক দিন রায় রামানন্দকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করেন;

"কোন্ পথে গেলে জীব, আর না আইসে।
কোন্ পথে গেলে না ভাঙ্গয়ে তার দিশে॥"

রায় রামানন্দের উত্তর;—

"যে পথে সাধুর গতি, সেই পথ সার।
অন্য পথে যায় যদি, ফিরে আসা ভার॥"

মনেকরুন, এই উভয় প্রশ্নকর্ত্তার মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, দ্বিতীয় ধর্ম্ম-সংস্থাপক যুগাবতার; উত্তর দাতার মধ্যে প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠায়ীর আদর্শ স্বরূপ রাজা যুধিষ্টির, দ্বিতীয় ভক্তের প্রতিরূপ রায় রামানন্দ, উভয় পক্ষেরই তাৎপর্য্য এক।

যুধিষ্টির যাহা উত্তর দিলেন, ইহাতে ইহাই বোধহয়, ক্রমান্বয়ে মহাজনগণ যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তৎপরবর্ত্তী জীবগণও যদি তাহারই অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে নির্ব্বিবাদে ইহকাল ও পরকাল, এই উভয় কালেই সুখভোগী হইতে পারে। কারণ, পথ শব্দের অর্থ, যাহা অবলম্বন করিয়া গমন করিলে নিজ অভিপ্রেত গন্তব্য স্থানে যাওয়া যায়; তাহারই নাম পথ। এক্ষণে জীবের অভিপ্রেত গন্তব্য স্থান কোথায়? যে স্থানে যাইলে জীব চিরকালের জন্য সুখে অবস্থান করিতে পারে, তাহাই জীবের অভিপ্রেত ভূমি।

কিন্তু নির্ব্বোধ মৃগগণ তৃষ্ণায় আকুল হইয়া জল পাইলে সুশীতল হইব, ইহা বোধ-

করিয়া মরীচিকা-ভ্রান্ত যেমন জীবনের জন্য জীবন হারায়, ভ্রান্তজীবগণও আপাততঃ রমণীয় মরীচিকা স্থানীয় কুতার্কিক কুহকীর বাগজালে, পতিত হইয়া, সুখবোধে নরক যন্ত্রণায় নিক্ষিপ্ত হইয়া, অনন্তজীবনে অপার যন্ত্রণা ভোগ করে; প্রকৃত অভিপ্রেত স্থানে যাইতে সমর্থ হয় না। অতএব যিনি চতুর হইবেন, তিনি হঠাৎ কোন কার্য্যে মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্ব প্রথা পরিত্যাগ করিবেন না। অথবা আপাততঃ হৃদয়গ্রাহিণী যুক্তিতে মোহিত হইয়া প্রাচীন পথ ত্যাগ করিয়া আধুনিক পথ অবলম্বন করিবেন না। যিনি সুবোধ হন,তাহাকে ঔদ্ধত্য কখনই আক্রমণ করিতে পারে না। সুতরাং যিনি বেশ বুঝিতে পারেন যে, শিষ্টগণ (সাধুগণ) যে পথ দিয়া যাতায়াত করিয়াছেন, আমাদেরও সেই পথে যাওয়া উচিত। যে সে একটা পথ পাইলে যাওয়া অবিধেয়। গমনের পূর্ব্বে তাহার বিশেষ অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য। কোথাও কোন বিভীষিকা আছে কি না? ইহা দেখিয়া তবে চরণ চালন অথবা লেখনী সঞ্চালন করিতে হয়।

মহাত্মা চণ্ডীদাস একজন সাধক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, স্বয়ং বিশালাক্ষী দেবী যাঁহার উপদেষ্টা, মৃত্যু যাঁহার করতলাধীন, যিনি শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ চতুরাক্ষর মহামন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া এবং অনুক্ষণ হৃদয়পটে সেই যুগলরূপ দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রেমবৈচিত্র্যত্য বর্ণনা করিতেন,তাঁহার কখন কি অপমৃত্যু হইবার সম্ভব?

সাহিত্যবেত্তাগণ যাহাই বলুন, বা যাহাই লিখুন, সরল বিশ্বাসী বৈষ্ণব অর্থাৎ সাধুগণ তাহা কখনই বিশ্বাস করিবেন না। প্রতিবাদ করিবেন আর বলিবেন, যদি চণ্ডীদাসের মতিপুরে হঠাৎ-মৃত্যু হইয়াছিল,তবে শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার সমাধি কেন?

এই উপকাহিনী বলিবার তাৎপর্য্য এই, সম্প্রতি,নদিয়া মেহেরপুর নিবাসী উচ্চশিক্ষিত বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় বহু পরিশ্রম ও বহু প্রযত্নে মহাত্মা চণ্ডীদাসের জীবনী ও টীকা সহিত এক খানি পুস্তকে বহুসংখ্যক পদ প্রকাশ করিয়া পুস্তক খানির "চণ্ডীদাস" নামকরণ করিয়াছেন। দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি, তাঁহার উদ্দেশ্য অতীব মহৎ ও সৎ। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল মহোদয়গণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে চণ্ডীদাসের কিছু কিছু পদ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, রমণী বাবুর পুস্তকে সে সকল অপেক্ষা পদসংখ্যা অধিক। ইহার ভিতর আশাতীত পদ আছে। এত পদ পূর্ব্বে কখন কোন পুস্তকে দেখা-যায় নাই,অথবা কেহই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর। কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, অঙ্গ সৌষ্ঠব ততোধিক ভাল। অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় বিনা সূতায় গাঁথনি নহে; এমনি সূত্রে পদ গুলিন গাঁথনি যে, মণিময় হার ফেলিয়া তাহা কণ্ঠে ধারণ করিতে ইচ্ছা হয়। অধিক কি, ক্রীড়াশালিনী কুসুমরূপিণী বালিকা যেরূপ পিতা মাতার গলা জড়াইয়া ধরে, পদগুলি যে কোন সময়ে অধীত হইলে পাঠক শ্রোতার চিত্তকে সেইরূপ বাঁধিয়া ফেলে এবং প্রেমরসে অভিষিক্ত হইতে হয়। ধন্য,রমণী বাবুর অধ্যবসায়কে ধন্য!

তিনি, গ্রন্থখানি প্রকাশে কোন অংশে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। বর্ত্তমানকালে তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকে কীর্ত্তনব্যবসায়ীদিগের বিশেষ উপকার ও শিক্ষার সুলভ হইবে ও উত্তম ব্যবস্থা চলিবে। তন্নিবন্ধন এক একখানি পুস্তক ঘরে ঘরে সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত।

সংগ্রহ কালে যদিও অন্যান্য পদকর্ত্তার রচিত ২। ১ টী পদ, যথা, "যমুনা যাইয়া,

শ্যামেরে দেখিয়া ইত্যাদি” মিশ্রিত হইয়াছে, ফলতঃ তাহা ভুষি মাল নহে, মহাজনী মাল, গঙ্গাতে নদ নদীর জল মিশ্রিত হইয়া যেরূপ সুনির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ হয়, উহা তদনুরূপ, সুতরাং কিছু আসে যায় না। কিন্তু পুস্তকে একটী বিষয়ের বড়ই অভাব। মুখবন্ধে বৈষ্ণবের উপাস্য শ্রীগৌরচন্দ্রিকা নাই। বিশেষতঃ “হরি সর্ব্বত্র গীয়তে” বেদে, রামায়ণে, পুরাণে, ভারতে, যে নামের সার্থকতা করিয়াছে, নান্দীতে সে নাম না থাকা বড় দোষ, পণ্ডিতে তাহা অস্পর্শ্য বলিয়া জ্ঞান করেন।

দ্বিতীয় কথা ; রমণী বাবু সমস্ত পদ উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই ; সে কার্য্য সাধন না হইবারই কথা। যেহেতু মহাত্মা চণ্ডীদাসের পদ এখন সমুদ্র গর্ভে নিহিত। সমুদ্রের অপর একটী নাম রত্নাকর,যে কোন রত্নের আবশ্যক হউক না কেন, তাহাতে অবগাহন করিলে পাওয়া যায়,পরন্তু রমণী বাবু সে সন্ধান আদৌ করেন নাই ; সুতরাং এখনও অনেক পদ প্রকাশ হইতে বাকী।

তৃতীয় কথা, রমণী বাবু, চণ্ডীদাসের যাহা কিছু জীবনী লিখিয়াছেন, তাহার ভিতর নূতন বিষয় কিছুই নাই “যথাপূর্ব্ব তথাপর” গোড়াতেও যা ভুল,আগাতেও তা ভুল। তিনি, একা তাহাতে দোষের ভাগী নহেন। নূতন পথে চলিতে গেলে,বা জনশ্রুতি কথায় বিশ্বাস করিলে যেরূপ ভ্রমে পড়িতে হয়, পূর্ব্বেই তা বলা হইয়াছে।

এখন অনুরোধ এবং ভরসা করি, তিনি এখন পদ গুলি মিলাইয়া দেখিবেন, কোন্ পথ সোজা, দ্বিতীয় বারে তাহা অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ মহাজন পথে চলিলে অবশ্যই অভিপ্রেত স্থানে গমন করিতে পারিবেন এবং যশোকীর্ত্তি থাকিবে। অধুনা, ভজনতত্ত্ব সম্বন্ধে পদকর্ত্তার বিশেষ পরিচয়, কোন রসজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন, মহাত্মা চণ্ডীদাস কেবল পদ্য কাব্য লিখিবার জন্য কবি নহেন,কেবল শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য শিল্পী নহেন, লোক সকলকে স্বরে মুগ্ধ করিবার নিমিত্ত গায়ক নহেন ; রমণীর চিত্ত আকর্ষণের জন্য রসিক নহেন ; অথচ তিনি, উৎকৃষ্ট কবি; উৎকৃষ্ট শিল্পী, উৎকৃষ্ট পণ্ডিত, উৎকৃষ্ট গায়কও উৎকৃষ্ট রসিক বা রসিকা ভক্ত।

তাঁহার গীতিকাব্য, তাঁহার শিল্প, তাঁহার সঙ্গীতবিদ্যা, তাঁহার পাণ্ডিত্য, এবং তাঁহার রসিকতা, ও তাঁহার শরীর ও তাঁহার মন এ সকলেরই এক উদ্দেশ্য ; সে উদ্দেশ্য কেবল “শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি আর ব্রজের নিগূঢ় রস প্রচার।” ভক্তি সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ, যেরূপ পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া আপনাদের ভক্তি প্রকাশ করেন, চণ্ডীদাসের ভক্তি সে ভক্তি নহে ; যে ভক্তিতে ঈশ্বর জগতের শ্রষ্টা, মনুষ্য সৃষ্টপদার্থমাত্র, চণ্ডীদাসের ভক্তি সে ভক্তি নহে ; যে ভক্তিতে ঈশ্বর প্রভু, ভক্ত তাঁহার দাস, তাঁহার সেবার জন্য ভক্তের জীবন,সে ভক্তি চণ্ডীদাসের ভক্তি নহে ; যে ভক্তিতে ভক্ত ঈশ্বরকে আপনার পুত্র মনে করিয়া নন্দ যশোদার ন্যায় তাঁহার প্রতি বাৎসল্য ভাবে ভক্তি প্রকাশ করে, চণ্ডীদাসের ভক্তি সে ভক্তি নহে ; যে ভক্তিতে ভক্ত ঈশ্বরকে বন্ধু ভাবে শ্রীদাম সুদামের ন্যায় ভক্তি করে,চণ্ডীদাসের ভক্তি সে ভক্তি নহে ; যে ভক্তিতে বা প্রেম ভক্তিতে রমণী মনোগত নায়কের প্রতি অনুরক্ত হয়,চণ্ডীদাসের ভক্তি সেই ভক্তি। ইহাতেও একটুকু বিশেষ আছে।

পরিণীতা ভার্য্যা যে ভক্তিতে ধর্ম্ম কামার্থ লাভের উদ্দেশে আপন স্বামীকে আত্মসমর্পণ

করে,সে ভক্তি চণ্ডীদাসের ভক্তি নহে; রমণী যেরূপ প্রেমচাঞ্চল্যের বশীভূত হইয়া পর পুরুষের প্রতি অনুরক্ত হয়, ভক্ত যদি সেইরূপ প্রেমচাঞ্চল্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণে আত্ম সমর্পণ করিতে পারে,তাহা হইলেই চণ্ডীদাসের ভক্তি কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারেন। যথা গৌতমীয় তন্ত্রে; প্রেমৈব গোপ রামাণাং কামইত্বা গমৎ প্রথাং। ইত্যাদি।

শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুরের সহিত যে দিন চণ্ডীদাস ঠাকুরের মিলন আর আধ্যাত্মিক বিচার হয়,সেই দিন প্রশ্নচ্ছলে চণ্ডীদাস ঠাকুর বিদ্যাপতি ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন।

"ধৈরয ধরি দুহু, নিভৃতে আলাপই,
পুছত মধুর রসিক।
রসিক হইতে কিয়ে রস উপযায়ত,
রস হইতে কি রসিক॥
রসিক হইতে কিয়ে, রসিক হোয়ত,
রসিকা হইতে কি রসিকা।
রতি হৈতে প্রেম, প্রেম হইতে রতি,
কাঁহে করে মানব অধিকা॥
পুছত চণ্ডীদাস, করিরঞ্জনে,
শুনতঁহি রূপ নারায়ণ।
কহ বিদ্যাপতি, ইহ রস কারণ,
লছিমা পদ করি ধ্যান॥

তিনি, কোন্ ভাবের সাধক ছিলেন, উক্ত পদের অর্থেই তাহা বিশেষ প্রমাণিত হইবে। আমরা ভক্তি গ্রন্থ উদ্ঘাটন করিলেই দেখিতে পাই,ভক্ত নায়িকা,আর শ্রীকৃষ্ণ নায়ক। কোন একটী রসের বর্ণনা করিতে হইলে অবলম্বন, উদ্দীপন, বিভাব, স্থায়ী, ও সঞ্চারি প্রভৃতি রসের প্রয়োজনাধিক্য অধিক হয়,এই সকলের সাহায্যে পরমাস্বাদ্য রূপ যে রস উৎপত্তি হয়, তাহাই প্রকৃত রস,সে রসের ভাণ্ডার কে?

"রসিক শেখর কৃষ্ণ, পরম করুণ।"

শেখর শব্দে শৈল, পক্ষান্তরে গগন চন্দ্র, যে চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে, পরন্তু রসিক শেখর কৃষ্ণচন্দ্র যিনি চৌষট্টি কলায় পরিপূর্ণ, কোন কালে তাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। যথা,—

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।"

সেই রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণকে নিষ্কাম হইয়া ব্রজের গোপরামাগণ যে ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবে শ্রীবিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ঠাকুর উপাসনা করিতেন। এই জন্য তাঁহাদের কৃত ভক্তিরসসমন্বিত পদ সকল চৌষট্টি রসে পরিপূর্ণ।

বৈষ্ণব অলঙ্কার গ্রন্থে নায়ক নায়িকার যে সকল সূক্ষ্ম ভাব প্রদর্শিত আছে, অবৈষ্ণব গ্রন্থে সে সকল অতি বিরল।

এখনকার কালে যিনিই যত কবি হইবার চেষ্টা করুন না কেন, নির্য্যাস রস বিনা নির্য্যাসতত্ত্ব সাধনে কবি নামে অভিহিত হইবার যো নাই। আমি যে এ কথায় একেবারে কবির আসন শূন্য করিতেছি, তা নয়। আমার এইরূপ বলার তাৎপর্য্য, ভক্তি গ্রন্থের আলোচনা ও আস্বাদ বিনা কেহ কখন প্রকৃত প্রেমের কবি হইতে পারিবেন না।

মধ্যকালে এই ভারতে শ্রীভারতচন্দ্র রায় গুণাকর শ্রীনীলাচল ক্ষেত্রে (ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মঠে) কিছুদিন অবস্থিতি করিবার কালে শ্রীবৈষ্ণবের অনুগ্রহ প্রসাদাৎ ভক্তি শাস্ত্র ও নির্য্যাস তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া কবি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পরন্তু তিনি কোন ভক্তিগ্রন্থ লেখেন নাই। যে একখানি কাব্য ও রসমঞ্জরী লিখিয়াছেন,তা একখানি উপরস। ঐ উপরসের ভিতর বৈষ্ণবাচার্য্য ও পদকর্ত্তাগণের ছন্দোবন্ধ রস ও শব্দ অলঙ্কার চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া কেবল ভাব উন্টাইয়া লিখিয়াছেন; চৌষট্টি রস যে কি, তা তিনি

জানিতেন। প্রকারান্তরে তা লিখিয়া ধরাও দিয়াছেন ; যথা ;—

"চন্দ্রে সবে ষোল কলা, হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণ চন্দ্র পরিপূর্ণ, চৌষট্টি কলায়॥"

নির্য্যাসতত্ত্ব ভেদ না করিলে কেহ কি এ তত্ত্ব বলিতে ও লিখিতে পারেন ?

মহাত্মা চণ্ডীদাস অলস, সম্ভোগ, রসোদ্গার প্রভৃতি কবিতায় যাহা কিছু উদগীরণ করিয়াছেন, সেই উদ্গীর্ণ প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করিতে তিনি অনুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন নাই ও লজ্জা বোধ করেন নাই। কেমন চোর দেখুন; চণ্ডীদাস ঠাকুর অলসের পদে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, কবি তাহা চুরি করিয়া নিজ কাব্যের বিরহ বর্ণনের একস্থানে অবিকল লিখিয়াছেন ; যথা ;—

"রতি মদ সাগর, নাগরী নাগর,
নিরখি নিরখি দুই ঠাটে।
রাখিতে নিজ ঘর, রতি রতি নায়ক,
কুলুপিল কুলুপ কপাটে।" পদসমুদ্র।

স্থানে স্থানে এমন অনেক আছে।

বলিতে হইবে, সেই হইতে রস ভাণ্ডারের দ্বারে একপ্রকার কুলুপ পড়িয়াছে। ভারতমাতার এতদূর দুর্দ্দশা হইয়াছে যে, ভারতে পূর্ব্ববৎ প্রকৃত কবি জন্মেও নাই, জন্মিবেও না। আজি এই পর্য্যন্ত ; পশ্চাৎ শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুরের পরিচয়।

শ্রীহারাধন দত্ত।

মগধের পুরাতত্ত্ব।

মগধ অতি প্রাচীন স্থান। ঋগ্বেদে (৩।৫৩।১৪) ইহা অনার্য্যজাতির বাসস্থল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতায় ও অথর্ব্ববেদ সংহিতায় ইহা কীকট নামে উল্লিখিত হইয়াছে। কীকটদেশবাসীরা আর্য্যজাতির অনুষ্ঠান করিত না, এজন্য তাহারা ব্রাত্যদিগের ন্যায় অনার্য্যজাতি বলিয়া পরিচিত ছিল। কীকটগণ অতি ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল। ভগবানে ভক্তিমান্ সাধুগণ কীকটে বাস করিলেও অপবিত্র হইবে না বলিয়া ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। এই কীকটে কলিকালে বুদ্ধদেব ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইবেন *। টীকাকার শ্রীধরস্বামী কীকট শব্দের "গয়াপ্রদেশ" অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'ত্রিকাণ্ড শেষ' অভিধানে মগধের পূর্ব্বতন নাম কীকট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কুরু-পাণ্ডবের ভীষণ যুদ্ধ সঙ্ঘটনের পূর্ব্বেই মগধে অতি পরাক্রান্ত রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে। মহাভারতে মহারাজ জরাসন্ধের নাম উল্লিখিত আছে। গিরিবেষ্টিত গিরিব্রজপুরে জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। কিরূপে ভীমসেন ও অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মগধে গমন করিয়া মহাপরাক্রান্ত অসুররাজ জরাসন্ধকে নিহত করেন,তাহা মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে *

* যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
সাধবঃ সমুদাচারা স্তে পূয়ন্তেঽপি কীকটাঃ (৭।১০।১৮)
ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে, সম্মোহায় সুরদ্বিষাং।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জন সুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি। (১।৩।২৪)

* মহাভারতীয় সভাপর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টের সহস্র বা দ্বাদশ শত বৎসর পূর্ব্বতন মগধের অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইতেছে।

উত্তীর্য্য সরযূং রম্যাং দৃষ্ট্বা পূর্ব্বাঞ্চ কোশলাং।
অতীত্য জগ্মু মিথিলাং মালাং চর্ম্মণ্বতীং নদীং॥
অতীত্য গঙ্গাং শোণঞ্চ ত্রয়স্তে প্রাঙ্মুখাস্তদা।
কুশচীরচ্ছদা জগ্মু র্মাগধং ক্ষেত্রমচ্যুতা॥
তে শশ্বদ্-গোধনাকীর্ণং অম্বুমন্তং শুভদ্রুমং।
গোরথং গিরিমাসাদ্য দদৃশু র্মাগধং পুরং॥

বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সেই অতীত কালের ইতিহাস লিখা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অতএব জরাসন্ধের উল্লেখমাত্র করা গেল। মহারাজ জরাসন্ধের পঞ্চপর্ব্বতবেষ্টিত রাজধানী গিরিব্রজপুর অদ্যাপি 'রাজগির' নামে পরিচিত রহিয়াছে।

খ্রীষ্টের পূর্ব্বতন ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই পঞ্চপর্ব্বতবেষ্টিত গিরিব্রজ (=কুশাগারপুর, = রাজগৃহ, =রাজগির) নগরে বিম্বিসার রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারই রাজত্ব সময়ে কপিলবস্তু নগরে শাক্যবংশীয় শুদ্ধোদন আবির্ভূত হন। এই কপিলবস্তু নগর বারাণসী ও গোরখপুরের উত্তরে হিমালয়ের পাদমূলে অবস্থিত ছিল। রাজা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থ নামে যে পুত্ররত্ন লাভ করেন, তিনিই উত্তরকালে বুদ্ধদেবনামে জগতের সর্ব্বত্র পূজিত ও আরাধিত হইতেছেন। সমগ্র ভূমণ্ডলের এক তৃতীয়াংশ (৫০কোটী) অধিবাসী এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া শুনা যায়। তিনি প্রথমে বৈশালীতে ও পরে রাজগৃহে এক ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন। পরে উরুবিল্ব গ্রামের নিকটে নির্জ্জন পার্ব্বত্যদেশে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করেন। পরে বোধিদ্রুমের নিম্নদেশে বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে জ্ঞান লাভ করিয়া "বুদ্ধ" হন। 'ললিতবিস্তর' নামক প্রাচীনগ্রন্থে তাঁহার জীবনী বর্ণিত হইয়াছে।

একদা ভিক্ষুকবেশে বুদ্ধদেব সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের পর এই রাজ গৃহে প্রবেশ করেন। নগরবাসীরা ভিক্ষুকের অলৌকিক রূপে ও দিব্যকান্তিতে মুগ্ধ হইয়া,তাঁহার নগর প্রবেশের বিষয় রাজা বিম্বিসারের কর্ণগোচর করে। রাজা গবাক্ষপথে দৃষ্টিপাত করিয়া ভিক্ষুকবেশী মহাপুরুষের রূপলাবণ্যে মোহিত হন। ভিক্ষুক কোথায় গমন করেন,তাহা অনুসন্ধানের নিমিত্ত চর নিযুক্ত করেন। নগর হইতে ভিক্ষান্ন-সংগ্রহ করিয়া বুদ্ধদেব প্রবেশ দ্বার পথে নিক্রান্ত হইলেন। বহ্ওয়া(গৃধ্রকূট ?) পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ-পূর্ব্বক আপনার ভিক্ষাপাত্র হইতে খাদ্যদ্রব্য বাহির করিয়া আহার করিলেন। পরে সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।

অনুচর মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া রাজা বিম্বিসার বহুতর অনুচরসহ শিবিকারোহণে বুদ্ধদেবের সমীপে গমন করিলেন। রাজা বুদ্ধদেবের পরিচয় প্রাপ্তে তাঁহাকে আপনার রাজধানীতে গমনের অনুরোধ করিলেন এবং রাজ্যভোগের প্রলোভন দেখাইলেন। বুদ্ধদেব আপনার সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনের বিষয় রাজাকে অবগত করাইয়া নিরস্ত করিলেন। দিব্যজ্ঞান-লাভের পর রাজগৃহে আগমনপূর্ব্বক প্রথমতঃ স্বীয়ধর্ম্ম প্রচার করিতে, রাজার অনুরোধে বুদ্ধদেব সম্মত হইলেন। মগধের অসংখ্য পর্ব্বত-মালার নির্জ্জনতা বুদ্ধদেবকে বিশেষ আকৃষ্ট করে। পক্ষান্তরে ইহাও শুনা যায় যে, বুদ্ধদেব রাজগৃহপ্রবেশের পূর্ব্বে নগরের নিকটবর্ত্তী এক তাল উপবনে অব-

এষ পার্থ মহান্‌ভাতি পশুমান্ নিত্যং অম্বুবান্।
নিরাময়ঃ স্ববেশ্মাঢ্যো নিবেশো মাগধঃ শুভঃ॥
বৈহারো বিপুলঃ শৈলো বরাহো বৃষভস্তথা।
তথা ঋষিগিরি স্তাত শুভা শ্চৈত্যকপঞ্চমাঃ।
এতে পঞ্চ মহাশৃঙ্গাঃ পর্ব্বতাঃ শীতলদ্রুমাঃ
রক্ষন্তীবাভিসংহত্য সংহতাঙ্গা গিরিব্রজং॥
অপরিহার্য্য মেঘানাং মাগধা মনুনা কৃতাঃ।
কৌশিকো মণিমাংশ্চৈব চক্রাতে চাপ্যনুগ্রহং॥
এবং প্রাপ্য পুরং রম্যং দুরাধর্ষং সমন্ততঃ।
অর্থসিদ্ধিস্ত্বনুপমাং জরাসন্ধো ঽভিমন্যতে।
বয়ং আসাদনে তস্য দর্পং অদ্য হরেমহি॥

স্থিতি করেন। রাজা বিম্বিসার লক্ষাধিক অনুচর সহ তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বুদ্ধদেব সকলের সমক্ষে রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া আপ্যায়িত ও অনুগৃহীত করেন। পর দিন বুদ্ধদেব মহা সমারোহে বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহে প্রবেশ করেন। রাজা নগরপ্রান্তে আপনার মনোহর উদ্যানে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এই উদ্যান 'বেণুবন' নামে পরিচিত ছিল। কলন্দ নামে জনৈক ধনী ব্যক্তি এই উদ্যানের পূর্ব্বতন অধিস্বামী ছিল, এইজন্য এই বেণুবন (বেলুবন)'কলন্দোপবন' বিহার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বুদ্ধদেব রাজগৃহের নিকটস্থ এই পিতা বিহারে তিন বৎসর পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচার করিয়া, শুদ্ধোদনের ঐকান্তিক অনুরোধে কপিলবস্তুতে ১২ বৎসর পরে পিতামাতাকে দর্শন দেওয়ার জন্য আগমন করেন। পরে তিনি কোশল-রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীতে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। এইবেণুবনে অবস্থিতিকালেই কাশ্যপ, সারীপুত্র ও মোগলায়ন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সপ্তদশতম ও বিংশতিতমবর্ষ বুদ্ধদেব রাজগৃহে, এবং একাদশতমবর্ষ নালন্দায় যাপন করেন। সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তিনি পুনরায় রাজগৃহে আগমন করিয়া রাজা বিম্বিসারকে অনুগৃহীত করেন। সারীপুত্র নালন্দায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে গৃহে জন্মগ্রহণ করেন,সেই গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সমাবিস্থ অবস্থায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পূর্ব্বে সারীপুত্র স্বীয় জননীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পিতার নাম সিংহসেন এবং পিতামহের নাম জয়সেন। সিংহসেনের পাঁচ পুত্রের মধ্যে শুদ্ধোদন সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ছিলেন। শুদ্ধোদন যে সময়ে কপিলবস্তু নগরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে রাজগৃহে মগধের সম্রাট্ ভাতীয় রাজত্ব করিতেছিলেন। কপিলবস্তু তখন মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে মগধ সম্রাটের যে পুত্র জন্মে, তিনি বিম্বিসার নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর পঞ্চদশ বৎসর বয়সে বিম্বিসার মগধ সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে পঞ্চদশতম বর্ষে বুদ্ধদেব রাজগৃহে উপনীত হইয়া, তাঁহারই সমীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথমতঃ প্রচার করেন। বুদ্ধদেবের বয়ক্রম তখন ৩৫ বৎসর মাত্র। ৫২বৎসর রাজত্বের পর বিম্বিসার পরলোক গমন করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করিয়া মগধে রাজত্ব আরম্ভ করেন। তদনন্তর তাহার পুত্র অজাতশত্রু মগধের সিংহাসন লাভকরেন। তিনি ৩২ বৎসর কাল মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের অষ্টমবর্ষে পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বুদ্ধদেব বৈশালীতে ধর্ম্ম প্রচারের পর কুশীনগর নামক স্থানের বনে নির্ব্বাণ (মোক্ষ) লাভ করেন। নশ্বরদেহ পরিত্যাগের সময়ে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর ছিল। সিংহলের প্রামাণিক ইতিহাস দীপবংশ ও মহাবংশের মতে এই ঘটনা খ্রীষ্টের পূর্ব্বতন ৫৪৩ অব্দে ঘটে। অতএব খ্রীঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে কপিলবস্তু নগরে মহামায়ার গর্ভে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া, জগতকে পবিত্র করেন। এই সময় নির্দ্দেশে ৬৫ বৎসরের ভ্রম আছে। পশ্চাৎ তাহা প্রদর্শিত হইবে।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির সময় হইতে সিংহলে বৌদ্ধ শকের গণনা আরম্ভ হয়। এই সময়ে বাঙ্গালার সিংহপুরের রাজা সিংহবাহুর

জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়সিংহ সাতশত অনুচরসহ অর্ণব-পোত আরোহণে সমুদ্র পথে লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হন। তত্রত্য রাজাকে পরাজিত করিয়া তিনি লঙ্কায় সিংহবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। বিজয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র পাণ্ডুবাস্ বঙ্গ হইতে গিয়া সিংহলের রাজপদ গ্রহণ করেন। ৩৭ বৎসর রাজত্বের পর বিজয়সিংহের মৃত্যু হয়। এক বৎসর অরাজকতার পর, পাণ্ডুবাস রাজত্ব আরম্ভ করেন। ৩০ বৎসর রাজ্য শাসনের পর ৪০৯ খ্রীঃ পূঃ অব্দের আরম্ভে তাঁহার মৃত্যু হয়। পাণ্ডুবাসের বংশধর মহাসেনের সময়ে (৩০২ খ্রীঃ) দীপবংশ পালিভাষায় লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। রাজা মহাসেনের রাজত্বপর্য্যন্ত দীপবংশে বর্ণিত আছে। সিংহলের রাজা ধাতাসিংহের সময়ে (৪৫৯—৪৭৭খৃঃ) মহানাম মহাবংশ রচনা করেন। অনুরাধপুরে সিংহলের প্রাচীন রাজধানী অবস্থিত ছিল।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পর অজাতশত্রু মহা সমারোহে তাঁহার দেহের ভস্মাবশেষ কুশীনগর হইতে আনয়নপূর্ব্বক রাজধানী রাজগৃহে সমাহিত করিলেন। রাজগৃহ হইতে কুশীনগর ২৫যোজন দূরে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, ২৫ যোজন পথ অতিক্রম করিতে ৭মাস ৭দিন অতিবাহিত হয়। ৮০হাত গভীর গর্ত্ত খনিত হইয়া তন্নিম্নে সুদৃঢ় লৌহশলাকা স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে লৌহশলাকা নির্ম্মিত মন্দির প্রবিষ্ট করান হয়। সেই মন্দির মধ্যে ছয়টী স্বর্ণ নির্ম্মিত বাক্সে বুদ্ধদেবের ভস্মাবশেষ সংস্থাপিত হয়। বুদ্ধদেবের পিতামাতা এবং ৮০জন প্রধান শিষ্যের প্রতিমূর্ত্তি তৎসঙ্গে লৌহ মন্দিরে সমাহিত হয়।

অজাতশত্রু পুরাতন রাজগৃহ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বৈভার ও বিপুল পর্ব্বতের পাদমূলে নূতন রাজগৃহে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। বৈভার পর্ব্বতের উত্তরাংশে সত্তপাণি গুহার সম্মুখস্থ রাজগৃহের এক প্রকাণ্ড প্রাসাদে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির অনতিবিলম্বে, তাঁহার মত ও উপদেশ সকল একত্র সংগ্রহের জন্য বৌদ্ধদিগের প্রথম বিরাট সভা আহুত হয়। মগধরাজ অজাতশত্রু তাহা সুনির্ব্বাহ করিতে বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁহার রাজ্য কোশল, মিথিলা, কাশী ও অযোধ্যা(বৈশালী)পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি মিথিলা হইতে তুরাণীয় শকজাতিকে প্রাচীন বিদেহ হইতে দূরীভূত করিয়া স্বীয় রাজ্য সম্প্রসারিত করেন।

অজাতশত্রুর পর হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত মগধের সিংহাসনে যে সকল নৃপতি আরোহণ করেন, তাঁহাদের সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁহাদের নাম সম্বন্ধেও পালী মহাবংশের সহিত বিষ্ণুপুরাণ, দিব্যাবদান ও অশোকাবদান গ্রন্থের বিলক্ষণ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত উভয় গ্রন্থের তিনখণ্ড প্রতিলিপি নেপাল হইতে সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ হগসন (B. H. Hodgson) সাহেব আনয়ন পূর্ব্বক কলিকাতা, লণ্ডন ও প্যারিস নগরীর এসিয়াটিক সোসাইটী সভায় প্রেরণ করেন। মহারাজ অশোকের গুরু উপগুপ্ত স্বীয় শিষ্যকে যে সকল নীতিবিষয়ক গল্প ও উপদেশ প্রদান করেন, তাহা গল্পময় অশোকাবদানের শেষে নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার প্রথমার্দ্ধে সম্রাট অশোকের জীবনী বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী পাটলী পুত্র (পালিবোথ্র) নগরে মহারাজ অশোকের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার নিকটে কুক্কুট বিহারের সংলগ্ন উপকণ্ঠিকারথ নামক উদ্যানে বৌদ্ধাচার্য্য

জয়শ্রী আপনার শিষ্যদিগকে অশোকের জীবনী বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। এই সকল উপদেশ অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় 'অশোকাবদান' লিখিত হয়। ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় এই 'অশোকাবদান' অবলম্বনে রাজাধিরাজ অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ বিষয়ে একটী প্রবন্ধ রচনা করেন। নেপাল হইতে 'অশোকাবদান' চীনদেশে নীত হইয়া অনুবাদিত হয়। অশোকাবদান ও দিব্যাবদানে অশোকের পিতামহ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের নাম পর্য্যন্ত দেখা যায় না। সিংহলের পালী মহাবংশের নির্দ্দেশ অধিকতর প্রামাণিক বোধে, আমরা মগধের রাজবংশাবলী তাহা হইতে গ্রহণ করিলাম। বিষ্ণুপুরাণে রাজা বিম্বিসারের পূর্ব্বতন চারি পুরুষের নাম লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। নিম্নে এই চারি পুস্তক হইতে মগধের রাজবংশাবলী ডাক্তর মিত্রের প্রবন্ধ হইতে প্রদর্শিত হইল।

পালী মহাবংশ	অশোকাবদান	বিদ্যাবদান	বিষ্ণুপুরাণ	সিংহলের রাজা	বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান যাজক
			শিশুনাগ		
			কাকবর্ণ		
			ক্ষেমধর্ম্মন		
ভাতীয়			ক্ষত্রৈয়		
বিম্বিসার (৫৭)	বিম্বিসার	বিম্বাসার	বিম্বিসার		বুদ্ধদেব
অজাতশক্র (৩২)	মহীপাল	অজাতশক্র	অজাতশক্র	বিজয়সিংহ	উপালি
উদয়িভদ্রক(১৬)	উদয়ীশ	উদয়ী	দর্ভক		
অনুরুধক		উদয়িভব (মুরী)	উদয়াসব		
মুণ্ড	মুণ্ড		নন্দিবর্দ্ধন		
নাগদশক	কাকবর্ণি	কাকবর্ণি	মহানন্দ	পাণ্ডুবাস	দাসক
	সহলি	সহলি			
	তুরকুরি	তুলকুচি	{সুমাল্যাদি নব নন্দ	পাণ্ডুকাভয়	শোনক
শিশুনাগ (১০)	মহামণ্ডল	মহামণ্ডল			
কালাশোক(৩৬)	প্রসেনজিৎ	প্রসেনজিৎ			
ঐ ১০ পুত্র (২২)	নন্দ	নন্দ	চন্দ্রগুপ্ত		সিগ্‌গব
চন্দ্রগুপ্ত (২৪)			বিন্দুসার		মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য
বিন্দুসার (২৮)	বিন্দুসার	বিন্দুসার			
অশোক (৩৭)	অশোক	অশোক	অশোক	মুতাসিব	মহেন্দ্র

মহাবংশ ও দীপবংশের মতে বিম্বিসার ৫৭ বৎসর, অজাতশক্র ৩২, উদয়িভদ্রক ১৬, শিশুনাগ ১০, শিশুনাগের দশজন ভ্রাতা ২২, চন্দ্রগুপ্ত ২৪এবং অশোক ৩৭ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। দীপবংশে কালাশোক বা মহানন্দের নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত দেখা যায় না। এই মহানন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার নয় পুত্র মগধের সাম্রাজ্য সম্মিলিতভাবে শাসন করেন। পুরাণে ইঁহাদের মধ্যে সুমাল্য, মহাপদ্ম, নন্দ ও ধননন্দের নাম পাওয়া যায়। বিশাখ দত্ত রচিত

মুদ্রারাক্ষস নাটকের পূর্ব্বপীঠিকায় অনন্ত কবি লিখিয়াছেন যে, সুধন্বা রাজা নন্দের ঔরসে রত্নাবলী মহিষীর গর্ভে উদগ্রধন্বা, তীক্ষ্ণধন্বা, বিকটধন্বা, উৎকটধন্বা, প্রকটধন্বা, সংঘটধন্বা, বিষমধন্বা, শিখরধন্বা ও প্রখরধন্বা নামে নয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই সকল নাম কবির কল্পনা প্রসূত বলিয়া বোধ হয়। ১৮৭৫ খ্রীঃ কর্ণালে মহারাজ কুনন্দের নামাঙ্কিত একটী মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। পালী অক্ষরে তাহাতে 'রাজ্ঞ কুনন্দস্য অমোঘভ্রাতিস্য মহারাজস্য' এই কয়েকটী শব্দ অঙ্কিত ছিল। শেষ নন্দের রাজত্বকালে ৩২৭ খ্রীঃ পূঃ মহাবীর আলেকজাণ্ডার পঞ্জাব আক্রমণ করেন। ইহাদের উচ্ছেদ চাণক্যের বুদ্ধিকৌশলে সাধন করিয়া, অনুমান ৩১৬খ্রীঃ পূঃ অব্দে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত পাটলী পুত্র নগরে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মগধে মৌর্য্যবংশের আধিপত্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নবযুগের আরম্ভ হয়। ঐতিহাসিক কাল গণনা প্রথমতঃ আরম্ভ হয়। রাজগৃহ হইতে ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী পাটলিপুত্র (কুসুমপুর মহাবীর আলেকজাণ্ডারের বা পুষ্পপুর) রাজধানী নীত হইয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে মগধ সম্রাটের অপ্রতিহত প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির সময়ে সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধাচার্য্য উপালীর বয়স ৪৪ বৎসর ছিল : তিনি শিষ্যদিগকে বৌদ্ধশাস্ত্রীয় ত্রিপিটক শিক্ষা দিয়া, বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম সবিশেষ প্রচারিত করেন। নির্ব্বাণ প্রাপ্তির(৫৪৩ খ্রীঃ পূঃ) পর ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রধান আচার্য্যের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ৭৪ বৎসর বয়সে আচার্য্য উপালির মৃত্যু ঘটে। ৫১৩ খ্রীঃ পূঃ এই ঘটনা সংঘটিত হয়। উপালির প্রিয় শিষ্যদাসক বৌদ্ধাচার্য্যের গৌরবান্বিত পদে অধিরূঢ় হন।

মহাবংশ ও দীপবংশের নির্দ্দেশ অনুসারে খ্রীঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণলাভ করেন এবং তাঁহার ২১৮ বৎসর পরে খ্রীঃ পূঃ ৩২৫ অব্দে মহারাজ অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অশোকের রাজ্যারম্ভকাল খ্রীঃ পূঃ ২৬০ অব্দ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। এই গণনা অনুসারে দীপবংশ ও মহাবংশের সময় নির্দ্দেশে ৬৫ বৎসরের ভ্রম পাওয়া যাইতেছে। আমরা বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধানে খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন ৫৫৮ বর্ষ হইতে ১৯৩ অব্দ পর্য্যন্ত মহাবংশ ও দীপবংশের সুপণ্ডিত টার্ণার ও বুলার সাহেব কৃত আংশিক মূল ও অনুবাদ এবং অন্যান্য গ্রন্থ প্রবন্ধাদি দৃষ্টে যে সময় নির্ণয়তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রদর্শন করিলাম। বৌদ্ধ সাহিত্য অপার সমুদ্র বিশেষ। তাহার যথোচিত আলোচনা অদ্য পর্য্যন্তও হয় নাই। যথাসাধ্য চেষ্টায় যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা যে ভ্রম প্রমাদ শূন্য হইবে,এমত আশা করিতে পারি না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সময় নির্ণয় বড়ই দুরূহ ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা হইতেছে,তদ্দ্বারাই ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কৃত হইতেছে। সুপণ্ডিত Rhys Davids সাহেব দীপবংশের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া, অশোক ও বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির অন্তর ১৫০বৎসর মাত্র অনুমান করেন। তাঁহার অনুমান যে কল্পিত ও অমূলক,তাহাতে সন্দেহ নাই।

খ্রীঃ পূঃ ৫৫৮ কপিলবস্তু নগরে শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থের (বুদ্ধদেব) মহামায়ার গর্ভে জন্ম।

খ্রীঃ পূঃ ৫৪২ কলির রাজা সুপ্রবোধের তনয়া যশোধারার সহিত বুদ্ধদেবের বিবাহ।

খ্রীঃ পূঃ ৫২৯ বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন।

,, ,, ৫৫৩ মগধরাজ ভাতীয়ের পুত্র বিম্বিসারের রাজগৃহে জন্ম।

,, ,, ৫৩৮ রাজা ভাতীয়ের মৃত্যু ও বিম্বিসারের সিংহাসন প্রাপ্তি।

,, ,, ৫২৩ বুদ্ধদেবের রাজগৃহে আগমন ও বিম্বিসারের নিকট ধর্ম্মপ্রচার।

,, ৫২২ বৌদ্ধাচার্য্য উপালির জন্ম।

,, ৫২০ নালন্দায় সারীপুত্রের নির্ব্বাণ লাভ ও বুদ্ধদেবের রাজগৃহ হইতে কপিলবস্তু নগরে পিতামাতার অনুরোধে গমন।

,, ৪৮৬ রাজা বিম্বিসারের মৃত্যু ও অজাতশত্রুর মগধে রাজত্ব আরম্ভ।

,, ৪৭৮ বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভ ও সিংহপুরের রাজকুমার বিজয়সিংহের সিংহলে রাজত্বপ্রাপ্তি।

,, ৪৫৪ মগধরাজ অজাতশত্রুর মৃত্যু ও উদয়ভদ্রের রাজপদ প্রাপ্তি।

,, ৪৪৮ প্রধানতম বৌদ্ধাচার্য্য উপালির মৃত্যু ও তাঁহার শিষ্য দাসকের তৎপদে নিযুক্তি।

,, ৪৪১ রাজা বিজয়সিংহের সিংহল দ্বীপে মৃত্যু।

,, ৪৩৯ বিজয়সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস বঙ্গদেশ হইতে গমন ও সিংহলের রাজপদ প্রাপ্তি।

,, ৪৩৮ মগধরাজ উদয়ভদ্রের মৃত্যু।

,, ৪৩০ নাগদশকের মগধের সিংহাসনপ্রাপ্তি।

খ্রীঃ পূঃ ৪০৯ সিংহলরাজ পাণ্ডুবাসের মৃত্যু।

,, ৪০৬ মগধরাজ নাগদশকের মৃত্যু ও শিশুনাগের রাজ্যপ্রাপ্তি।

,, ৩৯৮ প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য দাসকের মৃত্যু ও তাঁহার শিষ্য শোনকের তৎপদে নিযুক্তি।

,, ৩৯৬ রাজা শিশুনাগের মৃত্যু ও তৎপুত্র কালাশোক মহানন্দের রাজ্যলাভ।

,, ৩৭৮ দ্বিতীয়বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘের বৈশালী নগরে অধিবেশন।

খ্রীঃ পূঃ ৩৬০ কালাশোকের মৃত্যু ও সুধন্বানন্দের মগধের সিংহাসন লাভ।

,, ৩৫৪ আচার্য্য শোনকের মৃত্যু ও তাঁহার শিষ্য চণ্ডবজ্রের তৎপদপ্রাপ্তি।

,, ৩৩৮ কুনন্দাদি নব নন্দতনয়ের রাজ্যলাভ, ও নন্দের মৃত্যু।

,, ৩১৬ নন্দবংশের উচ্ছেদ ও চন্দ্রগুপ্তের মগধের সিংহাসন লাভ।

,, ৩১৫ সিরিয়ার রাজা সেলিউকাস নাইকেটরের পঞ্জাব আক্রমণ।

,, ৩০৫ মহারাজ অশোকের জন্ম।

,, ৩০২ আচার্য্য সিগ্‌গবের মৃত্যু ও মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্যের তৎপদে নিযুক্তি।

,, ২৯২ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু ও তৎপুত্র বিন্দুসারের রাজপদ প্রাপ্তি।

,, ২৭৭ অশোকের উজ্জয়িনীর শাসনকার্য্যে নিযুক্তি।

,, ২৭৪ অশোকের পুত্র মহেন্দ্রের জন্ম।

,, ২৭২ মহেন্দ্রের কনিষ্ঠা ভগিনী সঙ্ঘমিত্তার জন্ম।

,, ২৬৪ রাজা বিন্দুসারের মৃত্যু ও রাজকুমারগণের বিরোধে অশোকের জয়।

,, ২৬০ সাম্রাজ্যে বিদ্রোহদমনের পর মহারাজ অশোকের পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অভিষেক।

,, ২৫৭ গুরু উপগুপ্ত হইতে মহারাজ অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও নিগ্রোধের বৌদ্ধধর্ম্ম যাজকের পদে অভিষেক।

,, ২৫৬ অশোকের ভ্রাতা তিষ্যের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও এণ্টিয়োকাসের সহিত সন্ধি।

,, ২৫৪ মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্তার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ।

,, ২৫২ কুন্তীবংশীয় বৌদ্ধরাজকুমার তিষ্য ও সুমিত্রকের মৃত্যু।

,, ২৫১ অশোকের প্রথম খোদিত শাসনলিপি প্রচার এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার।

,, ২৪৯ মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোকের দ্বিতীয় শাসনলিপি প্রচার।

,, ২৪৮ পার্থিয়ায় বিদ্রোহ।

,, ২৪৬ বাক্ট্রিয়ায় বিদ্রোহ।

,, ২৪৪ রাজকুমার মহেন্দ্রের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক পদে নিযুক্তি।

,, ২৪২ তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘের অধিবেশন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারার্থ মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্তার সিংহলযাত্রা এবং বরাবর পর্ব্বতগুহায় শাসনলিপি প্রচার।

,, ২৩৪ প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্যের মৃত্যু ও রাজকুমার মহেন্দ্রের তৎপদে অভিষেকএবং আলাহাবাদের স্তম্ভলিপি প্রচার।

,, ২৩১ অশোকের প্রথমা রাজ্ঞী অসন্ধিমত্যার মৃত্যু।

,, ২২৮ অশোকের দারান্তর গ্রহণ।

,, ২২৬ নবীনা রাজ্ঞীর বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম বিনাশের চেষ্টা।

,, ২২৫ মহারাজ অশোকের সিংহাসন পরিত্যাগ।

,, ২২৪ সহস্রাম ও রূপনাথের খোদিত শিলালিপি প্রচার।

,, ২২৩ মহারাজ অশোকের মৃত্যু।

,, ২০২ সিংহল-রাজ উণ্ডিয়ের রাজ্যাভিষেক।

,, ১৯৪ প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য মহেন্দ্রের সিংহলে মৃত্যু।

,, ১৯৩ মহেন্দ্রের ভগিনী সঙ্ঘমিত্তার সিংহলে মৃত্যু।

,, ১৬১ সিংহলরাজ দুথগামিনীর রাজ্যাভিষেক।

মগধ বৌদ্ধধর্ম্মের স্মৃতিগৃহ। মগধেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথমবিকাশ হয় এবং বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমের তলে যোগাসনে বসিয়া বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করেন। প্রাচীন ও পবিত্রতায় মগধের সমকক্ষ হইতে পারে, ভূমণ্ডলে এমন স্থান বোধ হয় আর নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্রতার তীর্থস্থান গুলি এক্ষণে গয়া ও পাটনা জেলার অন্তর্ভুক্ত। মগধরাজ অজাতশত্রুর রাজত্বের অষ্টমবর্ষে বুদ্ধদেব সমাধিমগ্ন হইয়া কুশীনগরে নির্ব্বাণ (মোক্ষ) লাভ করেন। বুদ্ধদেবের প্রিয়তম শিষ্য আনন্দের রাজগৃহে জন্ম হয়। কাশ্যপ শোকে রাজগৃহের বেণুবনে দীক্ষিত হন। ইন্দ্রগুপ্ত রাজগৃহ হইতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুদিগের সহিত সিংহলে গিয়া অনুরাধপুরের প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের ৬১, দিন পরে রাজা অজাতশত্রুর বিশেষ সাহায্যে ও উদ্যোগে বৌদ্ধদিগের প্রথম মহাসঙ্ঘ রাজগৃহে সমবেত হয়। এই মহাসঙ্ঘে বৌদ্ধধর্ম্মের আদিম পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক গুলি একত্র সঙ্কলিত ও লিপিবদ্ধ হইয়া তিন অংশে (পিটকে) বিভক্ত হয়। বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত শিষ্যপ্রদত্ত উপদেশাবলী সূত্রভাগে, বৌদ্ধধর্ম্মের যাবতীয় নিয়মাবলী বিনয়ভাগে, এবং অভিধর্ম্মপিটকে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও দার্শনিক তত্ত্বাবলী প্রাকৃত মাগধী ভাষায় সংগৃহীত হইয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের চিরস্থায়িত্ব বিধান করে। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির শত বৎসর পরে (খ্রীঃ পূঃ ৩৭৮ অব্দে) মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘের অধিবেশন হয়। সভাকামী এই মহাসভার সভাপতি ছিলেন। শোনক সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধানতম আচার্য্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, উত্তরস্থ বৌদ্ধদিগের মতে এই মহাসভা ৩৬৮ খ্রীঃ পূঃ অব্দে পাটলীপুত্র নগরে সমবেত হয়। মহারাজ অশোকের

রাজত্বের অষ্টাদশবর্ষে ও বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির ২৩৬ বৎসর পরে (২৪২ খ্রীঃ পূঃ অব্দে) জগদ্বিখ্যাত সম্রাট অশোকের বিশেষ যত্নে ও উদ্যোগে পাটলীপুত্র (পালিবোথ্র) নগরে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘ সমবেত হয়। মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান ধর্ম্মচার্য্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই বৌদ্ধসঙ্ঘে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ বৌদ্ধমতের সামঞ্জস্য বিধানের বিশেষ চেষ্টা হয়। এই মহাসভায় বৌদ্ধসঙ্ঘে সর্ব্বত্র প্রচারের জন্য চারিদিকে প্রচারক প্রেরণের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়। ২৪২ খৃঃ পূঃ রাজকুমার মহেন্দ্র বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য স্বীয় ভগিনী সঙ্ঘমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া সিংহলের রাজধানী অনুরাধপুরে উপনীত হয়েন। মুতাসিব সেই সময়ে সিংহলের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধানতম ধর্ম্মাচার্য্য মহেন্দ্র সিংহলরাজ উত্তিয়ের রাজত্বের অষ্টমবর্ষে ১৯৪ খ্রীঃ পূঃ মানবলীলা সংবরণ করেন। মহেন্দ্রের সিংহল যাত্রার সময়ে গান্ধার, কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক প্রেরিত হয়।

মহেন্দ্র সিংহলে যাবতীয় বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র (ত্রিপিটক) পাটলীপুত্র হইতে নিজের সঙ্গে লইয়া যান এবং তাহা মাগধীভাষা হইতে সিংহলীভাষায় অনুবাদিত করেন। বুদ্ধদেবের সময়ে তাঁহার উপদেশ বাক্য লিখিত হওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বুদ্ধদেবের প্রিয়শিষ্য অর্হৎ ও শ্রমণগণ গুরুবাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ৬১ দিন পরে ত্রিপিটকের মূল নির্দ্ধারণের জন্য রাজগৃহে প্রথম মহাবৌদ্ধসঙ্ঘের অধিবেশন হয়। ত্রিপিটকের মূল আদ্যোপান্ত শুদ্ধরূপে স্মরণ শক্তির বলে উচ্চারিত হইয়া, সমবেত বৌদ্ধাচার্য্য অর্হৎদিগের অনুমোদন ক্রমে তাহা ভবিষ্যতের জন্য নির্দ্ধারিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মহাসঙ্ঘের * অধিবেশনেও প্রথমাধিবেশনের নির্দ্ধারিত মূল আবৃত্ত হইয়া, তাহার শুদ্ধাশুদ্ধতা নিরূপিত হয়। পূর্ব্বাধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পরবর্ত্তী অধিবেশনে বিবৃত ও গৃহীত হয়। ত্রিপিটক এইরূপে লিপিবদ্ধ না হইয়া বৌদ্ধাচার্য্য অর্হৎ ও ভিক্ষুদিগের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির প্রভাবে ৪০০ বর্ষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয়। অবশেষে রাজা বত্মগামিনীর সময়ে (১০৪-৭৬ খ্রীঃ পূঃ) পিটকত্রয় ও তাহার অর্থকথা (ভাষ্য) সিংহল দ্বীপে তাহা প্রথমতঃ লিপিবদ্ধ হইয়া ত্রিপিটকের চিরস্থায়িত্ব বিধান করে। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ পালীভাষায় লিখিত এবং নেপালীয় বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থাবলী সংস্কৃত ভাষায় প্রথমতঃ লিখিত হইয়া তিব্বতী, চৈনিক ও মঙ্গোলীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। সিংহল হইতে প্রাচীনতর বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আরাকান, পেগু, ব্রহ্মদেশ, সায়াম, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম পূর্ব্বক জাপানে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সিংহলীয়

* উত্তরীয় বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থাদির মূল বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির ৫০০ বৎসর (তিব্বতীয় জনপ্রবাদ মতে ৪০০ বৎসর) পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পরাক্রান্ত শকরাজ কনিষ্কের রাজত্বকালে কাশ্মীরে স্থিরীকৃত ও নির্দ্ধারিত হয়। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির ২৩৬ বৎসরের মধ্যে যাহার মূল তিনবার মহাসঙ্ঘের অধিবেশনে স্থিরীকৃত ও পরিশোধিত হইয়াছে, তাহা যে ৪০০ কি ৫০০ বৎসর পরের নির্দ্ধারণ অপেক্ষা অধিক প্রামাণিক ও সারবান হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। এই কনিষ্ক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি যে শকাব্দের প্রবর্ত্তক নহেন, তাহা স্থলান্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম যে অতি প্রাচীন ও অধিক প্রামাণিক, তাহা সুপণ্ডিত হগ্‌সন্ সাহেবকেও অবশেষে স্বীকার করিতে হইয়াছে। টার্ণার, বিল, ডেভিডস্, কারণ, ওয়েবার প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বহুতর যুক্তি তর্কের অবতারণা দ্বারা সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা পালী বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব, সারবত্তা ও প্রামাণিকত্ব প্রাতিপাদন করিয়াছেন। *

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে 'দীপবংশ' ও পঞ্চম শতাব্দীতে 'মহাবংশ' নামক দুই পালী গ্রন্থে সিংহলীয় বৌদ্ধধর্ম্ম ও রাজবংশের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থকার তারানাথ ১৬০৮ খৃঃ অব্দে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস লিখিয়াছেন। ভট্টঘটি, ইন্দ্রদত্ত ও ক্ষেমেন্দ্রভদ্র তাঁহার পূর্ব্বতন উত্তরীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসলেখক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তারানাথেরগ্রন্থে প্র সঙ্গক্রমে বাঙ্গলার ইতিহাসও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তারানাথের তিব্বতী ভাষায় রচিত ইতিহাস এবং অন্যান্য তিব্বতীয় ও চীনদেশীয় পুস্তক অবলম্বনে ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে সুপণ্ডিত ওয়াসিলজিউ (W. Wassilijew) রুসীয় ভাষায় উত্তরীয় বৌদ্ধধর্ম্মের এক ইতিহাস লিখিয়াছেন। ১৮৬৯খ্রীঃ জার্ম্মেন পণ্ডিত সিফনার তারানাথের গ্রন্থ জার্ম্মেন ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিতবর বার্ণুফের ন্যায় রুসিয়াবাসী ওয়াসিলজিউ উত্তরীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস অধ্যয়ন ও সংগ্রহে চিরজীবন অতিবাহিত করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস আমাদের এক্ষণে আলোচ্য বিষয় নহে। যথোচিত ভাবে তাহা লিখিয়া সম্পন্ন করা আমাদের সাধ্যাতীত বিরাট ব্যাপার। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসলেখকের সংস্কৃত, পালী, তিব্বতী, চীনীয় ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তির সহিত ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসের সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মগধের পুরাবৃত্ত বৌদ্ধধর্ম্মের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাসের সহিত অতি ঘনিষ্ট ভাবে সংসৃষ্ট বলিয়া, আমরা সংক্ষেপে সেই বিষয়ে দুইচারি কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি।

রাজগৃহের প্রথম মহাবৌদ্ধসঙ্ঘে ৪৭৮ খ্রীঃপূঃ বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র তিনভাগে বিভক্ত হয় বলিয়া, ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বিনয়-পিটক পাঁচ অংশে বিভক্ত। তাহাতে ৪২২৫০ টী গাথা বা শ্লোক আছে। বিনয়-পিটকের ভাষ্যে ২৭০০০ গাথা আছে। সূত্র-পিটক সাতভাগে বিভক্ত। তাহাতে ১৪২২৫০টী গাথা ও তাহার ভাষ্যে ২৫৪২৫০টী গাথা আছে। অভিধর্ম্ম-পিটকে ৯৬২৫০টী গাথা এবং তাহার ভাষ্যে ৩০০০০টী গাথা আছে

* উত্তরীয় ও দক্ষিণীয় বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচীনত্ব বিষয়ে সুপণ্ডিত হগসন্ টার্ণার সাহেবের দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তর্ক বিতর্ক চলে। ১৮৩৫ খ্রীঃ সিংহলে টার্ণার সাহেব মহাবংশের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৩৮ খ্রীঃ তিনি দীপবংশও অনুবাদ করেন। মূলে উভয় পালী গ্রন্থের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৫০ খ্রীঃ R. Spence Hardy সাহেব Eastern monarchism এবং ১৮৫৩ খ্রীঃ Manual of Buddhism প্রকাশ করেন। পাদরি Bigandet ব্রহ্মদেশীয় পালী ও Alabaster সায়ামের ভাষা হইতে বুদ্ধদেবের জীবনী অনুবাদিত করিয়াছেন। Fausboll, Rhys Davids, Childers, Mason, Senart, মধুকুমারস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পালী ভাষার আলোচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

Csoma Korosi, B. H. Hodgson, Foneaux, Schmidt, Feer, Beal, W. Wassiljew, Schiefner, Bumony, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু শরচ্চন্দ্র দাস ও প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ নেপালী ও তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনায় বিখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

বলিয়া শুনা যায়। যাবতীয় পিটকে ৮৪০০০ খণ্ড, ৭৩৭০০০ গাথা (ভাষ্য সহ) এবং ২৯-৩৬৮০০০ অক্ষর আছে।

৩১৬ খ্রীঃ পূঃ মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া মগধে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্ত (তমলুক) পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তৃত হয়। অনুমান ৩১৫ খ্রীঃ পূঃ সেনাপতি ও সিরিয়ার পরাক্রান্ত রাজা সেলিউকাস নিকেটর পঞ্জাব আক্রমণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের নিকট আপনার কন্যা সম্প্রদান করিয়া,মগধসম্রাটের সহিত সন্ধিবন্ধন করিতে বাধ্য হন। ৩১২ খ্রীঃ পূঃ তিনি স্বরাজ্যের বিদ্রোহ দমনার্থ ব্যাবিলনে প্রত্যাবৃত হন। মিগাস্থিনিস নামে জনৈক সুচতুর গ্রীক সেলিউকাসের দূতরূপে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্রে অবস্থিতি করিতে আদিষ্ট হন। গ্রীক দূতের লিখিত বিবরণে ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা সবিশেষ বর্ণিত আছে।

চন্দ্রগুপ্তের মগধ সাম্রাজ্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় রাজগৃহ হইতে ভাগীরথী ও শোনের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটলীপুত্র নগরে মগধের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। চাণক্যের বুদ্ধি কৌশলে নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধে প্রতিষ্ঠিত হন। এই ঘটনা অবলম্বনে বিশাখদত্ত "মুদ্রা রাক্ষস" নাটক রচনা করেন। ২৪ বৎসর রাজত্বের পর স্বীয় পুত্র বিন্দুসারের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত লোকান্তর গমন করেন। চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার উভয়েই হিন্দুধর্ম্মের অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। বিন্দুসার ২৮ বৎসর রাজত্বের পর মৃত্যু মুখে পতিত হন। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্ত মুরা নাম্নী নাপিতানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাজান্তঃপুরের দাসী মুরার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত এই বংশ মগধে প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া, ইহা মৌর্য্যবংশ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। ৩২৭ খ্রীঃ অব্দে শেষ নন্দের সময়ে আলেক্জাণ্ডার পঞ্জাব আক্রমণ পূর্ব্বক শতদ্রুর তীরপর্য্যন্ত অগ্রসর হন। চন্দ্রগুপ্ত মগধ হইতে পলায়ন করিয়া পঞ্জাবে উপনীত হন। আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার শিবিরে তিনি কয়েক দিন অবস্থিতি করেন এবং মগধ আক্রমণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। চন্দ্রগুপ্তের ধৃষ্টতায় দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে, চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক্ সম্রাটের শিবির হইতে পলায়ন করেন। আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্ত্তনের পর চন্দ্রগুপ্ত কিছুকাল পঞ্জাবে অবস্থিতি করিয়া একদল সেনা সংগ্রহ করেন। তাঁহাদের সাহায্যে ও চাণক্য পণ্ডিত নামে এক নন্দবিদ্বেষী ব্রাহ্মণের মন্ত্রণাকৌশলে নন্দবংশীয় শেষ রাজাকে পরাস্ত করিয়া, মগধের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। তিনি সুধন্বানন্দের জারজপুত্র বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। নন্দবংশের সহিত তাঁহার কোনরূপ সংস্রব না থাকিলে,মগধে তাঁহার আধিপত্য এত সহজে ও অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না।

চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রে আপনার রাজধানী সংস্থাপন করেন। রাজধানী দীর্ঘে ৪ ক্রোশ এবং প্রশস্ততায় প্রায় ১ক্রোশ পরিমিত ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠময় উন্নত প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, প্রাচীরের বহির্ভাগে বিস্তীর্ণ জলপূর্ণ পরিখা খনিত হইয়াছিল। নগর প্রবেশের জন্য ৬৪টী দ্বার বিদ্যমান ছিল। পরিখা ৪০০হাত প্রশস্ত ও ৩০ হাত গভীর ছিল। প্রাচীর গাত্রে ৫৭০টী অস্ত্রাগার ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় গ্রীকদূত মেগা-

স্থিনিস দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে চন্দ্রগুপ্তের অসীম ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির সহিত হিন্দুদিগের সভ্যতার প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষে ১১৮টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। চন্দ্রগুপ্ত এই সকল রাজ্যের অধিকাংশে আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। মগধে ইতিপূর্ব্বে যে সকল রাজা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় ক্ষমতাশালী ও পরাক্রান্ত ছিলেন না। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

"রূপসনাতন" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

বর্ত্তমান ১৩০১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের "নব্যভারত" পত্রে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়, বৈষ্ণবাচার্য্য রূপ ও সনাতন গোস্বামী এবং আনুষঙ্গিক ভগবান চৈতন্যদেবের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া "রূপ ও সনাতন গোস্বামী" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ পাঠে কতিপয় কৃতবিদ্য বৈষ্ণব বন্ধু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রতিবাদ নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। যদিও স্বেচ্ছাচার-প্রসূত উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করা বিড়ম্বনা মাত্র, তথাপি বৈষ্ণব বন্ধুগণের অনুমতি পালন অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে প্রতিবাদ করিতে হইল।

বটব্যাল মহাশয় প্রথমতঃই ইতিহাস-নিরপেক্ষ হইয়া লিখিয়াছেন, "এই দুই ভ্রাতার (রূপ সনাতনের) প্রকৃত অর্থাৎ পিতা মাতার রক্ষিত নাম কি ছিল, তাহা জানা যায় নাই," ইত্যাদি। বাস্তবিক একথা প্রামাণিক নহে; রূপ ও সনাতনই যে আদি নাম, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা রূপ সনাতনের প্রথিত নামা ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামীর লিখিত নিজ বংশাবলী এস্থলে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিতেছি (১)। বিষয়ে লিপ্ত থাকা কালে ইহাঁদিগের প্রকৃত নামের পরিবর্ত্তে "সাকর মল্লিক" ও দবির খাস" নাম সাধারণ্যে প্রচলিত হয়। চৈতন্য দেব, পরিশেষে সেই পূর্ব্ব নামেরই প্রচার করিয়াছেন। পরন্ত মোরগ্রাম মাধাইপুরে রূপ সনাতনের বাল্যকাল অতিবাহিত হয় নাই; পূর্ব্ব বঙ্গের বাকলা চন্দ্রদ্বীপ ও ফতোয়াবাদ গ্রামে পিতৃভবনে ইহারা লালিত পালিত হইয়াছেন। রূপ সনাতনের পিতা কুমার দেব নৈহাটির পূর্ব্ব বাস পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন, জীব গোস্বামীর লিখিত বংশাবলী ও "ভক্তিরত্নাকর" প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিশদ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় (২)। পরন্ত রূপ গোস্বামী যে "সাকরমা" গ্রামে বাস করিয়াছেন, ইতিহাসে ইহার কোন প্রমাণ নাই। উভয় ভ্রাতাই যে রামকেলী গ্রামে বাস করিয়াছেন, ইহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় (৩) তবে

(১) আদিঃ শ্রীল সনাতন স্তদনুজ শ্রীরূপ নামাততঃ।
ইত্যাদি।

(২) জ্ঞাতিবর্গ হইতে উদ্বেগ হইল মনে।
ছাড়িলেন নরহট্ট গ্রাম সেইক্ষণে॥
নিজগণ সহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা।
বাকলা চন্দ্র দ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা॥
যশোরে ফতোয়াবাদ নামে গ্রাম হয়।
গতায়াত হেতু তথা করিলা আলয়॥
(ভক্তিরত্নাকর ১ তরঙ্গ)

উক্ত প্রমাণানুসারে জানা যাইতেছে, রূপ সনাতনের পিতা কুমার দেবের দুই স্থানে দুইটি বাটী ছিল।

(৩) গৌড়ে রামকেলী গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস॥ ইত্যাদি
(ভক্তিরত্নাকর)

'সাকর মল্লিক' হইতে "সাকরমা" গ্রামের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। কেননা আজিও প্রধান ব্যক্তিদিগের নামে গ্রাম নগরের নামকরণ হইতে দেখা যায়।

রূপ-সনাতন, এই পিতৃ ভবনেই লালিত পালিত ও সংস্কৃত পারস্যাদি ভাষাতে শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ইঁহাদিগের বিদ্যা-বুদ্ধির প্রসংশাবাদ নানা দেশে ঘোষিত হওয়াতে গৌড়াধিপতি হোসেন সাহ ইঁহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যান, এবং রাজ্যের সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করেন। ভক্তি রত্নাকরানুসারে জানা যায়, গৌড়াধিপতি ইঁহাদিগকে একটি রাজ্য ও প্রদান করিয়াছিলেন। (৪)

কতকগুলি অনভিজ্ঞ লোকের ন্যায় বটব্যাল মহাশয় রূপ সনাতনকে যে ম্লেচ্ছ কুলোৎপন্ন বলিয়া স্থির করেন নাই, ইহাতে তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তবে তিনি যে কারণে রূপ সনাতনের হিন্দুত্বে বিশ্বাস করিয়াছেন, তদপেক্ষা সুস্পষ্ট আরও কারণ আছে, তাহা রূপ সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র বৈষ্ণব দর্শন প্রণেতা জীব গোস্বামীর লিখিত বংশাবলী ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ও বংশাবলী অনুসারে রূপ সনাতনকে ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন বলিয়া জানা যায়। আরও জানা যায় যে, ইঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা ছিলেন। (৫)

বটব্যাল মহাশয় "বোধহয়" শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, আমরা ইতিহাসের আশ্রয়ে তদ্বিপরীতে বলিতে সাহসী হইতেছি যে, রূপসনাতন নবদ্বীপে অধ্যয়ন করেন নাই, এবং পাঠদ্দশাতে চৈতন্য দেবের সহিত তাঁহাদিগের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

দুই ভ্রাতার মধ্যে কে বড় কে ছোট, এ বিষয়ে বৈষ্ণব ইতিহাসে কিছুমাত্র মত ভেদ নাই। কোন সন্দেহেরও কারণ নাই। সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থেই সনাতনের জ্যেষ্ঠত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রূপের নাম পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয় বলিয়া কেহ কেহ রূপের জ্যেষ্ঠত্ব অনুমান করেন; কিন্তু বৈষ্ণব সমাজে এ বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। রূপ গোস্বামী অগ্রে সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন বলিয়া সনাতনের অভিমতানুসারেই তাঁহার নাম অগ্রে কীর্ত্তিত হয়। হোসেন সাহ সনাতনকে তিরস্কারের সময় "তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার" ইত্যাদি যাহা বলেন, তাহাতে "বড় ভাই" শব্দ রূপ গোস্বামী সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই,

---

(৪) সনাতন রূপ মহামন্ত্রী সর্ব্বাংশেতে।
শুনিলেন রাজা শিষ্ট লোকের মুখেতে॥
গৌড়ে রাজা যবন অনেক অধিকার।
সনাতন রূপে আনি দিল রাজ্য ভার॥
ম্লেচ্ছ ভয়ে বিষয় করিল অঙ্গীকার।
এ দুই প্রভাবে রাজ্য বৃদ্ধি হইল তার॥
রাজা হর্ষে দিল রাজ্য পৃথক্ করিয়া।
রাজ্য ভোগ করয়ে কিঞ্চিৎ কর দিয়া॥ ইত্যাদি।
(ভক্তিরত্নাকর)

(৫) রেজে রাজসভা সভাজিত পদঃ কর্ণাট ভূমী পতিঃ।
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু ভুবি ভরদ্বাজান্বয় গ্রামণী॥
(বংশাবলী)

শ্রীজীব গোস্বামীর সপ্ত পুরুষ প্রচার।
প্রথম হইতে নাম করি তা সবার॥
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু নাম বিপ্ররাজ।
মহাপূজ্য যজুর্ব্বেদী গোত্র ভরদ্বাজ॥
সর্ব্ববেদে অধ্যাপক মহাপরাক্রম।
কর্ণাট দেশের রাজ নাহি যার সম॥ ইত্যাদি
(ভক্তিরত্নাকর)

সনাতনের অগ্রজ সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। সনাতনের যে আরও জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন, জীবকৃত বংশাবলীই তাহার প্রমাণ। কুমার দেবের কেবল ৩ টি মাত্র পুত্র নহে; অনেক গুলি পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছিল। কুমার দেবের পুত্রগণের মধ্যে রূপসনাতন সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছেন। (৬)

কনিষ্ঠ অনুপমও চৈতন্য দেবের কৃপা পাত্র বলিয়া ইতিহাসে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই। এই রূপ রূপসনাতনের অনেক গুলি ভ্রাতুষ্পুত্র সত্বে ও এক মাত্র জীবই ভগবৎ কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। অতএব হোসেন-সাহ সনাতনের তিরস্কার উপলক্ষে যে"বড়ভাই" শব্দের উল্লেখ করেন, তাহা রূপগোস্বামীর পরিচায়ক নহে, ইহা প্রতিপন্ন হইল। পরন্তু সনাতন গোস্বামী যে রূপগোস্বামীর জ্যেষ্ঠ, অধিকাংশ বৈষ্ণব গ্রন্থেই ইহার বিশদ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়,সন্দেহ করিবার কিছু-মাত্র কারণ নাই। অতএব বটব্যাল মহাশয়ের রূপ গোস্বামীকে দুরাচার দুর্জ্জনরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এস্থলে নিতান্তইব্যর্থ হইতেছে।

রূপ সনাতন যে ম্লেচ্ছ সংসর্গে কথঞ্চিত দূষিত হইয়াছিলেন, একথা অস্বীকার্য্য নহে, দূষিত হইয়াছিলেন বলিয়াই চৈতন্য দেবের কাছে "ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম" ইত্যাদি দৈন্যোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবং এই কারণ বশতঃই ইহারা জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই। পরন্তু "দরবেশ হইয়া আমি মক্কাতে যাইব" ইত্যাদি কথা যবনকারাধ্যক্ষের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় জানিয়া তিনি বলিয়াছিলেন। আর, পথে পাছে ধরা পড়েন, এই ভয়ে তিনি দরবেশের বেশে কাশী যাত্রা করিলেও, তাহা যবনত্বের প্রমাণ হইতে পারে না।

ভারতবর্ষ ম্লেচ্ছ রাজগণের অধিকৃত হওয়ার পর অদ্যাপি যখন ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ জাতি অর্থলোভে ম্লেচ্ছ রাজপুরুষ গণের পদলেহন করিতেছেন,তখন রূপসনাতনের গৌড় রাজের মন্ত্রীত্ব স্বীকার করা শোচনীয় ঘটনা মধ্যে পরিগণিত হইবে কেন? প্রথম জীবনে ইহারা যদি প্রলোভনে ভুলিয়াও থাকেন, তাহাতেই বা অসাধারণ কি দোষ হইয়াছে? সেকালে রূপসনাতন যেরূপ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, আজকাল ইংরাজ রাজের অধিকাংশ উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্ম্মচারী কি ততোধিক নহেন, আজ কাল আর অনুতাপ নাই, প্রায়শ্চিত্ত ও নাই, কিন্তু সেকালে, রূপসনাতনের বিবেক বৈরাগ্যের উদয় হইলে,তাঁহারা অনুতাপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পবিত্র হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, রূপ সনাতনের বিবেক বৈরাগ্যেও বটব্যাল মহাশয় ছিদ্রানুসন্ধান করিতে বিস্মৃত হন নাই। বিবেক বৈরাগ্যের তাড়নায় রাজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রূপ গোস্বামী গৌড় রাজের কোপ দৃষ্টিতে পড়েন, সমগ্র বৈষ্ণব ইতিহাসের ইহাই অবিসম্বাদিত মত; কিন্তু বটব্যাল মহাশয়ের মতে চুরি ডাকাতি ইত্যাদি দুষ্কার্য্যই রাজার কোপের কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার" সনাতন গোস্বামীর প্রতি গৌড়

(৬) তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ পৃষ্ঠাত্রয়ো জজ্ঞিরে। ইত্যাদি। (বংশাবলী)

শ্রীমুকুন্দ দেবের নন্দন শ্রীকুমার।
বিপ্রকুল প্রদীপ পরম শুদ্ধাচার॥
কুমার দেবের হইল অনেক সন্তান।
তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ॥
সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ এই ত্রয়।

(ভক্তিরত্নাকর, ১ম, তরঙ্গ)

রাজের এই ভৎর্সনা বাক্যই রূপ গোস্বামীর দুষ্কার্য্যপরায়ণতা সম্বন্ধে বটব্যাল মহাশয়ের অকাট্য প্রমাণ ; কিন্তু রূপ গোস্বামী যে সনাতন গোস্বামীর বড় ভাই নহেন, বৈষ্ণব গ্রন্থ সকবে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। (৭)

প্রকৃত অর্থ বোধ না হইলেও নিজের অনুকুল মনে করিয়া, বটব্যাল মহাশয় "তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার" ইত্যাদি চৈতন্য-চরিতামৃতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন ; কিন্তু উক্ত গ্রন্থে রূপ সনাতনের বৈরাগ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে বিশ্বাস করেন নাই। লিখিয়াছেন "চৈতন্য চরিতামৃতে তাহাদের যেরূপ বর্ণন আছে, তাহা অসংলগ্ন বোধ হয়, প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইলে একখানা কৌপীন পরিধান করিয়া বাহির হইয়া গেলেই হয়। শাস্ত্র বিধানানুসারে কর্ত্তব্য পালন না করিয়া কেবল কৌপীন পরিধান করিয়া বাহির হইয়া গেলেই যে হয় না, লেখক মহাশয় বোধ হয় এবিষয় অবগত নহেন।"

অতঃপর তিনি রূপ সনাতনের পুরশ্চরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "কিন্তু পুরশ্চরণের কথা সত্য হইলেও তাহার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভিন্নরূপ ছিল, গ্রহ দুর্ব্বিপাকের কোন শান্তি কার্য্য করাইয়াছিলেন, হইতে পারে, ইত্যাদি। ইতিহাসের বিরুদ্ধে এরূপ অন্তর্য্যামিত্ব প্রকাশ করা বড়ই বিচিত্র ব্যাপার। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভিন্ন রূপ ছিল, ইহা তিনি জানিলেন কিরূপে ? "নিশ্চয়" শব্দের পরিবর্ত্তে "বোধহয়" শব্দ ব্যবহার করিলে কতকটা ভাল হইত নাকি ? পরন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে ;—

শ্রীরূপ গোসাই তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা॥

এস্থলে বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন—"এত "পাগল বুচকী আগলের কথা" চৈতন্য চরণ পাইবার জন্য এক নৌকা ভরা ধনের আবশ্যক কি ?" এ প্রশ্নের উত্তর চৈতন্যচরিতামৃত হইতে তিনি নিজেই ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা ;—"ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিলা তার অর্দ্ধধনে" ইত্যাদি। গৃহত্যাগের পূর্ব্বে সঞ্চিত অর্থ রাশির সদ্ব্যয় না করিয়া "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" করিলেই কি চৈতন্য প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হইত ? সদ্ব্যয় করিয়াও রূপগোস্বামী লেখকের কাছে অপরাধী !!! গুণে দোষারোপের এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

"আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ" এই নীতি অনুসারে সনাতন গোস্বামী গৌড়ে যে দশহাজার টাকা গোপনে রাখেন, ইহাকে প্রভূত অর্থ বোধ করিয়া লেখক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন, এ টাকা তাঁহার সম্বন্ধে প্রভূত বটে, কিন্তু গৌড় রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা সনাতনের সম্বন্ধে অতি সামান্য। বিষয় ত্যাগ নিমিত্ত গৌড় রাজের বিরাগভাজন হওয়াতে অগত্যা উক্ত অর্থ সংগোপনে রক্ষিত হইয়াছিল। বিপদ উদ্ধারই ইহার উদ্দেশ্য। এই অর্থদ্বারাই সনাতন কারাধ্যক্ষকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কারামুক্তির পর তিনি যখন কাশী অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন তিনি কপর্দ্দকও রাখেন নাই। রাজমহলে দস্যু হস্তে পতিত হইলে জানিতে পাইলেন যে, তাঁহার সহচরের কাছে

(৭) আদিঃ শ্রীল সনাতন স্তদনুজঃ শ্রীরূপ নামা ততঃ। ইত্যাদি।

সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ ভক্তভূপ।
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সনাতন অনুজ শ্রীরূপ॥
সবার অনুজ শ্রীবল্লভ প্রেমময়।
শ্রীজীব গোস্বামী হন তাঁহার তনয়॥

(ভক্তিরত্নাকর)

এস্থলে "আদি" ও" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শব্দ রূপ ও বল্লভ এই দুই ভ্রাতা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে।

কতিপয় স্বর্ণমুদ্রা আছে; তৎক্ষণাৎ সেই মুদ্রা দস্যুকে প্রদান ও ভর্ৎসনা পূর্ব্বক সেই সহচরকে পরিত্যাগ করেন।

বটব্যাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "রূপ যে বহুতর অর্থ লইয়া গৌড় হইতে সাকরমায় পলাইয়া আসিলেন, তাহার সিকি বিশ্বাসী ব্রাহ্মণের নিকটে পুতিয়া গচ্ছিত রাখিলেন কেন?" ইত্যাদি বহু প্রশ্ন। আবার নিজেই মনের অনুকূল উত্তর করিয়াছেন। উত্তরে পূর্ণমাত্রায় অনবস্থা দোষ ঘটিয়াছে। আমরা এই অনবস্থা দোষ পরিহারার্থ বলিতেছি যে, গৃহস্থ আত্মীয়-কুটুম্ব প্রভৃতির ভরণ পোষণার্থই রূপ সিকি অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, রাজ দণ্ড ভয়ে নহে। মাটিতে টাকা পুতিয়া রাখিবার রীতি তখন সাধারণ্যেই প্রচলিত ছিল, কেবল রূপ গোস্বামীই রাখেন নাই। পরন্তু রূপ গোস্বামী বহুতর অর্থ লইয়া সাকরমায় যান নাই, পৈত্রিক ভদ্রাসন চন্দ্রদ্বীপ ফতোয়াবাদে গিয়াছিলেন। (৮)

বটব্যাল মহাশয় "বোধহয়" শব্দের সাহায্যেই অনেক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। রূপের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "সেই রাজ দণ্ডের ভয়েই তিনি গৌড় হইতে পলায়ন করিলেন, বৈরাগ্যের খাতিরে বোধ হয় না" ইত্যাদি। অতঃপর রূপসনাতনের স্বচ্ছ চরিত্রে যত দোষারোপ করিয়াছেন, একমাত্র "বোধ হয়" শব্দই তাহার প্রমাণ। শেষে সনাতন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "লোভেই তিনি জাতি দিয়া ছিলেন এবং ঐ লোভ-প্রসূত চুক্তি য়াতেই বোধহয় রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন। রূপ বোধ হয়, কোন নিয়মিত বেতন পাইতেন না, সনাতনেরও বেতন একজন বড় মহুরির বেতন মাত্র ছিল" ইত্যাদি। কেবল "বোধহয়" শব্দ সাহায্যে যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল তত্ত্বই জানেন, তাঁহার কথার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদর্শন করা বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁহারা রাজপ্রতিনিধি বলিয়া ইতিহাসে ঘোষিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবৈতনিক ও সামান্য বেতনভোগী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশাবস্থাতে প্রভূত ধন সঞ্চয় করা, চুরি ডাকাতি ব্যতীত অসম্ভব, অতএব রূপসনাতন অতিশয় বদমায়েস ছিলেন। "বোধহয়" শব্দ ব্যতীত কোন ইতিহাসের সাহায্যে বটব্যাল মহাশয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্ভাবিত নহে জানিয়াই, এস্থলে তিনি ইতিহাসের ত্রিসীমাতেও পদার্পণ করেন নাই। আরবী ভাষাতে "দবিরখাস" শব্দের অর্থ খাস উজির অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ। বটব্যাল মহাশয় দবির খাসের কখনও প্রাইভেট সেক্রেটারি, কখন বড় মুহরি অর্থ করিয়াছেন। পুনরায় "বোধহয়" শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন "রূপসনাতন বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে (চৈতন্য দেবকে) চিনিতেন।" নবদ্বীপে পঠদ্দশাতে চৈতন্য দেবের সহিত রূপসনাতনের সাক্ষাৎ আলাপ থাকার বিষয় ইতিপূর্ব্বে বোধহয় শব্দ দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াও আবার এস্থলে "বোধহয়" শব্দের আশ্রয় গ্রহণ পুনরুক্তি মাত্র।

লেখক মহাশয় কেবল রূপসনাতনকে আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কলিযুগ পাবনাবতার ভগবান চৈতন্য দেবেরপ্রতিও

(৮) পূর্ব্বে পরিজনে পাঠাইয়া সাবহিতে।
কতো চন্দ্র দ্বীপে কতো ফতোয়াবাদেতে॥
শ্রীরূপ বল্লভ সহ নৌকাতে চড়িয়া।
বহুধন লৈয়া গৃহে গেলা হর্ষ হৈয়া॥
বিপ্র বৈষ্ণবাদি সবে ধন বাঁটি দিল।
প্রভু ব্রজে গেলেন শুনিয়া যাত্রা কৈল॥
(ভক্তিরত্নাকর)

তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। রূপ সনাতন বিষয় ত্যাগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া বার বার পত্র লিখিলে, তাঁহাদিগের তখনও গৃহ-ত্যাগের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হয় নাই জানিয়া,পত্রোত্তরে চৈতন্য দেব,গৃহে থাকিয়াও যে ভাবে ভগবানে মনঃসংযোগ করা যায়, তদর্থক একটি শ্লোক লিখিয়া পাঠান, যথা ;—

> পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
> তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্ণব সঙ্গ রসায়নং ॥

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, পরপুরুষে রতা নারী, গৃহ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও যেরূপ প্রেমাস্পদ নায়ককে নিরন্তর চিন্তা করে,গৃহে থাকিয়াও ভগবৎপরায়ণ সাধুগণ সেইরূপ ভগবানকে চিন্তা করিবে।

বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন "উপমাট বড় নোংরা সন্দেহ নাই" ইত্যাদি। ইনি উক্ত উপদেশ বাক্যের যে তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়াছেন,আমাদিগের বিবেচনায় বাস্তবিক তাহাই নোংরা। ইনি বুঝিয়াছেন যে, চৈতন্য দেব রূপ সনাতনকে কুলটা স্ত্রীলোকের ন্যায় কপটাচরণ শিক্ষা দিয়াছেন। ইঁহার প্রবন্ধের অধিকাংশই মনঃকল্পিতকথায় পূর্ণ; সুতরাং কোন কোন বিষয় অসম্বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এক স্থানে লিখিয়াছেন যে "এমন সময়ে হঠাৎ এক দিন চৈতন্য রামকেলীতে উপস্থিত। বৃন্দাবন যাইবার ছলে বহির্গত হইয়া তিনি বাকিয়া গৌড়ে আসিলেন" ইত্যাদি। অতঃপর লিখিয়াছেন "চৈতন্য নিশ্চয়ই সরল হৃদয় লোক ছিলেন,মনে যাহা হইত তাহাই করিয়া ফেলিতেন, বড় ভাল মন্দ ভাবিতেন না।" আমরা জিজ্ঞাসা করি,যিনি ছলকরিয়া অর্থাৎ মনে একরূপ বাহিরে অন্যরূপ কার্য্য করেন, তাঁহাকে কি সরল বলা যায় ?

চৈতন্য দেব বৃন্দাবন যাইবার ছলে রামকেলীতে গিয়াছিলেন, ইতিহাস গ্রন্থে এরূপ প্রমাণ নাই। তিনি হৃদয়ের আবেগ বশতঃই বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে বহুলোক তাঁহার অনুগমন করাতে নানা বিঘ্নাশঙ্কা বশতঃ প্রবীণ ভক্তগণ প্রভুকে এ যাত্রা বৃন্দাবন গমনে নিষেধ করেন ; সুতরাং অগত্যা তিনি সংকল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পথে রামকেলী গ্রাম নিকটবর্ত্তী জানিয়া পরম প্রেমাস্পদ রূপসনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎকরিতে গিয়াছিলেন। এথানে রূপসনাতন ও বহুজন সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনযাইতে নিষেধ করেন। প্রভুর চরণানুচর বৈষ্ণবগণের তাঁহাকে তিরস্কার করা নিতান্তই অসম্ভব। বর্ত্তমান কাল হইলেও কতকটা সম্ভব হইত। প্রভুর অনুচরগণের অনেকেই তাঁহার রামকেলি গমনের কারণ জানিতেন না, তাই তিনি রূপসনাতনকে বলিয়াছেন ;—

> গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন।
> তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহা আগমন ॥
> এ মোর মনের ভাব কেহ নাহি জানে।
> সবে বলে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে ॥

চৈতন্য দেব রামকেলিতে যাইবার কারণ সাধারণে প্রকাশ করেন নাই বলিয়াই যে, বৃন্দাবন যাইবার ছল করিয়া বাঁকিয়া রামকেলিতে গিয়াছিলেন, কোন মতেই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

মুণ্ডিতমস্তক ন্যাংটা সন্ন্যাসীরা যে চৈতন্য দেবের সঙ্গে রামকেলিতে গিয়াছিল,বটব্যাল মহাশয় ইহার প্রমাণ কোথায় পাইলেন ? চৈতন্য দেব যে সময়ে রামকেলি যান, সে সময়ে তাঁহার অনুচরেরা মুণ্ডিতমস্তক ছিলেন না। পরন্তু চৈতন্য সম্প্রদায়ে পূর্ব্বেও ন্যাংটা সন্ন্যাসী ছিল না, এখনও নাই। ভেকধারীদিগের কৌপীন ধারণের রীতি আছে; কিন্তু

তাহাও প্রশস্ত বহির্ব্বাসে আবৃত থাকে। বটব্যাল মহাশয়ের মতে যদি ইহাই ন্যাংটার লক্ষণ হয়, তথাপি বলা যাইতে পারে, রামকেলিতে এরূপ ন্যাংটা সন্ন্যাসীও প্রভুরসঙ্গে ছিল কিনা,সন্দেহ। কেননা,তৎকালে ভেক-গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

চৈতন্য দেবের গৌড়ে গমন ও তাঁহার সঙ্গে সহস্র সহস্র লোক সমাগমের কথা শুনিয়া, হোসেনসাহ,কেশবছত্রিকে তৎবিবরণ জিজ্ঞাসা করেন সত্য; কিন্তু তিনি তজ্জন্য ক্রোধ করেন নাই,মারিয়া ফেলিতেও চাহেন নাই; বরং শ্রদ্ধাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। বটব্যাল মহাশয়ের উদ্ধৃত সনাতনোক্তিতেই ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা;—

"ইহা হইতে চল প্রভু ইহা নাহি কায।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি॥" ইত্যাদি।

সনাতন গোস্বামী অতিমাত্র বিনয়ের সহিত প্রভুকে যাহা বলিলেন, বটব্যাল মহাশয়ের মতে তাহাই ভর্ৎসনা। পদাবনত দাসাভিমানী ব্যক্তি প্রভুকে ভর্ৎসনা করিতে পারে, এ কথা অনেকেরই অশ্রুতপূর্ব্ব।

অতঃপর বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন, "চৈতন্য দেব এত বলিলেন, তোমাদের দুই জনার জন্যই আমি বাঘেরমুখে মাথা দিয়াছি, তত্রাচ (তথায় ?) রূপ সনাতন বৈষ্ণব হইলেন না" ইত্যাদি। চৈতন্য দেবের রামকেলি পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই রূপ গোস্বামী ও তদনুজ অনুপম বিষয় সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপ ফতোয়াবাদের বাটীতে প্রস্থান এবং সঞ্চিত অর্থ গুলির সদ্ব্যয় পূর্ব্বক অবিলম্বে প্রয়াগে যাইয়া মহাপ্রভুকে আত্মসমর্পণ করেন, এদিকে সনাতন ও রাজ কার্য্য পরিত্যাগ করাতে রাজাদেশে কারারুদ্ধ হন। চৈতন্য চরিতামৃত ও ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে এ বিষয় বিস্তৃত রূপে লিখিত আছে। এমতাবস্থাতে ও বটব্যাল মহাশয় যে, আজগুবি মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে হয় বৈষ্ণব ইতিহাসে অনভিজ্ঞ, না হয়, প্রলাপবাদী ব্যতীত আর কি বলিব?

ইনি আরও লিখিয়াছেন,"কৃষ্ণদাস কবিরাজ, হোসেন সাহার মুখে চৈতন্য দেবের যে গুণানুবাদ করিয়াছেন, তাহা খাপ ছাড়া" গুণানুবাদ বলিয়াই খাপছাড়া বোধ করিয়াছেন, নিন্দাবাদ হইলে আর সেরূপ বোধ করিতেন না। ইনি কেশব ছত্রির মুখে চৈতন্য দেব সম্বন্ধে হোসেন সাহাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার পোনের আনাই কল্পনা প্রসূত জল্পনা; এই জন্যই চৈতন্যচরিতামৃত হইতে কেশব ছত্রির উক্তি উদ্ধৃত করেন নাই।

চৈতন্যানুচর বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধ রীতি অনুসারে ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন নাই, তাঁহারা বেদমার্গানুসারেই ভিক্ষা করিতেন। বেদেও আশ্রম বিশেষে ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের বিধান আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের বহু পূর্ব্বে সংসারবিরক্ত মহারাজ ভরত প্রভৃতি এইরূপ ভিক্ষা করিয়াছেন।

ভারতে রূপসনাতনের অতুলনীয় ভাস্বতী কীর্ত্তিও যাঁহারা দেখিতে পান না,তাঁহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। ইঁহাদিগের মহার্হ গ্রন্থ সকলের বৈষ্ণব সমাজের বাহিরে প্রতিপত্তি থাকুক, আর নাই থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বেদের ও হিন্দু সমাজের বাহিরে প্রতিপত্তি নাই,তজ্জন্য বেদের গৌরবের বিন্দুমাত্রও কি ক্ষতি হয়?

বৈষ্ণবদিগের বৃন্দাবনের বৈচিত্র্য অবৈষ্ণবের বুঝিবার অধিকার নাই। বৃন্দাবন পৃথিবীর দেশ বিশেষ বটে, মহাপ্রভুর যদি

ইহাই মত হয়, তবে তিনি পৃথিবীর দেশ বিশেষ বৃন্দাবনে যাইলেন কেন ? যাইয়া লুপ্ততীর্থ রাধাকুণ্ডের আবিষ্কারই বা করিলেন কেন ? ব্যক্তেই অব্যক্ত অন্তর্নিহিত রহিয়াছেন, জ্ঞানিগণ ব্যক্তেই অব্যক্তের অনুসন্ধান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। অতএব পুরাণাদি শাস্ত্রে পৃথিবীর দেশ বিশেষ এই ব্যক্ত বৃন্দাবনেরই মহামহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এস্থলে বলা উচিত যে, বৈষ্ণবদিগের বৃন্দাবন এক বিচিত্র জিনিস নহে ; কিন্তু বর্ত্তমান আধ্যাত্মিকবাদই এক বিচিত্র জিনিস। পরন্তু ইহাই কি বিশ্বাস করিতে হইবে যে, নিখিল বৈষ্ণবাচার্য্য চৈতন্যচরণানুচর রূপসনাতন, মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই ; কিন্তু বটব্যাল মহাশয় বুঝিয়াছেন ?

প্রবন্ধের উপসংহারে বটব্যাল মহাশয় পরম ভাগবত রূপসনাতনের বিমল চরিত্রে যে কলঙ্কারোপ করিয়াছেন, তাহাতে নব্যভারতের বৈষ্ণব পাঠকগণ তাঁহাকে বিশেষ রূপে চিনিতে পারিয়াছেন ; অতএব এস্থলে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্ফটিক মণি স্বভাবতঃ স্বচ্ছ হইলেও মলিন বস্তুর সান্নিধ্য বশতঃ মলিনরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

শ্রীগোবিন্দ মোহন রায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

পুরাতন প্রেম।

পুরাতন প্রেম, পুরাতন ঘৃত,
দুর্গন্ধ বিস্বাদময়,
বেদনার স্থানে, হৃদয়ে মাখিলে,
অথচ অমৃত হয় !
ফুলের সুরভি পরিমল সুধা,
গেলে বসন্তের স্নেহ,
পুরাতন কাঠ— শুকনা চন্দন,
নিদাঘে জুড়ায় দেহ !
বড় আদরের বাক্সের আঙ্গুর,
দু'দিনে পচিয়া তল,
চিরকাল সম পবিত্র অমৃত,
শুষ্ক হরিতকী ফল !
দু'দিনে শুকায়, সবুজ ঘাসের
সুকোমল আস্তরণ,
রহে চিরশুষ্ক, ঋষির আরাম
শুষ্ক তৃণকুশাসন !
শাওণের ধারা, বরষে সতত,
বিরামের নাহি লেশ,
অযাচিত জলে, অবনী ভাসায়,
জলময় করে দেশ !
শীতের বিশুষ্ক, বিদারিত ধরা,
মরে যবে পিপাসায়,
মুক্ত জলদের এক ফোটা জল
বিনা কে বাঁচায় তায় ?
অতি আনন্দের—অতি আহ্লাদের-
অতি পুলকের পরে,
বিষাদের ছায়া, যেথানে আছে, সে,
সেথানে অপেক্ষা করে !
চন্দ্র অস্ত গেলে, ঘোর অন্ধকারে,
নক্ষত্র নয়নে চায়,
বাদলের দিনে, ঝটিকা তুফানে,
চপলা চমকি যায় !
দু'পরের রোদে, তরুতলে এসে,
ছায়া হ'য়ে থাকে খাড়া,

শীতল বাতাস, বহে কি কখন,
তাহার অঞ্চল ছাড়া?
দ্বিধা বা সন্দেহে, ভরিলে হৃদয়,
বিবেচনা হ'য়ে নাশে,
পাপের কলঙ্ক ধুইতে যেন সে,
অশ্রুরূপে চখে আসে!
যৌবনের জ্বালা, জুড়াবার তরে,
সেই যে আসিছে জরা,
দূর হ'তে হাত বাড়াইছে যেন,
শান্তির শিশির ভরা!
সংসার মরুতে, ঘুরিয়া মরিয়া,
অবসাদে হ'বে যেতে,
তারি লাগি আছে, দাঁড়াইয়া পথে,
পরকাল-কোল পেতে!
এক বিন্দু অশ্রু, একটী নিশ্বাস,
একবার হাহাকার,
অকৃতজ্ঞ আমি, এখন তাহারে,
নাহি দেই পুরস্কার!
অযতনে আছে, কোথা সে পড়িয়া,
বিশুষ্ক বীণার মূল,
এক ফোটা জল, যদি পায় সেই,
কে তাহার সমতুল?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

লক্ষ্মীপূজা।

শারদ পূর্ণিমা নিশি,—ত্রিদিব হইতে,
শশিপদ্মসিংহাসনে স্থাপিয়ে চরণ,
আসিছে ইন্দিরারাণী আজি পৃথিবীতে,
বহিছে অমৃত-বার্ত্তা কৌমুদী কিরণ!
দগ্ধ ও ফরিদপুর দুর্ভিক্ষ-অনলে,
অনাহারে মৃতদেহ-করোটি-কলস
স্থাপিয়া, পল্লব দিয়া শব-করতলে,
হাহাকারে পূরে শঙ্খ পূরি দিক্ দশ!
শ্মশানে আসন পাতি—পাদ্য অশ্রুজল,
চন্দন গুগ্‌গুল গন্ধ পূতিগন্ধ তায়,
মেদ মজ্জা মাংসে রচি নৈবেদ্য সকল,
হৃৎ-রক্তপদ্মে পূজে কমলার পায়!
নয়নে নাহিক নিদ্রা—জাগে নারী নর,
শূন্যময় বঙ্গে আজি পুণ্য কোজাগর!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

বাসনা।

ঘুচেছে সকল সাধ, সেজেছি যোগিনী,
বিভূতি ভূষিত অঙ্গে গৈরিক ধারিণী।
রুদ্রাক্ষের মালা আহা শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,
সাদরে ধরিব এবে অঙ্গে তা' আমার।
দূর কর হীরা মুক্তা, দাও বিলাইয়া
দীন দরিদ্রেরে, আর কি কাজ রাখিয়া?
লালসা বিলাস মাখা ঐশ্বর্য্যে কি হবে,
অনন্তের পক্ষে যদি কাজ নাহি দিবে?
কর্ম্মপথ সম্মুখেতে রয়েছে বিস্তৃত,
সাধিতে পারি গো যেন জগতের হিত।
কর্ম্ম কর্ম্ম এই বাক্য রবে সদা মুখে,
প্রাণ মন ঢেলে দিব জগতের সুখে।
নাহি পাই কর্ম্মফল, নাহি চাই কিছু,
অগ্রসর হ'ব শুধু, নাহি চা'ব পিছু।
জগৎ-সংসার মোর আপনার ঘর,
সকলেই ভাই বোন, কেহ নয় পর।
ভাই ভগিনীর কাজে জীবন আমার
যাপিব, কামনা মোর নাহি কিছু আর।
প্রভাত হইবে যবে এ ঘোর রজনী,
চলে যাব মহালোকে হইতে ধরণী।
হে পিতা, হে পরমেশ, এই শুধু দিও—
তখন আমারে তুমি কোলে তু'লে নিও।

শ্রীমৃণালিনী।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ।(১০)

পাঠকগণ! যদি কেহ মনে সন্দেহ করেন যে, সকলই ত পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের রূপ, তবে অন্যান্য কোন পদার্থকে ধারণ করিতে না বলিয়া কেবল মাত্র সূর্য্য নারায়ণ ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃ স্বরূপকে ধারণ করিতে বলিবার অর্থ কি? আমি তাঁহাদের সন্দেহ দূর করিবার জন্ত কয়েকটী স্থূল দৃষ্টান্ত দিতেছি,তাঁহারা যেন সূক্ষ্ম ভাবে গ্রহণ করেন। এস্থলে ইহা সকলেরই জানা উচিত যে, ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে তাহা যেমন সহজে সিদ্ধ হয়, এবং মনে শান্তি আইসে, তদ্রূপ মানব-কল্পিত কার্য্য করিতে গেলে নানা প্রকার কষ্ট হয়, কার্য্যও সিদ্ধ হয় না এবং মনে শান্তিও আইসে না।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ভগবানের স্বরূপ তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন তোমাদের পিপাসা হইবে,তখন তোমরা জল পান করিবে, ক্ষুধা হইলে অন্ন আহার করিবে এবং অন্ধকার দূরকরিতে হইলে অগ্নি আলো জ্বালিবে, ইহাই প্রাকৃতিক (ঈশ্বরের) নিয়ম, যদি ইহার বিপরীত কিছু করিতে যাও, অর্থাৎ অগ্নি দ্বারা আলো না করিয়া যদি জল কিম্বা অন্ত কোন পদার্থ দ্বারা করিতে যাও, তাহা হইলে তোমার সে কার্য্য কখনই সিদ্ধ হইবে না এবং ঈশ্বরের আজ্ঞাও পালন করা হইবে না।

যখন তোমাদিগকে ব্যবহার কার্য্য সাংসারিক কার্য্য করিতে হইবে,তখন স্থূল পদার্থের অংশ লইয়া ব্যবহার কার্য্য করিতে হইবে; যখন জ্ঞান ও মুক্তির প্রয়োজন হইবে, তখন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ বিরাট ভগবান তেজোময় সূর্য্য নারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপকে ধারণ করিতে হইবে। ইহাতে মনে তেজ, বল, শক্তি, বুদ্ধি, ও জ্ঞান হইবে এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ দেখিয়া পরমানন্দে থাকিতে পারিবে। তোমরা প্রত্যক্ষ দেথ যে স্থূল পদার্থ অন্ন যদি তোমরা একদিন আহার না কর, তাহা হইলে তোমাদের স্থূল শরীর দুর্ব্বল হয়, উঠিবার ক্ষমতা থাকে না, এক বেলা জল পান না করিলে মৃত প্রায় হইতে হয়; এবং যখন তুমি অন্ন আহার ও জল পান কর,তখন তোমার স্থূল শরীরে উঠিবার শক্তি হয়, মনে তেজ ও স্ফূর্ত্তি হয়। স্থূল পদার্থের অংশ বিনা তোমার স্থূল শরীর রক্ষা হয় না। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সূক্ষ্ম শরীরে তুমি তেজহীন বলহীন হইয়া আছ, যখন তুমি সূক্ষ্ম পদার্থ তেজোময় জ্যোতিঃ স্বরূপ বিরাট ভগবান সূর্য্য নারায়ণকে ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করিবে, তখন তোমার আধ্যাত্মিক বিষয়ে সূক্ষ্ম শরীরের উন্নতি হইবে। তখন তোমার মনে তেজ বলবুদ্ধি জ্ঞান হইবে,এবং জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ দেখিয়া নিরাকার সাকার পরিপূর্ণ রূপে অখণ্ডাকার বিরাজমান থাকিবে। মনে কোন প্রকার ভ্রমের উদয় হইবে না, এবং ইহলোকে পরলোকে সুখী হইবে।

তোমরা জগৎপিতা জগদীশ্বরের নিয়ম ও আজ্ঞানুসারে চলিও, তাহা হইলে তোমাদের কোন কষ্ট হইবে না। যেমন চলিবার জন্ত তিনি পা দিয়াছেন, সেই পদ দ্বারাই চলিলে কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু তুমি তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মাথা দ্বারা চলিতে যাই ও না, তাহা হইলে কখন সে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। অধিকন্তু কষ্টের একশেষ হইবে।

সেইরূপ হস্তের কার্য্য হস্ত দ্বারাই করিবে, নেত্রের কার্য্য নেত্রের দ্বারাই, কর্ণের কার্য্য কর্ণ দ্বারা করিও; যে যে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সেই সেই ইন্দ্রিয় দ্বারাই করিও, তাহা হইলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা হইবে; ইহার অন্যথাচরণ করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করাও হইবে না, কার্য্যও সিদ্ধ হইবে না— যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইবে। নিরাকার ও সাকার পরব্রহ্মে ও সকল বিষয়ে এইরূপ ভাব বুঝিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হয়। কোন কার্য্যেতে আলস্য করিতে নাই। যে কার্য্যে আলস্য করা যায়, তাহা উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয় না।

বেদ বেদান্ত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই একমাত্র তেজোময় জ্যোতিঃ স্বরূপ সূর্য্য নারায়ণেতে ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতার, সাবিত্রী গায়ত্রী সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর ধ্যান অর্থাৎ যত দেব দেবী আছে,সকলেরই ধারণা করিবার বিবি ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ এ জ্যোতির নামই সকল দেব দেবীর নাম, একাল পর্য্যন্ত সকলেই সেই রূপ করিয়া আসিতেছেন,কিন্তু অনেকেই অন্য অর্থ ধরিয়া করিতেছেন, প্রকৃত অর্থ জানিয়া অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষার দোষ সন্দেহ, নাই। গৃহস্থগণের নানা প্রকার মন্ত্র জপ করিতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয়, তাহাতে সাংসারিক কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হয়; যাহাতে সহজে তাহাদের ঈশ্বরোপাসনা হয়, তাহার সহজ উপায় বলিতেছি। তাহারা সেই প্রণালীতে কার্য্য করিলে ঈশ্বর উপাসনা করাও হইবে, অথচ সংসার ধর্ম্মের কোন বিঘ্ন ঘটিবে না।

যিনি নিরাকার ও সাকার পরিপূর্ণ রূপে বিরাজমান আছেন, সেই একমাত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরুকে উপাসনা ও ধ্যান ধারণা করিবে। শাস্ত্রে ও বেদে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নাম একাক্ষর মন্ত্র ওঁকার। সেই একাক্ষর ওঁকার প্রণব মন্ত্র জপ করিলে নিরাকার সাকার দেব দেবী পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ ভগবানের উপাসনা করা হয়। গৃহস্থ মাত্রেই, বাল বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী পুরুষ সকলেই প্রত্যহ প্রাতে ও সায়ংকালে একশত আটবার প্রণব মন্ত্র জপ করিবেন; যদি সময় না থাকে,তবে দশবার জপ করিবেন। যাঁহার ভগবানে ভক্তি প্রীতি আছে,তিনি যখন ইচ্ছা তখনই জপ করিতে পারেন; তাঁহার সময় অসময় নাই; শুচি অশুচি নাই; সুখ অসুখ নাই। রাত্রি দিন যখনই মনে হইবে, তখনই জপ করিবেন। সংখ্যা রাখিবার আবশ্যক নাই। সংখ্যা রাখিলে ফল কামনা করা হয় ও আত্মাভিমান জন্মে, নিষ্কাম ভাবে অর্থাৎ কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া করা উচিত। প্রাতঃ ও সায়ং কালে অর্থাৎ সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালে প্রত্যেক ব্যক্তিই বিরাট ভগবান জগৎ পিতা জগন্মাতা জগদ্‌গুরু জগদাত্মা জ্যোতিঃ রূপ সূর্য্য নারায়ণ ও চন্দ্রমার সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিবে ও আপনাপন ইষ্টদেবতারূপ চিন্তা করিবে; অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর রূপ চিন্তা করিবে। আপনার রূপ, মন্ত্রের রূপ ও ইষ্টদেবতার রূপ চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণের জ্যোতিঃ স্বরূপের রূপ একই রূপ চিন্তা করিবে। তাহা হইলে, সকল দেব দেবীর রূপ ধারণ করা ও পূর্ণ রূপ উপাসনা করা হইবে। মনের সকল অজ্ঞনতা দূর হইয়া পরমানন্দে আনন্দ রূপ থাকিবে। মন শান্তির আধার হইবে। যদি সময় ও ক্ষমতা হয়, তবে প্রত্যহ প্রাতঃ ও সায়ংকালে অগ্নিতে যথা শক্তি আহুতি দিবে।

যদি প্রত্যহ না হয়, তবে প্রতি অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসীতে দিবে। প্রত্যেক বাটীর মধ্যে অন্ততঃ একজনও দিলে বাটীর সকল লোকেরই কল্যাণ সাধিত হইবে। ওঁ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপায় স্বাহা, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিবে। যদি সম্পূর্ণ মন্ত্র না বলিতে পারেন, তবে একমাত্র ওঁকার প্রণব উচ্চারণ করিয়া অর্থাৎ ওম্ স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিবে। তাহা হইলে নিরাকার সাকার সমস্ত দেব দেবীর নামে আহুতি দেওয়া হইবে। একাক্ষর ওঁকার মন্ত্র নিরাকার সাকার সকল দেব দেবীরই নাম। এই কারণে সকল মন্ত্রের প্রথমেই ওঁকার আছে। ইহাও তোমাদের জানা উচিত যে, সকলেরই ইষ্ট একই পুরুষ। যে কোন উপাসকই হউননাকেন, আহুতি দিবার সময় সকল দেবতার নামে সকলেই সেই একমাত্র অগ্নিতেই আহুতি দিয়া থাকেন। আহুতি না দিলে সকল পূজা ও যজ্ঞ নিষ্ফল হয়। এই কারণে সকল পূজা ও যজ্ঞাদির শেষে আহুতি দেওয়া হয়। আর ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তুঃ বলিয়া কার্য্য শেষ করা হয়। গৃহস্থগণ, তোমরা কোন বিষয়ে ভীত ও চিন্তিত হইওনা। তোমাদের কিসের অভাব আছে? তোমাদের গুরু পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ ভগবান নিরাকার সাকার রূপে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সকলরূপে তোমাদের লইয়া বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে তোমরা ভুলিয়া আছ বলিয়া সকল বিষয়ে বলহীন, তেজহীন, ভীত ও অপদার্থ হইয়া আছ। তাঁহাকে জানিয়া ভক্তি প্রীতি কর, দেখিবে যে, তোমরা কেহই সেই পরমাত্মা হইতে অভেদ নহ। তোমরা সকলেই সেই পরম পদার্থ, তোমরা অজ্ঞান, মোহ নিদ্রা হইতে জাগরিত হও, জগতের মঙ্গল হউক।

আহুতি দিবার দ্রব্য। বিশুদ্ধ গব্য-ঘৃত অভাবে মহিষের ঘৃত, মিষ্ট দ্রব্য—চিনি কিম্বা ইক্ষুগুড়। সুগন্ধাদি—শ্বেত ও অগুরু চন্দন, দেবদারু, কর্পূর, গুগ্গুল, কেশর, ও কস্তুরি। ইহার সহিত কৃষ্ণ, তিল, যব, আতপ চাউল, ফল ইত্যাদি; কিসমিস, পেস্তা, বাদাম ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্য পরিষ্কার করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত আহুতি দিবে। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে অবস্থানুসারে যিনি যেরূপ অর্থাৎ যে যে দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাহাই শ্রদ্ধার সহিত আহুতিদিবেন। অভাবে কেবল মাত্র ঘৃত ও চিনি আহুতি দিলে ফল সম্পূর্ণ হইবে, আম্রকাষ্ঠ পাওয়া যায় ভালই, অন্যথা যে কোন কাষ্ঠ পাওয়া যায়, তাহাতেই অগ্নি জ্বালিয়া শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত আহুতি দিবে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে ভগবান প্রীতি পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। কিন্তু শ্রদ্ধা-হীন হইয়া ব্রহ্মাণ্ড পরিমিত উত্তম উত্তম দ্রব্য ভগবানে উৎসর্গ করিলে তিনি তাহা কখনই গ্রহণ করেন না। ইহা জ্ঞানী মাত্রেই জানেন। ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মহাভারতে আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের ক্ষুদ খাইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের রাজভোগ গ্রহণ করেন নাই। অধিক কি, আপনাদিগকে দিয়াই দেখ না কেন, যদি কেহ কোন দ্রব্য অশ্রদ্ধা করিয়া তোমাকে দেয়, তুমি তাহা কি গ্রহণ কর? কখনই না। সেইরূপ পরমাত্মাকে—যিনি বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা, তাঁহাকে অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক দিলে, তিনি কখনই তাহা গ্রহণ করেন না।

পাঠকগণ! এখানে গম্ভীর ও শান্তিরূপে ভাব গ্রহণ করিবেন। জ্ঞানী মাত্রেই জানেন যে, জগৎময়ই আপনার আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ। এইজন্য তাঁহারা সকলকেই উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করাইয়া সৎপথে লইয়া যান এবং

যাহাতে সকলে পরমানন্দে কাল যাপন করিতে পারে, সতত তাহার চেষ্টা করেন। যাহাতে জগতের মঙ্গল হয়, নিজে তাহার চেষ্টা ত করেনই, এবং অপরের দ্বারা করাইয়া থাকেন। স্বার্থপর অজ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনিও উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করে না এবং অপরকেও করিতে দেয় না। সদা পশুর ন্যায় ব্যবহার করে। যদি কেহ উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করে, তাহা হইলে ইহাদের আর পরিতাপের সীমা থাকে না এবং তাহাকে বিদ্রূপ করে ও বাধা বিঘ্ন জন্মায়। উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিতে মানব মাত্রেরই অধিকার আছে; কেননা মনুষ্য মাত্রেই জ্ঞান ও মুক্তির অধিকারী। এক জন উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিয়া সদা পরমানন্দে কালযাপন করিবে, আর একজন চিরকাল নীচকার্য্য করিয়া পশুরন্যায় কালযাপন করিবে, ইহা জ্ঞানবান ঋষি মুনি প্রভৃতি শাস্ত্রকর্ত্তাগণের ও ভগবানের উদ্দেশ্য নহে। শ্রেষ্ঠকার্য্যের শ্রেষ্ঠফল ও নিকৃষ্ট কার্য্যের নিকৃষ্টফল আছেই আছে। প্রত্যক্ষ দেখ, চাষ করিয়া ধান বুনিলে ধানই জন্মিয়া থাকে, আর কাঁটার বীজ বুনিলে কাঁটাগাছ ব্যতীত অন্য কিছুই হয় না। মনুষ্য মাত্রেরই উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করা অর্থাৎ বেদ পাঠ করা, ব্রহ্ম গায়ত্রী ও ওঁকার জপ করা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া কর্ত্তব্য; আর সকলেরই এই সকল কার্য্য করিবার অধিকার আছে। ইহাতে জাতি বা বর্ণ ভেদ নাই। অন্ধকার দূর করিতে গেলে মনুষ্য মাত্রকেই অগ্নি দ্বারা অন্ধকার দূর করিতে হয়। এইরূপ, অজ্ঞান রূপী অন্ধকার দূর করিতে গেলে, মনুষ্য মাত্রকেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরুকে ধারণ করিতেও ওঁকার মন্ত্র রূপ জপ করিতে হইবে। তাহা হইলে অজ্ঞানরূপী অন্ধকার দূর হইয়া জ্ঞানালোক প্রকাশিত হইবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বেঙ্গল স্যানিটারী ড্রেণেজ বিল। (২)

বেঙ্গল স্যানিটারি ড্রেনেজ বিল বিষয়ক আমাদের প্রথম প্রবন্ধে আমরা এই বিলের ইতিবৃত্ত এবং মূল তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি। উহার আনুষঙ্গিক ও আভ্যন্তরিক আরও অনেক কথার আলোচনা করিয়াছি।

ড্রেণেজ বিলের মূল তত্ত্বের আলোচনায় আমরা অনেকানেক উচ্চপদস্থ, বিজ্ঞ, বহুদর্শী বৈষয়িক ব্যক্তি এবং বিজ্ঞানবিদ্ স্বাস্থ্য তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উক্তি এবং তাঁহাদিগের প্রদর্শিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এবং যাহার উপর নিরতিশয় নির্ভর করিয়া স্যর চার্লস এলিয়ট বাহাদুর এই বিল প্রস্তুত করিয়াছেন ও আইনে পরিণত করিতে চাহেন, তাহা অর্থাৎ সেই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, তাঁহার এই বিলের আদৌ অনুকূল নহে।

আমরা দেখাইয়াছি, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান তাহার তথা কথিত উন্নতি ও ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও, আপাদমস্তক মতভেদে পূর্ণ; এবং তাঁহার ম্যালেরিয়া সম্বন্ধীয় অভিমত অধিকতর অনির্দ্দিষ্ট, অব্যাখ্যাত এবং সংশয়-অন্ধকারে আবৃত; ম্যালেরিয়া-তত্ত্ব, তৎকর্ত্তৃক আদৌ অনাবিষ্কৃত। ম্যালেরিয়া মূলতঃ কিসে জন্মে, এবং ম্যালেরিয়ায় আদৌ কোনও রোগ জন্মে কি-না,

সে বিষয়েই ঘোর সন্দেহ ;—অন্ততঃ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান নিজে তাহাতে মহাসন্দিহান। প্রথম প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা স্তর জোসেফ্ ফেরারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এ সন্দেহের সবিশেষ সারবত্তা সূচিত করিয়াছি। স্তর জোসেফ্ সরল এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন ;—

"যে প্রকৃতির ম্যাসমাটা—বা ম্যালেরিয়ার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বা তদনুরূপ কোনও ম্যাসমাটা বা ম্যালেরিয়ায় রোগোৎপত্তি হওয়ার সমগ্র তত্ত্বটী সন্দেহের ও অজ্ঞেয়তার অন্ধকারে এতাধিক আচ্ছন্ন যে, ম্যালেরিয়ায় আদৌ রোগোৎপত্তি হয়, ইহা কোনক্রমে ঐকান্তিক নিশ্চয়তা ও উগ্রতা সহকারে বলা যাইতে পারে না।"

কিন্তু, স্তর চার্লস এলিয়ট অত্যুগ্র!! বিজ্ঞান যাহাতে সন্দিহান, বঙ্গেশ্বর তাহাতে কৃতনিশ্চয়! তা, যাউক সে কথা।

ম্যালেরিয়া কিসে জন্মে, কেমনে জন্মে, মূলতঃ তাহার উৎপত্তিস্থান কোথায়? স্তর চার্লস বলেন"ম্যালেরিয়ার বীজাণু বা বেসিলী নিম্নভূমিস্থ পলিত বা পলিতোন্মুখ উদ্ভিদপদার্থ হইতে জন্মে। কিন্তু, বিজ্ঞান তাহা বলে না। এ বিষয়েও বিজ্ঞানবিদের সহিত এখনকার বঙ্গাধীপের মত-বিরোধ।

পচনশীল উদ্ভিদ বা অন্য কোনও পলিত নির্জীব জৈব পদার্থ হইতে ম্যালেরিয়া-বীজ উৎপন্ন হইয়া সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার করে ;—এই ভ্রান্ত মত বহুপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল বটে ; কিন্তু এখন আর নাই। এখন এ মত, অতীব পুরাতন,—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাদ-পূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন ; ইয়ুরোপে এ মত অপদস্থ ও উচ্ছিন্ন হইয়াছে। অথচ স্তর চার্লস দেখিতেছি, এই পলিত মতেরই পক্ষপাতী। পলিত পদার্থ হইতে মূলতঃ ম্যালেরিয়া বীজ জন্মে না ; সে বীজ নিজেই সজীব পদার্থ (Germ) এবং তাহা বায়ু প্রবাহে এবং জলোপরি ভাসমান ; ইহাই আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানের অভিমত* বলিয়াই লোকে অবগত আছে। তবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিজ্ঞান যদি বিবর্ত্তিত হইয়া,আইনের উদ্দেশে অন্য রকমের রূপ ধারণ করিয়া থাকে ; সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু, ইয়ুরোপের অগ্রগণ্য অধ্যাপক মণ্ডলী, হক্সলে, টিণ্ডল,প্যাষ্টর প্রভৃতি বড় বড় বৈজ্ঞানিক, ম্যালেরিয়া বীজাণু বিষয়ক শেষোক্ত মতেরই প্রবর্ত্তক ও পরিপোষক বলিয়াই ত আমাদের শুনা আছে।

কিন্তু, আমরা নিজে অজ্ঞ, অবৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে একান্ত অন্ধ; তাহার কোনও তত্ত্বই স্বয়ং পরীক্ষা করি নাই ; পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত বা অপ্রতিষ্ঠিত হইতেও প্রত্যক্ষ দেখি নাই। এক কথায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমাদের অপ্রত্যক্ষ ; কিন্তু, বঙ্গেশ্বরের ইচ্ছা এবং আদেশ অতি প্রত্যক্ষ। অতএব প্রথমোক্তকে উপেক্ষা করিয়া শেষোক্তকেই শিরোধার্য্য করিলাম। পরন্তু, ম্যালেরিয়ার বিষে যখন আমরা জ্বর জ্বর, জীবন্মৃত, তখন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অনিশ্চয়তা ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণের একান্ত অভাব সত্বেও, না হয় আমরা স্বীকার করিলাম ;—এই ম্যালেরিয়া-জ্বর-বিকম্পিত কলেবরে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া, বিশ্বাসই করিলাম যে বঙ্গেশ্বরের কথাই সত্য,—ম্যালেরিয়া পলিত গলিত দ্রব্যের অভ্যন্তর হইতে উদয় হইয়া বা সিক্ত মৃত্তিকা পঙ্ক উদ্ভেদ করিয়া,পয়োপ্রণালীর অভাবেই আমাদিগগের অস্থি মজ্জা পীড়ন এবং আমাদের প্রাণ-বায়ু শোষণ করিতেছে। পরন্তু, ইহাও সকলকে বিশ্বাস করিতে বলিলাম যে, এই ড্রেণেজ বিল পাস হইয়া পল্লীতে পল্লীতে ড্রেণ নর্দ্দমা

* Late professor Tyndall on Dust.

হইলে বা পয়োনালীর পথ পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত হইলে আমরা ম্যালেরিয়ার প্রাণান্তকারী প্রেমালিঙ্গন হইতে পরিত্রাণ পাইব। অতএব ড্রেণেজ বিল আইনে পরিণত হউক; পল্লী গ্রামে ড্রেণ হউক বা ড্রেণের পথ পরিষ্কার হউক। তোমরা পথ-কর দিতেছ, পূর্ত্তকর দিতেছ; পুনঃ ড্রেন-কর দেও। অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিয়া বা অন্য যে উপায়েই পার, অন্যান্য করের ন্যায় এ করও যোগাও। বেশ, ড্রেণই হউক।

কিন্তু, সে কেমন ড্রেণ? তাহার আকার অবয়ব, কলেবর ও কান্তি কীদৃশ? তাহা কলিকাতা সহরের ড্রেণের মত পাকা ও ঢাকা নর্দ্দামা অথবা সহরতলীর উলঙ্গ অনাবৃত এবং অতীব সুবাসিত পগাররূপী-পয়োপ্রণালী বা পঙ্ক-নালী? গ্রাম্য ড্রেণ পদার্থ টী কি? গ্রাম্য ড্রেণ বলিতে এই বড় বড় বিলময় বঙ্গদেশে, চরে চত্তরে, ধান্যের ক্ষেত্রে, বাঁশবাগানে, গ্রাম্য লোকের আনাচে কানাচেই ড্রেণ বুঝায়; কিন্তু সে ড্রেণের মূর্ত্তি কেমন, আকার প্রকার ও প্রকৃতি কিরূপ? এক কথায় এই ড্রেণেজ বিলের গঠনে তাহার উদ্দিষ্ট ড্রেণের কিদৃশ গঠন পিঠন বর্ণিত হইয়াছে?

বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবেন কি?—সে বর্ণনা, সে ব্যাখ্যা এই বিলে এক বর্ণও নাই! অথচ এখানি ড্রেণেজ বিল! ড্রেণ করার জন্য এই বিল প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু ড্রেণ কি প্রকারের হইবে, সে কথা ইহাতে একটীও নাই, তাহা আদৌ অনির্দ্দিষ্ট; একান্ত অপরিজ্ঞাত আকাশ কুসুম!

ড্রেণেজ বিলে সর্ব্বশুদ্ধ ৬২টী ধারা; তাহা ব্যতীত আরও বিস্তর উপধারা আছে; ধারা নিচয়ের শাখাপ্রশাখা এবং তস্য শাখা আছে; এবং এই ধারা-প্রবাহে ড্রেণের আনুষঙ্গিক এবং অবান্তরিক অসংখ্য কথা আছে। ড্রেণের করের কথা আছে, করের কিস্তির কথা আছে, ড্রেণ-কমিসনরের কথা আছে, এঞ্জিনিয়ারের কথা আছে, করদাতার কথা আছে, কম্পেনসেসনাদির কথাও আছে;—কোন্ কথা নাই? নাই কেবল একটী কথা; সেটী ড্রেণটী কেমনতর হইবে সেই কথাটী!

ইহা আশ্চর্য্য বটে। ড্রেণেজ বিল প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরে, ড্রেণ কেমন হইবে, এই কথা লইয়া সাধারণ্যে সবিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়? অবস্থাজ্ঞ লোক মাত্রেই একবাক্যে প্রশ্ন করেন,—"গ্রাম্য ড্রেণের গঠন কেমন হইবে, এবং সে গঠনের কথা বিলে না থাকার কারণ কি?" পরন্তু, এ প্রসঙ্গে আরও প্রদর্শন করা হয়, পদে পদে প্রতিপন্ন করা হয় যে, নিম্ন বাঙ্গালার ভৌগলিক সংস্থান গ্রাম্য ড্রেণের অনুকূল নহে; প্রত্যুত সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুপযোগী। অর্থাৎ চৌড়া চেপ্টা চরভূমি সমাকীর্ণ, ধান্য ক্ষেত্র পূর্ণ, বিল বাঁওড় খাল জোল জলা পূর্ণ, বঙ্গদেশে, তাহার অর্থ বঙ্গীয় কৃষকপল্লী নিচয়ে, মিউনিসিপাল সহর বাজারের পথ পার্শ্বস্থ পয়োনালীর অনুরূপ ইংরেজী ধরণের ড্রেণ আদৌ হইতে পারে না; হওয়ার কিছু মাত্র প্রয়োজনও নাই; হইলে ইষ্টের পরিবর্ত্তে মহা অনিষ্ট সাধিত হইবে; কেন না তদ্দ্বারা কৃষকপল্লীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী এবং মধ্যবর্ত্তী ধান্য-ক্ষেত্র সমূহে জল চলাচলেরপথ রোধ হইয়া দেশের সর্ব্ব প্রধান খাদ্যশস্য, বাঙ্গালী জাতির দেহ-প্রাণ একত্রিত রাখিবার একমাত্র উপায় ধান্য ফসলের ধ্বংস হইবে; কারণ ধান্য-ক্ষেত্র শুষ্ক হওয়া এবং ধান্যের ধ্বংস হওয়া একই কথা। গ্রামে গ্রামে সহর বা সহরতলীর মত ড্রেণ হইলে, (হওয়া যদি আদৌ সম্ভব হয়) ধান্য-

ক্ষেত্র শুষ্ক হওয়া একরূপ অবশ্যম্ভাবী। অতএব গ্রাম্য ড্রেণে লোকের জ্বর জ্বালা কমুক আর না কমুক; তদ্দ্বারা ম্যালেরিয়া জনিত মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস হউক বা বৃদ্ধিই হউক,—কি হইবে ঠিক করিয়া কেহই বলিতে পারেন না,—ইহা নিশ্চয়,যে ধান্য হানিতে,লোকের জীবন ধারণের উপায় থাকিবে না। ড্রেণেজ বিল জারি হওয়ার অব্যবহিত পরে, উক্ত বিল সম্বন্ধে অন্যান্য আপত্তির আন্দোলনের সহিত, উপরোক্ত কথা দুইটা বর্ত্তমান বেঙ্গলগবর্ণমেণ্টের গলাধঃকরণ করিয়া দিবার সবিশেষ চেষ্টা চরিত্র করা হয়। বুঝান হয় যে, নিম্ন-বঙ্গের ভৌগলিক সংস্থান গ্রাম্য ড্রেণের অত্যন্ত অনুপযোগী। তথা গ্রাম্য ড্রেণ, বঙ্গদেশের সর্ব্ব প্রধান খাদ্য শস্য ধান্য উৎপাদনের অন্তরায়। কারণ,কৃষক পল্লীতে মিউনিসিপাল ড্রেণ করা, ধান্য ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে ড্রেণ কাটিয়া তাহার জল বাহির করিয়া দেওয়ারই অনুরূপ।

উপরোক্ত কথা দুইটী প্রথমতঃ কাউন্সিল গৃহে এবং তাহার পর বহুদিন পর্য্যন্ত দেশীয় সংবাদ পত্রে উত্থাপিত ও আন্দোলিত হয়। কাউন্সিল গৃহে (Bengal Legislative Council Chambers) মাননীয় মিঃ এলেন, মিঃ লালমোহন ঘোষ, মিঃ লায়েল,বাবু গণেশচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি সদস্য বর্গ,অল্পাধিক পরিমাণে, উপরোক্ত কথা দুইটীর আলোচনা করেন। মিঃ এলেনের বক্তৃতার কিয়দংশ কিছু বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করা আবশ্যক।

মিঃ এলেন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের এক জন বহু পুরাতন, বিশ্বস্ত, বহুদর্শী এবং অত্যুচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে ইহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা একরূপ অতুলনীয়। বিগত ৩২ বৎসর হইতে ইনি ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বহু বিভাগে, সরকারী সিবিলসার্ব্বিশের কর্ম্ম, মহকুমার মাজিষ্টরী হইতে বিভাগীয় কমিসনরী পর্য্যন্ত করিয়াছেন; এবং প্রথম এপিডেমিক কমিসন গঠনের সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া জ্বর অবলোকন ও ম্যালেরিয়া তথ্য অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন। প্রথম এপিডেমিক কমিসন নিযুক্ত হইয়াই যখন, ম্যালেরিয়ার কারণ অনুসন্ধানকল্পে বারাসতে গমন করেন, মিঃ এলেন তখন বারাসতের মাজিষ্টর। তৎকাল হইতেই ইনি ম্যালেরিয়াতত্ত্ব অধ্যয়নে নিযুক্ত, এবং বরাবরেই ম্যালেরিয়ার মধ্য-কেন্দ্রে অবস্থিতি করিয়া এ তত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছেন। অতএব ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ইহার অভিজ্ঞতা, আলোচনা, সাক্ষাৎ সংগৃহীত প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং বহুকাল-ব্যাপী পরীক্ষা, কাহারও অপেক্ষা কম নহে; অনেকেরই অপেক্ষা অধিক,এ কথা আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি। মিঃ এলেন নিজেও ইঙ্গিতে এ কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন;—

"There is no member in this Council and there is probably no member in the Service in Bengal, who has a larger acquaintance with the Malarial fever, commonly called the Burdwan fever, than I possess."

অর্থাৎ বর্ত্তমান বেঙ্গল কাউন্সিলে,সম্ভবতঃ সমগ্র বঙ্গীয় সার্বিসে এখন এমন একজনও সদস্য নাই,ম্যালেরিয়া জ্বরসম্বন্ধে যাঁহার অভিজ্ঞতা আমার অপেক্ষা অধিক।

মিঃ এলেনের এই উক্তি অহঙ্কারের উক্তি নহে; ইহা প্রকৃত ঘটনামূলক। অতএব ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে, এই মিঃ এলেন কি বলিয়াছেন, তাহা শুনা, এ সময়ে সকলেরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মিঃ এলেন সেই কথাগুলি কহিয়াছিলেন,তাঁহার কর্ত্তব্য তাহাতে সবিশেষ কর্ণপাত করিয়া কার্য্য করা। বেঙ্গলকাউন্সিলের বাঙ্গালী সদস্য এবং বাঙ্গালীর দেশের বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের কথা

উপেক্ষনীয় হইলেও, মিঃ এলেনের মত বহুদর্শী ও বিশ্বস্ত রাজপুরুষের কথাও কি উপেক্ষিত হইবে ?

কিন্তু, ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া প্রশমন-পরিকল্পিত এই ড্রেণেজ সম্বন্ধে মিঃ এলেনের অভিমত কি ?

এককথায়, উত্তর,—আমরা এই প্রবন্ধের আরম্ভ হইতে এপর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি,—তাহাই। তাহা অপেক্ষাও অধিক দূর মিঃ এলেন গিয়াছেন। মিঃ এলেনের দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রত্যক্ষজ্ঞান ও বহুকালব্যাপী গবেষণার ফল—(১) তথা-কথিত ম্যালেরিয়া জ্বর ম্যালেরিয়া জনিত নহে; অবরুদ্ধ পয়োনালী জনিতও নহে; (২) গ্রামে গ্রামে পয়োনালীর সৃষ্টি ও সংস্কারে এবং তথা কথিত উন্নতিতে গ্রাম্য স্বাস্থ্যের আদৌ সম্ভাবনা নাই; সে বিষয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্দিগের মত ঘোর সন্দেহান্ধকারাবৃত; (৩) তথা কথিত উন্নত পয়োনালীতে বঙ্গদেশব্যাপী-জ্বর প্রশমিত হওয়ার পরিবর্ত্তে সম্ভবতঃ প্রবলীকৃত হইবে; (৪) বেঙ্গল ড্রেনেজ বিলের মূলতত্ত্ব অর্থাৎ তাহার পরিকল্পিত বিষয় ভ্রমসঙ্কুল এবং (৫) বঙ্গদেশে গ্রাম্য ড্রেণ আদৌ অসম্ভব; তদ্দ্বারা দেশের জীবন ধারণোপযোগী শস্য ধান্য ফসল মারা পড়িবে।

পাঠকের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য মিঃ এলেনের নিজের উক্তির কতক কতক এস্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করি।

মিঃ এলেন বলেন,—ব্যবস্থাপক বৈঠকেই বলিয়াছেন;—

"For these reasons after having had my constant attention directed to the subject and being naturally anxious to ascertain some cause, I have been utterly unable to satisfy myself that this fever is in any way connected with drainage or malaria. My conclusion was that it is mainly due to constitutional conditions, but I will not now detain the council on this theory. It is sufficient for me to simply to draw attention to the uncertainty which hangs over the main assumption of this Bill, namely that by improving the drainage of a tract of country we necessarily improve the health of the people. It may be so but my own experience in Calcutta does not lead me to think so. After having run the gauntlet of the most malarial districts of Bengal, I gained experience in my own person of fever for the first time in the town of Calcutta, and this I will say that the fever of Calcutta is much more vicious and persistent type than any fever in the Mafassal. Infact improved drainage appears to give a ty-phoid * character to the most trifling fever."

ইংরেজী অভিজ্ঞ উপরোক্ত উক্তির অন্তর্নিহিত গুরুত্ব অনুভব করিবেন। ইংরেজী অনভিজ্ঞের অনুধাবনার্থে উহার বাঙ্গালা অনুবাদ ফুটনোটে দিলাম। মিঃ এলেনের বিবে-

* এই সকল কারণে এবং স্বাভাবিক প্রবণতা বশতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ নির্ণয় কল্পে সতত উহার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায়, আমি উহার কারণ আবিষ্কারের জন্য বহুকালাবধি সবিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছি; কিন্তু, কখনও আমি এ কথায় সন্তুষ্ট ও বিশ্বাসবান্ হইতে পারি নাই যে, এই জ্বর আদৌ ড্রেণেজ বা ম্যালেরিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই জ্বর প্রাকৃতিক অবস্থা সঞ্জাত ইহাই আমার সিদ্ধান্ত; কিন্তু সে কথা সবিস্তারে বলিবার জন্য আমি কাউন্সিলের সময় গ্রহণ করিতে চাহি না। এস্থলে কেবল ইহাই বলিলে প্রচুর হইবে যে, এই বিলের মূল বিষয় অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কোন স্থানের ড্রেণের উন্নতি করিলে তথাকার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে ইহা সমূহ সংশয়ের বিষয়। কলিকাতার সহর সম্বন্ধে আমার নিজের যাহা অভিজ্ঞতা, তাহাতে উন্নত ড্রেণেজে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। বরং তাহার বিপরীতই আমার বিশ্বাস। ম্যালেরিয়া পূর্ণ বঙ্গের বহু জিলা ঘুরিয়া আসিয়া আমি সর্ব্বপ্রথম জ্বরে পড়ি, কলিকাতা সহরে। সহরের জ্বর মফঃস্বলের জ্বর অপেক্ষা অধিকতর উগ্র, ইহাই আমার ধারণা। ফলতঃ সমুন্নত ড্রেণেজে অত্যল্প জ্বরও টায়ফয়েড প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

চনায় মফঃস্বলের জ্বর অপেক্ষা কলিকাতা সহরের জ্বর ভয়ঙ্কর;—অধিকতর সাংঘাতিক; সহরে অত্যল্প জ্বরও অচিরাৎ টায়ফয়েড্ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়; তাহার কারণ,মিঃ এলেনের বিবেচনায়, কলিকাতা সহরের সমুন্নত ও সংস্কৃত পয়োনালী বা ড্রেণেজ!! মিঃ এলেন নিজে ইহার ভুক্তভোগী; নিজের শরীরে এবং স্বাস্থ্যে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন। তিনি ম্যালেরিয়া পূর্ণ বঙ্গের বহু জিলা নিরাপদে পার হওয়ার পর, প্রকৃষ্ট পাকা পয়োপ্রণালী সুশোভিত রাজধানী কলিকাতা সহরে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম জ্বরের হাতে পড়েন এবং সে জ্বর, তাঁহাকে বড় সহজে ছাড়ে নাই। তা,সহরের জ্বরাসুর সম্বন্ধে, স্ব স্ব শরীরে যাঁহাদের সবিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা মিঃ এলেনের এই উক্তি এককথায় উড়াইয়া দিতে পারেন না। পরন্তু,মিঃ এলেন স্পষ্টভাষাতেই বলিয়াছেন যে, বঙ্গীয় জ্বর বা বর্দ্ধমান ফিবারের সহিত ম্যালেরিয়া ও ড্রেণেজের সবিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই।

কিন্তু, আমরা উপস্থিতে যে বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহারই পুনঃ অবতারণা করি। নিম্নবঙ্গের গ্রামে, মফঃস্বলে কৃষকপল্লীতে সহরানুরূপ ড্রেণ হওয়া অসম্ভব; অস্বাভাবিক উপায়ে তাহা করাতে শস্য ক্ষেত্র শাফ্ উজাড় হইবে; ধান্য সটান মারা পড়িবে। এ সম্বন্ধে, মিঃ এলেনের উক্তি এই;—এ উক্তিও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়,বঙ্গেশ্বর স্যর চার্লস এলিয়টের সম্মুখে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত;—

"But admitting that malaria is the cause of all this deadly fever, what is the remedy? Is it possible to improve the drainage of Bengal? I observe that there is no section in the Bill prohibiting the cultivation of rice in any area, subjected to drainage and being improved. It rice cultivaiion is still to go on, in a drained area it is perfectly certain that the drainage must be perfectly inoperative. Is it contemplated that rice cultivation should cease? If so, the last stage of the people may be worse than the first, and it may prove a measure for starving men in order to save them from fever. The actual condition of things in Bengal renders any thing like effective drainage absolutely impossible."

পাঠক, এইখানে ক্ষণেকের জন্য একটু বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া মাননীয় মিঃ এলেনের উপরোক্ত আধ বিদ্রূপাত্মক, মর্ম্মভেদী উক্তির লাবণ্য, তাহার সম্যক সাহিত্য-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবেন। আর মনে রাখিবেন মিঃ এলেন বঙ্গীয় সদস্য নহেন; বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সম্পাদকও নহেন; স্বয়ং সাহেব লোক। বে-সরকারী যে সে সাহেবও নহেন। সিবিল সার্ব্বিসের একটী সিংহ। তিনি সরকারের বৃদ্ধ, বহুদর্শী, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। মিঃ এলেন, এই বিল ব্যপদেশে, ব্যবস্থাপক বৈঠকে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন;—"তা,স্বীকারও যদি করা যায়, স্বীকারই না হয় করা গেল যে, ম্যালেরিয়াই এই মৃত্যুকর মর্ম্মভেদী জ্বরের কারণ; কিন্তু, ইহার প্রতিকার কি? বঙ্গদেশের ড্রেণেজের উন্নতি সম্পাদন করা কি অদৌ সম্ভব? আমি এই বিলে এমন একটীও ধারা দেখিতে পাইতেছি না, যে ধারায় ধান্যের চাষ করা নিষেধ কর বলিয়া আদিষ্ট হইয়াছে। যে সকল স্থলে ড্রেনেজ দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি করা হইবে, সে সকল স্থলে যদি ধান্যের চাষ অবিচলিত ভাবেই চলিতেথাকে তবে ইহা সম্যক নিশ্চয় যে, ড্রেনেজ স্বকার্য্যোপযোগী হইবে না। ধান্যের চাষ বন্ধ হউক, ধান্য রোপণ নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত, ইহাই কি তবে,সুচিন্তা দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে? তাহাই যদি হয়, তবে রোগ অপেক্ষা ঔষধেতেই লোকের প্রাণ

যাইবে; প্রথমের অপেক্ষা শেষের এই বিপদ বহু গুণে বেশী ও বিষম হইবে। গবর্ণমেণ্টের এ ব্যবস্থা, রায়ত লোককে জ্বর হইতে পরিত্রাণ করিতে যাইয়া, তাহাদিগকে অনাহারে মারিবে। ফলতঃ বঙ্গদেশের প্রকৃত এবং প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অবস্থা যেরূপ,তাহাতে করিয়া, ইহার ড্রেণেজের কোনও কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা একান্ত অসম্ভব।"

"পশ্চিম বাঙ্গালার অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ভূমি পশ্চাতে রাখিয়া,মুর্সিদাবাদের ভাগিরথী হইতে ত্রিপুরার পাহাড় পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশ বৎসরের চারি মাস কাল, প্রায় "একশা" জল-মগ্ন থাকে। জল ৫ ফুট হইতে কোথাও কোথাও ১৫ ফুট পর্য্যন্ত গভীর। এরূপ স্থলে, এবম্বিধ অবস্থায়,কোনও স্থায়ী কার্য্যোপযোগী ড্রেণেজ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?" মিঃ এলেন বলেন এবং এ কথা প্রকৃতও বটে যে, যে কয় মাস দেশ জলে ভাসিতে থাকে, জল নিঃসরণ না হইয়া জল-প্রণালী-নিচয় অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, সেই কয় মাসই জ্বর জ্বালা কম;—সেই কয় মাসই বরং বঙ্গদেশ স্বাস্থ্যকর; পরন্তু যখন হইতে জল সরিতে ও শুষ্ক হইতে থাকে, তখন হইতেই জ্বর জ্বালার প্রাদুর্ভাব হয়।

আমরা ইত্যগ্রে উল্লেখ করিয়াছি যে, ড্রেণেজ বিল প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরে, কি প্রকারের ড্রেণ হইবে বলিয়া সাধারণ্যে প্রশ্ন হয় এবং গ্রামে গ্রামে সহস্রানুরূপ ড্রেণ অসম্ভব ও অনিষ্টকর হইবে, ইহা প্রদর্শিত করা হয়। ড্রেণেজ বিলের উদ্দিষ্ট ড্রেণের প্ল্যান বা কল্পনা লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের মনে, প্রথম সূত্রে যাহাই থাকুক বা একেবারেই কিছু না থাকুক, উপরোক্ত প্রশ্ন ও প্রমাণ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে; এবং প্রবেশ করিয়া, বোধ হয়, কিছু ক্লেশকর হয়। লোকের পীড়াপিড়ী, অথচ ড্রেণেজ বিলের ড্রেণ একান্ত অনির্দ্দিষ্ট; স্যর চার্লস এলিয়ট অগত্যা একটী উপায় চিন্তা করিতে বাধ্য হন;—অতঃপর একটী উপায় উদ্ভাবনও করিয়াছেন। এ ড্রেণেজ গঠন সম্বন্ধে এ উদ্ভাবন, ড্রেণেজ বিলের অঙ্কুরে,অথবা তাহা জন্মিবার অগ্রে তিনি, আপনার মনে, আপনি করিয়া রাখিয়াছিলেন; অথবা লোকের পীড়াপিড়িতে পরে উদ্ভাবন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে তাহা যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজেরই স্বকপোল কল্পিত,এবং তদীয় ঢাকাই বক্তৃতার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, অন্য লোকের, এমন কি তাঁহার চিফ সেক্রেটারী কটন সাহেবেরও পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্রও কারণ আমরা সম্মুখে দেখিতেছি না। ফলতঃ ড্রেণেজ বিলে বর্ণিত ড্রেণের গঠন কেমন হইবে,তাহা এক ছোটলাট সাহেব ব্যতীত রাজপুরুষদিগের অপর কেহই বোধ হয় জানিতেন না; ড্রেণেজ বিল যিনি ড্রাফ্‌ট করিয়াছিলেন তাঁহারও বোধ করি, উহা অজ্ঞাত ছিল; বিল দেখিয়া, তাহার অনুমানও কেহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে পারেন নাই,লাটসাহেবের ব্যাখ্যা পার্শ্বে রাখা ব্যতীত,পরেও তাহা কেহ অনুমান করিতে পারিবেন না; ইহা নিশ্চয়। ড্রেণেজ বিলের গঠনটী এমনি "ধরি মাছ-না ছুঁই-পানি প্রকৃতির করা হইয়াছে যে,যখন যাঁহার যেমন ইচ্ছা,তেমনি ড্রেণের ব্যবস্থা দিতে পারিবেন। বিনা ড্রেণেও ড্রেণেজ কর আদায় করিতে পারিবেন। ড্রেণেজের প্রথম সূত্রপাতেই ত সেইরূপ হইতে চলিয়াছে, দেখিতেছি, বিনা ড্রেণে অর্থাৎ কোন রকমের ড্রেণ তৈয়ার না করিয়াও ড্রেণেজ করা যাউক। সরকারী

সাহেবরাও সম্ভবতঃ জানিতেন না, ড্রেণ কেমন হইবে; কেন না, তাহা জানা থাকিলে, ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী সদস্যেরা সে বিষয়ের প্রথম উথাপন কখনই করিতেন না। প্রমাণ এলেন সাহেবের উপরি আলোচিত বক্তৃতা। সুতরাং কেবল এক স্যর চার্লসই এই ড্রেণেজ বিলের ড্রেণের মূর্ত্তি পূর্ব্বে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, কাহাকেই বলেন নাই; অথবা পাকে বা বিপাকে পড়িয়া, পরে উদ্ভাবন করতঃ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় বলিয়াই বোধ হয়!

ঢাকা নগরীতে প্রদত্ত তাঁহার প্রসিদ্ধ "স্পিচে" স্যরচার্লস বিল ব্যপদেশে বঙ্গীয় ড্রেণের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এই বক্ষ্যমান বিল সম্পূর্ণ এক বিভিন্ন এবং অভিনব স্তরে উত্থিত বা পতিত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই বলিতে হয়। সে স্তর কিদৃশ, পরে বিবৃত করিব। তাহার পূর্ব্বে একটী কথা এই স্থলে।

জল প্লাবন-প্রবণ এবং জলে প্লাবিত, পরন্তু, ধান্যক্ষেত্রের চর-সমাকীর্ণ নিম্ন বাঙ্গালায় ইংরেজী গঠনের ড্রেণ হওয়া অসম্ভব এবং হইলে অনিষ্টকর, এ বিষয়, বর্ত্তমান বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট, উপস্থিত আন্দোলন হইতেই যদি অবধান করিয়া, ড্রেণেজ ব্যপদেশে আত্ম-কল্পিত অনুষ্ঠান অধুনা অন্য দিকে চালিত করিয়া থাকেন, তবে উক্ত গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী প্রমাণাদিতে উদাসীন বা অনভিজ্ঞ, ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে। কেন না, উপরোক্ত কথা নূতন নহে; এবং কেবল অদ্যকার এই আন্দোলন হইতেও উদ্ভূত নহে।

১৮৭০সালে,—সে আজ ২৪বৎসরের কথা, যখন বেঙ্গল কাউন্সিলে মাননীয় অ্যাস্লে ইডেন কর্ত্তৃক "ড্রেণেজ ও ইরিগেসন বিল" পেস হয়, তখনও অবস্থা এই; অতএব তখনও এই অবস্থানুসারে উপরোক্ত কথা উত্থাপিত হইয়াছিল এবং মিঃ এলেন এখন এ সম্বন্ধে, যেরূপ বলিয়াছেন, তখনও কাউন্সিলের সদস্য গতাসু রাজা দিগম্বর মিত্র ঠিক সেইরূপ কথা বলিয়া ব্যবস্থাপকদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে, ধান্য ক্ষেত্রে ড্রেণ করিলে, ধান্য ধ্বংস হইয়া লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। এ সম্বন্ধে মিত্র মহাশয়ের প্রসিদ্ধ বক্তৃতার অনেক উক্তির মধ্যে একটী উক্তি এই;—

"But unfortunately for Mr. Adley's Scheme of drainage, and removal thereby of the cause of the epidemic, the adjoining lands happened to be paddy lands over which water lodged to the depth of two or three feet and which continued in that state for at least four months in the year and these lands according to him were equally productive of miasm. In this list of causes were found "moist lands and meadows" or 'water-lodged sub-soil when dried up under the sun" again rice grounds especially in Jallahs, where the ears of the crops only are cut off and the stalks left to rot,—thus adding fuel to the fire." Now, was Mr. Adley prepared to drain these rice lands which constituted nine-tenths of the culturable lands of lower Bengal and deprive the people, if possible, of the only food crop, the lands were capable of bearing? But what made Mr. Adley so sure that these *bheels* and "rice grounds" were the causes of the epidemic fever?"*

---

* মিঃ অ্যাডলের ড্রেণেজ প্রস্তাবানুসারে ধান্য ক্ষেত্রও সংক্রামক ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ। কেননা ধান্য ক্ষেত্রে বৎসরের অন্যূন চারিমাস পর্য্যন্ত দুই তিন ফিট করিয়া জল আটকাইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহার মতে তাহার অভ্যন্তর হইতে ম্যালেরিয়া উৎসারিত হয়। বিশেষতঃ ধান্য কাটার পর ধান্য ক্ষেত্রে যখন ধান্যবৃক্ষের নিম্নভাগ বা "নাড়া" পলিত হইয়া তথাকার জল শুষ্ক হইতে থাকে, তখন ত আর কথাই নাই; তখন এই সাহেবের বিবেচনায় হুতাশনে ঘৃতাহুতি; ম্যালেরিয়া মর্ম্মান্তিকভাবে মুখব্যাদান করিয়া মৃত্যু বিস্তার করে। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সাহেব বাহাদুর কি ড্রেণ করিয়া ধান্য ক্ষেত্রের জল বাহির করিয়া দিয়া তাহা শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করতঃ দেশ শুদ্ধ লোককে অনাহারে মারিতে চাহেন। কেননা ভূমির $\frac{9}{10}$ ভাগ ধান্য ক্ষেত্র!! কিন্তু ধান্য ক্ষেত্র হইতেই যে ম্যালেরিয়া উদ্ভাবিত হয়, কি প্রমাণে এই সাহেব সে বিষয়ে এতাধিক কৃতনিশ্চয় হইলেন।

পরন্তু, এতাদৃশ ড্রেণেজে কেবল স্বাস্থ্যের নহে, ভূ সম্পত্তিরও উন্নতি হইবে, বলিয়া, তখন কল্পনা করা হইয়াছিল; এখনও সে কল্পনা, এই বক্ষমান বিলের অন্তর্নিহিত বটে;—নহিলে কেবল ভূমি সংশ্লিষ্ট লোক মাত্রেই ড্রেণেজ করের কবলীভূত হইত না, ড্রেণেজ জনিত স্বাস্থ্যের অংশী সকল শ্রেণীর লোককেই সে কর দিতে বাধ্য করা হইত। কিন্তু, স্বাস্থ্যের ন্যায়, এ প্রকারের ড্রেণেজে প্রধানতঃ ধান্য মাত্র প্রসূ, বঙ্গীয় ভূমির কিছুমাত্র উন্নতির সম্ভাবনা নাই; প্রত্যুত, অনিষ্টই অতি নিশ্চয়। এ কথাও দিগম্বর মিত্র তখন বুঝাইয়াছিলেন;

"As for land improvement, he hoped, it was not pretended that drainage, *perse*, was beneficial to agriculture in a country when-tenths of the culturable lands were only fit for the cultivation of paddy which required for its growth and maturity a continuous supply of water for four months."*

রাজা দিগম্বর মিত্রের কথা গ্রাহ্য হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট "ড্রেণেজ ও ইরিগেসন বিল" দেশব্যাপী ব্যবস্থায় পরিণত করিতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু, এখন দেখিতেছি, পুনঃ সেই প্রশ্নের উদয়! বেঙ্গল স্যানিটারী ড্রেণেজ বিলের বক্ষে পূর্ব্বের সেই প্রমাদ প্রতিভাত! অতএব, অগত্যাই বুঝিতে হইতেছে যে, স্যর চার্লস এলিয়াটের গবর্ণমেণ্টের, এ সমস্যা-সংলগ্ন পূর্ব্ব সূত্রে সবিশেষ দৃষ্টিপাত করেন নাই। করিলে, ২৪ বৎসর পূর্ব্বে, যে প্রমাদ প্রতীত হইয়া, পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট, পুনঃ সেই প্রমাদে পতিত হইলেন কেন? ড্রেণেজ বিলের ঢাকাই ব্যাখ্যায় গবর্ণমেণ্ট, কিঞ্চিৎ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বটে; কিন্তু, তাহাতেও এ প্রমাদ সংশোধন হয় নাই; কারণ বিল পূর্ব্ববৎই বিদ্যমান। তা, সে বিষয়ের আলোচনা আমরা একটু পরে করিতেছি। অগ্রে দেখা যাউক, গবর্ণমেণ্ট, কি প্রকৃতির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

ড্রেণেজ বিল সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়, বিগত শীত ঋতুতে, ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে; শ্রদ্ধাস্পদ স্যর চার্লস এলিয়ট, গবর্ণমেণ্টের বর্ষা শফর ব্যবদেশে ঢাকা নগরে গমন করেন বিগত জুলাই মাসের শেষ ভাগে। সেটী বিল প্রসূত হওয়ার পর ষষ্ঠ মাস। ষষ্ঠ মাস, হিন্দু মতে, অন্নপ্রাশনের অতি প্রশস্থ সময় বটে। সেই সময়ে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এই বিলের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা হয়। ঢাকা মিউনিসিপালটীর অভিনন্দনের উত্তর উপলক্ষে স্যর চার্লস এই বিল সম্বন্ধে সাধারণ সমালোচনার একটী সমালোচনা করিয়া সপক্ষ সমর্থনের অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্যই বলিতে হইবে, ইহা তাঁহার সহৃদয়তা, সুশাসন-বাসনা এবং সাধারণ অভিমতের প্রতি অনুপেক্ষার অতি উদার পরিচয়। পরন্তু, তিনি সম্পূর্ণরূপে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া প্রজা সাধারণের প্রভূত মঙ্গল কামনায় যে এই বিল ব্যবস্থায় পরিণত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তাহারও ইহা অপর একটী নিদর্শন। ফলতঃ তাঁহার সদুদ্দেশ্য এবং সাধারণ মতামতের প্রতি এই সাহানুভূতির জন্য তিনি অবশ্যই এ দেশীয়দিগের কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা আবর্ষণ করিয়াছেন। এই বিল ব্যপদেশে তাঁহার সদভিপ্রায়ের জন্য, তাঁহাকে যাহারা মুক্ত কণ্ঠে ধন্যবাদ প্রদান না করে, তাহারা প্রত্যবায়ভাগী আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি। ড্রেণেজ বিল সর্ব্বাংশে সদভিপ্রায় প্রণোদিত; তবে সুমন্ত্রণা সঞ্জাত নহে; কারণ অভিপ্রেত ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনভিপ্রেত অনিষ্টই ইহাতে ঘটিবে।

আমরা পূর্ব্বেও এই কথা বলিতেছি। বিল সুমন্ত্রণা-সঞ্জাত এবং সুযুক্তি সিদ্ধ নহে; পরন্তু, ঢাকা নগরের বক্তৃতায় তাহার যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাও সন্তোষ-জনক নহে। তাহাতে সাধারণের আপত্তি নিচয়ের একটীও খণ্ডিত হয় নাই; প্রকৃত তত্ত্ব পরিস্কৃত হয় নাই; গবর্ণমেণ্ট সমগ্রবিষয়টীর গুরুত্ব এখনও সম্যক রূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, ইহাও অনুভূত হইতেছে না। প্রত্যুত সে ব্যাখ্যায় অন্ধকার আরও অধিক পরিমাণেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ সমালো-

---

* যে দেশের কৃষিযোগ্য ভূমির ৯/১০ ভাগ ধান্য ক্ষেত্র, যাহাতে বৎসরের চারিমাস কাল ক্রমাগত জলের প্রয়োজন, সে দেশে ভূমি ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি কল্পে, ড্রেণেজ প্রকৃত প্রস্তাবে আদৌ ইষ্টকর হইতে পারে, এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না।

চন্দীয় স্তর চার্লস্ যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার স্বাস্থ্য ঘটিত কথার আলোচনা আমরা ইত্যগ্রেই সমাপ্ত করিয়াছি, পাঠক স্মরণ রাখিবেন; পরন্তু, রায়ত লোকের দারিদ্র্য দুঃখ,অন্নকষ্ট,অনাহার এবং করভারের উপর পুনঃকর অসহিষ্ণুতার বিষয়ও অল্পাধিক উল্লেখ করিয়াছি। স্তর চার্লসের সমালোচনার আরও কোন কোনও প্রধান কথার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইবে। তবে তাঁহার সকল কথার সম্যক বিচার করিতে হইলে বৃহৎ একখানি বই লিখিতে হয়; অতএব তাহা হইয়া উঠিবে না। ক্রমশঃ

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

হিন্দুপত্রিকা।

(সমালোচনা।)

হিন্দুপত্রিকা—যশোহর সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম-সমাজ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মজুমদার, এম্, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য বার্ষিক মূল্য ১৲। ইহার ৬ষ্ঠ সংখ্যাপর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। এই পত্রিকার তিনটি বিশেষ আকর্ষণ আছে;—

(১) রমেশবাবুর বেদানুবাদের নিন্দা।

(২) "পদপাঠ" বা সন্ধি বিশ্লেষণ।

(৩) যে সমাজ হইতে ইহা প্রকাশিত, সেই সমাজে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ পূর্ব্বক সমাজকে পরিবর্ত্তিত করিবার ইচ্ছা।

যাঁহারা স্বতঃ পরতঃ ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের জন্য যত্নবান,তাঁহারা রমেশ বাবুর নিন্দায় আহ্লাদিত। কেন না রমেশবাবু কায়স্থ হইয়া বেদানুবাদ করিয়াছেন,ইহা অনেকের গাত্রজ্বালাকর হইয়াছে। যাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কৃতদাস,যথা বসু দাস মহাশয়,ঘোষদাস মহাশয় ইত্যাদি, তাঁহারাও রমেশ বাবুর নিন্দায় অসন্তুষ্ট নহেন। রমেশ বাবুর অনুবাদ ভ্রমাত্মক হইয়াছে,ইহা শুনিলেই এই সকল ব্যক্তি এই পত্রিকাস্থ অনুবাদ অতি শুদ্ধ হইয়াছে, ধরিয়া লইবেন,সন্দেহ নাই। ঘটনাও তাহাই হইয়াছে,অনেক"স্মৃতিরত্ন" "ন্যায়ভূষণ"সম্পাদকের অনুবাদকে "হিতকর" বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। যে কারণে রমেশ বাবুর অনুবাদ অহিতকর বিবেচিত হইয়াছে, সে কারণ যে এই অনুবাদে কম আছে, তাহা নহে! তবে এ অনুবাদে বর্ণভেদ প্রথা সমর্থন করিতে পারে। 'অগ্নি'শব্দের অর্থে'পরমাত্মা' করিয়া রমেশ বাবুর ভ্রম প্রমাদ দেখাইতে উদ্যত সুতরাং ইহা যে হস্ত হইতে বাহির হউক না কেন,ইহা ভট্টাচার্য্য মহলে উৎসাহযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় আকর্ষণ, একটী প্রবল আকর্ষণ। যাহারা অল্প সংস্কৃত জানে,যাহাদের অধ্যবসায় কম, তাহারা আর সন্ধিবিশ্লেষের কষ্ট ভোগ না করিয়া এই পত্রিকাস্থ উদ্ধৃত সংস্কৃতাংশ সুখে পাঠ করিতে পারিবে। এজন্য অনেক পাঠক আহ্লাদিত, সন্দেহ নাই। এই আকর্ষণ টুকু মৌলিক হইলেও, ইহার শক্তি দীর্ঘকাল কাজ করিবে, এরূপ বিবেচনা করা যায় না, কেননা, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন শিক্ষণীয় বিষয় নহে।

তৃতীয় আকর্ষণ বা নবীনত্ব একটী বিশেষ শক্তি হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ছয় খণ্ড পত্রিকা পাঠ করিয়াও, আমরা বুঝিতে পারি নাই, এই পত্রিকা হিন্দু সমাজে কি পরিবর্ত্তন করিতে চাহে। "পরিবর্ত্তন" "পরিবর্ত্তন" "পরিবর্ত্তন" ইহার ধ্বনি। কিন্তু কি পরিবর্ত্তন, তাহা ইহার মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই। আমরা এজন্য সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনাদের কার্য্যপ্রণালী বা প্রোগ্রাম কি,তাহাতে উত্তর পাইয়াছি,"কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রণালী নাই।" সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সমাজ "আবাদ" করিবেন, বীজ বপন নাকি অন্যের হাতে। সুতরাং সনাতন হিন্দুধর্ম্মসমাজ ধ্বংসের জন্য অবতীর্ণ, নির্ম্মাণ কার্য্য অন্য পুরুষের হাতে। বঙ্গবাসীর

মত গোঁড়া সমাজরক্ষকও কন্যাপণ প্রভৃতিপ্রথা উঠাইতে চাহে। সমাজে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, শুদ্ধ একথা বলিবার জন্য কি একখান বাগাড়ম্বর পূর্ণ পত্রিকার প্রয়োজন ? সমাজ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতার জন্য যুক্তি উপস্থিত করার সময় বোধ হয় অতীত হইয়াছে। যে প্রণালীতে এই পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহাই এক্ষণ প্রদর্শন করার, পত্রের দরকার, এবং তাহাই করা সমাজের প্রয়োজনীয়।

এতগুলি কথা বলিলেও আমরা হিন্দু-পত্রিকার হিতৈষী। কেননা, সম্পাদকের হৃদয় আমাদের অপরিজ্ঞাত নহে। বিশেষতঃ, তাঁহার অন্তঃকরণের মর্ম্মনিহিত ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার প্রতিকূল নহে। যাঁহারা নব্য-ভারতে সময় সময় বর্ণনির্ব্বিশেষে সজল ব্যবহারের প্রস্তাব মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, এবং "জাতীয় একতা" সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যাঁহাদের নেত্রতলস্থ হইয়াছে, তাঁহারা দেখিবেন, এই পত্রিকার উদ্দেশ্যে এই উভয় কথাই আছে। তবে বড় অস্পষ্ট ভাবে।

"যাহাতে জাতীয় একতা সংস্থাপিত হয়, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সমাজ তৎপক্ষে চেষ্টা করিবেন"—সমাজের উদ্দেশ্যের মধ্যে এ কথাটী আছে। এস্থলে "জাতীয় একতা" শব্দদ্বয় কোটেশনের মধ্যে লিখিলেই ভদ্রোচিত হইত, কেননা জাতীয় একতা সম্বন্ধে নব্যভারতে ৮টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

(১ম সংখ্যার টাইটেল পেজের অপর পৃষ্ঠা দেখ) ৫ম সংখ্যায় ৪৩ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে লিখিত হইয়াছে ;—

"হিন্দু সমাজে যাহারা নীচ অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া গণ্য, তাহারা যত দিন হিন্দু সমাজের নিয়মানুসারে কার্য্য করে, তত দিন তাহাদের অনেক সমাজিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয়, কিন্তু যাই তাহারা হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিল, অমনি হিন্দুরা তাহাদিগকে অপবিত্র জ্ঞান করিতে বিরত হইলেন, কিম্বা পবিত্রই জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যদি একজন হিন্দু বিনামা নির্ম্মাণের ব্যবসায় নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে অস্পৃশ্য জঘন্য চামার বলিয়া পরিগণিত হইবে, কিন্তু একজন ইংরেজ যদি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে তিনি মেঃ অমুক্ সাহেব, সেলাম কুরনিসের যোগ্য এবং তাহার পদাঘাত বেত্রাঘাতও সহ্য হয়। * * আরও দেখুন, ঐ চামার অদ্য যদি হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তখন আর আমাদের সাধ্য কি যে কর্ত্তৃত্ব খাটাই। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল আর হিন্দুচক্ষেও তাহাদের অপবিত্রতা দূর হইল। তবে কি হিন্দুধর্ম্মই তাহাদের অপবিত্রতার কারণ ছিল? কেবল কি ব্যবসার দ্বারাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব কি নীচত্ব নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত ? যে ব্যক্তি সমাজে নীচ বলিয়া পরিগণিত, ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে অনেক সদভ্যাসসম্পন্ন ব্যবসায়োপজীবী অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল হইতে পারে। তাহার পরোপকার বৃত্তি, ঈশ্বর নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, জিতেন্দ্রিয়ত্ব অধিক হইলেও কি হিন্দু সমাজে সে অনাদৃত ও অপমানিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে ? এইরূপ হওয়া শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম ও যুক্তির বিপরীত।"

অনাচরণীয় হিন্দুকে আচরণীয় করিবার প্রস্তাবে, আমরা যে জলচল পত্রিকা লিখিয়াছিলাম, এই কথাগুলি সেই উদ্দেশ্যের কত অনুকূল। সম্পাদকের সহৃদয়তার নিকট আমরা কত কৃতজ্ঞ। তথাচ আমরা না বলিয়া পারিতেছি না যে, যে প্রণালী অনুসারে তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মনস্তুষ্টি করিতে চাহেন, তাহা তাঁহার এ হৃদয়ের বিরুদ্ধ। রমেশ বাবুর নিন্দাবাদে কোন ফল নাই। প্রভূত পরিশ্রম, প্রগাঢ় চিন্তা, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক যত্ন এবং উচ্চনিম্ন সর্ব্ব প্রকার হিন্দুর হিতচিন্তায় রমেশ বাবু সমাজ সংস্কারকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি বঙ্কিম বাবুর মত হৃদয় প্রচ্ছন্ন করিয়া কোন কথা বলিতে যান নাই, কোন বিশেষ মত সমর্থন করাও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। যাহাই সত্য ও ঐতিহাসিক, তাহাই সরল বিশ্বাসে হিন্দু সাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছেন। ঋক্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তে আমরা অগ্নি শব্দে অগ্নিই বুঝি, ১০ম মণ্ডলের ১২১ সূক্তেও রমেশ বাবুর অনুবাদ বিশুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করি। যাহারা এই পত্রিকার অনুবাদ রমেশ বাবুর অনুবাদের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় আমাদের মতে মত দিবেন। বৃথা অর্থবিভ্রাট ঘটান, প্রকৃত সংস্কারের বিরোধী। দুঃখের বিষয়, হিন্দুপত্রিকার চেষ্টা যেন সেই দিকে!

শ্রীমধুসূদন সরকার।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। হোম-রুল।—শ্রীশ্রীপতিচরণ রায় প্রণীত, মূল্য ৶০ আনা। এই পুস্তিকাখানি হোমরুলের সমালোচনা নহে। কোন্ কোন্ অবস্থার ভিতর দিয়া আইরিশ জাতি হোম-রুল-বিল-আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, অতি সংক্ষেপে, হৃদয়গ্রাহী মধুর ভাষায় শ্রীপতি বাবু এই পুস্তকে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ন্যায় পরাধীন জাতির প্রত্যেকের গৃহে, পঞ্জিকার ন্যায়, এক একখানি এইপুস্তক রাখা উচিত; কেননা, ইহাতে শিখিবার, বুঝিবার, ভাবিবার, মনুষ্যত্বলাভের অনেকউপদেশ আছে, পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা খুব সুখী হইলাম।

২। দারোগার দপ্তর—বাঃ গ্রন্থকার।—শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৶০। প্রিয় বাবুর যেমন ভাষা, তেমনই ভাবযোজনা। অল্প কথায় সরল করিয়া এদেশের অল্প লেখক এরূপ গল্প লিখিতে পারেন। পড়িলে শিক্ষা পাওয়া যায়, জ্ঞান জন্মে, কৌতুহল পরিতৃপ্ত হয়, বিশুদ্ধ আমোদ পাওয়া যায়, এবং আমাদের মনে হয়, কোন কোন ব্যক্তি জাল জুয়াচুরি কিরূপ করিয়া করিতে হয়, তাহাও শিখিতে পারে। "বাঙ্গলা-গ্রন্থকার" পড়িয়া আমাদের মনে এ প্রশ্ন উদিত হইয়াছে যে, ইহাতে অপরিপক্ক-চরিত্র লোকের অনিষ্ট হয় কি না? গ্রন্থকার একজন সৎ লোক, এই সন্দেহের মীমাংসা করিবেন, আশা করি।

৩। Treatment by Electricity or Electro-Therapeutics. By Nandalal ghosh, L. M. S. এই পুস্তকের প্রারম্ভে, সুযোগ্য, সুচিকিৎসক বিখ্যাত ডাক্তার হরনাথ রায় মহাশয়ের বিস্তৃত একটী উপক্রমণিকা আছে। তাহা অতি উদার, উপাদেয়, সুচিন্তাপূর্ণ। বৈদ্যুতিক চিকিৎসা-প্রণালীতে কোন্ কোন্ রোগের উপকার হয়, দৃষ্টান্ত দ্বারা এই পুস্তকে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইলে বহু লোকের উপকার হইত। পুস্তকখানিতে শিক্ষা করিবার অনেক জিনিষ আছে। পড়িয়া যারপর নাই সুখী হইলাম।

৪। রাবণ-বধ কাব্য—প্রথম খণ্ড, মূল্য ১৲। শ্রীহরগোবিন্দ লস্কর বিরচিত ও প্রকাশিত। মেঘনাদবধ কাব্যের পরবর্ত্তী ঘটনাবলম্বনে লিখিত। সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে এই গ্রন্থখানি লিখিত, এজন্য গ্রন্থকারের আশঙ্কা যে, সাধারণ পাঠকগণের নিকট পুস্তক খানি নীরস বোধ হইবে। কিন্তু এরূপ চেষ্টা না করিলেও বাঙ্গালা ভাষার তাদৃশ পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে না। এজন্য, আমরা গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার এই অভিনব ভাষা-চাতুর্য্য বাঙ্গালা সাহিত্যে চলিবে কিনা, বলিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যদি নাও চলে, এ কথা সকলেই বলিবে যে, হরগোবিন্দ বাবুর চেষ্টা ও উদ্যোগ বড়ই প্রশংসনীয়। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি কল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, অর্থ ব্যয়করিতেছেন, ইহা অবগত হইয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া পারিবে?

পুস্তক খানি এখনও অসম্পূর্ণ, সুতরাং বিস্তৃত সমালোচনার সময় উপস্থিত হয় নাই। সমাপ্ত হইলে এই পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করার ইচ্ছা আছে।

৫। চরিত-রত্নাবলী শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল কর্ত্তৃক লিখিত ও ২১০।৬ নং কর্ণওয়ালিস-ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, মূল্য ।০ চারি আনা। এই পুস্তক খানিতে কয়েকটী ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা ও কয়েকজন সাধক ভক্তের জীবনী সংগ্রথিত হইয়াছে। ধার্ম্মিক কিরূপে পাপাত্মাদিগের শত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও আপনাকে পবিত্র রাখে, নিমজ্জমান পাপী কিরূপে পুনরুত্থান করে, এই সাধু মহাত্মাদিগের জীবনে তাহা শিক্ষা করা যায়। পুস্তক খানির ভাষা বেশ সরল ও তৃপ্তিকর, পাঠে অনুরক্তি জন্মে। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই ইহা পাঠযোগ্য।

মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন? (৩)

একবার কোন ব্যক্তি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোনকে বলিলেন, হার্বার্ট স্পেন্‌সর এক খানি গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মানুষ পরমেশ্বরের বিষয় কিছু বুঝে না। গ্লাড্‌ষ্টোন উত্তর করিলেন, মানুষ পরমেশ্বরের বিষয় কি বুঝিবে? লোকে যখন আমার বিষয়ই বুঝিতে পারে না, তখন ঈশ্বরের বিষয় কি বুঝিবে? আমি কি অভিপ্রায়ে, কি কার্য্য করি, ইংলণ্ডবাসীগণ কি তাহা বুঝিতে পারে? আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া নানা কথা বলে। যখন মানুষ মানুষকেই বুঝিতে পারে না, তখন ঈশ্বরকে কেমন করিয়া বুঝিবে? কেমন করিয়া তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ের মধ্যে প্রবেশ করিবে?

বিজ্ঞান বলিতেছেন যে, জগৎ আগ্নেয় বাষ্পাকারে শূন্যমার্গে ঘুরিতেছিল। ক্রমে শীতল ও কঠিন হইয়া জীবের বাসোপযোগী হইয়াছে। এই উপযোগিতা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই; ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। একদিকে প্রাকৃতিক উৎপাত ক্রমশঃ অল্প হইয়া আসিতেছে, অপরদিকে মনুষ্যের জ্ঞান ও ক্ষমতার ক্রমোন্নতি হওয়াতে প্রাকৃতিক উৎপাতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় সকল আবিষ্কৃত ও অবলম্বিত হইতেছে। যে শক্তি ও নিয়ম, সকল জগৎকে বাষ্পাকার হইতে বর্ত্তমান আকারে আনিয়াছে, সেই শক্তি ও নিয়ম সকলের ক্রিয়া এখনও চলিতেছে। এখনও পরিবর্ত্তন ও উন্নতির স্রোত বহিতেছে। সৃষ্টি ক্রিয়া ক্রমাগত চলিতেছে। জগৎ পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হয় নাই। জগতের পরিণাম সম্বন্ধে পরমেশ্বরের পূর্ণ অভিপ্রায় এখনও প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং বর্ত্তমান্ সময়ে জগৎ কার্য্যের সমালোচনা, উহার দোষ গুণ বিচার, নিতান্তই অসঙ্গত। কিন্তু জগতের কার্য্য আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে ইহা সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র জগৎ ক্রমশঃ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতেছে।

যে সকল বিষয়কে আমরা আপাততঃ কষ্টকর বলিয়া মনে করি, গভীর ভাবে চিন্তা করিলে তাহার মধ্যেও পরমেশ্বরের শুভাভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ভয় এই সকলকে মানুষ সচরাচর কষ্টের কারণ মনে করে। কিন্তু ঐ সকল কি আমাদের উপকার করিতেছে না? যদি বুদ্ধি চালনা করিয়া, বিচার করিয়া আহার পান করিতে হইত, তাহা হইলে কয় জন লোকের শরীর প্রকৃতিস্থ থাকিত? যখন শরীরের পক্ষে আহার প্রয়োজন, তখন ক্ষুধা আমাদিগকে উহাতে বল পূর্ব্বক প্রবৃত্ত করে। যখন জল পান প্রয়োজন, তখন তৃষ্ণা আমাদিগকে জলপান করিবার জন্য অস্থির করিয়া তুলে। আমরা এতদূর নির্ব্বোধ যে, ক্ষুধা তৃষ্ণার উত্তেজনা সত্ত্বেও অনেক সময় উপযুক্ত সময়ে আহার না করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করি। এরূপ স্থলে যদি আহার পান করিবার ভার সম্পূর্ণ রূপে আমাদের বিচারশক্তির উপরে নির্ভর করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের শরীর রুগ্ন হইয়া শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হইত। জ্ঞানময় পরমেশ্বর তাহা জানেন। সেই জন্যই তিনি আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার উপরে আমাদের আহার পানের ভার দিয়া রাখেন নাই। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা রূপ এমন দুই প্রবল শক্তিকে আমাদের দেহে রক্ষা করিয়াছেন যে, উহারা আমা-

দিগকে উপযুক্ত সময়ে আহার পান করিতে বাধ্য করে। ক্ষুধা না থাকিলে শিশুগণ কি সময় বিবেচনা করিয়া আহার করিতে পারিত? অথবা তাহাদের পিতা মাতাগণ কি সকল সময়েই তাহাদের শরীরের উপযুক্ত অবস্থায় তাহাদিগকে আহার দিতে পারিতেন? কেবল শিশু বলিয়া কেন? প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণই যখন ক্ষুধা তৃষ্ণার স্বাভাবিক উত্তেজনা সত্ত্বেও অনেক সময় স্বেচ্ছাচারী হইয়া শারীরিক নিয়মলঙ্ঘন করেন, তখন শিশুদিগের বিষয় ত দূরের কথা।

ভগবান্ মানবাত্মার মধ্যে তাঁহার আদেশ প্রকাশ করেন, ইহা কি আপনারা বিশ্বাস করেন? আমি করি। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়ে যেমন তিনি আমাদিগকে আদেশ করেন, তেমনি শারীরিক বিষয়েও তিনি এক প্রকার আদেশ করিয়া থাকেন। উপযুক্ত সময়ে আহার পান করিবার জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা তাঁহার এক প্রকার আদেশ। আমাদের কল্যাণের জন্য, প্রতিদিন তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন যে, আহার পানের উপযুক্ত সময় হইয়াছে।

দুর্গন্ধে আমাদের কষ্ট হয়,কিন্তু উহাতেও মঙ্গলময়ের মঙ্গলাভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। দুর্গন্ধ আমাদিগকে সাবধান করে। শটিত বা অন্যরূপ দুর্গন্ধময় পদার্থ হইতে এমন এক প্রকার গ্যাস নির্গত হয়, যাহা আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইলে শরীর অসুস্থ হইতে পারে। সুতরাং মঙ্গলময় বিধাতা এমনই বিধান করিয়াছেন যে,যখনই উহার সহিত আমাদের নাসারন্ধ্রের যোগ হয়, তখনই ক্লেশানুভব হইয়া থাকে। ক্লেশানুভব হইলেই আমরা সাবধান হই, দুর্গন্ধময় পদার্থকে পরিহার করি। তাহাতে আমাদের শরীর রক্ষা পায়। পরমেশ্বর কেমন সুকৌশলে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেছেন। পশুরা যখন কোন দ্রব্য আহার করে, তখন প্রথমে তাহার ঘ্রাণ লয়। ঘ্রাণদ্বারা তাহারা বুঝিতে পারে, উহা তাহাদের আহার্য্য কি না। বোধ হয় ঘ্রাণ মনোরম হইলেই তাহারা আহার করে, এবং ক্লেশকর হইলেই তাহারা উহা পরিত্যাগ করে।

পরমেশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে অল্প ক্লেশ, অধিকতর ক্লেশ নিবারণ করে। অল্প ক্লেশ পাইলেই আমরা সাবধান হই। তাহাতে অধিকতর ক্লেশ, অনেক সময় গুরুতর বিপদ্ নিবারিত হয়। সুতরাং ক্লেশ আমাদের বন্ধু। পরমেশ্বর অনেক সময়ে কিছু কষ্ট পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে মহা দুঃখ ও বিপদ হইতে রক্ষা করেন। আমরা বুঝি না বলিয়া তাঁহাকে দোষ দিই। সকল দিক্ দেখিনা বলিয়া তাঁহাকে দোষ দিয়া থাকি।

এক ব্যক্তি কোন স্থানে দেখিলেন যে, দুই জন লোক একটী শিশুকে বলপূর্ব্বক ধরিয়াছে এবং অন্য এক ব্যক্তি শিশুর উরুদেশে তীক্ষ্ণ ছুরিকা প্রবিষ্ট করিয়া দিতেছে। শিশুর শরীর হইতে রক্তস্রোত বহিতেছে। সে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। যিনি ইহা দেখিলেন, তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। এই ভয়ঙ্কর নৃশংস ব্যাপার দেখিয়া তিনি বিরক্তি ও ক্রোধে অস্থির হইলেন। উক্ত তিন জন লোকের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে তীব্রভাবে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন শুনিলেন যে, যে দুই ব্যক্তি শিশুকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আছে, উহার মধ্যে একজন শিশুর পিতা; আর একজন তাহার পিতৃব্য; আর যিনি উহার উরুদেশে অস্ত্র চালনা করিতেছেন, তিনি একজন চিকিৎ-

সক। গভীর স্ফোটক হওয়াতে তিনি অস্ত্র চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সকল কথা শুনিয়া দর্শক ভদ্রলোকটীর বিরক্তি ও ক্রোধ চলিয়া গেল, তিনি লজ্জিত হইয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

একদেশদর্শিতার জন্য আমরা অনেক বিষয়ে প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি না। অনেক বিষয়ের অর্থ না বুঝিয়া আমরা ভ্রান্তি-সঙ্কুল সিদ্ধান্তে উপনীত হই। শিশুর প্রতি ঘোরতর নিষ্ঠুরতা হইতেছে মনে করিয়া যিনি ক্রোধে অস্থির হইলেন, তিনিই আবার উক্ত ঘটনার সমগ্র জ্ঞান লাভ করিয়া, উহার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া, লজ্জিত হইলেন। যাঁহাদিগকে তিনি নিষ্ঠুর অত্যাচারী মনে করিয়াছিলেন,তাঁহাদিগকেই শিশুর পক্ষে পরম হিতকারী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। জগৎ কার্য্য সম্বন্ধেও মনুষ্যের এই প্রকার হইয়া থাকে। আমরা অনেক ঘটনার অর্থ না বুঝিয়া পরমহিতকারী বন্ধুকে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী বলিয়া মনে করি। পরমেশ্বর অনেক সময় আমাদিগের সম্বন্ধে অস্ত্র চিকিৎসা করিয়া থাকেন, আমরা না বুঝিয়া মনে করি তিনি কষ্ট দিতেছেন।

মনুষ্যের অভাব আছে বলিয়াই তাহার কার্য্যশীলতা আছে। কার্য্যশীলতা আছে বলিয়াই ক্রমবিকাশ সম্ভব হইতেছে। সেই জন্যই সহানুভূতি, সহযোগিতা, ও প্রতিযোগিতা সম্ভব হইতেছে। এই স্বাভাবিক অভাবজনিত কার্য্যশীলতার জন্যই মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের যোগ হইতেছে। মনুষ্যের পরস্পরের মধ্যে যত প্রকার সম্বন্ধ, তাহার মূলে এই স্বাভাবিক অপূর্ণতা ও অভাব। সেই স্বাভাবিক অভাব দূর করিবার জন্যই মনুষ্য কার্য্যশীল হয়। কার্য্যশীলতাতেই তাহার গৌরব, মহত্ত্ব ও উন্নতি। নতুবা মানুষ জড়ের মত হইয়া থাকিত। সহানুভূতি ও সহযোগিতা না থাকিলে, স্নেহ দয়া প্রেম না থাকিলে, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কোথায় থাকিত ? অভাব হইতেই কার্য্যশীলতা। কার্য্যশীলতা না থাকিলে মানুষ ও জড়ে কি প্রভেদ থাকিত? নিজের ও অপরের দুঃখ নিবারণ করিবার জন্যই মানুষ ব্যস্ত। ইহাতেই তাহার গৌরব ও মহত্ত্ব। ইহাতেই মানব প্রকৃতির ক্রমোন্নতি।

জীবের অপূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী (necessary)। সুতরাং অপূর্ণতা জনিত দুঃখও অবশ্যম্ভাবী। অবশ্যম্ভাবী হইলেও উহা অস্থায়ী। অনেক স্থলে উহা উচ্চতর সুখের হেতু। আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টি ইহা সকল স্থলে দেখিতে পায় না। সুতরাং না বুঝিয়া আমরা পরমেশ্বরকে দোষ দিই। বিশ্বরূপ যন্ত্রের সকল অংশ দেখিনা,বুঝিনা—প্রায় কিছুই বুঝিয়া—না বুঝিয়া কত কথা বলি, না বুঝিয়া দোষ দি।

একজন আদ্‌পাগলা রকমের লোক গ্রীষ্মকালে সূর্য্যতাপে বহুদূর পর্য্যটন করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী এক বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে আসিয়া উপবিষ্ট হইল। কিয়ৎক্ষণ বসিয়া শ্রান্তি দূর হইলে সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, পরমেশ্বরের এ কেমন বিবেচনা ? কুমড়া লাউ প্রভৃতি সামান্য লতা মাত্র; অথচ উহাদের কত বড় ফল; আর বটবৃক্ষ এমন প্রকাণ্ড, অথচ ইহার ফল কত ক্ষুদ্র। ভগবানের সামঞ্জস্য বোধ নাই। এই রূপে সেই লোকটী পরমেশ্বরের কার্য্যের সমালোচনা করিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ তাহার মস্তকে একটী বটের ফল পতিত হইল। তখন সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, বুঝিয়াছি, বাবা, তোমার ভুল নয়,আমারই ভুল। কুমড়া লাউ প্রভৃতি ফল যেমন বড়, যদি

সেই হিসাবে বটবৃক্ষের ফল বড় হইত, তাহা হইলে আজ আমার মস্তকটী ত গিয়াছিল। আমরা অনেক সময় না বুঝিয়া অনন্ত পুরুষের সৃষ্টি-লীলার সমালোচনা করি, না বুঝিয়া তাঁহার কার্য্যের দোষ প্রদর্শন করি। "খোদার উপর খোদকারী" করিতে গিয়া আমরা মহা-ভ্রমে পতিত হই।

মৃত্যু চরাচর শাসন করিতেছে। অবোধ মনুষ্য মৃত্যুকে মহা অমঙ্গল বলিয়া মনে করে। কিন্তু মৃত্যুতে জগতের মঙ্গল না অমঙ্গল? যাঁহারা পরমেশ্বরের মঙ্গলস্বরূপের বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থিত করেন, তাঁহারা বলেন যে, মঙ্গলময়ের রাজ্যে কেমন করিয়া মহা অমঙ্গলকর মৃত্যুর বিধান সম্ভব হইল? যাঁহারা মৃত্যুকে মহা অমঙ্গল বলিয়া পরমেশ্বরের স্বরূপে দোষারোপ করেন, তাঁহারা কি জীবনকে সুখময় বলেন? তাঁহাদের মতে জীবের জীবন দুঃখময়; জীবনে সুখ যদি থাকে, অতি সামান্য। এ সংসারে জীবকে অধিকাংশ স্থলে দুঃখই ভোগ করিতে হয়। জীবন যদি দুঃখময় হইল, তবে জীবনে মঙ্গল কোথায়? জীবের জীবন ও মৃত্যু এই উভয়ই দুঃখ ও যন্ত্রণাময়। সংশয়বাদী বলেন যে, জীবন ও মৃত্যু এ উভয়ই যন্ত্রণাময়। তবে মঙ্গল কোথায়? মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের জগতে এত দুঃখ যন্ত্রণা কেন?

যদি বল মৃত্যু অমঙ্গল; তাহা হইলে জীবন কি মঙ্গলময় হয় না? জীবনের অবসান হওয়ার নামই মৃত্যু। জীবনের অবসান হইল, তাহাতে দুঃখ কি? দুঃখময় জীবন চলিয়া গেল, ইহা ত সুখেরই বিষয়। জীবন যদি দুঃখময় হয়—অমঙ্গলময় হয়, তবে কোন্ যুক্তিতে মৃত্যুকে অমঙ্গল বল? জীবন ও মৃত্যু পরস্পর বিপরীত। জীবন যদি মন্দ হয়, তবে তাহার বিনাশ অবশ্য ভাল। যাহা মন্দ, তাহা নষ্ট হওয়াই ভাল। যদি বল, জীবন দুঃখময়—অমঙ্গলময়, তবে কোন্ যুক্তি অনুসরণ করিয়া বলিতে পার যে, মৃত্যু অমঙ্গল? যদি বাস্তবিকই মৃত্যু একটী অমঙ্গল হয়, যদি বাস্তবিকই জীবন শেষ হওয়া দুঃখের বিষয় হয়, তবে বলিতেই হইবে যে, জীবন দুঃখময় বা অমঙ্গলময় নহে—এ জীবনে অনেক সুখ আছে। জীবন যদি মন্দ হয়, মৃত্যু ভাল। আর মৃত্যু যদি মন্দ হয়, জীবন ভাল। অন্ধকার যদি মন্দ হয়, আলোক ভাল; আলোক যদি মন্দ হয়, অন্ধকার ভাল। পরস্পর দুই বিপরীত পদার্থ, উভয়ই ভাল বা উভয়ই মন্দ, ইহা সহজযুক্তিবিরুদ্ধ। যাঁহারা জীবন এবং মৃত্যু এই উভয়কেই অমঙ্গল মনে করিয়া পরমেশ্বরের স্বরূপে দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথার অসঙ্গতি দোষ তাঁহারা দেখিতে পান না। ক্ষুধায় আহার ভাল, অনাহার মন্দ। সমান অবস্থায় অনাহার ও আহার উভয়ই ভাল, বা উভয়ই মন্দ, ইহা সম্পূর্ণরূপে যুক্তি-বিরুদ্ধ।

জীবনে সুখ অধিক কি দুঃখ অধিক? সুখ কিসে হয়? জীবন রক্ষার পক্ষে যাহা অনুকূল, তাহাতেই সুখ। জীবন রক্ষার পক্ষে যাহা প্রতিকূল, সাধারণতঃ তাহাতে জীবের কষ্ট। জীবনরক্ষার পক্ষে অনুকূল অবস্থাতে সুখোৎপত্তি হয়; এবং জীবন রক্ষার প্রতিকূল অবস্থাতে দুঃখোৎপত্তি হয়। সাধারণতঃ প্রকৃতির এই নিয়ম। জীবন রক্ষার পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা অধিকতর হইলে জীবন থাকে না। জীবন রক্ষার পক্ষে অনুকূল অবস্থা অধিকতর থাকিলেই জীবন রক্ষা সম্ভব হয়। সুতরাং জীবের জীবনে প্রতিকূল অবস্থা অপেক্ষা অনুকূল অবস্থারই আধিক্য রহিয়াছে। নতুবা জীবন সম্ভব

হইত না। প্রতিকূল অবস্থা অপেক্ষা অনুকূল অবস্থার আধিক্য থাকাতে ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীবনে দুঃখের অপেক্ষা সুখ অধিক।

মানুষ যত দুঃখ পায়, অনেক নিজের দোষে। পরমেশ্বরকে দোষ দেওয়া অন্যায়। এ কথায় কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, পরমেশ্বর মানুষকে দোষ করিবার ক্ষমতা কেন দিলেন ? জড় প্রকৃতির ন্যায় মানুষ যদি অনতিক্রমনীয় নিয়মে বদ্ধ হইত, যদি মানুষের স্বাধীনতা না থাকিত, তাহা হইলে ত মানুষ দোষ করিতে পারিত না ? পরমেশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা দিলেন কেন ? স্বাধীনতা না দিলে মানুষের পক্ষে ধর্ম্ম অসম্ভব হইত। ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে, ইহাই মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ গৌরব। স্বাধীনতা না থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব হইত। স্বাধীনতাই ধর্ম্মের জীবন। যে নারী চিরকাল লৌহময় গৃহে কঠিন নিগড়ে বদ্ধ, তাহাকে সতী বলিয়া কি কেহ প্রশংসা করে ? যেখানে পাপ করিবার ক্ষমতা নাই, সেখানে ধর্ম্মোপার্জ্জনও অসম্ভব। পক্ষাঘাত রোগে যাহার হস্ত পদ অবশ, তাহাকে কি কেহ নিরুপদ্রব বলিয়া, কাহাকেও আঘাত করেনা বলিয়া, প্রশংসা করিতে পারে ? স্বাধীনতা আছে বলিয়াই মনুষ্য নীতি ও ধর্ম্মের অধিকারী হইয়াছে। স্বাধীনতাতেই মানুষের গৌরব। যদি স্বাধীনতা না থাকিত, তবে মনুষ্য কোন সৎকার্য্য করিলেও মনুষ্যের কার্য্য বলিয়া তাহার কোন মূল্য থাকিত না। বিপরীত পথে চলিবার শক্তি আছে বলিয়াই, মনুষ্য সৎপথে চলিলে তাহার প্রশংসা ও গৌরব। গ্রহের কক্ষের ন্যায় যদি মানবজীবনের একই নির্দ্দিষ্ট পথ থাকিত, উহা হইতে বিচ্যুত হওয়া ঐশিক নিয়মানুসারে অসম্ভব হইত, তাহা হইলে মানবের কার্য্যে নিন্দা বা প্রশংসা, দোষ বা গুণ, গৌরব বা হীনতা, ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের স্থান থাকিত না। যেমন ঐ কাষ্ঠ খণ্ড জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, যেমন ঐ তৃণ খণ্ড বায়ুহিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে, সেইরূপ মনুষ্যও অখণ্ডনীয় প্রাকৃতিক শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইত, তাহার নিজের স্বতন্ত্রতা কিছুই থাকিত না।

ব্রহ্মাণ্ডে দুই শক্তি, ঐশী শক্তি ও জীবশক্তি। পরমেশ্বর স্বয়ং কার্য্য করিতেছেন এবং জীব তাঁহা হইতে প্রাপ্ত শক্তি লইয়া কার্য্য করিতেছে। জগতের যাবতীয় ঘটনা ও কার্য্য, দুই প্রকার হইতে পারে। হয়, ঈশ্বরের কার্য্য-নতুবা জীবের কার্য্য। যদি বল, মানবের স্বাধীনতা নাই, তাহা হইলে সকলই ঈশ্বরের কার্য্য হইয়া যায়, সকলই তিনি করিতেছেন। স্বাধীনতা অস্বীকার করিলে, যাহাকে সচরাচর লোক জীবের কার্য্য বলে, তাহা বাস্তবিক জীবের কার্য্য থাকে না। পরমেশ্বরেরই কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। জীবের স্বতন্ত্র শক্তি যদি স্বীকার না কর, তাহা হইলে তাহার স্বতন্ত্র কার্য্যও কিছু থাকে না, সকলই ঈশ্বরের কার্য্য হইয়া যায়। যাহা আমি করিতেছি বলিয়া মনে করি, তাহা বাস্তবিক আমি করিতেছি না। আমার কার্য্য কিছুই থাকিল না। আমার কার্য্যকে ভাল বল, আর মন্দই বল, ধর্ম্ম বল, অধর্ম্মই বল, কিছুই আমার কার্য্য নহে।

একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। যদি কেহ সম্পূর্ণ বলদ্বারা আমাকে কোন কাজ করায়, যদি উক্ত কার্য্য সম্বন্ধে আমার কর্ত্তৃত্ব কিছু মাত্র না থাকে, তবে উক্ত কার্য্যের জন্য আমি ধর্ম্মতঃ দায়ী নহি। যদি সম্পূর্ণ বলের সহিত

তোমার হাত ধরিয়া তোমাকে কিছু লিখাইয়া লই, যদি আমার বলকে অতিক্রম করিবার শক্তি তোমার লেশ মাত্র না থাকে, তাহা হইলে ঐ লেখার জন্য তুমি দায়ী নহ। কেন না উহা তোমার লেখা নহে—আমার লেখা।

জীবের স্বতন্ত্র শক্তি না থাকিলে, ইহা বলিতেই হইবে, ব্রহ্মাণ্ডের সকল ঘটনা ও কার্য্য ব্রহ্মশক্তি হইতে নিঃসৃত হইতেছে। সুতরাং কার্য্যের মধ্যে পাপ ও পুণ্য, গর্হিত বা প্রশংসনীয়, এই রূপ বিভাগ কেমন করিয়া থাকিবে? জড়জগতে বা জীবজগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, যে কোন কার্য্য হইতেছে, সকলই পরমেশ্বরের কার্য্য। সুতরাং কার্য্যের মধ্যে পাপ পুণ্যের প্রভেদ কেমন করিয়া থাকিবে? ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই থাকে না। ধর্ম্ম আছে বলিয়াই অধর্ম্ম সম্ভব, অধর্ম্ম আছে বলিয়াই ধর্ম্ম সম্ভব।

স্বাধীনতা না থাকিলে ধর্ম্ম হয় না। কিন্তু কেবল স্বাধীনতা থাকিলেই যে ধর্ম্ম হয়, এমন নহে। ধর্ম্মবুদ্ধি (moral sense), স্বাভাবিক ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ব্যতীত পাপ পুণ্য সম্ভব হয় না। মানবহৃদয় নিহিত স্বভাবজাত ধর্ম্মজ্ঞান, ন্যায় অন্যায় বোধের সত্তা প্রতিপন্ন করিতেছে যে, মানুষ স্বতন্ত্রশক্তিসম্পন্ন জীব। যে ব্যক্তি অন্যের হস্তের যন্ত্র, বায়ুপরিচালিত তৃণ খণ্ডের ন্যায় অন্য শক্তি দ্বারা যে নিরন্তর পরিচালিত হইতেছে, তাহার পক্ষে উচিত, অনুচিত; ন্যায় অন্যায়; ধর্ম্মাধর্ম্ম এই সকল বাক্য অর্থশূন্য শব্দমাত্র। ধর্ম্মবুদ্ধি প্রকাশ করিতেছে যে, জড়জগতের ন্যায় মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে চিরবদ্ধ নহে।

তুমি জগতের হিত চাও, তোমার যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, জগতের কর্ত্তা, তিনি জগতের হিত চান না? তুমি কি তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছ? হাউয়ার্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা কি হাউয়ার্ড অপেক্ষা নিকৃষ্ট? স্রষ্টা অপেক্ষা সৃষ্ট বড়, কারণ অপেক্ষা কার্য্য বড়, ইহার অপেক্ষা অসার অযুক্ত কথা কি আছে?

এস্থলে কেহ এই আপত্তি করিতে পারেন যে, সাধু মহাত্মাদের দেখিয়া যদি তাঁহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের পবিত্রতা ও মঙ্গলভাব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাও, তাহা হইলে জগতে যে সকল নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, পিশাচ তুল্য লোক ছিল এবং এখনও আছে, তাহাদিগকে দেখিয়া ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বল না কেন? অভিনিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে এই আপত্তির অসারতা সহজেই প্রতীত হয়।

চিত্ত যখন প্রশান্ত থাকে, অর্থাৎ যে সময়ে পাশব প্রবৃত্তির উত্তেজনায় বিবেক চক্ষু মলিন হয় না, সেই সময়ে যদি অতি নৃশংসস্বভাব অত্যাচারীকে, অতি হীন স্বভাব পাপাত্মাকেও জিজ্ঞাসা করা যায়, বল দেখি, প্রেম ভাল, কি, অপ্রেম ভাল? বল দেখি, পুণ্য শ্রেষ্ঠ কি পাপ শ্রেষ্ঠ? বলদেখি, তুমি যে সমস্ত বস্তুর জন্য অত্যাচার কর, পাপ কর, অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, সুখ, যশঃ, মান, প্রভুত্ব, এই সমস্ত যদি অত্যাচার না করিয়া, পাপ না করিয়া পাও, তবে অত্যাচার কর কি না? তাহা হইলে সে ব্যক্তি অসংকোচে বলিবে, প্রেমই শ্রেষ্ঠ, পুণ্যই শ্রেষ্ঠ, বিনা অত্যাচারে অভিলষিত সমস্ত বস্তু পাইলে অত্যাচার করি না, পাপ করি না। এই যে প্রেম পুণ্যের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, স্বাভাবিক আকর্ষণ, ইহা মানব মাত্রেরই অন্তরে বর্ত্তমান। সকলের মধ্যে ইহা সমান উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত নহে। শিক্ষা, সভ্যতা ও সাধনের তারতম্যানুসারে ইহার উজ্জ্বলতারও তারতম্য হয়। কিন্তু সকলের মধ্যেই অল্পাধিক পরি-

মাণে পূর্ণমঙ্গল ও পূর্ণ পবিত্রতার সাধারণ আদর্শ বর্ত্তমান। যাহার মধ্যে যে পরিমাণে ইহা প্রকাশিত, তাহার নৈতিক দায়িত্ব তত। তাহার মধ্যে পাপ পুণ্যের সংগ্রাম তত অধিক। ইহাই পরমেশ্বরের পূর্ণ মঙ্গলভাব ও পূর্ণ পবিত্রতার উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি আত্মার অভ্যন্তরে স্পষ্টরূপে বলিতেছেন "আমি পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ, আমি পূর্ণ পবিত্রস্বরূপ।"

ঘোর অত্যাচারী, নৃশংস, দুর্বৃত্ত লোকের হৃদয়ের গভীর স্থানে যে স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই। যে ব্যক্তি ঘোর অত্যাচারী, আপনার স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য অন্য লোককে সর্ব্বদাই কষ্ট দিয়া থাকে, পরস্বাপহরণ, পরপীড়ন যাহার জীবনের প্রধান কার্য্য, যদি এমন কোন ব্যক্তির প্রতি অপর কেহ আসিয়া অত্যাচার করে, তাহা হইলে, সে কি আপনার উৎপীড়ককে অত্যাচারী বলিয়া মনে করে না? সে কি মনে করে না যে, তাহার প্রতি উৎপীড়ন করাতে যার পর নাই অন্যায় করা হইতেছে? অত্যাচারীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিলে সে কি উহাকে অন্যায় বলিয়া মনে করে না? যে চুরি করিয়া থাকে, তাহার দ্রব্য চুরি করিলে সে কি উক্ত কার্য্য নিতান্ত অন্যায় বলিয়া মনে করে না? চোরকে চোর বলিয়া ঘৃণা করে না? ব্যভিচারীর গৃহ মধ্যে দুরভিসন্ধি প্রণোদিত হইয়া অপর পুরুষ প্রবেশ করিলে সে কি তাহাকে দুষ্কার্য্যকারী বলিয়া ঘৃণা করে না? এবং অত্যাচার নিবারণের জন্য প্রাণগত বিরক্তি ও আগ্রহের সহিত যত্ন করে না? এই সকল দৃষ্টান্তে প্রমাণ হইতেছে যে, যে ব্যক্তি নিজে অত্যাচারী, তাহার প্রতি অত্যাচার হইলে, যে নিজে চোর তাহার সামগ্রী চুরি করিলে, যে নিজে পরদারগামী, তাহার পরিবারের মধ্যে অন্য পুরুষ মন্দ অভিপ্রায়ে প্রবেশ করিলে, তাহাদের হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া ঐ সকল কার্য্যকে অন্যায় বলিয়া ব্যক্ত করে, এবং তখন তাহারা ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠাতাগণকে দোষী, অপরাধী বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে। অন্যের প্রতি অত্যাচার করিবার সময় স্বার্থান্ধ হইয়া যাহারা আপনার কার্য্যকে অন্যায় বলিয়া স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না, তাহাদের নিজের প্রতি অপরে অত্যাচার করিলে তখন তাহারা উহা একান্ত অন্যায় বলিয়া পরিষ্কাররূপে বুঝে এবং অত্যাচারকারীকে ঘৃণা করে। ইহাতে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহারা জনসমাজে আপনাদের দুষ্ক্রিয়ার জন্য নরাধম দুরাত্মা বলিয়া গণ্য হয়, তাহাদেরও হৃদয়ে স্বাভাবিক বিশ্বজনীন ধর্ম্ম-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয় না।

পরমেশ্বর মানবহৃদয়ে ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান,—নৈতিক বুদ্ধি,—নীতির একটী আদর্শ, চির-স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। উহা কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে। তিনি মনুষ্যকে নৈতিক জীব করিয়া, ধর্ম্মের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাসা করি যে, ইহা কি কখন সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে যে, পরমেশ্বর তাঁহার জীবকে এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, সে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার স্বরূপে দোষ দিতে পারে? পুত্রকে পিতা এমন করিয়া শিক্ষা দিতেছেন যে, যাহাতে পুত্র পিতার কার্য্যের সমালোচনা করিয়া তাঁহার নিন্দা করিতে পারে? ইহা কি সম্ভব? নিঃস্বার্থ হিতৈষণা মানবহৃদয়ের একটী মূল-ভাব। ইহা স্বাভাবিক, বিশ্বজনীন, কোন বাহ্য কারণে ইহার উৎপত্তি হয় নাই। নির্দ্দোষ যুক্তি

মার্গের অনুসরণ করিলে এই নিশ্চয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে "নোপকারাৎ পরো-ধর্ম্মঃ" ইহা মানবহৃদয়ে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাবাক্য।

কেহ কেহ বলেন যে, মনুষ্য যাহা কিছু করে, সকলই স্বার্থসিদ্ধির জন্য। নিঃস্বার্থ হিতৈষণা মানবপ্রকৃতিতে সম্ভব নহে। মানব প্রকৃতিতে স্বার্থানুসন্ধান ভিন্ন উচ্চতর কিছু নাই, —নিঃস্বার্থ পরোপকার অমূলক বাক্য মাত্র। এরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা মানব প্রকৃতির বিষয় কিছু বুঝেন না। মানবপ্রকৃতির প্রকৃত মহত্ত্ব বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অন্ধ। নিঃস্বার্থ-ভাব না থাকিলে মনুষ্যের কোন কার্য্যেরই মহত্ত্ব থাকে না। অন্যের হিতের জন্য যাহা করিতেছি, তাহাই যদি স্বার্থমূলক হয়, তাহা হইলে পরহিতব্রতের মহত্ত্ব কোথায় থাকে? আপনার জন্য যাহা করিতেছি, এবং পরের জন্য যাহা করিতেছি, উভয়েরই উদ্দেশ্য যদি আত্মসুখ, স্বার্থসিদ্ধি, তাহা হইলে এই উভয় প্রকার কার্য্যই এক শ্রেণীভুক্ত হইয়া গেল। পরহিতব্রতের বিশেষ মহত্ত্ব কিছুই থাকিল না। কেননা, অভিসন্ধির মহত্ত্ব অনুসারে কার্য্যের মহত্ত্ব হয়। যখন উভয় প্রকার কার্য্যের একই অভিসন্ধি, তখন নিজের জন্য যাহা করি, এবং পরের জন্য যাহা করি, উভয়েরই মূল্য সমান। একই অভিসন্ধি হইতে উভয় প্রকার কার্য্য নিঃসৃত হইতেছে। পোলাও খাওয়া, দাবা খেলা, থিয়েটরে যাওয়া ইত্যাদি কার্য্যের সহিত, পরহিতব্রতে জীবন বিসর্জ্জনের প্রভেদ কোথায়? যদি এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত হয় যে, স্বার্থবুদ্ধি হইতেই সকল কার্য্যের উৎপত্তি,—নিঃস্বার্থ ধর্ম্মবুদ্ধি যদি একটা কথার কথা মাত্র হয়, তাহা হইলে কোন কার্য্যের নৈতিকত্ব থাকেনা। কোন কার্য্যকে বিশেষভাবে নৈতিক কার্য্য বলা যায় না। কার্য্যের মধ্যে উচ্চ নীচ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, এরূপ পার্থক্য বিনাশ হইয়া যায়। কেননা, সকল কার্য্যেরই অভিসন্ধি এক স্বার্থসিদ্ধি।

স্বার্থমূলক নীতি-তত্ত্ব যে একান্তই ভ্রান্তি-মূলক, তাহা মানবপ্রকৃতির সূক্ষ্মরূপ আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। মনুষ্য যতই উন্নতিপথে অগ্রসর হয়, ততই সে স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থে, আত্মসুখ ভুলিয়া অন্যের সুখ সাধনে জীবন সমর্পণ করিতে থাকে। আমি সুখী হইব, এই ভাব, এই বাসনা, ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। অন্যকে সুখী করিব, এই ভাব, এই বাসনা, ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। মনুষ্যের মধ্যে কে প্রকৃত মহৎ? কাহাকে মহাত্মা বলিব? আত্মসুখচিন্তা যাঁহার হৃদয়কে পরিহার করিয়াছে, জগতের লোক কিসে সুখী হইবে, এই চিন্তাই যাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া আছে। *

আর এক শ্রেণীর দার্শনিক, স্বার্থমূলক নীতিতত্ত্ব অস্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও অনেকে মানবহৃদয়নিহিত স্বাভাবিক, বিশ্বজনীন নৈতিক বোধের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতকে হিতবাদ বলে। তাঁহারা বলেন, যে কার্য্যে জগতের অধিকাংশ লোকের হিত হইয়া থাকে, অথবা হইবার সম্ভাবনা, তাহাই নৈতিক কার্য্য, তাহাই ধর্ম্ম এবং যে কার্য্য, তাঁহার বিপরীত হয়, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহাই নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য,—তাহাই অধর্ম্ম। হিতবাদী-দিগের মত স্বীকার করিলেও নীতির মৌলিক

* বিস্তৃতরূপে এবিষয়ের আলোচনা এস্থলে সম্ভব নহে। যতটুকু সম্ভব, সংক্ষেপে বলা হইল। যাঁহারা এবিষয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিতে ইচ্ছা করেন, নীতি-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সকল তাঁহাদের পাঠ করা আবশ্যক।

ভাবের অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয় না। হিতবাদী বলেন,যে কার্য্যে জগতের অধিকাংশ লোকের মঙ্গল হয়, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহাই করা উচিত। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই,যাহাতে অধিকাংশের উপকার, তাহা করা উচিত কেন? তাহা করিতে আমরা বাধ্য কেন? নীতি সম্বন্ধীয় স্বাভাবিক, বিশ্বজনীন, স্বতঃসিদ্ধ, মৌলিক ভাব স্বীকার করা ভিন্ন,এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর নাই, কোন মীমাংসা নাই। বিশেষতঃ যখন মনুষ্যকে আত্মস্বার্থ-বিসর্জ্জন দিয়া জগতের হিতসাধন করিতে হইবে,তখন সে আত্মসুখ পরিহার করিতে বাধ্য কেন? ইহার উত্তরে হিতবাদী বলিতে পারেন যে, জনসমাজের সাধারণ মঙ্গলে তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল; সুতরাং আত্মমঙ্গলের জন্য জগতের অধিকাংশ লোক হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। এরূপ বলিলে হিতবাদ আর কোথায় থাকিল? সেই স্বার্থমূলক নীতিতত্ত্বই আসিয়া পড়িল। হিতবাদ সমর্থন করিতে গিয়া স্বার্থমূলক নীতিতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, বাস্তবিক হিতবাদকে বিনাশ করা হয়। হিতোপদেশের গল্পের বিড়াল রূপী মুষিকের পুনর্ব্বার মুষিকত্ব প্রাপ্তির ন্যায় হিতবাদ স্বার্থবাদে পরিণত হয়। জগতের অধিকাংশের মঙ্গলে প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল, এই কথা বলিয়া স্বার্থ বিসর্জ্জন উপদেশ দিলে, সকল সময়ে,সকল অবস্থায়, সকল ব্যক্তি কি সন্তুষ্ট হইতে পারে? যদি কেহ দেখে যে, যাহাতে অধিকাংশের মঙ্গল তাহাতে তাহার নিজের সর্ব্বনাশ; হয় ত তাহার ও তাহার প্রিয় পরিজনের চির দরিদ্রতা। হয় ত তাহাকে সপরিবারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। বিশেষ বিশেষ জাতীয় সংকট কালে কি এরূপ ঘটে না? যাহাতে অধিকাংশের মঙ্গল, তাহাতে আপনার সর্ব্বনাশ, এরূপ হইলে সে ব্যক্তি তাহা করিতে বাধ্য কেন? স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, ধর্ম্মবুদ্ধি, নৈতিক বাধ্যতাবোধ স্বীকার না করিলে, এই সমস্যার মীমাংসা হয় না। নৈতিক বাধ্যতাবোধ স্বীকার না করিলে, কোন কার্য্যকেই নৈতিক কার্য্য, ধর্ম্মকার্য্য বলা সঙ্গত হয় না।*

বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি যখন মৌলিকভাব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে,তখন সহজেই এই প্রশ্ন আসে যে,ইহা কোথা হইতে আসিল? পরমেশ্বর স্বয়ং ইহাকে মানব হৃদয়ে চির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,ইহা ভিন্ন আর অন্য উত্তর নাই।

এখন দেখ, যে ঈশ্বর তোমাকে নিঃস্বার্থ হিতৈষণা দিয়াছেন, তুমি তাঁহাকেই দয়া-শূন্য বলিতেছ! তাঁহার নিকট হইতে দয়া পাইয়া তাঁহাকেই নির্দ্দয় বলিতেছ! তিনি দয়া না দিলে জগতের দুঃখ দেখিয়া কি তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করিতে পারিতে? যাঁহার নিকট জ্ঞান পাইলে তাঁহাকেই মূর্খ বল? যে তুলাদণ্ডদ্বারা পরিমাণ করিতেছ, কে উহা তোমার হস্তে তুলিয়া দিল? যে নীতির আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জগৎ কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিতে বসিয়াছ,উহা তোমার হৃদয়ে কে অঙ্কিত করিয়া দিল?

পরমেশ্বরের দয়ার একটী জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ এই যে, আমাদের জীবন রক্ষার জন্য যাহা কিছু একান্ত প্রয়োজনীয়, তিনি তদপেক্ষা অনেক অধিক আনন্দ জীবকে দান

* হিতবাদ দর্শনের বিস্তৃত-সমালোচনা এস্থলে অসম্ভব, যতদূর সম্ভব তাহা সংক্ষেপে বলা হইল। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নীতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল পাঠ করিবেন। ইংরাজিভাষানভিজ্ঞ পাঠক প্রথমভাগ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার ৯১—১০৭ পৃঃ দেখিবেন।

করিতেছেন। জীবন রক্ষার জন্য যাহা নিতান্ত আবশ্যক, কেবল তাহা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। শুদ্ধ জীবকে সুখী করিবার জন্য কত শত প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কে তাহার গণনা করিবে! সুমন্দ, সুস্নিগ্ধ মলয়ানিল; সুন্দর কোমল কুসুম রাজি; প্রাণমনমুগ্ধকরী শারদ পৌর্ণমাসী; হৃদয়রঞ্জন মৃতসঞ্জীবনী সঙ্গীত, এই সকল স্বর্গীয় সুখের ভাণ্ডার, নিরুপম আনন্দের উৎস সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন ছিল? প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যে কত সুখের উৎস, কে তাহার পরিমাণ করিবে! কত সুদৃশ্য, কত সুশ্রাব্য, কত সুগন্ধ, কত সুস্বাদ সুখাদ্যে সংসার পূর্ণ! জীবের রসনার তৃপ্তির জন্য তিনি যে কত প্রকার ফল মূলে সংসার কানন পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার সীমা কোথায়!

জগতে কেবল দুঃখ নিবৃত্তির উপায় রহিয়াছে, এমন নহে। তিনি অগণ্য উপায়ে জীবের দেহ মনে সুখরাশি ঢালিয়া দিতেছেন। এমন কত সুখের বিধান করিয়াছেন, যাহা না থাকিলে আমাদের জীবন রক্ষার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। কেবলমাত্র জীবকে সুখী করিবার জন্য জলস্থল শূন্যে শত সহস্র প্রকার সুখভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। সুমধুর আত্মীয়তা, বন্ধুতা ও বিবিধ আকারে মাধুর্য্য রসের সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি উদাসীন বা নিষ্ঠুর বলিয়াই কি এইরূপ করিলেন? তত্ত্বজিজ্ঞাসু আত্মার সম্মুখে অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন কেন? উদাসীন বা নিষ্ঠুর বলিয়াই কি এইরূপ করিলেন?

সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, দুঃখ নিয়মের ব্যভিচার,—নিয়ম লঙ্ঘনের ফল, কিন্তু সুখ নিয়ম। এই যে আমাদের মস্তক, উত্তমাঙ্গ, ইহার সৃষ্টি কি বেদনা ভোগ করিবার জন্য? শিরঃপীড়ার জন্যই কি শিরোদেশ সৃষ্টি হইয়াছে? চক্ষুরোগ ভোগ করিবার জন্যই কি চক্ষুর সৃষ্টি? কর্কশ শব্দ শ্রবণ করিয়া বিরক্ত হইবার জন্যই কি কর্ণের সৃষ্টি? বিস্বাদদ্রব্য গ্রহণ করিয়া অসুখী হইবার জন্যই কি রসনার সৃষ্টি? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করিতে গিয়া জীব সময়ে সময়ে নানা কারণে ক্লেশ পায় সত্য, কিন্তু ক্লেশ দিবার জন্যই কি সৃষ্টিকর্ত্তা জীবকে ইন্দ্রিয় নিচয়ে ভূষিত করিয়াছেন? আমাদিগের সুখের জন্যই যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, উহার একটীর অভাব হইলে যে দুঃখের অবধি থাকে না, ইহা কে না জানে? শোভা, সুস্বর, সুরস, সুগন্ধ ও সুস্পর্শ্য পদার্থে জগৎ পরিপূর্ণ! তিনি আমাদের প্রতি উদাসীন বা নিষ্ঠুর বলিয়াই কি এইরূপ করিলেন?

জগতে অনেক দুঃখ আছে সত্য, কিন্তু আমাদের প্রকৃতির মধ্যে এমন ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, দুঃখ চিরদিন কখন সমান থাকে না। প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়। যে দরিদ্রতা অদ্য অসহ্য বোধ হইতেছে, ক্রমে তাহাই সহজ হইয়া আসে। যে পুত্রশোক এত ভয়ঙ্কর, এত তীব্র যে, মনে হয় জীবন রক্ষা পাইবে না, তাহাও সময়ে নির্ব্বাণ প্রায় বা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। কোন দুঃখ কখন সমভাবে স্থায়ী হয় না। পরমেশ্বর যদি উদাসীন বা নিষ্ঠুর হইবেন, তবে এমন ব্যবস্থা করিলেন কেন?

যদি বাস্তবিক দুঃখ অত্যন্ত অধিক হয়, যদি যথার্থই উহা সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে, তখন তাহার জন্য মঙ্গলময় কি বিধান করিয়াছেন? তিনি তখন সকল দুঃখের অবসান করিয়া দেন। তাঁহার কৃপাহস্ত প্রসারণ করিয়া মৃত্যুরূপ মঙ্গলময়দ্বার দিয়া তাঁহার অদৃশ্য নিকেতনে তাঁহার সন্তানকে লইয়া যান। যে জীব অসহ্য রোগযন্ত্রণায়

অস্থির হইয়াছে, যে অগ্নিরাশির মধ্যে পতিত হইয়া দগ্ধ হইতেছে, অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; যে জলমগ্ন হইয়া শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় অবর্ণনীয় যাতনা ভোগ করিতেছে, সে যদি চিরদিনই ঐরূপ যাতনা ভোগ করিত, তাহার যন্ত্রণার যদি পরিণাম না থাকিত, তাহা হইলে সে যে কি ভয়ঙ্কর হইত, তাহা চিন্তা করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়!

মঙ্গলময়ের রাজ্যে এমন কেন হইবে? জীব যখন দুঃখে অবসন্ন হয়, যখন তাহার সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত হয়,যখন তাহার বাসগৃহস্বরূপ দেহ ভগ্ন হইয়া যায়, তখন জগতের পিতামাতা বলেন;—"এস, সন্তান! আর তোমাকে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। তোমার যন্ত্রণাময় দেহ হইতে আমি তোমাকে নিষ্কাসিত করিয়া লইতেছি। আমার অনন্ত ভবনে অনেক ঘর আছে। তোমার বাসস্থান পরিবর্ত্তিত হইল, তুমি এই পারলৌকিক গৃহে আসিয়া বাস কর।" মৃত্যু জীবের পরম বন্ধু। মৃত্যু তাহার সকল দুঃখের অবসান করিয়া দেয়! দুঃখী রুগ্ন ও বিপন্ন জীবের পক্ষে মৃত্যুর বিধান শতকণ্ঠে পরমেশ্বরের কৃপা কীর্ত্তন করিতেছে।

জগতে দুঃখ দেখিয়া যাঁহারা পরমেশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে সংশয় প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকেএকটী কথা বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করি যে, দুঃখ দেওয়াই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হইত,তাহা হইলে দুঃখকে জয় করিয়া তাহার উপর উঠিবার শক্তি আমাদিগকে তিনি কেন দিলেন? যথার্থই মনুষ্যের মধ্যে এমন এক স্বর্গীয় শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। উপযুক্ত উপায়ে তাহার বিকাশসাধন করিলে মনুষ্য পার্থিব সুখ দুঃখকে অতিক্রম করিয়া অচ্যুত পদ লাভ করিতে পারে। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট প্রভৃতি জগতের শত শত মহাত্মা পার্থিব সুখ দুঃখকে পদাঘাত করিয়া তাহার অতীত চিরশান্তিময় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। উহাই আমাদের লক্ষ্য,উহাই আমাদের চরম ও পরমগতি। পার্থিব ঝঞ্ঝাঝটিকার অতীত এই শান্তি নিকেতনের কথা ভগবদ্গীতা কীর্ত্তন করিতেছেন। পার্থিব সুখ দুঃখের অতীত হওয়াই সিদ্ধাবস্থা। প্রত্যেক সাধকের গতি সেই দিকে। ইহাই গীতার প্রধান শিক্ষা। সুখ বা দুঃখ কোন দিকে দৃষ্টি রাখিও না। জীবনের কর্ত্তব্য সংসাধন কর, নির্ব্বাণ পদলাভ করিবে; ভারতের শিরোভূষণ, জগতের গৌরব বুদ্ধদেবের ইহাই উপদেশ।

এই সত্যটী আপনার শিষ্যদিগের হৃদয়ে চিরমুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য তিনি কেমন গল্পচ্ছলে উপদেশ দিতেছেন;—এক ব্রাহ্মণ আপনার গৃহদ্বারে বসিয়া আছেন; তিনি দেখিলেন যে দূরে কে আসিতেছে। নিকটে আসিলে দেখিলেন, এক সালঙ্কারা পরমাসুন্দরী রমণী। ব্রাহ্মণ সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন,বৎস! তুমি কে? রমণী বলিলেন, আমি যে হই, আমি তোমার গৃহে বাস করিব। ব্রাহ্মণ আনন্দে তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। সুন্দরী নারী তাঁহার পরিবারের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমনে তাঁহার গৃহ আনন্দময়, উৎসবভবন হইল। দুই এক দিন পরে ব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহদ্বারে বসিয়া আছেন, আবার দেখেন কে আসিতেছে। ভাবিলেন, আবার কে আসে। নিকটে আসিলে দেখিলেন, রাক্ষসীর ন্যায় ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, রাক্ষসীর ন্যায় বিকট সুদীর্ঘ দন্তশ্রেণী, রাক্ষসীর ন্যায় সকল শরীরে রুধিরধারা বহিতেছে। ব্রাহ্মণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি ভয়বিহ্বল হইয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? উপস্থিতা নারী উত্তর করিল, আমি যে হই, আমি তোমার বাটীতে বাস করিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন, তাহা কখনই হইবে না; আমি তোমাকে আমার গৃহে স্থান দিতে পারিব না। নারী বলিলেন, দিতেই হইবে, তুমি যখন আমার ভগিনীকে স্থান দিয়াছ, তখন আমাকেও দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ বড় বিপদে পড়িলেন। অন্তঃপুর হইতে সেই সুন্দরী নারীকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! একি তোমার ভগিনী? ও আমার গৃহে থাকিতে চায়। আমি উহাকে কখনই আমার গৃহে স্থান দিতে পারিব না।" সুন্দরী নারী বলিলেন, "ব্রাহ্মণ! যখন আপনি আমাকে আপনার গৃহে স্থান দিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই উহাকেও স্থান দিতে হইবে; ও আমার ভগিনী। আমি যেখানে যাই, ও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়। ও ইহ সংসারে ক্রমাগত চিরদিন আমার অনুসরণ করিতেছে। যে আমাকে গৃহে স্থান দিবে, সে যেন নিশ্চয় জানে যে ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। উহাকে তাড়াইবার কোন উপায় নাই।" তখন ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, বৎস! বল দেখি তুমি কে এবং ঐ বা কে। সুন্দরী নারী বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আমার নাম সুখ এবং উহার নাম দুঃখ। যে সুখকে সমাদরে গৃহে স্থান দিবে, তাহার নিশ্চয় জানা উচিত যে, দুঃখ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে।"

সাধক বলেন, সুখ চাই না, দুঃখও চাই না; পার্থিব সুখ দুঃখের তরঙ্গ যাহা স্পর্শ করিতে পারে না, সেই শান্তিনিকেতন, সেই অচ্যুত পদ চাই। সুখ দুঃখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সাধক সেই দিকে দৌড়িতেছেন। সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, রোগ সুস্থতা, হর্ষ বিষাদ, হাস্য ক্রন্দন, আশা নৈরাশ্য, এই সকলের অতীত স্থানে উপনীত হইবার জন্য তিনি ধাবমান্। জগতের ভক্ত সাধকগণ বৈরাগ্য ও ভক্তিপথে যিনি যে পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে সাংসারিক সুখ দুঃখকে পরাস্ত করিয়াছেন। পরমেশ্বর এমন শক্তি আমাদিগকে কেন দিলেন? যিনি নিষ্ঠুর, যিনি উদাসীন, তিনি কেন আমাদিগকে এমন ক্ষমতা দিলেন, যাহার উপযুক্ত পরিচালনা দ্বারা আমরা সুখ দুঃখের অতীত হইয়া চির শান্তিলাভ করিতে পারি?

বাস্তবিক তিনি আমাদের সুখও চান না, দুঃখও চান না। মনুষ্যকে বহু সুখে সুখী করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহার মঙ্গল বিধানে, সুখ বা দুঃখ ইহার মধ্যে কিছুই জীবনের লক্ষ্য নহে। তিনি আমাদের জন্য সুখও চান না—দুঃখও চান না, ধর্ম্ম চান।

"Not enjoyment and not sorrow
Is our destined end or way
But to act that each to-morrow
May find us further than to-day."

এ সংসার যুদ্ধক্ষেত্র। তিনি এই যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন যে, আমরা সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিয়া সবল হই, পরম পুরুষার্থ লাভ করি। আমরা প্রত্যেকে সংসার কুরুক্ষেত্রে পরমেশ্বরের প্রেরিত সৈনিক পুরুষ। যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর, ক্রমাগত যুদ্ধ কর। সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, পাপ প্রলোভনকে পরাস্ত করিয়া ভগবানের জয়পতাকা হস্তে তাহার উপর দণ্ডায়মান হও। ইহাতেই মানবাত্মার চরম ও পরম গৌরব। পরমেশ্বর স্পার্টান মাতার ন্যায় দেখিতে চান্ যে, তাঁহার সন্তানগণ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়া

শোণিত প্রবাহের মধ্যে শক্ত বিজয় সম্পন্ন করে। আমরা ভীরু কাপুরুষ হইয়া আত্মসুখে বিমুগ্ধ থাকি, পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া আলস্যে দিনপাত করি, ইহা তিনি চান না। যুদ্ধজয়ী ক্ষত বিক্ষত সন্তানকে পুরস্কারস্বরূপ পরমার্থ ধন দিবেন বলিয়া জগন্মাতা প্রতীক্ষা করিতেছেন। বীরের ন্যায় যুদ্ধ কর, কাপুরুষ হইয়া আপনার চিরগৌরবে বঞ্চিত হইও না; এই স্বর্গীয় বাণী প্রত্যেক সাধকের হৃদয়ে উত্থিত হইতেছে।

In ths world's broad field of battle
In the bivouac of life;
Be not a dumb driven cattle,
Be a hero in the strife.

সাংসারিক সুখ দুঃখের ঝঞ্ঝা ঝটিকার মধ্যে আমাদের প্রকৃত শিক্ষা ও কল্যাণ। আমরা সবল হই, পবিত্র হই, প্রকৃত ধর্ম্ম উপার্জ্জন করি, ইহাই জগদ্‌গুরু জগদীশ্বরের অভিপ্রায়। জীবের জন্য তিনি ধর্ম্ম চান। তাহাতেই তাহার অনন্ত শান্তি। কঠোর সাধনপরায়ণ সাধুর হৃদয়ে যখন তিনি মঙ্গলময়রূপে প্রকাশিত হন, তখন সাধক তাঁহাকে দর্শন করিয়া চিরতৃপ্তিলাভ করেন। যে জন্য জন্ম, জীবন ও মৃত্যু তাহা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

সংশয়বাদী পরমেশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকেন, তাহার অসারতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তসৃষ্টিলীলা সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপার আমরা বুঝিতে না পারিলেও এই পরিষ্কার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, বিশ্বকারণ মঙ্গলাভিপ্রায়েই সকল কার্য্য করিতেছেন,—সুখ দুঃখ, জীবন মৃত্যু, পাপ পুণ্যের মধ্য দিয়া জগৎকে অসীম কল্যাণের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। বিজ্ঞান, দর্শন ও সহজ জ্ঞান আমাদিগকে নিশ্চিতরূপে এই সত্য শিক্ষা দিতেছেন। কুতর্কজালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সদ্বিচার, এই স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতেছে।

কিন্তু তর্কের অতীত উচ্চতর স্থান আছে, সাধন ভজনের পথ দিয়া সে স্থানে উপনীত হইলে আনন্দময়, শান্তি-নিকেতন, করুণাসাগর, প্রেমময় পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ হন। তিনি ভক্ত-হৃদয়ে 'সত্যং শিবং সুন্দরং' রূপে 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' রূপে প্রকাশিত হন। তর্কতরঙ্গের অতীত, পার্থিব হর্ষ বিষাদ, পাপ পুণ্যের অতীত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তজন চির শান্তি সম্ভোগ করেন। সেই আমাদের গম্য স্থান। প্রত্যেক সন্তানকে সেই গম্য স্থানে, সেই শান্তি-নিকেতনে লইয়া গিয়া তিনি কৃতার্থ করিবেন। তাঁহার দয়ার, তাঁহার প্রেমের সীমা কোথায়?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পুরাণ-তত্ত্ব।

ভূমিকা।

প্রাচীন আখ্যায়িকা সকলের নাম ইতিহাস। তাহা সৃষ্টি-ক্রিয়াদি-বিবরণ-সমন্বিত হইলে পুরাণ নাম প্রাপ্ত হয়। "ইতিহাসং পুরাতনং" বলিয়া প্রাচীন রাজা ও ঋষিরা যে সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেন, তাহা উত্তর কালে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী লক্ষণযুক্ত হইয়া এবং লোক পরম্পরায় ক্রমশঃ বিস্তারিত হইয়া একএকটী পুরাণ শাস্ত্র নামে পরিগণিত হইয়াছে।

পুরাণ শাস্ত্র ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত। কারণ তাহা ভারতবাসীর ভাল লাগে। কেবল

ভারতে কেন, সকল দেশেই তদ্দেশীয় পুরাণের সমাদর হইয়া থাকে।

য়িহুদীদিগের পুরাণ-কথার পর যীশু খ্রীষ্ট কতকগুলি নীতি উপদেশ দিয়া লোককে ধর্ম্মপথ দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাও উত্তর কালে পুরাণ বার্ত্তার মত প্রচলিত হইল, এবং তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যদিগের ক্রিয়া তদ্রূপ পুরাণ প্রসঙ্গেরই বৃদ্ধি করিয়া দিল। মুসলমানদিগের পক্ষে কোরাণ ঈশ্বরাদিষ্ট গ্রন্থ এবং সর্ব্বোপরি মাননীয়। কিন্তু ঈশ্বরানুগৃহীত ভক্তদিগের ইতিহাস বৃত্তান্ত তাহাদের অতিশয় ভাল লাগে। বুদ্ধদেব কতকগুলি উপদেশ ভিন্ন আর কিছু দিয়া যান নাই; কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকেরা লোকাতীত বহু বুদ্ধ কল্পনা করিয়া এবং অপরাপর দেবতার সহিত মিলাইয়া বিস্তর পুরাণ-কাহিনী রচনা করিলেন।

আমাদের ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাস বেদের কাল হইতে ধারাবাহিক রূপে চলিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত উহার চারি অবস্থা বিবেচিত হয়। ক্রমে ক্রমে তাহা বিবৃত হইতেছে।

বেদের প্রথম সময়েই পুরাণ ব্যক্ত হয়। ঋগ্বেদান্তর্গত স্ত্রীগণ প্রণীত ঋক্ মন্ত্র ও একটু একটু ইতিহাস কথা তাহার নিদর্শন। ঋক্ মন্ত্র হইতে ইন্দ্র,বরুণ,বসিষ্ঠ,বিশ্বামিত্র অদিতি ও লোপামুদ্রা প্রভৃতির প্রসঙ্গ লইয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পৌরাণিকী নানা কাহিনী রচিত হইয়াছে।

উত্তর কালে যখন বেদ-মন্ত্র অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল, তখন এমন কতকগুলি কথা বা কাহিনী পরস্পর আলাপের মধ্যে আইসে, যাহা বেদ মন্ত্রের মধ্যে গ্রহণ করা যায় না। তাহাই পুরাণ নামে পৃথক্কৃত হয়। উহার প্রাথমিক অবস্থা জানিবার উপায় নাই। পুরাণের এই অজ্ঞাত অবস্থাকে উহার আদিম অবস্থা ধরাযায়।

যখন অথর্ব্ব বেদের প্রকাশ হইয়াছে এবং উহা "ত্রয়ী" বেদের সহিত সংযুক্ত হইয়া বেদের চারি সংখ্যা পূরণ করিয়াছে, সেই চতুর্ব্বেদের সহিত পুরাণ ও ইতিহাসের নাম অন্বিত দেখা যায়।

ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস
ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ
সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি।
শতপথব্রাহ্মণ ১৪।৬।১০।৬

বেদ-ব্যাখ্যাতারা বলেন,দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতির নাম ইতিহাস; সৃষ্টি বিবরণের নাম পুরাণ। উপরের উদ্ধৃত বাক্যে আরো বিদ্যা, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান, এই কয়েকটী নাম পাওয়া যায়। সে গুলি ইতিহাস ও পুরাণের ন্যায় প্রাধান্য প্রাপ্ত হয় নাই। শতপথব্রাহ্মণের স্থানান্তরে(১৪।৫।৪।১০) উক্ত শাস্ত্রগুলির নামে ব্যক্ত হইয়াছে—

অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ—
ইত্যাদি—অস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি। *

এই পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, সূত্র, ব্যাখ্যান—এ সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহাতে উৎপত্তি বিষয়েও ইতিহাস ও পুরাণকে বেদের সমান বলা হইয়াছে। ছান্দেগ্য উপনিষদে ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং
চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং। ছান্দোগ্য, ৭প্র।

ভগবন্ আমি ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ, আথর্ব্বণ নামক চতুর্থ বেদ এবং পঞ্চম বেদস্বরূপ ইতিহাসপুরাণ জ্ঞাত আছি।

ইহাতে জানা যায় যে, যখন চতুর্থ বেদ

* বৃহদারণ্যকেও এই কথা—২।৪।১০

স্বীকার করা হয়, তখন ইতিহাস-পুরাণকেও পঞ্চম বেদ বলিয়া গণ্য করা হয়। এতদ্দ্বারা বোধ হয় যে, এই ইতিহাস-পুরাণকেও এ সময়ে বেদের ন্যায় পদ্ধতি মতে শিখিতে হইত।

শতপথ ও গোপথ ব্রাহ্মণে, সাংখ্যায়ন ও আশ্বলায়ন সূত্রে "পুরাণ বেদ" নামে পুরাণ-বিশেষের উল্লেখ আছে। তাহা যজ্ঞের দিবস পাঠ করিতে হইত। শতপথ, ১৩। ৪। ৩। ১৩

মনুসংহিতায় ব্যবস্থা আছে—

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ॥
৩ অধ্যায় ২৩২ শ্লোক।

শ্রাদ্ধ ক্রিয়াতে পিতৃগণকে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ ও খিল শাস্ত্র শ্রবণ করাইবে।

ইহাতে ইতিহাস ও পুরাণের তুল্য আখ্যান ও খিল নামক শাস্ত্রের নাম পাওয়া যায়। সকলই বহুবচনান্ত পদ।* তাহাতে বোধ হয়, তখন স্মৃত্যাদির † ন্যায় ইতিহাস, পুরাণ, আখ্যান ও খিল প্রত্যেকে সংখ্যায় অনেক ছিল। অতএব মনুসংহিতার সময়ে পুরাণ ও ইতিহাসের অনেক খানি বিস্তার হইয়াছিল বলিতে হইবে।

পুরাণের এই দ্বিতীয় অবস্থা।

উপরোক্ত প্রকারে পুরাণ ও ইতিহাসের সংখ্যা পৃথকরূপে বৃদ্ধি পাইতেছিল। মহাভারতের সময় পর্য্যন্ত ইতিহাস ও পুরাণের এইরূপ পৃথক্ ভাব থাকে। এইজন্য রামায়ণ ও মহাভারত পুরাণ নাম প্রাপ্ত না হইয়া ইতিহাস নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহাভারতে পুরাণ লক্ষণ কিছু কিছু আছে। রামায়ণ কেবল ইতিহাস-লক্ষণান্বিত। অতঃপর ইতিহাস ও পুরাণ একীকৃত হইয়া যায়। বেদব্যাস এক পুরাণ সংহিতা রচনা করেন। তাহাতে তৎকাল-প্রচলিত আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি, সকলেরই একত্র সমাবেশ হয়।

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬।১৬

পুরাণার্থ বিষয়ে পণ্ডিত (বেদব্যাস) আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্প শুদ্ধি * লইয়া পুরাণ সংহিতা রচনা করিলেন।

ব্যাসের শিষ্য পরম্পরায় এই সংহিতানুযায়ী বহু পুরাণ রচিত হইয়াছিল। ব্যাস মূল সংহিতা রচনা করিয়া, লোমহর্ষণকে এবং তিনি তাহা সুমতি, অগ্নিবর্চ্চাঃ, মিত্রায়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি, এই ছয় শিষ্যকে প্রদান করেন। তদনুসারে কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন এক এক খানি পুরাণ রচনা করেন। ইঁহাদিগকে "সংহিতা কর্ত্তা" বলা হইয়াছে। ব্যাসের প্রথম শিষ্য লোমহর্ষণ লোমহর্ষণিকা নামে আর একখানি সংহিতা প্রস্তুত করেন। বোধ হয়, এই সকল সংহিতা অন্যান্য পুরাণের মূল। অতএব ইহাদিগকে মূল পুরাণ বা পুরাণ সংহিতা রূপে গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সময়কার না মূল, না শাখা, কোন পুরাণই এক্ষণে বিদ্যমান নাই।

* তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (২।৯) "ইতিহাসান্ পুরাণানি" এই বহু বচনান্ত পদ আছে।

† স্মৃতিকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলা হয়। শ্রৌত, গৃহ্য ও সাময়াচারিক সূত্র হইতে স্মৃতি শাস্ত্র রচিত হইয়াছে।

* দৃষ্টি পূর্ব্বক যে বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহার নাম আখ্যান; পরম্পরা শ্রুত কথার নাম উপাখ্যান; পিতৃবিষয়ক ও পৃথ্বী বিষয়ক গীত এবং তাদৃশ অন্যান্য গীতের নাম গাথা; শ্রাদ্ধ কল্পাদি নির্ণয়ের নাম কল্প শুদ্ধি।

উপরোক্ত-সংহিতাকারেরা সূত জাতীয়। সূতেরা প্রথমে রাজাদিগের যুদ্ধে সারথ্যাদি কর্ম্ম করিতেন। তাঁহারা প্রাচীন রাজ বংশের এবং মহৎ ঘটনা সকলের সুশ্রাব্য অপূর্ব্ব কাহিনী অভ্যাস করিয়া রাখিতেন। রাজা দশরথ ও রামচন্দ্র পুরাণবিৎ সারথি সুমন্ত্রের নিকট ঐরূপ পুরাণ কথা শ্রবণ করিতেন, এমন নিদর্শন আছে। পরে ব্যাসের কৃপায় তাঁহার প্রিয় সূতশিষ্যেরা প্রসিদ্ধ পুরাণবক্তা হইয়া উঠেন। পুরাণ কথন সূতদিগের এক প্রকার জাতীয় ব্যবসায় হইয়াছিল। তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া এবং কোথাও বা সমাদরে আহূত হইয়া পুরাণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সূতদিগের দ্বারা অসংখ্য পুরাণ কাহিনী বহুকাল হইতে একত্রে সমাহৃত হইয়া শেষে মহাভারতরূপে পরিণত হইয়াছে। মহাভারতের বক্তা উগ্রশ্রবা। তিনি ব্যাসের রচিত ভারত শ্রবণ করিয়া তাঁহা নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষির সমীপে ব্যক্ত করেন।

এই সময়কার প্রচলিত পুরাণের যে পঞ্চ লক্ষণ ছিল, অমরসিংহ তাঁহার প্রসিদ্ধ কোষ-গ্রন্থে পুরাণের সেই পঞ্চ লক্ষণ ধরিয়া গিয়াছেন। টীকা সম্মত সেই পঞ্চলক্ষণ এই—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণং॥

মহাভূত সৃষ্টি, সমগ্র চরাচরের সৃষ্টি, বংশ বিবরণ, মন্বন্তর বর্ণন, প্রধান প্রধান বংশ-ক্রমাগত ব্যক্তিদিগের চরিত্র কথন,— পুরাণের এই পাঁচ লক্ষণ।

এই পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত পুরাণ সকল আর দৃষ্টিগোচর হয় না। কি প্রকারে এতগুলি পরমোপাদেয় সর্ব্বজন-মান্য শাস্ত্রের বিলোপ হইল, তাহা বলা দুষ্কর। অনুমান হয়, তন্ত্রাবং পুরাণের সার ভাগ সুবৃহৎ মহাভারত মধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়াতে লোকের ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের প্রতি দৃষ্টি রহিল না। সুতরাং শ্রোতৃ বিরহে সে সকল শাস্ত্র লয়প্রাপ্ত হইল।

ইহাই পুরাণের তৃতীয় অবস্থা।

চতুর্থ অবস্থায় পুরাণ সকল ঈশ্বরারাধনাত্মক অলৌকিক বিষয়ের বর্ণনায় বিভূষিত হইতে লাগিল। তখনকার প্রধান অবলম্বনীয় শাস্ত্র মহাভারত। শাস্ত্র কর্ত্তারা মহাভারতের মধ্যেই নানা অলৌকিক দেবতত্ত্ব সন্নিবেশিত করিলেন। কিছু দিন ধরিয়া এই প্রকার উপাদানে তাহা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল।

অধুনাতন কালের পুরাণ কর্ত্তারা দেখিলেন, রাজগণের বংশানুকীর্ত্তন, ঋষিদিগের চরিত্র বর্ণন, সাধু চরিত্র,মহৎ লোকদিগের গুণ ও ক্রিয়া বিবরণ, এ সমস্তই এক মহাভারত রূপ মহাভাণ্ডারে রহিয়াছে। তদতিরিক্ত, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিবদুর্গাদি দেবতাগণেরও প্রসঙ্গ তাহাতে আছে। তাঁহারা সেই প্রাচীন ইতিহাসের কতকগুলি কথা-প্রসঙ্গে এবং বিশেষ পক্ষে পরমার্থ সাধনের উপযোগী দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় তাঁহাদের গ্রন্থকে পরিপূরিত করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত পুরাণের পঞ্চ লক্ষণকে উপপুরাণের অর্থাৎ নিকৃষ্ট পুরাণের লক্ষণ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন এবং আপনাদের রচিত পুরাণকে মহাপুরাণ আখ্যা প্রদান করিলেন। মহাপুরাণের এই দশ লক্ষণ অবধারিত হইল :—

সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তেষাঞ্চ পালনং।
কর্ম্মণাং বাসনা বার্ত্তা মনূনাঞ্চ ক্রমেণ চ॥
বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্য চ নিরূপণং।
উৎকীর্ত্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
ব্র-বৈ-পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড ১৩২ অধ্যায়।

১ মূল সৃষ্টি, ২ বিশেষ সৃষ্টি, ৩-৪ জগতের স্থিতি ও পালন, ৫ কর্ম্মের বাসনা, ৬ মনুদিগের আগমনের ক্রম, ৭ প্রলয়, ৮ মোক্ষ,

৯ হরির এবং ১০ দেবতাদের পৃথক পৃথক গুণ কীর্ত্তন, এই সকলের বিবরণ থাকা মহাপুরাণের লক্ষণ।

যে সকল মহাপুরাণ এই মহাপুরাণ-শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত না হইল, তাহারা উপপুরাণ নামে খ্যাত হইল।

এইরূপে দেখা যায় যে, বেদোক্ত পুরাণ শাস্ত্র ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও বহু অংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে দাঁড়াইয়াছে। দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা, ব্রতনিয়মাদির উপদেশ-দান ও তদ্দ্বারা মনুষ্যের পরমার্থ সাধন এক্ষণকার পুরাণের অভিলক্ষিত। এই সকল পুরাণের প্রভাবে পূর্ব্বতন পঞ্চ-লক্ষণ-যুক্ত পুরাণের সহিত তাহার সূত জাতীয় কথকেরাও অন্তর্হিত হইয়া গেল। সেই প্রাচীন পুরাণের ন্যায় বর্ত্তমান পুরাণ সকলও সূতদিগের উক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছে বটে; কিন্তু এই সকল পুরাণের মতে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হয়, এবং তাহার উপযোগী যে অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন অপরের কার্য্য নহে। সুতরাং সূতগণ পুরাণ-বক্তার অধিকারচ্যুত হইয়া পড়িলেন। তাহার পর তাহাদের আর কোন সংবাদই রহিল না।

ইহাই পুরাণের চতুর্থ অবস্থা।

এই চারি অবস্থায় পুরাণ শাস্ত্র কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিতে করিতে কোন্ দিকে চলিয়া আইল, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। এক প্রকার আদি কাল হইতে এই পুরাণ শাস্ত্র কত পরিবর্ত্তন সহিয়া,কত বিপ্লব অতিক্রম করিয়া, চির দিন কিরূপে মনুষ্যের হৃদ্গত হইয়া রহিল,তাহা অবশ্যই অতি বিচিত্র কথা, সন্দেহ কি? চিরজীবী পুরাণ শাস্ত্র আপনি সুরক্ষিত হইয়া অন্য সকল শাস্ত্রেরই রক্ষা ও পোষণ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে। অতএব ইহার মহাপ্রাণ বিবেচিত হয়।

অনির্দ্দেশ্য কাল হইতে যে প্রকারে এই পুরাণ প্রবাহ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চলিয়া আইল, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে,সুরসরিৎ গঙ্গার মর্ত্ত্যভূমিতে আগমনের পৌরাণিকী কথা মনে পড়ে।

হিমাচলবক্ষে যে জল প্রবাহ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল, তাহাই গোমুখী দ্বারে বিধৃত হইয়া গঙ্গারূপে প্রকাশ পাইল। ক্রমশঃ তাহা নিম্নদেশে আসিয়া অগণ্য ধারায়, অগণ্য লোকের উপকার সাধন করিতে লাগিল। সেই রূপ দেখা যায়, যে সঙ্কীর্ণ কথা-প্রবাহ বেদ মধ্যে নিহিত হইয়া "পুরাণ বেদ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পুরাণ ও ইতিহাস নাম গ্রহণ পূর্ব্বক মহাভারতে পরিণত হইল। কবিত্বসমন্বিত বর্ত্তমান পুরাণ কারেরা সেই 'ইতিহাসং পুরাতনং' বা কথা-প্রবাহকে দেব প্রভাব সমন্বিত করিয়া নানা প্রণালীতে নানা দেশের মধ্য দিয়া নানা লোকের হিতসাধন করিয়া অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রে আনিয়া ফেলিলেন।

পুরাণকারদিগের বিচিত্র কথার অনেক মাধুরী এবং তাহা মহার্থপূর্ণ। এই কথাসরিৎ যখন অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল, তখন উহাকে হিমাচল-বক্ষস্থিতা জলধারা বা স্বর্গের মন্দাকিনী, যাহা বলিতে ইচ্ছা হয়, বল। ইহা বেদের মধ্যে বহুকাল বিধৃত হইয়া ছিল; সেই বেদ ব্রহ্মার কমণ্ডলু স্বরূপ বিবেচিত হউক। পুরাণের তৃতীয় অবস্থায় তাহা মহাভারতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সেই মহাভারতকে মহাদেবের জটা বলিয়া বিবেচনা করিতে পার। মহাভারতের মধ্য হইতে উক্ত কথাসরিৎ যখন বর্ত্তমান পুরাণের রূপ প্রাপ্ত হইল, তখন মনুষ্যের সাক্ষাৎ উপকার সাধক হইয়া চলিল। এক্ষণকার লক্ষ লক্ষ

লোকের সেবিতা কল্লোলিনী সুরসরিৎ বর্ত্তমান পুরাণসরিতেরই নিদর্শন বা উদাহরণ মাত্র।

শেষে কাপিল সমাগম। ভাগীরথীর সাগর সঙ্গম ঘটিত কাহিনীর মধ্যে পুরাণকারদিগের যে কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহী ও চমৎকৃতিজনক।

গঙ্গা-প্রবাহের শেষে সাগরসঙ্গম। এই স্থানে কপিল ঋষি বসিয়া আছেন। চিরজীবী কপিলের হস্তে চিরজীবী সাংখ্যশাস্ত্র বিরাজ করিতেছে। সংসারাসক্ত ঐশ্বর্য্যমদমত্ত লোকেরা সাংখ্যহস্ত কপিলের অমর্য্যাদা করিয়া নিপাত যায়। আত্মত্যাগী তপোনিষ্ঠ সাধু পুরুষ আপনার সদ্গতি লাভ করেন এবং স্বীয় বংশের উদ্ধার করেন। গঙ্গাসাগর সঙ্গম তীর্থের এই মাহাত্ম্য। গঙ্গা স্রোত যেমন কপিলাশ্রমকে বিধৌত করিয়া ভারত সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে, সেই রূপ পুরাণপ্রবাহ সাংখ্য শাস্ত্রকে বিধৌত ও উজ্জ্বল করিয়া অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইতেছে।

"প্রকৃতি পুরুষের বিচার কর, বন্ধন ও মুক্তির জ্ঞান লাভ কর; তাপত্রয় নিবারণের চেষ্টা কর; তত্ত্ব জ্ঞান হইলেই পরমপুরুষার্থ লাভ হইবে।" এই উপদেশ দিয়া, জনগণের ভব যন্ত্রণা অতিক্রম করিবার পন্থা প্রদর্শন করিয়া কপিল ঋষি জ্ঞানপয়োনিধির অনন্ততা নিরীক্ষণ করিতেছেন। পুরাণকারেরাও তাঁহাদের অনুযাত্রীদিগকে সেই জ্ঞান-সাগরাভিমুখে লইয়া যাইতেছেন। পুরাণগত উপাখ্যান ভাগ ভুলিয়া লোক জ্ঞানতত্ত্বে মনোনিবেশ করিবে, পুরাণকারদিগের এই চরম উদ্দেশ্য। এজন্য পুরাণে জ্ঞান-তত্ত্ব মধ্যে মধ্যে উদিত করা হয়। এই হেতু, সগরবংশের নিধন বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া পবিত্রাত্ম কপিল ঋষির মহোন্নত জ্ঞান প্রদর্শনার্থ শ্রীমদ্ভাগবতকার বলেন, যিনি মুক্তিপ্রার্থীদিগের ভবসমুদ্র উত্তরণ জন্য সাংখ্যনৌকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি কেন ক্রোধের বশীভূত হইবেন?

যস্যেরিতা সাংখ্যময়ী দৃঢ়েহ নৌ
র্যয়া মুমুক্ষুস্তরতে দুরত্যয়ং।
ভবার্ণবং মৃত্যুপথং বিপশ্চিতঃ
পরাত্মভূতস্য কথং পৃথঙ্ মতিঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৮।১২

ফলতঃ, সত্ত্বরজস্তমোময়ী সংসার মৃত্তিকার উপর দিয়া দুই দিকে কর্ম্মের বাঁধ রাখিয়া যে পুরাণ সরিৎ চলিয়া আইল, জ্ঞানসাগরে তাহার শেষ। এই সঙ্গমস্থলে অবগাহন করিলে অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় হয়। যদি তোমার সংসারাসক্তি ক্ষয় হইয়া থাকে, তুমি নিঃশ্রেয়স লাভার্থ পুরোভাগে জ্ঞানসাগরে ভাসমান হও। যদি তোমার ভোগাভিলাষ এখনো প্রশমিত না হইয়া থাকে, তবে কর্ম্মতটের মধ্য দিয়া সত্ত্বরজস্তম গুণাদি অবলম্বন করিয়া উচ্চাবচ গতিতে বিচরণ করিতে থাক। যখন সংসারের তাপত্রয়ে উৎপীড়িত বোধ করিবে, যখন নিত্যানিত্য বিবেক জন্মিবে, তখন এই সঙ্গম স্থলে পুনরায় আসিয়া মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত জ্ঞান মহোদধিকে আশ্রয় করিবে।"

মনু অত্রি বিষ্ণু যম উশনা হারীত।
আপস্তম্ব যাজ্ঞবল্ক্য সম্বর্ত্ত লিখিত॥
পরাশর ব্যাস শংখ দক্ষ কাত্যায়ন।
আর যাঁরা করিলেন শাস্ত্র প্রণয়ন॥
অঙ্গিরা গৌতম শাতাতপ ঋষিগণে।
করি নতি বৃহস্পতি বশিষ্ঠ চরণে॥

শাস্ত্রের নাম ও পরিচয়।

কালক্রমে যে সকল শাস্ত্র সমুদিত হইয়া ভারত সমাজকে রক্ষা করিতেছে, তাহাদের পার্শ্ব দিয়া পুরাণ প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে। পুরাণ প্রসঙ্গে সে সকল প্রাচীন শাস্ত্রেরও

উল্লেখ করিতে হইবে। অতএব তত্তাবৎ শাস্ত্রের নাম ও পরিচয় ব্যক্ত হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্র অসংখ্য। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান শাস্ত্রের ও তাহার প্রধান প্রধান শাখার নাম, শ্রেণী ও মর্য্যাদার বিবরণ করা যাইতেছে।

শাস্ত্র সমুদায় পঞ্চ শ্রেণীভুক্ত। (১) বেদ, বেদাঙ্গ ও উপবেদ, (২) দর্শন, (৩) স্মৃতি, (৪) ইতিহাস ও পুরাণ, (৫) তন্ত্র।

বেদ।

বেদের সংখ্যা চারি—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব। প্রত্যেক বেদের চারি অবান্তর ভাগ আছে; (১) সংহিতা, (২) ব্রাহ্মণ, (৩) উপনিষৎ, (৪) সূত্র। ব্রাহ্মণের অন্তর্গত কয়েকটী পরিচ্ছেদকে আরণ্যক বলে। বেদের কোন কোন ভাগকে শাখা বলা হয়। সূত্রের দুই ভাগ; গৃহ্যসূত্র ও শ্রৌতসূত্র। * যজুর্ব্বেদ প্রথমে কৃষ্ণ ও শুক্ল এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক ভাগ সংহিতাদি-চারি-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছে। বেদের শিক্ষা-সহযোগী কয়েকখানি শাস্ত্র আছে। তাহাদিগকে বেদাঙ্গ বলে।

এই সকল ভাগ ও বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন নাম দ্বারা স্পষ্টরূপে নির্ণীত হইয়াছে। নিম্নের তালিকায় তৎসমুদায় প্রদর্শন করা যাইতেছে।

ঋগ্বেদ।

১। সংহিতা।
২। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ঐতরেয় আরণ্যক।
৩। উপনিষৎ—(১)ঐতরেয়। (২)কৌষীতকী।
৪। গৃহ্যসূত্র,—(১)সাঙ্খ্যায়ন। (২)আশ্বলায়ন।
শ্রৌতসূত্র (১) সাঙ্খ্যায়ন। (২) আশ্বলায়ন।

* সাময়াচারিক সূত্র নামে আর এক ভাগ আছে, তাহা স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র আকারে পরিণত হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদ।

কৃষ্ণ যজুঃ।

১। সংহিতা। তৈত্তিরীয়।
২। ব্রাহ্মণ—তৈত্তিরীয়।
তৈত্তিরীয় আরণ্যক।
শাখা—(১) মৈত্রায়ণী; (২) কঠ।
৩। গৃহ্যসূত্র—(১) বৌধায়ন (২) আপস্তম্ব।
শ্রৌতসূত্র। (১) বৌধায়ন (২) আপস্তম্ব।
৪। উপনিষৎ—(১) তৈত্তিরীয়, (২) মৈত্রী বা মৈত্রায়ণী (৩) কঠ (৪) শ্বেতাশ্বতর।

শুক্ল যজুঃ।

১। সংহিতা—বাজসনেয় সংহিতা।
২। ব্রাহ্মণ—শতপথ ব্রাহ্মণ।
শাখা—(১) মাধ্যন্দিনী। (২) কাণ্ব।
৩। উপনিষৎ—বৃহদারণ্যক।
৪। গৃহ্যসূত্র—কাত্যায়ন সূত্র। শ্রৌতসূত্র।

সাম বেদ।

১। সংহিতা—আর্চ্চিক।
২। ব্রাহ্মণ—(১) ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ। (২) পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ। (৩) তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ।
শাখা—(১) তলবকার। (২) কৌথুমী। (৩) রাণায়নী।
৩। উপনিষৎ-(১)তলবকার (কেন) উপনিষৎ। (২) ছান্দোগ্য উপনিষৎ।
৪। গৃহ্যসূত্র—গোভিল।
শ্রৌতসূত্র—(১) লাট্যায়ন। (২) গোভিল।

অথর্ব্ব বেদ।

১। সংহিতা।
২। ব্রাহ্মণ—গোপথ ব্রাহ্মণ।
৩। উপনিষৎ—(১)মুণ্ডক,(২)মাণ্ডুক্য,(৩)প্রশ্ন।
৪। সূত্র—কৌশিক সূত্র।

উপনিষদের সংখ্যা শতাধিক। তন্মধ্যে দশখানি প্রধান। সেই দশখানি উপনিষদের নামে একটী শ্লোক রচিত হইয়াছে।

ঈশা কেন কঠ প্রশ্ন মুণ্ড মাণ্ডুক্য তিত্তিরিঃ।
ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যমৈতরেয় স্তথা দশ ॥

বেদাঙ্গ।

বেদাঙ্গের সংখ্যা ছয়। 'ষড়ঙ্গ বেদ' যথা, পাণিনি কৃত (১) শিক্ষা, (২) ব্যাকরণ, (৩) যাস্ককৃত নিরুক্ত, (৪) পিঙ্গলকৃত ছন্দঃ, (৫) গর্গাদি অষ্টাদশ মুনি কৃত জ্যোতিষ, (৬) কল্পশাস্ত্র।

সাময়াচারিক সূত্র সকলকে সাধারণতঃ কল্প শাস্ত্র বলে। সেই কল্পশাস্ত্রকে বেদাঙ্গ মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। এইরূপ আর কতকগুলি শাস্ত্র আছে, তাহা বেদের তুল্য এবং উপবেদ বলিয়া গণ্য হয়।

উপবেদ।

১। ধন্বন্তরি প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ।
২। বিশ্বামিত্র প্রণীত ধনুর্ব্বেদ।
৩। ভরত প্রণীত গান্ধর্ব্ববেদ।
৪। নানা মুনি প্রণীত অর্থশাস্ত্র।

দর্শন।

১। কপিল কৃত কাপিল বা সাঙ্খ্যদর্শন।
২। পতঞ্জলি কৃত পাতঞ্জল দর্শন বা যোগশাস্ত্র।
৩। গৌতম কৃত ন্যায় দর্শন।
৪। কণাদ কৃত বৈশেষিক দর্শন।
৫। জৈমিনি কৃত পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন।
৬। ব্যাস কৃত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন।

এই ষড় দর্শন প্রাচীন। তদ্ভিন্ন রামানুজ ও পাশুপত দর্শনাদি আর কয়েকখানি দর্শন অধুনাতন কালে রচিত হইয়াছে।

স্মৃতি।

স্মৃতির বিশেষ নাম ধর্ম্মশাস্ত্র। অনেক ঋষি স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই ২০ কুড়ি জন ঋষির প্রণীত স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রধান।

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরাঃ
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী।
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ॥

১ মনু, ২ অত্রি, ৩ বিষ্ণু, ৪ হারীত, ৫ যাজ্ঞবল্ক্য, ৬ উশনা, ৭ অঙ্গিরা, ৮ যম, ৯ আপস্তম্ব, ১০ সম্বর্ত্ত, ১১ কাত্যায়ন, ১২ বৃহস্পতি, ১৩ পরাশর, ১৪ ব্যাস, ১৫ শঙ্খ, ১৬ লিখিত, ১৭ দক্ষ, ১৮ গৌতম, ১৯ শাতাতপ, ২০ বশিষ্ঠ।

এতদ্ভিন্ন নারদ স্মৃতি প্রভৃতি আর কয়েকখানি স্মৃতি আছে।

ইতিহাস।

রামায়ণ ও মহাভারত ইতিহাস মধ্যে প্রধান। অন্যান্য ইতিহাস প্রচলিত পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

পুরাণ।

পুরাণ সকল দুই শ্রেণীভুক্ত; মহাপুরাণ, উপপুরাণ। প্রত্যেকের সংখ্যা অষ্টাদশ বলিয়া প্রথিত আছে।

মহাপুরাণ।

মহাপুরাণ সকলের নাম শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যক্ত আছে:—১২স্কন্ধ ৭অঃ

ব্রাহ্মাং পাদ্মাং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ং।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতং।
ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ঞ্চ বামনং।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্ ॥

১ ব্রহ্ম, ২ পদ্ম, ৩ বিষ্ণু, ৪ শিব, ৫ লিঙ্গ, ৬ গরুড়, ৭ নারদীয়, ৮ ভাগবত, ৯ অগ্নি, ১০ স্কন্দ, ১১ ভবিষ্য, ১২ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ১৩ মার্কণ্ডেয়, ১৪ বামন, ১৫ বরাহ, ১৬ মৎস্য, ১৭ কূর্ম্ম, ১৮ ব্রহ্মাণ্ড।

এই পুরাণগুলির নাম স্মরণে রাখিবার নিমিত্ত একটী কবিতা রচিত হইয়াছে;

তাহাতে ঐ পুরাণগুলির আগু অক্ষর কৌশলে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। শিবপুরাণের অন্য নাম বায়ু পুরাণ।

ম দ্বয়ং ভ দ্বয়ঞ্চৈব ব্র ত্রয়ং ব চতুষ্টয়ং।
অ না কূ স্ক প লিঙ্গানি পুরাণানি বিদুর্ব্বুধাঃ॥

ম দ্বয়ং—(১) মৎস্য (২) মার্কণ্ডেয়;
ভ দ্বয়ং—(৩) ভবিষ্য (৪) ভাগবত;
ব্র ত্রয়ং—(৫) ব্রহ্ম, (৬) ব্রহ্মাণ্ড, (৭) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত;
ব চতুষ্টয়ং—(৮) বরাহ, (৯) বামন, (১০) বায়ু, (১১) বিষ্ণু;
অ—(১২) অগ্নি; না—(১৩) নারদ; কূ—(১৪) কূর্ম্ম; স্ক—(১৫) স্কন্দ; প—(১৬) পদ্ম; লিং—(১৭) লিঙ্গ; গ—(১৮) গরুড়।

উপপুরাণ।

১ আদিত্য,	১০ পারাশর,
২ ঔশনস,	১১ ভার্গব,
৩ কল্কি,	১২ মাহেশ্বর,
৪ কাপিল,	১৩ বারুণ,
৫ কালিকা,	১৪ বাশিষ্ঠ,
৬ দুর্ব্বাসস,	১৫ শাম্ব,
৭ নন্দী,	১৬ শিব,
৮ নারদীয় বা বৃহন্নারদীয়,	১৭ সনৎকুমার,
৯ নৃসিংহ	১৮ সৌর।

ইহা ভিন্ন আদি, মানব, মুদ্গল, ভবিষ্যোত্তর, ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি কয়েকখানি উপপুরাণের নাম দেখা যায়। কালিকা পুরাণে অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যে মারীচ, ব্রহ্মাণ্ড, বামন ও কার্ত্তিকেয় কথিত পুরাণ ধরা হইয়াছে।

এই সকল পুরাণ ও উপপুরাণের রচনার পূর্ব্বে কতকগুলি পুরাণ সংহিতা রচিত হইয়াছিল। (১)স্বয়ং ব্যাসের কৃত পুরাণ সংহিতা (২) লোমহর্ষণিকা (৩—৫) কশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন কৃত তিনখানি পুরাণ সংহিতা। এই সংহিতা গুলির উল্লেখ দেখা যায়। পুরাণ সংহিতার আদর্শে অপরাপর পুরাণ রচিত হইয়াছিল। সে পুরাণ সকলের নাম বা কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

তন্ত্র।

তন্ত্রের সংখ্যাও বিস্তর। তন্মধ্যে মহানির্ব্বাণ,কুলার্ণব, জ্ঞানসঙ্কলিনী,কুলকুণ্ডলিনী, রুদ্রযামল, বৃহন্নীল, বারাহী, গৌতমীয়, মাতৃকাভেদ, কামধেনু, বিশ্বসার, কামাখ্যা, মন্ত্রকোষ ইত্যাদি প্রধান।

প্রধান প্রধান শাস্ত্র গুলির নাম ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। আবশ্যক মতে বিশেষ পরিচয় পরিব্যক্ত হইবে।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

কার্ত্তিক পূজা।

১

কার্ত্তিক! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি?
তুমি সে উমার ছেলে, ময়ূরে চড়িয়া এলে,
পারীন্দ্রে বেড়ায় যেই পাহাড়ে পার্ব্বতী?
তোমারি মা গিরিকন্যা, জগতে রমণী ধন্যা,
দশভুজে দশ অস্ত্র ধরে ভগবতী?
চরণে অসুর দলে, যে রমণী মহাবলে,
সে মহিষমর্দ্দিনীর তুমি কি সন্ততি?
কার্ত্তিক! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি?

২

কার্ত্তিক! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি?
প্রলয় বিষাণধারী, তুমি কি সংহারকারী
ত্রিপুরারি ত্রিশূলী সে শিবের সন্ততি?

যোগীন্দ্র তোমারি পিতা, যোগাসন করে চিতা,
গলে পঞ্চ হাড়মাল ভূষণ বিভূতি ?
সর্পের বলয় হাতে, রুদ্রাক্ষ শোভিত সাথে,
সদ্যছিন্ন বাঘছাল পরিধান ধুতি !
ললাট নয়নানলে, কীট সম কাম জ্বলে,
একত্র শোভিছে তাহে শশী দিনপতি !
মস্তকে বিশাল জটা, গঙ্গার তরঙ্গ ঘটা,—
আতঙ্কে মাতঙ্গ ভাসে মহাবেগবতী !
অমৃত ঠেলিয়া পায়, গরল সমুদ্র খায়,
তোমারি কি মৃত্যুঞ্জয় পিতা পশুপতি ?
কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই শিবের সন্ততি ?

৩

কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি ?
তুমি কি সে মহাশূর, বধিয়া তারকাসুর,
উদ্ধারিলা দেবতার সে অমরাবতী ?
তুমিই কি ভুজবলে, পুনরায় দেবদলে,
দানব দাসত্ব হ'তে করিলে মুকতি ?
তোমারি কি সুরপুরে, জয় বৈজয়ন্তী উড়ে
সুবর্ণ সুমেরু চূড়ে ওহে সুররথি ?
তুমি কি সে ষড়ানন সুরসেনাপতি ?

৪

তুমি কি কুমার সেই দেবসেনাপতি ?
তোমারে পূজিলে মেলে, তব সম বীর ছেলে,
সে নাশে তোমারি মত দেশের দুর্গতি ?
সে ফেলে সজোরে ছিঁড়ি, জননীর দাসীগিরি
তাহারো কি পদভরে কাঁপে বসুমতী ?
তারো কি হিমাদ্রি লঙ্কা, বাজে সে বিজয় ডঙ্কা,
তাহারো চরণে বিন্ধ্য করে কি প্রণতি ?
হায় সে ছেলের লাগি, সারারাত জাগি জাগি,
করে কি তোমার পূজা যত কুলবতী ?
কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই মহাসুররথী ?

৫

কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি ?
কোথা তবে বর্ম্মচর্ম্ম, এই কি বীরের কর্ম্ম ?
চাদরে আদর—কৃপা কেরেপের প্রতি !
কোথা বা সে মালকচ্ছ, সে বুঝি গয়াংগচ্ছ,
আগচ্ছ ঢাকাই ধুতি ত্রিকচ্ছে বসতি !
কোথা সে পিঠের তূণ, কোথা সে ধনুক গুণ,
কার্ম্মুক বহিতে হাতে নাহি কি শকতি ?
বিজয় কিরীট খু'লে, এলবার্ট্ এলে তু'লে,
পায়ে মেন্‌ফিল্ড যুতা ফুলবাবু অতি !
কার্ত্তিক ! তুমি সেই সুরসেনাপতি ?

৬

কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই দেবযোদ্ধাপতি ?
ছাড়িয়া বীরের সাজ, আসিতে হ'লনা লাজ,
তোমারো এখানে এসে ফিরে গেল মতি ?
বাঙ্গালার জলবায়ু, বিনাশে আরোগ্য, আয়ু,
দেবতারো এমনি কি ঘটায় দুর্গতি ?
সত্য এ মাটীর দোষে, হৃদয়ের বল শোষে ?
শোণিতে থাকেনা তেজ মোটে একরতি ?
এ মৃদু মলয় বায়, উদ্যম উড়িয়া যায়,
অবশ শিথিল হয় ধমনীর গতি ?
সত্যই পিকের ডাকে, হাতে না ধনুক থাকে,
কুহুরবে পক্ষাঘাত করে কি বসতি ?
প্রস্তর অস্থির করে মোমে পরিণতি ?

৭

কার্ত্তিক ! তুমিই যদি সুরসেনাপতি,
এ বেশে তোমারে পূজি, কি ফল আমি না বুঝি,
জন্মে শুধু কত গুলি জড় পাপমতি !
পরিচ্ছদ ফুলকোচা, ব্যবসা পেনের খোচা,
পদাঘাতে পীলা ফাটা, এই শেষ গতি !
যাহা কিছু উচ্চ শিক্ষা, উদ্দেশ্য দাসত্বভিক্ষা,
ছোট বড় সকলের একই পদ্ধতি !
সকলি কবন্ধাকার, মুখ আর পেট সার,
বায়ুভরা বেলুনের কথারি উন্নতি !
সকলি রুচির পুচ্ছ, জ্বালাইতে করে উচ্চ,
কাব্যের কনক-লঙ্কা মহারূপবতী !
সকলি সমাজ শোধে, কুরুচির গোড়া খোদে,
নাশিতে অশোক বনে বসন্ত-ব্রততী !

এ হেন বেবুন-বংশ, এক দিনে হ'লে ধ্বংস,
জগতের লাভ বই নাহি কোন ক্ষতি!
দুর্ভিক্ষ—আকাল যায়,'হাহাকার' 'হায় হায়',
কুটীরে কৃষক করে আনন্দে বসতি!
আল্‌সে শূয়র পালে,কাজ নাই কোন কালে,
বৃথা আরো অপবিত্র করে বসুমতী!
একটী সিংহের ছানা, অরণ্যে বসায় থানা,
রচে শৈল-সিংহাসন সাজে পশুপতি!
বাবুভরা বাঙ্গলার কি হবে হে গতি?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ভগবদ্গীতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাংখ্য যোগ।

"দ্বিতীয়ে শোকসন্তপং অর্জ্জুনে ব্রহ্মবিদ্যায়া।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিত-প্রজ্ঞস্য লক্ষণং॥
শোকপঙ্কং নিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ।
উজ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম॥"

সঞ্জয়—

এইরূপ কৃপাবিষ্ট আকুল-নয়ন
অশ্রুপূর্ণ বিষাদিত অর্জ্জুনে তখন,
কহিলেন এইকথা শ্রীমধুসূদন:—১

শ্রীভগবান—

অর্জ্জুন! কি হেতু এই বিষম সময়ে,
কীর্ত্তিলোপী স্বর্গলোপী অনার্য্য সেবিত,
হেন মলিনতা (চিতে) উপজিল তব? ২
হয়োনা কাতর আর; এ নীচতা কভু
সাজে কি তোমারে পার্থ? উঠ পরন্তপ,
করি' দূর এই ক্ষুদ্র হৃদি দুর্ব্বলতা। ৩

অর্জ্জুন—

কেমনে মধুসূদন, হানিব সমরে
শর আমি, পূজনীয় ভীষ্ম দ্রোণ প্রতি? ৪
না বধি মহাত্মা গুরুগণে
শ্রেয়ঃ হেথা ভিক্ষান্ন ভোজন;—
গুরু বধি ভুঞ্জিব হেথায়
রুধিরাক্ত অর্থ-কাম-ভোগ। ৫

টীকা।

(২) শ্রীভগবান—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"
এইরূপ 'ভগ' যাঁহার আছে তিনি ভগবান। অথবা
উৎপত্তি প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামগতিং গতিং।
বেত্তি বিদ্যাং অবিদ্যাঞ্চ সবাচ্য ভগবানিতি॥

বিষম সময়ে—যুদ্ধ সময়ে, সঙ্কটে (স্বামী, বলদেব)। সভয় স্থানে (গিরি, মধু)।

মলিনতা—(মূলে আছে কশ্মল) মোহ (স্বামী); শিষ্টগর্হিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখতা (মধু, গিরি)।

কীর্ত্তিলোপী, স্বর্গলোপী—এই কথা, এই অধ্যায়ের ৩১ হইতে ৩৭ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

অনার্য্যসেবিত—সাংখ্য ও কর্ম্মজ্ঞানীর অনুপযুক্ত। হৃদিশুদ্ধি জন্য যে স্বধর্ম্ম আচরণ করে, যে মোক্ষাভিলাষী—সেই আর্য্য। (বলদেব)।

কাতরতা, নীচতা—(মূলে আছে ক্লৈব্যং) ক্লীবতা বা অধৈর্য্য (গিরি, মধু) ভীরুতা (বলদেব)

(৫) ভিক্ষান্ন—এস্থলে অর্জ্জুন স্বধর্ম্ম যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষারূপ পরধর্ম্ম বা যতিধর্ম্ম গ্রহণের অভিলাষ করিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ টীকাকারগণ এই অর্থ করেন। কিন্তু যখন ইতিপূর্ব্বে

যদি জিনি—কিম্বা হই জিত,
কিবা শ্রেয় না বুঝি ইহার ;
বধি যেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে
নাহি থাকে বাঁচিতে বাসনা,—
অই তারা রয়েছে সম্মুখে ॥৬
কৃপণতা দোষে অভিভূত
স্বভাব আমার, ধর্ম্মে আমি
মূঢ়মতি—জিজ্ঞাসি তোমায়
শ্রেয় যাহা কহ সুনিশ্চয় ;
শিখাও আমায়—শিষ্য আমি
তব দেব ! লইনু শরণ ॥৭

কিন্তু জে'ন ধরার ভিতর
নিষ্কণ্টক রাজ্য যদি পাই,
কিম্বা হই অমরার পতি,
তবু আমি না পারি বুঝিতে
কেমনে এ শোক হবে দূর—
যাহে করে ইন্দ্রিয় শোধন। ৮

সঞ্জয়—
হৃষীকেশে কহি ইহা, পার্থ পরন্তপ
মৌনে রহে, গোবিন্দেরে যুঝিবনা বলি। ৯
উভয় সেনার মাঝে তবে হে রাজন !
বিষাদিত অর্জ্জুনেরে মৃদু হাসি মুখে
কহিলেন এই কথা দেব হৃষীকেশ। ১০

শ্রীভগবান—
অশোচ্য যে তার তরে করিতেছ শোক,
কহিছ বিজ্ঞের কথা; কিন্তু পণ্ডিতেরা
মৃত কি জীবিত তরে নাহি করে শোক॥১১

বনবাসী হৃতসর্ব্বস্ব পাণ্ডবদের ভিক্ষাই একরূপ উপজীবিকা ছিল—তখন এস্থলে সহজ অর্থ করিলেও চলে।

(৬) কিবা শ্রেয়—(মূলানুযায়ী অর্থ—কিবা গুরুতর) যুদ্ধ করা বা ভিক্ষা করা, ইহার মধ্যে আমার কি শ্রেয় (মধু ও গিরি) ; সাধারণতঃ কি কর্ত্তব্য (স্বামী)।

(৭) কৃপণতা দোষ—দীনতা বা বিপন্ন ভাবাপন্ন, মহাব্যসনগ্রস্ত।। "মহদ্বাব্যসনং প্রাপ্তো দীন কৃপণ মুচ্যতে (বাচস্পত্যং), যে আপনার অল্প স্বল্প ক্ষতি ও সহ্য করিতে পারে না সেই কৃপণ (গিরি), ইহাদের হত্যা করিয়া কিরূপে বাঁচিব, আত্মজ্ঞানাভাবে এই মমতা লক্ষণই দোষ (মধু)। কৃপণতা এবং দোষ অর্থাৎ ইহাদের হত্যা করিয়া কেমন করিয়া বাঁচিব, এই কৃপণতা এবং কুলক্ষয় জন্য দোষ দর্শন। (স্বামী) ; শাস্ত্রে আছে, "যোহবা এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বা স্মল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।"

ধর্ম্ম—অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের কার্য্য যুদ্ধ না ভিক্ষা, ইহার কোনটা অর্জ্জুনের ধর্ম্ম সঙ্গত (স্বামী) ; ধর্ম্ম—যে ধারণ করে, অর্থাৎ পরমাত্মা—তৎবিষয়ে বিবেকহীন (গিরি) ; হিংসা প্রধান ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ও অহিংসা রূপ যতিধর্ম্ম ইহাদের মধ্যে কি শ্রেয়, তাহা অর্জ্জুন বুঝিতে পারেন নাই।

(৮) অমরার পতি—ইন্দ্রত্ব অথবা ব্রহ্মত্ব (গিরি) ; হিরণ্যগর্ভত্ব পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্য। (মধু)

(১০) মৃদুহাসি মুখে—ভ্রান্ত অর্জ্জুনের কথায় ঈষৎ লজ্জিত হইয়া ও ব্যঙ্গ চ্ছলে হাসিয়া (মধু ও বলদেব) ; প্রসন্নমুখে (গিরি)। শেষ অর্থই অধিক সঙ্গত।

(১১) বিজ্ঞের কথা—নিজে বড় বিজ্ঞ এইরূপ অভিমান করিয়া কথা। রামানুজ অর্থ করেন, দেহাত্মস্বভাব মুগ্ধ প্রজ্ঞা বিক্ষিপ্ত বাক্য। মূলে আছে 'প্রজ্ঞা বাদাং'। মধুসূদন বলেন, "প্রজ্ঞা অবাদাং" বা জ্ঞানীর অযোগ্য বাক্য।

শোক—স্থূল অথবা সূক্ষ্ম দেহ বিনাশ জন্য শোক। (বলদেব)। ইহা কিছু দুরার্থ।

(১১)—গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই ১১শ্লোক হইতেই প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব আরম্ভ হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইতেছেন। কেন, কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবগণ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন, এমন সময় আত্মীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে দেখিয়া অর্জ্জুন

শোকাভিভূত হইলেন। বলিলেন যুদ্ধ করিব না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে লওয়াইতেছেন। অনেকে সেই জন্য গীতোক্ত শাস্ত্রে বিশেষ আস্থাবান্ নহেন। যাঁহারা মহাভারতের কথা জানেন, তাঁহাদের বলিতে হইবে না যে, যুদ্ধ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিছু হইল না, শেষে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল। হয় পাণ্ডবদের যুদ্ধ করিয়া অন্যায় রূপে হৃত নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে হয়; নতুবা চিরকাল অরণ্যচারী হইয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। আবার যুদ্ধ করিয়া কৌরবের পাপ প্রবৃত্তির দমন না করিলে তাহাদের পাপাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সুতরাং যুদ্ধ করিয়া জীবহত্যা করা ক্লেশকর হইলেও পাণ্ডবদের পক্ষে এ যুদ্ধ নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছিল। এই জন্য এ যুদ্ধ যে ধর্ম্মকার্য্য শ্রীকৃষ্ণ তাহাই অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন। মহাভারতে যতগুলি আদর্শ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্ম বাদে অর্জ্জুনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং অর্জ্জুনকে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা বুঝাইবার জন্য সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বেরই অবতারণা করিতে হইয়াছিল।

অর্জ্জুনের যুদ্ধ করিব না বলিবার কারণ তিনটী। প্রথমতঃ যুদ্ধ করিলে স্বজনগণকে ও অন্য লোককে হত্যা করিতে হইবে,—লোককে হত্যা করা বা কষ্ট দেওয়া অন্যায়। দ্বিতীয়তঃ তাহাতে অর্জ্জুনের নিজের চিরজীবন মনের ক্লেশ থাকিবে ও কৃতপাপের জন্য পরকালে নরক ভোগ হইবে। তৃতীয়তঃ যুদ্ধে লোক হত্যা করিলে সমাজের ও কুলের ক্ষতি হইবে। এই তিনটী কথারই উত্তর দিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ কাহাকে হত্যা করিলে তাহার নিজের কোন ক্ষতি নাই। ইহা বুঝিতে হইলেই আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ জীবাত্মার অমরতা ও জন্মান্তরবাদ বুঝিতে হয় এবং শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বুঝিতে হয়। এই (স্থূল) শরীরটা অসৎ ও আত্মা (বা জীবাত্মা) সৎ, জরাজীর্ণ শরীরটা ধ্বংস হইলে অন্য নূতন শরীর লাভ করায়, লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। শরীর নাশ হইবার সম্ভাবনায় আপততঃ কষ্ট মনে হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী, উহা আত্মাকে রঞ্জিত করিতে পারে না, ইহা বুঝিতে হয়। ইহা বুঝাইতেই এই অধ্যায়ের ১২ হইতে ৩০ শ্লোকের অবতারণা।

দ্বিতীয়তঃ অর্জ্জুন নিজের পাপাশ্রয়ের কথা বলিয়াছেন, জীবহিংসাজনিত ক্লেশ বা "অস্বর্গ্য ও অকীর্ত্তিকর মোহের" অভিভূত হইয়াছেন। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতে হইয়াছে যে ধর্ম্মযুদ্ধে পাপ নাই, অর্জ্জুনের স্বধর্ম্মই যুদ্ধ (৩১ হইতে ৩৭ শ্লোক) ধর্ম্মযুদ্ধে পাপ ও নরকের পরিবর্ত্তে স্বর্গ লাভই শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত। এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্মী বা রাজসিক প্রকৃতিযুক্ত, সুখ দুঃখ লাভালাভ গণনায় ব্যস্ত অর্জ্জুন যুদ্ধ জয় করিলে রাজ্য ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া সুখী হইবেন, আজীবন দুঃখিত থাকিবেন না।

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছিলেন যে, এ লাভালাভ পাপ পুণ্য গণনা করিয়া কর্ম্ম করা বা কর্ম্ম হইতে নিরত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া করিতে হয়, বুদ্ধি কর্ম্মযোগে সমাহিত করিয়া, আসক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, নির্দ্বন্দ্ব হইয়া কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করিতে হয়। (এই সব কথা ৩৮ হইতে ৫৩ শ্লোকে বুঝান আছে)। তাহার পর বুদ্ধি এইরূপে সমাহিত হইলে কি অবস্থা হয়, এবং তাহার কিরূপ কর্ম্ম তাহা ৫৫ হইতে ৭২ শ্লোকে বুঝাইয়া দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করা হইয়াছে।

অর্জ্জুনের যুদ্ধ করিব না বলিবার যে তৃতীয় কারণ উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার কোন উত্তর দেওয়া নাই। সমস্ত গীতার মধ্যে তাহার কোন স্পষ্ট উত্তর নাই। তবে চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার কতকটা উত্তর আছে। লোক রক্ষার ভার ভগবানের, মানুষ কেবল লোকহিতার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে, কর্ম্মের গৌণফল দেখিয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে সংশয় যুক্ত করিবে না। সে কথা এস্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই।

এস্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক। ভীরু ও দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি যুক্ত লোকে 'যুদ্ধ' নামে ভয় পায়। ধর্ম্মযুদ্ধ যে সম্ভব তাহা বুঝে না। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধ যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, অন্ততঃ আমাদের তাহা বুঝা বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। জগতের Struggle for existence এবং "Surrival of the fittest" নিয়ম অপরিহার্য্য। বিবর্ত্তন নিয়মানুসারে জীবের উন্নতির জন্য fittest হইতে হইলে আমাদের ধর্ম্ম বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও অধর্ম্ম বৃত্তির দমন করিতে হয়। জ্ঞান প্রভৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি বা ধর্ম্মগুলির স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি করিতে হয়। যাহারা লোকের এই ধর্ম্মবৃত্তির স্ফূর্ত্তির পথে বাধা দেয়

আমি কিম্বা তুমি আর এ নৃপ মণ্ডলী
না ছিলাম—কভু নহে তাহা; কিম্বা সবে
অতঃপর না রহিব—তা নহে কখন। ১২

তাহার বিনাশ করিতে হয়। সেই জন্য যুদ্ধও যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে তাহা ত্যাগ করিতে নাই। সেই যুদ্ধ রূপ ঘৃণ্যকার্য্য করিতে গিয়াও কিরূপে মানুষে শ্রেষ্ঠতম ধার্ম্মিক হইতে পারে, গীতায় তাহা দেখান হইয়াছে। কর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে যে এক সূত্রে গ্রথিত করিতে পারা যায়, গীতা ব্যতীত আর কোথায়ও তাহা বুঝান নাই।

আর একটী কথার উল্লেখ এস্থলে প্রয়োজন। 'গীতা' ও 'চণ্ডী'র আরম্ভ একই প্রকারের। দুর্য্যোধন প্রভৃতি যাহারা পাণ্ডবদের নিতান্ত আততায়ী, তাহাদের জন্যও অর্জ্জুনের মমতা হইতেছে, যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আত্মধর্ম্ম ও প্রকৃতি ধর্ম্ম বুঝাইয়া তবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মোহ দূর করিলেন। ইহাই গীতার আরম্ভ ও সমাপ্তি। সুরথ রাজার অনুচরগণ ফাঁকি দিয়া তাহার রাজ্য লইল, সুরথকে বনবাসী করিল; সমাধি নামক বৈশ্যের সংগৃহীত অর্থ তাহার স্ত্রী পুত্র আত্মসাৎ করিল, সমাধিকে বনে তাড়াইয়া দিল, তবু উঁহাদের সেই অনুচর ও স্ত্রী পুত্র জন্য মমতা রহিয়া গেল। যে প্রকৃতির গুণ বা শক্তি বা মায়া হইতে এই মমতা প্রভৃতি আসক্তি জন্মে, তাহার তত্ত্ব বুঝাইয়াই মার্কণ্ডেয় ঋষি সুরথ ও সমাধিকে মোহ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। এই মমত্ব বা অহঙ্কারই ধর্ম্মের অন্তরায় এবং এই দুইখানি অপূর্ব্ব ধর্ম্মগ্রন্থই সেই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম গীতার ও চণ্ডীর উপক্রমণিকায় অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে।

এখনও একটী কথা বুঝিতে হইবে। দুর্য্যোধনাদির ন্যায় আততায়ীদের উপর ক্রোধ হওয়াই সাধারণ লোকের স্বভাব। অর্জ্জুন চিত্তের সেই স্বাভাবিক বৃত্তি দমন করিয়া দয়া প্রভৃতি ধর্ম্মের বীজভূত সাত্ত্বিক মোহে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেও তাঁহার ইন্দ্রিয় ও মন যে বশীভূত "তিনি যে দৈবীসম্পদ্‌যুক্ত" তাহার পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং তিনি ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব ধারণা করিবার অধিকারী ছিলেন। অনেক টীকাকারগণ যে তাঁহাকে নিম্নাধিকারী বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে।

(১২) আমি কিম্বা তুমি—এস্থলে দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদীদের মধ্যে মহাতর্ক উপস্থিত। রামানুজ দ্বৈতবাদী। তিনি অর্থ করেন, "আমি সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা যেরূপ নিত্য, সেইরূপ তুমি প্রভৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের আত্মা নিত্য।" এস্থলে তাঁহার মতে পরমাত্মায় ও জীবাত্মায় প্রভেদ করা হইয়াছে। রামানুজ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদীদের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া বলেন যে, অজ্ঞানকৃত ভেদ দর্শনমূলক ব্যবহারিক ভাবে উপাধি হেতু জীবাত্মার ও পরমাত্মার প্রভেদ করা হয় নাই, স্বয়ং ভগবান যখন অর্জ্জুনের ন্যায় শিষ্যের উপদেষ্টা, তখন তিনি এরূপ ব্যবহারিক ও মিথ্যা ভেদ করিতে পারেন না। আরও এই দ্বৈতমত শ্রুতিসঙ্গত। শঙ্কর ও গিরি ইহার উত্তরে বলেন যে, অর্জ্জুন তখন যেরূপ মোহযুক্ত হইয়াছিল তখন অদ্বৈত জ্ঞান তাহার ধারণা হইবে না বলিয়া এরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আরও এস্থলে বেদান্তমতে আত্মাকে ব্যষ্টিভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। পরমাত্মার যেমন উৎপত্তি বিনাশ নাই, সেইরূপ সৃষ্টি অবস্থায় সেই আত্মার যে সকল অংশ অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ভিন্ন ভাবে জীবাত্মা রূপে বিচরণ করে, তাহারও কখন জন্মমৃত্যু নাই। এইরূপ সৃষ্টি অবস্থায় জীবাত্মায় নিত্যত্ব প্রভৃতি এই শ্লোকে ও পরের কয়টা শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।"

আর এক কথা। এস্থলে সাংখ্যের বহু পুরুষবাদ সূচিত হইয়াছে। গীতাতে পরে এই বহু পুরুষবাদের সহিত বেদান্ত ব্রহ্মবাদের সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। ইহাতে পরে দেখান হইয়াছে যে অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত (১) পরব্রহ্মের এক অংশ কলা বা পাদ চরাচর কারণ কূটস্থ অব্যক্ত অক্ষর, পরম অব্যয় (২) ব্রহ্মরূপে ব্যাপ্ত হইয়া সৃষ্টিতে পুরুষোত্তম বীজপ্রদ পিতা (৩) ঈশ্বররূপে প্রকাশিত।

তাঁহার দুই রূপ প্রকৃতি, এক দৈবী, পরা বা জীব প্রকৃতি, যাহা হইতে ভূত বা ভোক্তা পুরুষ, ক্ষর ক্ষেত্রজ্ঞ বীজরূপে উদ্ভূত। আর এক অপরা বা ত্রিগুণাত্মক জড় প্রকৃতি, যাহা হইতে জগৎযোনি মহান্ বা চৈতন্য পরিণাম পর্য্যন্ত ক্ষেত্র উদ্ভূত হইয়া বিকৃত হইয়া জড়-জগৎ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সনাতন জীবভূত অংশ (গীতা ১৫।৭) জগৎ ধারণ করে (৭।৫) আবার মহালয় কালে ঈশ্বরে লীন হয়। (৮।১৯) অথচ এই পুরুষ

কৌমার যৌবন জরা এ দেহে যেমন—
সেইরূপ দেহীগণ দেহান্তর পায়,
তাহে কভু বীরগণ নহে মুগ্ধ মন। ১৩

শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ দেয় ধনঞ্জয়
ইন্দ্রিয়ে-বিষয়-বোধে; অনিত্য এ সব,—
জন্মে'—হয় লয়, তাহে হ'ও না অধীর। ১৪
হে পার্থ যে জন ইথে নহে বিচলিত,
সেই ধীর,—সুখ দুঃখ সম-জ্ঞান যার,
অমরতা লভিবার যোগ্য সেই জন ॥১৫
অমৃতের (স্থায়ী) ভাব, অথবা সতের

প্রকৃতি রূপ ঈশ্বরের ভাব অনাদি (১৩।১৯) তবে ইহা কেবল সৃষ্টিকালেই নিত্য ও প্রকট অবস্থায় থাকে। (৯।৮)। এই তত্ত্ব বুঝিলে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে জীবাত্মার স্বরূপ বা সাংখ্যজ্ঞান কথিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে গোলযোগ হইবে না। এবং গীতার দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও বহুপুরুষবাদ প্রভৃতির কিরূপ সামঞ্জস্য হইয়াছে বুঝা হইবে।

(১৩) দেহান্তর প্রাপ্তি—সাংখ্য মতে শরীর দুই প্রকার—সূক্ষ্ম শরীর এবং স্থূল বা মাতা-পিতৃজ শরীর। মৃত্যুতে কেবল স্থূল বা অন্নময় শরীর ধ্বংস হয়। জীবাত্মা সূক্ষ্ম শরীর সহিত এ জীবনের ও পূর্ব্ব জীবনের সংস্কার গুলিতে বদ্ধ হইয়া প্রয়াণ করে। বেদান্ত মতে কারণশরীর ও লিঙ্গশরীর আত্মাকে বদ্ধ করে। কারণশরীর দেবতার, আর লিঙ্গশরীর মনুষ্যের। এই শরীর পাঁচটী কোষ বা আবরণময়—যথা অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দময় কোষ। মৃত্যুতে কেবল অন্নময় কোষ ধ্বংস হয়। মোক্ষ লাভেই সকল কোষ গুলিই ধ্বংস হয়, পুরুষ এই শরীর হইতে ভিন্ন। (সাংখ্যদর্শন ১।১৩৯)

দেহী—(১৮ শ্লোকে আছে শরীরী) লিঙ্গশরীর ধারী জীবাত্মা (মধু); মধুসূদন আরও অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া ইহার অর্থ করেন,—এক ব্রহ্মেরই ভোগ জন্য অধ্যাস হেতু সমস্ত জগতে নানারূপ শরীর-ধারী পরমাত্মা।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—"অন্নময়াদ্যানন্দময়ান্তং পঞ্চকোষান্ কল্পয়িত্বা তদধিষ্ঠানম্ কল্পিতং ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" ব্যষ্টি পুরুষের ন্যায় সমষ্টি আত্মার বা অব্যয় পুরুষ ঈশ্বরের পঞ্চকোষময় দেহ আছে। যথা, (১) পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত ও তাহার কার্য্যাত্মক স্থূল সমষ্টিই অন্নময় কোষ ইহাই বিরাট মূর্ত্তি। (২) উহার কারণ স্বরূপ অপঞ্চীকৃত পঞ্চসূক্ষ্মভূত ও তাহার কার্য্যাত্মক ক্রিয়াশক্তি সহ প্রাণময় কোষ। (৩) তাহার নাম মাত্রাত্মক সমষ্টি জ্ঞান শক্তি মনোময় কোষ। এবং (৪) তাহার স্বরূপাত্মক বিজ্ঞানময় কোষ। এই প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান কোষ বা সূক্ষ্ম সমষ্টিই হিরণ্যগর্ভাখ্য লিঙ্গশরীর। আর (৫) উহার কারণাত্মক মায়াউপহিত চৈতন্য সর্ব্বসংস্কার শেষ আত্মাই অব্যক্ত নামক আনন্দময় কোষ। (মধু)

বলদেব বলেন—দেহী অর্থাৎ দেহ স্বভাব জীব কর্ম্ম বিপাকে স্বরূপজ্ঞ জীব।

(১৪) ইন্দ্রিয়ে-বিষয়-বোধে—মূলে আছে মাত্রা স্পর্শ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের অনুভব। স্বামী বলেন, মাত্রা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় তাহার সহিত বাহ্য বিষয়ের স্পর্শ বা সম্বন্ধই আমাদের সুখ দুঃখানুভূতির কারণ। শঙ্কর বলেন, যাহার দ্বারা শব্দাদি বাহ্য বিষয় সকল পরিমাণ বা মনন করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়গণই মাত্রা। এবং শব্দাদি বাহ্য বিষয়ের সহিত সংযোগই স্পর্শ, কিম্বা যে বিষয়কে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় তাহাই স্পর্শ। এই মাত্রা এবং স্পর্শ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং তাহার বিষয় (অথবা সংযোগ) এই উভয় আমাদের সুখ দুঃখের কারণ। ইহার মধ্যে প্রথম অর্থই অধিক সঙ্গত। রামানুজ বলেন, আশ্রয় হেতু ও কার্য্য হেতু ইন্দ্রিয়গণকে মাত্রা বলে। টীকাকার রাঘবেন্দ্র বলেন মাত্রা অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়।

অনিত্য—যাহার উৎপত্তি ধ্বংস আছে, তাহাই অনিত্য। (ভাষ্য)

(১৫) দুঃখে বিচলিত—পাতঞ্জল দর্শনে আছে "ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ।" আত্মার সহিত সুখ দুঃখাদির কারণ ভূত প্রকৃতির সংযোগ উচ্ছেদ করিতে পারিলেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।

(পাতঞ্জল দর্শন ৬৭)।

(১৬) অসতের ভাব—অসৎ, অর্থাৎ পরিণামী দেহাদি; সৎ, অর্থাৎ অপরিণামী আত্মা। (বলদেব)। অসৎ, অর্থাৎ অবিনাশ কর্ত্তা আত্মা, অসৎ অর্থাৎ

(অস্তিত্বে) অভাব নাহি হয় কভু; হেরে—
স্বরূপ এ উভয়ের তত্ত্বদর্শীগণ। ১৬
যাহে ব্যাপ্ত এই সব—জানিও নিশ্চয়
তাহা অবিনাশী ; কেহ কভু নাহি পারে
অব্যয় ইহার নাশ করিতে সাধন। ১৭

অবিনাশী অপ্রমেয় নিত্য এ দেহীর
বিনশ্বর এই দেহ আছয়ে কথিত ;
অতএব হে ভারত, করহ সমর। ১৮
যে ইহারে ভাবে হন্তা, কিম্বা যেই ভাবে
নিহত ইহারে, তারা উভয়ে না জানে
নাহি হয় হত ইহা, নহে হন্তারক। ১৯
ইহা কভু না লভে জনম,
মৃত্যু কভু নাহিক ইহার,
জন্মি পুনঃ অস্তিত্ব না হয়;
নিত্য ইহা জনম-বিহীন,
পুরাতন, সদা একরূপ,
দেহ নাশে না হয় বিনাশ। ২০

বিনাশ স্বভাব-দেহ। (রামানুজ)। যাহার কারণ আছে, ও কারণ ব্যতীত উপলব্ধি হয় না, যাহা বিকারী তাহা অসৎ ; এই জন্য শীতোষ্ণাদি অসৎ। এবং যাহা নিত্য, যাহা সৎ, সেই আত্মার বিনাশ বা অভাব হয় না। (শঙ্কর)। যাহা শূন্য, যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাই অসৎ (গিরি)। যাহার বিদ্যমানতা নাই, যাহা আত্মার ধর্ম্ম নহে, তাহাই অসৎ। এস্থলে শীতোষ্ণাদিকে সৎ বলা হইয়াছে (গিরি)। অতএব এই সকল অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, যাহা কারণ হইতে জাত ও কারণে লয় হয় (নাশঃ কারণ লয়ঃ) (যেমন সুখ দুঃখাদি) কিম্বা যাহা পরিণাম ধর্ম্মী (যেমন দেহ) তাহাই অসৎ। আর আত্মা সৎ। সৎ বস্তুর ভাব বা অবস্থা নিত্য, অসৎ বস্তুর ভাব (বা অভাব) অনিত্য। সৎ আত্মার ভাবের সহিত অসদ্বস্তু (দেহ বা সুখদুঃখ ভাব) নিত্য সম্বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং রণে আত্মীয়ের মৃত্যু হইবে অর্থাৎ অসৎ দেহের বিনাশ বা অভাব সেই সকল লোকের আত্মাকে স্পর্শ করিবে অর্থাৎ তাহারাও ধ্বংস হইবে, এরূপ দুঃখের কারণ হইতে পারে না এবং সেরূপ দুঃখ অর্জ্জুনের আত্মাকে নিত্যরূপে স্পর্শ করিতে পারিবে না, ইহাই এস্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে।

এস্থলে অসৎ প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "নাসতো সৎ জায়তে" "নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ" "Ex nihilo nihil fit" প্রভৃতি স্থানে অসৎ, অবস্তু বা nihil যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এস্থলে অসতের অর্থ ঠিক সেরূপ নহে। অর্থাৎ "যৎ অসৎ শব্দেনাভিধানং তৎ অব্যাকৃতত্বাভিধানাভিপ্রায়ং ন তু অত্যন্তাভাবাভিপ্রায়ং। ইংরাজীতে যাহাকে Phenomena, Conditioned বা existance বলে, তাহাই অসৎ।

তত্ত্বদর্শী—(তৎ) সৃষ্ট বা ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানী (শঙ্কর); বস্তুর যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ (স্বামী)।

(১৭) এই সব—অর্থাৎ এই সব দেহ (বলদেব); এই জগৎ (শঙ্কর)।

(১৮) নিত্য—সর্ব্বদা একরূপে স্থিত।(স্বামী)।

অপ্রমেয়—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অতীত। অপরিচ্ছিন্ন। সর্ব্ব প্রকার পরিচ্ছেদ শূন্য। মধুসূদন বলেন, পরিচ্ছেদ তিন প্রকার—দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদ। স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদে বস্তুপরিচ্ছেদ তিন প্রকার। কেহ বলেন, বস্তু পরিচ্ছেদ পাঁচ প্রকার, যথা জীব ঈশ্বরে ভেদ, জীব জগতে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, ঈশ্বর জগতে ভেদ ও জগৎ পরমাত্মায় ভেদ।

করহ সমর—যুদ্ধ রূপ কর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা হইতে বিমুখ হইও না (শঙ্কর)।

(১৯) নহে হন্তারক—কর্ত্তা বা কর্ম্ম হয় না অর্থাৎ সর্ব্ব বিক্রিয়া শূন্য। (মধু)

নিম্নোদ্ধৃত কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর ১৯ শ্লোক দেখ—"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥"

(২০) কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর ১৮ শ্লোক যথাঃ
"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্য শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

জন্মি পুনঃ অস্তিত্ব—মূলে আছে, "নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ" কেহ কেহ পাঠ করেন "ভূত্বা অভবিতা বা ..", আত্মার ভবন (জন্ম) ক্রিয়া অনুভবের পর পুনঃ তাহার অভাব (অভবিতা) হইবে

হেন নিত্য, অবিনাশী, অজন্ম অব্যয়,
ইহারে জেনেছে যেই, কেমনে সে জন
সাধিবে কাহার বধ, বধিবে বা কারে? ২১
ত্যজি যথা পুরাণ বসন,
নব বাস পরে নরগণ—
জীর্ণ দেহ ত্যজিয়া তেমতি,
দেহীগণ করয়ে ধারণ
পুনঃ অন্য নূতন শরীর। ২২
নারে অস্ত্র ছেদিতে ইহারে, নাহি পারে
দহিতে পাবক, আর্দ্র নাহি করে বারি,
না পারে পবন ইহা করিতে শোষণ। ২৩
'অভেদ্য' 'অদাহ্য' ইহা 'অক্লেদ্য' অশোষ্য,
নিত্য, সর্ব্বগত, স্থির, অনাদি, অচল। ২৪
অচিন্ত্য অব্যক্ত ইহা হয় অবিকারী ;—

না। কিম্বা পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব না থাকিয়া একেবারে জন্ম গ্রহণ করিবে না। ইহার দ্বারা আত্মার জন্ম মৃত্যু হীনতার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (শঙ্কর); অথবা আত্মা কখন জন্মে নাই, কখন ভবিষ্যতেও জন্মিবে না, কিম্বা আত্মা একবার জন্মিয়া পুনর্ব্বার জন্মিবে তাহা নহে। স্বামী বলেন জন্মগ্রহণ করিয়া সাধারণতঃ বস্তু সকল যেমন অস্তিত্ব লাভ করে, অন্যথা তাহার অস্তিত্ব থাকে না—আত্মা সেরূপ নহে। অনুবাদ কালে এই অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে। রামানুজ বলেন, ইহা কল্পাদিতে জন্মিয়া পুনর্ব্বার কল্পান্তে বিনাশ হইবে তাহা নহে—এ অর্থ গীতার ৮। ১৯ শ্লোকের সহিত সঙ্গত নহে।

শঙ্কর বলিয়াছেন, এই শ্লোকে সাধারণ লৌকিক বিষয় যেমন ছয় প্রকার বিকৃত হয়—আত্মার সেরূপ হয় না, ইহাই দেখান হইয়াছে। স্বামী দেখাইয়াছেন, জন্ম, মরণ জন্মপরে অস্তিত্ব গ্রহণ বৃদ্ধি, ক্ষয় ও পরিণাম, ইহাই উক্ত ছয় প্রকার বিকৃতি।

পুরাতন—অতীত কালে বরাবর বিদ্যমান ছিল। সদা একরূপ—(শাশ্বত) ভবিষ্যতে বরাবর একরূপ থাকিবে। (স্বামী)। অথবা প্রকৃতির ন্যায় পরিণামী নহে (রামানুজ)।

(২১) নিত্য—পরিণাম রহিত। অবিনাশী,—অভাব বা বিকারহীন। অব্যয়—উপচয় অপক্ষয় রহিত। (শঙ্কর)। কাহার বধ—আত্মা নিষ্ক্রিয় ও অকর্ত্তা বলিয়া বধ করে না বা করায় না,—এবং নিত্য বলিয়া বধ্য হয় না।

(২২) অন্য নূতন শরীর—অতি সুখকর যুবা বা দেব শরীর। রণে যাহার স্থিত, তাহার রণে হত হইয়া স্বর্গে দেব শরীর ধারণ করিতে পারে (বলদেব)।

অর্জ্জুন মনে করিতে পারেন, আত্মার বিনাশ না হইলেও ত শরীর বিনাশরূপ ক্ষতি হয়, আমি কেন তাহার কারণ হইব, ইহার উত্তর এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

(২৩) নারে অস্ত্র—অস্ত্র (শস্ত্র)—খড়্গাদি, পাবক—আগ্নেয়াস্ত্র। বারি—আগ্নেয়াস্ত্র। পবন—বায়ব্যাস্ত্র—যে সকল যুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। (বলদেব)

(২৪) অভেদ্য—আত্মার নিরবয়বত্ব বা সূক্ষ্মত্ব বুঝাইবার জন্য ইহা উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। স্থির—রূপান্তরাপত্তি শূন্য। অচল—দৃঢ়রূপ অপরিত্যাগ। সর্ব্বগত—সর্ব্বব্যাপী। সনাতন—চিরন্তন বা অনাদি। (স্বামী)। স্বকর্ম্ম হেতু দেব মানব পশু পক্ষী প্রভৃতি সর্ব্ব শরীরে পর্য্যায়ক্রমে প্রবর্ত্তমান (বলদেব)। অচিন্ত্য অব্যক্ত—অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের অবিষয়।

(২৫) এইরূপ জানিয়া ইহার—পূর্ব্বোক্ত কয় শ্লোকের কোন স্থানে 'আত্মা' কথার উল্লেখ নাই। 'দেহী', "শরীরী" আর "ইহা" এই তিনটী কথা মাত্র ব্যবহৃত আছে। সুতরাং দেহে অবস্থিত জীবাত্মাই ইহা দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। এই জীবাত্মা বা পুরুষের যে সকল বিশেষণ কঠোপনিষদে ও সাংখ্য দর্শনে আছে, এই সব শ্লোকে তাহাই পাওয়া যায়।

সাংখ্য দর্শনে আছে, পুরুষ অসঙ্গ (১।১৫) নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব (১।১৯) নিষ্ক্রিয় (১।৪৯) নির্গুণ (১।৫৪) দ্রষ্টা বা সাক্ষি (১।১৬১) উদাসীন (১।১৬৩) সাংখ্য তত্ত্বসমাসের ব্যাখ্যায় আছে, "পুরুষ অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্ব্বগত, চেতন অগুণ, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা, ক্ষেত্রবিদ্, অমল ও অপ্রসবধর্ম্মী। পুরাণ বলিয়া, পুরীতে (দেহ বা প্রকৃতিতে) শয়ন করে বলিয়া অথবা

অতএব এইরূপ জানিয়া ইহায়,
শোক করা কভূ নহে উচিত তোমার। ২৫

পুরোহিত বা সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী বলিয়া ইহাকে "পুরুষ" বলে। ইহার আদি অন্ত মধ্য নাহি বলিয়া, ইহা 'অনাদি', নিরবয়ব ও অতীন্দ্রিয় বলিয়া ইহা 'সূক্ষ্ম'; সর্ব্বস্থানে বিরাজমান বলিয়া এবং গগনবৎ অনন্ত ব্যাপ্ত বলিয়া ইহা "সর্ব্বগত"।

জর্ম্মন পণ্ডিত ক্যান্ট যেমন দেখাইয়াছেন 'দেশ' ও 'কালের' অস্তিত্ব জ্ঞান ও মনের, তাহার বাহ্য অস্তিত্ব নাই। সেইরূপ সাংখ্যকার বলেন "দিক্ কালাবাকাশ দেভ্য" অর্থাৎ 'দেশ' 'কাল' প্রকৃতিজ আকাশের গুণ উহার নিত্য বা স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। আত্মা এই দিক্ কাল অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে বলিয়া ইহা 'সর্ব্বগত'। সুখ দুঃখ মোহ উপলব্ধি করে বলিয়া এই আত্মা "চেতন"। ইহাতে সত্ব রজ তমঃ গুণ আশ্রয় করে না বলিয়া ইহা "নির্গুণ"। ইহা সৃষ্ট বা উৎপাদ্য নহে বলিয়া "নিত্য"। প্রকৃতির বিকার উপলব্ধি করে বলিয়া "দ্রষ্টা"। চেতন জন্য সুখ দুঃখ পরিজ্ঞাত হয় বলিয়া "ভোক্তা"। উদাসীন ও অগুণ

কিম্বা যদি মহাবাহু ভাবহ ইহার,
নিত্য জন্ম হয়, আর নিত্য হয় নাশ,—
তথাপি ইহার তরে শোক অনুচিত। ২৬

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

বলিয়া ইহা "অকর্ত্তা"। ক্ষেত্র ও গুণ বুঝিতে পারে বলিয়া ইহা "ক্ষেত্রজ্ঞ"। ইহাতে শুভাশুভ কর্ম্ম নাই বলিয়া "অমল"। নির্ব্বীজ বলিয়া ইহা অপ্রসবধর্ম্মী। এই পুরুষের নামান্তর আত্মা, পুমান, পুংগুণজন্তুজীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, নর, কবি, ব্রহ্ম, অক্ষর, প্রাণ, যে, কে, সে, এই, ইহা, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উক্ত আছে।"

(২৬) নিত্য জন্ম হয়—এই লোকপ্রসিদ্ধ সাধারণ বিশ্বাসে যদি তোমার আস্থা থাকে। (শঙ্কর) অথবা যদি পাঞ্চভৌতিক (স্থূল ভূত হইতে মদশক্তির ন্যায় জাত) বলিয়া আত্মাকে ধরিয়া লও—কিম্বা বৌদ্ধদের মত দেহ হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা প্রতিক্ষণ বিনাশ হইতেছে বলিয়া লওয়া যায় (বলদেব); দেহের সঙ্গে আত্মার জন্ম ও দেহ নাশে আত্মার নাশ হয়, মনে কর (স্বামী) সৌগত লোকায়তিক ও চার্ব্বাকদিগের এইরূপ মত।

জীব গোস্বামী।

ইতিপূর্ব্বে নব্যভারতে, রূপ ও সনাতন গোস্বামীর বৃত্তান্ত এক্ষণে যতদূর জানা যায়, তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ঐ সংগ্রহে জীব গোস্বামী কৃত রূপ ও সনাতনের বংশাবলীর কোন উল্লেখ করি নাই বলিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইয়াছেন। আমার বিবেচনায় উক্ত বংশাবলী বিশ্বাস যোগ্য নহে।

জীব গোস্বামী রূপসনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র। এ দেশে যেমন চৌকীদারের পুত্র চৌকিদার, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হয়, তেমনি ভক্তের সন্তানও ভক্ত না হইবে কেন? জীব ও একজন তাদৃশ ভক্ত ছিলেন। রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনে তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজের প্রধান বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাঁহাদের জীবনান্তে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে সেই প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের গুণ কিরূপ ছিল তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়।

৺ জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের স্বপ্রকাশিত চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের প্রথমে কৃষ্ণদাস কবিরাজের একটী সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত দিয়াছেন। চৈতন্যের প্রতি এবং গৌরাঙ্গ ভক্তের প্রতি গুপ্ত মহাশয়ের গভীর শ্রদ্ধা থাকিলেও তিনি জীবের চরিত্র প্রকৃত পক্ষে যেরূপ ছিল তাহা চিত্রিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। 'বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করিলে জীব গোস্বামী অসূয়া পরবশ হইয়া তাহা বিনষ্ট করিতে চেষ্টা

করিয়াছিলেন; এই বৃত্তান্ত গুপ্ত মহাশয় এই রূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

"রাধাকুণ্ড তীরে গ্রন্থ প্রণয়ন পরিসমাপ্ত হইলে, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য কৃষ্ণদাস অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তৎকালের নিয়মানুসারে গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে স্থানীয় প্রধান প্রধান মান্য ব্যক্তির অনুমতি লইতে হইত। তাঁহারা গ্রন্থপাঠ করিয়া যদি প্রকাশ-যোগ্য বিবেচনা করিতেন, তবে গ্রন্থ শেষে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতেন; তখন সে গ্রন্থ সাধারণে লিখিয়া লইতে পারিত। তৎকালে জীব গোস্বামী বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণব-সমাজের অভিনেতা ছিলেন। বৃদ্ধ কবিরাজ গ্রন্থখানি সঙ্গে লইয়া জীবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ইহা পাঠ করিতে ও প্রকাশের অনুমতি দিতে অনুরোধ করিলেন। জীব গোস্বামী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলেন যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য ও চৈতন্যোপদেশ সকল বঙ্গ ভাষায় বিবৃত হইয়াছে; তাহা অবলীলা ক্রমে সাধারণের আয়ত্তাধীন হইবে, অথচ রূপ সনাতন ও তাঁহার স্বরচিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অপ্রচারিত থাকিবে, কেহ আর সে সকল আদর করিবে না। এই আশঙ্কা করিয়া ক্ষুদ্রচেতা জীব গোস্বামী কোপাবিষ্ট হইয়া যমুনার জল স্রোতে ঐ গ্রন্থ নিক্ষেপ করিলেন। বর্ণিত আছে যে গ্রন্থ ভাসিতে ভাসিতে মদনমোহনের ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছিল। তখন জীব গোসাঞী তাহা তুলিয়া আনিয়া গোস্বামী-দিগের অপর অপর গ্রন্থের সামিল একটী কুঠরীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কেহ কেহ বলেন যে সাধারণে গ্রন্থের আশ্চর্য্য মহিমা প্রতিপন্ন করিবার জন্য জীব গোস্বামী এই কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। *যাহাহউক বৃদ্ধ বয়সের বহু যত্নের ধন গ্রন্থের এইদশা হইল দেখিয়া কৃষ্ণদাস মর্ম্মাহত হইয়া শোকাকুল চিত্তে মথুরায় গমন করিলেন, এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা এই খেদ করিতে লাগিলেন যে সাধারণে পড়িবে বলিয়া তিনি বহুযত্নে যে গ্রন্থ রচনা করিলেন—তাহা প্রকাশিত হইল না ও শ্রীচৈতন্যেরও শেষ-লীলা অপ্রচারিত রহিয়া গেল।

এই সময়ে মুকুন্দ দত্ত নামে জনৈক শিষ্য তাঁহাকে জানাইলেন যে, যখন চৈতন্য চরিতামৃত রচিত হইতেছিল—তাহার এক এক পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইলে, তিনি (মুকুন্দ) উহা চাহিয়া লইয়া এক এক প্রস্থ নকল করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে সমস্ত গ্রন্থের প্রতিলিপি তাঁহার নিকটে রহিয়াছে। ইহা শ্রবণে বৃদ্ধ কবিরাজের আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনি ঐ প্রতিলিপি খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সংশোধনান্তে তাহা গোপনে রাখিয়া দিলেন। ইত্যবসরে শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর বঙ্গদেশ হইতে শ্রীবৃন্দাবন আসিয়া উপনীত হইলেন। এবং কৃষ্ণদাসের বাচনিক গ্রন্থ বিবরণ আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া জীবকে তাহা জানাইলেন, এবং ঐ গ্রন্থের টীকা করিয়া তাহা প্রচার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। জীব গোস্বামী অগত্যা কবি কর্ণপুরের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়া কুঠরী হইতে গ্রন্থ বাহির করতঃ তাহাতে অনুমোদন স্বাক্ষর করিলেন এবং প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে চৈতন্য চরিতামৃত পর্য্যন্ত লিখিত ছিল, তিনি 'কহে কৃষ্ণদাস' ভণিতা বসাইয়া দিলেন।

তখন বৃন্দাবনবাসীগণ সকলে ঐ গ্রন্থ লিখিয়া লইলেন এবং ব্রজধামে উহা প্রচারিত হইয়া গেল। কিন্তু জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ এ গ্রন্থ বঙ্গদেশে পাঠাইতে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় কৃষ্ণদাস মুকুন্দ দ্বারা পূর্ব্বলিখিত নকলটি নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। তদবধি উহা ক্রমে ক্রমে এদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। কৃষ্ণদাসের স্বহস্ত লিখিত মূলগ্রন্থ * * * * এ দেশে কখন আইসে নাই।"

গুপ্ত মহাশয় জীব গোস্বামীকে "ক্ষুদ্র-চেতা" বলিয়া যে তিরস্কার করিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে। আসলবৃত্তান্ত এই যে, চৈতন্যচরিতামৃতের উপর ক্রুদ্ধ হইবার জীবের অপর এক কারণ ছিল; গুপ্তমহাশয় তৎপ্রতি লক্ষ্য করেন নাই। গৌরাঙ্গ যৎকালে জীবিত ছিলেন, সেই সময় হইতেই রূপ ও সনাতন জাতিতে মুসলমান বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা বিবেচনা করেন যে রূপ ও সনাতন, ইহা ঐ দুই ব্যক্তির পিতৃ-

* বৈষ্ণবেরা স্বীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যদের চরিত্রে কোন দোষ দৃষ্ট হইলে এইরূপ ওকালতি করেন।

দত্ত নাম তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। চৈতন্য ভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবন দাস লেখেন

"শেষ খণ্ডে শ্রীগৌরসুন্দর মহাশয়।
দবির খাসেরে প্রভু দিলা পরিচয়॥
প্রভু চিনি দুই ভাই বন্ধ বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন রূপ সনাতন॥"

এখানে কোনও কূটার্থ করিবার আবশ্যকতা দেখিনা——দুই ভ্রাতাকে উদ্ধার করিয়া—"শেষে" চৈতন্য তাহাদিগকে রূপ ও সনাতন নাম প্রদান করিলেন। চৈতন্যের নিজ নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র। তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলে তদীয় গুরু তাঁহাকে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" এই নাম প্রদান করেন। দবীর খাস ও সাকের মল্লিক গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের গুরু চৈতন্যদেব তাঁহাদের বৈষ্ণবোচিত নূতন নাম রক্ষা করিলেন, ইহাই সরল অর্থ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজও স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—

"শুনি মহাপ্রভু কহে শুন দবীর খাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি দোঁহার নাম রূপসনাতন।
ইত্যাদি।

সরল শব্দের সরল অর্থ বুঝিলে দেখা যায় যে পূর্ব্বাশ্রমে রূপ সনাতনের অন্য নাম ছিল। তাহা না হইলে "আজি হইতে" চৈতন্যমুখে এ রূপ বাক্য কেন বহির্গত হইবে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভূরি ভূরি স্থানে রূপ সনাতনকে ম্লেচ্ছজাতি—নীচজাতি—এইরূপ শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণদাসের প্রতি জীব গোস্বামীর ক্রোধের ইহাই নিগূঢ় কারণ বলিয়া বোধ হয়।

ফলতঃ গৌরাঙ্গের সমাজে প্রথমতঃ জাতিভেদ একবারে না হউক—কিয়ৎ পরিমাণে উঠিয়া গিয়াছিল। গৌরাঙ্গের জীবদ্দশায় ও অব্যবহিত পরে নীচ জাতি হওয়া যে বিশেষ কোন অশ্লাঘার কারণ ছিল তাহা নহে। বরঞ্চ নীচ জাতি হইয়াও যাহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা প্রশংসার পাত্র ছিল। সুতরাং রূপ সনাতনের প্রকৃত বৃত্তান্ত লিখিতে কৃষ্ণদাসের চিত্তে বিশেষ দ্বিধা হয় নাই কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার ঐ রূপ লেখা লইয়া বৈষ্ণব সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। জীব গোস্বামী হইতেই এই হুলস্থূল আরম্ভ। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ পাঠ করিলেও জানা যায়, বৈষ্ণব সমাজে অনেকে তৎকালে রূপ ও সনাতনকে মুসলমান জাতি বলিয়া বিবেচনা করিত। উক্ত গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করিয়া ম্লেচ্ছজাতি ও নীচজাতি শব্দের অর্থ উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং যে বৈষ্ণবগণ রূপ সনাতনকে ম্লেচ্ছজাতি বলে, তাহাদের উপর তীব্র গালিবর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"সনাতন রূপ দৈন্য না বুঝি পারিতে।
মূর্খগণ ইথে তর্ক করে নানামতে॥
মহাঘোর নরক যাইতে যার সাধ।
সে করুক ঐছে কুতর্কাদি অপরাধ॥" ইত্যাদি।

ফলতঃ সনাতনকে মুসলমান বলিলে দোষ কি হয়? হরিদাসও ত মুসলমান ছিলেন? তবে ভক্তিরত্নাকরের এত ক্রোধ কেন? রূপ সনাতনের ম্লেচ্ছাপবাদ ঘুচাইবার জন্যই জীবগোস্বামীর বংশাবলী রচনা। এই বংশাবলী কতদূর প্রামাণিক, তাহা প্রমাণান্তর না পাইলে, নিশ্চয় করা কঠিন। তাদৃশ প্রমাণান্তর আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। সুতরাং আমি এপর্য্যন্ত উক্ত বংশাবলীকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই, এবং আমার সংগ্রহে উহা উল্লেখ করা হয় নাই।

এক্ষণে ভক্তিরত্নাকরের পক্ষ সমর্থন মূলক ব্যাখ্যা কতদূর শ্রদ্ধেয় অর্থাৎ সনাতন যে, আপনাকে নীচজাতি ও ম্লেচ্ছজাতি বলিয়া পরিচয়

দিতেন, তাহা দৈন্যোক্তি মাত্র কি প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ—চৈতন্যের চক্ষে মনুষ্যমাত্রেই জাতিনির্ব্বিশেষে সমান বলিয়া পরিগণিত। তিনি ব্রাহ্মণকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা করিতেন না—চণ্ডালকেও চণ্ডাল বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন না। কৃষ্ণভক্ত হইলেই মনুষ্যকে তিনি আদর করিতেন। ঈদৃশ মহানুভব ব্যক্তির নিকট কেবল আপনার জাতির হীনতা দেখাইলে দৈন্য প্রকাশ কিরূপে হয়? কোনও নিষ্ঠাযুক্ত ব্রাহ্মণ আপনাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া পরিচয় দিলে তাহাতে দৈন্যোক্তি কি প্রকাশ পায়?

দ্বিতীয়তঃ—সনাতন নিভৃতে আপন মনোমধ্যে আপনাকে কিরূপ দেখিতেন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে প্রকাশ। তিনি মথুরা হইতে পুরীতে চৈতন্যকে দেখিতে যাইতেছেন। পথক্লেশে শরীরে রোগ জন্মিল। তখন কবিরাজ গোস্বামী লেখেনঃ—

"নির্ব্বেদ হইল পথে—করেন বিচার।
নীচজাতি—দেহ মোর অত্যন্ত অসার॥
জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাইব।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব॥
মন্দির নিকটে শুনি তাঁর বাসা স্থিতি।
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি।
জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য অনুরোধে।
তাঁর স্পর্শ হইলে মোর হইবে অপরাধে॥"ইত্যাদি।

ইহাকে আর দৈন্যোক্তি বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। ইহা তাঁহার হৃদয়ের কথা। তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন যে, জগন্নাথ মন্দিরে তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই, এমন কি মন্দিরের নিকটে গেলেও দোষ বলিয়া পরিগণিত হইবে—কেন না জগন্নাথের পূজারি পরিচারকগণ যদি দৈবাৎ তাঁহাকে স্পর্শ করে, তবে তাঁহার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। প্রণিধানের বিষয় এই যে, গৌরাঙ্গের ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেবল তিনজন—হরিদাস, রূপ ও সনাতন জগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইতেন না। ইহার কারণ তিন জনের পক্ষেই সমান ছিল। হরিদাস যে পূর্ব্বে মুসলমান ছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। রূপ ও সনাতনও স্পষ্টাক্ষরে প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে ব্রাহ্মণত্ব বিবর্জ্জিত ম্লেচ্ছ বলিয়া কীর্ত্তিত। সনাতন স্পষ্ট বলিয়াছেন, জগাই মাধাইয়ের ব্রাহ্মণত্ব ছিল—তাঁহার তাহাও ছিল না। হরিদাসের ন্যায় তাঁহারাও যে মুসলমান হইয়াছিলেন, ইহাই সরল তাৎপর্য্য।

তৃতীয়তঃ—চৈতন্য নিজে রূপসনাতনকে নীচ জাতি বলেন কেন? চৈতন্যের মুখে আর সে কথা দৈন্যোক্তি বলা যায় না। সনাতন আত্মহত্যার ইচ্ছা করিলে চৈতন্য তাঁহাকে বলিতেছেন—

"কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাত পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন॥
"নীচ জাতি" নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুলবিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥" ইত্যাদি।

সনাতন আপনাকে "নীচ জাতি" বলিয়া বিবেচনা করিয়া দেহত্যাগের কল্পনা করেন; চৈতন্য তাই বলিতেছেন তুমি "নীচজাতি" তাহাতে ক্ষতি কি? কৃষ্ণ ভজনে জাতি বিচার নাই। তুমি যদি ব্রাহ্মণ হইতে, তাহা হইলেই কৃষ্ণ ভজনের যোগ্য হইতে না। ব্রাহ্মণ নহ, নীচ জাতি হইতেছ—তাহাতেও অযোগ্য নহ। ইহা সরল অর্থ। এস্থলে চৈতন্যও বলিতেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সনাতন নীচজাতি বটেন।

আর একস্থলে চৈতন্যের নিজ মুখে সনাতনের জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্য সমুদ্রতীরে বৈষ্ণবদিগকে নিমন্ত্রণ করেন;

সনাতনও নিমন্ত্রিত হইলেন। জগন্নাথের সিংহ দ্বারের সম্মুখ দিয়া প্রশস্ত ও সোজা পথ; কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সে পথে যবনের যাইবার অধিকার ছিল না। তখনও উৎকলে হিন্দু রাজত্ব প্রবল। সুতরাং সনাতনকে ঘুরিয়া উত্তপ্ত বালুকাপথে যাইতে হইল; তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়িয়া গেল। মহাপ্রভু সনাতনকে এরূপ কেন করিলে জিজ্ঞাসায় সনাতন বলিতেছেন—

"সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ ঠাকুরের তাঁহা সেবক প্রচার॥
সেবক সব গতাগতি করে অবসরে।
কারও সহিত স্পর্শ হইলে সর্ব্বনাশ করে॥
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হঞা তাঁরে কিছু কহিতে লাগিলা॥
যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেবমুনিগণ॥
তথাচ ভক্তের স্বভাব মর্য্যাদা রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘিলে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে—তুষ্ট হৈল মোর মন।" ইত্যাদি।

এখানে মর্য্যাদা রক্ষার সরল অর্থ এই—যে নীচজাতি হইয়া, শ্রেষ্ঠ জাতির ন্যায় ব্যবহার না করা। সনাতন আপনার ম্লেচ্ছত্ব অঙ্গীকার করিয়া যে বলিয়াছিলেন, ইহাতে মহাপ্রভু প্রীত হইয়াছিলেন।

অতএব বিবেচনা হয় যে, কৃষ্ণদাস রূপসনাতনকে যে নীচজাতি বলিয়া বারম্বার কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কেবল দৈন্যোক্তি নহে। জীবগোস্বামীর সে কথা ভাল না লাগায় তিনি কৃষ্ণদাসের চৈতন্য চরিতামৃতকে যমুনায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন!

গৌরাঙ্গ ভক্তগণের সমাজে ইতিহাসের মর্য্যাদা কিরূপ, তাহা জীবগোস্বামীর ব্যবহারে প্রকাশ। কৃষ্ণদাস সত্যকথা লেখায় তাঁহার গ্রন্থ যমুনায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। যাহারা সত্য ছাপিতে পারে, তাহারা যে মিথ্যা লিখিতেও পারে, তাহা বলা বাহুল্য। এইজন্য বৈষ্ণবগ্রন্থে ইতিহাস খুঁজিতে গেলে সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন।

আমি লিখিয়াছিলাম যে, মালদহ জেলার অন্তঃপাতি মোরগ্রাম মাধাইপুরে রূপসনাতনের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়, এবং তাঁহারা ঐ স্থানে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। একজন প্রতিবাদকারী বলেন, "মোরগ্রাম মাধাইপুরে রূপসনাতনের বাল্যকাল অতিবাহিত হয় নাই; পূর্ব্ববঙ্গের বাকলা চন্দ্রদ্বীপ ও ফতোয়াবাদ গ্রামে পিতৃভবনে ইহারা লালিত পালিত হইয়াছেন।" মালদহ জেলার প্রাচীন গৌড়নগরের অন্তঃপাতি চণ্ডীপুর নিবাসী মহাবৈষ্ণবভক্তাগ্রগণ্য ধনকৃষ্ণ অধিকারী মহাশয় সনাতন ও রূপ গোস্বামীর যে জীবন চরিত্র লিখিয়াছেন, তাহাই আমার উক্তির মূল। উক্ত লেখক বলেন যে, বাকলা চন্দ্রদ্বীপে পাত্রী অভাবে কুমার দেবের বিবাহ না হওয়ায় একজন ঘটক গৌড়দেশে আসিয়া মাধাইপুরের হরিনারায়ণ বিশারদের রেবতী নাম্নী এক কন্যার সহিত কুমার দেবের সম্বন্ধ করেন, এবং কুমারদেব রেবতীর পাণি গ্রহণ করিয়া ঘরজামাতা হইয়া মাধাইপুরে বাস করিয়াছিলেন। অধিকারী মহাশয় লেখেন—

"উদ্বাহান্তে মুকুন্দদেব (কুমারদেবের পিতা) স্ববাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কুমারদেব শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া রাজধানী গৌড়নগরকে সমৃদ্ধি সম্পন্ন বিলোকনে, এবং সম্ভ্রান্তগণের প্রণয়পাত্র হওয়াতে মাধাইপুরে চিরবাসেই বাধ্য হইলেন। কুমারদেবের কালে তিন পুত্র হইল। জ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম রূপ, কনিষ্ঠ অনুপম বা বল্লভ। পৌগণ্ডকালে ইঁহাদের তিন সহোদরের ব্যাকরণাদিতে সত্বর ব্যুৎপত্তি জন্মিল। গৌড়নগর

হুসেনসাহ পাতসাহের রাজধানী, অতি সমৃদ্ধিশালী, এবং ইহাতে বহুদেশীয় বহুবিদ্যায় পারদর্শীগণের নিয়ত গতিবিধি হইত। সুতরাং অনায়াসেই বহুবিদ্যা শিক্ষোপযোগী অধ্যাপক পাইয়া বহুবিদ্যাতেই পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তথাপি শিক্ষা পদবী হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া অবশিষ্ট বিদ্যাশিক্ষা উদ্দেশে ভ্রাতৃত্রয় দেশান্তরে যাত্রা করিলেন। নানাদিগ্দেশ ভ্রমণ করতঃ চৌষট্টি বিদ্যার পারগ হইয়া যৌবনাবির্ভাবের প্রাক্কালেই প্রত্যাগমন করিলেন।"

এখানে প্রতিবাদকারী মহাশয়ের কথা সত্য, কি অধিকারী মহাশয়ের কথা সত্য, ঈশ্বর জানেন। সম্প্রতি বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রূপসনাতনের যে জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নবদ্বীপে অধ্যয়ন করা প্রকাশ আছে। ধনকৃষ্ণ অধিকারী মহাশয়ও এক টীকায় বলেন যে, সনাতন "বিদ্যাবাচস্পতির" নিকট অধ্যায়ন করিয়াছিলেন। এই বিদ্যাবাচস্পতিকে আমি নবদ্বীপের একজন অধ্যাপক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। ফলতঃ রূপসনাতনের জীবনবৃত্তান্তে গোলযোগের কথা এবং কাল্পনিক কথা এতই শুনা যায় যে, তাহা হইতে সত্যকথা বাহির করা কিছু সুকঠিন।

প্রতিবাদকারী বলেন "পরন্তু রূপগোস্বামী যে সাকরমা গ্রামে বাস করিয়াছেন, ইতিহাসে ইহার কোনও প্রমাণ নাই। উভয় ভ্রাতাই যে রামকেলী গ্রামে বাস করিয়াছেন ইহাই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।" এই বলিয়া ভক্তিরত্নাকরের প্রমাণ দিয়াছেন। ভক্তি রত্নাকরও যাদৃশ ইতিহাস, আমাদের অধিকারী মহাশয়ের গ্রন্থও তাদৃশ ইতিহাস। উভয় তুল্য প্রামাণিক গ্রন্থ। এখন আমাদের অধিকারী মহাশয় কি বলেন, প্রতিবাদকারী মহাশয় শ্রবণ করুন—

"সনাতন রূপ মন্ত্রী হইয়া রাজপ্রাসাদের অত্যল্প ব্যবধানে (অর্থাৎ রামকেলীতে) বাসাগৃহ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তথাপি সময়ে সময়ে মাধাইপুরে বাটী গমন করিলে হস্তী অশ্ব শিবিকা পদাতিক সমভিব্যাহারে আসিলে স্থান সংকীর্ণ বশতঃ ক্লেশ হইবে, তজ্জন্য রূপ সাকার মল্লিক অত্যল্প ব্যবধানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করতঃ বহু প্রজাউপনিবেশে পরিশোভিত করিয়া নবগ্রামের নাম "সাকার মল্লিকপুর" রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই গ্রাম বিজনে পরিণত হইয়া সাকরমায় কাঠাল নামে অভিহিত হইয়াছে বটে, তথাপি রাশি রাশি ইষ্টক পাষাণ স্থানে স্থানে ভূত কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।"

প্রতিবাদকারীর সকল কথার উত্তর দিতে যাওয়া অনাবশ্যক। যাঁহাদের হৃদয়ে ঐতিহাসিক তত্ত্বান্বেষণ স্থলেও বিচারের আসন নিম্নে, ভক্তির আসন উপরে, তাঁহাদের জন্য আমার সংগ্রহ রচিত হয় নাই। কেবল সংস্কৃত শ্লোক বা গ্রন্থের লিখক মাত্রেই যাঁহাদের চক্ষে প্রমাণ, তাঁহাদের জন্যও রচিত হয় নাই। ভক্ত বৈষ্ণবগণের লিখিত বৃত্তান্ত, মালদহের দবীর খাস ও সাকার মল্লিক, ওরফে সনাতন ও রূপ গোঁসাঞীর প্রকৃত ইতিহাস কি পাওয়া যায়, তাহা বুঝিয়া লওয়া আমার উদ্দেশ্য। আমার বিবেচনায় রূপসনাতন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন, এবং আবার অবশেষে ভেকধারী বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিষয় লোভেই মুসলমান হইয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। যাহা হউক, উদ্ধার হইয়া তাঁহারা বিশ্বম্ভরমিশ্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের নিকট পরমার্থ বিষয়ে কি উপদেশ পাইয়াছিলেন এবং সেই উপদেশে তাঁহাদের জীবনের শেষ দশায় কিরূপ রঞ্জিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের বুঝা প্রয়োজন। মনুষ্য মাত্রেই প্রায় অজ্ঞান বা লোভের বশীভূত হইয়া বিপথ গামী হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা একবার বিপথ-

গামী হইয়াও অনুতপ্ত হৃদয়ে আবার সন্মার্গে বিচরণ করেন, তাঁহারা অবশ্যই আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। রূপসনাতনের জীবন এক সময়ে কলুষিত ছিল * একথা ভাবিয়া কাহারও বিশেষ ক্ষুব্ধ হইবার আবশ্যক নাই। সনাতন নিজ মুখেই (কৃষ্ণদাসের লেখামত)

* রূপসনাতনের চাকুরি পরিত্যাগের কারণ আমি যেরূপ লিখিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া কোনও কোনও ভক্ত পাঠক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এবিষয়ে আমার উক্তির বুনিয়াদ কি, তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি।

আলাউদ্দীন হুসেন সাহা একজন অতীব ন্যায়-পরায়ণ ও প্রজাবল্লভ নরপতি ছিলেন। কতদিন গৌড় বিলুপ্ত হইয়াছে, তত্রাচ অদ্যাপি মালদহে হুসেন সাহাকে লোকে ভক্তির সহিত স্মরণ করে। তিনি প্রথম অবস্থায় অরাজকের অবসান ও শান্তি পুনঃস্থাপনের জন্য কয়েকটি যথেচ্ছাচার কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি অতীব ন্যায়পরতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

ইতিহাসলেখক Stewart সাহেব বলেন—"After these afbitray but salutary acts, Ala Addin ruled with strict Justicc." P. 72. পুনশ্চ 'AlaAddin enjoyed a peaceable and happy reign, beloved by his subjects and respected by his neighbours." P.73." এই বিচক্ষণ ন্যায়পরায়ণ প্রকৃতিরঞ্জন রাজা রাজস্ববিভাগে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থকে চাকুরি দিয়াছিলেন। সনাতন তাঁহারই রাজসরকারের একজন মুহুরি ছিলেন এবং তাঁহারই আজ্ঞায় সনাতন নিগড়বদ্ধ হইয়া কারাগারে অর্পিত হয়েন।

রাজস্ববিভাগের একজন কেরাণীর উপর দণ্ডাজ্ঞা এমন কোনও গুরুতর বিষয় নহে যে, তাহা মুসলমান ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য। এদিকে ভক্তের নিকট প্রকৃত কথাও পাইবার আশা করা যায় না। সুতরাং সনাতন যে কি অপরাধে কারাদণ্ডের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। তবে কৃষ্ণদাসের ভক্তিগ্রন্থে কতক আভাসে কতক স্পষ্টাক্ষরে জানা যায় যে—

(১) সনাতন কারারুদ্ধ হইবার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বেই রূপ অনেক অর্থ লইয়া গৌড় হইতে গৃহে গমন করেন। সনাতনের ব্যবহার জন্য প্রভূত পরিমাণ অর্থ গৌড়ের এক মুদির ঘরে থাকিয়া যায়।

(২) রূপ বাড়ীতে আসিয়া যে অর্থ আনিয়াছিলেন, রাজদণ্ড হইলে উদ্ধার লাভের জন্য তাহার চতুর্থাংশ "ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য" বা গচ্ছিত রাখিলেন। এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে রাজদণ্ডের ভয় জাগরূক ছিল।

(৩) রূপ বাড়ীতে বসিয়া শুনিলেন যে সনাতন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তখন—

"শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঁঞি।
বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য গোসাঞী॥
আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তথা হইতে॥
দশ সহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি স্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে॥
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুই ভাই করিল গমন।"

এস্থলে বলা উচিত যে, রূপ গোঁসাঞী সংসারের একটা কোনও বিলি বন্দেজ না করিয়াই, তাড়াতাড়ি বাটী হইতে পলাইয়া গেলেন। এ কথা পরে প্রকাশ পাইবে। ভাবে বুঝা যায়, সনাতনের ন্যায় পাছে হুসেন সাহা তাঁহাকেও ধরিয়া কয়েদ করেন, এই ভয়েই রূপ তাড়াতাড়ি উদ্বিগ্নচিত্তে গৌড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া হুসেন সাহার রাজ্যের বাহিরে প্রয়াগে পলাইলেন।

(৪) প্রয়াগে বল্লভভট্ট যখন চৈতন্যের সহিত দেখা করিতে আইলেন, তখন চৈতন্য রূপকে নির্দ্দেশ করিয়া বল্লভভট্টকে বলিতেছেন—

"ইহা না স্পর্শিও ইহোঁ জাতি অতিহীন।"

রূপ গোঁসাঞীর যে তৎপূর্ব্বে জাতিপাত হইয়াছিল, তাহা এই চৈতন্য বাক্যে প্রকাশ।

(৫) তাহার পর সনাতন কারারক্ষককে অনেক টাকা ঘুস কবুল করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন এবং পলাইয়া গিয়া চৈতন্যের সহিত কাশীতে মিলিত হইলেন।

(৬) তাহার পর রূপ ও বল্লভ এবং সনাতন মথুরা বৃন্দাবনাদি তীর্থে কিছুকাল ভ্রমণ করিতে গেলেন। মহাপ্রভু ইত্যবসরে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

আপন বিষয় কর্ম্মকে, নরকের সহিত তুলনা করিয়াছেন। মন্দকে মন্দ অবশ্য বলিতে হইবে,

---

(৭) কিছু কাল পরে রূপগোস্বামীও তীর্থ পর্য্যটনের পর অবশেষে নীলাচলে (পুরীতে) আসিয়া চৈতন্যের সহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় কিয়ৎ কাল বাস করিলেন।

(৮) সনাতনও পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট কিয়ৎকাল থাকিয়া তাঁহার আদেশে স্থায়ীভাবে বৃন্দাবনে বাস করিতে গেলেন। গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তিনি সাহসী হইলেন না।

(৯) রূপ কিন্তু বৃন্দাবনে যাইবার পুর্ব্বে সংসারের বিলিবন্দোবস্ত করিতে (ফতেয়াবাদ বা চন্দ্রদ্বীপে নয়) গৌড়ে আর একবার আসিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

"এই মতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা।
পাছে আসি রূপ গোঁসাঞী তাঁহারে মিলিলা॥
এক বৎসর রূপ গোঁসাঞীর গৌড়ে বিলম্ব হইল।
কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল॥
গৌড়ে যে অর্থ ছিল তাহা আনাইল।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণে দেবালয়ে বাঁটি দিল॥
সব মন কথা গোঁসাঞী করি নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন॥"

এতদিনে রূপ গোঁসাঞী নিশ্চিন্ত হইলেন। এখানে যে এক বৎসর গৌড়ে থাকার কথা দেখা যায়, ইহা গৌড়ের সমীপবর্ত্তী সাকর মল্লিক পুরে (অধুনাতন সাকরমাতে) রূপ সনাতনের যে বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাই সম্ভব। রূপের নিকট কুটুম্ব ও পরিবার বর্গ এইখানেই বরাবর বাস করিতেছিল অনুভব হয়।

ইহাতে রূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার ভয়ে, এবং সনাতন কারাগার হইতে পলাইয়া গিয়া যে চৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়। ন্যায়পরায়ণ হুসেন সাহার নিকট তাঁহাদের এইরূপ দণ্ড বা দণ্ডের ভয় কেন—ইহা কোন বৈষ্ণব লেখকই স্পষ্ট করিয়া বলেন না। কৃষ্ণদাস যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার বিচারে অগ্রসর হইলে পাঠকের বুদ্ধির অবমাননা করা হয়। কৃষ্ণধন অধিকারী মহাশয় এক কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন যে, হুসেন সাহার মুরসীদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, যতদিন রূপসনাতন তোমার মন্ত্রী থাকিবে, ততদিন তোমার রাজত্ব বিনষ্ট হইবে না। ইহারা মন্ত্রিত্ব হইতে অবসর লইলে তোমার রাজ্য বিনষ্ট হইবে। এই জন্যই সনাতন মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া না পালায়, এই ভয়ে হুসেন সাহা তাঁহাকে কয়েদ করেন। ফলতঃ বৈষ্ণবভক্তগণের পক্ষ কি দুর্ব্বল, তাহা এই কিম্বদন্তীতে প্রকাশ। নিতান্ত বালক না হইলে কেহ এই কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করিবে না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। ইহা তাঁহার পরবর্ত্তী কালের সৃষ্টি। ফলত রূপসনাতন চলিয়া গেলেও যে হুসেন সাহার রাজত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহা ইতিহাসে প্রকাশ। ইতিহাসানভিজ্ঞ ভক্তেই রূপ সনাতনের সাফাই জন্য ঐরূপ অসার বালোচিত কিম্বদন্তীর সৃষ্টি করিয়া থাকিবে। মূল কথা, মুসলমান ইতিহাস রূপসনাতনকে চেনে না। অন্ততঃ আমার যতদূর জানা আছে, তাহাতে রূপসনাতন নামে কোন "উজীরের" নাম মুসলমান লিখিত হুসেন সাহার ইতিবৃত্তে দেখি নাই। তাঁহারা যে বৈষ্ণব গ্রন্থে রাজমন্ত্রীর পদ পাইয়াছেন, ভক্তিই তাহার মূল; তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখি নাই। ইতি।

কিন্তু মনুষ্য হইয়া কে না দুএক সময়ে মন্দকার্য্য করে? এক্ষণে কি উপদেশের প্রভাবে রূপসনাতন উদ্ধার হইয়া ছিলেন, উদ্ধার কাহাকে বলে এবং প্রকৃতপক্ষে রূপসনাতন উদ্ধারের পথে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন কি না, তাহাই বিবেচ্য। বারান্তরে তাহার আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

বেঙ্গল স্যানিটারী ড্রেণেজ বিল। (৩)

এমন দেখা যাউক, স্যর চার্লস এলিয়ট পয়োপ্রণালীর গঠন বিষয়ে বিলের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা এই ;—

"The bill was not aimed at small clearances of marshy land or pools of water round villages or rural towns ; this like the clearing out or digging of new tanks and wells, could be reached through the local self-government. Acts and the operation of District Boards or possibly by village unions." পল্লীগ্রামের পয়োনালী বা জলমগ্ন ভূমি সংস্কার ও পরিষ্কার করা এই বিলের উদ্দেশ্য নহে। সে কার্য্য পুষ্করিণী সংস্কার ও নূতন পুষ্করিণী খননের ন্যায় স্থানীয় আত্মশাসন আইন, ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড দ্বারা হইতে পারিবে ; সম্ভবতঃ ভিলেজ ইয়ুনিয়নও তাহা করিতে পারিবে।

অতএব অন্ততঃ আপাততঃ ইহা নিশ্চয় যে, গ্রাম্য পয়োনালী সৃষ্টি ও সংস্কার করার জন্য এই আইনের অনুষ্ঠান হয় নাই। গ্রাম্য ড্রেণেজ আইনে গ্রাম্য ড্রেণ প্রস্তুত ও পরিস্কার হইবে না ; ইহা হঠাৎ শুনিতে খুব নূতন কথা বটে ; কিন্তু, নূতনই বা বলি কেন ? ইহা আর অতঃপর আশ্চর্য্যই বা কি ? যেমন পথ-কর ও পূর্ত্ত-করে, কোনও পুরুষেও গ্রাম্য পথ ঘাট প্রস্তুত হয় না ; তেমনি ড্রেণেজ করেও গ্রাম্য ড্রেণ প্রস্তুত ও পরিস্কার হইবে না। তবে, তদ্দ্বারা হইবে কি ? যাহা হইবে, তাহা স্যর চার্লস সাধারণ আন্দোলনের আবর্ত্তে পড়িয়া আপনিই ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সে ব্যাখ্যা এই ;—

"The object of Government was to deal with the case of the silted up rivers and water channels which have ceased to perform their old functions and no longer carry off the rain water in a continuous stream. There were many of these in central Bengal and especially in Burdowan Hooghly, Nuddea, Jessore and Khoolna."

অর্থাৎ যে সকল নদী ও জলপ্রবাহ মৃত্তিকা বালু পূর্ণ হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সাধনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে, বৃষ্টি পতিত বারি আর পূর্ব্ববৎ সতেজ স্রোতে অবিরাম বহন করে না, এই আইনে তাহাদেরই সংস্কার করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। মধ্যবঙ্গে, বিশেষতঃ বর্দ্ধমান, হুগলী, নদীয়া, যশহর ও খুলনা জিলায়, এইরূপ অবরুদ্ধ স্রোত নদী প্রবাহ বিস্তর আছে।"

বঙ্গেশ্বরের মুখে গ্রাম্য পয়োপ্রণালীর এই অভূত পূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে বহু কথা, বহু ভাব, বহু প্রশ্নেরই উদয় হয়। গ্রাম্য ড্রেণ বা ড্রেণেজ বলিতে নদ নদী বুঝাইতে পারে, ইহা সাধারণ লোকের স্বপ্নাতীত। অন্ততঃ এত কাল সম্পূর্ণরূপে স্বপ্নাতীত ছিল। শব্দার্থের বিপুল ব্যাপকতা-বাদী অতি বড় শাব্দিক পণ্ডিতের মনেও কখনও গ্রাম্য পয়োনালীর এরূপ বিরাট অর্থ উদয় হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। নর্দ্দামা মানে নদ নদী একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোনও অভিধানেই বোধ হয় লিখিত হয় নাই। এমন কি বঙ্গীয় রাজ সভার কোনও সদস্য ইত্যগ্রে উহা অবগত ছিলেন, ইহাও অনুমান হয় না ; কেননা তাহা হইলে ব্যবস্থাপক বৈঠকের অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা অঙ্কুরেই অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হইত। নর্দ্দামা অর্থে নদী, ইহা পূর্ব্বে জানা না থাকাতেই সরকারী ও বেসরকারী অনেক ব্যবস্থাপকের বক্তৃতা আজ "বাতিল" হইয়া পড়িয়াছে। দেশীয় সভা সমিতি ও সম্পাদকদিগের সময়ও বড় কম নষ্ট হয় নাই। তাঁহাদের কয়েক মাস ব্যাপী আন্দোলন, আবেদন, আর্ত্তনাদ, যুক্তি তর্ক প্রায় সবই স্যর চার্লস একই উক্তিতে উধাও উড়াইয়া দিয়াছেন। কারণ অতঃপর সরকার বাহাদুর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ড্রেণ অর্থে নর্দ্দামা নহে, নর্দ্দামা অর্থে খানা খন্দ, বিল জোল জলা নহে ; গ্রাম হইতে নদী অভিমুখে গ্রাম্য জল নিকা-

সের পূর্ব্বাপর পরিচিত পথও নহে; শব্দার্থের নূতন নিয়মে, অলিখিত অভিনব অভিধানানুসারে নর্দ্দামার অর্থ বড় বড় নদ নদী;— যেমন ভৈরব, কপোতাক্ষ, ইত্যাদি।

কিন্তু, শব্দার্থ ঘটিত এই অসামান্য রহস্য এখন যাউক। বঙ্গেশ্বর এই ড্রেণেজ বিলের ড্রেণ ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বস্তুতই এক অতি বৃহৎ নৈয়ায়িক শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বঙ্গীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ সভার "ন্যায়ের ফাঁকি" ও ইহার নিকট অতি তুচ্ছ। কিন্তু,আমাদের আশঙ্কা হয়, ইহাতে জনসাধারণের মনে সরকার বাহাদুরের সদাভিপ্রায় সম্বন্ধে সমূহ সন্দেহ জন্মিতে পারে। কোথায় গ্রাম্য পয়োনালী পরিষ্কার,আর কোথায় নদ নদী সংস্কার! উভয়ে যে প্রায় আকাশ পাতাল প্রভেদ! ইহাকেই বোধ হয় বলে ধান্য পেষণে শিব সঙ্কীর্ত্তন! কিন্তু, নদী সংস্কার করিবার জন্য নর্দ্দামার নাম করার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা কি, আমরা আদৌ অনুমান করিতে অক্ষম। অবরুদ্ধ-স্রোত নদী উন্মুক্ত-প্রবাহ করিতে হইবে, বেশ, আইনটী ঠিক তাহাই বলিয়া করা হয় না কেন? তাহার জন্য গ্রাম্য নর্দ্দামার নাম করা কেন? মৃত্যু, ম্যালেরিয়া, স্বাস্থ্য-রক্ষা প্রভৃতি অপ্রাসঙ্গিক আড়ম্বর করিয়া আসল কার্য্যটীর উপরেই বা আবরণ দেওয়া কেন? ইহা কি সত্য সত্যই রাজনীতির একটী লক্ষণ? অথবা আইনের যদৃচ্ছা আকুঞ্চন প্রসারণ করিবার জন্যই এরূপ জটিল ও কুটিল পথ অবলম্বন করা? উদ্দেশ্য যাহাই হউক,—উপস্থিত ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য মূলতঃ মন্দ নহে আমরা জানি,—তথাচ অঙ্গীকার একরূপ করিয়া কার্য্য অন্য রূপ করিলে, লোকের মনে স্বতই শঙ্কা ও সন্দেহ জন্মে। এরূপ শঙ্কা ও সন্দেহের উদ্রেক করা, শাসন-নীতির বিরুদ্ধ কিনা শাসয়িতাদিগেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। নদ নদী বহতা করাই যখন গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য বলিয়া আমরা এখন শুনিতেছি,তখন এই বিলের নাম ও গঠন ঠিক্ তদনুরূপ করিলেই ত অনেক লেঠা মিটিয়া যাইত। কিন্তু তাহার নামে ও গঠনে ত নদ নদী পরিষ্কারের নাম গন্ধও নাই! অতএব রামের নাম করিয়া শ্যামকে দেখাইলে লোকে কিরূপে বুঝিবে,গবর্ণমেণ্টের আসল উদ্দেশ্য কি? উপস্থিত সংকল্প ও ভবিষ্যত সাধনাই বা কি? লোকে কিরূপেই বা সে বিষয়ে সমীচীন মত সংগঠন্ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে জানাইবে? বেঙ্গল ড্রেণেজ বিল সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রজা উপযুক্ত ও সারগর্ভ অভিমত প্রকাশ করিতে পারে নাই বলিয়া বঙ্গেশ্বর ইঙ্গিতে তাহাদিগকে একটু নিন্দা করিয়াছেন; কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, এই নিন্দার ভাগী কে? রায়ত না রাজা? গবর্ণমেণ্ট নিজে অথবা দেশীয় সভা সমিতি ও সংবাদপত্র সম্পাদকগণ! গবর্ণমেণ্ট বিলে লিখিলেন, একরূপ বক্তৃতায় বলিলেন অন্যরূপ! লোকে কোন্ কথায় আস্থা স্থাপন করিবে; কোন কথাটীকে কেন্দ্র করিয়া আপন আপন অভিমত সংগঠন করিবে!!

ফলতঃ বঙ্গেশ্বর তদীয় ঢাকা বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, এই বিল খানি বস্তুগত আদৌ তাহা নহে। তাহা করিতে হইলে উহার আমূল পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইবে, এবং সে পরিবর্ত্তন করা হইলে পর, তবে লোকে সে সম্বন্ধে স্ব স্ব অভিমত সম্যক সংগঠন করিতে সমর্থ হইবে। তাহার পূর্ব্বে অভিমত ব্যক্ত করা প্রায় অন্ধকারে ইষ্টক নিক্ষেপেরই তুল্য। বঙ্গেশ্বরের ব্যাখ্যানুসারে "বেঙ্গল স্যানিটারী বিলের" নাম হওয়া উচিত "বেঙ্গল রিভার রিক্লামেসনবিল", পরন্তু, বিলের

অন্যান্য অনেক ধারারই পরিবর্ত্তন ও সংশোধন প্রয়োজন। তবে কিনা এক কার্য্যের জন্য কর বসাইয়া অপর কার্য্যে তাহা ব্যয় করিতে গবর্ণমেণ্ট অনভ্যস্থ নহেন। পথ-কর, পূর্ত্ত-কর, দুর্ভিক্ষ-কর, পথ ও পূর্ত্তের জন্য এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সংগৃহীত হইয়া, ব্যয় হইয়া থাকে শিক্ষা-বিস্তারে, সীমান্ত-সমরে, অথবা ইয়ুরোপীয় সার্বিসের বিনিময়-বিভ্রাট সংহারে! অতএব এই হেতুবাদে যদি নর্দ্দামাকর নদ নদীর কার্য্যে ব্যয়িত হয়, তাহা আর তত আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কিন্তু কর করই। নর্দ্দামার নামেই হউক আর নদীর নামেই হউক, এই কৃষি-কর অন্যায়, অনুপযুক্ত, অত্যাচার-প্রণোদিত। তবে কিনা নর্দ্দামার আইন করিয়া সেই নর্দ্দামা নিমেষ মধ্যে নদীতে পরিণত করা "জলকে দুধ, দুধকে জল করার মত যেন অশিক্ষিত চক্ষে অল্লাধিক অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় বটে। স্যর চার্লস এলিয়ট বাহাদুর নর্দ্দামা বিলের যে নর্দ্দামাকে বলিতেছেন নদী, তাঁহার পরবর্ত্তী বঙ্গেশ্বর তাহাকেই বলিতে পারেন, সমুদ্র! তস্য পরবর্ত্তী আর এক জন আসিয়া আবার তাহাকেই মহাসমুদ্র বা মরুভূমিতে পরিণত অনায়াসেই করিতে পারেন! কেননা এই আইনটী যে প্রকার অপরিসীম স্থিতি-স্থাপকতা ও অনন্ত ব্যাপকতা স্বরূপে সমন্বিত, তাহাতে উহা টানিলেই বাড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব মুহূর্ত্ত মধ্যে বঙ্গীয় গ্রাম্য পয়োনালী আটলাণ্টিক মহাসাগরে বা সাহারা মরুভূমিতে বিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না, কে বলিল? এবং বঙ্গীয় ভূমি সংশ্লিষ্ট ড্রেণেজ টেক্স আটলাণ্টিকমহাসাগর শোধন বা সাহারার মরু সংস্কার কার্য্যে ব্যয়িত হইবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? কারণ ম্যালেরিয়া বা মাসমাটা উপরোক্ত মহাসমুদ্র ও মরু হইতে উদ্ভূত হইয়া বঙ্গীয় প্রজার প্রাণান্ত করাও ত এক সময়ে অসম্ভাবিত না হইতে পারে। কাজেই ড্রেণেজ বিল বিষয়ক স্যর চার্লসের এই ব্যাখ্যা উহার শেষ ব্যাখ্যা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তাঁহার সহিত তদীয় এই ব্যাখ্যাও বঙ্গদেশ ছাড়িয়া বিলাতে গমন করিবে। যখন অপর বঙ্গেশ্বর আসিয়া উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা করিবেন, তখন বর্ত্তমান বঙ্গেশ্বরকে হয়ত, এই বিশ্ব সংসারেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই কারণেই উপস্থিত আইনটীর এতাদৃশ অসংযত, অনির্দ্দিষ্ট ও অতি ব্যাপক ভাব দূরীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি।

কিন্তু, এই আইনটী আমূল ভ্রমসঙ্কুল; ইহার আদি অঙ্কুর হইতে প্রধান অঙ্গ, শাখা, প্রশাখা সমস্তই প্রমাদে পূর্ণ। ম্যালিরিয়া নর্দ্দামার ন্যায় নদীতে থাকাও অদ্যাবধি প্রমাণিত হয় নাই। নর্দ্দামার আলোচনা প্রসঙ্গে ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত যত কথা আমরা ইত্যগ্রে বলিয়াছি, সে সমস্তই নদী সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। অতএব নর্দ্দামা ছাড়িয়া নদীর পক্ষ অবলম্বন করাতেও প্রত্যক্ষ ঘটনা ও পরীক্ষিত ও প্রমাণীকৃত যুক্তির হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই। অবরুদ্ধ পয়োনালীর ন্যায় রুদ্ধ-স্রোত নদ নদী প্রবাহ পরিষ্কার ও প্রবাহিত করার প্রচুর প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে; প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু, তাহা অন্যান্য কারণে। ম্যালেরিয়া প্রসমন কল্পে সে প্রয়োজনীয়তা আদৌ অপ্রামাণ্য। এবং তজ্জন্য দেশব্যাপী কৃষি-কর সংস্থাপন করা একান্ত অন্যায় এবং অসঙ্গত। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত কৃষক এ কর দিতে কেবল অসমর্থ বলিয়া নয়, এ কর দিতে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ সে বাধ্যই নহে।

অবরুদ্ধ নদী-প্রবাহ পরিষ্কার করিবে কর; তাহা করা অতীব প্রয়োজন; কিন্তু, তজ্জন্য ম্যালেরিয়ার নাম লইও না। তদ্দারা ম্যালেরিয়া প্রশমিত হয় নাই; প্রত্যুত প্রবলীকৃত হইয়াছে। প্রমাণ সাহাবাদ ও গয়া জিলার কেনাল কাটিয়া শোণ নদীর সংস্কার এবং হুগলী জিলায় "কাণানদী" ও "কাণা দামোদর" নদ পরিষ্কার। কৃত্রিম উপায়ে নদীর স্রোত সচল ও প্রবল করাতে উপরোক্ত উভয় স্থলেই ইষ্টের পরিবর্ত্তে প্রভূত পরিমাণে অনিষ্ট ঘটিয়াছে। শিল্পের দ্বারা স্বাভাবিক নিয়মের উপর আঘাত করিয়া ছেলে খেলা করা, ব্যাপার বড় সহজ নয়। আগুনে হাত দেওয়ার মত হাতে হাতেই তাহার শাস্তি পাইতে হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে আরা, বক্সার, ডিহিরি, বারুণ প্রভৃতি স্থান কিরূপ চমৎকার স্বাস্থ্যকর ছিল, সকলেই অবগত আছেন। এই সকল স্থান বঙ্গদেশের স্যানিটেরিয়ম স্বরূপ ছিল। কিন্তু, কেনাল কাটিয়া শোণ নদের বারি রাশি সচল ও সুপ্রবাহিত করার পর হইতে ঐ সকল স্থানের কীদৃশ দুরবস্থা হইয়াছে? যাহা হইয়াছে, তাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ! যে আরা বক্সার বারুণ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে কেহ কখনও জ্বরজ্বালা চক্ষে দেখে নাই, তাহা এখন শোণ কেনালের প্রসাদাৎ ম্যালেরিয়ার মর্ম্মান্তিক হৃদ্‌কম্পে প্রকম্পিত, প্লীহা যকৃতে পূর্ণ! আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব সেক্রেটারী মিঃ অড্‌লিঙের উক্তির উল্লেখ করিয়া ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। সরকারী আরও অনেক কাগজ পত্রে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। পাটনা বিভাগের সাম্বৎসরিক শাসন বিবরণী, আজ কয়েক দিন মাত্র হইল প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণীতেও সাহাবাদ প্রভৃতি "কেনাল ডিষ্ট্রিক্ট" সকলের বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ, তাহা প্রকাশ। বিভাগীয় কমিসনর লিখিয়াছেন;—

"* * We have had everywhere great deal of fever, *especially in Shahabad* and also in the submerged tracts in the three northern districts as might have been expected; and though the mortality from this cause has been less (*except in Shahabad*) than in 1892, it has been greater than 1891 and previous years. This is partly, no doubt, to be attributed to improved registration as well as to the general increase in population; *but I am afraid that it must be admitted that the disease is itself every. where gradually making headway.* *

এ সম্বন্ধে উপরোক্ত উক্তিই প্রচুর। যে সাহাবাদ জিলায় লোকে কিছুকাল পূর্ব্বে জল বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যাইত, তাহা এখন জ্বরাসুরের লীলাভূমি। বিভাগীয় কমিসনর বলিতেছেন, সাহাবাদে মৃত্যু সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জ্বরাসুর ম্যালেরিয়া মাতঙ্গোপরি উত্থিত হইয়া সমগ্র বিহার ভূমে প্রতিমুহূর্ত্তে আধিপত্য স্থাপন করিতেছে। সংক্রামক ম্যালেরিয়ার মহিমা বিস্তার কল্পে এখন আর নিম্নবঙ্গে ও বিহারে বড় বেশী প্রভেদ নাই। কিন্তু বিহারভূমে অতি অল্পকাল পূর্ব্বেও ম্যালেরিয়া ছিল না। কেনাল কাটার পর হইতেই উহা তথায় প্রবেশ করিয়াছে। অতএব আমরা অবশ্যই বলিতে পারি যে, বিহারের ম্যালেরিয়া গবর্ণমেণ্টের নিজেরই সৃষ্টি; উহা সম্যক প্রকারে ইঞ্জিনিয়ারি শিল্পসঞ্জাত। বিহারী কেনালে কোটী কোটী টাকা ব্যয়িত হইয়া উৎপন্ন করিয়াছে ম্যালেরিয়া, বিস্তার করিতেছে জ্বরজ্বালা ব্যাধি! বলিবে, কেনাল প্রবাহিত জলে জ্বরজ্বালার সৃষ্টি করিলেও, ভূমির উর্ব্বরত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে; অনুর্ব্বর ভূমি শস্যপ্রসূ করিয়াছে। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে এই কথাটীই কি ঠিক? অথবা ইহার বিপরীত কথা সত্য? কেনাল জলে

* The italics are ours.

উর্ব্বর ভূমি উষর হইয়া যাইতেছে ; মৌতাতী অহিফেন-সেবীর মত মৃত্তিকা নিজের স্বাভাবিক শক্তি হারাইয়া শস্যোৎপাদন কল্পে সম্পূর্ণরূপে সেই জলের উপরেই নির্ভর করিতেছে। অতএব পাঠক ইহাতেই বুঝুন, এই কেনালে ইষ্টানিষ্ট কি ঘটিয়াছে। তবে গবর্ণমেণ্ট এই দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত সত্বেও যে নিম্নবঙ্গের নদ নদী লইয়া নাড়াচাড়া করিবার জন্য অসীম ব্যয়-সাগরে ঝাঁপ দিতে অভিলাষী হইয়াছেন, সে দেশেরই দুরদৃষ্ট।

পরন্তু বহু ব্যয়ে হুগলীজিলার কাণা নদী ও কাণা দামোদর নদের সংস্কার করা হইয়াছিল, তাহার ফল কি হইয়াছে? তাহাতে জ্বর জ্বালা প্রশমিত না হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে কিনা? গবর্ণমেণ্ট নিজেই ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া দেখুন না কেন? ড্রেণেজ বিলব্যপদেশে অভিমত ব্যক্ত করিতে আদিষ্ট হইয়া বালী-সাধারণী সভা এ সম্বন্ধে লিখেন ;—

"It may be mentioned, for example, that the project on the *Kana Nadi* and *Kana* Damodar in the district of Hooghly, for the better drainage of a portion of the district by the Damodar river which cost some Rs70000, proved worse than an utter failure."

অতএব ম্যালেরিয়া নিবারণের নাম করিয়া রুদ্ধস্রোতনদী প্রবাহিত করার প্রস্তাব দেদীপ্যমান ঘটনার বিপরীত। কেননা, তদ্দ্বারা ম্যালেরিয়া নিবারিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহাতে করিয়া ম্যালেরিয়ার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে,ইহাই লোকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কিন্তু, বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ ঘটনা ও অতীতের অভিজ্ঞতা, এ উভয়েই আমাদের গবর্ণমেণ্ট উদাসীন! নহিলে যাহাতে বার বার অনিষ্টোৎপাদন হইতেছে, তাহাই অতীব ইষ্টকর ভাবিয়া আইন করিতে উদ্যত হইবেন কেন?

নদীস্রোত সর্ব্বদা নৈসর্গিক নিয়মে চালিত হয় ; নৈসর্গিক নিয়মে গতি পরিবর্ত্তন করে ; খর্ব্ব-বেগ, বিচলিত-প্রবাহ এবং অল্পাধিক পরিমাণে অবরুদ্ধও হয়। মরা নদী,কাণা নদী, এবং পরিবর্ত্তিতস্রোতনদী নৈসর্গিক নিয়ম বা অবস্থারই ফল। এ কথা ছোট লাট বাহাদুর অবশ্যই স্বীকার করেন। তিনি নিজেই তাঁহার উপরোক্ত বক্তৃতায় বলিয়াছেন ;—

"The destruction of these rivers might be partly due to a change in the coast elevation, which some geologists believe to be rising in the east, so that rivers, such as the Bhoirab, Kobadak &c. which used to flow eastwards now flowed south or south-west. এই সকল নদীর ধ্বংসের আংশিক কারণ উপকূলের উচ্চতা বৃদ্ধি। কোন কোনও ভূতত্ত্ববিদের বিশ্বাস, এই উচ্চতা পূর্ব্বদিকপ্রসারী, পূর্ব্বাভিমুখে উত্থিত। অতএব ভৈরব, কপোতাক্ষ প্রভৃতি নদ যাহারা পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত ছিল, তাহারা এখন দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে প্রবাহ পরিবর্ত্তন করিয়াছে।"

লাট সাহেবের এই উক্তিতে তাঁহার বক্তব্য বিষয় তাদৃশ স্পষ্ট ও পরিস্ফুট না হইলেও, অন্ততঃ ইহাতে এতটা বুঝা যাইতেছে যে, নৈসর্গিক ঘটনায় নদী-প্রবাহ পরিবর্ত্তিত, অবরুদ্ধ হয়, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মানুষের ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলে বা কৃত্রিম উপায়ে নৈসর্গিক ক্রিয়া সম্যক্ রূপে নিবারণ করা সম্ভবে কি? এবং তাহার নিবারণ করিবার চেষ্টা করা সকল স্থলে আদৌ উচিত কি? স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম এবং শিল্পের কৃত্রিম কৌশলে তাহা বিচলিত করিবার প্রয়াস পাইলে,জীব জগতে স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তে অস্বাস্থ্যই কি উৎপন্ন হয় না? তদ্দ্বারা অস্বাস্থ্যের যে সমূহ সম্ভাবনা, তাহা আমরা সংঘটিত ঘটনা বিবৃত করিয়া ইত্যগ্রেই প্রদর্শন করিয়াছি ; প্রদর্শন করিয়াছি যে,নদী-প্রবাহের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সহিত

যুদ্ধ করিতে যাইয়া বঙ্গে ও বিহারে অস্বাস্থ্যেরই সঞ্চার হইয়াছে। পরন্তু, এখন বিবেচনা করিতেছি এই যে, নদ নদীর নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন, সরল বা বক্রগতি, বার্দ্ধক্য বা মৃত্যু নিবারিত ও নিয়মিত করিতে যাইয়া তাহাতে সিদ্ধ-কাম হওয়ার আদৌ কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা? রাজ ভাণ্ডারে এবং রায়তের কুটীরে কত অর্থ সঞ্চিত আছে, সমগ্র দেশের ধনধান্যেরই বা পরিমাণ কি যে, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এই অমানুষিক কার্য্য সাধনার্থে উদ্যত হইয়াছেন? সমগ্র দেশের প্রতিবৎসরের পথকর ও পূর্ত্তকরে এত কালের মধ্যে বঙ্গদেশের গ্রাম্য পথ ও পুষ্করিণী গুলার আংশিক সংস্কারও হইয়া উঠিল না, আর নর্দ্দমা-করে নদ নদী খনন সঙ্কুলন হইতে পারিবে, ইহা আমরা কোনও ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র বা মাদক দ্রব্য-সঞ্জাত তন্দ্রার সহায়তা ব্যতীত কিরূপে প্রত্যয় করিতে পারগ হই! ড্রেণেজ থিওরির আবিষ্কারক স্বয়ং রাজা দিগম্বর মিত্র, এবম্বিধ কার্য্যের, ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কার্য্যের কল্পনায় প্রতিবাদ করিয়া কি বলিয়াছিলেন? নদ নদী খনন বা তাহাদের গতি পরিবর্ত্তন ত বহু দূরের কথা, পয়োনালীর সম্যক্ সংস্থাপনও এ দেশের নৈসর্গিক অবস্থায় অসম্ভব, বহুব্যয়ের অসাধ্য এবং অনেক স্থলে অনাবশ্যক বলিয়া তিনি প্রতিপন্ন করেন এবং তাঁহার কথা তখনকার কাউন্সিলে গ্রাহ্যও হয়। ড্রেণেজ ও ইরিগেসন বিলের সময়, তিনি এ প্রকৃতির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, এখনও তাহার মূল্য তদনুরূপ আছে এবং এসময়ে তৎপ্রতি সাধারণের বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পতিত হওয়া উচিত। তিনি বলিয়াছিলেন;—

"Now, referring to the report, he found that Mr. Adley had made mention of nearly a dozen conditions under which miasm, whatever might that be, but which was said to be the germ of the epidemic fever, was generated, and none of them was removeable except by complete drainage both surface and subsoil, which the geological formation of the country could not possibly admit of at *any expenditure of of money* even if the same were both comming."

কিন্তু নদী-প্রবাহ পরিস্কৃত ও প্রবলীকৃত এবং নদী-মুখ উন্মুক্ত করিলেই যে দেশের ড্রেণেজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া জ্বরজ্বালা কমিবে, এ তত্ত্ব, আমাদের শাসয়িতা কোথায় পাইলেন? ১৮৬৪ সালের এপিডেমিক কমিসন অন্যান্য কথার সহিত প্রসঙ্গ ক্রমে ইহার একটু উল্লেখ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু, এ তথ্যের অর্থাৎ পরিবর্ত্তিতগতি ও অবরুদ্ধপ্রবাহ নদী-সংক্রান্ত সমস্যার প্রত্যক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষক ও প্রধান মুখপাত্র রাজা দিগম্বর মিত্র উহা স্বীকার করেন নাই, তিনি উহার বিপরীতই বলিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ এপিডেমিক ড্রেণেজ মিনিটে লিখিয়াছিলেন এবং তাহার পর পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে,—

"An obstruction occurring in any one of these conduits must interfere with the drainage and its effects are felt more or less according to the proximity or remoteness of the obstruction from the scene of its influence. Accordingly it has been found, as will be noticed more particularly hereafter, that the *Stoppage of the mouths of the different streams has not been productive of such serious consequences** to the villages lying within their influence as when the same occurrred more in the vicinity of those villages.

দিগম্বর মিত্র তাঁহার মেলেরিয়া মিনিটে স্বয়ং উদ্ভাবন করিয়া ও উদ্যোগী হইয়া ড্রেণেজের প্রস্তাব করেন, সেই মিনিটেই তাঁহার পরীক্ষার ফল বিবৃতি কল্পে প্রসঙ্গ ক্রমেই উহা লিখিয়া গিয়াছেন; কাহারও কথার প্রতি-

*The ittalics are ours.

বাদ করিবার জন্য উহা লিখেন নাই। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী পরীক্ষার ও ১ম এপিডেমিক কমিসনের কার্য্য ব্যপদেশে যাহা বুঝিয়াছিলেন, স্পষ্টভাষাতেই তাহা উপরোক্ত উক্তিতে ব্যক্ত। ব্যক্ত যে, নদী মুখ রুদ্ধ হইয়া গ্রাম্য ড্রেণেজের সুতরাং স্বাস্থ্যের তাদৃশ ব্যাঘাত করে না, অপেক্ষাকৃত অদূরবর্ত্তী পয়োনালী অবরুদ্ধ হইয়া তাহার যাদৃশ বিষম অনিষ্ট ঘটায়। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল দিগম্বর মিত্র এই কথা লিখিয়াছিলেন। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এ সম্বন্ধে সরকারী ও বেসরকারী কি তথ্যানুসন্ধান হইয়াছে, যাহাতে করিয়া এখন দিগম্বর মিত্রের কথার অন্যথা হইয়া তাহার বিপরীত কার্য্য সমর্থিত হইতে পারে? বেঙ্গলগবর্ণমেণ্ট ইহার কোনও উত্তর দিতে পারেন কি?

দিগম্বর মিত্র বলিতেছেন, অবরুদ্ধ মুখ-নদী গ্রাম্য ড্রেণেজের—অতএব জন সাধারণের স্বাস্থ্যের অব্যবহিত বা ঐকান্তিক অন্তরায় নহে। অথচ ইনিই ড্রেণেজ থিওরির প্রথম প্রবর্ত্তক এবং সংক্রামক মহামারীর কারণ নির্ণয় কল্পে, পরিবর্ত্তিতপ্রবাহ নদী-সংক্রান্ত সমস্যার সম্ভবতঃ আদি উদ্ধারক! কিন্তু, দিগম্বর মিত্র প্রবর্ত্তিত ড্রেণেজ প্রস্তাবটী কিরূপ, এস্থলে পাঠকের অবগত হওয়া আবশ্যক। পুরাতন তথ্য অজ্ঞাত থাকিলে, নূতন সমস্যার সমালোচনা সম্ভবে না। অতএব রাজা দিগম্বর মিত্রের অতি প্রসিদ্ধ ড্রেণেজ থিওরি সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

এপিডেমিক কমিসনের বহু পূর্ব্বে দিগম্বর মিত্র, কাশিমবাজার নগরে অবস্থিতি কালে, তথাকার সংক্রামক জ্বরের কারণ নির্ণয়কল্পে মনোযোগ প্রদানকরেন। কাশিমবাজার প্রভৃতি নগরের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাকৃতিক সংস্থান এবং কৃত্রিম উপায়ে তাহার পরিবর্ত্তনের পর হইতে তথায় সংক্রামক জ্বরের আবির্ভাব, তাঁহার চিন্তাকর্ষণ করে। তিনি স্থানীয় অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও চিন্তা দ্বারা তথাকার জ্বরের কারণ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, প্রথমতঃ এপিডেমিক কমিসনে, তদীয় ইংরেজী মিনিটে তাহাই বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় ম্যালেরিয়া-জাত সংক্রামক জ্বর এ দেশে নেহাত নূতন নহে। মধ্যবঙ্গে উহা সঞ্চারিত হইবার বহু পূর্ব্বে উত্তর বঙ্গের কাশিমবাজার, চুণাখালি প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ জনপদ তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহারও বহু পূর্ব্বে, বঙ্গের পুরাতন রাজধানী গৌড় নগর অতি সম্ভবতঃ ঐ জ্বরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। গৌড় নগরে এই জ্বর বহুদিন স্থায়ী হইয়া ভীষণ মহামারী উপস্থিত করাতে রাজধানী টণ্ডা নগরে অন্তরিত হয়। জাহ্নবীর জলপ্লাবন হইতে নগরের রক্ষার জন্য গৌড়ের পূর্ব্ব সীমা শিলাময় এক অতি সুন্দর সেতু দ্বারা আবদ্ধ ছিল। এই সেতু বা বাঁধের ভগ্নাবশেষ অদ্যাবধি উক্ত প্রাচীন নগরের ধ্বংসাভ্যন্তরে বিদ্যমান আছে। দিগম্বর মিত্রের বিবেচনায় গৌড়নগরের ঐ সেতু স্বাভাবিক পয়োনালীর ব্যতিক্রম করিয়া নগরের অবাধ বারি নিঃসরণের ব্যাঘাত করাতেই ভূমির উপরিভাগ ও ভূমি—নিম্নস্থ মৃত্তিকা (Subsoil) ক্রমাগত জলসিক্ত ও অস্বাভাবিক শৈত্যে দূষিত হয় এবং তাহা হইতে ম্যালেরিয়া উৎসারিত হইয়া সংক্রামক জ্বর রোগে গৌড়-নগর অচিরাৎ উৎসন্ন করে। তাহার পর কাশিমবাজার প্রভৃতি নগরের সংক্রামক জ্বরের কারণ সম্বন্ধে তিনি উপরিউক্ত মিনিটে লিখেন;—

"চুণাখালি, ভাটপাড়া, কাশিমবাজার, কালকাপুর,

বাগানবাটা এবং কয়াসভাঙ্গা গ্রাম পূর্ব্বে ভাগিরথী বা হুগলী নদীর একটী বাঁকের উপর অবস্থিত ছিল, ৬০ বৎসর অতীত হইল এই বাঁক কাটিয়া ভাগীরথীকে সরল স্রোতে পরিণত করত পথ সোজাকরা হয়। সুতরাং তদ্দ্বারা এই নদী-প্রবাহের প্রাকৃতিক গতি পরিবর্ত্তিত হয় এবং উপরোক্ত স্থান সকল নদী-তীর হইতে দূরে যাইয়া পড়ে। এই শিল্পনৈপুণ্য বা কৌশলময় এঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যের অব্যবহিত পরেই ঐ সকল স্থানে সংক্রামক জ্বরের আবির্ভাব হয়। এই জ্বরের প্রকোপ, পীড়ন এবং তজ্জনিত ঐ সকল স্থানের অধিবাসীদিগের অসংখ্য মৃত্যু, কেবল এক গৌড় নগরের মহামারী ব্যতীত, বাঙ্গালার ব্যাধি-বিপত্তির ইতিবৃত্তে অতুলনীয়। এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব কালে মৃত দেহের অগ্নি সৎকার করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, প্রত্যহ এতই লোক মরিত যে মৃতদেহ গাড়ি বোঝাই দিয়া কোনও প্রকারে নগরের বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইত। এইরূপে কাসিমবাজার নগর, যে কাসিমবাজার এক সময়ে বাণিজ্য-সমৃদ্ধিতে এতাধিক অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীসম্পন্ন ছিল যে, তাহার অর্থ আদান প্রদানের নিত্য আবশ্যকতা পরিপূরণার্থে তথায় একশত শরফ বা বাণিজ্য ধনাগার অর্থাৎ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল—সেই কাসিমবাজার পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে এই সাংঘাতিক জ্বরের মহামারীতে প্রায় মরুক্ষেত্রে পরিণত হয়!"

"এই জ্বর অদ্যাবধি কাসিমবাজারে বিদ্যমান আছে। অতএব এই জ্বরের কারণও অদ্যাবধি তথায় বিদ্যমান। একটী ভিন্ন,অন্ত আর কোন বিষয়েই কাসিমবাজার বঙ্গের কোনও স্বাস্থ্যকর সহর হইতে বিভিন্ন নহে। উহার বারি, বৃক্ষাদির উৎপত্তি, উহার গৃহ এবং অধিবাসীদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রণালী, অবিকল বঙ্গের অন্যান্য স্থানেরই সদৃশ; কিন্তু, কেবল একটী বিষয়ে কাশিমবাজার বঙ্গের অন্যান্য স্থানের মত নহে। তথাকার বায়ু সর্ব্বদাই—বৎসরের বারমাসই সর্দ্দির শৈত্যময়। গ্রীষ্মকালেও তথায় এই সর্দ্দি-শীতলতার আতিশয্য। সে এতাদৃশ যে, এক দিনের জন্যও তথায় কেহ যাইলে উহা উপলব্ধি করিয়া আশ্চর্য্য হয়েন; কারণ,বাঙ্গালার কোথায়ও আর অমনটী নাই। কাশিমবাজারের এই সর্দ্দি-সিক্ততা কেবল তাহার মধ্যস্থ মৃত্তিকার অত্যধিক আর্দ্রত্ব হইতেই উদ্ভূত হইতে পারে; এবং তথার নিম্ন মৃত্তিকার এই আর্দ্রতা, স্বাভাবিক পয়ঃনালীর ব্যাঘাত ও ব্যতিক্রম জনিতই ঘটিয়াছে; পরন্তু, এই ঘটনা ও প্রাকৃতিক পয়োনালীর ব্যতিক্রম, অতি সম্ভবতঃ উপরিউক্ত কৃত্রিম উপায়ে ভাগিরথীপ্রবাহের পরিবর্ত্তন জনিতই ঘটে। নদী স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন দ্বারা এবং (হইতে পারে) নগরের পয়োনালী প্রতিরোধক কতকগুলি রাজপথ দ্বারা ঐ স্থানের জল নিকাসের স্বাভাবিক পথ বন্ধ হওয়াতে ভূপৃষ্ঠ ক্রমাগত জলসিক্ত হইয়া নিম্ন মৃত্তিকা অত্যার্দ্র এবং তাহাতে করিয়া ম্যালেরিয়ার বীজ সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। প্রকৃতির কি প্রক্রিয়া দ্বারা ক্রমে এইকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে,এত কাল পরে,তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। সম্ভবতঃ এস্থলে তাহার তত প্রয়োজনও নাই। ইহাই প্রচুর যে এই স্থানটী অতিশয় সর্দ্দিযুক্ত এবং আর্দ্র! উহার অত্যধিক আর্দ্রতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; এবং আমি বিবেচনা করি, ইহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না যে, ঐ আর্দ্রতা নিম্ন মৃত্তিকার মজ্জাগত অতিরিক্ত সর্দ্দিসিক্ততা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।'

এ দেশের ড্রেনেজ তন্ত্রের প্রধান পুরোহিত রাজা দিগম্বর মিত্রের ড্রেণেজ মতের মূল এই।—১ম, এপিডেমিক কমিসনে এই মতই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এবং তাহার পর ড্রেণেজের পক্ষপাতী বড় বড় পণ্ডিত ও রাজপুরুষদিগের নিকট উহা গৃহীত ও আদৃত হইয়া আসিয়াছে। এক কথায়, দিগম্বর মিত্রের মতে, যে কোনও কারণেই হউক, কোনও জনপদের স্বাভাবিক পয়োপ্রণালীর অবরোধ হইলে, তাহার উপর আঘাত হইলে, তাহার ব্যতিক্রম বা বিচলন হইলে,তথাকার নিম্ন মৃত্তিকা অত্যার্দ্র হইয়া সংক্রামক জ্বরবীজ জনন করে। জ্বরবীজ বা ম্যালেরিয়া শব্দটী মিত্রজ মহাশয় বড় ব্যবহার করেন নাই। তিনি মৃত্তিকার অত্যার্দ্রতা জনিত জ্বর মাত্র অঙ্গীকার করিয়া

গিয়াছেন। যাহা হউক, স্বাভাবিক পয়োনালীর ব্যাঘাত এবং তাহার পুনঃ সংস্থাপনই তাঁহার মতের মূল সূত্র। কিন্তু, সেই ব্যাঘাতের যে সকল পরিদৃশ্যমান কারণ পরম্পরা তিনি নির্ণীত ও প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন এবং যে কারণ পরম্পরা বহু বিজ্ঞ ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদিগের দ্বারা এতাবৎ কাল স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা অন্তরিত করার পরিবর্ত্তে, উপস্থিত ড্রেণেজ অনুষ্ঠানে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে বরং তাহাই বর্দ্ধিত করিবার উদ্যোগ হইতেছে। কিরূপে, আমরা কিঞ্চিৎ পরে দেখাইব। এস্থলে কেবল এই মাত্র জিজ্ঞাস্য যে,নদী-প্রবাহ প্রবল ও বেগবান্ করিবার অভিপ্রায়ে,তাহার ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্কার কল্পে, স্রোতের স্বাভাবিক গতি বা পথ পরিবর্ত্তিত করিয়া অনেকস্থলে প্রাকৃতিক পয়োনালী প্রতিরোধ করিবে না,তাহার প্রমাণ কি, তাহার প্রতিভূ কে ?

সাধারণতঃ মধ্যবঙ্গের ম্যালেরিয়া নিপীড়িত স্থান নিচয়ের পয়োনালী ও তাহার অবরোধ সম্বন্ধে দিগম্বর মিত্রের মত এই ;—

"সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত নিম্ন বঙ্গের অন্যান্য সকল গ্রামের প্রাকৃতিক পয়োনালীর প্রথা বা প্রকরণ এইরূপ যে, গ্রামের জল প্রথমতঃ তাহার নিকটবর্ত্তী ধান্যক্ষেত্র নিচয়ে যাইয়া পতিত হয়, কারণ সচরাচর সকল গ্রামেরই "গড়ান" তন্নিকটবর্ত্তী ধান্য ক্ষেত্রের অভিমুখে। গ্রামের জল প্রথমতঃ ধান্যক্ষেত্রে গিয়া পড়ে; তথা হইতে সেই জল বিলে যাইয়া জমা হয়। পরন্তু, বিল হইতে সেই জল খাল দিয়া নদীতে যাইয়া পড়ে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নদী এই জল লইয়া বৃহত্তর নদীতে যাইয়া পতিত হয়। এই সকল পয়োনালীর কোনও একটীর অবরোধেই জল নিকাসের বাধা জন্মে; এবং অবরোধের দূরত্বের বা নৈকট্যের অনুপাতানুসারে তাহার কুফল অনুভূত হয়। অর্থাৎ গ্রাম্য জল অপেক্ষাকৃত দূরে যাইয়া পতিত হওয়ার পর যদি কোথাও জলনালীর অবরোধ ঘটে তাহাতে গ্রাম্য স্বাস্থ্যের তাদৃশ অনিষ্ট ঘটে না; যাদৃশ মহানিষ্ট ঘটে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী স্থলে জলনালীর অবরোধ ঘটিলে। অতএব ইহা দেখা গিয়াছে যে,ভিন্ন ভিন্ন নদী-মুখ রুদ্ধ হইয়া গ্রাম্য স্বাস্থ্যের তাদৃশ অনিষ্ট সাধন করে নাই, গ্রাম সকলের অনতিদূরবর্ত্তী স্থলে জলনালী বন্ধ হইয়া তাহার যেরূপ অনিষ্ট করিয়াছে।

"প্রধানতঃ রাজপথ দ্বারা এবং অংশতঃ মৎস্য ধরিবার জন্য খাল অবরোধক বাঁধ দ্বারা গ্রাম্য জলনালী রুদ্ধ হইয়াছে। উন্নত-শরীর ইষ্টক বা মৃত্তিকাবর্ত্ম ইদানীং এমন সকল স্থান ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে যে,সকল স্থলে পূর্ব্বে জল নিকাসের স্বাভাবিক পথ ছিল। সে পথ বন্ধ, সুতরাং গ্রাম্য জল আর অবাধে বাহির হইতে পারে না। গ্রামের মধ্যে তাহা বদ্ধ থাকিয়া নিম্ন মৃত্তিকা আর্দ্র ও গ্রামবাসীদিগের স্বাস্থ্য হানি করে। পরন্তু, মৎস্য ধরিবার বাঁধ খালের স্রোত রুদ্ধ করিয়া, গ্রাম্য বারির দূর নিঃসরণে বাধা জন্মায়।"

"বৃহৎ বৃহৎ নদীর তীরভূমি স্বভাবতঃই উচ্চ সুতরাং ভাগিরথীতীর হইতে গ্রাম সকলের জল নিকাসের পথ নদী তীরের বিপরীত অভিমুখে। অতএব ত্রিবেণী হইতে নোয়াসরই পর্য্যন্ত গ্রাম সমূহের এবং নদীতীর হইতে দূরে অবস্থিত আরও অনেক গ্রামের জল নিকটস্থ ধান্য ক্ষেত্র দিয়া ঝিনুক খালির খাল বহিয়া কুন্তী নদীতে যাইয়া পতিত হইত। ঝিনুক খালির খালে উৎকৃষ্ট বালু জন্মে। সে বালু অট্টালিকাদির প্রলেপ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ঝিনুক খালির খালে বালু উত্তোলন প্রক্রিয়ায় উপরিস্থ মৃত্তিকা রাশি খালে ধৌত হইয়া পড়িয়া ক্রমে কিয়ৎ পরিমাণে তাহার প্রবাহের হ্রাস করিয়া জল স্রোতের কিঞ্চিৎ অবরোধ ঘটায়; পরন্তু,নোয়াসরই খাল নামক কুন্তী-নদীর মুখ পলি পড়িয়া কয়েক বৎসর যাবৎ অবরুদ্ধ হইয়াছে। বর্ষার পর তথায় আর নৌকা চলে না। এই দুই কারণে জল নিকাসের কতক ব্যাঘাত ঘটিলেও চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের অধিবাসীদিগের কিছুমাত্রও স্বাস্থ্য হানি হয় নাই। কেননা তদ্দ্বারা গ্রাম্য জলনালীর অব্যবহিত অবরোধ ঘটে নাই। কিন্তু, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বাবু মধুসূদন নন্দী মগরা হইতে নোয়াসরাই পর্য্যন্ত এক রাস্তা বাঁধাইয়া দেন। এই রাস্তার মধ্যে কোথায়ও জল নিঃস-

রণের জন্ত সেতু নির্ম্মিত হয় নাই; পরন্তু এই রাস্তা উপরোক্ত গ্রাম সকলের জল-প্রণালী বহুস্থলে রোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল কি হইয়াছে? ফল হইয়াছে এই যে, এই রাস্তা নির্ম্মিত হওয়ায় এক বা দুই বৎসর মধ্যে ঐ সকল গ্রামে যুগপৎ সংক্রামক জ্বর ডাকিয়া উঠিয়াছে। পুনশ্চ, ত্রিবেণী হইতে মগরা পর্য্যন্ত গ্রাম্য রাস্তা উচ্চ ও পাকা করিয়া বাঁধার পর হইতেই জয়পুর,বাগাটী ও অন্যান্য গ্রাম সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে। এই শেষোক্ত রাস্তাতেও জল নিঃসরণার্থে সেতুপথ নাই। এই রাস্তা পূর্ব্বে যখন কাঁচা ছিল,এবং গ্রাম্য জলনালীর সহিত সমতল ছিল, তখন গ্রাম্য জল অবাধে যাইয়া কুন্তীতে পড়িত; সুতরাং জ্বরজ্বালা ছিল না।"

"রাজহাট হইতে দ্বারবাসিনী পর্য্যন্ত এক রাস্তা হইয়া জল নিকাসের পথরোধ করতঃ দ্বারবাসিনী প্রভৃতি গ্রামে ভীষণ সংক্রামক জ্বর আনয়ন করিয়াছে। আমি নিজে "সারেজমিনে" উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষ দর্শনে ও তদন্তানুসন্ধানের দ্বারা এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। পুনশ্চ অঞ্জনা নদীর দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। এই মরা নদী এক সময়ে বিলক্ষণ বহতা ছিল। ইহার প্রবাহে নৌকা চলিত এবং সে প্রবাহ মাতাভাঙ্গা নদীতে যাইয়া মিশিয়াছিল। অঞ্জনা কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম নিচয়ের সলিল বহন করিত। কিন্তু, ১৪ বৎসর যাবৎ অঞ্জনার দুই মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়াতেও তাহার তীরস্থ নিকট বা দূরবর্ত্তী কোন গ্রামেরই স্বাস্থ্য হানি হয় নাই; সংক্রামক জ্বর কোথায়ও প্রবেশ করে নাই। কিন্তু, গত দুই বৎসর মধ্যে কৃষ্ণনগরের বড় বাজার হইতে লালবাগান পর্য্যন্ত এক কাঁচা রাস্তা নির্ম্মিত হইয়া বারুই পাড়ার জল নিকাসের পথরোধ করিয়াছে। সুতরাং তাহার পর হইতেই বারুইপাড়া গ্রামে ভয়ঙ্কর সংক্রামক জ্বর ডাকিয়া উঠিয়াছে।"

"এইরূপে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেল-পথ, এবং উহার পরিপোষক পাকা ও কাঁচা রাস্তা সকল, ভাগিরথীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের তথা নদী-তীরের দূরবর্ত্তী এবং এই রেল-পথের পশ্চিম পার্শ্বস্থিত গ্রাম সকলের জল-প্রণালী অবরোধ করিয়াছে। কারণ, আমি ইহা পূর্ব্বেই সূচিত করিয়াছি যে, ভাগিরথীর পূর্ব্ব তীরস্থ গ্রাম সকলের জল নিকাসের পথ পূর্ব্বনিম্নাভিমুখী। সুতরাং চাকদহ, কাঁচড়া পাড়া, হালিসহর প্রভৃতি এবং তদনুরূপ অবস্থিত আরও বহু সংখ্যক গ্রাম সাংঘাতিক সংক্রামক জ্বরে উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে।

"এ দেশের ভূমি সম্পূর্ণ রূপে সমতল। সুতরাং জল-প্রবাহ সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ব্যাপিয়া ক্রমনিম্নাভিমুখে অগ্রসর হয় এবং তজ্জন্য বক্রগামী রেল-পথও অন্যবিধ রাজ পথ সকল ইহার মধ্য ভেদিয়া যদৃচ্ছা নির্ম্মিত হওয়াতে অগত্যাই তদ্দ্বারা স্বাভাবিক পয়োনালী নিচয় রুদ্ধ হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও ইষ্টারণ বেঙ্গল, এই উভয় রেল পথেই, আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় বটে যে, জল নিঃসরণার্থে বড় বড় সেতু-পথ আছে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা ছোট বড় খাল ও নদী-প্রবাহ; গ্রাম্য জল গ্রহণের স্থান মাত্র,নিঃসরণের পথ নহে। সুতরাং দেশব্যাপী এই সকল বর্ত্ম গ্রাম্য জল নিঃসরণের একান্ত অন্তরায়।

গ্রাম্য ড্রেণেজের ঐকান্তিক পক্ষপাতী এবং আমূল সমর্থক রাজা দিগম্বর মিত্রের উপরোক্ত অভিমত হইতে কি প্রকাশ পাইতেছে? প্রকাশ হইতেছে, মোটের উপর দুইটী তত্ত্ব। প্রথম নদী প্রবাহের অবরোধে বা প্রশমিত স্রোতোবেগে কোথাও স্বাস্থ্যের হানি নাই। দ্বিতীয়,—যদৃচ্ছা নির্ম্মিত রেল-পথ ও রাজপথ দ্বারা গ্রাম্য জল নিকাসের অব্যবহিত ও স্বাভাবিক পথ অবরুদ্ধ করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অপরিসীম অনিষ্ট সাধন করিয়াছে; দেশে সাংঘাতিক সংক্রামক জ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে। গতাসু রাজা সাক্ষাৎদৃষ্ট ঘটনা ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা এই দুই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন,ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এবং তাহার পর এযাবৎকাল পর্য্যন্ত কেহই এই দুই সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে খণ্ডন করিতে পারেন নাই। যাঁহারা উহা খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন (দৃষ্টান্ত স্থলে ডাক্তার লেথব্রিজ প্রভৃতি) তাঁহারাও কেহ এমন বলেন নাই যে, নদী-স্রোতের সংস্কার করিলে এ দেশীয় লোক সংক্রামক জ্বর হইতে অব্যাহতি পাইবে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে,

লোকের ঐকান্তিক অন্নকষ্ট ও উপবাস নিবারিত করাই এপিডেমিকের মস্তকে আঘাত করার সর্ব্বপ্রধান উপায়। সে সকল কথা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রকটিত করিয়াছি। এখন রাজা দিগম্বর মিত্রের মতানুসারেও যদি ড্রেণেজ করিতে হয়, তাহা হইলে, নদী-স্রোত সংস্কারের উদ্যোগ করিতে হয় না। রেলপথ ও অসংখ্য রাজপথের অবরোধ যথা সম্ভব উন্মুক্ত করিয়া দেশের স্বাভাবিক জলনালী প্রকৃতিস্থ করিতে হয়। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ছোট লাট বাহাদুর তাহাতে একান্ত উদাসীন, সম্পূর্ণরূপেই উপেক্ষাবান্। তিনি প্রমাণিত কারণ অবহেলা করিয়া, যাহা আদৌ কারণ বলিয়া অদ্যাবধি প্রতিপন্ন হয় নাই, তাহারই প্রতিকারে অভিলাষী, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। তিনি রেলপথ ও রাজপথের বিভ্রাট একেবারেই অস্বীকার করেন, কারণ, তাহা স্বীকার করিলে, বোধ হয়, ড্রেণেজের জন্য রেলওয়ে কোম্পানির উপর কর বসাইতে এবং রাজকোষ হইতে অর্থ দিতে হয়। কিন্তু এ উভয়ই অতি সঙ্কটজনক কার্য্য, সুতরাং তিনি নদীস্রোতের উপর লোকের স্বাস্থ্য সংস্থাপন করিয়া একটী অভিনব কৃষিকরের আইন করিতে উদ্যত, ইহা অগত্যাই লোকে সন্দেহ করিতেছে।

কাঁচাপাকা রাস্তা ও রেলপথে পয়োনালীর অবরোধ কেবল যে দিগম্বর মিত্রের ব্যক্তিগত অভিমত, তাহা নহে। এ তথ্য তৎকর্ত্তৃক সূচিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু, স্বীকৃত ও সমাদৃত হইয়াছিল বহু বহুবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের দ্বারা—১ম, এপিডেমিক কমিসন ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন; তাৎকালিক বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ গবর্ণর জেনেরল লর্ড লরেন্স ইহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। পরন্তু, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গাধীপ স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেল ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Dr. Pettenkoffer এবং চিকিৎসক সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকা "ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট" ইহাতে অনুমোদন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রথম এপিডেমিক কমিসনের অভিমত আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছি। লর্ড লরেন্সের কথা কয়েকটী এই :—

"The only new cause suggested by the native member of the Commission, Babu Digambar Mitra, as probably increasing the dampness, which the Commission considered to be the main source of the disease, was the obstruction to drainage by railways and roads and shutting up of outlets into rivers."

কিন্তু যাহা বড় বড় লোকে গ্রাহ্য ও প্রামাণ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন, যাহা চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক এবং তত্ত্বদর্শী লোকে মানিয়াছেন; যাহা স্যর জর্জ ক্যাম্বেল ও লাট লরেন্স স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করেন কেবল আমাদের এখনকার লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যর চার্লস এলিয়ট।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

আত্মার অস্তিত্ব ও জন্মান্তর পরিগ্রহতত্ত্ব।*

সুখ দুঃখাদি সমবায়িকারণ আত্মা। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই চতুর্দ্দশ আত্মার গুণ। আত্মা বিভু অর্থাৎ ব্যাপনশীল, অহঙ্কারের আশ্রয় অর্থাৎ অহংজ্ঞানের বিষয়, মনোমাত্রের গোচর

* এই প্রতিবাদ প্রবন্ধটী সাহিত্য-সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তিনি সাহিত্যে প্রকাশ করিতে অস্বীকার করায় নব্যভারতে দেওয়া হইল।

অর্থাৎ চাক্ষুষাদি ষড়বিধ প্রত্যক্ষের মধ্যে কেবল মানস প্রত্যক্ষের বিষয়। রথগতি দর্শনে সারথির বিদ্যমানতা যেরূপে অনুমিত হয়, প্রবৃত্ত্যাদি দ্বারা আত্মা সেইরূপ অনুমেয়।

আত্মা

বুদ্ধি — যত্ন — অদৃষ্ট ইত্যাদি

বুদ্ধি: অনুভূতি, স্মৃতি

যত্ন: প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, জীবনযোনি

অদৃষ্ট: ধর্ম্ম, অধর্ম্ম

অনুভূতি: প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দ

প্রত্যক্ষ: দর্শন, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, স্বাদন, স্পর্শন, মানস

যদিও "আমি জানি" "আমি সুখী" ইত্যাদি প্রত্যয় দ্বারা সকলেই আত্মার মানস প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তথাপি যে সকল বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিরা "দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই," "মানবের সুখ, দুঃখ আকস্মিক" ইত্যাদি বহুপ্রকার প্রলাপ বাক্য ব্যবহার করেন, তাঁহাদের প্রতীতির নিমিত্ত বর্ত্তমান প্রবন্ধে আত্মার অস্তিত্ব, অবিনাশিত্ব ও জন্মান্তর পরিগ্রহতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা যাইতেছে।

আত্মা ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের ও পরম্পরা সম্বন্ধে শরীরের চৈতন্য সম্পাদক। যেমন ছেদাদি ক্রিয়ার করণ অর্থাৎ সাধন, কুঠারাদি বিদ্যমান থাকিলেও কর্ত্তা ব্যতীত ছেদাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না; সেইরূপ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহ বিদ্যমান থাকিলেও, কর্ত্তা ব্যতীত দর্শন, শ্রবণাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞানের করণ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহের বিদ্যমানতা দেখিয়া তাহাদের অধিষ্ঠাতা (কর্ত্তা) এক অতিরিক্ত আত্মার অনুমান করিতে হইবে, অর্থাৎ আত্মা কর্ত্তা, চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ করণ ও দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান ক্রিয়া।

এ স্থলে কোন কোন তার্কিক এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, চক্ষুঃ কর্ণাদি করণ ও দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা কেহ আছেন, না হয় অগত্যা স্বীকার করা গেল; কিন্তু সেই কর্ত্তা শরীর-মন বা ইন্দ্রিয়গণ ইহাদের মধ্যে কেহ হইবেন, আত্মা নামক অতিরিক্ত কোন পদার্থ নাই। কিন্তু কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে, তাঁহাদের এই তর্কের মূলে কোন যুক্তি নাই।

শরীর আত্মা নহে। যদি শরীর চেতন হইত, তাহা হইলে মৃতব্যক্তির শরীর বিদ্যমান আছে, অথচ চৈতন্য নাই কেন? (১) যদি কেহ বলেন, প্রাণবায়ুর বিনির্গমন বশতঃ শরীরে চৈতন্যের অভাব হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার পূর্ব্বে অবয়বের উপচয় ও অপচয় বশতঃ শরীরের উৎপাদ বিনাশশালিত্ব হেতু বাল্যকালে বিলোকিত পদার্থের বৃদ্ধকালে কিরূপে স্মরণ সম্ভব হয়? শরীরাবয়বের প্রতিক্ষণ বৃদ্ধি ও ক্ষয় হেতু শরীর প্রতিক্ষণ বিনষ্ট ও উৎপন্ন হইতেছে, অতএব শৈশবে যে সকল পদার্থ দর্শন করিয়াছিলাম, এখন বৃদ্ধকালে তাহার স্মরণ কিরূপে সম্ভবিত হয়; কেননা যে শরীর বাল্যকালে পদার্থ দৃষ্টি করিয়াছিল, অবয়বের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হেতু সে শরীর বহুপূর্ব্বে বিনষ্ট হইয়াছে ও নূতন শরীর

উৎপন্ন হইয়াছে। দ্রষ্টা ও স্মর্ত্তা একই ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক, পূর্ব্ব শরীর কোন পদার্থ দর্শন করিয়াছিল,কিন্তু নূতন শরীর সে পদার্থ স্মরণ করিবে, এ কিরূপ ন্যায়? (২) যদি কেহ বলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব শরীরোৎপন্ন সংস্কার সকল পরপরবর্ত্তী শরীরে সংক্রামিত হয়,তাহা হইলে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করা যাইতে পারে যে,এরূপ অনন্ত সংস্কার কল্পনায় যুক্তির গৌরব দোষ উপস্থিত হয়,আর বাসনার সংক্রমও হইতে পারে না। কেননা তাহা হইলে মাতার বাসনা পুত্রে সংক্রমিত হইত। (৩) ইন্দ্রিয়গণ আত্মা নহে। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণই দর্শন শ্রবণাদির ক্রিয়ার একাধারে করণ ও কর্ত্তা, অর্থাৎ চৈতন্য ইন্দ্রিয় সমূহেই বিদ্যমান আছে,এরূপ কথা বলা অসঙ্গত,কেননা কোন ইন্দ্রিয়ের নাশ হইলে তদিন্দ্রিয় জনিত অনুভবের স্মরণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কোন ব্যক্তি চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা কোন বস্তু দর্শন করিয়াছিলেন,কিয়ৎকাল পরে তাঁহার চক্ষুর নাশ হইল, অথচ পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এ স্মরণ কে করিতেছে? অবশ্যই যে অনুভব করিয়াছিল,সেই স্মরণ করিবে কিন্তু অনুভবিতা চক্ষুরিন্দ্রিয় বিদ্যমান নাই। অপর কাহা কর্ত্তৃক স্মরণও সম্ভবপর নহে, কারণ স্মরণ ও অনুভবের সামানাধিকরণ্য হেতু পরস্পর কার্য্য কারণ ভাব সম্বন্ধ। অনুভব করিয়াছিলেন গোবর্দ্ধন,স্মরণ করিলেন হরিহর, তাহা সম্ভব নহে। অবশ্যই ইন্দ্রিয়গণ ব্যতিরিক্ত কোন আত্মা আছেন, যিনি মন ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে পদার্থ দর্শন করিয়াছিলেন,এক্ষণে চক্ষুর নাশ হইলে তৎপদার্থের স্মরণ করিতেছেন।

মনও আত্মা নহে। জ্ঞানসুখাদি মনের ধর্ম্ম বা গুণ হইলে আমরা জ্ঞানসুখাদি অনুভব করিতে পারিতাম না। "ত্বঙ্মনঃ সংযোগো জ্ঞানসামান্যেকারণ" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইয়া মনের সংযোগ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যে সময়ে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত রূপের (বিষয়ের) সন্নিকর্ষ ও মনের সংযোগ হইয়া দর্শন জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই সময়ে কর্ণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের (বিষয়ের) সন্নিকর্ষ হইলেও মনঃ সংযোগাভাবে শ্রবণ উৎপন্ন হয় না। যদি মন মহৎ, বিভু বা ব্যাপনশীল পদার্থ হইত, তাহা হইলে যখন মন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া দর্শন জ্ঞানোৎপাদনে ব্যাপৃত ছিল, সেই সময়ে কর্ণেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া শ্রবণ জ্ঞানোৎপাদনেও ব্যাপৃত থাকিতে পারিত। তাহা হইলে যুগপৎ দর্শন শ্রবণাদিজ্ঞান উৎপন্ন হইত। কিন্তু সকলেই অনুভব করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য দর্শনও স্বীকার করিয়াছে যে, এককালে দুই বিষয়ে মনঃ সংযোগ করা যায় না। জ্ঞান সকলের যুগপৎ অনুপপত্তিহেতু মন মহৎ,বিভু বা ব্যাপনশীল পদার্থ নহে,সুতরাং মন অণু পদার্থ। অণু পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব মনেরও প্রত্যক্ষ অসম্ভব। যদি মনই অপ্রত্যক্ষ হইল,তাহা হইলে জ্ঞানসুখাদি মনের গুণ সমূহও অপ্রত্যক্ষ হইবে, অর্থাৎ চাক্ষুষাদি মানস পর্য্যন্ত কোন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইবে না। আমাদের মতে মন ব্যতীত এক স্বতন্ত্র ব্যাপনশীল আত্মা আছে, জ্ঞান সুখাদি উহারই গুণ,মনোরূপ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উক্ত জ্ঞান সুখাদির মানস প্রত্যক্ষ হয়।

উপরি লিখিত যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়গণ ইহাদের কেহই আত্মা নহে, অতএব এক অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যদি কোন নাস্তিক চক্ষুরাদি করণ আত্মরূপ কর্ত্তা ব্যতীত

দর্শনাদি ক্রিয়া নিষ্পাদনে অসমর্থ দেখিয়া চক্ষুরাদির করণত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক স্বতঃ প্রকাশ জ্ঞান সমষ্টিই আত্মা, সুখদুঃখাদি উহারই আকারবিশেষ বলিয়া অবধারণ করেন, তাহা হইলে তিনি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন, এ তর্কও যুক্তিসঙ্গত নহে।

জ্ঞানসমষ্টি আত্মা নহে। স্বভাবতই জ্ঞান জন্মিতেছে, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহ যথাক্রমে দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান সমূহের করণ বা সাধন নহে, এরূপ যুক্তি যাঁহারা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, স্বভাবত যে জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, তাহা কি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধীয় জ্ঞান, কি যৎকিঞ্চিৎ বিষয় সম্বন্ধীয় জ্ঞান? যদি অখিল ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধীয় জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সকলেই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়েন। আর যদি যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ের জ্ঞান হয়, তবে কোন্ বিষয়ের জ্ঞান এরূপ নিয়ামকের অভাব হইয়া পড়ে। কোন ব্যক্তিই কোন বস্তু নির্দ্দিষ্টরূপে দেখিতে পাইবেন না, কেননা কোন্ জ্ঞান জন্মিবে তাহার নিশ্চয় নাই। জ্ঞান স্বতঃ প্রকাশ স্বীকার করিলে ঘটাদিও জ্ঞান হইয়া পড়ে, জ্ঞাতব্য অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত কোন পদার্থই থাকে না। যদি বল জ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তু নাই, অতএব ঘটও জ্ঞান, তাহা হইলে অনুভূয়মান ঘটাদির অপলাপ করা হয়। যদি বল ঘট জ্ঞানেরই আকার বিশেষ, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই আকার জ্ঞানাতিরিক্ত কিছু কি না? যদি আকার জ্ঞানাতিরিক্ত কিছু হয়, তাহা হইলে আকারের জ্ঞান হইতে পারে না এবং জ্ঞানব্যতিরিক্তও পদার্থ আছে স্বীকার করা হয়। আর যদি আকার জ্ঞানাতিরিক্ত কিছু না হয়, তাহা হইলে সমূহালম্বনে নীলাকার ও পীতাকার হইয়া পড়ে, কেননা জ্ঞানের স্বরূপতঃ কোন বিশেষত্ব বা বিভেদ নাই। যদি বল অপোহরূপ অর্থাৎ অতদ্ব্যাবৃত্ত (different from what is not-that, *i. e.* a blue is that which is different from not-blue) নীলত্বাদি জ্ঞানের ধর্ম্ম হউক, অর্থাৎ নীলজ্ঞান হইবার সময় অনীল (পীত, শ্বেত ইত্যাদি) হইতে পৃথক্, এরূপভাবে জ্ঞান হউক, তাহা অসম্ভব, কেননা নীলত্ব ও অনীলত্ব, এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র জ্ঞানে সমাবেশ ব্যতীত, অনীল হইতে পৃথক্ নীল এরূপ জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই; অথচ নীলত্ব ও অনীলত্ব বিরুদ্ধধর্ম্ম একত্র জ্ঞানে সমাবেশিত হইতে পারে না। যদি বল নীলত্ব ও অনীলত্ব বিরুদ্ধধর্ম্ম একত্র জ্ঞানে সমাবেশিত হইতে পারে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, নীলত্ব ও অনীলত্ব এরূপ বিরোধ কিরূপে উপপন্ন হইল।

অতএব জ্ঞান সমষ্টি, ইন্দ্রিয়গণ, মন ও শরীরাতিরিক্ত বুদ্ধ্যাদিগুণবান্ ব্যাপনশীল এক আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সেই অবিনাশী আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। আত্মা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত ইহ জন্মে ভোগসাধন দেহ আশ্রয় করিয়াছেন। আবার বর্ত্তমান জন্মের ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত পুনরায় দেহান্তর আশ্রয় করিবেন। এরূপে অনন্তজন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইলে তাঁহাকে আর জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হইবে না ও তিনি চির নির্বৃতি লাভ করিবেন। কৈবল্য রত্নে উক্ত আছে—

যানি কর্ম্মাণি সংসার ফলহেতূনি সপ্তম।
তানি তৎসাধনত্বেন দেহমুৎপাদয়ন্তিবৈ॥
শরীরারম্ভকং কর্ম্ম যোগিনোঽযোগিনোঽপিবা।
বিনা ফলোপ ভোগেনৈব নশ্যত্য সংশয়ম্॥

হে সত্তম! যে সমস্ত কর্ম্ম সংসার ফল হেতু ভূত, তাহারা ফলভোগ সাধন দেহ উৎপন্ন করিয়া থাকে। যোগী বা অযোগী সকলেরই শরীরারম্ভক কর্ম্ম ফলোপভোগ ব্যতীত নিশ্চয়ই নষ্ট হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে—

নজায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতান বা ভূয়ঃ ন
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরণোনহন্যতে হন্যমানে শরীরে।
বাসংসিজীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথাশরীরাণি বিহায় জীর্ণা ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

ইঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না, ইনি অজ (জন্মশূন্য) নিত্য, ক্ষয় রহিত ও পুরাণ; শরীর বিনষ্ট হইলেও ইঁহার নাশ হয় না। যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন অপর দেহ গ্রহণ করেন।

ভগবান্ মনু স্মরণ করিয়াছেন—

যোঽস্যাত্মনঃ কারয়িতা তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রচক্ষতে।
যঃ করোতিতু কর্ম্মাণি সভূতাত্মোচ্যতে বুধৈঃ॥
শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্॥
এতা দৃষ্ট্বাস্য জীবস্য গতীঃ স্বেনৈব চেতসা।
ধর্ম্মতোঽধর্ম্মতশ্চৈব ধর্ম্মে দধ্যাৎ সদা মনঃ॥

যিনি এই শরীরকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা বলে এবং যে কর্ম্ম করে, তাহাকে পণ্ডিতেরা পাঞ্চভৌতিক দেহ বলেন। মনুষ্য শারীরিক পাপদ্বারা স্থাবর যোনি, বাচিক পাপদ্বারা তির্য্যগ্ যোনি ও মানসিক পাপদ্বারা অন্ত্যজাতি প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে জীবের যে সকল দশা উপস্থিত হয়, তাহা স্বয়ং অবলোকন করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে।

কুসুমাঞ্জলিতে, ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক অতীন্দ্রিয় অদৃষ্ট, পরোলোকের হেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সাপেক্ষত্বাদনাদিত্বা বৈচিত্র্যাদ্বিশ্ববৃত্তিতঃ।
প্রত্যাত্মানয়মাদ্ভুক্তেরস্তি হেতুরলৌকিকঃ॥

যেহেতু প্রত্যেক কার্য্য কারণের সাপেক্ষ, সংসার অনাদি, জগৎ বিচিত্র ও লোকের স্বর্গাদি ফললাভের নিমিত্ত যাগাদিতে প্রবৃত্তি হয়; এবং প্রত্যেক আত্মা স্বকীয় কর্ম্মফল স্বয়ংই ভোগ করিয়া থাকে। অতএব পরলোক সাধন অদৃষ্টনামক অলৌকিক হেতু বিদ্যমান আছে। সংসারের প্রত্যেক কার্য্যই কোন নির্দ্দিষ্ট কারণ সাপেক্ষ, অকারণে কিছুই উৎপন্ন হয় না। অতএব আমাদের দেহও অকারণ উৎপন্ন হয় নাই। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যই এ দেহোৎপত্তির কারণ। যদি বল প্রত্যেক কার্য্যই কারণের উপর নির্ভর করিলে শেষ সীমায় যাইয়া যে কারণে পৌঁহুছিবে, তাহার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে, যখন সংসার অনাদি, তখন ইহার শেষ সীমায় কিছুতেই উপস্থিত হওয়া যায় না। যদি কেবল ব্রহ্ম বা প্রকৃতিই এই সংসারের কারণ হইতেন, তাহা হইলে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র এরূপ বৈচিত্র্য হইল কেন? বিচিত্র কারণ ব্যতীত বিচিত্র কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। যদি এক ব্রহ্মই সংসারের কারণ হইতেন, অদৃষ্ট নামক অপর কোন কারণ বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে ব্রহ্ম কাহাকেও সুখী, কাহাকেও দুঃখী সৃষ্টি করিয়া বৈষম্য (partiality) ও নৈর্ঘৃণ্য (cruelty) দোষের আস্পদ হইতেন। অতএব এই বৈচিত্র্যের কারণ অদৃষ্ট। আরও দেখ, সংসারের সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই স্বর্গাদি ফলকামনায় যাগাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যদি স্বর্গ নরকাদি কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে বিশ্বের লোকের যাগাদিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? বহুকাল পূর্ব্বে যাগাদি ব্যাপারের ধ্বংস হইলেও তজ্জনিত অদৃষ্ট ভোগকাল

পর্য্যন্ত আত্মায় বিদ্যমান থাকে। ভোগের শেষ হইলেই অদৃষ্টের শেষ হয়। প্রত্যেক আত্মা স্বকীয় কর্ম্মের ফল স্বয়ংই ভোগ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান জন্মের সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্ম-সম্ভূত অদৃষ্ট আত্মায় বিদ্যমান থাকিয়া মৃত্যুর পর আত্মাকে দেহান্তর আশ্রয় করায়। এই জন্মেই সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, কেননা

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি"

শতকোটী কল্পেও অভুক্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। অতএব এই জন্মের পর জন্ম আছে। ইহার পূর্ব্বেও জন্ম ছিল। অবিনাশী কোন আত্মা বিদ্যমান না থাকিলে, বালকের স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি হইত না। ইষ্টসাধনতাজ্ঞান না থাকিলে প্রবৃত্তি জন্মে না। জন্মের অব্যবহিত পরে বালকের কোন ইষ্টসাধনতা জ্ঞান থাকে না, তবে তাহার স্তন্যপানে কেন প্রবৃত্তি জন্মিবে? তাহার অবিনাশী আত্মা জন্মান্তরানুভূত ইষ্ট-সাধনত্বের স্মরণ করিতেছে বলিয়া প্রবৃত্তি জন্মিতেছে। উদ্বোধকাভাবে জন্মান্তরানুভূত অন্য কিছু স্মরণ করিতে পারিতেছে না। যখন উপযুক্ত উদ্বোধক (Association or Stimulation) উপস্থিত হইবে, তখন তাহার প্রত্যেক প্রবৃত্তিরই বিকাশ হইবে। এখানে জীবনাদৃষ্টকেই স্তন্যপানে প্রবৃত্তির উদ্বোধক বলিতে হইবে। এইরূপে সংস্কারের অনাদিত্ব নিবন্ধন আত্মা অনাদি। অনাদিভাবের নাশ হয় না, অতএব আত্মা নিত্য।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ, মহাশয় গত আশ্বিন মাসের সাহিত্যে "একটী পুরাতন বিষয়" শীর্ষক প্রবন্ধে আত্ম-নিরূপণের যে অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। তিনি বলেন "পরস্পর-কিয়দংশে-সদৃশ ও কিয়দংশে-বিসদৃশ-রূপে প্রতীত এই জ্ঞান সমূহের যে সমষ্টি, তাহারই নাম অথবা অভিধান, অথবা সংজ্ঞাই আত্মা অথবা আমি।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, জ্ঞান সমূহ কি? ইহারা কিরূপে উৎপন্ন হইল? তিনি বলিবেন, এ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য। স্বতঃ প্রকাশ জ্ঞান সমষ্টি যে আত্মা নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে বক্তব্য এই যে জড়জগৎ কিরূপে বিজ্ঞান জগতে পরিণত হইল, physical phenomena কিরূপে psychical phenomena হইয়া পড়িল, এ অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন পরিত্যাগ করিলে প্রশ্নের সিদ্ধান্ত অনেক পরিমাণে স্বীকারই করিয়া লওয়া হইল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিবেন, রূপ কর্ত্তৃক চাক্ষুষ স্নায়ু অভিহত হইলে, তন্মধ্যস্থিত স্বচ্ছ তরল পদার্থের কম্পন হয় এবং তন্মধ্যে এক প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া মস্তিষ্ক কেন্দ্র বা মস্তকের স্নায়ুকে আঘাত করতঃ দর্শনজ্ঞান উৎপন্ন করে। শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদন, স্পর্শন-আদি জ্ঞানেরও এইরূপে উৎপত্তি হইয়া থাকে। ক্রমে Sensation (নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান) হইতে perception (বেদনা,) imagination (সংস্কার) conception (সবিকল্পকজ্ঞান) judgement (পক্ষতাজ্ঞান) ও reasoning (যুক্তি অনুমানাদি) ইত্যাদি জটিলতর জ্ঞানের উদ্ভব হয়। কিন্তু স্নায়বিক উত্তেজন (nervous stimulation কিরূপে নির্ব্বিকল্পজ্ঞান (sensation) পরিণত হইল, এ জটিলতার ভঞ্জন পদ্ধতি, এখনও বোধহয় সম্যক আবিষ্কৃত হয় নাই। একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক পণ্ডিত (James Sully) লিখিয়াছেন :—

"This doctrine is known as that of human automatism, the doctrine that we are

essentially nearvous machines with a useless appendage of consciousness somehow added. The doctrine obviously fails to explain why consciousness should appear on the scene at all."

যদি জ্ঞান সমূহকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ভেদজ্ঞান (differentiation), সাদৃশ্যজ্ঞান (assimilation), উদ্বোধক (association) ও ধারণা (retentiveness) ইত্যাদি যত ইচ্ছা ধরিয়া লওয়া হউক, তাহাতে জটিলতার সমাধান কি হইল? এখানে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যে সকল জ্ঞান রামেন্দ্র বাবু স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া লইয়াছেন তাহারা, কি একাকার জ্ঞান? কি তাহাদের কোন বিভেদ আছে? যদি একাকার জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সাদৃশ্যজ্ঞান, ভেদজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানের বিভেদ কিরূপে উৎপন্ন হইল? যদি জ্ঞানগুলি পরস্পর বিভিন্ন হয়, তাহা হইলে বিভেদসম্বন্ধ নামক অতিরিক্ত জ্ঞান স্বীকারের কি প্রয়োজন? বিভিন্ন জ্ঞান উৎপন্ন হইল বলিলেই ত বুঝাযায় যে, আমি জানি ইহা হইতে ইহা পৃথক, তবে আর অতিরিক্ত বিভেদ সম্বন্ধের কল্পনায় 'কি প্রয়োজন? রামেন্দ্র বাবু যে জ্ঞান সমষ্টির কথা বলিয়াছেন, সে সমষ্টি কিরূপে উৎপত্তি হইল? তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। অবশ্যই জ্ঞানের দৈশিক ব্যাপকতা (extension in space) তিনি স্বীকার করেন না, তবে কালিক সম্বন্ধ (relation in time) তিনি মানেন। তাঁহার মতে যখন জ্ঞানাতিরিক্ত কোন জ্ঞাতা নাই, তখন সেই জ্ঞান সমূহের সমষ্টি কোথায় হইল? আর জ্ঞানের সমষ্টিবলিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানের স্মরণ ও বর্ত্তমান জ্ঞান এই দুইএর সমষ্টি বুঝিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বপূর্ব্ব জ্ঞানের স্মরণ কে করিল? আর জ্ঞান সমূহ কাহার নিকটই বা সদৃশ বিসদৃশ রূপে প্রতীত হইল? কেননা তাঁহার মতে জ্ঞানের প্রত্যেতা (জ্ঞাতা) নাই, অথচ জ্ঞান প্রতীত হইতেছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে "জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে কে বলিল?" আমরা বলি ক্রিয়া মাত্রেরই কর্ত্তা আছে, কর্ত্তৃবিহীন ক্রিয়া বা ক্রিয়াবিহীন কর্ত্তা, আমরা অনুভব করিতে পারি না। বস্তুতঃ কর্ত্তার কার্য্যই ক্রিয়া, ক্রিয়ার কারকই কর্ত্তা সুতরাং অনুমান প্রণালী দ্বারা জ্ঞানের জ্ঞাতা নিরূপিত হইবে।

ক্রিয়া মাত্রের কর্ত্তা আছে জ্ঞানক্রিয়া সুতরাং জ্ঞানের কর্ত্তা (জ্ঞাতা) আছে।	জ্ঞানং কর্ত্তৃবৎ ক্রিয়াত্বাৎ ঘট নির্ম্মাণবৎ।

এখানে যদি রামেন্দ্র বাবু বলেন যে, জ্ঞানাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা আছে কি না, তাহা পূর্ব্বে নির্দ্ধারণ না করিয়া ক্রিয়া মাত্রের কর্ত্তা আছে, এরূপ ব্যাপিণীপ্রতিজ্ঞা (universal proposition) কিরূপে ধরিয়া লওয়া যায়। আমাদের উত্তর এই যে, মানবের অনুভবে অর্থাৎ নিশ্চিত জ্ঞানে যত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক ক্রিয়ার কর্ত্তা আছে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কেহ কখনও ইহার ব্যভিচার দেখেন নাই। অতএব এই ব্যাপিণী প্রতিজ্ঞা লইয়া বর্ত্তমান অজ্ঞাত বা অনিশ্চিত প্রতিজ্ঞার অনুমান করিতে হইবে। যদি সৃষ্টির আদি হইতে অন্তপর্য্যন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ঘটনা দেখিয়া একটী ব্যাপিণী প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিতে হইত, তাহা হইলে যুক্তির অধিরোহণ (Induction) ও অবরোহণ (deduction) প্রণালী অসম্ভব হইয়া পড়িত। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রবাবু যদি এই প্রতিজ্ঞায়ই সন্দেহ করেন তাহা হইলে প্রচলিত ইংরেজী অনুমান প্রণালী কিরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

সক্রেটিস্ মরণধর্ম্মবান্ মনুষ্যত্বাৎ হরিবৎ।

All men are mortal Socrates is man Socrates is mortal.	সক্রেটিস্ মরণধর্ম্মবান্ মনুষ্যত্বাৎ হরিবৎ।

ইত্যাদি প্রতিজ্ঞায় পূর্ব্ব পক্ষেই সিদ্ধান্ত অন্তর্নিহিত আছে। সক্রেটিস্ মরণ ধর্ম্মবান্ কি না, তাহার নির্দ্ধারণনা করিয়া মানবমাত্রইমরণ ধর্ম্মবান্, এরূপ প্রথম পক্ষ কিরূপে স্থাপিত হইল? মানবের নিশ্চিত জ্ঞানে যত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে মনুষ্যত্ব ও মরণ ধর্ম্মবত্বের সামানাধিকরণ্য ছিল। এই ঐকাধিকরণ্য দেখিয়া বিশ্বের সমস্ত মনুষ্যকে পরীক্ষা না করিয়াই মানব মাত্রই মরণ ধর্ম্মবান্ প্রতিজ্ঞা স্থাপন করা যায়। অতএব বিপরীত-বাদী যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন প্রত্যক্ষ নিশ্চিত দৃষ্টান্ত

দেখাইয়া "ক্রিয়া মাত্রের কর্ত্তা আছে" এই ব্যাপিনী প্রতিজ্ঞার ব্যভিচার প্রমাণ করিতে না পারিবেন, ততক্ষণ "জ্ঞানের জ্ঞাতা আছে কি না?" এরূপ ভাবের যত সন্দিগ্ধ (doubtful cases) অনিশ্চিত (uncertain cases) প্রতিজ্ঞা আসিবে, সে সকলকেই আমরা উক্ত প্রতিজ্ঞা দ্বারা পরীক্ষা করিব।

জ্ঞানসমষ্টি আত্মা নহে, জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞাতা আছে ইহা যে কেবল হিন্দু দর্শনেরই মত, তাহা নহে, মহামতি জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিল ও উহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন :—

"If, therefore, we speak of the mind as a series of feelings we are obliged to complete the statement by calling it a series of feelings which is aware of itself as past and future; and we are reduced to the alternative of believing that the mind or ego, is something different from any series of feelings, or possibilities of them, or of accepting the paradox, that something which *ex hypot hesi* is but a series of feelings, can be aware of itself as a series."

আত্মতত্ত্ব অতি গহন বিষয়, উহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আইসে না। অতএব শ্রুতি এবিষয়ে কিরূপ মীমাংসা করিতেছেন, দেখা যাউক। শ্রুতি বলেন :—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ"।

"অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা" ইত্যাদি।

কঠ শাখায় উক্ত আছে :—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইত্যাদি
ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্নবভূব কশ্চিৎ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো ন হন্যতে
হন্যমানে শরীরে॥

হন্তাচেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌতৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত আছে :—

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্যো অভিচাকশীতি॥

সুন্দর পক্ষযুক্ত দুইটী পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সখা। তাহার মধ্যে একটী (জীবাত্মা) সুস্বাদু কর্ম্ম ফল ভোগ করেন, অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন মাত্র করেন। অতএব সংস্কৃত ও ইংরেজী দর্শন এবং উপনিষদাদি দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

যদি কেহ মনে ভাবে, জগতের কর্ত্তা অথবা আত্মা বলিয়া কিছু নাই, যতদিন আমি এই পৃথিবীতে আহার বিহার ক্রিড়া কৌতুক করিব, ততদিনই আমার, ইহার পর আমার এই নশ্বর ভৌতিক দেহ ভূতে মিশিয়া যাইবে, "আমি" বলিয়া জগতে আর কিছুই থাকিবে না, আমি জীবের প্রতি দয়াই করি, আর হিংসাই করি, সত্য কথাই বলি অথবা শঠতা প্রবঞ্চনাই করি, ইন্দ্রিয় সমূহকে নিগ্রহই করি কিম্বা অবাধ পরিচালনা করি, দানই করি আর ঋণ করিয়াই ঘৃত ভোজন করি, আমার কৃতকর্ম্মের জন্য আমি দায়ী নহি। আমার কার্য্যের পুরস্কর্ত্তা বা দণ্ডবিধাতা কেহ নাই, তাহা হইলে এই জীবন কিরূপ নীরস বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, নিরাশা আসিয়া কি প্রকারে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিবে! বস্তুতঃ নাস্তিকের জীবন ভীষণ যন্ত্রণাময়। অনেক তার্কিক প্রথমে ঈশ্বরের ও আত্মার সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছেন, শেষে জীবনাবসান সময়ে পরলোকের ভয়াবহ ভাব স্মরণ পূর্ব্বক, পূর্ব্ব সঞ্চিত যুক্তিরাশি বিসর্জ্জন দিয়া ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন।

যদি এ জগতে কেহই ঈশ্বর বা আত্মার অস্তিত্ব অঙ্গীকার না করে, সকলেই পাপ পুণ্যকে অলীক কল্পনা সম্ভূত মনে ভাবে, তাহা হইলে বেদ কোরাণ বাইবেল প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রের কার্য্যকারিতা বিলুপ্ত হইয়া যায়। শাস্ত্রের অনুশাসন অথবা আইনের বন্ধন মিথ্যা জানিয়া কেহই তাহাতে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে না। মানবসমাজ উচ্ছৃঙ্খল হওয়ায় পৃথিবী এক অভিনব ভীষণতর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া অধোগতির নিম্নতম সীমায় নীত হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য।

বর্ষার বোধন।

বিষম বরষা আজি ; সান্দ্র অন্ধকার
মৃত্যু মেঘছায়া রূপে এসেছে ঘেরিয়া ;
ঝর্ঝর ঝরে ধারা, বৃষ্টি অনিবার,
অশনি সঘন-ঘনে উঠিছে শ্বসিয়া ;
গর্জ্জিছে জীমূত-মন্দ্র কম্পিত গগনে ;—
আমি পান্থ সঙ্গীহীন সংসার-গহনে। ১

ছিল একদিন, নাট্যশালা সম যবে
পরিপূর্ণ প্রীতিরসে, উল্লাস-লালসে
উথলিত এ আলয় ; আনন্দ-উৎসবে
কাটিত চঞ্চল কাল, নিদ্রার পরশে
সুদীর্ঘ-প্রহর নিশি নিমিষের প্রায় ;
ছিল সেই একদিন, আজি নহে, হায় !২

ছিল প্রেমসাথী এক ; সন্ধ্যায় প্রভাতে
নিশ্বাস-মলয়ে যা'র উঠিত শিহরি'
হৃদি মোর, শর্ব্বরীর স্নেহবারি পাতে
সদ্যসিক্ত শতদল সম ; প্রাণ ভরি'
সে পুণ্য সৌরভ-সুধা মধু করি' পান
সকল সংশয়-ব্যথা হ'ত অবসান। ৩

তখন ছিলাম যেন প্রকৃতির কোলে
শান্ত শিশু অতি সুকুমার ;—ঋতুরাজ
আপনি যোগা'ত ফুল ; সুনীল নিচোলে
বীজনিত নীলাম্বর ; পরি' নব সাজ
নিত্য বসি' বীণাপাণি মানস-শিয়রে
কাব্যছন্দে দিব্য হাসি ফুটা'ত অধরে। ৪

হায় ! লুপ্ত আজি সব ; অদৃষ্ট পবনে
একে একে দীপগুলি আইল নিবিয়া ;
সঙ্গে সে উৎসব-রব, যৌবন-কাননে
অনাঘ্রাত ফুলমালা রহিল পড়িয়া ;—
দাঁড়াইনু পথে আমি ; হ'ব অগ্রসর,
সম্মুখে বরষা-সিন্ধু হেরিনু দুস্তর। ৫

কতবার করিনু কামনা, জীবনের
ছিন্ন গ্রন্থি-অবশেষ করিয়া ছেদন,
একেবারে পশি গিয়া মহা অনন্তের
চির-অন্ধকার মাঝে ; ত্যজি' এ ভুবন
অজ্ঞাত, নিভৃত, নিত্য রহস্যের ছায়
দেখি আরও দেখিবার আছে কি কোথায় !৬

কিন্তু অন্তর্যামি দেব ! এ মম অন্তর
জান তুমি ;—নহি আমি সংসারের রণে
ভীরু-কাপুরুষ, শক্তিহীন ক্ষীণ নর ;
যুঝিয়াছি বীরবেশে ; তরঙ্গ-তর্জ্জনে
বজ্রনাদে বৃষ্টিপাতে বক্ষ প্রসারিয়া,
আজন্মের সে গৌরব রেখেছি ধরিয়া। ৭

আজিও দুর্দ্দিনে তাই চাহি পুনর্ব্বার
মহান্ মন্দির নব করিতে সৃজন ;
পবিত্র ত্রিকালজয়ী উপাদান যা'র
যোগাইবে ত্রিজগৎ ; করিয়া হেলন
দারিদ্র্য-দীনতা-ভরা মর্ত্ত্যের প্রবাসে
অভ্রভেদী চূড়া যা'র উঠিবে আকাশে।৮

বিপুল বাসনা হেন বহিয়া মানসে
মুছিয়াছি অশ্রুনীর ; জীর্ণ এ হৃদয়
বাঁধিয়াছি বজ্রময় অন্তিম সাহসে ;
পাতিয়া মঙ্গল-ঘট, শুভ্র চিন্তাচয়
গাঁথিয়া কুসুম সম, হে বিশ্ব-শরণ,
করিতেছি বরষায় তোমারই বোধন। ৯

দেখিনে, জানিনে, আমি চিনিনে তোমারে ;
শুধু এ সৌন্দর্য্য ঘন সৃষ্টি পানে চাহি'
করিয়াছি অর্দ্ধ অনুভব ; আপনারে
করি' বিশ্লেষণ, সন্তর্পণে অবগাহি'
অন্তরের অন্তহারা অকূল মাঝার,
বুঝিয়াছি স্বপ্নসম রহস্য অপার। ১০

বরষার মেঘমন্দ্রে করেছি শ্রবণ
গম্ভীর আহ্বান-রব ; বসন্ত-বাতাসে
পরশিয়া স্নিগ্ধ কর পল্লব মতন
উঠেছি কাঁপিয়া ; শরতের শুভ্রহাসে
হেরেছি বয়ান-বিভা, নিদাঘ-সন্ধ্যায়
সকল সন্তাপহারী পেয়েছি তোমায়। ১১

বিশ্বলীন মূর্ত্তি সেই আজি একবার
করিয়া গ্রহণ, গৃহ-দেবতার ভাসে
অপূর্ব্ব আলোক-গর্ব্বে অন্তর আগার
উজলিয়া, দেখা তুমি দাও আসি দাসে ;
মিটাও এ উগ্রক্ষুধা, কাঙাল-কামনা,
উদ্গ্রীব আগ্রহ-ভরা অশান্ত প্রার্থনা। ১২

যৌবন-নিকুঞ্জে মোর লুণ্ঠিত ভূতলে
সে তরুণ তরু আর চাহিনা তুলিতে ;
এস তুমি ; দুর্ব্বলেরে নিজ পদবলে
কর সর্ব্বরিপুজয়ী ; হৃদয়-ভূমিতে
স্বহস্তে দেউলখানি করিয়া নির্ম্মাণ
চির-অধীশ্বর রূপে কর অধিষ্ঠান।১৩

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল।

আজ কাল অনেকেই যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেক ঐতিহাসিক মীমাংসাও হইয়া গিয়াছে। আবার সেই পুরাতন কথার উত্থাপনে প্রয়োজন কি? এ প্রশ্ন অনেকের মনে উদিত হইতে পারে।

দুই প্রণালীতে যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। একটি জ্যোতিষিক, অপরটি ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক প্রণালীতে ঐ কাল সম্যক্ বিচারিত হইয়াছে। জ্যোতিষিক প্রণালী দ্বারা লব্ধকালও আলোচিত হয় নাই, এমন নহে। তবে এ বিষয়ের মীমাংসা আমি যতদূর দেখিয়াছি—অবলম্বিত গণনাপ্রণালীর সহিত কোন কোন বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বিবাদ আছে। তাই এ প্রবন্ধের অবতারণা। পাঠকগণের বোধসুকর করিবার নিমিত্ত জ্যোতিষিক উপায়গুলি কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে বলা যাইতেছে।

১। বরাহমিহির তাঁহার বৃহৎসংহিতায় দুইটি শ্লোক নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই শ্লোক দ্বয়ের প্রকৃত অর্থগ্রহ এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারেন নাই। নানাবিধ অনুমানের অভাব নাই সত্য, কিন্তু কোনও অনুমান তত সন্তোষপ্রদ বোধ হয় না। আমিও একটা অনুমান করিতেছি। পাঠকগণ ইহার সত্যাসত্য বিচার করিবেন।

শ্লোক দুইটি অনেকবার উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাদের সারার্থ এই। বরাহমিহির লিখিয়াছেন যে "বৃদ্ধ গর্গের মতানুসারে যুধিষ্ঠির নৃপতির পৃথ্বী শাসনকালে সপ্তর্ষিগণ মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। শকাব্দার সহিত ২৫২৬ বর্ষ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে কত বর্ষ গত হইয়াছে, তাহা জানা যায়। এক এক নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ শতবর্ষ পর্য্যন্ত বিচরণ করেন।" খগোলের উত্তরাংশে সপ্তর্ষি নামক সাতটি তারকা আছে। তাঁহারা মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, ইহার অর্থ কি? এবং তাঁহারাই বা কি অর্থে এক এক নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন? দুইটি অর্থ লইয়াই গোলযোগ।

বিষ্ণুপুরাণের ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েঐরূপ ভাবের কয়েকটি শ্লোক আছে *। তাহাদের অর্থ এই। সপ্তর্ষিগণের যে দুইটি তারা পূর্ব্বদিকে উদিত হইতে দেখা যায়, তাহাদের মধ্য দিয়া একটি রেখা টানিলে সেই রেখা অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্র দিয়া গমন করে। আমাদের একশত বর্ষ পর্য্যন্ত সপ্তর্ষিগণ এক এক নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন। পরীক্ষিতের সময় সপ্তর্ষিগণ মঘা নক্ষত্রে ছিলেন এবং তখন কলির দ্বাদশ শতবর্ষ প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

পাঠক দেখিবেন যে সেই এক কথা। অতিরিক্তের মধ্যে পরীক্ষিতের সময়ে কলির দ্বাদশশত বর্ষ গত বলা হইয়াছে। বৃদ্ধ গর্গাচার্য্য মতে বরাহমিহির বলেন যে, যুধিষ্ঠিরের সময় জানিতে হইলে শকাব্দার সহিত ২৫২৬ বর্ষ যোগ করিতে হয়। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, আজ অবধি ২৫২৬+১৮১৬=৪৩৪২ বর্ষ পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির ছিলেন। এখন কলির ৪৯৯৫ বর্ষ গত। অতএব এই মতে যুধিষ্ঠিরের সময় কলিযুগ আরম্ভের পরে ৬৫৩ বর্ষ গত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণকার বলিতেছেন, তখন কলির প্রায় ১২০০ বর্ষ। এখানে আবার বৃদ্ধ

* ভাগবত পুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐ কয়েকটি শ্লোক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে দৃষ্ট হয়। শ্লোকগুলির সামান্য অর্থ লইয়াও মতভেদ আছে। কিন্তু ভাবার্থ সকলের একই।

গর্গ ও পুরাণকারের মধ্যে বিবাদ। বরাহমিহির বৃদ্ধ গর্গকে বিশেষ সমাদর করিয়াছেন। বৃদ্ধ গর্গ একজন জ্যোতিষী ছিলেন। এখন প্রশ্ন এই যে, জ্যোতিষীর না পুরাণকারের কথা গ্রাহ্য করা যাইবে? যাহা হউক, যুধিষ্ঠিরের বা পরীক্ষিতের সময় সপ্তর্ষিগণ মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, একথা দুই জনেই স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল।

আলবেরুণী নামক জনৈক আরবী পণ্ডিত ও পথিক প্রায় শক ৯৫৩ অব্দে ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ভারতের নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া এক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনিও বরাহমিহিরের সপ্তর্ষিগণ সম্বন্ধে মতটি তীব্র সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। বৃদ্ধ গর্গের ভিত্তি কাল্পনিক বা মিথ্যা বলিতেও ত্রুটি করেন নাই। বৃহৎ সংহিতায় উক্ত শ্লোক গুলির তিনি যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, এক এক নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ ৬০০ বর্ষ থাকেন। বোধ হয় তিনি ভুল করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, তিনি ৯৫২ শকাব্দার একখান কাশ্মীরের পঞ্জিকা দেখেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে, তখন অনুরাধা নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণের ৭৭ বর্ষ গত হইয়াছিল। মঘা দশম নক্ষত্র, অনুরাধা সপ্তদশ নক্ষত্র। অন্তর ৭ নক্ষত্র—৭৭ বর্ষ। সপ্তর্ষির এক এক নক্ষত্রে শত বর্ষ ভোগ ধরিলে ঐ অন্তর ৭৭৭ বর্ষ পাওয়া যায়। সুতরাং মনে করিতে হইবে যে, সপ্তর্ষিগণ মঘা হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার মঘাতে আসিয়াছিলেন এবং তথা হইতে শকের ৯৫২ অব্দে অনুরাধায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৭ নক্ষত্রের ভোগকাল ২৭০০ বর্ষ; উহাতে ৭৭৭ বর্ষ যোগ করিলে ৩৪৭৭ বর্ষ হয়। অর্থাৎ যুধিষ্ঠির শক ৯৫২ অব্দ হইতে ৩৪৭৭ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ এখন হইতে ৪৩৪২ বর্ষ পূর্ব্বে ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, কাশ্মীরের পঞ্জিকাকারের গণনা বৃদ্ধ গর্গের অনুরূপ। সম্ভবতঃ কাশ্মীরের পঞ্জিকাকার বরাহমিহিরোক্ত বৃদ্ধ গর্গের বচনকেই তাঁহার গণনার মূল ধরিয়াছিলেন।

আমরা উপরে দেখিলাম যে, বৃদ্ধ গর্গের বচন অনুসারে যুধিষ্ঠির প্রায় ২৪০০ খৃঃ পূর্ব্বে এবং পুরাণকারের মতে প্রায় ১৯০০ খৃঃ পূর্ব্বে ছিলেন ··· ··· ··· (ক)

সপ্তর্ষিগণের মঘা নক্ষত্রে থাকার কি অর্থ হইতে পারে, তাহার বিচার করা যাউক। বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণ চরিত্রে লিখিয়াছেন যে, "যেমন ইংলণ্ড ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমন সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে পুরাণকার ঋষি কি গাঁজা খাইয়া এই সকল কথা লিখিয়াছেন? এমন কথা আমরা বলিতেছি না, আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি যে, এই প্রাচীন উক্তির তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য নহে।"

মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষির অবস্থিতির সহিত ভারতবর্ষে ইংলণ্ড থাকার তুলনাটি যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। কেননা, পুরাণকার এমন কথা বলেন নাই যে, সপ্তর্ষিগণ সশরীরে ৫০।৬০ অংশে দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। সূর্য্য-সিদ্ধান্ত মতে লুব্ধক তারা (Sirius) ক্রান্তিবৃত্তের ৪০ অংশ দক্ষিণে অবস্থিত। অথচ মিথুন রাশির বিংশতি অংশে লুব্ধক আছে, একথা লিখিত আছে। বাস্তবিক, বঙ্কিম বাবু এখানে একটা ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, পুরাণকার সপ্তর্ষির দুইটি তারা দিয়া উত্তর দক্ষিণে একটা রেখা টানিতে বলিয়াছেন। সেই রেখাটি যুধি-

ষ্ঠিরের সময় রাশি চক্রকে মঘা নক্ষত্রে বিদ্ধ করিত। বিষ্ণু পুরাণের দ্বিতীয় অংশের ৭।৮।১২ অধ্যায়ে অনেক জ্যোতিষিক বিষয় বর্ণিত আছে। পুরাণকার যে সপ্তর্ষি বা মঘা চিনিতেন না, এমন সন্দেহ কিছুতেই হইতে পারে না।

এই সকল বিচার করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, (১) সপ্তর্ষির একটা বিশেষ অর্থ ছিল (২) ইহার একটা গতি ছিল, এবং (৩) এতদ্দ্বারা জ্যোতিষিক কোন বিশেষ ঘটনা ব্যক্ত হইত। সপ্তর্ষিরেখা শব্দের পরিবর্ত্তে সম্ভবতঃ সপ্তর্ষি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্যোতিষে এরূপ শব্দ-সংক্ষেপের দৃষ্টান্তের অভাব নাই, অতএব পুরাণকার যেমন আভাষ দিয়াছেন, তদনুসারে সপ্তর্ষি অর্থে সপ্তর্ষিরেখা বুঝিতে হইবে। তাহাই যদি ঠিক হয়,তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহা দ্বারা জ্যোতিষিক কোন্ রেখা বুঝিতে হইবে ?

জ্যোতিষিক গণনার নিমিত্ত গতিশীল দুইটি রেখা বা বৃহদ্বৃত্ত কল্পিত হয়। একটি ক্রান্তিপাত বিন্দু দিয়া, অন্যটি অয়নান্ত বিন্দু দিয়া গমন করে। ইংরাজিতে এই দুইটির নাম Epuinoctial colure এবংSolstitial colure গণনার পক্ষে উভয়েরই একই প্রকার ব্যবহার, একই ফল। ইংরাজি জ্যোতিষে ক্রান্তিপাতগতরেখার সমধিক ব্যবহার, আমাদের জ্যোতিষে অয়নান্ত রেখার তাদৃশ ব্যবহার। আমরা ক্রান্তিপাতের চলন না বলিয়া অয়নচলন বলি।

অতএব সপ্তর্ষিরেখা অর্থে অয়নান্তবৃত্ত এবং সপ্তর্ষির গতি অর্থে অয়নচলন বুঝিতে হইবে। বেণ্টলী সাহেবও বলেন, সপ্তর্ষির গতি অর্থে ক্রান্তিপাত বা অয়নগতি সূচিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে "মঘানক্ষত্রে সপ্তর্ষির স্থিতি ও তাহাদের অন্যান্য নক্ষত্রে গতি, অয়নচলন পরিমাণ করিবার একটা উপায় স্বরূপ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মঘা নক্ষত্রের আদি দিয়া কদম্বসূত্র ধরিলে, তাহা সপ্তর্ষিগণকে ভেদ করিয়া যায়। সপ্তর্ষি দিয়া ঐ রেখা টানা যায় বলিয়া ঐ রেখার নামও সপ্তর্ষি হইয়াছে। উহা মঘা নক্ষত্রে চিরকাল আছে। সুতরাং তাহা কখন কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিত, তাহা জানিতে পারিলেই অয়নচলনের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল।"

বেণ্টলী সাহেবের পুস্তক পাঠ করিলে পদে পদে তাঁহার ভারতবিদ্বেষ ভাব লক্ষিত হয়। তিনি ভারতীয় আর্য্যগণকে প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী বলিতে কোন স্থানে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের অপরাধ এই যে, তাঁহারা সত্য ত্রেতা যুগাদি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। যেমন করিয়াই হউক, ভারতের জ্যোতিষ অত্যন্ত আধুনিক এবং তাহাও পাশ্চাত্যদেশ হইতে "চোরাই মাল' এই কথা প্রতিপাদনই তাঁহার পুস্তক লেখার অভিপ্রায় বোধ হয়। সুতরাং তিনি জ্যোতিষী হইলেও তাঁহার মত গ্রাহ্য নহে। এ কথা অনেকে অনেক স্থলে ব্যক্ত করিয়াছেন। বেণ্টলী সাহেব, যুধিষ্ঠির পরাশর ও গর্গকে সমসাময়িক ঠাওরাইয়াছিলেন। পরাশরসিদ্ধান্ত ও গর্গসংহিতার কাল নিরূপণ করিয়া তিনি সেই কালে যুধিষ্টিরের অভ্যুদয় স্থির করিয়াছেন। "এইরূপ গণনা করিয়া বেণ্টলী যুধিষ্টিরকে ৫৭৫ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে আনিয়া ফেলিয়াছেন।"

সপ্তর্ষির অর্থ আমি যেরূপ দেখাইলাম, তাহাতে কোন আপত্তি দেখি না। এক্ষণে ঐ অনুমানটি সত্য মনে করিয়া গণনা করা যাইতেছে। যুধিষ্টিরের সময় সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিল। ইহার অর্থ তবে এই হইল যে, তাঁহার

সময়ে রবির দক্ষিণায়ন মঘা নক্ষত্রে ঘটিত। বরাহমিহির তাঁহার পঞ্চ সিদ্ধান্তিকায়, পুনশ্চ বৃহৎ সংহিতায় লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বে রবির দক্ষিণায়ন অশ্লেষা নক্ষত্রের অর্দ্ধে ঘটিত। যুধিষ্ঠির বা পরীক্ষিতের সময় তাহা মঘাতে ঘটিত, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

পঞ্জিকা দেখিলে জানা যায় যে, আজকাল রবির দক্ষিণায়ন আর্দ্রা নক্ষত্রের ৮০ কলায় ঘটিতেছে। আর্দ্রা ষষ্ঠ নক্ষত্র, মঘা দশম নক্ষত্র *। অতএব বলিতে হইবে যে, দশম নক্ষত্র হইতে ষষ্ঠ নক্ষত্রে অয়ন সরিয়া আসিয়াছে। মঘা নক্ষত্রের কোন্ অংশে দক্ষিণায়ন ঘটিত, তাহার নির্দ্দেশ নাই। এজন্য আমাদিগকে উহার আদি ও অন্ত উভয়ই গ্রহণ করিতে হইতেছে। আদি ধরিলে জানা যায়, যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে এখন অয়ন ৩ নক্ষত্র ৭২০কলা সরিয়া আসিয়াছে। অয়নের বার্ষিক গতি জানিলে এতদ্দ্বারা যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল নিরূপিত হইবে। আমাদের সিদ্ধান্তাদির মতে অয়নের এক এক নক্ষত্র যাইতে প্রায় ৯০০ বৎসর লাগে। অতএব যুধিষ্ঠির এখন হইতে প্রায় ৩৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টের ষোড়শ শত বর্ষ পূর্ব্বে ছিলেন।

মঘার অন্ত ধরিলে অবশ্য ঐ সময় আরও ৯০০ বর্ষ পিছাইয়া যাইবে। যাহাই হউক, আমরা দেখিতেছি যে, মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষির স্থিতির দ্বারাতেই জানিতেছি যে, খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ ১৫০০ হইতে ২৪০০ মধ্যে কোন সময়ে যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২। পুনশ্চ, মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১৬৭ অধ্যায়ে এই শ্লোকটি আছে :—

মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগ-শেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতু মর্হতি ॥*

কথাটা এই। সকলেই জানেন যে, কুরু পাণ্ডব যুদ্ধ ১৮ দিন ব্যাপিয়া হইয়াছিল। দশম দিবসে ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করেন। রবির দক্ষিণায়নে মৃত্যু বাঞ্ছনীয় নহে। এজন্য তিনি রবির উত্তরায়ণ অপেক্ষায় ৫৮ দিন জীবিত রহিলেন। শুভ কাল উপস্থিত হইলে, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—"হে যুধিষ্ঠির, সহস্রাংশু দিবাকর পরিবৃত্ত হইয়াছেন। শয়ানস্থ হইয়া আমার ৫৮ দিন গত হইয়াছে। চান্দ্র মাঘের শুক্লপক্ষ উপস্থিত। এখনও এই মাসের তৃতীয়াংশ থাকিতে পারে।"

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কালে চান্দ্র মাঘ মাসে রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত, এখন ৭ই কিম্বা ৮ই পৌষ রবির উত্তরায়ণ হইতেছে। বঙ্কিম বাবু চান্দ্র মাঘের পরিবর্ত্তে সৌর মাঘ ধরিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার গণনা সোজা হইয়া পড়িয়াছে। "২৮ শে মাঘেও উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাৎ।" ৪৮ দিনে রবির যত অংশ যত কলা গতি হয়, তত অংশাদি অয়ন সরিতে কত বৎসর লাগিয়াছে, তাহার গণনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে,

* নক্ষত্র শব্দে রাশি-চক্রের ৮০০ কলা পরিমিত অংশ বুঝিতে হইবে। বঙ্কিম বাবুর লেখার ভাবে বুঝা যায় যে, তিনি নক্ষত্র অর্থে তারা বুঝিয়া গোলে পড়িয়াছিলেন। নচেৎ ইংলণ্ড ভারতবর্ষে থাকিতে পারে না, ইত্যাদি বলিতেন না।

* বর্দ্ধমান মহারাজার মহাভারত হইতে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইল। এসিয়াটিক সোসাইটির মহাভারতে 'মাসঃ সৌম্যঃ' পরিবর্ত্তে 'মাসঃ পুণ্যঃ' পাঠ আছে। বঙ্কিম বাবু সৌম্য মাঘ অর্থে সৌর মাঘ বুঝিয়াছেন। সৌম্য অর্থে সুন্দর কিম্বা চান্দ্র বুঝায়। এখানে যে চান্দ্র মাস বুঝিতে হইবে, তাহা মহাভারতের উক্ত অংশ পাঠ করিলে বুঝা যায়। (ভীষ্ম পর্ব্বের ১১৬ ও ১১৭ অধ্যায় এবং শান্তি পর্ব্বও দ্রষ্টব্য।)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২৫৩০ অব্দের পূর্ব্বে ঘটে নাই। পুস্তকের পাদে টিপ্পনী করিয়াছেন যে "সে কালে ও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা আমি প্রমাণ করিতে পারি। ছয় ঋতুর কথা মহাভারতেই আছে। বার মাস নহিলে ছয় ঋতু হয় না। কুরু পাণ্ডবের সময় যে সৌরমাস দৈনিক কার্য্যাদিতে ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রমাণ তিনি দেন নাই। প্রমাণ পাইলে ভারতের প্রাচীন জ্যোতিষের একটা নুতন তত্ত্ব জানা যাইত। মহাভারতে ঋতুর নাম আছে বলিয়া যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সময়ে সৌর মাস প্রচলিত ছিল, এ কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইতেছে না। ঋগ্বেদেও রবির উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ, ছয় ঋতু, দ্বাদশ মাস লিখিত আছে। যাহা হউক, তাঁহার গণনায় কতকটা গোঁজা মিল আছে বলিয়া বোধ হয়।

যাহা হউক, চান্দ্র মাস ধরিলেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল যে একেবারে গণনা করা যায় না, এমন নহে। চান্দ্র মাঘ মাস সৌর ফাল্গুনের কতক দিবস পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। এমন কি ২৮।২৯ ফাল্গুনেও চান্দ্র মাস শেষ হইতে পারে। উপরিউদ্ধৃত শ্লোক হইতে আমরা জানিতেছি যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে যখন রবির উত্তরায়ণ হয়, তখন শুক্লপক্ষ এবং তখন চান্দ্র মাসের প্রায় চতুর্থাংশ গত হইয়াছিল। ৩০ ফাল্গুনও যদি চান্দ্রমাস শেষ হইয়া থাকে, তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে যে, আমাদিগকে ৭ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত দিন গণনা করিতে হইবে। ৭ পৌষ হইতে ৭ ফাল্গুন পর্য্যন্ত প্রায় ৫৮ কি ৫৯ দিন পাওয়া যায়। এখন যেরূপ রবির গতি আছে, তদনুসারে এই ৫৮ কি ৫৯ দিনে রবি প্রায় ৫৮ অংশ গমন করে।* এই ৫৮ অংশ অয়ন সরিয়া যাইতে কত বৎসর লাগে? সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে অয়ন চলন ধরিলে এতদ্দ্বারা প্রায় ৩৮০০ বৎসর পাওয়া যায়। পাশ্চত্য মত ধরিলে উহা প্রায় ৪০০০ বৎসর হয়। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা আমরা দেখিতেছি যে, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বেশী পুরাতন হইলেও খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৯০০ কি ২১০০ বর্ষের পূর্ব্বে ঘটে নাই। (গ)

৩। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভ কালে কোন্ কোন্ গ্রহ কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহার একটা বিবরণ ভীষ্ম পর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়। বাস্তবিক তখন গ্রহগণ বর্ণিত নক্ষত্রে ছিল, কিম্বা যুদ্ধের অশুভ ফল ঘটিবে, ইহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত ফলিত জ্যোতিষের বচনানুসারে তৎসমুদায় কেহ বসাইয়া দিয়াছেন, এই দুয়ের কোন্‌টি ঠিক, তাহা বলা যায় না। সেই রূপ জ্যোতি-নির্ব্বন্ধ নামক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম পত্রিকা প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রহগণের তৎকালীন স্থিতি ধরিয়া কোন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা কেহ কেহ নিরূপণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এইরূপ বাল্মিকী রামায়ণেও শ্রীরামচন্দ্রের জন্মকালীন গ্রহস্থিতি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তা বলিয়া তদনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব কাল গণনা করা কি যুক্তিসঙ্গত হইবে?

---

* বর্ত্তমান কালে পৌষ মাঘ মাসে রবির যেরূপ গতি, ৩।৪ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সে গতি ছিল না। বাস্তবিক বর্ত্তমান কালের কোন গতি অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কালের গণনা করা নিতান্ত দুরূহ, এমন কি অসম্ভব। তবে এরূপ গণনা দ্বারা সময়ের একটা স্থূল আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বঙ্কিম বাবু কোন্ পঞ্জিকায় পৌষ মাঘ মাসের ৪৮ দিনে রবির ৪৪ অংশ ৪কলা গতি পাইয়াছিলেন?

জ্যোতিষ সাহায্যে গণনা করিলে যুধিষ্ঠিরের যে যে কাল পাওয়া যায়, তাহা বলা হইল। এখন একটা প্রধান আপত্তির উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। সপ্তর্ষির অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রে শতবর্ষ ব্যাপিয়া স্থিতি সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতে পারে। পুরাণকার বলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং যেমন করিয়া হউক, তাহাকে মানিয়া লইতে হইবে, এই প্রকার ভাবই অনেকের লেখায় দৃষ্ট হয়। সপ্তর্ষির যে অর্থ এই প্রবন্ধের প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিত এক এক নক্ষত্রে সপ্তর্ষির স্থিতির সামঞ্জস্য হয় না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সপ্তর্ষির দ্বারা অয়ন চলন সূচিত হইয়াছে। যদি তাহা ঠিক হয়, তবে এক এক নক্ষত্রে সপ্তর্ষির ৯০৲ বর্ষ স্থিতি না লিখিয়া গর্গ কিম্বা পুরাণকার ১০০ বর্ষ ভোগ লিখিলেন কেন?

ইহার উপর আর ও কথা আছে। বিষ্ণু, বায়ু, ভাগবত প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণে লিখিত আছে যে, নন্দের সময় সপ্তর্ষিগণ পূর্ব্বাষাঢ়ায় গমন করিবেন। পুরাণে আরও আছে যে, পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেচন পর্য্যন্ত সময় প্রায় সহস্র বর্ষ। মঘা হইতে পূর্ব্বষাঢ়ার অন্তর দশ। সুতরাং একশত বর্ষে সপ্তর্ষির এক নক্ষত্রগতি স্বীকার না করিলে পুরাণকারের গণনার সহিত নন্দের ঐতিহাসিক কালের ঐক্য হয় না। শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল মহাশয় গত বৎসরের ভারতীতে লিখিয়াছেন যে, সাকল্য সংহিতায় লিখিত আছে, সপ্তর্ষিগণ প্রতি বৎসর ৮ কলা করিয়া অগ্রসর হয়েন।

আরও কথা আছে। কালক্রমে অয়নের পশ্চিমগতি হয়। এতদনুসারে আমরা সপ্তর্ষির বিলোমগতি স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু গর্গাদি ঋষিগণ বলিতেছেন যে, সপ্তর্ষিগণের অনুলোম গতি।

এই সকল আপত্তির জন্য সপ্তর্ষির প্রকৃত অর্থ কি, তাহা কেহ স্থির করিতে পারিতেছেন না। কেহ কেহ উহাকে কাল গণনার একটা বিধিমাত্র বলিতে চাহেন। কাশ্মীরে এক শত বর্ষ পরিমিত একটা লৌকিকাব্দ প্রচলিত ছিল। ইহা আলবেরুণীর কথায় জানা যায়। তদ্ভিন্ন কানাই বাবু ও দেখাইয়াছেন, কহ্লন পণ্ডিত তাঁহার সময়ে তাহা চতুর্ব্বিংশতি দিয়াছেন।

এক শত বর্ষ পরিমিত লৌকিকাব্দের কথা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু সেই লৌকিকাব্দের মূল কি? তাহাই অবধারণের চেষ্টা করা যাইতেছে। কানাই বাবু লিখিয়াছেন "যেমন সকল কল্পনারই (*Theory*) এক একটি অবলম্বন (*Locus Standi*) আছে, সেই প্রকার যুধিষ্ঠিরাদির সময় নিরূপণেও বরাহাদি একটি অবলম্বনের আশ্রয় লইয়াছেন।" বরাহমিহির স্বয়ং সপ্তর্ষির গতিসম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তিনি বৃদ্ধ গর্গের দোহাই দিয়াছেন। বৃদ্ধগর্গ এরূপ অসঙ্গত কল্পনা কেন করিলেন, তাহা ত বুঝা যায় না। আর কল্পনার মূলে কি সত্য ঘটনা কিছুই থাকিবে না? কাব্য উপন্যাসে যাহাই হউক, জ্যোতিষে এরূপ কল্পনা শোভা পায় না। বৃদ্ধ গর্গের কল্পনার অবলম্বনটি (*Locus Standi*) কি ছিল?

বরাহমিহির স্বয়ং অয়নচলন বা কোন নক্ষত্রের গমন বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। অয়নচলন বিষয়ে বলিবার মধ্যে এক স্থানে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে অশ্লেষার অর্দ্ধে রবির দক্ষিণায়ন ঘটিত। সুতরাং সপ্তর্ষির গমন সম্বন্ধে তিনি যাহা পড়িয়াছিলেন বা শুনিয়া-

ছিলেন, তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, এইরূপই মনে করিতে হইবে। যুধিষ্ঠিরের সময়ে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, এরূপ একটা কিম্বদন্তী, বোধ হয়, পূর্ব্ব কাল হইতে প্রচলিত ছিল। তাহাই হয়ত বৃদ্ধগর্গ কোন সংহিতায় লিখিয়া গিয়াছিলেন। কিম্বদন্তীর মূল অনেক স্থলে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বৃদ্ধ গর্গ মূল অন্বেষণ না করিয়া তাহার উপর শতবর্ষ গতি যোগ করিয়া গিয়াছিলেন।

ভারতে অয়নচলন প্রথমে কে কোন্ সময়ে নিরূপণ ও পরিমাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে বৃদ্ধ গর্গের মনোগত প্রকৃত অর্থ কি, তাহা স্পষ্ট জানা যাইত। এমন হইতে পারে, মূলে সহস্র বর্ষ ছিল, লিপিকর প্রমাদ বশতঃ হউক বা অপর কোন কারণে পরে তাহা শত বর্ষ হয়। সেই শতবর্ষ ধরিয়াই পুরাণকার নিজের গণনা করিয়া গিয়াছেন। অথবা বৃদ্ধগর্গ যখন ছিলেন, তখন ভারতে অয়নচলনবেগ অজ্ঞাত ছিল। স্থূল-যন্ত্রের সাহায্যে অয়নচলনের মৃদু বেগ এক শত কি দুই শত বৎসরের পরিবর্ত্তনে পরিমিত হয় না। বৃদ্ধগর্গ শকাব্দা প্রচলনের পরে ছিলেন কি? শকাব্দার সহিত ২৫২৬ যোগ করিতে বলেন, কে, গর্গ না বরাহ?

যাহা হউক, এক্ষণে পূর্ব্বপ্রাপ্ত গণিতাগত কাল সকলের তুলনা করিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করা যাউক।

যুধিষ্ঠিরের অভ্যুদয় কাল

	কল্যব্দ	খৃঃ পূঃ
(ক) বৃদ্ধ গর্গের মতে	৭০০	২৪০০
পুরাণকার	১২০০	১৯০০
(খ) সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে	৭০০-১৬০০	১৫০০-২৪০০
(গ) চান্দ্র মাঘ মাসের রবির উত্তরায়ণ	১১০০	২০০০
		(পরমসীমা)
ঐ সৌর মাসে	১৫০০	১৬০০
		(পরম সীমা)

এ কয়েকটির মধ্যে কোন্‌টা কত সত্য, তাহা বলা যায় না। তবে কলির একাদশ বা দ্বাদশ শত বৎসরের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হন নাই, তাহা স্বীকার করিতে কোন গোলযোগ নাই। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কেবল ঐতিহাসিক বিচার অবলম্বন করিলে যুধিষ্ঠির খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যান না এবং জ্যোতিষিক বিচার দ্বারা ঐ শতাব্দ হইতে গণনা প্রায় আরম্ভ করিতে হয়। মহাভারত কিম্বা পুরাণ সকলও কাল সম্বন্ধে এক মত নহে। কোথাও দ্বাপরান্তে কোথাও বা কলির দ্বাদশ শত বর্ষান্তে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান। যাহা হউক, সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া যুধিষ্ঠিরের সময় নির্দ্দেশ করিতে হইলে খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দী অর্থাৎ কলির সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে তাঁহার আবির্ভাব কাল ফেলিতে হয় *। অবশ্য এরূপ গণনায় দুই এক শত বর্ষের প্রভেদে তত আসে যায় না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

* এই কালের সহিত পুরাণোক্ত কালেরও সামঞ্জস্য আছে। বিষ্ণুপুরাণমতে পরীক্ষিত হইতে নন্দের সময় ১০১৫ বৎসর। মৎস্য পুরাণ মতে তাহা ১০৫০; ভাগবতমতে ১১১৫ বর্ষ। মহাপদ্ম লইয়া তাঁহার পরবর্ত্তী নয়জন নন্দ এক শত বর্ষ রাজত্ব করেন। চন্দ্রগুপ্ত ইঁহাদের পরবর্ত্তী—চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূঃ ৩১৫অব্দে ছিলেন। এই রূপে জানা যায় যে পরীক্ষিত প্রায় খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছিলেন। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে। তৎসমুদায় আলোচনা করা, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা প্রতিবাদ। (৪)

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, আমাদের ঈশ্বর চিন্তা করিতে হইলে, সেই সঙ্গে সাকার জগৎও চিন্তা করিতে হয়। জগৎ বাদ দিয়া আমরা কখনও ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারি না। আমাদের ঈশ্বরকে ধারণা করিতে হইলে, জগতের সাকার ও স্বগুণ ভাব তাহাতে আরোপ না করিয়া আমরা পারি না। আমাদের এরূপ কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দারা আমরা নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বরকে জানিতে পারি। তাঁহার নিরাকার স্বরূপ মানুষের চিত্তবৃত্তির অগোচর বলিয়াই ব্রহ্মকে "অবাঙ্মনসগোচর" বলা হইয়াছে। তবে কি কখনও মানুষ ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারে না? মানুষ কি কখনও নির্গুণ ব্রহ্মকে জানিতে পারে না? পারে বৈ কি। কিন্তু তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। তখন মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়। তখন মানুষের মনুষ্যত্ব ব্রহ্ম স্বরূপে লীন হইয়া যায়। নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে মানুষ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসন্নিত্য মগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্
নিচায্য তন্মৃত্যু মুখাৎ প্রমুচ্যতে॥
কঠোপনিষৎ।

ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম। তিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ গুণ রহিত, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত। তিনি ক্ষয় রহিত, অব্যয়। তিনি অতি সূক্ষ্মতম, যে বুদ্ধি বা মহত্ত্ব তাহার ও পরবর্ত্তী ও সর্ব্বসাক্ষী। তাঁহাকে এই অবস্থাপন্ন জানিলে জীব মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে।

তন্দুর্দর্শং গূঢ় মনু প্রবিষ্টং
গুহাহিতঙ্গহ্বরেষ্ঠম্ পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥ কঠ।

ব্রহ্ম দুর্দর্শ, কারণ তিনি অতি সূক্ষ্ম। তিনি প্রকৃতিজাত বিষয় বিকারের জ্ঞান দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকেন। তিনি বুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত। তাঁহাকে সেই গুহার মধ্যে দেখিতে হইলে অনেক অনর্থ ও শঙ্কট অতিক্রম করিতে হয়। তিনি পুরাতন। সেই দেবতাকে ধীরব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ দ্বারা জানিয়া হর্ষশোক হইতে মুক্ত হন, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্ত মুত্তমম্॥
অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এবচ।
যজজ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তু রমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥
কঠ।

"আত্মার প্রকাশ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন উৎকৃষ্ট, মন অপেক্ষা অভিমান উৎকৃষ্ট, অভিমান অপেক্ষা বুদ্ধি উৎকৃষ্ট, বুদ্ধি অপেক্ষা প্রকৃতি উৎকৃষ্ট, প্রকৃতি অপেক্ষা স্বয়ং আত্মা উৎকৃষ্ট—যিনি ব্যাপক, অলিঙ্গ, তাঁহাকে জানিলে জীব বিমুক্ত হয়, অমৃত হয়।"

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাঽভি ক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতা স্তে ভবন্তি॥ কঠ।

ব্রহ্মের রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। চক্ষু দ্বারা কেহ তাঁহাকে দেখিতে পারে না। অন্তঃকরণ স্থিত বুদ্ধি ও মননরূপ সম্যগ্দর্শন দ্বারা তিনি অভিপ্রকাশিত হন। যে তাঁহাকে

জানিতে পারে, সে অমৃত হয়, অর্থাৎ মোক্ষ-লাভ করে।

জ্ঞাত্বাদেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্ম মৃত্যু প্রহাণিঃ।
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

সেই পরম দেবতাকে জানিলে সর্ব্বপাশ ছিন্ন হয়, ক্লেশ সকল দূর হয়, ও জন্ম মৃত্যু শেষ হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি! আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

হে মৈত্রেয়ি! সেই আত্মাকে দেখিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে, তাঁহাকে দেখিতে পারিলে ও ধ্যান করিতে পারিলে, এই বিশ্বজগৎ সকলই জানা হয় অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়।

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তুসৌম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি॥
প্রশ্নোপনিষৎ।

"হে সৌম্য! যাহাতে সমস্ত দেবগণের সহিত বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, প্রাণ সমূহ এবং ভূতগণ সম্প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই অক্ষর ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মক হয়েন"—অর্থাৎ তাঁহার মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।

পুরুষ এ বেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্‌যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং
বিকিরতীহ সৌম্য॥ মুণ্ডকোপনিষৎ।

"সেই পুরুষই এই বিশ্ব, কর্ম্ম, তপ, ব্রহ্ম এবং পরম অমৃত। যিনি এই ব্রহ্মকে আপন হৃদয় গুহায় নিহিত জানেন, হে সৌম্য! তিনিই অবিদ্যাগ্রন্থি অর্থাৎ মায়াপাশ ছিন্ন করেন—মুক্ত হন।"

যথা নদ্য স্যন্দমানা সমুদ্রে
হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নাম রূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতিদিব্যম্॥
মুণ্ডকোপনিষৎ।

যেরূপ নদী সকল সমুদ্রে পড়িয়া স্ব স্ব নাম ও রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রে লয় হইয়া যায়, সেইরূপ যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি স্বীয় নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া-নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব হীন হইয়া সেই পরাৎপর পরমপুরুষের স্বরূপে পরিণত হন।

সযোঽহ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।
ন্যাস্যা ব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো
বিমুক্তোঽমৃতোভবতি॥

"যিনি সেই পরম ব্রহ্মকে জ্ঞাত হয়েন, তিনি ব্রহ্মেই পরিণত হয়েন। শোক পাপ উত্তীর্ণ হইয়া এবং হৃদয় গুহা গ্রন্থি সকল হইতে বিমুক্ত হইয়া তিনি অমরত্ব লাভ করেন।" নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে এই রূপে রাশি রাশি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। উক্ত শ্রুতিবাক্য সকলের দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায়, মানুষ যখন নিরাকার ব্রহ্মকে জানিতে পারে, তখন সে সর্ব্ব প্রকার সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্ম স্বরূপে লীন হইয়া যায়। উল্লিখিত শ্রুতি সকলের মধ্যে যেখানেই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, আবার সেখানেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হইয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে মানুষকে তাহার মানুষত্ব, "আমিত্ব" (individuality) ছাড়িতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে, "আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি" এরূপ কথনও কেহ বলিতে পারে না। কারণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত

আমি "আমি" থাকিব, ততক্ষণ আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারিব না। "আমিত্ব" বর্জ্জন না করিলে, সেই অনন্ত পরম পুরুষকে জানা যায় না। আবার যখনই তাঁহাকে জানা যায়, তখন আর আমার "আমিত্ব" থাকিতে পারে না। তখন "আমি" আর ব্রহ্ম এক হইয়া যায়। সুতরাং "আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি," এরূপ কেহ কখনও বলিতে পারে না। আর যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। বোধ হয় এই জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন—

যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্যন বেদসঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥
কেনোপনিষৎ।

"যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানি নাই, তাঁহারই ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে। আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানি নাই; যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান্ নহে, তাহার এই বিশ্বাস যে, আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি।"
নগেন্দ্র বাবুর বঙ্গানুবাদ।

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা আমরা এই দুইটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম—

(১) নিরাকারব্রহ্মজ্ঞানের অন্য নাম মুক্তিলাভ।

(২) মুক্তিলাভের পূর্ব্বে ব্রহ্মসম্বন্ধে আমাদের যে কিছু জ্ঞান জন্মে, সে সকলই জগৎসংশ্লিষ্ট, সুতরাং সাকার। মানুষ মোক্ষলাভের পূর্ব্বে নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

নিরাকারবাদী বলেন, তাঁহার প্রচারিত নিরাকার ব্রহ্মবাদ শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, তিনিও নাকি তাহাই প্রচার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রুতিপ্রতিপাদিত নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান যে কি জিনিষ, তাহা তিনি একবারও ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখেন না। শ্রৌত-ব্রহ্মজ্ঞান ও নিরাকারবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। শ্রৌত-ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়। কিন্তু নিরাকারবাদীর ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিলে মানুষ মানুষই থাকিয়া যায়। নিরাকারবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অতি সহজ। এমন কি, আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই তাহা লাভ করিতে পারে। কিন্তু শ্রৌত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা বড় সহজ বলিয়া বোধ হয় না। ব্রাহ্মগণ যে যে প্রণালীতে নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, শ্রুতিপ্রতিপাদিত নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান সে প্রণালীতে কদাচ লাভ করা যাইতে পারে না। "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" বলিয়া বিশুদ্ধ সুরতাল লয় সংযোগে গান করিলেই, সেই "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" পরব্রহ্মের জ্ঞান হয় না। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া অনর্গল বহুক্ষণ স্থায়ী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেই, সেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া কোলাহল করিলেই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে না। "জ্ঞানচক্ষু", "বিশ্বাস-নয়ন" প্রভৃতি রূপকময় কথা ব্যবহার করিলেই নিরাকার ব্রহ্ম দর্শনোপযোগী জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয় না। যাহা শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা লাভ করার উপায় ও প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার অধিকারী সকলেই হইতে পারে না। এ বিষয় সেই শ্রুতিই বলিতেছেন—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈন মাপ্নুয়াৎ॥
কঠোপনিষৎ।

যে দুষ্কর্ম্মপরায়ণ, সে আত্মাকে (ব্রহ্মকে) পাইতে পারে না। যে ইন্দ্রিয়লৌল্যসম্পন্ন, সে তাঁহাকে পাইতে পারে না। যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিষয় ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত থাকে, সে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। যাহার চিত্তের একাগ্রতা জন্মে নাই, সে তাঁহাকে পাইতে পারে না। তবে কে তাঁহাকে পাইতে পারে? যে ব্যক্তি এই সকল দোষ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই একমাত্র প্রজ্ঞা দ্বারা তাঁহাকে পাইতে পারেন। শ্রুতি আবার বলিতেছেন—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
নচ প্রমাদাত্তপসা বাপ্য লিঙ্গাৎ॥

"এই আত্মাকে বলহীন (অধ্যাত্মবলহীন) ব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। বিষয়াসঙ্গ নিমিত্ত প্রমত্ত বা ত্যাগবুদ্ধিহীন ব্যক্তি তপস্যা দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না।"

এই সকল শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা আমরা দেখিতে পাই, শ্রৌত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সকলের অধিকার নাই। যিনি জিতেন্দ্রিয়, বিষয়াসঙ্গবিহীন ও প্রজ্ঞা-সম্পন্ন একমাত্র তিনিই শাস্ত্রপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন নিরাকার ব্রহ্মকে জানিবার, আর কাহারও অধিকার নাই। পুরাণ ও ইতিহাসে পূর্ব্বতন মুনিঋষিগণের সাধনপ্রণালী ও জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্তের ভূয়োভূয়ঃ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, ব্যাস, শুকদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবনী পাঠ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি, এই সকল মনীষিগণ বিষয়-বাসনা সকল হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছিলেন। দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে দমন করিবার জন্য আজীবন যম-নিয়মাদি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহারা শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি প্রভৃতি ধর্ম্মানুশীলন পূর্ব্বক কামনা-পরিশূন্য হইয়া কেবল সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করিয়া মন, বুদ্ধি, অভিমান প্রভৃতিকে বিনাশ পূর্ব্বক অবশেষে সেই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাবসম্পন্ন পরমাত্মাকে লাভ করিয়াছিলেন। যদি পুরাণ ও ইতিহাসকে *myth* বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাও, দেও। তাহাতে কোনই আপত্তি নাই। এই সকল জ্বলন্ত তপস্তেজঃসম্পন্ন মনীষিগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিলেও শ্রুতি-প্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যেরূপ অশেষ ত্যাগস্বীকার, কঠোর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ও অসীম কৃচ্ছ্রসাধন করা আবশ্যক, এই সকল জীবনবৃত্তান্ত যে তাহার concrete example সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মগণের সাধনপ্রণালী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে যম নাই, নিয়ম নাই, জ্ঞান নাই, তপস্যা নাই, বৈরাগ্য নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই, ধ্যান নাই, ধারণা নাই, সমাধি নাই। আছে কি? যাহা আছে, তাহা না বলাই ভাল। অতএব নিরাকারবাদী নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী কিনা, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি!" নগেন্দ্র বাবু শ্রুতিবাক্যের এই অর্দ্ধাংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মত স্থাপন করিতে চাহেন। তিনি বলেন, শ্রুতিই বলিতেছেন, নিরাকার ব্রহ্মকে

দেখা যায়, শুনা যায়, মনন করা যায়, ধ্যান করা যায়; তবে সাকার উপাসনার প্রয়োজন কি? যাহারা মূর্খ, তাঁহাদের জন্যই শাস্ত্র সাকার উপাসনা বিধান করিয়াছেন। এ স্থলে, দুঃখের বিষয় এই যে, "কাণ টানিলে মাথা আসে" নগেন্দ্র বাবু তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। ব্রহ্মকে দেখা যায়, শুনা যায়, মনন করা যায়, ধ্যান করা যায়, যেন মানিলাম। কিন্তু তাহা কি তুমি আমি পারি? তাহা কে পারে? সেই শ্রুতিই তাহা বলিতেছেন—

"আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্"।

"সেই আত্মাকে দেখিলে, শুনিলে, বুঝিলে, জানিলে, সকলই জানা হয়।" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্ম হইয়া যায়। অতএব যাঁহারা ব্রহ্মকে দেখার কথা বলেন, তাঁহারা যখন কেহই ব্রহ্ম হইতে পারেন নাই, তখন অবশ্যই মানিতে হইবে, তাঁহাদের কাহারও নিরাকার ব্রহ্ম-দর্শন হয় নাই। আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক হইল, নিরাকার ব্রহ্মবাদ এদেশে প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু কোথায়, একজন ব্রাহ্মও ত ব্রহ্ম হইতে পারেন নাই? যদি বল, তাঁহারা মৃত্যুর পরে ব্রহ্ম হইয়াছেন। তাহারই বা প্রমাণ কি? আর শ্রুতি ত সে কথা বলেন না। অতএব আমরা দেখিলাম, নিরাকার-বাদীর নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান কেবল কথার কথা মাত্র। তাঁহারা যে সাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বলেন, আমরা নিরাকার ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সে কেবল তাঁহাদের আত্মপ্রবঞ্চনাময় অন্ধবিশ্বাস। তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি সমর্থন করে না। এস্থলে, নিরাকার-বাদ শ্রুতি-মূলক, এই মত চূর্ণীকৃত হইল।

নগেন্দ্র বাবু বলেন, "বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সমগ্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, মূর্খ-লোকদিগের চিত্তের স্থৈর্য্যের জন্য মূর্ত্তিপূজা। তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই।" এ কথা গুলি সব ঠিক। ইহার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু "মূর্খ লোকদিগের চিত্তের স্থৈর্য্যের জন্য মূর্ত্তিপূজা," ইহাই প্রকৃত শাস্ত্রের অভিপ্রায় যেন মানিলাম, কিন্তু এম্, এ; বি, এ, পাশ করা, পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী পণ্ডিতের চিত্ত-স্থৈর্য্যের নিমিত্ত মূর্ত্তিপূজা যে শাস্ত্রানুমোদিত নহে, তাহা আমি মানিতে পারি না। "উচ্চ-শিক্ষা" পাইলেই যে, আমার চিত্ত স্থির হইবে, আমার প্রতিমা পূজার কোন আবশ্যকতা থাকিবে না, তাহা বলিতে পারি না। তাহা যদি হইত, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ ষোল আনা যোগী ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলেই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে লীন হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হয় কোথায়? বস্তুতঃ অধ্যাত্মবিদ্যা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এক জিনিষ নহে। অশিক্ষিত, মূর্খ ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট সুশিক্ষিত, সর্ব্ববিদ্যাবিশা-রদ কেশব বাবু অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত ব্যক্তিও ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারেন। আবার সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী যিনি, তিনিও অধ্যাত্মবিদ্যা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে মূর্খ হইতে পারেন। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ কঠ।

"কেবল বেদাদি শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ আলো-চনা দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারা যায় না। কেবল মেধা বা গ্রন্থার্থ ধারণাশক্তি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। নিয়ত বেদার্থ শ্রবণের দ্বারাও আত্মজ্ঞান হয় না। কিন্তু সেই

আত্মা যাহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন। কেবল তাঁহারই নিকট আত্মা স্বরূপে প্রকাশিত হন।"

অতএব দেখা গেল, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা কেবল শিক্ষার উপর নির্ভর করেনা। যাঁহার উপর ব্রহ্মকৃপা পতিত হয়, তিনিই অনায়াসে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন আর সকলকেই—শিক্ষিত হউন বা অশিক্ষিত হউন—প্রতিমা পূজার ক, খ, হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। এই সকল মন্দাধিকারীর জন্যই শাস্ত্র প্রতিমূর্ত্তিপূজা বিধান করিয়াছেন। ইহাতে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যদি অপমান বোধ করেন, তবে তিনি কখনও মুক্তিপথের অধিকারী হইতে পারিবেন না। ইহাই শাস্ত্রের মত। ক্রমশঃ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

বেঙ্গল স্যানিটারি ড্রেণেজবিল। (৪)

কাঁচা পাকা রাস্তা ও রেল-পথে পয়োপ্রণালীর অবরোধ, স্যর চার্লস এলিয়ট সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করেন। কেবল অস্বীকার নহে; তিনি এই মতাবলম্বী লোকদিগের কাণ্ডজ্ঞানের প্রতি কটাক্ষ করিতেও অকুণ্ঠিত! এ সম্বন্ধে স্যর চার্লসের উক্তি, তদীয় ঢাকা নগরে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি;—

"As regarded the second objection" (obstruction of drainage by Railways and roads) "he thought it was rather curious to note that no one had taken the trouble to prove the point that this was an objection professing to be based on facts obvious to all observers, especially as regarded the railway embankments, but that it was of absolutely no value to merely assert in a general way that road and railway embankments obstructed drainage without designating the places where such obstructions occurred. It would have been easy for those who gave this as a cause, to look about them when travelling by road or by rail, and to note whether water was being ponded up and lying against the embankment, so that the country looked more water-logged on one side of it than on the other. If it was so then it might be alleged that at such and such a spot there was not sufficient water-way and that the health of the neighbourhood was suffering in consequence. But no one has asserted that he had seen any thing of this sort. Of course when great floods occured it was inevitable that those embankments prevented the water from flowing off quite as speedily as it would otherwise have done, but at such times the whole country was under water. Malaria was not caused by such flood but by the slow drying up of stagnant pools and marshes, and no one had declared that such stagnant water-pools were to be found by the railways or more on the one side than on the other. As has been said before, this particular objection was eminently capable of proof, and yet numerous authorities made and used it without feeling at all responsible for adding any proof."

স্যর চার্লস এলিয়টের উক্তি আমরা অতি বিস্তৃত ভাবেই উদ্ধৃত করিলাম; তাহার একটী (পাঠক ক্ষমা করিবেন)—একটী অক্ষরও অনুদ্ধৃত রাখিলাম না। কারণ আমরা চাই যে, লোকে তাঁহার সমস্ত কথা শুনিয়া বুঝে যে, তিনি যাহা বলিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, তাহাকেই এ দেশীয়েরা চলিত কথায় বলিয়া থাকে "সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কা'র ভার্য্যা?" যে বিষয় ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে এক ব্যক্তির অর্থ ব্যয়ে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, প্রমাণিত বলিয়া বিশিষ্ট ও অত্যুচ্চ পদস্থ রাজপুরুষদিগের কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে; এবং তাহার পর এই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া যাহা সময়ে সময়ে

আলোচিত ও প্রদর্শিত হইয়া আসিয়াছে; তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া আজ আমাদের ছোট-লাট সাহেব অনায়াসে বলিলেন "কই কে কবে তাহা প্রমাণ করিল? কে কবে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কিছুমাত্র কষ্ট স্বীকার করিল?"

কিমাশ্চর্য্যমতপরঃ! ইহাকেই কি বলে না "সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে, সীতা কাঁহার পিতা বা পত্নী?" কিন্তু স্যর চার্লস সাত কাণ্ড শুনিয়া বা না শুনিয়াই এ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন! অসংখ্য রাজকীয় কার্য্যের অপ্রতিহত অনবকাশে তথা অবিশ্রান্ত শফর-ভ্রমণ ও মফঃস্বল পরিদর্শন ক্লেশে, বোধ হয় ছোট লাট বাহাদুর এই রাস্তা ও রেলরোড বনাম পয়োপ্রণালীর অবরোধ ঘটিত সুদীর্ঘ ইতিবৃত্তে দৃষ্টিপাত বা কর্ণপাত করিবারও সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই; তাহাতেই সম্ভবতঃ তিনি উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; নহিলে কখনই করিতেন না; অন্ততঃ করিবার পূর্ব্বে একবার একটু ভাবনা চিন্তাও করিতেন।

স্যর চার্লস এলিয়ট তদীয় উপরোক্ত ইংরেজী উক্তিতে প্রথমে বলিতেছেন;—

"বড় বড় রাস্তায় ও রেলরোডে পয়োনালী অবরোধ করিয়াছে, এই কথাটা লোকে যখন তখন বলে; কিন্তু যাহারা এ কথা বলে, তাহারা এবং তাহাদের কেহ কখনও, সেরূপ অবরোধ দেশের কোন্ কোন্ স্থানে ঘটিয়াছে তাহা বলিতে পারে নাই; পরন্তু সেরূপ অবরোধ কি প্রকারে ঘটিয়াছে তাহাও প্রমাণ করিবার কষ্ট স্বীকার করে নাই।"

আপাততঃ অন্ততঃ আমরা এ কষ্ট কিছু স্বীকার করিয়াছি; তাহা এই প্রবন্ধের পাঠক-বর্গ জানেন। মধ্য বঙ্গের যে সকল স্থানে রাস্তায় এবং রেলরোডে গ্রাম্য পয়োনালী অবরুদ্ধ করিয়াছে এবং তাহা যে প্রকারে করিয়াছে, তাহা রাজা দিগম্বর মিত্রের মিনিট এবং প্রথম এপিডেমিক কমিসনের মিনিট হইতে আমরা ইত্যগ্রেই প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা স্থান নিচয়ের নামও করিয়াছি; এবং সেই সকল স্থানে যে প্রক্রিয়ায় রেলরোড ও রাস্তার দ্বারা পয়োনালীর অবরোধ ঘটিয়াছে, তাহাও বিস্তৃত ভাবে বুঝাইয়াছি। বাঙ্গালী পাঠক আমাদের বাঙ্গালা ভাষা অবশ্যই বুঝিয়াছেন। অতঃপরে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অবগতির জন্য আমাদের অবলম্বিত ইংরেজী মিনিট গুলির প্রতিই অতি বিনীত ভাবে, অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছি। * কিন্তু, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট অত্যুচ্চে অবস্থিত। ক্ষুদ্রের ক্ষীণ স্বর তাদৃশ উন্নত স্থলে উপস্থিত হইতে পারার একান্ত উপায়াভাব।

তথাচ কর্ত্তব্যানুরোধে উপরোক্ত ইংরেজী মিনিট নিচয় হইতে এক আধ ছত্র ইংরেজী এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া স্যর চার্লস এলিয়টের উক্তির সানুনয় উত্তর দেওয়া উচিত বিবেচনা করি।

স্যর চার্লস বলেন;—"It was of absolutely no value to merely assert in a general way that road and railway embankments obstructed drainage without designating the places where such obstruction occurred."

উত্তর; —"A road was run by Babu Madusudon Nundi (unprovided with a single bridge) from Mugra to Nasurye crossing the water course and thereby completely intercepting the drainage of all the villages noted above (namely the villages from Tribeni to Nasurye as also of those lying more inland) in its flow into the Koontee. This resulted in the breaking out of the epidemic a year or two after almost simultaniously in those in all those villages. In the same manner Joypur, Bagaty and the other adjacent

* (১) প্রথম এপিডেমিক কমিসনের মিনিট। ১৮৬৪ খৃঃ অঃ (২) ঐ মিনিট সংশ্লিষ্ট রাজা দিগম্বর মিত্রের মিনিট নিচয়। (৩) রাজা দিগম্বর মিত্র লিখিত ১৮৭৬ সালের ড্রেণেজ মেমোরাণ্ডাম।

villages were attacked soon after the village road from Trebeni to Mugra was raised and metalled ইত্যাদি।"

পরন্তু ;—A road from Rajhat to Dwar basini * * * has stopped its passage into the Kadermutti. There is an apology for a bridge * * but I was satisfied by personal observation that it was quite insufficient to afford free passage to the drainage of the place. * * The result is that a violent epidemic has been raging. * * A Kucha road * * runing from the Borabazar of Kishnaghur to Lallbagan, crossing the water courses of Baroepara, has been raised * * intercepting the drainage of that village * * and it has been followed by the breaking out of a fearful epidemic in Baroepara ইত্যাদি।

পুনশ্চ ;—In like manner the Eastern Bengal Railway and its feeders, when the same have crossed the water courses of villages lying on the eastern bank of the river Hooghly, and of others more inland, but situated to the west of the line, have obstructed the drainage of those places ; the fall of the villages lying on the eastern bank of the Hooghly, as I have before observed being towards the east and consequently Chagda, Kanchrapara, Halisahar and many others similarly situated have suffered. *

স্যর চার্লস এলিয়ট পূর্ব্বকথা না জানিয়া বা উড়াইয়া দিয়া প্রশ্ন করিতেছেন, রাস্তায় ও রেলরোডে পয়োনালী কোথায় অবরোধ করিয়াছে, কেহ কখনও বলে নাই, কই বলুক না। আমরা উপরে এ প্রশ্নের উত্তর দিলাম। পুনঃ উপরোক্ত মিনিট নিচয়ের আর একখানিতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া সানুনয় উত্তর দিতেছি ;—

"A line of villages extending from Itchapur, adjoining the Nawabgunge manufactory to Chagdah.

এইরূপে ছোট লাট বাহাদুরের প্রত্যেক উক্তি, প্রত্যেক প্রশ্ন উদ্ধৃত করিয়া, ভুরি-ভুরি প্রমাণের সহিত তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যুত্তর দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কেবল "পুঁথি" বাড়িয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে আমরা যে সকল পুরাতন মিনিট পেশ করিয়াছি তাহাই প্রচুর। তবে স্যর চার্লস এলিয়ট পূর্ব্ব কথা না জানিয়া বা তাহা বিস্মৃত হইয়া, সবিস্ময়ে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহাই যারপর নাই বিস্ময়ের বিষয়। ফলতঃ তিনি, যাহা প্রমাণিত, তাহা আদৌ উপেক্ষা করিয়া, যাহা অপ্রমাণিত, তাহারই উপর এই ড্রেণেজ বিলের গঠনে ও ব্যাখ্যায় একান্ত নির্ভর করিয়াছেন।

স্যর চার্লস প্রকৃত প্রস্তাবে কোন্ পন্থায় গমন করিতেছেন, ইহা বুঝা কঠিন। আমরা ক্রমে,এই ড্রেণেজ বিলের ইতিবৃত্ত,মূলতত্ত্ব,ও গঠনাদির বিষয় একে একে আলোচনা করিয়া তাহা দেখাইয়াছি। দেখাইয়াছি যে, এই বিল আমূল ভ্রম সঙ্কুল, ইহা কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট পন্থায় পরিচালিত হয় নাই ; অথচ পূর্ব্ব প্রকাশিত ও পূর্ব্ব প্রমাণিত পুরাতন পন্থা মাত্রই পরিত্যাগ করিয়াছে। স্যর চার্লস এলিয়ট প্রথম এপিডেমিক কমিসনের অভিমত ও অনুরোধ গ্রাহ্য করেন নাই ; দ্বিতীয় এপিডেমিক কমিসনের কথাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পরন্তু তিনি এ বিষয়ে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী লেফটন্যাণ্ট গবর্ণর নিচয়ের কথায়, এমন কি তদীয় সিংহাসনের অতি সম্ভাব্য ও অব্যবহিত উত্তরাধিকারী বিগতবর্ষের একটিন লেফ্টন্যাণ্ট গবর্ণর স্যর এণ্টনী ম্যাকডোনেলের কথাতেও কর্ণপাত করেন নাই। তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সরকারী বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের,তথা বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞদিগের অভিমত একসা উপেক্ষা করিয়া এমন এক অন্যের অপরিজ্ঞাত ও তাঁহার নিজের স্বকপোল-কল্পিত পথে চলিয়াছেন, যাহাতে করিয়া বোধ হয় যেন তিনি কি

* এই সকল ইংরেজী উক্তির অনুবাদ প্রবন্ধের অগ্রভাগেই দেওয়া হইয়াছে। পাঠক পুনরুক্তি দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

একটা অতুল কীর্ত্তির অভিলাষী। তাঁহার এই কীর্ত্তিলালসা সম্পূর্ণ সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইলেও তাহা বঙ্গীয় কৃষককুলের অপরিসীম কষ্টের কারণ হইবে, ইহা কিন্তু তাঁহার এখনও প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

স্যর চার্লস এলিয়ট বা বর্ত্তমান বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট যদি প্রথম এপিডেমিক কমিসনের কথা গ্রাহ্য করিতেন, তাহা হইলে প্রথমেই রাজকোষ ও রেলওয়ে কোম্পানীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া গ্রাম্য জল নিকাশের পথ পরিষ্কার ও প্রশস্ত করিতে হইত। অগ্রেই দূরে নদীতীরে না যাইয়া গ্রাম্য লোকের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী স্থানে তাহার অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করিয়া পরিষ্কার পানীয় জলাদির ব্যবস্থা করিতে হইত। পরন্তু, এই গবর্ণমেণ্ট যদি দ্বিতীয় এপিডেমিক কমিসনের কথায় কর্ণপাত করিতেন, তাহা হইলে অস্বাস্থ্য নিবারণের জন্য দেশের লোকের অপ্রচুর আহার, অনাহার ও উপবাস নিবারণের চেষ্টা করিতে হইত; আর কিছুই করিতে হইত না। পরন্তু, স্যর চার্লস যদি শ্রেষ্ঠতর-প্রতিভা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্যর এণ্টনীর অভিমত উপেক্ষা না করিতেন; তাহা হইলে, এই বিল দ্বারা বহু ব্যয়েরও অসাধ্য এক অনির্দ্দিষ্ট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য বঙ্গীয় কৃষককুলের শেষ রক্তবিন্দু শোষণের উদ্যোগ করিতে হইত না। স্যর এণ্টনী ম্যাকডোনেল, (পাঠক জানেন, ইনি এখন সুপ্রিম লেজিস্লেটিব কাউন্সিলের হোম মেম্বর) এই ড্রেণেজ ব্যপদেশে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ১৮৯২ সালের স্যানিটারী রেজলিউসনে লিখিয়াছিলেন ;—

The most noticeable aspect of these figures is the increased mortality due to cholera and fever. The causes assigned are the excessively insanitary condition of the towns, and in rural arreas, defective drainage and bad drinking water, and, no doubt, these are the true causes. They are suceptible of remedy with money and systematic effort. How the money is to be provided, and what the sanitary organization should be, for rural arreas, are points to which reference will presently be made; here the officiating Lieutenant-Governor would say that as sanitary improvements are expensive and not always acceptable to the people, it behoves all local authorities to concentrate their efforts on that improvement which is never unacceptable, never misunderstood and never ineffectual in preventing disease. That improvement is the provision of good drinking water; other expensive sanitary measures may wait.

স্যর এণ্টনী ম্যাকডোনেল বহুব্যয়সাধ্য ও সন্দেহ সঙ্কুল ড্রেণেজ কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়ার পূর্ব্বে, লোকের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করিবার জন্য স্থানীয় রাজপুরুষদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন।

কিন্তু, ছোট লাট বাহাদুর সগণ অগণ, শ্বেত কৃষ্ণ কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতে অসম্মত। সুতরাং এই ড্রেণেজ বিলের দৌরাত্ম্য; দেশে এই অভিনব কৃষিকরের আসন্ন-আবির্ভাব।

কিন্তু কৃষক-শ্রেণী কি আদৌ এই কর দিতে বাধ্য?

আমরা এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ কৃষকশ্রেণী এই করের এক কপর্দ্দকও দিতে বাধ্য নহে;—সমীচীন ব্যবস্থা ও ব্যবহারানুসারে নহে, সুধী ও সাধুজনসম্মত আইন অনুসারে নহে এবং এ মুহূর্ত্তের উন্নত সভ্যতার আদেশানুসারেও নহে। এই কর স্বাস্থ্যের জন্যই হউক, ড্রেণের জন্যই হউক, আর নদ্যাদি সংস্কারের জন্যই হউক, যে জন্যই হউক, কোনও ন্যায়-নীতি ও যুক্তি অনুসারে এই কর কৃষক-শ্রেণীর দেয় নহে। কৃষক যদি এই কর দিতে বাধ্যও হইত, তাহা হইলেও, এ দেশীয় কৃষক সমাজের উপ-

স্থিত করভার-বিড়ম্বিত অবস্থা ও অনাহার উপবাসের প্রতি দৃষ্টি করিয়া উহা তাহাদের উপর সংস্থাপন করা বিধেয় হইতে পারে না; ইহা আমরা ইত্যগ্রে প্রমাণ করিয়াছি। এখন প্রতিপন্ন করিব, কৃষকেরা এই কর দিতে কোন ক্রমেই বাধ্য নহে।

যে ভাবে যে যে শ্রেণীর প্রজার উপর এই ড্রেণেজ-কর সংস্থাপিত করিয়া অপর শ্রেণীব লোকদিগকে ইহা হইতে অব্যাহতি দিবার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছে, সবিস্তারে তাহার আলোচনা করিতে হইলে, স্বতন্ত্র একটী প্রবন্ধের আবশ্যক। যদি সুযোগ হয়, আমরা বরং স্বতন্ত্র ভাবে পরে সে আলোচনা করিব। এ স্থলে অতি সংক্ষেপে এই করের কথা কিছ কহিয়া কৃষক যে তাহা দিতে কোন ক্রমে দায়ী নহে, তাহাই দেখান যাইতেছে।

পথ-কর ও পূর্ত্ত-কর সংস্থাপনের পর হইতে এ দেশীয় রাজনীতির কেমনই এক গতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ভূমির সহিত যে সকল লোকের সংস্রব, কেবল তাহাদেরই উপর কর বসাইয়া অন্য শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তাহা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইতেছে। করভার হইতে কোনও শ্রেণীর লোক অব্যাহতি পাইলে, অপর শ্রেণীর তাহাতে হিংসা করা উচিত না হইতে পারে। কিন্তু, কথা হইতেছে, এই যে, যে কার্য্যে সকলেরই সমান স্বার্থ, ইষ্ট এবং উপকার বলিয়া কথিত, সে কার্য্যের জন্য কেবল, এক, দুই বা তিন শ্রেণীর লোকে কর দিবে, অপর অসংখ্য শ্রেণীর অসংখ্য বৃত্তি ব্যবসায়ে ব্যাপৃত দেশীয় বা এ দেশ-প্রবাসী বিদেশীয় লোক সে কর দিবে না, আইনানুসারে দিতে বাধ্য হইবে না; ইহা অপেক্ষা অধিকতর অন্যায় আর কি হইতে পারে? কিন্তু, এই প্রকারের অপরিসীম অন্যায় আচরণই হইয়াছে, দেখিতেছি; এ দেশে আইন সংগঠনের মূলনীতি! পথ-করে ও পূর্ত্ত-করে এ অন্যায় ব্যবস্থা হইয়াছে; ড্রেণেজ করেও সেই অন্যায় আচরণ পুনরুক্ত করার প্রস্তাব হইয়াছে।

রাজপথে সব লোকেই সমান চলে; তাহাতে সকলেরই সমান ব্যবহার ও অধিকার; কিন্তু পথ-কর দেয় কেবল তিন শ্রেণীর লোকের। প্রথম কৃষক, দ্বিতীয় জমিদার, তৃতীয় ব্রহ্মোত্তরাদি ভোগী লাখেরাজদার। অর্থাৎ ভূমির সহিত যে সকল লোকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্রব ও সংযোগ তাহারাই পথকর দিতে বাধ্য; অপরে তাহা দেয় না। কুসীদ-ব্যবসায়ী ধনকুবেরই হউন, আর বিপুল বিত্তশালী এদেশ প্রবাসী বিদেশীয় বণিক্‌ই হউন, পথ-কর ও পূর্ত্ত-কর তাঁহারা কেহই দিতে বাধ্য নহেন;—কৃষক "অন্ন-ভক্ষ-ধনুর্গুণ" হইয়াও তাহা দিতে বাধ্য!! অতি অপূর্ব্ব বিচার বটে! পথে যেন আর কাহারই প্রয়োজন নাই; পথে পা দিয়া যেন আর কেহই হাঁটে না; সকলেই উর্দ্ধগামী আকাশ-চর!—পথে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা কেবল জমি-জমা-ওয়ালা লোকের; যেন তাহারাই কেবল পথ দিয়া চলে; অপরে আকাশে আকাশে চলা ফেরা করে। সুতরাং এইরূপ একে কর দেয়; অপরে দেয় না। এইরূপ অতি অদ্ভুত সিদ্ধান্তানুসারেই পথকর ও পূর্ত্তকরের আইন প্রস্তুত হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? বড় বড় পাকা-রাস্তায় মেটাল্ডরোডে সাহেব-লোকের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই; তাঁদের বগী-ব্রুচ ব্রুহেম, চেরেট, ট্যাণ্ডাম আকাশ দিয়া উড়িয়া যায়! দেশের পাকা রাস্তার যাহা কিছু ব্যবহার, তাহা করে কেবল মেঠো-কৃষাণ ও দুই চারি কাঠা ব্রহ্মোত্তর মাত্র সম্বল-

দরিদ্র ব্রাহ্মণ! বলা বাহুল্য যে, যাহারা পথকর দেয়, তাহাদের অনেকেই কোনও পুরুষে বাঁধা রাস্তা কেমন, কখনও চর্ম্ম চক্ষে দেখে নাই।

পথকর ও পূর্ত্তকরের অবিকল অনুরূপ হইয়াই এই ড্রেণেজকর বসিতেছে। এই কর কেবল জমিজমাসংশ্লিষ্ট লোকেরাই দিতে বাধ্য হইবে। দিতে বাধ্য হইবে কেবল কৃষক, জমিদার ও লাখেরাজদার। আর কেহই নহে। ভাল, স্বীকারই বারেক না হয় করিলাম যে, তোমার এই তথাকথিত ড্রেণেজ দ্বারা দেশে অব্যাহত অসীম স্বাস্থ্যেরই সঞ্চার হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেই ড্রেণেজ-সঞ্জাত স্বাস্থ্যের দ্বারা কি কেবল উপরোক্ত তিন শ্রেণীর লোকেরই উপকার হইবে; আর কাহারই কিছু মাত্র ইষ্টসাধন হইবে না? দেশের উপরোক্ত তিন শ্রেণীর লোকই কি কেবল ম্যালেরিয়া রোগ-গ্রস্ত, আর কেহই নহে? তাহা যদি না হয়, তোমার ড্রেণেজ সঞ্চারিত স্বাস্থ্যের দ্বারা যদি শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল লোকেরই সমান উপকার—সমান ইষ্ট সাধিত হয়, তবে অপর সকল লোককে ছাঁটিয়া রাখিয়া কেবল ঐ তিন শ্রেণীর লোকের উপর কর বসাও কেন?

ড্রেণেজকর সংস্থাপনের সাধারণ নিয়মে ড্রেণেজবিলের এ অংশও অত্যন্ত দূষিত; অত্যন্ত অন্যায়নীতিপ্রণোদিত। অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়, উপস্থিত আন্দোলনে এ কথাটীর উল্লেখ প্রায় কেহই কিছু করিতেছেন না। কিন্তু এই ড্রেণেজকর যে কৃষক সম্প্রদায়ের উপর বর্ত্তিতেছে, বিশেষ ভাবে তাহাই আমাদের আপাততঃ আলোচ্য।

গ্রাম্য-ড্রেণেজ-সঞ্চারিত স্বাস্থ্যের জন্যই হউক, অথবা নদ্যাদি সংস্কারের জন্যই হউক, কোনও দিক দিয়াই কৃষক শ্রেণী এই কর দিতে বাধ্য নহে।

অগ্রে গ্রাম্য ড্রেণেজ-জনিত স্বাস্থ্যের কথাই কিছু আলোচনা করা যাউক। স্বীকার করা যাউক, তাহাতে অবিমিশ্র স্বাস্থ্যই উৎপন্ন হইবে। কিন্তু তাহার জন্য কৃষক কর দিতে বাধ্য নহে; কর দিতে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য ভূম্যধিকারী জমিদার। ইহা ন্যায়-নীতির আদেশ; আধুনিক উন্নত সভ্যতার অঙ্গীকার। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ধরিয়া বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। ইণ্ডিয়ান ন্যাসানাল কংগ্রেসের বিগত বেঙ্গল কনফারেন্সের অধিবেশনে কথাটী অস্ফুট ভাবে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এ দেশীয় তথা-কথিত কৃষক-বন্ধুবর্গের কৃষকসম্প্রদায়ের প্রতি এমনই প্রকৃত প্রাণের টান এবং এমনি জমিদার মুখাপেক্ষতার অল্পতা যে, কথাটী উপস্থিত হইতে হইতেই অশ্রদ্ধার ও অসমর্থনের অতিমাত্র ফাঁকা আওয়াজে আকাশমার্গে উধাও উড়িয়া আকাশেই বিলীন হইয়া গিয়াছিল! ইণ্ডিয়ানএসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিম্ন লিখিত উক্তিতে কথাটী উপস্থিত করিয়া কনফারেন্সের একটী মন্তব্য সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা কয়েকটী এই;—

"That before having recourse to any fresh taxation for the sanitary improvement of the country, the Government should recognise and give effect to the principle enunciated by Professor Thorold Rogers that it is the duty of every land-lord to keep his land in a habitable condition by making adequate provision for pure water, proper drainage and free access of air and light which are essential conditions of healthful living."

অর্থাৎ দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অভিনব কর সংস্থাপনের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের উচিত, অধ্যাপক থোরল্ড রজার্সের ব্যাখ্যাত ব্যবস্থা অনুমোদন করত তাহা কার্য্যে পরিণত করা। অধ্যাপকের উক্তি এই যে,

স্ব স্ব অধিকার মধ্যে রায়ত লোকের আবাস ভূমিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল, উপযুক্ত পয়োনালী এবং অবাধ আলোক ও বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা করা, তাহা মনুষ্যের বাসোপযোগী করা, প্রত্যেক ভূম্যধিকারীরই প্রধান কর্ত্তব্য; কেন না, ঐ সকল উপাদান স্বাস্থ্যরক্ষার্থে একান্ত আবশ্যকীয়।"

বলাবাহুল্য, ইহা কেবল উপরোক্ত অধ্যাপকের অভিমত নহে ? ভূম্যধিকারীর কর্ত্তব্য পরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠার আদেশ। কিন্তু আক্ষেপ এই, এ দেশীয় জমিদার মহাশয়েরা কর্ত্তব্যের এ আদেশ কচিৎ প্রতিপালন করিয়া থাকেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিয়া উপরোক্ত উক্তি কন্‌ফারেন্সের মন্তব্যে প্রকটিত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু, কেবল মাত্র এক ব্যক্তি ব্যতীত এই ন্যায্য প্রস্তাব সমর্থন করিবার জন্য অপর একটী সভ্যও উত্থিত হয়েন নাই!! পক্ষান্তরে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদক স্বয়ং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ প্রস্তাবকে অনির্দ্দিষ্ট, অনিশ্চিত ও অনিষ্টকর বলিয়া একেবারে উড়ায়াই দিয়াছিলেন।

তা দিবারই কথা বটে! নহিলে অকৃত্রিম প্রজা-নীতি ও আকণ্ঠপূর্ণ রায়তসহানুভূতি প্রকাশ পাইবে কেন! প্রকৃত প্রজানীতির এ প্রকার কলঙ্ক কবে এদেশ হইতে দূরীভূত হইবে বলা যায় না। বিহার সার্ভের প্রতিবাদ করিয়া ঐ ন্যাসান্যাল কংগ্রেস নিজেই যখন এ কলঙ্ক সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছেন, তখন আর অন্যের কথা কি ?

ফলতঃ এদেশে প্রকৃত প্রজানীতি অদ্যাবধি আবির্ভূত হয় নাই। তাহা যদি হইত, রায়ত শ্রেণী যদি অথর্ব্ব, অচল, নির্ব্বাক্ না হইত, দেশে দরিদ্রের বন্ধু যদি দুই দশজনও থাকিত—কৃষকের আপনার বলিবার যদি কেহ থাকিত, তাহা হইলে দ্বারিক বাবুর উপরোক্ত প্রস্তাব উপলক্ষে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইত সন্দেহ নাই; এবং ইহাও নিঃসন্দেহ যে, অন্যান্য ন্যায্য আন্দোলনের ন্যায় ড্রেণেজবিলের এই আন্দোলনেরও এমন করিয়া "অন্তর্জ্জলী" হইত না। কিন্তু, প্রকৃত প্রজা-নীতি কোথায় ? যদি এখানে কোনও প্রকার নীতি থাকে, তাহা ধনীর নিকট ধামাধরানীতি।

নদ্যাদি পরিষ্কার ও সংস্কারের জন্যও কৃষক কর দিতে বাধ্য নহে। কৃষক কেন তাহার জন্য কর দিবে? নদীর ফেরি ও টোল টেক্স লয়েন গবর্ণমেণ্ট; জলকর লয়েন জমিদার ও গবর্ণমেণ্ট উভয়ে। কৃষক নদী সংস্কারের জন্য কর দিবে কেন? নদীর উপসত্বে তাহার অধিকার কি ? যাঁহারা তাহার উপসত্বের অধিকারী তাঁহারাই তাহার সংস্কার করিতে ন্যায়ানুসারে বাধ্য।

নদীতীরনিবাসী কৃষক নদীর জল খায় বটে। তা, তেমন সূর্য্যের উত্তাপও লয়; আকাশের বায়ুও অবাধে গ্রহণ করে। চন্দ্রের কিরণ ও তাহার গৃহ প্রাঙ্গনে পতিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের তাপ, আকাশের বায়ু, বা চন্দ্রের জ্যোতি ব্যবহার করার জন্য বঙ্গীয় কৃষকের নিকট কর আদায় করা যে দিন ন্যায়ানুমোদিত হইবে, সেই দিনই নদীর জল পান করার নিমিত্ত সে কর দিতে বাধ্য হইবে; তাহার পূর্ব্বে নহে। তা বর্ত্তমান বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের শাসনে সে দিন সত্যই কি উপস্থিত হইয়াছে ?

কথা উঠিয়াছে, কথা ইঙ্গিতে গবর্ণমেণ্টই উঠাইয়াছেন যে, এই ড্রেণেজ নামক নদনদীর সংস্কার-উন্নতিতে কৃষকের শস্য-

ক্ষেত্রের উন্নতি হইবে; সুতরাং সে নদী ঝাড়াইবার কর দিবে না কেন? কিন্তু নদী-সংস্কারে সাধারণতঃ শস্য ক্ষেত্রের উন্নতিটা কিপ্রকারের এবং কোন দিক্ দিয়া হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহা কিছুই খুলিয়া বলেন নাই। বাঙ্গালার কোন কোনও জিলার কৃষক শস্য-ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে (অর্থাৎ ক্বচিৎ অত্যধিক শুষ্কতা উপস্থিত ও বৃষ্টিপাতের একান্ত অভাব হইলেই) সেঁচের জল ব্যবহার করিয়া থাকে বটে। কিন্তু, সে ক্বচিৎ এবং কোন কোনও স্থানে মাত্র। পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গে সেঁচের ব্যবহার প্রায় কোথায়ও নাই। যে ভৈরব ও কপোতাক্ষ নদের সংস্কারের কথা উঠিয়াছে, তাহাদের তীরে সেঁচের ব্যবহার কোথায় আছে, দেখাইয়া দিলে বুঝিতে পারিতাম। পক্ষান্তরে সেঁচের জলের কর আদৌ এক অভিনব কথা। বিহারে ও বাঙ্গালার এক আধ জিলার শস্য-ক্ষেত্রে কেনালের জল উঠাইয়া দিয়া কর লওয়া হইতেছে বটে। কিন্তু, এই ড্রেণেজবিলের উদ্দেশ্য কি কেনাল কাটিয়া "এনিকট্" বাঁধিয়া কৃষকের শস্যক্ষেত্রে জল যোগাইবার ব্যবস্থা করা? তা, এখানকার কোথায়ও ত কেনাল-কাটা জলের আবশ্যক হয় নাই; কৃষক সে জন্য কাহারও কাছে প্রার্থনাও করে নাই। পরন্তু, কেনালের কৃত্রিম জলে বিহারে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, এ কথাও প্রকাশ; সে দিন পায়োনিয়র পত্রে কোনও কৃষি ব্যবসায়ী এঙ্গলোইণ্ডিয়ান লেখক এ কথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের কি তাহাতে দৃষ্টি পতিত হয় নাই? পুনশ্চ ড্রেণেজ দ্বারা কৃষি কার্য্যের উন্নতির পরিবর্ত্তে যেরূপ বিভ্রাট সম্ভাবনা, ধানকুনী বিলের ড্রেণেজই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। সে বিভ্রাটকাহিনী পাঠককে কিঞ্চিৎ শুনাইতাম; কিন্তু স্থান নাই।

তা, ড্রেণেজ দ্বারা শস্য-ক্ষেত্রের উপকারই হইবে, যদি তর্কের খাতিরে স্বীকারও করা যায়;—সে জন্যও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষক কর দিতে বাধ্য নহে। আইন অনুসারে সে কর জমিদারদিগেরই দিতে হয়। অগ্রে ড্রেণেজ করিয়া, ক্ষেত্রের কি উন্নতি হইয়াছে দেখাও, তাহার পর জমিদার জোতদারের জমার হার বৃদ্ধি করিবেন। বেঙ্গল টেনেন্সি আইনে তাহারও ত বিশিষ্ট ব্যবস্থা আছে।

সাহেবেরা নেটিবদিগকে নোঙ্গরা বলিয়া যতই অপবাদ দিউন, আর অপমান করুন; দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষা স্বাস্থ্য-বিধান নেটিবদের মধ্যে কাহারও অনভিমত নহে। আমরা স্বাস্থ্যবিধানের সম্যক্ পক্ষপাতী, এবং তজ্জন্য অবিলম্বে কোনও উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বিত হওয়া একান্ত আবশ্যক, ইহাও বার বার বলিতেছি। কিন্তু, ড্রেণেজ আইনের এই আলোচ্য পাণ্ডুলিপি দ্বারা সে উপায় হইবে না; উপকারের পরিবর্ত্তে মহা অপকার ও অত্যাচার হইবে, ইহা নিশ্চয়। এ নিশ্চয়তা আমরা বোধ হয়, এই প্রবন্ধে কিয়ৎপরিমাণে প্রতিপন্নও করিয়াছি। তবে শ্রদ্ধাস্পদ স্যর চার্লস্ এলিয়ট্ ও তাঁহার গবর্ণমেণ্ট যে এ ব্যাপারে সদুদ্দেশ্য ও সম্যক্‌রূপে সরলতাপ্রণোদিত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা এই প্রবন্ধের আরম্ভ হইতে বার বার ইহা বলিয়াছি; উপসংহার কালেও পুনরুক্ত করিলাম।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

গীতা সমালোচনা।

আজ কাল গীতার বড় আদর। সকল গৃহেই প্রায় গীতা দৃষ্ট হয়। গীতার বহুবিধ সংস্করণ ও অনুবাদ হইয়াছে। গীতার প্রশংসা আর লোকের মুখে ধরে না। একমাত্র গীতা পাঠ করিলে অন্য শাস্ত্র অধ্যয়নের আর আবশ্যক নাই, শ্রীধর স্বামী এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। হিন্দুমাত্রেই এ কথা মুক্তকণ্ঠে অনুমোদন করেন। কেবল ভারতবাসী আর্য্য সন্তান নয়, ম্লেচ্ছ-কুলোদ্ভব ডেলিনিউসের (Daily News) বর্ত্তমান ইংরাজ সম্পাদক লিখিয়াছেন যে, পৃথিবীর মধ্যে ধর্ম্মপদ, বাইবেল, এবং গীতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুস্তক। তাহাদের মধ্যে গীতাই আবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গীতার সহিত তুলনা করিলে ইউরোপের রাজত্ব এবং সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। নিত্য এবং অনিত্য পদার্থের পার্থক্য, স্বর্গ এবং পরকালের কথা কেবল মাত্র গীতা পাঠেই অবগত হওয়া যায়। গীতার এরূপ প্রশংসা কত দূর যুক্তিসঙ্গত, তাহার সমালোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক প্রকার অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার মধ্যে অনেকগুলিই ভ্রমপূর্ণ। নিজের মানসসম্ভূত হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণার্থ কেহ বা কোন কোন স্থলে স্বকপোলকল্পিত অর্থ করিয়াছেন; কেহ বা অনুবাদ না করিয়া এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহার সহিত মূলের অনেক স্থলে কোনমাত্র সংস্রব নাই। শ্রীমান্ বঙ্কিমচন্দ্র, ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধর স্বামী প্রভৃতিকেও গীতার অর্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই; হিন্দুধর্ম্মের এমনই দুরবস্থা উপস্থিত! ! ! কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ সর্ব্বাপেক্ষা মূলানুযায়ী (literal) এবং উপরিউক্ত দোষ সকল বিবর্জিত। তাঁহার অনুবাদ মূলের সহিত শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে আমরা তাঁহারই অনুবাদ অবলম্বন করিব।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র গীতার ঘটনা স্থল। উক্ত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জুন গীতোক্ত উপদেশমালা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৌরব এবং পাণ্ডবগণ সংগ্রামাভিলাষে ধর্ম্মক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন। এক দিকে ভীষ্মদ্রোণকর্ণপ্রমুখ কৌরবপক্ষীয় বীরগণ ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, অপর দিকে পাণ্ডবীয়েরা উপযুক্ত রূপে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান। তখন প্রতাপবান্ ভীষ্ম, দুর্য্যোধনের হর্ষবর্দ্ধনার্থ সিংহনাদ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি করিলেন। পরক্ষণে ভেরি, শঙ্খ, পণব, আনক, গোমুখ সকল বাদিত হইয়া তুমুল শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। পাণ্ডবীয়েরাও নিরস্ত রহিলেন না। বাসুদেব অর্জ্জুন ভীমসেন যুধিষ্ঠির নকুল ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের হৃদয় বিদারিত করিয়া আপন আপন শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন-সারথি বাসুদেব তাঁহার আদেশে উভয় পক্ষের বল নিরীক্ষণার্থ উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ সংস্থাপন করিলেন। কপিধ্বজ পাণ্ডব দেখিলেন, উভয় সৈন্যের মধ্যে তাহার পিতৃব্য পিতামহ আচার্য্য মাতুল ভ্রাতা পুত্র পৌত্র সখা প্রভৃতি সমস্ত আত্মীয়গণ যুদ্ধে জীবন সংকল্প করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সমরাভিলাষী আত্মীয়-

গণকে দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের মুখ শুষ্ক ও দেহ অবসন্ন কম্পিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। গাণ্ডীব হস্ত হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল এবং সমুদায় ত্বক্ দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন তিনি কাতরস্বরে কহিলেন :—

"হে গোবিন্দ, এ সকল আত্মীয়গণকে নিহত করা শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে না। আমি জয় আকাঙ্ক্ষা করি না, রাজ্য সুখও চাহি না। যাহাদের নিমিত্ত রাজ্য ভোগ ও সুখের কামনা করিতে হয়,সেই আচার্য্য,পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালকপ্রভৃতি আত্মীয়গণকে বধ করিয়া আমাদের রাজ্যে প্রয়োজন কি? ইহারা আমাদের বধ্য করিলেও আমি ইহাদের বধ করিতে পারি না। হে মাধব, আত্মীয়গণকে বধ করিয়া আমি কি প্রকারে সুখী হইব? কৌরবগণের চিত্ত লোভদ্বারা অভিভূত হইয়াছে বলিয়াই যেন ইহারা কুলক্ষয়জনিতদোষ এবং মিত্রদ্রোহ জনিতপাপ দেখিতেছে না। কিন্তু হে জনার্দ্দন, আমরা কুলক্ষয়ের দোষ অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত এই পাপযুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইব না? কুলক্ষয় হইলে কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে কুল অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হয়। কুল অধর্ম্মে পূর্ণ হইলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হয়। এবং তাহা হইতে বর্ণসঙ্কর জন্মায়। ঐ বর্ণসঙ্কর কুল ও কুলনাশকদিগকে নিরয়গামী করে। কুলনাশকদিগের পিতৃগণের পিণ্ড ও উদকক্রিয়া বিলুপ্ত হয়, সুতরাং তাহারা স্বর্গ হইতে পতিত হয়। হায় কি কষ্ট! আমরা এই মহাপাপের অনুষ্ঠান করিতেছি। রাজ্য সুখ লোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমি অস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া রথের উপর উপবেশন করিলে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যদি আমাকে বধ করে, তাহাও আমার কল্যাণকর হইবে।"

অর্জ্জুন এই বলিয়া শোকাকুল চিত্তে রথে উপবেশন করিলেন।

অর্জ্জুনের এই সকল কথা শ্রবণ করিলে, তাঁহাকে শাক্যসিংহ বা যিশুখ্রীষ্টের অবতার বলিয়া বোধ হয়। যে কৌরবগণ তাঁহাদের অন্যায় পূর্ব্বক সমস্ত বিষয় অপহরণ করিয়া বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দান করিতে অস্বীকৃত, যাহাদের জন্য দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর বিরাটভবনে অজ্ঞাতবাসের অশেষ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি এরূপ অমানুষিক দয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া অর্জ্জুন নিজ মনের মহত্ত্ব দেখাইলেন। কৌরবগণ তাহাদের আজন্ম শত্রু। জতুগৃহ দাহ ও সভামধ্যে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা করিয়া তাহাদের কলুষিত হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছে। অস্ত্রহস্তে উপস্থিত এরূপ শত্রুকে সম্মুখসংগ্রামে হত্যা করিতে কোন বীরই পরাঙ্মুখ হয় না। শত্রুকে শাস্তি প্রদান করা মানবের প্রকৃতি, কিন্তু তাহাকে ক্ষমা করা ঈশ্বরের ধর্ম্ম। অর্জ্জুনের হৃদয় সেই স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইয়া জ্ঞাতিনিধনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। পাঠক হয় ত ভাবিবেন যে, কৃষ্ণ যখন ঈশ্বরের অবতার বলিয়া দাওয়া করেন, তখন তিনি অর্জ্জুনের সেই সাধু ইচ্ছার পোষকতা করিবেন, এবং নরহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিবেন; ঈশার ন্যায় মহাশত্রুর উপকার করিতে আদেশ করিবেন। কিন্তু কৃষ্ণের হৃদয় মর্ত্ত্যের মানবের ন্যায় প্রতিহিংসাপূর্ণ। তিনি অর্জ্জুনের কাতরতা দেখিয়া বলিলেন—

"হে পরন্তপ, তুচ্ছ হৃদয়দৌর্ব্বল্য দূরীকৃত করিয়া উত্থান কর। ঈদৃশ বিষম সময়ে কি জন্য অনার্য্যজনোচিত স্বর্গপ্রতিরোধকর এবং অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল।"

জ্ঞাতি বধই বোধ হয় কৃষ্ণের মতে আর্য্যজনোচিত কার্য্য, এবং গুরুহত্যা পিতামহহত্যাই স্বর্গ গমনের এবং কীর্ত্তিস্থাপনের একমাত্র উপায়।

কৃষ্ণের এই বাক্যে অর্জ্জুনের মোহ অপনোদন হইল না। তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন।

"ভগবন্, আমি কিপ্রকারে পূজনীয় ভীষ্ম এবং

দ্রোণকে শরজাল দ্বারা বিদ্ধ করিব। গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া যদি ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। এই যুদ্ধে জয় এবং পরাজয়ের মধ্যে কোন্‌টীর গৌরব অধিক, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ, যাহাদিগকে বধ করিয়া ভূমণ্ডলের রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও আমার ইন্দ্রিয়গণ শোকে পরিশুষ্ক হইবে, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যুদ্ধার্থে উপস্থিত।"

ইহা বলিয়া আমি যুদ্ধ করিব না বলিয়া ধনঞ্জয় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

কৃষ্ণ দেখিলেন, যথোপযুক্ত উত্তর দিয়া অর্জ্জুনের ন্যায়সঙ্গত আপত্তির খণ্ডন করা দুরূহ। যখন তর্কে পারা যায় না, তখন গম্ভীরভাবে মুরুব্বিআনা চালে—"বাপুহে তুমি বালক, তোমার বুদ্ধি সম্যক্‌ পরিস্ফুট হয় নাই; এ সকল শাস্ত্রীয় কথা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন; তুমি বুদ্ধিমান হইয়া এরূপ কুতর্ক করিতেছ কেন?" ইত্যাদি বলিয়াও জয়ী হওয়া যায়। কৃষ্ণ এখন সেই পথ অবলম্বন করিয়া যাহা বলিলেন, তাহার ভাবার্থ এই:—

"অর্জ্জুন, তুমি পণ্ডিত হইয়া মূর্খতা প্রকাশ করিতেছ কেন? শরীর অনিত্য, কিন্তু শরীরী আত্মা নিত্য এবং অবিনাশী। মৃত্যুর পর আত্মা দেহান্তর পরিগ্রহ করেন। তুমি আমি এবং রাজন্যবর্গ জন্মের পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিলাম, মৃত্যুর পরও থাকিব। জীবাত্মা শস্ত্রে ছেদিত হয় না, বা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। তিনি কাহাকেও বধ করেন না, বা করিতে আদেশ করেন না। জাত ব্যক্তির মৃত্যু এবং মৃত ব্যক্তির জন্ম অপরিহার্য্য। অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আনন্দচিত্তে জ্ঞাতিবর্গকে সমূলে নির্মূল কর। কেবলমাত্র তাহাদের শরীর বিনষ্ট হইবে। আত্মার কিছুই হইবে না, সুতরাং তোমারও কোন পাপস্পর্শ হইবে না।"

বেশ্‌ কথা; এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া অর্থের জন্য কেহ পিতৃহত্যা করিলেও গীতা-মুরারীর ব্রহ্মোপাসকগণ তাহার কিছুমাত্র দোষ দিতে পারিবেন না। এই সকল কথা শুনিলে Julius ceasar নাটকের Cassius এর উক্তি মনে পড়ে:—

Cassius:—He that cuts off twenty years of life, cuts off twenty years of fearing death.

Brutus:—Grant that and then is death a benifit; so we are Ceasar's friends, that have abridged his time of fearing death.

তৎপরে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের আত্মগরিমা বৃত্তি উত্তেজিত করণাশায় বলিলেন যে, "তুমি এক জন মহারথী হইয়া যুদ্ধ না করিলে অন্যান্য বীরগণ তোমাকে ভীরু বলিয়া উপহাস করিবে। আর সমরে বিনষ্ট হইলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে; জয়ী হইলে পৃথিবী উপভোগ করিবে। দুই দিকেই লাভ, অতএব তুমি যুদ্ধ কর।"

এই সকল "তত্ত্বজ্ঞানের" কথা প্রকাশ করিয়া বাসুদেব কর্ম্মযোগ বিষয়িণী বুদ্ধি কীর্ত্তন করিলেন। তিনি বলিলেন "হে ধনঞ্জয়, তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য জ্ঞান করত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান কর" ইহাই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্ব। এই সকল সুন্দর উপদেশের জন্য গীতার এত আদর। এই স্থানে বাসুদেব বেদোক্ত যজ্ঞাদি দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তীচ্ছু ব্রাহ্মণগণকে বিলক্ষণ উপহাস করিয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে তাহার সমালোচনা করিব। এই সকল শাস্ত্রীয় কথা শুনিতে শুনিতে অর্জ্জুনের "সমাবিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ" ব্যক্তির লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা হইল। কৃষ্ণ তাহা বলিয়া দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করিলেন:—

দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

"যিনি দুঃখে অক্ষুব্ধচিত্ত। সুখে স্পৃহাশূন্য এবং অনুরাগ ভয় ও ক্রোধ বিবর্জ্জিত, সেই মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ"

কখন জ্ঞানের কখন বা কর্ম্মের প্রশংসা শুনিয়া অর্জ্জুনের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তজ্জন্য তিনি বলিলেন "হে জনার্দ্দন, যদি তোমার মতে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে কি নিমিত্ত এই অধর্ম্মকর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ। যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, এমন একপক্ষ নিশ্চয় করিয়া বল।" ভগবান বাসুদেব বলিলেন, পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না, এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত না হইলে কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। "কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ" তদ্বিষয়ে অনেক নজীর দেখাইলেন, যথা (১) জনকাদি ঋষিরা নাকি কেবল মাত্র কর্ম্ম করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। (২) সৃষ্টির সময় প্রজাপতি এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন যে, প্রজাগণ যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা দেবতাগণকে সংবর্দ্ধিত করিবেন, এবং দেবতাগণও বৃষ্টি দ্বারা অন্নের উৎপত্তি করিয়া প্রজাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিবেন। এই ঘোর কলিকালে যজ্ঞকর্ম্ম যেরূপ লোপ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে দেবতাকুলের যেন কোন কষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য। খৃষ্টীয়ান্ মুসলমান প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতির নিকট ইহা প্রত্যাশা করা যায় না। "কারণ তাহারা এমন চোর যে, পঞ্চযজ্ঞাদি দ্বারা দেবঋণ পরিশোধ না করিয়াই দেবগণদত্ত অন্নাদি ভোগ করে"!!!

শ্রীভগবান আরও বলিলেন যে "শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহার অনুসরণ করে। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞদিগের কর্ম্মসকল নিষ্ফল ইত্যাদি বলিয়া তাহাদের বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন না করিয়া স্বয়ং সর্ব্ব প্রকার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাহাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবেন।" অর্থাৎ অজ্ঞ ও মূর্খকে অজ্ঞ ও মূর্খ রাখিতে বিজ্ঞব্যক্তি বিধিমত চেষ্টা করিবেন। পাছে মূর্খ লোকের অর্থশূন্য বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি সন্দেহ জন্মে এবং তন্নিবন্ধন পুরোহিতবর্গের আধিপত্য এবং অর্থলাভ কম হয়, তজ্জন্য বুদ্ধিমান লোকেরা সেই সকল কর্ম্মকে নিষ্ফল জানিয়াও তাহাদের প্রতারণার জন্য স্বয়ং আচরণ করিবেন!!! একথা কেবল ব্রাহ্মণ গীতাকারের মুখেই শোভা পায়।

কৃষ্ণের তৃতীয় সর্গের শেষ যুক্তি এই :— অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। তাহাতে তাহার পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিবার আবশ্যক নাই। অতএব তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে জ্ঞাতি হত্যায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কারণ, আপনার জাতিধর্ম্ম প্রতিপালন করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ॥

সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ। হাইকোর্টের শূদ্রবিচারপতি এবং উকিলগণ! আপনাদের গীতায় ভক্তি থাকিলে এই দণ্ডেই আপনাদের কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া দ্বিজগণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইবেন। ভিষক্‌কুলতিলক শ্রীমান্ কৃষ্ণানন্দ স্বামী আয়ুর্ব্বেদ পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে হিন্দু ধর্ম্ম প্রচাররূপ ব্রাহ্মণোচিতকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া গীতার অবমাননা করিতেছেন, তাহাও আমাদের বোধগম্য হইতেছেনা। তিনি ত স্বয়ংই "গীতার্থসন্দীপনী" ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, একের যাহা ঔষধ, অন্যের তাহা বিষ। সনাতন ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করা বিপ্রবর্গের স্বর্গলাভের উপায় হইলেও বৈদ্যাদি শূদ্রজনের অধোগমনের সেতু। পণ্ডিত প্রবর মহামতি Monier Williams উল্লিখিত

শ্লোকের এইরূপ ভাবার্থ ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

"Better to do the duty of one's caste,
Though bad and ill performed and fraught with evil,
Then undertake the business of another,
However good it be."

Remembering the sacred character attributed to this poem and the veneration in which it has always been held throughout India we may well understand, that such words as these must have exerted a powerful influence for the last 1800 years tending as they must have done to rivet the fetters of caste institutions which for several centuries preceeding the Christian Era not-withstanding the efforts of the great Liberator Budha, increased year by year, their hold upon the various classes of Hindu society, impeding mutual intercourse, preventing healthy interchange of ideas and making national union almost impossible.

চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে যোগের মাহাত্ম্য বর্দ্ধির জন্য ভগবান বাসুদেব এক 'আষাড়ে অবতারণা' করিয়া বলিলেন, আমিই প্রথম সূর্য্য ঠাকুরকে যোগের কথা বলি। আদিত্য (বোধহয় মর্ত্ত্যলোকে একদিন বেড়াইতে আসিয়া) মনুকে বলিয়া যান, মনু বলেন ইক্ষ্বাকুকে এবং নেমিপ্রভৃতি রাজগণ ইক্ষ্বাকুর প্রমুখাৎ অবগত হয়েন। কালক্রমে এই বিদ্যার লোপ হয়। তুমি আমার বিশেষ ভক্ত বলিয়া আজ আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ধনঞ্জয় ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মাধব, প্রভাকরের জন্ম হইবার অনেক পরে তোমার জন্ম। অতএব তুমি তাহাকে অগ্রে কিরূপে বলিলে? কেশব বলিলেন, এ জন্ম হইবার পূর্ব্বে আমার অনেক জন্ম হইয়াছিল, সেই সময় আমি বলি। এই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পূর্ব্বজন্মের দুই একটী বৃত্তান্ত শুনাইয়াদিলেন।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

মধুসূদন কোন্ সময় দুষ্টদিগের নিপাত করিয়া কোথায় ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তাহার পরিণামই বা কি, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু কালের এরূপ কুটিল গতি যে, দুষ্ট ম্লেচ্ছগণ তাঁহারই রাজ্য বিনাশ করিতে বসিয়াছে। সুরধুনী কাব্যে একথা তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। একদিন শ্রীকৃষ্ণের মথুরায়—

নিকুঞ্জ মন্দির দ্বার হইল মোচন,
বাহির হইল রাধা মদনমোহন,
বিষাদিনী বিনোদিনী নীলনেত্রে নীর,
মলিন মধুর মুখ আতঙ্কে অধীর,
উপনীত উভয়েতে প্রবাহিনী তটে,
কিশোরী কহিল কাঁদি কৃষ্ণের নিকটে।
কেন নাথ অকস্মাৎ এ ভাব তোমার,
কি জন্য ত্যজিতে চাও জগৎ সংসার?
রাধার বচন শুনি মদনমোহন,
বলিলেন মৃদুস্বরে এই বিবরণ,
অজ্ঞানের অন্ধকারে ভ্রমের মন্দিরে,
আধিপত্য এতদিন উন্নত শরীরে
করিয়াছি অনায়াসে, এবে অবোধিনি,
জ্ঞানালোকে আলোময় হয়েছে মেদিনী,
গিয়াছে আঁধার দূরে ভেঙ্গেছে মন্দির,
কতক্ষণ ঢাকা রহে মেঘেতে মিহির?
বলিতে বলিতে শ্যাম বিরস বদনে,
ঝাঁপ দিলা কালীদহে সার ভেবে মনে।
কোথায় প্রাণের হরি বলি কমলিনী,
পড়িল জীবন মাঝে যেন পাগলিনী।

এই সর্গে যোগের অনেক কথা আছে, যথা—"কোন কোন যোগী প্রাণবৃত্তিতে অপান বৃত্তিকে আহুতি প্রদান করিয়া, অপানবৃত্তিতে প্রাণবৃত্তিকে আহুতি প্রদান করিয়া রেচক এবং প্রাণ-অপানের গতিরোধ করিয়া কুম্ভক রূপ প্রাণায়াম করেন; আর কেহ কেহ নিয়তাহার হইয়া প্রাণেন্দ্রিয় সমুদায়কে হোম করিয়া থাকেন"। যোগে আমাদের

বিশ্বাস নাই। বিজ্ঞানশাস্ত্র ইহার সমর্থন করে না। যোগশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া দ্বারা জীবাত্মার উন্নতি এবং অমানুষিক শক্তিলাভ হইতে পারে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যোগ-সম্বন্ধে আমাদের দেশের "মুখোজ্জ্বলকারী" শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত C. I. E. বলেনঃ—

"As a system of Philosophy yoga is valueless. Patanjali tried to blend the idea of a Supreme Diety with the philosophy of Kapila; but unfortunately, he also mixed up with it much of the superstition and mystic practices of the age. In later times the philosophy of the yoga system has been lost sight of, and the system has degenerated into cruel and indecent Tantrik rites or into the impostures and superstitions of the so-called Yogins of the present day."

এবং যোগশাস্ত্রসম্ভূত তন্ত্রশাস্ত্র এবং তদুক্ত ক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি বলেন—"Ignorance is credulous and feebleness hankers after power. And when a superstitious ignorance and a senile feebleness had reached the last stage of degeneracy, men sought by unwholesome practices and unholy rites to acquire that power which Providence has rendered attainable only by a free, open, and healthy exercise of our faculties, moral, intellectual and physical. Tantra literature represents a diseased form of human mind." Monier Williams বলেন; "The yoga is scarcely worthy of the name of a system of Philosophy All these mortifications (i. e. those undergone by the Yogins) are explicable by their connection with the *fancied attainment of extraordinary sanctity and supernatural powers.*"

অন্যান্য ইউরোপীয় এবং অনেক দেশীয় পণ্ডিতগণের এই মত।

যোগ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, অর্জ্জুন, তোমার সম্যক্ জ্ঞান হয় নাই। জ্ঞান থাকিলে তুমি আর এ প্রকার বন্ধুবধজনিতমোহে অভিভূত হইতে না! (৪র্থ অধ্যায় ৩৫ শ্লোক) অর্থাৎ একবার ভাল করিয়া জ্ঞান জন্মাইলে, গো-ব্রাহ্মণ হত্যা করিতে তোমার কিছুমাত্র সঙ্কোচ থাকিবে না। এরূপ জ্ঞানকেই বোধ হয় চলিত ভাষায় টনটনে জ্ঞান বলে!

পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব, কর্ম্মযোগ এবং কর্ম্মত্যাগের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহা অবধারিত করিয়া বল। কৃষ্ণ বলিলেন, কর্ম্মত্যাগ এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিন্তু কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে। দীর্ঘ জটাশ্মশ্রুধারী গঞ্জিকাসেবী অলস কর্ম্মশূন্য সন্ন্যাসিগণের প্রতি গীতাকার বড়ই বিরক্ত। তিনি ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেনঃ—

অনাশ্রিত্য কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসীচ যোগীচ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ।

"যিনি ফলে বিতৃষ্ণ হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, তিনি সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী; কিন্তু যিনি অগ্নি-সাধ্য ইষ্টি (যজ্ঞকর্ম্মাদি) ও পূর্ত্ত (পুষ্করিণী খনন, পথ প্রস্তুতাদি) প্রভৃতি (সাধারণের হিতকর) কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসীও নন, যোগীও নন।" গৈরিকবসনধারী পরভাগ্যোপজীবী জ্ঞানানন্দ স্বামী, প্রেমানন্দ স্বামী, বগলানন্দ স্বামী প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর ধূমপায়ী পরমহংসগণ এবং তাঁহাদের ভক্ত এবং প্রতিপালক হিন্দু মহোদয়গণকে, আমরা গীতার এই শ্লোকটী স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি।

এই স্বর্গে যোগ সাধনের অনেক উপায় বর্ণিত আছে। যথা "পবিত্র স্থানে কুশ, অজিন ও বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত অনতি উচ্চ অনতি-নিম্ন স্থিরতর আসন সংস্থাপন করিয়া, শরীর মস্তক গ্রীবা সরল ভাবে ধারণ এবং দৃষ্টিকে অন্যান্য দিক্ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে।" এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা ঐহিক বা পারলৌকিক কোন উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না, তাহা আমরা জানি না। পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহাদের ভোজন-স্পৃহা বা নিদ্রাভিলাষ কিঞ্চিৎ অধিক, তাঁহারা

মাত্রা একটু কমাইয়া দিবেন, আর যাঁহারা অল্প আহার করেন, বা অত্যল্প সময় নিদ্রা যান, তাঁহারাও মাত্রা কিছু বাড়াইবেন। নচেৎ তাঁহাদের সমাধি হওয়া দুষ্কর। অর্জ্জুন দেখিলেন, যোগটা বড় সহজ ব্যাপার নয়। তজ্জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি "কেহ প্রথমে যোগে প্রবৃত্ত হইয়া পরে যত্নহীন হইয়া যোগ-ভ্রষ্টচেতা হয়; সে যোগ সিদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়? সে কি যোগ কর্ম্ম (মোক্ষ ও স্বর্গ) উভয় হইতে ভ্রষ্ট হয়?" কৃষ্ণ বলিলেন "যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারীদিগের প্রাপ্যলোকে বহুবৎসর অবস্থান করিয়া সদাচার ও ধনসম্পন্নদিগের গৃহে অথবা বুদ্ধিমান যোগীদের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন।" অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান বাসুদেব বলিলেন "যে ব্যক্তি একান্ত মনে অন্তিম কালে যে যে বস্তু স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, সে সেই সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।" এই শ্লোকটী বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য কোন বঙ্গীয় ভাষ্যকার অশেষ আয়াস সহকারে অনেকগুলি নজীর সংগ্রহ করিয়াছেন। যথা (১) তৈলপায়িকা অত্যন্ত ভয় প্রযুক্ত, ভ্রমর কীট (কাঁচপোকা) চিন্তা-বশতঃ দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে নিজ দেহ পরিহার পূর্ব্বক ভ্রমর ভাবাপন্ন হইয়া যায়। (২) নন্দীকেশরী সর্ব্বদা সদাশিবে ভাবনা করিতে করিতে সেই দেহেই শিবরূপী হইয়াছিলেন।" এরূপ রূপান্তরের বৈজ্ঞানিক যুক্তি তিনি প্রকাশ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। তিনি বলেন যে "যে বিষয়ের তীব্র চিন্তা সর্ব্বদা মনোমধ্যে ক্রিয়া করিতে থাকে, মনোময় সূক্ষ্ম শরীর তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া যায়।" তবে ত শ্রীক্ষেত্রবাসী যে সকল লোক মৃত্যুকালে দারুব্রহ্মের অঙ্গবিহীন রূপ চিন্তা করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন, পর জন্মে তাহাদের হস্ত পদাদি শূন্য হইয়া জন্মাইবার সম্ভাবনা। ম্রিয়মান ব্যক্তিকে গঙ্গাযাত্রা করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, স্রোতস্বিনী ভাগিরথী পার্শ্বে শয়ন করিয়া পুণ্যসলিলার স্নিগ্ধবারি পান এবং তরঙ্গমালা সুশোভিত জল-রাশি দর্শন করিতে করিতে যদি অন্তিম কালে কেবল মাত্র জলের রূপই মনে পড়ে, তবে ত তাহাকে পরজন্মে জল হইয়া থাকিতে হইবে।

এত পদার্থবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের ছড়াছড়ীর ভিতর, নন্দদুলাল কাবের কথাটী বিস্মৃত হইবার লোক নন। তিনি অর্জ্জুনকে সার কথা বলিয়াছিলেন যে, বৃথা বাক্য ব্যয় দ্বারা কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।

সকল সময় আমাকে অনুসরণ কর এবং যুদ্ধ কর। নবম সর্গে হৃষীকেশ, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবের আরাধনার অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া বলিলেন যে "দেবতাপূজকগণ দেবলোকে, পিতৃপূজকগণ পিতৃলোকে গমন করেন। যাহারা ভূতের উপাসক তাহারা ভূত হন। কিন্তু যাঁহারা আমার উপাসক, তাঁহারা ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হন"। এরূপ কথা তিনি পূর্ব্বেও অনেক বার বলিয়াছিলেন। "অন্য উপাসকের স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত ও (পুত্রলাভ শত্রুজয়াদি বিষয় বাসনা দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া) প্রসিদ্ধ উপবাসাদি নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ভূত প্রেতাদি ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনা করে" (৭ অধ্যায়-২০ শ্লোক)। আশ্বিন এবং কার্ত্তিক মাসে বঙ্গদেশে অনেক দেবতাই ষোড়শোপচারে পূজা পাইয়া থাকেন। তাহারাই গীতোক্ত ক্ষুদ্র দেবতা কি না, তাহা ভক্ত মাত্রেরই বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করা উচিত। কারণ, বহুবিধ অর্থ ব্যয় এবং

অশেষ শারীরিক এবং মানসিক ক্লেশ সহ্য করিয়া শেষে ভূত পূজার ফল স্বরূপ প্রেতত্ব পাইতে হইলে, অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। আর দেবতা পূজারই বা প্রয়োজন কি? ভগবান তো স্পষ্টাক্ষরে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, দেবতা পূজার ফল ক্ষণস্থায়ী। বেদত্রয় বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে পরলোকের মোক্ষ হয় না, তাহাদের পুণ্যসত্বর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং বারম্বার তাহাদের জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহাম্যহং।

"যাঁহারা অনন্যমনে আমারে চিন্তা ও আরাধনা করেন, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠব্যক্তিদিগকে প্রার্থনা না করিলেও যোগমোক্ষ অন্নবস্ত্রাদি অথবা নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি" অর্থাৎ ভক্তের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভগবান স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভক্তকে তজ্জন্য চেষ্টা ও যত্ন করিতে হয় না। পাপী এবং শূদ্রেরও নিরাশ হইবার কারণ নাই। কারণ, "যাহারা নিকৃষ্ট জাত বা নিতান্ত পাপাত্মা, যাহারা কৃষ্যাদিনিরত বৈশ্য ও যাহারা অধ্যয়ন বিরহিত শূদ্র-ও স্ত্রীলোক, তাহারাও ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলে অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে"। (৯ অধ্যায় ৩২শ্লোক) যদি ব্রহ্মোপাসনাই মোক্ষ লাভের এক মাত্র উপায় হয়, যদি ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলে সকল পাপ—সকল দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তবে কেন ভাই অনর্থক ভূতের উপাসনা করিয়া শরীর মন কলুষিত কর?

দশম অধ্যায়ের নাম বিভূতিযোগ। এই অধ্যায়ে কৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর আপনার বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যের এক তালিকা দিলেন। তাহার দুই একটী নমুনা দিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনি বলিলেন, আমি—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ; হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত; অশ্বের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা; সবিষ ভুজঙ্গের মধ্যে বাসুকি; এবং নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের মধ্যে অনন্ত; মৎস্যের মধ্যে মকর; অক্ষরের মধ্যে অকার; সমাসের মধ্যে দ্বন্দ; মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং

ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভারতর্ষভ।

সর্ব্বভূতের ধর্ম্মানুগত(স্বীয় বনিতাতে পুত্রোৎপত্তি মাত্রের উপযোগী)কাম ইত্যাদি।

একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন একটা মস্ত আব্দার করিয়া বসিলেন। তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন, আমাকে তোমার 'বিশ্বরূপ' দেখাও। কৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পরমবন্ধুকে এক জোড়া দিব্য চক্ষু দিলেন। তৎসাহায্যে মধ্যম পাণ্ডব বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া নয়নমন সার্থক করিলেন। বিশ্বব্যাপিমূর্ত্তি বাক্ দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। কৃষ্ণানন্দের গীতাস্থ আলেখ্য দর্শন করিলে পাঠকবর্গ অনেকটা idea করিতে পারিবেন। ধনঞ্জয় দেখিলেন, কৃষ্ণের দেহ বহুতর বাহু, উদর, মুখ ও নেত্রসম্পন্ন। তাহার আদি, অন্ত, মধ্য কিছুই নাই এবং একাকী স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সমস্ত দিগ্বলয় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন কিন্তু কোন্ স্থান হইতে ইহা দর্শন করিলেন, তাহা কোন ভাষ্যকারই ব্যক্ত করেন নাই। মহামতি পার্থ আরও দেখিলেন যে, মহাবীর ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অন্যান্য মহীপালগণ ও তাহাদিগের যোদ্ধৃবর্গ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের বদনবিবরে প্রবেশ করিতেছে এবং বিশাল দন্তাঘাতে তাহাদের উত্তমাঙ্গ চূর্ণীকৃত হইতেছে। বাসুদেব সেই মূর্ত্তিতেই বলিলেন—"হে অর্জ্জুন, আমিই লোকক্ষয়কারী সাক্ষাৎ কালরূপী হইয়া লোক সকল বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি ব্যতিরেকে প্রতিপক্ষীয় সমস্ত বীরগণই বিনষ্ট হইবেন। অতএব তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে বিনাশ করতঃ যশোলাভ এবং অতি সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর। আমি তাহাদের

অগ্রেই নিহত করিয়াছি; এক্ষণে তুমি বিনাশের নিমিত্ত মাত্র হও। হে অর্জ্জুন, আমিই দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ প্রভৃতি বীরগণকে বিনষ্ট করিয়া রাখিয়াছি" তুমি কেবল তাহাদের গলা একটু একটু কাটিয়া দাও, তাহা হইলেই কার্য্য উদ্ধার হইবে। তজ্জন্য কিছুমাত্র ব্যথিত হইওনা। অনতিবিলম্বে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। নিশ্চয় তোমার জয় হইবে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অর্জ্জুনের জ্ঞান-মার্গ উন্মুক্ত হইল, এবং আমি হন্তা, উহারা হত, এরূপ ভ্রান্তি দুর হইল। ইংরাজ বিচার-পতিগণকে আমরা গীতার এই অংশটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কারণ, তাহারা অনেক সময় অমুক লোক, অমুক লোককে হত্যা করিয়াছে বলিয়া নিরপরাধীকে অনর্থক শাস্তি প্রদান করেন। অনেক দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকের মনে একটা কুসংস্কার আছে যে, কোন কোন শ্বেত-পুরুষ কোন কোন কৃষ্ণকায়কে নিহত করিয়াছেন। ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সহিত ভগবদ্গীতা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বৃন্দাবনের ননীচোরাই যথার্থ হত্যাকারী; সাহেব নিমিত্তমাত্র। যিনি নিমিত্তমাত্র, তাহার আবার অপরাধ কি?

বন্ধুর অনেক স্তব স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া, কৃষ্ণ পুনরায় নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই আমার তেজোময় বিশ্বব্যাপী মূর্ত্তি দর্শন করে নাই।" এই কথাটার জন্য বঙ্কিম বাবু বড় গোলে পড়িয়াছিলেন। কেননা, কুরুসভায় এবং অন্যান্য স্থানে সহস্র সহস্র লোককে তিনি ইতিপূর্ব্বে বিশ্বরূপ সন্দর্শন করাইয়া আজ বলিলেন কি না "আমার বিশ্বরূপ তুমি ভিন্ন কেহ দেখে নাই" (কৃষ্ণ চরিত্র—৩৭৩পৃষ্ঠা), কিন্তু উপন্যাস কর্ত্তার কল্পনাময়ী লেখনী সত্বরই একটা সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বকার সমস্ত বিষয়ই "প্রক্ষিপ্ত", "অঙ্গুলীকণ্ডুয়ন নিপীড়িত প্রক্ষিপ্ত-কারীর জাতিগোষ্ঠীসম্ভূত কোন কুকবি প্রণীত অলীক উপন্যাস" আর এই বিশ্বরূপটাই আদৃত। * ক্রমশঃ।

শ্রীজয়গোপাল দে।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান। (প্রতিবাদ।)

ভাদ্র মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার তাঁহার "হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান" প্রবন্ধে বঙ্গদেশের কয়েকজন স্বর্গীয় মনস্বী ব্যক্তির প্রতি অযথা আক্রমণ করিয়াছেন, দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। তাঁহার সেই অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ আবশ্যক মনে করিয়া এই প্রবন্ধটী লিখিলাম।

বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন যে, প্রকারান্তরে জাতিভেদ মূলক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যেই হইতেছে, মধুসূদন বাবুর এই কথার সহিত আমাদিগের মতভেদ নাই। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন, "বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও ভূদেবের জীবনের মর্ম্মভেদ করিলে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের ক্রমবিকাশের লক্ষণ পাওয়া

* আমরা এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ সম্বলিত গীতা হইতে অনেক স্থলেই অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। উক্ত পুস্তকের অনুবাদই ভ্রমশূন্য। গীতার যথার্থ অর্থ জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ উহা পাঠ করিবেন। উক্ত পুস্তকের মূল্য আট আনা মাত্র।

যায়," এ কথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। অন্ততঃ প্রথমোক্ত দুইজন মহাত্মা সম্বন্ধে আমরা একথা আদৌ স্বীকার করি না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন যে, তাঁহার "বিধবা বিবাহের আন্দোলন ও বহু বিবাহ-নিবারণ-যত্ন কেবল ব্রাহ্মণবংশ বৃদ্ধির জন্যই সূচিত হইয়াছিল। সাধারণ হিন্দুজাতির ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক গণ্ডূষ চিন্তারও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।" বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে এরূপ রূঢ় কথা আর কাহাকেও কখনও প্রয়োগ করিতে দেখি নাই। কথাগুলি যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমরা তাহা কথঞ্চিৎ সহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু কে বলিবে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমস্ত জীবনব্যাপী কার্য্য কেবল মাত্র ব্রাহ্মন জাতির প্রাধান্য সংস্থাপনের জন্য। বিধবা বিবাহের আন্দোলন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল ব্রাহ্মণ জাতির বংশ বৃদ্ধির জন্য করিয়াছিলেন, একথা এই নূতন শুনিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় কি কোথাও বলিয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত হওয়া আবশ্যক? সরকার মহাশয় তাহার প্রমাণ দিলে বাধিত হইব।

বহুবিবাহ নিবারণের আন্দোলনই কতক পরিমাণে ব্রাহ্মণ জাতির মঙ্গলার্থ সূচিত হইয়াছিল বরং একথা স্বীকার করা যায়; কেননা কুলীনব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই বহুবিবাহ এক সময়ে বিশেষরূপ প্রবল ছিল, তথাপি ব্রাহ্মণেতরজাতির মধ্যে যে, একাধিক বিবাহ প্রচলিত ছিল না, একথা ত কেহই বলিতে পারেন না? অতএব আমরা কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে, সাধারণ হিন্দুজাতির উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বিন্দুমাত্র চিন্তা করেন নাই? সহমরণ প্রথা যখন প্রচলিত ছিল, তখন সাধারণতঃ ব্রাহ্মণবিধবারাই স্বামীর অনুগামিনী হইতেন। ব্রাহ্মণরমণীর তুলনায় অন্যান্য জাতীয়া সহমৃতা রমণীর সংখ্যা যে অল্প ছিল, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রাদেশ যেরূপ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন, শূদ্রেরা সেরূপ করিতেন না, তাঁহাদিগের ততদূর কঠোর ভাবে নিষ্ঠাবান হওয়া আবশ্যক বলিয়া কেহ বোধ করিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়া কি বলিব যে, রাজা রামমোহন রায় কেবল ব্রাহ্মণ জাতির কল্যাণার্থ সতীদাহ নিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন? সতীদাহের লোমহর্ষণ দৃশ্যে হৃদয়ে আঘাত পাইয়া রাজর্ষি রামমোহন যেমন তাহার তিরোধানের জন্য কায়মনে যত্ন করিয়াছিলেন, হিন্দুবিধবা ও কুলীন-কামিনীদিগের দুঃখে সেইরূপ ব্যথা পাইয়া, সহৃদয় বিদ্যাসাগর সেই কুপ্রথার তিরোধানের জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি ব্রাহ্মণশূদ্রের ভেদাভেদ করেন নাই, সে ক্ষুদ্র কথা তাঁহার বিস্তৃত হৃদয়ে স্থান পায় নাই। দুঃখিনী বঙ্গরমণীকুলের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছিল, তাই তিনি তাহার তিরোধানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। "অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং" বিদ্যাসাগরকে যিনি সেরূপ লঘুচেতা মনে করেন, তিনি কেবল নিজের সংকীর্ণহৃদয়তার পরিচয় দেন মাত্র।

তাহার পর বঙ্কিম বাবুর কথা। মধুসূদন বাবু বলিয়াছেন, "বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র কেবল ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপনের জন্য।" মধুসূদন বাবু কেমন করিয়া একথা বলিলেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম না। যে বঙ্কিম বাবু স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, বৈদ্যবংশোদ্ভব কেশবচন্দ্র সেন সকল ব্রাহ্মণের ভক্তিভাজন, তিনি

ব্রাহ্মণ জাতির প্রাধান্য স্থাপনের জন্য যত্ন করিয়াছেন, একথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বঙ্কিম বাবু যে, জাতিগত ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিতেন না, তাহা তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের দশম অধ্যায়ে তিনি বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। যজ্ঞোপবীতধারী হইলেই যে ব্রাহ্মণ হইল, এবং তাহাকেই ভক্তি করিতে হইবে, একথা একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন, পরন্তু তিনি ক্ষমবান্, দমশীল, জিতক্রোধ, জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মাত্রকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং যাঁহারা ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব হইয়াও উল্লিখিতরূপ গুণ-সম্পন্ন নহেন, তাহাদিগকে তিনি এক প্রকার শূদ্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই মত সমর্থনের জন্য এবং তাহা সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। সম্পাদক মহাশয়ের অনুমতি লইয়া আমি এস্থলে ধর্ম্মতত্ত্বের একস্থল হইতে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

শিষ্য। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণেরা লুচিও ভাজেন, রুটীও বেচেন, কালী খাড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে?

গুরু। কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম্ম। এই টুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনতির একটী গুরুতর কারণ। যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না।

গুরু। ঠিক্ তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব, যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য; ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন?

গুরু। কেন করিব না? ঐ মহাত্মা সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র।

শিষ্য। আপনার এরূপ হিন্দুয়ানীতে কোন হিন্দু মত দিবে না।

গুরু। না দিক্, কিন্তু ইহাই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম।

ইহাতেও কি বলিতে হইবে যে, বঙ্কিম বাবু, ব্রাহ্মণপ্রধান ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যত্ন করিয়াছিলেন? তবে বঙ্কিম বাবু সদাশয়-সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রকেই "ব্রাহ্মণ" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। হইতে পারে, মধুসূদন বাবুর এই "ব্রাহ্মণ" কথাটার উপরই যত আক্রোশ। যেমন যোনিবিশেষ "রাম" নাম সহ্য করিতে পারে না, মধুসূদন বাবু সেইরূপ "ব্রাহ্মণ" এই শব্দ শুনিলেই জ্বলিয়া যান। বঙ্কিম বাবু যদি তাহা বুঝিতেন, তাহা হইলে তিনি যে সকল গুণের পরিচায়করূপে ব্রাহ্মণ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা না করিয়া বোধ হয় তদর্থে অন্য শব্দ ব্যবহার করিতেন।

মধুসূদন বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে যেরূপ ভুল বুঝিয়াছেন, ভূদেব বাবু সম্বন্ধেও তাঁহার সেইরূপ ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। সমগ্র হিন্দু সমাজের যে উপায়ে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে, যাহাতে হিন্দুজাতির মধ্যে প্রকৃত জাতীয়তার বিকাশ সাধন হইতে পারে, তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। ভূদেব বাবু যদি গোঁড়া হিন্দুর পক্ষাবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে, তিনি শিল্পবিজ্ঞানাদির উন্নতির জন্য হিন্দু সন্তানকে বিলাত পাঠাইবার

পরামর্শ দিতেন না। তিনিও বঙ্কিম বাবুর ন্যায় ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে "ব্রাহ্মণ" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।* টোলের উন্নতির জন্য ভূদেব বাবু যে প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে, তাহা ব্রাহ্মণ জাতির মঙ্গলার্থে দান করা হইয়াছে বিবেচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে যে নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাহা সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এ দেশে আর্য্যশাস্ত্রের আলোচনা যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই উপধর্ম্মের অন্ধকার বিলীন হইয়া সনাতন ধর্ম্মের আলোকে চতুর্দ্দিক্ উজ্জ্বলিত হইবে। রাজর্ষি রামমোহন এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজে বেদালোচনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রও শেষাবস্থায় আর্য্যশাস্ত্রের আলোচনা ও ব্যাখ্যায় অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণও এক্ষণে ক্রমে ক্রমে এই নীতির অনুসরণ করিতেছেন। বাস্তবিক, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সংস্কারের পদ্ধতি অবলম্বন না করিলে, ইষ্ট সিদ্ধির আশা করা যায় না। এই জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দুশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া সমাজ সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও হিন্দুশাস্ত্র রূপ অসি হস্তে লইয়া ব্রাহ্মণ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই "জাতিগতব্রাহ্মণ্য" স্থাপনের জন্য যত্ন করেন নাই।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

* সামাজিক প্রবন্ধ ৩০২ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালীর অবনতির কারণ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সাবিত্রী-লাইব্রেরীর চতুর্দ্দশ বাৎসরিক অধিবেশনে "বাঙ্গালীর অভাব ও অবস্থা" বিষয়ে যে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা জন্মভূমিতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা সকলের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমি এই বিষয় সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার প্রয়োজন মনে করিতেছি।

আমাদের বর্ত্তমান অভাব ও অবস্থার কারণ, হীরেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নাই। কেবল তাহার আভাস দিয়াছেন মাত্র। আমি সেই কারণ অনুসন্ধান করিব। মানুষের স্বভাব, কোন একটী ঘটনা দেখিলেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করে। অনেকে উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। আমার এ প্রবন্ধ তাঁহাদের কোনরূপ উপকারে আসিতে পারে, এই বিশ্বাসেই ইহার অবতারণা করিলাম।

বাঙ্গালীর অভাব ও অবস্থা কি, সে সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই একটা না একটা ধারণা আছে। হীরেন্দ্রবাবু উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিবেন শুনিয়া আমার কোন বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, এক কথায় সমস্ত প্রবন্ধের মর্ম্ম কি হইবে তাহা বুঝিতে পারি। আমাদের অভাব অনন্ত ও অবস্থা শোচনীয়। হীরেন্দ্রবাবুও আমাদের অবস্থা ও অভাব শ্রেণিবিভাগ করিয়া, আমাদের শারীরিক, সামাজিক, "বণিজিক" আর্থিক, রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক প্রভৃতি অভাব ও অবস্থা একে একে পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের অভাব কি ও অবস্থা কিরূপ, তাহার

পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, আমাদের অভাব মহাজনগণের পথ অনুসরণ করিয়া অন্যরূপে শ্রেণী-বিভাগ করিয়া লইতে পারি। এই অভাব ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক।

এখন আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাউক। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, যাহাকে আপাততঃ কোন ঘটনার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা অনেক সময় প্রকৃত কারণ নহে। সুধু তাহাই নহে, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ অতি গূঢ়। যাহা আপাততঃ কারণ বলিয়া বোধ হয়, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার পরবর্ত্তী অবস্থা বা কার্য্য মাত্র। একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থা অনেক গুলি পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বা অবস্থার ফল মাত্র। তাহার উপর আর একটী নূতন ঘটনা সংযুক্ত হইয়া আমার জ্বর হইল। হয়ত, যদি আমার শারীরিক অবস্থা অন্যরূপ থাকিত, তাহা হইলে এই নূতন ঘটনায় আমার শরীরে জ্বর উৎপাদন করিতে পারিত না। তাহার পর সেই জ্বরই আমার শরীরকে আর একরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া দিল; তাহাতে আমার শরীর এরূপ ভগ্ন হইল যে, শরীর একেবারে ব্যাধিমন্দির হইয়া পড়িল। সুতরাং যে 'জ্বর' এক দিন 'কার্য্য' রূপে অনুমিত হইয়াছিল, তাহাই পরে আবার 'কারণ' রূপে গণ্য হইল।

অতএব কোন বর্ত্তমান ঘটনার ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অনুসন্ধান করিলেই যথেষ্ট হয় না। কারণের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে যতদূর আমরা অগ্রসর হইতে পারি, ততদূর আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে। আমরা শেষে, যত দূর পর্য্যন্ত সম্ভব, মূল কারণ জানিতে পারিব।

এখন কথা হইতেছে,—এরূপ কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি? আর মূল কারণ জানিবারই বা আবশ্যক কি? কোন একটী ঘটনার অতীত কারণ স্থির না করিলে তাহার ভবিষ্যৎ নিয়মিত করা যায় না। যতদূর মূল কারণ জানা যায়—ততদূর সে ঘটনা আমাদের আয়ত্বাধীন হয়। বৈদ্যকে রোগ চিকিৎসা করিতে হইলে সেই রোগের সমস্ত কারণ গুলি অনুসন্ধান করিতে হয়, মূল কারণ কি, তাহাও ঠিক করিতে হয়; পরে একে একে সেই কারণ গুলি উন্মূলিত করিতে হয়। জর্ম্মাণ পণ্ডিত ফিক্টে (Fichte) বলিয়াছেন।—

"যে সমস্ত কারণের সমবায়ে কোন এক বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেগুলি যদি অনুসন্ধান করিতে করিতে যাওয়া যায়, এবং সেই বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত কিরূপে পরিণত হইবে, তাহা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হওয়া যায়—তাহা হইলে সেই বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত ধরিয়া, আমরা সমগ্র অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত অবস্থা জানিতে পারিব। অর্থাৎ বর্ত্তমানের কারণ অনুসন্ধান করিয়া সমগ্র অতীত অবস্থা বুঝিব, আর তাহার ফল পর্য্যালোচনা করিয়া ভবিষ্যৎ জানিব।" *

অতএব যদি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য—আমাদের অভাব দূর করিবার জন্য, চেষ্টা করিতে হয়, যদি কেবল ভগবানের বা দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া আমাদিগকেও কিছু পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তবে আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

* Were I able to trace backwards the causes, throuh which alone any given moment could have come into actual existence, and to follow out the consequences which must necessarily flow from it, I shall then be able at that moment to discover all possible condition—both past and future: past—by interpreting the given moment, future—by foreseeing its results."

এই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে সমাজতত্ত্বের কতকগুলি স্থূল কথা বুঝিতে হয়। মানুষ পরস্পর একত্রিত হইয়াই মনুষ্য সমাজ সংগঠিত করে। কোন বড় ব্যবসায় করিবার জন্য, অথবা একলা যে কাজ হয় না এমন কোন বড় কাজ করিবার জন্য মনুষ্য একত্রিত হয় বটে। কিন্তু তাহাতে মনুষ্য সমাজ সংগঠিত হয় না। মানুষের সমাজবদ্ধ হইবার কতকগুলি বিশেষ কারণ বা বিশেষ নিয়ম আছে। শুধু তাহাই নহে। আজ এ কথা বিজ্ঞান বুঝাইয়া দিয়াছে যে, মানুষের শরীরের ন্যায়,সমাজ শরীরেরও আন্তরিক জৈব-শক্তি আছে। জৈবশক্তি বলে কতকগুলি পরস্পর বিরোধী-শক্তিসম্পন্ন পরমাণু, সে শক্তি গুলিকে সংযত করিয়া, জৈবশক্তি-দ্বারা অভিভূত হইয়া দেহরূপে সম্বদ্ধ হয়। মানুষকেও সমাজ সম্বদ্ধ হইতে হইলে—তাহার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া অন্যের সহিত একত্র হইতে হয়। যে শক্তি বলে সেই স্বার্থ—সেই সমাজ বিরোধী শক্তি সংযত হয়, তাহাই সমাজকে ধারণ করিয়া রাখে। সেই শক্তির বলে জড় জড়ান্তরকে আকর্ষণ করে, জীব অন্য জীবকে আকর্ষণ করে—জীবকে আপনাহারা করিয়া দেয়, মানুষ পরের বা সমাজের উন্নতির জন্য কর্ম্ম করে—কর্ত্তব্য (duty) করে,পরকে ভালবাসে। পরমাণু পরমাণুকে আকর্ষণ করে বলিয়া জড় জগতের বিবর্ত্তন হয়। জীবাণু জীবাণুকে আকর্ষণ করে বলিয়া জীবজগৎ উন্নত হয়। মানুষ মানুষকে আকর্ষণ করে বলিয়া মনুষ্য-সমাজ দৃঢ় সম্বদ্ধ হয়। সেই আকর্ষণ বলে—সেই বন্ধন বশে, মানুষ স্বধর্ম্ম পালন করে, নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে, অপরের উপকারের জন্য, সমাজের রক্ষার জন্য নিজ স্বার্থ উৎসর্গ করে। এই আকর্ষণের মূল ধর্ম্ম।

আদিম অবস্থায় মানুষের জ্ঞানে দুইটী বিষয় প্রতিভাত হয়—আপনি ও জগৎ। তখন মানুষ বাহ্য জগৎ দ্বারা চারিদিক্ হইতে বিপর্য্যস্ত হয়। বাহ্য জড় শক্তির সহিত তাহাকে অবিরত সংগ্রাম করিয়া কোনরূপে জীবন রক্ষা করিতে হয়। সংগ্রাম করিয়া মানুষ ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়ে; শেষে জড় শক্তির আশ্রয় লয়, কখন বা দেবতা ভাবিয়া জড় শক্তিকে পূজা করিয়া তাহাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া কোনরূপে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। এই আত্মরক্ষার জন্য তখন আদিম মনুষ্য পরস্পর সমাজ সম্বদ্ধ হয়। এই সমাজের প্রথম সূচনা। পরে বাহ্য জগতের সহিত সংগ্রাম করিয়া বাহ্য জড় শক্তিকে নিয়মিত করিয়া, সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষ আপনার কথা, অন্য কথা, ভাবিতে অবসর পায়। তখন সে আপনাকে, জগৎকে বড় নিয়মিত,বড় সীমাবদ্ধ দেখিতে পায়। এই সসীমের ধারণা হইতে ক্রমে অসীমের বা ঈশ্বরের ধারণা করিতে সমর্থ হয়। সেই সময়ই তাহার জ্ঞানে ধর্ম্ম-বীজ প্রথম উপ্ত হয়।

তখন মানবের ভাবিবার বিষয় হয় তিনটী—আপনি, জগৎ ও ঈশ্বর। ইহার মধ্যে এক একটী সমাজে এই তিনের কোন একটী ভাবনার প্রাধান্য থাকে। যাহারা স্বার্থ ভাবে, অর্থ কাম ভাবে—তাহাদের মধ্যে কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি হয়। এই স্বার্থ সংঘর্ষে সমাজ বন্ধন শিথিল হইবার উপক্রম হইলে, পরস্পরের স্বার্থ সুনিয়মিত হইবার চেষ্টা হয়। তাহা হইতে রাজনীতির উন্নতি হয়। বাহ্য জগতের আলোচনা হইতে বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। জগতের সৌন্দর্য্য তত্ত্বের ভাবনা হইতে শিল্পের উন্নতি হয়। আর ঈশ্বর ভাবনা হইতে ধর্ম্ম ও তত্ত্ব-বিদ্যার উন্নতি হয়। সুতরাং সমা-

জের মূলসূত্র সমাজ-নিয়ামক মূলভাব পাঁচটী যথা—(১) কৃষি বাণিজ্য, (২) রাজনীতি (৩) শিল্প, (৪) ধর্ম্ম ও (৫) তত্ত্ব বিদ্যা। সাধারণতঃ এইগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী। অর্থাৎ একের প্রাবাল্যে অপরগুলি সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়।*

পূর্ব্বে বলিয়াছি এই পাঁচটী বিষয়ের একটী না একটীকে—কোন এক বিশেষ সমাজ অবলম্বন করিয়া উন্নত হয়।† স্থান কাল ও জাতি বিশেষে এই মূল ভাবের পার্থক্য হয়। যে দেশের প্রকৃতি (আধিভৌতিক অবস্থা) বিশেষ অনুকূল নহে—যেখানে প্রকৃতির শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া মানুষকে উন্নতির পথে যাইতে হয়, সে দেশ বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের উন্নতির কতকটা অনুকূল। যে দেশের অবস্থান হেতু বিভিন্ন জাতির সহিত সর্ব্বদা সংঘর্ষণ সম্ভব, সেখানে রাজনৈতিক উন্নতি হয়। যে দেশের প্রকৃতি মানুষের অনুকূল—যেখানে মানুষকে বড় বেশী জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত থাকিতে হয় না, সে দেশ ধর্ম্ম ও তত্ত্ব বিদ্যার উন্নতির অনুকূল। সেই রূপ কাল ধর্ম্ম অনুসারে এক এক সময়ে এক এক ভাবের আধিক্য হয়। এক সময়ে জগতে ধর্ম্মভাবের আধিক্য ছিল—সত্য যুগ ছিল। তখন যে জাতি ধর্ম্মের উন্নতি করিয়াছিল, তাহারাই বড় হইয়াছিল। এখন বাণিজ্য বিজ্ঞানের দিনে—এই কলিযুগে, যে জাতি বাণিজ্যে বড় হইয়াছে—সেই সকলের উপর আধিপত্য করিতেছে।

যাহা হউক এতদূর পর্য্যন্ত আমরা যে টুকু সমাজ তত্ত্ব বুঝিলাম—তাহা আমাদের পক্ষে বড় আশাপ্রদ নহে। কিন্তু আরও কথা আছে। যদি কোন দেশে কোন কালে কোন সমাজের মূল মন্ত্র থাকে—বাণিজ্য, রাজনীতি বা শিল্প—তবে সে সমাজ স্থায়ী হয় না। মিসর, কার্থেজ, সীডন, টায়র প্রভৃতি কত জাতি বাণিজ্য বলে উন্নত হইয়াছিল। তাহারা এখন কাল গর্ভে বিলীন হইয়াছে। রাজনীতিতে, শিল্পে, প্রাচীন রোম ও আধুনিক ইতালী এক দিন কত বড় হইয়াছিল—রোমরাজ্য, ম্যাসিডন্ রাজ্য এক দিন সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, আজ তাহাদের নামমাত্রাবশেষ হইয়াছে। সুধু তত্ত্ববিদ্যার আলোচনায় গ্রীসও এক দিন বড় হইয়াছিল, তাহা এখন কেবল ইতিহাস-বক্ষে বিচরণ করিতেছে। কেবল যে জাতির একমাত্র ধর্ম্মই অবলম্বন ছিল, তাহারাই কারুকে উপহাস করিয়া কতদিন জীবিত রহিয়াছে। ধর্ম্ম ইহুদীদের অবলম্বনীয় না হইলে তাহারা এত অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়া এতদিন কোথায়

* The five elements in a nation's life are industry, state, art, religion and philosophy. They strive to conquer and absorb each other. Thus industry entirely occupied with utility would reduce to that all the rest. The state continually encroaches upon and attempts to draw all into its sphere. Religion cannot consent to abdicate its empire. Philosophy is peaceful but when the state or religion would reduce it to the condition of a servant it resists. This state of warfare comes from the essential diversity of elements. Cousin's History of philosophy vol I. P. 151.

† Every nation is called into existence to represent an idea: and it progresses towards the accomplishment of this idea. The different nations of the same epoch represent different ideas. The nation which represents the idea must in accordance with the general spirit of the epoch is the nation called to domain. When the idea of a nation has served its time, this nation disappears."

Cousin's. History of Philosoply.
vol I. P. 151.

ভাসিয়া যাইত। আজ নয় শত বৎসর অত্যাচার সহ্য করিয়া এবং দাসত্ব করিয়াও হিন্দু জীবিত রহিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম 'এখনো' আমাদের আশা আছে।

এ কথায় আর এক আপত্তি হইবে। ধর্ম্ম সকল সমাজকে রক্ষা করে নাই। ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ হইয়া একদিন মুসলমানগণ পৃথিবীর অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এখন তাহাদের সে আধিপত্য নাই। ধর্ম্ম অনেক সময় উন্নতির অন্তরায় হইয়াছে। সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে, বিজ্ঞানালোচনার পথে বাধা দিয়াছে, গ্যালিলিও কোপার্নিকাস্ প্রভৃতির উপর অত্যাচার করিয়াছে। ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের বিরোধের কথা conflict between religion and science এর কথা অনেকেই অবগত আছেন। অতএব কেবল ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই যে জাতির উন্নতি হইবে, তাহা কেমন করিয়া বলিতে পারা যায়।

ইহার উত্তর দুইটী। এক, যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম—যাহা সনাতন ধর্ম্ম, কেবল তাহা অবলম্বন করিলেই মানুষের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি হয়, মানুষ সাত্বিক ও দৈব প্রকৃতি সম্পন্ন হয়, এবং তাহা হইতেই জাতীয় উন্নতি হয়। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অবলম্বনে বা স্বার্থপ্রণোদিত তামসিক ধর্ম্ম অবলম্বনে তাহা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের সাধারণ লোক যাহাতে সেই ধর্ম্ম প্রণোদিত হয়—ধর্ম্মভাব যাহাতে সমাজ মধ্যে সজীব ভাবে বর্ত্তমান থাকে, যে সমাজে তাহার সুব্যবস্থা আছে, সেই সমাজই উন্নত হয়। নতুবা যে সমাজে সেরূপ ব্যবস্থা নাই, সেখানে উন্নতির আশা করা বৃথা। এই দুই কথাই আমাদের এ প্রবন্ধে বুঝিতে হইবে।

তাহার পূর্ব্বে আর একটী কথাও বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মের ফল এ জগতে ও পর জগতে মানুষের উন্নতি, তাহারই ফল সমাজের উন্নতি। মানুষ অসীমের দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহার সাধনা অনন্তজীবন ব্যাপী, সুতরাং মানুষের উন্নতির সীমা নাই। সমাজের উন্নতির একটা সীমা আছে। সমাজ একটা আদর্শকে লক্ষ করিয়া অগ্রসর হয়, সেই আদর্শে সমাজ উপনীত হইতে পারে। এবং সে আদর্শে উপনীত হইলে সমাজ আর উন্নত হয় না, সমাজ স্থায়ী হইয়া দৃঢ় সম্বদ্ধ হয়।

এই আদর্শ সমাজ কি? কথাটা বড় গুরুতর। সুতরাং সংক্ষেপে তাহার দুই একটী মূলসূত্র আমরা এখানে আলোচনা করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সমাজের প্রয়োজনীয় বিষয় পাঁচটী। কৃষিবাণিজ্য, শিল্প, রাজনীতি, ধর্ম্মসাধন ও তত্ত্ববিদ্যা। সমাজের লোকের শরীরধারণ ও রক্ষা প্রথম প্রয়োজন, তাহার জন্য কৃষিবাণিজ্যের আবশ্যক। সমাজকে বহিঃ ও অন্তঃ শত্রু হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজনীতি চাই। সমাজ রক্ষক চাই। সমাজের লোকের ধর্ম্ম বৃত্তি স্ফূর্ত্তির জন্য—তাহার রক্ষার জন্য, ধর্ম্ম ও তত্ত্ববিদ্যার আবশ্যক। এক কথায় সুনিয়মিত সমাজে এই সকল গুলিরই সুব্যবস্থা থাকে। ইহার একের আধিক্য হইলে অন্য গুলির ক্ষতি হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাহাতে সেরূপ না হয়, সুসমাজে তাহার ব্যবস্থা থাকে। আমরা দেখাইব যে, যে সমাজ ধর্ম্মভাব প্রণোদিত, সেই খানেই এরূপ সম্ভব হয়। হীরেন্দ্র বাবুও তাঁহার প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে "মানব সমাজের আধ্যাত্মিক অভাবের পূরণে, কোন অভাবের পূরণ অবশিষ্ট থাকে না। সকল অভাব নিঃশেষিত হয়।"

তাহার পর আরও এক কথা আছে। সমাজ কিসের জন্য? মানুষ পরস্পর সম্মিলিত

হইয়া যাহাতে নিজ উদ্দেশ্য পথে যাইতে পারে, কেবল তাহারই জন্য সন্দেহ নাই। মানুষের উদ্দেশ্য—এই জগতে ও পরজগতে উন্নতি, অনন্তের পথে গতি। তাহার জন্য মানুষের প্রয়োজন—ধর্ম্ম সাধন। এখন বুঝা যাইবে যে মানুষের মন যাহাতে অন্যরূপ বিক্ষেপের কারণ হইতে দূরে থাকিতে পারে, যাহাতে সমস্ত মন ধর্ম্মের দিকে, নিজের উন্নতির দিকে নিযুক্ত থাকিতে পারে—সমাজ তাহার পক্ষে অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। যদি মানুষের দেহ রক্ষার জন্য জীবন সংগ্রাম করিতে হয়—প্রতিকূল প্রকৃতির সহিত প্রতিক্ষণ সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিতে হয়—তাহা হইলে ধর্ম্মসাধন হয় না। অতএব সমাজ এরূপে সম্বদ্ধ হওয়া চাই, যাহাতে জীবন সংগ্রাম একেবারে কমিয়া যায়। পণ্ডিতবর কারলাইল তাঁহার কোন প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছেন যে, আমাদের দেহ যখন সুস্থ থাকে, তখন আমাদের যে দেহ আছে, তাহা মনেই হয় না। স্বাস্থ্যের সময় দৈহিক কার্য্য আমাদের অজ্ঞাতসারে এমনি সুনিয়ন্ত্রিত থাকে। কিন্তু যখন আমাদের পীড়া হয়, কেবল তখনই সেই শরীরের দিকে অথবা পীড়িত স্থানে আমাদের মন আকর্ষিত হয়, যতক্ষণ সে স্থান সুস্থ না হয়—ততক্ষণ মনকে আমরা সেস্থান হইতে সরাইয়া লইতে পারি না। আমাদের সমাজ-দেহ সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। যখন সমাজ সুনিয়ন্ত্রিত—সুস্থ থাকে, তখন সমাজের দিকে আমাদের মন আকৃষ্ট হয় না। তাহার কোন স্থান পীড়িত হইলে পরে যতক্ষণ সে স্থান সুস্থ না হয়, ততক্ষণ আমাদের মন সেই ভাবনায় ব্যস্ত থাকে।

একদিন আমাদের সমাজ সেইরূপ সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। সমাজের জন্য আমাদের ভাবিতে হইত না। সমাজে আমরা নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিয়া সমস্ত মনটাকে ধর্ম্মের দিকে নিয়োজিত করিতে পারিতাম। এখন সমাজে রোগ প্রবেশ করিয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজ সুস্থ সুনিয়মিত সমাজ নহে। নিহিলিজম্, সোসালিজম্ ট্রেড্ ষ্ট্রাইক্, trade strike ভঙ্গ, প্রভৃতিই তাহার সাক্ষী। সেখানে সমাজের ব্যাধি এত অধিক যে, সকলের মনই সেই দিকে এখন আকৃষ্ট। সেই অস্বাস্থ্যকর পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে আমাদের সমাজ কতকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াই সমাজ মধ্যে ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। যাউক, সে অপ্রাসঙ্গিক কথায় এস্থলে কাজ নাই।

বলিয়াছি যে, যে সমাজের মূল—প্রকৃত ধর্ম্ম, সেই সমাজই সর্ব্বদিকে সুগঠিত হয়, সুনিয়ন্ত্রিত হয়। এখন এ ধর্ম্ম কি তাহার কথা বলিব। এস্থলে তত্ত্ববিদ্যা বা ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিব না। এখানে কেবল আমাদের এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম্মের মূল-সূত্র সংযম, নিবৃত্তি। বাসনা-বীজই সংসারের মূল। এই বাসনা বীজই আমাদের মানুষ করিয়াছে, আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয় দিয়াছে, আমাদের কর্ম্ম প্রবৃত্তি দিয়াছে। আমাদিগকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের এই মূলতত্ত্ব জর্ম্মাণ পণ্ডিত সপেনহর বড় বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন।*

*Man emerges on the scene as a being charged with individual appetites and desires, concerned with nothing but his own interests, blind to everything, but securing means of gratification, wholly controlled by the lust of life, and exulting in the natural pride of existence. When his consciousness awakes, he finds himself lodged in the fabric of the body, identified with its lusts ann appetites—his intellect entirely in bondage to his passions, and without a thought beyond. * * * He affirms that lust of life, which he finds himself practically enacting, is the law of his being. Another step, and his selfishness, which makes it his only duty to be happy,

এই বাসনা বীজ নষ্ট হইলেই আমাদের মুক্তি হয়। এই জন্য স্বার্থ ও আত্ম ত্যাগ আমাদের মূল ধর্ম্ম।

ধর্ম্মবলে এই স্বার্থ ইচ্ছা, এই বাসনাজ প্রবৃত্তির দমন হয়; আমাদের অধঃস্রোতস্বিনী বৃত্তি সকল নিয়মিত হইয়া উর্দ্ধস্রোত হয়। এই প্রবৃত্তি দমন বা denial of the will হইতে আমাদের নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্ম পালনে মতি হয়—প্রীতি দয়া প্রভৃতি সৎবৃত্তি বা ধর্ম্মবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়, এবং পরিণামে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মের চরম সাধনার যোগ্য হওয়া যায়। এখন কথা হইতেছে, মানুষের স্বাভাবিক স্বার্থ-প্রবৃত্তি তাহার অহঙ্কারের পরিবর্ত্তে নিবৃত্তিধর্ম্ম কোথা হইতে আসে?

*পূর্ব্বে বলিয়াছি, আদিম অসভ্যাবস্থায় মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম্মবৃত্তির প্রথম স্ফূর্ত্তি হয়। তখন জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয় না। ক্রমে এই ইচ্ছা ও কর্ম্মবৃত্তির সহিত আমাদের চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়। সর্ব্বশেষে—মানুষ কতকটা উন্নত হইলে, তবে তাহার জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়। জ্ঞানে একদিকে সসীম জগৎ বা সংসারকে ও অপর দিকে সসীম আপনাকে প্রতিভাত হয়। শেষে সেই সসীমের মধ্য দিয়া অসীমকে দেখিতে পায়। পরিণামে আপনাকে ও সমস্ত সংসারকে সেই অনন্তের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়। তখন এক ব্রহ্ম ছাড়া সংসারে বা আপনাতে আর কিছু দেখিতে পায় না। ভিতরে বাহিরে কেবল সেই অনন্ত অসীমকে উপলব্ধি করে। তখন সে বুঝে—এ সংসার অসৎ—ব্রহ্মই সৎ। সংসার ও জীব তাঁহারই বিকাশ। জীবাত্মা এক—কিন্তু সংসারে মায়াবশে বহুরূপে প্রতিভাত। মানুষ (জীব) বহু হইয়াছে—পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া এক হইবে বলিয়া—তাহার ও জীবের আত্মার ভিতর দিয়া এক পরমাত্মার ভাব উপলব্ধি করিবে বলিয়া। * এইরূপ ধারণা হইলে পরে আমরা,

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানম্ সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
সমং পশ্যান্নাত্মযাজী স্বরাজ্যমধিগচ্ছতি।

এইরূপে সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করিয়া, অহঙ্কার বিনষ্ট করিয়া, সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া, ধর্ম্মের চরম ফল মোক্ষ লাভ করিবার উপযুক্ত হওয়া যায়। অতএব জ্ঞানবৃত্তির এইরূপ স্ফূর্ত্তি হইলে, আমাদের কর্ম্মবৃত্তি—প্রবৃত্তির মূল ছিন্ন করিয়া, নিষ্কামভাবে আসক্তি শূন্য হইয়া পরিচালিত হয়—আমাদের চিত্তবৃত্তি সংযত হইয়া ভক্তিমার্গে তাহা ঈশ্বরাভিমুখী হয়।

সে যাহা হউক, সমাজের মধ্যে সকল লোকেরই জ্ঞানের এরূপ বিকাশ ও পরিণতির সম্ভাবনা নাই। সমাজে সকল শ্রেণীর লোক থাকে। সুতরাং সমাজকে এরূপে সংগঠিত করিতে হয় যে, সকল শ্রেণীর

carries out its principles by reducing the whole world into a mere material and vehicle for his pleasures. * * Thus the selfish creed of the natural quest for happiness issues in the career of wrong—in a world of wrongdoing. The discomforts thus arising, call forth the machinery of public law, the state and its ministries of so called justice. * * But political and penal agencies would not exert even the slightest influence they do, were they not re-inforced by other and more purely moral stimuling.—Wallace's *Life of Schopenhauer*, p. 132.

* The universe is not what it seems. It is something higher which lies beyond mere appearence. It is the Divine Life manifested in Existence—as the World, as Human Life. The life of man is essentially one and indivisible. It is divided into the life of many proximate individuals, in order that it may form itself to unity, and that all the separate individuals, who compose it may through life itself blend themselves, together into oneness of mind. The progressive culture of the human race is the object of the Divine idea, and of those in whom the Idea dwells.—Fichte, *On Nature of the Scholar*.

লোকই, প্রবৃত্তি নিয়মিত করিয়া, স্বার্থ সংযত করিয়া, ধর্ম্মের দিকে—অনন্ত উন্নতির দিকে যাহার যতদূর সম্ভব অগ্রসর হইতে পারে। সকল মানুষেরই একটা না একটা অবলম্বন প্রয়োজন—বিষয়াকর্ষণে অস্থির মনের একটা আশ্রয় চাই। ধর্ম্ম বা পরহিতব্রত অবলম্বন না করিলে মন আপনাকে ও বিষয়কে অবলম্বন করে—মনঃ স্বার্থ চালিত হয়—অথবা নিরাশ্রয় হইয়া আত্মঘাতী হয়। তাপ উৎপন্ন হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত না হইলে, তাহা আপনার আধারকেই ভস্মীভূত করে, এবং তাহার সংস্পর্শে অন্যকেও নষ্ট করে, ইহা বিজ্ঞানের স্থিরসিদ্ধান্ত।

এখন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কথা বলা আবশ্যক। তাহা হইলে সমাজে বর্ণবিভাগের কথা বলিতে হয়। কেননা, হিন্দুর বর্ণ ও কর্ম্ম বিভাগতত্ত্ব না বুঝিলে সমাজতত্ত্ব সম্পূর্ণ বুঝা যায় না—সমাজ-বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে। এবং সেইজন্য বোধ হয় একথা সাহস করিয়া বলা যায় যে, ইউরোপে সকল বিজ্ঞানের উন্নতি হইলেও সমাজ বিজ্ঞান এখনও বড় অসম্পূর্ণ আছে। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে,

"তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণ কর্ম্ম বিভাগয়োঃ।
গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি সত্বান সজ্জতে॥"

সকল সমাজেই চারি শ্রেণীর লোক থাকে। কর্ম্ম ও গুণের বিভাগ হইতে এই বর্ণবিভাগ হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন।

চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।

অন্যত্র বলিয়াছেন,

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মানি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈ গুণৈঃ॥

অতএব এই বর্ণবিভাগ বুঝিতে হইলে গুণ ও কর্ম্মবিভাগের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। প্রথম কর্ম্মবিভাগের কথা বলিব। বঙ্কিম বাবুর কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম,—

"জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম। এজন্য জ্ঞানার্জ্জন যাহাদিগের স্বধর্ম্ম তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। জগতে অন্তর্বিষয় আছে, বহির্বিষয় আছে। অন্তর্বিষয় কর্ম্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। বহির্বিষয়ই কর্ম্মের বিষয়। মনুষ্যের কর্ম্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। কর্ম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধর্ম্মী; যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্যধর্ম্মী। এবং যাহারা রক্ষা করে তাহারা যুদ্ধধর্ম্মী।...... যখন জ্ঞানধর্ম্মী, যুদ্ধ ধর্ম্মী, বাণিজ্য বা কৃষিধর্ম্মীর কর্ম্মের এত বাহুল্য হয় যে, তদ্ধর্ম্মীগণ আপনাদের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক তাহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জ্জন বা লোকশিক্ষা (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা (৩) শিল্প বা বাণিজ্য (৪) উৎপাদন বা কৃষি (৫) পরিচর্য্যা—এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম। এই কর্ম্মানুসারে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণ বিভাগ হইয়াছে। গীতায় আছে,

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞান মাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং॥
শৌর্য্যং তেজোধৃতি দ্যাষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং।
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্র কর্ম্ম স্বভাবজং॥
কৃষি গোরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং॥

আরও এক কথা। এই কর্ম্ম বিভাগ প্রকৃতিজ গুণ বা লোকের স্বভাব অনুসারে হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কতকগুলি লোক

স্বভাবতঃ স্বার্থ পরিচালিত। কতকগুলি লোক সে স্বার্থ প্রবৃত্তি দমন করিয়া আত্মত্যাগ করিয়া থাকেন। আর কতকগুলি লোক জড়-ভাবাপন্ন—নিদ্রা আলস্যাদির বশীভূত। প্রকৃতিজ সত্ব রজঃ ও তমঃ গুণানুসারে আমাদের স্বভাবের এই প্রভেদ হয়। যাহারা সাত্বিক প্রকৃতির লোক, তাহারা আত্মত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম চর্চ্চা করেন—তাঁহারা ব্রাহ্মণ। যাহারা সাত্বিক-রাজসিক প্রকৃতির লোক, তাহারা সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ করিতে না পারিলেও লোক সংগ্রহের জন্য সমাজ রক্ষার জন্য কর্ম্ম করেন, তাহারা ক্ষত্রিয়। যাহার স্বার্থ চালিত, রজঃ ও তমঃ গুণের বশীভূত, তাহারা বৈশ্য; আর যাহারা তামসিক প্রকৃতির লোক, স্বাভাবিক জড়তা বশে কোন কর্ম্ম স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিতে পারে না—যাহারা কেবল পাশব প্রকৃতির বশে চালিত হয়, তাহারা শূদ্র। সকল সমাজেই এইরূপ বর্ণ-বিভাগ অল্পাধিক পরিমাণে আছে। কিন্তু স্বভাব মানুষ পিতামাতার নিকট শরীরের সহিত কতক পরিমাণে লাভ করে বলিয়া হিন্দু সমাজে বর্ণ বিভাগ পুরুষ পরম্পরাগত ও সুনিয়মিত।

এখন বুঝা যাইবে যে এই বর্ণ ও কর্ম্ম বিভাগের ভিতর সমাজের উন্নতি ও ধ্বংশের বীজ রহিয়াছে। রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোক সাধারণতঃ স্বার্থ চালিত। তাহার ফল আত্মসুখ লাভ চেষ্টা। নিজের মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা। আপনার অর্থ কাম লাভের চেষ্টা। এই চেষ্টা এই প্রবৃত্তি নিয়মিত না হইলেই সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। মনে কর একজন কামারের ব্যবসা করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। তখন অন্য একজন নিজের ছুতারের ব্যবসা ছাড়িয়া হয়তঃ কামারের এমন লাভজনক ব্যবসা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি হইবে। হয়তঃ একজন ক্ষত্রিয় রক্ষ আধিপত্য করিতেছে দেখিয়া অন্য বর্ণের কোন লোকের সে আধিপত্য লাভে চেষ্টা হইবে। এই একরূপ সমাজ ধ্বংশের বীজ আছে। ইহাতে সমাজের উক্ত কয়রূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্মের মধ্যে কোন একটী কর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। হয়ত বাণিজ্যের অত্যধিক সম্প্রসারণ হইল, তাহাতে অন্য কর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ক্রমে সে জাতির মূলমন্ত্র হইল বাণিজ্য। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, এইরূপ করিয়া কোন এক বিশেষ সমাজে কৃষি কি বাণিজ্য, রাজনীতি বা শিল্প কি তত্ত্ব-বিদ্যা—ইহার কোন একটী মূলসূত্র হইয়া পড়ে। তাহার ফলে অবশেষে সে জাতির উচ্ছেদ হয়। সুনিয়ন্ত্রিত সমাজে এ সকলগুলি নিয়মিত করিতে হয় তাহা বলিয়াছি। সেইরূপ যাহাতে একজন আর এক জনের কর্ম্ম করিতে না যায়, বা না পারে তাহাও দেখিতে হয়। আমাদের দেশে জাতি বিভাগ পুরুষ পরম্পরাগত হইয়া—কতকটা সেইরূপ হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে (trade guild) প্রভৃতি ব্যবসায়ীর সমাজ সৃষ্টি হইয়া কতকটা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা হইতেছে।

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি ধর্ম্ম ও স্বার্থ ত্যাগ শিক্ষা ব্যতীত সম্ভব হয় না। অর্থাৎ "স্বধর্ম্ম পালন" নিষ্কাম ভাবে নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ত্তব্য জ্ঞানে যাহাতে লোকে করিতে পারে, সে শিক্ষা দিতে হইবে। লোককে শিখাইতে হইবে যে, স্বধর্ম্ম পালন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নহে, স্বার্থত্যাগ শিক্ষার জন্য, সন্ন্যাস ভাব লাভ করিবার জন্য। ভগবান মনু বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণং।
বৈশ্যস্যতু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনং।"

অতএব স্বধর্ম্ম তপস্যা স্বরূপে পালন করিতে হইবে। এই স্বধর্ম্ম পালন হইতেই আত্মত্যাগ শিক্ষা হয়। ধর্ম্মের প্রধান সোপানে আরোহণ করা যায়। এইস্বধর্ম্ম পালন দ্বারা ঈশ্বর আরাধনা করিতে হয়। নিজের কি লাভ হইবে, না হইবে, তাহা গণনা করিতে হয় না। গীতায় শ্রীভগবান্ সেই জন্য বলিয়াছেন :—

"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব॥"

এই জন্যই শ্রীভগবান্ গীতায় অন্যত্র বলিয়াছেন,--

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

অতএব দেখা গেল যে, যে সমাজ সুনিয়ন্ত্রিত, যে সমাজ আদর্শ সমাজে পরিণত হইয়া স্থায়ী হইয়াছে, সে সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই রূপ বর্ণবিভাগ থাকে, এবং সকল বর্ণের লোকই ধর্ম্ম-প্রণোদিত হইয়া নিজের বর্ণধর্ম্ম পালন করে। বর্ণধর্ম্ম কর্ত্তব্য ভাবিয়া পালন করিলে, তাহাতে মন আকৃষ্ট হয় না—সেখানে লাভালাভ গণনা করিতে হয় না। বর্ণধর্ম্ম পালন, নিত্য বা স্বাভাবিক কর্ম্মের মত হইয়া যায় বলিয়া, তাহা আমাদের প্রবৃত্তি বা অনুরাগ আকর্ষণ করে না। মন সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে; একাগ্র হইয়া ধর্ম্মের পথে যাইতে পারে। সুতরাং সে সমাজে লোকের মধ্যে পরস্পরের স্বার্থে সংঘর্ষণ থাকে না, সমাজের কোথাও ব্যাধি থাকে না। যে সমাজে এইরূপ বর্ণবিভাগ না থাকে, অর্থাৎ এই চারি প্রকার প্রকৃতি-সম্পন্ন লোক উপযুক্ত পরিমাণে না থাকে, সে সমাজের ধর্ম্ম-বন্ধন ঠিক থাকে না। সে সমাজে স্বার্থ-সংঘর্ষণ থাকে ও পরিণামে সে সমাজ ধ্বংস হয়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, কেবল শূদ্র বা কেবল বৈশ্যপ্রকৃতির লোক লইয়া যে জাতি সংগঠিত ছিল, সে জাতি অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। অথবা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র; ইহার কোন এক বা ততোধিক প্রকৃতির লোকের সমবায়ে যে জাতি বা যে সমাজ সংগঠিত হয়, তাহাও স্থায়ী হয় না। কেন না; সে সমাজ অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন। ধর্ম্ম সে সমাজের মূলসূত্র হইতে পারে না।

অতএব বুঝিলাম যে, যে সমাজের মূলসূত্র এই ধর্ম্ম, সেই সমাজই স্থায়ী হয়। তাহাকে সহজে কেহ ধ্বংস করিতে পারে না। এখন কথা হইতেছে, স্বার্থ-চালিত সাধারণ লোক কিরূপে এইপ্রকার ধর্ম্ম প্রণোদিত হইবে? এখন সেই কথাই আমাদের আলোচ্য হইতেছে।

পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে এক রূপ বুঝা যায় যে, যে সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য থাকে, যে সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নিজ স্বধর্ম্ম পালন করে, সেই সমাজই ধর্ম্ম-প্রধান হয়। ব্রাহ্মণ—নিজ ধর্ম্মভাব সাধারণে সংক্রামিত করেন। ক্ষত্রিয়—নিষ্কামভাবে ধর্ম্ম পালন করিয়া, সাধারণকে রক্ষা করিয়া, সাধারণের আদর্শ হইয়া, তাহাদিগকে নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিতে শিখান। ব্রাহ্মণ জ্ঞান ও ভক্তির উৎস স্বরূপ। তাঁহারা নিজে ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিয়া সমাজের ধর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি করেন। ক্ষত্রিয় নিজ কর্ম্ম দ্বারা সেই শক্তি সমাজে বিস্তার করেন। অর্থশাস্ত্রে যেমন সমাজের জন্য অর্থের ও ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন (Production) বা সংযোজন ও সংগ্রহ (Distribution) ও রক্ষার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ সমাজের জন্যও ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি বিস্তার ও রক্ষার প্রয়োজন হয়। সমাজের জন্য অর্থ কাম ও ধর্ম্ম এ ত্রিবর্গই সাধারণতঃ প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

উপরের কথা হইতে একরূপ বুঝা যায় যে, সকল দেশে ও সকল কালে সুনিয়ন্ত্রিত উন্নত ও স্থায়ী সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা সেই প্রকৃতির লোকই সমাজের মেরুদণ্ড। যে সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রকৃতির লোক না থাকে, সে সমাজের উন্নতি হয় না। যাঁহারা ইউরোপের ইতিহাস জানেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, সে দিনের অসভ্য বর্ব্বর ইউরোপে মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রভাবে পুরোহিত সম্প্রদায় বা কতকপরিমাণে ব্রাহ্মণ প্রকৃতির লোকের ও সেই সঙ্গে ক্ষত্রিয় প্রকৃতির লোকের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে, ইউরোপ অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়াও এখন এত বড় হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মপ্রণোদিত পিউরিট্যান সম্প্রদায়ের লোকের ধর্ম্মবীজবলে আজ আমেরিকা এত বড় হইয়াছে। ইউরোপের উন্নতির ইতিহাস এই ধর্ম্মের ইতিহাস, তাহা ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞ বুসেঁ বুঝাইয়া দিয়াছেন। দার্শনিক-প্রধান ফরাসী পণ্ডিত, কুঁজে বুঝাইয়াছেন, ধর্ম্মই সকল সভ্যতার মূল। তিনি বলেন,—

Religion is the foundation of every civilization. * * In every epoch of the world, the religion is the foundation of the epoch. It is religion which makes the general faith of the epoch, and for this reason its manners, and its institutions. Religion is the cradle of philosophy." (Cousin's History of philosophy.)

সুতরাং ধর্ম্মই সমাজের ধারণ ও রক্ষণ শক্তি। বিজ্ঞানের কথায় সমাজই ধর্ম্মের higher potential energy—উচ্চতর সত্ত্বশক্তি। ব্রাহ্মণই সেই শক্তির আধার। ক্ষত্রিয়ই সেই ধর্ম্মের kinetic energy—বা কার্য্যশক্তি—শুদ্ধ সাত্বিক রজঃশক্তি।

তামসিক প্রকৃতির লোকে সে ধর্ম্ম শক্তির কার্য্যকারিতা বড় থাকে না—সেখানে এই ধর্ম্মশক্তি Dissipated হয়। যে ধর্ম্ম যে পরিমাণে স্বার্থ দমন ও বাসনা নষ্ট করিয়া মানুষকে নিবৃত্তির পথে লইয়া যাইতে পারে, সেই ধর্ম্মই সেই পরিমাণে সমাজ ধারণ ও রক্ষা করিবার উপযোগী হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির লোক কাহাকে বলে, তাঁহাদের কার্য্য কি, তাঁহারা কিরূপে সমাজের ধর্ম্ম বৃদ্ধি ও রক্ষা করেন, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কথায় বুঝাইব। জর্ম্মাণ পণ্ডিত ফিক্তের (Fichte) কথায় তাহা প্রথম বুঝাইতেছি। ফিক্তে বলিয়াছেন ঃ—

"প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য যাহার জীবনে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার জীবনই আদর্শ ধর্ম্মজীবন। এ সংসারের আমূল সংস্কার ও পরিবর্ত্তন তাহার ফল। দুই রূপে তাহা সিদ্ধ হয়। এক বাহ্যিক দৃষ্টান্ত ও ফল দ্বারা; দ্বিতীয়, কেবল জ্ঞান দ্বারা। যাঁহারা নিজ শক্তিতে আপনার জ্ঞানবলে, লোক সংগ্রহের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যেক যুগের ধর্ম্ম পালনে একতান করিয়া মিলাইয়া নিয়মিত করেন, তাহাদের সামাজিক সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেন, তাঁহারাই এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। যাঁহারা রাজা বা রাজমন্ত্রীর ন্যায় উচ্চপদস্থ. এবং যাঁহাদের লোকহিতার্থ উক্তরূপ কার্য্য স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার, স্থির করিবার বা নিয়মিত করিবার অধিকার ও ক্ষমতা আছে, ও সেই কার্য্য যাঁহারা অবলম্বন করেন, তাঁহারাই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।"

"জ্ঞানী পণ্ডিতগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। যাহাতে লোকসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং যাহাতে তাহা সাধারণে আরও পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করিতে পারে, সেই কার্য্যই তাহাদের অবলম্বনীয়। প্রথম শ্রেণীর সহিত সাধারণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। তাঁহারাই ঈশ্বর ও সংসারের প্রত্যক্ষ সংযোগস্থল। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক, আচার্য্য ও শাস্ত্রবেত্তারূপে,

ঈশ্বরজ্ঞানের নির্ম্মল আধ্যাত্মিকতা এই প্রথম শ্রেণীর কার্য্য দ্বারা কিরূপে সমাজে শক্তিসম্পন্ন হয় ও নিয়মিত হয়, তাহাই মধ্যবর্ত্তী হইয়া স্থির করেন; তাঁহারাই প্রথম শ্রেণীর লোকের শিক্ষক।" *

ফরাসি দার্শনিক কুজেঁও কতকটা এইরূপ কথা বলিয়াছেন। † ফরাসি-পণ্ডিত কম্‌টীও এই তত্ত্ব বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা আজকাল অনেকে নিজের ধর্ম্মশাস্ত্রের বাক্যে আস্থাবান্ নহি, এজন্য পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের কথায় এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি। নতুবা গীতায় শ্রীভগবান্ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইত। তাহা এই—

> "লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥
> যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ তত্তদেবেতরো জনাঃ।
> স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে ॥

এই লোকসংগ্রহ কার্য্য ক্ষত্রিয়ের। ব্রাহ্মণ তাহার নেতা।

এখন আমরা বাঙ্গালী জাতির অবনতির কারণ বুঝিতে পারিব। বাঙ্গালীর ধর্ম্মহীনতা, তাহার এ আধ্যাত্মিক দুরবস্থা, তাহার অবনতির প্রথম কারণ। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অবনতি ও অভাব, তাহার দ্বিতীয় কারণ। এই আধ্যাত্মিক অভাব হইতে বাঙ্গালার স্বার্থসংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। দেশের জল বায়ুর বিশেষ অবস্থা, সেই অবস্থার জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যাধির বিকাশ এবং রাজনৈতিক অবস্থা—ইহাদের সমবায়ে আমাদের আর্থিক, বণিজিক, দৈহিক, বৌদ্ধিক প্রভৃতি অনেকগুলি দুরবস্থা ঘটিয়াছে, হীরেন্দ্রবাবু তাহা দেখাইয়াছেন। এ সকল গুলিরই মূল কারণ আমাদের আধ্যাত্মিক অভাব।

এই আধ্যাত্মিক দুরাবস্থার বীজ বাঙ্গালায় কত শতাব্দী পূর্ব্বে উপ্ত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বাঙ্গালায় পূর্ব্বে অনার্য্যের বসতি ছিল। মধ্যে বাঙ্গালার একবার উন্নতি হইয়াছিল। বোধ হয়, তাহারও মূলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সে উন্নতি প্রধানতঃ বাণিজ্যমূলক। তখন—সে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার কথা—বাঙ্গালার বাণিজ্য রোম প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। বোধহয় তখন বাঙ্গালার আর্থিক, বণিজিক ও বৈষয়িক উন্নতির অভাব ছিল না। কিন্তু

---

* The Life of him in whom learned culture has fulfilled its ends—is itself the life of the Divine Idea in the world, changing and reconstructing it from the very foundation. It may manifest itself in two forms—either in actual external Being and action, or only in Idea. The first class comprehends all those who by their own strength and according to their own Idea, assume the guidance of human affairs, leading them on to ever new perfection in constant harmony with each succeeding age, who direct their social relations. They are not only those who stand in the higher places of the earth as kings, councellors of kings, but who possess the right and calling...... to think, judge, and resolve independently the original disposal of their affairs. The second class embraces the scholars, whose vocation it is to maintain among men the knowledge of the Divine Idea, to elevate it unceasingly to greater clearness and precision. The first class act directly upon the world—they are the immediate point of contact between God and reality: the last are the mediators (as Teachers and authors) between the pure spirituality: of thought in the God-head, and the material energy and influence, which that thought acquires through the instrumentality of the first class—they are the trainers of the first class.

Fichte—On the Nature of the Scholar.

† The two greatest things in the world are action and thought. The greatest modes of serving humanity are to cause it to advance a step in the road of truth, by elevating the ideas of an age to their highest expression, by carrying them to their utmost metaphysical limits; or by impressing these ideas......upon the face of the world.

Cousin's, History of Philosophy P. 178.

ধর্মের ভিত্তিতে সে উন্নতি বিশিষ্টরূপে স্থাপিত না থাকায়, পূর্ব্বেকার অন্যান্য বাণিজ্য-প্রধান দেশের ন্যায়, বাঙ্গালার সে উন্নতি বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এই ধর্ম্মহীনতা বা আধ্যাত্মিকতার অভাবের প্রধান কারণ, বাঙ্গালায় পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ছিল না। আর্য্যগণ বাঙ্গালায় আসিতে চাহিতেন না। বাঙ্গালায় আসিলে তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতার অবনতি হইবে, ইহা তাঁহারা বুঝিতেন। সেই জন্য যদি কেহ বিশেষ কারণে বাঙ্গালায় আসিতেন,তবে তাঁহার"পুনঃ সংস্কার"প্রয়োজন হইত। তখন বালাঙ্গায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বাস করিতেন না। ঘটনাচক্রে দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণ বা দুই দশ ঘর ক্ষত্রিয় দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজা আদিশূর যজ্ঞকালে তাহাদের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণত্ব খুঁজিয়া পান নাই। তখন বাঙ্গালা ক্ষত্রিয়-হীন "পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ" ছিল।

রাজা আদিশূর বাঙ্গালী ছিলেন না। শুনিয়াছি, তিনি দাক্ষিণাত্যের ক্ষত্রিয় ছিলেন। পরে বাঙ্গালার রাজা হইয়া, সেনবংশ স্থাপন করেন। তিনি প্রথমে পশ্চিম হইতে সুব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন। সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে কায়স্থও আসিয়াছিল। কায়স্থকে কেহ ক্ষত্রিয় বলিতে চাহেন না—বলিবার প্রয়োজনও নাই। কেন না, এখন কায়স্থে ক্ষত্রিয়োচিত গুণ নাই। পূর্ব্বে তাহা ছিল কি না, জানি না। কিন্তু বাঙ্গালায় পূর্ব্বে কায়স্থও সমাজের মেরুদণ্ড হইতে পারিয়াছিল—বাঙ্গালায় কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের স্থান অধিকার করিয়াছিল—ইহা স্থির। সে যাহা হউক,এই সকল আনীত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের স্বধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য,বাঙ্গালার সংস্পর্শে তাহাদের অবনতি নিবারণ করিবার জন্য পরে বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আজ তাঁহারই সেই কৌলিন্য প্রথাফলে বাঙ্গালায় প্রায় দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ ও দশ লক্ষ কায়স্থের আবাস হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়,সে কৌলিন্য প্রথা অক্ষুণ্ণ নাই। বাঙ্গালায় এখন ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিশেষ অবনতি হইয়াছে। সেই অবনতি বাঙ্গালীর আধুনিক অবনতির কারণ।

বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ কায়স্থের এ অবনতি কেন হইল। বোধ হয়, বাঙ্গালার আদিম অনার্য্য জাতির সহিত, অথবা অনার্য্য ধর্ম্মাক্রান্ত পূর্ব্বেকার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণাদির সহিত, আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণাদির বিবাহ—এই অবনতির এক কারণ। প্রথমে বোধ হয় এইরূপ অসম বিবাহ হেতু তাহাদিগের অবনতি হইতে আরম্ভ হইতেছে দেখিয়া, তাহা নিবারণ জন্যই বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা বিধিবদ্ধ করেন। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে, অসবর্ণ বিবাহে বিভিন্নরূপ রক্তের সংমিশ্রণেই জাতীয় উন্নতি হয়। এ কথা আর্য্যপণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহারা অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের বিরোধী ছিলেন। বিলাতে ব্রিডিং যে নিয়মের উপর স্থাপিত, যাহা হইতে অশ্ব,গো, কুক্কুর,পারাবত প্রভৃতি জাতির ক্রমোন্নতি হইয়াছে—সেই নিয়মই আর্য্য পণ্ডিতদিগের বিশ্বাসের যথার্থতা প্রমাণ করিবে। আমাদের শাস্ত্র মতে অসবর্ণ বিবাহ বা সঙ্কর বর্ণের সৃষ্টিই জাতীয় অধঃপতনের একটী প্রধান কারণ। গীতায় অর্জ্জুন বলিয়াছেন :—

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্যচ।

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—

সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।

বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের অবনতির আরও এক কারণ আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি

যে, আগে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ছিল না। বাঙ্গালার অনার্য্যের বসতিছিল। হিন্দুর অধিকারে তাহারা শূদ্র হইয়া হিন্দুদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এইজন্য দেখিতে পাই, বাঙ্গালায় কৃষিকর্ম্ম বা বাণিজ্য, সমস্তই শূদ্রের কর্ম্ম হইয়াছিল। শূদ্রের প্রকৃতি—তামসিক, কার্য্য—দাসত্ব। কালক্রমে বাঙ্গালায় শূদ্র, কৃষি বাণিজ্য দ্বারা বৈশ্যপ্রকৃতি লাভ করিয়াছিল। তখন বাঙ্গালার একরূপ বৈষয়িক উন্নতিও হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগতের অপরিহার্য্য নিয়মবলে সে উন্নতি কালগর্ভে বিলীন হইয়াছিল। বাঙ্গালীরা পুনর্ব্বার শূদ্র-প্রকৃতি হইয়া, প্রথমে বিদেশীয় হিন্দু রাজার, পরে বৌদ্ধরাজার—সেন বা পালবংশীয় রাজার, ও শেষে মুসলমান রাজার অধীনে ছিল। মধ্যে ব্রাহ্মণের ও কায়স্থের শুভাগমনে বাঙ্গালার অদৃষ্টও ফিরিয়াছিল। তখন বৈদেশিক রাজনীতির অধীন থাকিয়াও ধর্ম্মশক্তিতে বাঙ্গালী জীবিত ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব ও তৎপ্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম—সেই শক্তির শেষ অভিব্যক্তি। সে শক্তিও ক্রমে লোপ পাইয়াছে। কেননা বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ কায়স্থের অবনতি হইয়াছে। এখন তামসিক শূদ্রপ্রকৃতি বাঙ্গালাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সাত্বিক ও শুদ্ধ রাজসিক (দৈব) প্রকৃতির স্থানে তামসিক বা আসুরিক প্রকৃতি তাহাদিগকে অভিভূত করিয়াছে। এই তামসিক প্রকৃতির ফল শূদ্রত্ব—দাসত্ব। "পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্মং শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং।" সেইজন্য বাঙ্গালায় এখন ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলেই শূদ্র। যে দুই দশ ঘর ছত্রী বা দুই দশ ঘর পশ্চিম দেশীয় বণিক্ বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে বাঙ্গালায় বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা ধর্ত্তব্যই নহে। একে ত বাঙ্গালায় পূর্ব্বেই শূদ্রসংখ্যা বাড়িয়াছিল। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, "প্রাচীন কাল অপেক্ষায় একালে শূদ্রজাতির সংখ্যা বিশেষ প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।...অনার্য্য জাতি সকল হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু শূদ্র-জাতি বিশেষে পরিণত হইয়াছে।... এইরূপে কালক্রমে শূদ্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বর্ণসঙ্কর শূদ্র বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।" এখন বাঙ্গালায় কায়স্থগণও শূদ্র মধ্যে পরিগণিত। বাঙ্গালায় এক্ষণে শূদ্রগণকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। যথা (১) সৎশূদ্র, (২) নবশাক, (৩) আচরণীয় শূদ্র (৪) অনাচরণীয় শূদ্র ও (৫) অস্পৃশ্য শূদ্র। সুধু তাহাই নহে, এই শূদ্র-প্রকৃতির প্রাবল্যে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণও অনেকটা শূদ্র-প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়াছে। অন্ততঃ তাঁহাদের সকলের সাত্বিকপ্রকৃতি আরনাই। কাজেই এখন দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা সকলেই শূদ্র, সকলেই দাস। আমরা সকলেই অনুকরণপ্রিয়। আমরা নিজে ভাবিয়া কায করিতে পারি না। স্বার্থত্যাগের ত কথাই নাই। আমাদের স্বাবলম্বন আদৌ নাই। আজ বিদেশীয় পণ্ডিত আমাদের যেরূপ বুঝাইবেন, আমরা তাহাই বুঝিব। তাঁহারাই এখন আমাদের ব্রাহ্মণ। বিদেশীয়গণ আমাদের রক্ষা করিতেছে, আমাদের সমাজ নিয়মিত করিতেছে, আমাদের কার্য্য দেখাইয়া দিতেছে—তাহারাই এখন আমাদের ক্ষত্রিয়। আজ বিদেশীয়গণ বা বিদেশী শিক্ষা-প্রাপ্ত—বিদেশী-ভাবাক্রান্ত লোকই আমাদের সমাজের নেতা। তাহারাই আমাদের হইয়া কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে, তবে তাহার উন্নতি হইবে। কেননা এখন আমাদের বৈশ্য-প্রকৃতির উপযুক্ত গুণও নাই। বাঙ্গালায়

প্রকৃত বৈশ্যও কখন ছিল না। বাঙ্গালায় কৃষি-বাণিজ্য,শূদ্র ও বাঙ্গালার আদিম নিবাসীরাই করিত; সেইজন্য বাঙ্গালায় কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতিও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। বাঙ্গালার আদিম নিবাসীরা বৈশ্য-প্রকৃতি হারাইয়াছিল। এখন বাঙ্গালায় কৃষিবাণিজ্য-শিল্প শূদ্রের হাতে। তাই বাঙ্গালায় তাহার উন্নতি নাই। পশ্চিম-উত্তর প্রদেশীয় শেঁঠী, বণিক্, কেঁয়ে প্রভৃতি সম্প্রদায় কিরূপ শ্রমশীল,কত অধ্যবসায়ী,কিরূপে সামান্য অবস্থা হইতে, অতি অল্প মূলধন লইয়া আপনার অবস্থা উন্নত করে, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করে, নিজে ধনশালী হয়, জাতীয় ধন বৃদ্ধি করে, তাহা ভাবিয়া দেখিলেই প্রকৃত বৈশ্য-প্রকৃতি কি, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালায় সে বৈশ্য নাই—সে বৈশ্যপ্রকৃতি নাই। এইজন্য আমরা এখন বাণিজ্য কৃষিকর্ম্ম করিতে যাইয়া—যৌথ কারবার করিতে যাইয়া, আমাদের অশক্তি অক্ষমতা—আমাদের বৈশ্যপ্রকৃতির অভাব এবং অতি সামান্য পরিমাণেও স্বার্থত্যাগে আমাদের অক্ষমতা, বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। তাই বলিতেছিলাম,প্রায় সমস্ত বাঙ্গালীই শূদ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়াছে। আমরা জ্ঞানার্জ্জনের উপলক্ষ করিয়া লেখাপড়া করি বটে—কিন্তু আমরা প্রকৃত জ্ঞান যাহা,তাহা লাভ করিনা। তাহা হইতে আমরা কেবল স্বার্থসিদ্ধির অথবা নীচপ্রবৃত্তি অনুশীলন করিবার পন্থা আবিষ্কার করিয়া লই। বড় জোর জীবিকা নির্ব্বাহের একটা উপায় করিয়া লই মাত্র।

সুতরাং অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়াছে। সমাজের স্বাভাবিক নেতা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অবনতিতে,বাঙ্গালী প্রকৃত নেতার অভাবে, স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে দিন দিন পরাঙ্মুখ হইতেছে। বাঙ্গালী স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া, বৃথা অভিমানবশে রাজসিক-তামসিককর্ম্মেই কেবল নিযুক্ত হইতেছে। যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সমাজ নিয়মিত করিতেন, লোকহিতার্থ কর্ম্ম করিতেন, তাহাদিগকে জীবন্ত আদর্শ দেখাইয়া দিয়া প্রকৃত কর্ম্মপথ দেখাইয়া দিতেন, তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন, "নবুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং"—এই মহাবাক্য অনুসারে কার্য্য করিতেন—সেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হারাইয়াই বাঙ্গালীর এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে। শূদ্র বা বৈশ্যপ্রকৃতির লোক নিজ বুদ্ধিবলে কাজ করিতে পারে না। তাহাদের বুদ্ধি ভ্রান্ত, স্বার্থচালিত, অব্যবসায়ী—তাহার ফল মরণ, কেননা "বুদ্ধিভ্রংশাৎ প্রণশ্যতি।" আবার তাহারা সে বুদ্ধিও নিজে পরিচালনা করিতে পারে না—তাহারা যাহাকে শ্রেষ্ঠ মনেকরে, তাহারই অনুসরণ করে—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেইজন্যই এখন বিধর্ম্মী লোক বাঙ্গালী সমাজের শ্রেষ্ঠ বা নেতা হইয়াছে। ইহার ফল, সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও মরণাভিমুখে সমাজের গতি।

এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রকৃতির লোকের অভাবে বাঙ্গালীর ধর্ম্ম লোপ হইতেছে। সমাজশরীর রক্ষার জন্য যে জৈবশক্তির, যে আকর্ষণের, যে স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে শক্তি ক্রমে লোপ পাইতেছে। বাঙ্গালী জাতির এক ধর্ম্মের হানিতে, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম—এই ত্রিবর্গসাধন অসম্ভব হইয়াছে। বাঙ্গালী সমাজশরীর হইতে প্রাণ বহির্গমনোন্মুখ হইয়াছে, সমাজ দেহ বিশ্লেষণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে,এখন বাঙ্গালী পরের জন্য কর্ম্ম করা—বা "Struggle for existence for others" এই মহাসত্য ভুলিয়া গিয়া-

ছেন। নিজের জন্য কর্ম্ম. ও সেই জন্য "Struggle for self-existence "আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালী ভুলিয়া যাইতেছে যে, ভক্তির দিক্‌দর্শনযুক্ত, সাধনা-কল-চালিত, অতিবৃহৎ নিঃস্বার্থ পরহিত-জাহাজ ব্যতীত, প্রজ্ঞাহারী আসক্তি-ঝড় অতিক্রম করিয়া জীবন-সাগর পার হওয়া যায় না, কেবল স্বার্থ-ভেলায় চড়িয়া যাইলে বায়ুর্ণাবামবাত্তসি শুধু বিচলিত ও নষ্ট হইতে হয়। তাই বাঙ্গালী এখন স্বার্থবশে চালিত। যে কোন সামাজিক নিয়ম তাহার স্বার্থকে একটুও সঙ্কুচিত করে, তাহার ইন্দ্রিয়-সুখের পথে একটুও বাধা দেয়, বাঙ্গালী সে নিয়ম তখনই পদদলিত করিতে প্রস্তুত হয়। সেইজন্য সমাজে যথেচ্ছাচার প্রবেশ করিয়াছে। একজন যথেচ্ছাচারী হইলে, দশজনে যে তাহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবে, এ কথা আজ কালের শিক্ষিত বাঙ্গালী মনে করে না। সমাজে দৃষ্টান্ত জন্য নিজের স্বার্থ সংযত করিয়া যে কর্ত্তব্য করিতে হয়, যথেচ্ছাচার প্রবৃত্তি দমন করিতে হয়, বাঙ্গালী তাহা এখন বুঝে না। চারিদিকেই স্বার্থ সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এই মহা স্বার্থ সংঘর্ষণে, সমাজে যে ভয়ানক সমাজবিপ্লবকারী বা বিনাশকারী মহাকাল-রূপী তপ্তশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই বাঙ্গালীকে ধ্বংসের মুখে দ্রুতগতিতে লইয়া যাইতেছে। তাহাই বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থকে আরও অবনত করিয়া দিতেছে, সমস্ত বাঙ্গালীকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতেছে। বর্ণ-ধর্ম্ম ও কর্ম্ম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। মোহময় তামসিক শক্তি আসিয়া সমস্ত বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছে। সমাজ-বন্ধন শ্লথ করিয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত সমাজ-ধর্ম্ম বা সমাজের ধারণ, রক্ষণ ও পোষণশক্তি লোপ করিবার উপক্রম করিয়াছে। সমাজ মরণের মুখে যাইতেছে। যদি এ দুর্দ্দিনে বিদেশীয় রাজনীতি বাঙ্গালাকে রক্ষা না করিত, তবে বোধ হয় বাঙ্গালীর এতদিন ধ্বংস হইত। অথবা দারুণ ফরাসীবিপ্লবের মত একটা ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত করিয়া সমাজকে ওতপ্রোত করিয়া দিত।

এতক্ষণে বোধ হয় কতকটা বুঝাইতে পারিয়াছি, যে ধর্ম্মের অভাব ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অবনতিই বাঙ্গালীর বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রধান অথবা একমাত্র মূল কারণ। এস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি যে, বাঙ্গালা অপেক্ষা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যে ধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অল্প অবনতি হইয়াছিল, সেখানে বর্ণ ও কর্ম্ম বিভাগ কতকটা সুনিয়ন্ত্রিত ছিল, এই জন্য যে বিরুদ্ধধর্ম্মী রাজনৈতিক শক্তির সংঘর্ষে বাঙ্গালী এত আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে, উক্তপ্রদেশীয়গণ সেরূপ হয় নাই।

এখন কথা হইতেছে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের এবং সমস্ত বাঙ্গালী জাতির এ অবনতি, এ ধর্ম্ম-হীনতা কি দূর হইবে না? আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাহা দূর হওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইলেও একেবারে অসম্ভব হয় নাই। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সাত্ত্বিক ও শুদ্ধ রাজসিক প্রকৃতি ক্রমে হীন হইয়া গিয়াছে। শূদ্রপ্রধান বাঙ্গালায় তামসিকশক্তির প্রাধান্যই তাহার কারণ। এই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রকৃতির—এই তিন গুণের নিয়ম এই যে, ইহার একটীর আধিক্যে অপর গুলি অভিভূত হয়।

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন:—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥

অতএব তমঃ শক্তির প্রভাবেই বাঙ্গালীর ব্রাহ্মণের অবনতির প্রধান কারণ। কথাটা

আর একবার বুঝাইব। তমঃ প্রধান বাঙ্গালার উর্ব্বর ক্ষেত্রে, আদিশূর রাজা কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বীজ আনাইয়া নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। তমঃ শক্তির 'আওতায়' তাহাদের সাত্বিক ও দৈবী রাজসিক-শক্তি ক্রমে শুকাইতে লাগিল। কৌলিন্য প্রথা তাহা কতক পরিমাণে রক্ষা করিলেও সে'আওতা'দূর হয় নাই। বাঙ্গালায় মুসলমান অধিকার হওয়ায় ক্রমে বাঙ্গালার ক্ষত্রিয়প্রকৃতি একরূপ ধ্বংস হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ প্রকৃতি তখন কতকটা ছিল এবং এখনও আছে বটে, কিন্তু তাহার ধারণ ও রক্ষার জন্য, যে ক্ষত্রিয় শক্তির প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গালায় লোপ হইয়া গেল। সুতরাং ব্রাহ্মণের সাত্বিক বা ধর্ম্মশক্তি সমাজে (ক্ষত্রিয়ের দ্বারা) সংক্রামিত হইতে পারে নাই। ক্রমে ব্রাহ্মণের সে সত্ব-শক্তি ও একেবারে লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

অতএব প্রকৃত সাত্বিক প্রকৃতির অভাব বা অবনতি হইতেই বাঙ্গালীর অবনতি হইয়াছে। ইহারই নামান্তর ধর্ম্মের অভাব, ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অবনতি। বাঙ্গালার কথা ছাড়িয়া দাও, যে কোন দেশের কথা ধর,সে দেশ স্বাধীন হউক বা অধীন হউক, সে দেশ অধিক উন্নতিশালী হউক আর না হউক, সে দেশের যখনই ধর্ম্ম,সত্বশক্তি ও সাত্বিক ব্রাহ্মণাদি প্রকৃতির অভাব হইয়াছে, তখনই সে দেশ অধঃপাতে গিয়াছে। প্রাচীন রোম,গ্রীস, মিসর, কার্থেজ প্রভৃতি কত জাতি ইতিহাস বক্ষে মাত্র বিচরণ করিতেছে, কেবল নাম মাত্রাবশেষ হইয়াছে—তাহাদের কথা স্মরণ করিলে—তাহাদের ধ্বংসের কারণ ভাবিয়া দেখিলে,এই তত্ত্ব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিব।

এখন যদি আমরা বাঙ্গালার অবনতির প্রকৃত কারণ বুঝিয়া থাকি, তবে ইহার উন্নতির কি উপায় তাহাও বুঝিতে পারিব। যে ধর্ম্ম শক্তির অভাবে বাঙ্গালা এবং অন্যান্য দেশের অধঃপতন হইয়াছে, সেই শক্তির আবির্ভাব ও প্রচার হইলেই তাহার উন্নতি হইবে। ইটালীর কথা ভাবিয়া দেখ, অন্য যে কোন অধঃপতিত জাতির পুনরুত্থান হইয়াছে, তাহাদের কথা ভাবিয়া দেখ, বুঝিবে এই ধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব, বৃদ্ধি ও বিস্তার হইতেই তাহাদের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। বাঙ্গালায় যদি আবার ধর্ম্মশক্তি, সত্বশক্তির বৃদ্ধি করিতে পার, যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পার, তবেই আবার বাঙ্গালার উন্নতি হইবে। আমাদের সমবেত চেষ্টায় তাহার সম্ভব কিনা, বলিতে পারি না। যাহারা নিজেই তামসিক শক্তিতে অভিভূত—আসুরী ও রাক্ষস প্রকৃতি-সম্পন্ন—তাহারা কি উপায়ে সেই তামসিক শক্তিকে অভিভূত করিয়া, আসুরী ও রাক্ষস প্রকৃতি দমন করিয়া, সাত্বিক শক্তি বা ধর্ম্ম-শক্তির বিকাশ ও বৃদ্ধি করিবে,দৈবী প্রকৃতির সৃষ্টি করিবে, তাহা জানি না। তবে এই মাত্র বুঝি যে, এই খানেই অবতারের প্রয়োজন। হীরেন্দ্র বাবুও তাহাই বলিয়াছেন।

যখন প্রকৃতিতে উচ্চ তড়িতাদি শক্তি কার্য্য রূপে প্রকাশিত হইয়া,নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হইয়া, নিস্তেজ হইয়া পড়ে; অথবা বৈজ্ঞানিকের কথায় যখন "higher potential, উচ্চসত্বশক্তি kinetic energy কার্য্য-শক্তি উৎপাদন করিয়া lower potential বা নিম্ন শক্তিতে পরিণত (Dissipated) হয় —যখন সূর্য্যের ন্যায় উচ্চ শক্তির আধার পরমাণুস্তূপ চন্দ্রের ন্যায় শক্তিহীন জড়পিণ্ডে পরিণত হয়, তখন ঐশ্বরীয় শক্তি ব্যতীত, তাহাদের সেই প্রলয় অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া,

সৃষ্টি রূপ কার্য্যশক্তির বিকাশের কারণ উচ্চতর সত্বশক্তিতে পরিণত করিতে পারে,এমন কোন তত্ব আজিও বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিতে পারে নাই। সুধু সিদ্ধান্ত কেন, ধারণাও করিতে পারে নাই।

সেইরূপ জীব জগতে বা মনুষ্য জগতে যখন এই নিম্নতর তামসশক্তি জীবকে অভিভূত করিয়া ফেলে, তখন তাহার মধ্যে উচ্চতর সত্বশক্তির বিকাশ করা মানুষের নিজের পুরুষকারের সাধ্যায়ত্ব নহে। তখন যদি ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহার অবতার না হয়,তিনি যদি মানুষকে এই সত্বশক্তি স্বয়ং না বিলান,চুম্বক লৌহকে নিকটে পাইয়া যেমন তাহাতে চুম্বকশক্তির বিকাশ করে, সেইরূপ মানুষকে নিকটে আনিয়া, সেই অবতীর্ণ পুরুষ যদি তাহাকে সত্বশক্তি না বিলান,অথবা অন্যকোন প্রকারে স্বয়ং ঈশ্বর এই সত্বশক্তির উৎপাদন না করেন, তবে অন্য উপায়ে যে সেই তামসিক প্রকৃতি সম্পন্ন মানুষের বা জাতির উন্নতি হইতে পারে,তাহা আমরা কোনরূপ যুক্তিতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।

বিজ্ঞ মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন লিখিয়াছেন—

"The philosophy of Incarnation is indeed a great and indestructible philosophy. The Incarnation brought righteousness out of the region of cold abstraction, clothed it in flesh and blood, opend for it the shortest and broadest way to all our sympathies, gave it the firmest command over the springs of human action, by incorporating it in a person, and making it liable to love." *On atonement.* Nineteenth Century, Sept 1894.

হীরেন্দ্র বাবু যথার্থ বলিয়াছেন যে, যিনি সাধুদের পরিত্রাণ জন্য,দুষ্কৃতের বিনাশ জন্য, ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি অধঃপতিত বাঙ্গালাতে একবার শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, যদি সময় আসিয়া থাকে বা প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে তিনিই আবার অবতীর্ণ হইয়া বাঙ্গালাকে রক্ষা করিবেন। তিনি যেমন এক জনেতে বা একাধারে বিকাশিত হইতে পারেন,তেমনি অনেকের হৃদয়েও এককালে বিকাশিত হইয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিতেপারেন। বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ কি তাহা জানি না। তবে এই মাত্র বুঝিতে পারি যে, বাঙ্গালার বিনাশ যদি বিধাতার নির্ব্বন্ধ না হয়, তবে যেরূপেই হউক, আবার এই সত্বশক্তির এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন হইবেই। এখন আমাদের কর্ত্তব্য—যাহার যতটুকু ক্ষমতা,এই সত্বশক্তির—এই ধর্ম্মের বৃদ্ধি করি, যাহাতে পূর্ণ সত্বশক্তির বিকাশের পথ পরিষ্কার হয়,গুণাতীত ও গুণাধার পুরুষের আবির্ভাব হইবার উপযুক্ত ভূমি প্রস্তুত হয়,তাহারই জন্য যাহার যত সাধ্য চেষ্টা করি। বাঙ্গালায় যদি কেহ সাধু না থাকেন, বাঙ্গালায় যদি ধর্ম্ম না থাকে, যদি বাঙ্গালা কেবল অধর্ম্মে পূর্ণ হয়, তবে কাহার আকর্ষণ বলে, কাহাকে পরিত্রাণ জন্য বা কিসের রক্ষার জন্য এখানে পবিত্র ঈশ-শক্তির আবির্ভাব হইবে? তাই বলিতেছি,আমাদের যাহার যতদূর সাধ্য ধর্ম্মার্জ্জন জন্য চেষ্টা করিতে হইবে—সাধু হইতে চেষ্টা করিতে হইবে—নিষ্কাম কর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে, স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আর আমাদের কর্ত্তব্য নাই। অন্য কর্ম্ম নাই। বাঙ্গালার অভাব দূর ও অবস্থা উন্নত করিবার আর অন্য উপায় নাই। আমাদের আর্থিক বণিজিক বৈষয়িক উন্নতির পথ একেবারে বন্ধ আছে,এমনকি অন্নাভাব পর্য্যন্ত দূর করিবার আমাদের নিজের সাধ্য নাই। আমাদের যাহা সাধ্য, যে কার্য্য করিতে আমরা নিজে পারি, যে কর্ম্মপথ উক্তরূপে আবদ্ধ নহে, আমাদের চেষ্টা ও কার্য্য সেই আধ্যাত্মিক

উন্নতির দিকে নিয়মিত হওয়াই প্রয়োজন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতীত আমাদের অন্য উন্নতির সম্ভাবনা নাই; ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে সকলকেই রক্ষা করেন। আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলে,সকল অভাব সকল দুঃখ ঘুচিয়া যায়। সেদিন বক্তৃতা সভায় কোন বক্তা বলিয়াছিলেন,যখন বৃক্ষের শক্তি 'কুড়িতে' পরিণত হয়, তখন জগতে এমন কোন শক্তি নাই যে, তাহার প্রস্ফুটন বন্ধ করিতে পারে। উপন্যাস লেখক লিটন বলিয়াছেন,বৃক্ষ যখন আলোক অভিমুখে, আলোকের আশ্রয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, তখন কোন বাধা তাহার সে স্ফূর্ত্তি বন্ধ করিতে পারে না। ধর্ম্মই জীবের ও জাতির একমাত্র বিকাশশক্তি। যতক্ষণ সে শক্তি থাকে, ততক্ষণ সে জীবের বা জাতির বিকাশ ও উন্নতি কিছুতেই বন্ধ করিতে পারে না। সেই ধর্ম্ম শক্তিহীন হইলেই জীবের ও জাতির বিনাশ হয়।

অতএব আমাদের এ অনন্ত অভাব দূর করিবার,এ শোচনীয় অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায় ধর্ম্ম। আমাদের আর উপায়ান্তর,অন্য গত্যন্তর নাই। তবে আইস আমরা সেই ধর্ম্ম রক্ষার ও বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করি, ও যিনি যুগে যুগে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আবির্ভূত হন, তাঁহার প্রতীক্ষা করি এবং জাতীয় শক্তির ও সমাজশক্তির উদ্বোধনের জন্য আরাধনা করি। আইস সকলে প্রার্থনা করি—

"উঠ মা জননি জন্মভূমি!
যোগ-নিদ্রা ত্যজ একবার;
হের মা শ্মশান চারিভিতে
শবপ্রায় সন্তান তোমার।
তোমার অমৃত পরশনে
পাবে দেহে চেতনা আবার;
তোমার করুণা বরিষণে
প্রাণে হবে শক্তির সঞ্চার।
নতুবা কালের আবাহনে
সিন্ধু উঠি মরণের সাতে
লবে সবে অতলের কোলে
বিস্মৃতি যেথায় রাজ্য পাতে।"

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

সারদা ও প্রেমদা।

সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদা উঠিছে পূবে,
জীবন-গগন মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া;
অপূর্ব্ব সুন্দরী ঊষা, অপূর্ব্ব সন্ধ্যার ভূষা,
পৃথিবীর দুই প্রান্ত শোভিছে ব্যাপিয়া!

২

সারদা ধরেছে ডা'ণে, প্রেমদা বাঁ হাত টানে,
বুঝিতে পারিনা আমি কোন্ দিকে যাই,
দোঁহারি সমান স্নেহ, বেশ্ কম নহে কেহ,
দু'জনে ওজনে তুল চুকভুল নাই!

৩

দোঁহারি সমান জোর,প্রাণ ছিঁড়ে যায় মোর,
দু'জনেই চাহে তারা পুরাপুরি নেয়,
দু'জনেই করে আশা, পরিপূর্ণ ভালবাসা,
তিলমাত্রা নাহি চাহে কেহ কারে দেয়!

৪

সারদা যাইতে ডাকে, প্রেমদা ধরিয়া রাখে,
ঠেকেছি বিষম দায়—বিষম সঙ্কটে,
কে হয় বেজার খুসি,কারে রুষি কারে তুষি,
এমন দারুণ দায় কারো নাকি ঘটে?

৫

চে'তে প্রেমদার পানে, সারদাও মরে প্রাণে,
বুঝি না কেমন হিংসা এ কেমন আড়ি,
দু'জনেই বলে তারা, কেবল তোমারে ছাড়া,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চে'লে তা'ও দিতে পারি!

৬

প্রেমদা পদ্মার কূলে, কোমল শেফালি ফুলে,
করিয়া বাসর শয্যা ডাকিছে আমায়,
সারদা 'চিলাই' তীরে, আমকাঠ দিয়ে শিরে,
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায় !

৭

নাহি নিশি নাহি দিন, দু'জনেই নিদ্রাহীন,
দুই দিকে দুই সিন্ধু গর্জ্জিছে সমানে,
পাষাণহৃদয় স্বামী, 'পানামা' যোজক আমি,
দু'দিকে ভাঙ্গিয়া নামি দু'জনার বানে !

৮

যদি কভু ভুলে চুকে, কারো নাম আনি মুখে,
অমনি আরেক জন অভিমানে ভোর,
না নড়িতে চুল কণা, সাপিনীরা ধরে ফণা,
ভয়ে ভয়ে সদা আছি হ'য়ে গরুচোর !

৯

কিবা ঘুম কিবা জাগা, দু'জনে পিছনে লাগা,
পারি না তিষ্ঠিতে, বড় পড়েছি ফাঁফরে,
একটু নাহিক স্বস্তি, জ্বালায়ে ফেলিল অস্থি,
হায় ! হায় ! লোকে কেন দুই বিয়া করে !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

স্বামী।

প্রণাম করলো তায় সেই ত দেবতা তব,
জীবন ফুলের মত, হইবেক বিকশিত,
তাঁহার প্রণয়াদরে শিখিবে গরিমা নব,
বিনে সে চরণরজ ভবে কি বিভব তব ?
সে পবিত্র পদরজে, মিশালো এ তুচ্ছ কায়া,
কি ভয় অশান্তি মাঝে থাকিতে এ পদ ছায়া!
সেই পদাম্বুজে লিপ্ত জগত সংসার সব,
নমলো তাঁহার পায় সেই ত দেবতা তব।
নিকটে পবিত্রমূর্ত্তি প্রাণের বাসনা মোর
করিব সে পদ সেবি এ জীবন-নিশিভোর !

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

দুর্গোৎসবে।

সারা বৎসরের পরে, এলি মাগো ধরা' পরে
নে গো কোলে ছেলেদের তুলি ;
আশাপথ ছিল চেয়ে, দেখ তোর দেখা পেয়ে,
'মা' 'মা' করে ডাকে ছেলে গুলি।
যতনে তুলে নে কোলে, মধুর স্নেহের বোলে,
তৃষার্ত্তের হৃদয় জুড়াক্।
আদরে তাদের গায়ে, পদ্মহাত দে বুলায়ে,
রোগ, শোক, তাপ দূরে যাক্।
তোরে মা ! বলার তরে, সারাটী বৎসর ধরে,
রেখেছে জমায়ে কত কথা।
অশ্রু ও যাতনা জ্বালা, গেঁথেছে কতই মালা,
বুকে ভরা আছে কত ব্যথা।
মুছে দে মা আঁখি জল, দে বুকে নবীন বল,
দুরবল হোক্ বলীয়ান্।
অন্নপূর্ণে ! দে মা অন্ন, ঘুচুক বঙ্গের দৈন্য, —
দুরভিক্ষ-পীড়িত-পরাণ
বাঁচুক দয়ায় তোর, কাটুক আঁধার ঘোর,
হাহাকার ঘুচুক তাদের।
(উথলে নয়ন লোর), ত্রিনয়ন মেলি তোর,
দেখ্ দশা ফরিদপুরের।
শুধু অস্থিমাত্র সার, দাঁড়াইয়া সার সার,
হাজার হাজার তোর ছেলে,
অশন বসন-হীন, কাঙ্গাল দরিদ্র দীন,
ডাকে ওই 'মা'-'মা'-'মা'-'মা' বলে।
কাতর কণ্ঠের ধ্বনি, শূন্যে হয় প্রতিধ্বনি,
জাগাইয়া তোলে দশ দিক্।
এ আর্ত্ত কাতররবে, স্থির আছে যারা সবে,
তাহাদের শতবার ধিক্ !
দয়াময়ী তুই মা তো, কভু স্থির রবি না তো,
গেহ হীন, অন্ন বস্ত্র হীন,
এই শত শত ছেলে, মাগো তোর দয়া পেলে,
রক্ষা পায় ; ওই অন্ন-ক্ষীণ

বাজেনা কি তোর কাণে ? পরশে না কি
তোর প্রাণে ?
না না তুই নিদয়া ত নয়,
সন্তানের আঁখি জল, দেখিয়ে কোথায় বল্
জননী অধীরা নাহি হয় ?
এ অভাগী তোর কাছে, আর কিছু নাহি যাচে,
অনাথ সে ভাই বোন্‌দের,
জগন্মাতা মহামায়া ! দে মা তোর পদছায়া,
ঠাঁই আর কোথায় তাদের ?
ঘুচুক্ বঙ্গের দৈন্য, অন্নপূর্ণে ! দে মা অন্ন,
দারুণ ক্ষুধিত ভাই বোনে,
প্রসারি কোমল হস্ত, বস্ত্র হীনে দে মা বস্ত্র,
দে আশ্রয়, নিরাশ্রয় জনে।
মাগো তোর তনয়ার, রেখেছিস্ কিবা আর,
সুখ সাধ নিয়েছিস হ'রে,
সবি তুই দিয়েছিলি, এরি মাঝে কেড়ে নিলি,
এবে এই ধরণী উপরে
আর মোর কিছু নাই—স্বদেশ, ভগিনী, ভাই,
ইহাদেরি মুখ চেয়ে আছি।
এদের দেখিলে দুখ, বিদরে যেন গো বুক,
তাই তোর কাছে এই যাচি।
পূজিতে চরণ মা'র, লয়ে পুষ্প অর্ঘ্য ভার,
কা'রা ভাই দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
এ নয় পূজার রীতি, যদি চাও মা'র প্রীতি,
দাও হস্ত দরিদ্রে বাড়ায়ে।
পাপ, তাপ, মলিনতা; ঘুচাও ব্যথীর ব্যথা,
ভেদাভেদ কোরো না গণন।
সাধু-ইচ্ছা, ভাই ! যার, জননী সহায় তার,
এই ব্রত করহ মনন ;
আনন্দ ভকতি স্নেহ, পূর্ণ-হোক-বঙ্গ-গেহ,
আত্মপর উচ্চ নীচ জ্ঞান,
হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা, ঘৃণা, ক্রোধ, নিঠুরতা,
সবে তারা করুক্ প্রয়াণ।
সারা বৎসরের মাঝ, শুভদিন ভাই আজ,
এসগো ধরিবে কে এ ব্রত !
ছুঁইয়া চরণ মা'র, কর এ প্রতিজ্ঞা সার,
পরউপকারে রবে রত।
ম'ার পূজা এরি নাম, অন্য পূজা নাহি চান,
জননী তোদের কাছ হতে,
বৎসরান্তে একবার, আগমন হয় মা'র,
হিসাব, কাজের তাঁর, ল'তে।
নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম ভাবে, তাঁর প্রিয় সাধ সবে,
আনন্দিতা হবেন জননী।
প্রেমানন্দ শান্তিময়—স্বর্গ আর কারে কয়,
হবে স্বর্গ মোদেরি ধরণী।

শ্রীমতী মৃণালিনী।

শ্রীমৎ রূপ-সনাতন প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

এতদ্দেশীয় মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি পত্রিকায় পুরাবৃত্ত, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজ-নীতি, রাজনীতি, সাধুচরিত, বৈজ্ঞানিক, ও ঐতিহাসিক যাহা কিছু প্রকাশ হয়, বা হই-তেছে, তাহা স্বদেশোন্নতি ও শিক্ষোন্নতির একটী প্রকৃষ্ট উপায়। কারণ,তৎপাঠে লোকের অন্তঃকরণ সুনির্ম্মল এবং বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইয়া ক্রমশঃ

"শ্রদ্ধারতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

ঈশ্বরের গুণ লীলাদি বীর্য্যের সম্যক্ জ্ঞানলাভ ও হৃদয় কর্ণ আনন্দে আপ্লুত এবং ভক্তি মার্গে শ্রদ্ধা হইবারই কথা। এই জন্য দেশের বড়

বড় লোক, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায় বহু-চিন্তা ও গবেষণা পূর্ব্বক নানা বিষয় লিখিতে-ছেন,এবং দেশের হিতানুষ্ঠানে অনেকে মনো-যোগ দিয়াছেন। বস্তুতঃ,এ সকল দেখিতে ও শুনিতে বড়ই সুখ।

সংবাদপত্রসমূহের প্রধান কর্ত্তব্য, প্রকৃত ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করা, প্রকৃত সত্যের অবমাননা না করা,আর আপামর সাধারণকে নীতিশিক্ষা প্রদান করা কিন্তু,—

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্নব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।"

যে বিষয় হউক না কেন,সত্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া সত্য এবং প্রিয় বলা উচিত। ফলতঃ কোন প্রসঙ্গ ন্যায়বিরুদ্ধ অথবা শ্রুতিকটু হইলে, কি ভাল দেখায়?

পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমাদের আর্য্য ঋষিতুল্য শ্রীপাদ গোস্বামী মোহান্তগণ ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ক্ষমতাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। যাঁহাদের যোগ সাধন প্রভৃতি সত্ব প্রধান ছিল, যাঁহাদের উদার ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি,সমাজনীতি, অমানুষিক শক্তি এবং শিক্ষা দর্শনে এক সময় সমস্ত বিভাগ আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন; যাঁহাদের প্রণীত অভ্রান্ত অপরি-হার্য্য ভক্তি শাস্ত্রের এক একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে ইদানীন্তন কালে অনেকের মস্তক ঘূর্ণিত হয়,কি সর্ব্বনাশ! তাঁহাদের লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ।

প্রবাদ সত্যই হউক,আর মিথ্যাই হউক, যে নিন্দায় মহতের মহিমাকে বিনষ্ট করে, ইচ্ছা করিয়া তেমন কথা লিখিয়া প্রকাশ করিতে নাই।

বড়ই দুঃখের বিষয়, বৈষ্ণবজগতের আদি-গুরু,গোস্বামীর প্রধান শ্রীমদ্রূপ ও শ্রীমৎ সনা তন প্রভুদ্বয়, দস্যু, মিথ্যাবাদী, কপট, যবন ও যবন সম্রাটের সামান্য বেতনভুক্ চাকর, প্রজাপীড়ক, এবং অবৈধ উপায়দ্বারা বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন,বিগতভাদ্র আশ্বিন-পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যক নব্যভারত পত্রিকায় এবম্বিধ একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যারপর নাই ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছি। প্রস্তাবলেখক অজ্ঞ লোক নহেন, অজ্ঞ হইলে কোন কথাই ছিল না। অসত্য উক্তির প্রতিবাদ করিতে আমাদিগের ইচ্ছাও হইত না; কথা গুলি হাসিয়া উড়াই-তাম। লেখক অতি বিজ্ঞ,লব্ধনামা শ্রীযুক্ত মিঃ উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ, সি, এস্,। তাই এক চোখে হাসিয়া, এক চোখে কাঁদিয়া প্রতিবাদ ও সমালোচন করিতে হইতেছে।

ভক্তিশাস্ত্র অগাধ সমুদ্র, তন্মধ্যে ডুবিয়া রত্নোদ্ধার কঠিন কথা, তিনি সে গভীরতার ভিতর প্রবেশ করেন নাই। সমস্ত না দেখিয়া, না শুনিয়া না বুঝিয়া কোন বিষয় সিদ্ধান্ত করা কেবল অস্থিরমতিত্বের পরিচয়। মহা-কবি কর্ণপুর কৃত (সংস্কৃত) শ্রীচৈতন্যচরিত-কাব্য এবং শ্রীশ্রী জীবগোস্বামী প্রণীত লঘু-তোষিণী গ্রন্থ যদি তাঁহার দেখা থাকিত,তাহা হইলে উক্ত ভ্রমে পড়িতেন না এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও করিতেন না।

উজ্জ্বল ভক্তিশাস্ত্রের মতানুসারে উচিত লেখা হয় নাই। সুতরাং সত্যের পথ হইতে তিনি স্খলিতপদ হইয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রের কুটিল অর্থ করিয়া সাধারণকে প্রতারিত করা কি তাঁহার ন্যায় মহাশয় ব্যক্তির কর্ত্তব্য?

(১) "অনর্পিত চরীংচিরাৎ করুণায়াবতীর্ণঃ কলৌ।"

বাল্যে সংস্কৃত শিক্ষা না হইলে এমন কবিত লেখনীতে আসা অসম্ভব। শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু প্রথমে যে এই এক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আর শ্রীরূপ ও সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম

শ্রীবল্লভ এবং ভগিনী-পতির নাম শ্রীকান্ত,ইহা হিন্দু নাম থাকাতে তাঁহারা হিন্দু ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ঠিক।

(২) শ্রীরূপ সনাতনের মধ্যে কে ছোট কে বড়,সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান্ হইয়াছেন, অর্থাৎ সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, কিন্তু এ দিকে "রূপস্যাগ্রজ" বলিয়া শ্রীসনাতনের সমসাময়িক শ্রীকবিকর্ণপুর-কৃত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। ফলতঃ যখন শ্রীসনাতনের সঙ্গের সঙ্গী শ্রীকবি-কর্ণপুর সুস্পষ্ট বিধানে "রূপস্যাগ্রজ" বলিয়া শ্রীসনাতনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,তখন আবার ছোট বড় লইয়া সন্দেহ কেন? লঘু-তোষিণী গ্রন্থে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্পষ্টা-ক্ষরে লিখিয়াছেন ঃ—

"আদিঃ শ্রীলসনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপ নামাততঃ।
শ্রীমদ্বল্লভ নামধেয় বলিতো নির্ব্বিদ্য যে রাজতঃ॥
ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের চতুর্থে শ্রীসনাতন শ্রীবল্লভের পরিচয়ে বলিয়াছেন; "আমি আর রূপ তার জ্যেষ্ঠ সহোদর"ইহার অর্থে শ্রীবল্লভের জ্যেষ্ঠ শ্রীরূপ আর শ্রীরূপের জ্যেষ্ঠ শ্রীসনাতন। শ্রীরূপ জ্যেষ্ঠ হইলে শ্রীসনা-তন কখনই শ্রীরূপ নাম উল্লেখ করিতেন না। কনিষ্ঠ বলিয়াই নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। ফলতঃ শ্রীসনাতনের জ্যেষ্ঠ কেহই ছিলেন না। শ্রীসনাতনের পিতা শ্রীকুমার দেবের অনেক গুলি পুত্র সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু জ্যেষ্ঠ শ্রীসনাতন,মধ্যম শ্রীরূপ,কনিষ্ঠ শ্রীবল্লভ ব্যতীত অন্য কেহ জীবিত ছিলেন না। সকলেই অকালে কালকবলে নিহিত হইয়াছিলেন, এই জন্য তাহাদের নাম পর্য্যন্ত শ্রীজীব কৃত বংশাবলীতে পরিকীর্ত্তিত নাই।

"তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার॥"

ইহার অর্থে শ্রীরূপ শ্রীসনাতনের জ্যেষ্ঠ নহেন। তাহার অর্থ স্বতন্ত্র। বিগত মাঘ-একাদশ খণ্ড দশমসংখ্যক নব্যভারতের ৫২৪ পৃষ্ঠায় তাহার মীমাংসা আছে। শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু শ্রীরূপ,শ্রীসনাতনের জ্যেষ্ঠ বলিয়া কোথা হইতে সে অর্থ টানিয়া লইয়াছেন, আমরা কোন গ্রন্থে সে নজীর খুজিয়া পাই-লাম না। তবে ছোট বড় লইয়া এই এক প্রশ্ন হইতে পারে, যদি শ্রীরূপই কনিষ্ঠ, তবে শ্রীসনাতনের নামের পূর্ব্বে রূপের নাম কেন?

উত্তর। সম্বোধন স্থলে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ লইয়া অনেক স্থলে উল্টাপাল্টা নাম ব্যবহৃত হয়; যথা—কানাই বলাই, কার্ত্তিক গণেশ, অতুল-উমেশ,প্রভৃতি এমন উদাহরণ অনেক আছে। তা'তে কি আসে যায়? স্ত্রীলোকেরা কথায় বলে;—

"যে যে নামে মানায় ভাল।
সেই সেই নাম, বাসি ভাল॥
ছোট বড়য়, কিবা কাজ।
যে দুষে তার, মুণ্ডে বাজ।"

সম্বোধন কালে যে যুক্তনাম কোমল হয়, সেই সেই নাম লোকে ব্যবহার করে। রূপ-সনাতন বলিলে যত মিষ্ট হয়, সনাতন রূপ বলিলে তত মিষ্ট হয় না। কোন কোন ভক্ত বলেন, শ্রীরূপ অগ্রে বৈরাগ্য করিয়াছিলেন, শ্রীসনাতন তৎ পশ্চাৎ বৈরাগ্য করেন, এজন্য শ্রীরূপ বৈরাগ্যে বড়, কিন্তু সনাতন অপেক্ষা বয়সে বড় নহেন।

(৩) দুই ভাই রাজ সংসারে মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হইবার কালে তখনকার নিয়মানু-সারে শ্রীরূপ "দবীর খাস" এবং শ্রীসনাতন "সাকের মল্লিক" এই উপাধি পাইয়াছিলেন। দবীরখাসের অর্থ সুলেখক, উমেশ বাবু তা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ সাকের

শব্দের অর্থ দাতা, অর্থাৎ উর্দ্দু ভাষায় সাও-কর। খাসমন্ত্রীশব্দে "দাবা" শতরঞ্চক্রীড়ায়, মূর্খেরাও তা বুঝে।

হরিভক্তি প্রকাশিকা নামক গ্রন্থে বিদিত আছে, শ্রীসনাতনের পিতৃদত্ত নাম "অমর", আর শ্রীরূপের নাম "সন্তোক" যথা,—

"অমর সন্তোক নাম, পূর্ব্বেতে আছিল।
সনাতন রূপ নাম, পশ্চাৎ হইল॥"
"দবীর খাস আর, সাকের মল্লিক।
খেতাবেতে এ দোঁহার, প্রভাব অধিক।"

ফল কথা, দবীর আর সাকের ইহা প্রকৃত মুসলমান নাম নহে। উপাধি—উপাধি—রাজ-প্রদত্ত উপাধি।

প্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী যে উত্তম লেখক ছিলেন,সে পরিচয় অন্যে পরে কা কথা,স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার অক্ষরের স্তুতি ও প্রশংসা করিয়াছিলেন। যথা ;—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের প্রথমে ;—

"শ্রীরূপের অক্ষর যেন, মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হয়ে করে প্রভু, অক্ষরের স্তুতি॥"

সুতরাং দবীর খাস নামের অর্থ ইহাই যথেষ্ট। শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু দবীর খাস নামের স্থলে যে সনাতন বলিয়া, বার বার উল্লেখ করিয়াছেন, সেটী তাঁহার ভুল। আরো একটী মহৎ ভুল এই যে,শ্রীরূপ ও সনাতনের অবরজ বল্লভ ও ভগিনীপতির নাম শ্রীকান্ত থাকায়, যখন তাঁহাদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন আবার মুসলমান বলিয়া সন্দেহ কেন? তাঁহার লেখনী না হয় দ্বিজিহ্বা, কিন্তু তিনিও কি তাই? তিনি নিজের মত সমর্থন করিয়া বলুন দেখি, মুসলমানের বালক কে কোথায় বাল্যে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছে? আমরা অনেক মুসলমান বালক কে অধ্যয়ন করিতে দেখিয়াছি, তাহারা বাল্যকালে স্বজাতীয় ধর্ম্ম পালনের নিমিত্ত কোরাণের মতানুসারে শিক্ষার পূর্ব্বে "আম সোওরা" নামে আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা ও আলোচনা করে। রাজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কালে শ্রীরূপ সনাতন যবন হন্ নাই, কলমাও পড়েন নাই; নবগুণ পৈতাও ত্যাগ করেন নাই।

"আসনাচ্ছায় নাদ্যানাৎ সম্ভাষাৎ সহ ভোজনাৎ।
সংক্রামন্তীহ পাপানি, তৈল বিন্দু রিবাম্ভসি॥"

মহর্ষি পরাশরোক্ত বচন ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পালন করিতেন। যবনের সহিত একাসনে বসিয়া কাজ করা দূরে থাক্, তাহাদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইতেন না।

কথিত আছে, শ্রীরূপ-সনাতনের পিতা শ্রীকুমার দেব বড়ই শুদ্ধাচার ছিলেন। এমন কি, অকস্মাৎ যবন দেখিলে অন্ন গ্রহণ করিতেন না। "পশ্চাদ্ জ্ঞানতো বাপি কুর্য্যাদ্ভাস্কর দর্শন।"

প্রায় শিশু স্বরূপ সূর্য্য দর্শন করিয়া পবিত্র হইতেন।

ভক্তিরত্নাকরে আছে ;—

"শ্রীমুকুন্দ দেবের, নন্দন শ্রীকুমার।
বিপ্রকুল প্রদীপ, পরম শুদ্ধাচার॥
সদা যজ্ঞাদিক ক্রিয়া, নিভৃতে করয়।
কদাচার জন স্পর্শে, অতি ভীত হয়॥
যদি অকস্মাৎ কভু, দেখয়ে যবন।
করয়ে প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করে গ্রহণ॥"

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ এবম্প্রকার পিতৃধর্ম্ম সতত রক্ষা করিতেন। অনায়ত্ত নিবন্ধন বিশেষ রাজদণ্ড ভয়ে তাহাদিগকে মন্ত্রিত্ব পদ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এখনকার কালে ম্লেচ্ছসেবী, এমন অনেক ম্লেচ্ছভক্ত আছে; "খানা পিনা পান পানীর, না করে আয়েব।" যাঁহারা আলালের ঘরের দুলাল আর "বোয়াটিয়া গোছ" সেই সকল হিন্দু সন্তান ইংরাজি শিক্ষার কাল হইতে শিক্ষার চূড়ান্ত পর্য্যন্ত, কি খাদ্যে কি পরিচ্ছদে সকল বিষয়েই ম্লেচ্ছ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া মাতা, বিমাতা, ভগ্নী ও ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতির প্রস্তুত অন্নাদি অর্থাৎ স্বাভাবিক খাদ্য পরিহার করতঃ অমৃত বোধে ম্লেচ্ছ খানা অবলেহন করে। পান পানী দোষ বলিয়া গণ্য করে না। ম্লেচ্ছ তাহাদিগের গায়ের ঘাম, এমন কি "কাজী সাহেব হাত ধরিলে জাতির ছারে করে কি?" তা কাজের জন্য বা পেটের দায়ে অনেকে ইংরেজের পদানত ও খানায় প্রবৃত্ত। কিন্তু শ্রীরূপ ও সনাতন, সে ধরণের লোক ছিলেন না।

"আঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজনং।"

পাছে রন্ধনের গন্ধ নাসা রন্ধ্রে প্রবেশ হয়, তাঁহারা সেই ভয়ে রাজমহল ছাড়িয়া গৌড়ে আজ পর্য্যন্ত শ্রীরূপ সনাতনের যে "বার-দুয়ারি"নামে প্রসিদ্ধ অট্টালিকা আছে,তাঁহারা তাহাতে বসিয়া এবং কেবলমাত্র হিন্দু ভদ্র-সন্তানদিগকে লইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন।

শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু, শ্রীরূপ ও সনাতনের যবনত্বের বিষয় এই কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—

(১) চৈতন্যের অনুচর বর্গের মধ্যে হরিদাস রূপ, সনাতন, শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতেন না।

(২) রামকেলী গ্রামে চৈতন্যের সহিত তাহাদিগের যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তাহারা ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসঙ্গী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল।

(৩) সনাতন কারাবদ্ধকালে কারাধ্যক্ষের নিকট মক্কায় যাইবার কথা প্রকাশ করিয়া মুক্তি প্রার্থনা করে।

(৪) সনাতন যখন কারাগার হইতে পলাইয়া কাশীতে গিয়া চৈতন্যের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাহার মুসলমান বেশ ছিল।

উত্তর। প্রথমতঃ হরিদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্ম ঔরসে ব্রহ্মকুলে (জেলা যশোহরের অন্তর্গত) ব্যূঢ়স গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তত্রস্থ বেণাপুরের জঙ্গলে থাকিতেন। পূর্ব্বে রাজা দুষ্মন্তের পত্নী দেবী শকুন্তলা,শকুনীকর্ত্তৃক যেরূপ রক্ষিতা ও পশ্চাৎ মহাতপা কণ্বমুনি কর্ত্তৃক পালিতা হইয়াছিলেন, ব্রহ্ম হরিদাস সেইরূপ শৈশবে পিতামাতা বিয়োগ জন্য,জনৈক যবন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পশ্চাৎ (নদীয়া জেলার অন্তর্গত) গঙ্গাতীরস্থ "ফুলিয়া গ্রাম" যে গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বসতি, আর সপ্তকাণ্ড রামায়ণ প্রণেতা পণ্ডিত কৃত্তিবাস বাস করিতেন, কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইবার কালে "হরিদাস" তথায় পর্ণকুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেন। এবং তত্রস্থ ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে শ্রীহরিদাসের অটল ভক্তি ছিল। তিনি শান্তিপুর স্বামী শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রতিদিবস তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যখন নীলাচলে, তখন হরিদাস শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকটে গমন করিয়া প্রভুর নিকটে থাকিতেন অন্য কোথাও যাইতেন না ; এবং হরিনাম নিয়ম ভঙ্গ করিতেন না। নির্জ্জনাশ্রমে থাকিয়া অহর্নিশি হরিনাম করিতেন। একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাসের মনোবৃত্তি জানিবার নিমিত্ত হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করেন ;" হরিদাস? শাস্ত্রে আছে যে,

"জগন্নাথমুখং দৃষ্ট্বা, পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে ॥"

জগন্নাথের মুখ দর্শন করিলে পুনঃজন্ম হয় না, সেরূপ সুগম পথ থাকিতে তুমি পুরীর মধ্যে প্রবেশ বা শ্রীজগন্নাথ দর্শন না কর কেন? হরিদাস উত্তর করিলেন ;—

"তোমাছাড়ি কাঁহা যাইতে মন নাহি লয়।
কিজানি যাইলে পাছে নিয়ম ভঙ্গ হয় ॥"

প্রভু! পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের শ্রীমুখ দর্শন করিবার আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্য দর্শনে আমার ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ হরিনাম নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অথবা তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে আমার মন অগ্রসর হয় না। কল্প-বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া অন্যত্র গমনে কোন ফল নাই,ফলেরও প্রত্যাশা নাই। যাঁহারা সে ফলের আকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে জগন্নাথ দর্শন করুন, আপনার শ্রীচরণ আমার একমাত্র আশ্রয়। মাধুর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে বহু ভেদ। কথায় আছে ; "আমতলায় থাকিলে যদি আম পাওয়া যায়, অন্য তলায় যাইবার দরকার কি?"

প্রভু হরিদাসের এই উত্তর শুনিয়া বলিলেন, সাধু! সাধু! সাধু! হরিদাস, তুমি যে নামই ব্রহ্ম বলিয়া সার করিয়াছ,ইহাতে তুমি ধন্য! ভগবদ্মূর্ত্তি দর্শন অপেক্ষা নামের ফল অধিক যথা ;—পদ্মপুরাণে ;—

"নামৈব পরমঃ ধর্ম্ম, নামৈব পরমন্তপঃ।"

ইহাতে সুস্পষ্ট বোধ হইবে (যবন বলিয়া নহে) শ্রীহরিদাস একমাত্র হরিনাম সার করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতেন না। ক্রমশঃ।

শ্রীহারাধন দত্ত ভক্তিনিধি।

ভীষ্ম।

বুঝিবা কাব্য-জগতে ভীষ্মের সমতুল্য চরিত্র আর নাই। প্রতিজ্ঞার অটল সিংহাসনে উপবিষ্ট, স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল কিরীটে সুশোভিত,জ্ঞানও বীরত্বের সমন্বয় স্বরূপ এতাদৃশ দেবচরিত্র আর কোথায় আছে? রামের পিতৃভক্তি ও কৃষ্ণের নিষ্কাম ধর্ম্ম,ভীষ্মের পিতৃভক্তি ও নিষ্কাম জীবনের নিকট ছার! বিপুল ঐশ্বর্য্যের পরিত্যাগ, প্রবল ইন্দ্রিয়ের সংযমন, দীর্ঘ জীবনের নিষ্কাম ভোগ, কাব্য-জগতের কি অতুল্য সৃষ্টি!!! যদি ধর্ম্মই কাব্য, তবে এই কাব্য-জীবনের উপাসনা কর না কেন?

উপাসনা করিবে কি? পৌরাণিক হিন্দু রত্ন চিনে কই? বসু-শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে ভস্মে সমাবৃত করিয়াছে! দেবোপম দেবব্রতকে নরাধমরূপে পরিণত করিয়াছে!

এই নিষ্কাম জীবন নাকি মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল? এই বীরশ্রেষ্ঠ ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠের জীবন নাকি অন্নসংগ্রহে অক্ষম হইয়া অধার্ম্মিক ও মহাপাপী দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল? শুন, ভীষ্মচরিতে রজনীকান্ত গুপ্ত বলিতেছেন কি! যথা—

"মানুষ অন্নের দাস। আমি যৌবনে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কুরুরাজের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি, এক্ষণে আমার বার্দ্ধক্যদশা উপস্থিত হইয়াছে। এতদিন যাঁহাদের অন্নে জীবন ধারণ করিলাম, এখন তাঁহাদের আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য। তোমরা ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ উভয় পক্ষই আমার সমক্ষে তুল্য। কিন্তু আমি ধৃতরাষ্ট্র তনয়ের অন্ন গ্রহণ করিতেছি, সুতরাং প্রতিপালক প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী না হইলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইব।"

ভীষ্মচরিত, ১৪০ পৃষ্ঠা।

আর এক মহাপ্রভু তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শিশু মহাভারতেও ঐ কথার রোমন্থন করিয়াছেন।

"কিন্তু কর্ণ ও ভীষ্ম প্রভৃতি সকলে এতদিন কুরুগণের নিকট জীবন ধারণ করিয়াছেন, এই জন্য কুরুপক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকাই তাঁহারা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া স্থির করিলেন।" শিশুমহাভারত ৭৬।৭৭ পৃষ্ঠা।

তবে এ সকল স্কুল-সাহিত্য; এবম্বিধ পৌরাণিক মাল আমদানি করাই এ সকল পুস্তকের পাস-মার্কা। দুরাদৃষ্টের কথা এই, রজনী বাবুর ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিতও এরূপ জিনিষের ফেরি করাই শ্লাঘ্য মনে করিতেছেন।

কেবল রজনী বাবু কেন,নবীন বাবুও কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মকে "পাপের আশ্রয় দাতা"বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"শিষ্য। মানিলাম দুর্য্যোধন পাপী দুর্ব্বিনীত;
কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ নৃপতি মণ্ডল?
ব্যাস। পাপের আশ্রয়দাতা অধর্ম্মে পতিত
জ্বালাইল সবে এই সমর-অনল।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, পঙ্গপাল মত
অসংখ্য বীরেন্দ্র বৃন্দ না হলে সহায়
হইত কি দুর্য্যোধন এই পাপে রত,
নদীস্রোতে রক্তস্রোত বহিত কি হায়?"

কুরুক্ষেত্রে—১ম সর্গ ৮ পৃঃ।

এ কথাগুলি কি নবীন বাবুর হৃদয়ের কথা? নবীন বাবুর ত রজনী বাবুর মত ফেরি করিবার আবশ্যক নাই। যাঁহার হৃদয়ে অতুল্য কবিত্ব, আর্ত্তের জন্য সহানুভূতি ও মহত্ত্বের সমাদর নিঃসন্দেহ বিদ্যমান, তিনি এই মহামহিম চরিত্রকে "পাপের আশ্রয় দাতা" কেন বলিলেন,তাহা বুঝিতে পারি নাই। এই নবীন বাবুই কৃষ্ণের মুখে ভীষ্মের কি মহিমা গান গাইয়াছেন, শুন;—

"কহিলেন কৃষ্ণ—আর্য্য! একি কথা হায়,
জগতে কাহাকে তবে করিব প্রণাম?
পবিত্র জীবন যার বীরত্বের গাথা,
জগতের ইতিহাসে রবে অতুলিত;

বীজ। যাহারা হিন্দু কি বুঝিতে পারে,তাহারা দুর্য্যোধন ও ভীষ্মকে চিনিতে পারে। আর যাহারা হিন্দুত্ব ও ব্রাহ্মণপ্রাধান্য এক পদার্থ বলিয়া ভ্রম করিতেছে, তাহাদের ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনকে চিনিবার উপায় নাই।

যে সময় কুরুপাঞ্চালে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, সে সময় ব্রাহ্মণপ্রাধান্য বদ্ধমূল; বর্ণভেদ প্রথা প্রধূমিত। ইতঃপূর্ব্বে অনার্য্যের ভয়ে আর্য্য ভীত। শত শত ঋকে ইহার প্রমাণ আছে। গাঙ্গ্য প্রদেশে অনার্য্য কতক পরিমাণে জিত। একটা কড়াকড়ি সমাজবন্ধন দ্বারা তাহাদিগকে নিস্তেজ করিবার সময় এই। এ সময়ে সেই গাঙ্গ্য প্রদেশে অনেক অনার্য্য আর্য্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে; অনেক আর্য্য অনার্য্যের সহিত পরিণীত হইয়া মিশ্রবর্ণ উৎপন্ন করিয়াছে। সমাজ বন্ধন দ্বারা আর্য্যানার্য্যের রক্তসংশ্রব নিয়মিত করার চেষ্টা করা হইল। যতদূর নির্ম্মমতা ও কৃপণতা জিতের প্রতি প্রদর্শন সম্ভব,এই সমাজবন্ধনের প্রস্তাবে তাহার কিছুই বাকী রাখা হইল না। যে সকল আর্য্য অনার্য্যকে কন্যা সম্প্রদান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকেও অবমানিত করা বিধেয় বোধ হইল। কিন্তু তদানীন্তন অনার্য্য ও আদি সঙ্করবর্ণ সকল একটুকু হীনপ্রভ হইলেও তাহাদের জাতীয় জীবন নির্ব্বাপিত হয় নাই। এখনকার অনার্য্য ও মিশ্রবর্ণ সকল যেমন ব্রাহ্মণপদলেহন সুস্বাদু মনে করিতেছে, তাহাদের সেই সুদূর পূর্ব্বপুরুষগণের রসনায় ইহা এত সুস্বাদু বোধ হইত না। কুইনাইনের স্বাদ তাহাদের জিহ্বায় কুইনাইনের মতই লাগিত, অভ্যস্ত জিহ্বায় যেরূপ মিষ্ট হয়,সেরূপ মিষ্ট বোধ হইত না। তাহারা সেই সমাজবন্ধনের দুরভিসন্ধি অনুষ্ঠানেই নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। অবিলম্বে সমস্ত প্রজাশক্তি দুর্য্যোধন-প্রমুখ মহাসমরে অগ্রসর হইল। এই মহাসমরই কুরুপাঞ্চাল সমর।

ভাবিয়া দেখ, যাহারা ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের বিরোধী, তাহারাই দুর্য্যোধন পক্ষ। মহারাজ দুর্য্যোধন কি কাহাকেও পৌরহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন? অনার্য্য পাণ্ডবগণ যেমন ধৌম্যকর্ত্তৃক স্ব ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণানুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন,দুর্য্যোধনের পক্ষে কেহই সেরূপ করেন নাই। মহারাজ দুর্য্যোধনের পক্ষ সেই বিশুদ্ধ হিন্দুত্বের দৃঢ়ভিত্তিতে দণ্ডায়মান। দৈব ও পৈতৃক কার্য্য যথারীতি করা হইত, পাশুপত যজ্ঞ করা হইত, কিন্তু আপনারাই করিতেন—পুরোহিতের আনুগত্য স্বীকার করিতেন না। আর্য্যকুলধুরন্ধর পিতামহ ভীষ্ম তাঁহাদের সহায়তা করিতেন। গাঙ্গ্যপ্রদেশে আর্য্যপ্রাধান্য স্থাপনে যে সকল কষ্ট ভোগ হইয়াছিল,অনার্য্যগণের সহিত মিশ্রণপ্রবৃত্তি প্রাচীন আর্য্যগণের যে সমীচীন নীতি ছিল,পিতামহের স্মৃতিতে তাহা তখনও জাগরূক ছিল। দুর্দ্ধর্ষ তেজস্বী অনার্য্যগণকে শত্রু রূপে দেখিলেও তাহাদের বিরুদ্ধতার ঔচিত্য বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন না। বরঞ্চ স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের জন্য তাহারা দলে দলে মরিতেছে দেখিয়া, তিনি তাহাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। এই আন্তরিক শ্রদ্ধা বশতঃ তিনি দুর্য্যোধন-প্রমুখ অনার্য্য পক্ষের সহায়তায় ব্রতী হইবেন, বিচিত্র কি?

কেবল এও নয়। ভীষ্মের বাল্য ও যৌবনকাল ব্রাহ্মণ্যের বিরোধী। এই গাঙ্গ্যআর্য্য কিছুমাত্র দ্বিধাচিত্ত না হইয়া কৈবর্ত্তকন্যাকে বিমাতা পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মৎস্যগন্ধা তাঁহার নমস্যা ছিলেন। সেই তেজস্বিনী অনার্য্য দুহিতা পরামর্শ দিয়া ভীষ্মকে পরিচালিত করিতেন। বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের

জন্য আর্য্য কাশীগণের রাজকন্যাত্রয় হরণ,এই তেজস্বিনী রমণীর সাহসক্রমেই হইয়াছিল। সেই কন্যাত্রয় মধ্যে জ্যেষ্ঠা অম্বার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিলে, মৎস্যগন্ধা তাহাকে পুত্রবধূ করিতে সম্মত হইলেন না। কন্যারত্নটী আপাততঃ সন্তুষ্টা হইয়া অভীষ্ট পতি শাম্বরাজের নিকট গমন করত, তাঁহার পাণি প্রার্থনা করিলেন। শাম্বরাজও তাঁহাকে গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন না। কতকগুলি ব্রাহ্মণ তখন তাহাকে পরামর্শ দিল "ভীষ্মই তোমার এই অবমাননার কারণ, অতএব তুমি পরশুরামের সহায়তা প্রার্থনা কর। সেই ব্রাহ্মণ ভীষ্মকে জব্দ করিবেন।" বলা বাহুল্য, এই রমণীরত্নের আহ্বানে পরশুরামে ও ভীষ্মে একটা যুদ্ধ হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের আশা পূর্ণ হইল না। পরশুরামই পরাজিত হইলেন। তৎপরে সেই কাশীরাজদুহিতা অম্বা ক্ষোভে ও দুঃখে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইনিই পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া দ্রুপদের গৃহে শিখণ্ডী হইয়া ভীষ্মের পরাভবকারী হইয়াছিলেন।

এই বিবরণ মহাভারতে অম্বোপাখ্যান নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে ভীষ্মকে ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে দেখা যাইতেছে এবং ভীষ্মের পরাভবকারক শিখণ্ডীকে ব্রাহ্মণের অনুগত দেখা যাইতেছে। সুতরাং ভীষ্মের অনার্য্যপক্ষে সহানুভূতি কেবল উদারতা নহে,কতক পরিমাণে স্বাভাবিক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এসময়ে সঙ্কর বা মিশ্রবর্ণের সংখ্যা নিতান্ত কম না হইতে পারে। ইহাদের ক্ষমতাও যে দেশীয়গণের ক্ষমতা অপেক্ষা কম ছিল, এরূপ ভাবিবার কারণ দেখা যায় না। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাঁহারা ভবিষ্যদ্দর্শী, তাঁহারা কুরুপক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে (১) দ্রোণ (২) কর্ণ (৩) বিদুর (৪) অশ্বত্থামা ও (৫) কৃপের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্রোণাচার্য্যকে সঙ্করবর্ণের মধ্যে ধরিবার কারণ দুইটী। (১)তিনি শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন; মহাভারতে ইহার প্রমাণ আছে। এই শ্যামবর্ণত্বই সঙ্করত্বের চিহ্ন। গৌরবর্ণ আর্য্য ও কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যের যোগেই শ্যামবর্ণের উদ্ভব। দ্রোণাচার্য্যের বর্ণ শ্যামল,তিনি সঙ্কর। (২) দ্রোণি অর্থাৎ ডোঙ্গা হইতে তাঁহার জন্ম এরূপ প্রবাদ দ্বারা তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রচ্ছন্ন করিবার সঙ্করত্ব ভিন্ন আর কি কারণ হইতে পারে? কর্ণ ব্রাত্যক্ষত্রিয়,বিদুর দাসীপুত্র,অশ্বত্থামা শৈব ও সঙ্করজ, কৃপ দ্রোণের কুটুম্ব। ইঁহাদের কাহারই বর্ণভেদের প্রস্তাবে শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। এ জন্য তাঁহারা সকলে দুর্য্যোধন পক্ষ।

পক্ষান্তরে পাঞ্চালেরা ব্রাহ্মণানুগত। এই যুদ্ধপ্রিয় জাতিই সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপনের মূল কারণ। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে ইহাদের যজ্ঞের বড় আড়ম্বরের কথা লেখা আছে। শস্যশালী ভূতলে আসিয়া পরের অর্থ অপহরণ করিয়া, বিস্তর পশুবধ করিয়া ইঁহারা যজ্ঞ সম্পাদনকে পানাহারের বিষয়ীভূত করিয়াছিলেন। এক শ্রেণী ব্যবসায়ী পুরোহিত ভিন্ন এবম্বিধ যজ্ঞাড়ম্বর যুদ্ধপ্রিয়লোকের সম্ভব হয় না। ইঁহারাই এক শ্রেণী ব্যবসায়ী পুরোহিতের সৃষ্টি করেন বা করিতে ইচ্ছা করেন। যখন ইহাতে বিরুদ্ধতা উপস্থিত হইল ও সমর আরম্ভ হইল, তখন পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রাহ্মণপক্ষে সেনাপতি হইলেন। অথর্ব্বাঙ্গিরসগণ দ্বারা উৎসাহিত হইয়া বিরাটেরা আসিয়া ইহাতে যোগ দিল। আর সেই কালাপাহাড় দলের ত কথাই নাই—স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ও আর্য্যধর্ম্মে ব্যাপ্তীকৃত পাণ্ডবেরা প্রাণপণে ব্রাহ্মণ্যের জন্য যুদ্ধ করিল। বর্ত্তমান মহাভারত হইতে কুরু-

ক্ষেত্র যুদ্ধের নৈতিক কারণ যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এতদ্ভিন্ন অন্যতর নহে।

আর্য্যবংশধরগণকে কুকার্য্যে রত দেখিয়া, অনার্য্যকে অপমান করিতে উদ্যত দেখিয়া, যেরূপ গভীর দুঃখে দেবব্রত ভীষ্ম অনার্য্যের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, নবীনচন্দ্রের অমর তুলিকায় রৈবতকে ও কুরুক্ষেত্রে একাধিক স্থানে সেইরূপ দুঃখের চিত্র পাওয়া যায়। সকল স্থান উদ্ধৃত করা অসম্ভব; একটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

"সেকি কথা?—কহে ভদ্রা মূর্চ্ছিতা আমায় পথে
পাইলে ভগিনি! তুমি যেতে কি ফেলিয়া?
একটী হরিণী হায়! এরূপে পড়িয়া পথে
দেখিলে কি, তব বুক পড়ে না ভাঙ্গিয়া?"
"পড়ে, কিন্তু আমি নারী অনার্য্যা আমার ছায়া
মাড়ালেও মহাপাপ হয় যে আর্য্যার!
পশু, পক্ষী, যেই দয়া, পায় আর্য্যদের কাছে,
আমরা অনার্য্যা নাহি পাই বিন্দু তার।
হায় নাথ! তুমি পিতা"—চাহি আকাশের পানে
কাতরে, করুণকণ্ঠে, কহে নাগবালা—
হায় নাথ! তুমি পিতা নহ কি অনার্য্যদের,
তবে কেন তাহাদের কপালে এ জ্বালা?
মানব তাহারা নহে, যদি নাথ! তবে কেন
একরূপ রক্ত মাংসে করিয়া সৃজন?
কেন বা হৃদয়ে দিলে, হৃদয়েতে দিলে প্রেম
প্রেমেতে নিরাশা দিলে গভীর এমন?"
দয়াময়ী সুভদ্রার দুই আঁখি ছল ছল;
অন্তরালে আঁখি ছল ছল নারায়ণ,
করুণার এ উচ্ছ্বাস, পরশি উভয় প্রাণ
কাঁদাইল একতান বীণার মতন।

কুরুক্ষেত্র, ৮ম সর্গ ১১১ পৃঃ।

অনার্য্যের দুঃখে এ গভীর উচ্ছ্বাস কি নবীন বাবুর? আমার বিবেচনায় নবীন বাবুর ভিতরে যে পরম পবিত্র কবিত্ব আছে, এ জিনিষটুকু সেই পবিত্র কবিত্বের নিজস্ব, কবির নহে। ইহা কবির জ্ঞানতঃ হইলে, তিনি ভীষ্মকে চিনিতেন; ভীষ্ম স্থানান্তরে

"পাপের আশ্রয় দাতা অধর্ম্মে পতিত"

এইরূপ কুৎসিত রঙে তৎকর্ত্তৃক চিত্রিত হইতেন না। ফলে যে গভীর দুঃখে ভদ্রার দুই চক্ষু "ছল ছল" হইয়াছিল, নারায়ণ অন্তরালে "ছল ছল আঁখি" হইয়াছিলেন, দেবব্রত নরহিতৈষী (নারায়ণ) ভীষ্ম সেই দুঃখেই দুর্য্যোধন পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনও পাপাত্মা নহে, প্রকৃত দেবতা; দেবব্রত-দেবতারও দেবতা।

যদি কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে চাও, তবে দুর্য্যোধন শত শত ভারতবাসী-প্রমুখ সুরেন্দ্রনাথ, ভীষ্ম হিউম। তবে বোধ হয় বিভিন্নতা এই, বর্ত্তমান যুদ্ধ বাক্‌যুদ্ধ, আর সেটি একটি প্রকৃত যুদ্ধ বৃত্তান্তের উপর একটি বাক্‌যুদ্ধের টপ্পর। শ্রীমধুসূদন সরকার।

মগধের পুরাতত্ত্ব।

মগধের ইতিহাসের সহিত গুপ্ত সম্রাটদিগের অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে, গুপ্তবংশের ইতিহাসের সহিত পরবর্ত্তী সময়ের আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাস সংসৃষ্ট।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে কাপ্তান ট্রয়ার (Captain A. Troyer) এলাহাবাদ-প্রস্তরস্তম্ভের লিপি আংশিক রূপে পাঠ করিতে করিতে, গুপ্ত বংশীয় চারিজন নরপতির নাম আবিষ্কৃত করেন। ইতিপূর্ব্বে এই প্রাচীন রাজবংশের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কেহ জানিত না। স্তম্ভলিপির

মর্ম্ম পাঠ করিয়া, তিনি চন্দ্রগুপ্ত, ঘজ্জকচ, চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত এই চারিটী নাম জনসমাজে প্রচারিত করেন। নামের সাদৃশ্য দৃষ্টে তিনি এই প্রস্তর লিপির প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত অভিন্ন কল্পনা করেন।

কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স (Sir William Jones), তাঁহার দশম সাংবার্ষিক বক্তৃতায় মগধের সম্রাট মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের নাম ও সময় নিশ্চিত রূপে নির্দ্ধারিত করিয়া, ভারতীয় পুরাতত্ত্বের কালনির্ণয় বিষয়ে মহোপকার সাধন করেন। সংস্কৃত পুরাণাদির অধ্যয়ন কালে তিনি চন্দ্রগুপ্তের নাম সর্ব্ব প্রথম জ্ঞাত হন। মুদ্রারাক্ষস নাটকে তিনি চন্দ্রগুপ্তের বলে ও কৌশলে রাজ্যাধিকারের বিবরণ অবগত হন। পাটলীপুত্র নগরে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই পাটলী পুত্র (বর্ত্তমান পাটনা) গঙ্গা ও শোণ নদের সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। গ্রীকরাজ সেলিউকাস এই চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া মেগাস্থিনিসকে আপনার দূতরূপে মগধের রাজধানীতে অবস্থিতি করিতে প্রেরণ করেন। মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত বা Sandracottas রাজার রাজধানী পালিবোথ্র গঙ্গা ও Erannoboas নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া স্বরচিত বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন। যদিও পাটলিপুত্র ও চন্দ্রগুপ্তের সহিত Palibothra ও Sandracottas নামের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে, তথাপি উহার অভিন্নতা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় নাই। D'anville নামে ফরাসী পণ্ডিত যমুনাকে গ্রীক দূতের লিখিত Erannoboas বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের ভ্রমজাল আরও বৃদ্ধি করেন। সার উইলিয়ম জোন্স একখানি প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থ পাঠে শোণ নদের প্রাচীন নাম "হিরণ্যবাহু" বলিয়া অবগত হন, ইহা হইতে তিনি পালিবোথ্র ও পাটলিপুত্রের এবং Sandracottas ও চন্দ্রগুপ্তের অভিন্নতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেন। কাপ্তান ফ্রান্সিস উইলফোর্ড (Captain Francis Wilford) এই আবিষ্ক্রিয়ায় সবিশেষ আস্থাবান হইয়া অবিলম্বে এই বিষয়ের আরও কতিপয় প্রমাণ প্রকাশ করেন। গ্রীক ঐতিহাসিক জাষ্টিনের (Justin) মতে দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের শাসনকর্ত্তাকে নিহত করিয়া খ্রীঃ পূর্ব্বতন ৩১৭ বর্ষে ভারতবর্ষের সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। সেলিউকাস নাইকেটর (Seleucus Nicator) বেবিলন গ্রহণ ও ব্যাকট্রিয়া পরাজয় করিয়া ভারতবর্ষের সীমান্তভাগে উপনীত হন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধিবন্ধন ও মিত্রতা স্থাপন করিয়া, তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দী এণ্টিগোনাসের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ৩১২খ্রীঃ পূর্ব্বতন অব্দে সিলিউকাস বেবিলনে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই বিবরণ হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ৩১৭ হইতে ৩১২ খ্রীঃ পূর্ব্বতন অব্দে (সম্ভবতঃ ৩১৬ খ্রীঃ পূঃ) আরম্ভ হয়। এইরূপে গ্রীস দেশের জ্ঞাত সময়ের সহিত ভারতবর্ষের সমসাময়িক ঘটনার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া, অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভারতীয় ইতিহাস আলোকিত হইতে থাকে। কল্পনার সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষীয় ঘটনাপুঞ্জ ইতিহাসের রাজ্যে আনীত হয়। চন্দ্রগুপ্তের কাল নির্ণয় দ্বারা মহাত্মা সার উইলিয়াম জোন্স ভারতীয় পুরাতত্ত্ব আলোচনার পথ সর্ব্ব প্রথম প্রদর্শন করিয়া, ভারতবাসী মাত্রেরই চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সুপণ্ডিত কাপ্তান ট্রয়ার ও জেমস্ প্রিন্সেপ সাহেবের আবিষ্কৃত ও এলাহাবাদ শিলাস্তম্ভলিপির

উল্লিখিত চন্দ্রগুপ্ত যে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা মগধ সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি, তাহা ডাক্তার মিল (Rev. Dr. A. H. Mill) অবিলম্বে ১৮৩৪ খ্রীঃ মে মাসে প্রদর্শন করেন। পুরাণের চন্দ্রগুপ্তকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এই চন্দ্রগুপ্ত সূর্য্যবংশীয় রাজা। মৌর্য্যবংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত শৈব বলিয়া বর্ণিত। শিলালিপির অক্ষর অপেক্ষাকৃত এত আধুনিক যে, তাহা খ্রীষ্টের পূর্ব্বতন চতুর্থ শতাব্দীর চন্দ্রগুপ্তের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। ডাক্তার মিল কাপ্তান ট্রয়ারের পঠিত প্রথম দুই রাজার নাম শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

বহুতর চেষ্টা করিয়াও ডাক্তার মিল ও জেম্‌স্ প্রিন্সেপ সাহেব নবাবিষ্কৃত গুপ্তবংশকে কোনও পৌরাণিক রাজবংশের বা মধ্যযুগের অসংখ্য রাজপুত বংশের সহিত সংযুক্ত করিতে পারিলেন না। ১৮৩৭ খ্রীঃ তাঁহারা উভয়ে ভিটারির প্রাচীন শিলালিপির মর্ম্মোদ্ধার করিয়া, গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়), কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের নাম আবিষ্কৃত করেন। এই তিনটী নূতন নাম আবিষ্কারের পর, ডাক্তার মিল ১৮৩৭ খ্রীঃ পুরাণে বর্ণিত মগধের গুপ্তবংশের সহিত শিলালিপির গুপ্তবংশের অভিন্নতা অনুমান করেন এবং গুপ্ত বংশের রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহার পূর্ব্ববৎসর পণ্ডিতকুলতিলক জেম্‌স্ প্রিন্সেপ এবংবিধ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ডাক্তার মিলের বিশেষ সাহায্য করেন, কিন্তু গুপ্তবংশের সময় পুরাণোক্ত কাল অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া শিলালিপির অক্ষর দৃষ্টে তাঁহার প্রতীতি জন্মে।

১৭৮৩ খ্রীঃ কলিকাতার নিকট হুগলী নদীর তটে কতিপয় প্রাচীন হিন্দুরাজগণের নামাঙ্কিত স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। তাহা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হয়। তাহার সহিত ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক অক্ষরে লিখিত 'ইণ্ডো-সাইথিয়ান' স্বর্ণমুদ্রার বিশেষ সাদৃশ্য ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল টড প্রথম প্রদর্শন করেন। ১৮২৫ খ্রীঃ অধ্যাপক উইলসন (H, H. Wilson) এবং ১৮৩৩ খ্রীঃ জেম্‌স্ প্রিন্সেপ, এবম্বিধ আরও কতিপয় স্বর্ণ মুদ্রার বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৩৪ খ্রীঃ ডাক্তর মিল ও প্রিন্সেপ সাহেব এলাহাবাদ প্রস্তরলিপির সহিত তাহাদের অক্ষর সাদৃশ্য অনুভব করিয়া, তাহাদের মর্ম্মোদ্ধার পূর্ব্বক ঘটোৎকচ, চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের নাম পর্য্যন্তও প্রকাশ করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ ভিটারীর প্রস্তরলিপির উল্লিখিত কুমার গুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া, শিলাস্তম্ভ ও স্বর্ণমুদ্রার উল্লিখিত গুপ্তবংশীয় নরপতিগণের অভিন্নতা প্রতিপাদন করেন। এই সকল সুবর্ণ মুদ্রার মধ্যে কোন কোনটীর পাঠ উদ্ধার করিয়া প্রিন্সেপ সাহেব মহেন্দ্রগুপ্তের নাম প্রাপ্ত হন। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ (E. Thomas, H. H. Wilson and Lassen) প্রিন্সেপের আবিষ্কৃত এই মহেন্দ্র গুপ্তকে প্রথম কুমারগুপ্ত হইতে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদেরা সকলেই একবাক্যে মহেন্দ্রকুমার গুপ্ত প্রথমের উপাধি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। প্রিন্সেপসাহেব গুপ্তবংশীয় যে ত্রয়োদশ জন রাজার নাম প্রকাশ করেন, পরবর্ত্তী গবেষণায় তাহা হইতে এবম্বিধ নামান্তর আরও নির্ণীত হইয়াছে, ডাক্তর বার্জেস ও জেনারেল কানিংহাম নর ও বক্র গুপ্ত নামে আরও দুইটী নূতন গুপ্ত নৃপতির নাম প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ ডাক্তর হরনলি (Dr.

R. Hœrnle) অনুমান করেন যে, বক্র গুপ্ত চন্দ্র গুপ্তেরই নামান্তর এবং ভ্রমক্রমে 'চন্দ্র' শব্দ 'বক্র' বলিয়া পঠিত হইয়া থাকিবে।

গুপ্তবংশের নৃপতিদিগের নামাঙ্কিত সুবর্ণ মুদ্রার সহিত যেমন ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক ও ভারতীয় ইণ্ডোসাইথিক রাজাদিগের নামাঙ্কিত মুদ্রার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়,সেইরূপ তাঁহাদের কতিপয় রৌপ্যমুদ্রায় সৌরাষ্ট্রের সত্রপ (ক্ষত্রপ) রাজাদিগের রৌপ্যমুদ্রার সাদৃশ্য দৃষ্টে ১৮৩৪—৩৫খ্রীঃ ডাক্তর মিল ও জেমস্ প্রিন্সেপ এই সকল মুদ্রাকে সৌরাষ্ট্রের সত্রপ রাজাদিগের রৌপ্যমুদ্রা বলিয়া প্রথমতঃ অনুমান করেন। মুদ্রালিপির অক্ষর পাঠে তাঁহারা পরবর্ত্তী গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়), কুমার গুপ্ত, স্কন্ধগুপ্ত ও বুধ গুপ্তের নাম প্রাপ্ত হইয়া, উহা যে গুপ্তবংশেরই রৌপ্যমুদ্রা, তাহা নির্দ্ধারিত করেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ টমাস(E.Thomas)গুপ্তবংশীয় যাবতীয় স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার বিবরণ একত্র সংগৃহীত করিয়া, এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া,আপনার পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দেন।

গুপ্ত সম্রাটদিগের নামাঙ্কিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বিষয়ক গবেষণায় ও আলোচনায় তাঁহাদের রাজত্বকালের সঙ্গে ২ তাঁহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃতির বিবরণ প্রকাশিত হয়। গুপ্তবংশ সূর্য্যবংশের শাখা হইতে উদ্ভূত এবং তাঁহাদের নামাঙ্কিত স্বুবর্ণ মুদ্রার অধিকাংশ প্রাচীন কনোজনগরীর ভগ্নাবশেষ মধ্যে পাওয়া যায়, এই দুই কারণে ডাক্তর মিল ১৮৩৪ খ্রীঃ কনোজ নগরীকে গুপ্তবংশের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুপণ্ডিত প্রিন্সেপ সাহেব ডাক্তর মিলের এই অভিমত গ্রহণ করেন। গুপ্ত বংশীয় নৃপতিদিগের রৌপ্য মুদ্রা সৌরাষ্ট্র ও উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত হইয়া,প্রিন্সেপ সাহেব পূর্ব্বে মগধ হইতে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহাদের রাজ্য বিস্তৃতির বিষয় প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী গবেষণায় প্রাচীন পাটলীপুত্রে তাঁহাদের রাজধানী অবস্থিত ছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য মৌর্য্যবংশীয় বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের শাসিত সাম্রাজ্য অপেক্ষা বড় ন্যূন ছিলনা বলিয়া অবধারিত হয়।

খ্রীষ্টের পূর্ব্বতন তৃতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের নামাঙ্কিত প্রস্তরলিপির পালী অক্ষর ও খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ কুটিলা অক্ষরের সহিত গুপ্তনরপতিদিগের নামাঙ্কিত স্তম্ভলিপি ও মুদ্রালিপির অক্ষরের তুলনা করিয়া, পণ্ডিতবর প্রিন্সেপ তৃতীয় ও চতুর্থ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্তবংশের আবির্ভাব কাল নির্দ্দেশ করেন। ভারতীয় শক(Indo-Scythic) নৃপতিদিগের স্বর্ণমুদ্রার এবং সৌরাষ্ট্রের সত্রপ ও বল্লভী বংশীয় ভূপতিদিগের নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রার সহিত গুপ্তবংশীয় সম্রাটদিগের নামাঙ্কিত স্বুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে,তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হনযে, গুপ্তবংশীয় আট জন নরপতি শক ও সত্রপ বংশের পরে এবং বল্লভীবংশের পূর্ব্বে প্রায় দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে রাজত্ব করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে টমাস সাহেব সৌরাষ্ট্রের সাহবংশীয় নরপতিগণের যে বিস্তীর্ণ বিবরণ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর ত্রৈমাসিক পত্রিকার দ্বাদশ ভাগে প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি গুপ্তবংশের তিরোভাব কাল ৩১৯খ্রীঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং আরবীয় ঐতিহাসিক আবুরিহান আলবিরুণিকে তাঁহার উক্তির প্রমাণ স্বরূপে নির্দ্দেশ করেন। জেনেরল ক্যানিংহাম ও জেমস ফারগুসন সাহেব গুপ্ত বংশের রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম

কি ষষ্ঠ শতাব্দী নির্দ্দেশ করিয়া, তাঁহাদিগকে বল্লভীবংশের সমসাময়িক অনুমান করেন।

গুপ্তাব্দের আরম্ভকাল সম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। গুপ্তাব্দের ৯৩ বৎসরে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নামাঙ্কিত প্রস্তরলিপি ১৮৩৭ খ্রীঃপ্রিন্সেফ সাহেব কর্ত্তৃক সাঞ্চীর স্তূপে আবিষ্কৃতহয়। ১৮৩৮খ্রীঃতিনি এরাণের প্রস্তর লিপিতে ১৬৫ গুপ্তাব্দে বুধগুপ্তের নাম অঙ্কিত দেখিতে পান এবং কুহাওনের শিলা-লিপিতে স্কন্ধগুপ্তের মৃত্যুর পরবর্ত্তী ১৩৩ অব্দ পাঠ করেন। ডাক্তর হল(Fitz Edward Hall)১৮৬১ খ্রীঃপূর্ব্বোক্ত বুধগুপ্তের অব্দকে সংবতাব্দ ও ১৩৩ কে১৪১ অব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১৮৭৪খ্রীঃডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র শেষোক্ত সনকে১৪১গুপ্তাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ১৪৬ গুপ্তাব্দে খোদিত স্কন্ধগুপ্তের নামাঙ্কিত লিপি প্রকাশ করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ ডাক্তর হল১৫৬ ও ১৬৩ গুপ্তাব্দে খোদিত দুইখানি হস্তীরাজার শাসন লিপি প্রকাশ করেন। ডাক্তর মিত্র এবং মাননীয় বেইলী (E. C. Bayley) সাহেব গুপ্তাব্দকে শকাব্দ হইতে অভিন্ন অনুমান করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ জেনেরল কানিংহাম প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের কাল১৮৬৬খ্রীঃনির্দ্দেশ করিয়া তাহাই গুপ্তাব্দের আরম্ভকাল অবধারণ করেন।

১৮৮৪ খ্রীঃ বোম্বের সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর মহোদয় স্বরচিত 'দক্ষিণাপথের প্রাচীন ইতিহাস' (Early History of Deccan) নামক ক্ষুদ্রকায় উৎকৃষ্ট ও বহু গবেষণা পূর্ণ পুস্তকে শকাব্দের ২৪১অব্দে গুপ্তাব্দের আরম্ভ কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই গণনা হইতে তিনি ৩১৯খ্রীঃ গুপ্তাব্দের আরম্ভ কাল বলিয়া বহুতর যুক্তি প্রমাণের অবতারণা দ্বারা প্রতিপাদিত করেন। তাঁহার মত অতঃপর প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ ফ্লীট ও হারনলি সাহেব গ্রহণ করিয়াছেন। গুপ্ত সম্রাটদিগের সম্বন্ধে স্বসংগৃহীত সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থে(Corpus Inscriptionarum Indicarum, Vol.III) ফ্লীট সাহেব ৩১৯খ্রীষ্টাব্দকে গুপ্তাব্দের আরম্ভকাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

অধ্যাপক রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর শকাব্দ যে মহারাজ কনিষ্কের প্রবর্ত্তিত অব্দ, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শন করেন। গুপ্তাব্দের সহিত শকাব্দের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বিধায়, আমরা এস্থলে শকাব্দের প্রচলন সম্বন্ধে বিস্তীর্ণভাবে আলোচনা করিব।

(শকাব্দ।)

গ্রীক ভূগোলবিৎ টলেমি (১৫১-১৬৩খ্রীঃ)শক জাতির খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিন্ধু দেশে ও রাজপুতানায় প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। উজ্জয়িনীর শকরাজা চষ্টনের নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। চষ্টনের পর তাঁহার পুত্র জয়দামন ও পৌত্র রুদ্রদামন দক্ষিণাপথের অপরান্ত (উত্তর কঙ্কণ) পর্য্যন্ত শকবংশের আধিপত্য বিস্তারিত করেন। সাতবাহন বংশীয় মহাপরাক্রান্ত রাজা গোতমীপুত্র শতকর্ণিকে (১৩৩-১৫৪) দুই বার পরাজিত করিয়া রুদ্রদামন মহাক্ষত্র বা (মহাসত্রপ) উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র রুদ্রসিংহের নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা কাঠিয়াবারে (গুজরাট) পাওয়া গিয়াছে। গুজরাটের মহাপরাক্রান্ত সত্রপ (ক্ষত্রপ) বংশীয় সম্রাটগণ উজ্জয়িনীর ক্ষত্রবংশের সহিত ঘনিষ্টসম্বন্ধে সম্পর্কিত বলিয়া অনুমিত হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত সত্রপবংশ গুজরাট ও উত্তর ভারতে রাজত্ব করেন। মগধ ও মিথিলা পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত থাকা অসম্ভব নহে।

এই শক বংশীয় নহপান অন্ধ্রভৃত্য-বংশীয়

এক অজ্ঞাত নামা সম্রাটকে পরাজিত করিয়া প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পর্য্যন্ত দক্ষিণাপথে রাজত্ব করেন। অধ্যাপক ভণ্ডারকরের মতে তিনি অনুমান ৭৮—১২৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ৪৬ বৎসর কাল জুনার নগরে রাজত্ব করেন। বাৎস্য-গোত্রজ ব্রাহ্মণ জাতীয় "অয়ম" তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। দীনীকের পুত্র উষাবদাত ক্ষরাট্ নহপানের তনয়া দখামিত্রাকে বিবাহ করেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি ১৩৩খ্রীঃ পর্য্যন্ত সাত বৎসরকাল সাম্রাজ্যশাসন করেন। নহপান ও উষাবদাতের নামাঙ্কিত কয়েকখণ্ড শাসনলিপি হইতে অধ্যাপক ভণ্ডারকর এই সকল নাম ও বিবরণ সংগৃহীত করিয়া স্বরচিত "Early History of Deccan" নামক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। শক জাতীয় সর্ব্ব-প্রধান নরপতির দ্বারা শকাব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। সাতবাহনবংশীয় সম্রাটদিগের আধিপত্য প্রতি-ষ্ঠার শতবর্ষের মধ্যে যে বৈদেশিক শক রাজা তাঁহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া,শকসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন,তিনি অবশ্যই অসামান্য পুরুষ ছিলেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের কাল হইতে শকাব্দের আরম্ভ হয়, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দক্ষিণাপথের বহুতর তাম্রশাসনে 'শক-নৃপকাল' বা 'শককাল' বলিয়া এই অব্দ বর্ণিত হয়। পরে কালক্রমে 'শকে' বা 'শাকে' শব্দ প্রচলিত হয়,এবং শালিবাহন এই শকা-ব্দের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ভ্রান্তজনপ্রবাদ প্রচা-রিত হয়। "শালিবাহন শক" পদের কোনও অর্থ নাই। কারণ এই পদ দ্বারা সাতবাহন (শালিবাহন) ও শক এই দুই রাজবংশ মাত্র নির্দ্দেশ করে। সম্ভবতঃ শক জাতীয় সত্রপ ক্ষরাট্ (ক্ষত্রপ সম্রাট্) নহপানের দ্বারা জুনার নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠার সময় হইতে 'শক-নৃপকালের' গণনা আরম্ভ হয়। ৭৮-১৪৬খ্রীঃ পর্য্যন্ত ৪৬ বৎসরকাল শকরাজ নহপান জুন্নারে রাজত্ব করেন। অধ্যাপক ভণ্ডারকর কাশ্মী-রের সম্রাট কনিষ্ককে শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সম্মত নহেন।

অধ্যাপক ভণ্ডারকর এই সম্পর্কে যে চারিটী কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ১২৯৮ সালের শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে (নবম খণ্ড,২২২ পৃষ্ঠা) শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যা-পক ভণ্ডারকরের"দক্ষিণাপথের প্রাচীন ইতি-হাস" বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া, আমি পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং কনিষ্ক দ্বারা শকাব্দ প্রব-র্ত্তিত হয় নাই, এই মত গ্রহণ করিয়াছি। আমার মত পরিবর্ত্তনের কারণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা অনাবশ্যকীয় বোধ হইবে না।

(১) শকাব্দ পৈঠান বা প্রতিষ্ঠান নগরের অধিপতি শালিবাহন উজ্জয়িনীর মহারাজা বিক্রমাদিত্যকে পরাজিত করিয়া শকাব্দ প্রতি ষ্ঠিত করেন, এই জনপ্রবাদ দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। এই জন-প্রবাদের মূলে এই সত্য নিহিত আছে যে, শকাব্দ দক্ষিণাপথ হইতে উত্তর ভারতে বা আর্য্যাবর্ত্তে কালক্রমে প্রচলিত হয়। ডাক্তার বার্জ্জেস ও ফ্লিট্ সাহেবের গবেষণায় দক্ষিণা-পথের ৯৭ খানি প্রাচীন শাসনলিপিতে শকা-ব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর্য্যা-বর্ত্তের প্রাচীনতম শাসনপত্রে শকাব্দের বিরল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সংবতাব্দ, গুপ্তাব্দ ও হর্ষাব্দ আর্য্যাবর্ত্তে অধিকতর প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। দক্ষিণাপথের সর্ব্বত্র অতি প্রাচীনকাল হইতেই শকাব্দ প্রচলিত হয়, গুজরাটের মহাপরাক্রান্ত 'সত্রপ' বংশীয় সম্রাট-গণ পর্য্যন্ত এই শকাব্দ ব্যবহৃত করিতে থাকেন।

ক্রমে ক্রমে তাহা আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতে থাকে।

(২) শালিবাহন নামে কোনও নরপতি দক্ষিণাপথে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বহুতর শাসনলিপিতে অন্ধ্রভৃত্যবংশই 'সাতবাহন' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। সাতবাহন বংশের এক শাখা মহারাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। মহারাজ পুলুমায়ী ১৩০-১৫৪খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠান নগরে এবং ১৫৪-৫৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তৈলঙ্গ দেশে ধনকটক (ধরণীকোট) নগরে রাজত্ব করেন। তিনি গোতমীপুত্র শতকর্ণির পুত্র। পুলুমায়ী ও তাঁহার পিতা শতকর্ণি উজ্জয়িনীর শক অধিপতি চষ্টন ও তাঁহার পুত্র জয়দামন ও পৌত্র রুদ্রদামনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া শকদিগের হস্ত হইতে সাম্রাজ্যের উদ্ধার সাধন করেন। এই পুলোমায়ী সাতবাহনই কিংবদন্তীর শালিবাহন বলিয়া অনুমিত হয়। গোতমী পুত্র শতকর্ণি শকবংশীয় ক্ষরাট্ নহপান বা তাঁহার উত্তরাধিকারী ও জামাতা ঊষাবদাতকে পরাজিত করিয়া, প্রায় ৫৩ বৎসর রাজ্যচ্যুতির পর অন্ধ্রভৃত্য (সাতবাহন) বংশের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অন্ধ্রভৃত্য সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যখন বর্ত্তমান গণ্টুর জিলায় ধনকটক নগরে (১৩৩-১৫৪ খ্রীঃ) রাজত্ব করিতে থাকেন, সেই সময়ে তাঁহার পুত্র পুলুমায়ী নবনূর নগর হইতে মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমস্থ প্রদেশের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হন। দক্ষিণাপথ হইতে শকজাতির আধিপত্য উন্মূলিত করিয়া, শতকর্ণি উজ্জয়িনীর শকাধিপতি জয়দামনকে আক্রমণ করেন। জয়দামন শতকর্ণির দ্বারা পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হয়। অবন্তী (মালব) ও সুরাষ্ট্র (গুজরাট) পর্য্যন্ত শতকর্ণির একাধিপত্য বিস্তৃত হয়। ইহাই কিংবদন্তীতে শালিবাহন কর্ত্তৃক উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের পরাজয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, জয়দামনের পুত্র রুদ্রদামন অনুমান ১৪৯ খ্রীঃ গোতমী পুত্র শতকর্ণিকে দুইবার পরাজিত করিয়া শকসাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া, মহাক্ষত্রপ উপাধি গ্রহণ করেন।

(৩) নাসিকের এক গুহায় ক্ষরাট্ নহপানের জামাতা ঊষাবদাতের চারি খানি শাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে শকরাজ ঊষাবদাতকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। শকাদি বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীদিগের সহিত কালক্রমে সংমিশ্রিত হইয়া উঠে। শকাব্দের প্রবর্ত্তক ক্ষরাট্ নহপানও সম্ভবতঃ সম্রাট কনিষ্কের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

(৪) গজনীর সুলতান মামুদের সহচর আরব-ইতিহাস-লেখক এলবিরুণীর নির্দ্দেশ মতে ২৪১ শকাব্দে গুপ্তাব্দ আরম্ভ হয় এবং বল্লভী সম্রাটগণ এই গুপ্তাব্দ গুজরাটে প্রচলিত করেন। গুপ্ত সম্রাটদিগের আধিপত্য লোপের সময় হইতে গুপ্তাব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এলবিরুণীর এই উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। রাজ্যাভিষেকের কাল হইতে সচরাচর অব্দগণনার আরম্ভ হয়। রাজ্যচ্যুতির সময় হইতে অব্দগণনা ইতিহাসে কুত্রাপি দেখা যায় না। কর্ণেল টড্ সোমনাথে যে শাসনলিপি প্রাপ্ত হন, তাহাতে ২৪২ শকাব্দ বল্লভী অব্দের প্রারম্ভ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বল্লভীরা গুপ্তবংশের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া পরে স্বাধীন হয়। ২৪১ শকাব্দ (৩১৯ খ্রীঃ) গুপ্তাব্দ ও বল্লভী অব্দের আরম্ভ কাল এই

বিষয়ে সংশয় নাই। ফ্লীট,ভণ্ডারকর,হারনলি, স্মিথ,হাণ্টার ও বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের এই মত সুযুক্তিপূর্ণ ও সুসঙ্গত। গুজরাটের সত্রপ-সম্রাটগণ শকাব্দের ব্যবহার করিতেন। গুপ্ত-বংশীয় চন্দ্রগুপ্ত (১) সত্রপদিগকে পরাজিত করিয়া সমগ্রআর্য্যাবর্ত্তে গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সত্রপদিগের নামাঙ্কিত রৌপ্য-মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রা সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচলিত করেন।

(৫) গুপ্ত সম্রাটদিগের নামাঙ্কিত স্বর্ণ-মুদ্রার সহিত মহারাজ কনিষ্কের স্বর্ণমুদ্রার এতদূর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় যে,তিনি গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার শতবর্ষের অধিকতর পূর্ব্বতন বলিয়া বোধ হয় না। কাশ্মীররাজ কনিষ্ক, হুবিষ্ক (হুষ্ক) ও বাসুদেবের রাজত্বকাল শতবর্ষের অধিক স্থায়ী ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কোনও কারণ পাওয়া যায় না।

(৬) তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে,শকরাজ কনিষ্ক বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির ৪০০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। নাইসার গ্রীকরাজ হার্ম্মিয়া-স্কে পরাভূত করিয়া ক্যাডফাইসিস্ যে শক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার রাজধানী কাবুল নগরে অবস্থিত ছিল। কাবুলে ক্যাড-ফাইসিসের সমাধিস্তম্ভ ডাক্তর মার্টিন হোনি-গ্বার্জ্জার দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। কনিষ্ক এই বংশের দ্বিতীয় সম্রাট। তিনি বংশের প্রতি-ষ্ঠাতা নহেন। তাঁহার সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে মথুরা ও বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি শকাব্দের প্রবর্ত্তক হইলে, কাবুল, কাশ্মীর, পঞ্জাবাদি প্রদেশে তাঁহার প্রবর্ত্তিত অব্দের নিদর্শন সূচক বহুতর শাসন-পত্র ও মুদ্রাদি পাওয়া যাইত। প্রকৃত প্রস্তাবে দক্ষিণাপথেই শকাব্দাঙ্কিত বহুতর তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণাপথে বৌদ্ধ সম্রাট কনিষ্কের রাজ্য কস্মিন্‌কালেও বিস্তৃত হয় নাই। তিব্বতীয় জনপ্রবাদ কনি-ষ্ককে শকাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করে নাই; বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের৪০০বৎসর পরে কনিষ্ক আবির্ভূত হইয়া শকাব্দ প্রবর্ত্তিত করেন, খ্রীঃপূঃ ৭৮ অব্দে শকাব্দের আরম্ভ গণনা হইল। কিন্তু ৭৮খ্রীঃ শকাব্দের প্রতিষ্ঠাকাল বলিয়া যে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার বিশেষ কিছু মূল আছে বলিয়াও বোধ হয় না। বৃহন্নাটক ও বৃহৎসং-হিতার টীকাকার ভট্ট উৎপল বিক্রমাদিত্যকে শকাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য প্রণীত "করণ কুতূহল" গ্রন্থের ৪০০ বৎসরেরও অধিক প্রাচীন একখানি হস্তলিখিত টীকায় টীকাকার সোধল লিখিয়া-ছেন যে 'শক নামক ম্লেচ্ছদিগকে পরাজিত করিয়া বিক্রমাদিত্য শকাব্দ প্রচলিত করেন'। এই উক্তির ন্যায় তিব্বতীয় জনপ্রবাদও অমূ-লক বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধ দেবের (৪৭৮+৭৮) ৫৫৬ বৎসর পরে কনিষ্কের রাজ্যারম্ভ কাল গৃহীত হইলে তিব্বতীয় জনপ্রবাদ অনু-সারে তাঁহার ৪০০ বৎসর পরে। কনিষ্কের অবির্ভাব সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক হইয়া উঠে।

(৭) বিজাপুর জিলার অন্তর্গত বাদামীর গুহালিপিতে চালুক্যরাজ মঙ্গলীশের নাম অঙ্কিত আছে (Indian antiquary III. 305.) এবং ৫০০ শকাব্দে তাহা লিখিত হয় বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। শকাব্দ শক নৃপতির রাজ্যাভিষেককাল। "শক নৃপকাল সংবৎসরে" "শক নৃপতি সংবৎসরে-ষ্বতিক্রান্তেষু পঞ্চসু শতেষু" বলিয়া বর্ণিত হই য়াছে। রবিকীর্ত্তির নামাঙ্কিত ঐহোলির শাসনলিপি ৫৫৬ 'শক নৃপকালে' লিখিত হয়। উহাতে মহাকবি কালিদাসের নাম উল্লিখিত

হইয়াছে (Indian antiquary VIII. 243) খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ বরাহমিহির শকাব্দকে 'শকভূপকাল' ও 'শকেন্দ্র কাল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। একাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য্য স্বরচিত গোলাধ্যায়ে শক নৃপ সময়ের ১০৩৬ বৎসরে নিজের জন্ম হয় বলিয়া(রসগুণ পূর্ণ মহীসম শকনৃপ সময়ে ভবন্মমোৎপত্তিঃ) লিখিয়াছেন। আধুনিক কালের বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকাতে 'শকনৃপতের-তীতাব্দ' লিখিত দেখা যায়। শকাব্দ অতি প্রাচীনকাল হইতে কনিষ্কের অনধিকৃত দক্ষিণাপথে প্রচলিত ছিল, ইহা হইতে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে।

(৮) মহারাজ কনিষ্কের নামাঙ্কিত শাসন লিপিতে বৌদ্ধরাজ কনিষ্ক কোনও অব্দ প্রবর্ত্তক বলিয়া বর্ণিত হন নাই। ১৮৭০ খ্রীঃ মেজর ষ্টাবস (Major Stubbs R.A.) বহাবলপুরের ১৬ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বস্থিত 'সুবিহার'নামক স্থানের গুম্বজযুক্ত গোলাকার গৃহে (tower) কনিষ্কের নামাঙ্কিত যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত করেন, তাহার অক্ষর খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর বা গুপ্তবংশের স্তম্ভলিপির অপেক্ষা অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। এই শাসনপত্র চারিপংক্তিতে কনিষ্কের রাজত্বের একাদশবৎসরে সম্ভবতঃ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়। উহার প্রথম পংক্তিতে "মহারাজস্য রাজতিরাজস্য দেবপুত্রস্য কনিষ্কস্য সংবৎসরে একাদশে ১১" লিখিত রহিয়াছে।

কনিষ্কের নামাঙ্কিত শাসনপত্রে তিনি শক নৃপতি বা শকাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন নাই। তিনি যে আপনার রাজ্যাভিষেকের কাল হইতে কোনও অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাও বোধ হয় না। তিনি কোনও অব্দের প্রবর্ত্তক হইলে, তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী শক নৃপতি হুবিষ্ক (হুষ্ক বা হুয়ার্কি) ও বাসুদেবের শাসনপত্রে উহার বিশেষ উল্লেখ অবশ্যই থাকিত। কিন্তু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৭০ খ্রীঃ মথুরা হইতে আনীত যে তিনখানি সংস্কৃত শাসনপত্রের বিবরণ ও প্রতিলিপি প্রকাশ করেন, তাহাতে শকাব্দ বা কনিষ্কাব্দের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। হুবিষ্ক ও বাসুদেবের পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কনিষ্ক আবির্ভূত হন বলিয়া অনুমিত হয়।

(ক)"সং ৫৯দি ৪০ মহারাজস্য রাজতিরাজস্য দেবপুত্রস্য হুবিষ্কস্য বিহারে দানং ভিক্ষু জীবকস্য উদিয়নকস্য"

(খ) "মহারাজস্য রাজাতিরাজস্য দেবপুত্রস্য বাসুদেবস্য সংবৎসরে ৪৪ বর্ষে ম...স প্রথম দিবসে।"

(৯) মথুরার তৃতীয়খণ্ড শাসন লিপিতে শকাব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে (দানংসকে ১৪০ বুধমিহিরস্য সিংহপুত্র)। ২১৮ খ্রীঃ (১৪০শকাব্দে) লিখিত লিপির সহিত হুবিষ্ক ও বাসুদেবের নামাঙ্কিত শাসন পত্রের বিলক্ষণ অক্ষর সাদৃশ্য আছে। কনিষ্কের নামাঙ্কিত শাসনলিপির অক্ষর কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ও পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বোক্ত দুই শাসনলিপি হইতে হুবিষ্ক ও বাসুদেব খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে যথাক্রমে অন্ততঃ ৫৯ ও ৪৪ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে। অথচ রাজতরঙ্গিনীতে কনিষ্ক, হুষ্ক ও বাসুদেব এই তিন ভ্রাতার রাজত্বকাল ৬০ বৎসর মাত্র নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া সুপণ্ডিত বেইলি সাহেব (E. C. Bayley) ১৮৬২ খ্রীঃ কর্ণেল কানিংহামের মত প্রকাশ করেন। পুরাতত্ত্ববিৎ কানিংহাম হুবিষ্কের নামাঙ্কিত শাসনলিপির অঙ্কে ৪৩১ এবং বাসুদেবের শাসনপত্রে ৪০১ দেখিতে পান। ডাক্তার মিত্রের নির্দ্দেশই অধিক সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে।

এই সকল কারণে কনিষ্ক যে শকাব্দের প্রবর্ত্তক নহেন, এই সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ বা তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইতেছে। দক্ষিণাপথ হইতে শকাব্দের প্রচলন আরম্ভ হইয়া, কালক্রমে আর্য্যাবর্ত্তে প্রবর্ত্তিত হয়। মহাপরাক্রান্ত অন্ধ্রভৃত্য (সাতবাহন) সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া, যিনি ৫৩ বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে তাহা শাসন করেন, সেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ক্ষরাট্ নহপ্রানই শকাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া অনুমিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ৭৮ অব্দে শকাব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৪১ শকাব্দে (৩১৯ খ্রীঃ) গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্ত আবির্ভূত হন। শ্রীগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের কাল হইতে (৩১৯ খ্রীঃ) গুপ্তাব্দের কাল গণনা আরম্ভ হয়। শ্রীগুপ্ত ও তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচের সময়ে গুপ্তসাম্রাজ্য সবিশেষ সমৃদ্ধ ও পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। শকবংশীয় সত্রপ সম্রাটদিগের শেষ সম্রাটকে পরাভূত করিয়া শ্রীগুপ্তের পৌত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুজরাট পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে মহাপরাক্রান্ত গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সত্রপ সম্রাটদিগের রাজত্বকালে গুজরাটে শকাব্দ প্রচলিত ছিল। ৩০৪ শকাব্দের পরবর্ত্তী কোন শাসনলিপি বা মুদ্রায় সত্রপদিগের উল্লেখ দেখা যায় না। অতএব ৩৮২ খ্রীঃ বা তৎসন্নিহিত কালে চন্দ্রগুপ্ত সত্রপদিগের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত করিয়া গুপ্তসাম্রাজ্যের সীমা সবিশেষ পরিবর্দ্ধিত করেন।

গুপ্তসাম্রাজ্য মগধেই প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া অনুমান হয়। ক্রমে ক্রমে তাহা পশ্চিমে গুর্জ্জর ও মালব এবং পূর্ব্বভাগে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। বিষ্ণু পুরাণের মতে মগধের গুপ্তগণের রাজ্য গঙ্গার উপকূলভাগে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বায়ুপুরাণ বিষ্ণুপুরাণের অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পণ্ডিতবর রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং স্বমতের পরিপোষক নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বায়ুপুরাণের মতে সাকেত (অযোধ্যা) গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মগধের প্রধান নগরী পাটলিপুত্রই গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রধান রাজধানী ছিল। গ্রাণ্ট (A. Grant) সাহেব অযোধ্যা হইতে গুপ্ত সম্রাটদিগের যে সকল স্বর্ণমুদ্রা আহরণ করেন, তাহার অধিকাংশই প্রাচীন সাকেত (ফৈজাবাদের নিকটবর্ত্তী অযোধ্যা) নগরের নিকট প্রাপ্ত হন। হুপার (Hooper) সাহেব অযোধ্যার পূর্ব্বভাগ হইতে অনেক গুপ্তমুদ্রা সংগ্রহ করেন। এতদ্দ্বারা বায়ু পুরাণের ঐতিহাসিক সত্য নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

বহুতর যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া সুপণ্ডিত ভিনসেণ্ট স্মিথ (A. V. Smith) সাহেব ১৮৮৪ খ্রীঃ কনোজের পরিবর্ত্তে পাটলীপুত্র নগরকেই গুপ্তদিগের প্রধান রাজধানী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কনোজ, বারাণসী ও এলাহাবাদ গুপ্তসম্রাটদিগের অধিকৃত প্রধান নগরী মধ্যে পরিগণিত ছিল। কনোজ নগরে কনোলি (Lieut. Conolly) কর্ত্তৃক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। এই মুদ্রালিপির পাঠ হইতেই পণ্ডিতকুলচূড়ামণি জেমস্ প্রিন্সেপ বহুতর গুপ্তমুদ্রার মর্ম্ম উদ্ধার করেন। গুপ্তসম্রাটদিগের ৩৭টী মুদ্রার মর্ম্ম প্রিন্সেপ সাহেব উদ্ধার করেন। তন্মধ্যে ৩টী মাত্র কনোজ নগরে পাওয়া যায়। গুপ্তমুদ্রায় গ্রীক ও মুসলমান নৃপতিদিগের মুদ্রার ন্যায় মুদ্রাপ্রস্তুতের স্থান বা টাঁকশালের নাম দেখা যায় না। মুদ্রাবিষ্কৃতির স্থানের দ্বারা তাঁহাদের

সাম্রাজ্যের সীমা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হইতে পারে।

কনোজ নগরী গুপ্ত সম্রাটদিগের রাজধানী থাকিলে তথায় তাঁহাদের নামাঙ্কিত বহুতর স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা কি তাম্র মুদ্রা অবশ্যই আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু ৬টীর অধিক স্বর্ণমুদ্রা কনোজ নগরে পাওয়া যায় নাই। কনোজের পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিমে ১০ টী স্বর্ণমুদ্রা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। কনোজের পূর্ব্বভাগে অন্যূন ৬৯০টী স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কনোজের পূর্ব্বভাগে গুপ্ত সম্রাটদিগের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। আফগানিস্থান ও পঞ্জাবে বহুতর শকনৃপতিদিগের নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু একটীও গুপ্তমুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা হইতে অনুমান হইতেছে যে, পঞ্জাবে গুপ্তদিগের অধিকার বিস্তৃত হয় নাই।

যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন, তখন ১৭২টী স্বর্ণমুদ্রা (gold darics) বারাণসীতে আবিষ্কৃত হইয়া বিলাতে ডিরেক্টর সভার নিকট প্রেরিত হয়। ঐ সকল মুদ্রা টাঁকশালে দ্রবীভূত হইয়া চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। এই সকল গুপ্তমুদ্রা বলিয়া অনুমিত হয। ১৭৮৩খ্রীঃ হুগলীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী কলিকাতার সন্নিহিত কালীঘাটে ২০০ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। তাহা টাকশালে বিনষ্ট না হইয়া, ব্রিটিস মিউজিয়মাদি স্থানে রক্ষিত ও বিতরিত হয়। তাহা নিকৃষ্ট ধাতুদ্বারা নির্ম্মিত হইলেও, গুপ্তমুদ্রা বটে। ১৮৩৮ খ্রীঃ ট্রেগিয়ার (Tregear) সাহেব জোয়ানপুরের সন্নিহিত "জয়চন্দ্রের মহল" নামক পুরাতন স্থানে কয়েকটী গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। ১৮৫১ খ্রীঃ বারাণসীর ১২ মাইল দূরবর্ত্তী ভরসর নামক প্রাচীন গ্রামে বহুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা মেজর কিটোর(Major M. Kittoe) যত্নে আবিষ্কৃত হয়। সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত (১) মহেন্দ্র, স্কন্ধগুপ্ত ও প্রকাশাদিত্যের নামাঙ্কিত ৩২টী মুদ্রার বিবরণ মেজর কিটো প্রকাশ করেন। ১৮৫২খ্রীঃ যশোহর জিলার অন্তর্গত মহম্মদপুরে অরুণখালী নদীর তীরে গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (২) কুমারগুপ্ত (১) এবং স্কন্ধগুপ্তের নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রার সহিত কিরণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্কগুপ্তদেবের (অনুমান ৬০০ খ্রীঃ) এক রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। ১৮৫৪ খ্রীঃ গোরখপুর জিলায় সরযূর তীরবর্ত্তী গোপালপুর গ্রামে ২০টী গুপ্ত সম্রাটদিগের স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। অনুমান ১৮৬৪ খ্রীঃ প্রথম কুমারগুপ্তের নামাঙ্কিত প্রায় ২০০ স্বর্ণ মুদ্রা আলাহাবাদে আবিষ্কৃত হয়। ১৮৭৭ খ্রীঃ প্রথম কুমারগুপ্তের ২০।৩০টী স্বর্ণমুদ্রা আলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী ঝুসি গ্রামে পাওয়া যায়। ১৮৮৪খ্রীঃ ১৩টী গুপ্তমুদ্রা হুগলীতে আবিষ্কৃত হয়। এতদ্ভিন্ন মেদিনীপুর, মহানদ, মির্জাপুর, গাজীপুর, গয়া, পাটনা, সাহারানপুর, বুলন্দসহর, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, মথুরা, আগ্রা, আজমীর ও উজ্জয়িনী নগরে কতিপয় গুপ্তবংশীয় স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত স্বর্ণমুদ্রার স্থান সকলের নাম হইতে গুপ্তসাম্রাজ্য যে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তৃত ছিল, তাহার নিঃসন্দিগ্ধ বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। কনোজ যে গুপ্তসম্রাটদিগের রাজধানী ছিলনা, মুদ্রা প্রাপ্তির স্থান সমূহের নামমালা হইতে তাহাও প্রতীয়মান হইতেছে। কনোজ যে অতি প্রাচীন নগরী, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। গ্রীক ভূগোলবিৎ টলেমি অনুমান১৪০-৬০খ্রীঃ ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ৪০০খ্রীঃ চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান

কনোজ পরিদর্শন পূর্ব্বক তাহার সমৃদ্ধি বর্ণনা করিয়াছেন। উহা তখন গুপ্ত সম্রাটদিগের অধিকার-ভুক্ত ছিল। থানেশ্বর হইতে বর্দ্ধন রাজবংশ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ বা মধ্য-ভাগ কনোজে রাজধানী স্থাপন করিয়া, তাহার গৌরব ও সমৃদ্ধি বিশেষরূপে বৃদ্ধি করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর তাঁহাদের সম্পর্কিত বর্দ্ধনবংশ কনোজে রাজ্যপাট প্রতিষ্ঠিত করে। বর্দ্ধনবংশীয় শেষ নৃপতি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হর্ষবর্দ্ধনশীলাদিত্যকে (৬০৮-৪৮ খ্রীঃ) চৈনিক পরিব্রাজক সুবিখ্যাত হিয়াংসাঙ্ সমগ্র ভারতের (আর্য্যাবর্ত্তের) রাজাধিরাজ সম্রাট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৬৩৪ খ্রীঃ হিয়াংসাঙ্ কান্যকুব্জ নগরে উপনীত হন। বর্দ্ধনবংশের রাজ্যারম্ভ হইতে গাহড়বার রাজপুত বংশের অধঃপতন পর্য্যন্ত (অনুমান ৫৫০—১১৯৪ খ্রীঃ) কনোজের ধারাবাহিক ইতিহাস ভবিষ্যতে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করার ইচ্ছা রহিল। অযোধ্যা, আলাহাবাদ, বারানসী ও উজ্জয়িনীর ন্যায় কনোজ গুপ্তসম্রাটদিগের অন্যতম প্রধান নগরী ছিল। রাজধানী থাকা সম্পর্কে কোনও প্রমাণ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

কর্ণেল উইলফোর্ড ও গাজীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ওল্ডহাম (Wilson Oldham) সাহেব পাটলী পুত্রকে (বর্ত্তমান পাটনা) গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাটলীপুত্রে মৌর্য্যবংশীয় সম্রাটদিগের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৪০০ খ্রীঃ ফাহিয়ানের ভ্রমণ কালেও পাটলীপুত্র সমৃদ্ধ নগরী ছিল। সম্ভবতঃ বৈদেশিক হুনজাতি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানী পাটলীপুত্রকে তদনন্তর এরূপ ভাবে বিধ্বস্ত করে যে, ৬৩২ খ্রীঃ চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াংসাঙ্ প্রাচীন শ্রাবস্তীর ন্যায় ভারতের রাজধানীকে এক সামান্য হীনাবস্থ-গ্রামে পরিণত দেখিতে পান। গুপ্তসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর, কনোজের মহতী শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। তৎ সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পরিত্যক্ত নগরীর হীনাবস্থা ধারণ করে। তদবধি তাহার অবনতি আরম্ভ হইয়া, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সামান্য গ্রামে পরিণত হয়। প্রাচীন পাটলীপুত্র এক্ষণে গঙ্গানদীর কুক্ষিগত হইয়া নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

জেনারেল কানিংহাম (Arch. Report XI. 153) নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ২২২-২৮০ খ্রীঃ জনৈক চৈনিক পরিব্রাজক পাটলীপুত্রে মহাপরাক্রান্ত এক রাজার রাজধানী দেখিতে পান। এই রাজাকে তিনি কুমারগুপ্ত (১) মহেন্দ্র বলিয়া অনুমান করেন। আমাদের বিবেচনায়, এই নরপতি গুপ্তসম্রাটদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ প্রথম কুমারগুপ্ত ৪১৫-৪৫৪ খ্রীঃ পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। গুপ্তসম্রাটদিগের পূর্ব্বতন কালেও যে পাটলীপুত্র মহাসমৃদ্ধ রাজ্যের রাজধানী ছিল, ইহা হইতে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। চৈনিক পরিব্রাজক ইসিঙ্গ (Itsing) অনুমান ৬৯০-৭০০ খ্রীঃ পর্য্যটন উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তখন গুপ্তবংশীয় দেবগুপ্ত পূর্ব্বভারতের সম্রাটরূপে মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইসিঙ্গ তাঁহাকে দেববর্ম্মা নামে উল্লেখ করিয়াছেন। মগধের মহারাজ শ্রীগুপ্ত গঙ্গাতীরস্থ মৃগসিকবন মন্দিরের নিকট চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাস জন্য যে মন্দির নির্ম্মিত করাইয়া দেন, তাহার ভগ্নাবশেষ এই চৈনিক পরিব্রাজক দেখিতে পান। তাঁহার বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে ইহা হইতে গুপ্ত

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম যে শ্রীগুপ্ত ও পাটলীপুত্রে যে তাঁহার রাজধানী ছিল, স্পষ্টাক্ষরে তাহারপ্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।*

মহারাজ প্রথম চন্দ্র গুপ্ত সময় হইতে তাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্তের সময় পর্য্যন্ত (৩৬০-৫৩৩ খ্রীঃ) সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত গুপ্তসম্রাটদিগের পদানত থাকে। তাঁহাদের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত বঙ্গদেশ হইতে পশ্চিমে গুজরাট পর্য্যন্ত এক শাসন দণ্ডের অধীনে অবস্থিত থাকে। ৪৮৪ খ্রীঃ হুনরাজ তোড়ামন পশ্চিম মালবে আপতিত হইয়া, তাহার রাজা মাতৃবিষ্ণুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া অধিকার করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্যানবিষ্ণু ভ্রাতার মৃত্যুর পর স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। এই সময়ে পূর্ব্বমালব গুপ্তবংশীয় বুধগুপ্ত শাসন করিতেছিলেন। ৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের বুধগুপ্তের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ ৪৯৪ খ্রীঃ পূর্ব্বমালব তোড়ামনের পদানত হয়। এই বৎসর গুপ্তসম্রাট নরসিংহ গুপ্তকে পরাজিত করিয়া তোড়ামন মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। ৪৯৪ ৫১০খ্রীঃ সম্রাট তোড়ামন গুপ্তসাম্রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া, তাহা শাসন করিতে থাকেন। সম্ভবতঃ ৫১০ খ্রীঃ গুপ্ত সম্রাটের অধীনস্থ গুজরাটের শাসনকর্ত্তা ভট্টারক সেনাপতি কনক সেন ও পূর্ব্বমালবের বুধগুপ্তের উত্তরাধিকারী ভানুগুপ্ত হুনরাজ তোড়ামনকে পরাজিত করিয়া সাম্রাজ্যে সম্রাট্ নরসিংহগুপ্তকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। বুধগুপ্ত, ভানুগুপ্ত ও তোড়ামনের শাসনলিপি পূর্ব্বমালবের অন্তর্গত এরাণে আবিস্কৃত হইয়াছে।

ভট্টারক সেনাপতি কনকসেন হইতে গুজরাটের সুবিখ্যাত বল্লভীবংশ উদ্ভূত হইয়াছে। ৪৯৫-৫১৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সম্রাট নরসিংহ গুপ্তের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা রূপে তিনি গুজরাট সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শাসন করিতে থাকেন। কনকসেন মিহিরকুলে জাত হুনরাজ তোড়ামনকে পরাজিত করিয়া "মৈত্রক"-দলন বলিয়া বল্লভী সম্রাটদিগের শাসন পত্রে অতঃপর বর্ণিত হইতে থাকেন। বল্লভীবংশের প্রতিষ্ঠাতার হস্তে পরাজয়ের কিছুকাল পরেই তোড়ামনের মৃত্যু ঘটে এবং সম্ভবতঃ ৫১৫খ্রীঃ তাঁহার পুত্র মিহির-কুল পৈতৃক রাজ্যলাভ করেন। ডাক্তার মিত্র ইঁহাকে পশুপতি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পিতার ন্যায় পুত্রও মহাপরাক্রান্ত হইয়া উঠেন এবং গুপ্তসাম্রাজ্যে পুনঃ পুনঃ উপদ্রব করিতে থাকেন। ৫৩০ খ্রীঃ নরসিংহ গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিক্রমাদিত্য কুমার গুপ্ত (দ্বিতীয়) পাটলীপুত্রের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্রাবস্তী তাঁহার প্রিয় আবাসস্থল ছিল, কিন্তু উহা তাঁহার রাজধানী ছিল কি না, নিশ্চয় বলা যায় না।

৫৩০খ্রীঃ বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্তের সেনাপতি প্রবল পরাক্রান্ত হুনরাজ মিহিরকুলকে (পশুপতি) যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, বন্দীভাবে

* "All parts of the world have their appropriate temples, except China, so that priests from that country have many hardships to endure. Eastward, about forty stages following the course of the Ganges, we come to the Mrigasikavana temple. Not far from this is a ruined establishment, called the China Temple. The old tradition* says that formerly a Maharaja called Sri Gupta built this for the priests of China. At this time some Chinese priests, some twenty men or so, came from Sz'chuan to the Mahabodhi Temple to pay worship to it, on which the king, seeing their piety, gave them as a gift this plot of land. The land now belongs to the king of Eastern India, whose name is Deva Varmma."

(Journal of Royal Asiatic Society, N. S. P. 571 XIII.)

সম্রাট নরসিংহ গুপ্তের সমীপে আনয়ন করেন। ৫১৫-৫৩০খ্রীঃ পর্য্যন্ত মিহিরকুল পুনঃ পুনঃ গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক অস্থির করিয়া তোলেন। গোয়ালিয়ারের শাসনপত্র দৃষ্টে এরূপ অনুমিত হয়। বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্তের মাতার অনুরোধে সম্রাট তাঁহার প্রাণদান করেন। তদবধি তিনি মাতৃগুপ্ত নামে পরিচিত হন। অতঃপর ৪ বৎসর কাল কাশ্মীরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাহা শাসন করিয়া রাজপদ স্বেচ্ছানুসারে পরিত্যাগ করেন। মিহিরকুল ও মাতৃগুপ্ত যে অভিন্ন ব্যক্তি, সুপণ্ডিত ডাক্তার হারনলি তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরিব্রাজক হিয়াংসাঙ্ এই মিহিরকুল ও বালাদিত্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

মিহিরকুলের পরাজয়ের পর মহারাজ নরসিংহ গুপ্তের (৪৮৫-৫৩০) মৃত্যু হয়। তদনন্তর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় সমুদ্র গুপ্ত (৫৩০-৫৫০ খ্রীঃ) পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন। মিহিরকুলের বিজেতা সেনাপতি যশোধর্ম্মন মহারাজাধিরাজ-বিষ্ণুবর্দ্ধন উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হন। ৫৩০-৫৪০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সম্রাটের পদে বিষ্ণুবর্দ্ধন আসীন ছিলেন। দ্বিতীয় সমুদ্র গুপ্ত আপন রাজত্ব আরম্ভের দুই তিন বৎসরের মধ্যেই বিষ্ণুবর্দ্ধন দ্বারা সম্রাট্ পদ হইতে অবনীত হন। এদিকে গুজরাটে বল্লভীবংশ স্বাধীনতা অবলম্বন করে। তোড়ামনের পরাজয় হেতু বল্লভীবংশের প্রতিষ্ঠাতা সেনাপতি কনকসেনের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দ্রোণসিংহকে ৫২০ খ্রীঃ মহারাজ পদে সম্রাট্ নরসিংহ গুপ্ত অভিষিক্ত করেন। ৫৩০-৮০ খ্রীঃ মহারাজ বিষ্ণুবর্দ্ধন কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন বলিয়া ডাক্তার হারনলি অনুমান করেন।

৫৪০-৫৮৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মৌখরীবর্ম্মন বংশীয় ঈশান বর্ম্মন, সর্ব্ববর্ম্মন, সুস্থিত বর্ম্মন ও অবন্তীবর্ম্মন রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তদনন্তর কনোজের বর্দ্ধন রাজবংশীয় প্রভাকরবর্দ্ধন, রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য ৫৮৫-৬৪৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সম্রাটের পদলাভ করেন। হর্ষবর্দ্ধনের পর পূর্ব্বভারতে গুপ্তবংশীয় আদিত্য সেন মগধে, এবং বল্লভীবংশীয় তৃতীয় শীলাদিত্য পশ্চিম ভারতের গুজরাটে মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন। প্রায় এক শতাব্দী পর্য্যন্ত এই উভয় বংশ পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারত অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন করিতে থাকেন। নিম্নে গুপ্তসম্রাটদিগের আনুমানিক সময় নির্দ্দিষ্ট হইল।

গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণ।

(৩১৯—৪০) শ্রীগুপ্ত।

(৩৪০—৬০) ঘটোৎকচ।

(৩৬০—৮০) চন্দ্রগুপ্ত (প্রথম)—নেপালের লিচ্ছবীবংশীয় কুমারদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

৩৮০—৪০০) সমুদ্রগুপ্ত—পত্নীর নাম দত্তাদেবী।

(৪০০—৪১৪) চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়)—পত্নীর নাম ধ্রুবদেবী।

(৪১৫—৫৪) কুমারগুপ্ত (প্রথম)—অনন্তসেনের ভগিনী অনন্তাদেবী ইঁহার পত্নী।
(মহেন্দ্র)—উচ্ছাকল্প মহারাজবংশীয় জয়দেব ইঁহার ভগিনী কুমারীদেবীকে বিবাহ করেন।

(৪৫৫—৬৮) স্কন্দগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) পুরগুপ্ত (৪৬৯—৮৪)—শ্রীবৎসদেবীকে বিবাহ করেন।

(৪৮৫—৫৩০) নরসিংহগুপ্ত—শ্রীমতীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।
(বালাদিত্য)

(৫৩০—৫০) কুমারগুপ্ত (দ্বিতীয়)
(বিক্রমাদিত্য)

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা। প্রত্যুত্তর। (১)

নব্যভাঁরতে 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' বিষয়ে আমার যে প্রবন্ধ ক্রমে ক্রমে ছয়বারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দুইবার মাত্র বাহির হইতেই শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উহার এক প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠান। সমগ্র প্রবন্ধটি প্রকাশিত না হইতেই,—তাহার অতি অল্প অংশ মাত্র প্রকাশ হইতেই,—এক প্রতিবাদ আসিয়া উপস্থিত! সাহিত্য-জগতে ইহা এক নূতন ব্যাপার বটে! ইহা সকলেই জানেন যে, যে প্রবন্ধের উত্তর দিতে হইবে, তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া উত্তর দিতে হয়। কিয়দংশমাত্র পাঠ করিয়া উত্তর দিতে যাওয়া যে অন্যায় ও নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য, ইহা কেনা বুঝেন? বাস্তবিক সব কথা না শুনিয়া,—কেবল কিয়দংশ মাত্র শুনিয়া, কথার উত্তর দিতে গেলে যে, প্রকৃত উত্তর হয় না, ইহা বালকেও বুঝে? কিন্তু গঙ্গেশ বাবু এমনি অসহিষ্ণু যে, আমার প্রবন্ধের কিয়দংশ মাত্র পড়িয়াই অমনি তাহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন;—সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক, এই সহজ বিবেচনাটীও তাঁহার মনে আসিল না;—নিরাকারবাদের পক্ষ সমর্থন এবং সাকারবাদের অযুক্ততা প্রদর্শন করিয়া, প্রবন্ধ প্রকাশ হইতেছে দেখিয়াই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল! অমনি যুদ্ধবেশ ধারণ করিলেন। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বলিবেন, ইহা ন্যায় ও বিবেচনাসিদ্ধ কার্য্য হয় নাই।

গঙ্গেশ বাবু বলিতেছেন,"সাকার ও নিরাকারোপাসনার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি।" ঈশ্বরজ্ঞানে আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থের উপাসনাই সাকার উপাসনা। চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক; বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি আকৃতি-বিশিষ্ট পদার্থের উপাসনা, সাকার উপাসনা। দেশপ্রচলিত মূর্ত্তি-পূজা, অবশ্য, সাকার উপাসনা।

সাকার কাহাকে বলে? যাহার বিস্তৃতি (extension) আছে, তাহাই সাকার। "নিরাকার কাহাকে বলে? যাহার বিস্তৃতি (extension) নাই, তাহাই নিরাকার। কিন্তু নিরাকার উপাসনা বলিলে, চিন্ময়, নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাই বুঝায়।

গঙ্গেশ বাবু বলিতেছেন,—"আমি বলি, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা সাকারোপাসনা ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা নিরাকারোপাসনা।" সগুণ বা নির্গুণ, বেদান্তানুসারে ব্রহ্মের যেরূপ অধ্যাস হউক না কেন, ব্রহ্মোপাসনা সর্ব্বথাই নিরাকার উপাসনা। সগুণ ব্রহ্মের যে হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে,—সগুণ ব্রহ্ম যে পরিমিত হইয়া দেশ কালে-বদ্ধ হইয়াছেন, এমন নহে। সুতরাং সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা হইলেই যে উহা সাকার উপাসনা হইল, এমন হইতে পারে না। উহা নিতান্তই অযুক্ত কথা।

গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন, "যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার, ও যাহার নাশ নাই, তাহা নিরাকার।" গঙ্গেশবাবু অবশ্য বলিবেন না যে, নাশ্য ও সাকার, এবং অবিনশ্বর ও নিরাকার একার্থবোধক শব্দ। যাহার নাশ আছে,—যাহা মৃত্যুর অধীন, তাহা নাশ্য। আর যাহা আকৃতিবিশিষ্ট,—যাহার বিস্তৃতি আছে,—তাহা সাকার। যাহা নাশ্য, তাহা সাকার হইতে পারে, এবং যাহা সাকার, তাহা নাশ্য হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া নাশ্য ও সাকার একার্থবোধক শব্দ নহে। সেইরূপ,

অবিনশ্বর ও নিরাকার একার্থবোধক শব্দ নহে। অবিনশ্বর বলিলে যাহা বুঝায়, নিরাকার বলিলে তাহা বুঝায় না। যাহা অবিনশ্বর তাহা নিরাকার হইতে পারে, এবং যাহা নিরাকার, তাহা অবিনশ্বর হইতে পারে, কিন্তু অবিনশ্বর ও নিরাকার একার্থবোধক শব্দ নহে।

গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন, "যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার।" এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, যাঁহারা সাকার উপাসক, তাঁহারা কি নশ্বর পদার্থের উপাসনা করেন? আমাদের দেশবাসী সাকার উপাসকগণ, এ কথায় নিশ্চয়ই বিরক্ত হইবেন। যিনি আমার ইষ্ট দেবতা,— যিনি আমার উপাস্য, তিনি নাশ্য;—সুতরাং ঈশ্বর নহেন, এমন কথা কেহই বলেন না,— বলা সম্ভব নহে! বলিলে উপাসনা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন,—"সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা, সাকারোপাসনা, ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা, নিরাকারোপাসনা।" আবার বলিতেছেন,—"যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার।" এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, সগুণ ব্রহ্ম কি সাকার ও নাশ্য? সগুণ ব্রহ্মকে সাকার বলিলে, সাকারবাদীগণ, অবশ্য, আপত্তি করিবেন না। কিন্তু তাঁহাকে নাশ্য বলিলে তাঁহাদের মর্ম্মে আঘাৎ দেওয়া হয়।

গঙ্গেশবাবুর কথাটা কিরূপ দাঁড়াইতেছে দেখুন;—

যাহা নাশ্য, তাহা সাকার;
সাকারোপাসকের উপাস্য সাকার।
সুতরাং সাকারোপাসকের উপাস্য নাশ্য।
যাহা নাশ্য, তাহা পরমেশ্বর নহে;
সাকার উপাসকের উপাস্য নাশ্য;
সুতরাং তাহা পরমেশ্বর নহে।

গঙ্গেশবাবু সাকারবাদীদের উকীল হইয়াছেন। কিন্তু যে উকীল মোকদ্দমা লইয়া মক্কেলের সর্ব্বনাশ করেন, এমন উকীল কে চায়? গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন,—"আমি বলি, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা সাকারোপাসনা, ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা নিরাকারোপাসনা। যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার ও যাহার নাশ নাই, তাহা নিরাকার।" প্রথমে বলিতেছেন,—"সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা সাকারোপাসনা।" তাহার পর, আবার বলিতেছেন,— "যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার।" ইহাই কি বলা হইতেছে যে, সগুণ ব্রহ্ম সাকার ও নাশ্য? সগুণ ব্রহ্ম বলিলেই যে সাকার ও নাশ্য বুঝায়, ইহার যুক্তি কি? ইহার কি কোন প্রমাণ আছে?

যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার; সুতরাং সাকার উপাসনা নশ্বরের উপাসনা। যাহা নশ্বর, তাহা ঈশ্বর নহে; সুতরাং সাকারোপাসনা, ঈশ্বরোপাসনা নহে। গঙ্গেশবাবু কি ইহাই বলিতে চান? ইহা সাকারবাদ সমর্থন করা নহে; সাকারবাদ বিনাশ করা।

কেহ বলিতে পারেন, নাশ্য পদার্থ মাত্রেই সাকার, কিন্তু সাকার মাত্রেই নাশ্য নহে। পশু মাত্রেই জীব, কিন্তু জীব মাত্রেই পশু নহে। এরূপ ভাবে তর্ক করিলে, সাকারবাদীদের উপাস্য দেবতাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করা যায়। কিন্তু "সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা, সাকারোপাসনা" এই কথা বলিয়াই তৎপরক্ষণে, "যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার" এরূপ বাক্য বলিবার সার্থকতা কি?

এস্থলে গঙ্গেশবাবু বলিতে পারেন যে, সাকার নাশ্য বটে, কিন্তু আমি যে সাকারোপাসনা বলিতেছি, তাহার অর্থ সাকারের উপাসনা নহে। সাকারের অবলম্বনে নিরাকারের উপাসনা।

ইহাই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তিনি তো প্রকারান্তরে নিরাকার উপাসনারই পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। তাঁহার মত যদি ইহাই হইল যে, সাকার বিনাশশীল ;—উহা ব্রহ্ম নহে ; সাকারের অবলম্বনে নিরাকারের উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা, তাহা হইলে সাকারবাদ কোথায় থাকিল ? প্রকারান্তরে সাকারবাদকে খণ্ডিত করিয়া নিরাকারবাদই সমর্থিত হইল।

"এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কোন পদার্থের অবলম্বনে সেই পরম পুরুষের পূজা হয়।" —আমার লিখিত এই বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন ;—

"ইহাতে বোধ হয় সাকারোপাসকের প্রতিমা বা বিগ্রহ, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোন পদার্থ নহে ; যদি না হয়, তবে উহা কি ? বনের ফুল ও মালীর প্রস্তুত বাগানের ফুল দেখিয়া যদি ঈশ্বরকে স্মরণ হয়, তবে একটা মৃত্তিকা স্তূপ বা মৃণ্ময়মূর্ত্তি দেখিয়া স্মরণ না হইলে তাহা কুসংস্কার নয় কি ?"

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কোন পদার্থ, —ইট্, কাঠ, পাথর প্রভৃতি যাহা কিছু,—এবং কালীঘাটের কালী, তারকেশ্বরের মহাদেব, দেওঘরের বৈদ্যনাথ, কাশীর বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি যে সকল মূর্ত্তি বা প্রস্তর খণ্ড স্থানে স্থানে দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেছে, এই উভয় কি সমান ? কাশীর বিশ্বেশ্বরমূর্ত্তি এবং রাস্তার ঐ পাথর খানা কি সমান ? গঙ্গেশ বাবু কি তাহাই বলিতেছেন ? তাহা হইলে প্রচলিত সাকারবাদে আমার ন্যায় তাঁহার কিছুই বিশ্বাস নাই দেখিতেছি। এ বিষয়ে তাঁহাতে ও আমাতে প্রভেদ কোথায় ?

কালীঘাটের কালীমূর্ত্তি এবং 'মালীর প্রস্তুত বাগানের ফুল', উভয়ই সৃষ্ট পদার্থ,—উহাদের উভয়ের সহিত, পরমেশ্বরের সৃষ্ট ও স্রষ্টা সম্বন্ধ। উভয়ের সহিত পরমেশ্বরের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। সুতরাং ফুলটা দেখিয়া ঈশ্বরকে যেমন স্মরণ হয়, কালীমূর্ত্তি দেখিয়াও ঈশ্বরকে সেইরূপ স্মরণ হয়। উভয়ই একশ্রেণী ভুক্ত। কালীমূর্ত্তি যেমন, ঐ ফুলটাও তেমন, ঐ রাস্তার পাথর খানাও সেইরূপ। তবে কালীমূর্ত্তির বিশেষত্ব কি রহিল ? (পরমেশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার পক্ষে, কৃত্রিম পদার্থ অপেক্ষা স্বাভাবিক পদার্থের উপযোগিতা যে অধিক, ইহা সুবুদ্ধি ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, এ স্থলে সে কথার বিশেষ প্রয়োজন নাই।)

ঐ রাস্তার পাথর খানা এবং জয়পুরের গোবিন্দজীর মূর্ত্তি, দুই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত পদার্থ। সুতরাং দুই সমশ্রেণীভুক্ত, এ কথা বলিলে তো পৌত্তলিকতা উড়াইয়া দেওয়া হইল। তাহা হইলে পৌত্তলিকতা কোথায় থাকে ? গঙ্গেশবাবু যাহাই বলুন, সাধারণ হিন্দুগণ তাহা কখনই বলিবেন না। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত পদার্থ বলিয়া যদি সাকারবাদীর দেববিগ্রহ এবং যে কোন একটা পদার্থ সমান হয়, তাহা হইলে লোকে চট্টগ্রাম হইতে কালীঘাটে, এবং মান্দ্রাজ হইতে কাশী বৃন্দাবন ছুটাছুটি করেন কেন ? বিশেষ বিশেষ দেবতার অস্তিত্বে, এবং মূর্ত্ত্যাদিতে ঐ সকল দেবতার বিশেষ অধিষ্ঠানে বিশ্বাস করেন বলিয়াই, ঐরূপ করিয়া থাকেন। ঐরূপ বিশেষ ভাবে মূর্ত্ত্যাদিতে অধিষ্ঠিত কল্পিত দেবতার পূজা করিতে ব্রহ্মোপাসক প্রস্তুত নহেন। এই স্থলেই প্রভেদ।

গঙ্গেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন ;—"হস্তে, পদে, জলে, বায়ুতে ও তাড়িতে যে সকল শক্তি থাকার কথা বলিয়াছেন, উহা-

দিগের দার্শনিক নাম কি, এবং ঐ সকল শক্তি উপাস্য কি না?" শক্তি ই উহার নাম। স্বতন্ত্র কোন দার্শনিক নাম আছে, এমন জানি না। "অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তি।" ব্রহ্মশক্তি অবশ্য উপাস্য। ব্রহ্ম হইতে তাঁহার শক্তি ভিন্ন নহে। সুতরাং ব্রহ্মকে ছাড়িয়া তাঁহার শক্তির স্বতন্ত্র উপাসনা স্বীকার করি না। গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন, "ঐ সকল শক্তি।" বহুশক্তি মানি না। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতেছেন, নিখিলব্রহ্মাণ্ডে একই শক্তি কার্য্য করিতেছে।

গঙ্গেশবাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন;—"নিরাকার মনের ক্ষয়ের স্বীকার করেন কি না, যদি না করেন, তবে সমাধি ও সুষুপ্তি কি প্রকারে সম্ভব হয়? মনের সাকারত্ব প্রতিপক্ষ করিয়া লেখক প্রশ্ন করিয়াছেন, "মন দীর্ঘ, কি চতুষ্কোণ, কি ত্রিকোণ, কি আকার? লেখক অন্যত্র বলিয়াছেন, "বায়ু অদৃশ্য হইলেও সাকার, উহা স্পর্শদ্বারা অনুভূত হয়; তাড়িত এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ, সূক্ষ্ম জড়।" সাকার বায়ু দীর্ঘ, চতুষ্কোণ, না ত্রিকোণ? সূক্ষ্ম জড় লম্বা না গোল? উহাদিগের আকৃতি, বিস্তৃতি, বেধ কি?"

সুষুপ্তি ও সমাধির অবস্থায় নিরাকার মনের ক্ষয় হয়, ইহা অমূলক কথা। সুষুপ্তি ও সমাধির অবস্থায় যদি মনের ক্ষয় হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তি ও সমাধির পর, মন কিরূপে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়? যদি মন ক্ষয় হইয়াই গেল, তবে আবার কোথা হইতে আসে? সমাধি ও সুষুপ্তির পর দেখা যায় যে, যেমন মন তেমনি আছে। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, মনের ক্ষয় হইয়াছিল? গাজিপুরের পাহাড়ী বাবা ভূগর্ভে পাঁচবৎসর সমাধির পর, সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যখন তিনি উপরে উঠিলেন, দেখা গেল, তাঁহার কিছুই ক্ষয় হয় নাই। গভীর নিদ্রার পর যখন মানুষ জাগ্রত হয়, তখন সে ষোল আনা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যদি ক্ষয় হইয়া গিয়া থাকে, তবে আবার কোথা হইতে আসে?

"সাকার বায়ু দীর্ঘ, চতুষ্কোণ, না ত্রিকোণ? সূক্ষ্ম জড়, লম্বা না গোল ইত্যাদি।"

উত্তর;—জল যেমন পাত্রে থাকে, সেইরূপ আকার ধারণ করে। বায়ু প্রভৃতি সূক্ষ্মজড়ও, সেইরূপ, যেমন আধারে থাকে, সেইরূপ আকার প্রাপ্ত হয়।

গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন;—"বিশ্বের উপাদান কি হইল? ব্রহ্ম স্বয়ং, না, ব্রহ্মেতর কোন পদার্থ? আমরা লেখককে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই বাক্যটির ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করি। যদি চরাচর মূর্ত্তামূর্ত্ত সমস্তই ব্রহ্ম হয়, ভাল; যদি না হয়, তবে এই বিশ্বকে ব্রহ্মেতর পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে দ্বৈতবাদ আসিয়া পড়ে; আর যদি জগৎকে মিথ্যা বলেন, তবে লেখকের সত্তাও মিথ্যা, সুতরাং বিতণ্ডা নিষ্ফল।"

বিশ্বের উপাদান ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। ব্রহ্মশক্তিতে সকল পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি, লয়; সকলই ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ; ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ ভিন্ন আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। এই ভাবে, "একমেবাদ্বিতীয়ং" বাক্যটি বুঝি, ও ব্যবহার করিয়া থাকি। "একমেবাদ্বিতীয়ং" একই আছে, দ্বিতীয় নাই, অর্থাৎ সকলই ব্রহ্মশক্তির বিকার বা প্রকাশ, অন্য কিছু নাই। "চরাচর মূর্ত্তামূর্ত্ত সমস্তই ব্রহ্ম" বটে, অথচ নয়। কি ভাবে সমস্তই ব্রহ্ম? না, সমস্তই ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ; এবং শক্তি হইতে ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্মনয়, কি ভাবে? "চরাচর মূর্ত্তামূর্ত্ত সমস্তই" ব্রহ্মশক্তির পরিমিত, সাময়িক, ও ক্ষণস্থায়ী

প্রকাশ। সুতরাং এসকলের কিছুই ব্রহ্ম নহে। যাহা পরিমিত, সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী, তাহা কেমন করিয়া ব্রহ্ম হইবে? সেইজন্য উপনিষদে মহর্ষি এক স্থলে বলিতেছেন, সকলই ব্রহ্ম। আবার অন্য স্থলে বলিতেছেন, এ সকলের কিছুই ব্রহ্ম নহে। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয়ের মধ্যেই সত্য রহিয়াছে।

আমি যাহা লিখিয়াছি, যদি একটু মনোযোগ করিয়া গঙ্গেশবাবু পাঠ করিতেন, তাহা হইলে আমার অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন।

অদ্বৈতবাদে যে সত্য আছে, তাহা আমি এইরূপে প্রকাশ করিয়াছি ;—"ব্রহ্মশক্তি জগৎ হইল। পদার্থকে ছাড়িয়া তাহার শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা সম্ভব নহে। সুতরাং ব্রহ্মশক্তি জগৎরূপে প্রকাশ হইয়াছে বলিলে, ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রকাশ হইয়াছেন, বলা হয়। ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। ব্রহ্মশক্তি জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে বলিলে, সৎস্বরূপ ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রকাশ হইয়াছেন, বলিতে হয়। ব্রহ্মের জ্ঞান, আনন্দ, প্রেম, দয়া, শান্তি, পবিত্রতা সকলই তাঁহার সৃষ্টিলীলায় প্রকাশ হইয়াছে। এব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সত্তায় সত্তাবান।"

আবার দ্বৈতাবাদে কি সত্য আছে, তাহা দেখাইবার জন্য লিখিয়াছি ;—'পরমেশ্বর নিত্য, জগৎঅনিত্য। পরমেশ্বর সার সত্য, জগৎ অসার, অসত্য। পরমেশ্বর স্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয় ; জগৎ অস্থায়ী, চিরপরিবর্ত্তনশীল। যখন উভয়ের লক্ষণে এতদূর পার্থক্য, বা বৈপরীত্য, তখন কেমন করিয়া বলিবে যে, জগৎ ও ঈশ্বর এক, তিনি স্বয়ং এই জগৎ হইয়াছেন? এই জগতের অতীত তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তা আছে কি না?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, উভয়েই সত্য রহিয়াছে। অনেকের নিকট বিরোধী বলিয়া প্রতীত হইলেও, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতেছি। দ্বৈতাদ্বৈতবাদই প্রকৃত তত্ত্ব।

"নিরাকারবাদীর অবলম্বন নাই, একথা কে বলে? সাকারবাদীর অবলম্বন ক্ষুদ্র একটি প্রতিমূর্ত্তি, নিরাকারবাদীর অবলম্বন অখিল ব্রহ্মাণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ।" আমার প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত করিয়া গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন ;—"ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, নিরাকারবাদীর অবলম্বন সাকার হইল, কি নিরাকার হইল?"

এ প্রশ্নের কি প্রয়োজন ছিল? যখন বহির্জগৎকে অবলম্বন বলা হইতেছে, তখন উহা যে সাকার, সে কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়? যে স্থান হইতে ঐ অংশটুকু উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেস্থানে এই সাকার জগতের বর্ণনা রহিয়াছে,—"ক্ষুদ্রতম বালুকণা হইতে অত্যুচ্চ হিমালয় পর্য্যন্ত" ইত্যাদি, তবে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন যে, "অবলম্বন সাকার হইল, কি নিরাকার হইল"?

জড়জগৎ ও তদন্তর্গত পদার্থ অবলম্বন করিয়া যিনি পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, গঙ্গেশবাবুর মতে তিনি নিরাকার উপাসক নহেন ; তিনি সাকারোপাসক। গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন,—"আমার সংজ্ঞা অনুসারে ইনি নিরাকারোপাসক পদবাচ্য হইতে পারেন না। যদি জগতে কেহ সাকারোপাসক থাকে, তবে ইনিই স্পষ্টতঃ তিনি।"

গঙ্গেশবাবুর সংজ্ঞা যে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। সুতরাং সেই সংজ্ঞা অনুসারে যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। যিনি সাকারজগৎকে অবলম্বন করিয়া নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন, গঙ্গেশবাবু তাঁহাকে সাকার উপাসক বলিতেছেন। ইহার

তুল্য অসার কথা আর কি আছে? হিমালয় দর্শনে এক জনের মনে পরমেশ্বরের ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল;—তিনি সুগম্ভীর হিমাচলে বিশ্বপতির সত্তা, শক্তি, জ্ঞান—এক কথায়, তাঁহার আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশিত দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থবোধে উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলেন;—"জগদীশ! ধন্য! ধন্য! ধন্য! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার মহিমা!" এই কথাগুলি কি তিনি ঐ সাকার হিমাচলকে বলিলেন? না, যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা চিন্ময়, সচ্চিদানন্দ পুরুষ হইতে হিমাচলের উৎপত্তি ও স্থিতি, তিনি তাঁহারই আরাধনা করিলেন? তিনি সাকার হিমালয়ের পূজা করিলেন না; হিমালয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, নিরাকার পরমেশ্বরেরই পূজা করিলেন। তবে কোন্ যুক্তি অনুসারে, বলেন যে, তিনি সাকার উপাসক? তিনি সাকারের উপাসনা করিলেন না,—করেন না।

ঐ বৃক্ষটী দেখিয়া আমার পরমেশ্বরকে স্মরণ হইল। ঐ বৃক্ষে তাঁহার মহিমা দর্শন করিয়া আমি মনে মনে তাঁহার আরাধনা করিলাম। আমি সাকার বৃক্ষের আরাধনা করিলামনা; যিনি বৃক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই নিরাকার পরমেশ্বরেরই আরাধনা করিলাম। তবে আমি সাকার উপাসক বলিয়া গণ্য হইব কেন? সাকারের উপাসনা করিলে সাকার-উপাসক হয়। সাকার বৃক্ষের তো উপাসনা করিলাম না; বৃক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা নিরকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিলাম; তবে কেন আমাকে সাকারউপাসক বলিবে? কোন প্রকারে সাকারকে অবলম্বন করি বলিয়া বলিতে পারেন, সাকার অবলম্বী, অথবা সাকার হইতে 'সাহায্য গ্রহণকারী।' কিন্তু 'সাকার উপাসক' এই অমূলক কথা কেন বলেন, ইহা কি অসত্য ও অন্যায় নহে?

ব্রহ্মজ্ঞানের প্রধান শাস্ত্র উপনিষদে, প্রাচীন আর্য্য মহর্ষি বহির্জগতে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করার কথা বলিতেছেন;—

ইহচেদবেদীদথ সত্যমস্তি
নচেদি হা বেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।

এখানে তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়; অতএব ধীরেরা স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তুতে একমাত্র পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হয়েন।

পৃথিবীতলে ও গগনমণ্ডলে, আর্য্য মহর্ষি কেমন তাঁহার মহিমার কথা বলিতেছেন;—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎযস্যৈষ মহিমাভুবি দিব্যে।
তদ্বিজ্ঞানেন অপরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"

যিনি সামান্যরূপে ও বিশেষরূপ সর্ব্ববস্তু জানিতেছেন, ভূলোকে ও দ্যুলোকে যাঁহার এই মহিমা, যিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে, প্রকাশ পাইতেছেন; জ্ঞানদ্বারা ধীরেরা তাঁহাকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন।"

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

ইহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহার ভয়ে মেঘ, ও বায়ু ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে। প্রাচীন আর্য্য মহর্ষি সমস্ত জগতে পরব্রহ্মের মহিমা ও লীলা দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। ইহা কি ব্রহ্মের আরাধনা নহে? অথবা বলিবেন কি যে, তাঁহারাও সাকার উপাসক ছিলেন?

তাহার পর গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন;—

"আর প্রত্যেক পদার্থ অর্থে, প্রতিমাবাদে বোধ হয় জগতের ইট, কাঠ, জল, পাথর, ঘসী, ঢেলা ইত্যাদি সমস্ত; প্রতিমাটা বাদ দিলেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না, রাস্তার একখানা পাথরের খোয়া বুঝাইবে, তথাপি সাকারোপাসকের নারায়ণ শিলা বুঝাইবে না, ইহারই বা মারপেঁচ কি? আর সাকারবাদীর প্রতিমূর্ত্তি অপেক্ষা একটা ঢেলা বা ঘসী আয়তনে বড় না ছোট? তবে সাকারবাদীর অবলম্বন, ক্ষুদ্র একটী প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াছেন, কেন? এ ক্ষুদ্রত্ব কি হিসাবের?"

"প্রতিমাটা বাদ দিলেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না" কে বলিল যে, প্রতিমাটা বাদ দিয়াছি? আমার প্রবন্ধের কোন স্থলে কি লেখা আছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত পদার্থ নিচয়ের মধ্যে প্রতিমাটা বাদ দেওয়া হউক? গঙ্গেশবাবু এ কথা কোথায় পাইলেন?

সাকারবাদীদিগের দেববিগ্রহ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত পদার্থ সকলের মধ্যে। "জগতের ইট, কাঠ, জল, পাথর, ঘসী, ঢেলা ইত্যাদি সমস্ত" যেমন সৃষ্টপদার্থ, সাকারবাদীর প্রতিমাও সেইরূপ সৃষ্ট পদার্থ। সৃষ্টপদার্থ স্রষ্টাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রত্যেক সৃষ্টপদার্থে, স্রষ্টার সত্তা, শক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি যেমন প্রকাশ পায়। "ইট, কাঠ, জল, পাথর, ঘসী, ঢেলা ইত্যাদি সমস্ত" পদার্থে যেমন প্রকাশ পায়, প্রতিমাতেও সেইরূপ প্রকাশ পায়। কেননা লোকে যাহাকে প্রতিমা বলে, উহা সৃষ্ট পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং যখন বলিতেছি যে, অখিল ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ ব্রহ্মপূজার অবলম্বন, তখন প্রতিমা কেমন করিয়া বাদ যাইবে? প্রতিমা কি ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া? "ইট, কাঠ, জল, পাথর, ঘসী, ঢেলা" যেমন, প্রতিমাও সেইরূপ। সকল পদার্থই ব্রহ্মের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সকল পদার্থই ব্রহ্মোপাসনার অবলম্বন।

কিন্তু সাকারবাদীর প্রতিমাকে ব্রহ্মোপাসক প্রতিমারূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। প্রতিমা শব্দের অর্থ প্রতিমূর্ত্তি। যাহার মূর্ত্তি আছে, তাহারই প্রতিমূর্ত্তি সম্ভব। কিন্তু অনন্তের মূর্ত্তি অসম্ভব।* অনন্ত পরমেশ্বরের মূর্ত্তি অসম্ভব। সুতরাং তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি অসম্ভব। সেই জন্য অনন্ত পরব্রহ্মের উপাসক, সাকারবাদীর বিগ্রহকে প্রতিমারূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। ব্রাহ্মের যিনি উপাস্য, তিনি সর্ব্বব্যাপী; অসীম। তাঁহার প্রতিমা সম্ভব নহে; প্রতিমা নাই। আমার প্রবন্ধের যে অংশ নব্যভারতে দ্বিতীয় বারে প্রকাশ হইয়াছে, গঙ্গেশবাবু তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে, কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিতেন।

জগৎ অবলম্বন করিয়া জগদীশ্বরের উপাসনা, এবং আমাদের দেশপ্রচলিত সাকার-উপাসনা, এ উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

১২৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠের নব্যভারতে আমার প্রবন্ধের যে অংশ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে প্রচলিত পৌত্তলিকতা কি অনন্ত ব্রহ্মের পূজা? এই প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত রূপে আছে। আমার প্রবন্ধের কিছু অংশমাত্র নব্যভারতে দুইবারে প্রকাশ হইলেই, গঙ্গেশবাবু উহার উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন। তৃতীয়বারে যাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহা দেখিবার পূর্ব্বেই তিনি উত্তর লিখিয়াছেন। সুতরাং তিনি এমন অনেক কথা লিখিয়াছেন, যাহার উত্তর আমার প্রবন্ধের মধ্যেই আছে। যদি তিনি একটু সহিষ্ণু হইয়া সমগ্র প্রবন্ধ প্রকাশ হইলে উহার

* নব্যভারত ১২৯৯; বৈশাখ। সাকার ও নিরাকার উপাসনা। (২) দেখ।

উত্তর লিখিতেন, তাহা হইলে, "প্রতিমাটা বাদ দিলেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না, রাস্তার এক খানা পাথরের খোয়া বুঝাইবে, তথাপি সাকারোপাসকের নারায়ণ শিলা বুঝাইবে না, ইহারই বা মারপেঁচ কি ?,, ইত্যাদি কথা লিখিবার প্রয়োজন হইত না।

"সাকারবাদীর অবলম্বন ক্ষুদ্র একটি প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াছেন কেন ? এ ক্ষুদ্রত্ব কি হিসাবের ?" ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় ক্ষুদ্র ; এবং লোকে ক্ষুদ্র বা পরিমিতে বদ্ধ বলিয়া ক্ষুদ্র বলা হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গরিব ব্যাঙ্ক।

"তোমার টাকা আছে। আমার টাকা নাই। তুমি কিন্তু খাটিতে পার না। আমি খাটিতে পারি। তুমি টাকা খাটাইতে পার না, আমি টাকা খাটাইতে পারি। কিন্তু আমি টাকা খাটাইব কি করিয়া ? আমার যে টাকা নাই। আমি গরিব কৃষাণ, খাটিয়া খাইতে চাহি, চাষবাস করিয়া সংসার চালাইতে চাহি। কিন্তু পারি কই, চাষ করিতে হইলে যে জমি চাহি, জমিদারকে খাজনা না দিলে যে জমি পাই না। আমার টাকা নাই, খাজনা কেমন করিয়া দিব ? চাষ করিতে হইলে, লাঙ্গল চাহি, গরু চাহি, বীজ চাহি। আমি এ সকল পাই কোথা ? আমার যে টাকা নাই। যদি তুমি এখন আমাকে টাকা ধার দেও, আমি সেই টাকা দিয়া জমি লইয়া, লাঙ্গল ও গরু কিনিয়া, চাষ করিয়া, ফসল হইলে, ফসল বেচিয়া, তোমার টাকা শোধ করিব এবং সেই ফসল হইতে আমার দিন গুজরান হইবে, আমি দুই মুটা খাইয়া বাঁচিব। তুমি আমাকে টাকা অমনি ধার দিবে কেন ? দয়া করিয়া। অতদূর দয়া তোমার নাই ? তুমি কিছু লাভ না পাইলে আমাকে টাকা ধার দিবে না ? আচ্ছা, বেশ, আমি সুদ দিব। তাহাতে তোমারও লাভ হইবে, আমারও লাভ হইবে। তোমার লাভ অর্থ বৃদ্ধি, আমার লাভ জীবনরক্ষা। আমি তোমার টাকা ধার না লইলে তোমার টাকা খাটিবে না, তাহার বৃদ্ধি হইবে না ; তুমি আমাকে টাকা ধার না দিলে আমার খাইবার উপায় হইবে না। তুমি টাকা ধার দিয়া আমার জীবন রক্ষার বিষয় সাহায্য করিবে সুতরাং তোমাকে আমি "মহাজন" বলিয়া স্বীকার করিয়া তোমার খাতাতে, আমার নামে হিসাব পত্তন করিলে, আমি তোমার "খাতক" হইব *।

ফসল হইলে যে তোমার কর্জ্জ শোধ করিব, তুমি কেমন করিয়া জানিলে ? বিশ্বাস (credit)। তুমি বলিতেছ, পুরা বিশ্বাস হইতেছে না। ভাল, লেখা পড়া করিয়া লও, এই খত লিখিয়া দিলাম। লিখিয়া লইলে বটে, তবু তুমি সুদসমেত আসল টাকা পাইবে, এই বিশ্বাসে, আমাকে টাকা কর্জ্জ দিলে। ঐ বিশ্বাস টুকু না থাকিলে তুমি আমাকে টাকা কর্জ্জ দিতে না, সুদও পাইতে না। আমি খাইতে পাইতাম না, তোমার টাকাও খাটিত না।"

তাইত, বিশ্বাসের কি মহিমা ! ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলে ধর্ম্ম হয় না। পরোপকারে বিশ্বাস না থাকিলে মানুষ হয় না। স্ত্রীজাতিতে

* কৃষাণের এই ব্যুৎপত্তি ঠিক নহে।

বিশ্বাস না থাকিলে প্রণয় হয় না। কৃষাণে বিশ্বাস না থাকিলে কর্জ্জ দেওয়া হয় না, চাষ হয় না। বিশ্বাসে সংসার চলিতেছে। বিশ্বাসে টাকা চলিতেছে, মূলধন এক হাত হইতে আর এক হাতে যাইতেছে, অশ্রমীর হাত হইতে শ্রমীর হাতে যাইতেছে। শ্রমীর নিকট গিয়া মূলধন নূতন ধন প্রসব করিতেছে, ধরাকে শস্যময়ী হাস্যময়ী আনন্দময়ী অন্নপূর্ণা-রূপিণী করিতেছে। কিন্তু তাহাতেও সে শ্রমী কৃষাণ ভাইয়ের দুঃখ ঘুচিতেছে না, পেটে দুই বেলা অন্ন যাইতেছে না, হাঁটু তক্ কাপড় পড়িতেছে না। কেন? ভাই কৃষাণ, তুমি বৈশাখের রৌদ্রে পুড়িয়া, শ্রাবণের ধারায় ভিজিয়া, ক্ষেতে সারাদিন মেহনত করিয়া, যে প্রচুর ফসল জন্মাইলে, তাহা কে কাড়িয়া লইয়া যাইল! তুমি মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছ, তোমার স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ কাঁদিতেছে। কে তোমাদিগকে কাঁদাইয়াছে। কি? মহাজন ও জমিদার তোমার প্রায় সমুদয় ফসল লইয়াছে। মহাজনের সুদ, এবং জমিদারের খাজানা দিতেই ফসল সব ফুরাইল। "মহাজনকে" তোমার রক্ষক বলিয়াছিলে, এখন দেখিতেছ, যে রক্ষক সেই ভক্ষক। গরিব কৃষক এইরূপ মহাজনের হাত হইতে কিসে নিস্তার পাইতে পারে, স্বদেশপ্রেমিকগণ, একবার ভাবিয়া দেখুন। সেদিন কংগ্রেসে সভাপতি ওয়েব (Webb) সাহেব এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কয়েক মাস হইল কংগ্রেসের মুখপাত্র (India) নামক কাগজে মান্দ্রাজে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমিনন এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমি প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা আসিয়াছিল, নব্যভারতে জমিদারগণের কর্ত্তব্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এ বিষয় লিখিয়াছিলাম। Court of wards র অধীন জমীদারী গুলিতে এখন টাকা উদ্বৃত্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট-সিকিউরিটি ক্রয় করা হয়। তাহা না করিয়া যদি ঐ টাকা হইতে শত করা ৬৲ বা ৯৲ বা ১২৲ টাকা সুদে প্রজাদিগকে কর্জ্জ দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রজারাও বাঁচে, নাবালক জমিদারও কোম্পানির কাগজের অপেক্ষা দ্বিগুণ বা তিন গুণ সুদ পান। এ বিষয়, ষ্টেটস্‌ম্যান নামক ইংরাজি সংবাদপত্রে, কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবারজন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম।

বেহারে এক বিলাতি কোম্পানি (Messrs Mylne & Co.) তাহাদিগের জগদীশপুর জমীদারিতে কিছুকাল কৃষি-ব্যাঙ্ক চালাইতেছেন। তাঁহারা বার্ষিক শতকরা ১২৲ সুদে টাকা কর্জ্জ দেন। আদায় অনাদায় উভয়ে গড় পড়তা ধরিলে তাহাদিগের শতকরা ৮৲ বা ৯৲ টাকা করিয়া লাভ হইতেছে। বাঙ্গালী জমীদারগণের মধ্যে এইরূপ কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার উদ্যোগ আমরা অদ্যাপিও বড় দেখিতে পাই না। "জমীদারী পঞ্চায়ত সভা" এ বিষয় চেষ্টা করিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু করিয়াছেন কি না, তাহা ঠিক জানি না। আমাদিগের দেশের অধিকাংশ জমীদারগণের শিক্ষা ও প্রজাসহানুভূতি যেরূপ অল্প, তাহাতে তাঁহাদিগের নিকট বড় অধিক ভরসা হয় না।

যে সকল লোক দেশের উন্নতির জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেছেন, দেশের জন্য প্রভূত শ্রম করিতেছেন, তাঁহারা এই মঙ্গল কার্য্যের সূচনা করিবেন, আমরা আশা করি। তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা যেমন রাজনীতির দিকে দৃষ্টি করিতেছেন, তেমনি একবার প্রজানীতির দিকে দৃষ্টি করুন। এমন অনেক গুলি বিষয় আছে; যাহাতে রাজার দ্বারস্থ না হইয়া,

প্রজার মধ্যে খাটিয়া আমরা দেশের মহীয়সী উন্নতি করিতে পারি। সেই গুলি আর উপেক্ষা করিলে, দেশের মঙ্গল নাই। সেই গুলি উপেক্ষা করিলে কংগ্রেস প্রভৃতির মহৎ উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হইবে না।

আমাদিগের দেশের কৃষকগণ অতিশয় গরিব। এখানে মহাজনের সুদও অতিশয় অধিক। এখানে অল্প সুদে কর্জ্জ না পাইলে কৃষক কেমন করিয়া বাঁচিবে?

কৃষকগণ অল্প সুদে কর্জ্জ পাইলে, দেখিবে, তাহাদিগের ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে, তাহাদিগের ঘরে লক্ষ্মী দেবী আসিবেন। যে যে দেশে কৃষকেরা অল্পসুদে টাকা কর্জ্জ পাইতেছে, সেই সেই দেশে কৃষকগণের কেবল মাত্র দারিদ্র্য মোচন হয় নাই; অন্য সকল বিষয়েও তাহাদিগের বিস্ময়জনক উন্নতি হইয়াছে।

জর্ম্মনি, অষ্টিয়া, রুষিয়া, ইটালি দেশে গরিবদিগের সাহায্যের জন্য অনেক গ্রামে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। কৃষকগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম সুদে টাকা কর্জ্জ পাইতেছে। শ্রীযুক্ত উল্‌ফ (Mr. H. W. Wolff) দেশে দেশে গিয়া গরিবদিগের ব্যাঙ্ক বিষয় অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া তাঁহার Popular Banks নামক একখানি উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। গত বৎসরে তিনি ওয়েষ্টমিনিষ্টার-রিভিউ নামক সাময়িক পত্রে এ বিষয়ে একটী অতীব সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন, যে যে গ্রামে কৃষকদিগকে অল্প সুদে টাকা ধার দিবার জন্য ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই গ্রামের অবস্থা ব্যাঙ্কহীন গ্রামের অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে।

"Any one acquainted with agriculture can not fail to detect at the very first glance the contrast between an Italian village which has no bank and one in which such a bank has been at work a few years. Where there is such a bank cultivation is sure to be better. Crops look cleaner and heavier. The live stock are better kept. The buildings are in better order. There is, generally speaking, less poverty, a look of greater prosperity about both people and farms; and if any visitor has time to look into the social life of the village, he will find that there is a good deal more still to distinguish a "bank" village from an ordinary one, even apart from increased economy, sobriety, thrift, and saving. The population appear more independent and better conditioned. Hence that marvellous educating power which has made priests own that the bank in their parish has done more to make good men of their parishowners than all their preaching."

সংক্ষেপে, এই গ্রাম্য কৃষিব্যাঙ্ক হওয়ায় কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইয়াছে, ঘর বাড়ীর শ্রী হইয়াছে, দারিদ্র্য কমিয়া গিয়াছে, গ্রামের লোক স্বাবলম্বী ও সাধু হইয়াছে। গরিবদিগের এমন হিতকর গ্রাম্যকৃষিব্যাঙ্ক আমরা সংস্থাপন করিবার জন্য কি চেষ্টা করিব না? জর্ম্মনি দেশে গ্রাম্য ব্যাঙ্কগুলিতে ১৫০ ক্রোর টাকা খাটিতেছে; অষ্ট্রীয়াতে ২৫ ক্রোর; রুষিয়াতে ২ ক্রোর; ফরাসি ও ইটালী দেশে গ্রাম্য কৃষিব্যাঙ্কে অনেক টাকা খাটিতেছে। কত কৃষক ইহাতে অল্পসুদে কর্জ্জ পাইতেছে, কত স্থানে ইহাতে কত জনের অন্নের সংস্থান হইতেছে। প্রকৃত স্বদেশহিতৈষীদিগের যত্নে, দীনজনবন্ধুদিগের শ্রমে এই সকল গ্রাম্য কৃষিব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইয়াছে। আমাদিগের দেশে কি এমন দীনবন্ধু নাই, এই বিষয়ের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন? প্রথমে অতি ক্ষুদ্র আয়তনে কার্য্য আরম্ভ করিতে পারা যায়।

প্রথমে, একজন লোক নিজের ৫০০৲ টাকাতে ইহার কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন। তাহার পর তিনি অংশীদার লইতে পারেন। এবং এই মূলধন ক্রমে ৫০০০৲ হইতে পারে। ব্যাঙ্কের কয়েকটী নিয়ম থাকা আবশ্যক। শত

করা ১২৲ বার টাকার অধিক সুদ লওয়া হইবেনা। অংশীদারগণ শতকরা ৬৲ টাকার অধিক লাভ লইবেন না। শতকরা ৬৲ সুদের অধিক যাহা আদায় হইবে তাহা মূলধনে যোগ হইবে। যদি কখন কোন টাকা লোকসান হয়, সুদের এই উদ্বৃত্ত টাকা হইতে তাহা পূরণ করা হইবে। এই গেল কর্জ্জ দেওয়ার কথা। এখন টাকা গচ্ছিত রাখার কথা বলিতেছি। ব্যাঙ্কের এইরূপ কোন নিয়ম থাকা উচিত যে, যাঁহারা ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিবেন, তাঁহাদিগের টাকার উপর শতকরা ৬৲ বা ৫৲ করিয়া সুদ পাইবেন, এবং দুই একমাস পূর্ব্বে সংবাদ দিলে তাঁহারা টাকা তুলিয়া লইতে পারিবেন। এই গচ্ছিত টাকা ব্যাঙ্ক শতকরা ১২৲ সুদে খাটাইবেন। যদি গড়পড়তা শতকরা ৯৲ সুদ আদায় হয়, তাহা হইলে এই গচ্ছিত টাকার উপরও ব্যাঙ্কের শতকরা ৩৲ বা ৪৲ লাভ হইতে পারে। এই লাভও অংশীদারগণ লইবেন না। মূলধনে ইহা যোগ করিবেন। কোন টাকা লোকসান হইলে, এই বৃদ্ধি টাকা হইতে তাহা পূরণ হইতে পারিবে। এইরূপ করিলে কোন অংশীদারের বা গচ্ছিতকারীর এক পয়সাও কখনও ক্ষতি হইতে পারিবে না। এই ব্যাঙ্ক সুন্দররূপে চলা আর না চলা, ব্যাঙ্কের কার্য্যাধ্যক্ষের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। কার্য্যাধ্যক্ষ সৎ ও কার্য্যপটু হওয়া আবশ্যক। গ্রামের কোন্ কৃষকের অবস্থা কিরূপ, কাহার চরিত্র কিরূপ, এ সকল বিষয় তাঁহার বিশেষ সন্ধান রাখা আবশ্যক। কাহার নিকট কিরূপ জামিন লওয়া আবশ্যক, তিনিই তাহার সমুদয় অবস্থা জানিয়া স্থির করিবেন। গরিব কৃষকদিগের সম্পত্তি নাই বলিলেই হয়। সুতরাং সম্পত্তি বন্ধক চাহিলে গরিবদিগের ব্যাঙ্ক চলিবে না। তবে জামিন স্বরূপ দুইজন অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন ও সচ্চরিত্র কৃষকের নাম খতে লিখিয়া লইলে যথেষ্ট হইবে। যে কৃষক সচ্চরিত্র, তাহার চরিত্রই উত্তম জামিন। যে ব্যক্তি অলস, মদ্যপায়ী, জুয়াচোর, তাহাকে অবশ্য কার্য্যাধ্যক্ষ টাকা কর্জ্জ দিবেন না। কৃষক টাকা কর্জ্জ লইয়া তাহা কি বিষয়ে ব্যয় করে, তাহার প্রতি যথাসম্ভব নজর রাখাও ভাল।

কার্য্যাধ্যক্ষের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও তাহাকে পরামর্শ দিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা থাকিবে, অংশীদারগণ যাহাকে যাহাকে মনোনীত করিবেন, তাঁহারাই এই সভার সভ্য হইবেন। যাহাকে যত টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে, তাহার হিসাব সকল অংশীদারের দ্রষ্টব্য থাকিবে। যাহাতে অন্ততঃ কথঞ্চিৎ সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক টাকা বাঁচাইয়া ব্যাঙ্কে দিয়া সুদ পায়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টে Savings Bank আছে বটে, কিন্তু তাহাতে ৩৸০ মাত্র সুদ পাওয়া যায়। কৃষিব্যাঙ্কে শতকরা ৬৲ করিয়া সুদ পাইলে কৃষক ঐ ব্যাঙ্কে উদ্বৃত্ত টাকা রাখিতে পারে। ইউরোপে সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকগণ উদ্বৃত্ত টাকা কৃষিব্যাঙ্কে রাখিতেছে। তাহাতে সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকের টাকা নিঃস্ব কৃষকে কর্জ্জ পাইতেছে। এইরূপে, কৃষকের টাকায় কৃষকের সাহায্য হইতেছে। এই জন্য এই সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যকে কেহ কেহ Brotherly Banking বলিয়াছেন। আমাদিগের দেশে কৃষকগণ আপাততঃ ব্যাঙ্কের অংশীদার হইতে পারিবে বা টাকা গচ্ছিত রাখিবে, আমার ততদূর ভরসা হয় না। কিন্তু ব্যাঙ্ক কিছুকাল চলিলে, কৃষকগণ ক্রমে এক দুই জন করিয়া ব্যাঙ্কে যোগ দিতে পারে। জর্ম্মনি এবং ইটালিতে গরিবদিগের জন্য যে সব ব্যাঙ্ক চলিতেছে, তাহাতে এতাবৎকাল একজন অংশীদারের বা গচ্ছিতকারীর একটী পয়সাও লোক-

পান হয় নাই। আমরাও যদি ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় নিয়মগুলি রক্ষা করিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপন করি,এবং ব্যাঙ্কের কার্য্য চালাই,আমাদিগের দেশেও গরিবব্যাঙ্ক বা কৃষিব্যাঙ্ক চলিতে পারে, এবং বর্ত্তমান মহাজনি প্রণালীরূপ রাক্ষসের মুখ হইতে গরিব কৃষকগণকে রক্ষা করিতে পারি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

সামাজিক পবিত্রতা।

অল্পদিন হইল ভবানীপুর সাউথ সুবারবন্ স্কুল-গৃহে সামাজিক পবিত্রতা রক্ষণ সম্বন্ধে একটী বৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তথায় শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়লাল দত্ত যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে লিখিত হইল :—

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, ও সুশিক্ষিত ও স্বদেশানুরাগী ভদ্র মহোদয়গণ, আমি প্রস্তাবিত আবেদন অনুমোদন জন্য বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে ভার প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সভাস্থলে আমার অপেক্ষা অধিকতর সুশিক্ষিত ও সুবিজ্ঞ অনেক লোক উপস্থিত আছেন,তাঁহাদের কাহারও প্রতি এই ভার অর্পিত হইলে উহা অধিকতর দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইত। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ বক্তাদ্বয় তেজস্বী ইংরাজী ভাষায় সারগর্ভ বক্তৃতায় আপনাদের কর্ণে এতক্ষণ অবিশ্রান্ত মধুধারা বর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়োন্মাদক বক্তৃতার পর আমার ক্ষীণ কণ্ঠের নিস্তেজ বাঙ্গালাবক্তৃতা আপনাদের প্রীতিপ্রদ হইবে না। পক্ষান্তরে এই সভাস্থলে আমার অনেক আত্মীয় ও গুরুজন উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার শিক্ষা-গুরু—জীবনের প্রভাত সময়ে আমি তাঁহাদের চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া বিবিধ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছি। বক্তব্য বিষয়টী এরূপ লজ্জা ও সঙ্কোচজনক যে, অনেকস্থলে আমি তাঁহাদের সম্মুখে আমার মনের ভাব পরিষ্কার রূপে প্রকাশ করিতে পারিব না। এই সমস্ত প্রতিকূল ঘটনা সত্বেও আমি সাধ্যানুসারে সভাপতি মহাশয়ের আদেশ প্রতিপালনে যত্নবান হইব।

বর্ত্তমান সভার উদ্দেশ্য আপনাদিগকে বুঝাইবার জন্য আমাকে অধিক ক্লেশ পাইতে হইবে না—যে পবিত্র উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা আজি এই স্থলে সম্মিলিত হইয়াছি, তদ্বিষয়ে সুশিক্ষিত ও সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই প্রাণগত সহানুভূতি আছে। উক্ত উদ্দেশ্য আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণ কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। আজিকার এই আন্দোলন কোন অংশেই নূতন নহে—প্রায় দুই বৎসর হইতে এই আন্দোলন কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে চলিয়া আসিতেছে। কতিপয় সহৃদয় খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক কর্ত্তৃক প্রথমতঃ এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কলিকাতার চারিদিকে অবাধে যে পাপ ও দুর্নীতির স্রোত বহিতেছে, এবং দিন দিন যে স্রোত পরিপুষ্টি লাভে খরতর বেগে ধাবিত হইতেছে, তাহা দমনপূর্ব্বক সামাজিক পবিত্রতা সংরক্ষণ জন্য তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে যত্নবান হন। কলিকাতার প্রায় প্রত্যেক রাস্তায় ভদ্র পরিবারের নিকট বিদ্যালয়, ধর্ম্ম-মন্দির, উপাসনালয় ও সাধারণের প্রকাশ্য সম্মিলন স্থলপ্রভৃতি স্থানের পার্শ্বে অথবা সম্মুখে বেশ্যালয় ও অবৈধাচারী লোকদিগের আবাসজনিত সামাজিক ও পারি-

বারিক পবিত্রতা ও শান্তি বিনষ্ট হইবার ভয়ে, তাঁহারা পাপ ও দুর্নীতি দমনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহৃদয় ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া, সামাজিক পবিত্রতা "Social purity" সমিতিনামে একটিসভা সংস্থাপন করেন। ভদ্র পল্লী, বিদ্যালয়, ও ধর্ম্ম-মন্দির প্রভৃতি স্থানের নিকট হইতে বেশ্যালয় দূরীকরণ, পাপ ব্যবসায়ের জন্য অল্প বয়স্কা বালিকার ক্রয় বিক্রয় নিবারণ ও পাপ-কার্য্যে প্রকাশ্য ভাবে আহ্বান দমন জন্য তাঁহারা বিশেষরূপে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের দল পুষ্ট হইতে লাগিল। গত বৎসর ২৭ এ নবেম্বর তারিখে কলিকাতায় টাউন হলে এই পাপ ব্যবসায় ও দুর্নীতি দমন করিবার জন্য যে বিরাট সভার আয়োজন ও অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদেরই যত্নের ফল। এই মহা সভায় কলিকাতাবাসী প্রায় সকল সম্প্রদায়স্থ লোক সম্মিলিত হইয়া একবাক্যে এই কলঙ্কিত ব্যবসায়ের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান ও পার্শী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সুযোগ্য প্রতিনিধিগণ সভাস্থলে জ্বলন্ত বক্তৃতায় এই পাপ ব্যবসায়ের ঘোরতর প্রতিবাদ করেন, এবং উহা হইতে সমাজের যে কি ঘোরতর অমঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাহা সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখ করেন।

এই সভার পর,দিন ২ উল্লিখিত আন্দোলন ঘনীভূত ও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। অনন্তর উল্লিখিত Social Purity Committee উক্ত ঘৃণিত ব্যবসায়ের প্রতিবিধান জন্য গত ৩রা এপ্রিল তারিখে আমাদের মহামান্য লেপ্‌টেনেণ্ট্ গবর্ণর বাহাদুরের নিকট একখানি আবেদন প্রেরণ করেন। উক্ত আবেদনে তাঁহারা ইংলণ্ডের ১৮৮৫খ্রীঃ অব্দের দণ্ডবিধি আইনের ৪৮ ও ৪৯ ভিক্টোরিয়া ৬৯অধ্যায়ের বিধানানুসারে (English Criminal Law Amendment Act of 1885, 48 and 47 Victoria, Chapter 69) ১৮৬৬সালের ৪আইনের৪৩ ধারা সংশোধন পূর্ব্বক ভদ্রপল্লী হইতে প্রকাশ্য বেশ্যালয় ও বেশ্যাবৃত্তি দমন ও উল্লিখিত ১৮৬৬সালের পুলিস আইনের ৬৬ অথবা ৬৮ ধারা সংস্করণ পূর্ব্বক প্রকাশ্য ভাবে পাপ কার্য্যে আহ্বানও অন্যান্য ঘৃণিতকার্য্য নিবারণ জন্য বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

গত ২৮এ এপ্রিল তারিখে তাঁহারা উল্লিখিত মর্ম্মে আর এক খানি আবেদন পত্র এদেশের প্রধানতম রাজপুরুষ মহামান্য গবর্ণর জেনেরলের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময় কলিকাতার বিভিন্ন মিসনরি সম্প্রদায় ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হইতে আরও কতিপয় আবেদন তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। সকলেই একবাক্যে উক্ত দুর্নীতি দমনার্থে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট উক্ত ৩রা এপ্রিল তারিখের আবেদন সম্বন্ধে কলিকাতার পুলিস কমিসনার মহাশয়ের অভিমত ও মন্তব্য অবগত হইবার জন্য তাঁহার নিকট উহা প্রেরণ করেন। পুলিশ কমিসনর সারজন্ ল্যাম্বার্ট্ সাহেব মহাশয় এই বলিয়া প্রস্তাবিত আইনের প্রতিবাদ করেন যে, উহা বিধিবদ্ধ হইলে, উহা হইতে একটি নূতন অপরাধ সৃজিত হইবে। উহা বিস্তর দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক ও গৃহস্বামীকে আক্রমণ করিবে। তিনি তাঁহার মন্তব্যের উপসংহার ভাগে এই বলিয়া উহার প্রতিবাদ করেন—

"Until a really strong case is made out and until it is shown that the evil as it exists can not be kept in check by the present law, the Government will embark on a change, which the people do not ask for, and which they would resent as an interference with the conditions of Eastern life."

তাঁহার উক্তির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, বর্ত্তমান পুলিশ আইন দ্বারা উক্ত পাপ ও দুর্নীতি দমন করা যায় না, ইহা প্রমাণিত হইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট উক্ত আইনের পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলে, এমন কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, যাহার আবশ্যকতা প্রজাবর্গ অনুভব করে না; এবং যাহা পূর্ব্বদেশীয় রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবে বলিয়া তদ্দেশীয় অধিবাসিগণ বিশেষরূপে অসন্তোষ প্রকাশ করিবে। সার জন ল্যাম্বার্টের বিবেচনায় ভারতবাসী স্বস্ব বাসগৃহের নিকট বেশ্যালয় রাখিতে ও বেশ্যাবৃত্তির প্রশ্রয় দিতে আপত্তি করে না। বেশ্যাবৃত্তিটা যেন তাহারা পাপ বলিয়াই গণনায় আনে না, বেশ্যালয় ও বেশ্যাবৃত্তি যেন তাহাদের সমাজের অঙ্গের ভূষণ! অহো লজ্জা! অহো লাঞ্ছনা!!

মহাশয়গণ, আমি জানিতে চাই, আমার স্বদেশবাসী সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, জাতীয় চরিত্রের এইরূপ কলঙ্কিত চিত্রে যাঁহার মস্তক ঘোর লজ্জা ও ঘৃণায় অবনত না হয়? আমার স্বদেশবাসী কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান, কি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়, আমি বিনীত ভাবে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, জাতীয় চরিত্রে এই দুরপনেয় কলঙ্কারোপজনিত আপনাদের মুখমণ্ডল কি লজ্জা ও ঘৃণায় আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিবে না? আপনাদের শরীরের প্রত্যেক ধমনীতে কি উষ্ণ শোণিতস্রোত প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে না? যদি আপনাদের প্রকৃত আত্মসম্মান বোধ থাকে, জাতীয় চরিত্রে যদি আপনাদের বিন্দুমাত্রও অনুরাগ থাকে, তবে আপনারা নীরব ও নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া মুক্তকণ্ঠে গভীর স্বরে উক্ত কলঙ্কের প্রতিবাদ করুন। জাতীয় চরিত্রে এরূপ দুর্গন্ধময় কলঙ্ক অপেক্ষা লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় আর কি হইতে পারে?

পুলিশ কমিশনর সাহেব মহাশয়ের অভিমত অবলম্বনে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী অনারেবল শ্রীযুক্ত কটন্ সাহেব মহাশয় Purity Committeeর আবেদনের প্রত্যুত্তরে ৮ই জুন তারিখে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে, "ভারতবাসীর সামাজিক রীতিনীতির বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে ইংলণ্ডের দণ্ডবিধি আইনের বিধান এদেশের আইনে সন্নিবিষ্ট হইতে পারেনা"।

("......Under the existing conditions of native social life in India, the provisions of the English law can not be extended to this country.")

গত ২৩এ আগষ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত হিউএট্ সাহেব মহাশয় Purity Committeeর আবেদনের প্রত্যুত্তরে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও সার জন্ ল্যাম্বার্ট সাহেব মহাশয়ের অভিমত অবলম্বিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত বিধান এদেশের পক্ষে অসম্ভব, এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন:—

"The Government of India decided that no change of the kind was called for on any consideration of the Criminal law and that the adoption of the proposal on social grounds was open to objection under the present circumstances of the Indian society."

বড়ই দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, পুলিস কমিসনর মাননীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ও ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রধানতম রাজ কর্ম্মচারী গবর্ণর জেনেরল, সকলেই ভারতবাসীর সামাজিক পদ্ধতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় প্রকৃত অবস্থা জানিতে চেষ্টা না করিয়া, অতি সহজে, একবাক্যে, সভ্য জগতের নিকট এই ঘোষণা

করিলেন যে, প্রস্তাবিত আইনের পরিবর্ত্তন ভারতবাসীর সামাজিক রীতিনীতির প্রতিকূল বিধায়, উহার প্রবর্ত্তনে ভারতবাসিগণ অসন্তুষ্ট হইবে, সুতরাং উহা বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। যে ভারতবাসী চিরদিন পবিত্রতার পক্ষপাতী, যে ভারতবাসী, কি হিন্দু কি মুসলমান, স্বীয় ধর্ম্ম নীতি হইতে সামাজিক পবিত্রতার সম্মান করিতে শিক্ষাপায়, যে ভারতবাসী মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা স্বরূপা ভারত-ললনার চরিত্র কোন রূপ কলঙ্কস্পর্শ হইতে বিমুক্ত রাখিবার জন্য দীর্ঘকাল হইতে রমণীগণের অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী, সেই ভারতবাসীর সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধা ও অসম্মান প্রদর্শন একান্ত অসঙ্গত ও অন্যায়।

আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, সুশিক্ষিত ও হিতাহিত জ্ঞান-সম্পন্ন ভারতবাসীগণের মধ্যে এমন একজনও হৃদয়বিহীন ব্যক্তি নাই, ভারতবর্ষের সামাজিক ও পারিবারিক পবিত্রতা ও শান্তি অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন মঙ্গলকর বিধান প্রবর্ত্তন করিলে যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট চিত্তে উহার প্রতিবাদ করিবে। জননী, স্ত্রী, ভগিনী ও পুত্রকন্যা প্রভৃতিকে লইয়া পবিত্র সমাজে শান্তিময় গৃহে বাস করিতে কাহার অনিচ্ছা? কয়জন লোক সাধ করিয়া দুর্গন্ধময়, অপবিত্র, অস্বাস্থ্যকর ও পীড়াজনক স্থানে বাস করিতে ভালবাসে? আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ মল মূত্রাদি দূষিত দুর্গন্ধময় রাস্তা অথবা পয়ঃপ্রণালীর ধারে বাস করিলে যেমন তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ সাধারণের শারীরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ-হইয়া উৎকট রোগ জন্মে, তেমনই দুর্নীতি ও পাপের লীলাক্ষেত্র, অনন্ত প্রলোভনময় বেশ্যা-নিবাসের সন্নিকটে কোন ভদ্র পরিবার বাস করিলে, উক্ত পরিবারের পবিত্রতা ও শান্তির প্রতি আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। মানসিক সুখশান্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ যাহাতে কণ্টক-শূন্য হয়, তৎপক্ষে দূরদর্শী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যে প্রলোভনময় দূষিত স্থান হইতে চিত্ত-বিকার জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা এবং যাহা হইতে দুর্ব্বল নরনারীর অধঃপতন অনিবার্য্য, সেই ঘৃণিত প্রলোভনময়স্থান ভদ্র পরিবার মাত্রেরই সযত্নে পরিত্যাগ করা উচিত।

এই কলিকাতা সহরের চারিদিকে দিন দিন দুর্নীতি ও পাপের স্রোত যেরূপ দ্রুতবেগে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তাহার প্রতিবিধান একান্ত আবশ্যক। সমস্ত কলিকাতার মধ্যে ৫।৭ পাঁচ সাতটি প্রকাশ্য রাস্তা ভিন্ন এমন রাস্তা নাই, যেখানে ভদ্র পরিবার, স্কুল, ধর্ম্ম-মন্দির ও প্রকাশ্য সম্মিলন স্থল প্রভৃতি স্থানে বেশ্যালয় ও অবৈধাচারী লোকদিগের আবাস না আছে। অনেক স্থানে এই সকল শ্রেণীর লোকেরা এমন ভাবে সজ্জিত ও দলবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকে যে, সেই সকল স্থানের নিকট দিয়া পিতা পুত্রের সহিত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের সহিত এক সঙ্গে গমনাগমন করিতে একান্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করেন। ভিন্ন ভিন্ন পল্লীগ্রামবাসী প্রায় দুই তিন সহস্র বালক ও অপরিণত বয়স্ক যুবক কলিকাতার স্কুল ও কলেজ সমূহে বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে, এখানে তাহাদের অভিভাবক অল্পই আছেন, অনেক স্থলে তাহারা আপনারাই স্ব স্ব তত্ত্বাবধায়ক। তাহারা যে সকল স্কুল বা কলেজে পাঠ করে, সেই সকল স্কুল ও কলেজের নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান বেশ্যানিবাসে পরিপূর্ণ। প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসিতে ও তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে উল্লিখিত বালক ও যুবকগণ কি দেখিতে পায়? পাপ-পথের

প্রলোভন প্রতিদিন দেখিয়া দেখিয়া কয়জন পুণ্য-পথে স্থির থাকিতে পারে? কয়জন অবিকৃত চিত্তে স্ব স্ব চরিত্রের বিমলতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়? অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, এই সকল প্রলোভন প্রতিদিন তাহাদের সম্মুখে অবারিত ভাবে বিদ্যমান থাকায় অনেকের পদস্খলন হইয়াছে—তাহাদের কলঙ্কিত চরিত্রের দোষে তাহাদের ভবিষ্যজীবন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে!

আমরা আজি যে বিদ্যালয়ে সম্মিলিত হইয়াছি,এই বিদ্যালয়ের অবস্থা ক্ষণকালের জন্য আপনারা চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, এখানে সুকুমারমতি বালকদিগের অধ্যয়ন কতদূর আশঙ্কার বিষয়। এই স্কুলের সম্মুখস্থ সদর রাস্তার উভয় পার্শ্বে অনেকগুলি বেশ্যালয় বিদ্যমান রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের অল্প বয়স্ক ছাত্রগণ রাস্তা দিয়া আসিবার ও যাইবার সময় কি দেখিতে পায়? কোন্ বিষয় তাহারা ভাবে? এই সকল পাপ-প্রলোভন হইতে অনেক দুর্ব্বল-চিত্ত বালকের চরিত্র কলুষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সাধারণ হিতকর-স্থানের নিকট হইতে এই সকল কলঙ্ক দূরীকরণ সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

কেহ কেহ মনে করেন, পুরুষের চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে দুশ্চরিত্রা বেশ্যা,সমাজের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। এই জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে প্রকাশ্য ভাবে পুরুষজাতিকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, "অগ্রে তোমরা ভাল হও, পরে বারাঙ্গনাদিগের চরিত্র সমালোচনা পূর্ব্বক তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য উদ্যোগী হইও। তোমাদের মন দৃঢ় হইলে কে তোমাদিগকে অসৎ পথে লইয়া যাইতে পারে? পুরুষের সঙ্গে মিলিত হইতে না পারিলে তাহারা আপনারাই পাপ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবে, অতএব তাহাদের ভয়ে ভীত হইবার কোন কারণ নাই।" এইরূপ উপদেশ যে কতদূর সুসঙ্গত, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমার বিবেচনায় যাঁহারা এরূপ উপদেশ দান করেন, তাঁহারা অদূরদর্শী ও মানব-হৃদয়-তত্ত্ব-অনভিজ্ঞ। বারাঙ্গনাদিগের প্রলোভন ও বিবিধ বিভ্রম-বিলাস অনেক সময় অন্তঃপুরবাসিনী কুসুম-শোভনা বালিকা ও সরলতাময়ী যুবতীর চিত্ত-বিকার ও অধঃপতনের কারণ হইয়াছে, একথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। পক্ষান্তরে এমন সুকৃতিশালী যুবক কতজন আছেন, যাঁহারা সহজে সমস্ত প্রলোভন জয় করিয়া স্ব স্ব চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষণে সমর্থ? মানুষ যতই জ্ঞানী ও দূরদর্শী হউন, যতই তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল ও অন্তঃকরণ সমুন্নত হউক, তিনি দুর্ব্বল; সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুরুষগণও অনেক সময় স্ব স্ব চিত্তের দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রলোভনের দাসত্ব স্বীকার করেন, অধঃপতনের পথ যখন অতি সুগম, এবং একবার সে পথে ধাবিত হইলে সহজে যেমন পুণ্য-পথে প্রত্যাবর্ত্তন দুঃসাধ্য, তখন দুর্ব্বল নর-নারীর সম্মুখ হইতে প্রলোভনজনক পদার্থ দূরে রাখা কি প্রার্থনীয় নহে? প্রলোভন জয় করিতে না পারিয়া কত লোক পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে—প্রলোভনের অনিবার্য্য মোহিনী ও উন্মাদিনী শক্তিতে কত নর-নারীর সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। পৃথিবীর নানা জাতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে এই সকল দুর্দ্দশাগ্রস্ত নর-নারীর দুর্গতির অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। আমি আপনাদিগকে আমাদিগের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে এইরূপ একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। যাঁহারা এই ধর্ম্মগ্রন্থ ধীর মনে পাঠ

করিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ ব্রাহ্মণকুমার বিশুদ্ধস্বভাব সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ অজামিলের উপাখ্যান ভুলিয়া যান নাই। অজামিল জনৈক গৃহাশ্রমবাসী সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণের পুত্র। ইনি শ্রুতসম্পন্ন, সুস্বভাব, সদাচার,ক্ষমাদি বিবিধ গুণে অলঙ্কৃত, শুদ্ধ ব্রতধারী, মৃদু, দান্ত, শুচি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও শাস্ত্রানুশীলনানুরাগী ছিলেন। ইনি অহঙ্কার শূন্য হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে গুরু ও বৃদ্ধবর্গের সেবা করিতেন। একদিন এই আদর্শ-চরিত্র অজামিল পিতৃআজ্ঞায় বনে গমনপূর্ব্বক তথা হইতে ফল, পুষ্প, সমিধ ও কুশ আহরণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় তিনি সহসা তাঁহার সর্ব্বনাশের বস্তু সম্মুখে দেখিয়া একান্ত মোহিত হইলেন—তাঁহার ঘোরতর চিত্তবিকার জন্মিল, মহাগ্রন্থে উহার এইরূপ বর্ণনা আছেঃ—

"দদর্শ কামিনং কঞ্চিচ্ছূদ্রং সহ ভুজিষ্যয়া।
পীত্বাচ মধু মৈরেয়ং মদা ঘূর্ণিত নেত্রয়া॥
মত্তয়া বিশ্লথন্নীব্যা ব্যপেতং নিরপত্রপং।
ক্রীড়ন্তমনু গায়ন্তং হসন্তমনয়ান্তিকে॥
দৃষ্ট্বাতাং কামলিপ্তেন বাহুনা পরিরম্ভিতাং।
জগাম হৃচ্ছয় বশং সহসৈব বিমোহিতঃ॥

আমি এই শ্লোকের অনুবাদ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না—এই সভাস্থলে অনেক সুকুমারমতি বালকের সমাগম হইয়াছে, উহার লজ্জাজনক অনুবাদ তাঁহাদের নিতান্ত অশ্রাব্য। সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সেই নীচ জাতীয় বেশ্যার কুহকে ভুলিয়া অজামিল স্বীয় অমূল্য ধন পবিত্র চরিত্রে জলাঞ্জলি দিলেন, জ্ঞান ও ধর্ম্ম হারাইলেন, অবশেষে পিতার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়া পথের ভিখারী হইয়া নিতান্ত হীনবেশে জীবন অতিবাহিত করিলেন।

দীর্ঘকাল চরিত্রের চারু শোভায় আত্মীয় বন্ধুগণেরপ্রীতিবর্দ্ধনওভালবাসা লাভ করিয়া,সহসা একদিন সম্মুখে দুর্জ্জয় প্রলোভনের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছে, এরূপ নরনারীর বিস্তর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা একান্ত অনাবশ্যক—একমাত্র অজামিলের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট শিক্ষা ও চিন্তার বিষয়। এখনও কি বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সানুনাসিক স্বরে পুরুষদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিবেন—"তোমরা আপনারা ভাল হও, বারাঙ্গনাগণ সমাজের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না!"

বারবিলাসিনীদিগকে একবারে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত কর, বেশ্যাবৃত্তিটা চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া যাউক, এমন হাস্যজনক প্রস্তাব করিতে আমরা কখনই প্রস্তুত নহি। আমরা জানি, এমন দেশ নাই, যেখানে বারাঙ্গনা ও অসতী রমণী নাই; এবং এমন সমাজ নাই, যেখানে প্রকাশ্যভাবে অথবা গোপনে বারাঙ্গনা-বৃত্তি চরিতার্থ না হয়। দেশ হইতে এই জঘন্য কলঙ্কিত বৃত্তির বিলোপসাধন একটি অভাবনীয়, অসম্ভাব্য বিষয়। সমাজের সমবেত শক্তি প্রয়োগেও যে পাপের অস্তিত্ববিলোপ দুঃসাধ্য, সেই পাপের চিহ্ন মাত্র দেশ হইতে বিলুপ্ত হউক, এরূপ অসঙ্গত বাক্যের অবতারণায় আমরা জগতের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু আমরা সাহসের সহিত এই ন্যায়ানুমোদিত প্রস্তাব ও প্রার্থনা করিতে বাধ্য যে, যখন উল্লিখিত পাপ এককালে সমাজ হইতে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইতে পারে না, তখন সামাজিকওপারিবারিক মঙ্গলের জন্য, উহা স্বকীয় দুর্গন্ধময় ঘোরতর মানসিক বিকারজনক কলঙ্ক রাশি লোক চক্ষুর অগোচরে গভীর অন্ধকারে লুকাইয়া

রাখুক—উহাকে উজ্জ্বল আলোকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে উহার অনিবার্য্য মোহময় প্রলোভন রাজি বিস্তার করিবার অবসর ও সুবিধা দান করিও না। তাহা হইলে সহজেই সামাজিক ও পারিবারিক পবিত্রতা ও শান্তি সুরক্ষিত হইবে।

বালিকা ক্রয়-বিক্রয় রূপ ঘৃণিত ব্যবসায় দ্বারা সমাজের যে কি ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা মনে হইলে সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। বালিকার পবিত্র জীবন লইয়া ব্যবসায়? প্রলোভন অথবা ভয়ে বাধ্য করিয়া চারুশীলা বালিকাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কলঙ্কিত পশুবৃত্তিতে নিয়োজন? এই লোমহর্ষণ ঘৃণিত পাপদমনের জন্য যথার্থই কি কোন উপায় বিহিত হইবেনা? যাহারা সংসারের কোন ছলনা, কোন প্রলোভন জানে নাই, সেই অবোধ সরল প্রকৃতি বালিকাদিগকেও তাহাদের দরিদ্র পিতামাতার নিকট হইতে শাক-মাছের ন্যায় সামান্য অর্থে ক্রয় করিয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা দানে তাহাদিগকে কলঙ্কিত পাপব্যবসায়ে দীক্ষিত করিয়া, তাহাদের ক্লেশকর জীবনের উপার্জ্জিত অর্থে কত পাষণ্ড অনায়াসে পরম সুখে স্ব স্ব জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। সমাজ এই সকল পামরদিগের দণ্ডবিধানে অক্ষম; কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের সুসভ্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কি তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানে উদাসীন থাকিবেন? প্রতিবৎসর সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে কতশত নিষ্কলঙ্ক বালিকা, ছলে, কৌশলে বা অর্থবলে সংগৃহীত হইয়া দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণের ভরণ পোষণের জন্য ভয়াবহ দুষ্কর্ম্মে নিয়োজিত হইতেছে—কত শত নয়নাভিরাম কুসুম-কোরক কালে নরকের কীট-দষ্ট হইয়া অনুতাপ, ক্ষোভ, জ্বলন্ত মর্ম্ম বেদনা ও নিরাশার অন্ধকারে স্ব স্ব দুর্ব্বহ জীবন ভার কোন রূপে বহন করিতেছে—কে তাহাদের মরুময় জীবনে শান্তিবারি বর্ষণ করিবে? সুনীতি-সম্পন্ন উদার পরদুঃখকাতর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, এই পাশব-বৃত্তি হইতে অবলা সরলা বালিকাকে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান আইনের সুসংস্কৃত বিধান প্রণয়নে তুমি ভীত? অহো লজ্জা! অহো ঘৃণা!! যে পুণ্য-পুঞ্জময় প্রভূত পরাক্রমশালী জাতি, জগতের বিশাল বক্ষ হইতে চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত দাস-ব্যবসায়ের উচ্ছেদ-সাধন জন্য এক সময় অকাতরে কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয় ও প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রমে সমগ্র সভ্য জগতের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সেই মহৎ জাতীয় সুসন্তানগণ, যাঁহাদের হস্তে এই বিশাল ভারতের শাসনদণ্ড শোভা পাইতেছে—যাঁহারা কোটী কোটী নিস্তেজ, দুর্ব্বল ভারতবাসীর অদৃষ্ট-বিধাতা স্বরূপে ভারতক্ষেত্রে বিরাজিত রহিয়াছেন, সেই অতুল ক্ষমতাশালী মহাত্মাগণ কি সৃষ্টির সার নারীজাতির এই মর্ম্মভেদী দুর্গতি দমনের জন্য বর্ত্তমান আইনের সামান্য রূপ পরিবর্ত্তন সাধনে সাহসী হইবেন না? সুসভ্য খ্রীষ্টান গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সদনুষ্ঠানের প্রতি এরূপ উপেক্ষার পরিচয় পাইলে আমাদের হৃদয় গভীর বিষাদে পরিপূর্ণ হয়।

কেহ কেহ মনে করেন যখন গবর্ণমেণ্ট Age of Consent Bill বিধিবদ্ধ করেন, তখন সমগ্র ভারতবর্ষে যে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল, তদ্দর্শনে গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইয়াছেন। আবার যদি সেই রূপ ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং প্রজাবর্গ অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে, এই ভয়ে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত আইন প্রবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের এরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক। Age of Consent Bill ও বর্ত্তমান আইনের প্রস্তাবিত সংশোধন ও

পরিবর্ত্তন,দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির বিষয়। একটি চিরপ্রচলিত সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি কঠোর হস্ত ক্ষেপ করিতে প্রয়াসী ভাবিয়া, সমাজের সমবেত শক্তি, তাহার বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল, অপরটি সমাজের কোন প্রথা বা রীতি নীতির প্রতি হস্ত ক্ষেপ করিবেনা; অথচ পাপ ও দুর্নীতি হইতে সমাজকে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিবে,এই ভাবিয়া,সমাজের সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই, কোন বিশেষ পাপ দমনের জন্য, বর্ত্তমান আইনের পরিবর্ত্তন প্রয়াসী। (Age of Consent Bill) যখন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল, তখন সমাজের অনেক প্রধান প্রধান চিন্তাশীল ব্যক্তি এই ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন,এদেশের সমাজসংস্কার,এদেশের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক বিহিত হওয়াই প্রার্থনীয়; বিদেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী এবং দেশীয় আচার ব্যবহারানভিজ্ঞ রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক কোন সংস্কার সাধিত হইলে তাহা জনসাধারণের প্রীতিপ্রদ হইবে না। পক্ষান্তরে অনেক স্থলে তাহা অশান্তি ও অত্যাচারের কারণ হইবে। এই ধারণা হইতেই সমস্ত দেশ মধ্যে উহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল। প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে কাহারও সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই; সুতরাং উহার বিরুদ্ধে কোন সামাজিক আন্দোলন উপস্থিত হইবারও সম্ভাবনা নাই।

কেহ কেহ মনে করেন,আমাদের দেশীয় অনেক ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি এই আন্দোলনের বিপক্ষাচরণ করিবেন, তাঁহাদের নিজ নিজ স্বার্থ তাঁহাদিগকে উক্ত কার্য্যে উৎসাহিত ও নিয়োজিত করিবে। তাঁহাদের অনেকগুলি বাড়ী সহরের মধ্যে বেশ্যাগণের নিকট ভাড়া দেওয়া রহিয়াছে,অথবা এরূপ ব্যক্তির নিকট ভাড়া দেওয়া আছে, যাহারা তাহা পাপ ও দুষ্ক্রিয়ার জন্য সর্ব্বক্ষণ উন্মুক্ত রাখিয়াছে। উল্লিখিত গৃহস্বামিগণ ঐ সকল গৃহ হইতে মাসে মাসে বিস্তর টাকা ভাড়া পান। এই পাপব্যবসায় ও দুষ্কার্য্য নিবারিত হইলে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে, সুতরাং তাঁহারা বর্ত্তমান আন্দোলনের প্রতিবাদ করিবেন। তাঁহাদের অনুমান কিয়ৎপরিমাণে সত্য হইলেও, আমি কখনই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিনা যে,উল্লিখিত গৃহস্বামিগণ স্ব স্ব স্নেহাস্পদ পুত্রকন্যা ও সমাজের কল্যাণের প্রতি মমতাবিহীন হইয়া নির্লজ্জভাবে উক্ত আন্দোলনের প্রতিকূলাচরণ করিবেন। কয়দিনের জন্য এই সংসার,কয়দিনের জন্য এই সংসারের ঐশ্বর্য্য ও সম্পদের গৌরব? অল্পদিন পরেই আমাদিগকে এই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইতে হইবে। যখন অল্পদিনের জন্যই এই পৃথিবীর সহিত আমাদের সম্বন্ধ, তখন মৃত্যুর সময় এই সংসার হইতে বিদায় লইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্যশালী পিতামাতা স্ব স্ব প্রাণারাম পুত্রকন্যাগণকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়া অনন্ত প্রলোভনময় পাপ ও দুর্নীতিপূর্ণ স্থানে রাখিয়া যাইবার পরিবর্ত্তে পরিমার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ সমাজে তাহাদিগকে নিরাপদে রাখিয়া বিপুল ধনসম্পত্তির সহিত তাহাদিগকে চরিত্রের বিমলতা ও সুনীতির প্রতি অনুরাগ উইল করিয়া যাইতে পারিলে কি তাঁহারা আপনাদিগকে যথার্থ সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিবেন না? এইরূপ মহৎ ও পবিত্র কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রত্যেক সন্তান-হিতৈষী পিতা স্বীয় পুত্রকন্যার প্রতি

তাঁহার প্রকৃত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন। কত ঐশ্বর্য্যশালী যুবক প্রলোভন ও কুসংসর্গে পতিত হইয়া পিতা-মাতার বিপুল সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছে। তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়াও কি ধনশালী পিতামাতা সাবধান হইবেন না? যে সমাজে পবিত্রতা ও সুনীতির বাতাস বহিতে থাকে, সেখানে লোকে জনসাধারণের মতকে অবজ্ঞা করিয়া প্রকাশ্যভাবে অবৈধাচরণে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হয় না; সেইরূপ স্থান ভদ্র পরিবারের বাসের উপযুক্ত। পক্ষান্তরে যেখানে দুষ্কর্ম্মপরায়ণ নরনারী সাধারণের মতকে তৃণবৎ অবজ্ঞা করিয়া শতবিধ পাশবিক আচার ব্যবহারে সমাজের মুখ দুর্গন্ধময় কলঙ্কে সমাচ্ছন্ন ও পারিবারিক পবিত্রতা ও সুখশান্তি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত করিতে প্রয়াসী, সেই ঘৃণিত স্থান ভদ্র পরিবারের অবাস ভূমি না হইয়া ভূত-প্রেতদিগের ক্রীড়াভূমি হইবে; প্রকৃত হৃদয়বান মনুষ্য সেই অপবিত্র স্থানকে একান্ত ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিবে।

মহাশয়গণ, যখন এই সভার আয়োজন হয়, তখন অনেক গুলি সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোক এই বলিয়া নিরাশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "সভার উদ্দেশ্য সুমহৎ হইলেও উহার সমস্ত অনুষ্ঠান বিফল হইবে—সভার সমস্ত প্রার্থনা ন্যায্য হইলেও উহা অরণ্যে রোদনের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইবে। কে তাহাতে কর্ণপাত করিবে? আমাদের প্রবল ক্ষমতাশালী গবর্ণমেণ্ট যেমন অনেক সময় আমাদের অনেক ন্যায়ানুমোদিত সকাতর প্রার্থনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, এই সভার ন্যায্য প্রার্থনাতেও সেইরূপ অনাস্থা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করিবেন।" আমি বুঝিতে পারিনা, তাঁহাদের নিরাশার প্রকৃত কারণ আছে কিনা। আমি একথা কখনই বিশ্বাস করিতে পারিনা যে, আমাদের সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট দুর্নীতি ও পাপ দমন পূর্ব্বক প্রজাবর্গের কল্যাণ সাধনে উদাসীন থাকিবেন। সে দিন ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিসনর ন্যায়পরায়ণ ও সুনীতির সম্মানকারী স্যার আলেকজ্যাণ্ডার মেকেঞ্জি সাহেব মহোদয়ের পবিত্রতার প্রতি অনুরাগ ও সৎসাহসের পরিচয় পাইয়া আমরা যারপরনাই পুলকিত হইয়াছি। দীর্ঘকাল হইতে ব্রহ্মদেশবাসী অনেক গুলি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ী ইংরেজের চরিত্র কলুষিত হইয়াছে। তাহারা তদ্দেশীয় রমণীগণের সহিত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে পাপে লিপ্ত হইয়া ইংরেজচরিত্রে গভীর কলঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছিল। একজন রমণীকে ছাড়িয়া অপরের প্রতি আসক্ত হইয়া, তাহাদের সংসর্গজাত পুত্রকন্যাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়া, ইতিপূর্ব্বে কত উচ্চপদস্থ ইংরেজ নির্ভয়ে স্বদেশে বা স্থানান্তরে গমন করিয়াছে। এই সকল কর্ম্মচারীর দুর্নীতি ও দুরাচার হইতে অনেক স্থলে রাজকার্য্যে কতই বিঘ্ন ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত। ইতিপূর্ব্বে আর কোন প্রবল ক্ষমতাশালী শাসনকর্ত্তা এই সকল দুর্ব্বৃত্ত কর্ম্মচারীদিগকে শাসন পূর্ব্বক সৎপথে আনিতে যত্নবান হন নাই। স্যার আলেকজ্যাণ্ডার বাহাদুর ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান দূষিতচরিত্র রাজপুরুষদিগের কলঙ্ক আর সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি প্রথমতঃ তাহাদিগকে গোপনে সতর্ক হইতে বলেন, তাহাতেও তাহারা সাবধান হইল না দেখিয়া সংপ্রতি তিনি প্রকাশ্য সভাস্থলে তাহাদিগকে বিশেষরূপে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে ঐ সকল দুরাচারী লোকদিগকে জানাইয়াছেন যে,

তাহাদের সহিত আচরণে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনিষ্ট জন্মিতেছে, অতএব উহা দমন করা একান্ত আবশ্যক। যে মগ রমণীর সহিত বাস করে, সে ইংরেজকুলের কলঙ্ক স্বরূপ—সে আর ইংরেজ নামে পরিচিত হইবার উপযুক্ত নয়—সে এ দেশে কোন সদনুষ্ঠানের অনুপযুক্ত। ইংরেজশাসনপ্রণালী যে কেবল বিশুদ্ধ হইবে, তাহা নহে, ব্রহ্মদেশবাসিগণ যেন বুঝিতে পারে যে, ইংরেজশাসনপ্রণালী সর্ব্বথা নিষ্কলঙ্ক। রাজকর্ম্মচারিগণ তদ্দেশীয় রমণীগণের সহিত অবৈধ সংসর্গ করিলে, তদ্দেশ-শাসন কখনই কলঙ্ক পরিশূন্য হইতে পারে না। তিনি ঐরূপ কর্ম্মচারীকে দেশের কলঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের ভয়ের কারণ জ্ঞান করেন। তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তিনি কাহারও গুপ্ত চরিত্র অন্বেষণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু যে সকল কর্ম্মচারী দুশ্চরিত্র বলিয়া পরিচিত, তিনি কখনও তাহাদের পদোন্নতি বিধান করিবেন না এবং নানারূপে তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করিতে যত্নবান হইবেন। আশা করি, স্যার আলেকজ্যাণ্ডারের এই কঠোর দণ্ডাজ্ঞা হইতে ব্রহ্মদেশে শুভ ফল উৎপন্ন হইবে।

আমাদের দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ স্যার আলেকজ্যাণ্ডারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক এদেশের পাপাসক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি ঐরূপ শাসন ভয় প্রদর্শন করিলে, বর্ত্তমান দুর্নীতির স্রোত অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। শুনিতে পাই, এদেশের অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে দুর্নীতি ও দুষ্কার্য্যের প্রশ্রয়দান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের চরিত্র সুসংযত নহে; আমাদের ন্যায়বান, সুনীতির উপাসক লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর তাঁহাদিগের প্রতি সাহস পূর্ব্বক কোন রূপ ভয় প্রদর্শন করিলে বর্ত্তমান দুর্নীতির প্রতি অনেকের নিরুৎসাহ ও অনাস্থা জন্মিবে; সুতরাং পাপের স্রোত আপনা হইতেই সঙ্কুচিত ও মন্দীভূত হইবে। প্রজার হিতের জন্য উদার শাসন প্রণালীর প্রয়োজন। প্রজার মঙ্গলেই গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল; প্রজার সুখশান্তি ও তৃপ্তিতেই ন্যায়ানুরাগী গবর্ণমেণ্টের সুখ-শান্তি ও সম্পদ নির্ভর করে। আমাদের বর্ত্তমান মাননীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মহাশয় কি লক্ষ লক্ষ প্রজার কল্যাণের জন্য আমাদের এই ন্যায়ানুমোদিত প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন না? আমাদের আবেদন কি সত্য সত্যই নিষ্ফল হইবে? একথা ভাবিতেও অত্যন্ত কষ্ট হয়!

মহাশয়গণ, আজিকার এই সভাস্থলে আপনারা ঈশ্বরের নাম স্মরণপূর্ব্বক পাপকার্য্যার্থে বালিকা বিক্রয় রূপ জঘন্য ব্যবসায়ের অস্তিত্ব লোপ ও ভদ্রপরিবার ও সাধারণ হিতকর স্থানের নিকট হইতে বেশ্যালয় দূর করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন। যাহাতে কলিকাতার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ অনেকগুলি মহাসভার আয়োজন হয়, তজ্জন্য আপনারা সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান হউন। কলিকাতা মহানগরীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান এই আন্দোলনে উত্তেজিত হউক। একদিনে সহজে এই গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান একান্ত অসম্ভব, দশ দিনেও উহার কিছুই হইবে না; পক্ষান্তরে দশমাস কাল নিয়ত যত্ন ও পরিশ্রম করিলেও যদি উহার প্রতিবিধান না হয়, তথাপি যেন আমাদের অধ্যবসায় শিথিল না হয়। আবশ্যক হইলে দশ বৎসরেও যেন আমাদের উৎসাহ ও উদ্যম নির্ব্বাপিত না হয়। যতদিন আমাদের

উদ্দেশ্য সংসাধিত না হইবে, ততদিন যেন আমরা আমাদের সমবেত শক্তি প্রয়োগে এই আন্দোলন ঘনীভূত করিতে সাধ্যানুসারে যত্নবান হই। দিন দিন এই আন্দোলন-স্রোত চতুর্দ্দিকে খরতরবেগে প্রবাহিত হউক। ক্ষীণ জলস্রোত যেমন অনিশ্চিত পর্ব্বত-গুহা হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রথমতঃ অতি ধীরে, অতি নিস্তেজভাবে অগ্রসর হইতে থাকে, ক্রমশঃ যতই দূরবর্ত্তী হয়,ততই তাহার কলেবর পরিপুষ্ট ও শত শাখায় বিভক্ত হইয়া উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার পূর্ব্বক গ্রাম, নদী, বন, উপবন প্রভৃতি স্থান প্লাবিত করিয়া ভীম গর্জ্জনে দ্রুতবেগে সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, এবং তখন যেমন কেহই তাহার গতি রোধ করিতে পারে না, তেমনই বর্ত্তমান আন্দোলন,যাহা প্রথমতঃ কতিপয় শান্তপ্রকৃতি সদাশয় মিসনরীগণের যত্নে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, টাউন হলের মহাসভার পর দিন দিন যাহার অঙ্গ পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে, যতই দিন যাইতেছে, ততই যাহার তেজ ঘনীভূত হইতেছে, ক্রমে যখন দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ও ক্ষমতাশালী লোক উহাতে যোগদান করিবেন, তখন কোন বিঘ্ন বাধা উহার গতিরোধ করিতে পারিবে না—তখন এদেশের গবর্ণমেণ্ট আমাদের ন্যায্য প্রার্থনায় আর উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে সাহসী হইবেন না। সেই জন্য আমি বিনীতভাবে বলিতেছি যে, যদি আমাদের বর্ত্তমান আবেদন বিফল হয়, তাহা হইলে আমরা যেন হতাশ না হইয়া এইরূপ আর দশটি আবেদন প্রেরণ করিতে প্রস্তুত হই। অবিচলিত অধ্যবসায়-পূর্ণ কঠোর সাধনায় জগতের কোন্ বস্তু সুসিদ্ধ না হয়? বঙ্গদেশের পরলোকগত সুকবি দীনবন্ধু মিত্র অতি সুললিত কথায় একটি মহান্ শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেনঃ—

"যে মাটিতে পড়ে লোক উ'ঠে তাই ধ'রে,
বারেক হতাশ হ'য়ে কে কোথায় মরে?
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল,
আজিকে বিফল হ'ল হ'তে পারে কাল।"

আমাদের উদ্যম আজিকে বিফল হইলেও, কালি হয় ত উহা সফল হইতে পারে,এই বিশ্বাস-প্রণোদিত হইয়া যেন আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমরা যদি সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান হই, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ আমাদের সমাজ পাপ ও কলঙ্ক-স্পর্শ হইতে সহজে বিমুক্ত হইবে। সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হইতে হইবে, স্ব স্ব চরিত্রের বিমলতা প্রদর্শনে সাধারণের বিশ্বাস উৎপাদন ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে হইবে—কোনরূপ দুর্নীতি-জনক কার্য্য যেন আমাদের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না পায়। যখন আমাদের দল দিন দিন পরিপুষ্টি লাভ করিবে, —যখন সমাজের চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র লোক স্ব স্ব বিশুদ্ধ চরিত্রের চারুশোভায় প্রতিবাসিগণকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন,তখন দুর্নীতি ও পাপকার্য্যের প্রশ্রয়দাতা বিস্তর লোক তাঁহাদের প্রদর্শিত উজ্জ্বল আদর্শে স্ব স্ব চরিত্র সংগঠনে যত্নবান হইবেন। তখন উল্লিখিত ঘৃণিত পাপ ব্যবসায় ভদ্র সমাজের নিকট হইতে দূরে রাখিতে অধিক ক্লেশ পাইতে হইবে না। তখন যদি আমরা সামাজিক শাসনে উক্ত পাপ দমন করিতে সক্ষম না হই, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের সকাতর প্রার্থনা বিনীতভাবে জানাইলে তাহা উপেক্ষিত হইবে না। ইতিপূর্ব্বে অনেকবার আমাদের প্রবল ক্ষমতাশালী গবর্ণমেণ্ট এদেশবাসিগণের অনেক ন্যায্য প্রার্থনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন কোন উচ্চপদস্থ সুবিজ্ঞ লোকের মনে এই বিশ্বাস আজিও প্রবলরূপে বিদ্যমান আছে

যে, Age of consent Bill বিধিবদ্ধ হইবার সময় দেশের নানা স্থানে বিস্তর লোক উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্ব্বিনীত ভাবে আন্দোলন ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এজন্য এদেশের বিপুল বলশালী গবর্ণমেণ্ট স্বীয় বল বিক্রমের পরিচয় দিবার জন্য জিদ করিয়া উক্ত আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উহাকে পরিবর্ত্তিত ও সুসংস্কৃত আকারে বিধিবদ্ধ করিলে পাছে লোকে মনে করিত যে, গবর্ণমেণ্ট জন-সাধারণের ভয়ে ভীত হইয়া উক্তরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এই আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট কাহারও প্রার্থনা ও পরামর্শে কর্ণপাত করেন নাই। এ কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহা বিচার করিবার এ সময় নয়। আমাদের বর্ত্তমান আন্দোলন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ন্যায়ানুমোদিত। দেশের চতুর্দ্দিক হইতে যখন সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক ধীরভাবে, বিনয় সহকারে, ব্যথিত অন্তরে সকাতর প্রার্থনা সুস্পষ্টরূপে গবর্ণমেণ্টের নিকট জানাইবেন, তখন আমাদের প্রবল শক্তিশালী শাসনকর্ত্তাগণ তাঁহাদের ধর্ম্মানুমোদিত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। বঙ্গদেশের একজন সুবিজ্ঞ দার্শনিক কবি সুললিত কবিতায় একটি মহাসত্য প্রচার করিয়াছেন। সেই সুন্দর কবিতাটি এই—

"অশ্বতেজে ভরা, মৃদু হস্তে মরা,
চারুতার কাছে আর দর্প খাটে কার।"

হৃদয়ের চারুতার সহিত যে সকাতর ন্যায্য প্রার্থনা এদেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের মহাতেজী শাসনকর্ত্তৃগণের নিকট উপস্থাপিত করিবেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের উপাসক রাজপুরুষগণ দর্পের সহিত কখনই তাহা অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইবেন না।

আমাদের বর্ত্তমান লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণর মাননীয় সার চার্লস ইলিয়ট্ একজন সুনীতি ও পবিত্রতার সম্মানকারী সুবিজ্ঞ রাজপুরুষ। তিনি দেশীয় বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও ছাত্রগণের সুনীতির একান্ত অনুরাগী। দেশীয় যুবকগণের চরিত্র সংশোধন ও নৈতিক উন্নতি বিধান জন্য কলিকাতায় "Society for the higher training of young men" নামক যে একটি সভা কয়েক বৎসর হইল সংস্থাপিত হইয়াছে, তিনি তাহার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক বন্ধু। দেশীয় লোকের সুনীতি ও সচ্চরিত্রের প্রতি যাঁহার এরূপ আন্তরিক যত্ন ও অনুরাগ, তিনি বঙ্গদেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিতে যদি বঙ্গদেশের সামাজিক পবিত্রতা ও পারিবারিক শান্তি সুরক্ষিত না হয়, তাহা হইলে আমাদের দুঃখ ও ক্ষোভের সীমা থাকিবে না। আশাকরি বর্ত্তমান আন্দোলনের প্রতি তাঁহার প্রসন্নদৃষ্টি নিপতিত হইবে। তাঁহার যত্নে ও অনুগ্রহে আমাদের ন্যায়ানুমোদিত প্রার্থনা সফল হইবে।

মহাশয়গণ, ইতিমধ্যেই আমি আপনাদের অনেক সময় অধিকার করিয়াছি, আর আমার নূতন বক্তব্য কিছুই নাই। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণ অতি দক্ষতার সহিত যে প্রস্তাবের অবতারণা ও অনুমোদন করিয়াছেন, আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার পোষকতা করিতেছি। *

---

* সামাজিক পবিত্রতা বিষয়ক আন্দোলনে আমাদের গভীর সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য এই প্রবন্ধটী মুদ্রিত হইল। আশা করি, এই বিষয় লইয়া সহযোগী সম্পাদকগণ বিশেষ আন্দোলন করিবেন। ন, স।

শ্রীকৃষ্ণ-যাত্রা।

দেশ হইতে অনেক উপাদেয় পদার্থ অন্তর্হিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-যাত্রা একটি। পূর্ব্বে এই সংস্কার ছিল যে, "কানু ছাড়া গীতই নয়।" অর্থাৎ যে গানে কৃষ্ণ নাম নাই, সে গানই নয়। প্রকৃতই তাই। ভগবানের একটী সর্ব্ব উচ্চ আশীর্ব্বাদ সংগীত। বস্তুতঃ সংগীত ভগবানের নিজস্ব ধন। একটি কথা দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হইবে। শ্রীভগবান্ ভক্তগণকে লইয়া নানারূপ লীলা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লীলা কি? অবশ্য রাসলীলা। এই রাসলীলার সময় তিনি কি করিয়াছিলেন? তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে লইয়া শাস্ত্রালাপ কি তত্ব কথা বিচার করিয়াছিলেন না। সরলা ও কামগন্ধহীন গোপিকাদের সহিত নৃত্য গীত করিয়া মহাভাবে বিভাবিত হইয়াছিলেন। সুতরাং যাঁহাদের কস্মিন্ কালে শ্রীভগবানের উচ্চতম লীলা দর্শন করিবার অভিলাষ থাকে, তাঁহাদের শুদ্ধ তত্বকথা ও শাস্ত্র বিচার শিখিলে হইবে না, তাঁহাদের সংগীত-লম্পট হইতে হইবে।

সকলের সুকণ্ঠ হয়না, অনেকের সংগীত শিক্ষা করার ক্ষমতা নাই। ইহাতে কিছু আসে যায় না। সংগীত শুনিয়া হৃদয় দ্রবীভূত হয়, শুদ্ধ এই অধিকার টুকু হইলেই যথেষ্ট। যাঁহার এই টুকু আছে, তিনিই কোন না কোন কালে, শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার রাসলীলা আস্বাদ করিতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহার এই বৃত্তি প্রস্ফুটিত হয় নাই— যাঁহার কাছে কোকিলের ধ্বনি আর কাকের কুলাকুলি সমান —তিনি পরম ভক্ত হইলেও, রাসলীলা দর্শন ও শ্রবণ তাঁহার ভাগ্যে নাই, কারণ রাসমণ্ডলীতে নৃত্যগীত বই আর কিছুই ছিল না।

রাসলীলা অনেক দূরের কথা। বিশেষ চিহ্নিত ভক্ত ভিন্ন ভগবানের সে লীলা দর্শন করিবার কাহারও অধিকার নাই। কিন্তু সাধারণতঃ শ্রীভগবানের ভজনা সম্বন্ধে সংগীত কিরূপ উপকারী তাহা দেখুন। অধিকাংশ লোকেই শ্রীভগবান্‌কে পুষ্পদিয়া পূজা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ফুলের ন্যায় সুন্দর পদার্থ জগতে আর দেখা যায় না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং কিরূপ সুন্দর, তাহা কুসুম কাননে প্রবেশ করিলেই বুঝা যায়। সুতরাং যখন সুগন্ধময় বেল কি বাতাবীলেবুর ফুল শ্রীভগবানের পাদপদ্মে কোন ভক্ত অর্পণ করেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে যে আনন্দ উদয় হয়, তাহা পরিমাণ করা যায় না। কিন্তু সংগীত দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে পূজা করা, ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। অতি সহজ উপায়ে এই শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষিত হইবে। কোন ভক্ত একটী অতি মনোহর কুসুম হস্তে করিয়া "হরি হরয়ে নমো, কৃষ্ণ যাদবায় নমো" বলিয়া শ্রীভগবানের চরণে উহা অর্পণ করিলে, অবশ্য বিপুল আনন্দ ভোগ করিবেন। কিন্তু ভক্ত আবার "হরি হরয়ে নমো ইত্যাদি" কথা গুলি লইয়া যদি একটী সংগীতের মালা রচনা করেন, এবং উহা শ্রীভগবানের গলায় পরাইয়া দেন, তাহা হইলে তিনি যে আনন্দ ভোগ করিবেন, তাহা পূর্ব্ব আনন্দ অপেক্ষা ঢের বেশী।

নিগূঢ় কথা এই। শ্রীভগবান্‌কে হৃদয় দ্বারাই পূজা করিতে হইবে, জড়দেহ দ্বারা নয়। হৃদয় যদি জড়দেহের মত কঠিন রহিল,

তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার অর্চ্চনাই হইল না। সুতরাং যিনি কোমল হৃদয়ে শ্রীভগবান্‌কে পূজা করিতে পারেন, তাঁহার ভজনাই প্রকৃত পক্ষে সফলজনক। কিন্তু হৃদয়কে দ্রব করিবার ঔষধ যেরূপ সংগীত, এরূপ আর কিছুই নয়। অবশ্য শুদ্ধ ভগবানের নাম কি তাঁহার লীলা স্মরণ করিলেও হৃদয় বিগলিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই নাম কি লীলাগুলি যদি সুস্বরে সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে হৃদয় পাষাণের মত হইলেও দ্রবীভূত হইবার সম্ভাবনা। এমন কি, কখন কখন নাম কি লীলাগুণ শ্রবণে হৃদয় স্পর্শ করিবে না, কিন্তু শুদ্ধ একটী সুস্বর শুনিবামাত্র, হৃদয় তরলিত হইবে, ক্রমে উথলিয়া উঠিবে, এবং ননীর মত কোমল হইয়া যাইবে। সুতরাং পাষাণ হৃদয়, কোমল করিবার অমোঘ অস্ত্র যেরূপ সংগীত, এরূপ আর কিছুই নয়।

জীবের, সঙ্গীতের ন্যায় আশীর্ব্বাদ, কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, দেখা যাউক। প্রথম, সঙ্গীত শ্রবণ দ্বারা হৃদয়টী কাদার মত নরম করিয়া লউন। শেষে সেই বিগলিত হৃদয়ের উপর শ্রীভগবানের লীলার ছবিগুলি অঙ্কিত করুন। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা আরো পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। "হরি বলে আমার গৌর নাচে," এই গীতটি সম্মুখে রাখুন। মুখে বলিতেছেন, "হরি ব'লে আমার গৌর নাচে," কিন্তু হৃদয় পাষাণের মত কঠিন, বাক্যগুলি অন্তর্হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। এরূপ অবস্থায় "হরি ব'লে আমার গৌর নাচে," ইহার একটী উপযোগী সুর দিয়া গাহিতে থাকুন, কি কাহারও দ্বারা গাওয়াইয়া শুনুন। খুব সম্ভবতঃ গীতাকারে পদটী শুনিবামাত্র হৃদয় কোমল হইবে, আর হৃদয়ের উপরস্থ কঠিন আবরণটী খসিয়া পড়িবে। অমনি অন্তর্হৃদয়ে "হরি ব'লে আমার গৌর নাচে" কথাগুলি প্রবেশ করিবে, আর সেগুলির ছাঁচ বসিয়া যাইবে। তখন অন্তর্জগতে একটী অপূর্ব্ব ছবি দেদীপ্যমানরূপে দর্শন করিতে থাকিবেন। সে ছবিটি কি,—না, শ্রীগৌরাঙ্গ মধুর স্বরে হরি বলিতেছেন, আর নৃত্য করিতেছেন; তাঁহার কমল-নয়নে শত শত প্রেমধারা বহিতেছে; ঊর্দ্ধমুখ হইয়া তিনি বারম্বার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতেছেন, আর আনন্দে সঙ্গীদের কোলে গলিয়া গলিয়া পড়িতেছেন। এইরূপে হৃদয় ভাবময় হইয়া উঠিবে; তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতে থাকিবে; ক্রমে ক্রমে এরূপ বিভোর হইয়া যাইবেন যে, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকৃতই আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া,—আর তিনি যেন প্রকৃতই নয়ন-বাণ হানিতেছেন।

সঙ্গীতের দ্বারা এইরূপে কৃষ্ণ ও গৌর-লীলা সংক্রান্ত ঘটনাগুলি হৃদয়ে জীবন্ত করা যাইতে পারে। এই জন্যেই সে কালে গৌর-সন্যাস যাত্রা শুনিয়া অনেকে "বাউরী" হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, আর সংসারে প্রবেশ করিতেন না। এই জন্যই লোকে সেকালে কৃষ্ণযাত্রা শুনিয়া সংজ্ঞা শূন্য হইয়া যাইতেন।

উপরে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে "কানু ছাড়া গীতই নয়," অর্থাৎ যে গানগুলির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কি শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ও গুণ বর্ণিত না হয়, সে সমস্ত গানই বৃথা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অবতারের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারই উচ্চতম। সুতরাং যখন ভগবানকে আস্বাদ করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায় সঙ্গীত, তখন তাঁহার সর্ব্বপ্রধান দু'টি অবতারের ঘটনাগুলি লইয়াই গান করা কর্ত্তব্য।

এই নিমিত্ত পূর্ব্বে প্রায়ই কৃষ্ণ কি গৌর-যাত্রা ভিন্ন অন্য কোন যাত্রা ছিল না। মান,

মাথুর, অক্রুর সংবাদ, প্রভাস, গৌর-সন্ন্যাস, প্রধানতঃ এই পালা গুলিই গীত হইত। বছরের প্রতি পার্ব্বণে লোকে এই যাত্রাগুলি উপর্য্যুপরি শুনিত, তবু যখনই শুনিত, তখনই উহা নূতন বলিয়া বোধ হইত, এবং তখনই মোহিত হইত। গানগুলিতে যেন কোন মাদক দ্রব্য মিশান থাকিত। উহা শুনিবামাত্র লোকে উন্মত্ত হইত।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণ যাত্রা শুনিয়া আমাদের দেশীয় দুই জন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির হৃদয়ে কিরূপ ভাবের উদয় হইত, তাহা শুনিলে অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে, এই যাত্রা কিরূপ ক্ষমতাশালী জিনিস। বারিষ্টার শ্রীযুক্ত ডবলিউ,সি, বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের সহিত একদিন কৃষ্ণযাত্রা সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা হইতেছিল। বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "উহুহু, ও কথা আর মনে করে দিও না। একদিন কাল আমি কৃষ্ণ যাত্রা শুনিয়া পাগল হইতাম। সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত এক আসনে বসিয়া গান শুনিতাম, আর কান্দিতাম, আর হৃদয়ে কত তরঙ্গই উঠিত। এমন কি, যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেলেও দুই তিন দিন আমি বিভোর থাকিতাম। আমার বোধ হয়, এখনও অশ্রুপাত না করিয়া কৃষ্ণযাত্রা শুনিতে পারি না।"

হাইকোর্টের জজ বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিতও একদিন ঐরূপ কৃষ্ণযাত্রা সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার বয়স যখন ১২।১৩ বৎসর, তখন তিনি শোভাবাজার রাজবাটীতে এক রাত্রি বদন অধিকারীর যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলেন। বদন মানের পালা গাহিতেছেন। গুরুদাস বাবু তখন কৃষ্ণকেও চেনেন না, বৃন্দাবনও জানেন না, এবং মানের পালা কি,তাহাও অবগত নহেন। কিন্তু গান শুনিতে শুনিতে তিনি যেন একটী নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন। বদনের প্রেমপূর্ণ সুস্বর, তাঁহার অঙ্গ ভঙ্গি, তাঁহার হাব ভাব দেখিয়া গুরুদাস বাবুর হৃদয়ের কবাট যেন খুলিয়া গেল, এবং "শ্রীবৃন্দাবন" দৃশ্যটী তাঁহার মনে অঙ্কিত হইল! গুরুদাস বাবু বলিলেন যে, যদিও সে ৪০ বৎসরের কথা, তবু সেই ছবিটী তাঁহার হৃদয়ে জাজ্বল্যমানরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এমন কি, যদি কেহ বৃন্দাবন শব্দটী উচ্চারণ করেন, কি কোন পুস্তকে তিনি উহা পাঠ করেন, তখনই তাঁহার বদনের যাত্রা ও সেই "পূরবের" ভাবগুলি মনে উদয় হয়।

হৃদয় দ্রব ও পবিত্রকারী এই অব্যর্থ যন্ত্র লুপ্ত হইয়াছে।* বর্ত্তমান যাত্রা গুলিতে প্রায় কৃষ্ণ ও গৌর নাম ভিন্ন আর সবই আছে। আবার পূর্ব্বে দু'টী বিষয় ভিন্ন যাত্রা হইত না, অর্থাৎ সুসঙ্গীত ও নৃত্য। কিন্তু এখনকার যাত্রায় আর সবই আছে, কেবল গান ও নৃত্যের অভাব। এখনকার যাত্রায় কৃষ্ণ কি গৌর নাম নাই; নৃত্য ও গীত নাই; তবে আছে কি, না বক্তৃতার ছটা, ঢাল তরোয়াল লইয়া লড়াই, আর "ছিন্নমূল দ্রুমের" ন্যায় ঢিব্‌ঢাব্‌ করিয়া পড়া। এখনকার যাত্রা ইংরেজি থিয়েটারের অপভ্রংশ মাত্র। তবে যাঁহারা থিয়েটার করেন, তাঁহারা রাত্রে ঘরের মধ্যে ভাল ভাল দৃশ্যগুলি দেখাইয়া দর্শক মণ্ডলীর একরূপ মনোরঞ্জন করিতে পারেন। কিন্তু যাত্রাওয়ালারা অনেকে ক্ষৌর হইয়া, মেয়ে মানুষ সাজিয়া, থিয়েটারের নকল করিতে গিয়া লোকের মনে কিরূপ ভাবের উদয় করেন, তাহা সহজে অনুভব করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যাত্রা সম্বন্ধে

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একটী মহস্য-জনক কথা বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন যে, "এখনকার যাত্রা ত শুনিতেই পারি না। তবে কোন বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে যদি কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা শুনিতে যাই, তবে একটী বিষয় দেখিয়াই আমি প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করি। যখন দেখি যে, তবলা ও বাওয়া সরাইতেছে, তখনই বুঝিতে পারি যে, যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে একজন না এক-জন ঝপাৎ ক'রে পড়্‌বে। পড়ার আগেই আমি প্রায় প্রস্থান করিয়া থাকি।"

সকলেই, বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা হইতেছে। বস্তুতঃ এইরূপ একটী দলের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এই দলটীর কিঞ্চিৎ সৌরভও বাহির হইয়াছে। বঙ্গ-দেশের একখানি প্রধান পত্রিকা "হিতবাদী" এই যাত্রা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকগণকে জানাইয়াছি যে, সম্প্রতি এই কলিকাতা নগরে একটী কৃষ্ণযাত্রার দল হইয়াছে। যাঁহাদের আশ্রয়ে এই দলটী প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই কৃতবিদ্য, মনস্বী ও রসজ্ঞ বলিয়া দেশ-প্রসিদ্ধ ; সুতরাং ইহা যে অতি অপূর্ব্ব হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ অমৃতবাজার পত্রিকার অধ্যক্ষেরা এই দলটি প্রস্তুত করিতে কেবল প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াই নিরস্ত হন নাই, বিস্তর কায়িক পরিশ্রম দ্বারাও ইহার অঙ্গপুষ্টি করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণে না জানিতে পারেন, কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকগণের বিশেষ বিশেষ বন্ধু বান্ধবগণ জানেন যে, ইঁহারা সংগীত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী এবং ইঁহাদের ন্যায় সুগায়ক অতি অল্প পাওয়া যায়। আবার ইঁহারা যেরূপ কালোয়াতী গানে পটু, তেমনি কীর্ত্তন পারদর্শী। সুতরাং ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে যে দল প্রস্তুত হইয়াছে, সেই দলের লোকে যে সংগীত সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট শিক্ষা পাইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। আবার বাবু শিশিরকুমার ঘোষের ন্যায় রসিক ভক্ত আজ কাল কে আছেন? সুতরাং তিনি কৃষ্ণলীলার যে পালাগুলি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে যে কোন রসাভাস নাই, ইহাও বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ যাঁহারা এই যাত্রা শুনিয়াছেন, তাঁহারা একেবারে বিমোহিত হইয়া গিয়াছেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বৈঠকখানায় এই যাত্রা দুই দিন হইয়াছিল। মহারাজা বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি অতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করেন। মহারাজা ও অন্যান্য শ্রোতৃবর্গ এক স্বরে বলিয়া উঠিলেন যে, এরূপ অপূর্ব্ব যাত্রা তাঁহারা অধুনা শুনেন নাই। অনারেবল জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনেও এক দিন এই যাত্রা হইয়াছিল। আমরা শুনিলাম, গুরুদাস বাবু এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, মাঝে মাঝে তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। যখন এরূপ উচ্চ পদস্থ সমুদায় লোক যাত্রার সুখ্যাতি করিতেছেন, তখন আর ইহার বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। অমৃতবাজার পত্রিকার অধ্যক্ষগণ মাসে প্রায় চারি শত টাকা ব্যয় করিয়া এই যাত্রার দলটি এতদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এ ভার তাঁহারা চিরকাল বহন করিতে পারেন না, সুতরাং ধনাঢ্য ও সঙ্গীত-প্রিয় হিন্দুমাত্রেরই এই দলটি পরিপোষণ করা কর্ত্তব্য। এই দলের অধ্যক্ষ পণ্ডিত সৃষ্টিধর চট্টোরাজ। ইনি একজন ভাল সংস্কৃতজ্ঞ এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও গোস্বামী-শাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। বিশেষতঃ ইনি পরম ভক্ত। ইনিই এই দলে দূতীর অভিনয় করেন। যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ জানিতে চান, তাঁহারা ২ নং আনন্দ চাটুর্য্যের লেন—বাগবাজার, উক্ত শ্রীযুক্ত সৃষ্টিধর চট্টোরাজের নিকট অনুসন্ধান করিবেন। আমরা বিশেষ অনুরোধ করি, সকলেই যাত্রা একবার শ্রবণ করুন।"

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের বৈঠকখানায় যে দুই রাত্রি গান হইয়াছিল, সে সভায় আমরা উপস্থিত ছিলাম। মহারাজা বাছিয়া বাছিয়া সহরের অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ বদন অধিকারীর যাত্রা শুনিয়াছেন। ইঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া বলিলেন যে, বদনের পরে এরূপ যাত্রা তাঁহারা আর শুনেন নাই।

প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত সকলেই চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় গান শ্রবণ করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে এরূপ তরঙ্গ উঠিয়াছিল যে, কেহ কেহ মহারাজাকে বলিতে লাগিলেন, যে, "মহারাজ! আসুন সকলে নৃত্য করা যাউক, কারণ গীত শুনিয়া পা নাচিয়া উঠিতেছে।" মহারাজা বলিলেন যে, প্রকৃতই সকলের নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইতেছে। মহারাজার পরিবারস্থ মহিলাগণের মধ্যে অনেকে বিশেষ ভক্তিমতী। তাঁহারাও যাত্রা শুনিয়া বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

যখন গান হইতেছে, তখন মহারাজা একটী অপূর্ব্ব কথা বলেন। মান-ভঞ্জনের পালা হইতেছে। এই পালার মধ্যে প্রসিদ্ধ টপ্পাওয়ালা নিধুবাবুর একটী গান দেওয়া হইয়াছে। গানটী অতি অদ্ভুত। যখন শ্রীমতীকে সারানিশি দুঃখ দিয়া রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ প্রাতে তাঁহার কুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন শ্রীমতী তাঁহাকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিতেছেন :—

বন্ধু, আদরে আদরে ভাল ত আছিলে।
যে তোমারই অনুগত তার কি দশা এই করিলে॥
সজল জলদ তুমি, তৃষিত চাতক আমি,
কোথা তুমি কোথা আমি,
কোথা বিন্দু বরষিলে॥

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন এই গানটী শুনিয়া অত্যন্ত বিগলিত হইয়া বলিলেন, "কি সুন্দর! কি সুন্দর! যিনি এই মানের পালা করিয়াছেন, তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ! কারণ এত দিন পরে নিধু বাবুর এই গানটী তিনি দেবসেবায় লাগাইয়াছেন।"

বলা বাহুল্য যে, নিধু বাবু এই অদ্ভুত গানটী পবিত্রা, সরলা ও বিশুদ্ধ প্রেমাধিকারিণী শ্রীমতী রাধারাণীর জন্য করিয়াছিলেন না, কিন্তু অন্য কাহারও জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই গানটী এ যাবৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণ-ব্যক্তিদের সম্পত্তি ছিল। কিন্তু এতদিন পরে ঐগানটী পবিত্র হইয়া গোলোকের সম্পত্তি হইল দেখিয়া মহারাজার আনন্দের আর সীমা থাকিল না। এবং তিনি বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "আজ এই গানটী দেব-সেবায় লাগিল।"

গুরুদাস বাবুর বাটীতে যে রাত্রি যাত্রা হয়, সে দিবসও আমরা উপস্থিত ছিলাম। গুরুদাস বাবু মাঝে মাঝে এরূপ বিগলিত হইতেছিলেন যে, তাঁহার অশ্রু পতন হইতেছিল। অভিসারের সময় শ্রীমতীকে ঘেরিয়া যখন সখীরা নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন গুরুদাস বাবু বলিয়া উঠিলেন, "কি মনোহর দৃশ্য।" একটী গান শুনিয়া তিনি বিশেষ মোহিত হইয়াছিলেন। গানটী বেহাগ রাগিণীতে। বলিলেন যে, এরূপ গান তিনি কখনও শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। যখন শুনিলেন যে, সে গান ও সুরের রচয়িতা শ্রীল শিশির বাবু, তখনই তিনি গানটী মুখস্থ করিলেন। গানটী এইঃ—

সুখের রাতি, জ্বালহে বাতি,
মন্দির কর আলা।
কুসুম তুলিয়ে, বোঁটা ফেলি দিয়ে,
গাঁথহে চিকণ মালা॥
অগুরু চন্দন, কুসুম আসন,
সপুষ্প লবঙ্গ ডাল।
শুভ আলিপনা, কুসুম বিছানা,
রাখহে কদম্বের মাল॥
যমুনার বারি, পুরি হেম ঝারি,
রাখহে শীতল করি।
পিক শুক সারি, ডাক ত্বরা করি,
নিকুঞ্জ বসুক ঘেরি॥

যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেলে গুরুদাস বাবু এই কয়েকটী কথা বলিলেন ;—"শ্রীগৌরাঙ্গ

অবতীর্ণ না হইলে আমরা যাত্রার ন্যায় এরূপ উপাদেয় সামগ্রী পাইতাম না। 'নাচিয়া গাহিয়া' শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায়, ইহা কেবল শ্রীগৌরাঙ্গই দেখাইলেন। আর আমাকে আমি আজ পরম ভাগ্যবান্ মনে করিতেছি। এই যাত্রার অভিনয় দর্শন করিতে আমার কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় হইল বটে, কিন্তু সামান্য ব্যয় করিয়া আমি কত অর্জ্জন করিলাম, শুনুন। প্রথম, আমি নিজে যে আনন্দ ভোগ করিলাম, তাহা ৬০।৭০ টাকা অপেক্ষা ঢের বেশী। শুদ্ধ আমি নই, আমার বাড়ীর পরিবারগণ ও আত্মীয় স্বজন ইত্যাদি প্রায় দুই শত লোককে এই আনন্দ বণ্টন করিয়া দিতে পারিলাম। তৃতীয়তঃ,হয়ত এই দুইশত লোকের মধ্যে কাহার কাহার হৃদয়ের এরূপ পরিবর্ত্তনও হইয়া গিয়াছে যে, শত সহস্র ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িলেও তাহাদের তাহা হইত না। যদি এই টাকা দিয়া সন্দেশ কিনিয়া এই লোকগুলিকে খাওয়াইতাম,তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত জিহ্বার উপর সন্দেশ টুকু থাকিত, সে পর্য্যন্ত হয়ত তাহারা কিঞ্চিৎ সুখ পাইত, কিন্তু গলাধঃ হইবামাত্র তাহাদের ইহা মনেও থাকিত না।"

উপরের যে কৃষ্ণযাত্রার কথা উল্লেখ করিলাম, ইহাতে কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহার অধিকাংশ গান গুলি মহাজনের পদ হইতে গৃহীত। সুরগুলি প্রায়ই কীর্ত্তন ভাঙ্গা। সুর সম্বন্ধে একটি বিষয় লক্ষিত হইবে। দুধে ও তেলে মিশেনা, কিন্তু দুধে ও আল্‌তায় অপূর্ব্ব রঙ্গের সৃষ্টি হয়। কীর্ত্তন সুরে কালোয়াতি মিশান বড় কঠিন। মিশাইতে গেলেই কিম্ভূতাকার ধারণ করে, কিন্তু মিশাইতে পারিলে অতি মনোহর বস্তুর সৃজন হয়। এই যাত্রায় যতগুলি গান আছে, তাহার অধিকাংশই কীর্ত্তন ও কালোয়াতি সুরে মিশান। আকারটি কীর্ত্তনের মতন, অথচ খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, ইহাতে কালোয়াতির ভাঁজ আছে। যাঁহারা সংগীত শাস্ত্রে বিশারদ,তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, এই দুই জাতীয় সুর নিখুত রূপে মিলিত করা কি দুরূহ ব্যাপার। এইরূপ প্রায় একশত নূতন সুর এই যাত্রায় আছে। আধুনিক যাত্রায় প্রায় ভাল সুর নাই, যদিও কোন কোন যাত্রায় শুনা যায়,তাহার সংখ্যা চারি পাঁচটির বেশী হইবে না। পূর্ব্বকার বদন অধিকারী প্রভৃতি যাত্রা গায়কগণও ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১০।১৫টি ভাল সুর ব্যবহার করিতেন।

উপরিউক্ত কৃষ্ণযাত্রার আর একটি বিশেষ লক্ষণ এই। আপাততঃ মান, মাথুর, ও উৎকণ্ঠা সংক্রান্ত তিনটি পালার সৃষ্টি হইয়াছে। মান কি? মাথুরের উদ্দেশ্য কি? ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী যাত্রাগায়কগণ পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত করিয়া যান নাই। বরং গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি কতকগুলি যাত্রা গায়কগণ মান কি মাথুরের মধ্যে এরূপ সমস্ত রস প্রবেশ করাইয়াছিলেন যে,তাহা অতি অশ্রাব্য বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়গণ মানভঞ্জনের পালাকে অনেক সময় "খেউড়" বলিয়া গণ্য করেন। তাহাদের ইহা বলিবার কিছু দাবিও আছে,কারণ অশিক্ষিত সাধারণ লোকের রুচি অনুসারে ঐ সমস্ত কৃষ্ণযাত্রার পালাগুলি সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু যে যাত্রার কথা আমরা লিখিতেছি,ইহা শুনিলে অতি সামান্য ব্যক্তিও বুঝিতে পারিবেন যে, কি উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণ মান লীলা কি মাথুর লীলা করিয়াছিলেন। বস্তুত মান, কি মাথুর, কি উৎকণ্ঠার পালাগুলি যে ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে,তাহা শুনিলে হৃদয় ভক্তি ও প্রেমরসে পরিপূর্ণ না হইয়া থাকিতে পারিবে না

এবং শ্রীভগবান্ যে কত মধুর ও প্রিয়জন, তাহাও জাজ্বল্যমান রূপে অনুভূত হইবে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া না মানেন, তাঁহারাও এই কৃষ্ণযাত্রা শুনিয়া আপনাদের হৃদয় পবিত্র ও শীতল করিতে পারিবেন। এই অতি উপাদেয় যাত্রার দলটি পরিপোষণ করা ধনাঢ্য হিন্দুমাত্রের কর্ত্তব্য, কারণ ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। এই উদ্দেশ্য কি না, "নাচিয়া গাইয়া" শ্রীভগবানের প্রতি জীবের মন আকর্ষণ করা।*

শ্রীমৎ রূপসনাতন প্রবন্ধের প্রতিবাদ। (২)

শ্রীরূপ সনাতন যথন (অগ্রপশ্চাৎ) লীলাচলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট গমন করেন, তথন তাঁহারা অপরাধ আশঙ্কায় শ্রীজগন্নাথ দর্শনে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকটে আর শ্রীহরিদাসের ভজনাগারে থাকিতেন। এবং দূর হইতে শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের চক্র দর্শন করিতেন।

উৎকল-দীপিকায় আছে;—শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রত্নবেদী গণ্ডকীজাত লক্ষ শালগ্রাম শিলোপরি নির্ম্মিত, এজন্য মন্দিরের ভিতর প্রবেশ নিষিদ্ধ। যথা, উৎকল ভাষ্যে;—

"জগন্নাথ দর্শনে যারন্তি।
মন্দিরে প্রবেশ না করন্তি॥
লক্ষ শিলাতে স্থাপয়ন্তি।
যাকে রত্নবেদী কহন্তি॥"
* * * * ইত্যাদি।

এই কারণে মহাপ্রভু গরুড় স্তম্ভের নিকটে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখ দর্শন করিতেন। মহাবিচক্ষণ সর্ব্বশাস্ত্র পরিজ্ঞাতা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন দৈবাৎ স্খলিত পদে বেদী স্পর্শাপরাধ আশঙ্কায় মন্দিরের ভিতর প্রবেশ ও শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিতেন না। তাঁহাদের আরও এক উদ্দেশ্য ছিল, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অচল, অর্থাৎ দারুব্রহ্ম ঐশ্বর্য্যশালী, শ্রীচৈতন্যদেব সচল, পূর্ণব্রহ্ম, মাধুর্য্যের আধার। এতন্নিবন্ধন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকটে থাকিতে ভালবাসিতেন। একদিন, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীসনাতনের মন পরীক্ষার নিমিত্ত পুরীর সন্নিকট যমেশ্বর টোটায় অবস্থিতি করিয়া মধ্যাহ্নকালে প্রসাদ ভুঞ্জিবার নিমিত্ত সনাতনকে নিমন্ত্রণ করেন, সিংহদ্বারের পথ হইতে ঐ স্থান অতি নিকট। যদিও সমুদ্রের বেলাভূমি হইয়া যমেশ্বর টোটায় যাইবার একটী দ্বিতীয় পন্থা আছে, কিন্তু সে পথটী অধিক বক্র। যে মধ্যাহ্ন সময়ে প্রভুর নিমন্ত্রণ, সে সময়টী জ্যৈষ্ঠমাস, ঐ সময়ের মধ্যাহ্নকালে মার্ত্তণ্ডদেবের প্রচণ্ড কিরণে সমুদ্রতীরস্থ বালুকারাশি অধিক উত্তপ্ত হয়। পরন্তু, প্রভুর আমন্ত্রণে শ্রীসনাতন

* এই প্রবন্ধটী একজন প্রসিদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তের লেখা। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই দেশে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। আমরা সাদরে এই প্রবন্ধটী পত্রিকাস্থ করিলাম।

আমি একদিন শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে গিয়াছিলাম। সেখানে সেদিন এই যাত্রার দলে মানের পালার তালিম হইতেছিল। সৌভাগ্য ক্রমে আমরা এই গান শুনিবার অবসর পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। পালার স্থানে স্থানে এত মধুর বোধ হইয়াছিল যে, আমরা অভক্ত হইলেও ভক্তি ও প্রেমরসে আর্দ্র হইয়াছিলাম। বাল্যকালে রাধাকৃষ্ণ বৈরাগীর "প্রভাস মিলন" পালা শুনিয়া অনেক দিন অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি, এতকাল পরে আবার শ্রীকৃষ্ণযাত্রা শুনিয়া মোহিত হইয়াছি। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা এই যাত্রাদলের গান শ্রবণ করিবেন, তাঁহারাই মুগ্ধ হইবেন। ন, স।

সৌভাগ্য ও হর্ষাতিশয়ে বালুকাপথে, অর্থাৎ যে পথে গমন করিলে পা দগ্ধ হইবে, তাহা মনেও স্থান দিলেন না, অতি উল্লাসে সেই তপ্ত বালুকার পথে গমন করিয়া যমেশ্বর টোটায় প্রভুর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। প্রভু দেখিলেন, সনাতনের পদদ্বয় অত্যন্ত স্ফীত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের চতুর্থে;—

"প্রভু কহে, কোন্ পথে, আইলা সনাতন।
তিহঁ কহে সমুদ্রপথে করিনু গমন ॥
প্রভু কহে তপ্ত বালুকায় কেমনে আইলে।
সিংহ দ্বারের শীতল পথ কেন না আইলে ॥"

হে সনাতন! সিংহ দ্বারের নিকট পথ থাকিতে তপ্ত বালুকার পথে এত কষ্ট করিয়া আসিবার প্রয়োজন কি?

সনাতন উত্তর করিলেন; প্রভো!

"সিংহ দ্বারের পথ, শীতল কভু নয়।
সে পথে ঐশ্বর্য্য রূপ কণ্টক আছয় ॥
মাধুর্য্যের পথ সুগম অতিশয়।
সে পথে আসিতে তাপের নাহি ভয় ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু, এই উত্তর শুনিয়া পরমানন্দে শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন;—অহো! সনাতন তোমার যে অনুরাগ, ইহাই যথার্থ। তুমি যে মহাজন পথ ত্যাগ কর নাই, ইহাতে তুমিই ধন্য! এবং তোমাকে স্পর্শ করিয়া আজি আমি ধন্য! এস্থলে ইহাই বিবেচিত হইবে যে, শ্রীরূপ সনাতন রাগানুগ ভক্ত ছিলেন। তজ্জন্য ঐশ্বর্য্য দর্শনাভিলাষে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিতেন না।

(৩) শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজগণ সহ যখন রামকেলী গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীরূপ, সনাতন শ্রীচৈতন্য দেবের কৃপাভিলাষে নীচত্ব স্বীকার করিয়া অতি দীনভাবে প্রভুর শরণাপন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন;

"নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচকর্ম্ম।" ইত্যাদি।

তাৎপর্য্য;—

"দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥"

ঈশ্বর দাম্ভিকের কেহই নহেন, কিন্তু ভক্তের ভগবান্। ভক্তি ভিন্ন শক্তিতে কখনই কেহ তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারেন না। হে, প্রভু! আমি নীচ,—নীচ হইতেও নীচ, আমি অধম, নীচ হইতেও অধম, আমি মূর্খ—আক্ষুটী হইতেও মূর্খ, আমি পাপী—জগাই মাধাই হইতেও পাপী, কীট—কীট হইতেও বিষ্ঠা বা নরকের কীট, মনে করুন, এইরূপ দৈন্যোক্তিতে ঈশ্বরের স্তব করিলে কখন কি, নীচ, অধম, মূর্খ, পাপী, অতি পাপী, বা কীট হইতে হয়? যাঁহারা ইহা মনে করিয়া নিন্দা করেন, তাঁহাদিগের দুর্বুদ্ধি বলিতে হয়, এবং যাঁহারা এ কথার অর্থ বুঝেন না, তাঁহাদের বোধশক্তি অতি অল্প।

(৪) শ্রীসনাতন যখন বন্দীশালে, তখন তিনি শ্রীরূপের একখানি পত্র পাইয়া সাতিশয় ব্যাকুল হন্, এবং তখনই বৈরাগ্যভাবের পুনঃ উদ্রেক হয়। সেই কালে কারাধ্যক্ষকে বিনয়বাক্যে বলিয়াছিলেন, হে জিন্দাপির! আপনি ভাগ্যবান্, আপনার কেতাব কোরাণে বিলক্ষণ জ্ঞান আছে, একটী বন্দীকে কিঞ্চিৎ পথ সম্বল দিয়া ছাড়িয়া দিলে কি পুণ্য হয় না? আমি এক সময় আপনার বহু উপকার করিয়াছি, এখন আমার এই দুঃসময়ে আমাকে ছাড়িয়া দিয়া আমার বিশেষ উপকার করুন। ইহাতে রাজভয়ের আশঙ্কা করিবেন না; রাজা উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমন করিলে বলিবেন, সনাতন বাহ্যকৃত্যে গিয়া পতিতপাবনী শ্রীগঙ্গাদেবীর নিকট পতিতপাবন স্বরূপ দ্বিতীয় গঙ্গা দেখিয়া তন্মধ্যে ঝাঁপ দিয়াছে, দাড়ুকা অর্থাৎ বেড়ী

সহ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, অনুসন্ধান পাওয়া যায় না, ইত্যাদি। কারাধ্যক্ষ যবন, অতি নিষ্ঠুর, সে কি বিলাপ শুনিবার পাত্র? "না ছোড় বান্দা" ব্যাল কথন কি মন্ত্রে বশীভূত হয়? যদি হয়, একটা ভাষা কথায় আছে;—

"সু সাপ কাঁদনী শুনে, রোজার হয় যশঃ।
চোড়া ঢেম্না, ডেগরা, মন্ত্রে নহে বশঃ॥

রাজমন্ত্রী সনাতন তখনই বুঝিলেন,—এ দুরাচার কখনই বিনয়ে বশীভূত হইবার নহে। "লুব্ধমর্থেন গৃহ্নীয়াৎ" স্মরণ হইল মুদি ঘরে দশ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে, অগত্যা কারাধ্যক্ষকে মুদ্রার লোভ দেখাইয়া বলিলেন, আমি এ দেশে রহিব না, দরবেশ হইয়া মক্কায় যাইব। এ স্থলে "অর্থেন সর্ব্বে বশা" কারাধ্যক্ষ তখন লোভে পড়িয়া এবং সাত হাজার মুদ্রা ঘুষ লইয়া সনাতনকে ছাড়িয়া দেয়। সনাতন মুসলমান হইলে কি এত কাণ্ড হইত! কারাধ্যক্ষ কি জাতিভায়ার নিকট এরূপ ঘুষ লইতে পারিত? বিপৎকালের কাকোক্তি মক্কায় যাইবার কথা যদি যবনের পরিচয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, সে এক ভৌতিক বিচার।

(৫) সনাতন যখন কারামুক্ত হইয়া কাশীতে গিয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত হন, তখন তাঁহার মুসলমানী বেশ ভূষা ছিল না। কারাগারের যে মলিন অবস্থা, তাহাই ছিল। উদাহরণে দেখা যায়। যথা;—স্বয়ং লক্ষ্মী শ্রীরামপ্রিয়া অশোক কানন হইতে বিমুক্ত হইয়া যখন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন করিতে উদ্যত, সেই কালে ধার্ম্মিক বিভীষণ-পত্নী সরমা বাধা দিয়া বলিলেন;—দেবি! এরূপ কুৎসিত বেশে গমন করিবেন না; শ্রীরামচন্দ্র মনে করিবেন কি? এ বেশ দেখিলে বলিবেন, পাপ লঙ্কাপুরে কেউ কি ভক্ত নাই? কেউ কি দাসী বলিতে নাই? অতএব আমি দাসী থাকিতে কখনই এ বেশে যাইতে দিব না। আসুন আপনার পদদ্বয় অলক্তে রঞ্জিত এবং আলুলায়িত অচিক্কণ কেশগুলি সুগন্ধ তৈলযুক্তে সুচিক্কণ করিয়া এবং উত্তম বস্ত্র পরিধান করাইয়া মনের সাধে শ্রীমন্তিনী সজ্জা করিয়া দি!

জানকী বলিলেন, ভগ্নি! এখন কোন বেশ প্রয়োজন করে না।

"যেই বেশে আছি আমি সেই বেশে যাব।
আমারে দেখিলে প্রভুর করুণা হইব॥"

মনে করিতে হইবে, এখানেও শ্রীসনাতনের আশয় সেইরূপ। কারণ, তিনি কারামুক্ত হইয়া কাশী গমন করিবার কালে পথিমধ্যে হাজিপুরে তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্ত মজুমদারের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইয়াছিল। শ্রীকান্ত সেইকালে শ্রীসনাতনের মলিন অবস্থা দেখিয়া ভদ্রবেশে অর্থাৎ শ্মশ্রু আদি ত্যাগ করিয়া যাইবার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন ও অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সনাতন সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে সেই কালে শ্মশ্রু ত্যাগ ও উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া ও শাল দোশালা গায়ে দিয়া ভদ্র বেশে প্রভুর সকাশে যাইতে পারিতেন। ফলে, তাঁহার সে উদ্দেশ্য ছিল না। কারাগারের প্রকৃত অবস্থা প্রভুর দৃষ্টিগোচর হইলে অবশ্যই প্রভুর কৃপা হইবে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপদে পড়িয়া মলিন বেশ ধারণ করিলে কি নীচ অথবা ম্লেচ্ছ হইতে হয়? কোথাও কি সে নজীর আছে? উমেশ বাবু অনেক জেল পরিদর্শন করিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহার বাহ্য দৃষ্টিতে কোন না কোন নজীর থাকিবার সম্ভব! তা যাহাই হউক, তিনি কোরাণ, পুরাণ, বাইবেল ছাড়া

আকাশ পাতাল ভাবিয়া অতি মহৎ শ্রীরূপ ও সনাতনের আরো কতকগুলি দোষানুসন্ধান করিয়া অসূয়া প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

(১) রূপ সনাতন মতিচ্ছন্ন বশতঃ অর্থ লোভে যবন হইয়াছিল, পরন্তু তাহাদের জাতি গিয়াছিল অথচ পেট ভরে নাই।

(২) রূপ দণ্ড ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছিল,আভাসে জানা যায়, রূপকে হুঁষেণসাহা প্রজাপীড়ক, অত্যাচারী, দস্যু বলিয়াই জানিতেন।

(৩) সনাতন পীড়িত ছিল না, পীড়ার মিথ্যা ভান করিয়া রাজকার্য্যে অবহেলা করাতে সে মিথ্যাবাদী 'কপট' অর্থাৎ প্রতারক ছিল বলিয়াই পাতসা হুষেণ সাহা সক্রোধে ;—

"তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।"
"পশু পক্ষী মারি সব চাকলা কৈল খাস॥"

এইরূপ ভৎর্সনা দ্বারা শেষে সনাতনকে জেলে দিয়াছিলেন। এই কয়েকটী কথার উত্তরে বলিতে হইতেছে ;—শ্রীযুক্ত উমেশ বাবুর এ সকল কটাক্ষ বিষম হইতেও বিষম, অর্থাৎ কালকূট অপেক্ষাও কটু। বস্তুগত্যা সাধু নিন্দায় পুরুষার্থ কি ? তাহাতে পৌরুষ নাই।

যাঁহারা বাল্যকালে বৈয়াকরণাদি বিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং প্রতিভাশালী হইয়া নানা শাস্ত্র দর্শন ও নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়া বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে শ্রীবৃন্দাবনে সম্রাট পদে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন, যে সনাতন স্পর্শমণিকে লোষ্ট্র জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নাই, যে সনাতন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের সমতুল্য পণ্ডিত ও সমসাময়িক; যাঁহার বৈষ্ণবস্মৃতি বঙ্গে দেদীপ্যমান ও সর্ব্বত্রে পরিব্যাপ্ত ও সাধুগণের বহু মান্য ; যে সনাতনের প্রতিষ্ঠা শুনিয়া স্বয়ং দিল্লীশ্বর আকবরসাহা আগরা হইতে পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করেন, এবং তাঁহার ভক্তি প্রস্তাব দর্শনে নতশির হইয়াছিলেন ; যে শ্রীরূপ, সনাতন পৃথিবীর উচ্চ গোলোক সদৃশ শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়া জগতে কীর্ত্তি স্তম্ভ রাখিয়াছেন ; যে শ্রীরূপের কৃত উজ্জ্বল নীলমণি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' হংসদূত, বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব, দানকেলী-কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থের অর্থ করিতে ও অর্থ বুঝিতে এ কালে পণ্ডিত ও লোক খুজিয়া পাওয়া যায় না ; সেই সনাতন, সেই শ্রীরূপ, দস্যু, মিথ্যাবাদী, প্রজাপীড়ক, যবন ছিলেন, এ সকল উদ্ভট কথা মনেও আনিতে নাই, কাণেও শুনিতে নাই, শুনিলেও পাপ, বলিলেও পাপ !!

"নিন্দাং য কুরুতে সাধো স্তথা স্বং দূষয় ত্যসৌ।
খেধূলিঃ যস্তক্ষেৎ দুষ্টো মুর্দ্ধি তসৌ বসা পতেৎ॥"

আকাশে ধূলা ছড়াইলে, আকাশের সেই ধূলা মস্তকে আসিয়া পড়ে। সেইরূপ সাধু নিন্দায় আপনাকে দূষিত হইতে হয়।

শ্রীরূপ সনাতন, উমেদার হইয়া কিম্বা নিজে নিজে চেষ্টা করিয়া যবন রাজের চাকরি করেন নাই, পেটের দায়ে সোণার জাতি খোয়ান নাই। রাজভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে তাঁহাদের বিলক্ষণ খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং আদিবাস, বাকলা চন্দ্রদ্বীপ এবং নূতন বাস রামকেলী বা সাকরামায় বহু প্রকার দেবকীর্ত্তি ও তদুপলক্ষে বার মাসে তের পার্ব্বণ, ক্রিয়াকলাপ, দান ধর্ম্ম অর্থাৎ সদাব্রত ও অন্নাদির বিলক্ষণ যোগাড় সম্ভ্রম ছিল। রাজার মুখাপেক্ষা বা কোন কার্য্যে তোষামোদ করিতেন না। কার্য্যকালে গৌড়-রাজ তাঁহাদিগের বিহিত সম্মান ও খাতির করিতেন। তাঁহারা

প্রজারঞ্জক ছিলেন, প্রজাদিগকে পুত্রভাবে স্নেহ চক্ষে দেখিতেন। রাজনীতি বিষয়ে এতদূর দক্ষ ছিলেন যে, রাজা লোক পরম্পরায় তাঁহাদের গুণ ও মর্য্যাদা শ্রবণ করিয়া বহু যত্নে তাঁহাদিগকে আনাইয়া এবং নানা সর্ত্তে নিজে বাধ্য হইয়া রাজ্যের সমস্ত কার্য্যভার তাঁহাদের উপরন্যস্ত করতঃ নিজে নিশ্চিন্ত ভাবে স্বতন্ত্র স্থানে থাকিতেন। একাসনে বসিতেন না ও মিশিতেন না। ভক্তিরত্নাকরে আছে ;—

"রূপ, সনাতন মহামন্ত্রী সর্ব্বাংশেতে।
শুনিলেন রাজা শিষ্ট লোকের মুখেতে ॥
গৌড়রাজ যবনের অনেক অধিকার।
রূপ সনাতনে আনি, দিলা রাজ্য ভার ॥"

প্রশ্ন হইতে পারে, সনাতন যদি যবন রাজের এতই প্রিয়পাত্র ছিলেন, তবে রাজা তাঁহাকে কয়েদ করিলেন কেন ?

সে কয়েদের অর্থ স্বতন্ত্র। ডাকাইতি, খুন, রাহাজানি বা দাগাবাজী অসৎ কার্য্যের নিমিত্ত নহে। কেবল আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত। ফলতঃ তাঁহাদের পূর্ব্ব চরিত্র কোন পাপপঙ্কে লিপ্ত ছিল না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরন্তু যে কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগের আবির্ভাব, তাঁহারা তৎকার্য্য একপ্রকার বিস্মৃত হইয়া মায়ামোহগর্ত্তে অর্থাৎ রাজ বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া আসল কাজ ভুলিয়া ছিলেন। এইজন্য তাঁহাদিগের চৈতন্যহেতু চৈতন্যপ্রদায়ক শ্রীচৈতন্যদেব প্রথমতঃ অসতীর তুলনা দিয়া একখানি প্রেমমিশ্র পত্র লেখেন। তাহার পর তাঁহাদিগকে বিষয়রূপ বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবন গমনের ছলে গৌড় রাজধানীর সমীপবর্ত্তী সহচরবর্গ সমভিব্যহারে রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হইয়া হরিনাম জোর ডঙ্কার দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করতঃ,কৃপারজ্জু বন্ধন দ্বারা ভ্রাতৃদ্বয় অর্থাৎ শ্রীরূপ ও সনাতনকে উদ্ধার ও শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীনীলাচলে পুনরাগমন করেন। তাহারই কিছুদিন পরে,শ্রীরূপ বৈরাগ্য ইচ্ছায় প্রিয়ানুজ শ্রীবল্লভ সমভিব্যহারে'রাজার আজ্ঞাতে' শ্রীবৃন্দাবনের দিকে গমন করিলে রাজা অত্যন্ত ব্যথিত হন। কথায় আছে, বিপদ বিপদের ও সম্পদ সম্পদের অনুগামী। সেই সময় উড়িষ্যায় শত্রু বিগ্রহের সংবাদে রাজা বহু উদ্বিগ্ন হন্। রাজা, শ্রীসনাতনকে গৌড় রাজ্যে রাখিয়া অথবা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উড়িষ্যা যাইবার মনস্থ করেন। পরন্তু, ঐ সময়ে শ্রীসনাতন শ্রীরূপের বিরহে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া রাজকার্য্য ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে হিন্দু ভদ্র সন্তান অর্থাৎ যাঁহারা তাঁহার অধীনে কাজ করিতেন,সেই সমস্ত পদস্থ ব্যক্তিগণের হস্তে কার্য্য ভার ন্যস্ত করিয়া পীড়িত ছলে দরবারে যাইতেন না। পণ্ডিতদিগকে লইয়া নিজ বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ শ্রবণ করিতেন।

রাজা বৈদ্য প্রমুখাৎ অবগত হইলেন,পীড়া কেবল ওজর মাত্র। বস্তুতঃ সনাতন বৈরাগ্যের পূর্ব্বানুষ্ঠান করিয়াছেন। আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, সকল দিকেই বিপদ ; (১) শ্রীরূপের প্রস্থান, (২) শত্রুবিগ্রহ, (৩) সনাতন কার্য্যে অনুপস্থিত। উড়িষ্যার শত্রুদমনে যাইতে হইলে,কে রাজ্যরক্ষা করিবে,কেই বা সঙ্গে যাইবে, এই সকল চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া স্বয়ং পদব্রজে শ্রীসনাতনের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে রাজ্য লইয়া গৌড়ে থাকিবার কিম্বা উড়িষ্যায় সঙ্গে যাইবার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন ও অনুরোধ করেন। কিন্তু সেইকালে শ্রীসনাতনের অনুরাগের নদী

এতই তরঙ্গ ধারণ করিয়াছিল যে,সাধ্যসাধনায় সেই বেগ ধরিয়া রাখিবার নহে। সনাতন রাজ্য লইয়া থাকিতে অথবা সঙ্গে যাইতে কোনমতে স্বীকৃত হইলেন না। ইতিহাসে কথিত আছে, সেকালে যবন রাজাদিগের এরূপ শাসন দণ্ডের ক্ষমতা ছিল যে, এক হস্তে কোরাণ,অপর হস্তে শাণিত তরবারি। জাতি নাশ ত সহজ কথা, রাজাজ্ঞা অবজ্ঞা করার অপরাধে তদ্দণ্ডেই রাজা সনাতনের শিরচ্ছেদন করিতে পারিতেন। ফলতঃ তিনি শ্রীসনাতন দ্বারা বহু উপকার পাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ অঙ্গীকারপত্রের সর্ত্তমতে সনাতনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা কি, দিল্লীশ্বরের বিনানুমতি শ্রীসনাতনের উপর সা-হুষেণের কোন ক্ষমতা প্রকাশ কি শারীরিক দণ্ড বিধান করিবার অধিকার ছিল না। সনাতন যখনই মন্ত্রীত্ব পদ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবেন,তখনই ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং রাজাকে তাহা গ্রাহ্য করিতে হইবে, নিয়মপত্রে ইহা সর্ত্ত ছিল। সুতরাং রাজা সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। তজ্জন্য সনাতনের প্রতি অন্য কোন শাস্তি বিধান না করিয়া পলাইয়া যাইতে না পারে, এতন্নিবন্ধন পাদবন্ধন দ্বারা (উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের কাল পর্য্যন্ত) কারাধ্যক্ষের নজর বন্দীতে অর্থাৎ হাজতে রাখিয়া রাজা উড়িষ্যায় গমন করেন। উর্দ্দু ভাষায় নজরবন্দী বা হাজত শব্দের বাঙ্গলা অর্থ অবরুদ্ধ বা নির্জ্জন কারাবাস।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, শ্রীরূপ প্রজাপীড়ক ছিলেন না। অবৈধ উপায় দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করেন নাই। বেতনের পরিবর্ত্তে রাজসংসারে রাজ্যের ¼ অংশ ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ বহু জায়গীর বরাদ্দ ছিল। সেই সমস্ত ভূমির ন্যায্য কর স্বরূপ অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তা "পাগলের বুচকি আগলের" বা "বৈরাগ্যের পুঁজি নহে"। তৎসমুদায় অর্থ স্বর্ণ ও রজত উভয় মুদ্রা হইতে পারে, কিন্তু "আদার বেপারী হইয়া জাহাজের খবর রাখিবার দরকার কি?" এই জন্য তাহার বিশেষণ অনাবশ্যক, তাই তাহা প্রকাশ নাই। বস্তুতঃ সেই সমস্ত অর্থ দানসাগর, কুটম্বভরণপোষণ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে বিতরণ, তড়াগাদি খনন, ও মন্ত্র পুরশ্চরণের নিমিত্ত সংগ্রহ ও বৈরাগ্যের পূর্ব্বে তৎসমুদায় অকাতরে ব্যয় করিয়া শেষে কেবল ডোরকৌপীন মাত্র লইয়া ভিখারী হইয়াছিলেন। ভিখারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু, "অন্নব্রহ্ম" বলিয়া অন্যান্য হিন্দুপতিতদিগের মত যার তার বাটীতে ভাত বা পিঠা পানা মাগিয়া খাইতেন না। সমাদরে বৈষ্ণবের ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন।

"বেদ না মানিয়া বুদ্ধ হইলা নাস্তিক।"

এই যে একটী কথা আছে, শ্রীরূপ, সনাতন সেরূপ নাস্তিক ছিলেন না। বেদ মানিতেন ও তদনুসারে হিন্দুধর্ম্ম আচরণ করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকার তাঁহাদের ধনবিভাগের কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই সত্য।

শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু যদি গুরুতন্ত্র, কি গৌতমীয় তন্ত্র, অথবা নির্য্যাসতত্ব ঈশান সংহিতা দেখিতেন, কুত্রাপিও ভ্রমে পড়িতেন না। তাই পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সন্তরণ না জানা বড়ই দোষ।

শ্রীশ্রীপ্রভু রূপগোস্বামী যে কিছু অর্থ নৌকা পূর্ণ করিয়া গৃহে আনিয়াছিলেন, সে সমুদায় লুট কি চোরাই মাল ছিলনা। স্বোপার্জ্জিত পারিশ্রমিক অর্থ। যাহা কিছু আনিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের দৃষ্টিগোচরে অর্থাৎ

প্রকাশ্যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুলাচার্য্যগণকে যাহা কিছু দান করিয়াছিলেন, তাহাও প্রকাশ্যে, পণ্ডিত কুলাচার্য্যগণ যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন,তাহাও প্রকাশ্যে, বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ ও মুদি ঘরে যাহা গচ্ছিত বা সঞ্চয় রাখিয়াছিলেন, তাহাও প্রকাশ্যে। ঐ সকল ধন গ্রহদুর্ব্বিপাকের শান্তি অথবা কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য অব্রাহ্মণে দান করেন নাই। তাঁহাদের নিকট সেরূপ দান লইয়া কোন ব্রাহ্মণ পতিত হয়েন নাই। তাঁহারা পতিত হইলে তাঁহাদের নিকট বেদবিৎ কি শাস্ত্রবিৎ কোন বিপ্র অর্থ লোভে দান লইলে অবশ্যই পতিত হইতেন,এবং সেইকাল হইতেই একটা তুমুল কাণ্ড অর্থাৎ সমাজ দূষিত দল হইয়া ভিন্ন ভিন্ন থাক হইত ও এপর্য্যন্ত তাহার কোন না কোন একটা নিদর্শন থাকিত। শাস্ত্রে আছে, বৈরাগ্যের পূর্ব্বে মন্ত্র পুরশ্চরণ করিতে হয়। বিনা পুরশ্চরণে কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হইবার নহে। এই জন্য সেই মন্ত্র পুরশ্চরণ বৃহদব্যাপারে শ্রীরূপসনাতন, নবদ্বীপাদি নানা সমাজের বড় বড় অধ্যাপকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ও আনাইয়া তাঁহাদের দ্বারা সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়া পণ্ডিতবর্গকে সন্তোষের সহিত বিদায় করিয়াছিলেন।

"শ্রীচৈতন্য দাস" যিনি সেই ঘটনা চাক্ষুষে দেখিয়াছিলেন, তিনি নিজ পুত্র শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে এইরূপ বলেন। যথা ;—ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে পিতাপুত্র সংবাদে ;

"নবদ্বীপ আদিস্থিত অধ্যাপকগণ।
রামকেলী গ্রামে হয় সভার গমন ॥
মোর অধ্যাপক অগ্রগণ্য চাখন্দিতে।
রামকেলী হইতে লোক আইল তারে নিতে ॥
চলিলেন অধ্যাপক, মোরা সঙ্গে গেনু।
শুভক্ষণে রামকেলী গ্রামে প্রবেশিনু ॥
সনাতন রূপের ভবন সন্নিধানে।
হইল সভার বাস,পরম সম্মানে ॥
অধ্যাপকগণ মহা উল্লাস হিয়ায়।
চলিলেন সনাতন, রূপের সভায় ॥
অধ্যাপক সঙ্গে গিয়া, দেখিনু সাক্ষাতে।
করিলেন সভার সম্মান, নানা মতে ॥
ঐশ্বর্য্যের সীমা অহংকার মাত্র নাই।
কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি, মাগে সর্ব্ব ঠাঁই ॥
দুই ভাই সর্ব্বশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত।
জ্যেষ্ঠ সনাতন রূপ কনিষ্ঠ বিদিত ॥
নানা দেশী পণ্ডিতের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনে।
বহু অর্থ দিয়া পরিতোষে সর্ব্ব জনে ॥"
ইত্যাদি।

পুরশ্চরণ বিধি—যথা গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীশ্রীদেবী ভগবতী প্রতি শ্রীঈশান বাক্যং।

"গঙ্গা গর্ভে সরিত্তীরে তীর্থস্থানে সুপুণ্যকে,
দেবালয়ে পুণ্য ভূমৌ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে।
পুরশ্চর্য্যা বিনা দেবি ন সিদ্ধতি কদাচন,
তস্মাদো দৌ পুরঃ শ্চর্য্যা কর্ত্তব্যা বৈষ্ণবোত্তমৈ।"
ফলমাহ ;
"কৃষ্ণং স্মরণং জনঞ্চাস্য শ্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং
তত্বৎ কথা রতশ্চাদৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥"

শ্রীমৎরূপসনাতন পুরশ্চরণ ও মন্ত্রচৈতন্য দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া রাগানুগা ভক্তির সহিত ব্রজধামে বাস করিয়াছিলেন।

"লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।"

শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু যে এই একটা কথা লিখিয়াছেন, তাহা ভুল। লোভী না হইয়া লেভ হইবে। মূল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদর্শ বহুকালের প্রাচীন হস্তাক্ষরী গ্রন্থ যাহা আমার বাড়ীতে আছে,তাহাতে এবং পঞ্চাশৎ বৎসরের পূর্ব্বে ছাপার গ্রন্থে আছে ;

"অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি, না যায় রাজ দ্বারে।
লেভ কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে ॥"

বৈষ্ণবাভিধানে প্রকাশ, লেভ শব্দে লেখক অর্থাৎ মসীজীবী, পদস্থ কর্ম্মচারীগণ। তখনকার কালে এক এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন

পদ ছিল,তাঁহারা তন্নামে অভিহিত হইতেন, যথা ;—উর্দ্দু ভাষায়, মুন্সী, বক্সী, নাজীর, সেরেস্তাদার, পেস্কার, কানুনগুহি প্রভৃতি।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, শ্রীরূপ সনাতন সৎশূদ্র বিশ্বাসী কার্য্যকারক অর্থাৎ কায়স্থ জাতির দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালনা করাইতেন। সুতরাং লেভ শব্দটী কায়স্থ জাতির বিশেষণ ; ফলতঃ আপনারা কোন লেখাপড়া বা কেরাণীর কার্য্য করিতেন না। সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। এখনকার মুদ্রিত ছাপার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনেক স্থলে অনেক ভুল আছে। অনেক স্থলে হস্তলিখিত পুস্তকের সহিত ঐক্য নাই।

শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু, শ্রীরূপসনাতনের যে মতিচ্ছন্ন দোষের উল্লেখ করিয়াছেন,কথাটা বড়ই নোংরা, সে সম্বন্ধে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যখন ছন্নমতি হয়, তখন নিজের দোষেই হয়। আমরা এক বিভাগে বাস করিয়া বেশ জানি, শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু, বাল্যকাল হইতেই চালাক চোস্ত। স্বভাব অতি নম্র, বুদ্ধি অতি প্রখর, সরল চিত্ত, লোকপ্রিয়, এবং গম্ভীর। কপাল এমনই জোর প্রথম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়সে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া,মেধা শক্তিবলে, যখন যে বিষয় পরীক্ষা দিয়াছেন, কখনও অনুত্তীর্ণ হন নাই। উচ্চশিক্ষায় রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তি দশ সহস্র টাকা এককালীন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছন্নমতিত্ব কখনও লক্ষিত হয় নাই, দেশেও তা প্রচার নাই। কিন্তু ম্লেচ্ছবিদ্যা বড় ভয়ঙ্করী। অসতীর সহবাসে সতী যেরূপ দুঃশীলা হয়, সেইরূপ অসৎ সহবাসে মন বিগড়াইয়া দেয়। যেরূপ নির্ব্বোধ মৃগগণ তৃষ্ণায় আকুল হইয়া জল পাইলে সুশীতল হইব,এইরূপ ইচ্ছা করিয়া, মরীচিকা ভ্রান্তে জীবনের জন্য জীবন হারায়,ভ্রান্তজীবগণও রমণীয় মরীচিকা স্থানীয় কুতার্কিকের কুহকীয় বাক্‌জালে পতিত হইয়া আপাততঃ সুখবোধে শেষে, "ইতঃভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট" অর্থাৎ দুকুলের বাহির হয়। ফলতঃ যিনি সুবোধ হন, তাঁহাকে ঔদ্ধত্য কখনই আক্রমণ করিতে পারে না। আমরা বেশ জানি,উমেশ বাবু বড়ই সুবোধ। কিন্তু, জগৎ পরিবর্ত্তন শীল ; মতিভ্রম হইতে কতক্ষণ। আমরা সহজ চক্ষে দেখিতে পাই, শৈশবের পরিধেয়, যৌবনে ব্যবহৃত হয় না। সেইরূপ শিক্ষা ও সঙ্গ দোষে অনেক স্থলে পৈতৃক রীতিরও পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে ? সে নজীর "হাতের নখ দর্পণে" প্রতিফলিত হইয়াছে দেখিয়া এখন আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমাদের (শুদ্ধ আমাদের কেন ? সকলের) পিতৃপিতামহাদিক্রমে ঈশ্বরের নাম লিখিবার কালে নামের পূর্ব্বে "শ্রীশ্রী" এবং মনুষ্যের নাম লিখিবার কালে "শ্রী"শব্দ বাঙ্গলায় লিখিবার রীতি নীতি আবহমান কাল হইতে প্রচলিত আছে এবং সকলেই তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহা দ্বারা ঈশ্বরের ও মনুষ্যের একটুকু ভেদাভেদ জ্ঞান হয়। কিন্তু অনীশ্বরবাদীরা তা মানে না। পরন্তু,বাঙ্গালীর ছেলে হইয়া (বিশেষতঃ পবিত্রকুলে জন্ম লইয়া) বাঙ্গলা লিখিবার কালে "শ্রীশ্রী" বা "শ্রী" শব্দটা ত্যাগ করা কি দোষের ও নাস্তিকতার পরিচয় নয় ? তবেই বলিতে হইল ;

"যোধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণী তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবহি॥"

শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু "শ্রীশ্রী" বা "শ্রী"পাঠ ত্যাগ করিয়া লিখিয়াছেন।

(১) "চৈতন্য" রূপসনাতনকে যে এক খান পত্রলেখে, সেটা বড় নোংরা, তাহার উপমাটা 'চৈতন্যের' লেখা উপযুক্ত হয় নাই।

(২) "চৈতন্য" কতকগুলা মুণ্ডিতমস্তক কৌপীনধারী সহচর সঙ্গে যখন রামকেলী গ্রামে গিয়া হরিবোলের ধুয়া তুলে, সেই সময় মুসলমান দল ক্ষেপিয়া উঠে, হাঙ্গামা ও ব্রহ্মহত্যা হইবার যোগাড় হয়। শেষে রূপ সনাতন বেগতিক দেখিয়া চুপে চুপে চৈতন্যের নিকটে গিয়া তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে বলে। তদনুসারে "চৈতন্য" নীলাচলে ফিরিয়া যায়।

(৩) চৈতন্যের ভক্তগণ যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছে, তাহা নিতান্ত খাপছাড়া, পরস্পর সামঞ্জস্য নাই এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাহিরে সে সকলের প্রতিপত্তি নাই। বৃন্দাবন বৈষ্ণবদিগের একটা বিচিত্র জিনিস ইত্যাদি। এসকলের উত্তরে বলিব,

"জড়ে প্রভবতি প্রায়ো দুঃখং বিভ্রতি সাধবঃ।"

অর্থাৎ জড়ের প্রভাবে সাধুর দুঃখ হয়। তৈলকার ঠুলী দ্বারা বৃষচক্ষু রোধ করিলে কখন কি দিনরাত বোধ থাকে ? পৃথিবীতে এমন জড় অনেক আছে। যাহার যেরূপ দৃষ্টিশক্তি,সে সেই ভাবেই বাহ্য বিষয় দর্শন করে। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে অসূয়া প্রকাশ করা বিজ্ঞ উমেশ বাবুর ন্যায় সরল বিশ্বাসীর উপযুক্ত হয় নাই, উহা সমাজনিন্দনীয়।

অনেকের ইহা বোধ আছে,যিনি অচেতন পদার্থকে চৈতন্য দেন,তিনিই শ্রীচৈতন্য নামে বিখ্যাত। তিনিই দুষ্কৃতজনের হস্ত হইতে সাধুদিগকে পরিত্রাণের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতার রূপ ধারণ করেন। যথা ;—

"পরিত্রাণায় সাধুনামিত্যাদি।"

ঈশ্বর অন্যান্য যুগে অসুর বিনাশের নিমিত্ত নানা অবতার হইয়া, অসুর বিনাশের কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিযুগে অসুর বিনাশের কার্য্য নাই। সহিষ্ণুতা গুণই সমধিক ; মার খাইয়া অযাচককে প্রেম দিয়াছিলেন, এজন্য দয়াল নামে বিখ্যাত।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে দলবল সমভিব্যাহারে রামকেলী গ্রামে গিয়াছিলেন,তাহার ভিতর কেহ ন্যাঙটা সন্ন্যাসী ছিল না। যাঁহারা সৃষ্টিস্থিতি, প্রলয় আর দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকর্ত্তা "সঙ্গোপাঙ্গ রূপে" সেই সমস্ত বীর্য্যবান পুরুষ সঙ্গে ছিলেন। শুদ্ধ এ যুগে নহে, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে ঈশ্বরের যখন যে কোন অবতারের প্রয়োজন, ঐ সকল সঙ্গের সঙ্গী সর্ব্বসময়ে তাঁহার সহচর রূপে অনুগমন করেন। কলিযুগে একমাত্র ;

"হরে র্নামৈব কেবলং॥"

হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই। এজন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম প্রেম প্রচারার্থ রামকেলী গ্রামে গিয়াছিলেন,হাঙ্গামাকে ভয় করেন নাই, যে হরিনামের ধুয়া তুলিয়াছিলেন,তাহাতে হাঙ্গামার কথা দূরে থাক্,কীট, পশু,পক্ষী, স্বপচ, যবন প্রভৃতি তন্নামে প্রমত্ত হইয়াছিলেন। এমন কি,স্বয়ং হুষেণসাহু তদ্দৃষ্টে আশ্চর্য্য হইয়া ঈশ্বর জ্ঞানে বলিয়াছিলেন ;—

"কাজিবা কোটাল কিম্বা হউ যেই জন।
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

শ্রীগৌরাঙ্গ কি তদীয় সহচরবর্গের মহত্ত্ব আসুর প্রকৃতি ব্যক্তি মাত্রেই অতি অল্প জানে ; এ কথা বিশ্ববিদিত। যথা ;—

"দ্বৌ ভুত স গোলকোঽস্মিন, দৈব আসুর এবচ।
বিষ্ণু ভক্তি স্মৃতোদৈব, আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়॥"

(২) শ্রীচৈতন্য দেব, শ্রীরূপ সনাতনকে যে একটী প্রেমপত্রিকা লিখিয়াছিলেন,যাহার উপমাটা নোংরা বলিয়া উমেশ বাবুর নজরে ঠেকিয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নোংরা নহে। বড়ই সদুপদেশ পূর্ণ এবং সুনীতি জড়িত। নৈতিক সমুদ্রমন্থনোত্থিত। এক দুর্লভ তত্ত্ব, ভাষা কথায় আছে ;—

"সাপের হাঁচি বেদে বুঝে"

ব্রজবাসীগণেই ইহার বিশেষ তত্ত্ব জানেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ;—

"এই প্রেম নৃলোকে না পায়"

তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু,

"পর ব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবা স্বাদয় ত্যন্তর্নব সঙ্গ রাসায়ণং॥"

(৩) মহামহোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রবেত্তাগণ গ্রন্থে খাপছাড়া কথা লেখেন নাই। যাহা কিছু লিখিয়াছেন,তাহার সামঞ্জস্য ভাব রক্ষা করিয়াছেন, তবে অনেক স্থলে ;—

"সকলের গম্যনহে গদাধর তত্ত্ব।
অজ্ঞান অন্ধজনে না জানে মহত্ত্ব॥"

তাহার কারণ, ভক্তিশাস্ত্র বাহির সম্প্রদায়ে প্রতিপত্তি নাই। তা কেনই বা থাকিবে? গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ;—

"বিনয় করিয়া বলি, বৈষ্ণব গোঁসাই।
অবৈষ্ণবে গ্রন্থ কভু দেখাইবে নাই॥
গবাগুল গ্রন্থ অর্থ বুঝিতে নারিবে।
ভিন্ন অর্থ ঘটাইয়া, লোক হাসাইবে॥"

(৪) শ্রীবৃন্দাবন পৃথিবীর উচ্চ ভূমি, শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসস্থান। শাস্ত্রে আছে ;

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।"

তাই, শ্রীবৈষ্ণবে ঐ তীর্থ বড় ভালবাসেন, ও ঐ স্থানে থাকিতেই অভিলাষ করেন। যদি তাহার কিছু মহত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা হয়, স্বয়ের কথা নয়, শাস্ত্রের কথা—বৈষ্ণবগ্রন্থ ভক্তিরত্নাকরে মথুরামাহাত্ম্য পাঠ করিলেই উমেশ বাবু তা বুঝিতে পারিবেন।

স্বদেশের কথা ;—

"জননী জন্মভুমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

দ্বারকেশ্বর নদের উপকুলবর্ত্তী শ্রীপাঠ খানাকুল কৃষ্ণনগর। যেথানে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সহচর শ্রীরামদাস শর্ম্মা নামান্তর শ্রীশ্রীপ্রভু অভিরাম গোস্বামী, যিনি ষোলসাঙ্গেরকাষ্ঠ একখানা বাঁশী করিয়াছিলেন, যাঁহার তেজপুঞ্জ প্রভাবে এক এক দণ্ডতে শত শত শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি বিদীর্ণ হইয়াছিলেন ; যাঁহার জয়মঙ্গল চাবুক আঘাতে বড় বড় লোক সোজা হইয়াছিল ; যিনি,শ্রীব্রজধামে শ্রীদাম নামে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা ছিলেন ; যাঁহার কীর্ত্তি সমূহ শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্টে এবং প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর ও অভিরামচরিতে বিস্তারিত ব্যক্ত আছে ; যাঁহার স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ এপর্য্যন্ত খানাকুল শ্রীপাঠে বিরাজ করিতেছেন, যে শ্রীপাঠ বৈষ্ণবের দ্বাদশ পাটের প্রধান ; শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু সেই মাতৃভূমির ক্রোড়ে বসিয়া একবার পুরাবৃত্ত অনুধাবন করিয়া দেখুন, তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কোন্ দেবতা এবং শ্রীরূপ শ্রীসনাতন কোন্ পদার্থ,তাহার প্রকৃততত্ত্ব জানিতে পারিবেন ; বেশীদূর যাইতে হইবে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগদ্গুরু,শ্রীমৎ সনাতন ও রূপ ছয়গুরুর প্রধান। আমরা বৈষ্ণবের দাসানুদাস এবং স্তাবক। ভারতবর্ষের বিখ্যাত নৈয়ায়িক শ্রীশ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম, বলিয়াছিলেন ;—

"শিরেবজ্র পড়ে যদি, পুত্র মরি যায়।
তথাপি প্রভুর নিন্দা, সহা নাহি যায়॥"

তাই ব্যথিত হৃদয়ে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে পাগলের ন্যায় যাহাকিছু বলিলাম, তাহাতে বিরক্ত বা ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই। যদি শ্রুতিকটু হয়, আশাকরি, শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু সাধুগুণে ক্ষমা করিবেন। অলমতি বিস্তরেণ। ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০১।

বৈষ্ণবদাসদাসানুদাস
শ্রীহারাধন দত্ত, বদনগঞ্জ।

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম্মপ্রচার। (ভ্রম প্রদর্শন)

বহুদিন যাবৎ জয় নারায়ণ বাবু 'ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম্মপ্রচার' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন। আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, এপর্য্যন্তও কেহ তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হন নাই। রীতিমত প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নয়; কয়েকটী মাত্র ভ্রম প্রদর্শন করিলেই বিজ্ঞ পাঠক বুঝিতে পারিবেন, জয়নারায়ণ বাবুর প্রবন্ধের মূল্য কি?

১। জয়নারায়ণ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টকে যথেষ্ট আক্রমণ করিয়াছেন। আক্রমণের প্রধান ভিত্তি 'প্রতিভাঞ্জিলিয়ম' প্রভৃতি উপগস্পেল। এই সকল গ্রন্থের অন্য নাম (Pseudepigrapha) অথবা মিথ্যা গস্পেল (Spurious gospels) খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী এই সকল গ্রন্থকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। কে কি কারণে এই সকল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কেহ অবগত নন। এই পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই কয়খানা মিথ্যাগস্পেল্ বাইবেলের চারি খানা গস্পেলের অনেক পরে লিখিত। কারণ ২৫০ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে একখানারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ অসত্য এবং অজ্ঞাত লোকদের দ্বারা লিখিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া খ্রীষ্ট কিম্বা খ্রীষ্টধর্ম্মকে আক্রমণ করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত, বিজ্ঞ পাঠক তাহা বিচার করিবেন। এই সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, আমি সেই সম্বন্ধে কিছুই বলিবনা, কারণ, যাহার ভিত্তিই মিথ্যা, তাহার প্রতিবাদ করিয়া কি হইবে?

২। জয়নারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন "খ্রীষ্টোপাসকেরা ত্রিমূর্ত্তির উপাসক; যোষেফ ইহুদি। ইহুদির একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অপর ঈশ্বরের পূজা বা মান্য করা নিষেধ।

I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage, thou shalt have no other gods before me.

Exodus XX. 2, 3.

* * *। ইহুদিদিগের এক ঈশ্বর ভিন্ন অপর ঈশ্বর নাই। হোলিঘোষ্ট ইহুদি শাস্ত্রের কি বিপরীত মত নহে?" (নব্যভারত ১০ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা) এখন দেখা যাউক, এই কয়টী মাত্র কথাতে তিনি কি কি ভুল করিয়াছেন?

(ক) খ্রীষ্টিয়ানগণ তিন মূর্ত্তির উপাসনা করেন, এরূপ অসত্য কথা তাঁহার প্রবন্ধে দেখিতে আশা করি নাই। লোকে নিজের মত দাঁড়া করাইবার জন্য কিনা করিতে পারে? খ্রীষ্টিয়ানগণ এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। কিন্তু একই ঈশ্বরে তিন ব্যক্তিত্ব অথবা ত্রিত্ব (Trinity) বিশ্বাস করেন। ত্রিত্বের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যদি সুযোগ হয়, বারান্তরে কিছু বলিতে পারি। সম্প্রতি জয়নারায়ণবাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য কিনা, তাহাই দেখাইব!

(খ) জয়নারায়ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাব এই যে, ঈশ্বরে একাধিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ইহুদির বিশ্বাস খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের অনুরূপ নহে বরং বিপরীত। দেখা যাউক, এ কথা সত্য কিনা? বাইবেলের ১ম অধ্যায়ে আছে;—

And God said Let *us* make man in *our* image, after *own* likeness. (Genesis 1.26.)

ঈশ্বর 'us' এবং 'our' প্রভৃতি বহুবচন শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। এবং Genesis কি ইহুদি শাস্ত্র নয়? বাইবেলের ১ম পৃষ্ঠা ভাল করিয়া না পড়িয়াই এরূপ মত প্রকাশ

করা কি ঠিক হইয়াছে? এ অধ্যায়ে ১ম পদে আছে;—

In the beginning God created the heaven and the earth. (Gen. I. 1.)

'God' শব্দটী হিব্রু Elohim শব্দের অনুবাদ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। হিব্রুভাষাতে Elohim বহুত্বব্যঞ্জক, অথচ ইহার ক্রিয়া একবচনান্ত হয়। ইহাতে কি ইহুদির বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেল না? খ্রীষ্টিয়ান ও ইহুদি উভয়ই বিশ্বাস করেন,ঈশ্বর এক; কিন্তু তাঁহাতে তিন ব্যক্তিত্ব, তাই Elohim শব্দ তাই বহুবচনান্ত 'us'এবং 'our' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(গ) তিনি বলিয়াছেন, পবিত্র-আত্মা ইহুদি শাস্ত্রের বিপরীত মত। পবিত্র-আত্মা বলিতে ঈশ্বরের আত্মাকে বুঝায়, সকলেই বোধ হয় ইহা জানেন। দেখা যাউক,পবিত্র-আত্মা ইহুদিশাস্ত্রের বিপরীত মত কিনা? বাইবেলের ১ম পৃষ্ঠার ৫ম পংক্তিতে আছে;—

And the Spirit of God moved upon the face of the waters. (Genesis I. 2.)

আবার জিজ্ঞাসা করি Genesis কি ইহুদির শাস্ত্র নয়? শুধু একবার নয়,ঈশ্বরের আত্মা পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে Old Testament এ অনেক স্থানেই আছে। আমার বিশ্বাস জয়নারায়ণ বাবু বাইবেল না পড়িয়া,অন্যের কথা শুনিয়াই প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ কথার সত্যতা ক্রমশঃ আরও দেখিতে পাইবেন।

৩। জয়নারায়ণ বাবু বলিয়াছেন "মথি এবং লুক স্বর্গীয় দূতের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অসংলগ্ন দোষ আছে। মথি দূতের নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। লুক বলিয়াছেন, ঐ দূতের নাম গেব্রিয়েল। মথি লিখিয়াছেন, দূত যোষেফের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, লুক বলেন,দূত মেরীকে দর্শন দিয়াছিলেন। মথি বলেন, যোষেফের স্বপ্নাবস্থায় দূত তাহাকে দর্শন দেন। লুক বলেন, জাগ্রত অবস্থায় দূতের সহিত মেরীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মথির প্রমাণে প্রতীয়মান হয়, মেরীর গর্ব্ভে যিশুর অবতীর্ণ হইবার পর দূত যোষেফের সহিত সাক্ষাৎ করেন। লুক বলেন, মেরীর গর্ব্ভ হইবার পূর্ব্বে দূত তাহার নিকট আগমন করেন। মথির গ্রন্থানুসারে সপ্রমাণ হইয়াছে,মেরীর গর্ব্ভ হেতু ব্যথিত যোষেফকে প্রবোধ দিবার জন্য দূতের আগমন হইয়াছিল; লুকের লিপির মর্ম্ম লোকসমাজে মেরীর কলঙ্কঘোষণা নিবারণ জন্য দূত আবির্ভূত হন। সত্যের জন্য উভয়েই দায়ী,কাহার কথা বিশ্বাস্য?" (ন, ভা ১০ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা) এ ঘটনাটিও কি জয়নারায়ণ বাবু বুঝিতে পারেন নাই? দুটী ঘটনাকে একটী ঘটনা মনে করিয়া তিনি ভ্রমে পড়িয়াছেন। মথি যে ঘটনাটির কথা লিখিয়াছেন, লুক তাহা লিখেন নাই। তিনি অন্য ঘটনার বিষয় লিখিয়াছেন। জয়নারায়ণ বাবু বুঝিতে পারেননাই বলিয়া কি মথি এবং লুক অসংলগ্ন দোষে দোষী হইবেন?

৪। জয়নারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন"খ্রীষ্টের বহুকাল পূর্ব্বে দায়ূদবংশ অবমূষ্টদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল।" ইহার প্রমাণ চাই। প্রমাণ ভিন্ন কথা মানিব কেন? তিনি রেনানের দোহাই দিয়াছেন। রেনান বলিয়াছেন "The family of David, *as it seems*, had been long extinct." (Italics আমাদের) এখন জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা যিশুর সঙ্গে ছিলেন, যিশুর নিজের মুখের কথা শুনিয়াছেন,তাঁহাদেরই কথা বিশ্বাস করিব,না, দুই সহস্র বৎসর পরে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যিনি

তাঁহাদেরপ্রতিবাদ করিলেন,তাঁহারকথা বিশ্বাস করিব ? ইহুদি বংশাবলী সম্বন্ধে ইহুদির কথা বিশ্বাস করিব, না, দূরদেশস্থ ফরাসী পণ্ডিতের কথা বিশ্বাস করিব ? জয়নারায়ণ বাবু বলিয়াছেন,ফরাসী পণ্ডিত রেনানের মতে খ্রীষ্ট রাজ বংশীয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে,তাহা প্রাচীনগণের চাতুরী এবং রেনান হইতে এই কথা গুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

"Never does he designate himself as son of David. The title son of David was the first which he accepted probably without being concerned in the innocent frauds by which it was sought to secure it to him."

'Probably without being concerned in the innocent fraud.'

এস্থলে Probably শব্দের অর্থ কি ? সাধারণ জ্ঞানে যতদূর বুঝি Probably শব্দে দুই দিকেই সম্ভাবনা বুঝায়,অর্থাৎ ইহাতে যেমন '*not* concerned in the innocent fraud' বুঝায়,তেমনই *Concerned* in the innocent fraud ও বুঝায়, অর্থাৎ দুইদিকেরই সমান সম্ভাবনা। কি ভয়ানক কথা ! বিজ্ঞ পাঠক যিশু সম্বন্ধে কি কখনো এ কথা বিশ্বাস করিতে পারেন ? প্রাচীনগণের চাতুরীই বা কোথায় ? রেনান উদ্ধৃত অংশে স্বীকার করিয়াছেন, খ্রীষ্ট 'দায়ূদের সন্তান' এই আখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে আবার রেনান কি করিয়া বলিতেছেন, জয়বাবুই বা কি প্রকারে বলিতেছেন,খ্রীষ্ট দায়ূদের সন্তান বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন নাই—যদি অযথা আখ্যা হইত, তবে কি তিনি ইহার প্রতিবাদ করিতেন না ? Innocent fraud কাহাকে বলে,জানি না। যিনি বলিলেন "আমিই সত্য" তাঁহার নিকট Fraud আবার innocent হইল ? Innocent fraud এ যে লজিক বিরুদ্ধ কথা,নির্দ্দোষ বলিলে আর প্রবঞ্চনা বলিবেন না, প্রবঞ্চনা বলিলে আর নির্দ্দোষ বলিবেন না। নির্দ্দোষ প্রবঞ্চনা অসম্ভব। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,যদি ফরাসী পণ্ডিত রেনান ও জয়বাবুর এসম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞান থাকে,তবে নিশ্চয়ার্থক শব্দ ব্যবহার না করিয়া Probably এবং as it seems প্রভৃতি পদের ব্যবহার কেন ? যিশু দায়ূদের বংশোদ্ভব,এই সম্বন্ধে যদি সংশয় থাকে, তবে এই গ্রন্থগুলি দেখিবেন। Eusebius bk. I c 7 & bk. III c 20 এবং La Histoire de la Palestine by Derenbourg P. 349 এবং Kitto's Biblical Encyclopædia.—মেরী বেৎলিহেমে গিয়াছিলেন, জয়নারায়ণ বাবু ইহা বিশ্বাস করেন না। এবারও জিজ্ঞাসা করি,অবিশ্বাসের কারণ কি ? তিনি নিজেই বলিয়াছেন, রোমক রাজনীতি অতীব প্রশংসনীয়। তাহারা যে দেশ জয় করিত, সেই বিজিত দেশের কোন প্রকার জাতীয় বিষয়ে তাহারা কখনই হস্তক্ষেপ করিত না। মেরী এবং যোষেফ এক বংশোদ্ভব। কাজেই উভয়েরই পৈত্র্যাবাস দায়ূদের নগর (City of David) বেৎলীহেম। Grotius বলিয়াছেন—

"The custom of the Jews was that a census should be made by tribes, houses, and families. But this, after the many revolutions and changes the Jews had suffered, could not be done, except by each person going to the place to which his ancestors had belonged."

রোমক রাজনীতি কি এই জাতীয় প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিল ? জয়নারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন "অল্সসেন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেৎলিহেমে মেরীর পৈতৃক সম্পত্তি ছিল।" ইহা অবিশ্বাস করিবার কি কোন কারণ আছে ? যদি থাকে,সেই কারণ জানিতে চাই। মেরী গর্ভবতী এটীও বেৎলিহেমে যাইবার দ্বিতীয় কারণ। কেন না যোষেফকে যাইতে হইবেই। মেরীর প্রসবকাল সন্নিকট।

তাঁহাকে এ অবস্থায় তিনি কাহার নিকট রাখিয়া যাইবেন? তাই দরিদ্র যোষেফ নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। এ সকল যুক্তি বিশ্বাস না করিতে হয় না করুন, কিন্তু মরিয়ম বেৎলিহেমে গিয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস করিবার স্পষ্ট কারণ জানিতে চাই।

৫। নক্ষত্র সম্বন্ধে জয়বাবুর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বলেন "মনুষ্যের নক্ষত্র সহ তুল্য গতি, একথা আমি বিশ্বাস করি না।" এ কথা আমিও বিশ্বাস করি না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য যে, কে বলিল জ্ঞানী লোকেরা "নক্ষত্র সহ তুল্য গতিতে" বেৎলিহেমে গিয়াছিলেন? বাইবেলে আছে—

"And, lo, the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was."

নক্ষত্র তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে গিয়াছিল, অথবা জ্ঞানী লোকেরা নক্ষত্রের অনুগমন করিয়াছিল। 'অনুগমন' এবং 'তুল্য গতি' এক কথা নহে। নক্ষত্র যত দ্রুত গতিতেই যাউক না কেন, যতক্ষণ দৃষ্টির বহির্ভূত না হয়, ততক্ষণ আমি অনুগমন করিতে পারি। বেৎলিহেম যিরুশালেমের এত নিকটবর্ত্তী যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে নক্ষত্র কোন প্রকারেই জ্ঞানীলোকদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে পারে না। একটী বিশেষ নক্ষত্র এই সময় উঠিয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধেও জয়নারায়ণ বাবু সন্দেহ করিয়াছেন। সন্দেহের কারণ কিছুই বলেন নাই। কিন্তু Wieseler মুস্তরের বিজ্ঞাপন হইতে দেখাইয়াছেন:—

"The astronomical tables of the Chinese actually record the appearance, for seventy days, of a *new star* in 750 (রোমীয় শকাব্দা) and this is corroborated by Humboldt (Kismos Vol I p. 389 and III P. 561) and by the astronomer Pingre (Cometsgraphie-tom I P. 287) who calls this *new star* a comet and records the appearance of two comets—one in February and March, 749, and the other in April 750 (Wieseler pp. 61,62)."

এরূপ ক্ষণস্থায়ী নক্ষত্রের কথা হর্শেলও উল্লেখ করিয়াছেন। তায়কোব্রাহি ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর এরূপ একটী নক্ষত্র দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন (Herschel's astronomy P. 383) কেপ্লারও এই নক্ষত্রোদয় বিশ্বাস করিতেন। এই সকল লোকদের সাক্ষ্যই বিশ্বাস করিব, না জয়নারায়ণ বাবুর অনুমানই বিশ্বাস করিব?

নক্ষত্র সম্বন্ধে জয়বাবু বলেন যে, 'নক্ষত্রটীর ব্যাস কি বাস্তবিক এত ক্ষুদ্র যে, শিশুটী যে স্থানে ছিলেন, তারাটী ঠিক তাহার উপরে স্থগিত হইয়া রহিল? ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?' জয়নারায়ণ বাবু ইহা বুঝিতে পারেন নাই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। দুই রকম ভাষা আমরা ব্যবহার করি। বৈজ্ঞানিক ভাষা এবং দৃষ্টির অনুরূপ ভাষা (Language of appearance)। "সূর্য্য উদয় হয় বা অস্ত যায়" ইহা দৃষ্টির অনুরূপ ভাষা, অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিতে যেরূপ বোধ হয়, ভাষাতে তাহাই প্রকাশ। কিন্তু বিজ্ঞান মতে 'সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে উদয় হয় বা পশ্চিমে অস্ত যায়' প্রভৃতি ভাষা কি সত্য? কখনই না। অথচ জয়নারায়ণ বাবু কি এরূপ ভাষা ব্যবহার করেন না? পক্ষান্তরে "সূর্য্য উদয় হইলে" না বলিয়া সেই স্থলে বিজ্ঞানমতে যদি বলি "পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের দেশ সূর্য্যের সম্মুখীন হইলে" তবে কি আমরা উপহাসাস্পদ হইব না? এখন বিজ্ঞ পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, জয় বাবু কেবল দৃষ্টির অনুরূপ ভাষা না বুঝিয়াই নক্ষত্রের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন।

৬। জয়নারায়ণ বাবু বিশ্বাস করেন যে, মেরী যিশুর জন্মের পরও কুমারী ছিলেন। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর রাখিয়া তিনি

বুদ্ধমাতা মায়ার সহিত মেরীর উপমা দিয়াছেন। তাঁহার মত সমর্থন করিবার জন্য তিনি যিহিস্কেল (Ezekiel) ৪৪ অধ্যায়ের ২য় পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন; এবং এই পদ হইতে তিনি মনে করেন, খ্রীষ্টিয় শাস্ত্র বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। দেখা যাউক, কথাগুলি কত দূর সত্য। যিহিস্কেলের পদটী যে মেরী সম্বন্ধে নয়, মনোযোগের সহিত ঐ অধ্যায়টী পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যায়। এই পদটী যদি প্রকৃত পক্ষে মেরী সম্বন্ধেই লিখিত হইয়া থাকে, তবে যে বৌদ্ধ শাস্ত্রই খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের অনুকরণ হইয়া পড়ে। যিহিস্কেল খ্রীষ্ট জন্মের ৫৭৪ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। বৌদ্ধের জন্ম এবং বৌদ্ধশাস্ত্র ইহার পরে লিখিত হয়। এখন দেখা যাউক, যিশুর জন্মের পরেও মেরী কুমারী ছিলেন কি না। যে যাহাই বলুক না কেন, আমরা শুধু বাইবেলই বিশ্বাস করি; বাইবেলে আছে—

"Joseph knew her nct till she had brought forth her firstborn son (Matt. I. 25).

পাঠক, এখন till এবং firstborn son এই দুটী কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবেন। Till শব্দে এই বুঝায় যে, যদিও মেরী স্বামীস্ত্রীরূপে থাকেন নাই, তবু প্রথমজাত পুত্র হইলে পর তাঁহারা স্বামীস্ত্রীরূপে একত্র থাকিতেন। "প্রথম জাত" (first born) শব্দে কি দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব বুঝায় না? দ্বিতীয় না থাকিলে আবার প্রথম কি?

৭। আর একটীমাত্র ভ্রম দেখাইয়াই আমি নিরস্ত থাকিব। জয়নারায়ণবাবু বলিয়াছেন, "ইহুদির হোলিঘোষ্ট বিশ্বাস ইহুদীয় শাস্ত্রের বিপরীত কিনা? * * * পালিষ্টিনে কোন্ সময় হইতে হোলিঘোষ্ট বিশ্বাস প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল? বাইবেলের প্রমাণ এস্থলে উল্লেখ করি;—

"Paul having passed through the upper coasts came to Ephe sus, and finding certain disciples he said unto them, have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost." (Acts XIX 1,2.)

জয়নারায়ণ বাবুর প্রবন্ধের এই স্থানটী পড়িতে পড়িতে বহুদিন হইল সুবিজ্ঞ বারিষ্টার এ, চৌধুরী মহাশয় Concord পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই মনে পড়িল। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাব এই— "আমার সমপাঠীদের মধ্যে যাঁহারা দুইয়ে দুইয়ে যোগ করিলে কত হয় জানিতেন না, যিরুশালেম বা জেমিকা কোথায় তাহা যাঁহারা অবগত ছিলেন না, আজ কাল তাঁহারাই সংবাদ বা সমালোচন পত্রের লেখক।" কেন এ কথাটী মনে পড়িল, পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাইবেলের যে অধ্যায় হইতে জয়নারায়ণ বাবু উল্লিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে অধ্যায়ের ৭ম পদ পড়িলেই জানা যায় যে "সেই লোকেরা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দ্বাদশজন পুরুষ ছিল" (Acts XIX. 7) এই বার জন লোকে পবিত্র-আত্মা সম্বন্ধে শোনে নাই বলিয়াই কি মানিব পালিষ্টিনে "হোলি ঘোষ্টবিশ্বাস প্রবর্ত্তিত" হয় নাই? পৌল তবে পবিত্র-আত্মা সম্বন্ধে কোথা হইতে জানিলেন? যিশুর অন্যান্য শিষ্যেরাও ত জানিতেন। যোহন অবগাহন ও প্রচার করিবার সময় সহস্র সহস্র ইহুদিকে বলিয়াছিলেন, "তিনি (যিশু) তোমাদিগকে পবিত্র আত্মাতে অবগাহিত করিবেন"। তবুও কি বলিব "হোলিঘোষ্ট বিশ্বাস পালিষ্টিনে প্রবর্ত্তিত ছিল না? পূর্ব্বে একবার দেখাইয়াছি, ইহুদিশাস্ত্রের প্রথম পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ৫ম পংক্তিতে "ঈশ্বরের আত্মা" সম্বন্ধে কথা আছে (Gen. I. 2) তবুও কি বলিব ইহুদিরা পবিত্র

আত্মার কথা জানিতেন না? তবে ইফিষের (Ephesus) বার জন লোক এ কথা বলিল কেন?

জয়নারায়ণ বাবু যে মহাভ্রমে পড়িয়াছেন। কোথায় বা ইফিষ কোথায় বা পালিষ্টিন! ম্যাপ খানা খুলিয়া দেখিয়া এই প্রবন্ধটী লিখিলে কি ভাল হইত না? কোথায় বা স্মার্ণার নিকটস্থ ইফিষ নগর, কোথায় বা পালিষ্টিন। কোথায় বা জেনটাইল, কোথায় বা ইহুদি। কাবুলের দোষের জন্য কলিকাতার লোক দায়ী! তাই বলিয়াছিলাম, বারিষ্টার এ, চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধের কথা মনে পড়িল। এরকম না জানিয়া না বুঝিয়া প্রবন্ধ লিখার ফল কি? বিজ্ঞ পাঠকগণ এখন বিচার করিয়া, দেখিবেন, জয়নারায়ণ বাবুর প্রবন্ধের মূল্য কত? শ্রীবিমলানন্দ নাগ।

ফুলের বিবাহ।

একদিন নিদাঘ কালে যখন প্রখর সৌরতাপে বঙ্গদেশ দগ্ধ হইতেছিল, মধ্যাহ্নাহারের পর মস্তক ন্যস্ত করিয়া সমুদ্র-সৈকতে কোন গৃহে বিশ্রাম করিতেছিলাম। তপনদেবের তীব্র রশ্মি বারিনিধির সংসর্গে শান্তভাবধারণ করিয়াছিল। নাতিশীতোষ্ণ দক্ষিণমারুতকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া সরিৎপতিও লহরী তুলিয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। কল্লোলমালার শুভ্র দীপ্তিতে দৃষ্টি সন্তপ্ত হইতেছিল। এজন্য সম্মুখে একখানি বহি ধরিলাম। দেখিলাম, একখানি কবিতাপুস্তক, বঙ্গ-কুলীন-কুমারীর দুঃখে কবি বলিতেছেন;—

"অই শুকালো মুকুল
ও নয় হৃদয়ানন্দা, গোলাপ রজনীগন্ধা
ও নয় চামেলী, বেলী, মালতী, বকুল।"

পড়িতে পড়িতে মনে হইল, বঙ্গ-কুলীন-কুমারী অপেক্ষা চামেলী বেলী বাস্তবিক সুখী না দুঃখী? এইরূপ অদ্ভুত ভাব মনোমধ্যে উদিত হইতেছিল, ইহার কত পরে মনে নাই, —দেখিলাম, কোন যেন অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন দেশে আসিয়াছি। সে-দেশে কেবলগাছ! দেখিলাম, কোথাও বট অশ্বত্থ পর্কটি প্রভৃতি বিশাল শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, কোথাও তাল নারিকেল গুবাক প্রভৃতি শিরঃ উন্নত করিয়া রাখিয়াছে; কোথাও মন্দার কিংশুকশাল্মলী প্রভৃতি নবপল্লবে দেহসুশোভিত করিতেছে; কোথাও কহ্লার কুবলয় কোকনদ প্রভৃতি দীর্ঘিকার জলে ক্রীড়া করিতেছে; কোথাও নাগকেশর বকুল, কোথাও মল্লিকা যূথী জাতি কুন্দ গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিয়াছে; কোথাও মাধবী মালতী অপরাজিতা লতাইয়া লতাইয়া উপরে উঠিতেছে। যে দিকে চক্ষু ফিরাই, সেই দিকেই দেখি, অসংখ্য বৃক্ষলতা তৃণগুল্মে দেশ পরিপূর্ণ। চারিদিকে কত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কত ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে, কত ফুল 'ফোট ফোট' হইয়া আছে। কত ফুল পবনের ধীর পদক্ষেপ ও মধুকরের ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেছে। সেখানে ফুলের রাজ্য, গ্রাম; ফুলের জনপদ, পরিবার। সেখানে ফুলে ফুলে কলহ হইতেছে, ফুলে ফুলে জীবন-সংগ্রাম ঘটিতেছে, ফুলে ফুলে সম্ভাষণ চলিতেছে।

বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে চারিদিক্ অবলোকন করিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ দেখিলাম, প্রৌঢ়া দীনভাবাপন্না বঙ্গ-কুলীন-কুমারীর ন্যায় চামেলী সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার মনের ভাব যেন বুঝিতে পারিয়াছে, তাই বলিতে লাগিল "তোমরা ও আমরা পৃথিবীতে এত দিন

একত্র বাস করিতেছি, আমাদিগকে চিনিলে না? একত্রে বাস করিলে যে সহানুভূতি জন্মে, তাহাও কি তোমাদের নাই? তোমরা নিজেদের কুলীন-কুমারীর দুঃখে ব্যথিত হইতেছ এবং আমাদিগকে না জানি কতই সুখে সুখী ভাবিয়া বলিতেছ—"ও নয় কুমুদ পদ্ম প্রাণময় ফুল।"

এই কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। ভাবিলাম,বাস্তবিক কি ফুলের আবার একটা বিবাহ আছে,তাহাদের আবার কুলীন-কুমারী আছে? চামেলি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"আমাদের রাজ্য বেড়াইয়া আইস। তাহা হইলে বলিবে যে, 'তুইও একজন জগতের তরে, এ বিশ্বজগত তোরও লাগি।' তাহা হইলে দেখিবে যে,ফুলরাজ্যের মধ্যে আমরা কত দুঃখী।"

সেই দিকে চলিয়া গেলাম। সেখানে দেখিলাম,যাহাকে পরাগকেশর বলিয়া জানিতাম, সে গুলি পুরুষপুঞ্জ, গর্ভকেশর গুলি রমণী, ফুলের পাঁপড়িগুলি পুরুষ রমণীর বসন ভূষণ, শাখা প্রশাখাগুলি জনপদ, পুষ্পবৃন্তগুলি এক একটি ঘর মাত্র। আমার চক্ষে ফুল আর ফুল রহিল না। দেখিলাম,ফুলগুলি এক একটি প্রেম অবতার, প্রণয়ী প্রণয়িনীর মূর্ত্তিমাত্র। সে প্রেমে পবিত্রতা সরলতা আছে, সে প্রেমে স্বার্থত্যাগ আত্মনাশ আছে। আবার, সে প্রেমে কটাক্ষ আছে, যৌবন তরঙ্গের লীলা আছে, সে প্রেমে কুহক আছে। দেখিলাম, যেমন মানব হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্বেগ প্রভৃতির লক্ষণ দেখিয়া তৎসমুদায় অপর প্রাণীর অনুমিত হয়, যেমন চিত্রাঙ্কিত নরনারীর হাব ভাব বসন ভূষণ আকার ইঙ্গিত দেখিয়া তাহাদের নিভৃত মনোগহ্বরের উদ্দাম ভাবনিচয় প্রতীয়মান হয়, ফুলেও তেমনই লক্ষণ বর্ত্তমান। অবগুণ্ঠনবতী তিল ফুলের ব্রীড়া, বা যৌবনোন্মুখী মাধবীর হাস্যচ্ছটা, বা গর্ভ-ভার-পীড়িত জবাকুসুমের ম্লান ও পাণ্ডুর বর্ণ দেখিলে তাহাদের মনোভাব বুঝিতে বাকী থাকে কি?

দেখিলাম ফুলরাজ্যে জন্মবর্দ্ধন পুষ্টি মরণ,যত কিছু কার্য্য আছে, সমুদায়েরই উদ্দেশ্য বিবাহ-সম্পাদন। বিবাহের জন্যই জনপদ, বিবাহের জন্যই ঘর বাড়ী রচনা,বিবাহের জন্যই হরিদ্‌বর্ণ পত্র-রূপ অন্নরন্ধন শালা, বিবাহের জন্যই প্রকাণ্ড-মহীরুহগণ ক্ষুদ্র তরু সকলকে নিপীড়িত করিতেছে, বিবাহের জন্যই লতা সকল বলিষ্ঠ বৃক্ষ সকলকে আলিঙ্গন করিয়া উঠিতেছে।

অধিকাংশ ফুলের এক গৃহে পুরুষ রমণীর বাস দেখিয়া ফুলরাজ্যে সম্বন্ধিত্ব বিষয়ে কিছু সন্দিহান হইলাম। ভাবিলাম, একই বাড়ীর ছেলে মেয়েরা পরস্পর পরস্পরকে বিবাহ করে কি? অলক্ষিত ভাবে চামেলি যে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, তাহা আমার জানা ছিলনা। ঘৃণা-ব্যঞ্জক স্বরে চামেলি বলিতে লাগিল"—আমাদিগকে কি এতই নিকৃষ্ট মনে করিতেছ? তোমরা যে রাজার শাসনে থাকিয়া সম্বন্ধিত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিতেছ, সে রাজার শাসনে আমরাও কি শাসিত নই? এক রাজার কি দুই রকম নিয়ম হইতে পারে?"

এই কথাগুলি শুনিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলাম। উত্তমরূপ না জানিয়া কোন কথা মনে করিলেও যে পাপ হয়, তদ্বিষয়ে আমার বেশ্‌ শিক্ষা হইল। অধোবদনে বিবাহের পদ্ধতি অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গুড়ুচি (গুলঞ্চ লতা), গঞ্জা, পেঁপে প্রভৃতি অনেক জাতির পুরুষ ও রমণীগণের ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ-রূপ পল্লীতে জন্ম হয়,

লাউ কুমড়া তাল খেজুর এরণ্ড প্রভৃতি জাতির পুরুষ রমণীর একপাড়ায় জন্ম হইলেও তাহারা এক মায়ের গর্ভে জন্মে না। হরীতকী বাদাম প্রভৃতি জাতির এক মায়ের পুত্র কন্যা জন্মিলেও শৈশবাবস্থায় কন্যার কিম্বা পুত্রগণের মৃত্যু হয়, কাহারও কাহারও কন্যা কিম্বা পুত্রগণকে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বিকৃত অবস্থায় জীবন যাপন করিতে হয়। সুতরাং এই সকল স্থলে আমার পূর্ব্বোক্ত সন্দেহের কোনও লক্ষণ বর্ত্তমান দেখিলাম না।

ইহাদের যেন নাই থাকিল, জবা অপরাজিতা ধুস্তুরা প্রভৃতিও অসংখ্য জাতি আছে। এক বৃন্তে তাহাদের ত অনেক পুত্র ও কন্যা জন্মিয়া থাকে। চামেলির ভৎর্সনার ভয়ে প্রথমে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, তাহাদের ভাই ভগ্নীর পরস্পর বিবাহ প্রথা নাই। কোন কোন উচ্ছৃঙ্খল পুরুষ অন্যের চক্রান্তে পড়িয়া ভ্রমক্রমে সেই ফুলের রমণীর প্রেমে আসক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে রমণীর অকালে বার্দ্ধক্য ও জরা উপস্থিত হইয়াছিল, কাহারও বা বিবাহের উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন ঘটে নাই। কোন কোন স্থলে এইরূপে পুত্র জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা এত হীনবীর্য্য ও ক্ষীণদেহ হইয়াছিল যে, তাহাদের বংশ রক্ষা হয় নাই। অন্যের চক্রান্তে পড়িয়া অনেক ফুলকুমারীর প্রাণান্ত হইয়াছে এবং যাহাতে এ বিপদে কখনও না পড়িতে পারে, এজন্য অনেক ফুলবধূ নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। দুই একটি কৌশল যাহা দেখিলাম, পরে বলিতেছি।

ফুলের বিবাহের ঘটক কে, ইহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, এক দিকে কোন কোন ফুলকুমারী পবনে গা ভাসাইয়া নৃত্য করিতেছে, কেন না স্বামী সমাগমের আশা হইয়াছে। কুসুম, কুমারীর বর সঙ্গে লইয়া পবনদেব আসিতেছেন, সে আনন্দে অধীর হইবে না ত কি? এই সকল ফুলকুমারীর বসন ভূষণের প্রতি মনোযোগ নাই। কেবল পবন দেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মুখ বাড়াইয়া থাকে। ইনি অসংখ্য বর লইয়া নগরে আসিয়াছেন, যে বর যাহার মনোমত হয়, সে তাহাকে লইতেছে। দুই একটা ভিন্ন জাতীয় বর, পবনের ত্বরিত গমনে কোন কোন ফুলকুমারীর গায়ে গিয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহাতে ফুলকুমারীর দৃক্‌পাত নাই। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। বঙ্গকুলকামিনীর ন্যায় কুসুমকুমারীগণ ঘরের বাহির হন না। বঙ্গকুলীনকামিনীর ন্যায় কোনও কুসুমকামিনী স্বামীর ঘর করিতে যান না। সকল জামাতাই শ্বশুর গৃহে বাস করেন।

আর এক দিকে দেখিলাম, কোন কোন কুসুমকুমারী পতঙ্গকে ঘটক নিযুক্ত করিয়াছে। ভ্রমর বড় লোলুপ। মধু না পাইলে সে ঘটকালি করিতে চায় না। কাজেই কুসুমকুমারীকে ভাণ্ডারে মধু সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। ওদিকে কোন কোন পতঙ্গ কেবল মধুতেই তৃপ্ত নহে। আতর গোলাব দিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিতে হয়। পাছে পতঙ্গের দিগ্‌ভ্রম ঘটে, পাছে সে বর লইয়া অন্য গৃহে প্রবেশ করে, এজন্য অনেক ফুলকুমারী বিচিত্র বর্ণ চারু বসনে স্বীয় দেহ আবৃত করিয়াছে। লোকে বলে, ফুল ফুটছে বলিয়া গরবে আটখানা হয়, ফুটছে বলিয়া চারিদিকে সুষমা ছড়াইয়া সকলকে সুখী করে। কিন্তু দেখিলাম যে, স্বার্থ ব্যতীত তাহার কোন দিকে দৃষ্টি নাই, বিবাহ ব্যতীত কোন উদ্দেশ্য নাই, নচেৎ জন্ম যে বৃথা হয়। বাস্তবিক, কোন

কুসুমের ভাণ্ডারে মধু এবং বসনের পারিপাট্য, উজ্জ্বল বর্ণ ও সুগন্ধ দেখিলে তাহার পরহিত-ব্রত অলীক বকব্রত বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস হইতে লাগিল।

যে সকল বর জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কন্যার পাড়ার দূরে বাস করে, পতঙ্গের ঘটকালি তাহাদের নিতান্ত আবশ্যক। মধু না থাকিলে বরের ঘরে পতঙ্গ আসিবে কেন? আর পতঙ্গ না আসিলেই বা পথ দেখাইয়া কন্যার ঘরে বরকে লইয়া যায় কে? এজন্য কোন কোন বরও ঘরে যৎকিঞ্চিৎ মধু রাখে। কোন কোন বরের দুই একটি ভগ্নী থাকে। ইহারা মধু সঞ্চয় করিয়া দিয়া নিজেরা রুগ্ন বা বিকৃত হইয়া পড়ে। এজন্য ইহাদের কখনও বিবাহোপযুক্ত যৌবন হয় না। এই মধুর সদ্ব্যবহার দ্বারা বর পতঙ্গের পিঠে চড়িয়া কন্যার অন্বেষণে বহির্গত হয়। পবনদেব পতঙ্গের মত লোভী নহেন। পবনের অভাব কি, একটু মধুর জন্য স্বীয় ঔদার্য্য খর্ব্ব করিতে চায় কে? ফুলকুমারী এ কথা পূর্ব্বেই জানিয়াছিল। এজন্য সে উৎকোচের ব্যবস্থা না করিয়া পবনের আগমনের ব্যাঘাত না ঘটে, এই অভিপ্রায়ে পথ ঘাট পরিষ্কার এবং অত্যধিক বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া কাল-প্রতীক্ষা করে।

কোন কোন ফুলকুমারীর ঘর জলের মধ্যে, সুতরাং বরকেও জলে বাস করিতে হইতেছে। যৌবনোন্মেষের পূর্ব্বেই বর কন্যা জলের উপরে উঠে। অলি-চুম্বিত না হইলে কুমুদ ও কমলের ন্যায় বৃহৎ জলজ পুষ্পের বিবাহ হয় না। জলে পড়িলে ইহাদের বরেরা হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। সুতরাং ষট্‌পদের পৃষ্ঠে আরোহণ ব্যতীত ইহাদের উপায়ান্তর নাই। বাস্তবিক, পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কোন স্থানের ন্যায় যে সকল ফুলের গ্রাম জলে নিমগ্ন থাকে, তাহাদিগকে দীর্ঘ-বৃন্ত-রূপ উচ্চ ভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। এক জাতীয় জলজ শৈবালের * কন্যার ঘর দীর্ঘ বৃন্তে রচিত, এজন্য কন্যা জলের উপরে থাকে। কিন্তু বরের ঘর ক্ষুদ্র বৃন্তে রচিত হওয়াতে উহা জল মধ্যে নিমগ্ন থাকে। ইহাদের পুরুষ রমণী পৃথক্ পৃথক্ পল্লীতে বাস করে। এস্থলে বিবাহের ঘটক স্বয়ং বরুণ দেব। যৌবনোন্মেষ হইবার প্রাক্কালেই বর স্বীয় গৃহ উৎপাটন করিয়া জলের উপরে গিয়া ভাসিতে থাকে। ওদিকে কন্যারা মুখ বাহির করিয়া বরুণ দেবের অনুকম্পার ভিখারী হইয়া বসিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত। স্রোতঃরূপে বরুণ-দেব কুমারীর দ্বারে দ্বারে বর লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান। বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, ইহাকে বরণ করিবে কি? অনেক সাংসারিক গৃহস্থ রমণী পসন্দ অপসন্দ বুঝে না। জাতি গোত্রের গোলযোগ না থাকিলে এবং স্বঘর পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট। বংশরক্ষা বিবাহের উদ্দেশ্য ত? তাহারা কুমুদ কমলের ন্যায় শোভা সৌন্দর্য্য বুঝে না, তাহাদের চালচলন মোটা, ঘর দ্বারও তত সৌখিন নহে। কিন্তু তা বলিয়া যে তাহারা স্বঘর না পাইলেও কুল বিক্রয় করিবে, এত হীন এখনও হয় নাই। তাহাদের বংশপরম্পরায় এই মর্য্যাদাটুকু অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এজন্য অনেক কন্যা বালিকা ভাবেই থাকে, স্বঘরের সম্বন্ধ আসিলে তাহারা যৌবনে বিকসিত হইয়া উঠে। যেমনই বিবাহ চুকিয়া যায়, অমনি কন্যা স্বীয় বৃন্ত আকুঞ্চিত করিয়া জল মধ্যে প্রবেশ করে। শুধু এই শৈবালের কেন, যাবতীয় ফুলকুমারীগণ গর্ভ সঞ্চার হইবা মাত্র

* Vallisneria.

বিবর্ণ হইয়া পড়ে। সৌন্দর্য্যের দিকে আর দৃষ্টি থাকে না, বসন দিয়া মুখ আবৃত করিয়া ফেলে। যে সুগন্ধ সৌন্দর্য্য ও মধুর লোভ দেখাইয়া—মধুকর কোন্ ছার—দেবতাদিগেরও মন হরণ করিতেছিল, তাহার সমস্তই বিনষ্ট করে।

ফুলরাজ্যে এক ঘরের ছেলে মেয়েদের বিবাহ নিবারণ জন্য বহুবিধ কৌশল অবলম্বিত হইতে দেখিলাম। কৌতুকাবহ দুই একটির কথা বলিতেছি। অর্ক (আকন্দ) ফুলের এক বৃন্তে পুত্র ও কন্যা জন্মে। সুতরাং ভাই ভগিনী একত্রে এক ঘরে বাস করে। ভগিনীটি মধ্যস্থলে ভাই গুলি তাহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাকে। দেখিলাম পবন দেবকেই ভয়। পাছে তিনি ভাই গুলিকে উড়াইয়া ভগিনীর গায়ে ফেলেন, এই আশঙ্কায় ভাই গুলি পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদিগকে উড়াইয়া লইয়া যাইবার পবনের সাধ্য নাই। সুতরাং অজ্ঞাতসারে ভ্রমক্রমে বিধি-বহির্ভূত কার্য্যে তাহাদিগকে লিপ্ত হইতে হয় না।

অর্কিড্ * (এক প্রকার পরজীবী) জাতীয় ফুলের বিবাহের অতি সুন্দর ব্যবস্থা দেখিলাম। ইহাদের বিবাহক্রম ফুলরাজ্যের একজন পাকা পথিক † সবিশেষ বলিয়া গিয়াছেন। অপরাজিতা পলাশ তিল প্রভৃতির গঠন দেখিয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য বিষয়ে কতকটা অনুমান করিয়াছিলাম। নিকটে গিয়া দেখিলাম, বস্তুতঃ তাই। পতঙ্গ উড়িতে উড়িতে আসে, অবতরণে তাহার কোন অসুবিধা না ঘটে, এজন্য কেমন পথ, কেমন অবতরণ স্থান! ঘাটে নামিয়া ঘরের ভিতরে যাইতে পাছে দিগ্‌ভ্রম ঘটে, এজন্য কেমন সুন্দর পথের ব্যবস্থা! আবার পথ দেখাইবার জন্য উহার দুই পার্শ্বে চিহ্ন দেওয়া থাকে।

* Orchids. † Darwin.

দেখিলাম, অনেক ঘরের ঘটক বংশ-পরম্পরা নিযুক্ত আছে। এই সকল ঘটকের চালচলন, আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি স্মরণ করিয়া ফুলকন্যারা স্ব স্ব গৃহ, অবতরণ ঘাট প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহারা এমন, যে-সে ঘটককে ঘরে আসিতে দেয় না। বংশের ঘটকের আগমনের লক্ষ্য করিয়া তদনুরূপ আয়োজন করিয়া রাখে। নররাজ্যেও অনেক বর বিবাহের সময় হস্তাশ্ব সমভিব্যাহারে লইয়া যান, তজ্জন্য পল্লীগ্রামের কন্যাকর্ত্তাকে বিলক্ষণ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।

বিদেশী রমণী দেশী পুরুষকে আকাঙ্ক্ষা করে না, কিম্বা বিদেশী পুরুষ দেশী রমণীর রূপ লাবণ্যে সহসা মুগ্ধ হয় না। অনেক বিদেশী এদেশে আসিবার সময় নিজের নিজের বংশের ঘটক সঙ্গে আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। কি আশ্চর্য্য, বিদেশী বরও আছে, কন্যাও আছে, কেবল কুলের ঘটক নাই বলিয়া ইহাদের অনেককে চিরকৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। প্রজাপতির নির্বন্ধ না থাকিলে বিবাহ হয় কি? স্বভাবগুণে ইহাদের যৌবনোন্মেষ হইয়াছিল, পতি সমাগম যদি ঘটে, এই আশায় ইহারা বেশ বিন্যাস করিতেও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু বংশের ঘটক নইলে কুলরক্ষা হয় কৈ? এ সকল স্থলে যৌবনবিকাশ নিষ্ফল। অবিবাহিত ও অপুত্রক হইয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া কন্যা ক্রমে মলিন ও শীর্ণ হইয়া পড়ে।

ঈশ্বরমূল * কচু † প্রভৃতি অনেক ফুলকুমারী আবার নিতান্ত কৃতঘ্ন। স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া স্ব স্ব অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য

* ইহাকে পাখীলতাও বলে। aristalochia.
† Arum ইহার কথা পরে দ্রষ্টব্য।

তাহারা ঘটককে বিলক্ষণ ক্লেশ দেয়। তাহারা ঘরে এমন কৌশল করিয়া কাঁটার বেড়া দেয় যে,ঘরে প্রবেশ করিতে পতঙ্গের কোন ক্লেশ হয় না। কিন্তু পাছে মধু খাইয়া বরকে না রাখিয়া পুনর্ব্বার সঙ্গে লইয়া পলায়, এই ভয়ে পতঙ্গ ঘরে ঢুকিলেই কাঁটার বেড়া বন্ধ করিয়া দেয়। তাহাতেও ভয় যায় না। সদর দরজা বন্ধ করিয়া পতঙ্গকে ঘরে আটক করিয়া রাখে। এই প্রকার ফুলকুমারী ভাইদের সঙ্গে এক ঘরে বাস করে। নিজের বর পাইলেই ত চলিবে না, ছোট ভাইদের বিবাহ দেওয়া বড় ভগ্নীর কর্ত্তব্য। বহির্গমনের পথ বন্ধ হওয়াতে ভগ্নীর বিবাহ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়; লোলুপ পতঙ্গও মধু নিঃশেষ না করিয়া যায় না, ওদিকে ভাইগুলি সুযোগ বুঝিয়া পতঙ্গের পিঠে চড়িয়া বসে। গর্ভসঞ্চার হইবামাত্র ফুল-কুমারীরা ম্লান ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। পতঙ্গও হাঁফ ছাড়িয়া ফাঁফর হইতে ভোঁ করিয়া চম্পট দেয়। প্রাণ ভয়ে পলায়ন সময়ে নিজের দেহের প্রতি দৃষ্টি করিবার অবসর কোথায়? ভাই গুলি বর সাজিয়া যে পিঠে চড়িয়াছে, তাহা ভাবিবার সময় কোথায়? কিন্তু লোভীর পক্ষে লোভ সম্বরণ সহজ নহে। অন্য ফুলকুমারীর চক্রান্তে পড়িয়া পতঙ্গের প্রাণ আবার 'যায় যায়' হয়।

পতঙ্গ যাহাদের ঘটক, তাহাদের অনেকে-রই "পরিবর্ত্ত ঘর"। তোমার কন্যার বর সে জুটাইয়া দিবে,তার সঙ্গে তোমার পুত্রদিগকে লইয়া বরের ভগ্নীর সহিত বিবাহ দেওয়াইবে। পতঙ্গের দুই ঘরেই লাভ। এমন নইলে কি বিবাহের ঘটকালি পোষায়?

পবনদেব যাহাদের ঘটক,তাহাদের মধ্যে কতকগুলি একটু নিকট সম্পর্কের ঘরেই বিবাহ কার্য্য সম্পাদান করে। ইহাদিগকে জ্ঞাতি বলিলে চলে,তবে নিকট কি দূর জ্ঞাতি,তাহা বলা কঠিন। বিবাহের ঘটকালির পুরষ্কার পবনকে দেওয়া হয় না। তিনিও সেইরূপ "না করিলে নয়" এমন মনে ঘটকালি করেন। তিনি অনেক বর সঙ্গে লইয়া উড়িতে উড়িতে বর ছড়াইয়া যান। এজন্য অনেক হতভাগ্য বরের অদৃষ্টে কখন স্ত্রীরত্ন লাভ ঘটে না। ফুলকুমারীর অনূঢ়াবস্থা ঘুচাইবার জন্যই বরের সংখ্যা এত অধিক। বঙ্গ নরলোকে কন্যার অপেক্ষা মনোমত বরের সংখ্যা কম হওয়াতেই দাম দিয়া বরকে কিনিতে হয়, তাই কন্যার বিবাহ দিতে অনেককে নিঃস্ব হইতে হয়।

পুষ্পরাজ্যে দেখিলাম,বরেরই ছড়াছড়ি, এ রাজ্যে বিধাতা, পুরুষ অপেক্ষা রমণীর সংখ্যা অল্প করিয়াছেন। বিধাতার আশঙ্কারও কারণ আছে। বিবাহের যেরূপ ব্যবস্থা,যেরূপ ঘটক, তাহাতে একজন আনিতে দশজন না আসিলে কার্য্যসিদ্ধ হওয়া কতকটা অসম্ভব। কত বরের বিবাহ দিবে বলিয়া তাহাদিগকে দেশ দেশান্তরে লইয়া পবনদেব ছাড়িয়া দেয়। পথে ঘাঠে মাটে তাহাদের অনেকেরই প্রাণ যায়। তবে যাহারা পবনকে ঘটক নিযুক্ত করিয়াছে, তাহাদের অনেকেই বুদ্ধিমান্। দারজিলিং,সিমলা প্রভৃতি দেশে যেমন পাহা-ড়ের গায়ে ঘরগুলি নির্ম্মিত,এজন্য কোন ঘর নীচে, কোন ঘর ঠিক তাহার উপরে থাকে, অথচ ঘরগুলি পরস্পর পৃথক্; ফুলরাজ্যেও (ধান্যাদি) অনেক ঘর তেমনই ভাবে রচিত। শৈলবিহারকালে দেবতারা নিম্নস্থিত গৃহের অপ্সরীর নিকট লম্ফ দিয়া পড়েন কিনা, পুরাণে লেখে না। কিন্তু ফুলরাজ্যে এরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। কি জানি, পবন যদি নাই আসেন, যথাসময়ে নিম্নে অবরোহণ করা

সহজ। স্বচ্ছন্দে বরগুলি (লালবিছুটি) কন্যার ঘরে লম্ফ দিয়া পড়ে।

ফুলরাজ্যে আর একটি আশ্চর্য্য-জনক ব্যাপার দৃষ্ট হইল। কোন কোন ঘরে ভাই-বোনগুলির বয়ঃক্রমের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক। ভাইবোন গুলি প্রায় সমকালেই যৌবনে পদার্পণ করে, ইহাই পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। এখানে তা নহে। দেখিলাম হয় ভাই বড়, বোন ছোট; কিম্বা বোন বড়, ভাই ছোট।* ইহাদের বিবাহের পদ্ধতিও বিচিত্র। মনে কর, ক ঘরে ভাইগুলি বয়সে বড়, বোনটি ছোট, এবং খ ঘরে ভগ্নীটি বড়,ভাইগুলি ছোট। ক ঘর অনেক আছে, তেমনই খ ঘরও অনেক আছে। কিন্তু কখন ক ঘরে ক ঘরে কিম্বা খ ঘরে খ ঘরে বিবাহ সম্পন্ন হয় না। ক ঘরের বর খ ঘরের কন্যা, আবার খ ঘরের বর ক ঘরের কন্যাকে বিবাহ করে। নর-রাজ্যেও পাত্র পাত্রীর বয়সের বিচার বিলক্ষণ আছে। তবে অল্প বয়সের মেয়ের সহিত বুড়া বয়সের বরের বিবাহ ঘটিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কচি বরকে বুড়ী মেয়ে বিবাহ করিতে দেখি নাই। শুনিয়াছি নাকি কোন কোন সভ্য নর-সমাজের এরূপ রীতি আছে।

ফুলরাজ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে তথায় নর-রাজ্যের আচার ব্যবহার বিবাহপদ্ধতি দেখিয়া একান্ত বিস্মিত হইলাম। এ রাজ্যে বিবাহে শোণিতবিচার বিলক্ষণ প্রচলিত। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ভাইবোনের বিবাহ দূরে থাকু, দূর দেশের বর না পাইলে অনেক কুমারীর মন উঠে না। অবশ্য স্বজাতি হওয়া আবশ্যক। নররাজ্যে এদেশের পুরুষ, ওদেশের রমণীকে কিম্বা এদেশের রমণী,ওদেশের পুরুষকে বিবাহ করে না। নরনারী মাত্রই এক জাতি,দেশ বিদেশের প্রভেদে জাতির প্রভেদ নাই। একথা নরসমাজে তত সমাদৃত হয়না।

যাহা হউক, ফুলরাজ্যে দুই এক স্থলে শোণিতবিচার নাই, একথাও বলিতে হইতেছে। একই ঘরে লালিত পালিত পুরুষগুলি সেই ঘরের রমণীকে বিবাহ করে। কোন কোন কন্যা (উলট চাঁড়াল *) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় বৃন্তস্থ পুরুষগুলির সহিত প্রেম আলাপনের জন্য মুখ বাড়াইয়া দেয়। যাহা হউক, ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বোধ হয় এইরূপ কদাচার বশতঃ অনেকে নির্ব্বংশ হইয়াছে। আর দিকে দেখিলাম যে, কতকগুলি ফুলের (আমরুল ও ভাওলেট † জাতীয়) ঘর সর্ব্বদা বন্ধ থাকে। ইহাদের কোন কোন ঘর কখনও খুলিতে দেখিলাম না। ইহাদের ঘরগুলি ক্ষুদ্র, সহজে চক্ষে পড়ে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, ইহাদের শোণিতবিচার ততটা নাই, তবে লোকলজ্জা আছে। এ জন্য দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে। ভাবিলাম,লজ্জায় মুখ লুকাইবার কথাটা ঠিক হউক না হউক, ঘটকের আবশ্যকতা নাই এবং ঘটক ভুলানো মধু কিম্বা রূপলাবণ্যের হাট বসাইবারও প্রয়োজন হয় না। একথাও বলা আবশ্যক যে, ইহাদের কোন কোন ফুলের শোণিতবিচারও আছে। বোধ হয়, ইহাতেই ইহারা এত দিন নির্ব্বংশ হয় নাই।

যাহা হউক, মোটের উপর দেখিলাম, ফুলরাজ্যে পতঙ্গ অপরিহার্য্য। কিন্তু তা বলিয়া যে যাবতীয় পতঙ্গ ঘটকালি কার্য্যে ব্রতী থাকে, তাহা নহে। অনেক ফুল কেবল এক গণের‡ পতঙ্গের মুখাপেক্ষী, অনেকে কোন কোন

* Primula.

* Gloriosa. † Viola.

‡ Order.

পতঙ্গ বংশের* কৃপার ভিখারী, কোন কোন ফুল কেবল একটি জাতির† পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। মধু, পরিমল ও দ্যোতমান বর্ণের প্রলোভনে অনেক পতঙ্গ আকৃষ্ট হইলেও, ফুলকুমারীর ঘরে সকলের প্রবেশ-অধিকার নাই। স্থূলদৃষ্টিতে মনে হয় যে, যতই পতঙ্গ ঘরে প্রবেশ করিবে, ফুলকন্যার বিবাহের পথ বুঝি ততই সুগম হইবে। কিন্তু যে সে পতঙ্গকে ঘরে ঢুকিতে দিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়না। ফুলকন্যার গৃহ রচনার প্রভেদে সকল পতঙ্গ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া দেখিলাম যে, কোন ফুলকন্যার ঘটক অল্প হইলেই তদ্দ্বারা অভিপ্রায় সিদ্ধ সহজে হয়। লোকে কথায় বলে, "অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট;" সন্ন্যাসীরা সকলে কার্য্যক্ষম ও শ্রমশীল হইলে তাহাদের এরূপ অপবাদ থাকিত না। যে মধুকর যত ফুল পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তদ্দ্বারাই বেশী কাজ হয়। এক ফুলে দশটা পতঙ্গ দশবার ঘুরিয়া বেড়াইলে যত কাজ হয়, সেই ফুলে একটা পতঙ্গ দশবার আসিলে অধিকতর ফল হয়। হাজার বাজে ঘটক দ্বারা কখনও কোন কন্যার বর মিলিয়াছে কি? অন্ততঃ দুইটি ফুল না বেড়াইলে পতঙ্গের ঘটকালি দ্বারা কোন লাভ নাই। সুতরাং যে পতঙ্গজাতি বিকসিত কুসুমের যৌবন কালের মধ্যে অন্ততঃ দুইটি কুসুমের ঘরে পদার্পণ না করে, তাহাদের গতায়াত নিষেধ করাই শ্রেয়ঃ। মন্দক্রিয়, নিশ্চেষ্ট বঙ্গনরের ন্যায় অসংখ্য কীট পতঙ্গ থাকিলেও ফুলরাজ্যের মধ্যে তাহাদের থাকা না থাকা, সমান কথা। যে মধুমক্ষিকার একটু বুদ্ধি আছে, সে সহজে এক ফুলে দুইবার যায় না। এক ফুলে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীকে বিরক্ত করা ভিক্ষার্থী মধুকরের কর্ত্তব্য নহে। আমি ভাবিতাম, আমাদের ন্যায় 'স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ' চাতুর্য্যকুশল বিশ্বমধ্যে আর কেহ নাই। পতঙ্গের উপযোগিতার সদ্ব্যবহার করিতে ফুল যেমন বুঝিয়াছে, তেমন বুদ্ধি নরলোকে প্রকাশিত হইতে সর্ব্বদা দেখা যায় না।

* Family. † Species.

যদি পতঙ্গের কথা পাড়িলাম, তবে একটু বিস্তারিত ভাবেই বলা যাক্। মধুই অনেক ষট্‌পদের আহার। ইহাদের দ্বারাই ফুলের সংসারে সমধিক কাজ হয়। কিন্তু যদি ফুলের তুলনায় পতঙ্গের সংখ্যা অধিক হয়, পতঙ্গগণের সকলই অনলস হইলেও ফুলের কোন ক্ষতি হয় না। বাস্তবিক যে সকল ফুলের পতঙ্গই একমাত্র ভরসা, তাঁহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ফুল পতঙ্গের কার্য্যে কোন ব্যাঘাত দেয় না, অন্যগুলি সময় বুঝিয়া পতঙ্গকে কিছু কাল ঘরে ঢুকিতে দেয় না। যেখানে অনেক ফুলের অল্প ঘটক, সে স্থলে ঘটকের আগমনে ব্যাঘাত দিয়া ফুলকন্যা কি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিবে? এই সকল ফুলকন্যাদের রূপের ছটা, সুন্দর বাস, মধুকোষ দেখাইয়া দিবার পথ অবতরণ ঘাট প্রভৃতির আয়োজনের একটি কারণ এই। জবা, স্থলপদ্ম প্রভৃতি অনেক ফুলের বর্ণ পরিবর্ত্তনের কারণও এই। বিবাহ হইলেই ইহারা বিবর্ণ হইয়া পড়ে, কেন না তাহাদের অন্যবরের প্রয়োজন কি? আবার পতঙ্গকেও ইঙ্গিত করে যে, তথায় তাহার আগমন অনাবশ্যক। পতঙ্গও বুঝিতে পারিয়া সেই জাতীয় অন্য বিকসিত ফুলে গমন করে। নিজের নিজের জাতির টান সকলেই টানে, জবা এমন ব্যবস্থা না করিলে স্বজাতীয় অন্য ফুলকন্যাদের বিবাহে যে বড় বিলম্ব হইত।

উপরে ঈশ্বরমূল জাতীয় ফুলের কৃতঘ্নতার

বিষয় বলিয়াছি। কচু মান প্রভৃতিও এইরূপ শঠতা করে। ইহাদের ফুলের তুলনায় পতঙ্গ-রূপ ঘটকের সংখ্যা সমধিক। যেখানে একটা কচু বিকসিত হয়, ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্রদেহ পতঙ্গ ফুলের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহা কচুর একটি ফুল বলিয়া সচরাচর লোকে বিদিত, বস্তুতঃ তাহার মধ্যে দণ্ডাকার দীর্ঘ পল্লীতে অনেক নরনারীর পৃথক্ পৃথক্ গৃহে বাস। কচ্বীরমণীগণ পল্লীর নিম্নদেশে, পুরুষগণ উপরিভাগে বাস করে। পুরুষগণের বাসগৃহের উপরিভাগে কণ্টক-বেষ্টন-স্বরূপ কেশজাল অপরিচিত পতঙ্গের আগমন প্রতিষেধ করে, এবং পল্লীর প্রাকার-স্বরূপ নারঙ্গবর্ণ একটা আবরণ থাকে। ইহাদের রমণীগণ যখন যৌবনে ফুটিয়া উঠে, পুরুষগণের তখন শৈশবাবস্থা। সুতরাং পতঙ্গের আগমন ব্যতীত রমণীগণের বিবাহ অসম্ভব। এজন্য বাহিরের কেশজাল প্রথমতঃ নিম্নাভিমুখে থাকে, তাহাতে পতঙ্গের সাহায্যে বর অনায়াসে রমণীদের পাড়ায় উপস্থিত হইতে পারে। বিবাহ সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত পতঙ্গকে কাঁটার বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। ইত্যবসরে পুরুষগণ যৌবন প্রাপ্ত হয়, কাঁটার বেড়াও ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকে, পতঙ্গও সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করে। পুরুষগণ এইরূপে পতঙ্গের পিঠে চড়িয়া অন্য কচ্বীরমণীর সন্ধানে বহির্গত হয়।

বেশী কথায় কাজ নাই। যে দুই চারিটি ব্যাপার দেখিলাম, তাহাতেই আমার চিত্ত চমৎকৃত হইয়া গেল। এইরূপে বেড়াইতে বেড়াইতে ফুলরাজ্যের দূরবর্ত্তী অন্য এক প্রদেশে আসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, এদেশের পথ ঘাট বড় দুর্গম; বনে জঙ্গলে, জল কাদায়, খাল বিলে এদেশের জনপদ রহিয়াছে।* বাড়ীগুলির অবস্থা নিতান্ত হীন বোধ হইল। কোথাও ফুল দেখিলাম না। ভাবিলাম, ভোগ করিবার লোক না থাকিলে কাহাদের জন্যই বা ঘর বাড়ী! এইরূপ বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে দণ্ডায়মান আছি, এমন সময় অদূরে চামেলিকে দেখিতে পাইলাম। আমি কিছু না বলিতে বলিতে চামেলি বলিতে লাগিল--"এই সকল গৃহস্বামীদের এখন হীনদশা হইয়াছে সত্য, কিন্তু বহুকাল পূর্ব্বে ইহাদেরই আধিপত্য ছিল। তখন ইহারাই রাজা ছিল, ইহাদের বড় বড় অট্টালিকায় দেশ শোভিত ছিল। ইহাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নগর ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। তোমাদের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ইহাদের অট্টালিকার অনুসন্ধান করিতেছেন। তোমরা ভূমি খনন করিয়া অনেক অট্টালিকা বাহির করিয়া লইতেছ। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমাদের জন্ম হওয়া দূরে থাক্, ধরাধামে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগেরও আবির্ভাব হয় নাই। কালের কুটিল গতিতে ইহারা এখন হীনজীব বলিয়া পরিগণিত এবং আমরা রাজা। যে কারণেই হউক, একবার রাজ্য হারাইলে আর কি মস্তক উত্তোলন করিতে পারা যায়? রাজ্যের সঙ্গে কত আধিপত্য আসে, রাজ্য গেলে সমস্তই হারাইতে হয়। এখন বল বীর্য্য হীন হইয়া ইহারা হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। তবে, ইহাদের বংশ বৃদ্ধি এত অধিক হয় যে, আমাদের জ্ঞাতি-গোত্র বন্ধু বান্ধব সমুদায়ের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা বেশী বই কম হইবে না। এজন্যই ইহারা এখনও টিকিয়া আছে, নতুবা আমাদের ন্যায় সভ্য সমাজের সংঘর্ষে কোন্ দিন সমূলে বিনষ্ট হইত।" চামেলীর এই কথা শুনিয়া নররাজ্যের কথা স্মরণ হইল। ভাবিলাম, সকল দেশেই কি একই নিয়ম? যেখানে

* Ferns, mosses &c.

কোন জাতীয় জীব ক্ষুদ্রাকৃতি বা সহায় সম্পদ হীন, সংগ্রামে তাহারাই পরাজিত হয়। তবে, প্রবল বংশবৃদ্ধি করিয়া সংসারে কয়েকদিন মাত্র আপনাপন বংশ লুপ্ত হইতে দেয় না।

যাহা হউক,এই সকল অদ্ভুত বৃক্ষের বিবাহ প্রণালী জানিতে ব্যগ্র হইলাম। আমার সঙ্গিনী বলিতে লাগিল যে "অধুনা উহাদের অসভ্য নাম হইয়াছে, আহার বিহার সভ্য সমাজের ন্যায় উন্নত নহে, কিন্তু ক্ষীণ ও হীন-জীবী হইয়াছে বলিয়া উহারা পূর্ব্ব গৌরব বা আচার ব্যবহার হারাইয়াছে,এমন নয়। উহাদের উদ্বাহপ্রণালী দুই একটা সামান্য বিষয়ে স্বতন্ত্র বোধ হইলেও প্রকৃততঃবিবাহক্রমসম্বন্ধে আমাদের সহিত উহাদের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। কেবল বাহ্যাড়ম্বর নাই মাত্র। পুরুষ ও রমণী গুপ্ত ভাবে বাস করে, তাহাতেই দেখিতে পাইতেছ না, উহাদের মধ্যে স্বয়ংবর প্রথা বিশেষ প্রচলিত। অনেক বর পায়ে হাঁটিয়া কন্যার নিকট উপস্থিত হয়।"

কিয়ৎক্ষণ অনন্যমনে ইহাদের আচার ব্যবহার দেখিতে লাগিলাম। পুষ্পরাজ্যের প্রান্ত সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিলাম। প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা হইল। এমন সময় চামেলি বলিতে লগিল,—"আমাদের রাজ্য বেড়াইয়া আসিলে। আচার ব্যবহার বিবাহ-ক্রম কতকটা দেখিয়াছ। এখন বল দেখি, তোমাদের জন্য বিধাতা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন,না আমাদের জন্য তোমরা কোথা হইতে অল্পদিন আসিয়া কতদিকে আমাদের কতবিঘ্ন ঘটাইতেছ। আমরা ইচ্ছামত গ্রাম নগর স্থাপন করিতে পারি না,ইচ্ছামত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি না। তোমরা যখন প্রথমে পৃথিবীতে আসিয়াছিলে, তখন আমাদের কৃপার ভিখারী হইয়া তোমাদিগকে থাকিতে হইত। এখন আমাদের উপর আধিপত্য করিতে ত্রুটি করিতেছ না। আমাদিগকে খেলার সামগ্রী করিয়াছ, কৌশলজাল বিস্তার করিয়া আমাদের অনেকের বিকৃত অবস্থা ঘটাইয়াছ। এখন তাহাদিগকে বিবাহ ছাড়িয়া দেহবিস্তার পূর্ব্বক বংশরক্ষা করিতে হইতেছে। বিশেষতঃ আমাকে ও আমার জ্ঞাতি বেলি যূই মল্লিকা কুন্দ প্রভৃতিকে সমাদর করিতে গিয়া আমাদের বিবাহের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছ। দেখ দেখি তোমাদের জন্যই আমাদের আশা মিটিল না,তোমাদের জন্যই আমাদিগকে অবিবাহিতা অবস্থায় জীবন কাটাইতে হইল। আমাদের চেয়ে তোমাদের কুলীনকুমারী বেশী দুঃখী? তোমাদের দৌরাত্ম্য কিছুকাল এইরূপ চলিলে আমরা অচিরে নির্ব্বংশ হইব"।

এই বলিয়া চামেলি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। আমার মনে কথাগুলি অঙ্কিত হইয়া গেল। ভাবিলাম,কথাগুলি সমস্তই ঠিক, ইহাদিগকে লইয়া কবিগণ টানাটানি না করিলে কি তাঁহাদের কবিতা লেখা হয় না? আমি কবি হইলে চামেলির অশ্রুকণা, বেলির বিরহ যূইএর দীর্ঘশ্বাস বিষয়ে কবিতা লিখিতাম। যাহা হউক,প্রকাশ্যে বলিলাম"যেমন তোমাদের কাহার কাহার বিবাহ অসম্ভব হইয়াছে,তেমনই আমাদের যত্নে তোমাদের রূপ গুণ কতই বাড়িয়াছে। গোলাপের পূর্ব্বদশা স্মরণ কর, তাহার এত সৌন্দর্য্য, এত রূপলাবণ্য ছিল কি? বেলির পরিচ্ছদ ও সৌরভের তুলনায় তোমাকেও সময়ে সময়ে লজ্জিত হইতে হয় না কি? মানুষ তোমাদিগকে কত আদর করে। ধর্ম্মানুষ্ঠানে তোমাদিগকে ডাকে, নতুবা দেবতারা পূজা গ্রহণ করেন না। এক

পারিজাত কুসুমের জন্য তুমুল সংগ্রাম হইয়া গেল। প্রণয়িগণ তোমাদিগকে শিরোভূষণ করিয়াছেন। কবিগণ উপমার জন্য তোমাদের দ্বারে দ্বারে ভিখারীর বেশে বেড়াইয়া বেড়ান। কোথায় তিলফুল, কোথায় কদম্ব-চম্পক, কোথায় মাধবী শিরিষ বান্ধুলী, এই অনুসন্ধানেই তাঁহারা ব্যাকুল,—এই কথা শেষ হইতে না হইতেই বোধ হইল সাগরের শৈত্য সংস্পর্শে দেহ অতিশয় শীতল হইয়াছে। চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, পশ্চিমদিকে রবি ঢলিয়া পড়িয়াছেন। ভাবিলাম দিনের বেলা এমন স্বপ্ন! *

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

পত্রাবলী।

প্রথম পত্র।

শ্রীচৈতন্যের প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়া

চৈতন্যদেব, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া, জননী শচীদেবী ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ পুর্ব্বক, নীলাচল ধামে শেষজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নীলাচল গমনের কয়েক বৎসর পরে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন।

ফাল্গুন পূর্ণিমা নিশা আজি নবদ্বীপে,
কোথা নবদ্বীপ-চন্দ্র! উৎসব-হিল্লোলে
নাচে নবদ্বীপ পুরী; মল্লিকা-সুবাস
হরি সমীরণ এই বহে ধীরে ধীরে;
ছড়ায়ে কিরণ-ধারা নীল নভো মাঝে
শোভিছেন নিশানাথ; জল, স্থল, নভ,
বিমল কিরণে দীপ্ত; পাপিয়ার গান
দূর গ্রামান্তর হ'তে পশিছে শ্রবণে;
মঞ্জরিত চূতশাখে বসিয়া পুলকে
গায় পিকবর ওই; পুরবাসী যত
উচ্চে হরিধ্বনি করি, চলে রাজপথে;
কি উল্লাস আজি হেথা! আপনি জাহ্নবী,
সে আনন্দ-স্রোত যেন ধরি নিজ বুকে,
তুলিয়া তরঙ্গ-বাহু, মধুর কল্লোলে,

* সকল সময় স্বপ্ন বুঝিতে পারা যায় না। এজন্য স্বপ্নদর্শীর অনুমতি লইয়া কয়েকটি কথা যোজিত হইল। কিপ্রাণী কিউদ্ভিদ,সকল জীবকেই জননেন্দ্রিয় অনুসারে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কোন কোন জাতীয় শম্বুক, জলোকা,কেঁচোর প্রত্যেকে এবং ধূতুরা বেগুন অপরাজিতা প্রভৃতিরপ্রত্যেকফুলে পুংওস্ত্রী উভয় বিধ জননেন্দ্রিয়ই থাকে। বিজ্ঞানে ইহাদের নামদ্বিলিঙ্গ (bisexual),জীবরাজ্যে ইহারা হরগৌরী(hermaphrodite) মনুষ্য পশু পক্ষী এবং লাউ তাল পেঁপে প্রভৃতির পুষ্পে হয় পুং কিম্বা স্ত্রীজননেন্দ্রিয় থাকে। ইহারা একলিঙ্গ (unisexual)যেমন পশুদিগের মধ্যে কোনটি নর কোনটি বা নারী, তেমন লাউ পেঁপে প্রভৃতির কোন পুষ্প পুরুষ কোনটি বা রমণী। প্রভেদের মধ্যে লাউর একই গাছের কোন ফুল পুরুষ, কোন ফুল বা রমণী; এবং পেঁপের কোন গাছে কেবল পুরুষ, কোন গাছে বা কেবল স্ত্রী থাকে। দ্বিলিঙ্গ পুষ্প সকলের মধ্যে যেমন নিজে নিজে নিষেক ক্রিয়া প্রায় হয় না, তেমনই দ্বিলিঙ্গ প্রাণিদিগের স্বনিষেক ঘটে না। শম্বুক ও শুক্তি দ্বিলিঙ্গ হইলেও তাহাদের পুং ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয় এককালে পক্ক হয় না। তবে অন্ত্রকৃমির (tape-worm) ন্যায় কোন কোন দ্বিলিঙ্গ প্রাণীর কখন কখন স্বনিষেক (self-impregnation) ঘটে; বস্তুতঃ প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়ই নিষেকক্রিয়া সম্বন্ধে এক।

ধাইছেন সিন্ধুপানে। শুভদিনে আজ
মত্ত নবদ্বীপবাসী ; বিষ্ণুপ্রিয়া তব
আঁধার কুটীরে শুধু কাঁদিছে নীরবে।
তব জন্মদিন আজি ! ওই চারিদিকে
বাজে শঙ্খ, বাজে ঘণ্টা, জ্বলে দীপাবলী,
হরিসঙ্কীর্ত্তনগানে ভক্ত বৃন্দ যত
পূরিছেন নবদ্বীপ, কিন্তু দেখ নাথ,
কি দশায় আছে আজ পরিজন তব।
লুটায়ে ধরণীতলে উন্মাদিনী সম
কাঁদেন জননী ওই ; শূন্য গৃহ মাঝে
কাঁদি অভাগিনী আমি। শুনি লোকমুখে,
জননীর অশ্রু তুমি হেরিলে শৈশবে
পড়িতে মূর্চ্ছিত হয়ে ; স্রোতো রূপে আজ
বহে সেই অশ্রুধারা, না জানি কেমনে
ভুলিয়া রয়েছ তবে ! শুন প্রাণেশ্বর,
"কোথা গেলি বাপ," বলি নাম ধরি তব
ডাকেন জননী ওই, এস একবার,
জুড়াও মায়ের প্রাণ ; তোমা পুত্রে ছাড়ি
কি দশা মায়ের আজি দেখ ভাবি মনে।
কি লিখিব প্রাণেশ্বর। শত মর্ম্মদাহে
প্রাণ যার জর্জ্জরিত, পারে কি সে কভু
জানাতে মরম ব্যথা ? কি দশায় আজ,
আছে বিষ্ণুপ্রিয়া তব জানেন বিধাতা,
ভগ্ন বক্ষস্থল তার। চাহি চারি দিকে
হেরি শূন্যময় সব ; সেই, গৃহ, দ্বার,
সেই শয্যা, যে শয্যায় শেষ দিনে নাথ,
বসায়ে দাসীরে নিজে, ও কর কমলে
সাজাইলে প্রেমাদরে ; সকলই তেমন
এখনও রয়েছে প্রভু, কিন্তু তোমা বিনা
শ্মশান এ পুরী আজি। নিত্য দিবাশেষে
যাই জননীর সনে, জাহ্নবীর কূলে
বারি আনিবার তরে ; হেরি অনিমেষে
উড়ায়ে কেতন কত আসিতেছে তরী,
মধুর সঙ্গীত ধ্বনি উঠে তার (ও) মাঝে,
বারিকুম্ভ লয়ে কক্ষে, এক দৃষ্টে আমি
থাকি আশা পথ চেয়ে, জ্ঞান হয় মম
স্মরি অভাগীর দুঃখ, সে তরণী পরে
ফিরিছ স্বদেশে তুমি ; যতক্ষণ তরী
রহে দূরে, আশা লয়ে থাকি চাহি আমি,
চলি গেলে, ভাবি মনে, ভেঙে গেল বুক,
দর দর ঝরে অশ্রু ; সন্ধ্যার তিমির
আসে ঘনাইয়া ক্রমে ; ডাকেন জননী
"বউ মা, গেল যে বেলা, কেন মা দাঁড়ায়ে
চল ফিরে যাই ঘরে।" ইচ্ছা হয় মম
থাকি দাঁড়াইয়া সেথা, কিন্তু নাহি পারি,
ফিরি শূন্য গৃহে, অশ্রু মুছিতে মুছিতে॥
যাই যবে স্নান আশে জাহ্নবীর কূলে
কত কথা উঠে প্রাণে ; মনে পড়ে নাথ,
বালিকা বয়স যবে মিলি সখী দলে
খেলিতাম কত সেথা। শিবলিঙ্গ গড়ি,
যতনে তুলিয়া ফুল, আনি বিল্বদলে
পূজিতাম ভক্তি ভরে ; নিরখি নয়নে
প্রবীণা রমণী সবে মগ্ন মহা ধ্যানে
আমিও তাঁদের মত বসিতাম কভু
আঁখি মুদি, কি যে ধ্যান, কে জানিত তবে !
কাঁপিত পরাণ কভু শুনিয়া শ্রবণে।
পদশব্দ, চমকিয়া হেরিতাম পাশে
ভুবন মোহন রূপে দাঁড়ায়ে নিকটে
হাসিছ মধুরে তুমি ; কহিতে আমারে
"কারে পূজ বিষ্ণুপ্রিয়ে, বর চাহ যদি
এই ত সম্মুখে আমি, দেহ মাল্য মোরে
চন্দ্রাননে," লাজে, ভয়ে, পলাতাম ছুটি
হাসিত সঙ্গিনী যত, কহিতাম মনে
"হে শঙ্কর ইনি যেন পতি হন মম।"
কিন্তু সে অতীত কথা, কি কাজ স্মরণে
কি কাজ জাহ্নবী বারি নিক্ষেপিয়া আর
শুষ্ক তুলসীর মূলে ? ভুলেছ যখন
অভাগীরে, ভূত কথা কি কাজ স্মরণে ?
কোথা নীলাচল নাথ, কোথা নবদ্বীপে

কাঁদে বিষ্ণুপ্রিয়া তব ; এ পাপ নয়নে
জনমে সে পুরী প্রভু, হেরি নাই কভু,
চির গৃহরুদ্ধ দাসী ; তবু প্রাণেশ্বর,
মানস নয়নে যেন হেরি দিবানিশি
সে পবিত্র ধামে তোমা ; দেখি জগন্নাথে
বিরাজিত শ্রীমন্দিরে ; মুগ্ধ আঁখি হেরি
ভুবন মোহন রূপ ; মন্দির সম্মুখে
হেরি যেন ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লয়ে তুমি
নাচিছ আনন্দ ভরে ; ঊর্দ্ধে বাহু ছুটী,
প্রেমে রোমাঞ্চিত তনু, শত চন্দ্র জিনি
শোভে বদনের কান্তি, ঝরে দুনয়নে
ধারা রূপে প্রেম অশ্রু ; রুণু রুণু বোলে
চরণে নূপুর বাজে ; অনিমেষ হয়ে
চাহি মুখ পানে আমি, ইচ্ছা হয় মম
তেয়াগিয়া লাজ ভয়, যেথা রাখ তুমি
ওই শ্রীচরণ ছুটী, পাতি দেই সেথা
এ মম হৃদয়, নাথ, কঠিন পাষাণে
ব্যথা পাছে পাও পদে ; কিন্তু কি বলিব
সরমে না পারি যেন। কভু হেরি তোমা
দাঁড়াইয়া সিন্ধু কূলে, পূর্ব্বাকাশ ভালে
উজলিয়া নীরনিধি উঠিছেন যেথা
পূর্ণবিম্ব সুধাকর, এক দৃষ্টে চাহি
সেই দিকপানে তুমি। বিহ্বলের মত
কভুবা সুধাংশুবিম্ব হেরি সিন্ধু জলে
নাচিতে তরঙ্গ সঙ্গে, বাহু প্রসারিয়া
"হা কৃষ্ণ এলে কি তুমি ?" বলি উচ্চৈঃস্বরে
ধাইছ ধরিতে তায় ; আবার কখন
হেরি যেন সিন্ধু নীরে লম্ফ দিয়া তুমি
পড়িছ উন্মাদ প্রায়, চীৎকারি অমনি
কাঁদি অভাগিনী আমি, না পারি রাখিতে
সরমের বাঁধ আর ; জিজ্ঞাসেন মাতা
"বউমা, বউমা, কেন সহসা এমন
উঠিলে চীৎকার করি ?" পারি না বলিতে
কি যে মরমের ব্যথা, কাঁদি শুধু খেদে ॥
জানি আমি প্রাণেশ্বর, নহ তুমি শুধু
অভাগীর একমাত্র, নরনারী যত
আছে,সকলেরই তুমি। শুনি সাধু মুখে
প্রেম-মন্দাকিনী রূপে অবতীর্ণ তুমি
এ শুষ্ক মরত-ভূমে ; ক্ষুদ্র নারী আমি
কি সাধ্য আমার, তুচ্ছ সংসার বন্ধনে
বাঁধিব তোমারে আমি ? যে প্রেম-জলধি
অতিক্রমি জ্ঞান-বেলা চাহে প্লাবিবারে
বিশাল অবনী-তল, কে সে নারী আমি
ক্ষুদ্র এ হৃদয়-ঘটে রোধিব যে তারে ?
কিন্তু জেনে শুনে তবু না মানে প্রবোধ
দুর্ব্বল নারীর প্রাণ ; কঠিন পুরুষ,
নারীপ্রাণে কি যাতনা পারে না বুঝিতে,
কঠোর হৃদয় তার ; কিন্তু নরদেহে
নারীর হৃদয় তব , ভেবে দেখ তুমি,
তব প্রাণারাম যদি লুকাতেন কভু
অন্তর হইতে তব, উন্মাদের মত
"কৃষ্ণরে, বাপ্‌রে, মোর পরাণের ধন,"
বলিয়া উঠিতে কাঁদি। চির দাসী তব,
দ্বাদশ বৎসর আজ হেরেনি নয়নে
ওই পাদপদ্ম তব ; শোনেনি শ্রবণে
(ইষ্ট দেব তুমি তার) তব মধু-বাণী—
কি দশা তাহার তবে ; তুমি না বুঝিলে
কে বুঝিবে, কিবা জ্বালা চির অভাগীর !
না চাহে অধিনী তব বাঁধিতে তোমারে
আবার সংসার বাঁধে ; কে হেন নিষ্ঠুর,
পতি দরশনে সতী ছুটি যান যবে,
চাহে ফিরাইতে তাঁয় ? যে মহা পরাণ
ছুটেছে অনন্ত পানে, কি কায ফিরায়ে
আবার সংসারে তারে ? চাহে না সে সব
চাহে না অধিনী তব ; কি ভাগ্য তাহার,
আবার তোমারে লয়ে পশিবে সংসারে,
অলীক সে স্বপ্ন নাথ ! একবার শুধু
এস ফিরি বঙ্গদেশে ; কাঁদেন জননী
দেখা তাঁরে দিও নাথ ; একবার শুধু

ভুবন মোহন রূপে দাঁড়া'য়ো অঙ্গনে
দাঁড়াতে যেমন তুমি; অন্তরাল হ'তে
দেখিব নয়ন ভরি; অন্তরে বাহিরে
ও সুন্দর মূর্ত্তি হেরি জুড়াইব আঁখি।
জানি কৃপাময় তুমি, যে ডাকে তোমারে
পূরাও বাসনা তার, ডাকে বিষ্ণুপ্রিয়া
ভুলোনা তাহারে তবে; নিবেদন ইতি॥ ১৫৯

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু—বৈদ্যনাথ দেওঘর।

ভগবদ্গীতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জন্মিলে নিশ্চয় মৃত্যু, মরিলে জনম;
অতএব কভু নাহি পরিহার যার—
তার তরে শোক তব নহে ত উচিত? ২৭
আদিতে অব্যক্ত ভূত, ব্যক্ত মধ্যকালে,
নিধনে অব্যক্ত পুনঃ হয় ভূতগণ;
তবে কেন, হে ভারত, এ শোক-বিলাপ? ২৮
কেহ ইহা করে দরশন,
যেন কত অদ্ভুত ব্যাপার?—

(২৭) জন্মিলে নিশ্চয় মৃত্যু—রামানুজ বলেন, উৎপত্তি বিনাশ উভয়ই সদ্বস্তুর অবস্থা বিশেষ মাত্র। নষ্ট হইয়া উৎপত্তি, সতের উৎপত্তির ন্যায় বোধ হয়—অসতের উৎপত্তি সেরূপে উপলব্ধি হয় না। দ্রব্যের পূর্ব্বাবস্থা হইতে উত্তরাবস্থা প্রাপ্তিই বিনাশ; যথা—সাংখ্যে আছে—নাশঃ কারণ লয়ঃ। স্বামী বলেন, আত্মা যদি মরে তবে কেহ পাপ পুণ্যের ভাগী নহে। বলদেব বলেন, অপূর্ব্ব শরীরে ইন্দ্রিয়-যোগই জন্ম, ও পূর্ব্ব শরীরে ইন্দ্রিয় বিয়োগই মৃত্যু। এইজন্য, জন্মিলে—অর্থে স্বকর্ম্ম বশে শরীর পাইলে। মধুসূদন বলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বশে লব্ধ শরীরে কর্ম্মক্ষয় হইলে শরীর ধ্বংস হয়, এবং পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ পুণ্যাদির ভোগের পর (স্বর্গে বা নরকে থাকিয়া এই ভোগ হয়) কর্ম্মফল জন্য সেই পাপ পুণ্যাদি ক্ষয়ের পরে পুনর্ব্বার জন্ম হয়। (কিন্তু এ ব্যাখ্যা এস্থলে তত সঙ্গত বোধ হয় না। জন্ম, মৃত্যু এখানে ব্যবহারিক অর্থে লওয়া যাইতে পারে।)

শোক করা নহেক উচিত—রামানুজ বলেন, পরিণাম স্বভাব দেহের উৎপত্তি বিনাশ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া শোক করা অনুচিত।

(২৮) ভূত—জীব। পুত্র মিত্রাদি কার্য্যকারণ সংঘাতাত্মক প্রাণী (শঙ্কর)। দেহ বা পৃথিব্যাদি ভূতময় শরীর (স্বামী ও মধু) গীতায় প্রায় সর্ব্বত্র 'ভূত' জীব বা প্রাণী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলেও সেই অর্থ বোধ হয়। শঙ্করাচার্য্যও সেই অর্থ করেন।

অব্যক্ত—অর্থাৎ অদর্শন বা অনুপলব্ধি (শঙ্কর)। জন্মের পূর্ব্বে ও পরে স্থূল শরীর থাকে না—এবং সূক্ষ্ম শরীরের উপলব্ধি হয় না; অথবা অবিদ্যা উপহিত চৈতন্য, সৃষ্টির প্রথমে (আদিতে) অব্যক্ত থাকে, লয়ের পরেও অব্যক্ত হয় (মধু)। স্বামী প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ বলেন—অব্যক্ত, এখানে সাংখ্য কথিত সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর মূল প্রকৃতি বা প্রধান। এবং এ শ্লোকের অর্থ এই যে, আদিতে বা সৃষ্টিকালে প্রধান 'অব্যক্ত', মধ্য বা সৃষ্টিকালে 'ব্যক্ত' বা ভূতময় শরীরাদিরূপে প্রকাশিত, ও শেষে বা লয়ে পুনর্ব্বার "অব্যক্ত" হইয়া প্রধানে মিশিয়া যায়। (বলদেব)

গীতার সর্ব্বত্র অব্যক্ত অর্থে অব্যক্ত বা কূটস্থ ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কচিৎ অব্যক্ত অর্থে ব্রহ্মের জীব ও জড় প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে। (৭।৫ ও ৮।৮ ইত্যাদি শ্লোক দেখ।) এস্থলে শঙ্করাচার্য্যের অর্থ অধিকতর সঙ্গত।

মধ্যকাল—জন্ম মরণান্তরাল কাল (স্বামী)

(২৯) গীতার ৭।৩ শ্লোক দেখ।

কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর ৭ শ্লোকও এইরূপ—

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবোযং ন বিদ্যুঃ।

অপূর্ব্ব ইহার কথা কভু
কহে কেহ—শুনে অন্যজন
হয়ে বড় বিস্ময়ে মগন;—
কিম্বা কভু শুনি হেন রূপে,
কেহ নারে জানিতে ইহায়। ২৯
দেহী ইহা, সর্ব্বদেহে করে অবস্থান;
নিত্য ইহা, নহে বধ্য; তবে হে ভারত!
সর্ব্বভূত তরে তব শোক অনুচিত। ৩০
তার পরে ভাবি দেখি' স্বধর্ম্ম আপন,
নাহি হ'য়ো বিচলিত; ধর্ম্ম-যুদ্ধ বিনা,
ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়তর নাহি কিছু আর। ৩১

আশ্চর্য্যাস্তো-বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধ
আশ্চর্য্য জ্ঞাতাং কুশলানুশিষ্ট ॥"

অদ্ভুত ব্যাপার—অদৃষ্টপূর্ব্ব আত্মার কথা জানিতে গিয়া লোকে আশ্চর্য্য হয় (শঙ্কর) অথবা শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ পাইয়া আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইলেও লোকে বিস্মিত হইয়া ইহার বিষয় আলোচনা করে—ইহার স্বরূপ সহজে ধারণা করিতে বা ইহার নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। অর্থাৎ "শরীরাতিরিক্ত আশ্চয্য স্বরূপ আত্মার দ্রষ্টা, বক্তা, শ্রোতা কাঁহারও আত্ম-নিশ্চয় করা সহজ হয় না।" অবিদ্যা হেতু আত্মাকে বিরুদ্ধধর্ম্মী অর্থাৎ মুক্ত বদ্ধ, জড় চৈতন্য ইত্যাদি দেখিয়া। (মধু)

কেহ নারে জানিতে—অর্থাৎ উপযুক্ত লোকের মধ্যে কত সহস্রের ভিতর কদাচিৎ দুই এক জন মাত্র আত্মাকে উল্লিখিত স্বরূপে জানিতে পারে (শঙ্কর)। আত্মা বাক্য মনের অগোচর বলিয়া ইহাকে সহজে কেহ দেখিতে, বলিতে বা শুনিতে পারে না। শ্রবণ মননাদি দ্বারা সাধনা বলে ইহার সাক্ষাৎ হইলে আশ্চয্য হইতে হয় (মধু)।

(৩০) সর্ব্ব ভূত তরে—ভীষ্মাদি সকলের জন্য (স্বামী) স্থুল সূক্ষ্ম যাহারা ভীষ্মাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের জন্য (মধুসূদন)। শেষ অর্থ দূরার্থ।

(৩১) ধর্ম্মযুদ্ধ—ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক, বা বর্ণোচিত বা আত্মস্বভাবানুযায়ী যে যুদ্ধ, যাহাতে পৃথিবী জয়ের দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ ও প্রজা রক্ষণ রূপ সৎকর্ম্ম সম্পাদিত হয় (স্বামী)। রাজ্য রক্ষার্থ, আপনা হইতে উপস্থিত এবং ধর্ম্মের জন্য যে যুদ্ধ কর্ত্তব্য—কেবল তাহাই ধর্ম্মযুদ্ধ। ও এই তত্ত্বই গীতায় পরে বুঝান হইবে। এখনও সে কথা আসে নাই। শাস্ত্রে আছে—

আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুদ্ধ মানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গংযান্ত্যপরাঙ্মুখং ॥
পরাশর স্মৃতিতে আছে—
"ক্ষত্রিয়োঽহি প্রজা রক্ষণ্ শস্ত্রপাণিঃ প্রদণ্ডয়ন্।
নির্জ্জিতং পরসৈন্যাদি ক্ষিতিং ধর্ম্মেন পালয়েৎ ॥
মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে,—
"সমোত্তমাধমৈ রাজা চাহুতঃ পালয়ন্ প্রজা।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্র ধর্ম্ম মনুস্মরন্ ॥"
গীতার ১৮।৪৩ শ্লোক দেখ।

স্বধর্ম্ম—জীব মাত্রেই প্রকৃতির সহিত নিত্য সম্বন্ধ যুক্ত। প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণাত্মক হওয়ায়, এবং জীবভেদে এই গুণের ইতর বিশেষ হওয়ায় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বর্ণবিভাগ স্বাভাবিক বা ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট। (গীতার ৪।১৩ শ্লোক দেখ) অর্থাৎ সত্ত্ব প্রকৃতির লোক ব্রাহ্মণধর্ম্মী; সত্ত্ব রজঃ, প্রকৃতির লোক ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী; রজ-তমঃ প্রকৃতির লোক বৈশ্যধর্ম্মী এবং তমঃ প্রকৃতির লোক শূদ্রধর্ম্মী। প্রকৃতি প্রভাবেই কর্ম্মের উৎপত্তি। সুতরাং বর্ণবিভাগ অনুসারে কর্ম্ম বিভাগ হইয়াছে। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়ের এই স্বাভাবিক কর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও ঈশ্বর ভাব। এ সব কথা গীতার ১৮ অধ্যায়ে ৪১ হইতে ৪৪ শ্লোকে বুঝান আছে।

অতএব যাহার যাহা ধর্ম্ম তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। বঙ্কিম বাবু বুঝাইয়াছেন, আমাদের সকল বৃত্তির অনুশীলনই ধর্ম্ম। অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তির সম্যক অনুশীলনই আমাদের ধর্ম্ম। জ্ঞানবৃত্তি অনুশীলন জন্য বাহ্যিক কর্ম্মের প্রয়োজন নাই তাঁহারা কর্ম্ম-সন্যাস করিতে পারেন। কিন্তু গীতায় দেখান হইয়াছে, জ্ঞান ও কর্ম্মবৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া অনুশীলনই ধর্ম্ম। প্রথম, কর্ম্ম—আত্মোন্নতির জন্য, জ্ঞান-মার্গে যাইবার জন্য। দ্বিতীয়—জ্ঞানপথ পাইলে নিজের জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন না হইলেও, সমাজের জন্য, লোককে দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। জ্ঞান পথে না যাইলেও নিজের (শরীরাদি রক্ষার) জন্য ও সমাজের জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। প্রথম সমাজরক্ষার

যে যুদ্ধ আপনা হতে হয় উপস্থিত
মুক্ত-স্বর্গ-দ্বার-প্রায়,—লভে যে ক্ষত্রিয়
এ হেন সমর পার্থ, সুখী সেই জন। ৩২

জন্য যুদ্ধাদি করিতে হয় (ইহা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম)। পরে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও তদানুষঙ্গিক গোরক্ষণাদি করিতে হয় (ইহা বৈশ্যের কর্ম্ম) আর এই সব কর্ম্মে নিযুক্ত লোক যাহাতে আপনার পরিচর্য্যা আপনি না করিয়া তাহাদের উচ্চতর শক্তি অপ্রতিহত রূপে নিজ কার্য্য সাধনে নিযুক্ত হইতে পারে তাহার জন্য নিম্ন শক্তি সম্পন্ন লোকের কর্ত্তব্য সেই সব লোকের পরিচর্য্যা করিতে হয়। ইহা শূদ্রের কর্ম্ম। যাহার যেরূপ প্রকৃতি ও শক্তি সে সেইরূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য বোধে অনুসরণ করিবে। কারণ সেই কর্ম্মই তাহার সহজ ও অনায়াস সাধ্য। ইহার মধ্যে যে যে কার্য্য করিতে নিযুক্ত, সেই তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বা Duty। আমাদের শাস্ত্রে এইরূপ প্রকৃতি অনুসারে বর্ণ বিভাগ ও প্রত্যেক বর্ণের স্বধর্ম্ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এবং জীব মাতাপিতৃজ শরীর হইতে তাহাদের অনুরূপ প্রকৃতি পায় বলিয়া সাধারণতঃ এই বর্ণ বিভাগ পুত্র পরম্পরাগত বা hereditary হইয়াছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে আছে, পরধর্ম্ম অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। টীকাকার বলদেব কতকগুলি স্বধর্ম্ম ত্যাগের দৃষ্টান্ত দিয়া এই কথা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, পরশুরাম বিশ্বামিত্র প্রভৃতি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে এরূপ আরও দৃষ্টান্ত কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে এই সাধারণ বিধির কোন ব্যভিচার হয় না। তাঁহারা যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কুলোচিৎ কর্ম্ম প্রবৃত্তি নিজ মহিমাবলে দমন করিয়াছিলেন, এবং এই প্রবৃত্তি দমন করিয়া কর্ত্তব্য বোধে অন্য রূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে বুঝান আছে যে এরূপ করিতে তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। দ্রোণাদির ক্ষাত্র ধর্ম্ম গ্রহণের কারণও সেইরূপ। তাহা উহাদের কষ্ট সাধ্য ও ছিল। ক্ষত্রিয় দেবারাতি প্রভৃতি আশ্রম ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বাসনা ক্ষীণ হইলে তবে পরিব্রাজকের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

(৩২) আপনা হতে—স্ব প্রযত্ন ব্যতিরেকে (মধু)

হেন ধর্ম্মযুদ্ধে যদি হও পরাঙ্মুখ,—
তা হলে স্বধর্ম্ম আর সুকীর্ত্তি তোমার
হবে লোপ, পাপরাশি স্পর্শিবে তোমায়। ৩৩
অক্ষয় অকীর্ত্তি তব ঘুষিবে সংসার—
মানীর অকীর্ত্তি হয় মরণ অধিক। ৩৪
মহারথীগণ ইহা ভাবিবে নিশ্চয়—
ভয় হেতু রণ হ'তে হইলে বিরত ;
সম্মান করিত যারা ঘৃণিবে তোমায়। ৩৫
নিন্দিবে যোগ্যতা তব যত শত্রুগণ,
অবক্তব্য কটু কথা কহিবে কতই—
ইহা হতে দুঃখ-কর কিবা আছে আর ? ৩৬
পাবে স্বর্গ রণে হত হলে ; রণ জয়ে

মুক্ত স্বর্গ-দ্বার প্রায়—কীর্ত্তি, রাজ্য বা স্বর্গ লাভ রূপ ফলসাধক যে যুদ্ধ। (মধু)

(৩৩) স্ব ধর্ম্ম...হবে লোপ—মানবধর্ম্মশাস্ত্রে আছে—

"যস্তু ভীত পরাবৃত্ত সংগ্রামে হন্যতে বারৈঃ
ভর্ত্তু র্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিত্তৎ সর্ব্বং প্রতিপদ্যতে।
যস্যাস্য সুকৃতং কিঞ্চিৎদমুত্রার্থ মুপার্জ্জিতং
ভর্ত্তা তৎসর্ব্বমাদত্তে পরাবৃত্ত হতস্য তু॥"

(৩৪) ঘৃণিবে—(মূলে আছে 'লাঘব') অনাদর করিবে। (মধু)

(৩২-৩৭)—বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, গীতার এ শ্লোকগুলি যেরূপ অসংলগ্ন, ও হেয় ধর্ম্মনীতিজ্ঞাপক তাহাতে এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সেরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। ১১ শ্লোকের টীকায় ইহার প্রয়োজন দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাহা ব্যতীত আরও কথা আছে। গীতার প্রথম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে, অর্জ্জুন তখন ভ্রান্ত ও মোহযুক্ত। তিনি যে লোক-সাধারণ দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি বশে মুগ্ধ হইয়া, প্রকৃত ধর্ম্মপথ বুঝিতে না পারিয়া বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান করিতেছিলেন, তাহা ক্ষণস্থায়ী। কিছুক্ষণ পরে ক্ষত্রিয় স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে তিনি তাহা ভুলিয়া গিয়া যুদ্ধে নিশ্চয়ই প্রবৃত্ত হইবেন। এই কথা গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৫৯ ও ৬০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

ভুঞ্জিবে ধরার রাজ্য ; তবে হে কৌন্তেয়,
সমরসঙ্কল্প করি করহ উত্থান। ৩৭
সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়,
সমজ্ঞান করি তবে রণে যুক্ত হও ;
তা হলে কখন পাপ হবে না তোমার। ৩৮

"যদহঙ্কার মাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যতে
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মনা
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপিতৎ॥"

এই ক্ষত্রিয় প্রকৃতি কিরূপে অর্জ্জুনকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিবে? লোকে তাহাকে ছোট করিবে তাহার কীর্ত্তি লোপ হইবে এবং যুদ্ধে তাহার যশঃ লোপ হইবে এই সকল রাজসিক ভাবনা পরে তাহাকেমুগ্ধ করিয়া কর্ম্মে নিয়োজিত করিবে। তাহাই এই কয় শ্লোকে বুঝান আছে। অথবা অর্জ্জুন প্রথমে যতটুকু বুঝিবার অধিকারী এখানে ততটুকু মাত্র বুঝান হইয়াছে,ইহাও বলা যায়।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, লৌকিক ন্যায় বা নীতি অনুসরণ করিয়া এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

স্বর্গলাভ—স্মৃতিতে আছে—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডল ভেদিনৌ।
পরিব্রাড় যোগযুক্তশ্চ রণেচাভিমুখোহতঃ॥"

(৩৮) পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে অর্জ্জুনের প্রকৃতি এরূপে গঠিত যে তাহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে। মহাভারতে তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান আছে। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশেও অর্জ্জুনের মোহ যায় নাই। তিনি প্রথম কয় দিন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরে যখন অভিমন্যুর বধ সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহার ক্রোধ হইল। তিনি সব ভুলিয়া গিয়া রীতিমত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং শত্রুবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অতএব যখন অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতেই হইবে—না করিয়া থাকিতে পারিবেন না--তখন উক্তরূপ লোকনিন্দাভয় বা স্বর্গাদি কামনা রূপ নিকৃষ্ট বুদ্ধিযুক্ত হইয়া যুদ্ধে রত হইবার পরিবর্ত্তে এইরূপ বুদ্ধিতে তাহার কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য যে, তাহাতে তাহার ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি হইবে। অধর্ম্ম হইবে না। শুধু স্বধর্ম্ম ভাবিয়া যুদ্ধ করিলেও বিশেষ লাভ নাই। তাহাতে স্বর্গাদি ফললাভ হয় মাত্র। তাহা এই অধ্যায়ের ৩১ ও ৩২ শ্লোকে দেখান আছে।

সাংখ্যজ্ঞানে যেই বুদ্ধি—কহিনু তোমায় ;
পুনঃ যোগবুদ্ধি যাহা করহ শ্রবণ—
যে বুদ্ধিতে যুক্ত হলে যাবে কর্ম্ম পাশ। ৩৯

এই স্বধর্ম্ম নিষ্কামভাবে ফলাকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া চিত্তকে অবিকৃত রাখিয়া বা সমতাযুক্ত হইয়া আচরণ করিতে হইবে। ইহাই কর্ম্মযোগ। এই অধ্যায়ের ৩৮ হইতে ৫৩ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ও পরের কয় অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত বুঝান আছে।

মধুসূদন বলেন, স্বধর্ম্ম বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য ভাবিয়া উক্ত রূপে যুদ্ধ করিয়া জীবহিংসা করিলেও তাহাতে পাপ হয় না। ফল কামনা করিয়া নিজের স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করিলেই পাপ হয়। পূর্ব্ব শ্লোকে যে যুদ্ধের আনুসঙ্গিক ফল স্বর্গাদির কথা বলা হইয়াছে,তাহাতে দোষ নাই। আপস্তম্ব স্মৃতিতে আছে, "ফলের জন্য আম্রবৃক্ষ রোপণ করিলেও যেমন তাহা হইতে ছায়া গন্ধ ইত্যাদি আনুসঙ্গিক রূপে পাওয়া যায়,সেইরূপ উক্তপ্রকারে ধর্ম্ম আচরণ করিলে তাহার আনুসঙ্গিক কোন গৌণ ফলে কোন দোষ হয় না।" এই অধ্যায়ের ৭০ শ্লোক দেখ।

(৩৯) সাংখ্য জ্ঞানে যেই বুদ্ধি—অর্থাৎ সাংখ্য বা পরমার্থ বিবেক বিষয়ে বুদ্ধি বা জ্ঞান যাহা হইতে সংসার শোক মোহাদি সাক্ষাৎ নিবৃত্ত হয়। (শঙ্কর)। সম্যক্ প্রকারে বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করে যাহা তাহাই সাংখ্য বা সম্যক্ জ্ঞান, তাহার দ্বারা যে আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাই নিরুক্তকার মতে সাংখ্যজ্ঞান (বলদেব, স্বামী)। অথবা সাংখ্য অর্থে আত্মতত্ত্ব বা ঔপনিষৎ পুরুষতত্ত্ব, (রামানুজ)। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—এই গ্রন্থে যে পরমার্থতত্ত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাই সাংখ্য—তদ্বিষয়ে যে বুদ্ধি অর্থাৎ আত্মা, জন্মাদি ছয় প্রকার (পূর্ব্বোল্লিখিত) বিকারের অতীত এবং অকর্ত্তা প্রভৃতি আত্মার যে স্বরূপ উপদিষ্ট আছে, তাহার সম্যক্ জ্ঞানই সাংখ্য জ্ঞান। সাংখ্য দর্শনে পুরুষ বা জীবাত্মার স্বরূপ ও তাহার প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ রূপমোক্ষের যে তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে—তাহা হইতে এই আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, এস্থলে বোধ হয় তাহাই সাংখ্য জ্ঞান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ১২ হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত এই সাংখ্যজ্ঞানতত্ত্ব বুঝান হইয়াছে।

যোগবুদ্ধি যাহা—যোগে অর্থাৎ কর্ম্মযোগে যে বুদ্ধি। সাংখ্যেরা বা জ্ঞানীরা আত্মজ্ঞান লাভের উপায়-ভূত আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ পূর্ব্বক সুখদুঃখ লাভালাভ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব জ্ঞান দূর করিয়া (তাহা সমান জ্ঞান করিয়া) কেবল ঈশ্বরারাধনার্থে যে কর্ম্মানুষ্ঠানে সমাধি বা মনোনিবেশ করে, তাহাই কর্ম্মযোগ। ইহার বৃত্তান্ত পরে (৪০ হইতে ৫৩) শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (শঙ্কর)। অথবা সাংখ্যজ্ঞান জন্মাইবার পূর্ব্বে দেহাদি হইতে ভিন্ন, আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি হইতে জাত, ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ সংস্কার সকলের স্বরূপ নিরূপণ পূর্ব্বক মোক্ষসাধনের যে অনুষ্ঠান তাহাই যোগ (শঙ্কর) সাংখ্য মতে,পণ্ডিতগণ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ করে। "বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ।"(সাংখ্য সূত্র,৩৷৩১) গীতায় এই যোগ প্রথম অর্থে—অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নিষ্কাম হইয়া ও সমতা প্রাপ্ত হইয়া আসক্তি ত্যজিয়া,কেবল কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিবার যে কৌশল—তাহাই এই যোগ।

কর্ম্মপাশ—(কর্ম্ম বন্ধন) পাপ পুণ্যাত্মক নানা রূপ কর্ম্ম হইতে, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম নামক যে আত্মার বন্ধন উৎপন্ন হয়, তাহাই কর্ম্মবন্ধন। আমরা যখন যে কর্ম্ম করি না কেন, সকলই আমাদের সূক্ষ্ম শরীরে একরূপ পরিবর্ত্তন অঙ্কিত করিয়া দেয়, তাহা কখন লোপ হয় না। এই জন্য আমরা আমাদের পূর্ব্ব কর্ম্ম বা মনোভাব পরে স্মরণ করিতে পারি; আর না করিতে পারিলেও, এ গুলি আমাদের মনে সংস্কারাবস্থায় থাকিয়া যায়। ইহাই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন রঞ্জিত করে। মৃত্যুর পরেও এই সকল সংস্কার সূক্ষ্মশরীরে থাকিয়া যায়। এই সংস্কার সমষ্টি পরজন্মে আমাদের 'স্বভাব' হয়—আমাদের প্রকৃতিকে সংগঠিত করে। ইহাতে যে বাসনা বীজ উপ্ত থাকে, পরজন্মে আমরা তদনুসারে কার্য্য করি। ইহাই কর্ম্মবন্ধন।

যোগ—এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সগুণ ঈশ্বরের সহিত, অথবা পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইবার কিম্বা ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিবার বিভিন্নপ্রকার সাধনাকেই গীতায় "যোগ" এই সাধারণ নাম দেওয়া হইয়াছে। যথা,—ঈশ্বরে সমাহিত চিত্ত হইয়া, চিত্তের বিক্ষেপ সংযত করিয়া কর্ম্ম সাধনা, অথবা ঈশ্বরে সমাহিতচিত্ত হইবার জন্য, নির্ম্মম নিষ্কামভাবে এবং মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া, সমতাযুক্ত হইয়া, কর্ম্ম করিবার কৌশলই—কর্ম্মযোগ। সেইরূপ আত্মধর্ম্ম-বিরোধী কর্ম্ম প্রবৃত্তিকে এবং মন ও ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া নিয়ত আত্মজ্ঞানে স্থির হইবার যে সাধনা—তাহা সাংখ্যযোগ। (সগুণ) ঈশ্বরে চিত্তকে সমাহিত ও অনুরক্ত করিবার উপায়—ভক্তিযোগ। ব্রহ্মে (নির্গুণ) সমাহিতচিত্ত হইলে—জ্ঞানযোগ। ইহার উপায় স্বরূপ চিত্তসংযম জন্যও কর্ম্মযোগ করিতে হয়। অতএব চিত্তবৃত্তির বিক্ষেপ নিরোধ করিবার উপায় স্বরূপ যে সকল পন্থা আছে—সকলই যোগ। এ কথা এখানে অধিক বিশদ করিয়া বলিবার স্থান নাই।

অনুষ্ঠানে নিষ্ফলতা কিম্বা অন্তরায়
নাহিক ইহার; এ ধর্ম্মের আচরণ
অল্প হলে—তবু তারে, মহাভয় হতে। ৪০
অধ্যবসায়ীর বুদ্ধি হয় একরূপ
হে পার্থ হেথায়; কিন্তু অস্থির বুদ্ধি,
বুদ্ধি তার অন্তহীন—বহু শাখাময়। ৪১

(৪০) অনুষ্ঠানে নিষ্ফলতা—আরম্ভে নিষ্ফলতা এবং মন্ত্রাদি অঙ্গবৈকল্য জন্য সমাপ্তিতে বিফলতা (বলদেব)।

অল্প আচরণ—জ্ঞান বা অন্যযোগ অল্প আচরণে কোন লাভ হয় না।

মহাভয়—সংসারভয়, বা জন্মমরণাদি রূপ দুঃখভয়।

(৪১) অধ্যব্যসায়ীর বুদ্ধি—মূলে আছে 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি'। অর্থাৎ নিশ্চয়স্বভাবাবুদ্ধি, প্রমাণ-জনিত বিবেক বুদ্ধি (শঙ্কর)। অথবা ঈশ্বরারাধনা লক্ষণ-যুক্ত কর্ম্মযোগে ঈশ্বরভক্তিবলে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইব (স্বামী) বা আত্মতত্ত্ব অনুভব করিব, (বলদেব) এরূপ এক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই অধ্যবসায় বুদ্ধি। শঙ্করাচার্য্য আরও বলিয়াছেন, যাহাকে সাংখ্যবুদ্ধি বলা হইয়াছে, এবং বক্ষ্যমান লক্ষণযুক্ত যে (কর্ম্ম) যোগ বুদ্ধির কথা বলা হইবে—উভয়ই ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি। মধুসূদন বলেন—এ সংসারে শ্রেয়মার্গে "সেই ইহা" এইরূপ নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি। সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ এক (মোক্ষ) ফলসাধক বলিয়া এ উভয় বুদ্ধিই ব্যব-সায়াত্মিকা। সর্ব্বাপেক্ষা রামানুজের অর্থই নিম্নোক্ত ৪৪ শ্লোকের সহিত অধিক সঙ্গত। তিনি বলেন, মুমুক্ষুর অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে বুদ্ধি, এবং আত্মনিশ্চয় পূর্ব্বক কাম্যকর্ম্মে (কামনাধিকারে) এক ফলসাধন বিষয়ে যে বুদ্ধি (৪৪ শ্লোক দেখ) তাহাই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। কেন না, সকলপ্রকার কর্ম্মেই বুদ্ধি এক নিষ্ঠ ও স্থির হইতে পারে—যদি তাহা একরূপ ফলসাধনার্থ প্রয়োজন মনে করিয়া এক মনে করা হয়। এ কারণ, যে এ জীবনে ধনোপার্জ্জনই এক মাত্র উদ্দেশ্য করিয়া তাহার জন্য কর্ম্ম করে—তাহার বুদ্ধিও এই অর্থে ব্যব-সায়াত্মিকা বলা যায়।

বুদ্ধি অস্থির যাহার—মূলে আছে 'অব্যবসায়ীর বুদ্ধি'। ইহার বশে স্বর্গ পুত্র ধন প্রভৃতি নানারূপ ফল কামনা করা হয় বলিয়া এ বুদ্ধি নানারূপে বিক্ষিপ্ত।

অবিবেকী যেই জন, বেদ-বাদ রত,
হে অর্জ্জুন! কহে যারা নাহি কিছু আর,
কামী—যার চেষ্টা স্বধু স্বর্গ লাভ তরে,
কহে তারা যেইরূপ পুষ্পিত বচন—
জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্যকর—
বহুল বিশেষ ক্রিয়া হয় যার সার; ৪২।৪৩
তাহে বিমোহিতচিত্ত হয় যেই জন—
ভোগৈশ্বর্য্যকামী যেই—নাহি করে তার
এ অধ্যবসায় বুদ্ধি একাগ্রতা লাভ। ৪৪
ত্রিগুণ বিষয় বেদ—হও দ্বন্দহীন

হয়—কোন একটীতে একাগ্রতা লাভ করিতে পারে না। এই অর্থ রামানুজের। বলদেব প্রভৃতি বলেন, কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর বুদ্ধিই অব্যবসায়াত্মিকা। ইহাদের অর্থ পুর্ব্বোক্ত কারণে তত সঙ্গত নহে।

অন্তহীন (অনন্ত)—উক্ত কামীদের কামনা অনন্ত বলিয়া এবং কর্ম্মফল গুণ ফলহেতু বহু প্রকারভেদে বহু শাখা বিশিষ্ট বলিয়া (স্বামী)।

(৪২-৪৩) বেদবাদ রত—বহু অর্থবাদ বা ফল সাধন প্রকাশক বেদবাক্য। (শঙ্কর ও মধু) অর্থাৎ ইহারা বেদ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিজ্ঞাত নহে (গিরি)। অথবা চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি ব্রত বা যজ্ঞাদি কর্ম্মে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয় এইরূপ কোর্থবাদ (স্বামী)। বেদের স্বর্গাদিফলবাদ (রামানুজ)। কর্ম্ম মীমাংসা প্রভৃতি বাদ।

কামী—বিষয়সুখবাসনাগ্রস্ত (বলদেব)।

নাহি কিছু আর—স্বর্গ পশ্বাদি ফলসাধক বেদোক্ত কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছু নাই (শঙ্কর, রামানুজ ও বলদেব।) কর্ম্মকাণ্ড নিষ্ঠার ফল ব্যতীত আর কিছুই নাই (গিরি)। কর্ম্মকাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নাই (মধু)। শ্রুতিতে আছে,—

"তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে,
এবমেব অমুত্র পুণ্যাজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।"

পুষ্পিত বচন—শ্রবণ রমণীয়(শঙ্কর),বিষলতাবৎ আপাতরমণীয় (স্বামী)।

জন্মকর্ম্মফল—যাহার কর্ম্মফলে পুনর্জ্জন্ম হয় (শঙ্কর)। জন্ম এবং কর্ম্মফল (স্বামী)। জন্ম (দেহ সম্বন্ধ), কর্ম্ম (আশ্রমবিহিত ইত্যাদি কর্ম্ম), এবং ফল (স্বর্গলাভাদি)এই তিন ইহাই বলদেব অর্থ করেন। জন্ম, তদধীন কর্ম্ম ও তদধীন ফল (মধু)।

ক্রিয়া—যাহাতে স্বর্গ পশু, পুত্রাদি লাভ নিমিত্ত অনেক ক্রিয়া বাহুল্য প্রকাশিত হইয়াছে (শঙ্কর)। অর্থাৎ দেশ কাল ও অধিকারী বিবেচনায় প্রকাশিত হইয়াছে (গিরি)। বোধ হয় অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞাদি ক্রিয়া—এই রূপ অর্থ করিলেই সহজ হয়। মধুসূদন এই অর্থ করেন।

ভোগৈশ্বর্য্য—স্বর্গের সুখভোগ ও ইন্দ্রত্বাদি ঐশ্বর্য্য (মধু)।

(৪৪) একাগ্রতা—মূলে আছে 'সমাধি'। অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত উভয় প্রকার চিত্তের একাগ্রতা (গিরি)। পরমেশ্বরে একাগ্রতা (স্বামী)। ব্রহ্মে অবস্থান রূপ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি (মধুসূদন)। আত্মজ্ঞান হইতে আত্মনিশ্চয় পূর্ব্বক মোক্ষসাধনভূত কর্ম্ম বিষয়ে বুদ্ধি (রামানুজ)। যাহাতে সম্যক আত্মস্বরূপ জানা যায়,তাহাই সমাধি—নিরুক্তকার এই অর্থ করেন, (বলদেব)। এই শ্লোকের শেষ অংশ টীকাকারগণ এই অর্থ করেন—এইরূপ লোকে সমাধিতে বা আত্মজ্ঞানে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিলাভ করিতে পারে না। রামানুজকে অনুসরণ করিয়া এস্থলে অন্য অর্থ করা হইয়াছে। তাহা ৪১ শ্লোকের টীকায় দেখাইয়াছি।

(৪৫) ত্রিগুণ—(মূলে আছে ত্রৈগুণ্য)—সংসার (শঙ্কর)। গিরি ও মধু বলেন, এস্থলে বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে বুঝাইতেছে, বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিশ্চয়ই সংসারে লিপ্ত হইতে হয়—তাই বেদ ত্রিগুণ বা সংসার ব্যাপার প্রকাশক। স্বামী বলেন, সকাম অধিকারীর কর্ম্মফল সম্বন্ধ বেদ হইতে প্রতিপন্ন হয়। সত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বিকারেই সংসারের উৎপত্তি। সাত্তিক, রাজসিক, তামসিক অধিকারীভেদে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ক্রিয়াকাণ্ড ও তদুপযুক্ত কর্ম্মফলের ব্যাপার বেদে বর্ণিত আছে,তাহার ফলে এই ত্রিগুণাত্মক সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। রামানুজ বেদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া কিছু ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন,ত্রৈগুণ্য অর্থে সত্ব রজ তম প্রচুর পুরুষ। রাজসিক তামসিক লোক স্বর্গাদি সাধনরূপ হিত বুঝে না। সাত্বিক লোক

ত্রিগুণ-অতীত, পার্থ! নিত্য সত্বস্থিত ;
যোগ ক্ষেম পরিহরি হও আত্মরত। ৪৫
সর্ব্বত্র প্লাবিলে জলে, ক্ষুদ্র সরসীর

যেই প্রয়োজন—তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণের,
হয় সেই অর্থসিদ্ধি—বেদে সমুদায়। ৪৬
কর্ম্মে শুধু অধিকার তব—নহে কভু
কর্ম্মফলে ; কর্ম্মফলপ্রার্থী নাহি হও ;
অকর্ম্মে আসক্তি যেন নাহি থাকে তব।৪৭

মোক্ষ বিমুখ হইলে কামনা বশে উদ্‌ভ্রান্ত হয়। এইজন্য বেদ ত্রৈগুণ্য বিষয়। এ অর্থ সঙ্গত নহে।

ত্রিগুণ অতীত—অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির অতীত হইয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থান কর। শঙ্করাচার্য্য ও স্বামী অর্থ করেন—নিষ্কাম হও। রামানুজ বলেন, ইদানিং অর্জ্জুনের সত্ব প্রচুর জন্য রজ ও তম গুণ সঙ্কীর্ণ হওয়ায়, তাহার এ দুই গুণ যাহাতে আর বৃদ্ধি না হয়, কেবল সে এক সত্বগুণেই যুক্ত থাকে, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। বলদেব বলেন, সমুদয় বেদের শিরোভূত বেদান্তনিষ্ঠাই নিস্ত্রৈগুণ্য বা নিষ্কামভাব।

দ্বন্দহীন—সুখ দুঃখ,লাভালাভ,শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতি বিপরীত অর্থবাচক বা প্রতিপক্ষীয় পদার্থকে দ্বন্দ বলে। রামানুজ অর্থ করেন—সকল সাংসারিক স্বভাব নির্গত।

সত্বযুত— সত্বগুণাশ্রিত (শঙ্কর)। সৎগুণাশ্রিত (গিরি)। ধৈয্যযুত (স্বামী)। রজঃ তম গুণদ্বয় রহিত করিয়া নিত্য প্রবৃদ্ধ সত্বস্থ(রামানুজ)। বোধ হয় এস্থলের এই'সত্বযুক্ত'ও পূর্ব্বের 'নিস্ত্রৈগুণ্য'এই দুইটার সামঞ্জস্য করিতে গিয়া রামানুজ 'ত্রিগুণ বিষয় বেদ, ইহার পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। এস্থলে গিরি ও স্বামীর অর্থ ধরিলেও কোন গোল থাকে না।

যোগক্ষেম—অপ্রাপ্ত বিষয় উপার্জ্জনই যোগ; আর প্রাপ্ত বিষয় রক্ষাই ক্ষেম। (মিতাক্ষরা ১।১০০ ও মনু ৭।২২৭ দেখ)। 'যোগক্ষেম' ও 'সত্বযুত' এই দুই বিশেষণের সামঞ্জস্য করিয়া রামানুজের মত গিরিও অর্থ করেন--এই সকলে ও দ্বন্দে অভিভূত হওয়া রজ ও তম গুণের কার্য্য, তাই এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া সত্ব গুণস্থ হইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

(৪৬) সর্ব্বত্র প্লাবিলে জলে—মূলে আছে, "সর্ব্বতঃ (ত্র) সংপ্লুতোদকে"। রামানুজ, স্বামী ও বলদেব ইহার অর্থ করেন—বৃহৎ হ্রদ। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে স্নানপানাদি যে যে প্রয়োজন স্বতন্ত্ররূপে সিদ্ধ হয়, এক বৃহৎ জলাশয়ে তাহা সমস্তই একত্র সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহাই অধিক সঙ্গত। এ শ্লোকের অপরার্দ্ধ লইয়াও টীকাকারগণ এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। শঙ্কর অর্থ করেন, সমস্ত বেদোক্ত কর্ম্মে যে ফল, তাহা পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসীর জ্ঞানফলের অন্তর্বর্ত্তী হয়। গিরি বলেন, সমস্ত বেদোক্ত কর্ম্ম হইতে বিষয়বিশেষ উপরতি জন্য যে সুখ জন্মায়, তাহাও আত্মজ্ঞের আনন্দের অন্তর্গত হয়। স্বামী বলেন—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মানন্দে কর্ম্মজনিত সমস্ত ক্ষুদ্রানন্দ ডুবিয়া যায়। কেহ অর্থ করেন—সকল প্রকার কর্ম্মের তথ্যই বেদে পাওয়া যায়। এস্থলে সঙ্গত অর্থ এই বোধ হয় যে, কর্ম্ম করিবার একটা মূলসূত্র এই গীতোক্ত কর্ম্ম-যোগ হইতে পাইলে বেদোক্তাদি সমুদায় কর্ম্মই তাহার অন্তর্গত করিয়া লওয়া যায়। কর্ত্তব্য বলিয়া—অব্যবসায় বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে আর গোলযোগ থাকে না।

মধুসূদন যে অর্থ করেন, তাহাও এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন। তিনি বলেন, (উদপানে) ক্ষুদ্র জলাশয়ে (যাবান্)স্নান পানাদিরূপ যে যে(অর্থ)প্রয়োজন সিদ্ধহয়, (সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে) পর্ব্বত নির্ঝরিণী গুলি সকল দিক্ হইতে স্রাবিত হইয়া কোন উপত্যকায় একত্রিত হইলে যে বৃহৎ হ্রদ উৎপন্ন হয়, সেই মহতী জলাশয়ে (তাবান্ অর্থ) সেইরূপ হয়। সর্ব্ববেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড সাধনে যে হিরণ্যগর্ভানন্দ ভোগ পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়, সেই সমস্ত ক্ষুদ্রানন্দ ব্রহ্মজ্ঞানীর ভূমা ব্রহ্মানন্দের সামান্য অংশমাত্র। অতএব এই ভূমানন্দ লাভ করিলে আর উক্ত ক্ষুদ্রানন্দের প্রয়োজন হয় না।

(৪৭)কর্ম্মেতেই অধিকার তব—তত্ত্বজ্ঞানার্থী অর্জ্জুনের (নিষ্কাম) কর্ম্মব্যতীত জ্ঞান নিষ্ঠায় অধিকার নাই (শঙ্কর)। তবে নিত্যসত্বস্থ মুমুক্ষু অর্জ্জুনের শ্রুত্যুক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যাদি সর্ব্বকর্ম্ম ফল বিশেষের সম্বন্ধ রহিত পূর্ব্বক করিবার অধিকার আছে। (রামানুজ)। মধুসূদন অর্থ করেন, পূর্ব্বশ্লোকোক্ত পরমানন্দ যখন কেবল নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা লাভ করা যায় না,যখন তাহা কেবল আত্মজ্ঞাননিষ্ঠতাতেই লাভ করা যায়, তখন আয়াস সাধ্য বহিরঙ্গ সাধনযুক্ত কর্ম্মে প্রয়োজন নাই। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ করিয়া জ্ঞানই সম্পাদ্য—এ কথা অর্জ্জুনের ন্যায় স্বভাবযুক্ত কেহ বলিতে পারে না। কেন না নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় মন জয় না হইলে জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। অর্জ্জুনের চিত্তশুদ্ধি জন্য বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কেবল কর্ম্ম করিবারই অধিকার আছে। কর্ম্ম ফলে তাঁহার অধিকার নাই। কেন না ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিলে কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবে না। কর্ম্ম বন্ধন কারণ হইবে।

স্বামী বলেন,যখন সর্ব্বকর্ম্মফল ঈশ্বরারাধনায় পাওয়া যায়, তখন বন্ধন হেতু কর্ম্মফলের প্রবৃত্তি বা কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। বলদেবও এইরূপ সহজ অর্থ করেন।

তিনি বলেন, শুদ্ধ চিত্ত হইয়া স্বধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বোধে অর্জ্জুনের যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য—এস্থলে ইহাই উদ্দিষ্ট হই-

আসক্তি করিয়া ত্যাগ, যোগযুক্ত হয়ে,
কর্ম্ম কর—সিদ্ধ্যসিদ্ধি সমজ্ঞান করি ;
কহে যোগ,—ধনঞ্জয় ! এই সমতাকে। ৪৮
বুদ্ধিযোগ হতে কর্ম্ম অপকৃষ্ট অতি ;
ফল হেতু কর্ম্ম করে কৃপণ যে জন—
এই বুদ্ধি, ধনঞ্জয় ! করহ আশ্রয়। ৪৯
সুকৃত দুষ্কৃত দুই—বুদ্ধি-যুক্ত হয়ে,
ত্যজে হেথা ; তাই যুক্ত হও এই যোগে—
যোগ হয় সুধু এই কর্ম্মের কৌশল। ৫০
এই বুদ্ধিযুক্ত হয়ে মনীষী সকল,
কর্ম্মজাত ফল ত্যজি—জন্ম-বন্ধ হতে
মুক্ত হয়ে—পায় তারা পদ শান্তিময়। ৫১
যেইকালে বুদ্ধি তব, হইবেক পার
মোহের গহন হতে—হইবে নির্ব্বেদ
সেইকালে, শ্রুত আর শ্রোতব্য বিষয়ে।৫২
শ্রুতিতে বিক্ষিপ্ত তব বুদ্ধি যেইকালে

য়াছে। এ অর্থ সঙ্কীর্ণ, কিন্তু বেশ সঙ্গত। বঙ্কিম বাবু বলেন,সাধারণতঃ যাহাকে কাজ বা action বলে, তাহাই কর্ম্ম শব্দে এখানে বুঝাইতেছে, কেবল বৈদিক কর্ম্ম বুঝাইতেছে না।

(৪৮) যোগযুক্ত—পরমেশ্বরে একপরতা, (স্বামী)। কেবল ঈশ্বরার্থ বা তাঁহাকে তুষ্টকরিবার জন্য কর্ম্ম করা, এবং কর্ম্ম করিতেছি বলিয়া ঈশ্বর আমার শুভকরুন, এরূপ কামনা ত্যাগ করাই যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করা (শঙ্কর)। সিদ্ধ্যসিদ্ধিতে সমত্বরূপ চিত্ত সমাধানই যোগ (রামানুজ)।

সিদ্ধ্যাসিদ্ধি—শঙ্কর ও গিরি বলেন, সত্বশুদ্ধি ও তাহার পরিণামে জ্ঞান প্রাপ্তিই কর্ম্মের সিদ্ধি তাহার বিপর্য্যয়ে কর্ম্মের অসিদ্ধি। ইহাতে এই অর্থ হয় যে, কর্ম্ম করিয়া আমার চিত্তশুদ্ধি হইবে, বা আমি জ্ঞান লাভ করিব, এরূপ কামনাও ত্যাগ করিবে। যে অভিপ্রায়ে(ইংরাজী কথা end) কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলে, তাহা তুমি সিদ্ধি করিতে পারিবে কি না,তাহাও দেখিবার আবশ্যক নাই ; কর্ত্তব্য বুঝিলেই কর্ম্ম করিবে। এই সহজ অর্থও এখানে অসঙ্গত হয় না। মধুসূদন বলেন, ফলসিদ্ধিতে হর্ষ ও ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদ ত্যাগ করাই সমত্ব জ্ঞান।

(৪৯) বুদ্ধিযোগ হতে—উক্তরূপ সমত্বাদিজ্ঞানে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি যুক্ত কর্ম্ম অপেক্ষা। বুদ্ধি সমত্ব বুদ্ধি (শঙ্কর)। ব্যবসাত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মযোগ (স্বামী)। ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মযোগ, আত্মবুদ্ধিসাধনভূত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ (মধু)।

কর্ম্ম—কাম্য কর্ম্ম (শঙ্কর ও মধু)।

কৃপণ—কর্ম্মফলপ্রার্থী (রামানুজ)। এই অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকের টীকা দেখ।

এই বুদ্ধি—উক্তরূপ বুদ্ধি। যোগ বুদ্ধি (স্বামী)। কিম্বা তাহার পরিপাক জাত সাংখ্য বুদ্ধি।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক বুঝিবার জন্য এই শ্লোক এবং ইহার পরবর্ত্তী শ্লোক বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্যক। সেই স্থানে এই দুই শ্লোকের বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজন হইবে।

(৫০) কৌশল—(মূলে আছে 'কর্ম্মসু কৌশলং') স্বধর্ম্ম নিরত, সমত্বজ্ঞানযুক্ত,ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হইয়া কর্ম্ম করিবার যে কৌশল,তাহাই যোগ(শঙ্কর)। কর্ম্মের ফল বন্ধন হইলেও ঈশ্বরার্থে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিবার কৌশল তাহাই যোগ (স্বামী)। সংসার বন্ধনকারক দুষ্ট কর্ম্ম নিবারণ চতুরতা (মধু)। বঙ্কিম বাবু অর্থ করেন, যিনি আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম যথাবিধি নির্ব্বাহ করেন তিনিই যোগী। কেহ পাঠ করেন—'কর্ম্ম সুকৌশলং,অর্থাৎ সুকৌশল যুক্ত কর্ম্ম। ইহাতে বিশেষ অর্থভেদ হয় না।

(৫১) পদশান্তিময়—(মূলেআছে'পদ অনাময়') বিষ্ণুর ভোগাক্ষ্য পরমপদ বিষ্ণুলোক (শঙ্কর ও স্বামী)। নিষ্কাম ভাবে সমত্ব বুদ্ধতে কর্ম্ম করিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় "তত্ত্বমসি" জ্ঞান, অজ্ঞান মেঘ বিনষ্ট করিয়া আপনিই প্রকাশিত হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি রূপ মোক্ষ হইবে (মধু)।

(৫২)মায়ার গহন—'মূলে আছে মোহ কলিল' তুচ্ছ ফলাভিলাষ হেতু অজ্ঞান গহন (বলদেব)। আমি আমার এই অহঙ্কারাত্মক অজ্ঞান (মধু)।

নির্ব্বেদ—বৈরাগ্যযুক্ত, আসক্তিবিহীন।

শ্রুত কিম্বা শ্রোতব্য বিষয়—যে উপদেশ পূর্ব্বে শ্রুত হইয়াছে বা হইবে। (শঙ্কর ও স্বামী)। আধ্যাত্মিক শাস্ত্র ব্যতিরিক্ত শাস্ত্রের উপদেশ, (গিরি)। শ্রুত ও শ্রোতব্য কর্ম্ম ফলের বিষয়, (মধু)। সর্ব্বকর্ম্মের উপলক্ষণ (রাঘবেন্দ্রযতি)। কেহ অর্থ করেন, বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্র।

(৫৩) শ্রুতিতে বিক্ষিপ্ত—অনেক সাধ্য সাধন বিষয় শ্রবণ করিয়া (শঙ্কর)। অথবা নানা লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যের ফলশ্রুতি দ্বারা (স্বামী)। নানাবিধ ফল শ্রবণে কাম্য কর্ম্মে বিক্ষিপ্ত (মধু)। শ্রবণ মাত্র বিক্ষিপ্ত (রামানুজ)। কেহ কেহ অর্থ করেন,বেদ বাক্যে বিক্ষিপ্ত

সমাধি—পরমাত্মায় সমাধি (মধু) যাহাতে সমিহিত হওয়া যায়, বা আপনাকে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, সেই

হবে স্থির, সমাধিতে হইবে অচল—
সেই কালে এই যোগ লভিবে নিশ্চয়। ৫৩
অর্জ্জুন—
সমাধিতে স্থিত-প্রজ্ঞ যে জন কেশব!—
কিরূপ লক্ষণ তার? হয় কি প্রকার
অধিষ্ঠান তার কিম্বা বচন চলন? ৫৪
শ্রীভগবান—
ত্যজে যেই মনোগত কামনা সকল,
আত্ম-বলে রহে তুষ্ট আত্মাতে আপন,—
স্থিত-প্রজ্ঞ কহে, পার্থ, তখন তাহারে।৫৫
দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত, সুখে স্পৃহাহীন,
বীতরাগভয়ক্রোধ—স্থিতধী সে মুনি।৫৬
সর্ব্বত্র যে স্নেহশূন্য, নহে উল্লাসিত

আত্মা (শঙ্কর ও স্বামী) জাগ্রত স্বপ্নরহিত বা বিক্ষেপ রহিত সুষুপ্তি অবস্থা (মধু) যাহাতে চিত্ত সমিহিত হয় সেই সমাধি (বঙ্কিম বাবু)।

স্থির—বিক্ষেপ বর্জ্জিত (শঙ্কর)।

এই যোগ—বিবেক প্রজ্ঞা সমাধি (শঙ্কর)। যোগফল তত্ত্বজ্ঞান (স্বামী) আত্মসাক্ষাৎকার 'সোঽহং' জ্ঞানরূপ যোগ (মধু)। স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা। আত্মাবলোকান (রামানুজ)।

(৫৪) স্থিত-প্রজ্ঞা—নিশ্চলা বুদ্ধি যার (স্বামী)। যাহার সমাধি লাভ হইয়াছে অথবা পরব্রহ্মে আমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি এইরূপ জ্ঞান যাহার, অথবা যিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া জ্ঞানযোগ নিষ্ঠায় প্রবৃত্ত কিম্বা যিনি কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত, তাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ (শঙ্কর)। বঙ্কিম বাবু অর্থ করেন, যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে স্থিত হইবে, তখন তুমি কর্ম্মযোগ সিদ্ধ হইবে।

কিরূপ লক্ষণ—মধুসূদন বলেন, স্থিতপ্রজ্ঞের দুই অবস্থা—সমাধি ও ব্যুত্থান। এই শ্লোকে চারিটী প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্নে, সমাধিযুক্ত স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা হইয়াছে। তাহার পর তিন প্রশ্নে (১) ব্যুথিত স্থিত-প্রজ্ঞের বাক্য, (২) অবস্থান বা মনের ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ কার্য্য, এবং (৩) বিষয় বিচরণের অবস্থা বা কর্ম্ম কিরূপ—তাহাই জিজ্ঞাসা হইয়াছে।

(৫৫) মনোগত কামনা—কামনা মনেরই ধর্ম্ম (বলদেব)। সঙ্কল্পাত্মক মনোবৃত্তি—"প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি" ভেদে পাঁচ প্রকার। (পাতঞ্জল দর্শন) কামনাত্যাগ অর্থাৎ সর্ব্বচিত্তবৃত্তি শূন্য হওয়া। কারণ যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ (মধুসূদন)।

রহে তুষ্ট—যে বাহ্য বস্তু লাভে নিরপেক্ষ হইয়া কেবল নিজ আত্মাতেই তুষ্ট অর্থাৎ পরমাত্মা দর্শনরূপ অমৃত আস্বাদনে পরিতুষ্ট আত্মারাম সন্ন্যাসী (শঙ্কর)। আত্মাবলোকন তুষ্ট, (রামানুজ)। পরমাত্মাতে তদেকচিত্ত হইয়া তৎপ্রসাদে সন্তোষ যুক্ত (রাঘবেন্দ্র যতি)। শ্রুতিতে আছে—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামাযেঽস্য হৃদি স্থিতা।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"

এই শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু বুঝাইয়াছেন যে, আত্মাতে আনন্দযুক্ত বা আত্মারাম হইলে যে বহির্বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করিতে হইবে না—এই শ্লোকে বা ইহার পরের কয় শ্লোকে এমন কথা নাই। সেই সকল ন্যায় মত উপভোগের বিঘ্নকারী কামনা ও ইন্দ্রিয় বশ করিতে হইবে ইহাই উদ্দেশ্য।

(৫৬, ৫৭)—মধুসূদন বলিয়াছেন, ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ "কি বলেন"—এই দুই শ্লোকে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এ কথা ঠিক বুঝা যায় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কামনা মনের ধর্ম্ম। অতএব কামনা ত্যাগ করিতে হইলে বা নিষ্কাম হইতে হইলে সেই মনের বৃত্তিগুলি দমন করা প্রথম কর্ত্তব্য। কারণ, সেই গুলিই কামনার বীজ। অতএব সেই মনোবৃত্তি গুলিই আগে বশ করিতে হয়। সে বৃত্তিগুলি কি তাহা এই দুই শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, দুঃখ, উদ্বেগ, সুখ, স্পৃহা, রাগ, ভয়, ক্রোধ, উল্লাস ও দ্বেষ। মধুসূদন এই সকল বৃত্তির নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেন।—

দুঃখ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ রজঃগুণজ সন্তাপাত্মক চিত্তবৃত্তি।

উদ্বেগ—সেই দুঃখ হেতু অনুতাপাত্মক ভ্রান্তিরূপ তামস বৃত্তি।

সুখ—উক্তরূপ ত্রিবিধ সাত্বিক প্রীতিজনক চিত্তবৃত্তি।

স্পৃহা—সুখজ ধর্ম্মানুষ্ঠান বিনা সুখের লালসারূপ তামস চিত্তভ্রান্তি। অথবা হর্ষাত্মক চিত্তবেগ।

রাগ—(অনুরাগ)শোভনঅধ্যাস নিবন্ধন বিষয়ে রঞ্জনাত্মক রাজসী চিত্তবৃত্তি।

ভয়—অনুরাগের বিষয়ে বিঘ্নকারী বা নাশক উপস্থিত হইলে তাহাকে বাধা দিবার অসামর্থ্য জন্য চিত্তের তামসিক দীনতা।

ক্রোধ—সেই বাধা নিবারণের ক্ষমতা থাকিলে, আপনাকে বড় মনে করিয়া তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টায় যে চিত্ত জ্বালা হয় সেই রাজস বৃত্তি।

স্নেহ—অন্য বিষয়ে প্রেমাপরপর্য্যায় তামস বৃত্তি বিশেষ। অন্যের সুখ দুঃখ ক্ষতি বৃদ্ধি হইলে, আপ-

লভি শুভ, বিষাদিত নাহি হয় কভু
অশুভ লভিয়া,—তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৫৭
করেঁ যেই প্রত্যাহার ইন্দ্রিয় সকল
ইন্দ্রিয়-বিষয় হতে,—কূর্ম্ম করে যথা
নিজ অঙ্গ সঙ্কুচিত—স্থিতপ্রজ্ঞ তার। ৫৮
বিষয়-সম্ভোগ-হীন দেহীর না যায়
বিষয় বাসনা কভু; আত্ম-দৃষ্টি লভি
বিষয়ের অনুরাগ তার হয় দূর। ৫৯.

বিবেকী পুরুষ যেই, কত চেষ্টা করে—
প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ তথাপি সবলে
মন তার, হে অর্জ্জুন, করয়ে হরণ। ৬০
যোগী যেই—সে সকল করিয়া সংযম
হয় মম পরায়ণ; ইন্দ্রিয় যাহার
রহে বশে,—প্রজ্ঞা তার হয় প্রতিষ্ঠিত। ৬১
করিলে বিষয় ধ্যান, জন্মে মানবের

নাতে তাহা আরোপ করা। বলদেব বলেন, ঔপাধিক প্রীতিশূন্য—নিরুপাধিক প্রীতি শূন্য নহে। শঙ্কর বলেন, দেহ জীবনাদিতে স্নেহ। স্বামী বলেন পুত্রমিত্রাদিতে স্নেহ। ভক্তেরা বলেন ঈশ্বর ব্যতীত অন্য পদার্থে স্নেহ। 'আমার' এই অভিমানে স্ত্রীপুত্র দেহাদিতে যে মমতা—তাহাই এস্থলে উদ্দিষ্ট হইয়াছে বোধ হয়,নতুবা সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া তাহাতে যে প্রীতি তাহা দোষাবহ নহে।

দ্বেষ—দুঃখহেতু অশুভ বিষয়ে অসূয়া জনিত নিন্দাদি প্রবর্ত্তক ভ্রান্ত তামস বৃত্তি।

উল্লাস—(মূলে আছে অভিনন্দন) সুখ হেতু (স্ত্রী পুত্র ধনাদি) শুভ বিষয়ে প্রশংসা প্রবর্ত্তক ভ্রান্ত চিত্ত বৃত্তি।

(৫৮)—মধুসূদন বলেন, স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপে অবস্থান করেন এই প্রশ্নের উত্তরে ৫৮ হইতে ৬৩ শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। প্রারব্ধকর্ম্মবশে ব্যুত্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণ বিক্ষিপ্ত হইলে, তাহাদিগকে সমাধি জন্য পুনর্ব্বার বিষয় হইতে আকর্ষণ বা নিরোধ করিতে হয়—তাহাই এই ৫৮ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

(৫৯) আত্মদর্শনই যে ইন্দ্রিয়ের এই বিষয়াকর্ষণ নিবারণের মুখ্য উপায়—এই শ্লোকে ইহা বুঝান হইয়াছে। আত্মাতে চিত্ত স্থির হইলেই ইন্দ্রিয় দমন হয়, বাসনার কোনচিত্তবিক্ষেপ ক্ষমতা থাকে না—তাহা পরবর্ত্তী ৭০ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

বিষয়সম্ভোগ হীন—(মূলে আছে 'নিরাহারস্য', অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য বিষয় আহরণ করিতে পারে না—বা করে না (শঙ্কর)। ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণই তাহার আহার। যে তাহাতে অশক্ত,যেমন জড় আতুর প্রভৃতি, তাহারা নিরাহারী। ইহারা আর যাহারা চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বে কর্ম্ম সন্ন্যাস করিতে যায়, বিষয় ভোগ করে না, তাহারা (রস) আশক্তিটুকু (বর্জ্জং) বাদ দিয়া বিষয় ভোগ ত্যাগ করে। অর্থাৎ তাহাদের মনের মধ্যে পূর্ব্ববাসনাজাত বিষয়ভোগতৃষ্ণা বা অনুরাগ টুকু থাকিয়া যায়।

আত্মাদৃষ্টে—(মূলে আছে "পরং দৃষ্ট্বা") অর্থাৎ বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে দেখিয়া। ইহা সকল টীকাকারগণই অর্থ করেন।

(৬০) ইন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রথমে না করিলে—৫৬ ও ৫৭ শ্লোকোক্ত সুখ দুঃখাদি মনোবৃত্তি দমন করা যায় না—ইহাই এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। মূলোচ্ছেদ করিলে তবে বৃক্ষ নষ্ট হয়। নদীর গতি বন্ধ করিতে হইলে তাহার উৎপত্তি স্থান রোধ করিতে হয়। সেই জন্য প্রথমে ইন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তিত মনের দমন জন্য এই ইন্দ্রিয় বিক্ষেপের দমন করিতে হয়।

কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীর ৫ম শ্লোক যথা—
"যস্ত্ব বিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ॥"

(৬১) এই শ্লোকে ইন্দ্রিয় বশ করিবার মুখ্য উপায় (Key) দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া তাঁহাতে যুক্ত বা তাঁহাতে মন স্থির করিলেই ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারা যায়। ঈশ্বরপরায়ণ বা তাঁহাতে অনুরক্ত হওয়া ও আত্মজ্ঞানে অবস্থিতি করা উভয়ের ফল এক। তাহা এখানে আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। মধুসূদন বলিয়াছেন যেমন বলবান রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দস্যুদিগকে নিবারণ করা যায় ও বা দস্যু আপনিই সরিয়া যায় সেইরূপ ভগবানের আশ্রয় লইলে দুষ্ট ইন্দ্রিয় আপনিই নিগৃহীত হয়।

কঠোপনিষদের ৩ বল্লীর ৬ শ্লোক এইরূপ—
"যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥

(৬২-৬৩)—ঈশ্বরে মন সমাহিত না করিয়া ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিয়া, যদি বিষয়ে মন আকর্ষিত হয়; অর্থাৎ বিষয় ভাবনা করা যায়,—তবে যে ফল হয়, তাহা এই দুই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। আমাদের এক দিকে আত্মা আর অন্য দিকে বিষয় রহিয়াছে। মধ্যে আছে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়। এক দিকে বিষয় এ গুলিকে আকর্ষণ করিতেছে। অন্যদিকে ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাদের আত্মাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বিষয় আকর্ষণই তন্মধ্যে প্রবলতর। কেন না বিষয় আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ আপাত রমণীয় ও দিবার প্রকাশমান। আত্মা প্রত্যক্ষ অথবা কেবল অন্তর প্রত্যক্ষ সাপেক্ষাও কষ্টকর সাধনা লভ্য ও রাত্রের ন্যায় প্রথমে অপ্রকাশিত। কাজেই বিষয়াকর্ষণ বড়ই প্রবল। অনেকরূপ কৌশল করিয়া সাধনা করিলে আত্মার

আসক্তি তাহাতে ; সেই আসক্তি হইতে
জন্মে কাম—কাম হতে ক্রোধের উদ্ভব ; ৬২
ক্রোধ হতে জন্মে মোহ ; ভ্রম—মোহ হতে,
এ স্মৃতিবিভ্রম হতে হয় বুদ্ধি নাশ—
বুদ্ধি-নাশ হতে হয় বিনষ্ট সে জন। ৬৩
আসক্তি-বিরাগ-হীন, আত্মবশেস্থিত,
ইন্দ্রিয়ের দ্বারা করি বিষয় সম্ভোগ,
আত্ম-জয়ী জন করে প্রসন্নতা লাভ। ৬৪
এই প্রসন্নতা লভি তার দুঃখ সব
হয় দূর ; যেই জন প্রসন্ন অন্তর,—
ত্বরায় তাহার বুদ্ধি হয় প্রতিষ্ঠিত। ৬৫
যোগযুক্ত নহে যেই, নাহি বুদ্ধি তার—
না থাকে ভাবনা তার, ভাবনাহীনের
নাহি শান্তি ; অশান্তের সুখ বা কোথায় ।৬৬
যে বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়ের মন অনুগামী
নিশ্চয় সে প্রজ্ঞা তার করয়ে হরণ,
বায়ু যথা হরে তরি বারিধি মাঝারে। ৬৭
অতএব সমুদয় ইন্দ্রিয় যাহার
হইয়াছে নিগৃহীত বিষয় হইতে,—
হে অর্জ্জুন, প্রতিষ্ঠিত হয় প্রজ্ঞা তার। ৬৮
অন্য জীব ভাবে যাহা নিশার আঁধার—
সংযমী জাগ্রত তাহে, যাহে জাগে জীব
সেই নিশি, তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট। ৬৯

আকর্ষণ প্রবল করা যায়। এই আকর্ষণ যত প্রবল হয়, বিষয় আকর্ষণ তত ক্ষীণ হয়। বিষয় আকর্ষণ প্রবল হইলে আত্মার আকর্ষণ ক্ষীণ হয়। বিষয়ের এই টান প্রবল হইয়া কিরূপে আমাদের ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাতসারে মৃত্যুর দিকে নিয়া যায় তাহাই এই দুই শ্লোকে দেখান হইয়াছে।

বিষয়ধ্যান—সুখ বুদ্ধিতে বিষয় চিন্তা (শঙ্কর)। মধুসূদন বলেন, বাহ্য ইন্দ্রিয় নিগৃহীত হইলেও যদি কেহ মনে মনে বিষয় ধ্যান করে বা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করে। এ অর্থ সঙ্কীর্ণ।

আসক্তি—মমতা উৎপাদক আসক্তি। শোভন অধ্যাস লক্ষণ যুক্ত প্রীতি। (মধু)

কাম—তৃষ্ণা, বাসনা। মমতা (মধু)।

ক্রোধ—এই বাসনা বা ইচ্ছা কাহারও দ্বারা প্রতিহত হইলে সেই প্রতিঘাতরূপ চিত্তজ্বালাই ক্রোধ, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

(৬৩) মোহ—কার্য্য ও অকার্য্য বিবেকজ্ঞান লোপ।

ভ্রম—ইন্দ্রিয় বিষয়ে যত্ন।

বুদ্ধিনাশ—আত্মজ্ঞানার্থ অধ্যবসায় নাশ।

বিনষ্ট—বিষয় ভোগে নিমগ্নহওয়ায় ধর্ম্মপথহইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারাবর্ত্তন বা নরকগতি (বলদেব)।

স্মৃতি—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশাদি হইতে সংস্কার জাত স্মৃতি। (শঙ্কর)

(৬৪-৬৫)—মন ও ইন্দ্রিয়কে প্রথমে বিষয় হইতে আত্মাতে আকর্ষণ করিতে অভ্যাস করিয়া যখন বৈরাগ্য জন্মিয়া চিত্ত বশ হইবে, তখন চিত্তকে বিক্ষিপ্ত না করিয়া অর্থাৎ আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া সমত্বজ্ঞানে নিষ্কাম ভাবে ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও চিত্তের নির্ম্মলতা জন্য প্রসন্নভাব (আত্মপ্রসাদ) দূর হয় না। কাজেই দুঃখাদি চিত্ত বিকার থাকে না, বুদ্ধি স্থির হয়।

আসক্তি ও বিরাগ—(মূলে আছে 'রাগ দ্বেষ') অর্থাৎ সুখকর বিষয়ে আসক্তি ও দুঃখকর বিষয়ে বিরক্তি। পাতঞ্জল সূত্রে আছে—"সুখানুশয়ী রাগঃ, দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।" (২—৭।৮)

প্রসন্নতা—বিষয়াসক্তি রূপ মলা দূর হওয়ায় চিত্তের নির্ম্মলতা।

বুদ্ধি—আত্মস্বরূপ বিষয়ক বুদ্ধি (মধু)।

(৬৬) অযুত—অসমাহিত চিত্ত।

ভাবনা—আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ (শঙ্কর ও গিরি)। ধ্যান (স্বামী)। নিদিধ্যাসনাত্মক আত্ম বিষয়ে ভাবনা (মধু)।

শান্তি—অবিদ্যাজনিত সমস্ত লৌকিক ও অলৌকিক (বা বৈদিক) কর্ম্মে বিক্ষেপ নিবৃত্তি (মধু)। বিষয় চেষ্টা নিবৃত্তি হেতু প্রসাদ (বলদেব)।

সুখ—মোক্ষানন্দ (মধু)।

(৬৭)—এই শ্লোকের অর্থরূপ যদি কোন একটী ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ নিবৃত্তি হইতে বাকি থাকে, তাহা হইলে, ইহাই মনকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া শেষে বুদ্ধি পর্য্যন্ত বিচলিত করিতে পারে। সুতরাং সকল ইন্দ্রিয় গুলিকেই প্রথমে সংযত করিতে হইবে—নিগৃহীত করিতে হইবে। ইহা পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে।

হরণ—বাহ্য ইন্দ্রিয় বিষয়ে প্রবর্ত্তিত—সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয় (রামানুজ, মধু)। বিক্ষিপ্ত বা বিচলিত করে (স্বামী), নষ্ট করে (শঙ্কর)।

(৬৯) নিশার আঁধার—অজ্ঞানান্ধকারে বা মায়ায় মোহিত হইয়া, অবিবেকী আত্মজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অন্ধকারবৎ দর্শন করে, অথবা তাহার কিছুই দেখিতে পায় না। বিবেকীরা সেই মোহাবরণ না থাকায় আত্ম

পশে বারি বারিধি অন্তরে
করে পূর্ণ তারে ;—তবু স্থির
রহে সিন্ধু—নহে উচ্ছ্বলিত ;—
সেইরূপ কামনা সকল
পশে যাহে—লভে শান্তি সেই ;—
কামী কভু শান্তি নাহি পায়। ৭০
যে পুরুষ করি ত্যাগ কামনা সকল,
নির্ম্মম নিস্পৃহ হয়ে, ত্যজি অহঙ্কার
করে বিচরণ, সেই—শান্তি করে লাভ। ৭১
ব্রহ্মে-স্থিতি এই পার্থ! যাহা প্রাপ্ত হলে
নাহি থাকে মোহ আর। অন্তিমেও ইথে
হলে অবস্থান—হয় ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ। ৭২

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

দর্শন করে (স্বামী)। এই তমোগুণজাত অন্ধকার বা অজ্ঞানমোহ সকল ভূতেই বা সকল জীবেই অবিবেক উৎপাদন করে বলিয়া ইহাকে রাত্রির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এই অজ্ঞানরূপ নিদ্রায় লোকে অভিভূত বা নিদ্রিত থাকে—কিন্তু যোগী অজ্ঞান দূর করিয়া সে নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়—তাহার আত্ম সাক্ষাৎকার হয়। আর এই অবিবেকী লোকেরা বাহ্য ইন্দ্রিয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকে—ও তাহাতেই কেবল মনস্থির করে—যোগী সে সকল বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করিয়া, তাহা একেবারেই অনুভব করে না—বা সে বিষয় সম্বন্ধে নিদ্রিত থাকে (স্বামী)। অথবা যোগী সংসারকে স্বপ্নময় ভাবেন—অবিবেকী তাহাকে সত্য মনে করে (শঙ্কর)। আত্মনিষ্ঠ আত্ম বিষয়ে বুদ্ধি সর্ব্বভূতে অপ্রকাশিত, আর ইন্দ্রিয় বিষয় বুদ্ধি সংযমীর নিকট অপ্রকাশিত (রামানুজ)।

সংযমী—যিনি যোগের অষ্টাঙ্গ সাধন করিয়া সমাধি লাভ করিতে করিয়াছেন। কোন ব্যাপারের প্রতি ধারণা ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ মানস প্রক্রিয়া প্রয়োগ করাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। পাতঞ্জল দর্শনে আছে—"ত্রয়মেকত্র সংযমঃ"। (৩।৪) এই সংযম হইতে প্রকাশ স্বভাব নিশ্চল উৎকৃষ্ট বুদ্ধির আলোক আবির্ভূত হয়, "তজ্জয়াৎপ্রজ্ঞালোক" (পাতঞ্জল দর্শন ৩।৫)

চণ্ডীর ১ম অধ্যায়ের ৩৫শ্লোকে কতকটা এইরূপ। যথা—

দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিন স্তুল্য দৃষ্টয়ঃ॥

(৭০) পশে যাহে—অর্থাৎ কামনা যাহাকে আদৌ বিচলিত করিতে পারে না। (শঙ্কর) প্রারব্ধ কর্ম্মবশে প্রবেশ করে (মধু)।

কামনা—অর্থাৎ প্রারব্ধাকৃষ্ট বিষয় (বলদেব)

(৭১) বিচরণ—কেবল জীবমাত্র চেষ্টা দোষ হইরা পর্য্যটন করে (শঙ্কর)।

প্রকৃত সাংখ্যজ্ঞানী সমাধিযুক্ত নির্ব্বিকল্প যোগী ব্যতীত এরূপ অহংভাবদূর করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে না। অভিমানই অহঙ্কার (পাতঞ্জল দর্শন)।

বিবরণ—প্রারব্ধ কর্ম্ম বশে বিষয় ভোগ করে। (মধু) ইহা সুসঙ্গত অর্থ বলিয়া বোধ হয় না।

(৭২) ব্রহ্মে স্থিতি—মূলে আছে—"ব্রাহ্মী স্থিতি"। ব্রহ্ম জ্ঞান নিষ্ঠা (স্বামী) ব্রহ্ম প্রাপিকা কর্ম্মে স্থিতি। (রামানুজ ও বলদেব)। ব্রহ্মরূপে অবস্থান (শঙ্কর)

মোহ—সংসার প্রত্যাবর্ত্তন কারণ অজ্ঞান। (রামানুজ)

মধুসূদন বলেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ই গীতার সার। এই অধ্যায়েই সমস্ত শাস্ত্রার্থ ও ধর্ম্মতত্ত্ব একত্র মুদ্রিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায় গুলিতে তাহাই আরও বিস্তারিত করিয়া বুঝান হইয়াছে। প্রথম সাধন-মার্গে নিষ্কাম কর্ম্ম নিষ্ঠা—ফল অন্তঃকরণ শুদ্ধি। দ্বিতীয় শমদমাদি সাধন পূর্ব্বককর্ম্ম সন্যাস—জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ বেদান্তাদি হইতে জানিয়া পরম বৈরাগ্য প্রাপ্তি। তৃতীয়—ভগবদ্‌ভক্তি নিষ্ঠা। চতুর্থ জ্ঞান নিষ্ঠা—ফল জীবন্মুক্তি ও শেষ বিদেহ। এই সাধন মার্গের অনুকূল দৈবী সম্পদ ও তাহার অন্তরায়—আসুরী সম্পদ।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে "কর্ম্ম কর যোগযুক্ত হয়ে" বলিয়া যে নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা সূচিত হইয়াছে, তাহাই তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ কর বলিয়া যে কর্ম্মসন্যাস-নিষ্ঠা সূচিত হইয়াছে, তাহা পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে। তৎপরে শমপরায়ণ হও যে বলা হইয়াছে, তাহাতে ভগবদ্ নিষ্ঠা সূচিত হইয়াছে, এবং তাহা সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে। ১২ হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত যে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বা সাংখ্যজ্ঞান নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে, তাহা ত্রয়োদশে বিস্তারিত হইয়াছে। 'ত্রিগুণ বিষয় বেদ—ত্রিগুণাতীত হও' যে বলা হইয়াছে, সেই ত্রিগুণতত্ত্ব চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে। শ্রুতি শ্রোতব্য বিষয়ে নির্ব্বেদ হইবার যে বৈরাগ্য তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে, তাহা পঞ্চদশ অধ্যায়ে বুঝান হইয়াছে। 'দুঃখে অনুদ্বিগ্ন চিত্ত' বলিয়া যে দৈবী সম্পদ সূচিত হইয়াছে ও 'পুষ্পিত বচন' বলিয়া যে সেই সম্পদের বিরোধী আসুরী সম্পদ সূচিত হইয়াছে—তাহা ষোড়শ অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে। সেই আসুরী সম্পদ ত্যাগ করিয়া "দ্বন্দ্বহীন" ও নিত্য সত্ত্বস্থ হইবার উপায় সমস্ত শ্রদ্ধার কথা হইয়াছে, তাহা সপ্তদশ অধ্যায়ে বুঝান আছে। অষ্টাদশঅধ্যায়ে উক্ত সমস্ত বিষয় সঙ্ক্ষেপে একত্র পুনরুল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গীতার উপসংহার করা হইয়াছে।

অতএব এই দ্বিতীয় অধ্যায় মনোযোগ পূর্ব্বক বুঝিলেই সমস্ত গীতা শাস্ত্র বুঝা যাইতে পারে।

বিদ্যাপতি।

কবিকুলকেশরী বিদ্যাপতির পদাবলী প্রেমিকের প্রাণধন। সাধু বা সংসারী, বৃদ্ধ বা যুবা, শাক্ত বা বৈষ্ণব উৎকর্ণ হইয়া মৈথিল কবির কাকলী শ্রবণ করেন। পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা, পদামৃতসমুদ্র, পদসমুদ্র, গীতচিন্তামণি প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থে ও কীর্ত্তনীয়াদিগের মুখে প্রাচীন মহাজন পদাবলী সংগৃহীত ছিল। বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র প্রথমে তাহা ইংরাজী শিক্ষিত পাঠকের উপযোগী করিয়া প্রকাশিত করেন। সে আজ ২২ বৎসরের কথা, তখন বিদ্যাপতির নামও অবৈষ্ণব সাধারণে অবগত ছিল না। সেই অন্ধকারে জগদ্বন্ধু বাবু যে বিজ্ঞতা, যত্ন ও সুরসিকতা দেখাইয়াছিলেন, বিদ্যাপতির নামের সহিত তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে গ্রথিত রহিবে। তাঁহার পরে বাবু সারদাচরণ মিত্র ও বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিদ্যাপতির এক সংস্করণ প্রকাশিত করেন। এই সংস্করণ আর একবার বঙ্গবাসীর সত্বাধিকারী উদ্যোগী অধ্যবসায়শীল ও কৃতিমান বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার একখানি সংগ্রহ গ্রন্থে বিদ্যাপতির কয়েকটী পদ প্রকাশ করেন। আমার প্রেমহারে আমিও কয়েকটী পদ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন গ্রীয়ার্সন্ সাহেব মৈথিল ভাষায় কতকগুলি পদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির জীবনকালে তাঁহার পদাবলী মুদ্রিত হয় নাই। মুখে মুখে ও হাতের লেখা পুঁথিতে পদগুলি সংগৃহীত ছিল। য, ব, ণ, ল প্রভৃতি অক্ষরগুলি বিদ্যাপতির সময় হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক রূপান্তর ধারণ করিয়াছে। ছাপার সীসার অক্ষরে সীমাবদ্ধ হইয়া বাঙ্গলা অক্ষরের পরিবর্ত্তন প্রিয়তার হ্রাস হইয়াছে। বিদ্যা বুদ্ধি অনুসারে নকল করিবার সময় অনিচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় পাঠান্তর ঘটে। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলীর বিভিন্নপাঠ বিস্ময়ের বিষয় নহে। এবং ইহার মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত-পাঠ রুচি ও অভিজ্ঞতায় তাঁহার নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আমার পাঠ আমার বিশ্বাস ও শিক্ষা মত সঙ্গত বলিয়া আমার বোধ হইতে পারে। কিন্তু মতভেদ হইলে অন্যদিগকে তিরস্কার করিবার আমার অধিকার নাই। কোন একখানি পুঁথির পাঠ প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে সে পুঁথিখানি কতদিনের, কোথায় কি অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, অনুসন্ধান করিতে হয়। আত্মম্ভরিতার স্থান এখানে নাই। একটী পদ উদ্ধৃত করা যাউক :—

"বোলন রসিক বিলাসিনী ছোটি
করে ধরইতে কত করু না কোটী"

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাঁহার নব প্রকাশিত বিদ্যাপতি গ্রন্থে* পদটী এই রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি অন্য পাঠ দেখিয়াছেন, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনদিগের ব্যাখ্যা শুনিয়াছেন, অথচ এই পাঠ ধরিয়াছেন এবং বোলন শব্দ বোড়্ শব্দজ বলিয়া ইহার অর্থ বর, নাগর এবং কোটী শব্দে কুট + ঞ করিয়া কুটিলতা বুঝিয়াছেন। শব্দটী বোলন হইলে যে ছন্দপাত হয়, তাহা ভাবেন নাই বোধ হয়। বজন্ত

* শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদকৃত টীকা, কবির জীবনবৃত্তান্ত এবং বাঙ্গলা ও মৈথিলী ভাষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমেত।

শব্দটী বিহারে বল অন—ইংরাজী wর মত ব্‌টীর উচ্চারণ হয়—এই শব্দ হইতে অপ ভাষায় প্রোয়ন শব্দ হইয়াছে। কোটী অর্থে কুটিলতা করিলে রাধার প্রথম মিলনের রস ভঙ্গ হয়। কুটিলতা যাহাদের সম্ভব,তাহাদের সঙ্গে রাধার নাম করিলে বোধ হয় পাপ হয়। আমরা এ পদটী এইরূপে পড়ি :—

"বলবন রসিক বিলাসিনী ছোটি
করে ধরাইতে কত করুণা কোটী"

পাঠে যেমন অন্তর হয়, অর্থেও তেমনি অন্তর হয়। লোকে আপন রুচি, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে অর্থ বুঝে। অনেক সময়ে কবি স্বয়ং যে অর্থ অনুমান করেন নাই, সে অর্থও প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। বিশেষতঃ পাঠান্তর হইলেই অর্থান্তরের সম্ভাবনা হয়। এরূপ স্থলে পূজনীয় মনীষিগণকে অবজ্ঞা প্রদর্শন ধৃষ্টতা মাত্র।

বিদ্যাপতি যে সময়ে আবির্ভূত হন, সে সময়ে বাঙ্গলার ভাষা কিরূপ ছিল, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গ্রন্থাবলী ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ দ্বারা জানিবার উপায় নাই।

বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। তিনি ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে বিসফী নামক গ্রাম দান প্রাপ্ত হন। ভক্তিনিধি হারাধন দত্ত চণ্ডীদাসের একটী পদ হইতে অতি সুন্দর উপায়ে চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়াছেন। সে পদটি এই:—

"বিধুর নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ
নবহুঁ নবহুঁ রস ইহ পরিমাণ"।

এই পদটী ১৩২৫ শকে রচিত। বাঙ্গলা দেশে সংবৎ অপেক্ষা শকাব্দের চলন অধিক ছিল। এজন্য আমরা ইহা শকাব্দ গণ্য করিয়া লইলাম। আমাদের অনুমান সত্য হইলে, যে বৎসর বিদ্যাপতি বিসফী দানপ্রাপ্ত হন, সেই বৎসর চণ্ডীদাস এই পদটী লিখিয়া বলিয়াছিলেন :—

"পরিচয় সঙ্কেত অক নির্জ্জা
চণ্ডীদাস কয় কৌতুক কির্জ্জা।"

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার ভাষা—অপভাষা। পণ্ডিতের ভাষা সংস্কৃত—অপভাষা কি ছিল তাহা অনুমান সাপেক্ষ। জয়দেবের পদাবলী হইতে দেখা যায়, হিন্দী বাঙ্গলা মিশ্রিত একটী ভাষা পূর্ব্ব হইতে সাধারণ লোকে ব্যবহার করিত। পাল ও সেন বংশের সময় মিথিলা বাঙ্গলার এক অংশ ছিল। মিথিলার বর্ত্তমান ভাষা ভোজপুরী হিন্দী অপেক্ষা বাঙ্গলার অনেক নিকটবর্ত্তী। মিথিলার সমাজ তখন বাঙ্গলার আদর্শ। আহার ব্যবহারে অদ্যাপি মিথিলা বাঙ্গলার নিকটতর। সুতরাং মিথিলা ও বাঙ্গলার ভাষা—উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গলার ও রাঢ় দেশের ভাষা—প্রায় একরূপ ছিল অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলীতে দুই প্রকার ভাষা দেখা যায়—এক বীরভূমের বাঙ্গলা আর এক ব্রজবোলী। খাড়ী বোলী ও ব্রজবোলী হিন্দী দুই প্রকার। ব্রজবোলী বিহারের সকল হিন্দু বুঝিতে পারে এবং বাঙ্গালীরও বোধগম্য। এ "ব্রজবোলী" কোথা হইতে আসিল? ব্রিজি বা লিচ্ছবী নামে এক পরাক্রান্ত জাতি মিথিলায় বাস করিত। সে অনেক দিনের কথা। ইহারা ভোট দেশ হইতে এখানে আসিয়াছিল। সিদ্ধার্থ ইহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, বৌদ্ধপুরাবৃত্তে ইহাদিগের বিবরণ পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ কালে ইহারা মিথিলা ছাড়িয়া নেপালে গিয়া বাস করে। ইহাদের ভাষা বলিয়া কি মিথিলার ভাষার নাম "ব্রজবোলী" হইয়াছিল? বোধ হয় না। যখন সিদ্ধার্থের আবির্ভাব হয়, তখন গাথা ভাষা বিহারে প্রচলিত, তাহার

পর শত শত বৎসর পালিভাষা রাজত্ব করে। পালি ভাষা হইতে হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। ব্রিজিদের এখন কোন চিহ্ন মিথিলায় নাই। মিথিলাকে জনকভূম বা দ্বারবঙ্গ ভিন্ন ব্রজপুর নামে কেহ অভিহিত করে নাই। বোধ হয় মহাজনগণ ব্রজলীলা যে ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন, সেই কৃত্রিম ভাষার নাম ব্রজবোলী হইয়াছে। আপন লালিত্যে ব্রজবোলী সকলের প্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গ্রীয়ার্সন সাহেব বিদ্যাপতির যে সকল পদ মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহার কতকগুলির ভাষা ঠিক ব্রজবোলী নহে। আবার বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত কতকগুলি পদের ভাষা যেরূপ পরিষ্কার বাঙ্গলা, মিথিলায় কখন সে ভাষা প্রচলিত ছিল বিশ্বাস হয় না। ইহাতেই অনুমান হয়, একদিকে মৈথিলগণ বিদ্যাপতির ভাষা খাঁটি হিন্দীতে, অন্যদিকে বাঙ্গালীরা খাঁটি বাঙ্গলায় পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অথবা অন্য কবিগণ আপন রচনায় বিদ্যাপতির ভণিতা সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।

বস্তুতঃ বিদ্যাপতি কোন্ ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন, কোন্ পদটী বিদ্যাপতির প্রকৃত, এখনও নিঃসংশয়ে বলিবার সময় হয় নাই। কখন হইবে কি না কে বলিতে পারে? পদসমুদ্র প্রকাশিত হইলে * এ প্রশ্ন মীমাংসার কিছু সাহায্য হইবে। নিশীথ নিস্তব্ধতায় স্বর্গীয় সঙ্গীতের ন্যায় বিদ্যাপতির পদাবলী আমাদের চিত্তহরণ করিতেছে—কে গাইতেছে, কোথায় গাইতেছে—বাক্যগুলির অর্থ কি, আমরা বুঝি না, বুঝিবার প্রয়োজনও রাখি না, মধুরতায় মুগ্ধ হইয়া আছি। ব্যাকরণের বজ্র প্রহারে কাব্যবিশারদগণের আনন্দ হইতে পারে, মৈথিল ফলকে তড়িত জ্যোতি প্রতিবিম্বিত করিয়া পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় স্পর্দ্ধা করিতে পারেন কিন্তু স্বপনের সুখ মোহে। তড়িৎ জ্যোতি ও বজ্রনিনাদ বিদ্যাপতি হইতে শতক্রোশ দূরে থাকুক।

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সংস্করণে আমরা কয়েকটী নূতন পদ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারীগণ বিদ্যাপতির একটী নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। আমার নিকট কতকগুলি পদ আছে—যাহা কাব্য বিশারদের গ্রন্থে দেখিলাম না। কোন মুদ্রিত গ্রন্থে সে গুলি লিপিবদ্ধ হইবে আশা করিয়া এ স্থলে কয়েকটী প্রকাশিত করিলাম; এতদ্ভিন্ন আরো অনেক বাকী রহিল। সংগ্রহ গ্রন্থে সে গুলি প্রকাশ করা চলে, কিন্তু নব্যভারতের ন্যায় পত্রিকায় সে গুলি প্রকাশিত করা উচিত বোধ হয় না।

করতলে বয়ান শোভয়ে মুখচন্দ
কিশলয় মেলি জনু নব অরবিন্দ
অনুখণ নয়ানে গলয়ে জলধারা
খঞ্জন গিলি উগল মতিহারা
তুঁহু মানিনী পালটি না নেহারি
অরুণ পিব চাহি ঘোর আঁধিয়ারী
বিরল নক্ষত্র নভোমণ্ডল ভাস
অরুণ ত্যজি কো বিমুখ হাস
তরুণী তড়াগে ফুয়ল অরবিন্দ
ভুখিল ভ্রমর পিবই মকরন্দ
তেঁ অপরাধে মারু পাঁচ বাণ
ধনি ধরহ হরি রাখহ পরাণ
বিদ্যাপতি কহে কে নাহি জানে
আদর লাগি নারী করু মানে।

২

শুন সুন্দরি বিদগধ সুপুরুখ সোই
কানুক হৃদয় সবহুঁ হাম বুঝলুঁ কবহুঁ না বিছুরই তোই
এক দিবস হাম মথুরা সমাগমে পহুঁহি দরশন ভেলা
তুয়া কাহিনী যত পুন পুন পুছুত লোরে লোচন চরি গেলা
পীত নিচোলে নয়ন মুখ মোছই পুন পুন অচেতন হোই

* পণ্ডিতবর হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় এই-মাস হইতে খণ্ডে খণ্ডে পদসমুদ্র প্রকাশিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

উরপর পাণি হানি খিতি লুটই ফুকরি ফুকরি কত রোই
তুয়া বিনু রাত্রি দিবস নাহি জানয়ে অত এ বুঝনুঁ অনুমানে
তোহে বিছুরল বলি কবহুঁ না বোলবি সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে।

(৩)

ছেদল চম্পক পনস রসাল
রোপলুঁ শিমুল এরণ্ড মন্দার
গুণবতী পরিহরি কুযুবতী সঙ্গ
হার হিরণ্য ছাড়ি রাগ হি রঙ্গ
কি কহব রে সখি পামর বোল
পাথর ভাসল তল গেল সোল
পণ্ডিত গুণিজন দুখ অপার
আছয়ে মরম সুখে পরম গোঙার
বিদ্যাপতি কহে বিহি অনুবন্ধ
গণই গুণিজন মনে রহে ধন্দ।

৪

সুহই।

সহকার মুঞ্জর ভ্রমর গুঞ্জর কোকিল পঞ্চম গায়
দখিণ পবন বিরহ বেদন নিঠুর নাহ না আয়
সজনি কহ মোহে সোই উপায়
মধুমাসে যব মাধব আয়ব বিরহ বেদন যায়
একু বেরি হর ভসম করল তে শর নয়ন আগি
আহির কুলে পুন জনম লয়ল হামারি বধের ভাগী
অঙ্গজ আছল অনঙ্গ ভই গেল ধনু ভাঙল হাথ
নাহ নিরদয় ভাগি পলায়ল তোড়ল হামারি মাথ
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী আকুল না করহ চিত
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লছিমা দেবী সহিত।

৫

বালা ধানশী।

শুন শুন মাধব কর অবধান
তো বিনু দিবস রয়নী না জান
যতহুঁ কলানিধি সংপূরণ ভেল
ততহুঁ কলাবতী ছিন ভই গেল
নীল নলিনী লেই বব করি বায়
হৃদয়ে বহুত ভয় উড়ি জনি যায়
চল চল মাধব কর আগুসার
ইন্দু পুতল বনি না জীয়ব আর
ভণে বিদ্যাপতি শুন ব্রজরায়
ভুরিতে চলহ ধনি অরি জনি যায়।

৬

ধানশী।

সজনি গেল সে সব দিন
বয়েস গরবে যো কিছু কহলি সো সব রহিল চিন
দাঁত ভাঙ্গল থোথর খোয়ায়েল কামায়ল সাপ
বৈসল রহিয় সকল সহিয় ভাঙ্গল বীরক দাপ
গগন মণ্ডলে উগরে কলানিধি কত নিবারিব দিঠ
যখন যে হব তেজ্ঞি গোঙায়ব যে হব তা দিব পিঠ
সজনী না বোল বচন আন
বহুত বিপতি ধৈরয করব কবি বিদ্যাপতি ভাণ।

আজ কাল কোন কোন গ্রন্থকার গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কোন বিখ্যাত লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বা অনুরোধ পত্র লইয়া এক একখানি প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করেন। সাহিত্য-ব্যবসায়ীর দারিদ্র্য সকল যুগে ও সকল দেশে বিখ্যাত। কিন্তু এ দারিদ্র্যেও সাহিত্যসেবী আত্মসম্মান রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারা বীণাপাণির ভক্ত। আজ কাল ভণ্ড সাহিত্যসেবীর নীচতায় মস্তক অবনত হয়। যাঁহারা সাহিত্যের নামে প্রসংশাপত্র ভিক্ষা করিতে লোকের দ্বারস্থ হন, তাঁহারা যেমন মর্য্যাদাশূন্য, যাঁহারা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চক্ষুলজ্জায় প্রশংসাপত্র প্রদান করেন, তাঁহারা তেমনি দুর্ব্বলচিত্ত এবং উভয়েই সাহিত্যের শত্রু।

বিদ্যাপতির উপক্রমণিকায় দেখিলাম—

"কৃষ্ণের প্রীতির জন্য ইন্দ্রিয়াসক্তি ভক্তের মতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অঙ্গ।" "ফলতঃ এ বিষয়ে (রুচি) যদি কিছু দোষ থাকে সে দোষ বিদ্যাপতির নহে—বৈষ্ণব ধর্ম্মের। এই ধর্ম্ম প্রভাবেই তড়িত লতা অবলম্বনে অবতীর্ণ, নিষ্কলঙ্ক শশধর বিনিন্দিত রমণীবদন কিছু ক্ষণ দেখিয়া বিদ্যাপতির আশা পূর্ণ হয় নাই। "মদন জ্বালা" বাড়িয়াছিল। সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্বে মগ্ন হইয়াও এই ধর্ম্মের প্রভাবে তাঁহার ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।"

কাব্যবিশারদ মহাশয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম বেরূপ

বুঝিয়াছেন, সেইরূপই লিখিয়াছেন। এই পুস্তক খানি পড়িয়া বৈষ্ণব-চূড়ামণি বাবু শিশির কুমার ঘোষ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন দেখিয়া অবাক্ হইয়া আমার ও শিশির বাবুর একটী বন্ধু, তিনিও একজন ভক্ত বৈষ্ণব এবং সুলেখক, তাঁহাকে এ রহস্যের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, শিশির বাবু শাস্ত্রমত ব্যবহার করিয়াছেন।

"অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়া সদা হরি"

পাঠক, প্রশংসাপত্র গুলির অর্থ অনুভব করিবেন। বস্তুতঃ কাব্যবিশারদ মহাশয় পণ্ডিত, সুলেখক ও সাহিত্যপ্রিয়। তাঁহার অনুগ্রহপত্র সংগ্রহ দেখিয়া আমরা লজ্জিত হইয়াছি। যিনি বঙ্গ সাহিত্যের রথীগণকে ঘৃণার সহিত পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহাকে অন্যের দ্বারস্থ দেখিলে মন কেমন হয় বুঝা যাইবে।

কালীপ্রসন্ন বাবু অন্যের পাঠাশুদ্ধি ও অর্থাশুদ্ধি দেখিয়া হুঙ্কার করিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহার পাঠ ও আমাদের পাঠ কয়েকটী পদ হইতে উদ্ধৃত করিলাম এবং কয়েকটী পদের তাঁহার কৃত অর্থ ও আমাদের কৃত অর্থ তাঁহার ও পাঠকগণের সমালোচনার জন্য তুলিয়া দিলাম। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের পাঠ প্রথমে, তাহার পর আমার পাঠ। আমার পাঠ কোনটী স্বকপোল কল্পিত নহে। দুই শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি হইতে উদ্ধৃত।

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু সাঙর চিকুর ভার
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল পিছে করি আন্ধিয়ার।
রামাহে অধিক চন্দিম ভেল
কত না যতনে কত অদ্‌ভুত বিহি বহি তোহে দেল।

বিশারদ মহাশয় চন্দিম অর্থে কান্তি এবং বহি অর্থে উয়ো—উহা বুঝিয়াছেন। আমার অর্থ চন্দিম, চাঁদ, বহি শব্দ নিহি বা নিধি (রত্ন) হইবে।

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু সাঙল চিকুর ভার
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল, পিছে করি আন্ধিয়ার
রামাহে অধিক চন্দিম তুঁহু ভেল।
কতহুঁ যতনে কত অদ্‌ভুত বিহি নিহি তোহে দেল।

(৭)

যব গোধুলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পশারিয়া গেলি।

বিশারদ মহাশয় দ্বন্দ্ব শব্দে যুগ্ম বা কলহ বুঝিয়া দুইটী স্বতন্ত্র অর্থ করিয়াছেন (ক) নবজলধর ও বিজলী লেখার মিলন সম্পন্ন করিয়া গেল। (খ) নবজলধর সম্ভূত যে বিদ্যুৎ তাহার সহিত কলহ বিস্তার করিয়া গেল অর্থাৎ সেই বিদ্যুল্লেখা অধিক রূপবতী কি রমণী অধিক রূপবতী, এই বিবাদের বিস্তার বা সূত্রপাত করিয়া গেল।

যব গোধুলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধর বিজুরি রেহা ধন্দ পশারিয়া গেলি।

বিদ্যুতের আলোতে চোখে ধান্দা লাগে। সন্ধ্যার অন্ধকারে বিদ্যুতের মত কি চলিয়া গেল, চোখে ধাঁধা লাগিল, ঠিক যেন বুঝা গেল না।

(৮)

সিংহ জিনিয়া মাঝারি খিনি, তনু অতি কোমলিনী
কুচ ছিরি ফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়ন বর
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর
বলি অর্থ—বলিয়া।

শিরিষ কুসুম তণি, সিংহ জিনি মাঝা খিনি
কুচ ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি
কাজরে রঞ্জিত কিয়ে ধবল নয়নবর
ভ্রমর ভুলল জনু বিকচ কমলোপর।

(৯)

আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাঁসি, আধ হি নয়াম তরঙ্গ
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি তব ধরি দগধে অনঙ্গ
একে তনু গোরা কনক কটোরা অতনু কাঁচলা উপাম
হারে হরি নব কম জনু বুঝি ঐছন ফাঁস পসারল কাম।

অতনু কাঁচরা উপাম—মদন কাঁচুলি সদৃশ হইয়াছে।
হারে হরি লব মন—হারে যেন মন হরিয়া লয়।
আধ আঁচর খসি আধ বদনে হাসি আধ হি নয়ান তরঙ্গ
আধ উরজ হেরি গেলি পুরুথ বধি অন্তর দগধে অনঙ্গ
একে তনু গোরা কনক কটোয়া ওতনু কাঁচর উপাম
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন ফাঁস পসারল কাম।

(১৪)

অলখিতে হাম হেরি বিহসিলি থোরি
জনু রজনী ভেল চান্দ উজোরি।

অর্থ—কবির তুলনায় কামিনী যামিনীর সদৃশ, হাস্য কৌমুদী তুল্য। সাদৃশ্য কিসে দেখাইলে ভাল হইত। রাধা কি রাত্রির মত কৃষ্ণবর্ণা ? আমার পাঠ এইরূপ :—

অলখিতে হামে হেরি বিহসিল থোরি
জনু বয়ান ভেল চাঁদ উজোরি।

এই পদটীর আর এক স্থানেও অশুদ্ধ পাঠ উদ্ধৃত করা হইয়াছে বোধহয়,

তৈ ভেল বেকতপয়োধর শোভা
কনক কমল নাহি কাহে মনোলোভা

অর্থ—কনককমলে কার মন না মোহিত হয় ? আমার পাঠ এই—

তেঁ ভেল বেকত পয়োধর শোভা
কনক কমল হেরি কাহে না লোভা।

এই পদটীর শেষভাগে আমার পুঁথিতে দুইটী নূতন ছত্র আছে। বিশারদ মহাশয়ের গ্রন্থে পাইলাম না।

সে সব অমুল নিধি দেগলি সন্দেশ
কিছুই না রাখলি রস পরিশেষ।

আর অধিক পদ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। এইরূপ ভিন্ন পাঠ ও ভিন্ন অর্থ অনেক পদে পাওয়া যায়। বিশারদ মহাশয় সূচিপত্র না দেওয়াতে তুলনা করিবার বড় অসুবিধা হইয়াছে।

পাঠ ও অর্থসম্বন্ধে ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও বলিতে হয়, বিদ্যাপতির এই নূতন সংস্করণে অনেকগুলি নূতন পাঠ একত্র থাকাতে পাঠকের সুবিধা হইয়াছে। পুস্তক থানি প্রকাশিত করিতে কাব্যবিশারদ মহাশয় পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছেন। তজন্য তিনি আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়।

কৈফিয়ৎ।

বিগত আষাঢ় ও ভাদ্র মাসের নব্যভারতে "ঐতিহাসিক মীমাংসা" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য যথাসাধ্য সংক্ষেপে নিম্নে প্রদান করিলাম।

গতবর্ষের আশ্বিন মাসের নব্যভারতে বাবু চারু চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মতের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে আমার বিরুদ্ধে প্রথম লেখনী চালনা করেন। উক্ত প্রবন্ধে "শ্রীমান্ সখারাম গণেশের" প্রতি একটু তীব্র ব্যঙ্গ ও অশিষ্ট ভাষা প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। বিগত চৈত্র মাসের নব্যভারতে আমার স্বীয় মতের সমর্থন জন্য "মগধের রাজবংশ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করি, তাহাতে চারু বাবুর মতের প্রতিবাদ ছিল। যদিও "সকলের মতের প্রতিবাদ করিয়া" বেড়ান আমার অভ্যাস, তথাপি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, দৃষ্ট হয়। আশ্বিন মাসের নব্যভারতে চারুবাবুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হই-

বার পূর্ব্বে, আমি তাঁহার বিরুদ্ধে কখনও কিছু লিখি নাই, লেখা আবশ্যকও মনে করি নাই। চারুবাবুই প্রথমে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিয়াছেন। "যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল" প্রবন্ধে চারুবাবু তাঁহার প্রতিবাদিগণের প্রতি যে সকল শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, চৈত্রমাসের নব্যভারতে সেই বাক্যগুলির অধিকাংশ আমি চারুবাবুর সম্বন্ধে যথাযোগ্য স্থলে ব্যবহার করি।

সত্য বটে আমি ("জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া" অথবা "সত্যের অনুরোধে") তর্করত্ন-মহাশয় ও কানাই বাবুর মতের বিরুদ্ধে আমার যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা হিতবাদী, তত্ত্ববোধিনী ও ভারতীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে তাঁহাদের প্রতি "ব্যাসদেবের গ্রীবাভঙ্গের" দোষারোপ, অথবা শ্লেষবাক্য বা অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করি নাই। তাঁহাদের মতের যে সকল অংশ আমার নিকট অসঙ্গত বোধ হইয়াছিল, আমি যথাসাধ্য সরলভাষায় তাহারই বিরুদ্ধে যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সুখের বিষয়, তাঁহারা আমার আপত্তি নিচয়ের উত্তর প্রদান কালে সরলতা, ধীরতা ও মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহার পর বিগত বর্ষের আশ্বিন মাসের নব্যভারতে চারুবাবুর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এই প্রথম পরিচয় কালেই তিনি আমার সহিত যেরূপ শিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে ভদ্রতা ও উদারতার নিতান্ত অভাব ছিল, একথা আমি নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি। তাহার পর, তাঁহার তাদৃশ ব্যবহার স্মরণ করিয়া বিগত চৈত্র মাসের নব্যভারতে আমি তাঁহারই কথাগুলি পাল্টাইয়া তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করি। ইহা যে সম্পূর্ণ সুনীতি সঙ্গত হইয়াছিল, একথা বলি না। কিন্তু চারুবাবু যদি প্রথমেই ধীরতা ও শিষ্টতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আজ তাঁহাকে ও আমাকে এতটা বিভ্রাটে পড়িতে হইত না।

পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে রাজতরঙ্গিণীর মতকে প্রামাণিক বলিয়া মনে করিতাম। পরে মনোযোগের সহিত মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতাদি পাঠ করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্বাপরান্তে অর্থাৎ কলি প্রবৃত্তির আনুমানিক সাত আট বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন ও কলির প্রথম শতাব্দীর তৃতীয় পাদের মধ্যভাগে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের মধ্যভাগে বা মগধাধিপতি মহারাজ নন্দের রাজ্যাভিষেকের ১৫ শত বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমর সংঘটিত হয়। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে আমার যাহা বক্তব্য তাহা ইতিপূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, হিতবাদী ও ভারতীতে প্রকাশ করিয়াছি।

ইহার পূর্ব্বে তর্করত্ন মহাশয়ের পুরাবৃত্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ হয়, এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কারণ, তখনও স্বয়ং এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে কিছু আলোচনা করি নাই। ইহার অল্পকাল পরে, (১২৯৯ সালের আষাঢ় মাসে) যুধিষ্ঠিরের সময় সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে ও বিশিষ্ট মনোযোগের সহিত সমস্ত পুরাণাদি আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী প্যারাগ্রাফে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বিগত আড়াই কি তিন বৎসরের মধ্যে এরূপ কোনও প্রমাণ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত পরি-

ত্যাগ করিতে পারি। সুতরাং এই আড়াই কি তিন বৎসরের মধ্যে এ সম্বন্ধে আমার মতেরও কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

কিন্তু চারুবাবু বলেন, ইতিমধ্যে আমি নাকি ৩।৪ বার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছি। তিনি বলেন ;—

"সত্যের অনুরোধেই তিনি তর্করত্ন মহাশয়ের "পুরাবৃত্ত" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া যুধিষ্ঠিরের স্থিতিকাল দ্বাপরান্তে সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। এইরূপ সত্যের অনুরোধেই তিনি কানাই বাবুর মত সমালোচনা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কলির প্রথম শতাব্দীতে আনিয়াছিলেন। * * * * আজ ছ মাস হয় নাই, তিনি যুধিষ্ঠিরকে কলির প্রথম শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আর ইহারই মধ্যে আবার কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে (নন্দাভিষেকের ১৫ শত বৎসর পূর্ব্বে) ধর্ম্মরাজকে আনিতেছেন। কি সুন্দর সত্যের অনুরোধ!"—নব্যভারত দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভ।

তাঁহার এই উক্তি যে সত্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত, তাহা দেখাইবার জন্য, গত আড়াই বৎসরের মধ্যে যে তিন প্রবন্ধে যুধিষ্ঠিরের সময় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

১। (ক)—"এই সকল প্রমাণে জানা গেল, বিষ্ণু পুরাণের মতে শ্রীকৃষ্ণ (ও যুধিষ্ঠির) দ্বাপরের শেষে জন্মগ্রহণ ও কলির প্রথম শতাব্দীর শেষে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। * * * *

(খ) কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, বিষ্ণুপুরাণের মতে, যুধিষ্ঠিরাদি কলির ১ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ভাগবতের মতও বিষ্ণুপুরাণ হইতে ভিন্ন নহে। * *

(গ) ইহা দ্বারাও (গর্গসংহিতার বচনের দ্বারাও) যুধিষ্ঠিরাদির কলির প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমানতা প্রমাণিত হইতেছে।" হিতবাদী ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯২ সাল।

২। (ক) "ইঁহারা সকলেই (শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি) দ্বাপরযুগের শেষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। * * (খ) কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি কলির প্রথম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (অর্থাৎ বর্ত্তমান ছিলেন) স্বীকার করিলে, উল্লিখিত আশঙ্কা সমূহ নিরাকৃত হয় ও মহাভারতের সহিতও বিরোধ হয় না। * * * (গ) নন্দের ১৫ শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ২৬ বৎসর পরে (১) পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ হয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, পৌরাণিক মতে ৪২৬+১৫০০—২৬=১৯০০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ হয় ও তাহার একশত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দে কলিযুগের আরম্ভ হয়।" —তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১২৯৯ সাল ১৪৮।৯।

৩। "এখন আমাদের ধারণা, কলির প্রথম শতাব্দীতে যুধিষ্ঠির বিদ্যমান ছিলেন।"—ভারতী ১৭শ ভাগ, ভাদ্র—"যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল" ২৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাঠকগণ দেখিবেন, হিতবাদীর (খ) চিহ্নিত উদ্ধৃতাংশের সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার (ক) চিহ্নিত অংশের ও ভারতীতে প্রকাশিত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। হিতবাদীর (ক) চিহ্নিত অংশ পাঠ করিলে, পাঠক তত্ত্ববোধিনীর (ক) ও (খ) চিহ্নিত অংশের একবাক্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তত্ত্ববোধিনীর (গ) চিহ্নিত অংশ পাঠ করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, আমি যাহাকে "পৌরাণিক মতে কলির প্রথম শতাব্দী" বলি, চারু বাবু (ও পঞ্জিকাকারগণ) তাহাকেই কলির দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব হয়" একথা আমি (১২৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের পর

(১) আমি যখন এই প্রবন্ধ রচনা করি, তখন যে মহাভারত আমার কাছে ছিল, তাহাতে দুই স্থলে ২৬ বৎসর ও একস্থলে ৩৬ বৎসরের কথা লিখিত ছিল। এখন বোম্বাই সংস্করণও অপর দুই একখানি মহাভারতে সর্ব্বত্র ৩৬ বৎসর লিখিত আছে, দেখিতেছি। এতদনুসারে ১৮৯০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ ধরিতে হইবে।

আর) কুত্রাপি বলি নাই। সুতরাং "ইঁহারই মধ্যে আবার কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে ধর্ম্মরাজকে আনিতেছেন।" একথা ভিত্তিহীন।

উল্লিখিত প্রবন্ধত্রয় ব্যতীত বিগত আড়াই বৎসরের মধ্যে আমি যুধিষ্ঠিরের সময় সম্বন্ধে আর কোনও প্রবন্ধ লিখি নাই। এই প্রবন্ধত্রয়ে যে সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাতে ভ্রম থাকিতে পারে, কিন্তু পরস্পর বিরোধ বা "দ্রুতগতিতে মত পরিবর্ত্তনের" প্রমাণ কোথায়? চারুবাবু যে মিথ্যা কথার অবতারণা করিয়া তাঁহার প্রতিপক্ষকে সাধারণের নিকট অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এমন আমরা বলি না; কিন্তু যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি ধারণ করিয়া "ঐতিহাসিক মীমাংসা" করিতে বসেন, তাঁহার এ সকল বিষয়ে আরও একটু সতর্ক হইয়া লেখনী ধারণ করা কর্ত্তব্য।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে, যুধিষ্ঠিরের বয়স কত ছিল, মহাভারতে তাহা কোথাও সুস্পষ্ট কথিত হয় নাই। দ্রোণপর্ব্বের ১২৫ অধ্যায়ের এক স্থলে লিখিত আছে যে, মৃত্যুকালে দ্রোণাচার্য্যের বয়স ৮৫ বৎসর ছিল।

"আকর্ণ পলিতঃ শ্যামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ।
রণে পর্য্যচরৎ দ্রোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শ বর্ষবৎ॥"

যুধিষ্ঠির দ্রোণের শিষ্য; সুতরাং তিনি দ্রোণের অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৭০ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন, অনুমান করা অসঙ্গত নহে। মহাভারত-কারের উক্তির উপর স্থাপিত আমার এই অনুমানকে চারুবাবু 'দেউস্কর মহাশয়ের স্বকপোল কল্পিত, ভিত্তিহীন ও নবাবিষ্কৃত" বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার উত্তরে মৌনাবলম্বন করাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করি। (২)

এ সকল বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া, এখন আসল কথা পাড়া যাউক্। চারু বাবু বলেন, জরাসন্ধ-পৌত্র সোমাপির পরবর্ত্তী ভূপালগণের রাজ্যভোগ কাল "ছয় শত বৎসরের অধিক নহে।" আমার বিবেচনায় এই মত পুরাণবিরুদ্ধ। বিগত চৈত্র মাসের নব্যভারতে বায়ু, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে বার্হদ্রথ বংশীয় নৃপতিগণের বংশ তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, সোমাপি—যিনি ভারত সমরের অব্যবহিত পরেই মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার সময় হইতে উক্ত বংশীয় শেষ নরপতি রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত বার্হদ্রথ রাজগণের রাজত্বকাল হাজার খানেক বৎসর। অর্থাৎ বায়ুপুরাণ মতে ৯২১ বৎসর, মৎস্য মতে ৯৩৫ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণানুসারে ৯১৯ বৎসর। বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে সামান্যতঃ সহস্রবৎসর বলা হইয়াছে। চারিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা সম্বন্ধে ৬০ বা ৭০ বৎসর লইয়া এইরূপ সামান্য মতভেদ বা অনৈক্য ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। যাহা হউক, বায়ু, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে সোমাপির রাজত্বকাল ৫৮ বৎসর। সুতরাং সোমাপির পরবর্ত্তী ভূপালগণের স্থিতি কাল মৎস্য মতে (৯৩৫ – ৫৮ =) ৮৭৭ বৎসর, বায়ুমতে (৯২১ —৫৮ =) ৮৬৩ বর্ষ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে (৯১৯ – ৫৮ =) ৮৬১ বৎসর। অর্থাৎ মোটের

(২) কুন্তীর বয়স সম্বন্ধে চারুবাবু যে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহার উত্তরে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, মহোদয় একদিন বলিতেছিলেন যে, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী গ্রহণ (বা গৌতম বংশীয়া জটিলার সপ্তস্বামী ও মুনিকন্যা বার্ক্ষীর দশ স্বামী গ্রহণ) যদি তাৎকালীন আর্য্যসমাজের অননুমোদিত না হয়, তবে বয়োজ্যেষ্ঠা কুন্তীর সহিত দ্রোণাচার্য্যের বিবাহ পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে কেন?

উপর ৮৬০ বৎসরের কম নহে। কিন্তু চারুবাবু বলেন, ছয় শত বর্ষের অধিক নহে। কাজেই আমার বিবেচনায় তাঁহার মত পুরাণ-বিরুদ্ধ। এ সম্বন্ধে চারুবাবু এপর্য্যন্ত যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এমন কোনও যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই, যদ্দ্বারা তাঁহার মতের সহিত এই পৌরাণিক মতের একবাক্যতা সাধিত হইতে পারে।

চারুবাবু "আপাততঃ" দেখাইতে চান্ যে, "দেউস্কর মহাশয় বার্হদ্রথ ভূপতিগণের যে রাজ্যকাল উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদপেক্ষা ন্যূন সংখ্যা ঐ তালিকা হইতেই সংগ্রহ করিতে পারা যায়"। তিনি বলেন, বিষ্ণুপুরাণে যে ভবিষ্য রাজগণের কথা বলা হইয়াছে, সোমাপি তাঁহাদের প্রথম নহেন,—তৎপৌত্র অযুতায়ুই প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্য রাজগণের প্রথম। বিষ্ণু পুরাণের ৪র্থ অংশের ১৯শ অধ্যায়ের উপসংহারে, বার্হদ্রথ বংশীয় অতীত ভূপালগণের নাম কীর্ত্তন কালে, সোমাপি পুত্র শ্রুতশ্রবার নাম উল্লেখিত হইয়াছে দেখিয়া চারুবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিষ্ণু পুরাণ অযুতায়ুর সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে—শ্রুতশ্রবার রাজত্বকালে রচিত হইয়াছে; এবং সেই জন্যই তিনি অযুতায়ুকে ভবিষ্য নরপতিগণের আদি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ২১ অধ্যায়ের প্রারম্ভে পুরাণকার যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে, সোমাপির রাজত্বকালে—সোমাপির মৃত্যুর অন্যূন ৯। ১০ বৎসর পূর্ব্বে বা ভারতসমরের প্রায় ৫০বৎসর পরে) বিষ্ণু পুরাণ রচিত হয়। ঐ একবিংশ অধ্যায়ের প্রারম্ভ এইরূপ,—

"পরাশর উবাচ। অতঃপরং ভবিষ্যানহং ভূমিপালান্ কীর্ত্তয়িষ্যে। যোঽয়ং সাম্প্রতমবনীপতিঃ তস্যাপি জনমেজয় শ্রুতসেনোগ্রসেন ভীমসেনাঃ পুত্রাশ্চত্বারো ভবিষ্যন্তি।"

অস্যার্থঃ।—পরাশর বলিলেন,—"অতঃপর ভবিষ্য ভূমিপালগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি। সম্প্রতি যিনি পৃথিবী শাসন করিতেছেন, তাঁহার জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন নামক চারি পুত্র জন্মিবে।"

এতদনুসারে জনমেজয়াদি ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের জন্মের পূর্ব্বেই বিষ্ণুপুরাণ রচিত হইয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। মহাভারত মতে, ভারত সমরের ৬০ বৎসর পরে পরীক্ষিতের মৃত্যুহয়। যে বৎসর পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরই তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ভীমসেনের জন্ম হইয়াছিল, স্বীকার করিলেও, তাঁহার মৃত্যুর অন্ততঃ ৮। ৯ বৎসর পূর্ব্বে তদীয় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র জনমেজয় ভূমিষ্ঠ হয়েন, স্বীকার করিতে হইবে(৩)। বিষ্ণুপুরাণ ইহারও পূর্ব্বে অর্থাৎ পরীক্ষিতের মৃত্যুর অন্ততঃ ১০। ১২ বৎসর পূর্ব্বে (ও সোমাপি, যিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ৫৮ বৎসর পরে ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তাঁহার মৃত্যুর অন্যূন ৯। ১০ বৎসর পূর্ব্বে) রচিত হয়। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণে যাঁহারা বার্হদ্রথবংশীয় ভবিষ্য ভূপাল নামে অভিহিত হইয়াছেন, অযুতায়ু তাঁহাদের প্রথম না হইয়া, সোমাপি পুত্র শ্রুতশ্রবাই তাঁহাদিগের প্রথম রূপে পরিগণিত হওয়া উচিত।

বিষ্ণু পুরাণের ৪র্থ অংশের ১৯ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে,—"জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, তৎপুত্র সোমাপি, তৎপুত্র শ্রুতশ্রবা"। কিন্তু ২১ অধ্যায়ে পরীক্ষিত পুত্র জনমেজয় ভবিষ্য নরপতিগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। অতএব ইহাই সম্ভব বোধ হয় যে, বিষ্ণুপুরাণ রচিত হইবার অন্ততঃ ২।১ বৎসর (বা সোমাপির মৃত্যুর ১০। ১২বৎসর) পূর্ব্বে শ্রুতশ্রবার জন্ম হইয়াছিল (এরূপ হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভবও নহে) বলিয়া ১৯ অধ্যায় জরাসন্ধের

(৩) এখানে বলা আবশ্যক, মহারাজ পরীক্ষিৎ একাধিক দার পরিগ্রহ করেন নাই।

বংশ কীর্ত্তন কালে শ্রুতশ্রবার নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এবং শ্রুতশ্রবার জন্মগ্রহণের ও বিষ্ণুপুরাণ রচনার কিছুদিন পরে জনমেজয়ের জন্ম হইয়াছিল, এই কারণে তাঁহার জন্মঘটনা ভবিষ্য বংশ বর্ণন স্থলে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ সামঞ্জস্য করিয়া না লইলে,উক্ত উভয় অধ্যায়ের বিরোধের নিরাস হয় না।

এই সকল কথার বিচার করিয়া আমি এ বিষয়ে শ্রীধরস্বামীর মতানুসরণ ও অযুতায়ুকে বার্হদ্রথবংশীয় ভবিষ্য নরপতিগণের প্রথম স্থান প্রদান করি নাই। নতুবা যে, "পুস্তক উদ্‌ঘাটন করিয়া যাহা" দেখিয়াছি, "তাহাই প্রামাণিক মনে" করিয়াছি ও "বিতণ্ডা করিবার ইচ্ছা এত প্রবল হইয়াছিল যে,শ্রীধর স্বামীর টীকা দেখিবারও (আমার) অবকাশ হয় নাই," তাহা নহে। চারুবাবু এ সকল কথা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই,এবং আমার প্রতি অকারণে নানা প্রকার ব্যঙ্গ ও অশিষ্টতাপূর্ণ বাক্যাবলী বর্ষণ করিয়া স্বীয় জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন।

আমার বিবেচনায়, সোমাপিই বিষ্ণুপুরাণবর্ণিত ভবিষ্য বার্হদ্রথ ভূমিপালগণের প্রথম। কারণ উক্ত পুরাণে স্পষ্টই লিখিত আছে,—

"জরাসন্ধসুতাৎ সহদেবাৎ সোমাপিঃ ভবিষ্যতি।"

অর্থাৎ "জরাসন্ধসুত সহদেব হইতে সোমাপি জন্মগ্রহণ করিবেন।"

ভাগবতকারও স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে, "ভবিতা সহদেবস্য মার্জ্জারি যৎশ্রুতশ্রবা"।

অর্থাৎ সহদেবের মার্জ্জারি (অপর নাম সোমাপি) নামক একপুত্র হইবে। মার্জ্জারি বা সোমাপি যদি ভবিষ্য রাজগণের প্রথমই না হইবেন, তবে পুরাণকারগণ "ভবিষ্যতি" ও "ভবিতা" এই ভবিষ্য-বোধক ক্রিয়া পদ ব্যবহার করিয়াছেন কেন?

এস্থলে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণকারগণ স্ব স্ব প্রণীত পুরাণের প্রাচীনত্ব খ্যাপন জন্য আপনাদিগকে পরাশর, মৈত্রেয় বা শুকদেবের স্থলাভিষিক্ত এবং পরীক্ষিতের সমসাময়িক ও ভবিষ্যদ্বক্তা বা ত্রিকালজ্ঞরূপে পরিচিত করিতে যাইয়াই এই সকল স্থলে একটু গোল বাধাইয়াছেন, এইরূপ আমার বিশ্বাস। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত পুরাণ সমূহে বর্ণিত বংশানুচরিতগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধঘটনাকে কেন্দ্র স্বরূপ করিয়া অতীত ভূপালগণের চরিত কীর্ত্তন ও ভবিষ্য (অর্থাৎ ভারতসংগ্রামের পরবর্ত্তী) রাজবংশ সমূহের স্থিতিকাল নির্দ্দেশ করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতসংগ্রামরূপ একটি অতি প্রসিদ্ধ যুগচিহ্নস্বরূপ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্রস্বরূপে গ্রহণ করত কাল নির্ণয় করা বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়াই প্রাচীনগণ উক্ত ঘটনার পর হইতে (বা পরীক্ষিতের জন্ম কাল হইতে) সময় গণনা করিতেন। এই কারণে, বিষ্ণুপুরাণকার আপনাকে সোমাপির ও ভাগবতকার আপনাকে পরীক্ষিতের মৃত্যু কালের (বা মগধপতি শ্রুতশ্রবার) সমসাময়িক রূপে পরিচিত করিয়াও, বার্হদ্রথবংশীয় অবশিষ্ট নরপতিগণের স্থিতিকাল নির্দ্দেশ স্থলে, ভারত যুদ্ধের অব্যবহিত পরে অভিষিক্ত সোমাপিকেই ভবিষ্যবংশের আদিপুরুষ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আর একটি উদাহরণ একথার প্রমাণ স্বরূপে এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনানুসারে ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যু হস্তে নিহত হয়েন, এবং তাঁহার অব্যবহিত পরেই তৎপুত্র "বৃহৎক্ষণ" অযোধ্যার রাজ-

সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, ভারতসমরের প্রায় ৫০ বৎসর পরেও (বা পরীক্ষিতের মৃত্যুর দশ বার বৎসর পূর্ব্বে) পরাশর কর্ত্তৃক বিষ্ণুপুরাণ কথিত হয়। অন্ততঃ বিষ্ণুপুরাণকার এইরূপ ভাবেই আত্ম পরিচয় প্রদান ও স্বীয় গ্রন্থরচনার সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভবিষ্য ভূপালগণের নামকীর্ত্তন কালে বৃহৎক্ষণ-পুত্র "গুরুক্ষেপের" নামই প্রথমে উল্লেখিত হওয়া উচিত। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণকার ৪র্থ অংশের ২২ অধ্যায়ে বৃহৎক্ষণকেই ভবিষ্য ভূপালগণের প্রথম বা আদিরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার দ্বারাও আমার পূর্ব্বানুমিত সিদ্ধান্তেরই দৃঢ়ীকরণ হইতেছে। ফল কথা, বিষ্ণুপুরাণ যে সময়েই রচিত হউক না কেন, ভারতসমরের পারভবিক নৃপতিগণই যে উহাতে ভবিষ্য বংশীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, এবিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। এই জন্যই, স্বয়ং বিষ্ণুপুরাণকার "ভবিষ্যতি"এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দ্বারা সোমাপিকে ভবিষ্যবংশীয়গণের মধ্যেই গণনা করিয়াছেন।

এখন চারুবাবু বুঝিবেন যে, কেন আমি অযুতায়ুকে পরিত্যাগ করিয়া সোমাপিকে ভাবী বার্হদ্রথ ভূপালগণের প্রথম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। যাহা হউক, সোমাপি প্রভৃতি ভারতসংগ্রামের পারভবিক অবশিষ্ট বার্হদ্রথ নরপতিগণের স্থিতিকাল সহস্র বৎসর, একথা বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে স্পষ্টই লিখিত আছে। বায়ু, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে সোমাপি প্রভৃতির রাজ্যশাসনকালের যে বর্ষসংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সমষ্টি করিলে উর্দ্ধকল্পে ৯৩৫ বৎসর ও ন্যূনকল্পে ৯১৯ বৎসর পাওয়া যায়। এইরূপে সমস্ত পুরাণের একবাক্যতা দ্বারা লব্ধসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি টীকাকারগণের মতানুসরণ পূর্ব্বক "ভাব্যাঃ" "ভবিতা" ও "ভবিষ্যতি" প্রভৃতি পদের অর্থবৈচিত্র্য সাধন করা আমি যুক্তিযুক্ত ও আবশ্যক মনে করি না।

বিষ্ণুপুরাণের যে শ্লোকে "পরীক্ষিতের জন্ম অবধি নন্দের রাজ্যাভিষেক কালের অন্তর ১০১৫ বৎসর", একথা আছে, সেই শ্লোকের সহিত বংশতালিকা-লিখিত বর্ষ সংখ্যার ঐক্য হয় না দেখিয়া আমি উক্ত শ্লোকে লিপিকর প্রমাদ কল্পনা করিয়াছিলাম। ইহার বিরুদ্ধে চারুবাবু বলিয়াছেন,—

"বিবাদাস্পদীভূত শ্লোকে লিপিকর প্রমাদ ঘটিয়াছে কি না, তাহাই দেখা যাউক। দেউস্কর মহাশয় যেরূপ পুরাণবর্ণিত বংশতালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাই আমরা আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইতেছি। তাহা হইলে বায়ু পুরাণ মতে বার্হদ্রথগণের রাজ্যকাল ৯২১ বৎসর হইতেছে। উক্তপুরাণ মতে প্রদ্যোত বংশের রাজ্যকাল ১৩৮ বৎসর এবং শৈশুনাগ বংশের রাজ্যকাল ৩৩২ বৎসর। সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৯১ বৎসর সোমাপি ও নন্দের অন্তর হইতেছে। কোথায় ১৫১০ আর কোথায় ১৩৯১। বেচারা লিপিকরের দোষ আর কি করিয়া বিশ্বাস হয়? না হয় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মত ধরা হউক। ৮৮১+১৩৮+৩৬২=১৩৮১ বৎসর হইল। এতদনুসারেও ১৫১০ বৎসর সংস্থান হয় কি? এত কষ্টকল্পনা করিয়া ১৫১০ বৎসর দেখাইতে পারিলেন কৈ? না হয়, ১৫ শত বৎসর (অভাব পক্ষে ১৪৯৮) বৎসর দেখাইলেও চলিত"—(নব্যভারত দ্বাদশ খণ্ড ২৩৯পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ইহার উত্তরে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, গত বর্ষের আশ্বিন মাসের নব্যভারতে আমি মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হইতে যে বংশতালিকা উদ্ধৃত করিয়াছি, তদনুসারে সোমাপি ও তৎপরবর্ত্তী নৃপতিগণের স্থিতিকাল যথাক্রমে ৯৩৫ ও ৯১৯ বৎসর। ইহাতে প্রদ্যোত ও শৈশুনাগবংশের রাজ্যকাল যোগ করিলে নন্দ

ও সোমাপির অন্তর মৎস্য মতে ৯৩৫ + ১৩৮ + ৩৬২ = ১৪৩৫ বৎসর ও ব্রহ্মাণ্ড মতে ৯১৯ + ১৩৮ + ৩৬২ = ১৪১৯ বৎসর হয়। কিন্তু তাহা হইলে যে এই দুই সংখ্যা ১৫শত বৎসরের কাছাকাছি যায়, এবং চারুবাবুর অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না! কাজেই তিনি মৎস্য পুরাণের কথাটা একেবারেই চাপিয়া গিয়াছেন, ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ৯১৯ বর্ষ স্থলে ৮৮১ বৎসর ধরিয়া ৮৮১ + ১৩৮ + ৩৬২ = ১৩৮১ বৎসর ধরিয়াছেন। ইহা ঐতিহাসিক মীমাংসকের সরলতা, দেউস্কর মহাশয়ের অজ্ঞতা ও লিপিকরগণের নির্দ্দোষিতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই!

বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের সহিত মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের প্রায় ৭০ বৎসরের * পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই পার্থক্যের কারণ, ইতিপূর্ব্বে নব্যভারতের একাদশ খণ্ডের ৬৫৭ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে বিস্তারিত বুঝাইয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বিষ্ণু, ভাগবত, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে শৈশুনাগ বংশের স্থিতিকাল ৩৬২ বৎসর —কেবল বায়ুপুরাণের মতে ৩৩২ বৎসর। বৈষ্ণবাদি পুরাণ চতুষ্টয় যখন শৈশুনাগ বংশের অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে একমত, তখন তাঁহাদের প্রদত্ত বর্ষ সংখ্যাই ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণীয়; এবং বায়ু পুরাণের উল্লেখে কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে, বিবেচনা করা অসঙ্গত নহে। এবং এই ভ্রমের জন্য বায়ুপুরাণোক্ত বার্হদ্রথ নৃপতিগণের বংশতালিকাকে অনৈতিহাসিক বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না।

* মৎস্যের সহিত ভাগবতের পার্থক্য ৬৩ বৎসর ও বিষ্ণুর সহিত ৬৫ বৎসর। ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ভাগবতের পার্থক্য ৭৯ বৎসর ও বিষ্ণুর ৮১ বৎসর। আমি সুবিধার জন্য মোটামুটি প্রায় ৭০ বৎসর ধরিলাম।

বায়ুপুরাণ মতে ভবিষ্য বার্হদ্রথ বংশ ও প্রদ্যোত বংশের রাজত্বকাল ৯২১ + ১৩৮ = ১০৫৯ বৎসর। শৈশুনাগ বংশের রাজত্বকাল প্রকৃতপক্ষে ৩৬২ বৎসর (৫)। সুতরাং নন্দ ও সোমাপির মধ্যে ১০৫৯ + ৩৬২ = ১৪২১ বৎসর অন্তর পাওয়া যাইতেছে। এই সংখ্যা, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণীয় তালিকোক্ত সংখ্যা অপেক্ষা ৭৭ বা ৭৯ বৎসর কম।

চারুবাবু বলিতেছেন,—"আমি দেউস্কর মহাশয়ের সংগৃহীত তালিকা হইতেই যাহা (অর্থাৎ যে অনৈক্য) দেখাইলাম, তাহাতে সকলে বুঝিবেন যে, উক্ত বংশতালিকার বলে বিষ্ণুপুরাণ বচনে লিপিকর প্রমাদ কল্পনা করা অনভিজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র।" কিন্তু চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ঘটনার সময় নির্ণায়ক প্রাচীন বংশ পত্রিকার ১৫ শত বৎসরের তালিকার মধ্যে মাত্র ৭০ বৎসরের (ভাগবত ও মৎস্য পুরাণের তালিকার মধ্যে ৬৩ বৎসরের) পার্থক্য বা গরমিলের জন্য সমস্ত বংশ পত্রিকাটিকেই অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কতদূর বিজ্ঞতার কার্য্য, তাহা বলিতে পারি না। কাজেই চারুবাবুর এই যুক্তির বিশেষ সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

উপসংহারে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। এপর্য্যন্ত অনেকেই বিঃ পুঃ ৪র্থ অং ২৪অধ্যায় লইয়া অনেক আন্দো-

(৫) বায়ু অপেক্ষা বৈষ্ণবাদি পুরাণের মতই এ বিষয়ে সমধিক ভ্রমশূন্য বলিয়া বোধ হওয়ায় তাহাই এস্থলে পরিগৃহীত হইল। বায়ু পুরাণে যে ভ্রম আছে, তাহা উক্ত পুরাণের প্রাচীনতা ও লিপিকর প্রমাদ বশতঃই সংঘটিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অপরাপর পুরাণেও এরূপ ভ্রমের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আবশ্যক হইলে ইহা সুন্দররূপে প্রমাণ করিতে পারিব। প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে এস্থলে সম্প্রতি মৌনাবলম্বন করিতে হইল।

লন আলোচনা করিয়াছেন ; কিন্তু তদন্তর্গত "অত্রোচ্যত" এই কথাটির প্রতি এপর্য্যন্ত কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে দেখি নাই। —আমি নিজেও অনেক বার ঐ অংশ পাঠ করিয়াছি ; কিন্তু "অত্রোচ্যতে" কথাটির প্রতি এতদিন আমার লক্ষ্য বা মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের সাহিত্যে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় এবিষয়ে সর্ব্ব প্রথম সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় প্রদান করেন। তিনি দেখান যে, বিঃ পুঃ ৪র্থ অং ২৪ অধ্যায়ে পরীক্ষিৎ ও নন্দের অন্তর সম্বন্ধে যে শ্লোক দৃষ্ট হয়, উহা একটী প্রাচীন কিম্বদন্তী—"অত্রোচ্যতে" কথার দ্বারা ইহা প্রমাণ হয়। বটব্যাল মহাশয়ের এই নির্দ্দেশ আমার নিকট সম্পূর্ণ সঙ্গত বোধ হইয়াছে ও আমি এ সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব সংস্কারের কিয়দংশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমি "যাবৎ পরীক্ষিতোজন্ম" ইত্যাদি শ্লোকে লিপিকর প্রমাদ কল্পনা করিয়াছিলাম কিন্তু এখন আর সেরূপ কল্পনার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। কারণ উক্ত বচন একটি কিম্বদন্তী মাত্র, তখন উহার সহিত পুরাণকারের সংগৃহীত বংশ তালিকার সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও বিশেষ কোনও দোষ দেখি না। আর এই প্রসঙ্গে সপ্তর্ষির অবস্থান সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও বিষ্ণুপুরাণকারের নিজের মত নহে—উহারও মূল কিম্বদন্তীতে।

চারুবাবু বলিতেছেন,—"বিষ্ণুপুরাণকার (পরীক্ষিত ও নন্দের অন্তর সম্বন্ধীয়) শ্লোকগুলি "অত্রোচ্যতে" বলিয়া প্রামাণিক স্থল হইতে নিজের সমর্থনের জন্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।" এ কথা ঠিক নহে। বিষ্ণুপুরাণকার যে স্বীয় মত সমর্থনের জন্য এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, এ কথার একান্ত প্রমাণাভাব। সুতরাং আমার মূল সিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণই রহিতেছে।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

সঞ্জীবনী।

আকাশ মেঘেতে ঢাকা,
নাহি চাঁদ, নাহি আলো,
হাসি মুখ গেছে নিবে,
নদী-বুকে ছায়া কালো!

মেঘের আঁধার কোলে,
ডুবে গেছে ধ্রুবতারা,
হিয়া কাঁপে দুরু দুরু,
কাঁদি একা দিশা হারা!

সহসা মাঝের পথে,
হ'য়ে গেছে পথ-ভুল,
কোথা যেতে কোথা যাব,
চিনিতে পারি না কূল!

আঁধারে হতাশ প্রাণে,
ব'সে আছি শূন্যে চাহি,
কার্য্য-শূন্য লক্ষ্য-ভ্রষ্ট,
সুখ নাহি, শান্তি নাহি!

কে জানে এ মেঘরাশি,
কতদিনে চ'লে যাবে,
কে জানে এ পোড়া হৃদি,
কতদিনে আলো পাবে!

বজ্রদগ্ধ শুষ্ক তরু,
মৃত প্রাণে আছি প'ড়ে,
পারি না ত বুকে নিতে,
আশা-লতা ভুমে প'ড়ে!

উদার কল্পনা রাশি,
না ফুটিতে ঝ'রে গেল,
জীবনের মাঝখানে,
যবনিকা প'ড়ে গেল !

কোথা মোর জ্ঞান-তৃষা,
বিশ্বগ্রাসী মহাক্ষুধা,
কেন ধরা মরুভূমি,
কে হরিল স্বর্গ-সুধা ?

কোথা সে শ্যামলা ধরা,
কোথা প্রীতি, কোথা আশা,
কোথা সে অনন্ত দয়া,
পুণ্য তীর্থ—ভালবাসা ?

কোথা তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম,
জীবনের সহচর,
কোথা তুমি মহাপুণ্য,
কোথা নিখিল নির্ভর !

অন্ধকার চারি ধারে,
লক্ষ্য-হারা ক্ষিপ্তপারা,
কিবা করি, কিবা চাহি,
বেঁচে আছি আত্মহারা !—

প্রাণ গেছে—আশা গেছে,
আয় রে মরণ আয়,
মধুর পরশ তোর,
স্থান দে রে তোর পায় !

সহসা কি পুণ্যফলে,
ঘুচে গেল অবসাদ,
মস্তকে পড়িল ধীরে,
বিধাতার আশীর্ব্বাদ !

আঁধারে জ্বলিল আলো,
সে আলোক চারিধার,
আলোকে হাসিল ধরা,
স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার !

সেই স্নিগ্ধ আলো মাঝে,
দেখিনু দাঁড়ায়ে তুমি,
তোমারি চরণ স্পর্শে,
সুধাপূর্ণ মরুভূমি !

পথ-হারা আমি দীন,
চাহিনু তোমার পানে,
কি সুন্দর আহা তুমি !—
কি মূর্ত্তি আঁকিলে প্রাণে !

ভুলে গেনু আপনারে,
ভুল হ'ল চরাচর,
প্রাণে প্রাণ মিশে গেল,
তুমি-আমি একাকার !

কে তুমি মমতাময়ি !
ছায়া-পথ বিহারিণী,
আঁখিতে করুণা-জ্যোতি,
বুকে প্রেম-মন্দাকিনী ?

আসিলে কি দীন পাশে,
মৃত দেহে দিতে প্রাণ,
দিতে কি অভাগাতরে,
আপনারে বলিদান ?

মঙ্গল-পল্লব করে,
ঢেলে দিয়ে শান্তিজল,
জুড়াবে কি প্রাণময়ি !
হৃদয়ের দাবানল ?

দিবে কি গো যাহা চাই,
সুখ শান্তি ভালবাসা,
অনন্তে বিশ্বাস প্রীতি,
কার্য্য-ক্ষেত্রে গুরু আশা ?

পার যদি, এস দেবি!
হ'বে মোর ধ্রুব-তারা,
তোমা' পরে আঁখি রাখি'
হবনাক পথ হারা!

মঙ্গল পরশে তব,
দূরে যাবে মেঘ রাশি,
হৃদয়ে খেলিবে আলো,
রবি শশী পরকাশি!

পরাণে সাহস পা'ব,
আঁধারে জ্বলিবে আলো,
তোমারে হৃদয় দিয়ে,
সবারে বাসিব ভালো!

চুম্বন-মদিরা তব,
শুষ্কতরু মুঞ্জরিবে,
আশালতা বুকে দিয়ে,
দগ্ধবুক জুড়াইবে!

স্নেহের অঞ্চল খানি,
মুছাবে নয়ন-লোর,
প্রাণে প্রাণে কোলাকুলি,
আনি দিবে ঘুম-ঘোর!

তোমার সুকণ্ঠ সনে,
বাঁশরী ধরিবে তান,
পথহারা চির দীন,
শুনিবে মোহিত প্রাণ!

কভু ত দেখিনে আর
ও মধুর মুখ খানি,
আজি এ প্রথম দেখা,
এরি মাঝে জানাজানি!

আঁধার গিয়াছে চ'লে,
গেছে চ'লে অবিশ্বাস,
ভক্তি প্রীতি শান্তি মিলি'
কোটী রবি পরকাশ!

একটী আলোক-রেখা,
অতি মৃদু, অতি ক্ষীণ,
নিবে বুঝি যেতেছিনু,
প্রতি পলে দীপ্তিহীন!

তুমি দেবি, প্রেমময়ি,
প্রাণে প্রাণ মিশাইলে,
ভুল ভেঙে, আশা দিয়ে,
দগ্ধ হৃদি জুড়াইলে!

স্থিতি-বিধায়িনী তুমি,
দুর্ভাগ্যের চির-আশা,
মৃতপ্রাণে সঞ্জীবনী,
পবিত্র ও ভালবাসা!

শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

মার্কিন পদ্ধতি।

রাজনৈতিক ও সামাজিক।

যে মার্কিন রাজ্য বর্ত্তমান যুগে সভ্যতা ও সম্পদের, বিজ্ঞান ও উন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, তদ্দেশীয় অধিবাসীদিগের রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে কিছু জানিবার অভিলাষ ও কৌতূহল অনেকেরই থাকা সম্ভব। আমরা আমাদিগের পাঠকদিগের সেই কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কতকগুলি মার্কিন প্রথা ও নীতির উল্লেখ করিব।

মার্কিন বলিতে আমরা সাধারণতঃ যুক্ত-

রাজ্যের (United States) বিষয়ই মনে করি। ইহা আদৌ একটি ইংরাজ উপনিবেশ হইলেও, এক্ষণে ইংলণ্ডাপেক্ষাও সমৃদ্ধিশালী ও পরাক্রমশীল। ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দ হইতে অত্রত্য ঔপনিবেশিকগণ মাতৃভূমি ইংলণ্ডের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনভাবে সাধারণ-তন্ত্র প্রথানুসারে আপনাদিগের রাজকার্য্য সমাধা করিয়া আসিতেছেন।

যুক্তরাজ্য চুয়াল্লিশটি ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টি। প্রত্যেক রাজ্য মধ্যে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত। কিন্তু একটি (Central Govern ment) দ্বারা সমুদয় রাজ্যগুলির শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। এই কেন্দ্রস্থানীয় শাসন-শক্তির হস্তে দেশ শাসন, ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বিচারভার নিহিত। রাজতন্ত্রের রাজার ন্যায় সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি। সভাপতিই প্রধান ও প্রকৃত শাসনকর্ত্তা। তিনি রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি। প্রত্যেক চারি বৎসর অন্তর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। সভাপতির বয়ঃক্রম অন্যূন পঁয়ত্রিশ বৎসর হওয়া আবশ্যক। প্রতিভা ও মনস্বিতাই ঈদৃশ উচ্চতম পদে আরূঢ় হইবার একমাত্র সহায়। প্রত্যেক অধিবাসীরই রাজ্যের এই শ্রেষ্ঠতম পদে উন্নীত হইবার অধিকার আছে। জন্ম, বংশ, কুল, ধন, মান, প্রতিপত্তি কিছুই প্রতিবন্ধক বা সহায় হইতে পারে না। প্রতিভা থাকিলে একজন রাখাল, একজন চর্ম্মকার, একজন কাঠুরিয়া অনায়াসে এক দিন সমগ্র যুক্তরাজ্যের সভাপতি পদে বরিত হইতে পারে। ভূতপূর্ব্ব সভাপতিদিগের মধ্যে অনেকেই এইরূপ নিম্নপদ ও শ্রেণী হইতে রাজ্যের এই উচ্চতম পদে আরোহণ করিয়াছিলেন।

সভাপতি রাজ্যের শীর্ষস্থানে সংস্থাপিত হইলেও তাঁহার আর কোন উপাধি নাই। ইংলণ্ড বা অপর দেশের লর্ড, আরল, ব্যারণ, কাউণ্ট, নাইট প্রভৃতি কোনরূপ মর্য্যাদা সূচক উপাধি বা বিশেষণ প্রেসিডেণ্টের প্রতি আরোপ করা হয় না। "Mr." প্রেসিডেণ্ট ব্যতীত, রাজ্যের উচ্চতম পদধারীর অন্য কোন সম্মান-পরিজ্ঞাপক, উপাধি নাই। সভাপতি স্থল-সৈন্য ও নৌ-সৈন্য উভয় বিভাগের একমাত্র সামরিক প্রধান অধ্যক্ষ। তিনিই পররাষ্ট্রে সন্ধি স্থাপন ও রাজদূত নিয়োগ করেন। তাঁহারই হস্তে বিচারক ও অন্যান্য উচ্চতম রাজ কর্ম্মচারী নিয়োগ ভার সন্ন্যস্ত। তিনিই আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগের উপর তত্ত্বাবধারণ করেন। তদীয় রাজকার্য্যের সহায়তার জন্য একটি মন্ত্রিসভা আছে। আটজন দক্ষ ও রাজনীতি বিশারদ সদস্য লইয়া এই মন্ত্রিসভা পরিগঠিত। সদস্যগণ স্ব স্ব কার্য্য-ভারানুসারে যথাক্রমে পররাষ্ট্র, সমর, নৌসৈন্য, ধনাগার, কৃষি ও স্বরাষ্ট্র সম্পাদক, পোষ্টমাষ্টার জেনারাল আর এটর্ণি জেনারাল নামে অভিহিত হন। ইঁহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। সদস্যগণ সপ্তাহে দুইবার সভাপতির গৃহে সমবেত হইয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত, আবশ্যক হইলে, সভাপতির আহ্বানানুসারে অন্য সময়েও তাঁহাদিগকে উপস্থিত হইতে হয়। প্রত্যেক সদস্য স্ব স্ব ভারার্পিত বিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পাদন করিবার জন্য সভাপতির নিকট দায়ী, এবং সভাপতি সমগ্ররাজ্যের সুব্যবস্থা ও সুশাসনের নিমিত্ত প্রজাবৃন্দের নিকট দায়ী।

যুক্তরাজ্যের কংগ্রেস বা পার্লামেণ্ট সভা দুই দল লোক লইয়া পরিগঠিত। এক দলকে (Senate) অপর দলকে (House of Repre

sentatives) কহে। সেনেট সভা ইংলণ্ডের লর্ড বা সম্ভ্রান্ত সভার সদৃশ। ইহাতে অষ্টাশী জন সেনেটার বা বয়োবৃদ্ধ সভ্য অধিবেশন করেন। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে কেহ সেনেটাররূপে মনোনীত হইতে পারেন না। প্রতি রাজ্য হইতে দুইজন করিয়া,চুয়াল্লিশটি রাজ্য হইতে অষ্টাশীজন সেনেটার নিযুক্ত হন। ইঁহারা স্থানীয় ব্যবস্থাপক বিভাগ হইতে ছয় বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। সময় উত্তীর্ণ হইলে, যে কেহ পুনরায় নির্ব্বাচিত হইতেও পারেন। যুক্তরাজ্যের সেনেটার নির্ব্বাচন প্রথা অতি সুন্দর নিয়মে সাধিত হয়। সেনেট সভার ৮৮জন সভ্য এককালে কর্ম্মে নিযুক্তবা কর্ম্ম হইতে অবসৃত হন না। ইহার এক-তৃতীয়াংশ সভ্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হন। সুতরাং সকল সময়েই দুই-তৃতীয়াংশ এরূপ যোগ্য ও বিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তি সভায় অধিবিষ্ট থাকেন, যাঁহাদিগের রাজকর্ম্ম সম্বন্ধীয় অন্ততঃ দুই কি চারি বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকেই থাকে।

প্রতিনিধি-সভা (House of Representatives)সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫০জন প্রতিনিধি সভ্য লইয়া পরিগঠিত। পঞ্চবিংশ বৎসরের ন্যূন হইলে কেহ প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। নির্দ্ধারিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, যে কেহ প্রতিনিধি হইতে পারেন। প্রতিনিধিগণ প্রত্যেকে এককালে দুই বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। সময় উত্তীর্ণ হইলে পুনরায় নির্ব্বাচিত হইবার সম্বন্ধে কোন বাধা নাই। সেনেট সভার ন্যায়, প্রতিনিধি সভার সভ্যগণও এককালে অবসৃত হন না। প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর কেবল অর্দ্ধ-সংখ্যক সভ্য সভার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন। নবেম্বর মাসে প্রতিনিধি সভার নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে, সভাপতির নির্ব্বাচনও ঐ সময় হয়। কিন্তু নির্ব্বাচিত নব-প্রতিনিধি-সভ্যগণ অথবা সভাপতি নির্ব্বাচনের পর হইতে দ্বাদশ মাস অতীত না হইলে সভামধ্যে অধিবেশনের অধিকার পান না। ফলতঃ নবেম্বর মাসের নির্ব্বাচনের পর তৎপরবর্ত্তী মার্চ্চমাসে নবনির্ব্বাচিত-সভ্যগণ রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।*

সভাপতি, সেনেট ও প্রতিনিধি সভার ক্ষমতা পরস্পরের দ্বারা সীমাবদ্ধ। কেহই একাকী আপন স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। কোন বিষয়ের পাণ্ডুলিপি (রাজস্ব-বৃদ্ধির পাণ্ডুলিপি ব্যতীত) সেনেট সভা কিম্বা প্রতিনিধি সভা দ্বারা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। কিন্তু মঞ্জুর হইবার পূর্ব্বে উভয় সভারই ঐক্য অভিমত আবশ্যক। রাজস্ব বৃদ্ধির পাণ্ডুলিপি কেবল প্রতিনিধি সভা কর্ত্তৃকই প্রথম প্রবর্ত্তিত হইবে। উভয় সভা কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও সমর্থিত পাণ্ডুলিপি শেষ মঞ্জুর হইবার জন্য সভাপতির নিকট প্রেরিত হয়। সভাপতি বিল মঞ্জুর বা পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু কোন বিল সভাপতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও, যদি বিলের স্বপক্ষে দুই

* মার্কিন রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে প্রতিনিধি সভার পরিবর্ত্তন নিয়ম একটি দোষাবহ প্রথা। প্রত্যেক দ্বৈবাৎসরিক নির্ব্বাচন উপলক্ষে অনেক বৃথা অর্থ-শ্রাদ্ধ, উত্তেজনা, ও আন্দোলন এবং নানাবিধ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও অপ্রিয় ভাব ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ ঘন ঘন প্রতিনিধি পরিবর্ত্তন জন্য প্রতিনিধি সভা সর্ব্বতোভাবে শাসন-ক্ষমতার সহিত সংস্পর্শ রক্ষা করিতে পারে না। এই জন্য অনেক সময়ে শাসন-বিভাগ ও ব্যবস্থা-বিভাগ সমবেত ভাবে কার্য্য না করিয়া পরস্পর স্বতন্ত্র ও বিরোধী ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে, এ কুপ্রথার প্রতি রাজনৈতিকদিগের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। সম্ভব, অচিরে এ প্রথার সংশোধন ঘটিবে।

তৃতীয়াংশ সভ্য—সেনেট সভার ও প্রতিনিধি সভার—একমত হন, তাহা হইলে সভাপতির নামঞ্জুর রহিত করিয়াও, বিল পাশ হইতে পারে। সেনেট সভার সম্মতি বা অসম্মতির উপর সভাপতির প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিয়োগ অথবা পররাষ্ট্র সহ সন্ধিবিগ্রহ করণ প্রধানতঃ নির্ভর করে। যখন সাধারণ প্রতিনিধিসভা উচ্চপদস্থ কোন রাজ কর্ম্মচারীকে অভিযুক্ত করে, তখন সেনেট সভা বিচারকের স্থলাভিষিক্ত হয়।

রাজ্যময় বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য তিন শ্রেণীর বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত আছে—সুপ্রীম কোর্ট, সার্কিট কোর্ট, ও ডিষ্ট্রিক্ট কোর্ট। সুপ্রীম কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি ও আট জন সহযোগী বিচারক (Associate justices) কার্য্য করেন। ওয়াসিংটন নগরে প্রতি বৎসর জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের অধিবেশন হয়। নয়টি বিচার সংক্রান্ত এলাকার মধ্যে, প্রতি বৎসর সার্কিট জজ একাকী, কিম্বা কোন এক জন সুপ্রীম কোর্টের জজ, অথবা সার্কিট জজ ও সুপ্রীম কোর্ট জজ উভয়ে একত্রে, কিম্বা ইহাদিগের মধ্যে একজন অপর কোন এক ডিষ্ট্রিক্ট জজের সহিত একত্রে, বসিয়া বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াথাকেন। বর্ত্তমানে সমুদয় যুক্ত রাজ্যে সর্ব্ব সমেত পঞ্চান্নটি ডিষ্ট্রিক্ট কোর্ট সংস্থাপিত আছে। ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টে অপেক্ষাকৃত সামান্য বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়। সুপ্রীম কোর্টই রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান ক্ষমতাধারী। ইহার ন্যায়ের সমক্ষে সভাপতি, কংগ্রেস-সভা, প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তা, স্থল ও নৌ-সৈন্য সংক্রান্ত সামরিক কর্ম্মচারী—সকলকেই বিনীতভাবে মস্তক অবনত করিতে হয়।

যুক্ত-রাজ্যের অন্তর্গত প্রত্যেক ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনপ্রণালী সমগ্র যুক্ত-রাজ্যের সদৃশ। প্রত্যেক রাজ্যের আপন আপন শাসনকর্ত্তা ও আইন আছে। সমগ্র যুক্ত রাজ্যের ন্যায় তদন্তর্গত এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বতন্ত্র সভাপতি, সেনেট ও প্রতিনিধি সভা, এবং বিচার সংক্রান্ত কোর্ট আছে। সভাপতি বা শাসনকর্ত্তা শুল্ক, কর প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করেন, এবং ইহাতে যাহা আয় হয়, তদ্দ্বারা রাজ্য শাসন সংক্রান্ত সমুদয়, এবং অন্যান্য ব্যয়ভার নির্ব্বাহিত হয়। দেশ শাসনের জন্য যে বিপুল অর্থাবশ্যক হয়, প্রজা সাধারণের পক্ষে তাহা ভারযুক্ত বোধ হয় না। কারণ, বিদেশাগত পণ্য ও আবকারী হইতে যে শুল্ক সংগৃহীত হয়, তাহাই সমগ্র দেশ-শাসন ব্যয় সঙ্কুলনে যথেষ্ট হইয়া থাকে।

রাজ্য শাসন-ব্যবস্থা-কর্ত্তাগণ মার্কিন যুবকদিগের শিক্ষাকল্পে সমূহ যত্ন প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যুক্ত-রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক বর্গ মাইল স্থানের উপর একটি করিয়া স্কুল স্থাপিত আছে। এখানে সরকারী ব্যয়ে বিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ ও বিদ্যালয়ের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। সমুদয় ইয়ুরোপে প্রত্যেকের জন্য শিক্ষার্থে যত ব্যয় করা হয়, আমেরিকায় তদপেক্ষা ছয় গুণ ব্যয়িত হইয়া থাকে। অধিকাংশ রাজ্য উচ্চশিক্ষা ও নিম্নশিক্ষার জন্য ইউনিভার্সিটি ও স্কুল স্থাপন করিয়া সরকারী ব্যয়ে ইহাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইউনিভার্সিটির সহিত কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী মতে নিম্নশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় আছে। তথায় বালক বালিকাগণ চতুর্দ্দশ হইতে বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিনা ব্যয়ে সকল প্রকার শিক্ষা লাভ করিতে পারে। ঈদৃশ অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের সুবিধার প্রধান কারণ এই যে, অধিকাংশ

কলেজ, ইউনিভার্সিটি ধনী ও সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদিগের বদান্যতা ও দানশীলতায় সংস্থাপিত ও সংরক্ষিত। প্রতি বৎসরই ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই সকল বিদ্যালয়ে প্রচুর অর্থ দান করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত, বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ সংসারে উন্নতিলাভ করিয়া সঙ্গতিপন্ন হইলে, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ পূর্ব্ব পরিচিত বিদ্যালয়ে অর্থদান করেন। অস্মদ্দেশে, আমরা প্রাচীন বিদ্যালয় ও অধ্যাপকদিগের নিকট এরূপ কৃতজ্ঞ যে, কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইলে শিক্ষক কিম্বা শিক্ষা-স্থানের কথা স্বপ্নেও ভাবি না। একবার কষ্টেসৃষ্টে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে যখন অনেকেরই পুস্তকের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, তখন আর শিক্ষার প্রকৃত মর্য্যাদা তাঁহারা কি বুঝিবেন? প্রাচীন শিক্ষক ও শিক্ষাস্থানের প্রতি সম্মান বা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ত ঢের দূরের কথা!

সাধারণ শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থে ব্যক্তিবিশেষের দানশীলতার কথা শুনিলে আমাদিগকে আশ্চর্য্য হইতে হয়। একজন সেনেটার কোন এক ইউনিভার্সিটিকে এককালে ছয় কোটী টাকা দান করিয়াছেন। ইহার অতুল বিষয়; কিন্তু ইনি অপুত্রক। সম্ভব মৃত্যুকালে সমুদয় সম্পত্তি সাধারণ শিক্ষার্থে দান করিয়া যাইবেন। আমাদের দেশে হইলে এমন ধনী লোক বিষয় রক্ষার চিন্তায় এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতেন, তথাপি এরূপ সৎকার্য্যে কখনই অর্থদান করিতেন না। মার্কিন সেনেটারের উচ্চ ও মহদ্দৃষ্টান্ত এদেশে কবে অনুসৃত হইবে? আমাদের দেশে ধনকুবেরের অভাব নাই। নৃত্যগীত প্রভৃতি, অনেক অসৎ কার্য্যে কত সহস্র অর্থ তাঁহারা ঢালিয়া দিতেছেন! কিন্তু স্বদেশবাসীর শিক্ষার জন্য একটি পয়সা দিতেও কত কুণ্ঠিত! পোষ্যপুত্রগণ প্রায়ই উত্তরাধিকৃত ও অনায়াসলব্ধ সম্পত্তির অপচয় করিয়া থাকেন। চক্ষের সমক্ষে এরূপ কত দৃষ্টান্ত লোকে দেখিতেছে। তথাপি বিষয়ী অপুত্রকগণ নিজেদের অর্থ এক অপোগণ্ডের হস্তে তুলিয়া দিয়া সচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যান; নিঃস্বার্থ সৎকার্য্যে স্বদেশ-হিতকল্পে দান করিয়া বিপুল অর্থের সার্থকতা করিতে ইচ্ছা করেন না। আবার, যাঁহারা কিছু দান করেন, নাম কিনিবার জন্যই হৌক, আর যে জন্যই হৌক, তাহাও গবর্ণমেণ্টের হস্তে। আজ কাল ত অনেক যোগ্য স্কুল, কলেজ গবর্ণমেণ্ট সংস্থষ্ট না হইয়াও অতি গৌরব ও প্রশংসার সহিত শিক্ষাদান করিতেছে। এই সমুদয় প্রাইভেট বা বেসরকারী কলেজ ও স্কুলের মূলধন অতি অল্প। সমুচিত অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকে অনেকেই ভাল করিয়া যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারিতেছে না। এই সকল প্রাইভেট কলেজ, স্কুল কি দানের সুপাত্র নহে? আমাদিগের দেশ যেমন হতভাগ্য, সেইরূপ প্রথা ও নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। আশা, মার্কিনদিগের ন্যায় আমাদিগের স্বদেশীয় ধনাঢ্য মহাত্মাগণ সাধারণের শিক্ষা সৌকর্য্যার্থে বেসরকারী স্কুল কলেজে অর্থদান করিয়া আপনাদিগের অর্থের সার্থকতা করিবেন।

মার্কিন দেশের বালক বালিকাগণ স্কুল কলেজে একত্রে শিক্ষা করে। বাল্যাবধি এইরূপ মেশামিশির জন্য অতি স্বাস্থ্যকর পবিত্রভাব পরস্পরের হৃদয়ে সঞ্জাত হয়। স্ত্রী ও পুরুষ একত্রে শিক্ষা পাইলেও, পুরুষ পুরুষই থাকেন এবং রমণী কদাচ মহিলোচিত কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হন না। বস্তুতঃ পরস্পরের প্রতি ভদ্র ব্যবহার ও সম্মান প্রদর্শনে এবং মহৎ ও পবিত্রহৃদয়তা ও উচ্চ

জ্ঞানে মার্কিন জাতি পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষাও হীন নহে। বালক অপেক্ষা অধিকাংশ বালিকা অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে পাঠ করে। এই জন্য আমেরিকার অধিকাংশ রমণী তাহাদিগের স্বামী অপেক্ষা সুশিক্ষিতা; এবং এইরূপ সুশিক্ষিতা মহিলাগণ যখন মাতা হইয়া সংসারে বাস করেন, তখন তাঁহারা কখনই অস্মদ্দেশের অধিকাংশ নিরক্ষরা বা সামান্য শিক্ষিতা মাতার ন্যায়, তনয় তনয়াদিগের বিকাশমান ও পরিবর্দ্ধমান জ্ঞানের সমীপে মূর্খা মাতা বলিয়া বিবেচিতা হন না। সন্তান সন্ততির উপর সুশিক্ষিতা মাতার প্রভাব কত যে মধুময় ও উন্নতি সহায়ক, মার্কিন সন্তানদিগের গঠিত চরিত্র, উন্নত-হৃদয় ও মনস্বী মস্তিষ্কের বিকাশ মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। মার্কিন দেশে সুশিক্ষিতা নারীগণ সুকুমারমতি বালক বালিকার ভবিষ্যজীবনের মূলভিত্তি গঠন সম্বন্ধে প্রধান সহায়িকা হন। বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষক অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ অধিক। গৃহে সুশিক্ষিতা মাতা, বাহিরে সুশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রী—উভয় স্থলেই রমণী প্রভাব, বালক বালিকার হৃদয়ে উচ্চ পবিত্র স্বাস্থ্যকর ও উন্নতিকর ভাব সমূহের বীজ বপন করিয়া, তাহাদিগকে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, মুকুলিত, পুষ্পিত ও ফলিত করিয়া দিতেছেন এবং মার্কিন সন্তানগণ যে এরূপ হৃদয় ও মস্তিষ্ক লইয়া কঠোর সংসারে উন্নতির মার্গে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী জাতি হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি! স্ত্রীজাতির এইরূপ উন্নত শিক্ষায় সমাজের, পরিবারের কত যে মহৎ উপকার সাধিত হয়, মার্কিনজাতীয় জীবনের মহোন্নতি তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন। নগরে, গ্রামে, দেশে, পল্লীতে, প্রাসাদে কুটীরে কোটি কোটি ঈদৃশ সুখ শান্তিপূর্ণ পরিবার মধ্যে যুক্তরাজ্যের সুখ ঐশ্বর্য্য শান্তি বিক্রম উন্নতি বিরাজ করিতেছে। যে গৃহে শান্তি পবিত্রতা নিঃস্বার্থ প্রীতি স্নেহ ও ভালবাসা পরস্পরকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আমরণ বাঁধিয়া রাখে, সে গৃহে স্বাধীনতার জন্য এক স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হয়। স্বাধীন প্রবৃত্তি স্বাভাবিক উৎসের ন্যায় স্বতঃই নির্ম্মল ধারা ছুটাইয়া প্রত্যেক হৃদয়কে পবিত্র অভিষেকে অভিষিক্ত করে। স্বদেশ-বাৎসল্য, স্বদেশ-হিতৈষণা স্বতঃই প্রত্যেক প্রাণে মাতৃস্তন্যধারা পানের সঙ্গে সঙ্গে স্ফুরিত হইতে থাকে। তাই মার্কিন জাতি এত স্বাধীনতাপ্রিয়, এত পরাক্রমশীল। যে মধুময় গৃহ-চতুষ্পার্শ্বে কত স্নেহের স্মৃতি, কত সুখকর শান্তি, পবিত্রতার দৃশ্য, কত আরাম, কত আনন্দ; যে গৃহ জননী, ভগিনী ও সহধর্ম্মিণীর স্নেহ শ্রদ্ধা ও প্রেমে স্বর্গতুল্য; যেখানে সুকুমারমতি ফুল্ল প্রসূন সম তনয় তনয়ার অস্ফুট বা অর্দ্ধস্ফুরিত প্রীতির রোলে নিয়ত পবিত্র আনন্দোচ্ছ্বাস প্রবাহিত; যেখানে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এবং সহস্র প্রকারের মমতা ও কমনীয় ভাব নিরন্তর বর্ত্তমান থাকিয়া গৃহকে স্বর্গাপেক্ষাও গরীয়সী করে; সেই গৃহ, সেই সুখ, সেই আরাম, সেই আত্মীয় বন্ধু, সেই স্ত্রীপুত্র মাতা পিতা সোদর সোদরাকে পরাধীনতা-পাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন্ কাপুরুষের প্রাণ না স্বাধীনতার উৎসাহে জ্বলিয়া উঠে? আপনার গৃহের, পরিবারের মর্য্যাদা যে বুঝে, তার প্রাণের অন্তঃপ্রদেশে অনিবার্য্য বেগে স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস উঠিবেই উঠিবে, স্বাধীনতার অনল চিরদিন অনির্ব্বাণ জাগিবেই জাগিবে! মার্কিনগণ সুশিক্ষিত পিতামাতা, ভ্রাতা ভগ্নী, স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবেষ্টিত অতুল গৃহ-সুখের

মর্য্যাদা সম্যক্‌ই বুঝিতে পারে; তাই গৃহ-রক্ষার জন্য,স্বদেশ রক্ষার জন্য সকলেই অকাতরে প্রাণ দিতেও পারে। আমরা পরাধীন ভারতবাসী,এই অতি সুন্দর স্বাভাবিক আত্মদানের প্রবলতম উৎসাহপূর্ণ ইচ্ছার সামান্যতম ছায়া পর্য্যন্তও বুঝি না ও জানি না। সেই জন্য যখন শুনি, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের জাতীয় পতাকার অবমাননার কথা শুনিবামাত্র সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ মার্কিন যুবক অশ্রু-প্লাবিত বক্ষে দৃঢ়মুষ্টি লইয়া দেশের হৃতগৌরব পুনঃস্থাপনের জন্য অগ্রসর হইল, আমরা ইহার প্রকৃত মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারি না। স্বদেশ রক্ষার ভাব প্রত্যেক 'ব্রদার জোনাথেনের' হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল বলিয়া আজ প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর হইল যুক্তরাজ্য সৈন্য সংখ্যার হ্রাস করিয়া পঞ্চবিংশ সহস্র মাত্র রাখিয়াছেন। এক সময়ে এই সৈন্য সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক ছিল। শাসনকর্ত্তাদিগের দৃঢ় প্রতীতি আছে যে, যদি কখন বিপদের সময় উপস্থিত হয়, দেশের প্রত্যেক অধিবাসী সেনানীবেশে সজ্জিত হইয়া শস্ত্রধারী সৈনিকের কার্য্য করিতে পারিবে। স্বাধীন দেশে স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির মধ্যে এইরূপই সম্ভব হয়; অন্য কুত্রাপি ইহা সম্ভব হইতে পারে না। সুসভ্য ও সমুন্নত ইংরাজ যদি ভারতবাসীকে আপনার বিশ্বস্ততার মধ্যে লইয়া, তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক স্বদেশ রক্ষার ইচ্ছাকে মুক্তভাবে পরিগঠিত হইতে দেন, ভারতবাসীকে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্য-শ্রেণীতে প্রবৃত্ত হইবার অধিকার দিয়া শারীরিক ও মানসিক নানাবিধ উন্নতির সহিত রণ-বিদ্যায় উন্নতি লাভ করিতে অনুমতি করেন, তাহা হইলে বিশাল ভারতসাম্রাজ্য সংরক্ষার্থে প্রবর্দ্ধমান সামরিক ব্যয়ভার অনেক হ্রাস হইতে পারে এবং তাঁহারাও অন্তঃ বা বহিঃশত্রুশঙ্কার এক দুরপনেয় ও দুষ্পরিহর মর্ম্মভেদী হৃৎকম্পন হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন।

মার্কিন দেশে ধনী নির্ধন, উচ্চনীচ ইত্যাদি বিশেষত্ব নাই; আইনের চক্ষে সকলেই সমান। রাজপথের এক জন মোট-বাহকেরও যে স্বত্ব ও অধিকার, প্রাসাদবাসী অতুল সুখাধিকারী ধনী বা সম্ভ্রান্তেরও সেই স্বত্ব ও অধিকার। রাজ্য-শাসনের দায়িত্ব ও ভার সকলের স্কন্ধেই সমান রূপে আছে। পথের মুষ্টিমেয় ভিখারীও রাজ্যের একজন। এই ভাব প্রত্যেকের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে বলিয়া, বিষয় কার্য্যের উচ্চতা বা নীচতা হেতু পরস্পরের মধ্যে কোন রূপ ঈর্ষা, বিদ্বেষ বা মন্দ ভাব জন্মে না। জমীদার, কি দোকানদার সকলেই এক শ্রেণীর লোক। শ্রমজীবিতা মার্কিনের চক্ষে ঘৃণনীয় বা নিন্দনীয় নহে। বস্তুতঃ সাধারণ লোকে শ্রমশীলতাকে মর্য্যাদার চক্ষে দর্শন করে। "স্বনামঃ পুরুষো ধন্য!" এই প্রবাদ বচনের মাহাত্ম্য ও সার্থকতা মার্কিনেরা প্রকৃততঃ স্ব স্ব জীবনে প্রদর্শন করে। যে ব্যক্তি নিজের পরিশ্রমে বা বুদ্ধি কৌশলে ধন সঞ্চয় না করিয়া, ভাগ্যবলে কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, কিম্বা বংশানুক্রমে বিষয় বা উচ্চপদের অধিকারী হয়, তাহার মনে কিছুই নাই। এই জন্য সকলেই আপন উদ্যম ও বুদ্ধি কৌশল সহযোগে অর্থ সঞ্চয়ের উপায় অন্বেষণে সতত ব্যস্ত থাকে। কাজেই, ব্যবসা বাণিজ্য সামান্য দোকান পশার কিম্বা কোন রূপ নীচ শ্রমসাধ্য কার্য্য কেহই ঘৃণা বা নিন্দার চক্ষে দেখে না। এইখানেই মার্কিন জাতির সমূহ বিস্ময়কর উন্নতির এক প্রধান কারণ নিহিত। স্বাধীন ভাবে

স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যদি শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহাতে লজ্জা বা অপমান কি? কিন্তু আমরা 'বাবুর' জাতি; শারীরিক পরিশ্রম আমাদের চক্ষে নিতান্তই ঘৃণনীয় ও নিন্দার্হ; এবং এই জন্যই আমাদিগের এত অধোগতি। আর আমাদিগের প্রকৃত জাতীয় উন্নতি এত অধিক দূরে। বাবুতাপ্রিয় হইয়াই আমাদের অদৃষ্টে এত দাসত্ব ঘটিয়াছে! আর সেই নিমিত্তই স্বাধীন ভাবের একটু সামান্যতম স্ফুলিঙ্গও আমাদের প্রাণের চতুঃসীমার মধ্যে কদাপি বিকাশ পায় না।

সাধুতা ও সরলতা প্রজাতন্ত্রের মূলভিত্তি। দেশের বা রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা যখন সামান্য দরিদ্র শ্রমজীবী হইতে উচ্চ ভূস্বামী পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির হস্তে সমভাবে ন্যস্ত, তখন যদি সকলে চরিত্রবান্, ধার্ম্মিক, সৎ ও সরল প্রকৃতি বিশিষ্ট না হয়, প্রজাতন্ত্রের মঙ্গল সুদূর পরাহত। এই নিমিত্ত মার্কিন দেশীয় সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রিকা সকল প্রতিনিয়ত অক্লান্ত ভাবে ব্যক্তিগত দায়ীত্ব ও পরস্পরের নৈতিক উন্নতির অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে সদুপদেশ প্রদান করিয়া থাকে। সত্যপ্রিয়তা ব্যতিরেকে প্রকৃত সাহস বিকশিত হয় না; আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান না থাকিলে প্রকৃত স্বাধীনভাব হৃদয়ে স্ফূরিত হয় না। নিজে সৎ ও সাধু না হইলে, অপরের বিশ্বাস ও নির্ভর আকর্ষণ করা যায় না। পরস্পরের সরলতা ও সততার প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে একটা বন্ধন হয় না। যে প্রজাতন্ত্র মতে সকলেই স্বাধীন, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সেখানে পরস্পরের এই সততা বোধ, পরস্পরের প্রতি এক সরল গভীর বিশ্বাসই একমাত্র বন্ধনসূত্র। ইহা ব্যতিরেকে সম্মিলন হয় না, সমিতি হয় না, নেতা হয় না; কোন উন্নতি কিম্বা সংস্কার সাধনও হয় না। সুতরাং সাধারণের উন্নতি, দেশের স্বাধীনতা, ও জাতীয় উচ্চতা লাভ হয় না।

এতদুদ্দেশ্যে, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের নৈতিক উন্নতি সাধন কল্পে সহস্র সহস্র নিঃস্বার্থ প্রাণ মার্কিন নরনারী অপরিশ্রান্ত অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে, জীবন মন ঢালিয়া, অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছেন। আমেরিকানদিগের মতে নিরক্ষর ও দরিদ্র ব্যক্তিরাই সমাজের প্রধান ভিত্তি। ভিত্তি অপটু হইলে, সমুদয় প্রাসাদ অচিরে ধ্বংসসাৎ হইতে পারে; আরো, মার্কিনেরা বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই আপন দেশের রাজকার্য্যভার নির্ব্বাহ সম্বন্ধে কিছু না কিছু করিবার বা বলিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক হওয়া উচিত। সুতরাং সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিত বুদ্ধি এবং সুনীতি পরায়ণ না হইলে মনুষ্যের চিন্তাশীলতার সার্থকতা সম্ভব কিরূপে? আর, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি ভাবিবে ও মনে করিবে যে দেশের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করা তাহার কর্ত্তব্য, দেশের হিতাহিতের উপর অন্য এক জনের মত, তাহারও স্বার্থ ও ইষ্ট নির্ভর করে, তখনি প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষণা বৃত্তি সম্যক্‌রূপে স্ফূরিত হয়। কিন্তু এইরূপ চিন্তা শক্তির বিস্তার করিতে হইলে, সাধারণের শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতি যে নিতান্তই আবশ্যক, মার্কিনগণ ইহা কখনই বিস্মৃত হন না। তাঁহাদের মতে রাজতন্ত্রই হৌক, আর প্রজাতন্ত্রই হৌক, যে রাজ্যশাসন প্রণালী মনুষ্যত্বের বা মানব জাতির প্রকৃত সম্মান না করে, তাহা অপবিত্র এবং কোন শাসন প্রণালীই শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য নহে, যাহা মনুষ্যকে পবিত্র সামগ্রী বলিয়া বিবেচনা না করে। প্রত্যেক শাসনতন্ত্রের এই মহোপদেশ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—ইহা বলা বাহুল্য।

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

মধুপুর।

সুন্দর পর্ব্বতপূর্ণ শোভে মধুপুর,
আদি লাবণ্যের লীলা, যে সময়ে উছলিলা,
হঠাৎ জমিলা যেন মধুর মধুর!
গিরি প'রে উঠে গিরি, স্বর্গের শ্যামল সিঁড়ি,
উপরে নন্দন বন নহে বেশি দূর।
অই শোন বাজে বটে, অমরীর কটিতটে,
ভাঙ্গিয়া কামের ঘুম 'ঘুগু'র ঘুঙ্গুর!
অই তারা নাচে গায়, পিকবধূ পাপিয়ায়,
শজারু বাজায় পায় কাঞ্চন-নূপুর!
আলিঙ্গনে সুরবালা, ছিঁড়েছে মুকুতা মালা,
নির্ঝরে সে নিরমল ঝরে মতিচুর!
তারাই চুম্বন দিতে, ফোটা পড়ে অবনীতে,
ফুটিয়া 'সুরেশা' ফুল মধুর মধুর!
সুন্দর পর্ব্বতপূর্ণ শোভে মধুপুর!

২

শৈলে শৈলে মধুপুর শোভে মনোহর,
যেন এ প্রকৃতিরাণী, রচিয়াছে রাজধানী,
অরণ্য প্রদেশে মরি হিরণ্য নগর!
উচু থাম তালগাছে, শিরে শিরে ধরিয়াছে,
আকাশের নীল ছাদ—অনন্ত সুন্দর!
কিবা রাজ-অট্টালিকা, উপরে উঠেছে শিখা,
জ্যোতির্ম্ময় হেমকুম্ভ দেব দিবাকর!
আরণ্য কুসুমে গাঁথা, রত্নসিংহাসন পাতা,
উপরে 'চাম্বল' ছাতা 'সুরঙ্গী' শিখর! *
পদতলে পাদ্য অর্ঘ্য, 'জয়ন্তী' † ও তৃণবর্গ,
অর্পিছে অনন্ত কাল—যুগ যুগান্তর!
শৈলময় মধুপুর বড়ই সুন্দর!

৩

শৈলে শৈলে মধুপুর কত শোভা ধরে,
সুনীল তাম্বুর মত, গিরিশ্রেণী শোভে কত,
সৈন্যের শিবির যেন দিক্ দিগন্তরে!
চারি দিকে শালবন, যেন শিখ সৈন্যগণ,
শ্যামল সাঁজোয়া পরি শ্যাম কলেবরে,
নিশ্চল নির্ভীক দেহ, সংগ্রামে ডরে না কেহ,
বরষে অশনি যদি শত জলধরে,
কিংবা যদি প্রভঞ্জন, এক সঙ্গে করে রণ,
তেমনি কঠিন পণ—পদ নাহি সরে,
অথচ হানে না বাণ, লয় না পরের প্রাণ,
কেমন স্নেহের যুদ্ধ! নিজে যদি মরে—
নীরবে সকলি সয়, যথা রাম দয়াময়,
বাল্মীকির তপোবনে সন্তান-সমরে!
শৈলে শৈলে মধুপুর কত শোভা ধরে!

৪

কত শৈলে কত শোভা রয়েছে ভরিয়া,
কোল হ'তে নামে কা'র, স্নেহের তরল হার,
নির্ঝরিণী খুকীরাণী হামাগুড়ি দিয়া,
বসুধা তাহার কাছে, বুক পেতে নিতে আছে,
পুলকে যেতেছে তার পরাণ প্লাবিয়া!
চন্দ্রমা দিতেছে 'চিক্', হাসাইয়া চারি দিক্,
পাখীরা গাইছে গান 'ঘুম পাড়ানিয়া'!
স্নেহময়ী মাশী পিসী, প্রতিবেশী 'দিবানিশি',
প্রভাতে সন্ধ্যায় করে সোহাগ আসিয়া!
জনমিলে বড় ঘরে, কে নাহি আদর করে,
কে না দেয় করতালি কুতুহলে গিয়া?
দীন বালকের দেহ, ঘৃণায় ছোঁয়না কেহ,
পড়িলে পায়ের কাছে গড়াগড়ি দিয়া!
অনন্ত শোভায় শৈল রয়েছে প্লাবিয়া!

---

* সুরঙ্গী—পর্ব্বত। ইহার শিখরে 'চাম্বল' জাতীয় একটী ঘনপত্র বৃহৎ বৃক্ষ ছত্রাকারে শোভা পাইতেছে।
† জয়ন্তী—নদী।

৫

নানা শৈলে নানা বেশে শোভে মধুপুর,
কোথাও আরক্ত দেহ, মৃণ্ময় পর্ব্বত কেহ,
পড়িয়া রয়েছে যেন প্রকাণ্ড অসুর!
বরষায় শত ধারে, বিদীর্ণ করেছে তারে,
অমর অসির ঘায় মরিয়াছে ক্রুর!
কোথা সে বিদার হ'তে,কোথা সে বিশাল ক্ষতে
গলিতেছে রসরক্ত গৈরিক প্রচুর!
কোথাও কেটেছে হাড়, পাষাণ পঞ্জর তার,
কত অস্থি গদাঘাতে হইয়াছে চুর!
যুগান্ত-যুগান্ত কিবা, খাইতেছে নিশিদিবা,
ফুরাইতে পারে নাই শিয়াল কুকুর!
বিশাল অসুর দেহে ভরা মধুপুর!

৬

উষায় পাষাণ শৈল হয় অনুমান,
অস্থির অঙ্গার স্তূপ, জ্বলিতেছে অপরূপ,
পূরব গগনে যেন দৈত্যের শ্মশান!
কে জানে এ মহানলে, কত যে যুগান্ত জ্বলে,
আরো যে জ্বলিবে কত নাহি পরিমাণ,
সন্ধ্যায় সহস্র তারা, চেয়ে দেখে দেবতারা,
হইল কি না হইল ভস্ম অবসান,
দানবের দৃঢ় অস্থি পর্ব্বত পাষাণ!

৭

সায়াহ্নে পর্ব্বত শোভা বড় মনোহর!
দিবাকর ধীরে ধীরে, নামে যবে গিরিশিরে,
কাঞ্চন চুচুক শোভে স্তনের উপর!
তেমনি পূরব ভাগে,আরেক পর্ব্বতে জাগে,
পূর্ণিমার সুধাপূর্ণ রাঙ্গা শশধর!
নভ তাহে নীল বুকে, পড়ে যেন অধোমুখে,
ধরণী ঘরণী টানে ছায়ার কাপড়!
সায়াহ্নে পর্ব্বত শোভা বড় মনোহর!

৮

বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে,
মধুর 'মহুয়া' ফুলে, বধূর ঘোমটা খুলে,
পাহাড় পর্ব্বত ভাসে মধুর উচ্ছ্বাসে!
চুত মুকুলের গন্ধে, কি উদাস কি আনন্দে,
কার যেন আবছায়া ছায়া মনে আসে,
যেন কোন প'ড়ো বাড়ী,গৃহস্থ গিয়েছে ছাড়ি,
মুড়া ঝাঁটা ভাঙ্গা হাঁড়ি রেখে ইতিহাসে!
আরো যেন আম গাছে,এমনি মুকুল আছে,
দেখিয়াছি কোন্ দেশে দিক্ ভরে বাসে,
তাহারি একটু ঝাঁজ,নাকে লেগে আছে আজ,
এখনি উড়িয়া যাবে, আরেক নিশ্বাসে!
কত মধু প্রাণে জাগে সুখ মধুমাসে!

৯

বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে,
লইয়া উৎসাহ আশা, সুখশান্তি ভালবাসা,
ত্রিদিবের দেবতারা বেড়াইতে আসে!
কেবলি উল্লাস স্ফূর্ত্তি, সকলি সজীব মূর্ত্তি,
স্বর্গের আরোগ্য আনে বসন্ত-বাতাসে!
নবীন জলদ হর্ষে, অমৃতের ধারা বর্ষে,
কঙ্করে অঙ্কুর মেলে তরুলতা ঘাসে!
যেন রেণু বালুকায়, সবাই জীবন পায়,
মরণ ভুলিয়া যায় ধরণী উল্লাসে,
মধুময় মধুপুরে সুখ মধুমাসে!

১০

বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে,
চঞ্চলা বালিকা পরী, চকোরীর গলাধরি,
খেলায় জোসনা রেতে রজত-আকাশে!
কেহ 'জহরুল' ফুলে, চুমা খায় সখীভুলে,
ফোটে অধরের দাগ গোলাপী উচ্ছ্বাসে!
আতর তাহারি গন্ধ, তারি রস মকরন্দ,
উড়ে প্রভাতের অলি তারি অভিলাষে!
পরীর প্রসাদ হায় কে না ভালবাসে?

১১

বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে!
উড়িছে বলাকা শ্রেণী, বিশুভ্র বরফ-বেণী,
বিমল আকাশ গঙ্গা নেমে যেন আসে!
কিবা দিক্-বালিকার, রজতের চন্দ্রহার,

নিবিড় নিতম্বে মরি থল থল ভাসে !
সন্ধ্যার শীতল বায়, নীল মেঘ সরে যায়,
বসন্ত আঁচল তার টানিছে উল্লাসে !
লজ্জায় ডুবিছে রবি, সুরুচির চারু ছবি,
নিলাজ বেহায়া কবি তাই দেখে হাসে !
এত 'ছি.ছি !' মধুপুরে সুখ মধুমাসে !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

কাব্যকুসুমাঞ্জলির কবি।

আমাদেরি গৃহে একটি সুন্দর সুগন্ধি কুসুম ফুটিয়া আছে, আমরা আজও বুঝি বা চিনি নাই। বোধ হয় নিশ্চয়ই এক দিন চিনিব ; কিন্তু হায়, যখন—

"————————all
Rush in to Peer and Praise when all in vain
Browning.

সে

'নীরবে ফুটায় সাধ
নীরবে শুকায় আশা,
নীরবে কবিতা তার
গাহিবে প্রাণের ভাষা।'

আরও—

'নীরবে সাঁঝের তারা
তার পানে চেয়ে রয়,
আদর সম্ভাষ সবি
নীরবে নীরবে হয়।'

সে—

'নীরবে মুদিয়া আঁখি
সে মুখ হেরিয়া হাসে,
নীরবে জনম তার
নীরবতা ভালবাসে।'

বিগত প্রণয়ের সুখস্মৃতি যেখানেই উদাসিনীর হৃদয় ব্যাকুল করিয়াছে, সেখানেই তাহার আভাষ আছে, কিন্তু তাহা কি সুন্দর, সুশীল, সংযত এবং সাবধানতার সহিত অভিব্যক্ত ! প্রিয়তমের বিয়োগে ব্যথিত হৃদয়খানি হা হতোম্মির উচ্ছ্বসিত উচ্ছৃঙ্খল স্রোতে কৃপাপাত্র নিরবলম্বনের মতন যেখানে সেখানে ভাসিয়া বেড়ায় নাই, তাহা ফল্গুনদীর গভীর বালুকাস্তরের নিম্নে, লোক নয়নের অন্তরালে, নীরবে তাহার প্রাণের দেবতার জন্য করুণ ক্রন্দন করিয়াছে।

আর, সাধনশীল গৃহী যোগী যেমন সম্পূর্ণ সংসারটার মধ্যেও লক্ষ্য রাখিয়াছেন এক অবিনাশী পদার্থে, তেমনি ইহাতেও সংসারের কথা দিয়াই কবি স্বর্গের দিকে অঙ্গুলি হেলন করিয়াছেন। এ শোভা ইহাতে প্রচ্ছন্ন নয়, সমুজ্জ্বল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের শাস্ত্রাংশ ও কাব্যাংশ পরস্পর বিষয়াংশে যেমন পৃথক্, সে হিসাবে 'কাব্যকুসুমাঞ্জলির' দর খুব বেশী। যে কয়েকটি সাধারণ কথা লইয়া আমাদের নিত্য ঘরকন্না, তাহারি ভিতর দিয়া 'আমার দেবতার' সরল বিশ্বাসী বিশ্বপতির সত্তা কেমন বুঝিয়াছেন :—

অই যে ভাসিছ তুমি নৈশ সমীরণে,
অই যে চাঁদের কোলে
তব চন্দ্রানন দোলে !
এই যে জাগিছ তুমি আমার নয়নে !
গাহিছে বিহঙ্গ বালা তুলিয়া লহরী,
বাগানে ফুটিছে ফুল,
হাসিছে জোনাকী কুল,
ভুবন ভরেছে মরি ! তোমার মাধুরী !

যদি সাকার উপাসনা থাকে, তবে তাহা ইহাই নয় কি ? আর যদি বেদবেদান্ত উপনিষদ-প্রতিপাদ্য বিরাট ওঁকার ধ্যান বল, তাহাও এই কয়টি কথার মধ্যে,—বেশী বক্তৃ-

তার কিছু নাই। বুঝি পুণ্যফলে তিনি একথা বুঝিয়াছেন; বুঝিয়া কি সুন্দর গাহিয়াছেন—

মিছে খুঁজিয়াছি আগে কোথা তুমি রয়ে,
এখন দেখিনু তাই
তোমাময় সব ঠাঁই,
তুমিই রয়েছ সদা বিশ্বময় হ'য়ে।

আর কি দিয়া সেই পরম দেবতার পূজা হইয়াছে? কর্ম্মকাণ্ডময় কোন সম্বল ত নাই। তবু ঐ যে দেখ, তিনি দেবোদ্দেশে যে উপহার দিতেছেন, সর্ব্বান্তর্যামী পরম আদরে নিশ্চয়ই তাহা গ্রহণ করিবেন;—

আবার প্রণমি আমি ধর আর বার,
কিবা দিব উপহার
দিতে কিবা আছে আর?
অশ্রুধারা বিনা আজ্ কি আছে আমার?

কবির সুরভি কবিতাগুচ্ছের সর্ব্বত্র বিশ্বজনীন স্নেহ ভালবাসার যে সৌরভ পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার প্রতি এক অকপট স্থায়ী শুদ্ধভাবের উদয় হয় এবং তিনি যে আমাদের সকলেরই একজন বিশ্বস্ত ও নিরাপদ সুহৃদ্, অজ্ঞাতসারে হৃদয় যেন তাহাই ভাবিতে ভালবাসে। আমার বোধ হয়—তাঁহার 'পতিতোদ্ধারিণী,' 'মায়ের সাধ,' 'অভাগিনী,' 'আমাদের দেশ,' 'নরবলি' 'ভিখারী,' 'ছোট ভাইটি আমার,' 'পিপাসী,' 'শোকাতুরা মা,' 'পথিক,' 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' 'ভ্রাতার প্রতি ভগ্নী,' প্রভৃতি কবিতা যিনিই দেখিবেন, তাঁহারি মনে এই সকলের সহিত এক অতি অন্তরঙ্গ সহানুভূতির উদ্রেক না হইয়া থাকিবে না।

'ভ্রমর' তাঁহার যথার্থ সমাজচিত্র। সরলা, পবিত্রস্বভাব ভ্রমর অভাগিনী বঙ্গকুলবধূ। ভ্রমরের চরিত্র বুঝাইতে আমাদের অযোগ্য আয়াস স্বীকার নিষ্প্রয়োজন, বঙ্কিমচন্দ্র সে চরিত্র চিত্রাঙ্কনে সফল হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই লাঞ্ছিতা পতিপ্রাণার উদ্দেশে বলিতে বলিতে কাব্যকুসুমাঞ্জলির কবি অনন্ত সত্ত্বে যাহা অকৃতজ্ঞ, কৃপাপাত্র গোবিন্দলালকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, তেমন গোবিন্দলাল আমরা অনেকে। বঙ্গজননীর অনেক ভ্রমর অসৎপুরুষের মুখ চাহিয়া আছে; কত রমণী প্রাণদিয়া ভালবাসিয়াও প্রতিদানে বিপরীত পাইয়াছে। আরাধ্য পতির একটুখানি স্নেহ ও আদরাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া মুগ্ধা বলিতেছে—'ছাই রাজরাণীর সম্পদসুখ, তুলনায় যদি তাহার একটু সোহাগ পাই; আর পতিপ্রেম আশালুব্ধ তাহার হৃদয়হীন, নির্ম্মম প্রতিদান বুকপাতিয়া সহ্য করিতেছে,—অবিশ্বাস—অনাদর—ঔদাস্য!' এখানে কবির কি প্রাণস্পর্শীসম্বোধন!—

হায় অভাগী ভ্রমর!
অনন্ত বিশ্বাস আশা,
সীমাশূন্য ভালবাসা,
যে পতি-চরণে সতী ঢালে নিরন্তর,
সেই কিনা কালো বলে'
চলে যায় পায়ে দলে,'
সে খোঁজে "কাহার রূপে আলো করে ঘর"
কার এ কপাল পোড়ে, অভাগী ভ্রমর!
হায় অভাগী ভ্রমর!
সাবাস্ পুরুষ প্রাণ,
এ উপেক্ষা অপমান,
দিতে কি একটুখানি হ'ল না কাতর?
ও কালো বুকের তলে
স্বর্গমন্দাকিনী চলে,
বুঝিলনা একবারো নিঠুর বর্ব্বর!
এই কি সংসার সুখ, অভাগী ভ্রমর?

সহানুভূতি-কাতর কোনও পুরুষ কবি এস্থলে মহিলা কবির মতন এমন অভেদ অন্তরঙ্গের কথা বলিতে পারিতেন না। কুলরমণীর প্রতি কুলরমণীর কি মধুর একান্ত সম্বোধন!

কবির বিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলিও মানস সৃষ্টির এক একটি সুন্দর কুসুম। তাহার উদ্দেশ্য কোমল, অথচ অনুভবে তীব্র। তাহা ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর অতি করুণ আত্ম-বেদনার কথা, অথচ তন্মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা অলক্ষিতে অপরাধীর মনে তাহার আত্ম-কৃতাপরাধের কথা অনুশোচনার সহিত স্মরণ করাইয়া দেয়। গুণপনা এই, ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর উক্তি তাঁহার মর্ম্মাশ্রুর সহিত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে; অথচ ভ্রাতাকেও সেই সঙ্গে পরিতাপিত হইয়া যথেষ্ট লজ্জিত হইতে হই-য়াছে। ইহাতে পরস্পর বয়স্যোচিত পরিহাস রসিকতার ছায়াও পরিলক্ষিত হয় না, বরং ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর যথার্থ সম্বন্ধের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই কথাগুলি নির্দ্দোষ বিদ্রূপে পরি-ণত হইয়াছে। এক কথায় ইহা সোঝাসুঝি তিরস্কার নয়, অথচ সুকোমল বিদ্রূপাত্মক তিরস্কার; ইহা সোঝাসুঝি পরিহাস নয়, অথচ শ্লেষাত্মক বিদ্রূপ। স্নেহের ভগ্নী যখন ভ্রাতার অযথা জ্ঞান গর্ব্বোজ্জ্বল মুখের দিকে তাঁহার লজ্জানত নয়ন-পল্লব ঈষৎ তুলিয়া ধরিলেন, তখন জ্ঞানগর্ব্ব স্ফীত ভ্রাতা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল, স্থির কৃষ্ণনীলাভ নয়ন প্রান্তে একটু ঘৃণা, একটু অবিশ্বাস, একটু অনুযোগ ও সেই সঙ্গে তীব্র লজ্জার আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবাল-রাগ-রক্তাধর-প্রান্তে বিদ্রূপের আধ-প্রচ্ছন্ন হাসিটুকু লুকাইবার চেষ্টা করিয়া ভগ্নী যখন কৌশলে আত্মদৈন্য বলিতে লাগিলেন—

কেন ভাই। আজি হেন ডাকিছ গো আকুলি?
পড়ে' আছি এক কোণে
কেন হেন প'ল মনে?
সহসা মমতা কেন উঠিল বা উথলি?
এসে এসে ফিরে যাই
ভয়ে না আসিতে পাই,
আমি বোন্ তুমি ভাই, জানিছ ত সকলি,
তবে কেন "জাগ জাগ"—ডাক আজি কেবলি?
দাঁড়াতে তোমার পাশে মানা করে' দিয়েছ,
তুমিই দিয়েছ ভয়
"একাল সেকাল নয়"
সাহস ভরসা বল তোমরাই নিয়েছ!
কি কব কপাল মন্দ
জেগে কি করিবে অন্ধ?
আজি কি পুরাণো কথা সব ভুলে গিয়েছ?
আমাদের যাহা ছিল তোমরাই নিয়েছ!

তখন শুনিতে শুনিতে আত্মপ্রশংসা-পরা-য়ণ ভ্রাতার উন্নত শির অবনত হয়, লজ্জায় অপরাধী ভ্রাতা ভূতলে দৃষ্টি সংন্যস্ত করে। পবিত্রতাময়ীর মুখের দিকে তিনি তখন তাকাইতে সাহস করিলেন না। হৃদয়ে যত্ন-পালিত অপরাধ লইয়া কোন্ মুখে আমরা আমাদের জননী ও ভগিনীর নিষ্কলঙ্ক মুখের দিকে তাকাই? আমাদেরি অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া তিনি আবার কহিতেছেন ঃ—

তোমাদের মাতা কিগো আমাদের জননী?
তোমরাত ধুরন্ধর
আর্য্যগণ বংশধর,
কি মুখে কহিব, মোরা তোমাদের ভগিনী?
তোমরা শিক্ষিত সভ্য
রুচিমান্ নব্য ভব্য,
আঁধারে আঁধারে মোরা ঘুরি দিবা রজনী,
আপনার দশা হেরি লাজে মরি আপনি।

শুধুই রহস্য নয়, সার্থক অনুযোগ! ভ্রাতার নিকট নিরাশ ভগিনীর ন্যায্য আকাঙ্ক্ষার কেমন স্বাভাবিক সংযত উক্তি! এ কথায় আমরা হিন্দুকুলবালার মন বুঝিয়াছি। বুঝিয়া তবু মর্ম্মপীড়িত,—আমাদের নয়ন-প্রান্তে অশ্রু-কণা! কেন, তাহাকি খুলিয়া বলিতে হইবে?

আর পর, আর একটু তীব্রতা আছে! কঠোর সত্যকথা, অথচ যেন অপ্রিয় কথা

কখনই নয়। হিতৈষিণীর তীব্র ব্যঙ্গোক্তি, অথচ বিদ্রূপের চঞ্চল কটাক্ষ নয়।—

ভেবেছিনু একদিন বড় হবে তোমরা,
পুলকে দেখিব চেয়ে—
জ্ঞানের আলোক পেয়ে
সাজাবে জনমভূমি অলকা কি অমরা;
সে আশা হয়েছে হত
এখন ভঙ্গিমা কত!
মুখে শুধু হাঁকাহাঁকি বুকে বিষপসরা!
তোমরা করিলে সব বাকী আছি আমরা!

তিরস্কার হইলেও ইহা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যমাখা এমন একটি যথার্থ কথা যাহা মাথাপাতিয়া মানিয়া লইতে হয় ও শত মুখে সুমার্জ্জিত রুচি, ভাবসম্মিলন, শব্দ-প্রয়োগ-নৈপুণ্য এবং স্নেহ-প্রবণ সহৃদয়তার প্রশংসা না করিয়া কোন মতেই থাকা যায় না।

মহিলাকবির কবিতাগুচ্ছ যথার্থই যেন সুন্দর সুগন্ধি বন-যূথিকা। ইহা রাজোদ্যানের সযত্নশোভিত গোলাপ চামেলি নয়; কোলাহলোচ্ছ্বাসময়ী নগরীর বিলাস-পুষ্প-শয্যায় মদালস-শায়িত সুন্দরী যুবতীদিগের চারু অঙ্গে শোভা পাইয়া ইহা অত্যুগ্র সৌন্দর্য্য-লালসা উদ্রেক করে না; এই অনাঘ্রাত, পার্থিব করবিক্ষত কুসুম লোকনয়নের অন্তরালে, যেখানে স্নেহময়ী সরলা বনবালা তাহার স্নেহযত্ন বর্দ্ধিত তরুলতায় তাহার শুভ্র হৃদয়খানি সমর্পণ করিয়াছে, যেখানে শান্ত প্রেমময় মুনিগণের তপোবনবেষ্টিত বন-পুষ্প-লতা, মুক্তপালিত নির্ভীক নিরীহ হরিণশাবক, হংসমিথুন, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম এবং পুষ্পভারাবনত তরুশাখা-সখী ঐ ঋষিগণের বিশ্বপ্রেমময় উদার হৃদয়োচ্ছ্বসিত স্নেহলাভ করিয়াছে, ইহা সেই দেবনন্দনোদ্যানের পারিজাত।

যদি প্রতীচ্য তুষার-শুভ্র-সুন্দরীগণ আমাদের এই মন্দার কুসুমশোভা দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই সরলা নীলনয়না বলিত—

"Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear;
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air"

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

তুমি কি দেবতা?

১

স্তব্ধ নিশীথে শয্যা উপরে
স্বপ্নে যুবতী বসিল উঠি,
শ্লথ-বন্ধন মুক্ত কবরী
পৃষ্ঠদেশেতে পড়িল লুটি;
ভুলিল টানিতে বক্ষে বসন,—
লজ্জা তখন নাহিক প্রাণে,—
স্বপ্ন-খচিত চক্ষু দুটিতে
চাহিল সুপ্ত পতির পানে।

দ্বাদশীর চাঁদ পশ্চিমাকাশে
হেলাইয়া তনু পড়েছে ঝুঁকি,
আড়ালে থাকিয়া বাতায়ন-পথে
কক্ষ ভিতরে মারিছে উঁকি;
মন্দ পবন নন্দন ভ্রমি
গন্ধ মাখিয়া দাঁড়াল এসে,
অচপল, তবু নিশ্বাস-ভরে
সৌরভ ঘরে এসেছে ভেসে;
জ্যোৎস্না-আড়ালে পাতিয়েছে আড়ি

কৌতুকভরা তারকা শত,
জড়াজড়ি করি—নববধূ ঘরে
কিশোরী বালিকাগণের মত !
না দেখিল চাঁদ, না দেখিল তারা,
না জানিল মৃদু-অনিল-শ্বাস,
নাহি সম্বরে মুক্ত কবরী,
নাহি সম্বরে বুকের বাস ;
জাগ্রত চোকে, নিদ্রিত মনে,
বিস্মিত যেন,হেরিছে,—কি এ ?—
স্বপনের ছবি, নিদ্রার পারে,
এসেছে মানব-শরীর নিয়ে ?
কিন্নরী-বীণা-নিন্দিত স্বরে
মানবী-কণ্ঠে ঝরিল কথা,—
"প্রিয় ! তুমি কি দেবতা ?"

২

"প্রিয় ! তুমি কি দেবতা ?"—
স্বপ্ন-বেলায় প্লাবি, এই কথা
সুধা-তরঙ্গে উছলি যায়,—
বর্দ্ধিত করি জ্যোৎস্না প্লাবন,
স্পন্দিত-হৃদি বায়ুর ভায় !

৩

নিদ্রিত-পতি-চরণ প্রান্তে
চঞ্চল আঁখি চলিল আগে ;
নগ্ন, সুঠাম, চিত্ত-বসতি
বক্ষেতে পরে ক্ষণেক জাগে ;
সুপ্তি-শান্ত, মুদ্রিত-আঁখি,
শ্লথ-কুঞ্চিত-নিবিড় কেশ,
প্রতিভাদীপ্ত পূর্ণ ললাট
বদনে সুধীরে আসিল শেষ।
চন্দ্রকিরণে মণ্ডিত চারু
সুন্দর সেই মহিমা-ছবি
দীপ্তিছটার উল্লাসে, যথা
স্নিগ্ধ কিরণ প্রভাত-রবি ;
স্বর্গ উচিত সূক্ষ্ম সুরভি
নিশ্বাসে যেন আসিছে বহি,—
চঞ্চল আঁখি সুস্থির এবে,
মুগ্ধ নয়নে রহিল চাহি।
কৌমুদী-মৃদু গৌরব জিনি
নয়নে কোমল আলোক ভায়,
কল্পনা, যাদু বিস্ময় ঢালি,
বাসবের ধনুঃ মেখেছে তায় ;
সুপ্ত সাগরে চন্দ্রমা মত
চুমে প্রিয় মুখে সে আলো কিবা,—
প্রতিভার সোনা, চাঁদের রজত,
জিনিয়া ত্রিদিব-বিমল-বিভা !
স্বপ্ন-তাড়িত হৃদয়-তন্ত্রী
ঝঙ্কারে মৃদু পুলক ব্যথা,—
"প্রিয় ! তুমি কি দেবতা ?"

৪

"প্রিয় !"

অজ্ঞানের পঙ্কে থাকি, রবিমুখে পদ্মমত,
চেয়ে থাকি তোমা পানে ;- অস্ফুট সুরভি কত
হৃদয়ের থরে থরে ঘনীভূত হয়ে রয়,
ইন্দ্রিয়, চেতনা, মন, তাহে পরিমলময়।
চাহিনা জানিতে কিছু;তোমার আলোকপ্রাণে
ধরিব, রহিব শুধু তোমারি মূরতি-ধ্যানে।
এই ত শুনিতেছিনু তব মুখে মধুকথা,
সাবিত্রীর দৃঢ় পণ, মৈথিলীর পুণ্য ব্যথা ;—
জানি না কেমনে,কিন্তু সে কাহিনী পুণ্যস্রোতে
ভাসিয়া এলাম কোথা,একেলা,অজানা পথে।
সে দেশের শোভা যেন পৃথিবীর শোভা নয় ;
শরীরের প্রতি অণু মনে হলো প্রাণময় ;
জড়তা যেখানে ছিল চেতনা সেখানে জাগে ;
রূপের, রিপুর তৃষা পরিণত অনুরাগে।
নবীন শতেক প্রাণে ভরিল আমার বুক,
কাঁদিল শতেক প্রাণে না হেরে তোমার মুখ

'প্রিয়!' বলে ডাকিবারে চাহিলাম সেবিজনে,
ডাকিতে নারিনু; তবু ডাকিলাম মনে মনে।
তপঃ-সাধনার পরে আশীর্ব্বাদে পুরি আশা,
কে যেন কহিল হৃদে অজানা মধুর ভাষা;
শব্দ তার না বুঝিনু, বুঝিনু কি অর্থ ধরে,
চাহিনু, আকুল-আঁখি, মুখ তুলি, শিরোপরে।
দূরতা, যোজন শত, দৃষ্টি নাহি বাধা দিল,
কি যে শক্তি অমানুষী নয়নেতে সঞ্চারিল;
যা দেখিনু সেথা, প্রিয়, না ভুলিব জন্মে আর,
আলোক-তরঙ্গে খেলে সুষমার পারাবার;
অঙ্কুরিত যে কল্পনা মর্ত্ত্য-হৃদি-মাটি মাঝে,
সে আলোক দিকে চাহি ফুটিল কুসুম-সাজে;
মণ্ডল মাঝারে যেন শরতের যুবা রবি,
বিভাসিল তার মাঝে তব ওই মুখছবি;
চাহিনু সে মুখ পানে; পুলকে হারানু জ্ঞান,
ইষ্টদেব দরশনে যথা ভকতের প্রাণ;
বিপুল পুলকে তবু গভীর বিষাদ রেখা
পড়িল; কাঁদিনু মনে,—'খালি চোকে২ দেখা?
তৃপ্ত নহে দরশনে,—রমণীর কি পিপাসা!
পরাণে মিশিতে চাহে,—রমণীর কি দুরাশা!
মানস রোদন মম, ধরিয়া কুসুম-কায়,
ছুটিল সে শূন্যপথে, লুটিতে তোমার পায়;
হেরিনু অনন্ত যেন করুণা তোমার মুখে
শত উৎসে উছলিল; নিরুপম শান্ত চোকে
চাহিলে আমার পানে; সুধাময় জ্যোতিঃ তার
ভেদি সে নিবিড় আলো (সূচিভেদ্য অন্ধকার
ভেদিয়া বিচরে যথা চামেলির পরিমল),
ধাইল আমার পানে, প্লাবিয়ে বিমান তল।
তোমার করুণা-জ্যোতিঃ বেদনা-কুসুম মম,
মিশিয়া আধেক পথে ধরিল কি অনুপম
বালক-মূরতি চারু; চরণ হইতে গ্রীবা
রচিত আমার ফুলে; তোমার অতুল বিভা
রচিল মস্তক তার; আসিল আমার কাছে,
বক্ষেতে ধরিনু তার, ব্যথা দেহে লাগে পাছে।
পুলকে পূরিল তনু; আঁখি নিমিলিত করি,
চুমিনু তাহার মুখে শতবার প্রাণ ভরি।
মনোভব সে শিশুটি কহিল আমার কাণে,—
'এস মা আমার সাথে, ঘুচিবে বেদনা প্রাণে!'
নয়ন মেলিয়া দেখি,—ইন্দ্রজাল চমৎকার!—
যে দৃশ্য দেখিতেছিনু তাহা ত নাহিক আর!
নন্দনকাননমাঝে, মন্দাকিনী উপকূলে
সুগন্ধ কুসুমনম্র মন্দারতরুর মূলে,
কনকসৈকত' পরে, পল্লব শয়নে তুমি
ঘুমায়ে রয়েছ, দেব, আলো করি দেবভূমি।
শশী নীলাকাশ যেন উছলে রজত হাসে,
উছল-হৃদয়ে আমি বসিয়া তোমার পাশে।
অসীম বাসনাভরে চাহিনু চুমিতে মুখে,—
নারিনু মিটাতে সাধ,—সাহস হলো না বুকে
'তুমি কি দেবতা?' বলি, চুমিনু চরণ-তল,
পরে শুধু হেরিতেছি তব মুখ নিরমল।"

* * * *

নিদ্রার আবেশ পুনঃ আসিল নয়নে ফিরে,
বিকচ কমল পুনঃ মুদে আসে ধীরে ধীরে,
পতির চরণ ছুঁয়ে সে কর মাথায় নিল,
ঢুলু ঢুলু আঁখি ফিরে প্রিয়-মুখ নেহারিল।
আধ-ভাঙা কথাগুলি অবশে ঝরিল মৃদু
(কাঁপিল ঈষৎ বায়ু, চমকিল তারা, বিধু)—
"বল, গো, ব্যগ্রতা করি, তুমি কি দেবতা, প্রিয়!
মানবীর এ পিপাসা,—অপরাধ নাহি নিও!"
বলিতে বলিতে, ধীরে ঢালিল অলস দেহ
নিদ্রিত সে বক্ষোপরে,—পরিচিত প্রিয় গেহ,
নিদ্রিত অধরে প্রিয় চুমিল ঘুমের ঘোরে,
মিটিল বুঝি সে তৃষা যাহা ছিল প্রাণ ভোরে।
গভীর নিদ্রার শ্বাস পতির কপোলপাশে
বহিল, যেমন বহে মলয় প্রভাতাকাশে।
অভ্যাসের বশে সেই প্রিয়ভার না জানিল,
অধরে ঈষৎ শুধু হাসিরেখা দেখা দিল।

* * * *

৫

কৃত্তিকা কহে রোহিণীর কাণে,—
"মিথ্যা মোদের দেবতা-ভাণ,
স্বর্গ ছাড়ায়ে উঠেছে, দেখনা,
মর্ত্ত্য একটি কোমল প্রাণ!"
সপ্তবিংশতি তারকার পতি,
অমৃতভাণ্ডার দেখিয়া খুঁজি,
সরম-জলদে ঢাকে চাঁদমুখ,
এর সমতুল না পেয়ে বুঝি!
নম্র, মথিত, শতেক কুসুমে
মত্তবিলাসী অলস বায়
দীর্ঘশ্বসিল, ভাবি মনে মনে,—
"এ পূজা জীবনে না পেনু, হায়!"

৬

পূর্ণ পরাণে, তৃপ্ত মানসে,
জাগিল যুবতী পতির উরসে,
প্রভাত বেলা;
শিশু কন্যাটি, উষার মতন
(বসুধা আকাশে যেথা আলিঙ্গন)
করিছে খেলা!

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

নেপালের পুরাতত্ত্ব। (১)

প্রথম অধ্যায়।

সাধারণ বিবরণ।

নেপালের উত্তর সীমায় জনশূন্য হিমালয় পর্ব্বত ও তিব্বত, পূর্ব্ব সীমায় মেচি নদী, সিঙ্গথা পর্ব্বত, সিকিমি ও দারজিলিং জিলা, পশ্চিমে (সরদা) কালী নদী ও কুমায়ুম,দক্ষিণ পশ্চিমে পূর্ব্ব অযোধ্যার অন্তর্গত পিলিভিত, খেরি, বারাইচ ও গোণ্ডা জিলা,এবং দক্ষিণে বস্তি, গোরখপুর, চম্পারন, মজফরপুর, দারভাঙ্গা, ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জিলা অবস্থিত। পূর্ব্ব পশ্চিমে এই পার্ব্বত্য প্রদেশের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫১২ মাইল এবং উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত প্রায় ৭০ হইতে ১৫০ মাইল। নেপালের পরিমাণ ফল ৫৪০০০ বর্গ মাইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কাহারও মতে নেপালের বার্ষিক আয় ৩০ লক্ষ, কাহারও অনুমান অনুসারে ৪৩ লক্ষ এবং অন্য কাহারও মতে এক কোটী টাকা।

মুরঙ্গ, চৈনপুর, মকমনি, খটঙ্গ, নেপাল, গুরখা, খাচি ও মলিভুম এই কয় প্রদেশে নেপাল বিভক্ত। করনালি, গণ্ডক, ত্রিশূল গঙ্গা, বুড়ী গণ্ডক, কোশী, ঘর্ঘরা (সরযূ) ও বাগমতী নদী তিব্বতের দক্ষিণস্থ মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া নেপালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কোন নদীই কোন সময়ে যাতায়াত বা বাণিজ্যবর্ত্ম রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কাটমণ্ডু, ললিত-পত্তন, ভাটগাঁও, গুরখা,জমলা ও মকোয়ানপুর নগর বিশেষ প্রসিদ্ধ। নেপাল উপত্যকাস্থিত কাটমণ্ডু নগরীতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক বাস করে। ইহা নেপালের বর্ত্তমান রাজধানী। বাঙ্গলার সমতল হইতে কাটমুণ্ড নগর ৪৭৮৪ ফুট উচ্চ। ৩০০০ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চ উপত্যকায় নেপালের অধিবাসীরা বাস করিয়া থাকে। এই সকল

উপত্যকার মধ্যে নেপাল বৃহত্তম। ইহা দৈর্ঘ্যে ১২ মাইল ও প্রশস্ততায় ৯ মাইল। ইহার চতুর্দ্দিকে উচ্চপর্ব্বতমালা অবস্থিত; ইহার দক্ষিণে চন্দ্রগিরি এবং উত্তরে সেওপুরি ও সীবজীরিয়া পর্ব্বত অবস্থিত।

প্রবাদ আছে যে কাশ্মীরের ন্যায় এই উপত্যকা অতি প্রাচীন কালে জলময় হ্রদে পরিণত ছিল। কৃষিজীবী, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী নেওয়ার জাতি এই উপত্যকায় অধিক সংখ্যায় বাস করে। নেওয়ার জাতি হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী। পূর্ব্বে তিব্বতীদিগের ন্যায় নেওয়ারগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিল। তাহারা তাতার জাতির বংশধর। তাহাদের মুখাকৃতি চীনদেশীয় লোকের মুখাবয়বের অনুরূপ। গুরখা, নেওয়ার, ভুটিয়া,কিরাত,পার্ব্বতীয়া ও নিম্ব প্রভৃতি আদিম অসভ্যজাতি নেপালের প্রধান অধিবাসী। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী গুরখা জাতি হইতে নেপালের মহারাজা এবং গোরখা ও নেওয়ার জাতি হইতে রাজকর্ম্মচারীগণ উদ্ভূত হইয়াছেন।

নেপালের দক্ষিণাংশ 'তরাই' নামে পরিচিত। ইহা নিবিড় বন জঙ্গল ও জলা ভূমিতে পূর্ণ। ইহার জলবায়ু অতি অস্বাস্থ্যকর। তরাইর ভূমিতে ধান্য, পোস্তা,তিসি, রাই,তামাকু এবং উম্বুরের চাষ হয়। চৈত্র হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত এখানে জ্বররোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হয়। তরাইর উত্তরে যে নিবিড় বনভূমি আছে, তথায় শাল, শিশু, ভঞ্জ,কত, ওক,পাইন,চম্পা প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে। এই বনভূমির উত্তরে পার্ব্বত্য প্রদেশ আরম্ভ হইয়াছে। জঙ্গলে চেরি, পিয়ার ও চা গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। 'জিয়া' নামে একপ্রকার শাল গাছের পাতার রসে যে 'চরস' প্রস্তুত হয় তাহা, ধুনার ন্যায় জলিয়া থাকে। সকলের উত্তরে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত হিমালয়, এবং তাহার শৃঙ্গ এভারেষ্ট (২৯০০২ ফুট), ধবলগিরি (২৬৮৬২ ফুট) গোসাইথান ও কাঞ্চন জঙ্গা (২৮১৫৬ ফুট) অবস্থিত। ভুটিয়াগণ তিব্বতের সন্নিহিত পর্ব্বতমালায় বাস করিতেছে।

সমুদ্র জলের উপরিভাগ হইতে বিবিধ উচ্চতা অনুসারে নেপালের জলবায়ু অতিশয় বিচিত্রতা ধারণ করিয়াছে। নেপালের উচ্চতা সমুদ্র জলের উপরিভাগ হইতে ৪০০০ ফুটের ন্যূন হইবে না। চির নীহারাচ্ছন্ন হিমালয় পর্ব্বত হইতে কদাচিৎ বায়ু দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়। চৈত্র মাসের মধ্যাহ্নে তাপ ৮০ হইতে ৮৪ ডিক্রীর অধিক হয় না। এখানের জল বায়ুতে আফ্রিকার মরুভূমির অতি ভীষণ উত্তাপ ও সাইবিরিয়ার দুঃসহ শীত যুগপৎ অবস্থিতি করিতেছে। জলবায়ু সাধারণতঃ দক্ষিণ ইউরোপের ন্যায় নাতিশীতোষ্ণ। দক্ষিণ পূর্ব্বদিক্ হইতে এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। অতি বৃষ্টিতে সময় সময় উপত্যকাস্থিত নদীতীর আপ্লাবিত হইয়া শস্য নষ্ট করে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে নেপালে বৃষ্টিপাত শীঘ্র শীঘ্র আরম্ভ হয়। কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টিপাত ক্ষান্ত হয়। শীত ৩।৪মাস স্থায়ী হয়। শীতের প্রভাবে পর্ব্বতশিখর বরফে আচ্ছন্ন হয়। নিম্নতন উপত্যকাস্থিত দীর্ঘিকাদি জলাশয় সময় সময় জমিয়া যায়। নদীর স্রোত জল কখনও প্রস্তরবৎ কঠিন হয় না।

নেপালে লৌহ,তাম্র, গন্ধক, সীসা ও হরিতালের খনি আছে। পূর্ব্বে নেপাল হইতে অযোধ্যায় প্রচুর তাম্র রপ্তানী হইত। পূর্ব্বে খনিজ দ্রব্য হইতে বৎসরে ২।৩ লক্ষ টাকা আমদানী হইত। গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী প্রস্তর ও চুণা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তামা, কাঁসা ও লোহার নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

কলিকাতায় ইউরোপীয় তাম্র একটাকা দরে সের বিক্রয় হইলে, নেপালী তাম্র দেড় টাকা দরে বিক্রীত হয়। ছুরি,বন্দুক,তরবারী,কামান, কাগজ ও মোটা কাপড় নেপালে প্রস্তুত হয়। তাম্র, লৌহ, কাষ্ঠ, তারপিন তৈল, অশ্ব, চমরীর লেজ,হস্তিদন্ত,মধু, মোম, বাজ ও ময়না পক্ষী, আফিম, চিরতা, সোহাগা, মৃগনাভি, কত, পাট, মঞ্জিষ্ঠা, মরীচ, হলদী, ঘি, চর্ম্ম, চাউল, শুষ্ক আদ্রক, সরিষা, তিসি, ধনিয়া ও নানাবিধ ফল মূল বিদেশে রপ্তানী হয়।

নেওয়ার জাতি কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কৃষক পত্নীরা বীজাদি বপন কার্য্যে কৃষকদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। কৃষকেরা কদাচিৎ হল চালনা করিয়া থাকে। ধান্য, গোধুম যব, মকাই, সরিষা, মূলা,পিঁয়াজ আলু, আদ্রক,ধনিয়া,গোলমরীচ, ইক্ষু ও তুঁত কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে প্রধান। গোময়াদি ও এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ আঁঠাল মৃত্তিকা, ক্ষেত্রে সার দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। তোরি নামে এক প্রকার উৎকৃষ্ট তরকারী নেপালে উৎপন্ন হয়। ধান্যক্ষেত্রে বৎসরে মোটা ও সরু এই দুই প্রকার ধান্যই জন্মিয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর ক্ষেত্রে ধান্য, গোধুম ও যব, মকাই সরিষা, গোলমরীচ, আলু, পিঁয়াজ প্রভৃতি শস্য বৎসরে বৎসরে উৎপন্ন হয়। খাটমুণ্ডু নগরের ইংরেজ রেসিডেন্সীতে সর্ব্ববিধ ইংলণ্ডীয় ফল, ফুল তরকারী জন্মিয়া থাকে। এক প্রকার পার্ব্বতীয় লৌহনির্ম্মিত খুন্তী দ্বারা ক্ষেত্র মধ্যে গর্ত্ত করিয়া, বর্ষার জলপ্লাবনে গর্ত্ত সকল পরিপূর্ণ হইলে তন্মধ্যে ধান্যবীজ রোপিত হয়। চাউলই নেপালীদিগের প্রধান খাদ্য। ঘিয়া ধান্য জলসেচন ভিন্ন অত্যুচ্চ স্থানে জন্মে। হল দ্বারা রীতিমত চাষের প্রণালী নেওয়ারী কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। নেপালে হল বা গোচালিত শকট দেখা যায় না। জলসেচনের প্রথা প্রচলিত আছে। নেপাল উপত্যকার পূর্ব্বাংশে নেওয়ারগণ লবণ ও সোডা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

বন্য জন্তুর মধ্যে চমরী গাভী ও চাঙ্গিয়া ছাগল তিব্বতের দক্ষিণস্থ পর্ব্বত মালায় দেখিতে পাওয়া যায়। চাঙ্গিয়ার রোমে এক প্রকার শাল প্রস্তুত হয়। চমরী গাভী লবণ ও শস্যাদি বাণিজ্য দ্রব্যের ভার বহনের জন্য ব্যবহৃত হয়। সারস ও বন্য হংস সময় সময় দেখা যায়। পার্ব্বত্য নদীর স্বচ্ছ ও নির্ম্মল জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য বিচরণ করে। হস্তী অশ্ব ও মহিষ নেপালের অরণ্যে দলে দলে বিচরণ করে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নেওয়ার জাতি ভবানীর নিকট বলি দিয়া মহিষের মাংস আহার করিয়া থাকে। গোরখা জাতির তিব্বত আক্রমণ কালে সেনাগণ চমরীর মাংস পর্য্যন্ত আহার করিতে বাধ্যহয়।

মোরঙ্গ ও নেপাল প্রদেশের জঙ্গলে বহুতর শিমুলগাছ আছে। পার্ব্বত্য মগর পুরুষ ও নেওয়ারী রমণীরা শিমুলের তুলায় দরিদ্র লোকের ব্যবহার্য্য এক প্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত করিয়া থাকে। ভুটিয়া জাতি পশমী কম্বল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে। ইহাই তাহাদের এক মাত্র বস্ত্র। ধনী, লোকেরা বিদেশ হইতে আনীত চীনা রেশম, মলমল, মখমলাদি ব্যবহার করে। নেওয়ারগণ নেপালের প্রধান শিল্পজীবী। তাহারা লৌহ, তাম্র, কাঁসা ও কাষ্ঠের দ্বারা নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। পাটন ও ভাটগাঁর কাংস্যপাত্র অতি প্রসিদ্ধ। দফনে নামক এক প্রকার বন্য লতায় নেওয়ারীরা মোটা কাগজ,ছুরি, বন্দুক, তরবারী, তীর, কোরা নামে ক্ষুদ্র তরবারী

প্রস্তুত করে। জঙ্গলে বাঁশ, বেত, ওক ও পাইন বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। ফলের মধ্যে কমলা ও আনারস প্রধান।

কাষ্ঠনির্ম্মিত কারু কার্য্যের জন্য নেপালের নেওয়ার জাতি প্রসিদ্ধ। তাহারা অতি উৎকৃষ্ট রূপ গিল্টি করিয়া থাকে। তিতিবোধি, সত্তিশাল, সকুয়া ও চম্পা নামে চারি প্রকার কাষ্ঠে নেওয়ারগণ 'কুরু' ও 'রাঙ্গা' নামে দ্বিবিধ লৌহাস্ত্র দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। দেবতা, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, সর্প, পশু, পক্ষী প্রভৃতি বিবিধ প্রাণীর এবং বিবিধ ফলপুষ্পের প্রতিকৃতি কাষ্ঠে খোদিত হয়। দেবমন্দির, রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় কার্য্যালয় ও ধনীর গৃহ কাষ্ঠখোদিত বিবিধ প্রতিমূর্ত্তির দ্বারা শোভিত দেখা যায়। পাটন নগরের দেবমন্দিরে এবংবিধ কারুকার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। নেপালের সূত্রধরগণ করাত দ্বারা কখনও কাষ্ঠ ছেদন করে না। কারুকার্য্য বিশিষ্ট গৃহদ্বার সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

নেপালের অধিবাসী নেওয়ার ও অন্যান্য জাতি অধিক মাত্রায় সুরাপান করিয়া থাকে। মহুয়াবৃক্ষ, চাউল ও গোধুম প্রভৃতি শস্য হইতে তাহারা স্বহস্তে "ফৌর" ও "রুক্ষি" নামে দুই প্রকার মদিরা প্রস্তুত করিয়া, তাহা পান করে।

নেপালীগণ দ্বিতল বা ত্রিতল ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহে সচরাচর বাস করিয়া থাকে। সুরকি চূণের পরিবর্ত্তে মৃত্তিকা দ্বারা ইষ্টক গ্রথিত করিয়া থাকে। প্রস্তর ও চূণা গৃহনির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয় না। বর্ত্তমান সময়ে নির্ম্মিত অধিকাংশ গৃহের ভিতরে কি বাহিরে কারুকার্য্য দ্বারা সৌষ্ঠব সাধনের অণুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। নেওয়ার জাতীয় হিন্দু রাজাদিগের সময়ে খাটমণ্ডু, ভাটগাঁও ও পাটন নগরে যে সকল প্রাচীন গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, তাহাতে কাষ্ঠখোদিত কারুকার্য্যের বিশিষ্ট উৎকর্ষতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৩০ বৎসরের অধিক কাল গত হইল, নেপালে গুরখা বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পূর্ব্বে নেপাল নানা ক্ষুদ্র ও স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেই সকল রাজাদিগের সময়ে নেপালে কাষ্ঠখনন ও ধাতুময় দ্রব্য নির্ম্মাণাদি নানাবিধ শিল্প কার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। নেপালে হিন্দুধর্ম্ম প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার শিল্প কার্য্যের বিশিষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

নেপালে সিকা নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত আছে। এই সকল সিক্কা মুদ্রার প্রত্যেকটীর মূল্য আমাদের আধুলীর তুল্য। প্রচলিত তাম্র মুদ্রার ২০০টী একসিক্কা মুদ্রার সমান।

নেপালের রণপতাকায় হনুমানের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। বন্দুক, কামান, তরবারী, ধনু ও তীর দ্বারা নেপালী সেনারা যুদ্ধ করিয়া থাকে। তাহারা বিলক্ষণ সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু। কথিত আছে যে, নেপালী সেনা ৫০।৬০ দলে বিভক্ত। গোরখাবংশের শাসন কালে নেপালী সেনার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সামরিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ শিল্পকার্য্যের বিলক্ষণ অবনতি ঘটিয়াছে। সেনাগণ ও সৈনিক কর্ম্মচারীগণ বেতনের পরিবর্ত্তে ভূমি ও গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বেতনও পাইয়া থাকে।

নেপালের মহারাজা গোরখা বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। নেপালে এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত। বৌদ্ধধর্ম্ম নেপালে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। তিব্বত ও চীনের সঙ্গে তখন নেপাল ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনের পর হইতে তিব্বতীয় লামার ধর্ম্মবিষয়ক আধিপত্য নেপালে বিলুপ্ত হইয়াছে।

নেপালের রাজা যথেচ্ছাচারী। প্রাচীন প্রথা ও হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের অনুসারে রাজ্যশাসিত হয়। রাজা ও রাজকর্ম্মচারীগণ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ জাতি হইতে উদ্ভুত। সেনাগণ ক্ষত্রিয় গোরখা জাতি হইতে সচরাচর নির্ব্বাচিত হয়। রাজসরকার হইতে সেনাদিগের বেশ-ভূষা ও অস্ত্রাদি প্রদত্ত হয়। সামান্য সৈনিকেরা বার্ষিক ৭০।৮০ টাকা বেতন পাইয়া থাকে। প্রতি গ্রামের অধিবাসী হইতে ভূমি ও গৃহের কর ব্যতীত তামাকু, সুপারী, লবণাদি ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উপর শুল্ক গৃহীত হয়। সৈন্যদিগের বেতনের পরিবর্ত্তে অনেক গ্রাম জায়গীর প্রদত্ত হইয়াছে। এবংবিধ সৈনিক জায়গীরের আয় তিন টাকা হইতে ৫।৭হাজার টাকা পর্য্যন্ত নিরুপিত আছে। প্রতিবর্ষে ৭।৮ লক্ষ টাকা টাঁকশাল হইতে আমদানী হয়। খনিজ দ্রব্যের বিক্রয় দ্বারা প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা আমদানী হয়। এতদ্ভিন্ন মূল্যবান কাষ্ঠ বিক্রয় ও বনকর হইতে বর্ষে বর্ষে রাজকোষে অর্থ সংগৃহীত হয়।

গোরখা ও নেওয়ার জাতি ভিন্ন নেপালে পার্ব্বতীয়া, ভুটিয়া, কিরাত, লিম্বু, হোবু, ধেনোয়ার এবং মগর নামে পার্ব্বত্য জাতি বাস করে। পার্ব্বতীয়াগণ নেওয়ার জাতির ন্যায় কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহারা চারি ভাগে বিভক্ত। ধেনোয়ার ও মাঞ্জি জাতি পশ্চিমস্থ প্রদেশে কৃষক ও মৎস্যজীবীর ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

নেপালী ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিয়া থাকে। ভাটগাঁও সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য বারাণসীর ন্যায় নেপালে প্রসিদ্ধ। নেপালের সর্ব্বত্র অসংখ্য দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। নেপালের উপত্যকায় পশুপতি, শম্ভুনাথ ও বুদ্ধনাথ প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রাচীন দেবমন্দির আছে। ভাটগাঁও নগরের এক পুস্তকাগারে পনরহাজার সংস্কৃত পুস্তক রক্ষিত ছিল বলিয়া ইংরেজ রাজদূত (রেসিডেণ্ট)General Kirkpatrick সাহেব ১৭৯৩ খ্রীঃ অবগত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন নেপালে পার্ব্বতীয়া, নেওয়ারী, ভুটিয়া, মগর, লিম্বুয়া ও কিরান্তী প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত আছে। হিন্দীভাষায় কথোপকথন,সভ্যতর গোরখা ও নেওয়ার জাতীয় নেপালীরা বুঝিতে পারে। নেপালী (পার্ব্বতীয়া) ভাষা মৈথিলী,হিন্দী, ও বাঙ্গলার ন্যায় প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; গোরখা জাতির মধ্যে এই পার্ব্বতীয়া ভাষা প্রচলিত। নেওয়ারী ভাষা স্বতন্ত্র। নেওয়ারগণ হিন্দীভাষায় কথোপকথন বুঝে। পার্ব্বতী, নেওয়ারী ভাষার অক্ষর সর্ব্বথা দেবনাগরী অক্ষরের অনুরূপী। বিহারের কায়েথী অক্ষর নেপালে প্রচলিত আছে। নেপাল স্বাধীনতার চির-লীলা ভূমি। নেপাল অদ্য পর্য্যন্তও কোন বৈদেশিক জাতির পদানত হয় নাই। আরব, পাঠান, মোগল, তাতার, আফগান প্রভৃতি মুসলমানজাতি পর্ব্বতবেষ্টিত নেপালে কস্মিন্ কালেও প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই। নেপাল চিরকাল আপনার অমূল্য স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিয়াছে। নেপালের শাসনকার্য্যে ইংরেজ দূতের হস্তক্ষেপ করার অধিকার নাই। বিনা অনুমতিতে নেপালে কোন বিদেশী প্রবেশ করিতে পারে না।

১৭৯২ খ্রীঃ মার্চ্চমাসে মহামতি গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণোয়ালিসের শাসন কালে নেপালের সহিত বাণিজ্যবিষয়ক সন্ধি সংস্থাপিত হয়। বারাণসীর ইংরেজ দূত সুপ্রসিদ্ধ(Jonathan Duncan)সাহেবের প্রযত্নে এই সন্ধি বন্ধনে ইংরেজরাজের সহিত নেপাল

মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হয়। তদবধি একজন ইংরেজ দূত (রেসিডেণ্ট) নেপালের রাজধানী খাটমণ্ডু নগরে অবস্থিতি করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বোক্ত জেনারেল কার্কপ্যাট্রিক সাহেব তদনুসারে প্রথম রাজদূত নিযুক্ত হইয়া নেপালে গমন করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম নেপালের বিবরণ সংগৃহীত করিয়া ইউরোপের সহিত নেপালকে পরিচিত করেন *। তৎপূর্ব্বে পাদরী (Guiseppe)সাহেব নেপালের সংক্ষিপ্ত ভৌগলিক বিবরণ প্রকাশিত করেন। (Asiatic Researches) পত্রিকার দ্বিতীয় ভাগে ১৭৯০খ্রীঃ এই বিবরণ প্রচারিত হয়। কার্কপ্যাট্রিক সাহেবের পর খাটমণ্ডুর ইংরেজ দূত (B.H.Hodgson) সাহেব নেপালের সম্বন্ধে নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা করিয়া আপনার পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দেন। ইংরেজ রাজদূতগণের নিকট নেপালের ইতিহাস সবিশেষ ঋণী। বাঙ্গলা ভাষায় অদ্যপর্য্যন্ত নেপালের ইতিহাস সম্যক্ রূপে আলোচিত হয় নাই।

মলবারের নায়রজাতীয় রমণীদিগের ন্যায় নেপালের নেওয়ার জাতীয় কামিনীদিগের মধ্যে বহুপতিত্ব প্রথা প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকেরা যথেচ্ছভাবে এক পতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে। নেওয়ার জাতি শান্তিপ্রিয়, হাস্যমুখ ও সরল প্রকৃতি। তাহারা বিলাসিতা, পরানুবৃত্তি ও বাহ্য বেশভূষা ভাল বাসে না। পুরুষ মধ্যমাকৃতি ও সবল শরীর। তাহাদের বক্ষস্থল ও স্কন্ধদেশ প্রশস্ত, নাসিকা চেপ্টা, চক্ষু ক্ষুদ্র, মুখাকৃতি চেপ্টা ও গোলাকার। তাহাদের গাত্রের রঙ্ ঈষৎ কৃষ্ণমিশ্রিত তাম্রবর্ণ।

নেপালে যে অব্দ প্রচলিত আছে, ৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাহার গণনা আরম্ভ হয়। ইহা নেপালী সংবৎ নামে প্রসিদ্ধ।

চম্পারণ জিলার অন্তর্গত সেগৌলি সেনানিবাস হইতে খাটমণ্ডু পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে,তাহা ৯৫ মাইল দীর্ঘ। রাকশূল নামক স্থানে এই পথ নেপালে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তদনন্তর সম্রবসা, হতৌরা,ভিমফেদি ও থানকোট দিয়া এই পথ খাটমণ্ডু পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে। এই পথে পাটনা ও রিভেলগঞ্জ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগর হইতে নেপালে প্রতিবৎসর তুলা,সূতা,সূতার কাপড়,সিন্দূর, লাক্ষা, তৈল, লবণ, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, পশমীবস্ত্র, শাল, রেশম, চিনি, নীল, মসল্লা, তামাকু, তামা ও কাঁসার অলঙ্কার, দর্পণ, মালা, চা, মূল্যবান প্রস্তর, বন্দুক এবং বারুদ প্রেরিত হয়। নেপাল হইতে নানাবিধ দ্রব্য এই পথেই ভারতবর্ষে রপ্তানী হয়।

রাজধানী খাটমণ্ডু হইতে কোশী নদীর এক শাখার তীরদেশ দিয়া তিব্বতের প্রান্তবর্ত্তী কুটি বা নিলম পর্য্যন্ত এক অতি দুর্গম রাস্তা আছে। অপর এক রাস্তা গণ্ডক নদের পূর্ব্বশাখার তীর দেশ দিয়া কিরঙ্গ হইয়া সানপু নদীর তীরবর্ত্তী তাড়ম পর্য্যন্ত বিস্তা-

* নেপাল সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কার্কপ্যাট্রিক সাহেবই তাঁহার প্রথম পথপ্রদর্শন করেন প্রয়োজনীয় বোধে নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল। সুবিখ্যাত হগসন সাহেব (১৭৯৯—১৮৯৩) দীর্ঘকাল নেপালে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নেপালের ইতিহাস, সাহিত্য ধর্ম্ম,শিল্প, আচার ব্যবহার ও প্রাণীবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বহুতর প্রবন্ধ রচনা করেন।

General Kirkparrick's Account of Nepal.
Dr. Wright s History of Nepal.
B. H. Hodgson's Essays (Asiatic Researches xvi, xvii, xx and Journal of A. S. B. i, ii, iii, iv, v, xii, xvi, xvii, xxv, xxvi.)
Indian Antiquary (vii, pp. 89—92, ix pp. 163—94,) xiii 411,(and xiv pp. 97, 342—44.)
Dr. Bhagavanlal Indraji's, "Twenty-three Inscriptions from Nepal" (1885).
C. Bendall's "Catalogue of Buddhist Sanskrit MSS in the Cambridge University Library.

রিত আছে। নিলম সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে চৌদ্দ হাজার ফুট এবং কিরঙ্গ নয় হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই উভয় পথই অতিশয় দুর্গম ও দুরারোহ। পুরুষ ও রমণীরা এই দুই পথ দিয়া তিব্বতে যাতায়াত করিয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষেরা প্রায় সকল দ্রব্যই স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যায়। তাহারা কেবল লবণ ও শস্যাদি পার্ব্বতীয় ভেড়া ও ছাগলের পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকে। তিব্বত হইতে এই পথে পশমিনা (পশমী শাল), মোটা পশমের শীত বস্ত্র, চৌরী, মৃগনাভি, সোহাগা, লবণ, পায়রা, হরিতাল, স্বর্ণরেণু, রসাঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, চরসাদি বিবিধ ভৈষজ্য দ্রব্য, ও শুষ্ক ফলমূলাদি আনীত হয়।

নেপাল হইতে তিব্বতে তৎপরিবর্ত্তে তাম্রপাত্র, কাংস্যপাত্র ও লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র প্রেরিত হয়। ইহা ভিন্ন বিলাতী বস্ত্র ও লৌহনির্ম্মিত দ্রব্য, তামাকু, মসল্লা, পান, সুপারী, নানাবিধ ধাতু ও মূল্যবান প্রস্তর তিব্বতে নীত হয়।

নেপালে সর্ব্ববিধ আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্ক গৃহীত হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মাশুল বিলাসিতার উপযোগী দ্রব্যের শুল্ক অপেক্ষা অনেক কম। বাণিজ্য বর্ত্মের স্থানে স্থানে ও প্রতি বাজারে শুল্ক আদায়ের জন্য রাজকীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। কখন কখন শুল্ক আদায়ের ভার প্রকাশ্য নিলামে ঠিকাদারের প্রতি অর্পিত হয়। বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন হারে বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই বিভিন্নতার জন্য বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগকে কোন রূপে উৎপীড়িত হইতে হয় না। বাণিজ্যজীবীরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শুল্কের হার অবগত থাকাতে, কেহই তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে সমর্থ হয় না। কোন কোন দ্রব্যের মূল্যের উপর শতকরা হারে শুল্ক আদায় হয়। কিন্তু সচরাচর ওজন, ভার বা সংখ্যা অনুসারে বিভিন্ন দ্রব্যের মাশুল আদায় হয়। কাষ্ঠ, গজদন্ত, লবণ, তাম্র মুদ্রা, তামাকু ও ধনিয়া বিক্রয়ের ব্যবসায় মহারাজ নিজ হস্তে রাখিয়াছেন। রাজার প্রিয়তম সভাসদ বা অমাত্যগণ সময় সময় রাজার অনুগ্রহে এই সকল দ্রব্যের ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। অন্যান্য দ্রবের ব্যবসায় সকল প্রজাই স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে স্বচ্ছন্দে চালাইতে পারে।

নেপাল রাজ্য সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় উপরে উল্লিখিত হইল। এই বিবরণ হইতে নেপালের নৈসর্গিক ও ভৌগোলিক অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। নেপাল সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় কোনও বিবরণ লিখিত হইয়াছে কিনা, তাহা জানি না। এই নিমিত্ত বহু যত্নে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ভারতবর্ষের মধ্যে নেপাল ও ভোটান মাত্র স্বীয় স্বাধীনতা অদ্য পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। কত যুগ অতীত হইল, কত দেশ উচ্ছন্ন হইল, কত জাতি ও ধর্ম্ম জগতের নানা স্থানে অভ্যুদিত ও পতিত হইল, কত রাজবংশ কালগর্ভে বিলীন হইল,—সুদৃঢ় পর্ব্বতময় দুর্গে পরিবেষ্টিত থাকিয়া নেপাল তাহার কোনও সংবাদ লয় নাই। নিয়তিচক্রের গতি পরিবর্ত্তনে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির শাসন প্রতিষ্ঠিত ও উন্মূলিত হইয়াছে, হিমাচলের আশ্রয়ে নিভৃতে ও নিরাপদে অবস্থিতি করিয়া নেপাল সে সকল ব্যাপার অবগত হইতে কোনও চেষ্টা করে নাই। নেপালে হিন্দুরাজত্ব অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, হিন্দুজাতির পূর্ব্ব

মাহাত্ম্য জগতে কীর্ত্তন করিতেছে। স্বাধীনতার লীলাভূমি নেপালের ইতিহাস ভারতবাসী হিন্দু মাত্রেরই অতি আদরের ও গৌরবের সামগ্রী। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বিধুরা।

আমি চাই ভুলে যেতে,
পূর্ণ বিস্মৃতিরে পেতে,
কাঁদিতে ভাবিতে নাহি সাধ!
শান্তি গেছে কোন দূরে,
অশান্তি বেড়ায় ঘুরে,
প্রেমে কলঙ্কিনী অপবাদ।

একাকিনী কুঞ্জমাঝে,
আমি কেন বৃথা কাজে,
আকাশ কুসুম লোভে আসি?
হাসে চন্দ্র সুষমায়,
ভাসে দিক জোছনায়,
ফুটে উঠে কুসুমের রাশি;

নব নব ব্যাকুলতা,
বিজন প্রাণের কথা,
আশার উত্তাপে উঠে ফুটে,
ঢালে ফুল পরিমল,
ব্যথা আনে অশ্রুজল,
যায় যায় বুক যেন টুটে;

প্রতি রজনীর শেষে
আশাগুলি ম্লান বেশে,
মূর্চ্ছাতুর হয়ে পড়ে প্রাণে,
দিন আসে দিন যায়
প্রদোষ হাসিয়া চায়,
মৃত আশা জীয়ে উঠে ধ্যানে!

উদাস হৃদয় মাঝে
কার যেন বাঁশী বাজে,
কোথা হতে কে আমারে ডাকে;
একি রহস্যের খেলা,
যে করে সতত হেলা,
প্রাণ কেন সদা চায় তাকে?

এ কেমন ঘোর ভ্রান্তি,
অশান্তির মাঝে শান্তি,
লভিতে বাসনা করে মন;
প্রেম যে চাহেনা কভু
তারে প্রাণ চায় তবু,
তার তরে সদা উচাটন।

করেছি যাহারে দান,
আমার সমগ্র প্রাণ,
সে চাহেনা মুখ পানে ফিরে,
নিসর্গ গুম্ফিত মালা
এই যৌবনের ডালা,
ভাসিবে কি নিরাশার নীরে?
বুকেতে উছলে মধু,
এসো তুমি এসো বঁধু!
যাতনা যে নাহি সহে আর,
নিরাশায় কম্পমান,
ম্রিয়মান এ পরাণ,
তোমা তরে কাঁদে বার বার।

যদি অবজ্ঞার বাণে
বিঁধিবে কোমল প্রাণে,
করেছিলে এরূপ মনন;
প্রেমের মূরতি হ’য়ে
অপার সৌন্দর্য্য লয়ে,
তবে কেন ভুলাইলে মন?

মোহ মাখা দরশনে,
অণিমন্ত্র পরশনে,
"আমাতে নাহিক আমি আর!
চারি ধারে জাগরণ
করিতেছে বিচরণ,
তন্দ্রাহীন নয়ন আমার!

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

ভগ্নমনোরথ।

দুই পাশে উষা সন্ধ্যা হেমস্বপ্নবৎ
আশার অলকাপূর্ণ মোহইন্দ্রজালে,
মধ্যাহ্ন চলেছে পথে ভগ্নমনোরথ
জ্বলন্ত জীবন নিয়ে দগ্ধ অন্তরালে!
দুই পাশে প্রস্ফুটিত গিরি-কুঞ্জবন,
পাষাণে আছাড়ে মাঝে নিরাশ-নির্ঝর,
অনাদরে উড়ে তার চূর্ণ প্রাণমন,
অরণ্য পবনে আহা দিক্‌দিগন্তর!
হাসে ধরা শস্যপূর্ণ শ্যাম-মমতায়,
হতাশে জ্বলিয়া মরে মধ্যে মরুভূমি,
এই দয়া এই স্নেহ এই করুণায়,
সংসার! জগতে ধন্য হইয়াছ তুমি?
এপারে বসন্ত হাসে ও পারে শরত্‌,
মধ্যে মরে শীতগ্রীষ্ম ভগ্নমনোরথ!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

সেক্ষপীয়রের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

অষ্টাদশ সংখ্যা।

সমধিক শান্তি শোভা বিরাজে তোমাতে
বসন্তের সনে তব করিলে তুলনা;
ক্ষণস্থায়ী শোভা তার; বসন্ত-প্রবাতে
বিকম্পিত সুকুমার কুসুম ললনা।
উদিত সুতীব্র কভু ত্রিদিব-লোচন
কভুবা তমসাচ্ছন্ন স্বর্ণ আভা তার;
সময়েতে সৌন্দর্য্যের অবশ্য পতন
প্রকৃতির আবর্ত্তনে কিম্বা ঘটনায়।
কিন্তু চিরস্থায়ী সখে, বসন্ত তোমার,
অতুল সুষমা কভু হবেনা মলিন;
তবোপরি শমনের নাহি অধিকার,
জীবিত এ গাঁথা বলে তুমি চিরদিন।
যতদিন রবে জীব—দেখিবে নয়ন,
অমর এ প্রেম-গাঁথা—তোমার জীবন।

সপ্তবিংশ সংখ্যা।

পরিশ্রান্ত যাই যবে করিতে শয়ন
লভে শান্তি গতিক্লান্ত চরণ যুগল;
কিন্তু মন, অবিশ্রান্ত করে পর্য্যটন
দিবসের কার্য্যে যবে শরীর বিকল।
চিন্তা মম অতিদূরে—তোমা পানে ধায়
ব্যাকুলিত ভক্ত যথা তীর্থ দরশনে;
নিদ্রা-অবসন্ন আঁখি তোমাকে ধেয়ায়
আঁধারে;—আলোক যাহা অন্ধের নয়নে।
কল্পনা—মানস-আঁখি-মূরতি তোমার
আনে মম দৃষ্টিহীন নয়ন সম্মুখে;
লভিয়া তামসীনিশা রূপ আভা তার
হয় বিভাসিত—যথা উজ্জ্বল মাণিকে।
এইরূপে দেহ মন সারা নিশা দিন
তোমা কিম্বা আমা তরে বিরাম-বিহীন।

শ্রীবিহারীলাল গুহ।

প্রত্যাগত।

(১)

আর কি লইবি কোলে? দর অশ্রুধার
দিবি কি মুছিয়া? শ্রান্ত, শোকদিগ্ধজনে,
অসহায় শিশুসম ধরিয়া আবার,
পিয়াবি কি স্তনসুধা? শৈশব শয়নে
শোয়াইয়া, সাবধানে সেইরূপে, হায়,
হে বসুধে! আর কি মা বুঝিবি আমায়?

(২)

হায় মা! ছাড়িয়া তোরে প্রবেশিনু যবে
সংসারের রঙ্গমাঝে,—তখনও আকাশে
হাসে উষা, কালসিন্ধু ধাইছে নীরবে,—
হেরিনু মোহিনী মূর্ত্তি, বিভ্রম-বিলাসে
মায়াবিনী, বংশীরবে ব্যাধের মতন,
সরল পথিক-হৃদি করিল হরণ।

(৩)

যায় বর্ষ, যায় দিন। একদা সমুখে
হেরিলাম সরোবর, কামনা-কহ্লারে
শোভাময়; নিত্য তাহে বিচরিছে সুখে
সোণার তরণী এক। হৃদয় আঁধারে
প্রেমদীপ, কভু মৃদু, কভু বিস্ফুরিয়া,
বাসনার স্নেহসেকে উঠিছে শ্বসিয়া।

(৪)

কে জানে মা! কোথা হ'তে আইল ভাসিয়া
ফুলবাস; গীতরব পশিল শ্রবণে
নন্দনের বীণাধ্বনি সম; বিকীরিয়া
কররাশি শত শশী শোভিল নয়নে!
সুন্দর সংসার-গৃহ, শিশু নারী নর,—
সুন্দর দেখিনু আমি বিশ্ব-চরাচর।

(৫)

আনন্দে কহিনু,—লও মোরে, হে তরণি,
সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রপথ পানে, হই আমি
ব্যাপ্ত, পূত, বিকশিত; ত্যজিয়া অবনী,
দ্যুলোক হইতে পুন নাগলোকে নামি,
উদার আকাশ সম আলিঙ্গন দিয়া
চাহি আমি বিশ্বরাজ্যে রাখিতে বাঁধিয়া।

(৬)

গেল সুখে-দুখে কাল। অবশেষে, হায়,
অতর্কিতে এক দিন যৌবন-আকাশে
ঘনাইল কালমেঘ, মৃত্যুদূতী প্রায়
আইল ঝটিকা গরজিয়া; ক্রোধে ত্রাসে
নিনাদিল জলরাশি, কাঁপিল অশনি;—
হায় মা! হারানু আমি সাধের তরণী।

(৭)

তাই আজি, জননী গো, তোরই স্নেহাগারে
বিশ্রাম মাগিছে দাস। যে শয্যা মেলিয়া
ধ'রেছিলি, বসুন্ধরে, সদ্যোজাত তা'রে
অসহায়, তাই পুন ল'বে সে খুঁজিয়া;—
মাতৃবাহু উপাধান, অঞ্চল শয়ন,
মানব-শিশুর আর কি আছে এমন?

(৮)

লতার আশ্রয় ছাড়ি' কুসুম কাননে
পড়ে আসি কোলে তোর; শ্রান্ত যবে পাখী
ধায় তোরই স্নেহনীড় পানে;—প্রেমরণে
পরাজিত তেমতি মা! অশ্রুভরা আঁখি,
হৃতসুখ, নষ্টগৃহ, দীনজীর্ণ হিয়া,
প্রকৃতি, জননি, আমি এসেছি ফিরিয়া।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

বাঞ্ছিত প্রণয়।

তোমারে কহিব প্রাণ আশা,
যবে মোর ফুটাইবে ভাষা!
তোমারেই দিব সঁপে প্রাণ,
যবে মোরে করিবে আহ্বান।
তোমারেই দিব ভালবাসা,
আগে মোর মিটাইও আশা।
তবরূপ হৃদে ভরে রাখি,
যদি মোর খুলে দেও আঁখি।
তব তরে হইব আকুল,
আগে মোর ভেঙ্গে দিও ভুল।
তোমারি গাহিব গুণ গান,
শিখাইও সুর তাল মান।
তোমারি আবাসে যাব চ'লে,
যদি মোরে পথ দেও ব'লে।

তুমি মোর হৃদয়ের সখা,
ভালবেসে আগে দেও দেখা।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকা।

নির্ম্মল যমুনাতট, বারি রেখা লট পট,
তটদের চরণে।
কি শোভা মরিরে মরি, গিয়েছে যমুনা ভরি,
শশী তারা রতনে।
নদীর বাতাস পেয়ে, আছে যেন ঘুমাইয়ে,
নদী তটে চাঁদিনী,
পরিধানে শ্বেত বাস, অধরে মধুর হাস,
সুখে ভোর যামিনী।
অপূর্ব্ব গম্ভীর ভাবে, ভাবিতেছে একভাবে,
কোন জনে যমুনা,
হেরি সে অপূর্ব্বভাব, হয় কত আবির্ভাব,
ভাবুকের ভাবনা।
এলাইত কেশ রাশী, অধরে মলিন হাসি,
কে তুমিগো ললনা ?
বসিয়া যমুনাকূলে, ভাসিছ নয়ন জলে,
কি এতগো যাতনা ?
আকুল ব্যাকুল প্রাণ, গাইছ মধুর গান,
মরমেতে মরিয়া,
পিয়ে সে সঙ্গীত সুধা, চাঁদের মিটিল ক্ষুধা,
লাজে নত পাপিয়া !
পবিত্রতা সরলতা, একত্র রয়েছে গাঁথা,
হৃদিতলে তোমারি,
বদনে রয়েছে ঢালা, সঞ্চিত প্রীতির ডালা,
অমৃতের মাধুরী !
দুলিছে সমীর ভরে, হৃদি পরে ধীরে ধীরে,
কমলের মালিকা।
কমলের প্রতিদামে, রঞ্জিত কৃষ্ণের নামে,
প্রেমাদিনী গোপিকা—
রাধিকা দেখি সে লেখা, নিভাতে বিরহ শিখা,
চাহিতেছে যতনে,
কমল নয়ন বহি, পড়িতেছে রহি রহি,
প্রেমনীর সঘনে।

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস।

আঁধার-মাণিক।

১

আমার এ অন্ধকার ঘরে,
আঁধার সাজানো স্তরে স্তরে,
আঁধারের কর ধ'রে, অন্ধকার নৃত্য করে ;
আমার এথানে মাত্র আঁধারের মেলা,
ঘোর অন্ধকার ল'য়ে আঁধারের খেলা।

২

আমার এ অন্ধকার ঘরে,
প্রেতও পলা'য়ে যায় ডরে,
প্রাবৃটের অমানিশা এ'রকাছে হারা দিশা,
আঁধারে জড়ায়ে ধরি আঁধার মহান্,
অট্টহাস কোলাহল বিদরিছে কাণ !

৩

আমার আঁধার পারাবারে,
অন্ধকার আঁধারে সাঁতারে,
এ আঁধার কালিমায় দীপ্ত সূর্য্য ডুবে যায়,
না ফুটে হেথায় চন্দ্র নক্ষত্র কিরণ,
ফুটেনা হেথায় রবি ঊষার মিলন।

৪

আমার এ আঁধার আলয়,
ভয়েতে মলয় নাহি ব'য়,
গোলাপ মালতী ভরে হাসেনা আঁধার ঘরে,
ভয়ে ভয়ে শ্যামা, পিক নাহি করে গান,
উঃ! কি ভয়ানক এই আঁধার মহান্।

৫

আমার এ আঁধারের কাছে,
নীলা তরঙ্গিনী নাহি নাচে

নেচে নেচে বেলা পরে ঢেউ না বিথারি পড়ে,
বিকশিত কুমুদ কহ্লার শতদল
মলিন হেথায়, নাহি করে ঝলমল।

৬

হেরে মোর অন্ধকার ঘর,
অবহেলে বিশ্ব চরাচর,
সদা অন্ধকারে চাই, আলোক কভু না পাই,
সুহাসিনী প্রকৃতিও নাহি হাসে ভয়ে,
উঁকি দিয়া চলে যায় ছ'ঋতুকে ল'য়ে!

৭

এ আমার আঁধার ভবনে,
একা আমি ব'সে এক কোণে,
সদা শুনি কোলাহল, বিশ্ব করে টল মল
শত বজ্রনাদে স্বার্থ বাসনাকে ডাকে,
বাসনাও প্রলোভনে সঙ্গে সঙ্গে রাখে।

৮

আশা সদা দীর্ঘ অবয়বে,
ভ্রমিতেছে ঘোর বজ্র রবে,
তাহার ভ্রূকুটি ডরে, বিশ্বস্থিত যোড়করে,
তার(ই) পাশে হতাশার বিকট মূরতি,
ললাট ফলকে রক্তে লেখা "অবনতি।"

৯

গর্ব্ব এই আঁধার ভবনে,
ডাকে হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষগণে,
দন্তে দন্ত ঘরষিয়া, ক্রোধ ভ্রমে গরজিয়া
চূর্ণ করিবারে বিশ্ব চরণের ঘায়,
নেত্রকোণে সর্ব্বগ্রাসী অনল বেড়ায়।

১০

অন্ধমোহ আঁধারে ঘুরিছে,
হাতাড়িয়া "আমিত্ব" খুঁজিছে,
এই আঁধারের তলে, এই ঘোর কোলাহলে,
আকুল ব্যাকুল প্রাণ করে হায়,হায়!
কোথায় লু'কাব আমি লইয়া আমায়?

১১

"শ্মশান কি শান্তিময় স্থান,
তথা গেলে জুড়ায় কি প্রাণ?
উজল আলোক রেখা,তথা কি যায় না দেখা?
কোলাহলনাশী নিস্তব্ধতা না কি র'য়?
তথায় আমাকে আমি লুকালে না হয়?

১২

"না হয় তথায় প্রেতগণ,
অট্টহাসে বিদরে গগন,
করিয়া বিকট রব, শাঁখিনী পেত্নিনী সব,
না হয় গলিত শব করয়ে ভক্ষণ,
কড়মড়ি করে নরকঙ্কাল চর্ব্বণ।

১৩

"তবুও তথায় সুখে র'ব,
এ ভীষণ জ্বালা ত না স'ব,
আঁধার ঘরের কোণে, সদা ইহা ভাবি মনে,
সহসা দেখিনু সেই আঁধার আলয়,
আঁধারবিনাশী এক আলো জ্যোতির্ম্ময়।

১৪

ভাবিলাম "এ আলোক রাশি,
বিভাসিল কোথা হ'তে আসি,
এ মোর আঁধার ঘরে,কেহ ত আসেনা ডরে,
কোথা হ'তে এ আলোক ফুটিয়া উঠিল?
অন্ধকার, কোলাহল সব পলাইল!"

১৫

"এ তরল আলোকের ছা'য়,
পরাণ আনন্দ গীতি গায়,
দাহ শূন্য দীপ্ত আলো,নাশি এ আঁধার কালো,
ফুটিয়া উঠিল, স্নিগ্ধ ধাঁধেনা নয়ন,
একি অন্ধকারে খোঁজা মাণিক রতন?"

১৬

কে যেন বলিল কাণে মোর,
"আঁধার মাণিক-আলো তোর"
করি কর প্রসারণ, ধরিনুরে সে রতন,

যেমন ছুটিনু, পুনঃ কি দেখিনু হায়!
মিলিনু অমৃত জ্যোতি মহাশূন্য-গায়।

১৭

জগৎ-জনক হয়ে হায়!
বিড়ম্বন কেন গো আমায়?
আঁধারমাণিক মোর, ঘুচায়ে আঁধার ঘোর
আমার এ আত্মা তুমি লও উপহার,
করুক এ বিশ্ব যাহা ইচ্ছা হয় তার।

১৮

এ সংসারে কিছু নাহি চাই,
যেন আমি তোমাকেই পাই,
তুমিই কোটী রতন, তুমি সাধনার ধন,
তোমা বিনা ধন, মান-জীবনেতে ধিক্!
বসো এ আধার গেহে আঁধার মাণিক!

শ্রীকুমুদিনী দাসী।

বাহ্য পূজা এবং ব্রহ্মসাধন।

সাকার নিরাকারের মীমাংসা সাধারণ ভাবে কত দিনে হইবে, কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু ব্রহ্মর্ষি সাধকজীবনে ইহার সীমা নির্দ্ধারিত এবং অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য অবশ্যই আছে। নিম্নাধিকারী অজ্ঞান লোকদিগের জন্যই পূর্ব্বতন জ্ঞানীরা মূর্ত্তিপূজা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, মূর্ত্তিপূজা, গুরুব্রহ্মের পূজা করিয়াও লোকে পণ্ডিত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে চাহেন। লোকশিক্ষার্থ তাঁহারা কি ইহা করেন? নিজেদের জন্য কি নয়? মূর্ত্তির রাজ্য অতিক্রম করিয়া অমূর্ত্ত চিদানন্দের রাজ্যে প্রবেশের জন্য সাধকদিগের সাধন তবে কত দিনে আরম্ভ হইবে? জনপ্রশংসিত সাধারণ প্রচলিত ধর্ম্মকার্য্যের ভিতর গোলমাল করিয়া দিন কয়টা কাটাইয়া দেওয়াই কি অনেকের উদ্দেশ্য নয়? ধর্ম্মসাধনের যে শ্রেণী-বিভাগ, অধিকার-ভেদ কল্পিত হইয়াছিল, তাহার সার্থকতা কোথায়? জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই এক কথা বলেন, এক রূপই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করেন; কোন তত্ত্ব ব্যাখ্যার সময় কেবল পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়, উভয়ের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ দেখিতে পাই। যখন প্রাচীন কাল হইতে সকল দেশে ব্রহ্মজ্ঞান এবং বাহ্য পূজার দুইটী বিভিন্ন মত এবং কার্য্যপ্রণালী চলিয়া আসিতেছে, শাস্ত্রেও তৎসংক্রান্ত ভূরি ভূরি নিদর্শন রহিয়াছে, তখন কার্য্যতঃ বর্ত্তমানে দুইয়ের সীমা নির্দ্ধারণ একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু সীমা নির্দ্ধারণ কোথায় কিরূপে হইবে? জ্ঞানী বহুদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সাক্ষাৎসম্বন্ধে মূর্ত্তিপূজা করিলেন না বটে, কিন্তু দেবালয়ে দেবমূর্ত্তি কিম্বা অবতারের নিকট প্রণিপাত করিলেন, ভক্তিপূর্ব্বক প্রসাদ খাইলেন, গলায় মালা, নাকে তিলক পরিলেন, আর পৌরাণিক দেবলীলার যাবতীয় কল্পিত কাহিনী গুলি সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন, তৎসঙ্গে বলিলেন, "আমি সর্ব্বভূতে যে অনন্ত চিন্ময় ভগবান আছেন, তাঁহাকেই প্রণাম করিলাম, সর্ব্বত্র তাঁহাকেই বিরাজমান দেখিয়া থাকি।" এ কথাতে আর কাহার আপত্তি হইবে? অজ্ঞানী জনসাধারণও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল, কিন্তু তাহারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে জানে না; অথচ

বাহিরের ব্যবহার উভয়ের একই। কোথায় এখন তবে উভয়ের ব্যবহারের সীমা নির্দ্ধারণ করিবে? জ্ঞানী যদি সর্ব্বভূতে ব্রহ্মের আবির্ভাব বাস্তবিক দেখিতে পান, কেনই বা তিনি পূজার্থ প্রতিষ্ঠিত সুন্দর সুসজ্জিত দেবপ্রতিমায় সে আবির্ভাব দেখিবেন না? যদি দেখেন, কেনই বা তবে তিনি সেখানে ভূমিষ্ঠ হইবেন না? এস্থলে কত টুকু তাঁহার লোক শিক্ষার্থ প্রচলিত পন্থার অনুসরণ, বা লোকরঞ্জন, বা গূঢ় স্বার্থ-সাধন, আর কত টুকুই বা সর্ব্বভূতময় হরির আবির্ভাব দর্শন, তাহা কেবল অন্তর্য্যামী ভগবান্ই জানেন। শাস্ত্র যুক্তি জ্ঞান বিজ্ঞান দুই পক্ষেই যথেষ্ট আছে। এই বাহ্য পূজানুষ্ঠানের সঙ্গে সামাজিকতা, লৌকিক ভদ্রতার বিলক্ষণ যোগ দেখিতে পাই। ভিতরে বিশ্বাস কর না কর, আত্মীয় প্রিয়জন বন্ধু, বা গুরুজনের অনুরোধে, অন্নদাতার ভয়ে অনেক কার্য্যে যোগ দিতে হয়। এ সম্বন্ধে বিবেক এবং সরল বিশ্বাসকে অকলঙ্কিত রাখিবার উপায় কি? আজ কাল যে রূপ উদারতার প্রাদুর্ভাব, তাহাতে বিশ্বাস সম্বন্ধে আপনার নিকট আপনি ঠিক থাকা যায় কি প্রকারে?

মনুষ্য জড় চৈতন্যে মিশ্রিত, তাহার প্রত্যেক কার্য্য বাহ্য অবলম্বনের ভিতর দিয়া হইয়া থাকে। তিনি ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি বাহ্য পদার্থের পূজা করেন না সত্য, কিন্তু তাহার সাহায্য লইয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষ অনন্ত ব্রহ্মকে স্থান কাল ব্যক্তি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া গ্রহণ করেন, তদ্ভিন্ন ভক্তি যোগ বিশ্বাস প্রেম ঘন হয় না। এই ঘনত্বের অনুরোধেই মূর্ত্তিপূজকেরা বিশেষ বিশেষ স্থান-কাল এবং ব্যক্তি বা পদার্থে একবারে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। এত দূর তাঁহারা ঘন করেন, যে পরিশেষে তাহা আর আত্মস্থ হয় না; ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে বাহ্য ভাবোচ্ছ্বাসে চিরদিন আবদ্ধ থাকিয়া যায়। তাঁহাদের আপাতরম্য শ্রবণমনোহর যুক্তি এ বিষয়ে বড়ই হৃদয়গ্রাহী। ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্গে সে যুক্তির কোন প্রভেদ দেখা যায় না; কিন্তু উদ্দেশ্য উভয়ের এক নয়। এক জন উপায়কে উদ্দেশ্য করিয়া লইয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, আর এক জন বাহ্যোপায়ের সাহায্যে অন্তর্জগতে প্রবেশ করেন; এবং প্রবেশ করিয়া নিরবলম্ব যোগে মগ্ন হন।

সকল স্থানে, সকল বস্তু এবং ব্যক্তিতে, কিম্বা সকল কালে ধর্ম্মসাধন ঘনীভূত হয় না; তাহার জন্য বিশেষ সময়, বিশেষ স্থান এবং বিশেষ ব্যক্তি বা পদার্থের প্রয়োজন হয়। হট্টমন্দির অপেক্ষা দেবমন্দির, জনাকীর্ণ পথ অপেক্ষা গিরিশিখর, সুরম্য বন, উপবন, নদীতট সাধনের অনুকূল। জনসাধারণ বিষয়ী সংসারী লোক অপেক্ষা সাধুসঙ্গের আবশ্যকতাই বা কে অস্বীকার করিতে পারে? সচ্চরিত্র আত্মত্যাগী ভক্তজনের সেবা এবং অধীনতাও সাধনের একটী প্রধান অবলম্বন বটে। পূজার্থ গৃহীত বিশেষ বিশেষ পদার্থ ছবি মূর্ত্তি, সাধুর সমাধি স্তম্ভ, শ্রদ্ধা প্রীতি-উদ্দীপক মনোহর দেবমন্দির, তীর্থ স্থান পুষ্প চন্দন ধূপ ধূনার গন্ধ, তপোবনাশ্রম, এসকল কাহার মনে না ভগবদ্ভক্তি আনিয়া দেয়? কিন্তু এ সমস্ত বাহ্যাবলম্বনপ্রসূত ধর্ম্মভাব কি স্থান কাল অবস্থা ঘটিত ব্যবহিত ভাব নহে? তুমি চর্ম্মচক্ষে প্রতিমার চেতনাবিহীন নাক মুখ চোখ কপাল রাঙ্গাচরণ দেখিলে; নাসিকায় পুষ্প ও ধূনার সুগন্ধ আঘ্রাণ করিলে, কর্ণে শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ মন্দিরার শব্দ এবং স্তব স্তুতি শুনিলে, রসনায় গভীর অর্থ-যুক্ত কবিত্বরসপূর্ণ মন্ত্রাদি পাঠ করিলে, এ

সমস্তই উপাস্য উপাসকের বাহ্য সম্মিলন সাধক; তদ্দ্বারা কি জীবাত্মা পরমাত্মার পরস্পর ভাব জ্ঞান ইচ্ছার একত্ব সম্পাদিত হয়? দেহধারী মনুষ্য সচেতন জীব, তাহার নিকট কথা কহিলে, কাঁদিলে, ভিক্ষা চাহিলে,সে শুনিতে পায়, বুঝিতে পারে, হৃদয়ঙ্গম করে, তৎপরে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়। জড় প্রতিমার অবশ্য সে সব ক্ষমতা নাই,সকলেই জানেন। প্রতিমার মৃণ্ময় বধির কর্ণের ভিতর দিয়া অন্তর্যামী দেবতাকে কিছু জানাইতে হয় না, তাহাও জানা আছে, তাহাতে আরোপিত ভগবান আছেন, তিনিই প্রার্থনা শ্রবণ করত পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই প্রার্থনা জ্ঞান ইচ্ছা ভাবের বিনিময় ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়ের অতীত,বিশ্বাসগত আধ্যাত্মিক বিষয়; বাহ্যেন্দ্রিয়ের সাহায্যে দৃশ্য স্পৃশ্য পদার্থ এখানে কেবল বাহ্য ভাবের উদ্দীপক মাত্র। অবশ্য এই উদ্দীপনা জীবাত্মা পরমাত্মার অব্যবহিত জীবন্ত জ্ঞানপ্রভা উপলব্ধির সহায় হইতে পারে। এই পর্য্যন্তই উহার উপকারিতা। কিন্তু উহা প্রকৃত জ্ঞানরাজ্যের বহির্ভাগে বহু ব্যবধানে অবস্থিত। যে পর্য্যন্ত আত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞানযোগ ঘনতররূপে উপলব্ধি না হয়, ততদিন কেবল বাহিরের বিষয় বিশেষের উপর সাধক নির্ভর করেন, কিন্তু অধিক দিন তাহাতে আবদ্ধ থাকিলে আধ্যাত্মিক সাধন ভজনের আর উন্নতি হয় না, তখন অভ্যস্থ কতকগুলি বাহ্য বস্তু কার্য্যচক্রে মন ঘুরিয়া বেড়ায়, একই বিষয়ের চর্ব্বিত চর্ব্বণ হয়।

এখন কথা এই, ব্রহ্মজ্ঞ নিরাকারবাদীরাও ত পূজার সময় মন্ত্র পাঠ করেন,প্রার্থনা করেন, সঙ্গীতাদি শুনেন, কুসুম চন্দন ধূপ ধূনার গন্ধ বিস্তার করেন। তাঁহাদেরও স্থানে বদ্ধ উপাসনামন্দির আছে, কালেবদ্ধ উৎসব উপাসনা আছে, ভাবায়বদ্ধ চরণকমল, প্রেমমুখ, স্নেহহস্ত, পিতা মাতা বন্ধু সখা ইত্যাদি শব্দও তাঁহারা ব্যবহার করেন; নমস্কার কৃতাঞ্জলি ইত্যাদি নানাবিধ অঙ্গভঙ্গীও আছে, সাধু ভক্ত ঋষি যোগীদিগকে তাঁহারা ভক্তি করেন,তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রসাদের ভিখারী হন; তবে কি কেবল প্রতিমা খানারই যত দোষ? যদি গেরুয়া বসন, ফুলের মালা,চন্দনের ফোটায় দোষ না থাকে,তবে কি নামাবলী তুলসীমালা তিলক ছাবেরই যত দোষ? জগন্নাথকে পরমান্ন উৎসর্গ করিয়া তার পর দুধের সঙ্গে ভাত এবং চিনি মিশাইয়া খাও, তবে কি জগন্নাথকে কেবল গুড় গাছটী দিয়া আসিয়াছ? মানবীয় ভাব উভয়েতেই আছে, আমরা সেটাকে না হয় ভোগ নৈবেদ্য শীতলী বৈকালী বলি,উপহার আরতি বরণ ইত্যাদিতে আরো উজ্জ্বলরূপে মানবীয় করিয়াছি; এই কি অপরাধ? দেবদেবীরপূজকেরা এ কথা অবশ্য বলিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক বিবাদের প্রয়োজন নাই। এ সকলের মধ্যে কোন্ কোন্টী ব্রহ্মবাদীর অপৌত্তলিক এবং আধ্যাত্মিক যোগ সাধনের অনুকূল অনুষ্ঠান, তাহাই নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সমস্তগুলি ত্যাগ করিয়া জড়বৎ মৌনী হওয়া সহজ, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর ভক্তি সাধনের প্রণালী ঠিক করা বড় কঠিন। প্রতি জনের বিবেকের নিকট ইহার মীমাংসা আছে, তাহার সমষ্টি দ্বারা সমবেত বিবেকানুযায়ী একটী সাধারণ বিধি নির্দ্ধারণ প্রার্থনীয়।

ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যেও এক শ্রেণীর বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয় ভক্ত সাধক আছেন, যাঁহারা অন্তরের প্রত্যেক ভক্তিভাব বাহিরে প্রদর্শন করিতে ভালবাসেন; অর্থাৎ তাঁহাদের ভক্তি প্রকা-

শের আধিক্য বেশী। আর এক শ্রেণীর গম্ভীর স্বভাব চিন্তাশীল ব্যক্তি ঠিক ইহার বিপরীত। ইহারা এক দল বাহ্যপূজা, অন্ধ ভক্তি এবং পৌত্তলিকতার প্রশ্রয়দাতা, অপর পক্ষ শুদ্ধ বৌদ্ধ ভাববিশিষ্ট ভক্তিবিরোধী। উভয়ের পরিণাম পৌত্তলিকতা এবং নাস্তিকতা। ইহার মধ্যে একটী মধ্যপথ আছে। তাঁহারা অন্যকে তর্ক দ্বারা বুঝাইতে পারুন না পারুন, নিজের জ্ঞান ভক্তির সামঞ্জস্য করিতে পারেন। তাঁহারা বলেন, বাহ্যাবলম্বনের দিকে অধিক যাইও না, তাহাতে অন্তঃসার বিহীন হইয়া পড়িবে। "কোথায় কি করিব, কারে কি বলিব, দিও বলে সব যে হয় উচিত।" এই বাক্য দ্বারা তাঁহারা ভগবানকে সম্বোধন করেন। ভক্তিভাবের মত্ততা, বাহ্য পূজার আকর্ষণ জন সাধারণের বড় প্রিয়, ইহা বাস্তবিক একটা লোভের বিষয়; শুষ্ক হৃদয় বুদ্ধিবাদী ব্রাহ্মজ্ঞানীর প্রাণ যখন শূন্য নির্গুণবাদে এবং অসার সামাজিকতায় পড়িয়া ছটফট করে, তখন অন্ধব্যক্তির বাহ্যাড়ম্বর, গুরুবাদ এবং মত্ততা অতিশয় হৃদ্যপথ্য হইয়া উঠে। তখন সে জ্ঞানকে নিন্দা করিয়া বলে, "ভুসি কে কেবল বতু, ভুসি সে কেবল।" জ্ঞান চেতনাহীন ব্যক্তি অন্ধ, তাহার অন্ধ ভাবুকতা সুরা মত্ততার ন্যায় অসার। ভগবান পরম চৈতন্য দিব্য জ্ঞানময়, এবং তিনি প্রেমে যেন আনন্দ স্বরূপ। তাঁহার স্বরূপত্ব প্রাপ্তি জীবের চরম ধর্ম্ম। স্বয়ং তিনিই সাকার নিরাকারের মীমাংসার স্থল।

শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

স্পর্শদোষ প্রথার রাক্ষসী মূর্ত্তি।

স্পর্শদোষ প্রথা কি প্রকার রাক্ষসী মূর্ত্তিতে হিন্দুজাতীয় জীবনের রক্ত শোষণ করিতেছে, অনেকে হয় ত তাহা ভাবেনই না। যাঁহারা বৃহৎ নগর নগরীতে বাস করেন, তাঁহারা এপ্রথার অনিষ্ট যথেষ্ট উপলব্ধি করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। বহুসংখ্যক শান্তিরক্ষক দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া, দিবারাত্রি স্বার্থসেবায় রত থাকিয়া নাগরিকেরা নিকটস্থ প্রতিবেশীকেও চিনেন না। পরস্পর নির্ভর ভিন্ন জীবন যে দুঃসহ হইয়া উঠে, তাহা নাগরিক অপেক্ষা গ্রামিকেরা সমধিক উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এমন স্থান দেখা গিয়াছে যে, পাঁচকাঠা পরিমিত স্থানে পাঁচ প্রকার জাতি বাস করে; তাহার কেহ কাহাকে স্পর্শকরে না। একে অন্যের গৃহে প্রবেশ করেনা। বালকেরা একত্র হইয়া খেলা করিলেও, একে অন্যকে ঘৃণা করিতে শিখে। এই যে পরস্পর ঘৃণার বীজ, ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহা ঠিক হিন্দুশাস্ত্রের বিধিও নহে, অথচ ইহাতে সহস্র সহস্র লোকের উন্নতির পথ,—মানবত্ব লাভের পথ চিররুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আধুনিক প্রচারকগণের আবার বক্তৃতা এই যে, এরূপে অন্যের সর্ব্বনাশ করাই নিষ্কাম ধর্ম্ম। কেননা, বর্ণভেদরক্ষা করা নিষ্কাম ধর্ম্মের অন্তর্গত। এই নিষ্কাম ধর্ম্মে নগরগুলির ক্ষতি হউক, আর না-ই হউক, গ্রামগুলিকে কলহময় করিয়া হিন্দুজাতি সাধারণের মহানিষ্ট করিবে সন্দেহ নাই।

আমাদের বসুদাস ও দাসগুপ্ত বা রায়গুপ্ত মহাশয়গণেরও অনেকে এই ধর্ম্মের প্রচারক। ইহাদের বিশ্বাস, ইহারা আর্য্য কুলধুরন্ধর; নিম্নশ্রেণী হিন্দু বা পৌরাণিক হিন্দুর সহিত

সকল ব্যবহারে বড় হইলে ইহাদের আর্য্যত্ব প্রকাশিত হইয়া যাইবে। ইহারা সকলে দর্পণ ব্যবহার করেন কিনা, জানিনা; তাহা হইলে অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন, অনার্য্যের কৃষ্ণবর্ণত্ব তাঁহাদের যার আনা লোকের চেহারায় দেদীপ্যমান আছে। অনেক তর্কচূড়ামণি ও বেদান্তবাগীশ মহাশয়েরাও অনার্য্য সংস্রবে বড় রুষ্ট, তাঁহারাও একবার দর্পণ হাতে করিলে বুঝিতে পারেন, আজ যাহাদের জলসংস্রবে আসিলে জাতিচ্যুত হইতে হয়,তাহাদের রক্ত সংস্রবও তাঁহাদের শরীরে যথেষ্ট আছে। এই যদি প্রকৃত ঘটনা, তবে স্পর্শদোষ প্রথা সর্ব্বাগ্রে উঠাইয়া দেওয়া উচিত। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন,স্পর্শ দোষ উঠাইয়া দিলেত একাকার হয়। কিন্তু একাকার ও একতা একই কথা। ধর্ম্মও একতা মাত্র।

ধর্ম্মত্ব মেকত্ব মেব।

ইহাই সকল জাতির ধর্ম্মের মূল সূত্র। হিন্দুর ধর্ম্মেরও মূল সূত্র উহাই। তবে সম্প্রতি বিকৃত মস্তিষ্ক হিন্দুদিগের উহা বুঝিবার উপায় নাই।

স্পর্শদোষ-প্রথার অনিষ্টকারিতা অনুসন্ধান করিতে হইলে, ইহাকে সাত ভাগে বিভক্ত করিতে হয়।

(১) বৈদ্যুতিক স্পর্শ বা দর্শনদ্বারা স্পর্শ-দোষ। (২) ছায়াস্পর্শ দোষ। (৩) গাত্র-স্পর্শ দোষ। (৪) জলস্পর্শ দোষ। (৫) খাদ্যস্পর্শ দোষ। (৬) দেবস্পর্শ দোষ। (৭) পরমাত্মা স্পর্শ দোষ।

সমস্ত হিন্দু সমাজ ইহার কোন না কোন স্পর্শ-দোষ দ্বারা দূষিত। ঘোষবসু, দেবদত্ত, সেনগুপ্ত, রায়ইগুঁড়ী, চাঁইচাষার হিন্দুর যে শাখাই ধর, দেখিবে স্পর্শদোষ দ্বারা সকলেই দূষিত। ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও প্রায় অর্দ্ধাংশ, যথা অগ্রদানী, গণক, বর্ণ ব্রাহ্মণ এই প্রথায় একাধিক গুণানুসারে দূষিত।

(১) বৈদ্যুতিক স্পর্শ বা দর্শন দ্বারা স্পর্শ দোষ প্রথা কাহাকে বলিতেছি,গুণবতী খনার নিম্নধৃত বচন দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

আগে ধোবা পাছে নাই।
এমন কার্য্যে যেওনা ভাই॥
এও বাধা পায় ঠেলি।
যদি না দেখি সম্মুখে তেলী॥
খনার বচন।

সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রের স্তম্ভে যাঁহারা আর্য্যত্বের দুন্দুভিধ্বনি তুলিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন বোধহয় সর্ব্বসাধারণ হিন্দু খনার এ নিদেশ প্রতিপালনে ত্রুটি করেন না। এই বচনে ধোবা ও নাপিত দর্শন, তেলী দর্শন দোষাবহ বলা হইয়াছে। ইহাকেই আমরা বৈদ্যুতিক স্পর্শদোষ বলিতেছি। হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য টাক-টিকির উপর বিদ্যুতের যে ক্ষমতা, তাহাতে আমরা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া ইহার হাত ছাড়াইব কি প্রকারে? তুমি যাত্রা করিয়া যাই ধোবা,নাপিত বা তেলী দেখিলে, অমনি বৈদ্যুতিক স্পর্শে তোমার সর্ব্বনাশ হইল!!! তোমার যাত্রা ভঙ্গ হইল! তোমার অমঙ্গল ঘটিল ইত্যাদি। ইহা যে দেশে শাস্ত্রের আসন গ্রহণ করিয়াছে, সে দেশে যে একেবারে দগ্ধ হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য!

কেবল যাত্রাকালে এতাদৃশ বৈদ্যুতিক স্পর্শে সর্ব্বনাশ ঘটে, এমত নহে। হবিষ্যান্ন রন্ধন ও অশন সময়ে এই বৈদ্যুতিক স্পর্শে ভয়ানক ফল উৎপন্ন করে। ব্রাহ্মণের উপবীত গ্রহণের সময় অন্য বর্ণ তাহাকে দর্শন করিলে, এই বৈদ্যুতিক স্পর্শে ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ হয়, তাহা বোধহয় অনেক বসুদাস ও দত্তদাস মহাশয়েরা অনুভব করিয়া থাকিবেন।

যাঁহাদের বিশ্বাস, ব্রাহ্মণেরা অতিশয় নিষ্কামতার সহিত এসকল সামাজিকপ্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ইহার মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষের কোন কারণ নাই, তাঁহাদের অবগতির জন্য আমরা একটি প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

মালদহ ও বীরভূম জেলায় কয়েক ঘর অতি সম্ভ্রান্ত কলুবংশীয় বড় মানুষ আছেন। ইহাদের বেতন-ভোগী অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ কর্ম্মচারী আছে। ইঁহাদের জনৈক কলুপ্রধান একদা এক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর বাড়ীতে আহূত হইয়াছিলেন। কেবল ভোজনের জন্য আহূত এমত নহে, অধীনস্থ ব্রাহ্মণের কার্য্যের তত্ত্বাবধায়কতার জন্যও আহূত হইয়াছিলেন।

যখন সভাস্থ, তখন কলুমহাশয় স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার নম্রতা ভব্যতার কিছুই ত্রুটি ছিলনা। তবে তাঁহাকে কর্ম্মকর্ত্তা সেই তারিখের ব্যাপারের নিয়ন্তা করিয়াছিলেন এবং তিনিও তদনুরূপ যত্নচেষ্টা করিতেছিলেন। জনৈক সভাস্থ ব্রাহ্মণের ইহাতে ঈর্ষানল প্রজ্জলিত হইল। তিনি কলুবাবুকে একাধিক বার জিজ্ঞাসা করিলেন ;

"মহাশয়! একখান ঘানিতে একদিনে কত তৈল হইতে পারে?"

কলুবাবু তথাচ নির্বাক্। পুনর্ব্বারও নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল ;

"জিজ্ঞাসা করিতেছি, একখান ঘানিতে একদিনে কত তৈল হইতে পারে?"

কলুবাবুর তখন আর ধৈর্য্য থাকিল না ; ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—

"তোমার মত হৃষ্ট পুষ্ট গরু হইলে এক দিনেই পনর সের তৈল উৎপন্ন করিয়া লইতে পারি।"

আমাদের পাঠকবর্গের এই বিবাদের পরিশিষ্ট জানিয়া আবশ্যক নাই। যাহা জানা গেল, তদ্দ্বারা বোধ হয় উপলব্ধি হইবে যে, বর্ণ-ভেদ ও স্পর্শ-দোষ-প্রথার মধ্যে বড় বেশী পরিমাণে নিষ্কামতা নাই। ইহাতে এক শ্রেণীর স্বার্থপরতা ও অন্য শ্রেণীর অপমান ভিন্ন আর কিছুই নাই।

কেবল যে ধোবা নাপিত কলু এই বৈদ্যুতিক বা দর্শন দ্বারা স্পর্শ-দোষের অন্তর্গত, তাহা নহে। যে সকল কায়স্থ বৈদ্য জুগী আজ কাল আর্য্যত্বের উন্মাদে উপবীত পর্য্যন্ত ধারণ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিও এই বৈদ্যুতিক স্পর্শের কটাক্ষ সময় সময় সঞ্চালিত হয়। তবে নাকি তাঁহাদের চামড়া অত্যন্ত পুরু, উক্ত কটাক্ষ চামড়া ভেদ করিতে পারে কি না, জানি না। যজ্ঞহীন ধর্ম্মোপবীত পরিহিত বাবুরা ব্রাহ্মণগণের উপবীত গ্রহণের সময় নিকটে থাকিতে পারেন কি?

২। ছায়া-স্পর্শ-দোষের কথাই বা কে না জানে? অদ্যাপি আমাদের ঘরের গৃহিণীরা চাঁড়ালের ছায়া মাড়ালে স্নান করিয়া থাকেন। সকল সময় করুন আর নাই করুন, জলপূর্ণ কলসীকক্ষে চাঁড়ালের ছায়া স্পৃষ্ট হইলে কলসী দেবীর দেহত্যাগ ঘটে। কুলবালাদের এই সংস্কারের উল্লেখ প্রয়োজনীয়, কেন না সামাজিক ক্ষেত্র আমাদের বাচ্যবীরগণ অপেক্ষা পুরস্ত্রীগণ বেশী তেজস্বিনী। সুতরাং ছায়া-স্পর্শ-দোষ যে লুপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে। শুঁড়ীর পীড়িতে বসিতে নাই বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহাও বোধ হয় এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৩) গাত্র স্পর্শদোষ। ইহা এক্ষণেও পুরাদমে চলিতেছে। হাড়ী, ডোম, ধোবা, চর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কোনাই, ভোল্লা, আব্দাল, গাড়াল, দোসাদ, ধানুক, ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনেক নিম্ন হিন্দুকে এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে

হইতেছে। পূর্ব্ব বাঙ্গলার চণ্ডাল বা নবশূদ্রগণও ইহার হাত হইতে নিস্তার পায় নাই। তবে কয়েক বৎসর হইল তথায় এ বিষয় একটুক আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের পাঠকবর্গ তাহার রসাস্বাদন করিবেন কি?

আমাদের জনৈক সবরেজিষ্ট্রার বন্ধু এ বিষয় আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি এ স্থলে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

উক্ত সব-রেজিষ্ট্রার বাবুর বাড়ী ফরিদপুর জেলায়। তাঁহার অনেক ঘর নবশূদ্র প্রজা ছিল। ইহাদের উপর তাঁহার দুর্গা প্রতিমা বিসর্জ্জনের ভার ছিল। দশমীর দিবসে এই সকল প্রজা নৌকা সজ্জিত করিয়া যথাসময়ে সবরেজিষ্ট্রারের বাড়ীতে আসিয়া, প্রতিমা লইয়া ঘাঘর নদীতে গিয়া বিসর্জ্জন করিয়া আসিত। এইরূপ ব্যবহার পুরুষানুক্রমিক ছিল। ৭।৮ বৎসর হইল, নবশূদ্রগণ দশমীর দিবসে সবরেজিষ্ট্রার বাবুকে আসিয়া বলিল—

"মহাশয়, এ বৎসর আমরা দশহরা করিতে পারিব না। আপনি অন্য নৌকা মনুষ্যের চেষ্টা করুন। আমরা যথাসময়ে আপনাকে জানাইলাম।"

সবরেজি। কেন? কেন পারিবে না। চিরকাল তোমাদের উপর এই কাজের ভার আছে। এ জন্য তোমরা আমার বাস্তুভিটায় বাস কর। কেন পারিবে না?

নবশূদ্রগণ। না মহাশয়! পারিব না। কেন পারিব না জিজ্ঞাসা করেন কেন?

অনেক তর্ক বিতর্কের পর নবশূদ্রেরা মনের কথা বলিয়া ফেলিল—"দশহরার দিবস একটি শুভ দিবস। ইহা বৎসরের যাত্রার দিবস। কিন্তু আপনার বাড়ীতে দশহরা করিতে আসিয়া শেষে ফল এই দাঁড়ায় যে, আপনার মাতাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতে গেলে, তিনি পদধূলিটুকু পর্য্যন্ত দিতে চাহেন না। কেন না, আমরা স্পর্শ করিবে, তাঁহার জাতি যাইবে। আমাদের সমাজের নব্য যুবকেরা ইহাতে বড় অবমানিত বোধ করে। তাহারা এবার দশহরা করিতে আসিবে না।"

বলা বাহুল্য, আমার সেই সবরেজিষ্ট্রার বন্ধু এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দেখিলেন, বড় বিপদ। দুর্গা প্রতিমার আর বিসর্জ্জন হয় না। তাঁহার অনুচরেরা নবশূদ্রগণের আস্পর্দ্ধায় ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল—

"বেটাদেরে মেরে কাজ করাইয়া লইব।"

বেটেরা কিন্তু উহাতে কর্ণপাত না করিয়া সগর্ব্বে চলিয়া গেল। ক্রমে বেলা শেষ হইতে লাগিল। দুর্গাদেবী চণ্ডীদালানে আসন গাড়িয়া বসিলেন।

অতঃপর সবরেজিষ্ট্রার বাবু বলিলেন, "উহাদিগকে ডাকিয়া আন।" তাহারা আসিল, কিন্তু কিছুতেই সম্মত হইল না। বরঞ্চ বলিল "যদি আমাদের দ্বারাই দশহরা করাইতে হয়, তবে ব্রাহ্মণ কন্যাগণকে ত স্পর্শ করাইতেই হইবে। অধিকন্তু ব্রাহ্মণেরা আমাদিগকে অন্ন ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিবেন। পূর্ব্বে এরূপ করা হইত না। অগত্যা সবরেজিষ্ট্রারের উভয় কথায়ই সম্মত হইতে হইল। কিন্তু তাঁহার মাতা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী কিছুতেই চণ্ডালকে পদপ্রদান করিবেন না। এই বৃদ্ধ বয়সে চণ্ডাল গাত্র স্পর্শ করিবে? কিছুতেই তাহা হইবে না। অবশেষে সবরেজিষ্ট্রার বলিলেন "মাতঃ, তোমার চণ্ডী প্রতিমাও থাকিল, তুমিও থাকিলে, আমি চলিলাম।" ব্রাহ্মণীর ধনুর্ভঙ্গপণ ভঙ্গ হইল।

নবশূদ্রগণের সকল কথায়ই রাজি হইলেন। দশহরা করিয়া আসিয়া তাহারা ব্রাহ্মণীর পদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিল; ব্রাহ্মণ যুবকেরা তাহাদিগকে অন্ন ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা সবরেজিষ্ট্রার বাবুর নিজের উক্তি এবং তাঁহার নিজের পারিবারিক ঘটনা। যাঁহারা ভাবেন, স্পর্শ দোষ প্রথা নিম্ন শ্রেণীর অপমানের কারণ নহে, তাঁহাদের তার্কিকতার প্রশংসা করিলেও, অবস্থাজ্ঞানের প্রশংসা করিতে পারিনা।

ভরসা করি, আমাদের সকল প্রকার অস্পৃশ্য হিন্দুগণ ফরিদপুরের নবশূদ্রগণের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সমাজে যথোচিত সম্মান লাভের চেষ্টা করিবেন। আমাদেরও উচিত, যাহাতে উচ্চ ও নিম্ন হিন্দু এক হইয়া যাইতে পারি, তাহার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করি।

গাত্র স্পর্শ দোষ হইতে যে একটি সঙ্কটের উদয় হইতেছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টকে উহা নিবারণ করিবার অনুরোধ করিতে হইবে, বোধ করিতেছি। হাড়ি, ডোম, চর্ম্মকার প্রভৃতি অনেক নিম্ন শ্রেণী হিন্দুর প্রাথমিক শিক্ষা হইতেছে না। গাত্র স্পর্শদোষ বশতঃ ইহাদের বালকেরা আদৌ স্কুলেই প্রবেশ করে না। যদি বা কেহ করে, সে এক বেঞ্চ বা আসনে বসিতে পায় না। এজন্য নিম্ন শিক্ষার এক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।

(৪) জল স্পর্শ দোষ। ইহার সংহারিণী মূর্ত্তি অত্যন্ত ভয়ঙ্করী, ফল—ইহাতে হিন্দু সমাজকে দ্বিধাকৃত করিয়াছে। সুবর্ণ বণিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম বর্ণ পর্য্যন্ত ইহার করালজিহ্বা প্রসারিত হইয়াছে। নিম্নবর্ণের কেহ জলস্পর্শ করিলে উচ্চতর বর্ণের জাতিচ্যুতি ঘটে। এ জন্য যে সকল ব্রাহ্মণ নিম্ন হিন্দুদিগের যাজনিক কার্য্য করে, তাহারা জাতিচ্যুত ও পতিত ব্রাহ্মণ হইয়া দাঁড়ায়। জগতের কোন দেশে নিম্নশ্রেণীর সহিত সংস্রব এরূপ দোষাবহ বলিয়া জ্ঞান করা হয় নাই। ইহা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কীর্ত্তি। এই প্রকার দুটি শাখা (১) রান্নাগৃহে প্রবেশ-দোষ প্রথা (২) হুকা খাওয়া দোষ প্রথা। যদিচ, ক্ষত্রি ছত্রী, কায়স্থ বৈশ্য নবশাখ বা তেরশাখ আচরণীয় হিন্দুর মধ্যে গণিত অর্থাৎ জল-স্পর্শ দোষ প্রথার অন্তর্গত নহে, তথাচ ইহারা এই প্রথার উপরোক্ত শাখাদ্বয়ের অন্তর্গত। আমাদের ঘোষ বসু, দেব দত্ত, সিংহ পালিত মহাশয়েরা হয় ত 'আর্য্যামির' মোহনিদ্রায় অভিভূত আছেন। কিন্তু তাঁহারা কি কখন কোন গৃহস্থ ব্রাহ্মণের রান্না ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছেন? সারমেয় রান্না ঘরে প্রবেশ করিলে রন্ধন পাত্রের যে দশা হয়, এই সকল আর্য্যের ব্রাহ্মণ-রন্ধনগৃহে প্রবেশেও সেই ফল উৎপন্ন করে। হুকা খাওয়ার কথা ত বাজারেই রাষ্ট্র। হুক্কাদেবী এক্ষণ জনে জনের ওষ্ঠে বিরাজ করিয়া থাকেন। এই ঘৃণা ও অপমান ব্রাহ্মণ্যানুগত্যের মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। যাহারাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সেবাইত, তাহাদেরই অদৃষ্টে এই ঘৃণা ও অপমান।

(৫) খাদ্য স্পর্শদোষ আরও প্রসিদ্ধ। ব্যবহারিক হিন্দু ধর্ম্মের বার আনা এই খাদ্য স্পর্শ দোষ প্রথা। এক জন ব্রাহ্মণ পরম মূর্খ হউক, লুচি ভাজুক, চুরি ডাকাইতি করুক, তথাচ সে সমাজে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সে যদি কায়স্থ বা বৈশ্য স্পৃষ্ট অন্ন খায়, তবে সে ধর্ম্মচ্যুত। প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন তাহার গতি নাই। এক জন কায়স্থ দেবতুল্য ঋষি হউন, সমুদায় বেদ পাঠ

করুন, সমুদায় হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হউন; তাঁহার যদি খাদ্য স্পর্শ দোষ ঘটিয়া থাকে, তবে তাঁহাকে হিন্দু বলিতে হইবে না। ফলে ব্যবহারিক হিন্দু ধর্ম্ম (Practical Hindu Religion) এই খাদ্য স্পর্শ দোষের মধ্যেই বিদ্যমান। ইহার যে পৃথক্ অস্তিত্ব আছে,তাহা অনুভব করা দুষ্কর। এই খাদ্য-স্পর্শ-দোষ সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারক। কেন না, ইহাতে বর্ণভেদের উপর বর্ণভেদ উপস্থিত করিয়াছে। কৌলিন্য প্রথা ইহার কন্যা। কন্যাপণ পুত্রপণ ইহারই দৌহিত্র। আমি অমুক কায়স্থের অন্ন খাইব না, আমি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিব না। তবে দিব যদি সে আমাকে টাকা দেয়। যে কথা কায়স্থের পক্ষে, সে কথা ব্রাহ্মণের পক্ষে; সে কথা নবশাখের বা তের শাখের পক্ষে। এই প্রকারে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশাখ প্রভৃতি কেহ কাহার অন্ন খায়না, কেহ কাহাকে কন্যাদান করে না। কেবল এও নহে, দেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশাখ আবার শ্রেণী বিভাগ করিয়া কেহ কাহার ভাত খায় না। রাঢ়ীয় শ্রেণী বারেন্দ্রের,বারেন্দ্র রাঢ়ীয়ের ভাত খায় না। বঙ্গজ কায়স্থ দক্ষিণ রাঢ়ীয়ের, আবার দক্ষিণ রাঢ়ীয় উত্তর রাঢ়ীয়ের অন্ন ছুঁইবেনা। ইহার পরেও ভেদ আছে। তাহার সবিশেষ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। যাহা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে, খাদ্য স্পর্শ দোষ প্রথা না উঠাইলে কন্যাপণ পুত্রপণ উঠাইবার প্রস্তাব বিড়ম্বনা মাত্র।

(৬) দেব-স্পর্শ দোষ। ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল হিন্দুই এই প্রথার অন্তর্গত। ব্রাহ্মণেরও অর্দ্ধাংশ এই প্রথা দ্বারা দূষিত। জমিদার ব্রাহ্মণেরা দেব কার্য্যে বিরত। নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা বর্ণব্রাহ্মণ উচ্চ শ্রেণীর দেবতা স্পর্শ করিলে, দেবতাও জাতিচ্যুতি ঘটে।

হিন্দুর ব্যবহারিক ধর্ম্ম জীবনে দৈবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য প্রধান। দোলদোল দুর্গোৎসব ঠাকুর পূজা শিবপূজা; পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ, দশবিধ সংস্কার; যাহাই তাহার দৈব ও পৈত্রিক কার্য্য, তাহাই তাঁহার স্পর্শ করা দোষ!!! বৎসরান্তে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া তুমি দুর্গোৎসব করিলে, কিন্তু দেবতাকে তোমার স্পর্শ করার অধিকার হইল না। যে সকল স্তববাক্যে তাঁহাকে পূজা করিতে হইল, তাহা তোমার উচ্চারণ করিবার অধিকার হইল না। আজ যেমন ইংরেজ বণিক্ তোমার অত্যাবশ্যক গৃহোপকরণ গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইয়াছে—কাপড় তাহারা দিতেছে, লবণ তাহারা দিতেছে; সেইরূপ ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তোমার যাহা আবশ্যক, তাহা সকলই ব্রাহ্মণের হাতে। হিন্দু! তুমি কি মানুষ? তুমি কি সামাজিক জীব? তোমার ত কিছুই নিজস্ব নাই!!! বিদেশীয় কর্ম্মবণিক্ ও দেশীয় ধর্ম্মবণিক্ তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে। ধর্ম্মে ও কর্ম্মে হিন্দু মনুষ্যত্ব শূন্য। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম সেবায় এই ফল হইয়াছে।

হিন্দুর পুনর্জ্জন্মবাদের অর্থ এই (অন্ততঃ ইহা লৌকিক বিশ্বাস) যে বহু জন্ম জন্মান্তরে পাপ ক্ষালিত হইলে হিন্দু ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির পর তাঁহার মুক্তির সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণেতর হিন্দুর আত্মা পরমাত্মাকে স্পর্শ করিবে কি প্রকারে? স্বর্গেও স্পর্শ দোষ আছে! গ্রহ নক্ষত্র গুলিও স্পর্শদোষে দূষিত। ব্রাহ্মণগ্রহ, শূদ্রগ্রহ আছে!!! দেখিলে স্পর্শ

দোষ প্রথার দৌড় কোথায় ? দেখিলে ইহার রাক্ষসীমূর্ত্তি ? এ রাক্ষসী আকাশ পাতাল মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে।

এই ব্রাহ্মণপ্রাধান্য পুনরুত্থিত না করিলে কি চলে না ?

হা হিন্দুধর্ম্ম ! হা জগদারাধ্য হিন্দুত্ব ! তুমি কি কালক্রমে এমনই জঘন্য হইয়াছ যে, ইহ ও পরকালে তোমার সহিত ঈশ্বরের সংশ্রব হইবে না ? হিন্দু ! স্পর্শ দোষ প্রথাতে জঘন্যতা অনুভব করার শক্তি রহিত হইয়াছে বলিয়া তোমার এই নিদারুণ পতন হইয়াছে ও অবশাঙ্গতা জন্মিয়াছে। উত্তিষ্ঠ।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

ভগবদ্গীতা।

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মযোগ।

"স্বধর্ম্মেন যমারাধ্য ভক্ত্যামুক্তিমিতা বুধাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ॥"

অর্জ্জুন—

কর্ম্ম হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ—যদি জনার্দ্দন
এই মত তব, তবে কেন হে কেশব
নিযুক্ত করিছ মোরে কর্ম্মে ভয়ঙ্কর। ১

---

(১) কর্ম্মহতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ—শঙ্করাচার্য্য বলেন, "প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি এই দুইরূপ বুদ্ধি ভগবান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যবুদ্ধি আশ্রয়ে কামনা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস কর্ত্তব্য বলিয়াছেন, এবং তাহাতেই শ্রেয় লাভ হয়—ব্রহ্মে স্থিতি হয়, ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন। অন্যদিকে অর্জ্জুন কর্ম্মাধিকারী বলিয়া, কর্ত্তব্য বোধে আসক্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে কর্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন—অথচ বলেন নাই যে তাহাতে অর্জ্জুনের শ্রেয়লাভ হইবে। এই জন্য মোক্ষার্থী অর্জ্জুনের বুদ্ধি সন্দেহযুক্ত হইয়াছে।"

কোন কোন টীকাকার বলেন, গীতা কেবল আত্মজ্ঞান নিষ্পাদক, মোক্ষ শাস্ত্র নহে। ইহাতে সর্ব্বাশ্রমীর কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে দেখান হইয়াছে যে, জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই সামঞ্জস্য করিয়া সকল লোকেরই সাধনা করা কর্ত্তব্য। কেবল যাবজ্জীবন জ্ঞান সাধনা করিলেই মোক্ষ হয় না। সুতরাং শ্রুতি ও স্মৃতিউক্ত কর্ম্ম একেবারে কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে নাই। অনেক যুক্তি ও তর্কের দ্বারা আজীবনসন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য সেই মত খণ্ডনকরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে সংসারী কেবল তাহারই প্রথম কৃচ্ছ্র সাধ্য কর্ম্ম যোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়—সে একেবারে জ্ঞান সাধন করিতে পারে না। কিন্তু যে ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী, তাহার কর্ম্ম সাধনার প্রয়োজন নাই। শঙ্করাচার্য্য শ্রুতি স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়া আপন মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার দুই একটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"পরমাত্মনি যো রক্তো বিরক্তোঽপরমাত্মনি।
সর্ব্বৈষণাধিনির্ম্মুক্তঃ স ভৈক্ষং ভোক্তুমর্হতি॥
কর্ম্মনা বধ্যতে জন্তু র্ব্বিদ্যায়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম না কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥" শুকানুশাসন
"ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।

* * * *

প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতা।" বৃহস্পতি

গিরি শঙ্করাচার্য্যোক্ত এই মত সমর্থন করিয়াছেন। মধুসূদনও এই কথা বলেন। তিনি বলেন "সাধনার স্তর আছে। প্রথম নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা—ফল চিত্তশুদ্ধি, তাহার পর শমদমাদি সাধন পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস, তাহার পর ভগবৎভক্তি নিষ্ঠা, তাহার পর তত্ত্বজ্ঞান নিষ্ঠা—তাহার ফল জীবন্মুক্তি, পরাবৈরাগ্য প্রাপ্তিও বিদেহ মুক্তি। শ্রুতিতে আছে, আত্মজ্ঞান পরিপাকে লাভ করিলেই মুক্তি হয়—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি

করিতেছ মুগ্ধপ্রায় বিমিশ্র বচনে
বুদ্ধি মম ; কহ তবে নিশ্চয় করিয়া
এক কথা—যাহে মম হবে শ্রেয় লাভ। ২

শ্রীভগবান—
কহিয়াছি পূর্ব্বে আমি শুন পুণ্যবান
আছে হেথা দুই নিষ্ঠা—সাংখ্যজ্ঞানীদের
জ্ঞানযোগে, কর্ম্মযোগে যত যোগীদের। ৩

নান্তঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কর্ম্মাদি সাধনার প্রয়োজন। এই জন্য কর্ম্মাধিকারীকে জ্ঞান নিষ্ঠার উপদেশ উচিত নহে। এবং জ্ঞানাধিকারী হইবার পর কর্ম্মনিষ্ঠারও আর আবশ্যক নাই। সুতরাং একরূপ নিষ্ঠা অপেক্ষা অন্য নিষ্ঠা ভাল বা অনায়াসসাধ্য, এরূপ কথা সঙ্গত হইতে পারে না৭"

রামানুজ বলেন, "আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে আত্মাবলোকন বা আত্মপ্রত্যক্ষ করিতে হয়, আত্মসাক্ষাৎকার হইলে নিয়ত আত্মাতে অবস্থান করিতে হয় বা ব্রহ্ম স্থিতি করিতে হয়। এই পরা বিদ্যালাভ করিতে হইলে অবিদ্যাজনিত মনবুদ্ধিইন্দ্রিয় বিষয় হইতে জ্ঞানকে সরাইয়া লইতে হয়, ইন্দ্রিয় ব্যাপারের উপরতি আবশ্যক হয়। সুতরাং সে অবস্থায় সকাম হউক নিষ্কাম হউক কোন কার্য্যই থাকে না। অতএব পরাবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইলে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। তাহা আত্মজ্ঞান লাভের উপায় মাত্র হইতে পারে।"

কিন্তু এস্থলে আর একরূপ অর্থ করিলেও বেশ সঙ্গত হয়। পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"এষাতেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।" সুতরাং বুদ্ধি অর্থে এই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি উভয়ই বুঝাইতেছে, এবং বুদ্ধি যোগ অর্থে কর্ম্মযোগ ও সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ উভয়ই বুঝিতে হইবে। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধি যোগাৎ ধনঞ্জয়" ইহা বলা হইয়াছে। সে স্থলে কর্ম্ম সকাম কি নিষ্কাম, তাহা কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু সে স্থানে কর্ম্ম অর্থ সকাম কর্ম্ম,তাহা সকল টীকাকারগণই বলিয়াছেন। অর্জ্জুনও সেই স্থানে কর্ম্মের অর্থ ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। এই জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান ও যোগ বুদ্ধি উভয়ই শ্রেষ্ঠ, তবে "কর্ম্মেতেই অধিকার তব" একথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেন তাঁহাকে ঘোর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন!" এখনও এই কর্ম্মে অর্জ্জুনের বিরাগ দূর হয় নাই। তাই তিনি এখনও যুদ্ধকে ঘোর কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই যুদ্ধের ফলে আত্মীয় হত্যা হইবে ও অর্জ্জুনকে তাহাতে দুঃখ পাইতে হইবে,তাহাও অর্জ্জুনের ধারণা এখনও রহিয়াছিল। তাহার উপর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১ হইতে ৩৭শ্লোকে যুদ্ধের পরিণামে অর্জ্জুনের লাভ হইবে,শ্রীকৃষ্ণ এরূপ কথাও বলিয়াছেন। সুতরাং তখনও এ যুদ্ধ অর্জ্জুনের সকাম কর্ম্ম অথবা অশুভ কর্ম্ম বলিয়া ধারণা ছিল। তাই অর্জ্জুন বলিলেন এ যুদ্ধকর্ম্ম সাংখ্য জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত নহে, বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মমার্গেরও অন্তর্গত নহে। আবার বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা এ কর্ম্ম নিকৃষ্ট। তবে তিনি কেন যুদ্ধ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ এই তৃতীয় অধ্যায়ে দেখাইয়াছেন, কর্ম্ম যোগে বুদ্ধি যুক্ত হইয়াও এ যুদ্ধ করা যাইতে পারে। আর নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্যবোধে স্বধর্ম্ম যুদ্ধ না করিলেও তিনি আত্মজ্ঞান লাভের উপায়ভূত কর্ম্মযোগ বুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না।

ভয়ঙ্কর—মূলে আছে 'ঘোর'। সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ব্যাপাররূপ আত্মজ্ঞান বিরোধী (রামানুজ, বলদেব) হিংসাত্মক (স্বামী ও শঙ্কর)।

(২) বিমিশ্র বচনে—কখন বা কর্ম্ম প্রশংসা কখন বা জ্ঞান প্রশংসা এইরূপ সংশয় জনক বাক্যে (স্বামী)। "ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম যুদ্ধ বিনা আর কোন কর্ত্তব্য নাই বলিয়া, পুনর্ব্বার জ্ঞান হইতে মুক্তি হয় এইরূপ সন্দেহ জনক কথায়। বলদেব বলেন, সাংখ্য বুদ্ধি ও যোগ বুদ্ধি সাধ্যসাধক রূপে অবিরোধী হইলেও তাহা এস্থলে বিমিশ্রিত হইয়াছে। মধুসূদন বলেন, জ্ঞান ও কর্ম্ম যোগ উভয়ই একাধিকারীর কর্ত্তব্য কি ভিন্নাধিকারীর কর্ত্তব্য এবং ভিন্নাধিকারীর কর্ত্তব্য হইলে অর্জ্জুন কিসের অধিকারী, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই সন্দেহ যুক্ত হইয়াছিলেন।

(৩) নিষ্ঠা—স্থিতি, অনুষ্ঠেয় তাৎপর্য্য (শঙ্কর)। মোক্ষপরতা (স্বামী)। সাধ্যসাধন ভেদে নিষ্ঠা দুই প্রকার হইলেও উহা একাত্মক, এই জন্য একবচনে ইহা মূলে ব্যবহৃত হইয়াছে (বলদেব)।

কর্ম্ম অনুষ্ঠান সুধু করি পরিত্যাগ
না পারে পুরুষে কভু হতে কর্ম্মহীন ;
সুধু সন্ন্যাসেতে নাহি হয় সিদ্ধিলাভ। ৪

দুই—বিষয় ব্যাকুল বুদ্ধিযুক্ত মুগ্ধ লোকের কর্ম্ম যোগে অধিকার; আর মোহ উত্তীর্ণ কামনাত্যাগী অব্যাকুল বুদ্ধিযুক্ত লোকের জ্ঞানযোগে অধিকার— এই দুই অধিকার হইতে দুই নিষ্ঠা (রামানুজ)।

পূর্ব্বে—এই গীতার প্রথমে, অথবা সৃষ্টির পূর্ব্বে (স্বামী, বলদেব ও মধুসূদন)। কিম্বা বেদে, "পুরা বেদা স্বনা ময়া প্রোক্তা" (শঙ্কর)।

জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ—দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোকের টীকা দেখ। আত্মবিষয় বিবেকী সাংখ্যজ্ঞানীদের ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাসাশ্রমে পরমহংস, পরিব্রাজক প্রভৃতি হইয়া জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় হইয়া শুদ্ধান্তকরণ হইলে জ্ঞানমার্গ অবলম্বনীয় হয়। ও সেই জ্ঞান মার্গ লাভ জন্য, তাহার উপযুক্ত হইবার জন্য—চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়, ও সে জন্য শ্রুতি স্মৃতি নির্দ্দিষ্ট নিত্য নৈমিত্তিক বৈদিক লৌকিক কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে সম্পাদন করিতে হয়। ইহাই কর্ম্মযোগ। এস্থলে রামানুজ ভিন্ন সকল টীকাকারগণ এই অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় গীতায় এই দুই যোগেরই সমান প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কেন না উভয় নিষ্ঠার ফলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়, ইহা পরে বলা হইয়াছে। (১৩অধ্যায় ২৪ শ্লোক দেখ)। সুতরাং কর্ম্মমার্গ কেবল জ্ঞানমার্গের পূর্ব্ব সোপান, এরূপ বলা যায় না।

(৪) কর্ম্ম অনুষ্ঠান পরিত্যাগ—আরব্ধশাস্ত্রীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ (রামানুজ)। যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ত্যাগ (শঙ্কর)। অর্জ্জুন যুদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন বলিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে (শঙ্কর)।

কর্ম্মহীন—(মূলে আছে 'নৈষ্কর্ম্ম্য') নিষ্কর্ম্মভাব বা কর্ম্মশূন্যতা, কিম্বা জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা বা নিষ্ক্রিয় ভাবে আত্মস্বরূপে অবস্থান (শঙ্কর)। সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার রূপ কর্ম্মে বিরতি বা জ্ঞাননিষ্ঠা (বলদেব, রামানুজ)।

সুধু সন্ন্যাসেতে—কর্ত্তব্যকর্ম্ম সন্ন্যাসে, বা কেবল কর্ম্ম পরিত্যাগ মাত্রে, বা জ্ঞান লাভ হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ করিলে সিদ্ধি হয় না (শঙ্কর)। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞান শূন্য সন্ন্যাসে মোক্ষ হয় না। (স্বামী)।

নাহি হেন কেহ, যেই কর্ম্ম নাহি করি
রহে ক্ষণেকের তরে ; করে কর্ম্ম সব
প্রকৃতি-জনিত গুণে অবশ হইয়া। ৫

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পর বিরোধী হইলেও, অর্থাৎ উভয়ের একত্র অনুষ্ঠান এক রূপ অধিকারীর পক্ষে অসম্ভব হইলেও, ইহার একটীকে ত্যাগ করিয়া অন্যটার আশ্রয় গ্রহণ করিলে কোন ফল হয় না। অর্থাৎ কর্ম্মাচরণ কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য জ্ঞান মার্গে আরোহণ করিবার জন্য হইলেও—গৌণ কল্পে মোক্ষের কারণ হয়। এই জন্য সাধনার প্রথমাবস্থায় কর্ম্মমার্গ ত্যাগ করিতে নাই। কিন্তু তাহা হইতে পরিণামে জ্ঞান নিষ্ঠায় না আরোহণ করিতে পারিলে কর্ম্মে মোক্ষ হয় না। সেইরূপ চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞান মার্গে আরোহণ করা যায় না। কর্ম্মনিষ্ঠাই এই চিত্ত শুদ্ধির একমাত্র কারণ। এই কর্ম্ম হইতেই পরিণামে জ্ঞানলাভ হইতে পারে। সুতরাং ইহাদের একটী ত্যাগ করিলে আর একটীতে মোক্ষ হয় না (শঙ্কর)। গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৫ শ্লোক এই—

"সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।
যজ্ঞোদান তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিনাম্॥"
অন্যত্র আছে—
জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
যথাদর্শতল প্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি॥"

(৫) প্রকৃতি জনিত গুণে—প্রকৃতি হইতে জাত সত্ব, রজ ও তমোগুণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া (শঙ্কর)। অথবা প্রকৃতিজ বা নিজ স্বভাবানুরূপ রাগ দ্বেষাদি গুণে বশীভূত হইয়া (স্বামী)। প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে প্রবৃদ্ধ গুণ বশে (রামানুজ)। এই অধ্যায়ের শেষে এই কথা বুঝান আছে।

কি কারণে জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে কর্ম্ম সন্ন্যাসের দ্বারা সিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ আত্মা নিশ্চল হইলেও আত্মাতে অবস্থিতি করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতির অধীন মানব প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিচলিত হয় বলিয়া তাহাতে সিদ্ধি হয় না, ইহাই এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে (শঙ্কর, মধু)।

স্বামী বলেন, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কেহই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। কেননা সকলেই নিজ স্বভাব

কর্ম্মেন্দ্রিয়গণে যেই সংযত করিয়া
ইন্দ্রিয়-বিষয় সব ভাবে মনে মনে—
মূঢ়মতি মিথ্যাচারী কহে হেন জনে। ৬
কিন্তু চিত্তবলে করি ইন্দ্রিয় সংযত
আসক্তি ত্যজিয়া যেই, কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা
হয় কর্ম্ম-যোগে রত—শ্রেষ্ঠ সেই জন। ৭

বশে বিচলিত হইয়া কর্ম্ম করে। এই জন্য একেবারে কর্ম্মত্যাগ সম্ভব নহে, কেবল কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগই সম্ভব। এই অর্থই অধিক সঙ্গত বোধ হয়।

বলদেব বলেন, অবিশুদ্ধচিত্ত লোকে বৈদিক কর্ম্ম সন্ন্যাস করিলেও কি কারণে লৌকিক কর্ম্মে রত হয়, তাহা এথানে দেখান হইয়াছে।

(৬) ভাবে মনে মনে—বিমূঢ়াত্মা রাগদ্বেষ দূষিত চিত্ত যাহারা, তাহারা ঔৎসুক্য বশতঃ কর্ম্মেন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলেও, অর্থাৎ বহিরেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম না করিলেও, মনে মনে অনুরাগ-বিরাগ বশে শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয় স্মরণ করে (মধু)। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ করিয়া মনে ঈশ্বর ধ্যান করিতে গেলেও তাহার পরিবর্ত্তে বিষয় চিন্তা মনে উদিত হয়(বলদেব)। পাপধ্বংসের পূর্ব্বে, বাহ্য জয় হইবার পূর্ব্বে, আত্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত হইলেও মন বিষয় প্রবণতা বশতঃ আত্মা হইতে বিমুখ হইয়া বিষয় চিন্তা করে (রামানুজ)। ভগবান্ ধ্যান ছলে ইন্দ্রিয়ের বিষয় স্মরণ করে (স্বামী)।

মিথ্যাচারী—নিজ সংকল্পের অন্যথা আচরণ করে (রামানুজ)। পাপাচারী (শঙ্কর) বা কপটাচারী (স্বামী) হয়। ইন্দ্রিয় সংযম ক্রিয়া বৃথা হইয়া সে দাম্ভিক হয় (বলদেব)।

(৭) চিত্তবলে—(মূলে আছে 'মনসা' বা মনের দ্বারা) বিবেক যুক্ত হইয়া (মধু)।

ইন্দ্রিয়—জ্ঞানেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়।

সংযত—ঈশ্বর পরায়ণ করিয়া (স্বামী)। বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত করিয়া (মধু)। আত্মাবলোকন প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়মিত করিয়া (রামানুজ)।

কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্ পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়।

নিয়ত করিও কর্ম্ম ; কর্ম্ম ত্যাগ হতে
কর্ম্ম হয় শ্রেষ্ঠতর। কর্ম্ম ত্যাগ করি
নির্ব্বাহ জীবন যাত্রা হবে না তোমার। ৮

শ্রেষ্ঠ—উক্ত মিথ্যাচারী ও ইতরলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় (শঙ্কর, মধু)। তাহার জ্ঞান সম্ভাবনা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ(বলদেব)। চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানবান হয় (স্বামী)। কেবল রামানুজ ভিন্ন অর্থ করেন ; তিনি বলেন, তাহাদের প্রমাদের সম্ভাবনা না থাকায় তাহারা জ্ঞান নিষ্ঠাবান পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হয়।

(৮) নিয়ত করিও কর্ম্ম—নিত্য কর্ম্ম করিও-অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি বিহিত নিত্য কর্ম্ম করিও (স্বামী, মধু, শঙ্কর) চিত্তশুদ্ধি জন্য নিষ্কাম ভাবে স্ববিহিত আবশ্যক কর্ম্ম করিও (বলদেব)।

রামানুজ ভিন্ন অর্থ করেন। তিনি বলেন, তুমি প্রকৃতির সহিত সংসৃষ্ট থাকায় নিত্যকাল ব্যাপিয়া অনাদি বাসনার দ্বারা চালিত হইয়া যে কর্ম্ম করিবে, তাহাই তোমার সর্ব্বাপেক্ষা সুকর হইবে। এই শ্লোকের শেষ ছত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিলে এই অর্থই অধিক সঙ্গত হয়। এবং মূল শ্লোকে 'নিয়ত'—তৎপর স্থিত"কুরু এই ক্রিয়ার বিশেষণ বোধ হয়। 'নিয়ত'র সহিত 'কর্ম্ম' অন্বয় করিলে তাহা কিছু দুরান্বয় হইয়া পড়ে।

কর্ম্মত্যাগ হতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ—চতুর্থ শ্লোকে উক্ত কর্ম্মের অনারম্ভ অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ (শঙ্কর, বলদেব)। সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল(স্বামী)। রামানুজ বলেন, জ্ঞান নিষ্ঠা অপেক্ষাও কর্ম্ম নিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ। কেননা পূর্ব্বে অভ্যাস না হওয়ায় জ্ঞান নিষ্ঠার স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে সহজে নিবৃত্ত করা যায় না। আরও আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আত্মার অকর্ত্তৃত্ব অনুসন্ধান করিয়া স্থির হয়। এই জন্য আত্মজ্ঞান ও কর্ম্ম যোগের অন্তর্গত, ও সেই হেতু কর্ম্ম যোগ শ্রেষ্ঠ। এবং জ্ঞান নিষ্ঠা অধিকারীরও কর্ম্ম যোগ আচরণীয়। কেন না জ্ঞাননিষ্ঠেরও কর্ম্ম ত্যাগ করিলে শরীর রক্ষা হয় না। এই যুক্তি রামানুজের। তিনি আরও বলেন যে, যে পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করিতে হয়, ও সাধনার সমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত ন্যায়ার্জ্জিত ধনের দ্বারা মহা যজ্ঞ ও নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম অবশ্য সম্পন্ন করিয়া,

যজ্ঞ হেতু কর্ম্ম বিনা হয় এ সংসারে
অন্য কর্ম্ম, হে অর্জ্জুন, বন্ধন কারণ—
সেই হেতু কর্ম্ম কর আসক্তি ত্যজিয়া। ৯

যজ্ঞ সহ প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করি
কয়েছিলা পূর্ব্বে—"হও বর্দ্ধিত ইহাতে,
হ'ক ইহা তোমাদের ইষ্ট কাম দাতা। ১০

যজ্ঞাবশিষ্ট আহারের দ্বারা শরীর ধারণ করিবে। কেন না, আহার শুদ্ধ হইলে সত্বশুদ্ধি হয়। সত্বশুদ্ধিতে স্মৃতি স্থির হয়। এই জন্য প্রকৃতিসংসৃষ্ট কর্ম্মযোগই সুকর।

জীবন যাত্রা—শরীর স্থিতি (শঙ্কর)। শরীর রক্ষার জন্য জ্ঞানমার্গাবলম্বীকেও ভিক্ষাভ্রমণাদি ক্রিয়া করিতে হয়। ক্ষত্রিয়ের ত কর্ম্ম ব্যতীত জীবন ধারণের অন্য উপায় নাই(বলদেব)। কর্ম্ম ব্যতীত অর্জ্জুনের শরীরযাত্রা ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত রূপে নির্ব্বাহ হইবে না (মধুসূদন)। দেহাদি চেষ্টা দ্বারা শরীর রক্ষা হয়, নতুবা মৃত্যু হয় (গিরি)।

(৯) যজ্ঞহেতু—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া শঙ্কর, স্বামী, মধুসূদন, গিরি, বলদেব ইঁহারা 'যজ্ঞ' অর্থে বিষ্ণু বা পরমেশ্বর স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যজ্ঞহেতু অর্থে—ঈশ্বর বা বিষ্ণু আরাধনার্থ তাঁহাকে তোষণার্থ। কিন্ত রামানুজ 'যজ্ঞ' সাধারণ অর্থে বুঝিয়াছেন। অর্থাৎ এ শ্লোকে ও পরের শ্লোকে যজ্ঞ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই কথা বলিয়াছেন। এ অর্থও বেশ সঙ্গত।

বন্ধন কারণ—রামানুজ বলেন যে,আত্ম প্রয়োজন জন্য আসক্তি বশে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা হইতে কর্ম্মবন্ধন হয়। অহঙ্কার মমতা ও সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাকুলতা জনিত কর্ম্মে বাসনাবীজ থাকায় তাহাতে বন্ধন হয়। অর্থাৎ সেই বাসনা বা কামবীজ হেতু সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। ঋগ্বেদ মন্ত্রের ৮।১০।১১ মন্ত্রে আছে,"কামস্তদগ্রেসমবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।"

আসক্তি ত্যজিয়া—সুখাভিলাষ ত্যাগ করিয়া, এবং ন্যায়োপার্জ্জিত দ্রব্যসিদ্ধ যজ্ঞাদির দ্বারা বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া তাহার অবশিষ্ট দ্বারা দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া (বলদেব)। আত্ম প্রয়োজন সাধনের অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া (রামানুজ)। কর্ম্মফলে অভিলাষ ত্যাগ করিয়া (শঙ্কর)। আসক্তি ত্যাগ করিয়া পরম পুরুষকে যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা আরাধনা করিলে, অর্থাৎ যজ্ঞ হেতু কর্ম্ম করিলে, অনাদিকাল প্রবৃত্ত কর্ম্ম বাসনা দূর হইয়া যায়, ইন্দ্রিয় ব্যাকুলতা নষ্ট হয়, আত্মাবলোকন করা যায়।

পূর্ব্বশ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে,শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। আহার সংগ্রহ করিতে হয়। সে জন্য গৃহীর অর্থার্জ্জনাদি ও সন্ন্যাসীর ভিক্ষাদির প্রয়োজন হয়, অথবা অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্ত নিজের জন্য আহার সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইলে মন সেই দিকে আকর্ষিত হয়, কর্ম্মে আসক্তি হয়। তাহার ফল—কর্ম্ম বন্ধন। এখন কথা হইতেছে, এমন কোন উপায় আছে কিনা, যাহাতে আহার সংগ্রহও চলিবে, এবং সে নিমিত্ত কৃতকর্ম্মে আসক্তি হইবে না। এ উপায় এই যে, আহার সংগ্রহার্থ কর্ম্ম নিজের জন্য করিতেছি মনে যেন এরূপ ধারণা না থাকে। অর্থাৎ যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিতেছে,বা ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিতেছি, অথবা পশুপক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি সর্ব্বজীবের পোষণ ও বর্দ্ধন জন্য, ও প্রকৃতির যে শক্তির ব্যয়ে জীব জগৎ বর্দ্ধিত হয়, সে শক্তি বর্দ্ধন জন্য যে পঞ্চযজ্ঞাদি কর্ত্তব্য, তাহার জন্যই দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছি—কেবল এইরূপ ধারণা করিয়াই কর্ম্ম করিতে হইবে। তাহা হইলে নিজের জন্য কর্ম্ম করিতেছি এরূপ মনে হইবে না। সুতরাং কর্ম্মে স্বার্থ বা নিজ কামনা থাকিবে না। তাহাতে ধর্ম্মের মূলসূত্র denial of the will শিক্ষা হইবে। কর্ম্মে বন্ধন হইবে না। এই তত্ত্বই এ শ্লোকে ও পরের আট শ্লোকে বুঝান হইয়াছে, ও যজ্ঞ কেন কর্ত্তব্য তাহাও দেখান হইয়াছে।

(১০) যজ্ঞসহ—ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে যজ্ঞের সহিত তিন বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) সৃষ্টি করিয়াছিলেন (শঙ্কর, মধুসূদন, স্বামী), (মনু ১।১১ দেখ)। দেবতাদের আদিরূপ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন (বলদেব)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, ব্রহ্ম সৃষ্টি কালে অগ্নি, ইন্দ্র বরুণাদি, বসু রুদ্রাদি, ও পৃথ্বী—এই সকল দেবতাদের যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বেদে আছে (ঋক্ ৮।১০।৯০ দেখ)—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ।

"যজ্ঞ দ্বারা দেবগণে কর সম্বর্দ্ধিত
তাঁহারাও তোমাদের করুণ বর্দ্ধন;—
পরস্পর সম্বর্দ্ধনে কর শ্রেয় লাভ। ১১

অতএব সৃষ্টির প্রথমে চারি বর্ণই সৃষ্টি হইয়াছিল।

প্রজাপতি—ঈশ্বর, বিষ্ণু (বলদেব)। প্রজাস্রষ্টা (শঙ্কর, মধু)।

কয়েছিলা—নামরূপ বিভাগশূন্য,নিজ প্রকৃতির শক্তিতে বিলীন পুরুষদিগের প্রয়োজন অনুসারে সৃষ্টিকালে সেই প্রয়োজনের সম্পাদক নামরূপ বিভাগ করিয়া, যজ্ঞ এবং তাহার নিরূপক বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন (বলদেব)। অথবা অনাদিকাল প্রবৃত্ত অচিৎ (চৈতন্যাতীত) বিষয় সংসর্গে অবশ ও নামরূপ বিভাগ হেতু বহু পুরুষকে কালে আপনাতে লীন করিয়া বা বিলীন রাখিয়া,পরে সৃষ্টিকালে পুনর্ব্বার নামরূপ বিভাগ প্রজাসৃষ্টি করিয়াছিলেন(রামানুজ)। বলদেব ও রামানুজ উক্তরূপ অর্থ করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন বোধহয়।

বৃদ্ধি হও—আপনার বৃদ্ধি কর (বলদেব, রামানুজ)। উত্তরোত্তর উন্নত হও (মধুসূদন)।

ইহাতে—এই যজ্ঞ দ্বারা অথবা আশ্রমোচিত ধর্ম্মের দ্বারা (মধু)।

ইষ্টকামদাতা—অভিপ্রেত ফল দাতা (শঙ্কর)। কাম্যফলদাতা (মধু)। মোক্ষরূপ কাম ও তাহার অনুযায়ী কামনা সফলদাতা (রামানুজ)। হৃদিশুদ্ধি হইলে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ও দেহযাত্রা যজ্ঞ দ্বারা সম্পাদন করিয়া বাঞ্ছিত মোক্ষ ফল লাভ হইবে (বলদেব)।

এস্থলে কর্ম্মযোগ মার্গে আরোহণ জন্য প্রথম যজ্ঞ করা আবশ্যক বলিয়া ভগবান প্রথমে ইষ্টফল দাতা যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্মেরও প্রশংসা করিয়াছেন বোধ হয়। কারণ বিনা জ্ঞানে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কাম্য কর্ম্মও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ (স্বামী)। অথবা যজ্ঞ আদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ইহাই এস্থলে বুঝান হইয়াছে (গিরি)। শেষ অর্থই অধিক সঙ্গত।

(১১) সংবর্দ্ধিত—(মূলে আছে 'ভাবয়ত')অপ্যায়িত কর (শঙ্কর) বা যজ্ঞের হবি দ্বারা বর্দ্ধিত কর। (স্বামী,মধু)।

বর্দ্ধন—বৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া বর্দ্ধন করিবেন (মধু), (বিষ্ণুপুরাণ ১৬ দেখ)।

"যজ্ঞে পুষ্ট দেবগণ দিবেন সবারে
ইষ্ট ভোগ; ভুঞ্জে যেই দেবে নাহি দিয়া
দেব-দত্ত সে সকল—তস্কর সেজন। ১২
"যজ্ঞ অবশিষ্ট ভোজী সাধু যেই জন
হয় সর্ব্বপাপ মুক্ত; কিন্তু যেই পাপী
নিজ হেতু করে পাক—পাপাহারী সেই।"১৩

শ্রেয়—মোক্ষ (বলদেব),স্বর্গ (মধু)। মোক্ষ লক্ষণ যুক্ত জ্ঞান পাইবে,অথবা স্বর্গলাভ হইবে (শঙ্কর)। বলদেব আরও বলিয়াছেন যে,যজ্ঞ দ্বারা আহার শুদ্ধি হয়, (১৪ শ্লোকের টীকা দেখ) আহার শুদ্ধিই জ্ঞান নিষ্ঠার প্রধান অঙ্গ। কারণ শ্রুতিতে আছে, "তত্রাহার শুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধিঃ সত্ব শুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতি লম্ভে সর্ব্ব গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ)।

(১২) ইষ্টভোগ—স্ত্রী পুত্র পশু প্রভৃতি(শঙ্কর)। পশু স্বর্গাদি (মধু)। অন্নপানাদি বাহ্য সম্পদ (গিরি, রামানুজ)।

দেবগণ—দেবতাগণ ঈশ্বরেরই শরীরভূত অংশ বলিয়া ঈশ্বরই সর্ব্বযজ্ঞের ফল দাতা(রামানুজ)। গীতার ৪ অধ্যায়ের ১১ শ্লোক দেখ।

এস্থলে কর্ম্মত্যাগের দোষ দেখান হইয়াছে (স্বামী)। যজ্ঞে পারত্রিকের ফল ভিন্ন এ জন্মেও ফল পাওয়া যায়, তাহা এ স্থলে দেখান হইয়াছে (মধুসূদন)।

দেবে নাহি দিয়া—যজ্ঞে দেবোদ্দেশে আহুতি না দিয়া (মধু)। পঞ্চ যজ্ঞাদির দ্বারা দেবে তুষ্ট না করিয়া (বলদেব, স্বামী)।

ভুঞ্জে—নিজ দেহ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করে(মধু,শঙ্কর)।

তস্কর—দেবস্ব অপহারী (শঙ্কর)। অন্যের নিকট প্রাপ্ত বস্তু অন্যের প্রয়োজনে না দিয়া তাহাকে যে নিজস্ব করিয়া লয় (রামানুজ)।

(১৩) যজ্ঞ অবশিষ্ট ভোজী—দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ, এই পাঁচ যজ্ঞ। গিরি,দেব যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া চারি যজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন। দেবতা, পিতৃলোক, মনুষ্য ও অন্য ভূতগণের বর্দ্ধন জন্য ও ব্রহ্মের তৃপ্তির জন্য যে কার্য্য করা হয় তাহাই যজ্ঞ। এই কয় যজ্ঞ করিয়া যে ব্যক্তি যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে, সেই অমৃত ভোজন করে (শঙ্কর)।

সর্ব্বপাপমুক্ত—এস্থলে স্মৃত্যুক্ত পঞ্চসূনার (পঞ্চ পাপের) কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

অন্ন হতে সমুদ্ভুত হয় ভুতগণ,
জন্মে অন্ন বৃষ্টি হতে, বৃষ্টির উদ্ভব
যজ্ঞহেতু; কর্ম্মহতে যজ্ঞের সম্ভব ; ১৪

"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী।
পঞ্চসুনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥"

স্মৃতিমতে, অজ্ঞানকৃত এই পঞ্চ পাপ উক্ত পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা নষ্ট হয়। অজ্ঞান পূর্ব্বক ঢেঁকী, যাঁতা, চুল্লী, জলকলস ও ঝাঁটার দ্বারা লোকে সর্ব্বদা যে জীবহিংসা করে উক্ত পঞ্চ যজ্ঞের দ্বারা সেই পাপ মোচন হয়। আমাদের শাস্ত্র মতে সামান্য অজ্ঞানকৃত প্রাণীহিংসাও কতদুর পাপজনক তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়। শাস্ত্রে আছে—

"পঞ্চসুনা কৃতং পাপং পঞ্চ যজ্ঞৈ র্ব্যাপোহতি"।

বলদেব ও রামানুজ বলেন, অনাদি কাল হইতে উপচয় হইয়াছে যে পাপ ও যাহা আত্মতত্ত্ব অবলোকন বিরোধী তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

নিজহেতু করে পাক—(এ সম্বন্ধে মনু ৩।১১ দেখ) যজ্ঞপুরুষের অঙ্গ স্বরূপ দেবতাদের অর্চ্চনার জন্য যজ্ঞার্থ পাক না করিয়া আত্মপোষণের জন্য পাক করে (রামানুজ, বলদেব)।

পাপাহারী—সেরূপ অশুদ্ধ আহারের পরিণাম পাপ এই জন্য সে পাপাহারী (রামানুজ)। কেন না তাহার উক্ত পঞ্চসুনা বিদ্যমান থাকে। যজ্ঞ দ্বারা নষ্ট হয় না। শ্রুতিতে আছে, "ইদমেবাস্য তৎসাধারণমন্নং যদিদমদ্যতে স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্মানোব্যাবর্ত্ততে মিশ্রং হ্যেতৎ।" অন্যত্র আছে "মোঘ মন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধইংস তস্য নার্য্যমনং পুষ্যতি নোসখায়ং কেবলাঘোভবতি কেবল ইতি।"

(১৪) অন্নহতে সমুদ্ভুত—ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইয়া রক্তাদি সার পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহারই সার হইতে পরে পুরুষের রেতঃ ও স্ত্রীলোকের শোণিত উৎপন্ন হয়। এই শুক্র ও শোণিত যোগেই জীবদেহের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হয়। সুতরাং অন্ন হইতেই আমাদের মাতা পিতৃজ শরীর ও স্থুল দেহের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হয় (শঙ্কর)। "শুক্র শোণিত জীব সংযোগে তু খলু কুক্ষিগতে গর্ভসংজ্ঞোভবতি। (চরক)। এই মত আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত।

প্রশ্নোপনিষদে(১২শ্লোকে) আছে—"অন্নং বৈ প্রজাপতি স্ততো হ বৈ তদ্ রেতস্তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি।"

সাংখ্যকারিকায় আছে,—

"সূক্ষ্মা মাতা পিতৃজাঃ সহ প্রভুতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ সূক্ষ্মা তেষাং নিয়তা মাতা পিতৃজা নিবর্ত্তন্তে ॥"

বৃষ্টি হতে—মূলে আছে 'পর্জ্জন্য'—অর্থাৎ বৃষ্টি ও বজ্রাকুলিত মেঘ। কিন্তু এস্থলে অর্থ বৃষ্টি (স্বামী ও শঙ্কর) মধু ও গিরি বলেন এই কথা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

বৃষ্টির উদ্ভব যজ্ঞ হেতু—মনু স্মৃতিতে আছে—
"অগ্নৌ প্রাপ্তাহুতিঃ সম্যাগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥"

অর্থাৎ অগ্নিতে যে আহুতি প্রদান করা যায়, তাহা সমস্ত আদিত্যের অভিমুখে উপস্থিত হয়। তাহা হইতে আদিত্য প্রভাবে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে বসুমতী ফলবতী হইলে অন্ন উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে প্রজা সৃষ্টি হয়।"

অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে দেবতা স্মরণ পূর্ব্বক যে আহুতি প্রদান করা যায়,সেই হবি এক অপূর্ব্বাখ্য সূক্ষ্ম শক্তি বা ধর্ম্ম যুক্ত হইয়া বাষ্পাদি রূপে রশ্মি পথে সূর্য্যাভিমুখে আরোহণ করিতে থাকে। পরে সেই শক্তি হইতেই বৃষ্টি হয়, এবং তাহা হইতেই ব্রীহিযবাদি অন্ন জন্মে ও পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে তাহা হইতেই ভুত দেহ বর্দ্ধন হয় (গিরি)। সুতরাং যজ্ঞদত্ত হবিই পরে অন্নরূপে পরিণত হয় ও জীবদেহ বর্দ্ধন করে।

এই কথা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে হইলে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত দুই একটী তত্ত্বের আলোচনা করিতে হয়। সূর্য্যের উত্তাপে জল যখন বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তখন তাহার সহিত কতকটা সেই তাপ অন্তর্হিত হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকে(Latent heat) বলে। সেই বাষ্প পুনর্ব্বার বৃষ্টিরূপে পরিণত হইতে হইলে, তাহার সেই অন্তর্ভুত তাপ বাহির হইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হয়। উর্দ্ধেস্থিত শীতল বায়ু স্তরের সংযোগে,অথবা উর্দ্ধগমনক্রিয়া সম্পাদন হেতু সেই জলীয় বাষ্পের তাপ সম্পূর্ণরূপে অপহৃত হইতে পারে না—ইহা বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এক্ষণে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এখন অনুমান করেন যে, তাড়িতের ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই জন্য বাষ্প যখন মেঘরূপে প্রথমে পরি-

পন্ন হয়, তখন তাহার সহিত বিদ্যুৎ স্ফুরণ হয়। বোধ হয় বাষ্পের অন্তর্ভুক্ত উত্তাপ কোনরূপে তড়িত শক্তিতে পরিণত হয়; এবং সেই তড়িত ও পৃথিবী হইতে আকৃষ্ট তাহার বিরোধী তড়িত পরস্পর আকর্ষণ নিয়মানুসারে একীভূত হইয়া বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়, এবং তখন বাষ্পের সেই অন্তর্ভুক্ত উত্তাপ হ্রাস হওয়ায় বাষ্প বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। সূর্য্য হইতে বিস্ফুরিত তেজ, তড়িত বা চুম্বক শক্তি রূপে কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া বাষ্পের তাপকে তড়িৎ রূপে পরিণত করে। এই জন্য সূর্য্যের তড়িতের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত অতিবৃষ্টির ও অনাবৃষ্টির সম্পর্ক আছে, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতকে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে,কোন উপায়ে ঊর্দ্ধস্থিত বাষ্পে এই তড়িত শক্তির সংযোগ বিয়োগ দ্বারা অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নিবারণ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি আকাশাভিমুখে ডাইনামাইট নিক্ষেপ করিয়া তাহার সহসা বিশ্লেষণ জনিত শব্দের কম্পন হইতে বৃষ্টি উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছিল। তাহা কার্য্যকরী হয় নাই।

এস্থলে বৃষ্টি উৎপাদনের এক নূতন উপায় উল্লিখিত হইয়াছে। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে অগ্নিতে যে হবি ক্ষেপণ করা হয়, তাহার অপূর্ব্ব ধর্ম্ম বা কোন বিশেষ শক্তির সহিত ধূম ও বাষ্পাকারে সূর্য্যরশ্মি পথে ঊর্দ্ধে উঠিয়া জলীয় বাষ্পের সহিত মিলিত হয়, ও তাহাকে বৃষ্টিতে পরিণত করে (শঙ্কর ও মধুসূদন)। বৃহৎ যজ্ঞাগ্নিকুণ্ডে যে বহু পরিমাণে হবি নিক্ষেপ হয়,তাহাও হয়তঃ বাষ্প হইয়া উপরে উঠিবার সময় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে। সেই জন্য তাহা জলীয় বাষ্পকে বৃষ্টিতে পরিণত করিতে পারে।

ইহা ব্যতীত আরও এক কথা আছে। যজ্ঞাহুত এই হবি বাষ্প রূপে জলীয় বাষ্পের সহিত ঊর্দ্ধে সংমিলিত হয়। সেই হবি-বাষ্প বৃষ্টির সহিত ভূমিতে পড়িয়া ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। শুধু তাহাই নহে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, এই হবি-বাষ্প মধ্যে জীবদেহ সংগঠনকারী অণু অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। সেগুলি আধুনিক বিজ্ঞানাবিষ্কৃত Protoplasm Jerm cell বা blastema কিনা তাহা পরীক্ষা করিলে জানা যাইতে পারে। যদি তাহা হয়, তবে এই হবি শুধু ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে না। সেই ভূমিতে যে শস্য হয়, তাহাতে এই হবি হইতেই জীবদেহ গঠনকারী অণুর পরিমাণ বৃদ্ধি হয়; ও সেই শস্যে জীবদেহের উন্নতি হয়। এইরূপ জীবদেহ গঠনোপযোগী অণুবিশিষ্ট শস্যই প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেহের উপযোগী। তাহার অভাবে আমাদের দেহ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এ তত্ত্ব যদি সত্য হয়, তবে যজ্ঞ আমাদের কত উপকারী তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। যজ্ঞ দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির ভার, ও আমাদের দেহের প্রকৃত উপযোগী শস্য যাহাতে উৎপন্ন হয় এইরূপ কঠিন কার্য্যের ভার নিরক্ষর কৃষকের হস্তে রাখার পরিবর্তে সকল গৃহস্থের উপরই পূর্ব্ব কালে ন্যস্ত ছিল। এবং এই জন্য যজ্ঞ সকল গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য ছিল।

এই তত্ত্ব হইতে পূর্ব্বোক্ত ১১। ১২। ১৩ শ্লোকের অর্থও কতকটা বুঝা যাইবে। কেন না যজ্ঞের দ্বারা কিরূপে আমরা সম্বর্দ্ধিত হইতে পারি, তাহার কারণ ইহা হইতে জানা যাইবে। আর এই যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি কারী শক্তি বা দেবতা বরুণ বা পর্জ্জন্যদেব, ও বিদ্যুৎ শক্তির আধার বা আকাশ দেবতা ইন্দ্র কিরূপে সম্বর্দ্ধিত হন, অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে তাঁহাদের শক্তি কিরূপে বৃদ্ধি হয় তাহাও বুঝা যাইবে।

আরও এক কথা এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। সুকৃতি শক্তি বলে মৃত্যুর পর জীব সূক্ষ্মশরীর লইয়া বিদ্যুৎ পথে সূর্য্যলোকাভিমুখে গমন করে বটে কিন্তু যাহাদের ততদূর সুকৃতি শক্তি নাই তাহারা অত ঊর্দ্ধে বায়ু ও আকাশ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। উহারা পুনর্ব্বার হবি বাষ্পের সহিত বৃষ্টি মুখে ভূমিতে পতিত হয়, ও শস্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত হইয়া জীবদেহে প্রবেশ করে ও পরে সময় উপস্থিত হইলে শুক্র ও শোণিতের যোগে নিজ কর্ম্মানুকূল স্থূল শরীর গ্রহণ করে। শাস্ত্রে এই রূপে পুনর্জ্জন্ম তত্ত্ব বুঝান আছে। মনুসংহিতায় আছে,—

"যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংসৃষ্ট স্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি॥"

তাহা হইলে অন্ন হইতে জীবোৎপত্তির আরও এক কারণ আমরা বুঝিতে পারি।

সে যাহা হউক, জীবদেহ পোষক শস্য উৎপাদন করিতে যে প্রকৃতির কতকটা শক্তি ব্যয় হয়—ইন্দ্র

ব্রহ্মহতে হয় জে'ন কর্ম্মের উদ্ভব,
ব্রহ্ম হন সমুদ্ভূত অক্ষর হইতে—
তাই ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী সদা যজ্ঞে স্থিত। ১৫

বরুণ শক্তি যে কতকটা ক্ষয় হয়, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। কেন না বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্ব হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে উপযুক্ত পরিমাণ শক্তির ব্যয় ব্যতীত শস্য উৎপাদনরূপ কার্য্য সম্ভবে না। পরে সেই শক্তির যদি পূরণ না হয়—তবে ইন্দ্র ও বরুণ শক্তি ক্রমে হ্রাস হইতে পারে। যজ্ঞ দ্বারা সেই শক্তি পূরণ করিতে হয়, অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টির মূল কারণ নিবারণ করিতে হয়। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, যে মানব এই শক্তি দ্বারা পুষ্টহইয়া—পরে এই শক্তিকে নিজে পুষ্ট না করে—সে পাপী ও পাপাচারী।

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের অষ্টম শ্লোক এইরূপ—

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণোঃমনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসুচামৃতং॥"

কর্ম্মহতে যজ্ঞের উদ্ভব—এই যজ্ঞধর্ম্মাখ্য সূক্ষ্ম অপূর্ব্ব শক্তির উৎপাদনের কারণ কর্ম্ম, অর্থাৎ তাহা ঋত্বিক যজমানাদি ব্যাপার রূপ কর্ম্মবিশেষের দ্বারা সাধ্য হয়, (মধু, শঙ্কর, গিরি)।

(১৫) ব্রহ্ম—বেদ (শঙ্কর, স্বামী, গিরি, মধু, বলদেব)। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে আছে "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে" অর্থাৎ যজ্ঞ বা পরব্রহ্ম হইতে বেদের উৎপত্তি। ঐতরেয় আরণ্যকে আছে, "তদিদি বা এতস্য মহতোভূতস্য নাম ভবতি যোঽসৈ-তদেবং নামবেদ ব্রহ্মভবতি ব্রহ্ম ভবতি।" অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদ ব্রহ্ম নামে অভিহিত। রামানুজ বলেন, এখানে ব্রহ্ম অর্থে প্রকৃতি বা পরিণামরূপ শরীর। গীতার ১৪ অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে আছে-"মমযোনি মহদ্-ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।" পাশ্চাত্য টীকাকারগণ বলেন ব্রহ্ম এখানে ব্রহ্মা। সে অর্থ আদৌ সঙ্গত নহে। কেহ কেহ অর্থ করেন 'ব্রাহ্মক্ষর সমুদ্ভবম্' বলিতে ব্রহ্মা ও অক্ষর এক সময়ে উদ্ভূত ইহাই বুঝায়। এ অর্থ কখন সঙ্গত নহে।

উদ্ভব—অর্থাৎ বেদই কর্ম্মের প্রমাণ(মধু)। অথবা বেদ হইতেই কর্ম্মের প্রবৃত্তি (বলদেব, স্বামী)। প্রকৃতি পরিণামরূপ শরীর হইতেই কর্ম্মের উদ্ভব হয়(রামানুজ)।

অক্ষর হইতে—পরমাত্মার নির্দেশ হইতে পুরুষের নিশ্বাসের ন্যায় বুদ্ধি প্রয়োগ বিনা বেদ উদ্ভূত হইয়াছে। (মধু, শঙ্কর, গিরি)। শ্রুতিতে আছে "অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিত মেতৎ ঋগবেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ।" রামানুজ বলেন—অক্ষর বা জীবাত্মা হইতে উদ্ভূত।

কিন্তু গীতার ৮ অধ্যায়ের ৩।১১।২১ শ্লোকে, ১২ অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে এবং ১৫ অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকে এই 'অক্ষর'শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। সেই সব শ্লোক হইতে জানা যায় যে এই সৃষ্টিতে দুইরূপ পুরুষ আছে—ক্ষর ও অক্ষর। ক্ষর পুরুষ—জীব, কেন না তাহা ব্রহ্মে লীন হইতে পারে। অক্ষর পুরুষ 'কূটস্থ'। অর্থাৎ ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই অক্ষয় পুরুষরূপে সর্ব্বজীব দেহে জীবের সহিত বাস করেন। ঋগ্বেদের ১ মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ২১ ঋকে আছে—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে" অর্থাৎ দুই পরস্পর যুক্ত সখ্য ভাবাপন্ন পক্ষী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। এই কূটস্থ অক্ষর পুরুষ সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া ইহাকে সর্ব্বগত বলা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অব্যক্ত পরব্রহ্মকেও 'অক্ষর' বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে 'ব্রহ্ম' অর্থে বেদ বুঝাইলে 'অক্ষর' অর্থে—অক্ষর পুরুষ হইবে না—কেন না বেদ অপৌরুষেয়। অক্ষর অর্থে তাহা হইলে পরব্রহ্ম বুঝিতে হইবে। রামানুজের অর্থ ধরিলে 'ব্রহ্ম' অর্থে মহৎযোনি বা তাহা হইতে জাতভূত শরীর বুঝিতে হইবে—'অক্ষর' অর্থে কূটস্থ জীবাত্মা হইবে। (গীতার ১৪।৪ শ্লোকে দেখ)।

সর্ব্বগত—সর্ব্বপ্রকাশক (মধু, শঙ্কর)। মন্ত্রার্থবাদের দ্বারা সর্ব্বভূতের প্রয়োজনীয় আখ্যানাদিতে অবস্থিত (স্বামী)। সকল শরীর অধিকার করিয়া বাসকারী (রামানুজ)।

যজ্ঞেস্থিত—যজ্ঞ হইতে যে অতীন্দ্রিয় অপূর্ব্ব ধর্ম্ম বা শক্তি জন্মে, তাহাতে অবস্থান করেন (মধু), যজ্ঞ বিধি প্রধান বলিয়া তাহাতে বাস করেন (শঙ্কর)। নিজসৃষ্ট প্রজার জীবনোপায় বলিয়া অতি প্রিয় যজ্ঞে অধিষ্ঠিত থাকেন (বলদেব)। তিনিই যজ্ঞের মূল (রামানুজ)। সর্ব্বব্যাপী অক্ষর পুরুষ সর্ব্বদা যজ্ঞের উপায়ভূত হইয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন (স্বামী)।

এইরূপে প্রবর্ত্তিত চক্র যে হেথায়
নহে অনুবর্ত্তী, পার্থ—সেই পাপ-প্রাণ,
ইন্দ্রিয়ে নিরত—বৃথা জীবন তাহার। ১৬

এই শ্লোকের এইরূপ সহজ অর্থও হইতে পারে, যথা,—অক্ষর পরব্রহ্মের এক চতুর্থ পাদ (পুরুষসূক্ত দেখ) মাত্র মায়া উপহিত ব্রহ্মরূপে জগতে প্রকাশিত। এই মায়ার গুণত্রয় হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি। ব্রহ্মই এই কর্ম্মের আধার ও যজ্ঞ রূপ কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা।"

(১৬) প্রবর্ত্তিত চক্র—বেদ যজ্ঞ পূর্ব্বক ঈশ্বর প্রবর্ত্তিত জগৎ চক্র (শঙ্কর)। জীবের পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য প্রবর্ত্তিত কর্ম্মাদি চক্র (স্বামী)। ব্রহ্ম হইতে বেদের আবির্ভাব, তাহা হইতে কর্ম্মজ্ঞান ও তাহার অনুষ্ঠানে ধর্ম্মোৎপত্তি,তাহা হইতে পর্জ্জন্য,তাহা হইতে অন্ন,তাহা হইতে ভূতগণ, এবং পুনর্ব্বার ভূতগণ হইতে কর্ম্ম প্রবৃত্তি—এই পরমেশ্বর প্রবর্ত্তিত চক্র(মধুসূদন,বলদেব।) রামানুজ বলেন, "ভূতশরীর (ব্রহ্ম) হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন, অন্ন হইতে ভূতশরীর, পুনর্ব্বার ভূতশরীর হইতে কর্ম্ম ইত্যাদি—এইরূপ কার্য্য কারণ ভাবে জগতে কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হয়।"

নহে অনুবর্ত্তী—কর্ম্ম যোগাধিকারী বা জ্ঞান যোগাধিকারী যে কেহ (রামানুজ)। যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে কেবল তাহারা (শঙ্কর)। ইন্দ্রিয়নিরত বিশেষণ যখন এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন এই শ্লোক কেবল কর্ম্মাধিকারীকেই উপলক্ষিত হইয়াছে (মধুসূদন)। শ্রুতিতে আছে—এই জীবাত্মা সকল ভূতেরই লোক, অর্থাৎ সকলের জন্যই কার্য্য করিবে। সে যে হোম করে তাহাতে দেবলোকের কার্য্য হয়,যে উপদেশ দেয় তাহাতে ঋষিদের কার্য্য হয়,যে পুত্রোৎপাদন করে তাহা দ্বারা পিতৃলোক তৃপ্ত হয়। যে মনুষ্যদের বাস ও অন্ন দিয়া তাহাদের তৃপ্তি করে, তৃণ ও উদক্ দিয়া পশুদের তৃপ্তি করে ও শ্বাপদ বায়স পিপীলিকাকে আহার দিয়া তৃপ্ত করে। এই জন্য রামানুজের অর্থই অধিক সঙ্গত। পূর্ব্বে ১৩ শ্লোকের টীকায় যে পঞ্চ যজ্ঞের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা যে চিরদিনই আমাদের কর্ত্তব্য,এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে অন্য বেদোক্ত সকাম যজ্ঞ সম্বন্ধে মতান্তর হইতেপারে কিন্তু সে সকল যজ্ঞও নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য বোধে করা যাইতে পারে ও করা কর্ত্তব্য, তাহার কারণ পূর্ব্বোক্ত কয় শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

কার কথা শুনি ?

কার্ত্তিক মাসের নব্যভারতে "হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য" প্রবন্ধটী পাঠ করিলে মস্তকহীনের শিরপ্রদাহের গল্পটী মনে পড়ে। অগ্রে হিন্দু-ধর্ম্মটাই কি স্থির হউক,তৎপর তাহার প্রমাণ আলোচ্য। প্রতিপাদ্য বিষয়টা কি,প্রকাশ না করিয়া, প্রমাণ সংগ্রহ নিষ্ফল। খ্রীষ্টীয়ানগণ সহস্র দলে বিভক্ত হইলেও, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সংজ্ঞা নির্ণয় করা দুরূহ নয়। খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে এবং তাঁহার পুনরুত্থানে বিশ্বাসই খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম। প্রত্যেক খ্রীষ্টীয়ানের নিকট বাইবেল অভ্রান্ত শাস্ত্র, তাহার সকল কথাই সত্য এবং সকল আদেশই অবশ্য প্রতিপাল্য। মুসলমানগণ মহম্মদকে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ এবং কোরাণ ঈশ্বরাদিষ্ট গ্রন্থ মনে করেন। ধার্ম্মিক মুসলমানগণ কোরাণ হইতে এক পদও অগ্রসর হইবেন না। হিন্দুর কি এমন কতকগুলি পুস্তক নাই,যাহাতে তাহার ধর্ম্মের সমস্ত তত্ত্ব নিহিত আছে ? এই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময় অনেকে হয় ত এই প্রশ্নটী শুনিয়া হাস্য করিবেন। এক্ষণে ধর্ম্মের ঘোর আন্দোলনে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত ; বক্তা প্রচারক উপদেশক পরিব্রাজকে দেশ প্লাবিত ; সনাতন ধর্ম্মের মাহাত্ম্য পূর্ণ পুস্তকও যথেষ্ট প্রচারিত হইয়াছে। অথচ কোন খানিতেই উক্ত প্রশ্নের উত্তর

পাওয়া যায় না। পুনরুত্থিত হিন্দুধর্ম্ম বহু শাখায় বিভক্ত। কাহারও সহিত কাহারও মূল বিষয়ে ও মতের মিল নাই। সকলেই শাস্ত্রের দোহাই দেন, কাহার কোন্ শাস্ত্র তাহা কেহ বলেন না। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই "কলির বেদব্যাস" হইয়া স্বেচ্ছানুসারে শাস্ত্রের বিভাগ, ব্যাখ্যা এবং "প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের নির্দ্ধারণ" করিতেছেন।

বিবেকানন্দ একজন মহা হিন্দু। সুদূর আমেরিকায় হিন্দু-ধর্ম্মের বিজয় নিশান প্রোথিত করিয়াছেন; অথচ তাঁহার হিন্দুয়ানিটা কাশীর পণ্ডিতগণের মনঃপূত হইতেছে না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে আমেরিকার হোটেল নিবাসী শূদ্র পরমহংসের হিন্দু-ধর্ম্ম গঙ্গাজলে রন্ধন করা নিষিদ্ধ মাংসের ন্যায়। Indian Nation ইণ্ডিয়ান নেসনের বিজ্ঞ সম্পাদক তাঁহার বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, স্বামিজী খ্রীষ্টের উপদেশগুলি হিন্দু ধর্ম্মের উপদেশরূপে প্রচার করিয়া আমেরিকাবাসিগণকে প্রতারিত করিতেছেন। একজন সংসারত্যাগী হিন্দু সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রবঞ্চনার অভিযোগ বড় সামান্য নয়। তাঁহার অনেক কথায় আমাদেরও বিশ্বাস হয় না। সম্প্রতি তিনি তাঁহার মাদ্রাজী বন্ধুগণকে লিখিয়াছেন, যে "It (*i. e.*, Vedas) was all in the way of *Bhoga* and no one ever contended that it could produce *mokha*" (Vide Hope of December 9, 1894) অর্থাৎ বেদমার্গে মোক্ষ হয় না এবং হইতেও যে পারে, তাহাও কেহ কখন বলে নাই। আমাদের একটা ভ্রম ছিল যে, বেদ ব্রহ্মার মুখপদ্ম বিনিঃসৃত। অতএব ইহা হিন্দু মাত্রেরই পূজ্য। যে সকল দার্শনিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, বেদের অভ্রান্ততা এবং অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিয়া হিন্দু সমাজে স্থান পাইয়াছিলেন। স্বামিজীর গীতায় প্রগাঢ় ভক্তি। গীতাকার একজন Liberal হিন্দু হইলেও বেদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহযঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

(অগ্নি হোত্রাদি) কর্ম্ম বেদ হইতে, বেদ ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভব হইয়াছে, অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যে লোক ইহলোকে বিষয়াসক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মাদি চক্রের (কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরারাধনার) অনুবর্ত্তী না হয়, তাহার আয়ু পাপময় ও জীবন বৃথা। (গীতা ৩য় অধ্যায়ে ১৫।১৬ শ্লোক) অন্যত্র—

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞ বিদো যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ
যজ্ঞ শিষ্ঠ মৃতোভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ (৪।৩০)

এই সকল যজ্ঞবেত্তা যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ হন। এবং যজ্ঞশেষরূপ অমৃত ভোজন করিয়া ব্রহ্ম সনাতনকে লাভ করে।

বিবেকানন্দের কলিকাতাস্থ সহযোগীবর্গও এক নূতন হিন্দুধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। শাস্ত্রে দশ অবতারের কথা উক্ত আছে। তন্মধ্যে নয়টী হইয়া গিয়াছে এবং বাকি আছেন কল্কী। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী নিবাসী ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংসই তাঁহাদের মতে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সৃজনকারী পূর্ণ ব্রহ্মের শেষ অবতার!!!

বাঙ্গালার (Sir Walter Scott) বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন বড় সাধারণ রকমের হিন্দু ছিলেন না। উপন্যাস লেখকের যিনি রাজা, কুহকিনী কল্পনা যাঁর চির সহচরী, একটা নূতন ধর্ম্ম সৃজন বা চার সহস্র বৎসরের এক জরাজীর্ণ ধর্ম্মের পঙ্কোদ্ধার

করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ। অসাধারণ প্রতিভাবলে লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত এবং সুবিস্তীর্ণ পুরাণ রাশির ভিতর প্রচ্ছন্ন ভাবে লুক্কায়িত "প্রক্ষিপ্ত" শ্লোক সকল বাহির করিয়া দিয়াছেন। তিনি অগাধ শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শীতকালে কিঞ্চিৎ মদ্যপান করা দূষনীয় নয়। পরম বৈষ্ণবেও সকল প্রকার মাংসাহার করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ হইলেই যে ব্রাহ্মণ হইল, তাহা নয়। রামামুচির সন্তানও একজন সৎব্রাহ্মণ হইতে পারে; এবং আবশ্যক হইলে বোধ হয় শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মও তাহা দ্বারা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অনেকের সহিত তাঁহার এ সকল মত মিলে না বটে, কিন্তু ইহাকেই তিনি আদি ও অকৃত্রিম হিন্দুধর্ম্ম বলেন।

মহাভারত হরিবংশ প্রভৃতি পুস্তকগুলি অনেক দিনের রচিত। এক্ষণকার মার্জ্জিত-রুচি যুবকযুবতীর চিত্ত রঞ্জনের উপযুক্ত নয়। তাহাতে কৃষ্ণ পীতধড়া পরিধান করিয়া অধিকাংশ দেহ উলঙ্গ রাখেন; লোকের বাড়ীতে যজ্ঞের সময় ব্রাহ্মণগণের পদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হন। মাঠে গরু চরান প্রভৃতি অনেক অনেক কুৎসিত কর্ম্ম সময় সময় তিনি করিয়া থাকেন। এমন মহাভারত একালে চলিতে পারে কি প্রকারে? কবিবর শ্রীনবীনচন্দ্র সেন সম্প্রতি সভ্য সমাজের উপযোগী এক নূতন মহাভারত রচনা করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের এক মহৎ অভাব দূর করিয়াছেন। তাহার দুই (part) রৈবতক এবং কুরুক্ষেত্র বাহির হইয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণ (Prince Bismark) এর ন্যায় নিজের সুশোভিত মন্ত্রণাকক্ষে বসিয়া থাকিয়া গুপ্তচরের নিকট পররাষ্ট্রের গুহ্য সংবাদ শ্রবণ করেন। উত্তরা নভেলের (heroine) এর ন্যায় ছবি আঁকেন। অভি-মন্যু (Poetry) লেখেন এবং মধ্যে মধ্যে স্বভাবের শোভা হেরিয়া আত্মহারা হন। সুভদ্রা (Sister of mercy) হইয়া কুরুক্ষেত্রের আহত সৈন্যগণের শুশ্রূষা করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ গৃহ বিবাদে আত্মবল ক্ষয় করিতেছে দেখিয়া, দুর্ব্বাসা অনার্য্য রাজ্য পুনঃসংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন ইত্যাদি। আবার এমন হিন্দুও আছেন যে, যাঁহার নিকট গোমেধ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ হইতে ষষ্ঠী পূজা পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মই সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গ। নবমীতে অলাবু ভক্ষণ, হাঁচি-টিকৃটিকিতে যাত্রাকরিলে—এমন কি ষ্টারথিয়েটারে কীচকবধ অভিনয় বন্ধ হইলেও অনেকের সনাতন ধর্ম্মে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়।

বলা বাহুল্য, সকল দলই আপনাদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন এবং শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের মত সংস্থাপন, করেন। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব কি এবং ইহার শাস্ত্রই বা কোন গুলি?—ভাবিয়াছিলাম "হিন্দু ধর্ম্মের প্রামাণ্যে" ইহার সদুত্তর পাইব। কিন্তু সমস্ত প্রবন্ধটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াও আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। এক স্থানে তিনি সনাতন ধর্ম্মের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে—"বেদ মতে শব্দের অর্থ নিয়ম। হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্ম শব্দ এই বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধর্ম্ম সাংসারিক নিয়ম, আহারের নিয়ম, পারিবারিক নিয়ম—যে সমস্ত নিয়ম আত্মাকে পরমার্থ পথে নিয়োজিত, শাসিত ও উদ্বোধিত করে, সেই সমস্ত নিয়মই হিন্দু ধর্ম্ম। সর্ব্ব বিধায়ে ধর্ম্ম মনুষ্যকে নিয়মিত করে", অর্থাৎ যে সকল নিয়ম অবলম্বন করিলে মানবের ইহকালে উন্নতি এবং পরকালে অপবর্গ লাভ হয় তাহাই হিন্দু

ধর্ম্ম। তিনি আরও বলেন যে "যদি কোন ধর্ম্ম বাস্তবিক ধর্ম্ম নামের যোগ্য থাকে, তাহা সনাতন ধর্ম্ম"। এ কথা তাহার স্বধর্ম্মানুরাগের পরিচায়ক হইলেও তাহার সংজ্ঞানুসারে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজ প্রভৃতি খ্রীষ্টীয়ানগণের অবস্থার সহিত আর্য্য-বংশাবতংসগণের তুলনা করিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে নিয়মানুসারে আহার বিহার, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া তাহারা শৌর্য্যে বীর্য্যে সমস্ত জগতের মধ্যেশ্রেষ্ঠ, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা যে পরপদদলিত, অজ্ঞ, দরিদ্র জাতির সাংসারিক নিয়মাপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা একজন অন্ধেও বলিতে পারে। মৃত্যুর পর কে ব্রহ্মলোকে অগ্রে গমন করিবে, তাহা বলা বড় সহজ নয়। কিন্তু যদি প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগ, অকৃত্রিম স্বজাতিপ্রেম, সমস্ত মানব জাতির প্রতি সার্ব্বভৌমিক প্রেম, জগতের উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ যদি ইহলোকে স্বর্গের পরিচায়ক হয়, তবে খ্রীষ্টীয়ান দেশেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

পূর্ণ বাবুর সংজ্ঞানুসারে ত হিন্দু ধর্ম্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিলাম না। এখন দেখা যাউক, তাঁহার প্রমাণ গুলি কিরূপ ? কিসের মকদ্দমা, না হয় নাই জানিলেন, সাক্ষিদের জবানবন্দি শুনিতে দোষ কি ?

সনাতন ধর্ম্মের নাকি এমন সকল শক্ত শক্ত "প্রমাণ আছে যে, তাহার সহিত তুলনা করিলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রামাণ্য নগণ্য হইয়া পড়ে"। খ্রীষ্টীয় প্রমাণালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। লেখক নিশ্চয়ই জানেন যে, ইউরোপে Straus, Renan, Mill ছাড়া পণ্ডিত এবং Huxley ভিন্ন বিজ্ঞানবিৎ অনেক সহস্র আছেন, যাঁহাদের উক্ত ধর্ম্মে অচলা ভক্তি। আর যে Huxley, Mill খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রমাণকেও উপহাস করেন; সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের মত কিরূপ, তাহা কি একবার ভাবিয়াছিলেন ? সে যাহাই হউক, লেখকের মতে "হিন্দু ধর্ম্মের প্রামাণ্য" দ্বিবিধ, (১) স্বতঃ (internal), (২) পরতঃ (External)। হিন্দুধর্ম্মের পরতঃ প্রমাণ বুঝিতে হইলে লেখকের মতে এই সকল কথা অগ্রে জানা উচিত, যথা,—(১) হিন্দুধর্ম্মের দুই অঙ্গ, পৌরাণিক এবং বৈদিক। বেদেই হিন্দুধর্ম্ম; পৌরাণিক ধর্ম্ম সেই বেদের বিস্তৃতি মাত্র। (২) জনসমাজে জ্ঞানাধিকার বিভিন্ন বলিয়া সনাতন ধর্ম্ম এইরূপ দ্বিধা বিভক্ত। জ্ঞানিগণের জন্য যাহা প্রতিপাদ্য, অজ্ঞানীর কাছে তাহা অগ্রাহ্য। সকল অজ্ঞানীকে জ্ঞানী করা অসম্ভব।' এজন্য হিন্দুধর্ম্ম নিজেই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অধিকার ভেদের উপযোগী হইয়াছে"। (হিন্দু ধর্ম্মের এটা মহা অনুগ্রহ বলিতে হইবে)। (৩) অজ্ঞানী সকল এক সম্প্রদায় ভুক্ত, কিন্তু "জ্ঞানিগণের অনেক দল আছে, যথা শাস্ত্র জ্ঞানী মুনি, ঋষি, মহর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি" ইত্যাদি। এতগুলির মধ্যে কেবল মুনির Defination টা তিনি বলিয়া দিয়াছেন। "যে জ্ঞানীরা এক এক বিশেষ মত প্রচার করেন, তাঁহারাই মুনি"—কেন না বোধ হয়, নাসৌমুনির্যস্য মতংন ভিন্নং বলিয়া(৪)। "অদ্ভুত লীলা খ্রীষ্টধর্ম্মের ঈশ্বরত্বে প্রমাণ হিন্দু ধর্ম্মের নহে। হিন্দুধর্ম্মের লীলার প্রমাণ ঈশ্বর। শাস্ত্র প্রমাণ ঈশ্বরাবতার হিন্দুর বিশ্বাস্য। তাঁহার লীলা দেবলীলা। হিন্দু অগ্রে স্বীকার করেন যে, রাম, কৃষ্ণ, ভীম, যুধিষ্ঠির হনুমান প্রভৃতি দেবাবতার—তাহার পর কাজেই স্বীকার্য্য যে তাঁহাদের লীলা দেবলীলা বলিয়া অদ্ভুত এবং অলৌকিক।" এমন হিন্দুর বুদ্ধির প্রশংসা

কে না করিবে? বিশেষ হনুমান যখন তাহার দেবাবতার!

উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশটী পাঠ করিলে এই রূপ বোধ হয় যে, হিন্দুধর্ম্মের বৈদিক ভাগ জ্ঞানিগণের জন্য, আর অজ্ঞানীর জন্য পৌরাণিক। বৈদিক ধর্ম্মই বা কি, পৌরাণিকই বা কি, তাহা তিনি কোথাও বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেন নাই। * ভাবে বোধ হয়, লেখকের মতে "নিম্নাধিকার জ্ঞানী" হিন্দু সাকার সগুণ ঈশ্বরের উপাসক, আর, উচ্চাধিকার জ্ঞানী হিন্দু নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসক। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে (১) নির্গুণ ঈশ্বর কি? (২) বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য নির্গুণ ঈশ্বর কি না? (৩) নিম্নাধিকার জ্ঞানী হিন্দুই বা কে উচ্চাধিকার জ্ঞানী হিন্দুই বা কে? (১) বঙ্কিম বাবু বলেন, দার্শনিকেরা নির্গুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে গ্রন্থরচনা করিতে পারেন না বটে, কিন্তু তাহা আমাদের ন্যায় সাধারণ মানবের জ্ঞানের এবং কল্পনার অতীত।

(২) আর নির্গুণ ঈশ্বর যে বেদের প্রতিপাদ্য; বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের এবং Maxmuller এর গ্রন্থ পড়িলে ত বোধ হয় না। তবে লেখক বেদ শব্দটা বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করেন। রাম তাপনীয় উপনিষৎ, গোপাল তাপনীয় উপনিষৎও তাহার নিকট বেদ?

(৩) এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পাতা ব্রহ্ম যে চিন্ময় অদ্বিতীয়, মায়াতীত এবং অশরীরী, তাহা পূর্ণ বাবুও স্বীকার করেন; কেন না, তাহার রামতাপনীয় উপনিষৎ নামক বেদেতেই আছে—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ"

তবে জ্ঞানী সেই নিরাকারের উপাসনা করুন, আর অজ্ঞানীরা সাকার দেবদেবীর উপাসনা করুন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। ঈশ্বর বিষয়ে জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর প্রভেদ নির্ণয় করা সহজ নয়। ইংরাজী নবিশ বলেন, অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রের নিকট মহা পণ্ডিতেরও জ্ঞান ক্ষুদ্রতম-বালুকাকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। তাঁহার নিকট সমস্ত মানবের হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। ব্রহ্মের স্বরূপ কি, কোন্ মানব জানিতে পারে? কেনোপনিষতের এই কথা গুলি ত সকলেই জানেন।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদচ
যো নস্তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদচ
যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য ন বেদসঃ
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।

কেনোপনিষৎকার নিশ্চয়ই একজন "উচ্চাধিকার জ্ঞানী হিন্দু"। অথচ তিনিই বলিতেছেন, "যিনি মনে করেন, ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ রূপে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না" অর্থাৎ ব্রহ্ম অবিজ্ঞেয়; মানব তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে জানিতে পারে না। "অসম্যগ্দর্শী নির্ব্বোধ লোকেরাই মনে করেন যে, তাঁহারা ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছেন"। আর ব্রহ্মের যে কিছুই জানা যায় না, তাহাও নয়। সকলেই কিছু কিছু জানিতে পারেন। সুতরাং ব্রহ্মের নিকট জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাঁহার নিকট অজ্ঞানী। আর ব্রহ্ম যদি অশরীরীই হইলেন, তবে অজ্ঞানী তাঁহার রূপ কল্পনা করিবেন কেন? তাহাতে তাঁহার উপাসনার কি সহায়তা করিবে? ভগবান্ সত্যস্বরূপ। যাহা মিথ্যা তাহাই পাপ, মিথ্যা কল্পনায় পূর্ণ রূপের

* এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন যে, "হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপাদ্য নির্গুণ ঈশ্বর" আর "সগুণ ঈশ্বর নিম্নাধিকারীর উপাস্য।" হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপাদ্য নির্গুণ ঈশ্বর, অতএব যাহাদের ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য সগুণ ঈশ্বর, তাহাদের ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম নয়, ইংরাজী ন্যায় শাস্ত্রের মতেও এই রূপ দাঁড়ায়।

কিরূপে সন্তোষ জন্মিবে ? কেহ কেহ বলেন, অজ্ঞানীরা নিরাকার ঈশ্বর মনে ধারণা করিতে পারে না। কোন্ জ্ঞানীই বা তাহা পারেন ? প্রহ্লাদ"সিদ্ধ পুরুষ''হইয়াও বলিয়াছিলেনঃ—

"নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে'

বিষ্ণুপুরাণ ১।১২।৭৭

"ভগবানের নাম নাই, রূপ নাই, কেবল আছেন, এই মাত্র রূপে জানা যায়''। "তাঁহার অস্তিত্ব'' ভিন্ন মহাপণ্ডিতেও তাঁহার বিষয় অধিক কিছু জানেন না। অতি মূর্খেও তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম। স্বয়ং শিব মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বলিয়াছেন :—

স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ
স্ব প্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দ লক্ষণঃ
নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ
গুণাতীত সর্ব্বসাক্ষি সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃখিভুঃ।
সবেত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞ স্তং ন জানাতি কশ্চন
তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ২।৩৪ পৃঃ

"সেই পরমেশ্বরই কেবল সৎ অর্থাৎ নিত্য এবং তিনিই কেবল একমাত্র সত্যবস্তু। তিনি অদ্বিতীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি স্বপ্রকাশ, সর্ব্বদা পূর্ণ অর্থাৎ অখণ্ড এবং সচ্চিদানন্দ লক্ষণ বিশিষ্ট। তিনি নির্ব্বিকার, তাহার কোন আধার নাই, তিনি ভেদ রহিত এবং আকুলতা শূন্য। তিনি শীতোষ্ণ সুখ দুঃখাদির অতীত, তিনি সকল কার্য্যের শুভাশুভ মাত্রেরই সাক্ষী। সকলের প্রাণ স্বরূপ, সকল পদার্থের অবলোকয়িতা এবং সকল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। তিনি সর্ব্বজ্ঞ কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানে না। এই সমস্ত জগতই তাঁহার অধীন, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।'

(হিন্দুশাস্ত্র, ৪৮ পৃষ্ঠা)

শিবও ভাবেন ঈশ্বর :—

লোকাতীতো লোক হেতুরবাক্‌মনসগোচরঃ।

ঈশ্বর বাক্য এবং মনের অগোচর। মানবের মন তাঁহার রূপ কি ধারণা করিতে পারে ? না তাঁহার সত্তা ভিন্ন আর কিছু উপলব্ধি করিতে পারে ?

তর্কের জন্য না হয় স্বীকার করা গেল ; জ্ঞানী হিন্দু ঈশ্বরতত্ব সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারে। জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী দুইটা কি স্বতন্ত্র জীব ? সকলেই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষার তারতম্যানুসারেই লোকে জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী হইয়া থাকে। অজ্ঞানী যদি ভ্রম বশতঃ মনে করেন, ঈশ্বরের দশটা হাত বা পাঁচটী মস্তক ; জ্ঞানীর কি তাহার সেই ভ্রান্তি দূর করা উচিত নয় ? অজ্ঞানীর চক্ষে পৃথিবী সমতল বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞানী কি তাহার' জন্য বলিবেন—হাঁ পৃথিবী সমতল। এমন জ্ঞানীর জ্ঞানের আমরা বিশেষ পক্ষপাতী নহি। "ঈশ্বর নিরাকার'' এই তত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কি এতই দুরূহ ? খ্রীষ্টীয়ান, মুসলমান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীগণের সকলেই বুঝিতে পারেন। আর হিন্দুর "উচ্চাধিকার জ্ঞানী" না হইলে পারেন না। হিন্দুর বোধশক্তি কি এতই দুর্ব্বল ? আর হিন্দুর মধ্যে ''উচ্চাধিকারী জ্ঞানী''ই বা কে ? দেখিতে ত পাওয়া যায়, অতি মূর্খ শূদ্র হইতে হাইকোর্টের ব্রাহ্মণ বিচারপতি পর্য্যন্ত সকলেই ত মূর্ত্তি পূজা করেন। সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও তাঁহারা আজিও প্রতিমা পূজা ত্যাগ করেন নাই। "প্রতিমা নিম্নাধিকারীর জন্য'' এটা বোধ হয় কথার কথা। সাকার মূর্ত্তির পূজা করিতে করিতে ঈশ্বরের নিরাকারত্বে জ্ঞান জন্মে, ইহাও অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে হইতে পারে ? "সাকার'' এবং "নিরাকার'' দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন শব্দ। একটীর সঙ্গে আর একটীর কোন সাদৃশ্য নাই। একের দ্বারা অপরটী কখনই জানা যাইতে পারে না। যিনি নদী হ্রদ প্রভৃতি কিছুই কখন দেখেন নাই, তিনি কি কখন পর্ব্বতের

রূপ ভাবিতে ভাবিতে মহাসমুদ্রের রূপ স্থির করিতে পারেন? সাদৃশ্য যুক্ত দুই পদার্থের মধ্যে তুলনা হইতে পারে, এবং একের দ্বারা অন্যের রূপ স্থির করা যায়। নিরাকার সাকারের কোন সাদৃশ্য নাই। সুতরাং একটী হইতে অপরটী স্থির করা যায় না। শত শত বিদ্বান্ বুদ্ধিমান হিন্দু ত আজন্ম ঠাকুরকে যথেষ্ট পরিমাণে ভিজা চাল খাওয়াইতেছেন, কই, এজীবনে ত তাহাদের ভ্রম ঘুচিল না! আর একটি বালককেও ঈশ্বরের যথার্থ তত্ত্ব শিক্ষা দাও, অচিরাৎ সে বুঝিতে পারিবে।

"হিন্দু ধর্ম্মের প্রামাণ্য"টী পড়িলে লেখককে একজন সরল বিশ্বাসপ্রবণ লোক বলিয়া বোধ হয়। "সমস্ত পুরাণ একজনের লেখা" ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। বঙ্কিম বাবু বলেন—সমস্ত পুরাণ পড়িয়া যিনি বলিবেন ইহা একজনের লেখা, তাঁহার সহিত তর্ক করা বৃথা। তাঁহার প্রবন্ধের অনেক স্থলেই আমরা অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। যথা—"ব্যাস মহাভারত সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, তাহা কাব্য, কিন্তু নিম্নাধিকারী জ্ঞানী সমাজে তাহা ইতিহাস রূপে গৃহীত হইল।" নিম্নাধিকারী জ্ঞানীর এত বিদ্যা, তাহা ত আমরা জানিতাম না?

যে সকল যুক্তি দ্বারা লেখক শব্দের নিত্যত্ব সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে কলেজের ছাত্রেরাও হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। সংস্কৃত ন্যায়, দর্শন সকল পড়িলে এইরূপ জ্ঞান জন্মায় বলিয়া ভারতহিতৈষী মহাত্মা রামমোহন রায়, Lord Amherst কে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে ইংরাজী পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দিতে অনুরোধ করেন। এতদুপলক্ষে লিখিত উক্ত মহাত্মার পত্রখানি আমরা প্রবন্ধ লেখককে পড়িতে অনুরোধ করি।

পূর্ণ বাবুর মতে "হিন্দু ধর্ম্মের প্রামাণ্য ত্রিবিধ।" পৌরাণিক, দার্শনিক এবং যোগসিদ্ধ। তিনি বলেন, যে সকল লোকে পৌরাণিক গল্পে বিশ্বাস করেন না, বা দার্শনিকগণের মীমাংসায় সন্তুষ্ট নন; "তাঁহাদের জন্য যোগ পথের প্রামাণ্য।" "এ প্রামাণ্য কাহারও অগ্রাহ্য হইতে পারে না"—অতি সরল লোক না হইলে একথা কেহ আজিকার দিনে বলিতে সাহসী হয় না। এখনকার "ইংরাজী শিক্ষায় বিকৃত মস্তিষ্ক" লোকের কেবল যে যোগে অবিশ্বাস, তাহাই নয়; তাঁহারা যৌগিক ক্রিয়া সম্বন্ধে বলেন "Conscientiously observed, they can only issue in folly and idiocy" এই সকল ঘোর পাষণ্ডদের দলনার্থ তাঁহার আর কোন প্রমাণ আছে কি? তিনি সকলকে যোগাভ্যাস করিয়া দেখিতে বলিয়াছেন। তিনি কি নিজে যোগ দ্বারা কোন নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন?

আমরা দেখিতেছি, হিন্দুধর্ম্মে অনেক "সন্ন্যাসী জুটিয়া গাজন নষ্ট" করিতে বসিয়াছে। কাজেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কাহার কথা শুনি? হিন্দু ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব গুলি কি? তাহার নির্ণয় করা হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য হইয়াছে। হিন্দুর কোন্ গুলি শাস্ত্র? খ্রীষ্টীয়ানের বাইবেলের ন্যায় বা মুসলমানের কোরাণের ন্যায় হিন্দুর ধর্ম্মপুস্তক কোন্ গুলি, যাহাতে তাহার ধর্ম্মের সকল তত্ত্বই নিহিত আছে? সংস্কৃতে লিখিত হইলেই বা পুরাণ উপনিষৎ নাম হইলেই কি শাস্ত্র হইল? উক্ত পুস্তক সকল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত। কাজেই তাহাদের মতের কোন মিল নাই। হিন্দুর শাস্ত্র কোন্ গুলি, তাহা জানিতে পারিলেও অন্ততঃ হিন্দুধর্ম্ম কি, কতকটা স্থির করা যায়।

শ্রীজয়গোপাল দে।

কৃষি কার্য্যের উন্নতি। (১১)

জীবিত অণুর ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া।

কৃষিকার্য্যের অনুকূল ও প্রতিকূল নানা জাতীয় জীবিত অণু, বায়ু, জল ও মৃত্তিকা মধ্যে সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিয়া জগতের নানাপ্রকার আবশ্যক কার্য্য সাধন করিতেছে (১) ব্যাসিলাস্ টার্ডি ক্রেসেন্স (Bacillus tardecrescens) ব্যাসিলাস ফ্লুওরেসেন্স (Bacillus fluorescens) ব্যাক্টিরিয়াম্ ইউরিই (Bacterium Ureæ) ও মাইক্রোকক্কাস্ সিরিয়াস্ (Micrococcus Cereus) এই কয় প্রকার অণু মৃত্তিকা মধ্যে থাকিয়া জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং এমোনিয়া ঘটিত যৌগিক পদার্থ সকল হইতে নাইট্রিক এসিড্ উৎপাদন করে। এই নাইট্রিক এসিড্ এবং ইহার সহিত মৃত্তিকাস্থিত চূর্ণ, পট্যাশ ও সোডা মিলিত হইয়া যে নাইট্রেট সকল উৎপন্ন হয়, ঐ সকল নাইট্রেট্ কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায়। নাইট্রিক এসিড ও নাইট্রেট অবস্থাতেই উদ্ভিদগণ তাহাদিগের প্রধান আহার নাইট্রোজন (যবক্ষারযান) সংগ্রহ করিয়া থাকে। (২) শিম ও কলাই জাতীয় উদ্ভিদগণের Legaminous plants শিকড়ের সহিত সংলগ্ন হইয়া কতকগুলি অণু অবস্থান করে। ঐ সকল অণু বায়ু হইতে যবক্ষারযান আহরণ করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে এবং উক্ত উদ্ভিদের শিকড়ের সহবর্ত্তী নাইট্রেট সকল উৎপাদন করিয়া, উদ্ভিদের আহারের সুবিধা করিয়া দেয়। সাধারণতঃ বায়বীয় যবক্ষারযান উদ্ভিদগণ আহরণ করিতে অক্ষম। (৩) আবার এক জাতীয় অণু (Bacterium Denitrificano) উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী নাইট্রেট্গুলি নাইট্রাইট্ ও নাইট্রোজেনে পরিণত করিয়া কৃষিকার্য্যের প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকে। (৪) আর এক জাতীয় অণু (Micrococcus Ureæ) মূত্রের ইউরিয়া নামক অংশটীকে অ্যামোনিয়াম কার্ব্বনেটে পরিণত করিয়াও কৃষিকার্য্যের কিছু হানি করে। (৫) জল ও শর্করার সংযোগে টরুলা সেরিভিসিই (Torula Cerevisiæ) নামক অণু সুরা উৎপাদন করিয়া সংসারের নানাবিধ উপকার ও অপকার সাধন করিতেছে। (৬) সুরার সংযোগে ব্যাক্টিরিয়াম্ এসিটাই (Bacterium Aceti) নামক অণু শির্কা প্রস্তুত করে। এই শির্কা পচন কার্য্য নিবারণ জন্য বিশেষ উপকারী। (৭) ব্যাক্টিরিয়াম্ টার্ম্মো (Bacterium termo) নামক অণুর সহযোগে মাংস ও ব্যাসিলাস ফ্লুজিরির (Bacillus Pflugeri) সহযোগে মৎস্য পচিয়া গিয়া অখাদ্য হইয়া পড়ে। (৮) ব্যাসিলাস্ বিউটিরিকাস্ নামক অণুদ্বারা মাখন পচিয়া যায়। আবার এই অণুই পনির পাকাইবার উপাদান। এই অণুর প্রধান কার্য্য Butyric acid নামক অম্ল উৎপাদন করা। এই অম্ল জন্তুদিগের পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে বলিয়া, এই অণুকে কৃষিকার্য্যের অনুকূল বলিয়াই গণ্য করা উচিত। (৯) ব্যাক্টিরিয়ম্ ল্যাক্টিস্ (Bacterium lactis) নামক অণু দুগ্ধ হইতে দধি উৎপাদন করিয়া মনুষ্যের উপকারে আইসে। (১০) নীলগাছ হইতে রং প্রস্তুত হইবার জন্যও এক জাতীয় ব্যাসিলাসের সহায়তা আবশ্যক। (১১) অণুগুলির আর আর প্রক্রিয়া অপেক্ষা ব্যাধি উৎপাদন প্রক্রিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। এই

সকল প্রক্রিয়ার সহিত কৃষকের সম্বন্ধ নিতান্ত ঘনিষ্ট। অণু সকল যে নিম্ন নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী ব্যাধির কারণ, তাহা স্থির হইয়াছে। মাই-ক্রোকক্কাস্ জাতীয় অণু দ্বারা এই কয়েকটী ব্যাধি জন্মে—এরিসিপেলাস্ (হঠাৎ মুখ ফুলিয়া সাংঘাতিক প্রদাহ উপস্থিত হওয়া); পীত জ্বর(Yellow fever); হাম; বসন্ত; মনুষ্য ও গবাদি জন্তুর ফুস্‌ফুসের প্রদাহ (Pneumonia); জলাতঙ্করোগ; হুপিংকফ্ নামক শিশুদিগের সংক্রামক কাশ রোগ; প্রমেহ; লোহিত জ্বর (Scarlatina); গ্যাংগ্রিন্ বা হাড় ও মাংস খসিয়া যাওয়া; রাইণ্ডার পেষ্ট নামক গো-মড়ক; গোরু ও মেষের 'ক্ষুরে' (Foot and mouth desease) নামক রোগ; স্থতিকা জ্বর; এবং মুর্গির গুটী। ব্যাক্টিরিয়া জাতীয় অণু হইতে গোরু ও ঘোড়ার গলাফুলা রোগ জন্মে। ব্যাসিলাস্ জাতীয় কয়েক প্রকার অণু হইতে এই কয়েকটী ব্যাধি জন্মে—ডিপথিরিয়া (Diphtheria); শূকর জাতির জ্বর (Swine fever); টাইফয়েড জ্বর; ম্যালেরিয়া জ্বর; ঘোড়ার ও মেষের গ্ল্যাণ্ডাস্ ও ফার্সি নামক ক্ষত রোগ; (মনুষ্যেরও এই রোগ হইতে দেখা গিয়াছে); কুষ্ঠ-রোগ; উপদংশ; মনুষ্য ও জন্তুদিগের যক্ষ্মাকাশ রোগ; গো-বসন্ত ও রেসমকীটের (কাল শিরা)রোগ; ওলাউঠা; ও ধনুষ্টঙ্কার। স্পাইরিল্লাম জাতীয় অণু হইতে পালাজ্বর (Relapsing fever অথবা Jungle fever) হয়। প্যান্‌হিষ্টোফাইটান্ জাতীয় অণু হইতে রেসম কীটের কটারোগ জন্মে। ওইডিয়াম্ আল্‌বিকান্স নামক্ অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের অণু সমষ্টি হইতে ঘোড়ার ক্ষুরে থ্রাশ (Thrush) নামক ব্যাধি জন্মে। বোট্রাইটিস্ ব্যাসিয়ানা ও বোটাইটিস্ টেনেল্লা নামক দুইটী বৃহজ্জাতীয় অণুসমষ্টি হইতে রেসমকীটের 'চূণাকেটে' নামক রোগ জন্মে। এই সকল রোগের মধ্যে কয়েকটী একবার হইলে পুনরায় অনেক দিবস পর্য্যন্ত হয় না। ইহাদের জন্যই টিকার ব্যবস্থা হইয়াছে বা হওয়া সম্ভব। আর কতকগুলি রোগ একবার জন্মিলে পুনরায় জন্মিবার অথবা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবার আরও অধিক সম্ভাবনা থাকে। এই সকল রোগের জন্য টিকার ব্যবস্থা হইতে পারে না। যে সকল রোগের টিকা ব্যবস্থা হইয়াছে অথবা হইতে পারে, তাহারা এই গুলি, যথা,—বসন্ত রোগ, পীতজ্বর, গোবসন্ত; মুর্গির গুটি; জলাতঙ্ক রোগ, শূকর জাতির সংক্রামক জ্বর; ওবাইণ্ডার পেষ্ট্ নামক গো-মরক; ডিপ্‌থিরিয়া; গ্ল্যাণ্ডার্স ও ওলাউঠা যাহাদের জন্য টিকা ব্যবস্থা হইতে পারে না, তাহারা এই গুলি —যক্ষ্মাকাশ; ফুশ্‌ফুশের প্রদাহ (সংক্রামক নিউমোনিয়া); প্রমেহ; উপদংশ; এরিসেপেলাস্; ম্যালেরিয়া জ্বর; ও পালা জ্বর। যে সকল রোগের জন্য টিকা ব্যবস্থা হইতে পারে না, তাহাদিগের উপশম অথবা আরোগ্যের জন্য অণুনাশক পদার্থের ব্যবহারই একমাত্র উপায়। যে সকল রোগে টিকা প্রচলিত হইয়াছে, অথবা হওয়া সম্ভব, তাহাদিগের আরোগ্য অথবা উপশমের জন্য ও অণু-নাশক পদার্থ ব্যবহার করিয়া উপকার পাওয়া গিয়াছে। (১২) কৃষিজাত ওষধি সমুদায়ের "ঝুড়ে লাগা," "ধসা-ধরা" প্রভৃতি যে সকল রোগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা প্রায়ই অপেক্ষাকৃত বৃহজ্জাতীয় অণু-ঘটিত। ইহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, পেরনস্পোরিয়াম্, ফিউসিস্পোরিয়াম্, পেজিজা টিউবার সিনিয়া, পাক্‌সিনিয়া, আইসেরিয়া ওয়িডিয়াম্, ইসি-ডিয়াম্, মিক্রোমাইসিটি, ক্ল্যাভিসেপ্স, টেলি-

উটোস্পোরিয়াম্, ইউষ্টিলজিনাম্ ইত্যাদি। কৃষিজাত ওষধি সমস্তের ব্যাধি বিষয়ে এদেশে এখনও কোন অনুসন্ধান আরম্ভ হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিলাতে এই সকল ব্যাধির বিষয় আলোচনা অনেক অগ্রসর হইয়াছে। এ, বি, গ্রিফিথ্স্ সাহেব প্রণীত Diseases of crops, এবং ডব্লু, জি, স্মিথ্ সাহেব প্রণীত Diseases of Field and Garden crops; এই দুইখানি পুস্তক পাঠ করিলে বিলাতে কৃষিজাত ওষধি সকলের ব্যাধি সম্বন্ধে গবেষণা কিরূপে চলিতেছে, বুঝা যাইবে। এদেশে কয়েকটী ওষধির ব্যাধি বিলাতি ব্যাধির সহিত এক বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতে, এই কয়েকটীর বিশেষ বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে। আলুগাছ পচিয়া যাওয়া, গমের পাতা প্রথমে হরিদ্রা ও পরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়া শস্য নিতান্ত অল্প হওয়া, এবং গমের ও অন্যান্য শস্যের 'শীষ্' কাল হইয়া শুকাইয়া যাওয়া, বিলাতে ও এদেশে একই রকমে ঘটিয়া থাকে, দেখা যায়। যে তিনটী আণুবীক্ষণিক উদ্ভিজ্জ হইতে এই তিনটী রোগ হইয়া থাকে, তাহারাও সম্ভবতঃ বিলাতের তুল্য রোগত্রয়ের কারণভূত, পেরনস্পোরা ইন্ফেস্টান্স (Peronspora Infestans) টিল্লেটিয়া কেরিস্ (Tilletia caries) ও ইউ-ষ্টিলাগো কার্বো (Ustilago carbo), ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৃষিজাত ওষধি সমস্তের আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ ঘটিত ব্যাধি নিবারণ জন্য শেষ অধ্যায়ে (ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যার নব্য-ভারতে) কতকগুলি সাধারণ নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। এই সকল নিয়ম মৃত্তিকা ও বীজ শুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রযুজ্য। মৃত্তিকা ও বীজের মধ্যে ব্যাধিজনক অণু সকল যদি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে গাছ জন্মিবার পরে ব্যাধি হওয়ার বিশেষ সম্ভব থাকিবে না। যদি পরেও গাছে অণুঘটিত ব্যাধি দেখা দেয়, তাহা হইলে কোন একটী তীব্র অণুনাশক পদার্থ শস্য ক্ষেত্রে সময়মত (অর্থাৎ ব্যাধি দেখা দিবা মাত্র) ছিটাইতে পারিলে, ব্যাধি কাটিয়া যাওয়া সম্ভব। তুঁতিয়া ও চুণ জলের সহিত (১০০ গুণ অথবা তদপেক্ষাও অধিক জল) মিশ্রিত করিয়া, "এক্রেয়ার ভেপোরাই-জার" নামক কল দ্বারা ধূমাকারে ক্ষেত্রে ছিটা-ইয়া দেওয়াতে আলু গাছের ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছে। অণুনাশক পদার্থ প্রয়োগ করিবার সময় ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এই সকল পদার্থ যেমন আণুবীক্ষণিক উদ্ভিজ্জ পদার্থ নষ্ট করিতে সক্ষম, সেইরূপ সাধারণ উদ্ভিদও উহারা নষ্ট করিতে সক্ষম। একারণ ব্যাধি উপস্থিত না হইলে গাছের উপর সামান্য পরিমাণেও এই সকল পদার্থ সেচন দ্বারা, গাছের ক্ষতি ভিন্ন উপকার হয় না। বীজের কথা স্বতন্ত্র। বীজের মধ্যে যখন কোন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় নাই, তখনই বীজকে তুঁতিয়ার জলে অথবা কর্পূরের জলে ডুবাইয়া লওয়া নিয়ম। এরূপ করাতে বীজের উপরিভাগে যে ব্যাধিজনক অণু থাকে তাহারা নষ্ট হয়। বীজের মধ্যে তুঁতিয়া অথবা কর্পূরের জল প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই ঐ জল শুকাইয়া লইবার নিয়ম স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অধিকক্ষণ অণুনাশক পদার্থের মধ্যে থাকিয়া বীজও মরিয়া যায়। ইংলণ্ডের প্রধান বীজ বিক্রেতা সটন্ এণ্ড সান্স্ তাঁহা-দের আলুর ক্ষেত্রে তুঁতিয়ার জল ও চুণ প্রয়োগ করিয়া, কোন উপকার না পাইয়া বরং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন; অর্থাৎ যে সকল ক্ষেত্রে এই পদার্থ দ্বয় প্রয়োগ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্র হইতে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক আলু পাইয়াছেন। ঔদ্ভিদিক প্রক্রিয়া

অল্প বিস্তর স্থগিদ বা নাশ করিয়াই, অণু নাশক পদার্থগুলি আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ সকলকে উচ্ছেদ করে। এই প্রক্রিয়ার নাশ দ্বারা বৃহজ্জাতীয় উদ্ভিদেরও ক্ষতি হয়; অর্থাৎ পাতা শুকাইয়া গাছের বৃদ্ধি কমিয়া গিয়া শস্য অল্প জন্মে। যখন ব্যাধি দেখা দিবে তখনই অণুনাশক পদার্থের ব্যবহার বিধেয়। তখন ব্যাধি দ্বারা সমস্ত শস্যই নষ্ট হওয়া সম্ভব বলিয়া অণুনাশক পদার্থের ব্যবহার দ্বারা আণুবীক্ষণিক-উদ্ভিদের নাশ করিয়া (অথচ তৎসহকারে ওষধিরও কিছু ক্ষতি করিয়া) কতক পরিমাণে শস্য সংগ্রহ হইতে পারে। প্রথমাবধি প্রতিবিধান চেষ্টা করিলে অণুজাত ব্যাধি শস্যের ক্ষতি না করিয়া রোধ করা যায়; কিন্তু ব্যাধি উপস্থিত হইলে ব্যাধি দ্বারা যে শস্যের কিছুই ক্ষতি হইবে না এবং শস্যের উপর ব্যাধি নাশক পদার্থ প্রয়োগের দ্বারাও যে শস্যের কিছুই ক্ষতি হইবে না, এরূপ হইতে পারে না। জন্তুদিগের অণুজাত ব্যাধি সম্বন্ধেও এই কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যে সকল পদার্থ দ্বারা অণু সকল নষ্ট হয়, তাহারা বিষময়, অর্থাৎ তাহারা জান্তবিক ও ঔদ্ভিদিক প্রক্রিয়া, কোন না কোন প্রকারে, অল্প বা অধিক পরিমাণে, স্থগিত বা নাশ করিতে সক্ষম। অণুনাশক পদার্থের যদৃচ্ছা ব্যবহার কখনই বিধেয় নহে। সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলেই এই সকল পদার্থের ব্যবহার 'বিষস্য বিষমৌষধম' ভাবে চলিতে পারে। এ সকল পদার্থের নিত্য অথবা অপরিমেয় ব্যবহার দ্বারা ক্ষতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ সকলের যে কয়েকটী প্রধান প্রক্রিয়ার কথা বলা হইল, এ সকলের মধ্যে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে উপযোগী কয়েকটী বিষয়ের বিশেষ রূপ বর্ণনা করা যাইবে। পাস্তারি মতে টিকা দেওয়া এদেশে প্রচলিত হইলে, গো-বসন্তের হাত হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ গোরু রক্ষা পাইতে পারে, ইহা স্থির জানিয়া, এক্ষণে গো-বসন্ত সম্বন্ধেই কয়েকটী অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করিবার মানস করিয়াছি।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। ইন্দুমতী—সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযশোদালাল তালুকদার প্রণীত, এবং ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের একখানি সার্টিফিকেট পুস্তকের প্রথমেই গ্রথিত হইয়াছে। এইরূপ সার্টিফিকেট প্রথার আমরা বড় পক্ষপাতী নহি। সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—"স্নেহের চক্ষে সকলই ভাল,—সুতরাং ইন্দুমতীও ভাল লাগিয়াছে।" সমালোচকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কিন্তু বইখানা ভাল লাগিল না। ভাষার সরসতা এবং মাধুর্য্য যথেষ্ট আছে; স্থানে স্থানে ভাষা এবং কবিত্বের প্রীতিকর সমাবেশও হইয়াছে; কিন্তু উপন্যাস অংশে 'ইন্দুমতী' নিম্নশ্রেণীর পুস্তক হইয়াছে।

২। দেবী না মানবী—উপন্যাস।

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার প্রণীত; মূল্য ৷৷০। লেখক ইন্দুমতী দ্বারা একটী প্রকৃত দেবী চরিত্র পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। উদ্দেশ্যটী ভাল; আংশিক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চরিত্রটী সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত হয় নাই। কেমন একটু অসংলগ্ন, হঠাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত ভাবে দাঁড় করাইয়া, এই অতি সুন্দর চরিত্রটীর প্রভাব কিছু কমাইয়া ফেলিয়াছেন। লেখকের হৃদয়ের ভাব উচ্চ; ভাষাও অনেক স্থানে তদুপযোগী হইয়াছে।

৩, ৪। চরিতমালা—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ; শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত; ইংরাজি সংস্কৃত যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।০ এবং ।৵০। Example is better than precept একটী অতি পুরাতন প্রবাদ, একটী প্রকৃত মহৎ লোকের জীবনের সদা প্রভাব এবং জীবন্ত দীপ্তি যেরূপ অনায়াসেই চতুর্দ্দিকে সংক্রামিত হয়, জীবনশূন্য অগভীর শত মৌখিক উপদেশেও তাদৃশ হয় না। জীবনচরিতের প্রধান উদ্দেশ্য—সমাজের এই অশেষ কল্যাণদায়িনী শক্তিকে জাগ্রত এবং স্থায়ীরূপে রক্ষা করা। জীবনচরিত যখন বিদ্যালয়ে অধীত হয়, তখন এই শক্তি শিক্ষার্থীদিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। চরিতমালার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বর্ণিত চরিত্রগুলির প্রায় সমস্তই বঙ্গদেশবাসীর। বাল্যকালে সুদূর ইউরোপ এবং মার্কিন দেশীয় চরিতাখ্যায়িকা পাঠ করিয়া একটা ভাসা ভাসা স্বপ্ন কিম্বা উপন্যাস-সুলভ ভাবের উদ্রেক হইত। স্বতন্ত্র জলবায়ুপরিপুষ্ট দূরদেশবাসীর চরিত্র-দৃষ্টান্ত যেন ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ কার্য্যকর হইত না। কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় দেখাইয়াছেন, আমাদেরই মধ্য হইতে, অতি সামান্য অবস্থার ভিতর দিয়া, যত্ন এবং অধ্যবসায়শীল মনস্বীগণ কি প্রকারে আপনাদিগকে উন্নত করিয়াছেন এবং দেশের ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। চরিতমালার ভাষা সরল এবং মধুর।

৫। কুম্ভমেলা—শ্রীমনোরঞ্জন গুহ প্রণীত; কলিকাতা গুরুপ্রেস। গত বৎসর কুম্ভমেলা দর্শনে লেখকের মনে যে সমুদয় ভাবের উদয় হইয়াছিল, প্রধানতঃ তাহা লইয়াই এই ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিত। "নিবেদনে" লিখিয়াছেন—"এই গ্রন্থ কুম্ভমেলার প্রকৃত ইতিহাস নহে। * * * অনেকে বলিয়াছেন, কেবল গুণের কথাই বলা হইয়াছে, দোষের কথা কি কিছু নাই? * * * আমার নিবেদন, আমি সমালোচনার জন্য কিছু লিখি নাই"। এই ভূমিকার পর আমাদের কিছু বলা শোভা পায় না।

৬। মৌন-মুখরা—The Silent Preacher কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত; মূল ৶০। কয়েকটী নীতিপূর্ণ উপদেশ লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। অতি সামান্য বিষয় হইতে আমরা কিরূপে কবিত্বপূর্ণ সুন্দর "নীতিচয়ন" করিতে পারি, কবিরাজ মহাশয় পরিষ্কার রূপে দেখাইয়াছেন।

৭। ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী—চন্দন নগর নববিধান ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত; তারা যন্ত্র; মূল্য ।০। তালসমন্বিত রাগিণীই সঙ্গীতের প্রাণ; এই প্রাণশূন্য সঙ্গীত কবিতা মাত্র। ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী আধ্যাত্মিক কবিত্বে পরিপূর্ণ। ভক্তের প্রেমবিহ্বল কণ্ঠে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পাইয়া যখন ইহারা মূর্ত্তিমান হয়, তখনই ইহাদের শক্তি এবং মাধুর্য্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয়। কতকগুলি সাম্প্রদায়িক সঙ্গীত ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা সাধারণের নিকট প্রীতিকর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

৮। হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার—শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত; কুমারহট্টস্থ পূর্ণিমা ব্রত-সমিতি দ্বারা প্রকাশিত-মূল্য ৶০। এই প্রবন্ধটী পূর্ব্বে নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সমাজ-সংস্কারকদিগকে একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

৯। নির্ম্মলা—উপন্যাস, শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল প্রণীত, সাবিত্রী যন্ত্র, মূল্য ১৲। কৌলিন্য প্রথার মর্ম্মভেদী দৃশ্যের একটী দিক্ ইহাতে

বেশ দেখান হইয়াছে। নির্ম্মলার চরিত্রে লেখকের চরিত্রনির্ম্মাণের বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে; এই দেবী-চরিত্র সৃজন করিয়া গ্রন্থকার বাস্তবিকই সমাজের একটী বিশেষ উপকার করিয়াছেন। নির্ম্মলা প্রকৃতই দেবী; আশা করি, ইঁহার ভক্তিপূর্ণ মধুর আশ্বাসবারি সিঞ্চনে,বঙ্গের অনেক বিষাদময় ভগ্নহৃদয়ের তরুণ ক্ষতে শান্তিধারা বর্ষিত হইবে। মৃগেন্দ্রবালার ভয়ঙ্কর চরিত্র একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। বিমলানন্দের চরিত্র, স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক হইলেও, মোটের উপর বেশ হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, রুচি মার্জ্জিত এবং ভাষা মধুর।

১০। কৃষি ক্ষেত্র—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে, Fellow of the Royal Horticultural Society of London &c.—প্রণীত Elysium Press. মূল্য ১৲। জীবিকা প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত পূর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ হওয়াতে, আজ কাল আমাদের দেশের মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোকের "মান বাঁচান দায়" হইয়া পড়িয়াছে। এই মধ্যবিৎ শ্রেণীকেই এখনকার "শিক্ষিত বাঙ্গালী" বলা যাইতে পারে। অনেকে উপহাস করিয়া ইহাদিগকে "চাকুরিপ্রিয়" বলিয়া থাকেন। শরীরধারী জীবের "আহার-প্রিয়তা" ইত্যাদি বিশেষ উপহাসের বিষয় মনে করি না। রোগীকে "শয়নপ্রিয়" না বলিয়া রোগ মুক্তির উপায় দেখাইয়া দেওয়াই প্রকৃত হিতৈষীর কার্য্য। প্রবোধ বাবু "কৃষি ক্ষেত্র" দ্বারা অন্নচিন্তা-বিহ্বল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবিকা সমস্যার একটী সহজ মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়,ভাষার প্রতি গ্রন্থকার বিশেষ দৃষ্টি রাখেন নাই, এজন্য বহুল ভুল ভ্রান্তি রহিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে এইসব সংশোধিত হইবে আশাকরি।

১১। জীবন সন্দর্ভ—ভিক্টোরিয়া প্রেস। মূল্য ।৵০, গ্রন্থকারের নাম নাই। ভূমিকায় আছে, "প্রবন্ধ গুলির অধিকাংশই জীবনগত বা পরীক্ষিত ঘটনা সূত্রে আমার মনোমধ্যে সময়ে সময়ে উদ্ভাসিত হয়।" প্রবন্ধগুলি ভগবদ্ভক্তিমূলক; ইহা পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন।

১২। গুরু ও সাধন তত্ত্ব—শ্রীকালীনাথ দত্ত প্রণীত; কালিকাপ্রেস। কালীনাথ বাবু যেমন একজন ভগবদ্ভক্ত এবং চরিত্রবান ব্যক্তি, তেমনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক। এই পুস্তকে ৬টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার ৫টীই নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ কয়টী লেখকের চিন্তাশীলতা এবং পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়,ইহাতে কেবল একদিকেরই যুক্তি এবং মত প্রদর্শিত হইয়াছে, মতামতের নিরপেক্ষ আলোচনা হইয়াছে বলা যায় না। যে সকল মত অতি প্রাচীনত্বের পঙ্কিল জঞ্জালে পরিপূর্ণ, নবীন যুগের এই প্রখরদীপ্তির দিনে,সে সকল লইয়া আলোচনা করা,কালীনাথ বাবুর ন্যায় বিজ্ঞ ভক্তের পক্ষে কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, বুঝিতে পারি না। যাহা হইবার নয়, তাহা করিবার চেষ্টা কখনই সুফল প্রসব করিবে না। আত্মা ও পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ সংস্থাপনের যুগে এ সকল কথা সর্ব্বত্র আদৃত হইবে, আশা করি না।

১৩। ফুলশয্যা—বিয়োগান্ত দৃশ্য কাব্য শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য,এম, এ, প্রণীত; শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲। ধর্ম্মপ্রাণ রাজপুত বীরের অদ্ভুত স্বদেশপ্রেম এবং অতুলনীয় বীরত্বের কাহিনী শুনিলে স্বভাবতঃই হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। পাঠানরাজ লোলাখাঁর হস্ত হইতে তুদা রাজ্যের পুনরুদ্ধার এই দৃশ্যকাব্যের বর্ণিত বিষয়। দুঃখের বিষয়,গ্রন্থকার এই অসাধারণ স্বার্থত্যাগ এবং বীরত্বপূর্ণ ঘটনাটীর সমুচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। গ্রন্থকারের আত্ম-সংগোপন দৃশ্য-কাব্যের একটী প্রধান ভূষণ; ক্ষীরোদ বাবু ইহাতে বিশেষ কর্ত্তৃত্ব দেখাইতে পারেন নাই; ছন্দ মিলন এবং শব্দবিন্যাসও তাদৃশ প্রীতিকর হয় নাই। চরিত্রাঙ্কনে গ্রন্থকার বিশেষ নিপুণতা দেখা-

ইয়াছেন। দুই এক স্থানে পত্রাচ্ছাদিত কুসুমের ন্যায়,সুন্দর কবিত্ব বিকশিত হইয়া, বইখানির অতুল শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।

১৪। চিত্র ও কাব্য—শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত; আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস্; মূল্য ১. । চিত্র এবং কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটী সুন্দর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লইয়া এই পুস্তকখানি রচিত। ইহাদের সমস্তই গত তিন বৎসর সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার সংস্কৃত কাব্যাদি অধ্যয়নের ফল স্বরূপ যে কয়টী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই উপাদেয় হইয়াছে। ভাষা পরিপাটী।

১৫। আহুতি—জীবন সঙ্গীত। গায়কের নাম নাই। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-পূর্ণ কতকগুলি সুন্দর সুন্দর কবিতা। এই অজ্ঞাত কবির ভাষার মাধুর্য্যময় সরলতা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ভাবের অভিব্যক্তি ভাষাতে, এই ভাষার মধ্য দিয়া কবির হৃদয়ান্তঃপুরের রাস্তা। প্রবেশ-দ্বারের সৌন্দর্য্য-ছটায় দর্শকের মনকে নরম করিয়া দেওয়া, অল্প নিপুণতার পরিচায়ক নহে। তার পর ভিতরের কথা; এখানেও মৌলিকতা-পরিশূন্য কেবল "True copy"র ছড়াছড়ি নহে; সুস্নিগ্ধ অভিনবত্বও যথেষ্ট আছে।

১৬। প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি—'আসাম প্রবাসী' প্রণীত। শিলং সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত। ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধই পূর্ব্বে নবজীবন, নব্যভারত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে,সুতরাং পাঠকের নিকট তাহার নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। গ্রন্থকারের সকল প্রবন্ধেই আসামের বিবরণ সুন্দররূপে বিবৃত, কেবল তাঁহার বন্ধুর মণিপুর যাত্রীর দিনলিপি''তে মণিপুরের প্রাণিহরণ অর্থাৎ স্বাধীনতা হরণ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভূতিভুকের ধৃত লেখনীতে যা সম্ভব,দিন লিপিতে তাহাই দেখিলাম।

১৭। ইহকাল ও পরকাল—শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রণীত; মূল্য ১.। এই সুন্দর পুস্তকখানির বিস্তৃত সমালোচনা পরে করিব।

১৮। হাসি ও খেলা—জ্ঞানমুকুল প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত, মূল্য ॥৵০। এ পৃথিবীতে বালকবালিকার জন্য কিছু লেখার ন্যায় শক্ত কাজ আর কিছুই নাই। অতি অল্প ব্যক্তিই এই পবিত্র কাজে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন; আমাদের দেশে, এ পথের প্রধান নেতা ৺প্রমদাচরণ সেন। প্রমদাচরণ সচিত্র সখা সম্পাদন কার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইয়া এদেশে অমর হইয়াছেন। বঙ্গের যে পরিবার বাঙ্গলা-সাহিত্য-জগতের প্রদীপ্ত রশ্মিস্বরূপ,সে পরিবারও বালক বালিকার শিক্ষার উপযোগী, পত্রিকাপ্রকাশে তাদৃশ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। বাবু যোগীন্দ্রনাথ নব উৎসাহে, এই গুরুতর, এই অতি পবিত্র কাজে মনোনিবেশ করিয়া সর্ব্ব সাধারণের যে বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহাকে এই কাজের বিশেষ উপযোগী বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে। প্রবীণত্বের গাম্ভীর্য্যে যখন এই নবীন লেখকের লেখনী সংযত হইবে, এবং ভাবের সহিত মতের, মতের সহিত ভাষার সমন্বয় হইবে, তখন এই লেখক অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করি। তৎপূর্ব্বে কঠোর সাধনায়,কৃতকার্য্যতার গরিমা-পরিবর্জ্জনের নির্ম্মম সংযমে এই নবীন লেখকের সিদ্ধি লাভের একান্ত প্রয়োজন। কেন না,এই স্থলেই বহু সাহিত্য-সেবীর অকাল মৃত্যু ঘটে। হাসি ও খেলা, এদেশে অভিনব পুস্তক;—সখা,বালক ও সাথীর অভিব্যক্তি। ইহাতে সোজা ভাষায় অনেক ভাল কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। চিত্রগুলি অতি চিত্তাকর্ষক। ছাপা পরিপাটী। তবে পশু পক্ষী মানুষের ন্যায় কথা বলিতেছে, এরূপ শিক্ষায় বালক বালিকারা মিথ্যা কথা বলিতে শিখে কি না,আমাদের সন্দেহ আছে। গ্রন্থকার পাশ্চাত্য জগতের অবশ্য পদানুসরণ করিয়াছেন,কিন্তু তাহা সঙ্গত কি না,বিবেচনা করা উচিত। সরল করিয়া ভাল কথা শিখাইবার আর কি কোন উপায় নাই? যাহা বিরুদ্ধে বলিবার বলিয়াছি। এ পুস্তকে গুণের ভাগ অনেক বেশী। মোটের উপর পুস্তকখানি সুন্দর হইয়াছে। সর্ব্বত্র আদৃত হইবে,

...মূল্য আর কিছু কম হইলে ...হইত। পারিতোষিকের পক্ষে ইহা অতি সুন্দর পুস্তক।

১৯। পরিমল—শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।০। এই গীতিকবিতা পুস্তকখানি বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি। কাব্যকাননে অনেক ফুল ফুটে, অনেক ফুল শুকায়, পরিমল থাকে অতি অল্প ফুলে; সৌন্দর্য্য ফুল মাত্রেরই চিরসঙ্গিনী ধন, তাহাও ... অতি অল্প ফুলে শোভা পায়। ... কথা বলিতেছি না, বঙ্গদেশের ... বলিতেছি। এই গীতিকবিতার সকল ... যে পরিমল পাইলাম, তাহা বলি না, অন্ধ, কবির উপহার, সংসার, লর্ড টেনিসন, অজ্ঞাতবাসে প্রভৃতি কবিতায় যে পরিমল পাইলাম, তাহা যে কোন কবির যোগ্য। এই নবীন কবি, প্রেমিক, ভাবুক, চিন্তাশীল এবং সুনীতির পক্ষপাতী। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত স্থলে প্রতিভার বিকাশ হইলে, ইঁহার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকানন সুকোমল পুষ্পরাজির বিশুদ্ধ পরিমলে পরিপূর্ণ হইবে, কবিকে আমরা সাদরে অভিবাদন করিতেছি।

২০। স্বপ্নলিপি—শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এ লিপি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত, কিন্তু ইহাতে লিপিচাতুর্য্য কিছুই নাই।

২১। মনোরমা (উপন্যাস)—শ্রীকুমার কৃষ্ণ মিত্র প্রণীত। ইহাও আমাদের চিত্তরঞ্জক বোধ হইল না।

২২।২৩। দারোগার দপ্তর—...—দুই দারোগা—শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা ভাল, পড়িতে বেশ আগ্রহ জন্মে, কিন্তু 'দুই দারোগা' পড়িয়া তেমন সুখী হইলাম না।

২৪। প্রহ্লাদ—মূল্য ।০ আনা। উপ... ধর্ম্মপ্রচারক আর্য্যদর্শন সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্‌-এ বির- ... মহাত্মার জীবনী ... নূতন ধরণে, নূতন ভাবে বিদ্যাভূষণ মহাশয়, উপন্যাস রূপে প্রহ্লাদচরিত্র প্রকটিত করিয়া, দেশের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। আমরা আশা করি, বঙ্গবাসী নরনারী তাঁহার এই 'প্রহ্লাদ' পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন। গ্রন্থের প্রথমে ধ্যানময় অগ্নিবদ্ধ প্রহ্লাদের ছবি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর। প্রিয়গোপাল বাবুর বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি অতি সুন্দর হইয়াছিল, এখানিও তদ্রূপ হইয়াছে।

২৫। শরীর ব্যবচ্ছেদ ও শরীরতত্ত্ব-সার;—নিদান-তত্ত্ব, চিকিৎসা-তত্ত্ব, রোগ নির্ণয়-তত্ত্ব প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র (এম, আর, সি, পি, লণ্ডন) সঙ্কলিত, মূল্য ৩৷৵০। শরীর ব্যবচ্ছেদে (Dissection) পারদর্শিতা না জন্মিলে শরীর-তত্ত্ব (Anatomy) শিক্ষা করা যায় না। বাঙ্গলা ভাষায় ইংরাজি এনাটমির অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, বটে কিন্তু ব্যবচ্ছেদ-তত্ত্ব এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এজন্য মেডিকেল স্কুল সমূহের ছাত্রগণের যার পর নাই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। উৎকৃষ্ট চিত্রপটে ইংরাজী এনাটমি শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা ভাষায় আজও সেরূপ চিত্রপট প্রস্তুত হয় নাই। বাঙ্গালা এনাটমিতে যে চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাও তাদৃশ সুন্দর নহে। এজন্য, শরীরব্যবচ্ছেদ পক্ষে, বাঙ্গালা ভাষায় শরীরতত্ত্ব শিক্ষার্থীগণের বড়ই অসুবিধা ছিল। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, সুযোগ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের চেষ্টায় সে অসুবিধা তিরোহিত হইল। ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিলাতে গমন করেন এবং সেখানে এম, আর, সি, পি উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি একজন বিচক্ষণ শরীর-তত্ত্ব-বিদ পণ্ডিত। বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহার প্রভূত ক্ষমতা ... পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। আশা করি, ছাত্রগণের নিকট এ পুস্তক বিশেষ আদৃত হইবে। যেরূপ উৎকৃষ্ট প্র... হইয়াছে ... দিগের বিশেষ সহায়তা করিবে, ... আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যার পর নাই সুখী হইয়াছি।